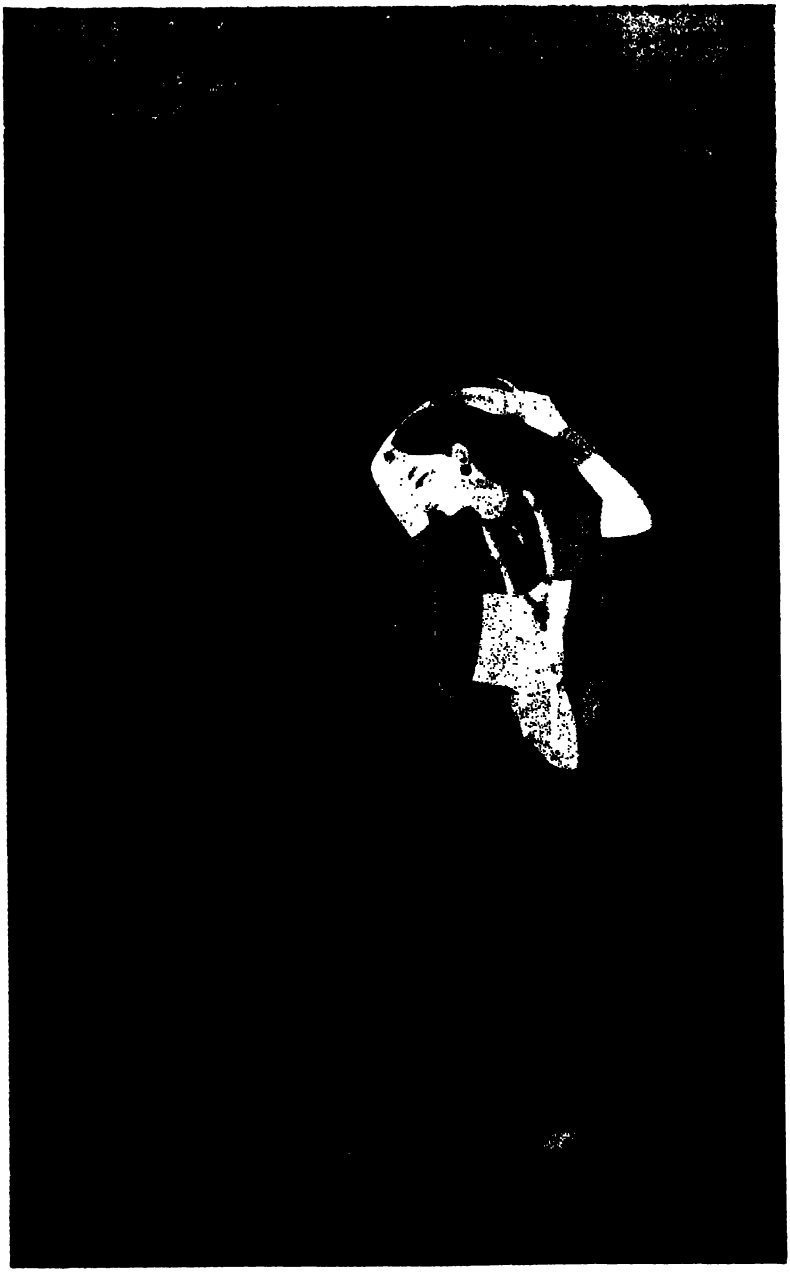


রূপসী

চিত্রাধিকারী--Mr. W. Gregory
এবং 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সৌজন্যে



রূপসী

চিত্রাধিকারী--Mr. W. Gregory

এবং 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সৌজন্যে

বিচিত্রা

চতুর্থ বর্ষ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৩৭ | প্রথম সংখ্যা

আত্মার জাগরণ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিদিন নিজকে বল্‌তে হবে, 'জাগো'। আমাদের প্রকৃতির সকল অংশ হতেই জড়তা ঘোচাতে হবে। আমাদের সকল দিকেই চৈতন্যকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে হবে। নিজের সকল রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়ে বল্‌তে হবে, জাগো। জ্ঞানে বিজ্ঞানে সাহিত্যে শিল্পে কল্যাণকর্ম্মে মানুষের এই বাণীই ফুটচে—জাগো। মানুষের দেহের চোখ যেমন ক'রে ফুটেচে,—অর্থাৎ যেমন ক'রে আকাশের আলোর ডাকে অনায়াসে সাড়া দিচ্চে, অন্তরের চোখ তেমন ক'রে ফোটে নি; সেখানে যে জ্যোতির অভিঘাত হচ্চে তার সাড়া অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট ক'রে মিল্‌চে না—সেখানে বাধা র'য়ে গেল; সেখানে প্রদোষের অন্ধকার; সেইজন্যে সেখানে কত সংশয়, কত ভয়, কত কল্পনা-কুহেলিকা, তন্দ্রার ছায়ায় মিলে কত উপছায়া রচনা।

একদিকে ভূর্ভুবস্বঃ, বিশ্ব-সৃষ্টির ধারা, আর একদিকে আমাদের ধিয়ঃ, আমাদের চৈতন্যের ধারা,—এই দুই ধারা যে পরম সত্যের মধ্যে, যে জ্ঞানময় পরম একের মধ্যে ঐক্যলাভ করেচে সেই অনন্তের মধ্যে জাগা, সেই আমাদের পরম জাগা। বাইরের আকাশে আলোক দেখা এবং সেই আলোকের মধ্যে সমস্ত বস্তুকে দেখা, এই হ'ল আমাদের চোখের সার্থকতা; তেমনি চৈতন্যময় ভূমাকে আপন উদ্বোধিত চেতনার নিষ্কলুষ দৃষ্টিতে দেখা এবং সেই চৈতন্যময় ভূমার মধ্যেই সমস্ত কিছুকে দেখা, এই হচ্চে আত্মার সার্থকতা। এই হচ্চে সত্যের দেখা, কেবলমাত্র বস্তুকে দেখা নয়; এই দেখার জন্যেই আত্মার গভীরতম আকাঙ্ক্ষা। এই সত্যের মধ্যে দিয়ে সমস্তকে যদি না দেখি তা হ'লে বিশ্বজগৎ মানুষের পক্ষে নিরর্থক হয়; তা হ'লে ক্ষীণপ্রাণ দেহে যেমন সকল রকম ব্যাধি জোর পেয়ে বাসা বাঁধে তেমনি আমাদের ক্ষীণসত্য জীবনযাত্রায় যত রকম দুঃখ তাপ অকল্যাণ আপন অধিকার বিস্তার করতে থাকে।

এই চোখে-দেখার কানে-শোনার জগৎকে আমরা মনে করচি যেন চিনলুম, কিন্তু তাকে তার নিজেরই মধ্যে কখনই চেনা যায় না। এই জন্যে তাকে তারই মধ্যে দেখে মানুষের পূর্ণ পরিতৃপ্তি নেই। এই জন্যেই প্রভাতে মানুষের চিত্তে এই উদ্বোধনের গান এসেচে :—

বিমল আনন্দে জাগরে,
মগন হও সুধাসাগরে।

যে জাগা বিশ্বকে কেবল চোখে দেখে না, কেবল জ্ঞানে দেখে না, যে জাগা তাকে আনন্দের মধ্যে দেখে, অমৃতময় পরিপূর্ণতার মধ্যে দেখে, এ সেই জাগার গান।

এ'কে বাধা দেয় আমাদের ছোট প্রয়োজনের জীবন, সেই জীবন যা কেবলমাত্র অভাবকেই প্রকাশ করে। একমাত্র সেই অভাবের চিন্তা, সেই দীনতার অভ্যাসই ক্রমে আমাদের পক্ষে চরম হ'য়ে আসে। এই কাঙালের পথের উল্টা দিকে একটা ভাবের রাজ্য, একটা অমৃতের রাজ্য আছে সেই কথাটা ভোলবার অভ্যাস আমাদের প্রতিদিন পাকা হয়ে আস্‌তে থাকে। সেই অভ্যাস আমাদের অধিকারকে সঙ্কীর্ণ করে, আমাদের লক্ষ্যকে ক্ষুদ্র করে, বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধকে সত্যভ্রষ্ট করে। এই জন্যেই পদে পদে এত ভয় ভাবনা, এত দ্বন্দ্ব বিরোধের সৃষ্টি হয়। সেই ছোট বাসনা, ছোট লক্ষ্যের জড়তা থেকে মানুষ আপনাকে জাগাতে চাচ্চে।

উৎসবের দিন এই জন্যেই সংসারের প্রতিদিনের থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে বিশেষ সাজ ক'রে বিশেষ গান কণ্ঠে নিয়ে দেখা দেয়। তবু মানুষের যান্ত্রিক অভ্যাস মানুষকে সহজে ছাড়তে চায় না। আনন্দের গান গাবার, মুক্তির বার্ত্তা দেবার একটি নির্দ্দিষ্ট দিনকেও তার তিন শ' চৌষট্টি দিনের অসাড়তা চাপা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তবু এ কথা মনে আছে যে, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—সত্য ক্ষীণ আকারে দেখা দেয়, কিন্তু বিপুলায়তন অসত্যকে সে আঘাত করতে পারে। চৈতন্যের স্ফুলিঙ্গ দৈবাৎ ঠিক জায়গায় পড়লে ভূরি পরিমাণ অসারতাকে সে দগ্ধ করতে পারে। সেই জন্যে সম্বৎসরের মানসিক অভ্যাসকে একদিনের জন্যেও আঘাত করতে চাই—বাধাকেই একান্ত বড় ব'লে বিশ্বাস করতে চাইনে। দরজাটা অতি ছোট বটে, কিন্তু খুলে দেবামাত্রই দেখি অসীম আকাশভরা আলোক। এই আলোককে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে পাবার যদি কথা থাকৃত তা হ'লে আলোককে পাওয়া কথার কথা হয়ে দাঁড়াত। আসল কথা, সকলের চেয়ে বড় যা তা সহজ হ'য়েই দাঁড়িয়ে আছে—ছোটটাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়াই শক্ত। কেন না, সেই ছোটই যে নিজেকে বড় ব'লে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত আমাদের কানে মন্ত্র দিয়েচে। তার উপরে যতই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েচে, আত্মার উপর ভূমার উপর বিশ্বাস ততই দুর্ব্বল হয়েচে। এই আত্ম-অবিশ্বাসই আমাদের সব চেয়ে বড় বাধা। উৎসব দিনের উদ্বোধন যেন এই আত্ম-অবিশ্বাস থেকেই আমাদের জাগিয়ে দেয়। এই আত্ম-অবিশ্বাসই আত্মা সম্বন্ধে অচেতনতাকে স্থায়ী করে, এই হচ্চে গভীর নিরানন্দ; এইখানেই সকল ভয়, সকল অবসাদ, সকল অক্ষমতার মূল আকর—এরই বিষময় আবেশ থেকে জাগো জাগো—

বিমল আনন্দে জাগরে
মগন হও সুধাসাগরে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বরূপ

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

হে অচ্যুত ! ' অভিনব তব বিশ্বরূপ
অনুভবে দেখিয়াছে পরাণ আমার !
কল্পনা ধারণাতীত বিস্ময়ের কূপ,—
কালাতীত,—সীমাতীত, বিপুল আকার !

নতোন্নত মহানীল অনন্ত আকাশ—
দিগন্তে দেখায় যেই আনতি নাড়ীর—
গাঢ় রক্তবহা নীল,—শুদ্ধ রক্তোচ্ছ্বাস
যার প্রভাতে প্রদোষে,—যার পরিধির

সীমা—নাই, ক্ষুদ্র স্নায়ু সে তোমার দেহে,
সূচী অগ্রে রক্তকণা সহে দিনকর
পরিবৃত সংখ্যাতীত গ্রহ উপগ্রহে ;
কোথা এ বিরাট দেহে কোথা আমি 'নর' ?

রেণু হ'য়ে অণু হ'য়ে কোথা মিশে যাই,
নিজেরে খুঁজিয়া নিজে দেখিতে না পাই !



যুগান্তরের কথা

—উপন্যাস— —শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী

৯

সম্বন্ধ

"বাহিরে তোমার ঐ স্নাথ ছবি ভগ্ন-ভিত্তি লগ্ন মাধবী
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি হেরিয়া হাসিছে স্নেহে!
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি প্রাচীন তোমার গেহে।"

"তার পরে ঠাকুর্ঝি?"

"আজ আর নয় বৌ! ঐ দেখ কনে এল এ বাড়ীতে দলবল সঙ্গে! গাঁয়ের ছেলেমেয়ে বুঝি আর ঘরে কেউ নেই! দেখি, দিদি ঠাকুরুণ ঠাকুরতলা থেকে এসেছেন কিনা,—আদর করে তুলে নিতে হবে যে! দিদির সব দিনই সমান! মেয়ে জেঠির বাড়ী আস্‌ছে তাও যদি একটু ভাবনা আছে!"

ছোটবৌর কানে তখন এসব কথা কিছুই প্রবেশ করিতেছিলনা, তার মন তখন সেই দূর অতীতের মধ্যে, কানেও বাজিতেছিল ক্ষণকাল পূর্ব্বের সেই গভীর অনুভূতিভরা রুদ্ধ কণ্ঠস্বরের মৃদু মৃদু ভাষায় সেই সাংঘাতিক কাহিনী! সে স্তব্ধভাবে শুধু উঠানের সেই আনন্দের বিচিত্র অভিযানের দিকে চাহিল মাত্র। কিছুই যেন বোধগম্য হইতেছিল না। নানা কলভাষায় ও ঘুঙুরের শিঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবিকার কণ্ঠস্বর কানে আসিল, "কইগো কনের জেঠিমা কই? বেলা যাচ্ছে দেখে ভাইতো গিয়ে জেঠিমার প্রতিনিধি হয়ে বোন্ নিয়ে এল, এখন ঘরের কর্ত্রী কই?" কোথা হইতে কিশোরী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "বলনা কি করতে হবে? তাঁর এখনো পূজো হয়নি যে! কনে ঘরে তুলতে হবে বুঝি তারই জন্যে এত চেঁচামেচি? 'এসতো—" বলিয়া দুই হাতে কনের দুই হাত ধরিয়া কিশোরী তাহাকে গৃহাভিমুখে টানিয়া লইয়া চলিল। অভিভাবিকা সত্রাস কণ্ঠস্বরে বলিলেন, "হয়েছে হয়েছে থাম বাপু, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। দস্যি মেয়ের সব তাতেই দস্যিমি। তোমাকে ঘরের গিন্নির পদ কে দিলে?" রাধাদাসী এতক্ষণ একটু দূরেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে একে শূদ্রা, বিধবা, তাহাতে তাহার সর্ব্ব বিষয়ে কুণ্ঠার অনেক কারণই বর্ত্তমান ছিল, এখন তাড়াতাড়ি বড় ঘরের দাওয়ায় একখানা পুরাতন বৃহৎ সতরঞ্চ টানিয়া পাতিয়া দিতে দিতে ঈষৎ মৃদুস্বরে বলিল, "কে আর দেবে দিদি, যে বোঝাবার সেই বুঝিয়ে দেয়।" অভিভাবিকাও একটু কোমল সহানুভূতির সঙ্গে বলিলেন, "সত্যি, এইতো ওর—" রাধার ইঙ্গিতে এই অর্দ্ধোক্তিতেই তিনি থামিলেন। রাধা ততোধিক মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ কর দিদি, এখনি রেগে কেঁদে ছুটে পালাবে।"

উঠানে সকলের পশ্চাতে যতীন দাঁড়াইয়া ছিল। সতরঞ্চখানার বৃহত্ত্ব দেখিয়া ব্যস্তভাবে "দেন আমি পেতে দিচ্চি" বলিয়া দাওয়ায় উঠিয়া রাধার সতরঞ্চের একদিক ধরিতেই কিশোরী তাহার অন্যদিক ধরিয়া যতীন সেটা ভাল করিয়া ধরিতে না ধরিতেই একটানে হস্তচ্যুত করিয়া দিল। "তুমি পাতবে কি? তুমি না কুটুম্ব মানুষ? পিসি আর আমি পাত্‌ব।" আবার সেই দ্বন্দ্বের উপক্রম দেখিয়া রাধা তাড়াতাড়ি "সত্যি কথাই তো বাবা, তুমি ব'স আমরা পাত্‌ছি" বলিয়া মুখ নীচু করিয়া মৃদু হাস্য লুকাইতে লুকাইতে সতরঞ্চি পাতায় মনোনিবেশ করিল। অভিভাবিকা অবাক্ অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, "যতীনেরও অধিকার আছে তা জানিস? যতীন যে তোর জেঠিমার ছেলে।" কিশোরী যতীনের দিকে তাহার কালো মেঘের মত চোখের দৃষ্টি বিদ্যুৎ খেলাইয়া ঝটিকার মত ভ্রুভঙ্গী তুলিয়া বলিল, "হাঁ তাই বইকি! তা হলে এতদিন ছিলেন কোথায়?" যতীনের মুখের হাসি একটু মলিন হইয়া গেল। সে মাথা নামাইতেই রাধা বলিয়া উঠিল, "আর তুই! তুই বা কোথায় ছিলি, কোথায় থাকিস্?" "যেখানে খুসি আমার!" বলিয়াই কিশোরী রান্নাঘরের দিকে ছুটে দিল। সেই ভরা হেঁসেলের মাঝখানে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বাঃ কাকিমা, 'আঁদোসা' যে চুঁয়ে যাচ্চে! উঠোনের দিকে কি দেখ্‌ছ?"

উঠানে তখন কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী আসিয়া দাঁড়াইয়া সাদর বচনে সকলকে আপ্যায়িত করিতে করিতে হাতের ফুলের সাজি একদিকে রাখিতেছিলেন। পরণে তাঁহার ঈষৎ গৈরিকাভাযুক্ত বসন, রুক্ষ চুলের রাশিতে তাঁহাকে যেন যোগিনীর মতই দেখাইতেছিল। ক্ষণ-পূর্ব্বের কথিত কাহিনী-মগ্নহৃদয়া ছোটবৌ স্তব্ধ হইয়াই তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিল। ইঁহাকে দেখিয়া রাধাদাসীবর্ণিতা সেই দুই যুগ পূর্ব্বের রাধারাণী মূর্ত্তি বিবাহের কথা এবং ষোড়শী কৃষ্ণ-প্রিয়ার সেই নিদারুণ বৈধব্য সব যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার কল্পনাকুশল মনশ্চক্ষে ভাসিতেছিল।

"ও কাকিমা, মালপুয়া পুড়ে যায় যে! এর নাম এখানে বলে 'অাঁদোসা,' তা জান? গড়নটাও করে ঢিবি ঢিবি অন্য রকম। কি বিচ্ছিরি নামটা, না কাকিমা?" কাকিমা তখন সংসক্ত হইয়া হস্তের কার্য্যে মন দিয়াছেন। বাহিরে আনন্দালাপ চলিতেছিল "আপনি ছিলেন না, আপনার দেওরপো আর ভাইঝিই যা করবার সব করেছে, কিন্তু ভাইঝির দাপটে ছেলের বেশী এগুবার যো নেই। বেচারী বোন এনে জেঠিমার ঘরে তুলে দিয়েই একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।" কৃষ্ণপ্রিয়া প্রফুল্ল দৃষ্টিতে যতীনের পানে চাহিলেন। মুখে কিছু না বলিলেও সেই দৃষ্টিতেই যতীন আনন্দিত হইয়া উঠিল। জেঠিমা মৃদুস্বরে বলিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন যতীন, বোস!" অভিভাবিকা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ঘরের কর্ত্রী কিশোরীরাণীর যে কর্ত্তৃত্ব, কিজানি না বস্‌তে বল্‌তেই বস্‌লে যদি কোন ফ্যাসাদ বাধে তাই বোধহয় যতীন্ একপাশে দাঁড়িয়ে আছে!" তাঁহারা তখন কনে সহ সদলে বিস্তৃত সতরঞ্চের উপর চাপিয়া বসিয়াছেন। যতীনের সলজ্জ হাসিভরা মুখের পানে আবার প্রফুল্ল দৃষ্টি মেলিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন, "বোস"। যতীন বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের ভগিনীর পার্শ্বেই বসিয়া পড়িল। কৃষ্ণপ্রিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কিশু তাহলে এসেছে এই সঙ্গে। আমার ভয় হ'য়েছিল আজ আর বুঝি এই সব ব্যাপার দেখে এদিকে ঘেঁসবেই না।"

"ওদের সঙ্গে নয় পিসিমা! আমি অনেক আগে এসেছি।" রান্নাঘর হইতে কিশোরী চেঁচাইয়া উত্তর দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাসিয়া উঠিল। কিশোরী বাহিরে আসিবার জন্য উঠিতে যাইতেছিল, সেই হাসির শব্দে রাগে স্তব্ধ হইয়া আবার সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

মালপুয়া ভাজিতে ভাজিতে ছোট-বৌ ভাবিতেছিল কৃষ্ণপ্রিয়ার এই বিবাহ এই বরকনে সেই শ্বশুরবাড়ীর বংশীয় এই দেওর-ঝি দেওর-পোদের না জানি কেমন লাগিতেছে!

সন্ধ্যা না হইতেই বধূর দ্বিরাগমনের অভ্যর্থনাসূচক মাঙ্গলিক ভার স্বরূপ দুই হাঁড়ি দই সন্দেশ থালায় করিয়া পান সুপারি বাতাসা এবং বড় একটা মাছ কৃষ্ণপ্রিয়ার উঠানে আসিয়া পড়িল, এবং সন্ধ্যার পরে যাহারা বধূকে লইয়া এবাড়ী আসিয়াছিল তাহারাই নূতন যাত্রীর মত বধূকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বরকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া আর একবার মঙ্গল-অভিযান করিল। আর একবার হাসি গল্প আনন্দ কোলাহল জাঁকিয়া উঠিল। তারপর সকলের আহারপর্ব্ব শেষ হইলে শঙ্খ ও উলুধ্বনির সঙ্গে বরের দ্বারা কনের হস্ত ধারণ করাইয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া সকলে সদলে বিবাহবাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। কিশোরীর মাও এ দলে ছিলেনি, তিনি কন্যাকে আহ্বান করিতেই সে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "আমি এখনি তোমাদের বাড়ীর লোক হ'তে পারবনা। আজ আমি এই বাড়ীই থাক্‌ব।"

মা একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে দাঁড়াইলেন। রাধা ব্যস্ত ভাবে বলিল, "পরিবেষণের ধূমে ওর কি খাওয়া হয়েছে বৌঠাকুরুণ? খাওয়া হোক্ তার পরে—"

"তারপরে কি? আমি আজ তোমার কাছেই শোব! না মা, কাকিমা আমায় রান্না ঘরেই একটা 'পাটিসাপ্‌টা' আর একটা মালপুয়া খাইয়ে দিয়েচে, তুমি যাও বাপু বরকনে বরণ ক'রে তোল গে! তোমার খুড়িমা এখনি "বড় বৌমা কই" ব'লে চেঁচাতে লাগ্‌বেন। আমি আজ যাচ্চিনা, আর আমি কিছু খাবওনা।" সে জানিত যে মা তাহার সম্মুখে না উপস্থিত থাকিলে তাহার খাওয়া মঞ্জুরই হইত না। তাই তাহার খাওয়া শেষের কথা মাকে জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিতে চেষ্টা করিল। তাহার কাকিমার তখনো রান্নাঘরের কাজ শেষ হয় নাই, কিশোরীর আহারে আপত্তি শুনিয়া বলিলেন, "কেন

বাপু, তখন যে পরে খাব বল্লি! বাড়ীর লোক হ'য়ে তখন যে কত গিন্নিত্ব করা হল—"ওদের সঙ্গে খাব কি গো? ওরা যে নেমন্তন্নে লোক, ওদের পরিবেষণ করব!" আর এখন, আর খাবনা কি?" কিশোরী গোঁজ হইয়া দাঁড়াইল। রাধা বিপদ দেখিয়া কৃষ্ণপ্রিয়াকে ইঙ্গিত করিতে তিনি আসিয়া কিশোরীর স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন, "মাছের ডাল্না রয়েছে, ওগুলো যে নষ্ট হবে তুমি না খেলে কিশু? সকলকে খাইয়ে শেষে যা থাকে তাইত পরিবেষণীকে খেতে হয়। নইলে বাড়ীর লোক কিসের?" কিশোরী আর বাক্য ব্যয় না করিয়া কাকিমার কাছে গিয়া খাইতে বসিল বটে, কিন্তু গজ্ গজ্ করিতে করিতে বলিল, "তবে ওঁর ছেলে না দেওরপো যিনি যতীনবাবু গো,—তিনি কেন সাত্ কুটুম্ব সেজে আগেই খেয়ে গেলেন? ভারি তবে বাড়ীর লোক!" কাকিমা হাসিটী একা হজম করিতে না পারিয়া সকলের কাছে সেটী প্রকাশ করিয়া ফেলিতে বড় বধূ বলিলেন, "ও তাই ওর রাগ? সত্যই তো যতীনের অন্যায়! তারও উচিত ছিল এখন রান্না ঘরের দাওয়ায় পীঁড়ে পেতে ব'সে সব হাঁড়ির "শেষানি কোসানি" মুছে পুঁছে খাওয়া! দাঁড়া যতীনকে গিয়ে বল্‌ছি একথা!"

কিশোরী মুখে আহার পুরিয়া গোঁ গোঁ করিয়া বলিল, "বলগে না বড় ব'য়েই গেল! সবাই বলছেন বাড়ীর লোক আপনার ছেলে—ভারি তো"! সকলের উচ্চ হাস্যের মধ্যে কৃষ্ণপ্রিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শাশুড়ীর ডাকা-ডাকিতে বড়বধূ ছোট বধূ আর বেশীক্ষণ তিষ্টাইতে পারিলেন না। হেঁসেল যেমন তেমন করিয়া সারিয়া তাঁহাদের ছুটিতে হইল, কেন না তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া মাঙ্গলিক ক্রিয়া দর্শন এবং আশীর্ব্বাদ না করিলে খুড়শাশুড়ীর মন সন্তুষ্ট হইবে না। কিশোরী নিবিষ্ট চিত্তে পরম নিশ্চিন্ত ভাবে খাইতেই লাগিল। রাধা বড়বধূকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিল যে, খাওয়ার পরে বুঝাইয়া সে নিজে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া আসিবে। কিন্তু বেশী আর বুঝাইতে হইল না, খাইতে বসার অলসতার অবসরে কিশোরীর ঘুম আসিতেছিল, সে একটু পরেই হাত মুখ ধুইয়া প্রায় ঢুলিতে ঢুলিতেই যেন বলিয়া বসিল, "পিসিমার কাছে যাব!" রাধা ও কৃষ্ণপ্রিয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

রাধার সঙ্গে কিশোরী বাড়ীর বাহির হইতেছে, এমন সময়ে যতীন্ ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়াই কিশোরী যেন সজাগ হইয়া রাধার কানে মুখ রাখিয়া বলিল, "এতক্ষণে ঘরের ছেলের বুঝি মনে পড়েছে বাড়ীর আর কেউ খেলে কি না, তাই দেখ্‌তে—"

রাধা তাহার মুখখানা মৃদুভাবে চাপিয়া ধরিয়া যতীনের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বাবা, কিছু দরকার আছে?" যতীন দাঁড়াইয়া পড়িয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "জেঠিমার খাওয়ার কথন কি হল আজ?" "আজ আর তো হবিষ্যি কর্‌লেন না, এখন আহ্নিকে বস্‌ছেন। রাত্রে ফল দুধ খাবেন হয়ত।" "আমি প্রসাদ পেলাম না!" "বেশত কাল হবে বাবা"। কিশোরী ইতিমধ্যে মুখটা ছাড়াইয়া লইয়াছিল, আবার বলিয়া উঠিল, "এখন আবার তাঁর পূজোয় বাধা দিয়ে গল্প করতে হবে না, বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়ুন গে তার চেয়ে।"

রাধা ঈষৎ তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "তোর কি তাতে শুনি? ওঁর জেঠিকে দেবেন না আজ পূজো কর্‌তে! কাল্‌কে চ'লে যাবেন,—কথা কবেন না আজ?"

"উঃ ভারি তো দূরে যাওয়া কিনা! এর পর কি আর আসা যায়না না কি? তাই—" যতীন রাধার পানে চাহিয়া কুণ্ঠিত মুখে যেন এই কথার উত্তর স্বরূপই বলিল, "আমায় কলকাতা চ'লে যেতে হবে যে পিসি!" "তা বুঝেছি বাবা ও পাগলির কথা শুনো না"। "কাল সকালেই আস্‌ব, আজ আর থাক্" বলিয়া যতীন তাহাদের সঙ্গেই ফিরিয়া চলিল। মুখরা বালিকা আবার বলিল, "কিন্তু আমার নামে সকলের কাছে লাগিয়ে আমায় বকুনি খাওয়াবেন নিশ্চয় কাল?"

যতীন গম্ভীর মুখে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "নিশ্চয়।"

"সেতো বুঝ্‌তেই পার্‌ছি! পিসি তোমায় কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছি না আর! আমায় গল্প বলতে হবে শুয়েই আজ।" পিসি শঙ্কিত ভাবে বলিল, "এখনো যে কাজ আছে বাড়ীতে পাগলি। দিদি ঠাকুরুণের রাখাল কৃষাণ, আরও কে কে তাদের খেতে আস্‌বে, আজ তাদের খাওয়াতে হবে যে আমার।"

. . . .

"চল মাকে গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমায় থাক্‌তেই হবে"।

"আর দিদি ঠাকুরুণের যে এখনো খাওয়া হয়নি, তিনি একটু জলটল যা খাবেন, কে দেখে দেবে?" বালিকা আর উত্তর দিলনা, যতীন পশ্চাতে একটু দূরে দূরে আসিতেছিল এইবার সুযোগ পাইয়া একটু হাসিয়া বলিয়া ফেলিল, "গৃহকর্ত্রী সে কাজটা না সেরেই চ'লে এলেন যে বড়।" কিশোরী ভ্রুভঙ্গ করিয়া দাঁড়াইতেই প্রমাদ গণিয়া রাধা বলিল, "তুমিও লাগলে বাবা, একেই তো—" তাহার মৃদুস্বর ডুবাইয়া কিশোরী রুষ্ট উচ্চস্বরে বলিল, "নিজের ছেলে সে কাজটা সার্‌বেন ব'লে। নিজে খেয়ে দেয়ে দিব্যি চ'লে গেলেন আবার—" "যাবই তো। আমার পেয়ারা পাড়্‌তে দেওয়া হ'লনা, সতরঞ্চি পাড়্‌তে দেওয়া হ'লনা কুটুম্ব ব'লে।" "দেব নাই তো! অন্য দেশের লোক কুটুম না তো কি?" "দূরে থাকলেই যদি কুটুম হয় তো আরও তো অনেকে অন্য দেশে থাকে শুনি?" "পিসি কত আস্তে আস্তে চল্‌বে, আমার বুঝি ঘুম পায় না? আমি একাই চলে যাচ্ছি" বলিয়া কিশোরী দ্রুত পদে অগ্রসর হইল, পিছন হইতে হাস্যধ্বনির সঙ্গে "হেরে গিয়ে যে রাগে তাকে ছুয়ো দেয় না পিসি?" যতীনের এই মন্তব্যে তাহার রাগ আরও বাড়িয়া গতিকে দ্রুততর করিয়া দিল।

১০

"হে ধরণী, কেন প্রতিদিন তৃপ্তিহীন একই লেখা পড়ো ফিরে ফিরে?
—যে উত্তর লিখিতে উন্মনা আজো তাহা সাঙ্গ হইল না!
যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে বারম্বার মুছে ফেলো, তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে; অবশেষে একদিন জলশূন্য ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলিঘূর্ণিপাকে সব দাও ফেলে অবহেলে, আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।
তারপরে আর বার ব'সে ব'সে, নূতন আগ্রহে লেখো নূতন ভাষায়!
যুগ যুগান্তর চ'লে যায়।"

"সে আমি কিছুতেই শুন্‌বনা, বাকিটুকু শেষ কর।"

"বাকি আর কি শেষ কর্‌ব, আরতো বেশী কথা নেই। এখন যেমন দেখ্‌ছ তাই—না, দিদি ঠাকুরুণের কথা আছে বটে আরও কিছু।"

"তাইতো শুন্‌তে চাইছি, বল তারপরে ওঁরই কথা—"

"কিছু দিন একেবারে চুপ ক'রে থেকে শ্বশুরবাড়ী যাব ব'লে এমন জেদ ধর্‌লেন যে, সবাই কেঁদেও মরে ভয়েও মরে। সেইতো শ্বশুরবাড়ী, না জানি মেয়ের কি লাঞ্ছনা পেতে হবে এই পাগলামিতে। কিছুতেই কারও কথা শুনবেন না, না খেয়ে না নেয়ে এমনি কর্‌তে লাগলেন যে, শেষে এঁরা বাধ্য হয়ে সঙ্গে একটি ছোট্ট সম্পর্কের ভাই আর একটা ঝি এমনি কাকে কাকে দিয়ে পাল্কী ক'রে দিলেন পাঠিয়ে সেইখানে। দুই এক দিন না হ'তেই ভাই আর ঝি তো ফিরে এলো, দিদিই নাকি জোর ক'রে তাদের ফেরত পাঠিয়েছেন। তারা এসে যা যা বললো সে তো বুঝতেই পার্‌ছ, 'রাক্ষসি' ব'লে তারা বাড়ীতেই ঢুক্‌তে দেয় না। সমস্ত দিন কি রকমে দুয়োরে 'হত্যে' দিয়ে প্রায় দিনের শেষে সেখানের একজন মেয়েমানুষের দয়ায় ঢুকবার হুকুম হ'ল; তিনি বুঝি শ্বশুরের মা। বৈষ্ণব বাড়ীর মেয়ে ব'লে তারা বুঝি তাঁকে কি অভিষেক না কি ক'রে শুদ্ধ ক'রে নেবে বলেছে। বাপ খুড়ো না তাই শুনে দুঃখে রাগে গর্জ্জাতে লাগ্‌লেন, আর বল্লেন, "ঐ মেয়ের জন্যে কপালে এতও ছিল, আরও না জানি কত আছে, এখনো মরে তো ভাল!" মেয়েরা সব কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা স্থির হ'তে না পেরে আবার সেই বিন্দুর মা বুড়িকে পাঠিয়ে দিলেন পুরুষদের লুকিয়ে। তারা যা বলে সহ্য ক'রে কোন রকমে মেয়েটার কাছে থাক্‌বে, এই রকম শিখিয়ে পড়িয়ে দিলেন।

বোধ হয় দিন দশ বারোর মধ্যেই আবার একখানা পাল্কী এসে দরজায় নাম্‌লো। রাঙা দিদি ফিরে এসেছে শুনে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে দেখি পাল্কীর মধ্যে শুয়ে ঠিক্ যেন মরা রাঙাদিদি! আরও একবার এমনি ক'রে এসেছিল বটে, কিন্তু তখন তো তিনিও ছোট, আমি আরও ছোট। এ ঠিক্ যেন সতী-দেহ! বুড়ি মাগী "পাগল হ'য়ে গিয়েছে কৃষ্ণপ্রিয়ে" ব'লে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগ্‌লো। ধরাধরি ক'রে ঘরে তোলার পর তাদের পাল্কী তো চ'লে যাক্, সবাই ঘরে পাঠিয়েছে এও ভাগ্যি! বিন্দুর মা বল্লে, "তা কি পাঠাতো গো! আমি যখন কাঁদতে কাঁদতে এখানে

খবর দিতে আসি তখন পাল্কীতে তুলিয়ে দিল। এবারে তাদের তত দোষ নেই, মেয়েই বল্লে মন্তোর নেব অভিষেক হব, এমনি কি সব মা,—জানিও না সে সব কথা! ও যা যা বল্লে তারা তাই তাই ক'রে দিলে। মন্তোর হ'ল, ঘরেই তো কালীঠাকুর তাঁর পূজো বলি—এই সব হ'ল! সেই বলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ মেয়ে দেখ্‌লে একটু হেল্‌লো না। মাগো, এখনো গায়ে কাঁটা দেয়! সেই জিভ আর চোখ্‌ বের করা পাঁটার মুণ্ডুটার উপর সল্‌তে জেলে আরতি কর্‌তে লাগ্‌লো পুরুতে। মেয়েটার দায়ে ঠিক সেই সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম তাই নজরে পড়লো, তার আগে তো পালিয়েই ছিলাম। তার পরে কি হ'ল ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লাম মা—'কারণ' না কি বলে, সে বোধ হয় মা মদ, বোতলে করা তাই ঢেলে ঢেলে ছোট ছোট বাটী ক'রে মাছ মাংস ভাজা এই সব নাকি নৈবিদ্যি দেয় তারা। পূজোর পরে কেষ্টপ্রিয়ে নাকি বলেছিল, "ইষ্টি দেব্‌তার প্রসাদ পুরুষে আর সধবাতে খাবে আর অন্তে খাবে না কেন? প্রসাদ আবার সধবা বিধবা কি? তবে সে কেমন পূজো কেমন দেবতা?" মেয়ে নাকি জোর ক'রে তাই খেতেও গিয়েছিল। তারা "পাগল হয়েছে" ব'লে আট্‌কে রাখ্‌লে। সত্যিই মেয়ে যেন পাগলের মূর্ত্তি হতে লাগল দিন্‌কের দিন। পরশু তো আমাবস্তে গেল, তাদের বাড়ীতে তো ফি আমাবস্তেতেই পূজোয় পাঁটা বলি হয়, কার্ত্তিক মাসে তো মোষও পড়ে। অমন সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে বাড়ীর বড় ছেলে—সবাই কাঁদছে কাট্‌ছেও কিন্তু কর্ত্তার পূজোর ত্রুটী হবার জো নেই। সবাই বল্‌ছিল ছেলে গিয়ে কর্ত্তা যেন কালী কালী ক'রে আরও খেপে উঠেছে। সেদিন দুপুর রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে, পূজোর কাছে ঢাক বাজছে, আমি তো কাঠ হয়ে মেয়ের ঘরের দুয়োরের এক পাশে প'ড়ে আছি। মেয়ে সেদিন সেরাত দুয়োর বন্ধ ক'রে ঘরে প'ড়ে ছিল। ঢাক বাজতেই দেখি রুখু চুলগুলো বাঁধতে বাঁধতে ছুটে বেরুলো ঘর থেকে, চল্‌লো পূজোর দিকে, আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম। ঠাকুরঘরে গিয়েই কি একটা ব'লে চেঁচিয়ে দড়াম্‌ ক'রে সেই যে মাকালীর সাম্‌নে প'ড়ে গেল আর উঠলো না। আমিতো চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লাম। তারা খুব বক্‌তে বক্‌তে কোন রকমে ঘরে তুলে দিয়ে গেল। কাল চোপর দিন রাতও হুঁস এলোনা দেখে আজ আমি তোমাদের খবর দিইগে বলায় তখন পাল্কী আন্‌তে হুকুম দিলে। ঘরে গিয়ে দেখি মেয়ে একটু একটু তাকাচ্চে। বল্লাম, "বাড়ী চল্‌ কেষ্টপ্রিয়ে, তোর রাধাবল্লভের কাছে চল্‌, এখানে আর থাকিস্‌নে।" মেয়ে তখন আস্তে আস্তে বল্‌লে, "তাই চল!"

এই তো গেল বিন্দুরমা বুড়ির কথা—তারপরে এঁদের কথাও প্রায় তেমনি। এই ধর্ম্মমতের দায়েই যে এমন সর্ব্বনাশ হয়ে গেল তা যেন এঁরাও তুচ্ছ ক'রেই দিদির প্রায়শ্চিত্তে লেগে পড়লেন। তাঁকে যে শাক্ত মন্তর দিয়েছে তারা, এতে যেন এঁরা অস্থির হয়েই উঠলেন। ভুলেই গেলেন যে, বরের বাপের ধর্ম্মমতের চাপেই এই প্রাণ দুটির বলিদান হয়ে গেল। ঐ নিয়েই তো তাদের সঙ্গে মনান্তর। তা তাদের মতের মতন না হ'তে পারাতেই তো বৌকে তাদের ত্যাগ আর ছেলেরও সেই বাপের ভয়ে আত্মহত্যা। এঁদেরও গুরু এল, নতুন ক'রে দিদির আবার বৈষ্ণব মন্ত্র হ'ল, ছ'মাস ধ'রে বাড়ীতে ভাগবত কথা প্রত্যহ হ'তে লাগ্‌লো! দিদির হাতেই রাধাবল্লভের সব কাজের ভার পড়লো। কিন্তু মনে হলো যেন তখন সবই বৃথা, আগে যে দিদি ছিলেন তা যেন আর হলেন না। আমারই মনে পড়ে দিদির ছোট থেকেই রাধাবল্লভের ওপর আশ্চর্য্য ধরণের টান ছিল, ঠাকুর যেন তাঁর কাছে কেমন একটা প্রত্যক্ষ জিনিষের মত ছিল। ওরকম কই আর কারুতো দেখিনি। যে কদিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী একত্র হয়েছিলেন—হায় রে সেইবা ক দিন? আঙুলে গণা যায়। তোমাকে বলেছি কাল সেকথা একটু—দিদির মা খুড়িমা, মেয়েকে শ্বশুরে ত্যাগ করেছে কিন্তু জামাই যদি ভালবাসে তবুও মেয়ের আশা থাকে, তাই জানবার জন্য আমাকে তাঁদের পিছনে লাগাতেন। আমারও তখন তাদের কথা শোনবার ইচ্ছার উৎসাহের বয়সও হয়েছিল, লুকিয়ে শুনেছি জামাই দাদা বল্‌ছেন, "আমার হিংসা হয় প্রিয়া, তোমার ঠাকুরের ওপরে! ভাগ্যে পাথরের মূর্ত্তি তাই রক্ষা! কিন্তু সত্যি অবাক্‌ হয়ে যাই, কি ক'রে এতটুকু বয়সে এমন

শিখেছ এমন হয়েছো জানতে ইচ্ছে করে! সে ফুলটি তুমি সত্যি আমায় দিতে পারলে না? রাধাবল্লভকেই দিয়ে এসেছো?" একথাগুলো সব শেষ হবার বাক্যেরই কথা। যাক্, সেই ষোল সতের বছর থেকেই দিদি আবার তাঁর রাধাবল্লভের জন্মই মা বাপের দ্বারা উৎসর্গ হলেন, কিন্তু ছেলেবেলার মত আর তেমন ক'রে ফুল দিতে মালা গাঁথতে যেন তাঁকে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। এ যেন আর এক জন কেউ সেই দেহে! বাবা মা আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় জড়ের মত তাঁরা যা বলতেন তাই ক'রে যেতেন মাত্র। নিজের মনের নূতন একটা ধাক্কায় যা করতে গেলেন সেদিকেও ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলেন। নিজের পুরাণো জীবন-যাত্রাতেও আর শান্তি তৃপ্তি ছিল না, তাই দুই কূল হারা অবস্থা হ'য়ে গেল যেন তাঁর।

শুনেছি নাকি অনেক দিন পরে ওঁদের বাড়ীর না গ্রামের কে পশ্চিমে তীর্থ করতে গিয়ে কাশীতে কোন দণ্ডীকে দেখে এসে তাঁদের কি খবর দেন, আবার কে নাকি বিন্ধ্যাচলে গিয়েও কোন্ সন্ন্যাসীকে তাঁর মত দেখে আসে। বাপ মা নাকি দু একবার লোকও ছুটিয়েছিল কি নিজেরাই গিয়েছিল ঠিক্ জানি না; খবর তো দেবার নেবার কোন যোগ ছিল না দু পক্ষের মধ্যেই। ওরকম কাণ্ড হ'লে যে-রকম গুজোব ওঠে মধ্যে মধ্যে সেই রকমই ও গুলো বোধ হয়; কেন না, কোনটাই যে সত্যি নয় তা বেশই বোঝা যেতে লাগলো দিনে দিনে। তার পর আর কি ভাই, কাল ব'য়ে যেতে লাগলো ক্রমে। সবই প্রায় উল্টে পাল্টে গেল, কত ঘটনা ঘটলো জীবনে। দিদির যত বাপ খুড়ো এদিকের সব আত্মীয় স্বজন সবই একে একে গেলেন; বাকি প্রাণী ক'টিও ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো দেশে দেশে। কোথায় বা গেল তাঁদের ধর্ম্মমত, কোথায় বা থাকলেন তার দেবতা! কাল সব মুছে ধুয়ে শেষ ক'রে দিল। যাঁরা ঝড়তি পড়তি ভাবে টিকে গেলেন তাঁরাও নিজেদের সুখ দুঃখের গণ্ডি ছোট ক'রে এনে সব ভাগ-ভিন্ন হ'য়েই রইলেন। দিদির মা পিসি ওঁকে নিয়ে আলাদা হ'য়ে ঐ মেটে বাড়ী করলেন। দিদির ভাই বিদেশে চাকরী করতে গেলেন, ওদিকে দিদির শ্বশুরবাড়ীতে নাকি আরও সাংঘাতিক ভাবে কাল তার কাজ চালিয়েছিল,—সবই নাকি বছর কতকের মধ্যে শেষ। কেবল দেওর বুঝি ছিল একটি, তাঁরই ছেলেমেয়ে এরা; তিনিও তো নেই। এসব আমার শোনা কথা পরের মুখে, দিদিকে তাঁর শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে কি অন্য কোন কথাই জিজ্ঞাসা করতে কখনো ভরসা পাইনি। কত বছর পরে যখন দিদিকে আবার দেখলাম, তাঁরই চরণে যখন আশ্রয় পেলাম তখন এই এখনকার দিদিকেই দেখলাম যেন। সেও আজ এক যুগের কথা। বাপেরা তাঁকে যে মতে যে সংস্কারে গ'ড়ে তুলেছিলেন আবার তা ছাপিয়ে তিনি এই রকম হয়েছেন। কালীতলায় আর শিবের কোঠাতেই বেশীর ভাগ গিয়ে পুজো করেন। রাধাবল্লভের মন্দিরে কখনো যেন অন্যমনস্কে গিয়ে প'ড়ে আবার তখনি চ'লে আসেন, বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারেন না। জানি না তাঁর কি ভাব মনের মধ্যে থাকে। আমায় তখন লোকে বলেছিল, ওঁর শ্বশুর বংশের ইষ্টদেবী ওঁকে স্বপ্ন দিয়ে ওঁকে আবার নিজের সাধিকা ক'রে নিয়েছেন।"

নিশ্বাস ফেলিয়া রাধা থামিতেই প্রায় বাহ্যজ্ঞানহীনা শ্রোত্রীরও যেন রুদ্ধ নিশ্বাস এতক্ষণে ত্যাগ হইল। তখনি সে কিন্তু আবার প্রশ্ন তুলিল, "তুমি তাঁকে আবার দেখলে, আশ্রয় পেলে, কেন বল্লে? তুমি কি এখানেই চিরদিন ছিলেনা? আর কিশোরীর বাপ মার কথা দিদির সেই ভাইভাজের কথা তো কিছু বললে না? তাঁরা—" সবিষাদে রাধা উত্তর দিল, "সবাই যেখানে গেছেন তাঁরাও অকালে সেই খানে। তাঁদের কথা সকলের কাছেই শুনতে পাও তো,—উঠি বৌ এইবার। দিদিঠাকরুণকে আজ সকাল ক'রে হবিষ্যি করতেই হবে, যতীন আজ তাঁর প্রসাদ না পেয়ে যাবেনা।"

"তোমায় তো অমনি বসিয়ে গল্প শুনিনি, কত কুটনো কুটে ফেল্লাম আমরা দেখ দেখি! কনে বৌকে নিতে এখনি হয়ত পাল্কী বেহারা লোকজন আসবে যতীনদের বাড়ী থেকে। তাদের খাওয়ানোর খুব হাঙ্গাম আছে আজও—কিন্তু তোমার কথাটার তো উত্তর দিলেনা—তুমি কোথায় ছিলে—না-কি যে বল্লে?" "রাঙাদিদির কথার পরে আর সে কথা নয় দিদি, কখনো যদি—উঠলাম, তুমিও ওঠ, তোমার দিদি

ডাক্‌ছেন হেঁসেল ঘরে। নরকনে তো বিকেলেই অষ্টমঙ্গলার জোড়ে যাবে সেখানে?"

"সেতো যাবে কিন্তু কাকামশায়ের তাদের 'দিন করা' পছন্দ হ'লনা—কাল খুব ভোরে নাকি ভাল দিন আছে, ঘটবেও তাই, কুটুম বাড়ীর লোকদের ভাল ক'রে খাওয়াবার জন্যে মাছের যে আড়ম্বরি আরম্ভ করেছেন,—জেলেরা আবার পুরোনো পুকুরে জাল নিয়ে গেল,—গোয়ালারা পায়েসের যে দুধ এনে দিলে তা মঞ্জুর হ'লনা—আবারও লোক ছুটলো। তাদের খাওয়াতেই কত রাত হবে তাই ছাখ। কিন্তু তুমি আর একবার এস সন্ধ্যা বেলায় ভাই—এ কথাটুকু—"

রাধা ততক্ষণ বঁটী ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

ঠাকুরঘরের সন্ধ্যারতির অনেক পরে শ্বশুর শাশুড়ী পুত্র ও পুত্রবধূকে পরদিন অতি প্রত্যুষে যাত্রা করাইবার উদ্দেশে তাহাদের "জোড়ে" গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া রাখিতে লইয়া গেলেন। অত ভোরে গ্রামান্তর হইতে পুরোহিত আসিয়া পরদিন হয়ত ঠাকুর-ঘর খুলিতে পারিবে না। কনের বাড়ীর পক্ষ হইতে ঠাকুর প্রণামী দিবার জন্য যতীন্দ্রও সে দলে ছিল এবং কৃষ্ণপ্রিয়াকেও অনুরোধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিল। অঙ্গনটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষের ছায়ায় একটু বেশী অন্ধকার, বিগ্রহগৃহের ক্ষীণ তৈল-প্রদীপের আভায় তাহার আঁধার যেন আরও বাড়াইয়াই তুলিয়াছিল। সদলে সেখানে পৌছিতেই অগ্রবর্ত্তী কর্ত্তার মনে হইল সেই অন্ধকারের মধ্যে দীর্ঘাকৃতি কেহ একজন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাদের দলকে দেখিয়া নিঃশব্দে অন্ধকারে মিশিয়া পাশ্ কাটাইবার চেষ্টা করিল। কর্ত্তা দ্রুতপদে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সানন্দ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আপনি? এই অসময়ে? সেদিন থেকে আর তো দর্শন পাইনি! কত খোঁজ কর্‌লাম—৺গৌর নিতাইয়ের মন্দিরেও এর মধ্যে দুদিন গিয়েছিলাম,—সেখানে তো কিছু বল্‌বার কেউ নেই, মাঠের দু একটা রাখাল ছেলে বল্‌লে—"গোঁসাইকে সবদিন দেখা যায় না,—কবে কোথায় থাকেন কোথায় যান কেউ বল্‌তে পারে না।" আবার যে দর্শন পাব এ আর মনে হয়নি।" বলিতে বলিতে কর্ত্তা দলের আলোকধারী ব্যক্তিকে আগাইয়া আসিতে বলিলেন এবং প্রণামের জন্ম অবনত হইতেই উদাসীন মূর্ত্তি তাঁহার অপেক্ষাও বেশী অবনত হইয়া পড়িলেন। নিজে প্রণাম সারিয়া উঠিয়া কর্ত্তা দেখিলেন তাঁহার দৃষ্টান্তে দলের সকলেই প্রণত হইতেছে। তিনি তখন নিজের পুত্র ও বধূর হস্ত ধরিয়া বৈরাগীর নিকটে আনিয়া বলিলেন, "এই আমার পুত্র ও বধূ। প্রণাম কর তোমরা।" তাহারা আবারও অবনত হইতে উদাসীন কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "প্রণাম করা তো হয়েছে—বার বার কেন? রাধাবল্লভের সম্মুখে মানুষকে এমন ক'রে প্রণাম! আর, বিগ্রহ প্রণাম না ক'রেই আপনাদের এ কাজ, এটাও কি উচিৎ?" কর্ত্তা একটু লজ্জিত সন্ত্রস্ত হইয়া বাধ বাধ স্বরে বলিলেন, "পাছে আপনি চ'লে যান ইতিমধ্যে, এই ভয়ে—দর্শনের জন্য যে কত চেষ্টা পেয়েছি, তাই—" স্নিগ্ধস্বরে উদাসীন বলিলেন, "আমাকে দাঁড়াতে আদেশ কর্‌লেই ঠিক্ হ'ত।"

"আপনাকে আদেশ?" কর্ত্তা দ্বিগুণ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রস্তুত দেখিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া এইবার একটু আগাইয়া আসিলেন। তাঁহার মনে পড়িল তিনিই এই বৈষ্ণবকে প্রথম এ গ্রামে এই স্থানে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপও সেদিন হইয়াছিল। কৃষ্ণপ্রিয়া অগ্রসর হইয়া উদাসীনের দিকে একবার মাথা নামাইয়া বলিলেন—"স্ত্রীলোকের স্পর্দ্ধা ক্ষমা করবেন, আপনাদের শ্রীমদ্ভাগবতই তো ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রায় সমান আসনই দিয়েছেন, এমন কি স্থানে স্থানে যেন ভক্তের মহিমাই বেশী ক'রে বলেছেন। আপনাকে আগে প্রণাম করাতে তাহ'লে কেন দোষ হবে?" বৈরাগী এতক্ষণ যেন অন্তরস্থ ভাবে চক্ষু অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, এইবার জোড় হস্তে উদ্দেশে কাহাকেও প্রণাম করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "বুঝেছি আপনি কোন স্থানের কথা বল্‌ছেন। সেখানে ভগবান নিজে বল্‌ছেন বটে যে—

"কিং স্বল্প তপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকম্॥
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

কিন্তু তাঁর ভক্তের তাঁর কাছে এই যে আদর এ তাঁর মুখেই শোভা পেয়েছে। মানুষ আমরা একথা নিয়ে ভুল ক'রে মানুষকে যেন তাঁর আসনে না বসাই! আর এ সাধু কি এই অল্প-তপস্যা-সম্পন্ন জগতের মনুষ্যে সম্ভব—যা ভগবানই দুর্লভ বল্‌ছেন। তীর্থ এবং পাষাণমূর্ত্তি দেবতা বহুকালে মানুষকে পবিত্র করতে পারে, কিন্তু যে সাধুর দর্শন মাত্রে জীব পবিত্র হয় সে সাধু যে কি বস্তু তা নিশ্চয় ভাগবতের 'নব যোগীন্দ্র সংবাদে' আর 'অবধূত গীতায়' জেনেছেন।" কৃষ্ণপ্রিয়া একটু যেন সঙ্কুচিত ভাবে নীরব হইলেন কিন্তু দেখিলেন তাঁহার কাকা পর্য্যন্ত উৎফুল্ল ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। কৃষ্ণপ্রিয়া আবার তাঁহার ইচ্ছা ও উৎসাহ বুঝিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমাদের বেশী কিছু জানা নেই, তবে এক সময়ে ভাগবতের পাঠক ও কথকের মুখে যা কিছু ব্যাখ্যা শুনেছি আর যা একটু আধটু চোখে দেখেছি তাতে যেন মনে ছিল ভক্ত আর ভগবানকে খুব কাছাকাছিই করা হয়েছে।" উদাসীন একটু ক্ষোভের হাসির সহিত বলিলেন, "সেই প্রকৃত সাধু বা ভক্তকে কি আমরা দেখলেই তাঁদের চিন্‌তে পারি। আর তাঁরা কি আমাদের মত এই রকম ভেক্‌ধারী হ'য়ে দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ান?" "হ্যাঁ, তাও বেড়ান, আপনাদের ভাগবতেই বহু স্থানে একথা আছে। তাঁদের চিন্‌তে না পারলেও আপনাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবই বৈষ্ণব আর তাঁদের 'তর' 'তম'র কথা ব্যাখ্যা ক'রে সকলকেই ত প্রণম্য ব'লে গেছেন।" বলিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁহার কাকার মুখের দিকে চাহিতেই হরিনাথ রায় যেন একটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "এক সময়ে এই বাড়ীর কর্ত্তারা ভাগবত আর চৈতন্যচরিতামৃত নিয়ে কি আলোচনাই না করতেন! তাঁদের বংশে আমরা কি অধমই জন্মেছি! বিশেষ আমার কথা তো বল্‌বারই নয়, আমার পূজনীয় দাদারা—তাঁরা ধর্ম্মের জন্য প্রাণই উৎসর্গ করেছিলেন দেখেছি, আমরা আজ তাঁদের—" বাধা দিয়া উদাসীন সসম্ভ্রমে বলিলেন, "যাঁদের গৃহের নারীরা এখনো শাস্ত্রের উপর এতখানি অধিকার রাখেন তাঁদের একথা বলা বড়ই বিসদৃশ।" তারপরে কৃষ্ণপ্রিয়াকেই যেন উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এসম্বন্ধে অনেকই বলার আছে কিন্তু এখন যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আপনারা এসেছেন তাই আরম্ভ হোক্।" কর্ত্তার উদ্দেশে মাথা হেলাইয়া উভয় হস্তে নমস্কারের ভাবে বলিলেন, "আমি আজ যাই তবে?" কর্ত্তা সন্ত্রস্তে সঙ্গে সঙ্গে জোড় হাতে বলিলেন, "একটু সময়—দর্শন পাবার তো বেশী আশা নেই, যদি—" বৈরাগী মৃদু মৃদু হাস্যে বলিলেন, "আচ্ছা আপনারা প্রণাম করুন, আমি অপেক্ষা করছি।" কর্ত্তার ব্যস্ততায় সকলে বিগ্রহের প্রণাম একটু শীঘ্রই সারিয়া ফেলিল। পূজারী তখন ঠাকুরের শয়ন দিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাঁহাদের গলার মালা দুই গাছি লইয়া পূজারী যেন একটু দ্বিধার সহিত কর্ত্তার পানে চাহিতেই তিনি নিজে হাত বাড়াইয়া সে দুইটি গ্রহণ করিয়া উদাসীনের দিকে সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইলেন। বৈরাগী তখন বকুলতলার অন্ধকারে সম্পূর্ণ আবৃত হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। সহসা কর্ত্তাকে বিনম্র চেষ্টার সহিত তাঁহার কণ্ঠে মাল্য দিতে অগ্রসর দেখিয়া ত্রস্তে হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "আজ এ প্রসাদী মাল্যে বর বধূর অধিকার, আজ—" কর্ত্তা সশ্রদ্ধ অনুরোধের ভাবে বলিলেন, "তাহলে তারা ভগবান ও ভক্ত উভয়েরই প্রসাদ পাবে।"

উদাসীন মস্তক অবনত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে কর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল,

"ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্ গন্ধ বাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ
উচ্ছিষ্ট ভোজিন দাসা স্তব মায়াং জয়ে মহি।"

কর্ত্তা তাঁহার মস্তকে মালাগাছি স্পর্শ করাইতেই তিনি দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া সে গাছি মস্তকেই ঈষৎ চাপিয়া ধরিলেন, মাল্য স্রস্ত হইয়া কণ্ঠে না পড়ে! দু'এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া তিনি মালা দুইগাছিই হাতে লইয়া হাসিয়া বলিলেন, "তবে তাঁদের আসুন"। বর কন্যা তাঁহার নিকটে আর একবার অবনত হইতেই তিনি তাহাদের মস্তকে মালা দুইগাছি প্রথমে স্পর্শ করাইয়া পরে কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। নিজের পদতলে আর একটী যুবককে প্রণাম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে কর্ত্তার পানে চাহিতেই কর্ত্তা পরিচয় দিলেন, "আমার বধূমাতার জ্যেষ্ঠ। ওঁদের বংশে ও সম্প্রতি এই একমাত্র জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান,

নাম যতীন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই ছুটি ও দুই একজন বিধবা ভিন্ন ওঁদের আর কেহই অবশিষ্ট নেই।" উদাসীন একটু পরে বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদের যে ভাবে মস্তক স্পর্শ করিয়াছিলেন সেই ভাবে যতীনেরও মস্তক স্পর্শ করিলেন। এবং তখনি সকলের দিকে চাহিয়া বিদায়-অভিবাদনের মত একবার মাথা হেলাইয়া মৃদুকণ্ঠে "যাই" শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন। কর্ত্তা যতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে ঐ সময়ে আমরা এসেছিলাম তাই একজন মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ পাওয়া গেল। উনি লোক সঙ্গ এড়াবার জন্যই বোধ হয় এ সময়ে এসেছিলেন, আমরা তো তার উল্টোই ক'রে দিলাম।" তারপরে যেন সকলের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "এই সময়ে তোমরাও বরকনেকে আশীর্ব্বাদ ক'রে রাখ, শেষ রাত্রে সকলকে আর ডাকাডাকি ক'রে কাজ নেই। কৃষ্ণপ্রিয়া কই?" যতীন উত্তর দিল, "তিনি ভোরেই আবার আসবেন ব'লে একটু আগে চ'লে গেছেন।"

সকলে তখন গৃহাভিমুখ হইলে যতীন কর্ত্তার পানে চাহিয়া বলিল, "আজ ক'দিনই আপনাদের এখানে এসেছি কিন্তু এঁকে তো এখানে কোন দিন দেখিনি। ইনি কোথায় থাকেন?" কর্ত্তা উত্তর দিলেন, "আমরাই তা জানি না বাবা। এতদিন এসে মাত্র দু' তিনটি সন্ধ্যায় এইখানে দেখেছি। তবে শুনেছি বৃন্দাবন থেকে এসেছেন। যেখানে থাকেন শুনি সেখানে গিয়েও ত দেখা হয় না"। যতীন যেন মৃদু মৃদু আপন মনেই উচ্চারণ করিল, "এ রকম লোক কখনো দেখিনি। দেখেই যেন—" "আমরাই কখনো দেখিনি, তোমারা ত ক'দিনের ছেলে।"

"আমি কল্‌কাতা যাবার আগে জেঠিমার কাছে আর একবার আসব। আপনি যদি আর একবার এঁর কাছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান্।"

"আচ্ছা এসতো, দুজনেই চেষ্টা দেখব"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী

বাদল-বিলাস

শ্রীযুক্তা অপরাজিতা দেবী

তোতলার ছাদে যুঁইফুল যে গো, ফুটেছে টবে!
আজ আমাদের সিনেমায় যাওয়া কেমনে হবে!—
চেয়ার রিজার্ভ হোয়ে গেছে?—যাক্!—
মোটর তৈয়ারী?—দাঁড়াইয়া থাক্!
ওগো আজি মোর সাধের ছাদের ছোট্ট বাগানে ফুটেছে ফুল!
মেঘ-ঢলঢল শ্রাবণসন্ধ্যা চিত্ত কোরেছে আবেগাকুল!

দাস-দাসীদের ছুটি দিছি আজ,—গিয়েছে চ'লে!
সমাগত সবে কোরেছি বিদায় অনেক ছলে!
নিরালা আলয়ে শুধু দুই জনে
যাপিব এ সাঁঝ বড়ো সাধ মনে;
—চলো যাই ছাদে মেঘের তলায়, ভালো নাহি লাগে ঘরের কোণ;
মেঘছায়া-আঁকা শাড়ীটি পরেছি,——বাদল-বাতাসে উতলা মন।

থাক্—ভুলোনা গো, উড়ুক্ আঁচল পূবালী বায়ে!
আশমানী রং রেশমী-সেমিজ দিয়েছি গায়ে।
কিন্ কিনে কিকে ভূঁইচাপা ফুলে
কিরীট গড়েছি কবরীর চুলে,—
বেলির কুঁড়িতে শেলি গেঁথে আমি কণ্ঠে পরেছি কণ্ঠি ক'রে—
কদম কেয়ার তোড়া বেঁধে আজ ফুলদানীগুলো রেখেছি ভ'রে!

না—না গো, আজ্‌কে বেড়াতে যাবোনা।—ছাদেতে চলো।
ড্রয়িংরুমেতে পিয়ানো বাজাবো? ধ্যেৎ! কী বলো!!—
—কাজল-মেঘের চাঁদোয়ার তলে
চলো বসি গিয়ে দু'জনে বিরলে,—
হাতে হাত থুয়ে গায়ে গা'টি ছুঁয়ে—বাক্যবিহীন নীরব রবো!
গুরু গুরু ধ্বনি উঠিলে অমনি তোমার বুকেতে শরণ লবো।

চরাচর ব্যাপি শ্রাবণ এসেছে ঘনানুরাগে!
আজি নগরীর কৃত্রিম সুখ ভালো না লাগে!
'ফ্যানে'র বাতাস, 'গ্রীচেরিয়া'; 'পাম্'
সাজানো-আবাস নয়নাভিরাম!
আজ্ থাক্! ওগো, চলো চ'লে যাই, আমাদের সেই পল্লীবাসে।
নীল গগনের চরণ যেখানে ছুঁয়েছে মাঠের শ্যামল ঘাসে!

কূলে কূলে ভরা দীঘির দীঘল বকুল গাছে
এখনো হয়তো সেই দোলনাটি টাঙানো আছে!
যে কাজরী গান হেথা শুনিবারে
কতো অনুনয় করেছো আমারে,
ঝিল্লিমুখর পল্লী-প্রদোষে আপনি সে গান শুনাবো নিতি,
দোলায় দুলিব, ভুলিব ভুবন,—গাবো গুঞ্জরি' ঝুলন-গীতি!

ঘন কালোমেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে ঘনায় মরি!
গুরু গুরু তার গভীর আবেগ গগন ভরি!
এসো বাতায়নে বসি পাশাপাশি,
আজ দু'জনার মন যাক্ ভাসি'
মানসের তীরে বলাকার মতো। 'মেঘদূত' পড়ে শোনাও তুমি!
যক্ষের ব্যথা যক্ষে বাজুক্। হোক্ গৃহ মোর অলকা-ভূমি।



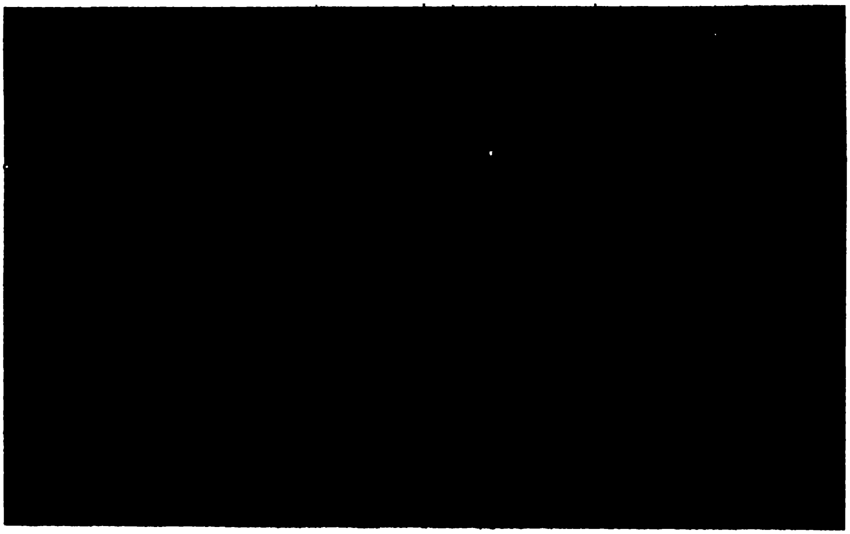
তিব্বতী ভিক্ষুক

চিত্রশালা

প্রভাত নিয়োগী



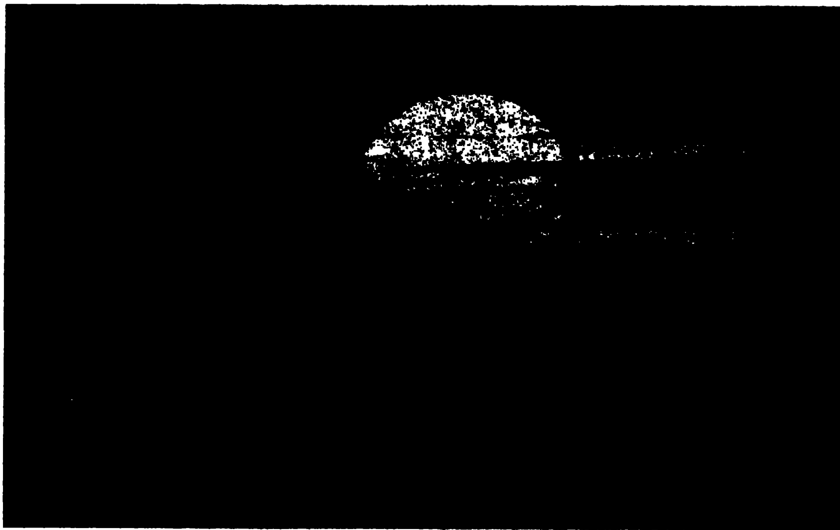
পসারিণী



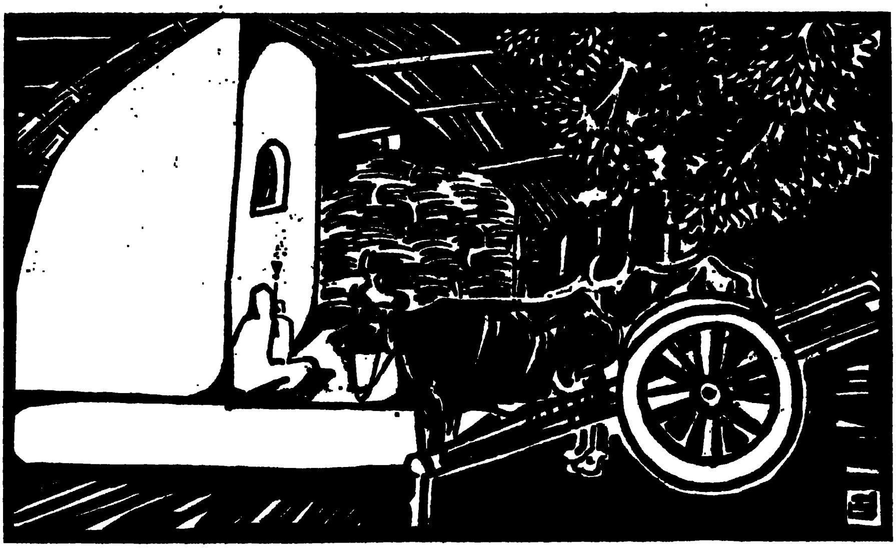
বর্ষার শেষে



ছায়াতলে



নব বসন্ত



গৃহাগত



ফলওয়ালী



অবসর কালে

শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রভাত নিয়োগী

বর্ত্তমান সংখ্যা বিচিত্রা-চিত্রশালার সবগুলি চিত্রই শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রভাত নিয়োগী অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

অল্প বয়সে এবং অল্পদিনের মধ্যে যাঁহারা চিত্র-জগতে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন প্রভাতবাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও ইঁহার অঙ্কনের মধ্যে স্বকীয়তার পরিচয় আছে। বিচিত্রার মধ্যে মধ্যে প্রভাতবাবুর অঙ্কিত রঙ্গিণ ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে—সুতরাং বিচিত্রার পাঠকগণের নিকট তাঁহার বিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। 'হাটের দিনে' ছবিটি বিচিত্রায় প্রকাশিত হইবা-মাত্রই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমরা এই নবীন প্রতিভাশালী শিল্পীর সর্ব্বতোভাবে উন্নতি কামনা করি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বলাকার যুগ

রবীন্দ্র পরিষদে পঠিত

শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়

১

আনাতোল ফ্রান্স ফরাসী লেখক ব্যালজাকের প্রতিভার সমালোচনা প্রসঙ্গে একটী ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, এবং আমার মনে হয় ঐ তুচ্ছ বিবরণের ভিতর দিয়ে ফ্রান্স সাহিত্য সম্পর্কে যে উচ্চাঙ্গের সত্য আবিষ্কার করেছেন তার তুলনা হয় না। ফ্রান্স একদিন পুরোণো বইয়ের দোকানে একটী লোকের সাক্ষাৎ লাভ করেন, যাঁর পোষাকের বৈচিত্র্য সর্ব্বপ্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অখ্যাতনামা ভদ্রসন্তানটী দেহের আর সকল অংশের পোষাকের পারিপাট্যে গভীর উদাসীন, কিন্তু মাথায় টুপিটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে ও মনোরম ভাবে পরিধান করেছিলেন। ফ্রান্সের এই অপূর্ব্ব লোকটিকে দেখে প্রথমেই মনে হয় যে, ইনি মস্তিষ্ক-জীবি। কোনো ভূমিকা না করেই এই মহাশয় ব্যক্তি উত্তেজিত ভাবে ফ্রান্সকে অনেক কথা বল্‌তে লাগলেন, তার মধ্যে মোদ্দাকথা এই যে, ব্যালজাক্ নামক ফরাসী লেখক তাকে পাগল গৃহ-ছাড়া করেছে, দিবানিশি এই লেখকের সৃষ্ট চরিত্রগুলো তার চিন্তা ও কার্য্যকে অধিকার ক'রে রাখে, তার মনে শান্তি নাই, কেননা, the most diabolical of all, the Lucifer of Literature is Balzac. He has imagined a whole infernal world, which we are realising to-day. It is in accordance with his schemes that we are jealous, greedy, violent or abusive এবং ইত্যাদি। অবশেষে ফ্রান্সের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি একজন শিল্পী, কবি ও ঔপন্যাসিক; ব্যালজাক্ তাঁর মনের সকল গ্রন্থিকে ছিন্ন ক'রে দিয়ে, সকল চিন্তার বাঁধন ছিন্ন ক'রে দিয়ে তাঁকে উন্মাদ ক'রে তুলেছে; Balzac is the prince of evil। এবং তাই গভীর নৈরাশ্যের সঙ্গে ফ্রান্সের এই অখ্যাতনামা সঙ্গীটী বারবার বল্‌তে লাগলেন,—"All poets and novelists trouble the peace of the earth"—পৃথিবীর শান্তি কবি ও ঔপন্যাসিকের দ্বারাই বার বার বিচলিত হ'য়ে ওঠে।

কাব্য ও কবির এমন অপূর্ব্ব সংজ্ঞা আর কখনও চোখে পড়েনি ব'লে বহুদিন আমার এই লাইনটী মনে ছিল। রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো রচনা পড়লেই আমার বার বার মনে হ'য়েছে, অ্যানাতোঁল ফ্রান্স কবি-কুলের যে মনোরম সংজ্ঞাটী একদা পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তা সকল শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ কবিদের পক্ষে ষোলো আনাই খাটে, এবং সত্যিকার কবিত্বের এর চাইতে ভাল কোনো সরস পরিচয় দেওয়া যেতে পারে না। কবিতাকে অনেকে ব্যাধির সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন উপহাসের ছলে—কিন্তু কাব্যানুভূতি সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যাধির মতই যে অস্বাভাবিক, এতে আমরা সন্দেহ করি না, কেননা, ব্যাধি যেমন স্বাভাবিক অবস্থার একটী ব্যতিক্রম মাত্র, কবিতা লেখাও তেমনি একটী অঘটন এবং অধিকাংশের জীবনে একটী দুর্ঘটনা। কবি এবং রসস্রষ্টা উভয়েই সমস্ত সংসারকে দেখেন অসাধারণ দৃষ্টিতে, তাঁদের চোখে থাকে দুরান্তের দৃষ্টি, তাই তাঁরা যা বলেন তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের আটপৌরে চিন্তার যোগ থাকে অতি অল্প, এবং সেইজন্যই আমাদের এই পৃথিবীতে বার বার কবি ও উপন্যাসিকের কথার অর্থ অন্বেষণ ক'রে বহু লোকের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে, বহু মানুষের চিন্তারস্থৈর্য্য নষ্ট হ'য়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং বহু অক্ষম লেখক রবীন্দ্র পরিষদে প্রবন্ধ পাঠ করার দুঃসাহস প্রদর্শন করেছেন। আমরা অনেকে বলি, কবি ও রসিকের মানস-জাত যে সৃষ্টি, তার জন্যে দুশ্চিন্তার পরিমাপে মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার ওজন হয়, এবং যে-কালে যে জাতি যত-খানি এই দুশ্চিন্তা বহন করেছেন, সে-জাতি সভ্যতা ও উৎকর্ষের দিক থেকে ঠিক ততখানি সম্মান ও শ্রেষ্ঠতা লাভ ক'রে থাকেন। এই জন্যই আমাদের দেশে একদল

লোক আমাদের এই কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেন যে, আজকার বাংলা যে-কোনো একখানা মাসিক পত্রে রবীন্দ্র ঠাকুরের একটী কবিতা বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনাবশ্যক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হ'য়ে ওঠে, ইহা স্বাস্থ্যেরই চিহ্ন, বাঙালীর মস্তিষ্কের উৎকর্ষেরই নিদর্শন। যে জাতি অপ্রয়োজনে যতখানি বেশী ব্যস্ততা দেখায়, সে-জাতি ততখানিই বেশী উন্নত ও অগ্রসর। ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রাচীন কালেও মানব সভ্যতার এই একটী মাত্র মাপকাটিই ছিল, এবং আজিকার যুগে সভ্যতার আকৃতি ও প্রকৃতির যতই বিকৃতি ঘটুক না কেন, সভ্যতার সারবত্তা ওজন করার মানদণ্ডটী ঠিক তেমনি রয়েছে। এই অপ্রয়োজনের দুঃখ-ভারটী বহন করার গৌরব যেমন বাঙ্গালী প্রতিভার অপরিহার্য্য অঙ্গ, রবীন্দ্র-সাহিত্যের দুর্জ্জয় অনিবার্য্যতাও তেমনি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দুঃখ শতগুণে বৃদ্ধি ক'রে গেলেন, আমাদের মনের স্থৈর্য্য, ও শান্তি পরিপূর্ণভাবে হরণ করে নিলেন; কেননা, আসল কবি-ধর্ম্মী এবং সকল শ্রেষ্ঠ রস-স্রষ্টার মতই পৃথিবীর প্রশান্ত নিশ্চলতাকে উত্তাল ক'রে তোলাই হয়েছে তাঁর কাব্যের বিশেষ রূপটী। এই হিসাবে আবার কবির কৃতিত্ব জগৎ-রচয়িতা বিধাতা পুরুষের মতই অপরিসীম ও অন্তহীন। বিধাতা যেমন জগৎ-সৃষ্টিকে অনায়াসে আটকিয়ে রাখতে পারতেন, এবং হিংসা-কলহময় পৃথিবীর দায়িত্ব হ'তে নিজেকে দিতেন মুক্তি, কবিও হয়ত তেমনি তাঁর সৃষ্টির আবেগ সম্বরণ ক'রে নিষ্ক্রিয় হ'তে পারতেন। কিন্তু জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপারেও যেমন সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায়ই সবখানি ছিলনা, কাব্য-রচনার বেলায়ও তাই। কবিতা রচিত বা লিখিত হয় না, সত্যিকার কবিতা যাকে বলে তা সংঘটিত হয়। কাব্য এমন একটী ঘটনা যার অঘটন ঘটানো কেবল অসম্ভব নয়, অসাধ্যও বটে।

রবীন্দ্রনাথও তেমনি একটী ঘটনা। আমাদের দৈনন্দিন জগতে এমন ঘটনা অহরহই ঘটেনা, এবং অহরহ ঘটেনা ব'লেই বোধ হয় এটী একটী ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষমতা ও দক্ষতা কেউই আয়ত্ত করতে পারে না, বোধ হয় এই জন্য যে ও ক্ষমতা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথেরও নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ও কবিতায় বার বার এই অদৃষ্ট প্রেরণার কথা ব'লেছেন, এবং এই অপ্রত্যক্ষ গুঞ্জরণ-ধ্বনিই যে তাঁকে কত ছলে কত দূরে নিয়ে গিয়েছে, তা কবি নিজেই মাঝে মাঝে অবাক্ হ'য়ে ভেবেছেন। এই প্রেরণাই, সাহিত্যসৃষ্টির মূল কথা, রসসৃষ্টির সম্পর্কে চরম বিচার। আমরা যতই না কেন কবির অন্তরের কথা বাহিরে টেনে আনতে চেষ্টা করি, কখনই এ-চেষ্টা সফল হবেনা। কারণ, কাব্য কেবল কবির অন্তরের কথা নয়, অন্তরতমের আদেশ। কাজেই তার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় পাবে কোথায়? কিন্তু তবুও কাব্যের বিচার সকল দেশেই প্রশস্ত, তবুও কবির মনের সকল দুয়ার উন্মুক্ত ক'রে সকল প্রকোষ্ঠ গুলিকে নিরীক্ষণ করার এত আগ্রহ মানুষের! কেন না, আমরা আগেই ব'লেছি, এই অহেতুক কার্য্যতৎপরতাই সভ্যতার একটী বড় চিহ্ন, এই অবিশ্রাম আলাপ আলোচনা প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধ পাঠ সংস্কৃতির একটী শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

এইজন্যই রবীন্দ্রনাথেরও সমালোচনা মার্জ্জনীয়, এই জন্যই যখনই কেহ রবীন্দ্র-প্রতিভার কোনো একটী বিশেষ দিকের এতটুকু আলোচনাও করেন তখন আমরা তাঁকে প্রশংসা করি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সমগ্র রূপটী কেউ কোনো দিন পৃথিবীর সম্মুখে ধরতে পারবে কিনা এ নিয়ে সন্দেহ যখন থেকেই যাচ্ছে, তখন এই অগাধ সমুদ্রের এক একটী বিশেষ রূপের সঙ্গে যদি কেউ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে তাকে প্রথমেই আমরা দুঃসাহসী বলবনা, এবং এই চেষ্টাকে স্পর্দ্ধার সঙ্গে তুলনা করবনা। কেননা, ভাল-মন্দ কোনো বিচার বিশ্লেষণই রবীন্দ্র-প্রতিভার গভীরতা ও বিশালতাকে ছোট করতে পারে না। তাঁর অন্তরলোকে যে ঊর্দ্ধশিখ দীপ প্রজ্জ্বলিত, তাকে ম্লান করতে পারে, তার শিখাকে নিম্নাভিমুখী করতে পারে এমন সমালোচনা হয় না। কেননা, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সৃষ্টির মূলে কোনো প্রয়োজন ও ফরমায়েসের অবকাশ ছিল না, এর তাগিদ এসেছে তাঁরই নিজের মধ্যে থেকে। রবীন্দ্রনাথ সেই ইঙ্গিতেরই অনুবর্ত্তন ক'রেছেন, অন্তরের এই মর্ম্মরধ্বনিকে ভাষায়, গানে ও গন্ধে অপূর্ব্ব ক'রে তুলেছেন। কাজেই তাঁর কাব্যের তাঁর প্রতিভার

যে বিশেষস্বটীকে নিয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন, তাঁর প্রতিভার অখণ্ড ও অমৃত রূপটীকে আমরা পাব না, তাঁর সঙ্গীতের অক্ষয় গীতিধ্বনিটীকে বেসুরো করার বা ক্ষুণ্ণ করার যথার্থ ক্ষমতা আমাদের হবে না।

প্রথমেই এত কথা বলবার প্রয়োজন এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের যে বিশেষ অধ্যায়টীর আলোচনা আমি এখানে আরম্ভ করতে চাই তার উদ্দেশ্য প্রথমেই স্পষ্ট ক'রে নেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের গানে আজ যে-সুরটী নানা বিচিত্র ছন্দে ও লীলায় মুর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে, সে সুর আনন্দের না বেদনার, হতাশার না উল্লাসের সমালোচকের বিচারবুদ্ধি দিয়ে আমরা তা এখানে নির্ণয় করতে চাই এবং সেইজন্যই ভূমিকায় বার বার ব'লে নিতে চেয়েছি, সমালোচনার মাপ-কাঠিতে যতই সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করি না কেন, যতই কেন একে আনন্দ বা বেদনা এমন একটা কিছু শব্দের মধ্যে বন্দী করতে চাই, কিছুতেই সব কথাটী ও শেষ কথাটী এসম্বন্ধে বলা হবে না; কেননা, হয়ত এ সুর আনন্দ ও বেদনা উভয়ের মিলিত সুর এবং হতাশা ও উল্লাস দুইয়ের মিশ্রণেই এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। কবি যদিও একথা ব'লেছেন যে, পূরবীর ছন্দেই শেষ রাগিণীর বীণ সঙ্গীতময় হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু তবুও একটী মাত্র সুরই এই বীণায় বাজেনি চিরদিন, একটী মাত্র রেশই এই সঙ্গীত থেকে ধ্বনিত হয়নি। ভূলোক ও দ্যুলোকের যে রসময় ও আনন্দময় সত্তা, তার প্রকাশ একটী বাঁধা-ধরা বিশেষ রূপের ভিতর দিয়েই হয়নি, এর বস্তুময় অস্তিত্ব সত্য হ'য়ে উঠেছে বহু ও বিবিধ মুর্ত্তিতে, বিচিত্র লীলায় ও বিলাসে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শেষ রাগিণীর বীণ কেবল একটী মাত্র সুরেরই ভাষা দেয় নি, একটী মাত্র কাহিনীই এর কথা নয়।

তবুও এই বিশেষ যুগটীতে রবীন্দ্র সাহিত্যে যে সুরটী প্রবল হ'য়ে উঠেছে, যে-গতি বার বার গানে ও কবিতায় সচল হ'য়ে উঠ্‌ছে, তাকে সম্পূর্ণ ভাবে না হোক সমগ্র রূপে না হোক, একটী বিশেষভাবে রূপায়িত আমরা দেখ্‌তে পাই এবং তাই থেকে এর প্রধান বৈশিষ্ট্যটীকে উপলব্ধি করতে পারি ও বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম এই নূতন আকৃতিটী উজ্জীবিত হ'য়ে ওঠে 'বলাকায়'। 'মানসী' 'সোনার তরীর' যুগ ও 'বলাকায়' যুগে সময়ের ব্যবধান প্রায় পঁচিশ বছরের। 'গীতালি' পর্য্যন্ত যে strainটী কবিতায় পরিস্ফুট ছিল, বলাকায় তার পরিবর্ত্তন অত্যন্ত রূঢ় ভাবেই চোখে পড়ে। অবশ্য এ-পরিবর্ত্তন আকস্মিক নয়। 'গীতালি'তেই কবি এই 'নবপ্রভাতের তীরে' পাড়ি দেওয়ার আয়োজনের কথা তু'লেছেন। উদয়াচলের সেই তীর্থপথে নূতন যাত্রা তাঁর সুরু হল, কেন না কবি নবতর সত্য, নূতন সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করার ব্যাকুলতা উপলব্ধি করছেন, তাই গীতালিতে তিনি বল্‌ছেন,—

"অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা
অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার
চিত্তাকাশে—"
—যাত্রাশেষ

কবি এতদিন অন্ধকারের রহস্য-ভেদ করার ব্যাকুলতা উপলব্ধি করেননি, অসংখ্য আনন্দ ও বন্ধনময় পৃথিবী,—রূপ, রস ও গন্ধ তাঁর কাব্যকে সূর্য্যালোকের মত দীপ্ত ও স্বচ্ছ ক'রে তুলেছিল। এই ধরণীর লোকোত্তর অনুভূতি-অগ্রাহ্য সত্তার জন্য তাঁর মনে বেদনা জাগেনি, অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্যময় পৃথিবী অশেষ আনন্দের আকর, তাইত পৃথিবীর সকল ছোটখাটো সুখদুঃখও তাঁর কাছে এত অপরূপ এবং তাইত তাঁর গান সেইখানে তাঁর স্থান খুঁজে নিল,

যেথায় সুখে তরুণ যুগল
পাগল হয়ে বেড়ায়,
আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে
সবার আঁখি এড়ায়।
পাখী যেথায় শোনায় গীতি
নদী শোনায় গাথা,
কতরকম ছন্দ শোনায়
পুষ্পলতা পাতা"
(যথাস্থান—ক্ষণিকা)

এবং সেইজন্যই হৃদয়ের অতি কাছে, হাতের মুঠোর মধ্যে

যে বস্তুকে যে সত্যকে পাওয়া গেল তাকে ত্যাগ ক'রে গভীর চিন্তা দিয়ে দুঃখের জাল বুনতে কবি রাজী হ'লেন না, এবং সরাসরি এই বিধান দিলেন,

নিজের ছায়া মস্ত ক'রে
অস্তাচলে ব'সে ব'সে
আঁধার ক'রে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে'
বিধির সঙ্গে বিবাদ ক'রে
নিজের পায়েই কুড়ুল মারো,—
দোহাই তবে এ কার্য্যটা
যতশীঘ্র পারো সারো।

(বোঝাপড়া—ক্ষণিকা)

এবং এ কার্য্যের অন্তে আবার নূতন প্রভাতের আবাহন, নূতন সূর্য্যালোক, এবং

তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোল,
ভুলে যা ভাই, কাহার সঙ্গে
কতটুকুন্ তফাৎ হ'ল।

কারণ কোনো বস্তুরই সূক্ষ্ম বিচারে কবির মন নাই, কোনো উদ্দেশ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণে তাঁর এখন কাজ নাই, ভালো মন্দ সকলকেই তিনি সহজে নিতে চান,

সুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে-কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে মন, তাইনে।

(অচেনা—ক্ষণিকা)

কেননা, কবির মন আজ গানে আনন্দে ঝঙ্কৃত, রসে নিমজ্জিত, দর্শনের দৃষ্টি দিয়ে, সমালোচকের ঠুলি দিয়ে কোনো কিছুরই বিচার করতে তিনি চাননা ; সত্যের সহজ সরল যে মূর্ত্তি তাই তাঁর কাছে প্রচুর, এর বেশী তাঁর প্রয়োজন নাই, আর সকল তত্ত্ব-বচন গ্রহণ করায় তিনি অপটু, সেইজন্যই কাব্যলক্ষ্মীর কাছে এই প্রার্থনাই হ'ল তাঁর বিশেষ প্রার্থনা। তাই তিনি 'অপটু' কবিতায় বললেন,

নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ প্রিয়ে,
এমন কোন কর্ম্ম দেহ
অকর্ম্মণ্য দাসে।

(ক্ষণিকা)

কিন্তু কবির মনের চটুল আনন্দে ভাঙন ধরেছে,'বলাকার' আগেই। গীতালিতে যে সুরের পূর্ব্বাভাষ পেলাম, খেয়াতে তার আগমনী শুনতে পাই। কবির মনে অন্ধকারের জন্য দুঃখ ঘনিয়ে উঠ্ছে তাই 'খেয়ার' সুর এত বিষণ্ণ ও করুণ। 'বিধির সঙ্গে বিবাদ করার' জন্য কবি আয়োজন আরম্ভ করেছেন, বিধির বিধানকে উচ্ছল আনন্দে সচল ও অনির্ব্বচনীয় ক'রে তুলতে তিনি যেন আর চাননা। তাঁর মনের অন্দর বাহির বেদনার ভারে মূর্চ্ছিত। পৃথিবীর সকল অশ্রু যেন সেখানে এ'সে জমাই হচ্ছে। 'ক্ষণিকায়' আনন্দের যে কলোচ্ছ্বাস, যে প্রাবল্য, তার ক্ষীণ চিহ্নটুকুও 'খেয়ার' নাই, যখন কবি লিখলেন,—

এপারেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে,
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।

(শেষ খেয়া খেয়া)

এইখানেই রবীন্দ্র-প্রতিভার নব বিকাশের transition-যুগ, এইখানেই নূতন আলোকের জন্য নবতর ব্যাকুলতা কবির অন্তরে। একদা প্রভাতালোকে যে সুপ্ত নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল, সেই নির্ঝরের নয়নে আজ বেদনার অঞ্জন, ব্যথার পাষাণ। সে উচ্ছ্বাস নাই, সে গতি নাই, কবির মনে আজ প্রশান্ত বেদনার নিবিড়তা। সেইজন্যই ঘাটের কিনারায় ব'সে নূতন সম্ভাবনার বেদনায় তাঁর আঁখি সজল হয়ে উঠ্ছে, তাঁর কণ্ঠে বেদনার বাণীই উচ্চারিত হচ্ছে ;—

ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফল্লোনা,
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো সব ফুরালো, সাঁঝের আলো জ্বল্লোনা,
সেই ব'সেছে ঘাটের কিনারায়।

(খেয়া)

আলোর জন্য যে ব্যাকুলতা, সত্যের জন্য যে আগ্রহ এখানে বেদনায় ধ্বনিত হল, তাই ক্রমশঃ নূতন আকার নিয়ে জন্মলাভ করল 'বলাকায়'। 'বলাকায়' এই বেদনায় গ্লানি

কেটে গেছে, মলিনতা মুছে গেছে এবং গাম্ভীর্য্য সুপ্রচুর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু 'ক্ষণিকার' সেই কল-গীতি নাই, সোনার 'তরীর' সেই মায়া মুছে গেছে, 'চিত্রা'র নিবিড় কামনা ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। ক্ষণিকার কবি একদা অপ্রয়োজনে ও অকারণে গাঁয়ের পথে চ'লেছিলেন; চলার কথাই ছিল তখন শেষ কথা,—

ছায়া তখন আলোর ফাঁকে
লতার মতো জড়িয়ে থাকে,
একা একা কোকিল ডাকে নিজ মনে;
আমি কোথায় চ'লেছিলেম অকারণে।

(পথে—ক্ষণিকা)

কিন্তু এই অকারণ গতির পথ নিদারুণ দুঃখের অন্ধকারে ক্রমশঃ বেদনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌ছে। ভাল মন্দ সকলকেই সহজে গ্রহণ করার শক্তি—অন্তরতলে অনুসন্ধান ক'রেও যেন কবি নাগাল পাননা। মানুষের দুঃখ দৈন্যের আর্ত্তনাদে কবির মন উতলা হ'য়েছে; তাঁর মনে আজ বারবার 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলিতে কত বিলম্ব' এই প্রশ্নই ধ্বনিত। জীবন দেবতার যে সঙ্কেত একদিন উদ্দেশ্যহীন অবিরাম গতিকেই কবির জীবনে সত্য ক'রে তুলেছিল, যারই উদ্দেশ্যে শান্তি-স্বর্গের অনুসন্ধানে ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজার ঘরে তাঁর যাত্রা, সে গতি আজ সহসা রুদ্ধ। যে মহাশঙ্খ তুলে ধরার ক্ষীণ বাসনা কবির মনকে সেই কত কাল ধ'রে আলোড়িত ক'রেছে, তাই আজ প্রখর হ'য়ে উঠল। পথের পাশে অবনত মহাশঙ্খ ধূলিধূসরিত, তাই তাঁর চঞ্চল গতি নিস্তব্ধ, উর্দ্ধে নিম্নে সর্ব্বত্র কবির বিষন্ন দৃষ্টি বিস্তারিত ও প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এক নূতন সর্গের প্রারম্ভ সূচিত হ'ল এখানে। এরপর থেকে কবির সমস্ত কাব্যাভিজ্ঞান নূতন রঙে রঞ্জিত হ'য়ে উঠল, তাঁর সমগ্র জীবন একটী নবীন নাবিকের আগমনের জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠল; যে নাবিক

সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আসছে তরী বেয়ে,
* * * !
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
বিরহী মোর নেয়ে।

(পাড়ি—বলাকা)

'রক্তসাগর পাড়ি দিয়ে' একদা গহন রাত্রি কালে কালো রাতের কালিঢালা ভয়ের বিষম বিষকে একটী রজনীগন্ধার গুচ্ছে রূপায়িত ক'রে এই নাবিক যে কবির কল্পনা ও চিন্তা-তরণীর কর্ণধার হলেন তাঁর পরিচয় এর পরের কবিতাতেই পাওয়া যায়। 'ছবি' কবিতাটী রবীন্দ্রনাথ এর কিছুদিন পরেই লেখেন। মিঃ এণ্ড্রুজ্ কবির জীবনের এই সময়ের একটী ঘটনা বহুদিন আগে কাগজে লিখেছিলেন। এই কালের কবিতার স্বরূপ ও বিশেষত্ব বোঝার পক্ষে এই ঘটনাটীর মূল্য আমি অনেকখানি দিয়ে থাকি। এই সময়েই য়ুরোপের যুদ্ধের সম্ভাবনা পরিস্ফুট হয় এবং কবি এর আগে হ'তেই মানুষের ভাবী অকল্যাণের চিন্তায় ম্রিয়মাণ ছিলেন। খেয়ার রচনাকালে যে বিপদের সুরটী ক্ষীণভাবে প্রবাহিত ছিল, তাই এই সময়ে সম্পূর্ণ মূর্ত্তি গ্রহণ করল। কবির দুঃখ যা ছিল ভাবলোকে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল কল্পনা ও চিন্তার বিচ্ছুরণে,—বলাকার পরবর্ত্তী রচনায় কবি যে বিশেষ টাইপের সৃষ্টি করলেন, তারই জন্ম হ'ল এইখানে।

বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনেও কবির নব-মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। এখন আর 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেমের' বন্দনা-গান নয়, 'নিরুদ্দেশের পথে বিলাস যাত্রাও নয়, 'নববর্ষার' ও 'কৃষ্ণকলির' 'আবির্ভাবের' অভিষেক নয়, 'সব পেয়েছির দেশে'ও কবি একবার পলাতক বালকের মত ছুটে যেতে চান নাই, এখন তাঁর বিষয়বস্তু গতিহীন, নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক 'ছবি'; এখন তাঁর কবি-প্রতিভা 'বিচার' ও বিতর্কের দ্বারা আলোড়িত। এই জন্যই দেখি কবি যখনই মাঝে মাঝে কল্পনায় সম্মুখের বস্তুময় ধরণীকে অতিক্রম ক'রে উধাও হবার চেষ্টা করেছেন,—যেমন 'ছবি'কে সম্বোধন ক'রে তিনি এক জায়গায় বল্‌ছেন,

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও,
পথিকের সঙ্গ লও।
ওগো পথহীন,
কেন রাত্রি দিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হ'তে আছ এতো দূরে,
স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে?

(ছবি—বলাকা)

তখনিই, তাঁর এই পলাতক কল্পনা হৃদয়ের দুঃখের গভীরতায় চাপা প'ড়েছে, যা ছিল নিছক কল্প-বস্তু তাই আবার ভাবের ও দর্শনের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল। কবি নিজের এই উদ্দাম কল্পনার আবেগে লজ্জিত হয়েই যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন, এবং তাঁর বিষয়-বস্তুর সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত একটা ঘটনাকে টেনে আন্‌লেন। তিনি এর পরেই লিখ্‌লেন,

'এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে,
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে' ইত্যাদি।

এখানে ধূলির উল্লেখ যে কেবল অপ্রাসঙ্গিক তা নয়, অপ্রত্যাশিতও বটে। কবি সমস্ত কবিতাটাকে প্রথমে যে মূর্ত্তি দিতে চেয়েছিলেন, সহসা মধ্য-পথে সে ইচ্ছা তাঁর পরিবর্ত্তিত হ'ল, কেননা, আপনার উদ্দাম খেয়ালে আপনার খুশীতে রচনা ক'রে যাওয়া এখন আর তাঁর আসে না। যে নাবিক একদিন গহন রাত্রিকালে তাঁর জীবনতরীর কর্ণধার হ'য়েছে, তারই ইঙ্গিতে ও ইচ্ছায় নিজেকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত প্রতি পদে তাঁকে করতে হয়; আজ তাঁর কল্পনার চরণে বেদনার জিঞ্জীর, তাঁর চিন্তায় উদ্দেশ্য ও আদর্শের গণ্ডী। এই জন্যই যখনই মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য ক্ষণিকার বিদ্যুৎ কল্পনায় ঝল্‌সিয়ে উঠেছে, অমনি কবি সন্ত্রস্ত হ'য়েছেন, তাঁর কল্পনাকে একটা বিশেষ অভিপ্রায়ের দিকে নিবদ্ধ করেছেন, চিন্তাকে দর্শনের ভাববাদে সংকীর্ণ করেছেন।

আমি কি বল্‌তে চেয়েচি তা স্পষ্ট করার জন্য আরো একটা উদাহরণ এখানে দেব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কত স্বচ্ছ, কত স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল ছিল, ক্ষণিকার 'অনবসর' কবিতাটার সঙ্গে বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতাটার তুলনা করলেই বোধগম্য হবে। ক্ষণিকার কবির মন কোনো ভাবের দ্বারাই আক্রান্ত ছিল না, তাই প্রথম উৎসারিত ঝর্ণার মত তাঁর কবিতা যেন বেরিয়ে এ'সেছিল, এবং তাই তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে গাইতে পেরেছিলেন,

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী,
ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্য বিলাপ করি—
সিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক
তোমায় চির-আপন জেনেই।
হায় রে আমার হতভাগা!
সময় যে নেই, সময় যে নেই!

(অনবসর—ক্ষণিকা)

কিন্তু বলাকায় এই তাৎপর্য্যেরই কত বাদশাহী আমেজ, কত আভিজাত্য ও গভীরতা।

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

এবং আবার,

উন্মত্ত সে-অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি।
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল,
দুলে ওঠে বিদ্যুতের দুল।

ক্ষণিকায় যে চঞ্চলা ছিলেন কলভাষিণী মর্ম্মর-গান-মুখরিতা, বলাকায় তাই হয়ে উঠেছে ভাবে, বচনে ও সংযমে অতিমাত্রায় ঐশ্বর্য্যশালিনী। মনে হয় কবি বিরাট নদীর অবিরাম গতির কথা এখানে ভুলে গেছেন, অবিচ্ছিন্ন অবিরল তার যে ক্লান্তিহীন চঞ্চল কলনাদ, তাকে ভাষায় সঙ্গীতে ধর্‌বার চেষ্টা কবি এখানে করেন নাই। এর বস্তুময় যে অস্তিত্ব তাকেই কবি বড় ক'রে ধর্‌তে চেয়েছেন, এই জন্যই 'চঞ্চলা' কবির মনে অচঞ্চল সত্য-দর্শনের কথা জাগিয়েছে, কবি তাই নদীর কায়াহীন বেগ প্রত্যক্ষ করলেন,

বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে;

এবং তাঁর কল্পনা ক্রমশঃ এই চিন্তার পথ ধ'রে আরও দার্শনিক তত্ত্বে উপনীত হ'ল।

ক্ষণিকার এবং এই যুগের কাব্য-রীতি হ'তে যে বলাকার রীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তা প্রথমেই আমাদের চোখে প'ড়েছে। এ প্রণালী উন্নততর কিনা তার আলোচনা এখানে করা চলে না, তবে এ যে স্বতন্ত্র এবং এ স্বাতন্ত্র্যের যে বিশেষ একটা রূপ আছে তাতে আর সন্দেহ থাক্‌ল না। ক্ষণিকায় সময় নাই ব'লে বিলাপ ক'রে কবি গেয়েছিলেন—"সময় যে নেই,—সময় যে নেই!" কিন্তু শাজাহানে যখন পড়ি 'নাই, নাই, নাই যে সময়' তখন কেবল যে কতকগুলো শব্দের ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি তা নয়, সমস্ত toneএ ভাবে আদর্শে এক নবতর কাব্যের সন্ধান পাই; কবির কল্পনার এক সম্পূর্ণ নূতন দিকের পরিচয় লাভ করি। এই জন্যই বলাকার যুগে কবিতা যে কেবল শব্দ-সম্পদে সুপ্রচুর ও ঝঙ্কারময়ী হয়েছে তা নয়, এই সঙ্গে কাব্য-লক্ষ্মীরও সজ্জা-পরিবর্ত্তন হয়েছে, কবিও বৃদ্ধ হ'য়েছেন।

কিন্তু তা হ'লেও কবির সম্পূর্ণ পরিচয় পেলাম এ-কথা বল্‌তে পারিনে। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি ও দার্শনিক নন, তিনি মানুষের কাছে অনন্ত বিস্ময়। তাঁর সম্বন্ধে শেষ-কথা কেউ বল্‌বে, এমনতরো কোনো শ্রেণীবিভাগে তাঁকে ভাগ করা যায়না। যখনই কোনো একটা দিক বিশেষভাবে তাঁর চিন্তায় ও রচনায় প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে তখনই তাঁর কবি-বুদ্ধি এই নিয়মের শৃঙ্খল থেকে স্বাভাবিক প্রেরণাতেই মুক্ত হতে চায়। যখনই দেখা গেল, বলাকার যুগের সমস্ত কবিতায় একটা সুর বিশেষভাবে uniform হ'য়ে উঠ্‌ছে তখনই এ'ল বিস্ময়ের পর বিস্ময়,—'পলাতকা' ও 'শিশু ভোলানাথ'। অনেকে মনে করেন এই কবিতাগুলি, গভীর বেদনার অনুভূতির পরে যে অবসাদ মানুষের মনে প্রবল হয়, রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও তারই চিহ্ন। কিন্তু একটু বিচারদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, বলাকার ভাববাদের সুর এই কবিতাগুলিতেও প্রচ্ছন্ন আছে। বস্তুতঃ বলাকার যে কেন্দ্রগত মর্ম্মকথা, তার প্রকাশ যে একই পথে হবে এমন কোনো বাঁধাধরা বিধান থাকতে পারেনা। জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা নুড়ি নিয়ে যে খেলা জমিয়েছে কবি কেবল তার বাহ্য-রূপের পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি বৃদ্ধ-বালক বেশে এই খেলায় যোগ দিয়েছেন। কিন্তু বলাকার প্রারম্ভে যে ধ্যানদৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে, তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগও করতে পারেন্‌নি। শিশু ভোলানাথের ছদ্মবেশে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকেই প্রত্যক্ষ করি, যদিও এখানে দর্শন-তত্ত্ব বালকের খেলার আমোদে অনেকখানি হাল্‌কা ও সহজ হ'য়ে উঠেছে, এবং কবির কল্পনা মাঝে মাঝে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু এ ছদ্মবেশ শীঘ্রই অশোভন হ'য়ে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনার অপরূপত্ব আবার নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে এবং কবি বহুদিন আগে যে রাগিণী পথপ্রান্তে ত্যাগ ক'রে এ'সেছেন, তারই জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে তাঁর নব-গৃহীত মন্ত্রের সাধনায় আপনাকে নিযুক্ত করেন। 'পূরবী'তেও বলাকার ধ্বনিই শুন্‌তে পাই, তেমনি কল্পনার সুদূর-প্রসারী অভিযান, গভীরতা ও স্থবিরতা। মাঝে মাঝে 'লীলাসঙ্গিনী'র স্মৃতি কবিকে ব্যাকুল ক'রেছে, গগন-ভরা তারার মাঝে তাঁর একান্ত আপনার তারাটীর সন্ধানে তাঁর নয়ন আকাশের কিনারা খুঁজে ম'রেছে, কিন্তু যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল দিনগুলি আজ আর কবির কাছে সত্য নয়, ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র, এর যে বেদনা তা কবির কল্পনায় একাকার হ'য়ে গেছে, কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দ্বারা এ আর বিশিষ্ট নয়। সেই জন্যই কবি বলেছেন,

—নিয়েছো তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখো সঙ্গোপনে।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্ত ধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।
(তপোভঙ্গ—পূরবী)

এই জন্যই তাঁর লীলাসঙ্গিনী, যাঁকে খেয়াঘাটে ফেলে এ'সেছিলেন কবি, তার সঙ্গে চেনা তাঁর হ'ল বিস্মরণের গোধূলি ক্ষণে, সন্ধ্যার আবছায়ায়, কাজের কক্ষকোণে। মানসপ্রতিমাগুলিকে আভরণে সাজাবার জন্য সে উদ্দীপনা সে উৎসাহ, সে-নেশা কবির আর নাই; তাই আজীবনের লীলাসঙ্গিনীর কাছে তাঁর বিদায় প্রার্থনা এত করুণ, এত নির্ম্মম—

এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সে দিনের সেই বাঁশী।

আজ সন্ধ্যার প্রাণ উঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন!
কেন অবেলায় ডেকেছো খেলায়
সারা হ'য়ে এ'লো দিন।
(লীলাসঙ্গিনী—পূরবী)

'প্রবাহিনী'তে'ও এই সুর অক্ষুণ্ণ রয়েছে। 'মহুয়া'য় কবি কোনো নূতন যুগের সূচনা করেননি, বলাকার ধারাই অব্যাহত রেখেছেন। যে অন্ধকার বিদীরণ ক'রে জ্যোতির্ম্ময় নব-সূর্য্যকে আবাহন ক'রেছিলেন 'বলাকা'র প্রারম্ভে মহুয়াতেও তারই প্রেরণা প্রবাহিত হচ্ছে,

সেইখানেতেই আমার অভিসার,
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতনবনের
ছায়াতলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ-জোনাকির
আলো জ্বলে।

এই তিমির নিদারুণ আলোকের বন্দনাতেই তাঁর কাব্য চেষ্টায় উল্লসিত, মেঘের দুর্য্যোগে খড়্গ হানিয়া ঘন অশ্রু-বাষ্পেভরা মিথ্যার অন্ধকার মোচন করার জন্য সবিতৃ-দেবতার কাছে তাঁর এই ছিল একান্ত নিবেদন এবং এইজন্যই পূরবীতে এই প্রার্থনা ছিল—

ফেলো, ফেলো টুটি
হে সূর্য্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনক পদ্মখানি
দেখা দিক্ ফুটি।
(সাবিত্রী—পূরবী)

মহুয়াতেও এই প্রার্থনাই কত রূপে ও বিভিন্ন গানে ধ্বনিত হয়েছে তার অন্ত নাই। 'প্রকাশ' কবিতাটিতে এই প্রার্থনারই রেশ শুনতে পাই, এই ইচ্ছারই বিদ্যুচ্ছটা দেখ্‌তে পাই। যেমন,

শুধু আসি অংশ জনতার
উদ্ধার করিয়া আনো
আমারে সম্পূর্ণ করি জানো।'
(প্রকাশ—মহুয়া)

কিন্তু চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর, যা একদিন পূরবীতে বার বার কাজের কক্ষকোণে কবিকে বিভ্রান্ত ক'রে দিত, চঞ্চল ক'রে তুলত, মহুয়াতেও সেই অনুতাপ কবিকে বার বার উন্মনা ক'রেছে। কবি মহুয়াতেও এই জন্য লিখেছেন,

যে-গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে-গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে?
(পুরাতন—মহুয়া)

কিন্তু হায়, এ গান রবীন্দ্রনাথের শেষ রাগিণীতেও ধ্বনিত হবে, শেষের কবিতাতেও বারবার বেজে উঠবে, কেন-না সমগ্র রবীন্দ্রনাথ আসলে তাঁর দুইটী স্বরূপের, কবি ও দার্শনিকের দ্বন্দ্ব মাত্র। উভয়ের মধ্যে অবিশ্রাম যে কলহ ও মিল তারই ফল রবীন্দ্র-সাহিত্য ও কবিতা, কাজেই সে কথা আমাদের কিছুতেই ভুল্‌লে চল্‌বে না।

এখন বলাকা থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে noteটি আমরা মহুয়া পর্য্যন্ত লক্ষ্য করলাম, তার বিশেষত্ব সম্বন্ধে সরাসরি একটা জবাব অবশ্য দেওয়া যায়। এ নির্দ্ধারণের পরিপূর্ণ সত্যতা যে স্বীকার করা যায় না, প্রথমেই সে কথা বলেছি, তা হ'লেও বলাকার যুগ রবীন্দ্র-সাহিত্যের দার্শনিক যুগ, একালে রবীন্দ্র-কাব্যে দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এই যুগে philosophical বলায় যে কেবল একথা বল্‌তে চেয়েছি যে, এ কালের লেখা লিরিক নয়—শুধু তাই বুঝলেই চল্‌বে না, রবীন্দ্রনাথের philosophyরও একটা বিশেষ ধরণ আছে; আমরা দার্শনিক বল্‌তে চোখে ঠুলি-আঁটা যে বিজ্ঞ লোকটার মূর্ত্তি কল্পনা করি, অথবা পৃথিবীর রহস্যের ইতিবৃত্ত ও অর্থ সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞানের বাহবা দেই এমন কাহারো কথা ভাব্‌লে চল্‌বে না। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। প্রোফেসর রাধাকৃষ্ণন্ বলেছেন যে, রবীন্দ্রদর্শন, is a sigh of the soul rather than a reasoned account of metaphysics; an atmosphere rather than a system of philosophy (The Philosophy of Rabindranath Tagore—Macmillan), এবং সত্য সত্য কোনো বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত নৈয়ায়িক বিতর্কপ্রসূত কোনো দর্শন-শাস্ত্রের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র দর্শন আসলে একটা atmosphere এবং একটা মত মাত্র, কোনো বিশেষ একটা প্রণালী নয়। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে যে philosophical

ব'লেছি তার অর্থও এই সংজ্ঞার আলোকেই বিচার করতে হবে। বলাকার যুগের কবিতা ভাব-প্রধান, গীতি-প্রধান নয়, philosophical বল্‌তে এই কথাই বুঝতে হবে। এবং এখানে আমরা এই জিনিসটাই বরাবর trace করবার চেষ্টা ক'রেছি এবং দেখাতে চেয়েছি যে, রস ও কাব্যের বিচারে বলাকার পরবর্ত্তীকালের অধিকাংশ কবিতাই যাকে আমরা খাঁটী কবিতা বলি তা নয়। হয়, এগুলি কবিতার চাইতেও বেশী এমন কিছু অথবা কবিতার চাইতে কম এমন কোনো সাহিত্য। অবশ্য খাঁটি কবিতা যে কবি এই যুগে লেখেননি তা নয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম কবিতার অন্যতম, 'নারী', কল্পনার প্রাচুর্য্যে ছন্দের লীলা ও রসের উপাদানে অনবদ্য ও অতুলনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির এযুগের গানে এমন একটা strain আছে যাকে সংজ্ঞার জন্য দার্শনিক বলা চলে। এ-সুর সহজিয়া কবির নয়, এ-সুর যেন কতকটা মিল্টনিক, গম্ভীর ও উদাত্ত। এর শব্দ যেন বাঁশীর রন্ধ্রে নয়, এ যেন একটা organ voice। আমি এই কালের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে স্থানান্তরে বলেছিলাম যে, 'it is the rumbling voice of the sea summoning the mountains' এবং আমার মনে হয় যে একথা বোধ হয় অনেকখানি সত্য।

রবীন্দ্র সাহিত্যের এ-কালটার এ-পরিচয়, কবি রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে সুষ্ঠু না হ'লেও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে সুবিচার-সম্পন্ন তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক কথায় ভাল বা মন্দ কিছু না ব'লে, আমরা যে আলোচনা ক'রেছি, তার থেকে একটা জিনিষ অনায়াসেই অনুমান করতে পারি যে, এ-কালের কবিতায় জটিলতা বেশী, বৈচিত্র্য আরও বেশী এবং বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য্য অনেকখানি। সহজ সত্যের এমন একটা অক্ষয় রূপ আছে যার মলিনতা কোনদিনই ঘটে না, যাকে কোনদিনই ছোট করা যায় না। সত্যের বিচিত্র প্রকাশ অবশ্য অনিবার্য্য, কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গী যদি জটিল হয়, যদি বিশেষ ক'রে মস্তিষ্ক-সঞ্জাত হয়, তা হ'লে রসের বিচারে তাকে সাহিত্যে উচ্চস্থান দেওয়া যায় না। কেননা, যা গ্রন্থিযুক্ত, যা বিবিধ, যা বহুবিধ তাকে মুক্ত করায় ও ঐক্যদানেই কবির শ্রেষ্ঠত্ব, তাই কবি অনন্যসাধারণ। আমরা সাধারণ জীবনে সত্যের সরল রূপকে বক্রভাবে দেখ্‌তে অভ্যস্ত ব'লেই কবি ও সাহিত্যিকের বিশেষ দৃষ্টিটা আমাদের এমন অভিভূত করে। রবীন্দ্রনাথ এই কালটাতে এই সরল দৃষ্টিটি হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁর গানে সহজ সুরটা খোয়া গেছে। এই জন্যই তাঁর কাব্য-রচনায় গানের চাইতে গমক বেশী, সুরের চাইতে কথা এত অধিক। একে শক্তির docadence বা decline বল্‌লে অন্যায় করা হবে, এবং কেন হবে তা আগেই আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু এ-কথা আমাদের মান্‌তেই হবে যে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর দার্শনিক মতবাদের অনেক নীচে এখানে চাপা পড়েছেন। Robert Browning এর শেষের কবিতাগুলির সম্বন্ধেও প্রফেসর Henry Jones এই ধরণের কথাই বলেছেন। এবং Browningএর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গোড়ার কবিতার মিল না থাক্‌লেও শেষের কবিতায় যে যথেষ্ট আছে, একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই তা চোখে পড়ে। কবিতায় এই গূঢ়তা ও নিপুণতা সাহিত্যিক কলা-কৌশলের বিচারে শ্রেয়ঃ ব'লে গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু আর্টের দিক হ'তে এর ক্ষুণ্ণতা লক্ষ্য না করে পারা যায়না। যাঁরা সদ্য-প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত ইংরেজী নাটক Journey's End দেখেছেন বা পড়েছেন তাঁরাই আমার একথার সত্যতা স্বীকার করবেন। সত্যের যে অনাড়ম্বর রূপটী প্রচ্ছন্ন থাকে, তাকে বাহিরে প্রকাশ করাই আসল কবি-ধর্ম্মীর কাজ এবং মানব মনের উপর তার প্রভাব কত মধুর কত মনোরম, শ্রেষ্ঠ সাহি-ত্যিকদের রচনার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করলেই তা ধরা পড়ে। এই বইখানার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একখানা বিলাতী মাসিকে একজন সাংবাদিক যে-কথা কয়টী বলেছেন, সাহিত্যের বিচারে অনেকে তা মনে রাখ্‌লে ভাল হয়। তিনি বলেছেন, Journey's End has proved that imagiration can not conceive anything as impressive as the simple truth"। বলাকার যুগের বিশেষত্ব এইখানে যে, এর কল্পনা সহজ সত্যকে ভয় ক'রে নাই, সত্যের বিবিধ বিচিত্র তথ্যকে আশ্রয় ক'রে এই যুগের রবীন্দ্র-সাহিত্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রীগিরিজা মুখোপাধ্যায়

সত্যাসত্য

—উপন্যাস— —শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৩৮

বাদলকে বিদায় দিয়ে এসে উজ্জয়িনী চিন্তা কর্‌বার সময় পেল প্রথম।

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনাগুলো যেন আপনা থেকে ঘ'টে যায় মানুষকে সাক্ষী ক'রে। পরম মুহূর্ত্তগুলির উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব যেন কথার কথা। কোথায় ছিল উজ্জয়িনী, কোথায় ছিল বাদল। কেমন ক'রে একদিন তাদের বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল ভাব্‌তে বস্‌লে অবাক হয়ে যেতে হয়। সে কি সহজ কথা! একটি দিনে জীবনের এত বড় পরিবর্ত্তন কি আর আছে! বাইরের লোক ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাজি পুড়িয়ে ভালোমন্দ খেয়ে ও খাইয়ে অন্তরের এই গভীর সত্যটাকে রূপক আকারে ব্যক্ত কর্‌তে চায়।

তবু উজ্জয়িনীর কেমন যেন মনে হ'তে লাগ্‌ল বিয়ে তার হলো না। অতলস্পর্শী পরিবর্ত্তনের ভাব তার অন্তরে কই? সে তো সেই উজ্জয়িনীই আছে, মোটের উপর। উৎসবের ত্রুটী হয়নি, রাশি রাশি উপহার এসেছে, শাড়ী ও বই এত এসেছে যে প'রে ও প'ড়ে শেষ কর্‌তে দু'টি বছর লাগবে। গহনা যা এসেছে তা নিয়ে গহনার দোকান খোলা যায়।

উজ্জয়িনী গোড়া থেকে ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌ল।

মাসের একটি বিশেষ তারিখ পর্য্যন্ত সে ছিল যোগানন্দ গুপ্তের কন্যা। তারপর থেকে হলো মহিমচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ। ছিল একেবারে তার নিজের, হলো বাদল ব'লে একটি প্রিয়দর্শন তরুণের। স্বামী কথাটার মধ্যে কী মহা রহস্য আছে, মুখে আন্‌তে এমন লজ্জা করে, গাল রাঙা হয়ে ওঠে, মনের কাঁপন আর থামে না। বাদল তার স্বামী।

যে মুহূর্ত্তে সে তার স্বামীকে দেখ্‌লে প্রথম, সে মুহূর্ত্ত তার স্মৃতির আকাশে উষারাগের মতো কখন মিলিয়ে গেছে, কেননা তারপরে ফুটেছে দিনের পর দিন বাদলের সঙ্গে পরিচয়ের দিবাদীপ্তি। উজ্জয়িনী স্বভাবত গম্ভীর, বাদল স্বভাবত লাজুক অথচ বাচাল। বাদলকে একবার যদি কোনো উপায়ে কথা কওয়ানো যায় তবে সে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে একটানা ও একতরফা বাক্যালাপ চালায়। কেবল ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড। কতদিনে সেখানে পৌছবে, আধুনিক যুগের কোন কোন চিন্তা-নায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বে, কোন অঞ্চলে চাষাদের ফার্ম্মে থাক্‌বে, কোন কোন ফ্যাক্টরীতে সখের এ্যাপ্রেন্টিস্ হবে, পায়ে হেঁটে ল্যাণ্ড্‌স্ এণ্ড্ থেকে জন্‌-ও-গ্রোট্‌স্ যাবে—এমনি হাজারো জল্পনা। বাদলের উচ্চাভিলাষ যেমন সংখ্যাতীত তেমনি তুলনাতীত। একদিন বল্‌ছিল, "গায়ে যদি আর একটু জোর থাক্‌ত তা হলে ইংলিশ চ্যানেলটা পার হবার জন্যে জাহাজের সাহায্য নিতে লজ্জা বোধ কর্‌তুম।" উজ্জয়িনী যখন চেপে ধর্‌ল, তখন বাদল চট্ ক'রে উত্তর কর্‌ল, "সাঁতার কেটে পার হবো এমন কথা আমি বলিনি। খুব সম্ভব এরোপ্লেন চালিয়ে পার হবো।"

বাদলের সঙ্গে এক ঘরে ও এক বিছানায় রাত কাটাতে উজ্জয়িনীর ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল। আশ্চর্য্যের ভাব পুরাতন হবার আগেই বাদল দেশ ছাড়ল। বাদলের দেশ ছাড়াতে উজ্জয়িনীর যে স্বাভাবিক বিষাদ সেই বিষাদের দ্বারা চাপা পড়্‌লেও মাঝে মাঝে আশ্চর্য্যের ভাব উজ্জয়িনীকে অভিভূত করে। সে নিজেকে বারম্বার প্রশ্ন করে, "সত্যি? সত্যি? সত্যি? সত্যি? সত্যি?…"

একটুখানি সান্নিধ্য। তবু কী অপরূপ আবেশ এনে দেয়। দিদিদের সঙ্গে এক বিছানায় কতবার শুয়েছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত বোধ হয় নি। তার কারণ বুঝি এই যে, বাদল অপরিচিত আর দিদিরা চিরপরিচিত? কিম্বা এই যে, বাদল তার স্বামী?

স্বামী কথাটা মনে মনে উচ্চারণ কর্‌তে উজ্জয়িনী সরমে

শিহরিত হয়। বন্ধু পাবে, সেই আশায় সে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়ের পরে বন্ধুর কথা গেল ভুলে। মনে রইল যার কথা সে তার স্বামী।

উজ্জয়িনীর মনে হলো এই ক'দিনে তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেল। যেন তাকে আর বোকা মেয়ে বলা চলে না, খুকী নাম বেমানান হয়। তার স্বামীর সান্নিধ্য তাকে কোন মন্ত্রশক্তির দ্বারা বিজ্ঞ ক'রে দিয়ে গেছে। এখন সে অনেক কিছুর অর্থ বোঝে। এই অতি-পরিচিত অতি-অবজ্ঞাত পৃথিবী যেন এই প্রথম তার চোখে পড়ছে। রাত্রের আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয়, কী একটা ভাষায় কী যেন লেখা রয়েছে, নেহাৎ হিজিবিজি নয়। তারাগুলো এক একটা হরফ।

কিন্তু কোনো এক বিষয়ে মন বসে না। তারার কথায় মনে পড়ে বাদলও জাহাজে ব'সে এই তারাই দেখছে। কিন্তু বাদল কি উজ্জয়িনীর কথা ভুলেও ভাবছে? তার লক্ষ্যের দিকে সে যত দ্রুত গতিতে ছুটেছে উজ্জয়িনীকে পিছনে রাখতে রাখতে যাচ্ছে তত বেশী। বাদলের জীবনে কি বিয়ে ব্যাপারটা কিছুমাত্র দাগ কেটেছে? উজ্জয়িনী যেমন তাকে স্বামী বলতে রোমাঞ্চিত হয় সেও কি উজ্জয়িনীকে স্ত্রী বলতে পুলক পায়? প্রেম শব্দটা উজ্জয়িনী বইতে পড়েছে, তার যে কী অর্থ কেমন প্রকৃতি সেকথা উজ্জয়িনীর বোধগম্য হতো না, এখন যেন কতকটা হয়— অন্তত তার একটা লক্ষণ হচ্ছে সঙ্গকামনা। বাদলের প্রাণে অমন কামনা কখনো জাগে না কি? নিশ্চয়ই জাগে না, জাগলে কি বাদল সারাক্ষণ ইংলণ্ডের ধ্যান করত?

বাদল যে উজ্জয়িনীকে স্ত্রী ভাবে না, ওকথা সে প্রকারান্তরে জানিয়ে গেছে বইয়ের গায় উজ্জয়িনী গুপ্তের নামাঙ্কন ক'রে। কোনোদিন মিস্ গুপ্ত ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকে নি। একদিন তো বাদল খোলাখুলি ব'লেও ছিল, "বিয়ে না করলে বিলেত যেতে পাবো না ব'লেই বিয়ে করছি। আর বিলেত না যেতে পেলে আমার জিনিয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। এতদিন যে এদেশে আছি এই এক ট্র্যাজেডী।"

অন্য কোনো মেয়ে হলে অভিমান করত অথবা অপমানে কেঁদে ফেলত, কিন্তু উজ্জয়িনীর বাদলের প্রতি অনুকম্পাই হলো। আহা বেচারা, বিয়ে না ক'রে করেই বা কী! এত বড় প্রতিভাশালী যুবকের প্রতিভা যে বিলেত না গেলে খুলবে না। রবি ঠাকুর, জগদীশ বসু, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু—ভারতবর্ষের প্রত্যেক মহাপুরুষের যৌবন বিলেতের বাতাস লেগে মঞ্জরিত হয়েছে।

বিয়েটা যেন উজ্জয়িনী একা করল, বাদল নামমাত্র বর হলো। উজ্জয়িনীর সিঁথিতে সিঁদুর উঠল ও হাতে নোয়া। তবু অন্তরে সে কুমারীই থেকে গেল। কেবল অন্তরে কেন, দেহেও।

৩৯

বাদল চিঠি লিখবে মাঝে মাঝে, এমন প্রত্যাশা উজ্জয়িনীর ছিল। তাদের সম্বন্ধটা দাম্পত্যের না হোক, বন্ধুত্বের না হোক, ভদ্রতার তো বটে।

উজ্জয়িনী বম্বে থেকে চিঠি না পেয়ে বিচলিত হলো না। মনকে বোঝালো, সময়ের অভাব। বিদেশ যাত্রার উত্তেজনা। ট্রেণ থেকে নেমে জাহাজ ধরা তো হেলে দুলে কোঁচা সামলে ধীরে সুস্থে হবার নয়। বাদলের সঙ্গে উজ্জয়িনীরও বম্বে অবধি যাওয়া উচিত ছিল, অন্তত উজ্জয়িনীর বাবার কিম্বা শ্বশুরের। তাঁরা যে যেতে চান নি এমন নয়, বাদলই তাঁদেরকে নিরস্ত করেছে, বলেছে ইংরেজের ছেলেরা যখন ঐ বয়সে সিবিলিয়ানী করতে কিম্বা ওর থেকে কম বয়সে ব্যবসা করতে ভারতবর্ষে আসে তখন ওদেরকে এগিয়ে দেবার জন্যে কেউ মার্সেল্‌স্ অবধি আসে না। কলকাতা থেকে বম্বে এক দৌড়ের মামলা, সঙ্গে একটা চাকর যাচ্ছে সেই যথেষ্ট বাড়াবাড়ি, অন্য কেউ যদি যান তবে বাদলের পৌরুষ লজ্জা পায়।

বাদল বম্বে পৌঁছে দুই গুরুজনকে দু'খানা টেলিগ্রাম করলে, কিন্তু উজ্জয়িনীকে না। অভিমান করা উজ্জয়িনীর স্বভাবের অঙ্গ নয়। উজ্জয়িনী হাসতেও জানে না, কাঁদতেও জানে না, মনের দুঃখ নীরবে পরিপাক করে। তার মুখ দেখে বোঝা যায় না সে কী ভাবছে, কী ভুগছে। সেইজন্যে তো

তার সমবয়সিনীরা তাকে সন্দেহ করে। তারা সাধারণ মানুষ —হাসে, হাসায়, কাঁদে, কাঁদায়, গল্প করে, দুষ্টুমি করে, ঝগড়া যেমন করেও তেমনি ভোলেও। উজ্জয়িনীর মনের নাগাল পায় না ব'লে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, উজ্জয়িনীটা কেবল যে বোকা তাই নয়, তার পেটে পেটে অনেক বিদ্যে।

উজ্জয়িনীর মনের গড়ন জানতেন একমাত্র তার বাবা। তাঁরই কাছে উজ্জয়িনীর গভীরতম ভাবনা-বেদনা-আবেগ-অভিলাষ ষ্টেথোস্কোপের মুখে বুকের স্পন্দনের মতো ধরা প'ড়ে যেত। উজ্জয়িনীর মনের এ্যানাটমি তাঁরই একার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে উজ্জয়িনীর মনের আড়ালে যে-সব কামনা ও যে-সব খেদ জমতে লাগল সে সকলের ডায়াগ্নসিস্ যোগানন্দের সাধ্যাতীত। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি নিতান্তই হাতুড়ে।

তা ছাড়া উজ্জয়িনীও তাঁর কাছে তেমন প্রাণ খুলে কথা কয় না, লজ্জা বোধ করে। অথচ লজ্জা ঢাকা না দিয়েও পারে না, সে যে আরো লজ্জার কথা। বাবার কাছে তার কিছুই গোপন ছিল না, এখন থেকে একটি বিষয়ে মিথ্যাচরণ সুরু হলো। বাদল সম্বন্ধে তার উৎকণ্ঠা নেই অনুমান ক'রে যোগানন্দ ভাবলেন, আহা, নেহাৎ ছেলে মানুষ। স্বামী কী জিনিষ বোঝে না ব'লেই কাঁদে না।

বলেন, "বাদল বোধ হয় এতদিনে এডেন পৌঁছে গেছে রে খুকী।"

উজ্জয়িনী অসংকোচে বলে, "সে কী ক'রে সম্ভব? এই তো সেদিন গেলেন।"

যোগানন্দ ভাবেন, তাই তো। আমাদের বয়সে আমরা একটা দিনকে একটা যুগ মনে করতুম। শনিবার চিঠি আসার বার, বৃহস্পতিবার থেকে পোষ্টম্যানের পায়ের শব্দ শুনতুম। রবিবারটা ছিল আমাদের সত্যিকারের Sabbath; সেদিন মেঘদূত ছাড়া অন্য কিছু পড়তুম না, খবরের কাগজ পর্য্যন্ত না। বিলেত যখন যাই তখন তো কতবার কত ছলে Cable করতুম ও করাতুম। হায় রে! কত দুঃখই না পেয়েছি!

যোগানন্দের স্মৃতি বিশ বছর পেছিয়ে গেল। উজ্জয়িনীর স্মৃতি গেল মাত্র সাতদিন পেছিয়ে। আজ বৃহস্পতিবার। গত বৃহস্পতিবার বাদল ছিল। এখন যে সে কত দূরে, দশ হাজার মাইল দূরে কি দশ মাইল দূরে—তার হিসাব হয় না।

কাছে থাকা ও কাছে না থাকা, এই দুইয়ের মাঝখানে যে ব্যবধান সে ব্যবধান এতই অসীম যে পরিমাপের দ্বারা তাকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রমাণ করলে তজ্জনিত দুঃখ কমেও না বাড়েও না।

উজ্জয়িনী দেয়ালের দিকে চেয়ে টিক্‌টিকির শীকার-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করছে, না, ক্যালেণ্ডারের প্রতি চোরা চাউনি ক্ষেপণ করছে যোগানন্দ টের পাচ্চেন না। তিনি ভাবছেন অল্প বয়সে বিয়ে করা দেহের পক্ষে অহিতকর হলেও মনের পক্ষে তপস্যার কাজ করে। সেইজন্যে বিয়ের অব্যবহিত পরেই বিরহের ব্যবস্থা দিতে হয়। আমাদের সমাজে এই ব্যবস্থাই এক কালে প্রচলিত ছিল, তখন এক বাড়ীতে থেকেও স্ত্রীপুরুষের কতখানি দূরত্ব ছিল আজকালকার স্বামী স্ত্রীরা শুনলে বিশ্বাস করবে না। সেই দূরত্বকে যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হতো তবে তো বাল্যবিবাহ নিরোধের প্রয়োজন থাকত না।

•

৪০

বিয়ের পূর্ব্বাহ্ন থেকে উজ্জয়িনীর জানা ছিল যে, বাদল বিদেশ-যাত্রী, উজ্জয়িনী তার যাত্রাপথের একটা মাইলষ্টোন মাত্র। সহযাত্রিণী নয়, অতিক্রমণীয়া। সেইজন্যে বিদায়কে সে যথাসম্ভব সহজ ক'রে এনেছিল।

তবু তার বিশ্বাস ছিল না যে, বাদলকে বিদায় দিয়ে সে বিবাহ-পূর্ব্বের যুগে ফিরে যেতে পারবে। কলকাতা থেকে বহরমপুরে ফিরে যাওয়া তো বর্ত্তমান থেকে অতীতে ফিরে যাওয়া নয়। উজ্জয়িনী দশ দিনে দশ বছর বেড়েছে, স্মৃতির থেকে মুছে গেলেও এই দশটি দিন বনাম বছর মনের অন্তরালে অক্ষয়।

বাদল চ'লে যাবার পর উজ্জয়িনী নিজের অনুভূতির খবর নিয়ে অবাক হয়ে গেল। সে মূর্চ্ছাও যায় নি, ম'রেও যায়নি, প্রিয়বিরহকে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ ক'রে নিয়েছে। তার জীবনে বাদলের থাকাটার স্থান-

পূরণ করেছে বাদলের না থাকাটা। সে এক হিসাবে ফিরেই গেছে পিছনে। ফিরে গেছে বইয়ের রাজ্যে, তারার দেশে, পশু পাখীর সংসারে।

থেকে থেকে যখনি বাদলের সান্নিধ্যের স্মৃতি জাগে তখনি উজ্জয়িনী উতলা হয়। তারপরে যথাপূর্ব্বং। শুধু চিঠির বার এলে মিথ্যা আশায় ভোরের আগে ওঠে। ছল ছল চোখে সপ্তর্ষির দিকে চেয়ে থাকে। হয় তো চিঠি আসবে না। পুনরায় আশাভঙ্গ। দিনের আলোর সকলের সামনে যে কান্না কাঁদতে পারবে না শেষরাত্রের আকাশতলে ব'সে সেই কান্না সাঙ্গ ক'রে রাখে।

কত সপ্তাহ কেটে গেল, চিঠি এল না। যোগানন্দের নামে cable এল দুই তিনবার, কিন্তু উজ্জয়িনীর নামে কিছুই না। কেবল শ্বশুরের চিঠিতে এল বাদল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। মহিম লিখ্‌লেন, "মা গো, বাদলের সবিশেষ জানিয়ে আমাকে সুখী ক'রো। তারের খবরে প্রাণ ভরে না।"

যোগানন্দও বিস্মিত হন্‌। বাদল কি তাঁর কন্যাকে ভালবাসে না? ভালবাস্‌লে তো এত মোটা চিঠি লিখ্‌ত যে চিঠিখানা নির্ঘাত বেয়ারিং হতো। এবং বেয়ারিং চিঠি কখনো পথে হারায় না।

যোগানন্দ বাদলকে চিঠি লিখ্‌লেন ভালোবাসা জানিয়ে। মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার ছল খুঁজ্‌লেন, কিন্তু উজ্জয়িনী তাঁকে সে অবসর দিল না। বল্ল, "তোমার এত উৎকণ্ঠা কেন বলো তো বাবা। ভালো আছেন সে খবর তো পেলে। মামুলী চিঠি তাঁর কাছে তোমার আশা করাই অন্যায়। যখন প্রেরণা পাবেন তখন তিনি চিঠি লিখ্‌বেন দেখো।"

বাদলের প্রেরণার অপেক্ষায় যোগানন্দ অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লেন, মহিম প্রমাদ গণলেন, পরস্পরের মধ্যে যে পত্র-বিনিময় চল্ল তার ধুয়া এই যে, ছেলেটা হয় তো ব'খেই গেল। এমন সময় তাঁরা পেলেন সুধীর চিঠি। আশ্বস্ত হলেন। যোগানন্দ ভাব্‌লেন, হাঁ, সাইলেণ্ট ওয়ার্কার বটে, চিঠিপত্র লিখে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করতে চায় না। মহিম ভাব্‌লেন, কার ছেলে সেটা মনে রাখ্‌তে হবে তো। বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য অবহেলা ক'রে বৌকে প্রেমপত্র লেখে না।

সুধীর লেখার মধ্যে সুধীর পরিচয় পেয়ে যোগানন্দের তাকে সহজেই মনে ধর্‌ল। মহিম তো সুধীর কতকালের মেসোমশাই—কোন সূত্রে মেসোমশাই সে কথা এতদিনে ভুলে গেছেন। সুধী তাঁর ছেলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কাজেই তার কাছে ছেলের দোসর। সুধী যে পরামর্শ দেয় তাই সুপরামর্শ, সুধী যে কথা বলে তাই সত্য কথা।

যোগানন্দ ও মহিম বাদলের চিঠি সুধীকেই লিখ্‌লেন, সুধীর চিঠিতে বাদলের চিঠির স্বাদ মেটালেন। বাকী থাক্‌ল উজ্জয়িনী। বাদল যে সুধীকে দিয়ে তাকেও চিঠি লেখাবে এমন কথা তার মনে উঠ্‌ল না। বাদল যদি তাকে ভুলেই গিয়ে থাকে তবু সে বাদলকে দোষ দেবে না, বাদলের যদি কোনো দিন তাকে মনে পড়ে সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করবে, তার প্রতি বাদলের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

হঠাৎ একদিন উজ্জয়িনীর নামে চিঠি এল। বাদলের হাতের লেখা উজ্জয়িনী চিন্‌ত। বাদলের হাতের লেখা নয়। সুধীর হাতের লেখাও উজ্জয়িনী দেখেছে। সুধীরই হাতের লেখা বটে।

উজ্জয়িনী চিঠিখানি খুল্‌বে কি না চিন্তা করল। সে তো বাদল সংক্রান্ত সংবাদের প্রার্থী নয়। তবে কেন সুধীর চিঠি খুল্‌বে? সুধীর সঙ্গে তার পরিচয়ও নেই। কোন অধিকারেই বা সুধীর চিঠিকে স্বীকার ক'রে নেবে?

কিন্তু জীবনে প্রতিদিন নতুন মানুষের আগমনী বাজে না। সুধীর হাতের লেখাই তো সুধীর পরিচয়-পত্র। গোটা গোটা অক্ষর, একটু ডান দিকে টান, কোনোটাতে কালির পরিমাণ বেশি-কম হয় নি, সমস্তটিতে আত্মসমাহিত প্রসন্ন অন্তঃকরণের ছাপ। উজ্জয়িনী এমনি হস্তাক্ষর আরো দেখ্‌বে এই আকাঙ্ক্ষায় চিঠিখানি অবশেষে খুল্‌ল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

সাহিত্যে নোবেল-প্রাইজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্তা অমিয়া দত্ত

রোম্যাঁ রোলাঁ (Romain Rolland)

জন্ম—১৮৬৬ ; প্রাইজলাভ—১৯১৫

১৯১৪ সালে কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। সুবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক রোম্যাঁ রোলাঁ ১৯১৫ সালের 'নোবেল-প্রাইজ' লাভ করেন। ১৮৬৬ সালের ২৯ শে জানুয়ারী মধ্য-ফ্রান্সের অন্তর্গত ক্লামসি নামে একটি ছোট সহরে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন, মাতা পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর কন্যা। তিনি স্নেহশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা ও সঙ্গীতানুরাগিণী ছিলেন। রোলাঁর স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর তাঁহার পিতা পুত্রের উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারীতে আসেন। এই সময় হইতেই লেখক ও সংস্কারক হিসাবে টলষ্টয়ের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হয়।

পড়াশুনা শেষ করিয়া রোলাঁ নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও ভাষাতাত্ত্বিক মাইকেল ব্রীলের বিদুষী কন্যাকে বিবাহ করেন। পতির উচ্চ আদর্শের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রচুর ছিল। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে রোলাঁর প্রবল অনুরাগ। এজন্য তিনি তাঁহার মাতার নিকট ঋণী। অমর সঙ্গীতজ্ঞ বেথোভেন, হ্যাণ্ডেল প্রভৃতির তিনি জীবনী লিখিয়াছেন।

১৯১২ সালে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত অতুলনীয় উপন্যাস "জঁ। ক্রিস্তফ" বা "জন ক্রিষ্টোফার" প্রকাশিত হয়। ইহা লিখিয়া তিনি ফরাসী বিদ্যাপীঠের Grand Prix পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। উপন্যাসের নায়ক জন ক্রিষ্টোফার একজন আদর্শবাদী জার্ম্মাণ সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী। তিনি অধিকাংশ জীবন প্যারীতে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ইউরোপের ও সমগ্র আধুনিক জগতের আধ্যাত্মিক জীবন ও আশা ব্যক্ত করা হইয়াছে। জন ক্রিষ্টোফার, অলিভার, গ্রেজিয়া, অ্যানটোইনেট, এম্যানুয়েল প্রভৃতির চরিত্র সম্পূর্ণজীবন্ত। ইহার অনেক পরিচ্ছেদেই শিল্পনিপুণতার চরমোৎকর্ষ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অ্যানটোইনেট, গৃহ, নূতন ঊষা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রোলাঁর মতে—"পৃথিবীতে বীরত্ব দেখাবার একটীমাত্র জায়গা আছে, সেটী পৃথিবী যেমন আছে তাকে ঠিক তেমনিভাবে দেখা ও ভালোবাসা"। পুস্তকের শেষ খণ্ডে গ্রন্থকার গভীর আবেগের সহিত নবযুগের তরুণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"বৎসগণ, আমাদের পিছনে ফেলে তোমরা সামনে এগিয়ে যাও। তোমরা আমাদের চেয়ে উন্নত ও সুখী হও। মৃত্যুর পর জন্ম ও জন্মের পর মৃত্যু, এই জগতের নিয়ম। মৃত্যু আমাদের অনিবার্য্য, কেননা আবার আমাদের জন্ম গ্রহণ করতে হবে।" এই অনুপম উপন্যাসখানি নানাভাষায় অনূদিত ও বহুল ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে মাত্র একখানি পুস্তক লিখিয়া কেহ এত বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। "জন ক্রিষ্টোফার" বর্ত্তমান যুগের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার অন্তর্নিহিত বাণী বিশ্বমৈত্রী।

পরবর্ত্তী উপন্যাস "Colas Brengnon" একজন বার্গাণ্ডী দেশীয় শিল্পীর কাহিনী। রোলাঁর জন্মস্থানের অনেক শিল্পীর আদর্শে ইহার নায়ক চরিত্র অঙ্কিত। নানা বাধাবিঘ্নের মধ্যেও সে কখনো নিরাশ হয় নাই। তার আশা বরাবর অটুট ছিল।

উপন্যাস ব্যতীত রোলাঁ কয়েকখানি নাটকও লিখিয়াছেন। তাঁহার "১৪ই জুলাই," "মুক্তির জন্য" "Liluli" প্রভৃতি নাটক সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছে। এ গুলির ইংরাজী অনুবাদ পাওয়া যায়। "মহাত্মা গান্ধী"

ও "শ্রীরামকৃষ্ণ" সম্বন্ধে পুস্তক দুইখানিতে তাঁহার বিচার-ক্ষমতা ও সহানুভূতিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পূর্ণ পরিস্ফুট। তিনি পণ্ডিত ও সাধক।

ইউরোপীয় যুদ্ধ রোলাঁকে গভীর ভাবে আলোড়িত করে। তিনি সে সময় জেনেভায় ছিলেন। একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। কারণ বিবেক দলিত না করিয়া তাঁহার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করা সম্ভব ছিল না। সে সময়ে তাঁহাকে বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। ফরাসীরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়া-



রোমাঁ রোলাঁ

ছিল এবং জার্ম্মাণেরাও খুসী হয় নাই। কিন্তু তিনি বিচলিত না হইয়া নিজের বিবেক অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে রচিত তাঁহার কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ "Above the battle" নামক বইখানিতে আছে। যুদ্ধে আহতদিগের শুশ্রূষা ও অন্যান্য কল্যাণকর কার্য্যে তিনি সাধ্যমত সাহায্য করেন এবং নোবেল-পুরস্কারে প্রাপ্ত ধন ইউরোপের দুঃখ নিবারণার্থে দান করেন।

"Clerambault" বা যুদ্ধের সময়ের একটি স্বাধীন আত্মার কাহিনীতেও তিনি যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। গল্পের নায়ক Clerambaultএর আধ্যাত্মিক জীবনের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আত্মার স্বাধীনতার জয়-ঘোষণা গ্রন্থখানির বর্ণনীয় বিষয়। এই মনস্তত্ত্বমূলক গল্পটির অনেক স্থানে রোলাঁর নিজ জীবনের ও অভিজ্ঞতার ছায়া দেখা যায়।

তাঁহার "Soul Enchanted" নামক উপন্যাসের এ পর্য্যন্ত তিনটি খণ্ড বাহির হইয়াছে। ইহা চারি খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। উক্ত তিন খণ্ডের নাম, "অ্যানেট এণ্ড সিলভি", "গ্রীষ্ম" এবং "মাতা ও পুত্র"। সত্যানুসন্ধানের জন্য মানবাত্মার অসীম আগ্রহ ও একান্ত চেষ্টা অ্যানেটের চরিত্রে সুপরিস্ফুট। "জন ক্রিষ্টোফার" যেমন নানা অবস্থায় পতিত একটি পুরুষের সমগ্র জীবনের কাহিনী, "Soul Enchanted" তেমনি নারীর জীবন-কাহিনী। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ও চরিত্র চিত্রণে রোলাঁ অসামান্য কলানৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচনার সহজ সৌন্দর্য্য অননুকরণীয়। তিনি সত্যকার শিল্পী। মানুষের উপর তাঁহার অনন্ত বিশ্বাস। আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব ও ভাবের ক্ষেত্রে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে মিলন তাঁহার আদর্শ। তিনি বর্ত্তমান ইউরোপের ভাবুক-শিরোমণি।

ভার্‌নার্‌ হিডেন্‌ষ্ট্যাম্‌ (Verner Heidenstam)

জন্ম—১৮৫৯ ; প্রাইজলাভ—১৯১৬

"সুইডেনের মুকুট" এই নামে হিডেন্‌ষ্ট্যাম্‌ তাঁহার স্বদেশে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। ৬ই জুলাই সুইডেনের Narke নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। তিনি অভিজাতবংশীয়,—ধনী জমীদারের পুত্র। বাল্যকালে অত্যন্ত লাজুক ছিলেন এবং পড়াশুনা করিতেই ভালোবাসিতেন, বিশেষতঃ কবিতার উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি চিত্রকর হইবেন। কিছু দিন প্যারীতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষাও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে সাহিত্যকেই জীবনের অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহার রচনায় চিত্রকরের দক্ষতা দেখা যায়। যৌবনে তিনি একটি সুইটজারল্যাণ্ড-দেশীয়া তরুণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ও পিতামাতার আপত্তি সত্ত্বেও

তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী সাধারণ গৃহস্থকন্যা। ইহার ফলে অনেকদিন তিনি পিতামাতা ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে বাধ্য হন। প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে তিনি বিখ্যাত বস্তুতন্ত্রপন্থী নাট্যকার ষ্ট্রীণ্ডবার্গ ও তাঁহার নিজের পত্নী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত মিশিতেন না। "নির্জ্জন চিন্তা" (Thoughts in Loneliness) বইখানির বহু কবিতায় বাড়ীর জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। "বাল্যকাল" "মা" প্রভৃতি কবিতা ইহার দৃষ্টান্ত।

১৮৮৭ সালে পিতার মৃত্যুর পর তিনি সুইডেনে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক "কবিতাগুচ্ছ" প্রকাশিত হওয়ার পর স্বদেশে তাঁহার যশ বাড়িয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের অন্তর্ভূত "সুইডেন" কবিতাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইহার সহিত ইংলণ্ডের রাজকবি জন ম্যাসফিল্ডের "আগষ্ট, ১৯১৪" শীর্ষক কবিতাটির অনেকে তুলনা করিয়াছেন। ইহার স্বাদেশিকতা ও লিখনভঙ্গী মনোমুগ্ধকর।

পরবর্ত্তী কবিতা ও প্রবন্ধে হিডেন্‌ষ্টাম্ সার্ব্বজনীন উদারতা এবং ধনী ও দরিদ্রের ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার একটি কবিতায় তিনি বলিতেছেন,—

> প্রভেদ নাহিক কিছু ধনী আর দরিদ্রের তরে,
> শ্রম, তৃপ্তি দুই মোরা সমভাবে লই ভাগ ক'রে।

১৮৮৯ সালে তাঁহার প্রথম উপন্যাস "Endymion" প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি একটি পুরাতন বিষয়কে নূতন রূপ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসের ভিতর "The Charnles Men" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই অনবদ্য নিপুণ গল্পটি সুইডিস সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। "The Tree of the Falkungs"-এ ইতিহাস, রোম্যান্স, পৌরাণিক কাহিনী একত্র মিলিয়াছে। সমালোচকেরা ইহার সহিত ইব্‌সেনের বিখ্যাত নাটক "Peer Gynt"এর তুলনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ আছে।

১৯১২ সালে হিডেন্‌ষ্টাম্ সুইডিশ বিদ্যাপীঠের সদস্য নির্ব্বাচিত হন ও ইহার চারি বৎসর পরে "নোবেল পুরস্কার" লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। সুইডিশ সাহিত্যে তিনি নবযুগের স্রষ্টা। সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে হিডেন্‌ষ্টাম্ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁহার লেখার ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি ও অদ্বিতীয় সমালোচক।

হেনরিক্ পনটোপিডান (Henrik Pontopidan)

জন্ম—১৮৫৭ ; প্রাইজলাভ—১৯১৭

হেনরিক্ পনটোপিডান ও কার্ল জিলেরূপ একযোগে ১৯১৭ সালের নোবেল-প্রাইজ লাভ করেন। ইঁহারা দুইজনেই ডেন্মার্কের অধিবাসী। পনটোপিডান জাটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ফ্রেডেরিকায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ও পিতামহ উভয়েই পাদ্রী ছিলেন। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিক্ষার জন্য কোপেন্‌হেগেনে প্রেরিত হন। ১৮৮১ সালে তাঁহার প্রথম গল্পগ্রন্থ "Clipped Wings" প্রকাশিত হয় ও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে। উক্ত গ্রন্থের "The Church Ship" গল্পটি বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প।

তিনখণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার সুবৃহৎ উপন্যাসে তিনি ডেন্মার্কের পল্লীগ্রামের দৃশ্য ও চরিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের নাম "The Promised Land"। ইহাকে বহু সমালোচক "গদ্যে ব্র্যাণ্ড" বলিয়া থাকেন। Brand বিখ্যাত নাট্যকার ইব্‌সেনের একখানি প্রসিদ্ধ নাটক। দ্বিতীয় খণ্ড "Lucky Peter" লিখিতে গ্রন্থকারের চারি বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহার নায়ক গ্রন্থকারের মত পাদ্রীর পুত্র ও ইঞ্জিনীয়ার। তৃতীয় খণ্ড "The Kingdom of the Dead" যুদ্ধের সময়ে লেখা। ইহাতে পনটোপিডানের স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

পনটোপিডান তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের শিক্ষার উন্নতির একান্ত পক্ষপাতী। তিনি কোপেনহেগেনের সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিজ্ঞানবিদ্‌গণের শ্রদ্ধেয় নেতা। বিখ্যাত সমালোচক জর্জ্জ ব্র্যাণ্ডেস্ তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি অত্যন্ত উদারচেতা। অন্যায়, অসত্য, মিথ্যা ইত্যাদির উপর তিনি সুবিধা পাইলেই কশাঘাত করেন। ডেন্মার্কের বাহিরে পনটোপিডানের নাম প্রায় অজ্ঞাত। তাহার কারণ তাঁহার অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থই এ পর্য্যন্ত ইংরাজী, ফরাসী, বা জার্ম্মাণ ভাষায়

অনূদিত হইয়াছে। তিনি ভাবুক ও আদর্শবাদী। ডেন্মার্কের নগর ও পল্লীগ্রামের ফটোগ্রাফের মত এরূপ সুন্দর চিত্র তাঁহার মত আর কেহই আঁকিতে পারেন নাই। বহু সমালোচক তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ রুষদেশীয় ঔপন্যাসিকের সহিত তুলনা করেন। বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।

কার্ল গিলেরূপ (Karl Gjellrup)

জন্ম—১৮৫৭ ; মৃত্যু—১৯১৯ ; প্রাইজ লাভ—১৯১৭

পন্টোপিডানের মত কার্ল গিলেরূপও পাদ্রীর পুত্র। ডেন্মার্কের Roholte নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি ধর্ম্মবিজ্ঞান (Theology) শিক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার পাদ্রী হইবার ইচ্ছা ছিল না। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ড্রেসডেনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার নিজের দেশের অপেক্ষা সেখানে তিনি বেশী জনপ্রিয় ছিলেন।

গিলেরূপ উপন্যাস, নাটক, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিষয়ে পুস্তক লিখিয়াছেন। "মিনা" (Minna) ও "Pilgrim Kamanita" তাঁহার দুইখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক। নায়িকা মিনার প্রেমহীন বিবাহ ও তাহার দুঃখময় জীবন সহজেই সহানুভূতির উদ্রেক করে। উক্ত উপন্যাসখানি সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া লেখা। গিলেরূপের বন্ধু ফেজার মিনাকে হারাইয়া দারুণ রোগে আক্রান্ত হন ও এই প্রেম-কাহিনীর পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে দিয়া যান। ইহা অবলম্বন করিয়া গিলেরূপ "মিনা" লিখিয়াছেন। মিনার চরিত্রের বেশীর ভাগই চিঠিপত্রের আবেগময়ী ভাষার মধ্য দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার "তীর্থযাত্রী কমনিতা" একখানি পৌরাণিক রোম্যান্স। বৌদ্ধযুগে গঙ্গার ধারে ইহার ঘটনা-সংস্থান। কল্পনাশক্তি ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের গুণে গিলেরূপ তাঁহার চরিত্রগুলিকেও দৃশ্যপটকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের আব্‌হাওয়া সৃষ্টি করিতেও তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পুস্তকের আরম্ভভাগ বর্ণনা-সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। কমনিতা অবন্তীনগরের ধনী সওদাগরের পুত্র। কুড়ি বৎসর বয়সে সে কার্য্যবশতঃ কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের নিকট প্রেরিত হয়। এইস্থান হইতেই তাহার প্রেমের "তীর্থযাত্রা" আরম্ভ। ভাব-সম্পদে ও ঘটনা-বিন্যাসে গ্রন্থখানি অতি সুন্দর। ইহাতে বাস্তবের সহিত অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও দার্শনিকতার একত্র সমাবেশ হইয়াছে।

গিলেরূপের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে জার্ম্মাণেরা বিশেষ আনন্দিত হয়, কেননা শিল্পে ও সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, বিশেষতঃ ড্রেসডেনে। তিনি জার্ম্মাণ জীবন ও দর্শনের কতকগুলি জিনিষ ডেন্মার্কের পাঠকদের নিকট সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক কৃতিত্ব স্বীকার করিলেও ডেন্মার্কের অধিবাসীরা তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর লেখক বলিয়া মনে করে না। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক জর্জ ব্র্যাণ্ডেস্, নাট্যকার Bergstrom, কিম্বা কবি Drachmann নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

গিলেরূপের লেখার কবিত্বময় অন্তর্দৃষ্টি ও চরিত্র-বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রতিভাবান না হইলেও ক্ষমতাশালী শিল্পী।

শ্রীঅমিয়া দত্ত

শ্বশুর-রাজ

—গল্প—

—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

পলাশডাঙ্গার প্রতাপান্বিত জমীদার রাজীবলোচন চৌধুরীর একমাত্র পুত্রের স্ত্রী মালতী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর শ্বশুর কর্তৃক পরিত্যক্ত। রাজীবলোচনের বিচারে অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড হয় নাই, বৈবাহিক পরেশনাথের সহিত কলহে অপদস্থ হইয়া তিনি পুত্রবধূ মালতীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কন্যার মুখ চাহিয়াও কঠিন পরেশনাথ বৈবাহিকের অন্যায়াচরণের কাছে নত হন নাই। তিন বৎসর হইল পরেশনাথের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রাজীবলোচনের ক্রোধ উপশমিত না হইয়া বাড়িয়াই গিয়াছিল,—পরেশনাথের শ্রাদ্ধে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয় নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার বর্ত্তমানতায় পলাশডাঙ্গার জমীদার-গৃহে মালতীর স্থান হইবে না, তাঁহার মৃত্যু পর যাহাই হউক না কেন। মালতীর পক্ষে সে সুযোগের কিন্তু আশু সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না ;—রাজীবলোচনের সুস্থ সবল দেহ দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-মাখনের নিত্য-পুষ্টি আহরণের দ্বারা কালের আক্রমণকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিয়াই চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পুত্র অজলোচন পিতৃভক্ত ব্যক্তি ;—তাহা ছাড়া সমস্ত ব্যাপারটাকে সে প্রবল অদৃষ্টের অলঙ্ঘনীয় বিধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যাহার উপর তাহার নিজের, তাহার পিতার অথবা তাহার স্ত্রীর কোনো হাত নাই—নহিলে এমনই বা ঘটিবে কেন? দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাশ করার পর সে স্থির বুঝিয়াছে যে, যে যাহাই বলুক, Theory of Predestination মানা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। দার্শনিক তত্ত্বের এই বর্ম্মাবৃত মনের মধ্যেও সে যে মাঝে মাঝে বেদনা অনুভব করিত না, তাহা নহে ; কিন্তু ইহাকে সে মনের ব্যাধি বলিয়া মনে করিত। দেহের ব্যাধি আছে, মনের ব্যাধিই থাকিতে নাই? ঔষধের অন্বেষণ করিতে করিতে মনে পড়িয়া যাইত—'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোয়মতীব বিচিত্রঃ।' সত্যই বিচিত্র—নহিলে এমনই বা ঘটিবে কেন?

রাজীবলোচনের আচরণের সমালোচনা করিতে অজলোচনের পর সংসারে আর কেহ ছিল না। গৃহিণী বহুকাল গত হইয়াছেন, একমাত্র দুহিতা সুলোচনা অবিবাহিতা বালিকা,—তাহা ছাড়া আর যাহারা, তাহারা আশ্রিত, তাহাদের সাহসই বা কোথায় আর প্রয়োজনই বা কতটুকু।

কিন্তু সুলোচনার বিবাহের কিছু পরেই কথাটা একজন তুলিল। সে সুলোচনার স্বামী ইন্দ্রনাথ। পদার্থ-বিদ্যায় এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিলাত যাইবার জন্য সে ব্যগ্র। জামাতার বিলাত যাওয়ায় রাজীবলোচনের আদৌ ইচ্ছা ছিলনা। তবে বিলাত যাওয়ায় সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিবেন ইন্দ্রনাথের ধনী পিতা, সুতরাং অনিচ্ছার মত আপত্তি প্রবল হইয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বিবাহের পর দ্বিতীয়বার শ্বশুর-গৃহে পদার্পণ করিয়াই ইন্দ্রনাথ অজলোচনের কাছে কথাটা তুলিল। বলিল, "বিনা অপরাধে আপনারা বউদিদিকে নির্ব্বাসনে দিয়েচেন কেন দাদা?"

অজ বলিল, "আপনারা বলছ কেন? আমি ত দিই নি, বাবা দিয়েচেন।"

ইন্দ্র বলিল, "বাবা দিয়েচেন বটে—কিন্তু আপনি তাতে আপত্তি করেন নি, করবেন ব'লেও মনে হয় না।"

অজ বলিল, "না, তা করব না। কিন্তু সেটা কি তুমি আমার অপরাধ বল? পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ—এ কথা তুমি শোন নি?"

ইন্দ্র ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে অজর দিকে চাহিয়া রহিল ; তাহার পর বলিল, "শুনেছি ; কিন্তু এ কথার যে এই অর্থ হয় তা জানতাম না। পিতার অন্যায় আচরণ পুত্র সমর্থন

করলে যে-দেবতারা প্রীত হন, তাঁদের প্রতি আমার বিন্দু-মাত্র শ্রদ্ধা নেই দাদা!"

মৃদু হাসিয়া অজ বলিল, "তোমার যে নেই তা'ত বুঝ্‌তেই পারচি—কিন্তু আমার আছে। রাজ্যাভিষেকের বদলে রামকে চোদ্দ বছর বনবাস করবার অনুরোধ ক'রে দশরথ যে সমীচীনতার পরিচয় দেন নি, তুমি ত তা বলবেই,—কিন্তু রামচন্দ্র সে-কথা, মুখে ত দূরের কথা, মনের মধ্যেও আনেন নি। পিতার ইচ্ছাকে নির্ব্বিবাদে বরণ করা তিনি কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন।"

ইন্দ্রনাথের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "রামায়ণ প'ড়ে কি আপনি এই শিক্ষা পেয়েচেন দাদা?"

অজ হাসিয়া বলিল, "তুমি কি শিক্ষা পেয়েছ?—সাগর লঙ্ঘনের?"

এই সাগর লঙ্ঘনের উল্লেখ যে তাহার বিলাত যাইবার কথা লইয়া তাহা বুঝিতে ইন্দ্রনাথের বিলম্ব হইল না, কিন্তু সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়া ত্রেতাযুগের উপমাটাই চালাইয়া সে বলিল, "মহাবীর ব'লে আমাকে যদি মনে হয় তা হ'লে রামচন্দ্র হয়ে একবার আদেশ করুন না দাদা, কলিকাতা পুরী থেকে সীতা উদ্ধার ক'রে আনি!"

অজ বলিল, "উদ্ধার ত' ক'রে আন্‌বে—কিন্তু অগ্নি-পরীক্ষার কথাটা ভুলে যাচ্চ ভাই।"

ইন্দ্রনাথ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "শুধু কি তাই? তার পরেও হয় ত' আবার নির্ব্বাসন দেবেন, তারপর আবার ডেকে এনে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার কথা তুলবেন—তারপর হয় ত' একেবারে পাতাল প্রবেশ!"

অজ হাসিতে হাসিতে বলিল, "তবে?"

ইন্দ্রনাথ বিরস মুখে বলিল, "না থাক্,—কাজ নেই!"

২

স্টার ফিল্ম্ কোম্পানী কলিকাতার একটি প্রধান ফিল্ম্ ব্যবসায়ী। ইহাদের বায়স্কোপ গৃহ এবং ফিল্ম্ প্রস্তুত করিবার কারবার দুই-ই আছে। বহুলক্ষ টাকা কারবারে খাটিতেছে। কোম্পানীর ম্যানেজিং পার্টনার সুরেশ মিত্র উদ্যমশীল যুবক। ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণী গিয়া বায়স্কোপ সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দেশে আসিয়া সে উন্নত পদ্ধতিতে বায়োস্কোপ গৃহ এবং ফিল্ম্ তৈয়ারীর কারবার খুলিয়াছে।

সকালে বায়োস্কোপের অফিস্-রুমে একা বসিয়া সুরেশ একটা নূতন সেনারিয়োর পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময়ে ইন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল।

খাতাখানা মুড়িয়া রাখিয়া সুরেশ বলিল, "কি ইন্দ্রনাথ, এত সকালে কি মনে ক'রে?—বক্স-টক্স্ কিছু চাই না কি?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "রেখে দাও তোমার বক্স্! আমার শালাজটিকে নিয়ে টানাটানি করছ—তোমার কান বক্স্ করতে এসেচি।"

সিগার-কেস্ হইতে একটি সিগার নিজে লইয়া এবং অপর একটি ইন্দ্রনাথকে দিয়া সুরেশ বলিল, "রহস্যজাল আর বেশি বিস্তার কোরো না,—খুলে বল তোমার শালাজই বা কে, আর আমিই বা কেমন ক'রে তাঁকে নিয়ে টানাটানি করছি।"

"কেন, তাঁকে তোমার ফিল্মের একজন আর্টিষ্ট ক'রে।"

সবিস্ময়ে ইন্দ্রনাথের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সুরেশ বলিল, "সে কি হে? আমার আর্টিষ্টদের মধ্যে তোমার শালাজ আবার কে? মাধুরী দেবী না কি?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "ব্যাপারটা খুবই সীরীয়স্,—চল, তোমার প্রাইভেট চেম্বারে গিয়ে কথাবার্ত্তা হবে।"

সুরেশ বলিল, "এখানে এখন কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই—তবু চল, চেম্বারেই যাই।"

কথাটা শেষ হইতে একঘণ্টারও বেশি সময় লাগিল। ইন্দ্রনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "এখন তা হ'লে চললাম সুরেশ।"

সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এসো। আমার দ্বারা যতটা হবার তার কিছুমাত্র ত্রুটি হবে না।"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "ধন্যবাদ!"

৩

এ ঘটনার দিন তিনেক পরে হঠাৎ একদিন বৈকালের দিকে ইন্দ্রনাথ শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমান

হইতে পলাশডাঙা প্রায় সাত ক্রোশ পথ, তাহার মধ্যে দুই ক্রোশ কাঁচা সড়ক, পূর্ব্ব হইতে পাল্কী অথবা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা না রাখিলে হাঁটিয়া যাইতে হয়। নূতন জামাই দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসায় জমীদার গৃহে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল।

রাজীবলোচন বলিলেন, "একটু খবর দিলেনা কেন বাবা, তা হ'লে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে লোক-জন পাল্কী সবই হাজির থাকত।"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "হঠাৎ এলাম ব'লে খবর দিতে পারি নি;—তা-ছাড়া শীতকালে দু ক্রোশ পথ হাঁটা ত' একটুও কষ্টকর নয়।"

সন্ধ্যার পর রাজীবলোচন বৈঠকখানায় বসিয়া আলবোলায় তামাক খাইতেছিলেন, ইন্দ্রনাথ নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকারি কথা আছে বাবা। সেইজন্তেই আমার আজ তাড়াতাড়ি আসা।"

মুখ হইতে নলটা খুলিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "তোমার বিলেত যাওয়া সংক্রান্ত কিছু?"

"আজ্ঞে না, এর তুলনায় সে ত' তুচ্ছ কথা। এ-সত্যিই অতি গুরুতর ব্যাপার যার মধ্যে আপনার বংশ-মর্য্যাদা, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও, একান্তভাবে জড়িত।"

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় রাজীবলোচনের হাত হইতে আলবোলার নল খসিয়া পড়িল; ইন্দ্রনাথের নিকট একটু সরিয়া আসিয়া মৃদু ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বউমাকে নিয়ে কোনো কথা না কি?" এই কথাটা সর্ব্বদা তাঁহার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকিত।

ইন্দ্রনাথ বলিল, "তাঁকে নিয়েই। ষ্টার ফিল্ম কোম্পানী নামে কলকাতায় খুব বড় একটা বায়োস্কোপের কারবার আছে। তারা "শ্বশুর-রাজ" নাম দিয়ে একটা প্লে খুলচে—, বৌদিদিকে আপনাদের পরিত্যাগ করার ব্যাপারই তার আখ্যান-ভাগ। পলাশডাঙাকে করেচে পলাশপুর, অজদাদার নাম দিয়েচে পদ্মলোচন, আপনারও নাম ঐ রকম কি একটা দিয়েছে যাতে আপনাকে বুঝতে কষ্ট হয় না। "শ্বশুর-রাজে" বউদিদি প্রধান স্ত্রী-ভূমিকার পার্ট গ্রহণ করেচেন।"

আরক্ত নয়নে রাজীবলোচন বলিলেন, "ভূমিকা কি?"

"চরিত্র,—character।"

রাজীবলোচন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, "বলিলেন "চুলোয় যাক্—যা ইচ্ছে হয় করুক! আমি তাকে একেবারে ত্যাগ করলাম। মাঘ মাসে অজর আবার বিয়ে দেবো!"

ইন্দ্রনাথ সবিনয়ে বলিল, "কিন্তু তাতে ত' আর তারা নূতন ক'রে জব্দ হবে না বাবা,—ওরা ত' ধ'রেই রেখেছে যে, সম্বন্ধ চিরদিনের জন্তে ছিন্ন হয়েচে। অথচ আমাদের একটা কলঙ্ক-কাহিনী যুগ যুগ ধ'রে লোকচক্ষুর সামনে অভিনীত হবে। বৌদিদির পবিত্র মূর্ত্তি অভিনেত্রীর রূপে সমস্ত পৃথিবীর ভদ্র-অভদ্র জনসাধারণের চোখে ছড়িয়ে পড়বে। লোকে ত' বলবে ইনি পলাশডাঙার সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের বউ!"

অস্থির ভাবে আলবোলার নলটা মুখে তুলিয়া লইয়া দুইতিন বার সজোরে টান দিয়া রাজীবলোচন বলিলেন; "কবে তারা অভিনয় আরম্ভ করবে?"

"খুব সম্ভবতঃ বড়দিনের সময়ে?"

"প্ল্যাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল এসব দিয়েচে?"

"এখনো দেয়নি, কিন্তু আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দেবে।"

"প্রোপাইটারদের নামে নালিশ দায়ের ক'রে injunction পাওয়া যায় না?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "সে পরামর্শ আমি আমাদের একজন আত্মীয় উকিলের কাছে নিয়েছিলাম। তিনি বলেন, নালিশ করলে কোনো ফল হবে না; কারণ, প্রথমতঃ, ফিল্ম তোলানো আইনের চক্ষে গর্হিত কর্ম্ম নয়,—এবং দ্বিতীয়তঃ, বউদিদিকে ত্যাগ ক'রে তারপর তাঁর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করবার আপনাদের কোনো অধিকার নেই। তা ছাড়া, নালিশ করলে কথাটাত' দেশময় জানাজানি হয়ে যাবে। আমাদের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।"

ক্ষণকাল গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "তুমি তা হ'লে কি করতে বল?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "আমি বলি, ষ্টার ফিল্ম কোম্পানীর প্রোপাইটার সুরেশ মিত্রকে এ বিষয়ে অনুরোধ ক'রে অভিনয়

বন্ধ করানো। সুরেশের সঙ্গে আমারও একটু আলাপ আছে—আমিও তাকে চেপে ধরতে পারি। সে সত্যিই এক জন ভদ্রলোক।"

বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শের পর স্থির হইল পরদিন প্রাতে আহারাদি করিয়া রাজীবলোচন ইন্দ্রনাথের সহিত কলিকাতা যাইবেন এবং সেখানে সুরেশ মিত্রের সহিত সাক্ষাত করিয়া অভিনয় বন্ধ করাইবার চেষ্টা করিবেন।

পরদিন বেলা দশটার সময়ে পাকা সড়কের মোড়ে একটা ট্যাক্সি হাজির রাখিবার জন্য রাত্রেই একজন লোক বর্দ্ধমান চলিয়া গেল।

রাত্রে আহারে বসিয়া অজ বলিল, "বাবা যে কথাটা আমার কাছেও ভাঙতে চান না,—তোমাদের মতলবখানা কি বল দেখি ইন্দ্রনাথ? রামায়ণের পালা নয় ত?"

মাছের মুড়া খাইতে খাইতে ইন্দ্রনাথ ক্ষণকাল বিষম খাইল, তাহার পর বলিল, "ক্ষেপেচেন দাদা? রাম বাদ দিয়ে কখনো রামায়ণ হয়?"

অজ বলিল, "তোমাদের পালায় সবই হয়।"

৪

পরদিন বেলা দুইটার কিছু পূর্ব্বে ইন্দ্রনাথের সহিত রাজীবলোচন সুরেশ মিত্রের সিনেমায় পৌঁছিলেন। ইন্দ্রনাথের মুখে রাজীবলোচনের পরিচয় পাইয়া সুরেশ প্রভূত ভাবে রাজীবলোচনের সম্বর্দ্ধনা করিল,—আহার্য্য পানীয় আনাইয়া দিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া রাজীবলোচন সংযত ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেহের মধ্যে প্রাচীন অভিজাত বংশের গর্ব্বোদ্ধত ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। তিনি সুরেশের আতিথ্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না—কাজের কথার জন্ত ব্যগ্রতা দেখাইতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথের মুখে সকল কথা সবিস্তারে শুনিয়া সুরেশ চিন্তিত হইয়া পড়িল। বলিল, "অনেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেচি,—তা' ছাড়া বড়দিনের ত' আর মাস খানেকও দেরি নেই—নূতন ফিল্মের কি ব্যবস্থা করব সেও ভাবনার কথা।"

রাজীবলোচনের বহু-নিরুদ্ধ ক্রোধ আর মানা না মানিয়া বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ইন্দ্রনাথের আপনি বন্ধু ব'লেই আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি—নইলে মকর্দ্দমা দায়ের ক'রে শুধু এ পালাই নয়, আপনার বায়োস্কোপই বন্ধ ক'রে দেবার ব্যবস্থা ক'রে যেতাম। আমার ব্যাঙ্কও এখানে—অ্যাটর্নি ব্যারিষ্টারও এখানে।"

রাজীবলোচনের কথা শুনিয়া মৃদুহাস্ত করিয়া সুরেশ বলিল, "ইন্দ্রনাথকে নিয়ে আপনার যেমন বিপদ আমারও তেমনি বিপদ দেখ্‌চি! আপনি যদি ইন্দ্রনাথের শ্বশুর না হতেন তা হ'লে আপনার এ অনুরোধ শুনে আপনাকে বসবার জন্তে চেয়ারও দিতাম না চৌধুরী মশায়। আপনি ইন্দ্রনাথের শ্বশুর ব'লে আমার মান্ত অতিথি,—আপনাকে রূঢ় কথা কিছুতেই বলব না;—কিন্তু আপনি যদি এই কথাটা ভুলে না যান যে, কলকাতা পলাশডাঙা নয়, আর আমি আপনার প্রজা নই—তা হ'লে আমার সঙ্গে কাজের কথাবার্ত্তাগুলো ঢের সহজে হবার আশা আছে। মকর্দ্দমার কথা আপনি বলচেন—কিন্তু মকর্দ্দমা করবার আপনার পক্ষের খরচাটাও যদি আমি বহন করি তা হ'লেও আমার লোকসান হয় না—কারণ মকর্দ্দমা দায়ের হ'লে "শ্বশুর-রাজ" দেখ্‌বার জন্তে কলকাতা ভেঙ্গে পড়বে—এমন কি পলাশডাঙা থেকেও লোক আসবে। কাজের কথা যদি কিছু থাকে ত' বলুন চৌধুরী মশায়; আমরা কুলি-মজুর মানুষ, আমাদের খেটে খেতে হয়, পলাশডাঙার ধনী জমিদারের মত সময় নষ্ট করবার সুবিধে আমাদের নেই।"

রাজীবলোচন দেখিলেন সুরেশ শক্ত পাল্লা - পলাশডাঙার জলবায়ুর কোনো ক্রিয়া ইহার মধ্যে ফলে নাই, সুতরাং কাজের কথা হওয়াই ভাল। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া কথা-বার্ত্তার পর স্থির হইল যে, যে-দশহাজার টাকা সুরেশ আলতীকে রয়ালটি স্বরূপ দিয়াছে তাহা রাজীবলোচন সুরেশকে প্রত্যর্পণ করিলে সুরেশ অভিনয় বন্ধ করিবার অঙ্গীকারপত্র রাজীবলোচনকে লিখিয়া দিবে।

এই কুৎসিৎ ব্যাপার যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া পলাশ-ডাঙায় ফিরিবার জন্ত রাজীবলোচন ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

তিনি পকেট হইতে চেক-বই বাহির করিয়া সুরেশের নামে দশ হাজার টাকার চেক্ লিখিয়া দিলেন।

সুরেশ বলিল, "কিন্তু এ বিষয়ে আপনার পুত্রবধূর বড় দাদার মতটা নেওয়াও একবার দরকার। অ্যাটর্নি মানুষ —কি জানি কোন্ দিক থেকে শেষে আপত্তি তুলবেন।" বলিয়া টেলিফোন তুলিয়া ডাকিল।

ক্ষণকাল কথাবার্ত্তা কহিয়া সুরেশ বলিল, "ত্রিপুরা বাবু বলছেন, আপনি যদি দয়া ক'রে তাঁর ভগিনীকে আপনার বাড়িতে আশ্রয় দেন তা হ'লে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। এর মধ্যে জীবিকা-অর্জ্জনের কথাও রয়েচে কি না। পলাশডাঙ্গার জমিদার বাড়ির পুত্রবধূ হ'য়ে অন্নবস্ত্রের জন্যে ভাইয়ের শরণাপন্ন হ'তে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত করে।"

একটা কঠিন বাক্য একবারে ওষ্ঠের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু এই কুলিমজুর শ্রেণীর লোকটির জিহ্বার অসংবৃততা স্মরণ করিয়া তাহা রোধ করিলেন। আরক্তনেত্রে বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা,—তাই হবে।"

সুরেশ কোম্পানীর ছাপানো চিঠির কাগজে অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া রাজীবলোচনের হাতে দিয়া নত হইয়া রাজীবলোচনকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমার অবিনয় ক্ষমা করবেন চৌধুরী মশায়,—কিন্তু ভারী সুখী হয়েচি। আপনি যে ক্ষমাশীলতার পরিচয় দিলেন তা আপনার মত মহৎ বংশ-জাতেরই উপযুক্ত।"

রাজীবলোচন কিছু বলিলেন না, পকেট হইতে তাড়াতাড়ি রুমাল বাহির করিয়া চাপা দিবার পূর্ব্বেই চোখ দিয়া একরাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। এত বড় পরাজয় তাঁহাকে জীবনে কোনো দিন ভোগ করিতে হয় নাই।

কাহারও আতিথ্য তিনি গ্রহণ করিলেন না—সুরেশেরও না—ইন্দ্রনাথেরও না। হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া ইন্দ্রনাথকে বলিলেন, "তিন চার দিনের মধ্যে একটা ভাল দিন দেখে অজকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দোবো— —বউমাকে নিয়ে যাবে। সঙ্গে তুমিও যেয়ো।"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "যাব।"

রাজীবলোচনের মনটা ভাল ছিল না—আর বিশেষ কথাবার্ত্তা না কহিয়া তিনি অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ইন্দ্রনাথেরও উপর তাঁহার মনটা তেমন প্রসন্ন ছিল না।

৫

দিন পাঁচেক পরে বৈকাল চারটার কিছু পূর্ব্বে মালতী, অজ ও ইন্দ্রনাথ হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দিল্লী এক্সপ্রেসের একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠিয়া বসিল। সে কামরায় আরো কয়েকজন মাড়োয়ারী প্যাসেঞ্জার ছিল।

অজ বলিল, "ইন্দ্রনাথ, তুমি যে মহাবীর তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু সীতা-উদ্ধারেই রামায়ণ শেষ হয় নি ত'া জান।"

ইন্দ্র বলিল, "ও-সব অমঙ্গলের কথা মুখে আনবেন না দাদা,—কিন্তু আপনি আমার উপর অযথা প্রশংসারোপ করছেন। আপনি বরং সীতাদেবীকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন যে, কোনো হনুমান কোনো দিন তাঁর অশোক-বনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল কি-না।"

অজ বলিল, "কলিকালের সীতা দেবী কি সহজে সে-কথা স্বীকার করবেন? হয় ত' ব'লে বসবেন, তোমার একথা জিজ্ঞাসা করবার অধিকার কোথায়?"

উভয়ের কথা শুনিয়া মালতীর বোধ হয় হাসি পাইতেছিল, সে জানলার দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

বর্দ্ধমানে গাড়ি দাঁড়াইতে তিনজনে দেখিল, গাড়ির সম্মুখে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রাজীবলোচন। সাতক্রোশ-পথ অতিক্রম করিয়া বধূকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিয়াছেন, মুখে কিন্তু সে-রূপ উৎসাহের চিহ্ন নাই।

মালতী গাড়ি হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি শ্বশুরের পদধূলি লইল। রাজীবলোচন হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অজ বলিল, "শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না, এতখানা পথ না এলেই ভাল করতেন। যাবার সময় ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।"

রাজীবলোচন বলিলেন, "আমি বেনারস এক্সপ্রেসে আজ কাশী যাচ্ছি অবু।"

সবিস্ময়ে অজ বলিল, "কেন?"

রাজীবলোচন বলিলেন, "এখন কিছুদিন কাশী বাসই করব মনে করেছি। বউমা এলেন—সংসার বাঁধল—আমিও

নিশ্চিন্ত হলাম।" বলিয়া গ্রহণকালের রৌদ্রের মত হাসিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রনাথ বুঝিল সত্যই রামায়ণ এখনো শেষ হয় নাই—এখনো পালা বাকি। সে চিন্তিত হইয়া পড়িল।

অজলোচন এবং ইন্দ্রনাথ উভয়ে মিলিয়া অনেক বুঝাইল। অজ বলিল, "যেতেই যদি হয় কিছুদিন পরে না হয় যাবেন।" রাজীবলোচন কিন্তু কিছুতেই রাজি হইলেন না; বলিলেন, "আজ দিন ভাল আছে;—তা ছাড়া উষ্‌খুস ক'রে বেরিয়ে পড়েছি—কাশীতেও বাড়ি ঘর দোর পরিষ্কার হয়ে গেছে। তোমরা চা-টা খাবে ত' খাও। আমার গাড়ি আসতে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি—আমি ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসি। বউমাও আমার সঙ্গে চলুন—তোমরা প্রস্তুত হ'লে ওঁকে নিয়ে যেয়ো।"

ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিয়া মালতী কাঁদিতে লাগিল; বলিল, "বাবা, আমি আসচি ব'লেই আপনি কাশী চ'লে যাচ্ছেন—কিন্তু বাবা, আমি ত' আপনার কাছে কোনো অপরাধ করি নি!"

রাজীবলোচন বলিলেন, "না অপরাধ ঠিক করো নি—কিন্তু তোমার কাছে আমি পরাজিত হয়েচি বউমা। যার কাছে আমি পরাজিত হয়েচি তার সঙ্গে এক গৃহে বাস করবার মত সহ্য-শক্তি আমার নেই।"

মালতীর মুখে-চক্ষে বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; আর্ত্ত-স্বরে বলিল, "আপনি পরাজিত হবেন কেন বাবা?—আমি ত' জানি আপনি আমাকে ক্ষমা করেচেন।"

"ও-রকম কদর্য্য উপায় অবলম্বন করলে কি ক্ষমা পাওয়া যায় বউমা?"

"কি কদর্য্য উপায় বাবা?"

"বায়োস্কোপে অভিনয় করা।"

"সে কি কথা বাবা?"

রাজীবলোচন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কেন, তুমি ষ্টার ফিল্‌ম্ কোম্পানীতে দশহাজার টাকা নিয়ে প্রধান স্ত্রী-চরিত্র হয়ে তোমার ছবি তোলাও নি?"

মালতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "এই অপরাধ আমি করেচি মনে ক'রে আপনি অভিমান ক'রে কাশী যাচ্ছিলেন বাবা?—তা হ'লে ত' আমাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করাই উচিত ছিল। নিশ্চয়ই কেউ আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেচে বাবা!"

ক্ষণকাল মালতীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রাজীবলোচন বলিলেন, "তুমি সে-রকম প্রতারণার কথাই কিছু জান?"

"কিছুমাত্র না। তবে আসবার আগে দাদা একটা মোড়া খাম আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, তাতে একটা দশহাজার টাকার চেক্ আছে—তিন মাস পরে আপনাকে দিতে। তা হ'লে খুব সম্ভবতঃ সেটা——"

বাহিরে জুতার শব্দ হইল—অজ বলিল, "বাবা, আমরা আসব?"

রাজীবলোচন নিম্নকণ্ঠে মালতীকে বলিলেন, "যে-সব কথা তোমার সঙ্গে হ'ল কাউকে বোলোনা।" তারপর উচ্চস্বরে বলিলেন, "এস।"

অজ ও ইন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলে রাজীবলোচন বলিলেন, "কাশী যাওয়া বন্ধ করলাম—বউমার অনুরোধে। শীঘ্র শীঘ্র বাড়ি ফেরবার ব্যবস্থা কর, নইলে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।"

অপরিমেয় বিস্ময়ে ও আনন্দে অজ ও ইন্দ্রনাথ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অব্যক্ত

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

ওগো চতুরিকা!
ললাটে আমার আঁকিলে তুমি যে
অগৌরবের টীকা,
......তারি লাগি আজ কত কানাকানি
চৌদিকে ওঠে পরিহাস বাণী......
তুমি জান আর আমি জানি শুধু
কি আছে তাহাতে লিখা।

ওগো চতুরিকা!
উদয়লগ্নে জ্বালালে তুমি যে
অস্তরাগের শিখা,
......অন্ধ যে যত বিজ্ঞের মত
অর্থ তাহার করে কত শত......
তুমি আর আমি জানি সে যে কার
সন্ধ্যা আরত্রিকা।

ওগো চতুরিকা!
কুঞ্জে তোমার ফুটিল না মোর
ছন্দ মঞ্জরিকা।
......পল্লবগ্রাহী ফিরে যায় ঘরে
হাসির চিহ্ন বক্র অধরে....
তুমি আর আমি তুলি যে বিরলে
সৃষ্টির যবনিকা।

ওগো চতুরিকা!
পরশে আমার টুটিল না তব
তন্দ্রা কুজ্ঝটিকা।
......ভিখারীর দল ধরিয়া দুয়ার
ভাবিছে গর্ব্ব ঘুচিল এবার..
তুমি আর আমি স্বপনেতে রচি
জীবনের মরীচিকা।

ওগো চতুরিকা!
আসিবে লগ্ন নিভিবে যেদিন
চিতার অগ্নিশিখা।
......স্বস্তি নিশাস্ কেহবা ফেলিবে
অলস নয়নে কেহবা চাহিবে......
আমি জানি তুমি আমারে সেদিন
পরাবে অমর টীকা,
ওগো চতুরিকা!

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতাবাসীর প্রথম প্রচেষ্টা

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর্-ই-এস্

১

রসরাজ অমৃতলাল বসু তদ্বিরচিত "বন্দে মাতরম্" নামক প্রহসনে ভোট সংগ্রহের একটি অভিনব পন্থার হাস্যোদ্দীপক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কোনও অফিসের বড়বাবুর এক পূর্ব্বপুরুষ এক নীলকুঠীতে মাল ওজনকারীর দায়িত্বপূর্ণ ও গৌরবময় কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে বংশধরগণের আর্থিক দুরবস্থানিবন্ধন তাঁহার জন্য কোনও প্রকাশ্য শোক-সভার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার এক বংশধর এক সওদাগরী অফিসের বড়বাবু হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের স্মৃতিপূজার উদ্দেশ্যে একটী প্রকাশ্য সভা আহূত হয়। ভোট যুদ্ধের একজন সেনাপতি এই বংশগৌরব-গর্ব্বিত বাবুর দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিসভার বন্দোবস্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দ্বারা তাঁহার ও তাঁহার আশ্রিতগণের ভোট-সংগ্রহ করিয়া লইতেছেন—এই দৃশ্যটী রসরাজ অমৃতলাল এমন নিপুণতা সহ চিত্রিত করিয়াছেন যে হাস্য সম্বরণ করিয়া রাখা দুঃসাধ্য। আজ কাল স্মৃতি-সভা ও শোকসভার এতই প্রাদুর্ভাব যে অনেক সময়েই সংবাদপত্রে এইরূপ সভার বিজ্ঞাপন দেখিয়া অমৃতলালের অঙ্কিত চিত্রটি মনে পড়িয়া যায়। শতবর্ষ পূর্ব্বে স্মৃতিসভার এরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল না, এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে এরূপ স্মৃতি-সভার বিবরণ অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতার টাউনহলে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল দিবসে একজন পরলোকগত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি বিরাট স্মৃতি-সভা হইয়াছিল, তাহাই বোধ হয় এতদ্দেশবাসী হিন্দু মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের চেষ্টা। এই সভায় রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতাবাসীর প্রথম প্রচেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়।

মস্তিষ্কের প্রদাহ জনিত জ্বরে রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর দিবসে ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুসম্বাদ প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার প্রতিভামুগ্ধ বন্ধুগণ তাঁহার দেশহিতকর কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার বিদ্যা ও সদ্গুণ প্রভৃতি কি প্রকারে চিরস্মরণীয় হয় তন্নিরূপণার্থ একটি স্মৃতি-সভার উদ্যোগ করেন, কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল দিবসের পূর্ব্বে এই সভার অধিবেশন হওয়া সম্ভব হয় নাই।



স্যার জে, পি, গ্রাণ্ট

এই সভায় সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইনি বাঙ্গালার দ্বিতীয় লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর—নীলকর-প্রপীড়িত প্রজানিকরের মুক্তি-প্রদাতা স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের পিতা। ইনি একাধারে যেমন জ্ঞানী তেমনই নির্ভীক ও স্বাধীন প্রকৃতি-বিশিষ্ট ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশে

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। সেই সময়ে কোনও রাজনীতিক কারণে বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর স্যর জন-ম্যাল্‌কমের গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এক আদেশ অমান্য করায় তিনি বিচারালয় বন্ধ করিয়া দেন এবং ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করেন যে, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধিরূপে তিনি যে আদেশ দিয়াছেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতনভোগী গবর্ণরের সে আদেশ অমান্য করা অসঙ্গত হইয়াছে। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড এলেনবরা রাজনীতিক কারণে স্যর জন ম্যাল্‌কমের কার্য্যের সমর্থন করেন এবং বোম্বাইএর সুপ্রিম কোর্টে আরও দুইজন বিচারপতিকে পাঠাইয়া দেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, এই দুইজনের মধ্যে স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট দুইটী পালিত হস্তীর মধ্যে মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইবেন। স্যর জন গ্রাণ্ট ইঁহারা আসিবার পর বোম্বাইয়ে পদত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় আসিয়া সুপ্রিম কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি উক্ত বিচারালয়ে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হন। তিনি পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। স্যর জন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যেই পরলোকে প্রয়াণ করেন।

স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট প্রথমে গাত্রোত্থান করিয়া সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন এবং বলেন :—"আমি একজন য়ুরোপীয় এবং এখানে বিচারপতির কার্য্য করিয়া আমার যে অতি অল্প অবসর থাকে তাহাতে আমি সাধারণ কার্য্যে সর্ব্বদা যোগদান করিতে পারি না এবং যে সকল মহাত্মা জনহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা রত রহিয়াছেন তাঁহাদের সহিতও সকল সময়ে একযোগে কার্য্য করিতে পারি না। রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তির গুণাবলী ও প্রতিভা সকলে বিদিত হইলেও আমি পূর্ব্বোক্ত কারণে যথার্থরূপে তাঁহার সহযোগিতা না করায় এ মহদনুষ্ঠানে আমি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদানে বিশেষ সহায়তা করিতে পারিব না। যাঁহারা তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ এ সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁহারা এই বিষয়ে উপযোগী প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে সহায়তা করিবেন।"

অতঃপর মিষ্টার জেম্‌স্ প্যাট্‌ল্ সভায় প্রথম প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন, যথা—"রামমোহন রায় মহাজ্ঞানী দেশহিতৈষী এবং স্বদেশস্থ লোকদিগের সুনীতি, জ্ঞানবৃদ্ধি এবং সাধারণ মঙ্গলের নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন, অতএব তাঁহার নাম এরূপে চিরস্মরণীয় করা উচিত যাহাতে তাঁহার প্রতি এই সভার সভ্যদিগের শ্রদ্ধা প্রকাশ হয়।"

মিষ্টার জেম্‌স্ প্যাট্‌ল্ তৎকালে বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সর্ব্বপ্রাচীন সদস্য ছিলেন। তিনি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর চৌরঙ্গীতে দেহত্যাগ করেন। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল এদেশে ছিলেন এবং উহার মধ্যে একবারও স্বদেশে যান নাই। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি এই আদেশ দিয়া যান যেন তাঁহার মৃতদেহ স্বদেশে প্রেরিত হয় এবং ক্যাম্বারওয়েলে পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

প্রথম প্রস্তাবটী উত্থাপন করিতে গিয়া মিষ্টার প্যাট্‌ল্ বলেন :—"কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আমরা যাহাকে বড়লোক বলি রামমোহন রায় সে শ্রেণীর বড়লোক নহেন। ইহা সত্য তিনি বড় যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেননা, তিনি মহা কবি ছিলেন না, তিনি প্রতীচ্য বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন না; কিন্তু আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি তিনি যথার্থই একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জ্ঞানালোকসম্পন্ন মন ও দৃঢ়তা সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিবে, এবং তাঁহার সদ্গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া কেহই তাঁহাকে প্রশংসার অর্ঘ্য প্রদানে বিমুখ হইবে না। তাঁহার প্রথম জ্ঞানোদয়ের সময় হইতে,—যখন তাঁহার মনোবৃত্তি প্রথম সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হইল তখন হইতে—তিনি জ্ঞানালোকের সাহায্যে জন্মগত কুসংস্কার সমূহ বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং পুরোহিতগণের অতি রক্ষণশীলতা এবং বন্ধুগণের মিনতি তাঁহাকে সার সত্যের অনুশীলন হইতে বিরত করিতে পারে নাই, যদিও উক্তবিধ কার্য্যে তাঁহাকে ইহলোকে সমাজচ্যুত এবং পরলোকে নিরয়গামী হইবার ভয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি তাহাদের সমস্ত ভীতিপ্রদর্শন, জনকজননীর স্নেহময় প্ররোচনা সমস্তই উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার

জ্ঞানালোকদীপ্ত মন তাঁহাকে বলিয়াছিল তাঁহার জীবনের 'একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে—তাঁহার কুসংস্কারান্ধ দেশবাসীর সম্মুখ হইতে তিমির রাশি অপসারিত করিতে হইবে, তাহাদিগকে তাঁহার সাধনালব্ধ আলোক বিতরণ করিতে হইবে, যে জ্ঞান ও অধ্যাত্মরাজ্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাদিগকে তাহার অধিকারী করিতে হইবে, এবং যে সকল আচার মানব প্রকৃতির নিকট ঘৃণ্য এবং তাঁহার কুসংস্কারবর্জ্জিত মন ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে তাহাদিগকে তাহা ত্যাগ করাইতে হইবে।"

প্রথম প্রস্তাবটীর সমর্থনে বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইংরাজী ভাষায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং "জ্ঞানান্বেষণ" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। বিখ্যাত য়ুরেশীয় শিক্ষক ও কবি হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' নামক তর্কসভার রসিককৃষ্ণ একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ী তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে রসিককৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেন। কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "রসিক কি বলে?" যখন আমরা স্মরণ করি যে আমাদের সেই মানসিক উদ্দীপ্তির সুবর্ণযুগে 'ভারতের ডিমস্থিনীস'—রামগোপাল ঘোষ, রাজনীতিক পাত্রী ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জন্মদাতা' রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ডিকেন্স' প্যারীচাঁদ মিত্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক সাধু শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি এই একাডেমিক এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন, তখন রসিককৃষ্ণ যে কত উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাহা রামতনু লাহিড়ীর শ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য হইতে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। রসিককৃষ্ণ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী কলেক্টর হন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

রসিক কৃষ্ণ প্রথম প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলেন :—"রামমোহন রায় অলোকসামান্য চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষ আমরা আর দেখিতে পাইব না। কুসংস্কারের বীভৎসতার মধ্য হইতে তিনি হঠাৎ উত্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দেশবাসিগণ তৎকালে যত ভাবিয়াছিল তাহা অপেক্ষা তিনি কত অধিক করিতে পারেন তাহা বিঘোষিত করিয়াছিলেন। এই সভা হয়ত জানিতে পারিলে তৃপ্ত হইবেন—কি সূত্রে রামমোহন প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম পরিহার করিয়াছিলেন এবং সেই সকল উন্নতির উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন যাহা দ্বারা তাঁহার নাম এত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং যাহা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য আমরা আজ সমবেত হইয়াছি।—আমার দুর্ভাগ্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলাম না; কিন্তু আমি শুনিয়াছি যখন তিনি বালক, একজন সন্ন্যাসী তাঁহার পিতৃভবনে আগমন করিয়া তাঁহাদের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তাঁহার পিতা সন্ন্যাসীর অনুরোধ পালন করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার গৃহে আশ্রয় দেন। রামমোহন রায় তখন তরুণ বয়স্ক এবং যতদূর সম্ভব রক্ষণশীল হিন্দু। সন্ন্যাসীর ভরণপোষণের ব্যয় কিছু উসুল হইতে পারে এই মনে করিয়া তাঁহার পিতা সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। এইরূপে রামমোহন রায়ের বেদশিক্ষা আরম্ভ হয়। বেদ পাঠই তাঁহার মন প্রথম বিকশিত করিল এবং কুসংস্কারের ঘৃণিত প্রথা পরিহার করিতে প্ররোচিত করিল, এবং স্বদেশের উন্নতি ও উহার ভবিষ্যৎ নবজীবনের উপায় চিন্তা করিতে উদ্বুদ্ধ করিল। ইহা হইতে তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে তাঁহার অভিপ্রেত অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। সতীদাহ প্রথার বিলোপের জন্য রামমোহন রায় যে অগ্রণীর কার্য্য করিয়াছিলেন তজ্জন্য আমার দেশবাসিগণ অনেকেই নিঃসন্দেহ আপত্তি করিবেন। যথার্থই একথা বলা হইয়াছে যে, মানবধর্ম্মের স্বপক্ষে তিনি প্রায় একক ছিলেন। ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি এই কার্য্য দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসীর ধর্ম্মভাবে আঘাত করিয়াছিলেন এবং যে কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের কোনও অধিকার ছিল না সেই কার্য্যে, অর্থাৎ—দেশের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আচারাদিতে হস্তক্ষেপ করিতে,—গবর্ণমেণ্টকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এবিষয়ে আমার দেশবাসী যে মতই পোষণ করুন না কেন, আমি আশা করি ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, ইহাতেও কেবল তাঁহার

মহাপুরুষদ্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না—ইহাতে প্রতীত হয় তিনি কত মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট এবং কিরূপ বিশ্বপ্রেমিক ও স্বদেশহিতৈষী ছিলেন,—কত মানবজীবনের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার রামমোহন রায়ের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তাহাদিগের শিক্ষার জন্য তিনি শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাই নহে—তিনি হিন্দুবালকগণকে শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি বিদ্যালয়ও পরিচালিত করিতেন। যে শিক্ষার দ্বারা তিনি নিজে উপকৃত হইয়াছিলেন, সেই শিক্ষা অন্যকে দান করিবার জন্য তিনি কত উৎসুক ছিলেন তাহার পরিচয় তাঁহার রচিত ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় প্রস্তাব নিচয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সম্মান তাঁহার প্রাপ্য ছিল, অতি-রক্ষণশীল দেশবাসিগণের নিকট হইতে সেই সম্মান পান নাই বলিয়া তিনি যতদূর মঙ্গল সাধিত করিতে পারিতেন ততদূর তাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। যে প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে থাকিলে তিনি দেশের সর্ব্বাপেক্ষা হিতসাধন করিতে পারিতেন সেই প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার কথা আমি বলিতেছি। যদি তাঁহাকে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে তাঁহার পরহিতচিকীর্ষু মন হইতে সুন্দর সুন্দর উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিত যদ্দ্বারা দেশের অধিকতর কল্যাণ সংঘটিত হইত। কিন্তু রামমোহন রায় কেবল ইহাই করেন নাই। তিনি আরও অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য বলিয়া অভিহিত হইতে পারে এরূপ কিছুই প্রায় ছিল না। আমরা এই গদ্যসাহিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী, এবং তিনি স্বয়ং গদ্য-রচনায় অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মার্জ্জিত বাঙ্গালা ভাষার লেখক একজনও নাই। ইহা নিশ্চয়ই একটা মহাকার্য্য যে তিনি কেবল তাঁহার দেশবাসীকে গদ্যরচনার আদর্শ দিয়া যান নাই পরন্তু স্বয়ং উক্তবিধ রচনায় অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি আরও অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, এবং ইহা দ্বারাও তিনি তাহার দেশবাসীর অনেক হিতসাধন করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রার ফলেই আমরা নূতন সনন্দে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিধিগুলি পাইয়াছি—সে সনন্দ যতই অপকৃষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন।” (হাস্য)

প্রথম প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর মিষ্টার হেনরি মেরেডিথ পার্কার দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। প্রস্তাবটী এই :—



এইচ, এম্, পার্কার

“উক্ত বিষয় নির্ব্বাহ হেতু সাধারণ চাঁদা করা কর্ত্তব্য এবং উক্ত মহানুভব ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয়করণ বিষয়ে চাঁদার স্বাক্ষরকারী অধিকাংশ ব্যক্তির যে মত তাহাই গ্রাহ্য হইবেক, তত্তৎ মহাশয়েরা স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা এই সভাতে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিবেন কিন্তু সভার বিবেচনার নিমিত্তে ৬ সপ্তাহ অবকাশ প্রদান করিতে হইবেক।”

হেনরি মেরেডিথ পার্কার, কাষ্টম্স, সল্ট, ওপিয়ম এবং মেরিণ বোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং উৎকৃষ্ট বাগ্মী, ইংরাজী গদ্যে পদ্যে সুলেখক, সঙ্গীতজ্ঞ, পরিহাসরসিক ও চমৎকার অভিনেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি ইঙ্গ-বঙ্গ সাহিত্যে বিশেষ সমাদৃত। ইনি

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি অবসরগ্রহণ করেন এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

ইঁহার বক্তৃতার পর মিষ্টার টমাস টার্টন প্রস্তাবটীর অনুমোদন করেন। টমাস টার্টন ব্যারিষ্টার এবং সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। সুবক্তা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারোনেট হন। স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, ১৩ই এপ্রিল পথিমধ্যে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হন।

মিষ্টার টার্টন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, রামমোহন রায়ের মৃত্যুতে ভারতবাসীর অসীম ক্ষতি হইয়াছে কারণ তাহাদের কল্যাণের জন্য তিনি তাহাদের মুখপাত্র স্বরূপ ছিলেন। তিনি এতদ্দেশবাসীকে তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিতে বলেন এবং এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই ব্যবস্থাপক সভা হইবে তাহাতে উপস্থাপিত বিধিগুলি আপত্তিজনক হইলে যেন দেশবাসিগণ অকুণ্ঠিত ভাবে এবং নির্ভয়ে তাহার প্রতিবাদ করেন,—যেমন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হরণকারী ঘৃণাজনক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইবার পর তাহাদের স্বদেশহিতৈষী দেশবাসী রামমোহন রায় তাহার বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহাদের যে সকল অভিযোগের হেতু আছে তাহা গোপন রাখা উচিত নহে কারণ এই বহুজননিন্দিত সনন্দেও (উহার দোষগুলি ভারতবাসীর অভাব সম্বন্ধে মন্ত্রীসভার অজ্ঞতাজনিত) দেশবাসীর অবস্থার উন্নতি ও তাহাদের সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধির অভিপ্রায় পরিদৃষ্ট হয়। যাঁহারা দেশের হিতচিকীর্ষু, তাঁহাদের উচিত, কে তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন তজ্জন্য নিশ্চেষ্টভাবে অপেক্ষা না করিয়া রামমোহন রায়ের ন্যায় নির্ভীকভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া এবং অন্যের অনুসরণ না করিয়া নিজেই অগ্রণীর কার্য্য গ্রহণ করা। মিষ্টার আড্যামের শাসনকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে তিনি যে নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, যখন অন্য কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করে নাই তখন তিনি যে নৈতিক অকুতোভয়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া সেই শ্রদ্ধেয় দেশবাসীর স্বাধীন ও নির্ভীক প্রকৃতির সমুচিত প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন যদি কলিকাতাবাসী কায়-মনোবাক্যে এই খ্যাতনামা মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে তাহা হইলে জগতের চক্ষে তাহারা তাহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবে।

এই প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অতঃপর 'বেঙ্গল হরকরা'র সম্পাদক, সুপণ্ডিত ও সুলেখক জেমস সাদারল্যাণ্ড তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। যথা:—



'বেঙ্গল হরকরা' সম্পাদক জেমস্ সাদার্ল্যাণ্ড

"এস্থলে উপস্থিত নিম্নলিখিত মহাশয়েরা চাঁদার টাকা সংগ্রহার্থে এক কমিটি করিবেন এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে ঐ টাকা আদায় হইলে কিছুকাল পরে স্বাক্ষরকারি ব্যক্তিদিগকে এই সভাতে আহ্বান করা যাইবেক।

স্যার জে পি গ্রাণ্ট	মিষ্টার ডব্লিউ এইচ স্মোল্ট
মিষ্টার টি এইচ টার্টন	,, রুস্তমজি কাওয়াসজি
,, এল ক্লার্ক	বাবু রসিক কৃষ্ণ মল্লিক

মিষ্টার জে সাদারল্যাণ্ড   বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল
„ জে, জি, গার্ডন

সভার অধিবেশনের পূর্ব্বদিন 'কলিকাতা কুরিয়ার' নামক পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে তিনি একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে লেখক ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় সরকারী টাকা অপহরণের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন রামমোহন তাঁহার পুত্রকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এবং যদিও বিচারে রাধাপ্রসাদ অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন মিষ্টার এডওয়ার্ড মলনি তাঁহাকে দোষী বলিয়াই মনে করিতেন। সাদার্ল্যাণ্ড রামমোহন রায় ও তাঁহার চরিত্রের প্রতি এই অযথা কলঙ্কারোপের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে বহু বৎসর পূর্ব্বে যখন উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়—তখন তিনি ঐ মোকদ্দমার বিবরণী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছিলেন এবং সংবাদ পত্রে সম্প্রতি এই বিষয় পুনঃ প্রকাশিত হইবার পর এই বিষয়ে সমস্ত তথ্য অবগত আছেন এরূপ একজন সিভিল সার্জ্জেন্টের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অনুমতি ক্রমে বলিতে পারেন যে তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল।

প্রস্তাবটী সভাকর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং প্রায় ছয় সহস্র টাকা সভাস্থলেই সংগৃহীত হয়।

২

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষা সমিতিতে ছয়জন য়ুরোপীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও একজন কোটিপতি পার্শী সদাগর ছিলেন তাহাতে মাত্র দুইজন বাঙ্গালী ছিলেন যথা, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও বিশ্বনাথ মতিলাল।*

* রসিককৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। বিশ্বনাথ মতিলালের কিঞ্চিৎ পরিচয় আধুনিক পাঠকগণকে দেওয়া আবশ্যক। রামদুলাল সরকার, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতির ন্যায় ইনিও অধ্যবসায় ও সাধুতার গুণে সামান্য অবস্থা হইতে লক্ষপতি হইয়াছিলেন। বহুবাজারের প্রসিদ্ধ বাজারটী ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর বাজারটী তাঁহার এক পুত্রবধূর কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে এবং তখন হইতে উহা বহুবাজার নামে বিখ্যাত হয়। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ডব্লিউ সি বানার্জ্জী এই পরিবারেরই এক কন্যাকে বিবাহ করেন। নদীয়া ও ভাওয়াল রাজপরিবারও বিবাহসূত্রে এই পরিবারের সহিত সম্বদ্ধ।

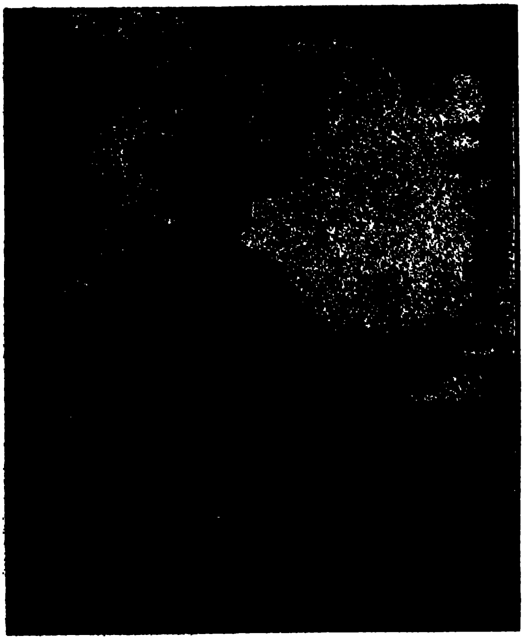
কিন্তু ইহাও স্মর্ত্তব্য যে সে সময়ে দেশ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল এবং রাজার বিপক্ষ দল বিশেষতঃ রাজা রাধাকান্ত প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দু নেতা পরিপোষিত "ধর্ম্মসভা"



রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য বিশ্বনাথ মতিলাল

তৎকালে প্রবল প্রতাপে সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রামমোহন রায়ের প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। রামমোহনের গুণমুগ্ধ ভক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম সমিতির সদস্যগণের মধ্যে না থাকা কিন্তু অতীব বিস্ময়কর। স্মৃতি-সভায় কেন যে তিনি তাঁহার ভক্তিভাজন বন্ধু ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হন নাই তাহার কারণ জানিতে কৌতূহল হয়। স্মৃতি সভায় যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং স্মৃতি-রক্ষা সমিতিতে যাঁহারা সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বারো বৎসর পরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্মৃতি সভায় স্যর জন পিটার গ্রান্টই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দ্বারকানাথ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, যে তিনি তাঁহাকে বহু

বৎসর হইতে জানিতেন এবং যথার্থই বলিতে পারেন তাঁহার ন্যায় সদ্গুণের অধিকারী তিনি আর কখনও দেখেন নাই। দ্বারকানাথ বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন সুতরাং উহার সদস্য প্যাট্ল্ ও পার্কারের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিচিত ছিলেন।



দ্বারকানাথ ঠাকুর

যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাহরণের বিপক্ষে রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি মহোদয়গণ সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন তখন টমাস টার্টনই তাঁহাদের দ্বারা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দ্বারকানাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। মেসার্স সাদার্ল্যাণ্ড যে 'বেঙ্গল হরকরা পত্রের সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ সেই সংবাদ পত্রের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিশেষ জানাশুনা ছিল। 'জ্ঞানান্বেষণ'-সম্পাদক রসিককৃষ্ণের সহিতও দ্বারকানাথের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কিরূপে এই বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হয় তাহা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবন-চরিত-লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্র এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"জ্ঞানান্বেষণ একবার দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে এক তীব্র সমালোচনা করেন। দ্বারকানাথের এক সম্পাদক আত্মীয় তাঁহাকে যাইয়া মল্লিক মহাশয়কে চাবুক মারিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া দ্বারকানাথ রসিককৃষ্ণকে নিজ বাটীতে আহারের নিমন্ত্রণ করেন এবং ধীরভাবে তাঁহাকে তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া দেন। রসিককৃষ্ণ তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে বিমোহিত হন এবং দ্বারকানাথের প্রতি তাঁহার মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া যায়। কিরূপে শত্রুকে বশীভূত করিতে হয় দ্বারকানাথ তাহা বিলক্ষণ জানিতেন।"

স্মৃতি সভায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই দ্বারকানাথের বিশিষ্ট এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, ইহাতে অনুমান হয় এই সভার আয়োজনে তাঁহার বিলক্ষণ হাত ছিল কিন্তু কোনও অপ্রকাশ্য কারণ বশতঃ তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সভায় প্রকাশ্য ভাবে যোগদান করিতে বিরত হইয়াছিলেন। হয়ত তাঁহার শোক এত ব্যক্তিগত ও গভীর ছিল যে তিনি প্রকাশ্যে তাহা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। স্মৃতিরক্ষা সমিতিতে যে কারণে রাজার পুত্রের নাম দেখা যায় নাই হয়ত সেই কারণেই উহাতে দ্বারকানাথের নামও দেখা যায় না।

(আগামী বারে সমাপ্য)

বিপথে

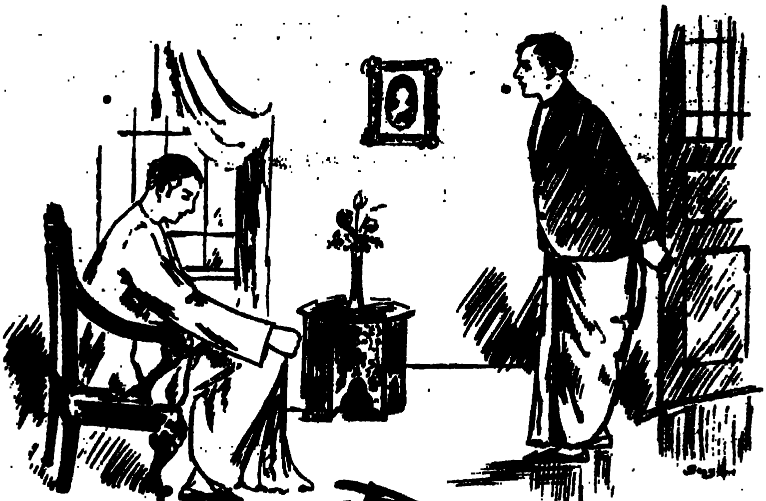
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিদ্রায় জাগরণে সারাদিন সারারাত্রি প্রিয়নাথ কেবলই বিভীষিকা দেখিল। সে বিভীষিকার নানা ভঙ্গী, বিকট ভ্রূকুটী। ভ্রূকুটী-ভঙ্গীতে প্রিয়নাথ কখন শিহরিয়া উঠে, কখন ছুটিয়া পলাইতে যায়, কখন কাঁদিয়া আকুল হয়।

অরুণোদয়ে অন্ধকার-নাশের সঙ্গে-সঙ্গে বিভীষিকার আবেশ কাটিয়া আসিল। প্রিয়নাথ প্রকৃতিস্থ বোধ করিল। ভাবিতে লাগিল,—যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, জীবনান্ত অনুতাপেও যে ক্লেদ ধৌত হয় না, রেশমী বস্ত্রে কর্দম-চিহ্নের মত শেষ পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে, এই সেই পাপ—এই বন্ধু-পত্নীর প্রতি লালসা, লালসার উন্মত্ততা, উন্মত্ততার চঞ্চলা অবলার নিরঙ্কুশ ধর্ম্ম-পথে প্রলোভন-জাল-বিস্তার।

প্রিয়নাথের দারুণ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। ভাবিতে লাগিল,—কুলকামিনী শতগ্রন্থি আনায় শত-ফেরে জড়াইয়াছে, এই কৃতঘ্নের শিরে তবু অশনিপাত হয় নাই, পিশাচ এখনও বাঁচিয়া! মন সহসা বলিয়া উঠিল— মরণ হয় না তাই বাঁচিয়া। অনুতাপদগ্ধ উত্তেজনা উত্তর দিতে চাহিল—নির্লজ্জ, আবার আত্মবঞ্চনা! মরণ হয় না!—কাপুরুষ, সাহস নাই তাই বল! এক বিন্দু বিষে, ভাগীরথির ক্ষুদ্রস্পর্শে কত মানুষ মরিয়াছে, মরণ হয় না! মৃত্যু হয় না, না, জীবনের মমতা হইতে দেয় না!

ভাবিতে ভাবিতে হেমচন্দ্রের চিত্র মানসপটে পূর্ণ প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। বাল্যসখা সহাধ্যায়ী হেম, সম্পদে সুহৃদ, বিপদে বান্ধব হেম, শিশুর ন্যায় সরলহৃদয় রমণীর ন্যায় কোমলপ্রাণ হেম, সেই হেমের—প্রেমিক



প্রিয়নাথ চিন্তাগ্রস্ত—পদপ্রান্তের ছোরার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ, এমন সময়ে হেমচন্দ্র তাহার অজ্ঞাতসারে ঘরে প্রবেশ করিল।

হেমের কণ্ঠলগ্ন হেমহার, মাথার মণি, নয়নের তারা ছিনাইয়া লইবার অভিলাষ, চক্রান্ত, প্রাণপণ প্রয়াস!—প্রিয়নাথ ভাবিতে লাগিল—ছিঃ ছিঃ! তাহার পূর্ব্বে সে আত্মহত্যা করে নাই কেন, বিষ খাইয়া, জলে ডুবিয়া,

রজ্জুতে ঝুলিয়া মরে নাই কেন, না পারিয়াছিল কাহাকেও খুন করিল না কেন, খুন করিলে ত ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ড লইতে পারিত, কিন্তু এই পৈশাচিক অপরাধ ভ্রূণ-হত্যার মত নীরব, আইনে ত ইহার দণ্ড নাই, ফাঁসিকাঠে শূলে সারমেয়-মুখে প্রাণবধ ইহার যোগ্য দণ্ড নয়, মনুষ্য-বুদ্ধি ইহার উপযোগী উৎকট শাস্তি বুঝি এখনও উদ্ভাবন করিতে পারে নাই!

চিন্তা-স্রোত ভিন্ন পথে ফিরিল। ভাবিল, পারে নাই অকাতর চেষ্টায় না অবহেলায়? ধিক্ আইনে, ধিক্ রাজশাসনে! মহাপাপে পাপী, অতিঘৃণিত অপরাধে অপরাধী স্বচ্ছন্দে নিঃশঙ্কে এই ত দাঁড়াইয়া, আর দরিদ্রা জননী অভুক্ত অনাহারক্লিষ্ট সন্তানের জন্য জমিদারের ক্ষেত্রের কয়েক মুষ্টি ধান্য লইয়াছে বলিয়া পুলিশ-প্রহরী তাহাকে ফাটকে পাঠাইবার বিপুল আয়োজনে ব্যস্ত!

অনুতাপ-বায়ু-বলে চিন্তাস্রোত অনাবিল বাহিয়া চলিল। প্রিয়নাথের মনে হইতে লাগিল হেম যখন শুনিবে সোদরোপম সুহৃদ কি বীভৎস কাণ্ড করিয়াছে, শুনিয়া বুঝিবে হৃদপিণ্ড উপাড়িয়া জলন্ত অনলে আহুতি দিতে কেবল বাকি রাখিয়াছে, দেবতুল্য ক্ষমাপরায়ণ হইলেও হেম কি তখন অযোগ্য বন্ধুকে ক্ষমা করিতে পারিবে—ক্ষমা সম্ভবে কি? মার্জ্জনার কি সীমা নাই?

প্রিয়নাথ তাহাই আলোচনা করিতে লাগিল। ভাবিল,—যদি থাকে, হেমচন্দ্র দৈত্যমুণ্ড স্বহস্তে দ্বিখণ্ড করুক, পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ত তাহাতে হইতে পারে; যদি না থাকে, মার্জ্জনা সত্যই যদি সীমাহীন অন্তহীন হয়, তবে ধরণী দ্বিধা হউক, বিষের পুতুল মাটীতে মিশিয়া মাটী হইয়া যাক্, সেই মাটীর উপর দিয়া প্রভাতে প্রদোষে হেমচন্দ্র সস্ত্রীক চলাফেরা করিয়া বেড়াক্—সুধাস্পর্শে মুক্তি যুগযুগান্তরে হইলেও হয়ত হইতে পারে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হৃদয়ের কূলে কূলে যখন আত্মগ্লানি, দুরন্ত আত্মগ্লানির অবিশ্রান্ত ঘাতপ্রতিঘাতে প্রিয়নাথ যখন হতবুদ্ধি অধোবদন, আত্মহত্যার সংকল্পে ব্যাপৃত, হেমচন্দ্র যে তখন প্রিয়বন্ধুর কয়দিন অদর্শনে কুতূহলী হইয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল প্রিয়নাথ তাহা আদৌ লক্ষ্য করে নাই, পদপ্রান্তস্থ ছোরার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া যেমন আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতেছিল তেমনই ধিক্কার দিতে লাগিল। হেমচন্দ্র বন্ধুবরের এই আকস্মিক অন্ত্র-প্রীতির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিল—অন্তরে কেবল বিষাদ, কেবল ব্যথা, কেবল কাতরতা; আকুল নয়নে তাহার সুস্পষ্ট ছায়া, বিবর্ণ বদনমণ্ডলে তাহার পূর্ণ বিকাশ।

হেমচন্দ্র এই পরিস্ফুট মনোব্যথায় মর্ম্মাহত হইয়া নিঃশব্দে যেমন বসিতে গেল, পদতলস্থ ডায়ারি-পুস্তকের প্রতি অমনই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

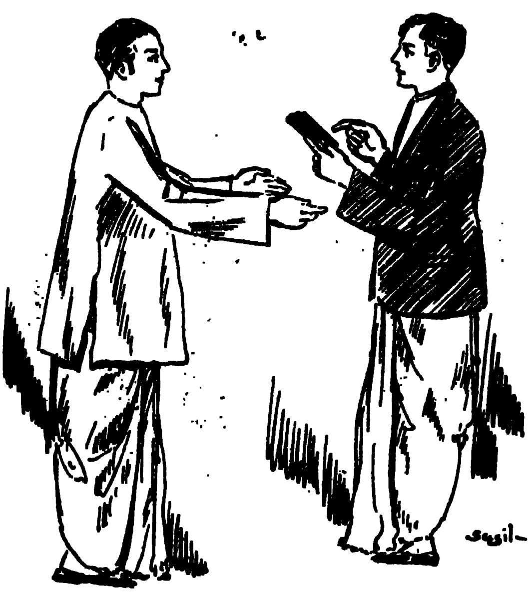
ডায়ারিখানা খুলিতে গিয়া হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। সেই পতন-শব্দে প্রিয়নাথের চমক ভাঙ্গিল। প্রিয়নাথ চাহিল। চাহিয়াই দেখিল, সম্মুখে হেমচন্দ্র! সত্যই কি হেমচন্দ্র—এত প্রত্যুষে ভগ্নগৃহে হেমচন্দ্র? নিজ নয়নের উপর, নয়নের তেজোহীন দৃষ্টির উপর প্রিয়নাথের ঘোরতর সন্দেহ হইল। সে ভাবিল—ভগ্নগৃহে হেমচন্দ্রের আগমন বিরল, আসিতে নিষেধ-ইঙ্গিতও না আছে এমন নয়, সে ইঙ্গিত উপেক্ষা বিচিত্র নহে সত্য, কিন্তু এত প্রত্যুষে হেম কেন আসিল, প্রয়োজনবশেই যদি আসিয়া থাকে কেমন করিয়া কখন আসিল,—অজ্ঞাতসারে তস্করের মত কেন আসিয়াছে, নীরবেই বা রহিয়াছে কেন? প্রিয়নাথ সিদ্ধান্ত করিল, হেমচন্দ্র কখনই নয়, যাহা দেখিল, দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিল—তাহা মনোবিকার, স্বপ্ন, স্বপ্নাবেশে বিভীষিকা, মায়া!

স্তোকবাক্যে মন যেমন প্রবোধ মানিল, সংশয় আসিয়া অমনই উপস্থিত—হেমচন্দ্র তবে কি কিছু শুনিয়াছে, শুনিয়া সমুচিত শাস্তি দিতে আসিয়াছে? মন বলিল, তাহাই সম্ভব, নহিলে সহসা এত প্রত্যুষে কেন? সংশয় বলিল, "শাস্তি দিতে যে আসে সে কি নীরবে আসে, নীরবে থাকে?" মন বলিল "তবে কি শুধুই কৈফিয়ৎ লইতে আসিয়াছে?" সংশয় হাসিয়া উঠিল, বলিল "এ সংবাদ যে শুনে কৈফিয়ৎ লইবার অবকাশ তাহার কৈ? সে কি তৎক্ষণাৎ সংহার-মূর্ত্তি ধরে না, সতী-দেহত্যাগে মহাদেবের ন্যায় রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ

করে না ?" মন যুক্তির সারবত্তা বুঝিল ; বুঝিয়া বলিল "হাঁ তাও বটে ; তবে সেই ঠিক—বিভীষিকাই নিশ্চিত।"

কম্পিত হস্তের কম্পিত অঙ্গুলী দিয়া চক্ষু রগড়াইয়া প্রিয়নাথ দৃঢ় বিশ্বাস দৃঢ়তর করিতে গেল, বিস্ফারিত নয়নে পুনঃ পুনঃ চাহিল, চাহিয়া স্পষ্ট বুঝিল—স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, বিভীষিকাও নয়।

বিবর্ণ দেহ আরও বিবর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া গেল, মস্তক অবনত হইল। ক্রমশঃ নয়ন মুদিত হইয়া আসিল, পাপ-পসরা শিরে লইয়া কেমন করিয়া মাথা তুলিবে—মাথা



হেমচন্দ্রের হাতে তাহার ডায়ারি দেখিয়া প্রিয়নাথ শশব্যস্তে বলিল, কি দেখিতেছ হেম, এ সব পাগলের পাগলামি—

তুলিয়া অপরাধপূর্ণ নয়নে নিরীহ হেমচন্দ্রের মুখপানে কেমন করিয়া চাহিবে, চাহিয়া কোন্ প্রাণে কথা কহিবে!

কথা না কহিলেও ত নয়। হেমচন্দ্র কি মনে করিবে, নিদারুণ নীরবতায় কি বিকট টীকাভাষ্যই না করিবে! প্রিয়নাথ বুঝিল—প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন, চেষ্টায় সে শক্তি হয় ত নাই, না থাকে তাহার উদ্বোধন আবশ্যক, আশু-কর্ত্তব্য। নিমেষে অমানুষিক বল সঞ্চয় পূর্ব্বক প্রিয়নাথ নির্ভীক নেত্রে চাহিল। চাহিবা মাত্র দেখিল, হেমচন্দ্রের হস্তে ডায়ারি-পুস্তক—যে পুস্তকে আশা আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-আগ্রহ সম্যক সপ্রকাশ! প্রিয়নাথের শুষ্ক মুখ শুকাইয়া পাংশুল হইয়া গেল, অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সে কম্পন গোপন করিবার চেষ্টায় প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইতে অধীর হইয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তেই বলপূর্ব্বক পুস্তক কাড়িয়া লইতে, লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে সাহস কৈ? বুদ্ধি আসিয়া সহায়তা করিল, সাহস দিল।

প্রিয়নাথ অন্তরের শক্তিপুঞ্জ সমবেত করিয়া দুর্দ্ধর্ষ বল সঞ্চয় করিল ; বলিয়া উঠিল—"কে ও, হেম, এত সকালে ?" স্বর গম্ভীর, গম্ভীর অথচ সকরুণ, সকরুণ অথচ নির্ভীক। হেমচন্দ্রের প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া ডায়ারিখানা লইয়া বলিল "কি দেখিবে, হেম, কেবল পাগলামি—জানই ত পাগলের পাগলামি। কাগজের অভাবে ডায়ারি পাণ্ডুলিপির কাজ করিয়াছে—প্রয়োজন ত বাধাবিঘ্ন মানে না।"

নিকটেই যে কয় দিস্তা সাদা কাগজ পড়িয়া ছিল ক্ষিপ্রতায় প্রিয়নাথ তাহা দেখে নাই। কাগজগুলা হেম-চন্দ্রের দৃষ্টি কিন্তু এড়াইতে পারিল না। অকারণ মিথ্যা কথায় হেমচন্দ্র বিরক্ত হইল, সন্দিগ্ধও হইল। অধিকন্তু ডায়ারি গোপন-চেষ্টায় প্রিয়নাথ আরও আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। চেষ্টার সঙ্গে যদি একটু ক্ষীণ হাসি থাকিত, হাসির সঙ্গে একটু হাল্‌কা রঙ্গরসিকতা মিলিত, গ্রন্থরচনা সংক্রান্ত অনাবশ্যক কৈফিয়ৎটুকুর উল্লেখ না থাকিত, তাহা হইলে হয়ত হেমচন্দ্রের মনে সংশয় আদৌ স্থান পাইত না—সাদা কাগজের অভাব সম্বন্ধে জলন্ত মিথ্যাটাকেও কোনক্রমে গলাধঃকরণ করিয়া লইত। ডায়ারির দুইচারি ছত্র পড়িয়াই হেমচন্দ্র বুঝিয়াছিল, হৃদয় দিয়া অনুভব না করিলে, নিজের প্রাণের কথা না হইলে, কেবল অনুমান-বলে, কেবল গ্রন্থ-রচনার খাতিরে আবেগরাশি অমন জলন্ত ভাষায় জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে না। মনের এই স্থির বিশ্বাস নির্ব্বুদ্ধিতায় ক্ষিপ্রতায় প্রিয়নাথ আরও স্থিরতর করিয়া দিল। হেমচন্দ্র সুস্পষ্ট বুঝিল, ইহার মূলে কোন গূঢ় রহস্য নিশ্চয় নিহিত আছে। হেমচন্দ্র এ কথায় কোন উল্লেখ করিল না, প্রিয়নাথের

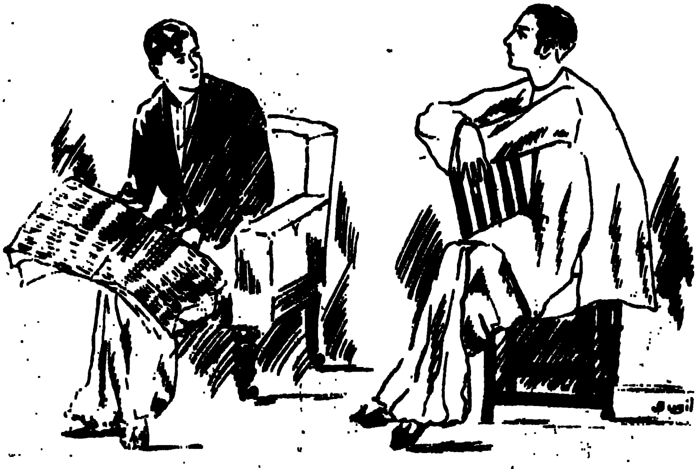
কথা ধরিয়াই কথোপকথন আরম্ভ করিল—"পাগলামির পরিচয় দিতে দ্বিধা কেন, প্রিয়? বন্ধুর কাছেও দ্বিধা!"

আত্মগ্লানি-পরিপূর্ণ হৃদয়ে হেমচন্দ্রের ধিক্কার সবেগে গুরু আঘাত করিল, অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করিল। প্রিয়নাথ ভাবিতে লাগিল, তুচ্ছ ত্রুটীতে যে আহত, বিষম আঘাত তাহার সহিবে কি! উত্তেজিত ক্রোধ হয় আপনাকে, নয় অপর কাহাকে—আপনার অপেক্ষা প্রিয় যাহারা তাহাদের কাহাকেও হত্যা না করিয়া স্থির হইতে পারিবে কি?

না, অসম্ভব। প্রিয়নাথ বুঝিল, কাহারও প্রাণসংশয় নিশ্চিত—হয়ত সুহাসিনীর, হয়ত হেমচন্দ্রের, হয়ত বিশ্বাসঘাতকের নিজের, হয়ত তিনেরই। প্রিয়নাথ শিহরিয়া উঠিল। হেমচন্দ্রের হস্তে যদি মৃত্যু হয়, সে মৃত্যু যদি মনের আবর্জ্জনারাশি ধৌত করিয়া দিতে পারে, মলিন মন নির্ম্মল করে, প্রিয়নাথ শতবার মরিতে প্রস্তুত; কিন্তু তাহার পাপে দুইটী অমূল্য জীবন অকালে বিনষ্ট হইবে!—প্রিয়নাথ ভাবিল, তাহার পূর্ব্বে তাহার পঙ্কিল হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইবে না? সুহাসিনী কুলবধূর আদর্শ না হইতে পারে,—না হউক, সামান্য কারণেই তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে তা উঠুক, সুহাসিনী নারী, অল্পবুদ্ধি, মার্জ্জনীয়া—শুধু তাহাই নহে হেমচন্দ্রের প্রাণাধিকা,—তাহার অকাল-মৃত্যু!—প্রিয়নাথ সংজ্ঞাহীনের মত শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল। সে দৃষ্টি হেমচন্দ্রের মুখের উপর পতিত হইল। আহা! এই মুখ—প্রিয়নাথ ভাবিতে লাগিল—আহা! এই মুখ—মন্দাকিনী-সলিলের মত স্বচ্ছ, বিকশিত কুসুমের ন্যায় নির্ম্মল, এই মুখ আত্মহত্যার রুধিরাপ্লুত হইয়া অনন্তের ক্রোড়ে মিশিবে, আর অনুতাপের উপহাস সহিবার জন্য রহিবে কেবল এই প্রিয়নাথ—কেন, মৃত্যু কি এতই ভীষণ, জীবন কি এতই প্রিয়, যমদণ্ডে পাপপঙ্ক যদি মুছিয়া যায় তবু প্রিয়! প্রিয়নাথ আরও ভাবিল, বিধাতার দণ্ড বিচার যদি তাহার অদৃষ্টে ঘটে, সেও নির্দ্দোষীর না হইয়া যদি তাহারই হয় তাহা হইলে

—প্রিয়নাথ আর ভাবিতে পারিল না। সে পরিণাম কল্পনার আনিতে সেই রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল—বিপদ যে হেমচন্দ্রেরই পূর্ণমাত্রায়। সারাজীবন দুঃস্বপ্নের মত যে পাপগ্রহ ঘেরিয়া থাকিত তাহা দূর হইবে বটে, কিন্তু সে নিরাময় ভোগ করিবে কে? হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া ভোগ করিতে সে রহিবে কি? পুণ্যহস্তের অস্ত্রাঘাতে যে মরিবে সে ত পুণ্যময় হইবে; কিন্তু যে আঘাত করিবে? সে হত্যাকারী! পরিণাম হয় দ্বীপান্তর, নয় ফাঁসিকাঠ, নয় শ্রীঘর—আর সেই সঙ্গে কেবল দুর্ণাম—শতমুখে ব্যঙ্গ, সহস্র হৃদয়ের ঘৃণা! অপরাধ?—সংসারের একটা কণ্টক উৎপাটন!

প্রিয়নাথ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরে গিয়া



হেমচন্দ্র অর্দ্ধ বিরক্ত, অর্দ্ধবিস্মিত ভাবে চিন্তান্বিত প্রিয়নাথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কাঁদিয়া অপ্রিয় কল্পনার হস্ত হইতে ক্ষণিক নিষ্কৃতি পাইবে ভাবিল। হায় দুরাশা! সকল দুঃখ কি রোদনে দূর হয়!

হেমচন্দ্র ভাবিতেছিল, শেষ কথাটা হয়ত ভাল হয় নাই, হয়ত প্রিয়নাথের প্রাণে লাগিয়াছে; উত্তর না দিবার, নীরবতার কারণ তাহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? এই ভাবিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে হেমচন্দ্র নীরবেই বসিয়াছিল, সহসা প্রিয়নাথকে উঠিতে দেখিয়া; বিরক্তিব্যঞ্জক নেত্রে চাহিতে দেখিয়া বলিল, "অপরাধ লইও না, প্রিয়!"

প্রিয়নাথ বিস্মিত হইয়া বলিল, "অপরাধ! কিসের?"

"না, এই যে বলিতেছিলাম, বন্ধুর কাছে প্রাণের কথা পাগলামির পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হওয়া সাজে না।"

"এই অপরাধ হেম? ইহারই জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা! তার চেয়ে বল না কেন, তোমার আমার সকল সম্বন্ধের এই শেষ!" বলিতে বলিতে প্রিয়নাথের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল; মনে করিল, সুহাসিনী-সংক্রান্ত সকল কথা খুলিয়া বলে, বলিয়া অনুতাপের বৃশ্চিকদংশন নিবারণ করে—দেবতার কাছে, দেবতার ন্যায় সরল কোমল হৃদয়ের কাছে প্রাণের কথা না বলিবে যদি কাহাকে বলিবে? কিন্তু কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। প্রিয়নাথ শতবার বলিতে গেল, একবর্ণও বলিতে পারিল না, গাঢ় আলিঙ্গনে কেবল হৃদয়-বেদনা কোনমতে শান্ত করিল।

হেমচন্দ্র বলিল "পাগলামির কথা তুলিয়াছিলে, প্রিয়। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পাগল নহে কে? 'পাগল' লোকে না বলে কাহাকে?"

প্রিয়নাথ বলিল, "কথাটা অতিরঞ্জিত করিও না, হেম। লোকে যখন তখন যাহাকে তাহাকে পাগল বলে না। জীবন যখন অতিমাত্রায় জীবন্ত, মানসিক কষ্ট যখন ষোলআনা, লোকে মুখের দিকে এক একবার চায়, চায় আর হাসে, ভাবে এমনই কি দুঃখ, বলে লোকটা নিতান্ত পাগল! বন্ধুত্বের বন্ধন বড় কঠিন বন্ধন বটে; বেশী ভর পড়িলে সে বন্ধনও টিকে না, খুলিয়া যায়। মর্মান্তিক কষ্টের সময় মানুষ একান্তই একা।"

প্রিয়নাথ কোন্ কথায় কোন্ কথা আনিল, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিল! প্রাণের আবেগ আপনা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল, প্রিয়নাথ তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না। প্রিয়নাথ প্রথমতঃ তাহা বুঝে নাই; যেমন বুঝিল অমনই জিহ্বা সংযত করিয়া লইল। হেমচন্দ্র কিন্তু এই প্রহেলিকার মর্মোদ্ভেদ করিতে পারিল না, বন্ধুত্ব সম্বন্ধে বন্ধুর ক্ষীণ ধারণা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইল মাত্র। বলিল "যাহা বলিলে তাহা আংশিক সত্য হইতে পারে, সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু কাজ নাই বাক্‌বিতণ্ডায়। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যাহা কিছু মহৎ সাধারণের চক্ষে তাহাই পাগলামি। লোকহিত-ব্রতে জীবন উৎসর্গ কর, তুমি পাগল! পতিতের উদ্ধারকল্পে স্বার্থ বলি দাও তুমি পাগল, স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন কর তুমি পাগল!"

প্রিয়নাথ নীরব নিরুত্তর। উত্তর দিবার সাহস কৈ? আশঙ্কা, কে জানে কি কথায় কি কথা বাহির হইয়া পড়ে!

নীরব দেখিয়া হেমচন্দ্র আপনা হইতে বলিল "পাগলামি কি বলিয়াছি, কি নয় জান? বিশ্বাসঘাতকতা পাগলামি নয়, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে মিথ্যাকথা পাগলামি নয়, প্রতারণা প্রবঞ্চনাও নয়, আর নয় সেই পাশবিক দুষ্ক্রিয়া—পরনারী-প্রসক্তি।"

প্রিয়নাথের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। প্রাণপণ চেষ্টায় এইমাত্র বলিল "বেলা হইল, হেম, স্নান করিয়া আসি, বস।"

"না, আমিও যাই।" (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ মিত্র

শোক

—গল্প— —শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র পাল

গ্রামটি ছোট। মোটে ত্রিশ বত্রিশ ঘর লোক, তাও আবার বছর খানেক আগে বসন্তে কতকজন বিদায় নিয়েছে। লাবণ্য ভাবে, সে মৃত্যু তাদের মুক্তি—এই অপরিসর ভবিষ্যৎহীন জীবন নিয়ে তারা কি-ই বা করত! গাঁয়ের সঙ্কীর্ণ সীমানার মাঝে বোধ হয় তাদের নিশ্বাস হাঁপিয়ে উঠেছিল। যেখানে ব'সে থাকলে সুদূরে ছুটতে পথ পায় না, দৃষ্টি একই দিকে বার বার আঘাতে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে,—যেসে মন্থর জীবনে বিস্তীর্ণতার সাড়া কোন দিন জাগবে না সে-বেঁচে থাকা কত নিরর্থক। চারি-পাশের হাওয়ায় যেন কি এক মর্মভেদী বিষণ্ণতা, তার প্রগাঢ় আত্মীয়তায় মনের ভেতর না হ'তে পারল একটি অতি ক্ষুদ্র উত্তেজনার সৃষ্টি, না এল কান্নার কলরোল—এ

জীবন যেন পঙ্গু, বোবা, অসহায়। ঘড়ির ছোট কাঁটাটির মত জীবন এখানে চলেছে তো চলেইছে।

আমরণ পর্য্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ হারিয়ে গেছে গভীর নীরবতার ভেতর—আনন্দ-রৌদ্রের পরিচ্ছন্ন আভাস নেই, নেই নব নব ঘটনার মাদকতা। গ্রামের জীবন শুধু গভীর একটানা প্রশান্তির স্রোতে ভেসে চলেছে, যে-প্রশান্তি দীর্ঘ রাত্রির অচঞ্চল বৈচিত্র্যহীন তমসার মত বিরক্তিকর। —যে-রাত্রে উৎসবের অস্পষ্ট কাকলীও কোনদিন উদ্বেল হয় না—প্রাণের আশা আকাঙ্ক্ষার মর্ম্মর—লাবণ্যের এমনি ক'রে বেঁচে থাকতে ভাল লাগে না।

ভালো হয়ত লাগত কিন্তু বিধাতা সেখানে বাদ সেধেছেন। ছেলেটিকে অকালে বিদায় দিতে হয়েছে, এক বছরের ছেলেটি—ছষ্টু, নাদাল ছেলে তবু তার সোনামণি। বসন্তরোগ এসে তাকে নিয়েছে। —বিধাতা কি নিষ্ঠুর, লাবণ্য ভাবে।

একেবারে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে লাবণ্য নয়। তার বাপের বাড়ী আধা সহর একটা জায়গায়। খাঁটি সহর নাই হোক, তবু লাবণ্য সহরের মেয়েলি সৌখীনতা শিখেছিল কিছু-কিছু। কেমন ক'রে কান ঢেকে চুল বাঁধতে হয়, শাড়ীতে কতগুলো ব্রূচ আর সেফ্‌টি-পিন লাগালে কি রকম সুচারু দেখায় সে তা' জানে। না জানবেই বা কেন, লাবণ্য যে স্কুলে পড়েছে, আর সে-স্কুলের দিদিমণি একেবারে খাস কলকাতার মেয়ে।

ছেলেবেলা থেকে লাবণ্যের কল্‌কাতা দেখবার ভারি আকাঙ্খা। কল্পনার সেই সহরটির সঙ্গে তার কি প্রগাঢ় আত্মীয়তাই না ছিল, চিন্তার চোখে ছিল অপরূপ মধুর মায়াঞ্জন মাখানো—লাবণ্য মনে মনে ভাবত কলকাতা বুঝি পৃথিবী নয়, মাটি নয়, স্বর্গের রাজধানী।

—বা রে, লাবণ্য কলকাতার ছবি দেখেনি বুঝি! আর দিদিমণি কি সুন্দর সুন্দর শাড়ী আর গয়না পরে, এসব বুঝি স্বর্গ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায়! —লাবণ্যকে শুধু শুধু ক্ষ্যাপালেই হ'ল! লাবণ্য যখন অত্যন্ত ছোট মেয়ে এ তখনকার কথা।

আর একটু যখন বড় হয়েছে লাবণ্য, একদিন চুপি চুপি তার পাড়ার একটি মেয়েকে বলেছিল, কলকাতায় শ্বশুর বাড়ী হ'লে কী মজাটাই না হবে, তোর কি মনে হয় ভাই।

কিন্তু তার এই মধুর স্বপ্ন একদিন টুটে গেল, যেন তার দুর্নিবার আকাঙ্খাকে অকস্মাৎ স্তব্ধ ক'রে দিয়ে তার বিয়ে হ'ল একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে। যেখানকার মধ্যরাত্রি ও মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধতায় সমান গম্ভীর ও বিষণ্ণ। গ্রামটির সর্ব্বাঙ্গে যেন ক্লান্তির অসাড়তা।

নিয়তির বিদ্রূপে এমনিই হয়। স্বামী ঘুমোবার পর ফুলশয্যার রাত্রে লাবণ্য খোলা জানালাটি দিয়ে বাইরের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে ছিল। জ্যোৎস্নার রাত্রি—ঘন অরণ্যের গায়ে তার আভা ছড়িয়ে গেছে আর তার ছায়া এসে পড়েছে অসমান মাঠের উপর। হাওয়ায় ছায়াগুলি যেন মাথা নাড়ছে। মাগো—লাবণ্যের বুঝি ভয় করে না?

ওদিকে আর সে চাইবে না। তাড়াতাড়ি সে পাশের জানালাটি খুলে দিল। সম্মুখে শুধু ধু ধু প্রান্তর—প্রান্ত সাগরের মত বিস্তীর্ণ, কোথাও জনমানবের সাড়া নেই; শুধু মাঝে মাঝে পাখীর বিকট কাত্‌রানি। হঠাৎ খোলা জানালার পাশে শেয়াল ডেকে উঠ্‌ল। লাবণ্য চম্‌কে উঠে দু'টো জানালাই বন্ধ ক'রে দিলে। যেন রাতের শ্মশানের মাঝখানে তারা ছুটিতে প'ড়ে রয়েছে—বিবাগী শিব আর অভাগী শিবানী।

অবসন্ন ভাবে লাবণ্য তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল; কেঁদেছিল কিনা জানিনা, কিন্তু যদি চুপে চুপে চোখ তার সজল হ'য়ে উঠে থাকে কে তা' দেখবে, তা'তে কার কি ক্ষতি, কিসের তার লজ্জা! দুঃখ যে তার কত বেশী কেউ বোঝে নি, বুঝবেওনা—তাকে যে প্রান্তরের মাঝখান থেকে টেনে এনে প্রাঙ্গণে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে; যেখানে রুদ্ধ-নিশ্বাসে সঙ্কুচিত ভাবে আমরণ কাটাতে হবে। ভবিষ্যৎ সেখানে অন্ধ হ'য়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে, উৎসব আনন্দের ভিড়ের মাঝখানে নয়, কোলাহল হ'তে বাইরে।

তবু লাবণ্যের দিন কাটতে লাগল। তার স্বামী বিলাসের অবস্থা স্বচ্ছল কিন্তু ত্রিসংসারে আত্মীয়স্বজন বলতে যদি কেউ থাকত তাহলে লাবণ্যের এত একা-একা থাকার যাতনা সহ্য করতে হ'ত না।

আর বিলাস, সে যেন কি! খেয়ালের তার সীমা নেই কিন্তু খুসী হ'তে সে জানে না। বিলাস বলে, আমার সংসারে রুটিন ধরে চলতে হবে, বুঝেচ লাবণ্য।

লাবণ্যের না বোঝারই বা কারণ কি থাকতে পারে!—বিলাসের রুটিন আর মতামত ইতিমধ্যে সে সব জেনে নিয়েছে। সকাল বেলা বিলাস যায় মাঠে, চাষের তদারক করতে। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে নিরালা বিশ্রাম অর্থাৎ ব্যাঘাত-হীন নিদ্রা, আর সন্ধ্যায় বেশীভাগ দিনই বাইরের দাওয়ায় বসে তামাক টানা ক্বচিৎ কখনো হয়তো একটু বাইরে ঘুরে ফিরে আসে।

লোকে বলে বিলাসটা পাগল—মৌনী পাগল। সত্যিই তো, বিলাস হাসতে জানে না, রসিকতা তার কাছে অসহ্য, লোকের সঙ্গে আলাপ করার ভেতর যেন মস্ত বড় গ্লানি আছে ব'লে তার মনে হয়।

এ সব ছাড়াও বিলাসের পাগলামির আরও অনেক পরিচয় আছে তার কথায় ও ব্যবহারে। তার চোখে সব সময়ে যেন কি এক রকম কঠিন, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আছে, চিন্তার কুটিলতা। বিলাস কারো বন্ধু হ'তে ভালবাসে না, নিজেকে ছাড়া সে আর কাউকে শ্রদ্ধা বা স্নেহ করতে শেখেনি। মাঝে মাঝে আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে সে নিজের ভেতর কি যে খুঁজে বেড়ায় তা' বোঝা যায় না।

লাবণ্য একদিন বুঝি তার পাশে দাঁড়িয়ে হেসে বলেছিল, আয়নাতে তুমি এত কি দেখ, চুলও পাকেনি দাঁতও পড়েনি তবু যেন তোমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই! আর হলেই বা একটু বুড়ো তাতে আমার ভয়টা তো একটু কমবে।

বিলাস বলে, তার মানে?

লাবণ্য পরিহাসের হাসি হেসে বুঝি বলেছিল, পুরুষ মানুষকে একদম বিশ্বাস নেই, বয়সের সঙ্গে সুখের বহর তাদের বড় বেশী—কে জানে হয়তো তুমি আর একটা বিয়ে করেও ফেলতে পার; কিন্তু তোমার বয়সের হিসাবে যদি আমি বুড়ী হয়ে না যাই তাহলে তো তুমি আমায় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মত ভালবাসবে, হ্যাঁগা তাই না?

বিলাস কথা বলে কম কিন্তু যে ক'টি বলে সে ক'টি চাবুকের চেয়েও কড়া। স্ত্রীর দিকে কঠোর ভাবে চেয়ে সে বললে, দেখ লাবণ্য, এসব ভাল নয়। জোড়া ভুরু আর বেহায়া বউ এ দুটোই আমি সহ্য করতে পারি না।

সেইদিন থেকে স্বামীর সঙ্গে অপ্রয়োজনে কথা বলা বা কাছে যাওয়া লাবণ্যের প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেছে।

আর একদিনের কথা। বিলাস রাত্রে ঘুমোবার আয়োজন করছে। শুক্লাতিথির রাত্রি, বসন্তের উন্মত্ত বিহ্বল হাওয়ায় গাছের পাতায় পাতায় মর্ম্মর ধ্বনি উঠেছে। সেদিন লাবণ্যের মনে অকস্মাৎ এই গভীর রাত্রের ব্যাকুল বসন্ত এসে শিহরণ জাগাল। সে ভাবলে আজ সে চুপ করে থাকবে না, বিলাসকে সে ঘুমুতে দেবে না আজ; তাকে নিজের মুখরতা দিয়ে বাঙ্ময় ক'রে তুলবে।

নিদ্রার আয়োজনে ব্যস্ত বিলাসের পাশে বসে লাবণ্য সোহাগের স্বরে বলেছিল, হ্যাঁগা, এরি মধ্যে ঘুমুলে? আমার যে কিছুতেই ঘুম আসচে না, এস না দুজনে একটু গল্প করি।

বিলাস তীব্র কণ্ঠে জবাব দিল, এ না হ'লে আর মেয়ে-মানুষের বুদ্ধি! একে রাতজাগা তার ওপর আবার কথা কওয়া, আয়ুক্ষয়ের যত সব ষড়যন্ত্র তো এরাই করে। আর স্বামী স্ত্রীতে আজীবন ধ'রে কি-ই বা এত কথা বলে আমি তো বুঝিনা।

বিলাস পাগল ছাড়া আর কি! এমনি কত রূপালি রাত্রি, আবেগাকুল বসন্তের প্রতিটি মুহূর্ত্ত, কত মেঘমন্দ্র বাদলের বাষ্পাকুল উৎসব-ক্ষণে লাবণ্যের দীর্ঘনিশ্বাস কাতর হয়ে উঠেছে, সকলের সঙ্গোপনে—হয়তো নিজেরও।

বিলাসের কাছে লাবণ্য যেন একটি নিতান্ত প্রয়োজনের সামগ্রী, ধাতুর তৈরী; যে কথা বলতে পারে না, যার আশা আকাঙ্খা পাষাণের মত নিরুদ্ধ, যার চেতনার উচ্ছ্বাস নেই, দুঃখ বেদনা অনুতাপ নেই, নেই হাসি ও উল্লাস।

আর লাবণ্য যেন বিরহিণী যক্ষ-প্রিয়ার মত চিরমুক্ত থাকতে বাধ্য। স্বামী তার কাছে থেকেও দূরে, তার বন্ধু নয়, প্রিয় নয় যাকে সে প্রাণের প্রণতি জানাতেও সাহস করল না; বিলাস শুধু তার নিষ্ঠুর অধিকারী মাত্র—যার চোখে যৌবনের অঞ্জন নেই, স্বপ্ন দেখতে যে ভুলে গেছে। প্রতিদিনের এই সচেষ্ট নীরবতার পাষাণ লাবণ্যের ভবিষ্যৎকে,

তার বেঁচে থাকাকে পর্য্যন্ত নিরর্থক করে দিয়েছে। স্বামীকে সে ভয় করতে শিখেছে। তার ভয় যেন ক্রমশঃ জীবন-সংশয়ের আতঙ্কের দিকে অগ্রসর হ'তে যাচ্ছিল। কারণ অধীরতা প্রকাশ করার শক্তিও যে তার আর অবশিষ্ট নেই।

এ অভিশাপ থেকে কোনদিন তার মুক্তি হবে তার প্রতীক্ষা লাবণ্য করেনি। কিন্তু যে প্রশান্তি, যে নিরবচ্ছিন্ন স্বস্তি-স্তব্ধতা নির্ম্মম শাস্তির মত লাবণ্যেকে ভয়-নিশ্চেষ্ট ক'রে রেখেছিল তা' আবার অকস্মাৎ কুয়াসার মতই গেল স'রে—দীপ্ত মাতৃত্বের নব উন্মেষে লাবণ্য জীবনের নূতন সঙ্গীত শুনতে পায়—ভয়হীন সঙ্কোচহীন আনন্দের কলকোলাহল, বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ সার্থকতার সন্ধান।

ছোট একটি ছেলে কিন্তু তার জন্যে যে এতখানি ভাবতে হয় এবং সে ভাবনায় এমন বিহ্বল-সুখে অভিভূত হওয়া যেতে পারে তা' লাবণ্য পূর্ব্বে কল্পনাও করতে পারে নি।

টুলটুলে দুটি চোখ মিটমিট ক'রে লাবণ্যের দিকে চেয়ে থাকে। লাবণ্যের আজকাল সময়াভাব হয়েছে—খোকাকে কাজল পরাতে হয়, দুধ খাওয়াতে হয়, সুর ক'রে ঘুম পাড়াতে হয়; এমনি খোকার জন্যে কত সযত্ন খুঁটিনাটি কাজ তার বেড়ে গেছে।

লাবণ্য আজকাল স্বামীকে ভয় করে না। প্রায়ই সে বিলাসকে বলে, কি যে সব পাগলামি কর তার ঠিক নেই।—আর বিলাসের অদ্ভুত খেয়ালও যেন এখন অনেক কমে গেছে। একদিন লাবণ্য খোকাকে কোলে ক'রে বিলাসের পাশে দাঁড়িয়ে হেসে বললে, নাওগো তোমার ছেলেকে কোলে নাও। দেখনা তোমার কাছে যাবার জন্যে কেমন হাত বাড়িয়ে রয়েছে।

বিলাস মুখ গম্ভীর করে বললে, ছোট ছেলেকে বেশী আদর দেওয়া ভাল নয়, মেয়েমানুষরা এসব যদি কিছুতেই বোঝে।

মেয়েরা নাই বুঝুক কিন্তু বিলাস একদিন ধরা পড়ে গেল। লাবণ্য বুঝি একদিন রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিল, খোকা তখন শোবার ঘরে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ সে খোকার হাসির শব্দ শুনে গিয়ে দেখে তার খেয়ালী স্বামী খোকার পাশে ঝুঁকে পড়ে তার কচি তুলতুলে আঙুলগুলি আলতো তাবে মুখে পুরে বলছে, হালুম খেয়ে নেবো। আর সেই সঙ্গে খোকার খিলখিল হাসি উথলে উঠছে।

অনেকক্ষণ ধরে লাবণ্য তার আসার সাড়া না দিয়ে খোকার প্রতি বিলাসের অজস্র আদর সোহাগের বর্ষণ দেখতে লাগল। হঠাৎ একসময়ে খোকা মাকে দেখে বলে উঠল, মা।

বিলাস চমকে পিছন ফিরে দেখে লাবণ্য দাঁড়িয়ে, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। মুখ গম্ভীর করে বিলাস তখন বললে, ঘুম ভেঙে গেলেই তোমার ছেলে কাঁদবার চেষ্টা করে কেন? তাইতো আমার এত কষ্ট ক'রে ওকে থামাতে হ'ল।

লাবণ্য দুষ্টুমীর হাসি হেসে বললে, এবার থেকে যখন ও কাঁদবার চেষ্টা করবে তখন তুমিই ওকে কষ্ট ক'রে থামিও, আমি আর আসবো না।

এমনি ক'রে দিনে দিনে খোকা বড় হ'তে লাগল। খোকার যে ভাল দেখে কি নাম রাখবে লাবণ্য তা' ভেবে পায় না, কোন নামই খোকার মায়ের পছন্দ নয়।

আর খোকা—বাবারে বাবা, কি দুষ্টু, জেদী ছেলেই না হয়েছে। আবদারের তার শেষ নেই। বিলাস একবার কোথাকার মেলা থেকে একটা নীল কাঁচের গেলাস কিনে এনেছিল। একদিন খোকা জেদ ধরল, সে কাঁচের গেলাস ভাঙবে, মা'র গয়না পরবে আর উচ্ছ্ব খাবে। কিছুতেই থামেনা। লাবণ্য তো প্রথমে ছেলেকে চিপ্ চিপ্ ক'রে ঘা কতক লাগিয়ে দিল, মার খেয়ে চুপ করবার ছেলে লাবণ্যের নয়। অগত্যা কাঁচের গেলাসটার পরমায়ু তখনই শেষ হ'ল, লাবণ্যের গলার হারটা উঠল খোকার গলায়। ভাগ্যিস্ সেদিন এই দুটো পেয়েই খোকা উচ্ছ্ব খাওয়ার কথা ভুলে গেছ্ল।

তা ছাড়া খোকা এখন থেকেই একটু সৌখীন, জামায় বা ইজেরে একটুও ধুলা লাগা তার সহ্য হয় না। সুতরাং দিনের ভেতর অন্তত তিন চার বার তার জামা বদলে দিতে হয়। তা হোক, খোকাকে নব নব সাজে দেখতে লাবণ্যের বেশ লাগে।

লাবণ্য হাসতে হাসতে মাঝে মাঝে বিলাসকে বলে, এতটুকু ছেলের কি ভয়ঙ্কর বুদ্ধি, বড় হ'লে তো ওর আর জোড়া থাকবে না।

খোকার দুষ্টু,মী-বুদ্ধির পরিচয় লাবণ্য অনেকবার পেয়েছে। একদিন লাবণ্য রান্না করতে বসেছে এমন সময়ে কেলে-দুলে এসে খোকা বললে, মা রান্না কল্‌ব।

মা বলল, ছি তুই কি রান্না করবি, তোর বউ এসে রান্না করবে।

খোকা বল্‌লে, না বউ দুষ্টু।

লাবণ্য হেসে ফেলে বললে, আর তুমি চারপেয়ে লক্ষী, না?

কিছুক্ষণ পরে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে খোকা, বড় হয়ে তুই সবচেয়ে কাকে বেশী ভালবাসবি, আমাকে, তোর বাবাকে না বউকে?

খোকা কিন্তু তখন মার পিছনে বসে র**া**ঁধা তরকারীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। আবার জবাব একটা কিছু না দিলে মার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং বলে বস্‌ল, বউকে।

—তাই নাকিরে দুষ্টু। বলে' লাবণ্য মুখ ফেরাইতেই দেখে ওমা—

এমনি ভাবে প্রায় তিনটি বছর শেষ হতে চলেছে। একটি ছোট ছেলের অকারণ কান্নার উৎসাহে, তুচ্ছ আনন্দের হাসির জোয়ারে, অস্ফুট কথার কাকলীতে লাবণ্যের সংসার, লাবণ্যের মন পরিতৃপ্ত হয়ে রয়েছে। খোকার অন্যায় আবদারের ভঙ্গীটি তার কাছে কত মধুর, তার কান্নার স্বরটুকু পর্য্যন্ত লাবণ্যের কাছে কি মিষ্টি লাগে।

লাবণ্য তার সহর দেখবার তৃষ্ণা ভুলে গেছে, ভুলে গেছে তার স্বামীর দুর্ব্যবহার। এই নির্ব্বাক গ্রামটির একটানা অবসন্ন বিষন্নতার জন্যে সে যে কোনদিন অত্যন্ত কাতর হ'য়ে উঠেছিল, যার আক্ষেপে সে প্রতিদিন নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়েছে—সে সব কথা আজ আর লাবণ্যের মনে পড়ে না।

তার মনে প্রাণে কোথাও দারিদ্র্য নেই, দুর্ভিক্ষ নেই, কুণ্ঠা নেই।

কিন্তু লাবণ্যের এমনি স্বভাব যে, যখন যে-ভাবে থাকে সে-ভাব যে ভঙ্গুর হ'তে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারে না। তার মনের গতিতে অকস্মাৎ রূঢ় আঘাত না লাগলে কিছুতেই পরিবর্ত্তন হয় না। জীবনের এক একটি সহসা-লব্ধ সুরকে বিনা দ্বিধায় বাধা না পাওয়া পর্য্যন্ত সুদূর ভবিষ্যতে সে প্রসারিত ক'রে দেয়।

বেচারী লাবণ্য বোঝে না যে, মানুষের মৃত্যু হয় একবার কিন্তু মানুষের সুখের মৃত্যু হয় প্রতি মুহূর্ত্তে, সমগ্র জীবনে সংখ্যাহীন সহস্রবার।

গ্রামে যেবার বসন্ত-ব্যাধির নিকরুণ উৎসবের ভয়ঙ্কর সাড়া উঠ্‌ল সেবার লাবণ্যের খোকারও আয়ুর আর গেল কমে—খোকাকে অসময়ে পৃথিবীর কাছ হ'তে চিরবিদায় নিতে হল, মৃত্যুর দরখাস্তে সই দিয়ে।

খোকা যে নেই, লাবণ্য যেন একথা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারে না। ওই যে পাশের ঘরে খোকা হাস্‌ছে—ওমা আমি এত খুঁজছি আর দুষ্টু ছেলে কিনা ওখানে ব'সে হাসছে! লাবণ্য পাশের ঘরে প্রায় ছুটে চল্‌ল, কিন্তু কই খোকা তো ঘরে নেই। নাঃ, আবার ওপাশ থেকে কি যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলার শব্দ আসচে না—বাবারে বাবা জঞ্জাল ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, এখনি না গেলে হয়তো সব ভেঙে চুরমার করে ফেলবে। লাবণ্য চলল। কিন্তু খোকা সেখানেও নেই, তার যাবার আগেই বোধ হয় পালিয়েছে। এমনি লাবণ্যের মনে হয়, খোকার কান্নার স্বর তার সোনামণির অস্ফুট কলকাকালী সব জায়গা হতেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। চোখে অশ্রু নেই, মুখে নেই বিলাপ, উন্মাদিনীর মত লাবণ্য ঘরে ঘরে তার খোকার খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। শুধু শ্রান্তি-স্তব্ধ সময়টিতে তার মনে হয়, কি যেন তার হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে—এই অকূল আকাশের তলায় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না; মাটির বন্ধনকে সে ফাঁকী দিয়েছে।

কে আজ লাবণ্যকে সান্ত্বনা দেবে? বিলাস! মনে বিলাস যত কাতর-ই হয়ে থাকুক মুখের গাম্ভীর্য্য তার বিচলিত হবে না—বিলাস কাপুরুষ নয়, দুর্ব্বল নয়—মানুষকে নিয়ে বিধাতার এই নিষ্ঠুর উল্লাসকে সে তুচ্ছ করে।

তারপর আবার সেই মৃত্যু-নিস্তব্ধ পূর্ব্বেকার মূক জীবন। আরও একটি বছর কেটে যেতে চল্‌ল। লাবণ্যের এখন শোকে আর উচ্ছ্বাস নেই, উন্মত্ততা নেই—লাবণ্যের মনের

মৃত্যু হয়নি, হয়েছে অপমৃত্যু। সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতিশক্তিও বুঝি লুপ্ত হ'তে চ'লল !

খোকার গড়নটি শুধু তার মনে রয়েছে, তার আকৃতি, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি সুস্পষ্ট রেখা লাবণ্য মনের ভেতর খুঁজে পায় না। খোকা কতখানি লম্বা ছিল কতখানি চওড়া ছিল তারই একটি শাশ্বত ছায়া লাবণ্যের চিন্তায় আঁকা হয়ে রয়েছে। তার যত নীরব বেদনা, যত উষ্ণ দীর্ঘ-নিশ্বাস সেই ছায়াটিকে জড়িয়ে চাপা কান্নার মত হৃদয়ের নিবিড়তম অন্তঃপুরটি পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন। লাবণ্যের বিয়োগের বিব্রত ভাবটুকু কেটে গেছে, অশ্রু-বর্ষণ-ক্লান্ত এখন সে আকাশ শুধু শ্রাবণদিনের মত প্রতিনিয়তই নিরবচ্ছিন্ন-মেঘে ঢাকা— নীরব, প্রশান্ত কিন্তু চিন্তার সুদূর ভবিষ্যৎ অবধি বিসর্পিত।

স্বামীকে লুকিয়ে লাবণ্য খোকার ছোট ছোট জামাগুলি নিয়ে ঘাঁটে। ভাবতে চেষ্টা করে, এর-ই ভেতর তার ছেলের সম্পূর্ণ শরীর আশ্রয় নিত, কত বড় হ'য়ে সে মারা গেছে জামাগুলি দেখলেই যেন তার হঠাৎ মনে পড়ে যায়। লাবণ্যের কাছে সময়ের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। কারণ, সে কিছুতেই ভাবতে পারে না যে, খোকা বেঁচে থাকলে এতদিনে সে আরও বড় হ'ত, তার অস্ফুট কথাগুলি হ'ত আরও পরিস্ফুট। লাবণ্যের মনে তার খোকার তিন বছরের মনের রূপটি শাশ্বত হয়ে থাকবে, সেইটুকুই বোধ হয় তার একমাত্র সান্ত্বনা।

এমনি করে যখন দিন কাটছিল তখন হঠাৎ বিলাসের খেয়াল গেল লাবণ্যকে নিয়ে সে ছুদিনের জন্যে কলকাতায় যাবে। লাবণ্যের এতদিনের অতৃপ্ত আকাঙ্খা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও একেবারে বিশীর্ণ হয়ে যায়নি। সে যেন খুসীই হ'ল একটু—ছুদিনের জন্য মুক্তির নিশ্বাস সে নিতে পারবে, অন্ততঃ ছুদিনের জন্যেও বিয়োগের বেদনা হ'তে উন্মনা হ'য়ে থাকতে পাবে।

কলকাতায় গিয়ে ত লাবণ্য আহার নিদ্রা ভুলে যাবার যোগাড়। এই কালীঘাট, তারপর দক্ষিণেশ্বর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মনুমেন্ট, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, রাত্রে থিয়েটার বায়স্কোপ কার্ণিভ্যাল কিছুই দেখতে বাকী রইল না। এখানকার সবই লাবণ্যের কাছে নূতন নূতন বিস্ময়— অসংখ্য সৌধশ্রেণী, দোতলা বাড়ীর মত দোতলা বাস, তার ছুঁয়ে সবুজ রংয়ের জোড়া জোড়া গাড়ী যাতায়াত করছে, এমন কি পথে পথে ব্যস্ত জনতাও লাবণ্যের কাছে অচিন্ত্য। এতগুলো লোক এক সঙ্গে এক জায়গায় থাকে, একই বাতাসের নিশ্বাসে বেঁচে থাকে তা' লাবণ্য কি পূর্ব্বে কোনদিন ভাবতে পেরেছে !

কিন্তু এ অন্যমনস্ক-স্ফূর্ত্তির মেয়াদ মাত্র ছুদিন। লাবণ্যকে আবার গাঁয়ে ফিরতে হল। এসে মনে হল, ইস্ কি ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ, নিজের নিশ্বাস পড়া ছাড়া বুঝি আর কোন শব্দ শোনা যায় না, তারা ছুটিতে ছাড়া পৃথিবীতে যে আরও অনেক লোক বেঁচে আছে তাও বুঝি অনুমান করতে হয় স্বপ্নে।

বিলাস ঘুমিয়েছে। রৌদ্রময় নিস্পন্দ দ্বিপ্রহর। লাবণ্য বসে বসে কলকাতার দেখা নব অনুভূতি নিয়ে তন্ময় হয়ে ভাবছে। তার চোখের সামনে যেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল মনুমেন্ট, চিড়িয়াখানার জীবজন্তুরা, পথের জনতা ভিড় ক'রে এসে দাঁড়াল। অকস্মাৎ তার অর্দ্ধসুপ্ত শোক ঝড় উড়িয়ে এল, যেমন করে বৈশাখী আকাশে ঘনঘোর মেঘ আর উন্মাদ হাওয়া ছুটে আসে।

লাবণ্য ভাবতে লাগল, যদি খোকা বেঁচে থাকত সেও কি তার সঙ্গে কলকাতায় যেত না ! যেত বৈকি। দোতলা বাস্ দেখে খোকার আতঙ্কমিশ্রিত বিস্ময়ের চাহনি লাবণ্য ভাবতে চেষ্টা করলে। চিড়িয়াখানায় বাঘের খাঁচার সামনে খোকা হয়তো গাল ফুলিয়ে বলত, হালুম। বাঁদরের ঘরে গিয়ে বলত, উপ্, তলা খাবি ?

কলকাতায় ছুপুরের পথে খেল্না-ফিরিওয়ালার করুণ অদ্ভুত সুরের ডাকটি মনে পড়তেই লাবণ্যের চোখে একি—

ঝরঝরে রোদ, কোথাও একটুও মেঘ নেই, কিন্তু বৃষ্টির ছুটি ফোঁটা জল এল কোথা হ'তে !

শ্রীফণীন্দ্র পাল

সিন্ধু

শ্রীমান অজিতকুমার মিত্র

নীল নিরমল অতুলন তুমি ভীষণ বিশাল সিন্ধু !
আরতি থালায় প্রদীপ জালায় তারকা তপন ইন্দু !
গরবে ফুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া করিছ হরষে নৃত্য,
দেশ হতে দেশে বহিয়া দিতেছ কত বণিকের বিত্ত !
কত শত কালে কত শত যুগে বরিছ কত না রঙ্গে,
নীরদের মত তারা চ'লে যায় মহা-অতীতের অঙ্গে !
শত ভূধরের মধু সম বারি নিতেছনিঙাড়ি' বক্ষে,
সে মধু করিছ সঞ্চয় তব সুনীল সলিল কক্ষে !

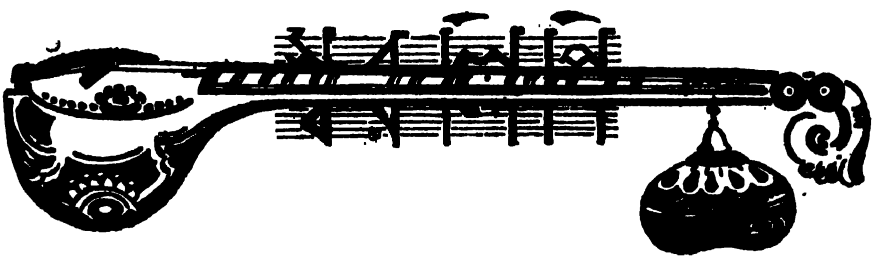
*　　　*　　　*
*　　　*　　　*

প্রভাতে প্রদোষে আলোকে আঁধারে আছাড়ি বিছাড়ি কুলছ !
কারে তুমি চাও তারে নাহি পাও, তাই কি সিন্ধু, ভুলছ ?
জগৎ-দেউলে জগৎ-দেবীর তুমি কি বিরাট কম্বু,
তাঁহারি আরতি কর দিবারাতি, গর্জ্জন-রত অম্বু ?
চিত্রা দেবীর চিত্রশালায় তুমি কি শ্রেষ্ঠ চিত্র,
তাই মহাকাল ঘিরিয়া ঘিরিয়া তোমারে করিছে নৃত্য ?
প্রভাতে তাই কি প্রভা দিয়ে দিয়ে প্রভাকর তোমা বন্দে ?
চন্দ্রমা রাতে হেসে দুলে নাচে ঢেউয়ে ঢেউয়ে শত ছন্দে ?
জগতের যত মাধুরী ও শোভা করে তব সেবা, সিন্ধু !
আরতি থালায় প্রদীপ জালায় তপন তারকা ইন্দু !

তুমি ক্ষণে ক্ষণে উঠিছ গরজি ফুঁসিয়া ফুলিয়া রুষ্ট,
গরবি, বিপুল ফেনের পুঞ্জে আপন গরবে পুষ্ট !
অন্তরে তব নাহিক অন্ত কেবলি সলিল পুঞ্জ,
তাহারি মাঝারে প্রবাল মুকুতা রচেছে মঞ্জু কুঞ্জ !
বাহিরে বিশাল সুনীল জলধি, মহিমায় ভরা চিত্র !
ছত্র ধরিয়া আছে মহাকাশ, মহাকাল তব মিত্র !
বিপদে আপদে নাহি কোনো ভয়, ডর না অশনি ঝঞ্ঝা,
'সাইক্লোন্' সাথে ঊর্ম্মি বাহুতে রুখে উঠে ধর পঞ্জা !
নাহি পরিচয় মহামারী ভয়, ভূমিকম্পের সঙ্গে,
আপনার মনে আলোড়ি বিলোড়ি খেলা করিতেছ রঙ্গে !

তোমার খেলার সাথী ক'রে তুমি কর যদি মোরে সঙ্গী,
আমিও শিখিব ও তব বিশাল নির্ভীক নটভঙ্গী !
বিপদে আপদে রহিব অটল, প্রলয়ের মাঝে হাস্‌ব,
তোমারি মতন চন্দ্র তপন তারকায় ভালবাস্‌ব !
বিশাল আকাশে দৃষ্টি থাকিবে, নীচে থাকিবেনা লক্ষ্য,
তোমারি মতন বিপুল বিমল হবে এ আমার বক্ষ !
জড়তা ঝরিবে কলুষ মরিবে শক্তি ভরিবে চিত্ত,
আলোড়ন-রত জলধির মত হ'তে চাই তেজোদৃপ্ত !
তাহারি মাঝারে স্নেহ করুণার মাধুরী প্রেমের পুঞ্জ !
প্রবাল মুকুতা দিয়ে গড়া যেন মনোহর কোনো কুঞ্জ !





হেমন্তিকা

চপল হাসি মিলালো তার,—আর ফোটে না শেফালিকা ;
মোহন ছাঁদে সোনার বসন পরেছে আজ হেমন্তিকা।
নিতুই বেলা-শেষের সাথে
ঘনায় বেদন আঁখিপাতে,
গগনকোণের আঙিনাতে কাঁপে সন্ধ্যাদীপের শিখা।
না জানি সে আকুল হ'ল না-দেখারি বাঁশীর স্বরে ;—
নিদ্রাহারা নিঝুম রাতে নীরবে তার অশ্রু ঝরে।
জানি, দখিন বাতাস আসি'—
ফুটাবে তার সলাজ হাসি,
বাঁশীর তানে যাবে ভাসি' বিষাদের ঐ যবনিকা॥

কথা—শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

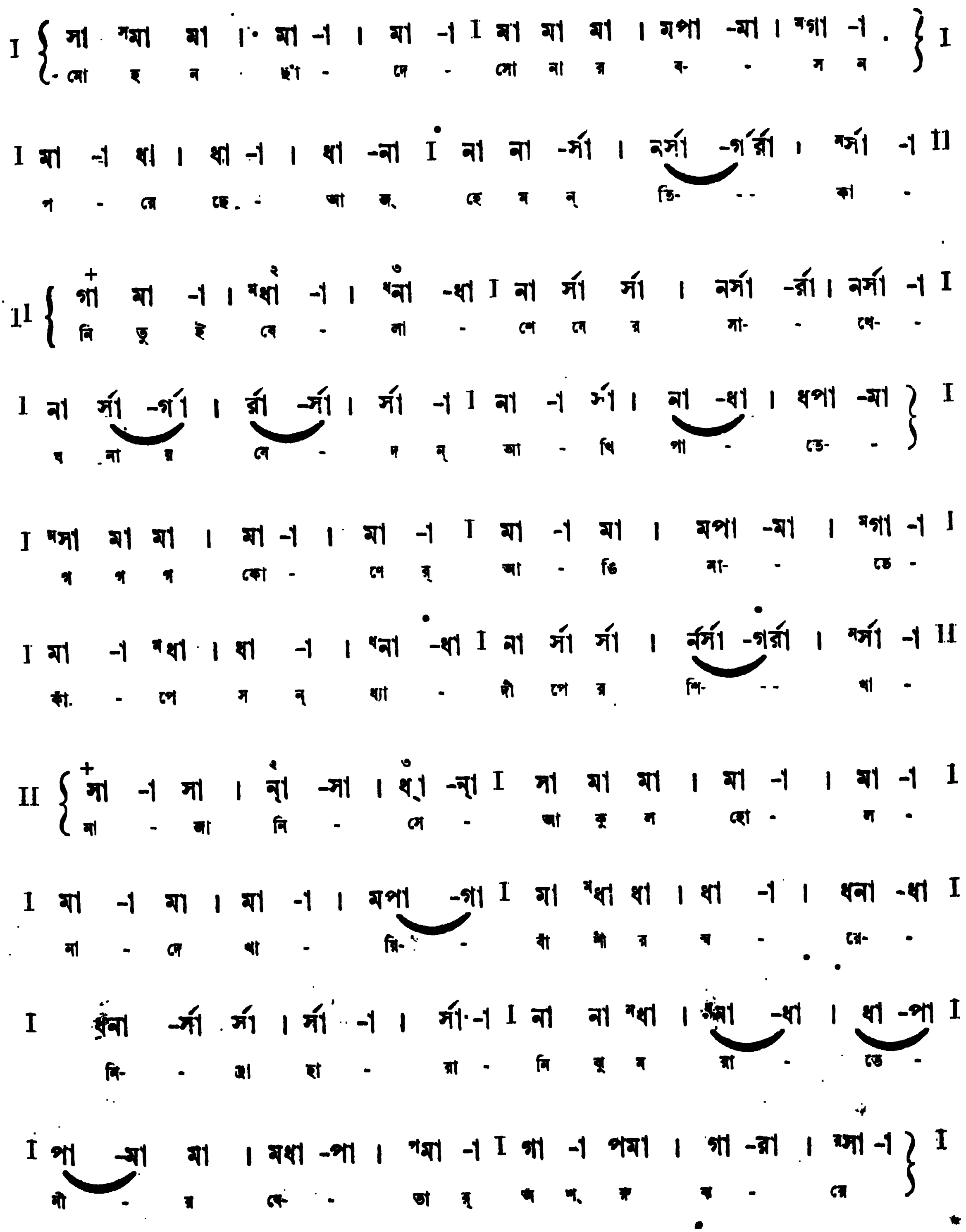
সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত সুরসাগর

রাগ হেমন্ত—তীব্রা

II র্সা র্সা র্সা । র্সা -া । র্সা -া I না না ধা । না -ধা । -মধা -নর্সা I
চ প ল হা - সি - মি লা লো তা - -- -র্

I র্সা র্সা র্সা । নর্সা -র্রা । র্সনা -র্সা I না না ধা । [illegible] -[illegible] । -পা -মা I
চ প ল হা- - সি - মি লা লো তা - - র্

I মা -া মা । মধা -পা । পমা -া I গা -া পমা । [illegible] -রা । সা -া
আ র্ ফো টে- - না - শে - ফা লি - কা -



I { মগা মা -া । মধা -া । ধনা -ধা I না র্সা র্সা । নর্সা -র্রা । নর্সা -া I
{ জা নি - ন - খি ন্ বা তা স আ- - সি- -

I না র্সা র্সর্গা । র্রা -র্সা । র্সা -া I না না র্সা । না -ধা । ধপা -মা } I
ফু টা বে তা - র - স লা জ হা - সি- - }

I মসা মা মা । মা -া । মা -া I মা -া মা । মপা -মা । মগা -া I
বাঁ শী র তা - নে - যা - বে ভা- - সি -

I মা -া মধা । ধা -া । ধনা -ধা I না -র্সা র্সা । নর্সা -র্গর্রা । নর্সা -া II II
বি - বা দে র্ ঐ - ব - ব নি- - - কা- -

হেমন্ত একটি নবগঠিত রাগ। ইহা ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব গঠন করেছেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিনের দেশ বাংলা;—কুমিল্লা জেলার শিবপুর নামক একটি নগণ্য গ্রামে (ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা'য় খাঁ সাহেবের বাড়ী ঢাকা জেলায় লেখা হ'য়েছে)। সামান্য বাদ্যকর শ্রেণীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও নিজের অতুলনীয় পরিশ্রম ও সাধনার বলে আজ আলাউদ্দিন খাঁ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ ব'লে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁর উপযুক্ত শিষ্য বিখ্যাত স্বরদবাদক শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে আমি এই নবগঠিত রাগটি পেয়েছি।

এই রাগের অবরোহীতে এমন একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, যা কোন প্রচলিতরাগ থেকে একে এত বিভিন্ন করেছে যে, একে একটি নূতন নামে নূতন রাগ ব'লে প্রচার কর্‌বার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে আমরা নিম্নে হেমন্ত রাগের একটি নাতিদীর্ঘ পরিচয় প্রসঙ্গ লিখ্‌লাম।

হেমন্ত রাগ বিলাবল্ ঠাট (সমস্ত স্বর শুদ্ধ) থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ অর্থাৎ আরোহণে পাঁচটি স্বর (র ও প বর্জ্জিত) ও অবরোহণে সাতটি স্বরই ব্যবহৃত হয়। এর বাদী মধ্যম ও সংবাদী ষড়জ। গান গাইবার সময় দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণই প্রশস্ত ব'লে মনে হয়।

আরোহাবরোহ স্বরূপ

সা গা, মা ধা না র্সা। র্সা না ধা পা, মা গা রা সা।

পকড় (যে বিশিষ্ট স্বর বিন্যাস দ্বারা রাগের পরিচয় পরিস্ফুট হয়)

গা মা ধা না র্সা, র্সা না ধা পা মা গপা মা গা রা সা।

এখানে আরেকটি কথা বলা বোধ হয় বাহুল্য হ'বে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি গানে (আধক ঘুমে নয়ন চুমে) হেমন্ত রাগের ছায়া সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন রাগরাগিণীর জাতি, আরোহী, অবরোহী, মেল, বাদী সংবাদী আলোচনা ক'রে যা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ নিজের স্বাভাবিক সুর-সৌন্দর্য্যবোধ-শক্তি দ্বারা সুরের বৈচিত্র্য প্রকাশ করতে গিয়ে অনেকটা প্রায় সেই জিনিষই গঠন করেছেন।

শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস—

—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম এ, বি-এল

১০

সার্জ্জেণ্ট রাডুব

আক্রমণকারী সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে রাডুব ভাঙনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই প্যারিসীয়ান ব্যাটালিয়নের অবশিষ্ট ছয়জনের মধ্যেও চারজন ইতিমধ্যেই হত হইয়াছে। "আমি প্রস্তুত" এই কথা উচ্চারণ করিবার পর রাডুব অগ্রসর না হইয়া বরং পিছাইয়া গেল। শুইয়া, সৈন্যগণের পায়ের ভিতর দিয়া, একরূপ হামাগুড়ি দিয়া সে পুনরায় ভাঙনের নিকট উপস্থিত হইয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল। ইহার অর্থ কি? এ কি পলায়ন? উহার মতো লোকের কি পলায়ন সম্ভব?

বাহিরে আসিয়া রাডুব ধূমে অন্ধপ্রায় নেত্রযুগল মার্জ্জনা করিল। এইমাত্র কক্ষমধ্যে যে ভীষণ দৃশ্য তাহার চক্ষুর্দ্বয়কে পীড়িত করিতেছিল যেন তাহার প্রতিবিম্ব সে অক্ষিগোলক হইতে মুছিয়া ফেলিতে চায়। নক্ষত্রালোকে সার্জ্জেণ্ট একবার দুর্গপ্রাচীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইল। তাহার মাথা নাড়ার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল সে যেন বলিতেছে, "না, ভুল করি নাই।"

রাডুব লক্ষ্য করিয়াছিল যে, দুর্গ-প্রাচীরের ফাটল উপর তলের একটা গবাক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এবং গোলার আঘাতে সেই গবাক্ষের লোহার গরাদগুলি ভাঙিয়া গিয়া নিম্নে ঝুলিতেছে। উক্ত গবাক্ষপথে ভিতরে প্রবেশ সম্ভব।

প্রবেশ সম্ভব, কিন্তু প্রাচীর বাহিয়া গবাক্ষ পর্য্যন্ত আরোহণ করা সম্ভব কি? একটা বিড়াল হয়তো ফাটলের দাগ ধরিয়া উঠিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে রাডুবও ছিল মার্জ্জার জাতীয়—লঘুদেহ, ক্ষিপ্রগতি, কর্ম্মপটু ব্যায়ামবীর।

সে হাত হইতে বন্দুক মাটিতে ফেলিয়া দিল, কোটও আগুরাখা খুলিয়া রাখিল, দুইটি পিস্তল কটি-বন্ধনীতে গুঁজিয়া দিল, আর একটি উন্মুক্ত কৃপাণ দন্তে চাপিয়া ধরিল। এইরূপে শরীর হইতে সকল অনাবশ্যক বোঝা সরাইয়া রাডুব নগ্নপদে অবলীলাক্রমে সেই ফাটা দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আক্রমণকারী সেনাদলের যাহারা এখনও ভাঙনের বাহিরে ছিল, তাহারা বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাডুব মনে মনে বলিল, "সৌভাগ্যক্রমে দ্বিতলে কোনো লোক নাই; নৈলে আমাকে এমনভাবে উঠ্‌তে দিত না।"

প্রায় চল্লিশ ফিট তাহাকে উঠিতে হইবে। ফাটল উপরের দিকে ক্রমশঃই সরু হইয়া আসিতেছে, সুতরাং আরোহণ কঠিনতর হইতেছে, এবং পতনাশঙ্কাও বাড়িতেছে।

অবশেষে সে গবাক্ষপার্শ্বে উপনীত হইল। ভগ্ন, দোদুল্যমান গরাদগুলি এক ধারে সরাইয়া, ডানহাতে একদিকের একটা ও বাঁ হাতে অপর দিকের একটা রেলিং ধরিয়া, চৌকাটের উপর জানু রাখিয়া বিশেষ চেষ্টায় নিজের দেহ উন্নমিত করিয়া সে গবাক্ষের ছিদ্রপথে ভিতরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল।

আর একটি লম্ফ দিতে পারিলেই সে দ্বিতলের কক্ষের মেঝেতে পৌঁছিতে পারে।

কিন্তু অন্ধকারে সহসা এক ভীষণ দৃশ্য রাডুবের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাডুব দেখিল, গবাক্ষমধ্যে বিকৃত মুখস-বৎ একখানা রক্তাপ্লুত বদন—তাহার একটি চক্ষু উৎপাটিত এবং গণ্ডাস্থি বিচূর্ণিত!

এই মুখস অবশিষ্ট চক্ষুদ্বারা রাডুবের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। ইহার দুইটি হাত ছিল। অন্ধকারে গবাক্ষের ছিদ্রপথে হস্ত প্রসারণ করিয়া সে একহাতে রাডুবের কটি-বন্ধস্থিত পিস্তল দুইটি এবং অপরহাতে তাহার দন্তধৃত তরবারীটি কাড়িয়া লইল।

রাডুব এইবার নিরস্ত্র। কার্ণিসের চালুতলে তাহার

জানু পিছলাইয়া গেল ; জানালার গরাদের উপর বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিতেছে ; নিম্নে অতলস্পর্শ গহ্বর !

এই মুখ ও হাত শাঁতিয়েন-হিবারের।

নিম্নতলের ধূমে প্রায় দম আটকাইয়া যাইবার মতো হইলে সে কোনক্রমে উপরে উঠিয়া আসিয়া এই জানালার ধারে বসিয়াছিল। বাহিরের বাতাসে তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল, শৈত্যসংস্পর্শে জমিয়া গিয়া তাহার রক্ত-স্রাব বন্ধ হইয়াছিল, এবং তাহার শারীরিক শক্তি কতকটা ফিরিয়া আসিয়াছিল। সহসা সে দেখিল গবাক্ষমধ্যে রাডুবের ছায়ামূর্ত্তি। ঝটিকার প্রাক্‌কালে প্রকৃতি যেমন শান্ত হয়, তেমনই শান্তভাবে সে রাডুবের অস্ত্র কাড়িয়া লইল। নিজেকে [নিরস্ত্র হইতে দেওয়া ভিন্ন রাডুবের উপায়ান্তর ছিল না। বাধা দিতে গেলে সেখান হইতে তাহার পতন অনিবার্য্য হইত।

এইবার এক অশ্রুতপূর্ব্ব দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল—নিরস্ত্রে ও আহতে। বিজয় মুমূর্ষুর করতলগত বলিয়াই বোধ হইল। একটি গুলির আঘাতই রাডুবকে নিম্নে গহ্বরে নিক্ষেপ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

রাডুবের সৌভাগ্যক্রমে পিস্তল দুইটাই শাঁতিয়েন-হিবারের এক হাতে ছিল। তাই পিস্তল ছুঁড়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। বাধ্য হইয়া তাহাকে তরবারীই ব্যবহার করিতে হইল। সে রাডুবের স্কন্ধে এক খোঁচা বসাইয়া দিল। রাডুব তাহাতে আহত হইল বটে, কিন্তু প্রাণে বাঁচিয়া গেল।

রাডুব নিরস্ত্র হইলেও তাহার শারীরিক শক্তির অপচয় ঘটে নাই। তরবারীর আঘাত সে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না। গবাক্ষের ভিতর দিয়া সে একেবারে শাঁতিয়েন-হিবারের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে শাঁতিয়েন-হিবার তরবারী ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে দুই পিস্তল লইল। রাডুব একেবারে পিস্তলের নলের মুখে। জানুর উপর ভর দিয়া সে রাডুবকে লক্ষ্য করিল। কিন্তু তাহার দুর্ব্বল হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল। সহসা সে পিস্তল ছুঁড়িতে পারিল না।

এই সুযোগে রাডুব উচ্চহাস্তে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল,—"বলি, ও বিরূপাক্ষ, তোমার এই ষাঁড়ের মাথা দেখে আমি ভয় পাব, মনে কর না কি ? ঈশ্, তোমার বদন-খানি যে একেবারে থেঁৎলে দিয়েচে !"

শাঁতিয়েন-হিবার রাডুবের প্রতি তাহার পিস্তল লক্ষ্য করিল।

রাডুব বলিতে লাগিল—"বলাটা হয়তো ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে, কিন্তু বাস্তবিক তোমার মুখখানি একেবারে ঝাঁঝরি করে' দিয়েচে। নাও, তোমার পিস্তলটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির ছুড়ে' ফেল।"

শাঁতিয়েন-হিবার পিস্তল ছুঁড়িল। গুলিটা রাডুবের কানের এক অংশ উড়াইয়া লইয়া গেল। তাহার প্রতি-দ্বন্দ্বী দ্বিতীয় পিস্তলটি উঠাইল, কিন্তু রাডুব তাহাকে আর লক্ষ্য স্থির করিবার অবকাশ দিল না। সে বলিল,—

"একটি কান হারাণোই যথেষ্ট। তুমি আমাকে দুইবার আঘাত করেচ। এখন আমার পালা।"

এই বলিয়া রাডুব শাঁতিয়েন-হিবারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং তাহার হাতে এমন জোরে আঘাত করিল যে, পিস্তলটা ছিট্‌কাইয়া পড়িল এবং আওয়াজ হইয়া গেল। সোঁ করিয়া গুলিটা একেবারে ছাদে গিয়া লাগিল। রাডুব দুই হাতে তাহার শত্রুর মুখটা ধরিয়া মোচড়াইয়া দিল। শাঁতিয়েন-হিবার যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। রাডুব পতিত শত্রুকে ডিঙাইয়া অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "থাকো, পড়ে' থাকো। নড়ো-চড়ো না। তোমাকে মেরে আর হস্ত কলঙ্কিত করতে চাইনে। এখন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াও ; পদতলই তোমার উপযুক্ত স্থান। মৃত্যু তোমার এল বলে'—তা'র থেকে আর তোমার পরিত্রাণ নেই। শীগ্‌গিরই বুঝ্‌তে পারবে, পাদ্রীরা এতদিন তোমাদের কি সব ভুল কথা শিখিয়েচে। যাও, কৃষক, সেই চির-রহস্ত-নিলয়ে প্রস্থান কর।"

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাডুব বলিয়া উঠিল, "কিছুই যে দেখ্‌তে পাচ্চি না।"

শাঁতিয়েন-হিবার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ও চীৎকার করিতে লাগিল। রাডুব ফিরিয়া বলিল, "চুপ, চুপ। দয়া করে' একটু চুপ ক'রো থাকো, সিটিজেন। তোমাকে নিয়ে মাথা

যাযাবার আমার আর সময় নেই। তোমাকে নিকেস করে' ফেল্‌তেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্চে। আমাকে একটু শান্তিতে থাক্‌তে দাও।"

তারপর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সে শাঁতিয়েন-হিবারের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল,—"এখন কি উপায় করি? আমি নিরস্ত্র। দুবার পিস্তল ছুঁড়বার মতো আমার বন্দোবস্ত ছিল; তুমি আমাকে তা' থেকে বঞ্চিত করেচ। বরঞ্চ যা ধোঁয়া উড়িয়েচ, তা'তে অন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়।"

এই সময়ে তাহার হস্ত আহত কর্ণটি স্পর্শ করিল। "উঃ" বলিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল। আবার বলিতে লাগিল,—

"আমার একটি কান বাজেয়াপ্ত করে' তোমার খুবই লাভ হয়েচে! যা হোক আর কিছু না গিয়ে যে আমার একটা কান গিয়েচে তা ভালই। কান ত দেহের শোভা মাত্র! আমার কাঁধটিও আঁচ্‌ড়ে দিয়েচ দেখ্‌চি—সেটা কিছুই নয় যদিচ। তোমাকে মার্জ্জনা করলেম, পল্লীবাসী! মর।"

রাড়ুব কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল। নীচে ভয়ঙ্কর কোলাহল। লড়াই প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

"বেড়ে মজা হচ্চে ওখানে," রাড়ুব বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বলিতে লাগিল। "রাজা দীর্ঘজীবী হোন্‌' বলে' কি চেঁচান-টাই চেঁচাচ্চে। বীরের মতোই ওরা মরচে—সেটা বল্‌তেই হবে।"

এই সময়ে ভূপতিত তলোয়ারখানা রাড়ুবের পায়ে ঠেকিল। সেখানা তুলিয়া লইয়া রাড়ুব শাঁতিয়েন-হিবারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যা হোক্‌, অন্ততঃ আমার তলোয়ার-খানা রেখেচ, যদিচ আমার পিস্তলগুলা পেলেই ভাল হ'ত। যাও, জাহান্নমে যাও, বুনো। আমি চল্লুম। এখানে থেকে আর কোনো ফল নেই।"

অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া সে হল ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। হঠাৎ মাঝখানের স্তম্ভের পশ্চাতে টেবিলের উপর কি একটা ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিল। রাড়ুব হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল সেগুলি বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের রাশি। আবশ্যকমতো ব্যবহারের জন্য অবরুদ্ধগণ ঐগুলি সঞ্চিত ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

"এযে একেবারে অস্ত্রাগার!" রাড়ুব বলিয়া উঠিল।

আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া সে যাহা পারিল দুই হাতে তুলিয়া লইল। এইরূপে সশস্ত্র হওয়াতে সে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। টেবিলের পশ্চাতে সিঁড়ির দ্বার তাহার চোখে পড়িল। ওদিক দিয়া উপরে ও নীচে যাওয়া যায়। রাড়ুব দ্বারপথে দুইবার পিস্তল ছুঁড়িল; এবং উপর্য্যুপরি কয়েক-বার বারুদভরা বন্দুকও আওয়াজ করিল। তারপর বজ্র-নির্ঘোষে চীৎকার করিয়া উঠিল, "প্যারিসের জয়!"

অতঃপর আরও বড় একটা বন্দুক হাতে লইয়া সিঁড়ির দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অবরুদ্ধগণের মনে হইল, তাহারা পশ্চাৎ হইতে একদল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। রাড়ুবের বন্দুকের গুলিতে দুইজন নিহত হইল। এই অতর্কিত আক্রমণে উহারা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

মার্ক্‌ইস বলিলেন, "উহারা উপরতলায়।"

এই কথায় দুর্গবাসীগণ প্রতিরোধ-প্রাচীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্তের মতন সোপানাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। মার্ক্‌ইস্‌ তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। "শীগ্‌-গির, চট্‌পট! এবার আমরা সব তেতালায় উঠে যাচ্চি; সেখানে আবার লড়াই সুরু হবে।" তিনি সর্ব্বশেষে প্রতি-রোধ-প্রাচীর পরিত্যাগ করিলেন। এই সাহসিক কার্য্যে তাঁহার প্রাণরক্ষা পাইল।

সোপানশীর্ষে দণ্ডায়মান রাড়ুবের বন্দুক, প্রথমে যাহারা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল, তাহাদেরই মুখের উপর অগ্নি উদগীরণ করিল। তাহারা পড়িয়া গেল। মার্ক্‌ইস ইহাদের মধ্যে থাকিলে তিনিও নিঃসন্দেহ নিহত হইতেন।

রাড়ুব আর একটি অস্ত্র তুলিয়া লইবার পূর্ব্বেই উহারা তাহাকে অতিক্রম করিয়া তেতালায় উঠিয়া গেল। মার্ক্‌ইস সকলের পশ্চাতে। তাহারা মনে করিয়াছেন, দ্বিতল শত্রুপূর্ণ। এই ত্রিতলেই লৌহদ্বার এবং গন্ধকাপ্লুত পলিতা। এইখানে তাহারা হয় আত্মসমর্পণ করিবে, নয় প্রাণ দিবে।

সিঁড়ির দিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া দুর্গবাসীগণের

মতো গভেনেরও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ঐ দিক হইতে কিরূপে সাহায্য আসিল, সে তাহা বুঝিতে পারিল না। বুঝিবার আর চেষ্টা না করিয়া সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল। প্রতিরোধ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অনুবর্ত্তীগণসহ সে পলায়িতগণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দ্বিতলে উপনীত হইল। সেখানে রাড়ুবের সহিত তাহার সাক্ষাৎ।

সার্জ্জেণ্ট অভিবাদন করিয়া বলিল, "কমাণ্ডেণ্ট, এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি এটা করেচি। ডল্-এর কথা আমার মনে ছিল। আমি আপনারই পন্থা অবলম্বন করেচি। আমি শত্রুকে দুই আগুনের মধ্যে ফেলেচি।"

ঈষৎ হাসিয়া গভেন বলিল, "তুমি উপযুক্ত শিষ্য বটে।"

অন্ধকারে কিয়ৎকাল থাকার পর মানুষের চক্ষুও নিশাচর পাখীর মতো দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। গভেন দেখিল, রাড়ুব একেবারে রক্তমাখা। সে বলিয়া উঠিল, "একি! তুমি যে আহত, বন্ধু!"

"ও কিছু নয়, কমাণ্ডেণ্ট! একটা কান কম বা বেশী, তা'তে কি এসে যায়? একটা আঘাত আমি পেয়েচি, কিন্তু সেটা কিছুই নয়। জানালা ভাঙ্‌তে গেলে আঁচড়-টাচড় একটু লাগে বই কি! খানিকটা রক্ত গেচে, এই মাত্র।"

আক্রমণকারীগণ দ্বিতলে একটু অপেক্ষা করিল। একটা লণ্ঠন আনা হইল। সিমুর্দ্যান গভেনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাহাদের একটু পরামর্শ করা আবশ্যক। তাহারা শত্রুর অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত ছিল না। কে জানে, অবরুদ্ধগণ এই সোপান উড়াইয়া দিবার আয়োজন করিয়া রাখে নাই?

এক বিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল। শত্রুর আর পলায়ন সম্ভাবনা নাই। যাহারা নিহত হয় নাই, তাহারা একরূপ বাক্সের মধ্যে তালাবন্দী হইয়া রহিয়াছে বলিলেই হয়। ল্যান্টিনেক ফাঁদে আটকা পড়িয়াছে।

সুতরাং একটু থামিয়া চিন্তা করিবার কোনও আপত্তি ছিল না। ইতিমধ্যেই আক্রমণকারীগণের অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; আর বৃথা সৈন্যক্ষয়ে প্রয়োজন নাই। যত অল্পসংখ্যক সৈন্যের প্রাণ বিনিময়ে এই ব্যাপারটা শেষ করা যাইতে পারে, এখন তাহারই উপায় ভাবিয়া লওয়া আবশ্যক। শেষ সংঘর্ষটা নিশ্চয়ই খুব গুরুতর হইবে।

ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত হইল। নিম্নতল ও দ্বিতল অধিকার করিয়া আক্রমণকারীগণ তাহাদের অধ্যক্ষের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। গভেন ও সিমুর্দ্যান পরামর্শ করিতেছে। রাড়ুব নীরবে তাহাদের আলোচনা শ্রবণ করিতেছিল। অবশেষে সসঙ্কোচে সে পুনরায় সামরিক প্রথায় অভিবাদন জানাইয়া বলিল,—

"কমাণ্ডেণ্ট?"

"কি, রাড়ুব?

"আমি একটা পুরস্কার চাইতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই। বল, কি চাও?"

"আমি সর্ব্বাগ্রে সোপানারোহণের অনুমতি প্রার্থনা করি।"

তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। আর, অনুমতি না দিলেও সে তাহাই করিত।

১১

নৈরাশ্য

দ্বিতলে যখন এই পরামর্শ চলিতেছিল, অবরুদ্ধগণ তখন ত্রিতল সুরক্ষিত করিবার প্রয়াসে ব্যাপৃত ছিল। মানুষ জয়ে উদ্দাম এবং পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। নিম্নতলে আশার উৎসাহ ও উত্তেজনা; আর উপরিতলে নৈরাশ্য— স্থির, গভীর, মর্ম্মান্তিক নৈরাশ্য। নিরাশাও আশার মতোই —বুঝি তার চেয়েও অধিক—কর্ম্ম-প্রণোদক।

অবরুদ্ধগণ তাহাদের শেষ আশ্রয়স্থল সেই তেতোলার কক্ষে উপনীত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রবেশ-পথটি আটক করিবার চেষ্টা পাইল। দরজা তালাবদ্ধ করিয়া ফল নাই। তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় রুদ্ধদ্বার অপেক্ষা যাহাতে শত্রুপক্ষের প্রবেশ নিবারিত হয়, অথচ তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের কোনো অসুবিধা না ঘটে, সোপানমুখে সেইরূপ বাধা স্থাপন করাই ছিল বেশী আবশ্যক।

ইমানুস গন্ধকমাখা পলিতার নিকট যে মশাল প্রোথিত

করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আলোকে কক্ষটি আলোকিত হইয়াছে।

কক্ষমধ্যে একটা বৃহৎ গুরুভার ওক্‌কাঠের সিন্দুক ছিল। এই সিন্দুকটি টানিয়া আনিয়া তাহারা সোপানের দ্বারপথে খাড়া করিয়া স্থাপিত করিল। তাহাতে দরজাটি প্রায় বন্ধ হইয়া গেল; কেবল উপরে খানিকটা ফাঁক রহিল। এই ফাঁক দিয়া শত্রুগণ যে একে একে প্রবেশের চেষ্টা করিবে তাহা সম্ভব নহে। কেন না এরূপ প্রচেষ্টার সুনিশ্চিত পরিণাম—মৃত্যু।

প্রবেশ-পথ আটক করিয়া তাহারা একটু দম লইবার অবকাশ পাইল। একবার তাহারা নিজেদের গণনা করিয়া দেখিল, উনিশ জনের মধ্যে সাতজন অবশিষ্ট আছে। ইমানুস তাহাদের মধ্যে একজন। মার্ক্‌ইস্ ও ইমানুস্ ভিন্ন আর সকলেই আহত। আহত হইলেও তাহারা অকর্ম্মণ্য হয় নাই।

তাহাদের বারুদ্ ফুরাইয়া গিয়াছে। কার্ত্তুজের বাক্স খালি। গুণিয়া দেখিল, মোটে আর চারটি অবশিষ্ট আছে।

তাহারা এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, যেখান হইতে পতন অনিবার্য্য। অতলস্পর্শ গহ্বর তাহার কালো করাল বদন বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আক্রমণকারীগণ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে,—খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল।

পলায়নের কোনো পথ নাই। লাইব্রেরীর ভিতর দিয়া? মালভূমিতে ছয়টি তোপ সজ্জিত;—প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে গোলন্দাজগণ দণ্ডায়মান। উপরের কুঠুরী দিয়া? কি লাভ তাহাতে? টাওয়ারের উপরে চড়িয়া তারপর সেখান হইতে লাফাইয়া পড়া ভিন্ন আর তো উপায় থাকিবে না।

হোমারের কাব্যে কীর্ত্তিত মহাবীরগণের মতো এই উনবিংশ বীরপুরুষের অবশিষ্ট সপ্তক বুঝিতে পারিল এইবার তাহারা পুরু প্রাচীরের আবেষ্টনের মধ্যে বন্দী, যদিও তাহারা এখনও ধৃত হয় নাই।

মার্ক্‌ইস্ বলিলেন, "বন্ধুগণ, সব শেষ!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "গ্রাণ্ড-ক্রান্থুর! আবার একটু পাদ্রীর কাজ কর।"

সকলে জপমালা হস্তে নতজানু হইল। সিঁড়ির উপর বন্দুকের গোড়ালীর খট্ খট্ শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

রক্তাপ্লুতশির গ্রাণ্ডক্রান্থুর দক্ষিণ হস্তে ক্রুশ তুলিয়া ধরিলেন। মার্ক্‌ইস্ ভিতরে-ভিতরে নাস্তিক হইলেও ক্ষিতিতলে জানু ন্যস্ত করিলেন।

গ্রাণ্ডক্রান্থুর বলিলেন, "প্রত্যেকে উচ্চৈঃস্বরে নিজ নিজ পাপ স্বীকার কর। মনসেইনিয়ার, বলুন।"

প্রত্যুত্তরে মার্ক্‌ইস্ বলিলেন, "আমি নর-হত্যার পাপ করিয়াছি।"

হোইস্‌লার্ড বলিল, "আমি নর-হত্যার পাপ করিয়াছি।"

বাকী চারিজনেও এইরূপে পাপ স্বীকার করিল।

তখন গ্রাণ্ডক্রান্থুর বলিলেন, "পবিত্র ত্রিদেবের নামে আমি তোমাদিগকে পাপ হইতে মুক্তি দিলাম। তোমাদের আত্মার শান্তি হৌক্।"

"আমেন্," অপর সকলে উচ্চারণ করিল।

মার্ক্‌ইস্ বলিয়া উঠিলেন, "এইবার প্রাণ দেওয়া যাক্।"

ইমানুস বলিল, "এবং প্রাণ নেওয়া আরম্ভ করা যাক্।"

আক্রমণকারীগণ বন্দুকের গোড়ালী দিয়া সিন্দুকের উপর আঘাত করিতেছে।

পাদ্রী বলিলেন, "পরমেশ্বরকে চিন্তা কর। তোমাদের এখন আর কোন পার্থিব সম্বন্ধ নাই।"

"তা সত্য," মার্ক্‌ইস বলিলেন, "আমরা ত এখন সমাধিগর্ভে।"

সকলে মাথা নত করিয়া বুক চাপড়াইতে লাগিল। কেবল মার্ক্‌ইস ও পাদ্রী দাঁড়াইয়া রহিলেন। পাদ্রী চক্ষু নত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে; কৃষকগণ প্রার্থনা করিতেছে; মার্ক্‌ইস চিন্তা করিতেছেন। শত্রুপক্ষের বন্দুকের ক্রমাগত আঘাতে সিন্দুক হইতে আর্ত্তধ্বনি নির্গত হইতেছে। নৈরাশ্যের অবসাদে কক্ষ বিষণ্ণ গম্ভীর।

সেই মুহূর্ত্তে তাহাদের পশ্চাৎ হইতে সহসা কে যেন দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মনসেইনিয়ার, আমার কথা ঠিক নয় কি?"

স্তব্ধবিস্ময়ে সকলে ফিরিয়া চাহিল। প্রাচীর গাত্রে একটা নিষ্ক্রমণ পথ উন্মুক্ত হইতেছে।

উপর ও নীচের মধ্যবিন্দুতে কীলকবদ্ধ একখণ্ড প্রস্তর প্রাচীরের গায় বেশ খাপ খাইয়া মিশিয়া ছিল, কিন্তু একত্র প্রোথিত ছিল না। এইমাত্র তাহা ঘুরিয়া গেল, এবং তাহাতে দেওয়ালের মধ্যে দুইটি ফাঁক হইয়া পড়িল। একটি প্রস্তরখণ্ডের ডাইনে, অপরটি তাহার বামে। পথ সংকীর্ণ বটে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া একজন লোক বাহির হইয়া যাইতে পারে। অভাবিতরূপে উন্মুক্ত এই ছিদ্রপথের বাহিরে একটা ঘুরানো সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপ দেখা যাইতেছিল।

ছিদ্রপথে একখানা মুখ আবির্ভূত হইল। দেখিয়া মার্ক্‌ইস্ চিনিলেন—হালম্যালো।

মুক্তি

"হালম্যালো, তুমি না কি?" "আজ্ঞে হ্যাঁ, মন্‌সেইনিয়ার। এখন দেখলেন তো, এমন পাথরও আছে যা 'ঘুরে' যায়। আপনারা এখান থেকে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারেন। ঠিক সময়েই আমি এসেচি। কিন্তু আর দেরী করবেন না; শীগ্‌গির বেরিয়ে আসুন। দশমিনিটের মধ্যে আপনারা একেবারে গহন বনে পৌঁছে' যাবেন।

"পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্!" পাদ্রী বলিল।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "মন্‌সেইনিয়ার, আপনি আত্মরক্ষা করুন।"

মার্ক্‌ইস্ বলিলেন, "তোমরা সকলে আগে যাও।"

আবেটুরমো বলিলেন,—"মন্‌সেইনিয়ার, আপনাকে সকলের আগে বেরুতে হবে; আমি যাব সর্ব্বশেষে।"

মার্ক্‌ইস্ একটু কঠোর স্বরে বলিলেন, "এখন সদাশয়তা দেখাবার সময় নেই। তোমরা আহত; আমি আদেশ করচি, তোমরা পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচাও। শীগ্‌গির চট্‌পট্ এই ছিদ্রপথের সুযোগ নাও। ধন্যবাদ, হালম্যালো।"

আবেটুরমো জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনসেইনিয়ার, আমাদের কি ছাড়াছাড়ি হ'তে হ'বে?

"নীচে গিয়ে নিশ্চয়ই ছাড়াছাড়ি হ'তে হবে। একে একে পৃথক্ পৃথক্ গেলেই পলায়ন সম্ভব।"

"আমাদের পুনর্মিলনের কোনো স্থান মন্‌সেইনিয়ার ঠিক করে' দেবেন কি?"

"হ্যাঁ, পিঃারিগডেন অরণ্যের মধ্যে একটা পরিষ্কার জায়গা আছে, তোমরা সেটা জানো?"

"আমরা সকলেই জানি।"

"আগামী কল্য দ্বিপ্রহরে আমি সেখানে থাকব। যারা হেঁটে যেতে পারে তা'রা সকলেই যেন আমার সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করে।"

"সব্বাই সেখানে যাবে।"

"তারপর আমরা আবার নূতন করে যুদ্ধ আরম্ভ করব,"—মার্ক্‌ইস্ বলিলেন।

প্রস্তরখণ্ডটিকে ধাক্কা দিয়া হালম্যালো দেখিল উহা আর নড়িতেছে না। ছিদ্রপথ আর বন্ধ করা যাইবে না।

সে বলিল, "মন্‌সেইনিয়ার, শীগ্‌গির করুন; পথটা আমি খুলেছি বটে কিন্তু আর বন্ধ করতে পারচি না।"

দীর্ঘকাল অব্যবহার হেতু প্রস্তরটি তাহার কব্জির উপর একেবারে আট্‌কাইয়া গিয়াছে। আর উহাকে ঘুরাইয়া পূর্ব্ববৎ স্থাপন করা অসম্ভব।

হাল্‌ম্যালো বলিতে লাগিল, "মন্‌সেইনিয়ার, আমার আশা ছিল যে পথটা বন্ধ করে' যেতে পারব। তা' হ'লে নীলদলের লোকেরা এসে যখন আমাদের কাউকে দেখ্‌তে পেতনা, তখন তারা মনে করত আমরা বুঝি উড়ে' গেচি। কিন্তু পাথরটা ত আর নড়চে না। শত্রু এসে এই মুক্তপথ দেখ্‌তে পেয়ে আমাদের পিছু নেবে। কাজেই আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সব্‌বাই চটু ক'রে সিঁড়ির দিকে চ'লে আসুন।"

ইমানুস্ হালম্যালোর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "বন্ধু, এখান থেকে বনের ভেতর গিয়ে নিরাপদ হ'তে কতক্ষণ লাগ্‌বে?"

হালম্যালো জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের মধ্যে কেউকি খুব জখম হয়েচেন?"

সকলেই বলিল, "না।"

"তা' হ'লে পনেরো মিনিটই যথেষ্ট।"

ইমানুস্ বলিল, "বেশ। যদি শত্রুকে এখানে পনেরো মিনিটকাল আটকে রাখা যায়"—

"তা' হ'লে তারা আমাদের অনুসরণ ক'রেও ধরতে পারবে না।"

"কিন্তু," মার্কুইস বলিলেন, "তারা ত পাঁচ মিনিটের মধ্যে এখানে এসে উপস্থিত হবে। পুরানো সিন্দুকটা দিয়ে ওদের আর কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে। বন্দুকের কয়েকটা গুতোরই কাজ সাবাড় হয়ে যাবে। পনেরো মিনিট! কে তাদের পনেরো মিনিট ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবে?"

ইমানুস্ বলিল, "আমি রাখ্‌ব।"

"তুমি, গুজ্‌-লা-ক্রয়াণ্ট?"

"আজ্ঞে, মনসেইনিয়ার। আপনারা ছ'জনের মধ্যে পাঁচজনই আহত। আমার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগে নি।"

"আমার গায়েও লাগে নি," মার্কুইস বলিলেন।

"কিন্তু আপনি হচ্চেন আমাদের দলপতি। আমি একজন সামান্য সৈনিক। দলপতি আর সৈনিক এক নয়।"

"স্বীকার করি আমাদের কর্ত্তব্য পৃথক্।"

"না, মনসেইনিয়ার; আপনার এবং আমার কর্ত্তব্য একই—সে হচ্ছে আপনাকে রক্ষা করা।"

ইমানুস সঙ্গীগণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ভাইসব্ এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে শত্রুগণকে যতক্ষণ সম্ভব ঠেকিয়ে রেখে অনুসরণ করতে না দেওয়া। আমার শারীরিক শক্তি একটুও কমে নি। এখন পর্য্যন্ত আমার একবিন্দু রক্তপাতও হয় নি। সুতরাং, তোমরা যারা আহত হয়েচ, তাদের চেয়ে বেশীক্ষণ আমি শত্রুদিগকে বাধা দিতে পারব। তোমরা সকলেই পালাও। তোমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি সব আমাকে দিয়ে যাও। আমি তার সদ্ব্যবহার করব। আধঘণ্টাখানেক আমি তাদের ঠেকিয়ে রাখ্‌বই, তা' বলে' দিচ্ছি। গুলিভরা পিস্তল ক'টা আছে?"

"চারটে।"

"মেঝেতে এগুলি রেখে দাও।"

সকলেই তাহার কথা মতো কাজ করিল।

"উত্তম। আমি থাক্‌লাম—বাছাধনেরা আলাপ করবার লোক একজন পাবে। এইবার সরে' পড়—শীগ্‌গির।"

জীবন মরণের সমস্যা। ধন্যবাদ দিবার সময় নাই। করকম্পনের অবকাশ নাই।

"অচিরেই আমাদের আবার দেখা হবে," মার্কুইস বলিলেন।

"না, মনসেইনিয়ার; সে আশা আমি করি না—শীঘ্র তো নয়ই—আমার মৃত্যু আসন্ন।"

একে একে ছিদ্রপথে বাহির হইয়া তাহারা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সর্ব্বাগ্রে আহতেরা নামিল। এই সময়ে মার্কুইস্ তাহার পকেটস্থ নোটবুক হইতে পেন্‌সিলটি বাহির করিয়া সেই অচল প্রস্তরখণ্ডের উপর কয়েকটি কথা লিখিলেন।

হ্যালম্যালো বলিল, "মনসেইনিয়ার, আসুন; আর সকলেই চ'লে গেচে।" সেও সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল, মার্কুইস তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

ইমানুস সেখানে একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

১৩

হত্যাকারী

ইমানুস মেঝে হইতে দুই হাতে দুইটি পিস্তল উঠাইয়া লইয়া সোপান দ্বারের নিকটে সিন্দুকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

আক্রমণকারীরা অতর্কিত বিপদের আশঙ্কায় আশঙ্কিত ছিল—কি জানি পাছে অবরুদ্ধগণ বারুদস্তূপে আগুন ধরাইয়া দিয়া নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বিজেতৃদিগেরও ধ্বংস সাধন করে! সেইজন্য তাহারা এই শেষ আক্রমণ খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিচালনা করিতেছিল, প্রথম আক্রমণের উদ্দাম চাঞ্চল্য ইহাতে ছিল না। সিন্দুকটাকে তাহারা ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিতে পারে নাই, বোধ হয় পারিলেও তাহা করিত না। তাহারা বন্দুকের বাঁটের উপর্য্যুপরি আঘাতে সিন্দুকের তলদেশ ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল, আর সঙীনের খোঁচায় উহার উপরিভাগ সচ্ছিদ্র করিয়া তুলিয়াছিল। সোপানস্থিত লণ্ঠনের আলোক-রেখা ঐ ছিদ্রপথে কক্ষমধ্যে প্রসারিত

হইতেছিল। প্রবেশের পূর্ব্বে ছিদ্রের ভিতর নেত্রপাত করিয়া তাহারা কক্ষাভ্যন্তরের অবস্থা বিনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল।

ইমান্নুস দেখিতে পাইল একটি চক্ষু ছিদ্রপথে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। অমনি সেইদিকে লক্ষ্য করিয়া সে পিস্তল ছুড়িল। পিস্তল আওয়াজের সঙ্গেসঙ্গেই একটা ভীষণ আর্ত্তচীৎকার ইমান্নুসের কর্ণযুগলকে পরিতৃপ্ত করিল। গুলিটা সৈনিকের অক্ষিগোলকের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সৈনিক পশ্চাদ্দিকে সিঁড়ির উপর পড়িয়া গেল।

আর একটা বড় ছিদ্রের ভিতর পিস্তলের নল ঢুকাইয়া দিয়া ইমান্নুস যদৃচ্ছাক্রমে গুলি চালাইতে লাগিল। তাহাতে আক্রমণকারীদের অনেকে হতাহত হইল এবং অবশিষ্টেরা ঘুরানো সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিম্নে নামিয়া গেল। তাহা দেখিয়া ইমান্নুস্ মনে মনে বলিল, "যা হোক্, কতকটা সময় পাওয়া গেল।"

সহসা ইমান্নুস্ ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। একটা তরবারী একেবারে তাহার অন্ত্রমধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে। একজন সৈনিক হামাগুড়ি দিয়া সিঁড়ির উপর উঠিয়া সিন্দুকের অপর একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়া তরবারী ঢুকাইয়া তাহাকে আঘাত করিয়াছে। সাংঘাতিক্ আঘাত!

ইমান্নুস পড়িয়া গেল না। সে দন্তে দন্ত চাপিয়া বলিল, "উত্তম।"

তারপর সে কোনওরূপে গড়াইয়া গড়াইয়া লৌহ কবাটের নিকটে গিয়া উপনীত হইল। কবাটের পার্শ্বে মশাল তখনও জ্বলিতেছে। পিস্তল মাটিতে রাখিয়া সে দক্ষিণ হস্তে মশালটি তুলিয়া ধরিল, এবং বামহস্তে পেটের ক্ষত চাপিয়া ধরিয়া গন্ধকের পলিতায় মশাল সাহায্যে অগ্নি সংযোগ করিল।

পলিতা মুহূর্ত্তমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। ইমান্নুস হস্তস্থিত মশাল ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। উহা মাটিতে পড়িয়া জ্বলিতে লাগিল। ইমান্নুস আবার পিস্তল উঠাইল, এবং প্রদীপ্ত পলিতায় ফুৎকার দিতে লাগিল। অগ্নিশিখা ক্রমে পলিতা বাহিয়া লৌহ কবাটের নিম্ন দিয়া সেতুপ্রাসাদে পৌছিল।

আপনার দুঃসাহসিক কর্ম্মকুশলতা অপেক্ষাও এই পৈশাচিক কার্য্যে অধিকতর গর্ব্বানুভব করিয়া ইমান্নুস—হত্যাকারীতে পরিণত এই বীরপুরুষ—সস্মিত মুখে বলিল, "বেশ! আমার কথা ওদের খুবই মনে থাক্‌বে। আমি এই শিশুগুলির উপর প্রতিহিংসা নিচ্ছি, সে কেবল আমাদের সকলের আপনার শিশুটির—সেই আমাদের টেম্পল্ দুর্গের অবরুদ্ধ রাজাটির দুর্ভাগ্যের জন্য।"

১৪

ইমান্নুস্‌ও ধরা দিল না।

এই সময়ে সিন্দুকটা প্রবল ধাক্কা খাইয়া সশব্দে হলের ভিতর পড়িয়া গেল, এবং তরবারী হস্তে একজন লোক প্রবেশ করিয়া চেঁচাইয়া বলিল, "আমি রাডুব। কি তোমরা কর্‌বে কর। অপেক্ষা ক'রে ক'রে আমার বিরক্তি ধ'রে গেচে। যা হয় হবে, একজনের তো আঁত ফুড়ে' দিয়েচি। এখন তোমাদের সব্‌বাইকে আক্রমণ করলাম। আর কেউ আমার সঙ্গে আসুক্ আর নাই আসুক্, আমি এসে পড়েচি। ক'জন তোমরা?"

রাডুবই বটে। সে একাকী।

সোপানের উপর অনেকগুলি সৈন্য ইমান্নুস্ কর্ত্তৃক নিহত হইলে গভেন অন্যান্যদের লইয়া পিছাইয়া গিয়া সিমুর্‌্ডানের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছিল।

রাডুব আবার চেঁচাইয়া উঠিল, "আমি একা, তোমরা কজন?" নির্ব্বাপিত প্রায় মশালের স্তিমিতালোকে কক্ষাভ্যন্তর স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল না।

রাডুবের প্রশ্নের কোনো উত্তর আসিল না। সে অগ্রসর হইল। নিভিবার পূর্ব্বে মশালটা সহসা একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত কক্ষটাকে আলোকিত করিয়া তুলিল। প্রাচীর গাত্রসংলগ্ন একটি দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া রাডুব উহার নিকটবর্ত্তী হইল, এবং নিজের রক্তাপ্লুত বদনমণ্ডল ও আহত কর্ণটি উহাতে পরীক্ষা করিয়া বলিল, "কি বিচ্ছিরি ক'রে দিয়েচে!"

তারপর ফিরিতেই বিস্মিত হইয়া দেখিল হলটি একেবারে শূন্য।

"এখানে যে কেউ নেই! একটি প্রাণীও দেখ্‌চি না।"

তখন সেই ঘুরানো পাথরখানা এবং ছিদ্রপথের বাইরে সোপান শ্রেণীর উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল।

"হুঁ! এখন বুঝা গেল ব্যাপারটা! বনের ভেতর বেরিয়ে পড়বার গুপ্তপথ।" তারপর রাডুব উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "বন্ধুগণ, তোমরা সব এস। ওরা পালিয়েচে, উড়ে গেচে। পুরাণো কেল্লাটার দেওয়ালে ফাট ছিল, সেই ছিদ্র দিয়ে ব্যাটারা সরে' পড়েচে। নিশ্চয়ই শয়তান এসে ওদের উদ্ধার করেচে। একটি প্রাণীও নেই।"

পিস্তলের আওয়াজে তাহার বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল। একটা গুলি তাহার কনুই স্পর্শ করিয়া সম্মুখের দেওয়ালে গিয়া ঠেকিল।

"ওহো; এখানে কেউ যেন আছেন দেখচি," রাডুব বলিল। "কে এই শিষ্টাচারটি আমায় দেখালেন?"

কেহ জবাব দিল, "আমি।"

রাডুব চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। অন্ধকারে ইমানুসের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল।

"যাহোক, অন্ততঃ একজনকে আমি পেয়েচি। অন্যেরা সব পালিয়েচে, কিন্তু তুমি আর তা পারচ না ব'লে রাখ্‌চি।"

ইমানুস্ বিদ্রূপাত্মক স্বরে কহিল, "সত্যি না কি?"

রাডুব একপদ অগ্রসর হইয়া আসিল, বলিল—

"ওহে মাটির ওপর প'ড়ে আছ যে ওখানে—তুমি কে?"

"আমি হচ্চি সেই, যে তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের তুচ্ছ করে।"

"তোমার ডান হাতে কি?"

"একটা পিস্তল।"

"আর বাঁ হাতে?"

"আমার নাড়ীভুড়ি।"

"তুমি আমার বন্দী।"

"সাধ্য থাকে তো আমাকে আট্‌কাও।"

ইমানুস্ মাথা নত করিয়া আপনার অন্তিম নিঃশ্বাসের ফুৎকারে দহ্যমান পলিতার অগ্নিশিখা উস্‌কাইয়া দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে গভেন ও সিমুর্দান সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে হলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই প্রাচীর গাত্রের ছিদ্রপথটি দেখিতে পাইল। হলটি ও বাহিরের সোপানশ্রেণী তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। সোপানের পাদমূলে একটা পথ গিরিগহ্বরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। অবরুদ্ধগণ নিশ্চিতই পলায়ন করিয়াছে। ইমানুসকে তাহারা ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া দেখিল—সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। লণ্ঠন হস্তে গভেন আবর্ত্তিত প্রস্তরখণ্ডটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। এটার কথা সে অনেকবার শুনিয়াছে, কিন্তু এই কিংবদন্তী সে কোন দিনই বিশ্বাস করে নাই। চাহিয়া দেখিতে দেখিতে প্রস্তর খণ্ডের উপর পেন্সিলে লিখিত কয়েকটি কথার উপর গভেনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। লণ্ঠন নিকটে আনিয়া সে পড়িল, "আপাততঃ বিদায়, ভাইকাউণ্ট ল্যান্টিনেক।"

গেচাম্প্ তাহার অধ্যক্ষের পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। পলায়িতগণের পশ্চাদ্ধাবন নিরর্থক। সমস্ত প্রদেশ তাহাদের অনুকূল, ঝোপঝাড় জঙ্গল খদ গর্ত্ত গহ্বরের অবধি নাই। নিঃসন্দেহ তাহারা ইতিমধ্যেই বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে ধরিতে পারা অসম্ভব। এখন কি করা যায়? সংগ্রাম আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। গভেন্ ও গেচাম্প্ নিরাশাপূর্ণ দৃষ্টি ও বাক্য বিনিময় করিল। সিমুর্দ্দান্ গম্ভীরভাবে সব শুনিতে লাগিল, কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

"মইটা কি হল, গেচাম্প্?"—গভেন্ জিজ্ঞাসা করিল।

"কমাণ্ডেণ্ট্, মইটা আসে নি।"

"কিন্তু আমরাত দেখেছিলেম, রক্ষী পরিবৃত একটা শকট আস্‌ছে।"

গেচাম্প্ কেবল বলিল, "তাতে মই ছিল না।"

"কি ছিল তা' হলে?"

সিমুর্দ্দান বলিল, "গিলোটিন।"

১৫

চাবি এবং ওয়াচঘড়ি এক পকেটে রাখিতে নাই।

মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেক বস্তুতঃ বড় বেশী দূর যাইতে পারেন নাই। তবে তিনি সম্পূর্ণই আক্রমণকারীদের হস্ত-

বহির্ভূত এবং নিরাপদ হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি হ্যালম্যালোর অনুসরণ করিলেন।

সোপান শ্রেণী যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখান হইতে একটা সুড়ঙ্গ পথ খাদের ও সেতুর খিলানের পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তথা হইতে পথটি দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া একটি খাদের দিকে এবং অপরটি অরণ্যের দিকে চলিয়া গিয়াছে। নিবিড়ঘন জঙ্গলে এই বিসর্পিত-গতি পথটি সুগুপ্ত। ইহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

মার্ক্‌ইসের এখন কেবল সোজা সম্মুখের দিকে চলিয়া গেলেই হয়। ছদ্মবেশের অভাবে তাহাকে কোনো অসুবিধায় পড়িতে হইল না। বৃটেনীতে আসিয়া অবধি তিনি তাঁহার কৃষ্ণপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করেন নাই। এতদ্দেশে এই পোষাকেই তাঁহার সুবিধা ছিল।

সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া মার্ক্‌ইস্ এবং হ্যালম্যালো অপর পাঁচজনকে আর দেখিতে পাইল না। হ্যালম্যালো বলিল, "স'রে পড়্‌তে ওদের বেশীক্ষণ লাগে নি।"

মার্ক্‌ইস বলিল, "তাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর?"

"মন্‌সেইনিয়ারকে কি আমি ছেড়ে যাব।"

"নিশ্চয়ই। আমি তো তা' আগেই বলেছি। নিরাপদ হ'তে হ'লে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক পালাতে হবে। যেখানে দু'জনের যাওয়া সম্ভব নয়, সে খানেও একজন অনায়াসে চ'লে যেতে পারে। একসঙ্গে গেলে আমরা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তুমি আমার এবং আমি তোমার জীবনহানি ঘটাব।"

"এ অঞ্চল কি মন্‌সেইনিয়ারের পরিচিত?"

"হ্যাঁ।"

"মনসেইনিয়ার এখনো কি 'পিয়ারি গডেনে' গিয়ে মিলিত হ'তেই বল্‌চেন?"

"আগামী কল্য মধ্যাহ্নে।"

"আমি ঠিক যাব। আমরা সকলেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব।"

তারপর হ্যালম্যালো বলিল, "মনসেইনিয়ার, যখন আমি ভাবি যে, মুক্তসমুদ্রবক্ষে আমরা দু'জন একত্র ছিলেম, আমি আপনার প্রাণসংহারে উদ্যত হয়েছিলাম, আপনি আমার মুনিব—একথা বল্‌লেই সব চুকে যেত অথচ আপনি তা বলেন নি, তখন আমার মনে হয় আপনি কি আশ্চর্য্য লোক!"

মার্ক্‌ইস বলিলেন, "ইংলণ্ড! ইংলণ্ড ভিন্ন আর উপায় নাই। পনেরো দিনের মধ্যে ইংরাজদের ফ্রান্সে আসা চাই-ই।"

"মন্‌সেইনিয়ারকে আমার অনেক কথা বল্‌বার আছে। আমি হুকুম তামিল করেচি।"

"সে কথা কাল হবে।"

"তা হ'লে কাল পর্য্যন্ত বিদায়, মন্‌সেইনিয়ার।"

"ভাল কথা, তোমার কি খিদে পেয়েচে?"

"হয়তো, মনসেইনিয়ার। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছবার জন্য আমি এত ব্যস্ত হয়েছিলেম্ যে, আজ খেয়েচি কিনা সে কথা মনেই নেই।"

মার্ক্‌ইস তাহার পকেট হইতে এক টুকরা কেক্ বাহির করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ হ্যালম্যালোকে দিলেন এবং অপরার্দ্ধ নিজে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হ্যালমালো বলিল, "মন্‌সেইনিয়ার আপনার ডাইনে খদ বাঁয়ে বন।"

"উত্তম। এখন আমাকে ছেড়ে তুমি নিজের পথ দেখ।"

হ্যালম্যালো আদেশ মত কার্য্য করিল। অন্ধকারের মধ্যে সে দ্রুত অগ্রসর হইল। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত মার্ক্‌ইস লতাগুল্মের আলোড়ন শব্দ এবং শুষ্কপত্রের মর্ম্মর শুনিতে পাইলেন; তারপর সব নিঃশব্দ হইল। হ্যালম্যালোর পশ্চাদ্ধাবন করা অতঃপর আর সম্ভব ছিল না। এই বনটি বিপক্ষভয়ভীত ব্যক্তিগণের আত্মগোপনের বিশেষ অনুকূল। তাহাদের পলাইতে হয় না, তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। এই জন্যই ভেণ্ডি সাধারণ তন্ত্রের পক্ষে এমন দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল।

মার্ক্‌ইস্ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি কিছুতেই নিজেকে বিচলিত হইতে দেন না। কিন্তু এতক্ষণ পরে রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের বদ্ধ বায়ুর বাহিরে আসিয়া মুক্ত বাতাস নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিতে করিতে তিনি আর হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বিপদের চরম

সীমায় উপনীত হইয়া আবার মুক্তির স্বাদ পাওয়া, কবরের গহ্বরে চিরতরে সমাহিত হইতে হইতে তাহার কবল হইতে সহসা বহুদূরে অপসারিত হওয়া, এককথায় মৃত্যু হইতে জীবনে ফিরিয়া আসা—ল্যান্টিনেকের মতো লোকের পক্ষেও ইহার আঘাতটা অল্প নহে। বিপদে চিরাভ্যস্থ, অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে বহুবার পরীক্ষিত মার্ক্‌ইসও প্রথমটায় সুস্থির থাকিতে পারিলেন না।

মার্ক্‌ইস মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, তিনি একটু আনন্দিত হইয়াছেন। এরূপ আনন্দ তিনি অনেক দিন অনুভব করেন নাই। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে ভাব দমন করিলেন। পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন কয়টা বাজিয়াছে।

মোটে দশটা বাজিয়াছে দেখিয়া তিনি বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। জীবন-মরণের মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আসিয়া মানুষ সর্ব্বদাই দেখিয়া বিস্মিত হয় যে, ঐ ভীষণ মুহূর্ত্তগুলির স্থায়িত্বও সাধারণ মিনিটগুলির অপেক্ষা অধিক নহে। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে তোপের আওয়াজে যুদ্ধারম্ভ বিজ্ঞাপিত হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ৭টা ও ৮টার মধ্যে লা টুর্গ আক্রান্ত হয়—তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই ভীষণ দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম ৮টার সময় আরম্ভ হইয়া দশটার মধ্যেই শেষ হইয়া গেল! এই মহানাটক অভিনীত হইতে মোটে ১২০ মিনিট লাগিল! মহাপ্রলয়ও কখন কখন তড়িৎ গতিতে সম্পন্ন হয়। এমন আকস্মিক এবং এত দ্রুত সংঘটিত বলিয়াই উহার সংহার-লীলা এমন প্রচণ্ড।

একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহাই বরং আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে, সংগ্রাম এতক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছিল। এত অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষে এরূপ প্রবল সৈন্য-বাহিনীকে দুই ঘণ্টা ঠেকাইয়া রাখা এক অসাধারণ ব্যাপার।

কিন্তু এখন আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। হালম্যালো নিশ্চয়ই অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। আর অপেক্ষা করার প্রয়োজনও নাই। ঘড়িটা আবার ওয়েষ্টকোটের পকেটে রাখিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে যে পকেটে ছিল তাহাতে রাখিলেন না। কারণ তিনি দেখিলেন সেই পকেটে ইমানুস প্রদত্ত লৌহদ্বারের চাবিটা রহিয়াছে, কি জানি চাবিতে লাগিয়া ওয়াচের কাচ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। অতঃপর তিনি অরণ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি যখন বাম দিকে ফিরিলেন তখন তাঁহার বোধ হইল যেন চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্ধকার ক্ষীণ আলোকরশ্মিতে ঈষৎ বিদীর্ণ হইয়াছে।

মার্ক্‌ইস ফিরিলেন। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া খদের দিকে অনতিদূরে অত্যুজ্জ্বল বৃহৎ আলোক তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। তিনি সেই দিকে দ্রুত ধাবমান হইয়াই সহসা থামিলেন। তাঁহার মনে হইল এই আলোকে নিজকে প্রকাশিত করা তাঁহার পক্ষে নিরতিশয় নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে। যাহাই ঘটিয়া থাকুক, উহাতে তাঁহার কিছুই যায় আসে না। পুনরায় তিনি হালম্যালো প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিয়া অরণ্যাভিমুখে কতকটা অগ্রসর হইলেন।

লতাগুল্মের অন্তরালে লুক্কায়িত মার্ক্‌ইস সহসা মাথার উপরে এক ভীষণ আর্ত্ত চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিলেন। মনে হইল যেন এই শব্দ একেবারে মালভূমির প্রান্ত হইতে উত্থিত হইতেছে। মার্ক্‌ইস উপরের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী



বাউল কবি মনোমোহন

শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন

যে বাউল কবির সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা, আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় যে একেবারেই নাই, তাহা বোধ করি নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। তাহার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মনোমোহন যে গণ্ডীর মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, এবং উত্তরকালে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল; তাহা ছাড়া মাত্র বত্রিশ বৎসরেরও কম সময় তিনি জীবিত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন এক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার জন্ম।



বাউল কবি মনোমোহন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জীবনের আরম্ভ হইলেও সাধারণ বাঙ্‌লা লেখাপড়া ছাড়া দারিদ্র্য হেতু আজকালকার ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে কোনরূপ পরিচয় লাভের সুযোগ তিনি পান নাই। ইহাও হয়ত তাঁহার জীবদ্দশায় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার অন্যতম কারণ। মনোমোহন জীবিত কালেই পূর্ব্ব বঙ্গের, বিশেষতঃ ত্রিপুরার, ময়মনসিংহের দক্ষিণপূর্ব্ব ও ঢাকার পূর্ব্ব অঞ্চলের সাধারণ নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর সঙ্গে একেবারেই পরিচিত ছিলেন না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন শিক্ষিত বাঙালীও দুই একজন ছিলেন।

সাধারণ নিরক্ষর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মনোমোহন যে এতটা পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বাউল গানের জন্য। আজকাল তাঁহার গান পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি পল্লীর কৃষক ও নিম্নসম্প্রদায়ের এক অতি আদরের সামগ্রী। ঐ অঞ্চলের যে কোন পল্লীর রাস্তা-ঘাটে-মাঠে যেখানেই বাহির হই সেখানেই মনোমোহনের গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে শুনিতে পাই। সকাল বেলার মাঠে চলার পথে পথে কৃষকের কণ্ঠে, দ্বিপ্রহরের খরতাপ-ক্লিষ্ট বটের ছায়ায় ছায়ায় রাখালের বাঁশীতে, সন্ধ্যার ক্লান্ত নদীর ধারে ধারে মাঝিদের আবেশমাখা স্বরে, পথশ্রান্ত উদাসী বাউলের একতারার তারে তারে মনোমোহনের গান সকল সময়ই ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

সাধারণের অতি আদরের মনোমোহনকে আজ শিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় করাইবার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা। মনোমোহনকে অনেক দিক দিয়াই বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রবন্ধে আমরা বাউল মনোমোহনকেই বুঝিবার চেষ্টা করিব। ভবিষ্যতে মনোমোহনের সাধনার বিস্তৃত আলোচনা হইবে বলিয়া আশা করি। সকল স্বাধীন দেশের ইতিহাসেই দেখিতে পাই সেখানকার মনীষিবৃন্দ তাঁহাদের দেশের অখ্যাত-অজ্ঞাত বহুদিন-বিস্মৃত সাধক, জ্ঞানী, কবি ও শিল্পীদের সাধনার ইতিহাস আবিষ্কার করিবার গবেষণায় কত চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশেও সে চেষ্টার কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। ইহা যে আনন্দের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে কত গাথা, কত গান, কত যুগের

ইতিহাস ও মর্ম্মের কথা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান ত আমাদেরই করিতে হইবে।

মনোমোহন সম্পূর্ণ বত্রিশ বৎসরও আমাদের সঙ্গে বাস করিয়া যাইতে পারেন নাই, অথচ এই স্বল্প পরিমিত জীবনে তিনি যে অমৃতের স্বাদ পাইয়াছিলেন এবং যাহা কিছু আমাদিগকে বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। বয়সের বন্ধনে ত মহাপুরুষরা কোন দিনই ধরা দেন না, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। সত্য-সন্ধানীরা কোন কালেই একদিনে পৃথিবীর হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। দিনের পর দিন চলিয়া গিয়াছে, যুগের পর যুগ আসিয়াছে গিয়াছে, হয়ত এমন করিয়া কত শতাব্দীর পর তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয় ঘটিয়াছে। জীবিত কালে মনোমোহন সরল বিশ্বাসী নিরক্ষর লোক ছাড়া কাহারো মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার তিরোধানের মাত্র বিশ বৎসর গত হইতে না হইতেই তাঁহার গানের এতটা প্রচার হওয়ায় বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইতে হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগে শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে ক্রমশঃ বাউল গান এতটা দূরে সরিয়া গিয়াছে যে তাহার সত্য স্বরূপটা আমরা এখন নির্ণয় করিতে পারি না। অথচ বাউল গান যেরূপ ও রসের সৃষ্টি করে তাহার আবেদন অন্য শ্রেণীর উচ্চাঙ্গের গানের আবেদনের চাইতে কোন অংশেই কম নয়। Classical music সাধারণ চাষাভূষা নিরক্ষর লোকের প্রাণ সকল সময় স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু বাউল গানের এমনি মোহিনী শক্তি যে, আপামর সকল লোকই ইহাতে তৃপ্তি পায়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বাউল গানে সুরের সারল্যের সহিত ভাবের প্রাধান্য এক অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আজকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালী পুনরায় বাউল গানের স্বাদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। Variety entertainment, charity performance প্রভৃতি গানের বৈঠকে বা জলসায় বাউলের সুর শুনিতে পাই। এ যুগের কবিদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ যে বাউল গানের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বাঙালীর শিক্ষিত সমাজে এক নূতন জিনিষ। এমন করিয়াই দিনে দিনে বাউল গান আবার আমাদের সমাজে আদৃত হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়।

২

মনোমোহন বাঙ্‌লা ১২৮৪ সনের ১০ই মাঘ ত্রিপুরা জিলার সাতমুড়া নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন এবং উক্ত গ্রামেই বাঙ্‌লা ১৩১৬ সনের ২০শে আশ্বিন মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাথ দত্ত এবং মাতার নাম হরসুন্দরী। দত্ত মহাশয় নিতান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ, মিষ্টভাষী, সরল, অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। পদ্মনাথ পিতৃপুরুষ হইতে বিশেষ সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু যৌবনে ঘটনাচক্রে সমস্ত হারাইয়া সামান্য কবিরাজী ব্যবসার দ্বারা বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিপালন করিতেন। বাঙ্‌লা ১৩০৯ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইরূপ কথিত আছে যে, পদ্মনাথ মৃত্যুর সাতদিন পূর্ব্বে মরণের নির্দ্দিষ্ট কথা বলিয়া, সকলকে নিকটে ডাকিয়া, সুস্থ দেহেই যোগাসনে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ষাটের কাছাকাছি হইয়াছিল।

মনোমোহন পদ্মনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি যখন ৩।৪ বৎসরের শিশু সেই সময় ত্রিপুরা জিলার কালীকচ্ছ গ্রাম নিবাসী সাধক আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয় তাঁহার এক শিষ্য বাড়ীতে সাতমুড়া গ্রামে আগমন করেন। সাধক আনন্দচন্দ্র ঐ অঞ্চলের সাধারণের নিকট আনন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে অনু-প্রাণিত হইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং আজীবন কঠোর সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রভূত বিত্তের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু অতিশয় দীনভাবে জীবন যাপন করিতেন। তিনি ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এবং কথিত আছে ত্রিকালজ্ঞের ন্যায় আপামর সকলের রোগ শোকের উপশম করিতে পারিতেন, এবং প্রত্যক্ষ দর্শনে সকলের ভূত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান বলিয়া দিতে পারিতেন। ইহা শুনা যায় যে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে শতাধিক লোক তাঁহার ব্রাহ্ম-মন্দিরে বিপদ, সম্পদ, রোগ,

শোক, মোকদ্দমা, অসুখ, অশান্তি এইরূপ নানাপ্রকারের বিষয় লইয়া উপস্থিত হইত। তিনি বহুদিন হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম অঞ্চলে একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার, অতিশয় ধার্ম্মিক, ত্যাগী এবং দাতা বলিয়া আপামর সকলের মন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতার সকল সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশী আন্দোলনের সময় কালীকচ্ছে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি মহেন্দ্রচন্দ্রকে বাঙ্‌লার ঋষি টলষ্টয় আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

আনন্দ স্বামী মহাশয় সাতমুড়া গ্রামে পদার্পণ করিলে হরসুন্দরী মনোমোহনকে সঙ্গে নিয়া তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যান। ঐ সময়েই মনোমোহনের ধর্ম্ম-জীবনের সূচনা হয়। পদ্মনাথ বহুদিন ধরিয়া শূলরোগে ভুগিতে-ছিলেন। কোন প্রকারেই ঐ রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া তিনি আনন্দস্বামীর শরণাপন্ন হন। তাঁহার কৃপায় তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহার অতিশয় ভক্ত হইয়া পড়েন। পরে, দুঃখে বা কোনরূপ বিপদে পড়িলেই তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। এইভাবে অতি শৈশব কাল হইতেই মনোমোহন এত বড় একজন মহাপুরুষের স্পর্শে আসেন এবং উত্তরকালে তাঁহার নিকটই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মনোমোহন পাঁচ বৎসর বয়সে গ্রামের ইস্কুলে যাতায়াত সুরু করেন এবং ঐ ইস্কুল হইতেই ত্রয়োদশবর্ষে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগড়তলার ইংরাজী ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াও অর্থাভাবে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কিছুদিন পর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি মোক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু যিনি উত্তরকালে ভগবানের প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহার জীবন এই স্বার্থ কুটিলতা বিজড়িত সামান্য ব্যবসায়ে অতিবাহিত হইতে পারে না। তাই দেখিতে পাই মোক্তারী পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য্য হইলেন। কি ভাবে অকৃতকার্য্য হইলেন তাহা পরে বিবৃত করিতেছি। ইহার পর হইতেই তাঁহার জীবনে এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়।

মনোমোহন অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। সামান্য লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়াও তিনি মোক্তারী অধ্যয়ন করিবার সময় গীতা, বেদ, পুরাণ, কোরাণাদি সকল ধর্ম্মগ্রন্থের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়া উঠেন। মোক্তারী পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি ঢাকা রওয়ানা হইয়া পথে একজন মৌলবীর সঙ্গে সারাদিন ধর্ম্ম প্রসঙ্গে এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়েন যে, পরদিন পরীক্ষার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। সন্ধ্যাকালে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার পিতার নিকটে সমস্ত জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই ভাবে তিনি মোক্তারী পরীক্ষায় বিফল-মনোরথ হন। কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া কিছুদিন পর তিনি আগড়তলায় স্বাধীন ত্রিপুরার ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য বাড়ী হইতে রওয়ানা হন। আগড়তলার নিকটবর্ত্তী হইলেই দেখিতে পাইলেন সামান্য অপরাধে সেখানকার একজন উকীল রাজ আদেশে নির্ব্বাসিত হইতেছেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। উপর্য্যুপরি এই ভাবে জীবনের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি ভাবিতে ভাবিতে কালীকচ্ছে তাঁহার গুরুর নিকট সকল দুঃখ নিবেদন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে তিনি ভগবানের প্রেম ও প্রীতিলাভের জন্য অত্যন্ত আত্মহারা হইয়া পড়েন।

এই সময় হইতেই মনোমোহন গুরুর আদেশে যখন যাহা মনে আসিত তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং এই ভাবেই ক্রমে তাঁহার মধ্যে কবিত্ব শক্তির সঞ্চার হয়। তিনি যাহা যাহা রচনা করিতেন মাঝে মাঝে গুরুকে তাহা পড়িয়া শুনাইতেন। বাঙ্‌লা ১৩০৭ সনে আনন্দস্বামী মহাশয় দেহত্যাগ করেন। মনোমোহন ১৩০৮ সনে বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সৌদামিনী। সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ হইয়া পড়ায় বিবাহের কিছুদিন পরেই বাড়ীর সকলের একান্ত ইচ্ছানুসারে মনোমোহন চাকুরীর উদ্দেশে বাহির হন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে ঘুরাঘুরি করিয়াও কোনপ্রকার সুবিধা করিতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে

তাঁহার ন্যায় সরল ও বিশ্বাসী লোককে বিদেশে নানাপ্রকার কুচক্রী লোকের চক্রান্তে পড়িয়া নিতান্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। এমন কি সমস্ত সম্বল হারাইয়া কোনপ্রকারে বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃশোক উপশমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনোমোহন নিজের ফুলবাগানের বিল্বমূলে একটী বেদীর মত উচ্চাসন করিয়া তাহাতে ভগবদারাধনায় ব্রতী হইলেন এবং নাম জপ, ধ্যান ধারণা, কীর্ত্তনাদিতে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই ফুলবাগানই পরে আনন্দাশ্রম নামে বিখ্যাত হইয়া উঠে। ইহা এখন বহু দর্শকের পরম আকাঙ্ক্ষার স্থান বলিয়া পরিগণিত।

এইভাবে কিছুদিন কাটিল, কিন্তু সাংসারিক অভাব অনটনে মনোমোহন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কোনরূপ ঠিক করিতে না পারিয়া তিনি চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। চট্টগ্রাম বহু মুসলমান ফকির দরবেশের স্থান। তাঁহাদের অনেকের সংস্পর্শে আসিয়া মনোমোহন সান্ত্বনা লাভ করিলেন। চাকুরী করা তাঁহার আর হইল না, প্রায় একবৎসর পরে আবার নিজগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া স্থায়ীভাবে আপনার আশ্রমে সাধনায় মগ্ন হন এবং পরে এইখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। এই ফুলবাগান জনশূন্য ছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে শত শত লোক আসিয়া ইহাকে জনাকীর্ণ করিয়া তুলিল।

ঐ সময়েই ত্রিপুরার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামনিবাসী বাউল-শ্রেষ্ঠ প্রেমিক, প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশী-বাদক ওস্তাদ আপ্তাবদ্দিন তাঁহার শূলরোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য লোকমুখে মনোমোহনের অসাধারণ ক্ষমতা অবগত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহার কৃপায় আপ্তাবদ্দিন দুরারোগ্য রোগের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বহুদিন আপ্তাবদ্দিন এই সময় মনোমোহনের সঙ্গে কাটাইয়াছিলেন। মনোমোহন সাধনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সব গান রচনা করিতেন প্রিয়-ভক্ত আপ্তাবদ্দিন তাহা সুরতান লয় যোগে গান করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন। মনোমোহনের সহস্রাধিক গানের প্রায় সকলগুলির সুরই আপ্তাবদ্দিনের দেওয়া।

ওস্তাদ আপ্তাবদ্দিন আরোগ্য লাভ করিলে কিছুকাল পর উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে কোনও আত্মীয়ব্যক্তির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া মনোমোহন গ্রামান্তরে গমন করেন। সেখানে কোনও দুষ্টব্যক্তি হিংসাপরবশ হইয়া দুগ্ধের সহিত এক প্রকার বিষ মিশ্রিত করিয়া গুপ্তভাবে তাঁহাদিগকে পান করিতে দেয়। এই বিষপানজনিত দুর্ব্বিষহ জ্বালা যন্ত্রণায় মনোমোহন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়েন এবং তাঁহার শিষ্য আপ্তাবদ্দিন প্রভৃতি সকলে পাগল হইয়া যান। প্রায় দেড় বৎসর পর তাঁহারা সকলেই সুস্থ হইয়া উঠেন। এই ঘটনার পর মনোমোহন জীবনের অবশিষ্ট কাল বাড়ীতেই ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করেন। প্রিয় শিষ্য আপ্তাবদ্দিন এই সময় তাঁহার নিকটে থাকিতেন এবং তাঁহার সমস্ত গানগুলির প্রচারকল্পে পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

বাঙ্‌লা ১৩১৬ সনের ২০শে আশ্বিন প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়সে মনোমোহন দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আলমারীতে ১৯।২০ খণ্ড হাতের লেখা বই পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে মলয়া, তপোবন, উপবন, নির্ম্মাল্য প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সহস্রাধিক গান লিখা ছিল এবং সত্য-শতক, প্রেম ও প্রীতি, পথিক, আলেয়া, ময়না বা পাগলের প্রলাপ, যোগপ্রণালী, পাথেয় বা সঙ্গের সম্বল, খনি, সর্ব্বধর্ম্ম-তত্ত্বসার প্রভৃতিতে আত্মতত্ত্ব, সাধনের সরল রহস্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক কিছু লেখা ছিল।

মনোমোহনের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ওস্তাদ আপ্তাবদ্দিন ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র-শিল্পী ওস্তাদ আলা-উদ্দিন সাধারণের অতি পরিচিত।

৩

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মনোমোহনের সমস্ত গানের আলোচনা সম্ভবপর নহে। তাঁহার গানের বইগুলির মধ্যে মাত্র 'মলয়া'র দুইখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই সমস্ত

গানগুলি এক স্থানে পাইবার কোন সুযোগ নাই। তাঁহার অনেক গান লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি যে বিকৃত হয় নাই একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। যতদূর পারা গেল, আমরা তাঁহার সমধিক প্রচলিত কয়েকটী গান এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ ইহাদের রূপ ও রসের আলোচনা করিবেন।

সাধন সম্বন্ধে তিনি "নির্দ্দিষ্ট-বাদ" মান্য করিতেন। "কৃপাবলেই মুক্তি" সর্ব্বদাই জানাইতেন, আর গাহিতেন,

মন মাঝে যেন কার ডাক শুনা যায়।
কে যেন আমারে, অতি সাধ ক'রে,
হাত দুখানা ধ'রে, কাছে টেনে নিতে চায়।
ইঙ্গিতে সঙ্কেতে পলকে পলকে,
কোথা যেতে নারি, পাছে থেকে ডাকে,
শুনে সেই তান চমকে উঠে প্রাণ,
বলে কথা মান, ফিরে আয় আয়।
অবহেলা করি দৌড়াইয়া যাই,
চৌদিকে নেহারি কিছু নাই পাই,
ফিরে এসে কাছে দেখি হৃদি মাঝে,
দাঁড়াইয়া আছে আমার অপেক্ষায়।
হেন প্রাণবন্ধু হৃদয়ের স্বামী
কাছে রেখে আমি দূরে দূরে ভ্রমি,
করি কত দোষ, নাহি করে রোষ,
সুজন পুরুষ মাখা মমতায়।
আমি হ'লে তারি সে হত আমারি,
নিলে তারি মর্ম্ম কাটিত কর্ম্মডুরি,
কেন কি কারণ, নিলে না তার মন,
বৃথা মনোমোহন নামটী ধরায়।

এ বিশ্বের অপূর্ব্ব বীণার ঝঙ্কার সকলে শুনিতে পায় না। অথচ সে বীণা অনবরত রাত্রিদিন বাজিয়া চলিয়াছে।

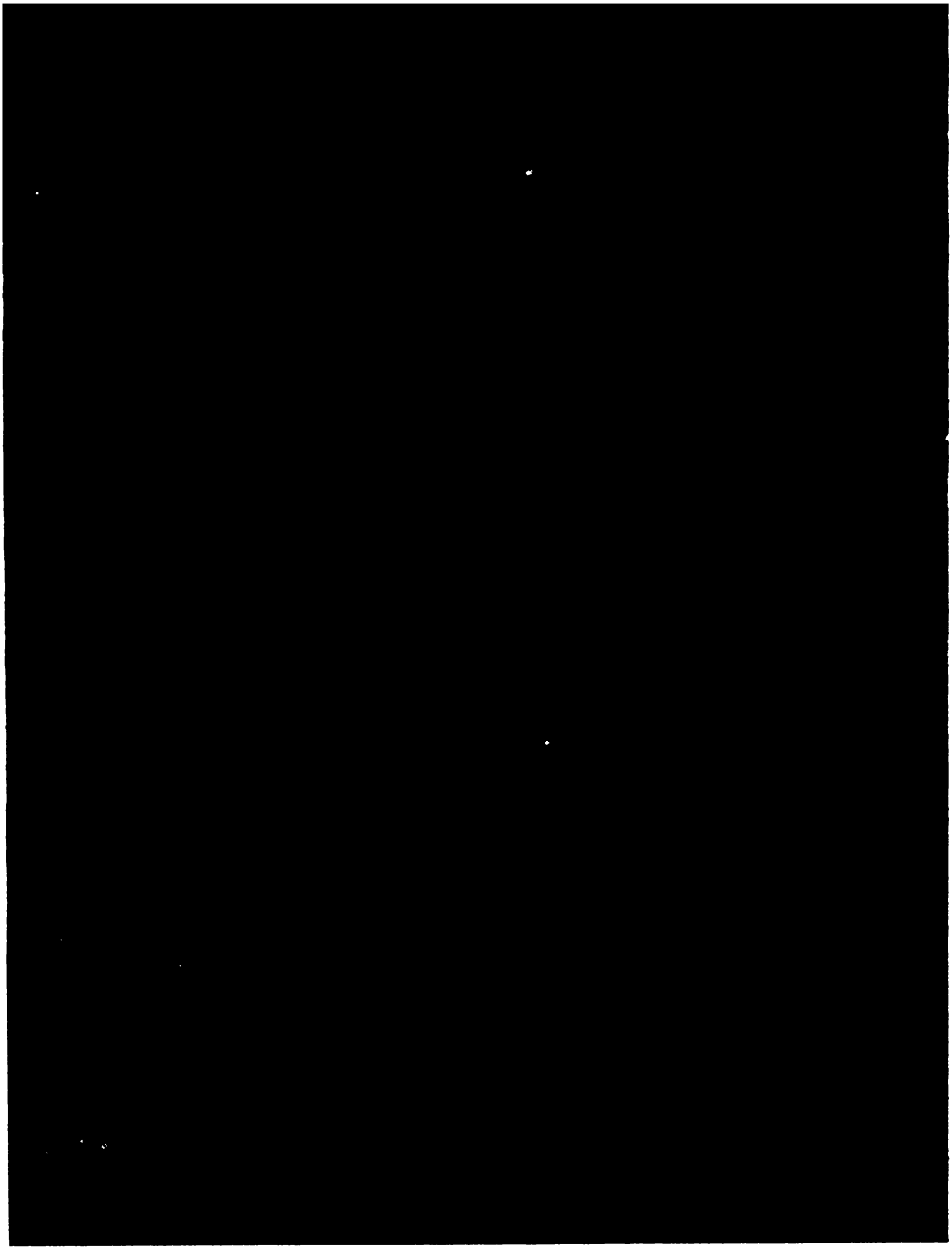
শুনরে মানুষ এক অপরূপ ধ্বনি,
অনাহত বীণা বাজে দিবস যামিনী।
কে বাজায় কোথা ব'সে, চল মন তার উদ্দেশে,
গেলে পরে সেই দেশে মিশিবে হৃদয়খানি।
ধীরে ধীরে আঁখিনীরে কি জানি কি কথা কয়।
সপ্তস্বরে তিনগ্রামে অনাহত ধ্বনি হয়।
আঁখিতে সঙ্গীত গায়, হৃদিযন্ত্র বাজে তায়,
হাওয়াতে প্রাণ খেলে বেড়ায়, প্রকৃতি মাধুরীময়।
উদারাতে প্রেমের ঝঙ্কার, মুদারাতে ধরে বিকার,
তারাগ্রামে বাজিলে তার ত্রিবেণী উজান বয়।
সপ্তস্বরে বাজে বীণা সঞ্চারিয়ে তা, না, না, না,
সুরতান লয় মূর্চ্ছনা, মূর্চ্ছনাতে মূর্চ্ছা হয়।
তার পরে তার খোলে আঁখি, এক দিনে সব দেখে ফাঁকি;
উড়ে গিয়ে প্রাণপাখী ব্রহ্মপদে হয় লয়।
মনোমোহন কয় সন্ধানে এ সেতারের তার কম্পনে
মুক্তিপদ পায় মহাজনে, ভাগ্যফলে, নইলে নয়।

প্রেম কি?

প্রেম বাজারে পরশমণি
বিনামূল্যে বিকিয়ে যায়।
তোদের মরিচা-ধরা লোহা তামা
যার যা আছে নিয়ে আয়।
শিয়ালের শিং সাপের পাঁচ পা,
আকাশ কুসুম আয় দেখে যা,
শুক্‌না ডালা হয়ে তাজা
ফুল ফুটিয়ে গন্ধ বিলায়।
সিংহ দরজায় নাই দারোয়ান,
নাইক কারো কৈতব গুমান,
হাড়ি মুচী সবাই সমান,
প্রেমানন্দে নেচে গায়।
মনোমোহনের কর্ম্মদোষে
ইহা উহা ভাব্‌ছে বসে,
দিন কাটাইলাম রঙ্গরসে,
যমদূতে যে চোখ্ পাকায়।

এই সংসারে সকলেই পাগল; কেউবা ধনের জন্য, কেউবা মানের জন্য, কেউবা প্রেমের জন্য, কেউবা ভগবানের জন্য। অথচ লোকে মনোমোহনকে পাগল বলিত। তাই তিনি গাহিয়াছিলেন—

পাগল পাগল সবাই পাগল, তবে কেন পাগল খোঁটা।
দিল্ দরিয়ায় ডুব দিয়ে দেখ পাগল বিনে ভাল কেটা।
কেউ বা ধনে, কেউ বা মানে, কেউ পাগল অভাবের টানে,
কেউ বা পাগল ঘরের কোণে, ভেবে মনে এইটা ঐটা।



"..................প্রদীপ নিবায়ে
তরী-বাতায়ন তলে দক্ষিণের বায়ে
সঘন-নিশ্বাস ফেলি' যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা ;·· ······"

—রবীন্দ্রনাথ ("পরিশোধ")

শিল্পী—শ্রীযুক্তা প্রকৃতি দেবী

কেউ বা রূপে, কেউ বা রসে, কেউ বা পাগল ভালবেসে,
কেউ বা পাগল কান্দে হাসে, ঐ পাগলামীর বড় ঘটা।
সবে বলে পাগল পাগল, পাগলামী কি গাছের ফল,
তুচ্ছ করি আসল নকল সমান সকল তিতা মিঠা।
যার হয়েছে সে আসল পাগল, তা বিনে আর নকল সকল,
কলের বেকল ঘুরছে কেবল, বেঁধে জটা দিয়ে ফোটা।
হ'তে গিয়ে অই সে পাগল মনোমোহনের গেছে সকল,
বাকী আছে গাছের বাকল, ছেলের হাতে খেতে ইটা।
তবু যদি ভাগ্য ফলে দয়া করে সেই পাগলে,
ফাঁকি দিতে পারি কালে, নৈলে কেবল মাথা কুটা।

ভগবানকে কি ভাবে জানা যায় ?

হরি তোমায় জানতে গিয়ে পড়েছি এক বিষম গোলে।
আসল কথায় ঠিক্ পাইনা তাঁর, শুনি কেবল যে যা বলে।
পুরাণে কয় এরূপ সেরূপ, কে জানে তাঁর কিবা কোন্‌রূপ,
বেদান্তে কয় অরূপ স্বরূপ, ঘটে পটে সর্ব্ব স্থলে।
বাইবেলে কয় ঈশার পিতা, আর যত হয় সবই মিথ্যা,
ঠিক্ পাইনা তার কোন কথা, কোন্ কথা রয়েছে মূলে।
কোরাণে কয় ঠিক্ দুরস্ত, বটে মহম্মদের দোস্ত,
হয়ে গেলাম হেস্ত নেস্ত প'ড়ে মস্ত কথার ভুলে।
গৌরাঙ্গে কয় কৃষ্ণরাধা, বৌদ্ধে বলে বুদ্ধের কথা ;
নাস্তিকে কয় ঈশ্বর মিথ্যা আপ্‌না আপনি জগৎ চলে।
ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, ইঞ্জিল, তৌরিত, কুর্‌কান, জব্বর,
যার যার ভাবে সেই জব্বর, ধান্দা দিছে কথার ছলে।
সাংখ্যে কয় ঈশ্বরাসিদ্ধে, ভাবুকে কয় হৃদয় মধ্যে,
হয়না কিন্তু কার সাধ্যে ধর্‌তে তাঁরে কোন কালে।
জ্ঞানী বলে জ্ঞান হয় বড়, ভক্তে বলে ভক্তি ধর,
যোগী বলে কুম্ভক কর চেপে ধর দোমের কলে।
কেহ কয় জপ ওঁকার, কেহ কয় হংস আকার,
ঠিক্ পাইনা তাঁর কোন কথার, কেহ কয় সহজে মিলে।
কেহ কয় ভজন সম্বল, কেহ কয় কৃপাহি কেবল,
তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে সকল ফল নাই কিছু কর্ম্ম ফলে।
যে যা বলে সবারি মূল এক ব্রহ্ম সূক্ষ্ম স্থূল,
লীলাতে ঘটাইছে গোল দীন হীন মনোমোহন বলে।
কৃপা হলে পাবে কৃপা, স্ববশ হবে অজপা,
তুচ্ছ হয়ে সোণা রূপা, রূপে যাবে নয়ন ভুলে।

মনোমোহন ফকির ছিলেন। নিম্নলিখিত গানটীতে তিনি ফকির-তত্ত্বের রূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

ফকিরি লওয়া নয় সামান্য।
হতে হয় অনন্যমনা, অতিশয় অতি নগণ্য।
দয়া ধর্ম্ম করুণাচিত, সুশীল শান্ত বিনীত,
চিন্তা সদা পরহিত, মিষ্টভাষী স্বভাব দৈন্য।
হিংসা নিন্দা ঘৃণা লজ্জা, কিছু নাই তার সাজ সজ্জা,
নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, না আছে তার পাপ পুণ্য।
দয়াল নাম সদা বদনে, অন্য কথা শুনে না কানে,
মত্ত হয়ে প্রেমের টানে মান ছেড়ে হয় জগত্ মান্য।

এ বিশ্বের যিনি স্রষ্টা তিনি কেমন ? যাঁহাকে সকল সময় মনে-প্রাণে চাহিতেছি তাঁহাকে কি ভাবে পাইব ?

দরদি ! ক'য়ে দে তার নিগম কথা তারে পাব কই।
যারে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হয় গো, দেখলে আপন হারা হই।
যার লাগিয়ে হৃদয় মন ঘুরে বেড়ায় অনুক্ষণ,
যার মধুর নামটী শুনলে পরে ভবজ্বালা ভুলে রই।
মনোচোরে মন দিয়ে কোথা গেছে লুকাইয়ে,
কেন্দে মরি ধর্‌তে নারি, ধরি ধরি আর না পাই।
যার সনে মন মাখা জোখা, তারে বিনে যায় কি থাকা,
মনোমোহন বলে আমি কেমনে বা একা রই।

অথচ সেই অজানা মনের মধ্যে রাত্রিদিন আনাগোনা করিয়া বেড়াইতেছে।

অচেনা এক পাখী আমার খাচার ভিতর করে খেলা।
ধর্‌তে পার্‌লে মন বেড়ীতে বেঁধে ফেল্‌তাম এই বেলা।
পাখী কেমনে আসে কেমনে যায় টের পাওয়া বড়ই দায়,
ভাত জুটে না দুইবেলা তার, খেতে চায় সে দুধ কলা।
পাখী আড়ালে লুকিয়ে থাকে, কত মধুর ডাক ডাকে,
স্বভাবের ছবি আঁকে ব'সে ব'সে সারা বেলা।
জ্ঞান ধনুতে ভক্তিবাণে বিঁধ্‌তে পার্‌লে পাখীর প্রাণে
মিশে যায় প্রাণে প্রাণে, বদল হয়ে প্রেমের-মালা।

আর,

কর্ম্মযোগে থাকে যদি একদিন তবে পাবি দেখা।
আকাশ পানে, চোখের কোণে, ঠিক্ রাখিস্ তুই আলোক রেখা।
হাসে রবি হাসে শশী, সে আলোক মিশামিশি,
দিগ্‌দিগন্ত পরকাশি হাসির ছবি দেখ্‌তে বাঁকা।
সরস প্রাণে তারি পানে চেয়ে থাক্ রাত্রি দিনে,
নাই কিছু আর সে ধন বিনে, লতায় পাতায় নামটী লেখা।
লেখা দেখে শিক্ষা ক'রে দীক্ষা লয়ে ধর তারে,
মনোমোহন কয় ভিক্ষা দেরে প্রাণের মানুষ পয়সা টাকা।

মনোমোহন বলিতেন; লোকের ভাল মন্দ মনে রাখিলে সাধন হয় না। অন্ধ হইয়া ও বধির হইয়া চলিতে হয়। কারণ সংসারী ইষ্ট চায় না। তাহাদের কাজ ও ভাব অনিষ্টের পথ খুঁজিয়া বেড়ায়।

যাবি যদি মন ফকির হাটা,
মুর্শিদাবাদ গিয়ে তবে পর্ওয়ানা লও মোহর আঁটা।
ধরিয়ে পীরের কদম, শেজ্‌দাতে কর নরম,
যতক্ষণ থাকে দম্, ভুলনা সেই ঐ কথাটা।
ইমান্ করে বসে থাক, সবুর পরহেজ রাখ,
হুজুরি দিলেতে ডাক, শক্ত করে বুকের পাটা।
সেই হাটের দোকানী যারা, ক্রেতা নয় কেউ সবাই মরা,
মরতে পারলে দিবে ধরা, ক্রেতা মরা শক্ত লেঠা।
লইয়ে কলঙ্কের ডালি, সইতে পারলে গালাগালি,
পুড়্‌তে পুড়্‌তে হলে ছালি, ধুলা বালির খেয়ে ইটা।
সার করিয়ে জঙ্গলা ঝোপ, দিল দরিয়ায় মারলে ডুব,
মনোমোহন কয় ছাড়্‌লে লোভ, কিঞ্চিৎ পাওয়া যায় ফকিরীর বাটা।

কে তুমি ?

কে তুমি কৌতুকময়ী মৃদু মধুর হেসে
তাল তরঙ্গে নেচে বেড়াও সুর তরঙ্গে ভেসে।
কে তুমি সতত রঙ্গে,
অবসাদ নাই তব অঙ্গে,
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে ভ্রূভঙ্গে, তরঙ্গ ছুটে নিশ্বাসে।
প্রভাতে আর সন্ধ্যাকালে,
শঙ্খ ঘণ্টা করতালে,
কে তুমি থেকে আড়ালে নেচে বেড়াও হেসে হেসে।
শিশুর অধর প্রান্তে
কে তুমি বসে একান্তে
হেসে হেসে উঠ কেন্দে খেলিয়ে লীলা রহস্তে।
কে তুমি বিহঙ্গ স্বরে
কি জানি কও ধীরে ধীরে,
কে তুমি নব পল্লবে ফুল ফুলে আস বসে।
উত্তাল তরঙ্গ সঙ্গে
কে তুমি খেলিছ রঙ্গে,
গম্ভীর জীমূত নাদে, প্রবল ঝড় বাতাসে।
কে তুমি তোমার তরে
থেকে থেকে আঁখি ঝরে,
পুলকে প্রাণ শিহরে, কর দয়া দীন দাসে।

৪

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনোমোহন সহস্রাধিক গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সকল গান পূর্ব্ববঙ্গের পথে ঘাটে মাঠে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। সে গুলি যে দিন প্রকাশিত হইবে সেদিন শিক্ষিত বাঙালী মনোমোহনের প্রকৃত পরিচয় পাইবে। আমরা এ প্রবন্ধে যে কয়েকটী গান তুলিয়া দিলাম, আশা করি তাহাতে মনোমোহনকে বুঝিবার পক্ষে কাহারো অসুবিধা হইবে না। তাঁহার সকল গানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই, তাহা সম্ভবপরও নহে, তাই হয়ত আমরা তাঁহার অনেক ভাল ভাল গান উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

মনোমোহন প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এবং যে কয়দিন তিনি এ পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন, সে কয়দিন তাঁহার সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। বড় বা ছোট কোন সহরের সঙ্গেই তাঁহার কোন যোগ ছিল না, তিনি আজীবন তাঁহার সাধের পল্লী-কুঞ্জেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁহার কোনরূপ পরিচয় ছিল না বলিলেই হয়, তাই তাঁহার গান এত সরলতায় ভরা। তিনি আপনাতে আপনি মগ্ন ছিলেন, এ বিশ্বের দিল্‌দরিয়ায় ডুবিয়াছিলেন, ভিতরের অনন্তরূপের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল, বাহিরের দিকে চাহিবার অবসর তাঁহার হয় নাই। তাই তাঁহার ভাষায় এমন সারল্য। সহজ ভাষায় কথা বলিবার ভঙ্গী বাউলদের একটা বৈশিষ্ট্য, মনোমোহনের গানে সে বিশেষ ভঙ্গীটি অতিশয় মধুর হইয়া ফুটিয়াছে। মনোমোহনের অনেক গানে গ্রাম্য ভাষা আশ্রয় পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে গানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। মনোমোহন আধুনিক যুগের হইলেও আধুনিক যুগের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে তাঁহার কোনরূপ যোগ ছিল না, তাঁহার গানগুলিই তাহার প্রমাণ।

বাউল কবিদের মধ্যে মনোমোহনের স্থান কোথায় সে আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে, আর সে দিনও বোধ করি এখনো আসে নাই। তবে অদূর ভবিষ্যতে যখন

আমরা আমাদের দেশের হারানো রতন খুঁজিয়া খুঁজিয়া মালা গাঁথিতে বসিব সে দিন নিশ্চয়ই আমরা তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াস পাইব। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মনোমোহন একজন অতি উঁচুদরের বাউল কবি। তাঁহার গাহিবার ভঙ্গী, বলিবার ঢং এবং সর্ব্বোপরি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অতি মধুর।

বাউল গানে সুরের একটা বাঁধাধরা নিয়ম নাই সত্য, কিন্তু তবুও গান বিশেষে আমরা সুরের তারতম্য অনুভব করি। মনোমোহনের গানের সুর অতি মিষ্ট। ইহা যাঁহাদের শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনোমোহনের অধিকাংশ গানের সুর সংযোজনা করিয়াছিলেন আমাদের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ আপ্তাবদ্দিন। তিনি উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। তাঁহার কল্যাণেই মনোমোহনের গানের এত প্রচার হইয়াছে।

শ্রীমণিলাল সেন

বিলাতের প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্তা রেণুকা দেবী

৩

বড় বড় স্থানেই হাঁসপাতাল আছে, কিন্তু প্রতি গ্রামে গ্রামেই চিকিৎসার সুব্দোবস্ত রহিয়াছে। আমাদের দেশে যে রকম লোকালবোর্ড, তেমনি ইহাদের কাউন্টি কাউন্সিল। এই সমিতি গ্রামবাসীর চিকিৎসার জন্য চিকিৎক নিযুক্ত করেন এবং ঔষধেরও ব্যবস্থা রাখেন। গ্রামবাসীদের চিকিৎসার জন্য নিজ নিজ আয় অনুযায়ী নির্দ্ধারিত সামান্য মাত্র কর দিতে বাধ্য থাকেন। আবশ্যক হইলে এই চিকিৎসকই নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে রোগীকে চিকিৎসার জন্য পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।

এদেশে ৫ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা মূলক ইহা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। এই সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের যথোপযুক্ত যত্ন "শিক্ষা বিভাগ" হইতে লওয়া হইয়া থাকে। এই কার্য্যের জন্য গত ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত ১২৯৩ জন সাধারণ চিকিৎসক, ৯২৯ জন বিশেষজ্ঞ (চক্ষু, কর্ণ, অস্থিবিদ্যা ইঃ) ও ৬৫৮ জন দন্তচিকিৎসক এবং ৫১৮৪ জন বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ধাত্রী ইঁহাদের অধীনে ছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বালকবালিকারস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে অনেকে নানা রোগাক্রান্ত হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে—তখন ইহাদিগকে ব্যাধিমুক্ত করা বিশেষ আয়াস-সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য এ দেশে শিক্ষাবিভাগের অধীনে বহু "নার্সরী স্কুল" বা শিশুপাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। "শিশু ও মাতৃমঙ্গল সমিতি"র অধীনেও এইরূপ স্কুল অনেক আছে। এদেশে স্ত্রীপুরুষ সকলেই উপার্জ্জন করে। শিশুদিগের মাতারা এই সকল স্কুলে সন্তান রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে কার্য্যে যাইতে পারেন ও কার্য্য অন্তে শিশুদের লইয়া গৃহে ফেরেন। এখানে এক মাস হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদিগকে লওয়া হয়। এক জন অভিজ্ঞ কর্ত্রীর অধীনে কয়েকজন ধাত্রীদ্বারা শিশুদের স্নান করান, খাওয়ান, নানাবিধ খেলা দেওয়া ও ঘুম পাড়ান হইয়া থাকে। খেলাস্থানে প্রচুর সূর্য্যালোকের ব্যবস্থা আছে। নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রদ খেলনা ছবির বই ইত্যাদি হইতে খেলাছলে শিক্ষা দেওয়া হয়। এক বয়সের বহু শিশুর একত্র মিলিয়া মিশিয়া বর্দ্ধিত হওয়াতে শিশুর মনে পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব জন্মে ও এই ভাবে অল্প বয়স হইতেই সামাজিক জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সকল "নার্সরী স্কুলে" মাতাদের জন্য সম্মিলনের ব্যবস্থা হয় এবং তাঁহাদের শিশুপালন সম্বন্ধে সদুপদেশ দেওয়া হয়।

এডিনবরা, ২৭-১১-৩০

শ্রীরেণুকা দেবী

'অশ্বত্থামা'র দিদি

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

গুরুপুত্র অশ্বত্থামার গরু চুরি মোকর্দ্দমায় এক বৎসরের জেল হইয়া গেল।

অধিকারী একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিল। কারণ, তিলসোণার মজুমদারেরা লোক ভাল নয়। বাড়ী আসিয়া পাঁচ টাকা বায়না দিয়া গিয়াছে এবং বারম্বার বলিয়া গিয়াছে—"কালীপুজো মঙ্গলবারে, তার পরের দিন বুধবার তেরোই তারিখে গান। বেলাবেলি হাজির হোয়ো হে, সাতাশ গ্রাম নেমন্তন্ন—" অতএব গাফিলি হইলে তাহারা সহজে ছাড়িবে না নিশ্চয়। সেই তেরোইও ত আসিয়া পড়িল। অধিকারী চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, মা কালীর খাঁড়ার লক্ষ্য এবার তাহারই মাথাটা।

কিন্তু মাথায় হাত দিয়া ত খাঁড়ার কোপ ঠেকান চলে না। কাজেই আর একবার সৃষ্টিধরের হাত পায়ে ধরিয়া দেখা ছাড়া উপায় কি? তিলসোণার আসরে অশ্বত্থামা সাজিয়া যদি সে এবারকার মতো ইজ্জত বাঁচাইয়া দেয়!

সৃষ্টিধর বিদ্বান ব্যক্তি, ইংরাজী ফাষ্ট্‌বুকও পড়িয়াছে—কিন্তু তাহার মোটে বিবেচনা নাই। গত বৎসর যাত্রাদলের সূচনার সময় সৃষ্টিধরকে অনেক বলা-কওয়া হইয়াছিল, এমন কি দশটাকা করিয়া মাহিনা দিবার কথাও উঠিয়াছিল। কিছুতে সে দলে আসিল না, সাফ জবাব দিল—"দশটাকায় ষাঁড় কিনে কাজ চালাও গে—" কিন্তু সৃষ্টিধরের গোঁফ উঠে নাই, নধর চেহারা—রাণী সখি বা নিতান্ত পক্ষে রাজপুত্র বেশেই মানায়, তাহাকে ত সেনাপতি সাজিতে ডাকা হয় নাই। অতএব ষাঁড় দিয়া তাহার কাজ চলে কি করিয়া?

যাহা হউক সে সব আবশ্যক হয় নাই, বলাই তেলিকে পাওয়া গিয়াছিল এবং বড় সুবিধা মতই পাওয়া গিয়াছিল। খুব ফুর্ত্তিবাজ লোক, টাকা কড়ির খাঁই মোটেই নাই। খুলনার দিকে কোথায় তার মামার বাড়ী, মামারা বড়লোক। যে মরশুমে দলের গাওনা থাকিত না মামার বাড়ী ডুব মারিত। ফিরিয়া আসিয়া দিন কতক হয়রাম খরচ করিত। অশ্বত্থামার পার্টও বলিত খাসা। কিন্তু তিলসোণার বায়না লইবার কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ একদিন থানার দারোগা আসিয়া বলাইকে ধরিয়া লইয়া গেল, উহারা কয়জনে মিলিয়া নাকি কোন গ্রাম হইতে গরু সরাইয়া ঝিকরগাছির হাটে বেচিয়া আসিয়াছে। তারপর জেল।

অধিকারী মনে মনে সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছিল—একটা রাতের গাওনা মোটে, টাকা তিনেকের মধ্যেই সৃষ্টিধর রাজী হইয়া যাইবে। তাহারও কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া প্রথমে সে প্রস্তাব করিল—"দুইটাকা—"। কিন্তু সৃষ্টিধর গরজ বুঝিয়া হাঁকিল একেবারে সৃষ্টি ছাড়া দর—"পাঁচ টাকার কম হবে না—"। লোকটার সত্যই বিবেচনা নাই। পঁচিশ টাকা বায়না, জুড়ী বেহালাদার প্রভৃতিকে ধরিয়া মানুষও জন পঁচিশেকের কম হইবে না। তাহার মধ্যে একা অশ্বত্থামাকে যদি পাঁচ টাকা বখরা দিতে হয় তাহা হইলে তস্য পিতা দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্ম, মধ্যম পাণ্ডব ভীম প্রভৃতি মহা মহা বীরগণের ভাগে কি পড়িবে?

তিন, সাড়ে তিন, পৌনে চার করিয়া অবশেষে পুরাপুরি চারই স্বীকার করিতে হইল। না করিয়া উপায় নাই। এই কয়দিনের মধ্যে পার্ট মুখস্থ করিয়া একরকম চালাইয়া দিতে পারে, এ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ঐ সৃষ্টিধর।

গীতাভিনয় সুরু হইয়া গিয়াছে।

দ্রোণাচার্য্যের প্রায় আজানুলম্বিত দাড়ি—রাজবাড়ীতে মাষ্টারী করিবার মানানসই দাড়ি হইয়াছে বটে। আসরের দক্ষিণ কোণে অশ্বত্থামা চিঁ চিঁ করিয়া বলিতেছে—"দুধ—দুধ খাবো, বাবা—" আর দ্রোণাচার্য্য দুইহাতে সেই দাড়ি-সমুদ্র অনবরত আলোড়িত করিয়া একবার ঝাড় লণ্ঠনের

মধ্যে একবার বেহালাদারের পশ্চাদ্দেশে একবার বা ছেঁড়া সামিয়ানার ফাঁকে আকাশমুখো তাকাইয়া দুধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এত অত্যুৎকৃষ্ট স্থান হইতেও দুধ মিলিল না। শেষে একজন ছোকরা হারমোনিয়ামের বাক্সের এককোণ হইতে একটা ছোট এলুমিনিয়মের তেলের বাটী বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। দ্রোণাচার্য্য কোন প্রকার উপকরণ ব্যতীত বোধ করি কেবলমাত্র তপঃ প্রভাবেই সেই বাটীতে পিটালি গুলিয়া দুধ বলিয়া ফাঁকি দিয়া অশ্বত্থামাকে খাওয়াইয়া দিলেন। আর সেই নিরাকার পিটালিগোলার শক্তিই বা কী অসামান্য! মুহূর্ত্ত মধ্যে অশ্বত্থামার মিহিগলা দস্তুর মত সবল হইয়া উঠিল এবং আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত বিশহাত আসরের আগাগোড়া প্রদক্ষিণ করিয়া দুধ খাওয়ার আনন্দে একটো করিয়া করিয়া সে লাফাইতে লাগিল। চারিদিকে বাহাবা বাহাবা পড়িয়া গেল।

চিকের আড়ালে একটি বধূ কেবলি চোখ মুছিতেছিল—মজুমদার-ষ্টেটের রকম সাত আনা শরীক স্বর্গীয় যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ উমাশশী। তার যেন হঠাৎ কেমন মনে হইল ঐ অশ্বত্থামা তাহার ভাই, সে তাহার দিদি। উমার কাঁচা বয়স, তবু এ'টুকু বুঝিবার বুদ্ধি আছে যে ইহার কিছু সত্য নহে, অভিনয় মাত্র। কিন্তু সত্য হউক মিথ্যা হউক, অমন সুন্দর ছেলেটি আসরের পাশে পড়িয়া একটুখানি দুধ খাইবার জন্য অত করিয়া কাঁদিতে লাগিল ত! আর যখন দুধ বলিয়া খানিক পিটালির গোলা খাওয়াইয়া দিল অশ্বত্থামা রাগ করিয়া ঐ বাটীশুদ্ধ আসর ডিঙাইয়া কলাবনের মধ্যে ফেলিয়া দিল না কেন? তাহা না করিয়া অবোধ বালক আনন্দে নাচিতে লাগিল।··· যাত্রা দেখিতেছে আর কত কি ভাবিতেছে এমনি সময়ে উমার মনে পড়িয়া গেল, তাহার খোকামণি এতক্ষণ হয়ত জাগিয়াছে। সন্ধ্যার সময় তাহাকে খাটের উপর ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া মোক্ষদাকে সেখানে বসাইয়া তবে গান শুনিতে আসিয়া বসিয়াছে। যে আছুরে ঝি মোক্ষদা—এতক্ষণ কি করিতেছে তার ঠিক কি! হয় নাক ডাকাইয়া কোথায় ঘুম মারিতেছে, নয়ত এই ভিড়ের মধ্যে কোন খানে চুরি করিয়া বসিয়া সে'ও গান শুনিতেছে। মোটে এক বছরের একরত্তি ছেলে, দুধ খাইবার সময় হইয়াছে—বাড়ীতে কেহ নাই, জাগিয়া থাকে ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন হইতেছে। ব্যস্ত হইয়া উমাশশী উঠিয়া পড়িল।

•

ছয় শরীকের এজমালি কালীপূজা। সম্পত্তির অংশ-ক্রমে যাত্রাদলের লোকজন খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যদুনাথের তরফে খাইবে বারোজন। অনেক রাতে গান ভাঙিয়া গেলে পুরুষ মানুষদের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। তারপর উমা খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"যাত্রার লোকেরা খেয়ে গেছে?" বামুন ঠাকরুণ উত্তর করিলেন—"না বৌমা, এমন কি নবাব পুত্তুররা এয়েছেন যে সন্ধ্যে না লাগ্‌তে বাবুদের আগে তাগে খাইয়ে দেব। আমার সব হয়ে গেছে, আর দেরী নেই। মোক্ষদা এবার ডাক্‌তে যাক্, মোক্ষদা—ও মোক্ষদা—"

উমার খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অবশিষ্ট ভাত গুলির কতক খাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচাইতে গেল। মোক্ষদা তখন উপর হইতে নীচে নামিতেছে। উমা কহিল—"কেমন গান শুন্‌লি, মোক্ষদা?" মোক্ষদা বিস্ময়ে খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না, শেষে কহিল, "অ পোড়াকপাল আমি গেনু কখন? আমি বলে—মাজার ব্যথায় ছটফটিয়ে মরি—" উমা হাসিয়া ফেলিল।—"তুই যে সেই আঁধারে-আঁধারে কচুবনের পাশ দিয়ে—আমি নিজের চোখে দেখ্‌লাম। তা বেশ ত, কি হয়েছে তাতে? তুই খোকাকে একলা ফেলে চ'লে গেছিস্, আমি কি তা কাউকে বল্‌তে যাচ্ছি?" অতঃপর মোক্ষদার আর মনে না পড়িবার কথা নয়—এখনও স্মরণ না হইলে আরও যে কি বাহির হইয়া পড়িবে তার ঠিক কি? বলিল—"আস্তে কথা-কও বৌদি, শুনতে পেলে গিন্নিমা আস্ত রাখ্‌বে না। বামুন ঠাকরুণকে ব'লে গিইছিনু—যখন বুদ্ধু হবে আমার ডেকো। তিনি এসে বল্লেন—মোক্ষদা, দ্যাখসে এসে ভীম সাঁই সাঁই ক'রে কী গদাই ঘুরুচ্ছে! তা—গিইছি আর এয়েছি—দাঁড়াই নি মোটে—"

উমা বলিল—"আর অশ্বত্থামা কেমন একটো কর্‌লে বল দিকিন! দেখ্‌তেও যেন রাজপুত্তুর—না?"

মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে সারিল—হুঁ। তাহার মাথার মধ্যে তখনও সাঁই সাঁই করিয়া ভীমের গদা ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল—"কিন্তু দুর্য্যোধন কী পালোয়ান রে বাপু! আমি শুণে দেখছু একটা নয় দুটো নয় ভীম ছয় ছয়টা গদার বাড়ি মারলে তবু লাফাতে লাফাতে চলে' গেল। সোজা কথা? ভীমের ঐ গদাটা বিশ পঁচিশ মণ হবে, না বৌদিদি?"

কিন্তু গদাতত্ত্বের আলোচনা আর অধিক চলিল না, বামুন ঠাকরুণ ডাকিতে ছিলেন—"ও মোক্ষদা, ডাক্‌তে গেলিনে? যা দিদি, আমি আর কত রাত অবধি ভাত চৌকি দেবো?"

উমাও বলল—"যাচ্ছিস্ ডাক্‌তে? যা—কেন মিছামিছি রাত করিস? আর ঐ যে অশ্বত্থামা—চিন্‌তে পার্‌বি নে?—যে দুধ দুধ করে' কাঁদ্‌ছিল গো, তাকেও ডেকে আনবি। বারোজন খাবে আমাদের বাড়ীতে—ঐ ছেলেটাও খাবে। যদি না আস্‌তে চায়, ছাড়বিঁনে—বুঝ্‌লি?

মোক্ষদা ডাকিতে চলিয়া গেল।

এবারে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া উমা দেখিল আয়োজন প্রচুর। ভীমরুলের ডিমের মতো মোটা মোটা আউশচালের ভাত পুঁইডাটার চচ্চড়ী এবং খেঁসারীর ডাল রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন নিবন্ত উনানে পাঁচ সাতটা বেগুণ পোড়াইয়া দিলেই হইয়া যায়। কহিল, "ও বামুন মা, করেছ কি? এই দিয়ে লোকগুলো কি ক'রে খাবে?" বামুন ঠাকুরুণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"বল কি বৌমা, বেগুন পোড়া দিয়ে তিন তিনটে তরকারী হল—আরো খাবে কি দিয়ে? বাড়ীতে ওরা কি সোণা-সুবর্ণ খেয়ে থাকে? তুমি ছেলেমানুষ, জানোনা ত—"

কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও উমা জানে। এই সব লোক যাহারা যাত্রার দলে রাজা সাজিয়া বেড়ায় আবার বাড়ীতেও ভাঙামণ্ডপে সাবেকীচালে একরকম নিশ্চিন্তভাবে হুঁকা টানিয়া থাকে এবং ধানভরা সবুজবিলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আগামী পৌষে নূতন গোলা বাঁধিবার স্বপ্ন দেখে, তাহারা সদা সর্ব্বদা যে অপরূপ সোণা-সুবর্ণ খাইয়া থাকে তাহা উমা ভাল করিয়াই জানে। সেই যে রূপকথার কোন কাঠকুড়ানী মেয়ে বনের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, রাজবাড়ীর শ্বেতহস্তী শুঁড়ে করিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল—উমারও হইল তাই। উমার বাপের বাড়ী উজ্জলপুরে, এখান হইতে পুরা তিনটী ভাঁটির পথ, একেবারে মধুমতীর উপর। সে গ্রামে এক ঘরও বড়লোক নাই। পাঁচ বৎসর আগে সেখানে প্রতি রাত্রে দিদি ও ভাইটি মায়ের কোলে জড়াজড়ি করিয়া শুইয়া থাকিত। বোকা ভাইটি—তার নাম হারাণ। এমনি অবোধ যে আর সকলের মতো তাহাদেরও বাবা বাঁচিয়া ছিল—এরকম অসম্ভব কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিত না, ইহা লইয়া উমার সাথে ঘোরতর তর্ক করিত। একবার হইয়াছে কি, চৌধুরীবাড়ী অমিয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে নানান রকম জিনিষ আসিয়াছে। সেদিন হারাণের আর টিকি দেখিবার যো নাই, বেলা দুপুর অবধি আগামী উৎসবের আয়োজন দেখিতেছে। অমিয়ার কাকা ট্রাঙ্ক খুলিয়া জিনিষপত্র বাহির করিয়া অমিয়ার মাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, উবু হইয়া বসিয়া হারাণ একমনে তাহা দেখিতেছিল। বাড়ী ফিরিয়া হারাণ উমাকে চুপি চুপি কহিল—"আজ এক তা পেয়েছি, কাউকে বলিস্‌নে দিদি। ভুলে ওরা রোয়াকের পরে ফেলে চ'লে গেল, কেউ নেই দেখে তুলে নিলাম। কি বল দিকিন? কল্‌কেতার মিঠাই—না?—" বলিয়া চারিদিক তাকাইয়া কোঁচার খুঁট হইতে অতি সন্তর্পণে সেই দুষ্প্রাপ্য কলিকাতার মিঠাই বাহির করিল। দেখিয়া খানিকক্ষণ ত হাসির চোটে উমা কথা কহিতেই পারিল না—একটা টকটকে রাঙা মোমবাতী—বলিল, "ও হারাণ, ওরে বোকা, তুই যেন কী—বাতি চিনিস্ নে? বাতি—বাতি—জেলে দিলে ঠিক পিদ্দিমের মতো আলো হয়—" দিদির অত হাসি দেখিয়া হারাণ অপ্রস্তুত হইয়া প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না কিন্তু একটু সামলাইয়া লইয়া শেষে পুরাদস্তর তর্ক করিতে লাগিল, উহা কক্ষণো বাতি নয়—সে বুঝি বাতি চেনে না? চৌধুরীদের মাণিক নন্দ প্রভৃতিকে স্বচক্ষে ঐ বস্তু খাইতে দেখিয়াছে যে!...

উজ্জলপুর গ্রামখানি পরগণে সৈদাবাদের মধ্যে, অতএব

তিলসোণা মজুমদার-ষ্টেটের অন্তর্গত। একবার কিস্তির মুখে যদুনাথ মজুমদার মহাশয় স্বয়ং আদায়-পত্র তদারক করিতে গিয়াছিলেন। কাছারী বাড়ীর সামনে দিয়া কাঁচা-রাস্তা সোজা দক্ষিণমুখো একেবারে খেয়াঘাট অবধি চলিয়া গিয়াছে। সকালবেলা মজুমদার মহাশয়ের অনেক কাজ—রোকড় সেহা খতিয়ান প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে হইত। তাহারই মধ্যে একবার রাস্তার দিকে তাকাইয়া চশমার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতেন, পাততাড়ি বগলে একটি ছেলে একেবারে দিদির আঁচলের মধ্যে গা ঢাকিয়া পাঠশালায় যাইতেছে। দিদি আর ভাই হরদম বকিতে বকিতে যাইত, কী যে বকিত উহারাই জানে। মজুমদার মহাশয় রোজই দেখিতেন। একদিন তিনি উমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যাবেলা ভাইকে লইয়া ফিরিতেছিল, যদুনাথ রাস্তার পাশে পায়চারী করিতেছিলেন, ডাকিলেন—"শোন মা-লক্ষ্মী—" উমা সসঙ্কোচে কাছে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যদুনাথ কী যে শোনাইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"আমার তিলসোণার বাড়ীতে যাবে? আমার ঘরদোর আলো হয়ে যাবে—লক্ষ্মী-মা, যাবে ত?" বলিয়া পরমস্নেহে উমার মুখের উপর যে ক'গাছি চুল উড়িতেছিল, তাহা সরাইয়া দিলেন। উমা কিছু কিছু বুঝিল, কিন্তু হারাণের কাছে যদুনাথের কথাগুলি বড় দুর্ব্বোধ ঠেকিল। পথে যাইতে যাইতে পরম উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, ওদের বাড়ী তো'কে যেতে বলে কেন? আবার যদি জিজ্ঞাসা করে তুই ব'লে দিস্—যাব না। যদি না যাস্ ওদের লেঠেল পাইক দিয়ে ধ'রে নিয়ে যাবে না ত?"

পরদিনই যদুনাথ স্বয়ং উমাদের বাড়ী আসিয়া সকল কথা পরিস্কার করিয়া বলিলেন যে, উমার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ-পুত্র রমানাথের বিবাহ দিতে চান। দেনা পাওনার কোন কথা নাই, স্বয়ং মা-লক্ষ্মী যে ঘরে গিয়া উঠিতেছেন, টাকা দিয়া আর কি হইবে?

বিবাহ হইয়া গেল। যেদিন উমারা রওনা হইয়া যাইবে তার আগেরদিন সন্ধ্যায় হারাণ বলিল—"দিদি, তুই রাজরাণী হলি, তা মাথার মুকুট কই?" উমা বলিল—"যাঃ—রাজরাণী না হাতী—কে বলেছে রে?" কিন্তু হারাণ বুঝি কিছু বোঝে না? বলিল—"রাণী নয় ত কি? মা বল্লে তবেগে সুশীলা মানিক সবাই বল্‌ছিল—আর তুই লুকুচ্ছিস্? ও দিদি, তোদের রাজবাড়ীতে যেতে দিবি আমাকে? সেপাইরা মারবে না?" উমা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেউ কোথাও নাই ত? শ্বশুরবাড়ীর কথা কহিতে বড় লজ্জা করে, কিন্তু অবুঝ ভাইটিকে আবার লজ্জা! বলিল—"ইঃ মার্‌লেই হল! আমার ভাইটিকে মারে কে! তুই আর একটু বড় হ'লি নে কেন হারাণ, তা হলে কালই সাথে নিয়ে যেতাম। খানিক বড় হয়ে যাস্—গেলে তোকে এত বড় রুই মাছের মাথা দিয়ে ভাত বেড়ে দেবো। যাবি ত?" হারাণ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল—"হাঁা, আর মেঠাই—কলকেতার মেঠাই দিস্, দিবিনে দিদি?—"

বামুন ঠাকরুণের চাকরী অল্পদিনের, তিনি উমার বাপের বাড়ীর কোনও খবর রাখেন না। বলিতেছিলেন—"তুমি মা ছেলেমানুষ—ভাবো, পিরথিমের সব্বাই বুঝি তোমাদের মতো খায় দায়। তিন তিনটে তরকারী রেঁধেছি, তবু বল্‌ছ যাত্রার লোকেরা কি দিয়ে খাবে? আর বড়বাবুর ঘরে দেখে এসোগে ত সেখানকার ব্যবস্থা; শুধু ফ্যানসা ভাত আর নুন—তেঁতুলটুকুও নয়—"

উমা বলিল—"তা হোক বামুন মা, বাড়ীতে কত মিঠাই মোণ্ডা ভিয়েন হল তার কি কিছু নেই? থাকে ত—ওদের একটা একটা যাহোক কিছু দিও। আচ্ছা, তুমি ভাত বাড়ো—আমি দেখ্‌ছি—"

উপরে আসিয়া ভাঁড়ার খুঁজিয়া দেখিল, কিছুই নাই। অনেক বড় বড় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহারাই শেষ করিয়া গিয়াছেন। আবার নীচে গিয়া সে কথা বামুন ঠাকরুণকে বলিয়া আসিতে লজ্জা করিতে লাগিল। যা হয় করুন গিয়া তিনি, উমা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিল সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া রমানাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মাথার কাছে আলো জ্বালা। শিয়রে এমনি আলো জ্বালাইয়া কখনো ঘুমায়? এমন মানুষ, যদি কোন কিছুর খেয়াল

থাকে। উমা আলোটা সরাইয়া জোর কমাইয়া দিল। তারপর খোকার চাঁদের মতো মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল। সেও অঘোরে ঘুমাইতেছে। আজ আর জাগে নাই, দুধও খায় নাই। খোকার সেই দুধের বাটী হাতে করিয়া উমা ফের নীচে নামিয়া গেল।

তখনো বামুন ঠাকরুণ একেলা ভাত লইয়া বসিয়া আছেন। বলিলেন—"দেখতো মা মোক্ষদার কাণ্ড—এখনও এল না। হতভাগী কোথায় গল্প গিলতে বসেছে—"

উমা বলিল—"ওর ঐ রকম—কিছু বোঝে না।—আচ্ছা তুমিও ত যাত্রা শুনেছ, বামুনমা, সব চাইতে ভাল এক্‌টো কর্‌লে কে?—অশ্বত্থামা না?

বামুন ঠাকরুণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"ছাই। এক্‌টোর কথা যদি বল, ভীমের উপরে কেউ নেই। প্রথম মোহড়ায় গোটা দুই লাফ দিয়েছে কি, সামনে যে ছেলেগুলো বসেছিল তারা ছুটে একেবারে নাটমণ্ডপের নীচে। হবে না? কত বড় বীর! মহাভারত পড়নি বৌমা?"

উমা কহিল—"তা ঠিক। কিন্তু অশ্বত্থামাকে দেখে আমার বড্ড কষ্ট হয়। গরীব বামুনের অবোধ ছেলে, একটুখানি দুধের জন্যে কি কান্নাটাই কাঁদ্‌লে?" তারপর দুধের বাটীটা আগাইয়া দিয়া বলিল—"ঐ অশ্বত্থামা ছোকরা এখানেই খেতে আসবে, তুমি তাকে এই দুধটুকু দিও, বামুন মা—"

বিড়ালের বড় উপদ্রব। বামুনঠাকরুণ দুধের বাটী তাকের উপর তুলিয়া ঢাকা দিয়া রাখিলেন। উমা চুপ করিয়া রহিল, তারপর উনানের কাছে সরিয়া গিয়া বসিয়া বলিল—"এবারে শীত যা পড়্‌বে—এরি মধ্যে কেমন শীত শীত লাগ্‌ছে, দেখনা। আর আমার বাপের বাড়ী এদ্দিন ঠিক লেপ গায়ে দিতে হচ্ছে—একেবারে মধুমতীর উপর কি না।—" হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—"মজার কথা শোন বামুন মা, আজকে প্রথমে যখন অশ্বত্থামা আসরে এল, আমি ভাবলুম আমার ভাই হারাণ এল বুঝি। অমন পেটুক তুমি ভূ-ভারতে দেখনি কখনো। অশ্বত্থামা যখন দুধ দুধ ক'রে কাঁদছিল, আমার মনে হল হারাণ দুধের বায়না ধরেছে।"

বামুন ঠাকুরুণ কহিলেন—"তোমার ভাই বুঝি ঐ রকম দেখ্‌তে—"

উমা কহিল—"দূর! ওর চেয়ে ঢের ছোট আর ধবধবে ফর্সা—যেন কড়ির পুতুল। সেবারে যখন এখানে আসি, খুব ভোর বেলা—পানসীতে উঠে দেখলুম, হারাণ কখন এসে ঘাটকিনারে বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে। পানসীতে ডেকে তার ক'ড়ে আঙুলে একটু কামড় দিয়ে এলুম। আঙুল কামড়ালে নাকি মায়ামমতা ছেড়ে যায়—ও সব ছাই কথা!"

বামুন ঠাকরুণ উমার দিকে চাহিয়া শুনিতেছিলেন। সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি অনেক দিন বাপের বাড়ী যাওনি। না—বৌমা?"

উমা মুখখানা ম্লান করিয়া কহিল—"হাঁ—আজ তিন বচ্ছর। শ্বশুর ঠাকুর মারা যাবার পরে আর যেতে পারিনি। হারাণ বলেছিল—দিদি, তোমার বাড়ী গিয়ে কল্‌কাতার মিঠাই খেয়ে আস্‌বো—সেও এলো না।"

বামুন ঠাকরুণ সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"আহা! আসে না কেন?"

উমা বলিল—"আসে কার সাথে? মোটে এগারো বছর বয়স। আর ক'টা বছর বাদে বড় হ'য়ে আসবে ঠিক। এসে সে আমাকে ফি বছর উজ্জলপুরে নিয়ে যাবে।"

এমন সময় ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, কান্না ত নয় যেন উপরে ডাকাত পড়িয়াছে। উমার বড় ইচ্ছা করিতেছিল, যাত্রার লোকদের খাওয়া হইয়া গেলে তবে যাইবে,—কিন্তু আর দাঁড়ান চলে না। যাইবার সময়ে বলিয়া গেল—"বামুন মা, ঐ ছোকরাকে মনে করে' দুধটুকু দিও—ভুলো না যেন। তোমার যে ভোলা মন—"

এমনি বেশ শান্ত কিন্তু উমার খোকা একবার কান্না যদি আরম্ভ করিয়াছে, অবাক হইয়া যাইতে হয় অতটুকু গলায় ঐ প্রকার আওয়াজ উঠে কি করিয়া? ইতিমধ্যে রমানাথেরও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল; উমাকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—"কোথায় ছিলে এতক্ষণ? জালাতন কর্‌লে! যাও,

তোমার ছেলে নিয়ে যাও—” উমা ছেলে কোলে করিয়া বাহিরে ছাদের উপরে আসিল। অন্ধকার রাত্রির মাথার উপর লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র জ্বলিতেছে। উমা ছাদের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলে শান্ত করিতে লাগিল। ছেলেকে বুকের উপর চাপিয়া বারম্বার বলিতেছিল—“কাঁদিস্ নি মাণিক আমার, ধন আমার,—আর কাঁদে না। আজকে আর দুধ পাবিনে—তোর সে দুধ দিয়ে দিইছি—একদিন দুধ না খেলে কি হয়? ওরে হিংসুটে, তবু কাঁদিস? তুই রোজ খাস, ওরা যে জন্মে কোন দিন দুধ খেতে পায় না—” চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল—“আ-মরে’ যাই, মরে’ যাই, খোকনমণির কি হয়েছে? তোমার দুধ তোমার মামা খাচ্ছে—মেঠাই ফুরিয়ে গেছে দুধ দিয়ে এলুম, তার জন্যে কাঁদতে আছে? আমার গোপাল, তুমি আজকে ঘুমোও। আয় চাঁদ, আয়—আয়—”

উমা আবার যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল, রমানাথ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আলো ধরিয়া ছারপোকা মারিতেছে। কহিল—“নতুন হিম পড়ছে, অমনি করে’ এখন বাইরে বাইরে ঘোরে?” যেন কে কাহাকে কহিতেছে, উমা যেন ঘরে নাই। ঘুমন্ত ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিল। রমানাথ কাছে আসিয়া উমার একখানি হাত ধরিয়া বলিল—“রাগ করেছ উমা? ঘুমের ঘোরে আমি কি বকেছি, আমার কিছু মনে নেই—” আর উমা চোখের জল ঠেকাইতে পারিল না, বর্ষার মধুমতী উমার চোখের কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। রমানাথের কোলের উপর মাথা রাখিয়া উমা কাঁদিতে লাগিল আর রমানাথ বিব্রত হইয়া তাহার চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিল—“আমায় মাপ কর—মাপ কর উমা, অত কাঁদছ কেন? কি হয়েছে? না, একেবারে পাগল তুমি—” কতক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে উমা বলিল—“আমি উজ্জলপুরে যাব, কতদিন যাই নি বল ত। আমার বুঝি হারাণকে মাকে দেখতে ইচ্ছা করে না—” রমানাথ বলিল—“এই কথা? দাঁড়াও, কিস্তির মুখটা কেটে যাক্, তারপর ছয়দাঁড়ের পানসী নিয়ে যাব—তুমি যাবে, আমি যাব, খোকা যাবে, মোক্ষদাও যাবে—আর কেঁদোনা লক্ষ্মীটি—”

যাত্রাওয়ালাদের ডাকিয়া আনিতে সত্যসত্যই অনেক রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে মোক্ষদার অপরাধ নাই। মোক্ষদা গিয়া দেখিল, অশ্বথামা ইতিমধ্যে পোষাক ছাড়িয়া ফেলিয়া বেঞ্চে বসিয়া বিড়ি টানিতেছে কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি রথীবৃন্দ দাড়ি গোঁফ সমন্বিত অবস্থাতেই বায়নার টাকার বখরা করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। অবশেষে অনেক কষ্টে হিসাব মিটিয়া প্রতিজনের ভাগে সাড়ে দশ আনা করিয়া পড়িল। দ্রোণাচার্য্য পয়সা গণিয়া ট্যাঁকে বাঁধিলেন, তারপর ছোঁ মারিয়া অশ্বথামার মুখ হইতে বিড়িটি কাড়িয়া লইয়া টানিতে লাগিলেন। অধিকারী অমনি হাঁ—হাঁ—করিয়া ছুটিয়া আসিল, অমন দাড়ি-পরা অবস্থায় বিড়ি খায় কখনো? পাঁচসিকা দামের দাড়িটায় আগুন লাগিলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। বায়োজনকে একত্র করিয়া গোছাইয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

আর সকলের খেঁসারী ডাল অবধি পৌছিয়া ইতি, কেবলমাত্র স্বস্তিধরের পাতের কোণে দুধের বাটী আসিল। সে যে আজিকার আসরে অত্যুৎকৃষ্ট এক্‌টো করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছে এবং তজ্জন্য অন্তঃপুরে আহারের এই বিশেষ ব্যবস্থা, তাহাতে স্বস্তিধরের সন্দেহ মাত্র রহিল না।

শ্রীমনোজ বসু

হিমেতপুরের বাওর

বন্দে আলী মিয়া

ছোটো সে বাওর পদ্মার মেয়ে হিমেতপুরের বাঁকে
চলিয়া গিয়াছে ঝপ্ ঝপে পানে পল্লীর ফাঁকে ফাঁকে।
দুই পারে তার মসিনার জমি, হল্‌দে ধানের শীষ,
বাঁশের কঞ্চি—বোড়ুয়ের গাছ—গোখ্‌রার হিস্‌পিস্।
হিমেতপুরের জনরব হোথা মানসিংহের বাড়ী,—
বাড়ী আজ নাই—খানকয় ইঁট প'ড়ে আছে আড়াআড়ি।
ওর 'পরে আজ জন্মেচে বট বিলেই আঁচড়া ঝাড়,
বেতের কাঁটায় বৈচি লতায় হোয়ে আছে আঁধিয়ার।
চারপাশে ওর সাপ কিল্‌বিল্—শিয়ালেরা গান গায়—
অর্জ্জুন ডালে বাদুড়েরা থাকে—কিচিমিচি শোনা যায়।
কচুবন আর ঘন বাঁশঝাড়—বাদাল বেঁধেচে ভাঁটি,
কাঁটা গাঁথিলার ফুলগুলো যেন রৌদ্রে গিয়েচে কাটি।

যে কালে আছিলো নীলকুঠি হোথা সেকালে লালসা ভরে
সায়েবেরা সব এসেছিলো হোথা গুপ্ত ধনের তরে।
কত দিন ধ'রে সাবল ঠুকিয়া খুঁড়িয়া দালান কোঠা
টাকার ঘরতো করিলো বাহির জালা সব গোটা গোটা।
মোহরের থান দেখিয়া তাদের প্রাণ করে ধুক পুক ;
পরের ধনের লাগিয়া সবার খুসিতে ভরিলো বুক।
জন মজুরেরা মোহর গুলিয়ে ছালাতে-বোঝাই ক'রে
পৌঁছায়ে দিলো নীল কুঠিয়ার সায়েব লোকের ঘরে।
সেখানে সকলে বস্তা ঢালিয়া দেখিলো অবাক হোয়ে
মোহর তো নাই—ভাঙা পাটকেল এসেচে তাহারা লয়ে !
সায়েব রাগিয়া হয়েচে আগুন—মজুরেরা সব চোর,
নিজেদের ঘরে টাকা রেখে এলো, শঠতার নাহি ওর।
মজুরেরা সবে কাঁদিয়া তাদের পায়েতে লুটায়ে পড়ে,
কিছুই জানেনা এমন ব্যাপার ঘটিলো কেমন কোরে !
সায়েবের মনে সন্দ রহিলো তার কথা মিছে ভাবি,
নিজেরা যাইয়া বাক্স ভরিয়া লাগাইল তাহে চাবি ;
নিয়ে এসে তায় ঢালিলো তাহারা—দেখিলো এবারো তাই,
মোহর বদলে পাটকেল ছাড়া আর কিছু তাতে নাই !
দেক্ সেক্ হয়ে পুনরায় তারা ওই দিয়ে ছালা ভরি
মানসিংহের ভাঙা দালানেতে নিয়ে এলো সরাসরি।
সেখানে আসিয়া ঢেলে দেছে যাই গাড়ীটা উপুড় ক'রে,
ইঁট পাটকেল গেল বা কোথায়—মোহরের থান প'ড়ে !
সব লোক যেন তাজ্জব হলো—মুখে বিস্ময় ভীতি,
কেমন করিয়া কী যে হ'ল কেহ বুঝিল না তার রীতি !

বাওরের পাশে দীঘল হালট রাখাল চরায় গরু,
ওরি পাশ দিয়ে ভুট্টার জমি—পাট খড়ি সরু সরু—
জনার গাছের আগ্‌ডালে বসি ফেঁচকে চেঁচায়ে মরে,
তার কাছে বসি বড়শী ফেলিয়া আব্দুল মাছ ধরে,
খালুয়ের মাঝে পেটুক পুঁঠিরা মনে মনে গজ্‌রায়,
পোনাগুলো তার চুলবুল্ করে ধাড়িটাকি আগে যায়।
বড়শী ছিঁড়েচে কাছিমের ছা—ছিপ্‌টি রয়েচে পড়ি,
হাত পাও ভাঙা কাঁকড়ারা যায় অনাদরে গড়াগড়ি।
জলি ধান ঝাড়ে কৃষাণের মেয়ে গান গায় আন্‌মনে,
সুর শুনি তার রাখাল ছেলের কাঁপে বুক ক্ষণে ক্ষণে।
সাঁঝের বেলায় জল নিতে আসে গোয়ালের ছুধু মেয়ে,
রাখালের রোজ গরুটা হারায় তার পথ চেয়ে চেয়ে।

আম কাঁঠালের বাগানের পাশে ওপারের ওই বাড়ী,
তেঁতুল বাদাম সজিনার গাছ—নারিকেল সারি সারি,
ওই হোথা আছে আমার মনের লুকানো গোপন সোনা
মেঘরঙা মেয়ে বুকে তার আজ ফাগুনের আনাগোনা ;—
ওরে ভালোবাসি—ভালোবাসি যেন সকল পরাণ ভ'রে,
কত কাল ধরি ওই চাঁদমুখ ভাবিছি নিজের ক'রে।

ওরে ভালোবেসে বাঁশরী সুরেতে গাহিতে শিখেছি গান,
ওর কথা মোর পরাণে বাজিছে সারা রাত দিনমান ;
দুই হাতে ওর বেঁধে দিছি মোর জীবনের রাঙা রাখী,
ওর সাথে সাথে কাঁদিয়া ফিরিচে আমার ভাবনা পাখী।
বিনি সুতা দিয়ে যে মালা গেঁথেচি দুই জনে মনে মনে,
সে মালা আমরা দোঁহার গলায় পরায়েছি সযতনে।
এ খবর জানে আকাশের তারা—মাঘের আঁধার রাতি,
এই বিয়ে দেছে শীতের সন্ধ্যা কুয়াশা আঁচল পাতি।

সাক্ষী তাহার বুড়ো আমগাছ—আতার দীঘল ডাল,
মাটির মায়ের ধাম ছুব্‌লায় বাঁধা মোরা চিরকাল।
ওর দিকে চাহি মোর দিনগুলা কান্নায় ভারী হয়,
সাত বছরের সারা দিন রাত ওরপানে চেয়ে রয়।
হিমেতপুর ও নারাণপুরের মাঝে কতখানি ফাঁক,
কবে এ ফাঁকের আঁধার মিলাবে—আসিবে মিলন ডাক।
এর লাগি আজ গণিছি পহর যৌবন-বেদনায়,
বাঙর ছেঁচিয়া তুলেছি মাণিক—গলায় পরিব তায়।

বন্দে আলী মিয়া

দিল্লীতে পুরাতন কীর্ত্তি

শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ [পি-আর্-এস্]

প্রাচীন হিন্দুযুগের স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনটী পুরাতন স্তম্ভ দিল্লীর মহাশ্মশানে আজিও দেখা যায়। তন্মধ্যে দুইটি প্রস্তরনির্ম্মিত এবং অপরটী লৌহের। প্রথম দুইটিই অতি পুরাতন—আজ প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে মৌর্য্যসম্রাট অশোক এই দুইটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লৌহস্তম্ভটী অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীযুগে নির্ম্মিত। পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী ইহার প্রতিষ্ঠাকাল। এটীর কথা অপর এক প্রবন্ধে বলা যাইবে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে অশোকের শিলাস্তম্ভ-দ্বয়ের কথাই বলি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ দুইটি আমি দেখিয়াছিলাম।

অশোক কিন্তু স্তম্ভ দুইটি আসলে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠা করেন নাই। খৃষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান সম্রাট ফেরোজ তোগলক অন্যস্থান হইতে আনিয়া স্তম্ভ দুইটিকে দিল্লীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমটি ফেরোজ সাহের লাট, সিবালিক স্তম্ভ, বা দিল্লী-তোপরা স্তম্ভ নামে সাধারণে পরিচিত। মিরাট হইতে আনীত বলিয়া অপরটি দিল্লী-মিরাট স্তম্ভ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুলতান ফেরোজ পুরাতন দিল্লী হইতে কিছুদূরে নূতন রাজপাট স্থাপন করেন। তাঁহার নামে এই নূতন পত্তনের নাম হয় ফেরোজাবাদ। যমুনাতটে দক্ষিণে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে উত্তরে পীরগায়েবের কিছু উত্তরাঞ্চল পর্য্যন্ত ফেরোজাবাদ বিস্তৃত ছিল। ইহার কতকাংশ পরে সেরসাহী ও সাহজাহানী দিল্লীর অন্তর্ভূক্ত হইয়া গিয়াছিল। ফেরোজাবাদের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। এইখানে ফেরোজসাহের কোথিলা বা দুর্গ নামে পরিচিত এক ভগ্ন সৌধের উপরে প্রথম অশোকস্তম্ভটী অবস্থিত। সাহজাহান বাদসাহের দিল্লী সহরের দিল্লীদরওয়াজা হইতে অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে রাজপথের বামপার্শ্বে ফেরোজসাহের কোথিলার ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত।

সামস-ই-সিরাজ নামক জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থে ফেরোজসাহ কর্ত্তৃক স্তম্ভটী দিল্লীতে আনয়নের সুদীর্ঘ বিবরণ দেখা যায়। সিরাজ লিখিয়াছেন যে, তিনি নিজে স্তম্ভটী দিল্লীতে প্রতিষ্ঠাকরণ দেখিয়াছিলেন, এবং সে সময়ে তাঁহার বয়স বার বৎসর ছিল। যে স্থান হইতে উহা আনা হইয়াছিল বলিয়া সিরাজ লিখিয়াছেন তাহার প্রকৃত নাম কি তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। দিল্লী হইতে ৯০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত খিজরাবাদের অদূরে সালেরা তহসিলের অন্তর্গত তোপরা নামক স্থান হইতে স্তম্ভটী আনা হইয়াছিল বলিয়া সিরাজ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পারস্তভাষায় স্থান বা ব্যক্তির নাম যথাযথরূপে লিখিবার কোন উপায় নাই। তোপরা, তোপারা, তোপেরা, তোপর, তোব্রা, তোপরসুক, তোহেরা, তমেরা, নহেরা ইত্যাদি নানাপ্রকারে ঐ নাম উচ্চারিত হইতে পারে, কাজেই ঐ স্থানের প্রকৃত নাম কি ছিল, বা বর্ত্তমানে তাহার অবস্থান কি, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। দিল্লী হইতে দূরত্ব ও পাহাড়ের উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, যেখানে যমুনা নদী পার্ব্বত্যপ্রদেশ ছাড়িয়া সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে সেই অঞ্চলে ঐ নদীর উপর খিজিরাবাদ নামে যে নগর আছে সিরাজ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কয়েক মাইল পশ্চিমে সিধোরা নামে একটী গ্রাম দেখা যায়,—কানিংহামের মতে তাহাই মুসলমান ঐতিহাসিকের সালোরা। এই সিধোরার সন্নিকটবর্ত্তী বেলনস্থানেই স্তম্ভটী অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, প্রাচীন যুগে এতদঞ্চল শ্রুঘ্নদেশ নামে পরিচিত ছিল। হিউয়েনসঙ্গ স্থানেশ্বর হইতে ৬৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে যমুনার পশ্চিম তটে শ্রুঘ্নরাজ্যের রাজধানীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* মুশুরীর ১৫ মাইল পশ্চিমে যমুনা নদীর পশ্চিমতীরে কালসী গ্রাম সমীপে অশোকের চতুর্দ্দশ গিরিলিপির এক সংস্করণ আবিষ্কৃত

* S. Beal—Buddhist Records of the Western World, Vol. I pp. 186-87.

হইয়াছে। * সিধৌরা হইতে কালসীর দূরত্ব বড় বেশী নহে। কানিংহামের মতে কালসীতেই বা তাহার অনতিদূরেই শ্রুঘ্নরাজ্যের রাজধানী অবস্থিত ছিল। তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ না হইলেও, এই অঞ্চল যে প্রাচীন যুগে শ্রুঘ্ন নামে পরিচিত ছিল এবং এখানে যে বহু বৌদ্ধকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অশোকের শিলা ও স্তম্ভলিপির অবস্থান হইতেই অতি প্রাচীনযুগে এখানকার সুখসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সিরাজের গ্রন্থমধ্যে স্তম্ভটী স্থানান্তরকরণের সুদীর্ঘ বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে। স্তম্ভটী আনিবার সঙ্কল্প করিয়া সুলতান তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামে-সমূহের অধিবাসীদিগকে এই কার্য্যে সৈন্যগণকে সাহায্য করিবার আদেশ দেওয়া হইল। সকলকেই এই কার্য্যের জন্য নিজ নিজ যন্ত্রাদি লইয়া আসিতে বলা হইল। প্রথমে স্তম্ভটীর চতুষ্পার্শ্বে সিমুলতুলা খুব পুরু করিয়া বিছান হইল, যাহাতে মাটিতে পড়িয়া উহা ভাঙ্গিয়া না যায়। তলদেশ খোঁড়া হইলে গুরুভার স্তম্ভ ধীরে ধীরে সেই স্থূল গদীর উপরে পড়িল। তখন চারিপার্শ্বের তুলারাশি সন্তর্পণে অপসারিত করা হইলে স্তম্ভটী মাটির উপরে পড়িয়া রহিল। অনন্তর কাষ্ঠ ও চর্ম্মখণ্ড সহযোগে আমূল স্তম্ভটীকে খুব ভাল করিয়া মুড়িয়া ফেলা হইল, যাহাতে লইয়া যাইবার কালে আন্দোলনের ফলে প্রস্তরের কোন ক্ষতি না হয়। ইতিমধ্যে স্তম্ভটীকে বহনের জন্য ৪২টী চাকাবিশিষ্ট একটি সুদৃঢ় গাড়ী বিশেষভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি বহু আয়াসে স্তম্ভটীকে গাড়ীতে তুলিতে সক্ষম হইলে পরে, উহার প্রত্যেক চাকায় দৃঢ়সংবদ্ধ রজ্জু দুইশত ব্যক্তি ধরিয়া টানিয়া কোনমতে উহাকে যমুনাতীরে লইয়া আসিল। স্বয়ং সুলতান এই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। অনন্তর বহু সহস্র মণ ভারবহক্ষম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকায় তুলিয়া অনেককষ্টে স্তম্ভটীকে দিল্লীতে লইয়া আসা হয়। সুলতানের আদেশে ইহার জন্য একটী নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে থাকে এবং বহু আয়াসে স্তম্ভটীকে তুলিয়া তাহার চূড়ায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্তম্ভটীকে উত্তোলন কালে উহার তলদেশে বেদীরূপে ব্যবহৃত সুবৃহৎ এক খণ্ড চতুষ্কোণ প্রস্তর দেখা গিয়াছিল। এটিকেও দিল্লীতে আনিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল।

সিরাজ লাটটিকে দৈর্ঘ্যে ৩২ গজ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে ৮ গজ পরিমাণ অংশ প্রাসাদমধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। * বর্ত্তমানে স্তম্ভটী ৪২ ফুট ৭ ইঞ্চি দীর্ঘ, তন্মধ্যে ৪ ফুট ১ ইঞ্চি পরিমাণ অংশ কোথিলার ছাদে নিহিত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্তম্ভের আরও কতকটা ছাদে প্রোথিত ছিল। কোথিলার ধ্বংসাবশেষ এবং স্তম্ভগাত্রের অবস্থা হইতেও তাহা সমর্থিত হইতেছে। আধুনিককালে স্তম্ভের তলায় কোথিলার ছাদের নিরেট গাঁথুনির কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার ফলে তলার প্রস্তরবেদী দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আরও অনেকগুলি পুরাতন স্তম্ভের তলদেশেও এই ধরণের প্রস্তরবেদীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

সামস-ই-সিরাজের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, স্থাপনকালে সুলতান স্তম্ভটীর চূড়াদেশ শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত-কারুকার্য্যদ্বারা সুশোভিত করিয়া তদূর্দ্ধে সুবর্ণরঞ্জিত কলস স্থাপনা করিয়াছিলেন,—সেই হেতু ইহার নাম হয় "মিনার-ই-জরিন"। ১৬১১ খৃষ্টাব্দেও উইলিয়াম ফিঞ্চ নামক জনৈক ইংরাজ পর্য্যটক স্তম্ভটীকে এ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। †

স্তম্ভগাত্রে খোদিত লেখাগুলির মর্ম্মোদ্ঘাটনের জন্য নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া ফেরোজ অনেক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থভেদ করা দূরে থাক, কেহই লেখাগুলি পড়িতেও সমর্থ হয় নাই। পরিশেষে কয়েকজন ধূর্ত্ত ব্যক্তি এই রূপ ব্যাখ্যা করে যে, ফেরোজ সাহ নামক জনৈক সুলতান ব্যতীত অপর কেহই ঐ স্তম্ভ স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইবেনা—এই কথা স্তম্ভগাত্রে লিখিত আছে! বলা বাহুল্য ফেরোজের ন্যায় বিজ্ঞব্যক্তি এ চাটুবাণীতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।

* বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৩, পৃঃ ১৮৪-৮৬; মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* এখানে বলা ভাল যে, মুসলমান ঐতিহাসিকের গজ মাপে ১৬।০ ইঞ্চিরও কম দাঁড়ায়।

† Kerr's Voyages and Travels, 9. 423

সাজাহানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক শোভন রায়ের গ্রন্থেও অশোকের এই স্তম্ভটীর উল্লেখ দেখা যায়। দিল্লী নগরীর বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, ফেরোজাবাদ নগর হইতে তিন ক্রোশ দূরে ফেরোজসাহ একটী সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার ভিতরে একটী সুদীর্ঘ স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ স্তম্ভ অদ্যাপিও একটি গণ্ডশৈল পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সাধারণের নিকট ইহা ফেরোজ সাহের লাট নামে পরিচিত।*

ইউরোপীয় ভ্রমণকারিদিগের মধ্যে অনেকেই স্তম্ভটী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছে। টম কারিয়ট নামক একজন লিখিয়াছিলেন, "আমি এ দেশে দিলি নামক এক সহরে আছি। এইখানেই আলেকজান্দার দি গ্রেট ভারতবর্ষের রাজা পোরাসকে ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। জয়লাভের স্মারক চিহ্নরূপে তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রোঞ্জনির্ম্মিত স্তম্ভটী এখনও বর্ত্তমান আছে।" পাদ্রি এডওয়ার্ড টেরি টমের নিকট শুনিয়া লিখেন, "টম কারিয়টের নিকটে শুনিলাম যে, সে দিল্লী নগরে গ্রীক অক্ষরে লিপিযুক্ত মার্ব্বেলপ্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ স্তম্ভ দেখিয়াছে। কালের বশে লেখা অনেকাংশে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। টম বলিল যুদ্ধজয়ের স্মারক চিহ্নস্বরূপে আলেকজান্দার ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

টম কারিয়টের মত অনেকেই স্তম্ভটীকে আলেকজান্দারের প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রীক বা হিব্রু অক্ষরে ক্ষোদিত লিপিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালার অনেক অক্ষর দেখিলে গ্রীক অক্ষর বলিয়া মনে হয়। উভয় বর্ণমালার আশ্চর্য্য রকম সৌসাদৃশ্য আছে।

দিল্লীর স্তম্ভটীকে অনেকেই ধাতুনির্ম্মিত বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বিশপ হেবারের ন্যায় পণ্ডিতব্যক্তিও এই ভুল এড়াইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার রোজনামচায় একবার এই স্তম্ভটীকে ঢালা লোহায় নির্ম্মিত এবং অপর একস্থলে চন্দ্ররাজার লৌহস্তম্ভকে 'ফেরোজসাহের দুর্গের ধাতুস্তম্ভের অনুরূপ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।†

* তারিখ-উল-মাসির। † Bishop Heber's Journal. II, 291-307.

এজন্য কিন্তু উঁহাদের বিশেষ দোষ দিতে পারা যায়না। কারণ স্তম্ভটী যেরূপ সুন্দর পালিসযুক্ত ও উজ্জ্বল তাহাতে ইহাকে ধাতু নির্ম্মিত বলিয়া মনে করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মৌর্য্যশিল্পের বিশেষত্ব যে উজ্জ্বল পালিস, তাহা পূর্ব্বের ন্যায়ই এখনও ইহার অঙ্গে অম্লান রহিয়াছে। যাঁহারা অশোক শিল্পের নমুনা দেখিয়াছেন তাঁহারা এ কথার তাৎপর্য্য অবগত আছেন। কঠিন প্রস্তর কিরূপে প্রাচীনশিল্পীর হস্তে দর্পণের ন্যায়ই উজ্জ্বল ও মসৃণ হইয়া উঠিত সে রহস্যের সন্ধান আধুনিক বৈজ্ঞানিক এখনও নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্তম্ভটী দৈর্ঘ্যে ৪২ ফুট ৭ ইঞ্চি, তন্মধ্যে ৪ ফুট ১ ইঞ্চি কোথিলার ছাদে প্রোথিত। উপর হইতে ৩৫ ফুট দীর্ঘ স্তম্ভদণ্ড সুন্দররূপে মসৃণ করা ও উজ্জ্বল পালিসযুক্ত। বাকী অংশে পালিস নাই; এমন কি উহা ভাল করিয়া মসৃণ করাও নহে, স্থানে স্থানে বাটালীর দাগও তোলা হয় নাই। এ জন্য মনে হয় যে, এই অংশ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত ছিল। স্তম্ভের সর্ব্বোচ্চ অংশের ও সর্ব্বনিম্ন অংশের ব্যাস যথাক্রমে ২৫.৩ এবং ৩৮.৮ ইঞ্চ। সুতরাং ৪২॥০ ফুট দীর্ঘ স্তম্ভদণ্ড প্রস্থে ১৩॥০ ইঞ্চ হ্রাস পাইয়াছে, অর্থাৎ প্রতিফুটে হ্রাসের পরিমাণ .৩৯ ইঞ্চি। অশোকের সবকয়টী স্তম্ভই এইরূপ উপরিদেশে ক্রমসূক্ষ্ম। স্তম্ভটী গোলাপীবর্ণের ছিটেছিটে বালুপাথরের।

দিল্লীতোপরা স্তম্ভেই সুধু অশোকের সমগ্র সাতটী অনুশাসন দেখা যায়। প্রথম ছয়টী অনুশাসন আরও নানাস্থানে দেখা গিয়াছে, কিন্তু সপ্তমলিপি আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। অক্ষরগুলি পরিষ্কার এবং সুন্দর ও গভীরভাবে খোদিত। চটাউঠার ফলে মধ্যেমধ্যে দুই একটী অক্ষরমাত্র নষ্ট হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রের চারিপার্শ্বে অনুশাসন গুলি পৃথক পৃথক স্তবকে খোদিত। উত্তর গাত্রে প্রথম তিনটী, পশ্চিমে চতুর্থ, দক্ষিণে পঞ্চম এবং পূর্ব্বগাত্রে ষষ্ঠ ও সপ্তম লিপির প্রথম একাদশ পংক্তি খোদিত। সপ্তম অনুশাসনের অবশিষ্ট অংশ এই গুলির নিম্নে স্তম্ভগাত্র বেড়িয়া মণ্ডলাকারে খোদিত। পূর্ব্বে সকলে ইহাকে একটা পৃথক

বা অষ্টম অনুশাসন মনে করিতেন। বুলহার ও কার্ণ সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, এই অংশ সপ্তম অনুশাসনেরই শেষ অংশ, এবং পরে সে সিদ্ধান্ত সকলেই মানিয়া লন। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, প্রথম ছয়টী অনুশাসন হইতে অপেক্ষাকৃত পরে সপ্তমলিপি প্রচারিত হয়। এই লিপির অক্ষরগুলি পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দরভাবে খোদাই করা নয়; কতকটা বাঁকা ও হেলান ধরণের, দেখিলেই মনে হয় যেন তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ সারা হইয়াছে। ছাপা লেখা ও হাতের লেখায় যে প্রভেদ, এই দুই অংশের অক্ষরের পার্থক্যও ঠিক সেই প্রকারের না হইলেও সেই ধরণের বটে।

অশোকের অনুশাসনগুলি ব্যতীত স্তম্ভগাত্রে চৌহানরাজ বিসালদেবের দুইটি লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। দুইটিই ১২২০ সম্বৎ বা খৃষ্টীয় ১১৬৩ অব্দে খোদিত হইয়াছিল। একটী লেখা অশোকের অনুশাসনগুলির কিছু উর্দ্ধে ও অপরটী তাহাদের নিম্নে অবস্থিত। লেখাগুলি হইতে চোহানরাজের শাকম্ভরীবিজয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত সকল যুগেরই দর্শক ও সাধারণ ব্যক্তির উৎকীর্ণ নাম ও নানাপ্রকার ছোট ছোট লেখা ইহার গাত্রে দেখা যায়। ঐতিহাসিকের নিকট এগুলির কোনই মূল্য নাই।

এইবারে অপর স্তম্ভটীর কথা বলা যাইতেছে। সামস-ই-সিরাজের লেখা হইতে জানা যায় যে, মিরাট হইতে আনিয়া সুলতান ফেরোজ এটাকে স্বীয় কুষক-ই-শিকার বা শিকার প্রাসাদের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুশক-ই-শিকার যেখানে ছিল বর্ত্তমানে সেখানে পীরগায়েব এবং ট্রিগনমেট্রি-কাল সার্ভে অফিস অবস্থিত। আধুনিক দিল্লী সহর বা সাহজাহানাবাদের উত্তর পশ্চিমে মোরিগেট হইতে তিন পোয়া দূরে রীজ বা ফত্তেগড় পাহাড়ের উপর বর্ত্তমানে স্তম্ভটী অবস্থিত।

আধুনিককালে স্তম্ভটী যখন আবিষ্কৃত হইয়াছিল তখন ইহা পাঁচখণ্ডে ভগ্ন অবস্থায় মাটির উপর পড়িয়া ছিল। ফেরুক-সিয়ারের রাজত্বকালে (১৭১৩-১৯ খৃষ্টাব্দ) নিকটবর্ত্তী এক বারুদখানায় দৈবক্রমে অগ্নিকাণ্ড ঘটায় তাহার প্রচণ্ড বিস্ফোরণজনিত কম্পনে স্তম্ভটী মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। পাদ্রি টাইফেনথেলার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এদেশে বাস করিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে রিজের উপর পাঁচ টুকরায় ভূপতিত দেখেন এবং শুনিয়াছিলেন যে, কিছুকাল পূর্ব্বে বারুদে আগুন লাগার ফলে স্তম্ভটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

দীর্ঘকাল এইভাবে পড়িয়া থাকার পর যে অংশে অশোকের অনুশাসনগুলি উৎকীর্ণ সেই খণ্ডটী কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর মিউজিয়মে লইয়া যাওয়া হয়। কয়েক বৎসর পরে আবার সেটীকে দিল্লীতে প্রত্যর্পণ করা হয় এবং সব কয়টী টুকরা জোড়া দিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্তম্ভটীকে তাহার বর্ত্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

স্তম্ভটীর বর্ত্তমান দৈর্ঘ্য ৩২ ফুট ৯ ইঞ্চি। অভগ্ন অবস্থায় স্তম্ভটীর দৈর্ঘ্য কত ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে নানাকারণে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এটী অন্যান্য অশোক স্তম্ভ অপেক্ষা আকারে কিছু ছোট ছিল। সিরাজও ইহাকে প্রথম স্তম্ভটী অপেক্ষা ছোট বলিয়াছেন।

মিরাট স্তম্ভের অনুশাসনগুলির নিতান্তই চরম অবস্থা। স্তম্ভটি চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ায় ফলে প্রস্তর গাত্র ঝরিয়া যাওয়ার জন্য লেখাগুলির গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় অশোকের স্তম্ভলিপিগুলির একাধিক সংস্করণ আছে। নচেৎ যদি শুধু এই স্তম্ভটীর উপর নির্ভর করিতে হইত তাহা হইলে ঐ বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় ছিল না। এই স্তম্ভটীর গাত্রেও এলাহাবাদ, নন্দনগড়, অররাজ এবং রামপুরোয়ার স্তম্ভের অনুরূপ অশোকের সপ্তমস্তম্ভলিপির প্রথম ছয়টী অনুশাসন উৎকীর্ণ ছিল বলিয়া মনে হয়। তন্মধ্যে প্রথমটীর শুধু শেষাংশের কয়েকটী কথা আছে, দ্বিতীয়টীর কয়েকটী কথা নষ্ট হইয়াছে, তৃতীয়টীর প্রায় সবটাই আছে, চতুর্থ ও পঞ্চম অনুশাসনের প্রায় অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়াছে, ষষ্ঠ অনুশাসন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত পাঁচটী অনুশাসনের প্রায় অর্দ্ধাংশ আছে।

সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য এস্থানে অশোকের অনুশাসনগুলির ব্যক্তব্যবিষয়ের সারমর্ম্ম প্রদান করা বোধ

হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নিম্নে কোনটীতে কি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা বলা যাইতেছে।

প্রথম—ধর্ম্মের প্রসার ও তাহার উপায়।

দ্বিতীয়—ধর্ম্ম কি? তাহার ব্যাখ্যা।

তৃতীয়—নিজ নিজ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ।

চতুর্থ—শাসন ও দণ্ডদানবিষয়ে রাজুকদিগের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য।

পঞ্চম—পশুবধ নিবারণের প্রচেষ্টা।

ষষ্ঠ—প্রজাগণের হিতসাধন, সর্ব্বধর্ম্মে সম্মান প্রদর্শন ও স্বধর্ম্মে অনুরাগ।

সপ্তম—ধর্ম্মবিধি প্রচারের ব্যবস্থা ও তদ্বিষয়ক অতীত কার্য্যাবলীর আলোচনা।

জেমস প্রিন্সেপ সাহেব সর্ব্বপ্রথম অশোকলিপিগুলির পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি ১৮৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব অনুশাসনগুলির এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। অনন্তর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বুলহার সাহেব অশোকের স্তম্ভলিপিগুলির নূতন করিয়া পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করেন। বুলহারউদ্ধৃত পাঠই এতদিন প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইত। সম্প্রতি E. Hultzsch অশোক অনুশাসনগুলির নূতন এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনের মত দেশ

শ্রীযুক্তা লীলা দেবী

নিজের ব'লে থাক্‌তো যদি এমন একটি দেশ।
শস্যে ফলে পুষ্পে ভরা, নির্জ্জন গ্রামের শেষ,
সেথায় যদি বছর সারা বাঁধ্‌তো মধু বাসা,
ফুল যদি না ঝ'রতো কভু, ফুট্‌তো চির আশা,
মিহিন্ আঁধার নিদ্‌মহলে গড়তো রূপের রাকা,
সূর্য্যকিরণ ভ'রত মিঠা চাঁদের আলোয় মাখা,
সেথায় ব'সে হাসির বনে কাট্‌তো সুখে কাল,
বাতাস দিত নত্র ডালে বকুল অশোক লাল,
বাপীর মাঝে কমল বনে মধুপ গুঞ্জন,
সে সুর শুনি' নিশিদিনই তন্দ্রাহত মন!
জন্ম মরণ কিছুই যদি থাক্‌তো না সে দেশে,
দুঃখ ও সুখ দ্বন্দ্ব যদি না বাধতো এসে,
জীবন তবে বইতো যেন একটী টানা গান,
থাক্‌তো যদি নিজের ব'লে একটী এমন স্থান।

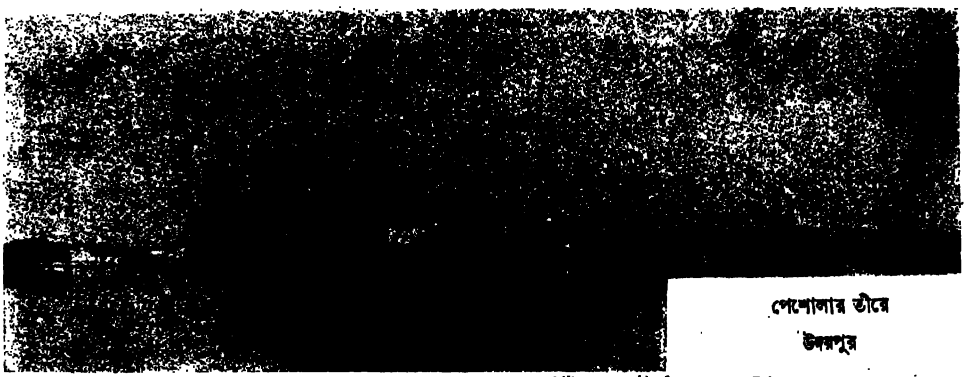
রাজপুতানা ভ্রমণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার এম-এ, বি-এল

উদয়পুর

সেদিন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রে উদয়পুরের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় মোটেই সুখের হয় নাই। ষ্টেশনে নামিয়াই প্রথম একদফা এক সরকারী কর্ম্মচারীর কাছে আমাদের নাম-ধাম-প্রয়োজন ইত্যাদি কৈফিয়ৎ লেখাইতে হইল। এত রাজ্য ঘুরিয়া আসিলাম, কৈফিয়ৎ দেওয়া এই প্রথম। তার পরে মেবাররাজ্যের অতিথি আমরা—আমাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন এক খাঁসাহেব। ষ্টেশনের বাহিরে অন্ধকার, তার মধ্যে টঙ্গার চেহারা যা শুদ্ধ আপিশ। যা'হৌক্ খাঁ সাহেবের সার্টিফিকেটে সে যাত্রা আমরা বিনা ক্লেশেই উদ্ধার পাইয়াছিলাম।

শোভাযাত্রা অগ্রসর হইয়া চলিল, কিন্তু ইতিমধ্যে রাস্তার ধূলার এবং টঙ্গার গতিভঙ্গীর কল্যাণে আমাদের দেহের শোভা প্রায় দর্শনের অযোগ্য হইয়া উঠিল। অন্ধকারে তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া অবশেষে যখন ফুলচাঁদজীর 'দোকানের' সামনে পৌছিলাম, তখনও মনটা বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠিল না। একটি দ্বিতল আর একটি একতল ছোট বাড়ী লইয়া দোকান—তাও যত বিদেশীর কলরবে ভরা। সে রাত্রে আমাদের অদৃষ্টে একটির বেশী



পেশোলার তীরে
উদয়পুর

চোখে পড়িল তা পূর্ব্ববৎ—নবীন রাজধানী উদয়পুর একেবারে প্রাচীনেরই অনুবর্ত্তী। চারিটি টঙ্গা বোঝাই করিয়া সবে পথে বাহির হইয়াছি এমন সময়ে এক কর্কশ কণ্ঠের চীৎকারে আমাদের অষ্টাশ্ববাহিত শোভাযাত্রার অপরূপ সঙ্গীত হঠাৎ থামিয়া গেল। প্রথমে মনে হইয়াছিল চিতোরের মত এ টঙ্গাওয়ালাদেরও এ মাসের মাশুল বাকী আছে, এবং সর্ব্বত্র যত মাশুল-অনাদায়ী টঙ্গা আমাদেরই অদৃষ্টে কেন জুটিতেছে তা ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। পরে দেখা গেল—এটি মাশুল আদায়েরই ব্যাপার বটে, কিন্তু টঙ্গাচালকদের নয়—আমাদের, অর্থাৎ সোজা কথায় এটি ঘর জুটিল না—তবে পরের দিন আমরা সমস্ত দ্বিতল বাড়ীটি পাইয়াছিলাম। খবরদারী করিবার জন্য এক 'মায়ী' আসিলেন; তাঁর যেমন চেহারা তেমনি গলার আওয়াজ। জল চাহিতে কোন্ বাউড়ী না কি হইতে যে জল আসিল তার যেমন রং তেমনি স্বাদ; মিঠাপানি পয়সা দিয়া কিনিতে হয়। রাজপুতানার মরুভূমিতে এই যথেষ্ট বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া গেল।

উদয়পুরের যথার্থ পরিচয় পাইলাম পরদিন (২২শে) সকালে—পোষ্টাপিশের পথে। প্রাচীন উদয়পুর চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা—তার পশ্চিম প্রান্তে পেশোলা হ্রদ আর

রাজপ্রাসাদের শ্রেণী। প্রাচীরের বাহিরে পূর্ব্বদিকের সহর-তলীতে পোষ্টাপিশ, উদয়পুর হোটেল এবং উত্তরদিকে রেসিডেন্সী। পোষ্টাপিশটি উচু জায়গায় বলিয়া সমস্ত সহরের দৃশ্য এখান হইতে পরিষ্কার দেখা যায়। মনে হইল প্রাতঃসূর্য্যকিরণে সমস্ত সহর যেন হাসিয়া উঠিয়াছে; দূরে পশ্চিমপ্রান্তে সজ্জনগড় শৈল আর তার শৃঙ্গে রাজপ্রাসাদটি যেন একখানি ছবি; আরও নিকটে নীল-সলিলা পেশোলার তীরে শুভ্র সুধাধবলিত প্রাসাদগুলি সূর্য্যালোক-প্রতিফলিত হইয়া ঝলমল করিতে লাগিল। উদয়পুর যে সুন্দর—দৃশ্য-শোভায় নাকি সুন্দরতম প্রাচীন নগরী, তা এইখানে প্রথম উপলব্ধি করিলাম।

বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া পাশ লইয়া আমরা পেশোলার তীরে হাজির হইলাম।

পেশোলার পূর্ব্বতীর জুড়িয়া খুব একটা উচু জমির উপর প্রাসাদগুলি একেবারে জলের ধার হইতে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে।

প্রাসাদের প্রধান তোরণ 'বড়ী পোল' উত্তর দিকে, পূর্ব্বদিকে আর একটি তোরণ আছে। বড়ী পোলের পর অশ্বশালা, হাতীশালা, রক্ষীনিবাস ইত্যাদি। মস্ত মস্ত দুই চারিটা জয়ঢাকও সেখানে দেখিলাম। তার পরে 'বড়ীমহল' নামে প্রাচীন প্রাসাদ—বিভিন্ন যুগের অনেক রাণার কীর্ত্তি। তার পাশে 'মিণ্টোহল' নামে বিরাট দরবার-গৃহ; তার পর



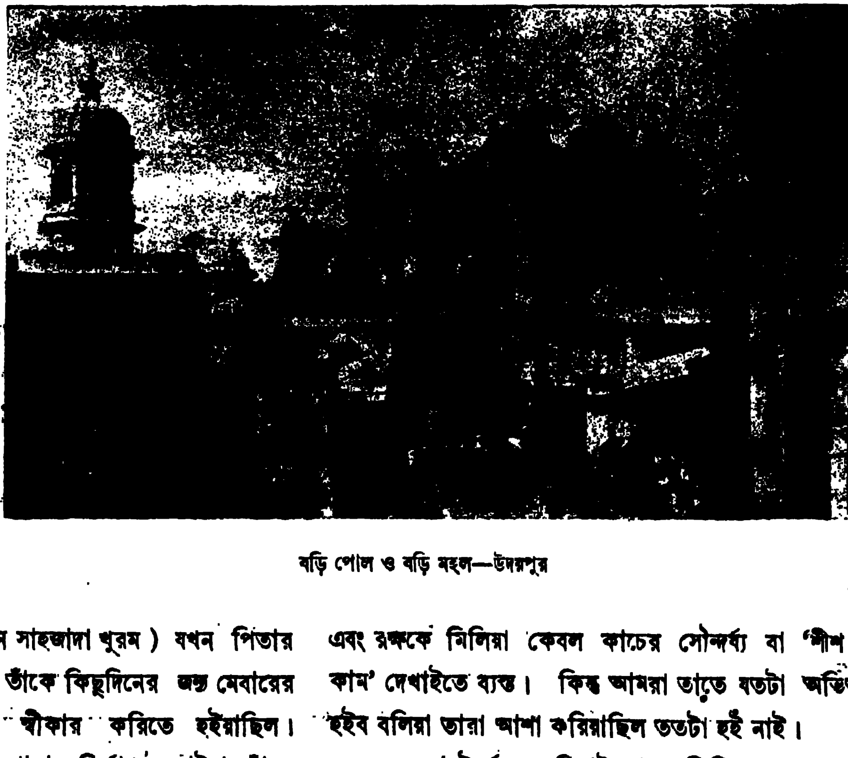
উদয়পুর সহর—সাধারণ দৃশ্য

প্রাসাদ দেখিবার জন্য পাশ লাগে, তার মালিক উদয়পুর সরকারের দেওয়ানজী—বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙ্গালী। বাড়ীতে তাঁকে না পাইয়া আমরা পুরাতন প্রাসাদের দপ্তরখানায় তাঁকে পাকড়াও করিলাম। দপ্তরখানা খুব জমকালো নয়, নানা অলিগলি ভাঙ্গিয়া সেখানে পৌছিতে হইল। আপিশের বন্দোবস্ত সব দেশী কায়দায়; সকালে বিকালে বসে, কৌচ কেদারার পাট নাই, দেওয়ানজীর আসনও মেজের গালিচার উপরে। প্রভাস

শম্ভুনিবাস—এখন গেষ্টহাউস রূপে ব্যবহৃত; সকলের শেষে শিবনিবাস—মহারাণার বর্ত্তমান আবাস-ভবন। পূর্ব্বপ্রান্তে গোলাপবাগ উদ্যান; দক্ষিণে একলিংগড় শৈলমালা পাষাণ প্রহরীর মত প্রাসাদের পার্শ্বদেশ রক্ষা করিতেছে। পেশোলার পশ্চিমদিকে আর এক সুবিস্তৃত শৈলমালা উত্তর প্রান্তে সজ্জনগড় শৈলের সহিত মিশিয়াছে। একলিংগড়ের উপর মস্ত প্রাকার, আর সব পাহাড়গুলির গায়ে অসংখ্য Shooting box, দূর হইতে ঠিক যেন হাতীর দাঁতে তৈরী বাক্সের মতই দেখায়।

তিনদিকের এই পাহাড়ের কোলে নীল-সলিলা পেশোলা —তার জল স্থির, নিস্তরঙ্গ। হ্রদের গর্ভে ছোট বড় অনেকগুলি দ্বীপ—তার উপরেও প্রাসাদ। বড় ছোট দ্বীপের উপর জগমন্দির এবং জগনিবাস-প্রাসাদ—যেন একেবারে হ্রদের বক্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। নৌকা করিয়া সেখানে যাইতে হয়, সে নৌকা আবার সরকারী, ভাড়া দিতে হয় না বটে কিন্তু পাশ না দেখাইলে ছাড়ে না। জনসাধারণের পেশোলায় নৌবিহার করিবার অধিকার নাই—শুধু পেশোলায় কেন—কোন হ্রদেই নাই। উদয়পুর রাজ্য নিষেধ এবং 'হুকুম নেহি'র বেড়া দিয়া ঘেরা, এ যাত্রায় অনেকবার তার পরিচয় পাইয়াছিলাম। নৌকায় চড়িয়া একটু ঘুরিয়া যাইবার প্রার্থনা জানাইয়া উত্তর শুনিতে হইল, 'হুকুম নেহি'।

জগমন্দির প্রাসাদ নয়—বিশ্রামাবাস। এক বিস্তৃত শ্বেত পাথরে বাঁধান অঙ্গনে আমরা নৌকা হইতে নামিলাম। জলের ধারে কয়েকটি সুন্দর হস্তীমূর্ত্তি; অঙ্গন পার হইয়া 'গুলমহল' বিশ্রামাবাস।



বড়ি পোল ও বড়ি মহল—উদয়পুর

সম্রাট সাজাহান (তখন সাহজাদা খুরম) যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন তাঁকে কিছুদিনের জন্য মেবারের রাণা কর্ণসিংহের আতিথ্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেই সময়েই নাকি গুলমহল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁকে বাসের জন্য দেওয়া হয়। মহলের মাথায় গম্বুজ মুসলমানী যুগের—হিন্দুস্থাপত্যের আদর্শে নয়, এবং মহলের পিছনে নাকি এক ফকিরের চৈত্য আছে। পরবর্ত্তী রাণা জগৎসিংহ একে জগমন্দিরে পরিণত করেন, কিন্তু সাজাহানের স্মৃতি এখনও লুপ্ত হয় নাই।

জগনিবাসও রাণা জগৎসিংহের কীর্ত্তি, তবে পরবর্ত্তী কালের অনেক নূতন মহলও ইহার ভিতরে আছে। মহারাণার পুত্র (বর্ত্তমান মহারাণা) তখন এখানে বাস করিতেন বলিয়া আমরা প্রাসাদের সামান্য অংশই দেখিতে পাইয়াছিলাম। মস্ত প্রাসাদ—তার মধ্যে উদ্যান, জলাধার, কৃত্রিম ফোয়ারা সবই আছে। কয়েকটি কক্ষের সজ্জা আমাদের বিশেষ ভাবে দেখান হইল কিন্তু আমরা তার মধ্যে দর্শনীয় কিছুই পাইলাম না। তবে মাঝে মাঝে রঙীন কাচের কারিকুরী উল্লেখযোগ্য। কাচের উপর মেবার-রাজবংশের অসাধারণ প্রীতি। শুধু এ প্রাসাদেই নয়—সর্ব্বত্রই গাইড এবং রক্ষকে মিলিয়া কেবল কাচের সৌন্দর্য্য বা 'শীশ কা কাম' দেখাইতে ব্যস্ত। কিন্তু আমরা তাতে যতটা অভিভূত হইব বলিয়া তারা আশা করিয়াছিল ততটা হই নাই।

সে বেলা ঐপর্য্যন্ত দেখিয়াই আমরা ফিরিলাম। প্রাসাদের পথে বাজারের মধ্যে একটি প্রাচীন সপ্তদশ শতাব্দীর মন্দির দেখা গেল—তার দেবতা জগদীশ বা জগন্নাথ, যদিও মূর্ত্তি জগন্নাথের নয় এবং শ্রীক্ষেত্র ছাড়িয়া তাঁর এতদূর আসিবারও কোনও কারণ দেখা যায় না। জগন্নাথ গরুড়বাহন—সামনে একটি ছোট মন্দিরে বদ্ধপাণি বিরাট পিতলের গরুড়মূর্ত্তি

দেখা গেল। মন্দিরটি সুন্দর, দেওয়াল উৎকীর্ণ মূর্ত্তিতে ভর্ত্তা এবং সে সব মূর্ত্তি কেবল দেবমূর্ত্তি নয়; শিল্পী দেবতার পাশে সাধারণ মানুষকেও মন্দির গাত্রে স্থান দিয়াছেন।

অপরাহ্নে গোলাপবাগ এবং খাস্ উদী দেখিয়া আসা গেল। গোলাপবাগ মস্ত উদ্যান—তার এক প্রান্তে ভিক্টোরিয়ার এক মূর্ত্তি এবং ভিক্টোরিয়া হল মিউজিয়াম। তার ভিতরে মেবারের শিল্প-সমৃদ্ধির নমুনা এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্যে বিভিন্ন যুগের অসংখ্য উষ্ণীষ এবং শিরস্ত্রাণ দেখিলাম। একটি উষ্ণীষ নাকি সাজাহানের—যেটি তিনি রাণা কর্ণের সঙ্গে 'পাগড়ী বদল' বা মৈত্রীবন্ধনের সময়ে ব্যবহার করিয়াছিলেন। উদ্যানের মধ্যে একটি চিড়িয়াখানাও আছে।

'খাস্ উদী' কথাটার অর্থ কি জানিনা, বুঝাইয়া দিবার মত কাকেও পাই নাই; কিন্তু গিয়া দেখি সেটি একটি বিরাট ভোজের ব্যাপার—মানুষের নয়—বন্য শূকরের। শুনিলাম ভূতপূর্ব্ব কোনও মহারাণার নাকি শূকর শীকারের ভয়ানক আগ্রহ ছিল। কিন্তু বনে বনে শীকারের সন্ধানে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া তিনি এইখানে শূকরপালের এক দৈনিক ভোজের ব্যবস্থা করেন—যাতে উক্ত বুদ্ধিহীন জীব সব আহারের লোভে আপনিই সামনের পাহাড় হইতে নামিয়া আসে। এখন শীকার বন্ধ, কিন্তু ভোজ বিতরণ বন্ধ হয় নাই। পেশোলার পশ্চিম তীরে একটি ছোট অট্টালিকা, তার পিছনে নিত্য এই ভোজের অনুষ্ঠান। রোজ বিকালে সামনের পাহাড় হইতে অসংখ্য শূকর এখানে নামিয়া আসে—সেই পালে পালে আসাটাই নাকি একটা দেখিবার জিনিস। আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন ভোজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, শূকর সম্প্রদায় জব ছোলা ছাতু প্রভৃতি লইয়া বড়ই ব্যস্ত। তবে তাদের আর বন্য বলা অন্যায়, এখন তারা রীতিমত সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত এবং দর্শনীয় বটে।

পরের দিন (২৩শে) সকালে আবার প্রাসাদে যাওয়া গেল—আমাদের বাড়ীওয়ালা ফুলচাঁদজীর সঙ্গে, তাঁরই মোটর বাসে। এর ইতিহাসটুকু এই—উদয়পুরে পৌঁছিয়াই আমরা জয়সমুদ্র যাওয়ার কল্পনা করিতেছিলাম। জয়সমুদ্র উদয়পুর হইতে ৩২ মাইল—পথ গভীর জঙ্গলের মধ্যে, মোটর চলে বটে কিন্তু খাস্ মহারাণার অনুমতি ছাড়া কেউ মোটর লইয়া যাইতে পারে না। ফুলচাঁদজীর একখানি মোটর বাস ছিল; তিনি মহারাণার 'ওয়াকিল', রাজদরবারে নাকি সম্মানও আছে—তাই আমাদের কাছে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, আমরা তাঁর বাস্ ভাড়া করিলে তিনি জয়সমুদ্রের পাশ জোগাড় করিয়া দিতে পারেন। আমাদের তাতে আপত্তি ছিল না, সুতরাং পাশের চেষ্টায় পরদিন সকালেই প্রাসাদে যাইতে হইল।

এবার পূর্ব্বতোরণ দিয়া আমরা ঢুকিলাম। শিবনিবাসের সামনে আমাদের দাঁড়াইতে বলিয়া 'ওয়াকিল' সাহেব দরবারে প্রবেশ করিলেন। এক ঘণ্টার উপর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল (কেউ বসিতে বলিল না)—প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা করিতেছিলাম এই বুঝি দরবারে ডাক পড়ে এবং তার জন্য হিন্দী বুলিও রপ্ত করিতেছিলাম। অনেক লোকজন প্রাসাদে আসা যাওয়া করিতেছিল—তবে তাদের মধ্যে আমীর ওমরাহ গোছের কাকেও দেখিলাম না। রাজপুতের পরিচয় দাড়ীতে—এরা বড় দাড়ী রাখে না, খুব ছোটও করে না, যেটুকু রাখে তা মাঝখানে দুভাগ করা এবং উপরে তুলিয়া দেওয়া। বেশ-লম্বা আচকান, দুই পাশে সূতা দিয়া আটকান, অনেকের তার উপরে একটা কোট। কোমরে কোষবদ্ধ তরবারীও ঝুলিতে দেখা গেল। প্রাচীন যুগের চিত্রে যে পোষাক দেখা যায়, এখনও তা প্রায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

যাক্, দরবারে আমাদের ডাক পড়িল না, একটা কাগজে নাম ধাম পরিচয় লিখিয়া দিয়াই আমরা নিষ্কৃতি পাইলাম। ফুলচাঁদজী জানাইয়া গেলেন পাশের হুকুম হইয়াছে এবং আমাদের প্রাসাদে ঢুকিতে অনুমতি দিলেন—অবশ্য কালকের পাশের বলে। শিবনিবাসে ঢুকিবার সময় জুতা এবং মোজা দুইই খুলিতে হইল, কিন্তু টুপী রাখিতে হইল, 'শিরনাঙ্গা' হইলে চলিবে না। মোজা খুলিয়া একেত্রে ভালই হইয়াছিল—কারণ প্রাসাদের অঙ্গনে মহারাণার হরিণ, কৃষ্ণসার এবং পাখীর দল ভদ্রভাবে পা ফেলার স্থান আর বড় রাখে নাই। এই জীবগুলি নাকি মহারাণার খুবই প্রিয়; আমাদের

তাতে আপত্তি ছিল না—যদি চিড়িয়াখানায় তাদের স্থান দেওয়া হইত।

শিবনিবাসের বাহিরের কয়েকটি কক্ষমাত্র দেখিতে দেওয়া হয়। কয়েকটি কক্ষে মহারাণার খাস কাছারী বসিয়াছে, শুনিলাম মহারাণাও নাকি এর একটি কক্ষে রোজ সকালে বসিয়া দরবার করিতেন। কক্ষগুলির সাজসজ্জা দেশী রকমের। একটিতে ভূতপূর্ব্ব মহারাণাদের বড় বড় তৈলচিত্র দেখিলাম। কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনারও চিত্র আছে, যেমন-ভীমসিংহ কর্ত্তৃক বৃটিশ দূতের অভ্যর্থনা।

শম্ভুনিবাস প্রাসাদটি বড় বড় সম্মানিত রাজঅতিথিদের সম্বর্দ্ধনার জন্য নির্দ্দিষ্ট। বড় বড় ছবি, ডিনার টেবিল, সোফা, কাটগ্লাসের টেবিল চেয়ার অনেক দেখা গেল। উদয়পুর প্রাসাদের একটি স্ফটিক পালঙ্কের খ্যাতি অনেকদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, অনেক অনুসন্ধানের পর এখানে তার সন্ধান মিলিল বটে, কিন্তু দেখা গেল সেটি স্ফটিকাধার নয় কাটগ্লাসের পালঙ্ক মাত্র। শম্ভুনিবাসের পাশে দরবার-হল তখন নতুন করিয়া গড়া হইতেছে।

তার পরেই প্রাচীন প্রাসাদ বা প্রাসাদের সমষ্টি 'বড়ী-মহল'। ঢুকিয়াই মনে হইল যেন প্রাচীন রাজস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছি—ছোট ছোট কক্ষ, স্বল্পপরিসর সোপানশ্রেণী, ছোট ছোট গবাক্ষ—সমস্তই প্রাচীন যুগের নিদর্শন। কক্ষগুলিতে সজ্জার অভাব, তাদের চিত্রকলা নিষ্প্রভ, অনেক জায়গায় ফাটল পর্য্যন্ত ধরিয়াছে। এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন যুগের অনেক মহল আছে তা অমরনিবাস ভীমনিবাস প্রভৃতি নামেই পরিচয়। অনেক কক্ষের নামও বিচিত্র—মতিমহল, সূর্য্যমহল, চিনি কা চিত্র মহল ইত্যাদি। সূর্য্য-মহলে একটি মস্ত গোলাকার ধাতুনির্ম্মিত সূর্য্যমূর্ত্তি দেওয়ালে লম্বিত আছে। এখানেই নাকি রাণা ভীমসিংহ বৃটিশরাজদূত কর্ণেল টড্‌কে অভ্যর্থনা করেন। একটি ক্ষুদ্র কক্ষের দেওয়াল, মেজে, ছাদ সমস্তই পুরু কাচের। আর একটি মহলের দেওয়াল ভরিয়া কাচের উপর এনামেলের কাজ এবং অসংখ্য ছোট ছোট অদ্ভুত চিত্র—সেগুলি নাকি কোন্ চীনা চিত্রকরের কীর্ত্তি—এমনি কক্ষ যে কত তার শেষ নাই। ভিতরের ত এই, বাহিরেও প্রাসাদের বিশাল আয়তন, তোরণ, স্তম্ভ, সূর্য্যা-লোকবিচ্ছুরিত শুভ্র-মর্ম্মরের শোভা যেমন বিস্ময়কর তেমনি চমৎকার।



উদয়পুর রাজপ্রাসাদ—শিব নিবাস

রাণা অমর এই প্রাসাদের সূচনা করেন। উদয়সিংহ বা প্রতাপসিংহ পেশোলার তীরে বাস করেন নাই—তাঁদের বাসভবন কোথায় ছিল জানিনা, আমাদের গাইড্ ত ফতেসাগরের তীরে পাহাড়ের উপর এক জীর্ণ ভগ্ন প্রাসাদকে রাণা প্রতাপের বাসস্থান বলিয়া দেখাইয়াছিল। শেষ জীবনে এই পেশোলার তীরে কুটির তুলিয়া প্রতাপ বাস করিয়াছিলেন। এমনই এক কুটিরে তিনি যখন মৃত্যু-শয্যায় তখন অমরের ভোগস্পৃহা লক্ষ্য করিয়া তিনি ভবিষ্যদ্-বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর সেই সব কুটির

ভাঙ্গিয়া বড় বড় প্রাসাদ তোলা হইবে এবং মেবারের স্বাধীনতাও তার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হইবে। এই সব সৌধরাজি যেন সেই মৃতের শেষ নিঃশ্বাসের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রাসাদ দেখা শেষ করিয়া পেশোলাকে আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাইয়া আমরা ফতেসাগর হ্রদের দিকে রওনা হইলাম। ফতেসাগর মহারাণা ফতেসিংহের কীর্ত্তি—নগরের বাহিরে সজ্জনগড় শৈলের পাদমূলে অবস্থিত। উত্তর দিকের তোরণ দিয়া বাহির হইয়া আমাদের প্রায় দুই মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে হইল। রাস্তার দুই পাশে সব বাগানবাড়ী, মহারাণার প্রসিদ্ধ উদ্যান সাকেলি ও কা বাগ বা ক্রীতদাসীর বাগানও এই পথে। এই বাগের প্রধান সৌন্দর্য্য—তিনটি ফোয়ারা, মহারাণার বিশেষ অনুমতি পাইলে সেগুলি দেখা যায়। 'ও।কিল' সাহেব আমাদের তার জন্যও পাশ জোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। উদ্যান বাটিকার প্রবেশ পথে, প্রাঙ্গণে এবং পিছনে অসংখ্য ফোয়ারার মুখ আছে—তার কোনওটি পাথরের হস্তীমূর্ত্তি কোনওটি পক্ষীমূর্ত্তি, কতকগুলি আবার পুষ্পগুচ্ছ; ফোয়ারা ছাড়িলে এই সব মূর্ত্তি এবং গুচ্ছের ভিতর দিয়া একত্রে উৎসের আকারে জল ছুটিতে থাকে। আলোর বন্দোবস্ত থাকিলে এর সৌন্দর্য্য আরও খুলিত। ফতেসাগর হইতে ফোয়ারার জল আসে।

ফতেসাগর প্রাকৃতিক হ্রদ নয়, একদিকে মস্ত বাঁধ দিয়া জল নিকাশের পথ বন্ধ করিয়া একে হ্রদে পরিণত করা হইয়াছে। এর তিনদিকে পাহাড়, একদিকে এই বাঁধ। পশ্চিমে ইহার জল সজ্জনগড়ের পাদমূলে গিয়া ঠেকিয়াছে, উত্তর এবং দক্ষিণেও কতকদূর পর্য্যন্ত সেই শৈলমালা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের উপর উদয়পুরের রেলওয়ে এবং ইঞ্জিনীয়ারীং আপিশগুলি। বাঁধের নীচে মস্ত খাদ—সেখান দিয়া উপচিত জলও বাহির হইয়া যায়। দক্ষিণে একটি খাল পেশোলা পর্য্যন্ত গিয়া দুইটি হ্রদকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে। দুই তীর ব্যাপিয়া বরাবর একটি সুন্দর রেলিং ঘেরা বেড়াইবার রাস্তা—সেখানে দাঁড়াইয়া এই গিরিপ্রাচীরবেরা বিস্তীর্ণ নীল সলিলসম্ভারের দিকে চাহিয়া দেখিলে ইহা যে প্রকৃতির সৃষ্টি নয় তা বিশ্বাস করা কঠিন হয়। খালের পাশ দিয়া এক নূতন রাস্তায় আমরা সহরে ফিরিলাম—পথে মহারাণা স্বরূপ সিংহের কীর্ত্তি স্বরূপসাগর দেখা গেল—তবে তাকে হ্রদ বলা চলে না।

মোকানে যখন ফিরিলাম তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ, কিন্তু জয়সমুদ্রের পাশ তখনও আসিয়া পৌছে নাই। শুনিলাম পুলিশের বড় কর্ত্তার সহি তখন বাকী আছে, তাঁর আবার দিবানিদ্রার অভ্যাস, দুটার আগে সহি হইবার আশা নাই। যে রাজ্যের পুলিশ এমন নিদ্রা দেয় সে রাজ্যে চোর ডাকাতের ভয় নিশ্চয়ই নাই। আড়াইটার সময়ে পাশ আসিল, আমরাও বাসে চড়িয়া বসিলাম।

উদয়সাগর ও দোবারী

উদয়পুর রাজ্যে বড় বড় হ্রদ তিনটি—জয়সমুদ্র, রাজসমুদ্র এবং উদয়সাগর। রাজসমুদ্র কাঁকরোলীর পাশে—সেখানে যাওয়া ত স্থিরই ছিল, জয়সমুদ্রের পাশও জোগাড় হইয়াছিল, এখন বাকী রহিল উদয়সাগর। আমরা প্রস্তাব করিলাম উদয়সাগর এবং তার কাছেই দোবারীর গিরিসঙ্কট দেখিয়া তবে জয়সমুদ্রের পথে যাওয়া হইবে। উদয়সাগর সহর হইতে প্রায় ন'দশ মাইল দূরে—জয়সমুদ্রের ঠিক পথেও পড়ে না, একটু ঘুর হইলেও এ সুযোগ আমরা ছাড়িতে পারিলাম না।

সমস্ত বাসটাই আমরা ভাড়া করিয়াছিলাম কিন্তু উঠিয়া দেখি জনকতক ওদেশী লোক আগে হইতেই তার খানিকটা দখল করিয়া আছে। 'ওয়াকিল' সাহেবের পুত্র বলিলেন—তারা আত্মীয়, জয়সমুদ্রে নামিয়া শালুম্বা যাইবে। আত্মীয় কথাটা অবশ্য ভুল, কিঞ্চিৎ উপরি রোজগারের ফন্দী মাত্র, কিন্তু শালুম্বার লোক শুনিয়া আমরা আর আপত্তি করিলাম না। ডি এল্ রায় মহাশয়ের কল্যাণে শালুম্বাপতি গোবিন্দসিংহের নাম কোনও বাঙ্গালীর অজ্ঞাত নাই, আমাদের দলের মধ্যে আবার দু তিনজন সখের অভিনেতাও ছিলেন—হয়ত গোবিন্দসিংহের ভূমিকা অভিনয়ও করিয়াছেন—তাঁর দেশের লোককে সমাদর করিয়াই সঙ্গে লওয়া উচিত, সুতরাং লইলাম। দুঃখের বিষয় এই সব অভাগ্যেরা গোবিন্দ সিংহের নাম কখনও শোনে নাই।

ষ্টেশন পর্য্যন্ত পুরাতন রাস্তায় গিয়া আমরা উদয়সাগরের পথ ধরিলাম। ষ্টেশন সহর হইতে প্রায় তিনমাইল দূরে—এদিকে লোক জনের বাস বড় নাই—একটি ছোট নদী পার হইতে হইল তার নাম 'আড়'। নিকটেই আড় গ্রামে ভূতপূর্ব্ব মহারাণাদের অনেকের স্মৃতিসৌধ আছে। সময়াভাবে আমাদের যাওয়া হয় নাই, তবে দু একটা সমাধি-মন্দিরের শীর্ষ রাস্তা হইতেই দেখা গেল।

ক্রমে সমতল রাস্তা ছাড়িয়া পাহাড়ে রাস্তায় পড়িলাম; কতকদূর বাঁদিকে পাহাড় তার কোল দিয়া পথ, তবে চড়াই বড় নাই। গ্রাম বা বসতি মোটেই চোখে পড়িল না। খানিক পরে দূরে উদয়সাগরের শুভ্র জলরাশি দেখা গেল। উদয়সিংহ উদয়পুরে রাজধানী স্থাপনার অনেক আগেই গীর্বো উপত্যকার এই পর্ব্বতবেষ্টিত নিভৃত স্থানটিতে একটি হ্রদ খনন করাইয়াছিলেন; পরে আবার এর দুই দিকের পাহাড়ের মাঝখানে বাঁধ দিয়া একটি গিরিনদীর স্রোত রুদ্ধ করিয়া হ্রদের পরিধি আরও বিস্তৃত করেন। আমরা হ্রদের যে তীরে নামিলাম তার সামনেই অপর পারে সেই বাঁধ—দুই পাহাড়ের মাঝখানে বিরাট সেতুর মত। দুই দিকে দুই পাহাড় হ্রদের দুই কূল রক্ষা করিতেছে, কেবল আমরা যে তীরে সেদিক পাহাড়ে ঘেরা ছিল না। এ তীরে একটি ছোট প্রাসাদ—ঠিক প্রাসাদ নয় বিশ্রামাবাস আছে, নাম উদয়নিবাস, কিন্তু উদয়সিংহের আমলের মত প্রাচীন বলিয়া মনে হইল না। হ্রদের জল স্থির নিশ্চল, বর্ণ শুভ্র; পাহাড়ের অন্তরাল থাকাতে সমস্তটা চোখে পড়ে না। হ্রদের পরিধি নাকি ২½×১½ মাইল। এরই উপচিত জলরাশি লইয়া 'বিরাচ' বা বেরিশ নদী বাহির হইয়াছে, চিতোরের প্রান্তরে আমরা তার দেখা পাইয়াছিলাম।



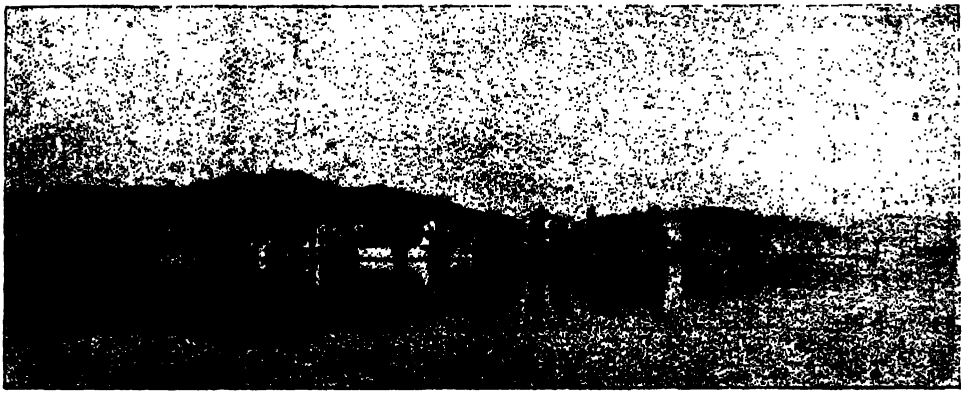
পেশোলা তীরে রাজপ্রাসাদ—উদয়পুর

হ্রদের বিস্তীর্ণ বাঁধান তটভূমিতে বেড়াইতে বেড়াইতে মনে হইতেছিল—হয়ত এই তীরেই, এই শিলাময় প্রাসাদ-অঙ্গনে রাজা মানসিংহ প্রতাপের আতিথ্য যাচ্ঞা করিয়া অপমান কুড়াইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন; তুর্কীর আত্মীয়ের সহিত সূর্য্যবংশধর একত্রে ভোজন করিতে পারে না, প্রতাপের সে বাণী হয়ত এইখানেই উচ্চারিত হইয়াছিল। মেবারের ইতিহাসে উদয়সাগরের তটভূমিও একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কিন্তু নিশ্চিন্তে উদয়সাগরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা সেদিন আমাদের অদৃষ্টে ছিলনা। আমরা যতক্ষণ তীরে ঘুরিতেছিলাম আমাদের মোটর-চালক ততক্ষণে মোটর লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ফিরিবার পথ সামান্য একটু চড়াইয়ের মত—মোটর কিছুতেই তার উপরে উঠিতে চায় না। কলকব্জা খুলিয়া অনেক চেষ্টা করা গেল, আমাদের মোটর-বিদ্যাভিজ্ঞ বন্ধুরাও যোগ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঘণ্টাখানেকের পর নিঃসন্দেহ জানা গেল এ মোটরে জয়সমুদ্র যাওয়া ত দূরের কথা উদয়পুর পর্য্যন্ত ফিরিবারও ভরসা নাই। আমাদের ত চক্ষুস্থির। এ সহর নয়, অন্য মোটরের আশা নাই; এই ন দশ মাইল রাস্তার মধ্যে একখানা গাড়ী দেখি নাই, একটা লোকালয়ও চোখে পড়ে নাই। গরু মহিষ দুই চারিটা দেখা গেল কিন্তু শুনিলাম 'বয়েল' গাড়ীও এদেশে মিলিবে না। ঘোড়াও দু একটা চোখে পড়িল কিন্তু আরোহীর জন্য তাদের বা তাদের মালিকদের কোনও আগ্রহ নাই। সামনে উদয়নিবাস প্রাসাদ ছিল বটে, কিন্তু বেশ জানিতাম সেখানে আতিথ্যভিক্ষা করিলে অভ্য-

র্ণনাটী রাজা মানসিংহের চেয়ে উঁচুদরের হইবে না। সুতরাং বেশ বোঝা গেল যে, এ সঙ্কটে দুই খানি চরণের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর উপায় নাই; তবে খাঁ সাহেব ভরসা দিলেন যে, দশমাইল রাস্তাই আমাদের হাঁটিতে হইবে না, তিনমাইল দূরে দোবারী ষ্টেশন—সেখানে সন্ধ্যার ট্রেণ এখনও পাওয়া যাইতে পারে। খাঁ সাহেবকে কাণ্ডারী করিয়া টিফিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া আমরা তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু বিপদ হইল আমাদের এক বন্ধু বিজয়দাকে লইয়া। তিনি তাঁর চরণযুগলের উপর কোনও দিনই বিশেষ ভরসা রাখেন না—গোয়ালীয়ার আর সাঁচী পাহাড় ভ্রমণের ধাক্কা তাঁকে চিতোরগড় পর্য্যন্ত সামলাইতে হইয়াছে। এই বাতব্যাধিগ্রস্তের জন্য যদি কোনও উপায় করা যায়—রাস্তায় তবু একটা অনুমতি দরকার, তাই ঘোড়া আটকাইয়া ছোকরাকে অনুমতির জন্য পাঠাইলাম। বিজয়দা যে চিরজীবন অশ্বপৃষ্ঠেই কাটাইয়াছেন ঠিক তা নয়—তবু এই অবসরে তিনি তাঁর অশ্বারোহণ-বিদ্যার পরিচয় দিবার লোভ ছাড়িতে পারিলেন না এবং তাঁর বিপুল দেহের ভারে আর চড়ার কসরতে রেকাব দুইটিই ছিঁড়িলেন। অতঃপর আমাদের আর তাঁকে চড়িতে দিতে ভরসা হইল না কারণ রেকাবের মত জীনও ত ক্ষণভঙ্গুর, অশ্বও অমর নয়। মেবারের পুলিশের অবশ্য ভদ্রতা আছে—অনুমতি মিলিয়াছিল—কিন্তু তাঁকে আর এ যাত্রা বাধিত করা গেল না বিস্ময়বিমূঢ় অশ্বপালকের হাতে বল্গা ফিরাইয়া দিয়া আমরা অনুতপ্ত চিত্তে প্রস্থান করিয়াছিলাম—রেকাব



জগ-নিবাস—উদয়পুর

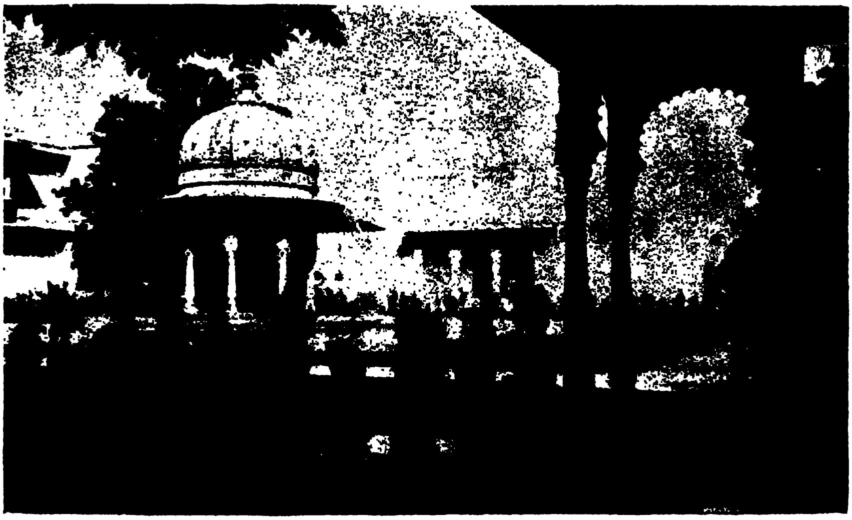
বাহির হইয়াও তার চেষ্টা ছাড়ি নাই। কিছুদূর গিয়া দূরে এক অশ্ববল্গাধারী ছোকরাকে দেখিয়া আশা হইল হয়ত বিজয়দার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। অশ্বের পৃষ্ঠে জিন বাঁধা—কেবল আরোহীর অপেক্ষা। ছোকরা ত সামনে দু'জন টুপীধারী দেখিয়া (আমরা হাফপ্যাণ্টে শোভিত ছিলাম) রণে ভঙ্গ দিবার চেষ্টায় ছিল—আমরা তাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলাম। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল—এ ঘোড়ায় পুলিশের জমাদার বা ঐরকম কোনও পদস্থ ব্যক্তি সামনের গ্রামে আসিয়াছেন, আজ আর তাঁর ঘোড়ার প্রয়োজন নাই। আমাদের তখন যা অবস্থা তাতে পুলিশের সঙ্গে বিবাদেও আপত্তি ছিল না—ছেঁড়ার কথাটা আর তাড়াতাড়িতে প্রকাশ করা হয় নাই।

কিন্তু বাহন শেষ পর্য্যন্ত না মিলিলেও বিজয়দা দমেন নাই—সঙ্গে রসদ থাকিলে দুইচারি মাইল হাঁটিতে তিনি দমিবার পাত্র নন। টিফিনের বাক্স খোলা হইল, রসদ সংগ্রহ হইল, তার পরে আবার যখন যাত্রা সুরু করিলাম তখন বাক্সের ভার অনেক কমিয়া গিয়াছে।

দোবারীর পথে সেদিনকার এই ভ্রমণ-কাহিনী অনেকদিন মনে থাকিবে। ট্রেণে চড়িয়া দোবারী ত সবাই দেখে কিন্তু এমন করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় কয়জন। তিন শতাব্দী

পূর্ব্বে এক সম্রাট-তনয় (আওরংজেব পুত্র আকবর) যেমন করিয়া আনন্দ ও উদ্বেগ লইয়া দোবারী গিরিবর্ত্মের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন আমরা ষট্ বঙ্গবীরও সেই মনোভাব লইয়া (অবশ্য উল্টা পথে) যাত্রা করিলাম। তিনি তারপরে এ গিরিসঙ্কটে রাজসিংহের হাতে যে সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন আমাদের সঙ্কটই বা তার চেয়ে কম কি?

আমরা যে পথ দিয়া যাইতেছিলাম সেটি কোথাও পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া, কোথাও পাহাড় হইতে দূরে প্রান্তরের বক্ষ দিয়া, কোথাও অরণ্যের মধ্য দিয়া, কোথাও বা গভীর খাদ বা নিম্নভূমির ধার দিয়া খিসর্পিত ভাবে চলিয়া গিয়াছে—সম্মুখে বা পিছনে চাহিলে মনে হয় যেন একটি শুভ্র বালুর রেখা। পথ কখনও উঠিতেছে, কখনও নামিতেছে, আবার উঠিতেছে। সম্মুখে কোথাও পাহাড় পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—মনে হয় তার কোলেই পথের শেষ, কিন্তু কখন যে আবার সে পাহাড় দাঁড়াইয়া অপর পাশে পৌছিলাম তা জানিতেই পারা যায় না। আমরা যখন যাত্রা সুরু করিয়াছিলাম তখন অপরাহ্ণ। ক্রমে সূর্য্যদেব গিরি-অন্তরালে মুখ লুকাইলেন—গোধূলির ম্লান আভায় চারিদিক ভরিয়া গেল। সেই অবসান-প্রায় সূর্য্যালোকে দূরের পর্ব্বতশ্রেণী দিগন্তের কোলে তাদের ধূসর অঙ্গ মেলিয়া যেন যুগান্তের স্বপ্ন দেখিতেছিল; মরুপ্রান্তরের বক্ষ যেন দিনের আলোকে ধরিয়া রাখিবার আগ্রহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, পাহাড়ের কোলে অরণ্য যেন আসন্ন অন্ধকারের সম্ভাবনায় মর্ম্মরধ্বনি করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ—শব্দের মধ্যে শোনা যায় দু একটা পাখীর ডাক, বড় বড় গাছের মাথায় বায়সকুলের কলরব আর অরণ্যের অশ্রান্ত মর্ম্মর। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে ময়ূর আর দূরে দূরে দুএকটা হরিণকে পলাইতে দেখা গেল। সেই আসন্ন সন্ধ্যায় মেবারের এই উপত্যকা-ভূমি, দোবারীর এই গিরি-অরণ্য যে আমাদের এমন করিয়া দর্শন দিবে তা একবারও মনে করি নাই।


সাঁকেলিও কা বাগ ফোয়ারা—উদয়পুর

ক্রমে গোধূলির আলো মিলাইয়া আসিবার উপক্রম হইল, কিন্তু পথের শেষ নাই। সম্মুখে যত পাহাড় দেখা যায়, আশা হয় ঐ দোবারী, পরক্ষণেই ভুল ভাঙ্গে। ঠিক পথে চলিয়াছি কিনা জানি না, পথ জনশূন্য—ভরসা খাঁসাহেব। তাঁর দু তিন মাইল যে কতক্ষণ অতিক্রম করিয়াছি ঠিক নাই, তবু শুনি দেরী আছে। খানিক পরে এক সমতলভূমি পাওয়া গেল, নিকটে পাহাড় নাই, কেবল দূরে দিক্চক্রবালে এক দুর্ভেদ্য গিরি-শ্রেণী আকাশে মাথা তুলিয়া আছে দেখা যায়। যখন শুনিলাম ঐ গিরি-শ্রেণীর নীচেই দোবারী, তখন পৌছিবার আশা প্রায় ত্যাগ করিতে হইল। এতক্ষণ আমরা একত্র যাইতেছিলাম—এখন একদল ট্রেণ আটকাইবার জন্য অগ্রগামী হইলেন, আমি বিজয়দাকে লইয়া সকলের পশ্চাত রহিলাম। সেই জনহীন শব্দহীন আলোক-

হীন অজানা মরুপথে যাত্রী আমরা মাত্র দুইজন—প্রতি-মুহূর্ত্তেই পথ হারাইবার আশঙ্কা, বন্য জন্তুর ভয়ও যে ছিল না তা নয়। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিয়াছে, গিরিশ্রেণীর ধূসর অঙ্গ যখন কালির প্রলেপে অদৃশ্যপ্রায় হইয়াছে তখন পূর্ণ পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া আমরা দোবারীর টানেলের উপর পা দিলাম। তার নীচে রেল লাইন দেখিয়া এবং দূর হইতে অগ্রগামী বন্ধুদের ডাক শুনিয়া এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে ট্রেণ ধরিতে পারা যাইবে। বন্ধুরা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আমাদের অপেক্ষায় ট্রেণ আটকাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই—এমন কি সিগন্যালম্যানকে ধমক দিয়া যথাসময়ে সিগন্যাল পর্য্যন্ত দিতে দেন নাই। ষ্টেশনঘরের যা চেহারা দেখিলাম তাতে সেদিন যে ট্রেণ ফেল হইতে হয় নাই তা পরম সৌভাগ্য মনে হইল। এমন ষ্টেশন যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট পর্য্যন্ত রাখে না। যথাসময়ে ট্রেণে চড়িয়া উদয়পুর পৌঁছিলাম। দোবারীর বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী এইখানেই শেষ, কিন্তু দুঃখ রহিল এত কষ্ট করিয়াও দিনের আলোয় দোবারীর গিরিবর্ত্ম দেখা হইল না—একখানা ছবিও লইতে পারা গেল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি সরকার

"অস্ত অরুণ রেখা—"

শ্রীযুক্ত অচ্যুত ঘোষ

অস্ত অরুণ রেখা—
শীতের সুনীল আকাশে মেঘের সোনার স্বপন লেখা,
কুহেলি মাঝারে হারাই তোমারে উতলা মানস মম,—
সুদূরে তোমার আসন রাজিছে রাজার আসন সম;
জানিহে কেবলি ক্ষণিক অতিথি তিথি উৎসবে মম,—
সুদূরে তোমার আরতি প্রদীপ এখনি হরিছে তম।
আকাশে বাতাসে কি সুর জাগিছে সে কথা কি জানি আমি
সুদূরপুরের বাঁশরী বাজিতে বীণা যে গিয়াছে থামি;
নয়নে জাগিছে পরশকাতর পদ্মফুলের ব্যথা,
—ফোটেনি মুকুল ভিজিছে দুকূল শিশির-সিনান-রতা।
জানি যে কেবলি বিদায়বেলার গোধূলি লগন আসে,
না কহিতে কথা, না জানাতে ব্যথা, আঁধার নামে গো পাশে;
ক্ষণেক তোমার থাকার কথা যে সে কথা ভুলি নি আমি,
তবু যে আমার উতলা হৃদয় তোমার পরশকামী।

অস্ত অরুণ-রেখা—
ত্রস্ত স্মৃতির শাড়ীর ভিতরে বেপথু বুকের ব্যথা।

গৈরিক

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

আশ্রমের ঠিক পিছন দিয়াই লাজুক, বঙ্কিম নদীটি নিঃশব্দ-ধারায় বহিয়া গিয়াছে। সূর্য্যাস্তের রাঙা আলোয় আশ্রম-মন্দিরের রূপালী ফলকটা একেবারে অপরূপ হইয়া উঠে।

কতদিন ডিঙ্গি বাহিয়া পাশ দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছি এবং মনে মনে উহার অজ্ঞাত প্রতিষ্ঠাতার স্থান নির্ব্বাচনের প্রশংসা করিয়াছি। আর কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই আশ্রমের সঙ্গেই জড়াইয়া গেলাম!—সেই কথাই বলিতেছি।

সেদিনও একা ছোট ডিঙ্গিটি বাহিয়া ফিরিতেছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়িয়া গেল তীরের দিকে। স্বামীজি হাত তুলিয়া ডাকিতেছেন।

ডিঙ্গি কূলে ভিড়াইলাম। কিন্তু আসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে, সেই নেড়া মাথা, কৌপীন-পরা মানুষটির সম্মুখে মুখ দিয়া অনেকক্ষণ একটা কথাও বাহির হইল না। স্বামীজি নিজেই বলিলেন, সঙ্গে এসো।

মাত্র চারখানি ঘর,—মন্দিরটি ছাড়া। মন্দিরের কোল দিয়াই প্রকাণ্ড উঠান—রক্ত-জবায় ভর্ত্তি। চারিদিকে সন্ধ্যার মত নিস্তব্ধ শৃঙ্খলা। পা ফেলিতে ভয় হয়। স্বামীজির ঘরখানি সকলের ছোট এবং সুশ্রী। জানালার বাহিরেই বাঁকা নদী-স্রোত, ওপারে খোলা সবুজ মাঠ। প্রদীপ জ্বালাই ছিল।

একপাশে ছোট একটি চৌকী—লাল চেলি দিয়া ঢাকা, উপরে খানকয়েক বই। স্বামীজি বলিলেন, বসো।...... তোমায় দেখে ভারি আশ্চর্য্য লাগল—কেন তা' জানি না।

আত্ম-প্রশংসায় হৃদয় স্ফীত হইলেও মাথা তুলিতে পারিলাম না।

স্বামীজি বলিলেন, তোমাকে ভাল রকম জানিই না, তবু মনে হচ্ছে, তোমাকে দিয়ে অনেক কাজই পাব। তুমি আমাদের এখানে থাকবে?

কেন?—ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি।

—সামনের মাসে আশ্রমের উৎসব। সে সময় দেশ-বিদেশ থেকে অনেক লোক-জন আসে। তুমি এলে আমরা অনেক সাহায্য পেতে পারি।

বলিলাম, যদি বলেন, সেই সময়েই আসব।

—সংসারে কে আছে?

—শুধু মা--একা।

—তা' হ'লে···উপায় কি! হ্যাঁ, সেই ভাল।···কিন্তু আসা চাই।

স্বামীজিকে ঠিকানা দিলাম। অন্ধকার বন বাদাড় দিয়া সে রাত্রে বাড়ী ফিরিবার পথে এই মানুষটির সম্বন্ধে কত কথাই না ভাবিয়াছি। আজ তাহার সবগুলি মনেও নাই, যাও বা আছে তাহাও আবার প্রকাশের উপযোগী নয়। শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি যে, সত্যকার স্বামীজির সহিত সেগুলির এতটুকু মিল ছিল না।

বাড়ী আসিয়া যখন নিজের ঘরের বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িলাম তখন মুণ্ডিত মাথা ও চওড়া কপালের নীচেকার একজোড়া অতি-তীক্ষ্ণ চোখ যেন বুকের মধ্যে আঁক কাটিয়া বসিয়া যাইতে লাগিল। কতক্ষণই বা তাঁহার কাছে ছিলাম, কথা বার্ত্তাই বা হইয়াছে ক'টা! তবু ঘরের অনতি-নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত হাসি, পল্লীরাত্রির গাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার গভীর-গম্ভীর কণ্ঠস্বর রহিয়া রহিয়া মনের মধ্যে অপূর্ব্ব এক ইন্দ্রজাল রচিতে লাগিল।

ছেলে বয়সে মানুষের মন কোন একটা বিশেষ বিষয়ে জড়াইয়া থাকিতে চায় না, পারেও না বুঝি। স্বামীজির সহিত সেদিনের সেই অত্যল্প পরিচয় আমার মনের উপর একদিন অনেকখানি দাগ রাখিয়া গেলেও কৈশোরের অসংখ্য প্রগল্‌ভতার মধ্যে কিছুদিন পরে কোথায় যে ডুবিয়া গিয়াছিল,

তাহার ঠিকই ছিল না। কিন্তু উৎসব সুরু হইবার কয়েক-দিন আগে স্বামীজির চিঠি আসিয়া পৌঁছিতেই দুরন্ত প্রাণ সেই অল্প-পরিচিত লোকটির জন্য আবার লালায়িত হইয়া উঠিল! মাকে আশ্রমে যাইতেছি বলিয়া সেই দিন-ই অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায় তিন-মাইল দূরবর্ত্তী আশ্রমের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু স্বামীজির দেখা মিলিল না। ভারি রাগ হইল লোকটার উপর—অভিমানই হয়ত! কি করি দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ দেখি ওদিকের ঘর হইতে একটি মেয়ে এই দিকেই আসিতেছে। একা একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কা'কে চাই তোমার?

মনটা প্রফুল্ল ছিল না; বলিলাম, তোমার দরকার—?

মেয়েটি বলিল, সকলে এখানে আসতে পায় না, তা' জানো?

—জানি। কিন্তু আমি অমনি আসিনি, স্বামীজি ডেকে পাঠিয়েছিলেন নিজেই। দরকার হ'লে চিঠিও দেখাতে—পারি, সঙ্গেই এনেচি। মেয়েটি ক্ষুণ্ণ হইল বোধ করি! ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরে চলিয়া গেল। বয়স বোধ হয় বারো তেরোর বেশী নয়, রজনীগন্ধার মত ঋজু ও কঠিন। কিন্তু সেদিন ইহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মেয়েটি নিঃশব্দে চলিয়া যাওয়ায় ভারি অপমান বোধ করিতেছিলাম, এমন সময় সে নিজেই ফিরিয়া আসিল।

মা ডাকচেন তোমায়।

কে তোমার মা?

জানি না।

মেয়েটি ফিরিয়া চলিল। রাগ যতই প্রবল হউক, অনুসরণ করিলাম। ঘরের ভিতর যাঁহাকে দেখিলাম তিনিও নূতন; উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, উনি সহরের দিকেই গেছেন, একটি ছেলের সন্ধানে। ক'দিন থেকেই তা'র অপেক্ষা করচেন। একটু বসো, এখুনি ফিরে আসবেন।

রাগের মাত্রা আরও একটু চড়িল। আমাকে আসিতে বলিয়া স্বামীজির আর একজনের সন্ধানে সহরে যাওয়াটাকে নিজের পক্ষে গৌরব-জনক মনে হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, সে ছেলেটী কে জানেন?

—না বাবা, তা' ত' জানি না। তবে নাম শুনলুম, কিশোর। একদিন নাকি তাঁর কাছে এসেছিল।

—আমিও যে কিশোর, সহরেই যে আমাদেরও···

মা ও মেয়ে দুই জনেই হঠাৎ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

—ছিঃ বাবা, এতক্ষণ এ'কথা বলতে হয়। মেয়েটা কি জানি কি কথা ব'লে এসেচে!···নাওয়া খাওয়া কিছুই হয়নি দেখচি, যাও, চট ক'রে নদীতে একটা ডুব দিয়ে এসো। গীতা, কিশোরের জন্যে চাট্টি চিঁড়ে ভিজিয়ে দে'মা।

আহারে বসিয়া গীতার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অভিভূত হইয়া গেলাম। তাহার পর অনেকদিন গিয়াছে, জীবনে কত নূতন আসিয়াছে পুরাতন হারাইয়া গিয়াছে, কত বয়সের কত রকমের দৃষ্টিই ত' দেখিলাম, কিন্তু সে চোখ দুটি আজও আমার মনে আছে। কি আশ্চর্য্য সে জিনিষ—যেন ভোরের আকাশের শুকতারা, সমুদ্রের বুকে কুড়াইয়া পাওয়া স্বচ্ছ দু'টি মুক্তা।

বৈকালের দিকে স্বামীজি আশ্রমে ফিরিলেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন আসিয়াছে, পূর্ব্বেও কয়েকজন আসিয়াছিল। স্বামীজি বলিলেন, এরা সব আমারই লোক, শিষ্যবর্গও বলতে পারি। এরা সবাই তোমার বন্ধু, আপনার। সকলের সঙ্গে ভাব ক'রে নাও।

উহাদের একজনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। শঙ্কর আমাদের চেয়ে খুব বেশী বড় নয়, সবে কলেজে ঢুকিয়াছে। স্বামীজির বাপ শঙ্করের মায়ের মন্ত্রগুরু। শঙ্করের মুখে আশ্রম সম্বন্ধে সেদিন অনেক কথাই শুনা গেল। আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য নাকি ধর্ম্ম-চর্চ্চা নয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম ধর্ম্ম-চর্চ্চা যদি আশ্রমের উদ্দেশ্য না হয়, তবে মেয়েরা কেন···? উত্তরে শঙ্কর বলিল, আশ্রম অনেক কালের। স্বামীজির ঠাকুর্দ্দা বা বাপের সময় ধর্ম্ম-চর্চ্চাই এখান-কার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা যাদের দীক্ষা দিয়েছেন, তা'দের ছেলেমেয়েরা অনেকেই এ' সময় এখানে আসেন।

সে রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। কোন পথে পা দিলাম ভাবিয়া ভয় হইতে লাগিল।

সকালে উঠিয়াই স্বামীজির ঘরে। সেই মাত্র তিনি স্নান সারিয়া উঠিয়াছেন। কুশাসনের উপর তাঁহার পাঠ-রত মূর্ত্তিখানি চমৎকার লাগিল। ধূপ-সুরভি ভোরের বাতাসটিকে আরও মধুর মন্থর করিয়া তুলিয়াছে।

—একটা কথা আপনাকে বলতে এলাম। এখানে আমি থাকব না। শঙ্করের কাছে যা' শুনলুম, তা'তে—

—ভয়ের কি আছে? স্বামীজি বলিলেন,—ভয় পাবার মত কোন কাজ আমরা করিনে। শঙ্কর বোধহয় বিপ্লবী ব'লে আমার পরিচয় দিয়েচে? এখনও এরা আমায় বুঝলে না। আচ্ছা কিশোর, মানুষের বাঁচতে চাওয়াটাকে কেউ বিপ্লব বলে? তা' হ'লে নিঃশ্বাস নেওয়াও বিপ্লব বলো?

কথা শেষ করিয়া স্বামীজি হাসিলেন; উত্তরে কিছুই বলিতে পারিলাম না। তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন, অন্যায় কোন কিছু আমাদের এখানে হয় না। আগে ধর্ম্মই ছিল আমাদের আশ্রমের মূল কথা, কিন্তু আজকের দিনে ও' জিনিষটা দিয়ে তেমন কিছু লাভের প্রত্যাশা থাকে না, তাই কাজগুলো একটু অন্য ধরণের ক'রে নিতে হয়েচে। এদেশের তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে কুড়ি কোটি লোক চাষের ওপর নির্ভর ক'রে আছে, মাটী ভিন্ন তারা আর কিছু জানে না, পদে পদে ভুল করে—অল্প টাকার জন্যে জমীদারের কাছে জমি বাঁধা দেয়, কি করলে অল্প পরিশ্রমে বেশী ফসল পাওয়া যায় বোঝে না। আমরা সাধ্যমত ওদের এই অসুবিধেগুলো দূর করতে চাই, দুঃখী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাই। একে যদি বিদ্রোহ বলো, তা হ'লে বেঁচে থাকাটাই প্রকাণ্ড বিদ্রোহ।

কথা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু সেই গভীর আত্মবিশ্বাসের সুরটুকু ঘরের মধ্যে যেন ঘুরিতে লাগিল। দেশের সেবা কোনখানে পা দিলে বিপ্লবে দাঁড়ায়, সে বয়সে তাহা আদৌ বুঝিতাম না, কিন্তু কি জানি কেন, স্বামীজির কথার পর ইহার মধ্যে দোষের যে কিছুই নাই, সেই কথাটাই অকপটে বিশ্বাস করিয়া লইলাম। স্বামীজি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের কাছেই থাকিব কি না, তখন অনেকটা নিজের অগোচরেই সায় দিয়া দিলাম।

হাতে একখানি গীতা তুলিয়া দিয়া স্বামীজি বলিলেন, আজ থেকে তুমি আমাদের। আমি আর তোমার কাছে স্বামীজি রইলাম না। শঙ্কর, তুমি, আমি—সবাই সমান। তুমি আমার নাম ধ'রেই ডাকবে। আমার নাম অসিত লাহিড়ী। গীতা আমাদের বেদ, ও' টি হাতে ক'রে স্বীকার করো, তুমি এই আশ্রমের।

মনে পড়িল, আশ্রমের সম্পর্ক চুকাইব বলিয়াই এই ঘরে ঢুকিয়াছিলাম, আর একদণ্ডও যে অপেক্ষা করা চলিবে না, তাহাই জানিতাম······কিন্তু স্বীকার করিলাম, আমি এই আশ্রমের।

তারপর, ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, ক'টা দিন আশ্রমেই কাটিল। প্রায় প্রতিদিনই দুই চারিজন নতুন লোক আসে, স্ত্রী, পুরুষ, ছোট ছেলে মেয়ে···। স্বামীজির সহিত কত লোকের কত রকমের আলোচনা হয়, দেশ যে শুধু খানিকটা মাটী, ক'টা স্ত্রী পুরুষ আর কতকগুলি বাড়ী ঘর নয়, এই কথাটি যেন বুঝিতে পারি। হ্যাঁ, আরও একটা কথা—গীতা ও তার মায়ের সঙ্গে আলাপটাও অনেকটা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। খাওয়া ত' দুইবেলাই হয় ওইখানে।

উৎসবের আগের রাত।

স্বামীজি একখণ্ড লাল কাপড় হাতে দিয়া বলিলেন, এইটের ওপর তুলো দিয়ে 'স্বাগতম' লিখে রাখো···কাল সকালেই চাই।

আঠা, তুল ও কাপড় লইয়া ছাদে উঠিয়া আসি। জ্যোৎস্নার জোয়ারে চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছে···নীচে সরু নদীটি একেবারে অপরূপ!

লঘু পদধ্বনি শুনা গেল। গীতা।

—তুমি যে

কি করচো দেখতে এলাম।

কিছুক্ষণ দুইজনেই নিঃশব্দে কাটাইয়া দিই, কিন্তু সে নিস্তব্ধতায় নিজেই কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করি। অবশেষে নিজেই মৌন ভঙ্গ করিলাম।

তোমাদের দেশ কোথা গীতা—?

নোয়াখালি।

অতদূর থেকে এসেচো তোমরা—?

দূর হ'লে কি হয়, মা যে এইখানকার মেয়ে। বিয়ে হয়েই ত' নোয়াখালি চ'লে গিয়েচে।—বলিতে বলিতে কি যেন গীতার মনে পড়িয়া গেল, কহিল, একটা ভারি মজার কথা আছে, শুনবে—?

শুনবো, বলো।

মা একদিন গল্প করছিলেন, এই স্বামীজির সঙ্গে তাঁর নাকি বিয়ের কথা হয়েছিল।—বলিয়া গীতা আবার হাসিতে লাগিল। মুখে আঁচল চাপিয়া বলিল,···বাপরে, কি বিচ্ছিরি চেহারা! চোখ দুটো অন্ধকারের মধ্যেও যেন জলতে থাকে। উনি আবার······মাগো!

এমনি কথায় কথায় কিছুক্ষণ যায়। গীতার হাসিটী ভারি মিষ্টি লাগিতেছিল, কিন্তু হাতের কাজ আর একটুও অগ্রসর হয় নাই। এমন সময় দুঃস্বপ্নের মত একেবারে স্বামীজির প্রবেশ। গীতা স্বামীজিকে দেখিলে বিশেষ উৎফুল্ল হইত না···কোন কথা হইবার পূর্ব্বেই পলাইয়া বাঁচিল।

স্বামীজির চওড়া কপাল তখন কুটিল ও কঠিন রেখায় ভরিয়া গিয়াছে······কি যেন একটা ভাবিতেছেন যাহার সহিত এই আশ্রম বা আসন্ন উৎসবের কোন সংশ্রবই নাই। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, এ' সব আমি পছন্দ করি না কিশোর, আর যেন এ' রকম ছেলেমানুষী না হয়।

স্বামীজি চলিয়া গেলেন, কিন্তু বিশেষ ক্ষুণ্ণ বোধ করিলাম না। ওই লোকটির মধ্যে এমন একটা অপরিমেয় রহস্য ছিল যার জন্য রাগ করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

শয্যায় পড়িয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অনুসূয়া—গীতার মা'র সঙ্গে নাকি অসিত লাহিড়ীর বিয়ের কথা হয়েছিল—?

শঙ্কর গভীর ঔদাসিন্যের সহিত বলিল, কি জানি মশায়, কতজনা কত রকমের কথা বলে—

রাগ হইল। বলিলাম, কি কথা শুনি?

শঙ্কর বলিল, এই দেখুন না···প্রত্যেক বছর সেই নোয়াখালি থেকে ছুটে আসা···তার পর রাত জেগে' দুজনায় নিরিবিলিতে কথাবার্ত্তা—

মিথ্যে কথা, বিশ্বাস করি না।

নাই করুন, কিন্তু আরও অনেকে এই কথা জানে। কেবল স্বামীজির ভয়েই কেউ কথা বল্‌তে চায় না। যাক্ সে কথা। অনুসূয়ার মেয়েটিকে আপনার কেমন মনে হয়—?

এ কথা কেন···?

এই, এমনি আর কি!—শঙ্কর বলিল। একটু চুপ করিয়া পুনশ্চ কহিল, আচ্ছা, আপনাকে যদি দেখাতে পারি অসিত লাহিড়ীর ঘরে অনুসূয়া গভীর রাত্রে—

—কি জানি, চুপ করুন।—বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুই। কিন্তু ঘুম আসে না। শঙ্কর ছেলেটি পরের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে একটু বেশী উৎসুক। এ'টা তাহার দুর্ব্বলতা। অনুসূয়ার সেই শুকতারার মত স্বচ্ছ দু'টি চোখের নীচে কি এতখানি আবিলতা চাপা থাকা সম্ভব? সেই ভোরের আলোর মত প্রসন্ন হাসির নীচে···না, আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

রাত তখনও অনেকখানি বাকি; পাতলা তন্দ্রাটুকু হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। শঙ্কর ঘুমে ডুবিয়া আছে। হঠাৎ মনে হয়, একবার স্বামীজির ঘরের পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসি। এই দ্বিধা ও সংশয়ের মধ্যে চুপ করিয়া থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

উঠিলাম।

পাণ্ডুর ইন্দুলেখা নারিকেল চূড়ার ওধারে হেলিয়া পড়িয়াছে, বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় স্বামীজির ঘরখানি অদ্ভুত মনে হয়। দুয়ার খোলা। ঘুরিয়া বাহিরের জানালার নীচে গিয়া দাঁড়াই। আজ ভাবি, ভাগ্যে সে রাত্রে উঠিয়া গিয়াছিলাম, তাই ত' এত বড় একটা সম্পদের পরিচয় আমার অজানা রহিল না। মানুষ বাহির হইতে একজনকে বিচার করিতে বসিয়া যে কত বড় ভুল করে, তাহাও সেইদিন প্রথম বুঝিতে পারি। কিন্তু যাক্ সে কথা।

প্রকাণ্ড পৃথিবী, তাহার সহস্র কোটী জীব-জন্তু, পাহাড় নদী লইয়া নিদ্রার নিশ্চেতন; আকাশে আধ-ঘুমন্ত চাঁদ,

গোপন নিঃশ্বাসের মত মাঝে মাঝে বাতাস বহিতেছে,—রাত্রি শেষের আকাশের তলায় একা দাঁড়াইয়া, কান পাতিয়া থাকিলাম।

—তুমি তা' হ'লে কালই যা'বে অনুসূয়া?

না, শঙ্কর মিথ্যা বলে নাই। হ্যাঁ, অনুসূয়ার অস্ফুট একটা কথাও যে শুনা গেল।

—কোন কারণেই থাকা হয় না?

—না।

তারপর চুপচাপ। চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে নিজেরি যেন ভয় হয়। কল্পনা করিলাম, অনুসূয়ার মুখখানি নত হইয়া গেল···চোখের কোণে হয়ত জলও ফুটিয়াছে। অসিত লাহিড়ীর চোখে এখন হয়ত হিংস্র জানোয়ারের তীব্রতা নাই।

আবার স্বামীজির কণ্ঠস্বর।

—কাল উৎসবের ভিড়ে হয়ত তোমাকে এমন একান্তে পাবো না। আর একটু বসো।

চারিদিকে চাহিয়া লই। না, কোথাও কেউ নাই!

এবার অনুসূয়ার কণ্ঠ—

না, অসিত, আমি যাই। গীতার যদি ঘুম ভাঙ্গে···আর, এতে তোমার লাভ কি!

—জানি না। তবে, বুঝতে পারি যে মরিনি, বেঁচে আছি।

আবার সেই স্তব্ধতা। জ্যোৎস্না আরও মলিন হইয়া গেছে···রাত শেষ হয়। অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে একটা রাত্রিচর পাখীর কান্নার স্বর ভাসিয়া আসে,—যেন সুপ্ত পৃথিবীর ব্যথার বিভাস।

—অসিত, মানুষ হয়ে তোমার কাজ বড় কঠিন। তোমার জীবনের সবটাই এখনও বাকি; সন্ন্যাসী সাজা তোমার কাজ নয়। মানুষের মত বিয়ে করো, সংসারী হও।

আমাকে তুমি সন্নেসী বল নাকি। ভারি মজার কথা বটে। তুমি জান না অনু, আমার সাধ কত অগাধ,—

—যত অগাধ, তত মিথ্যে। পৃথিবীর দুঃখ মানুষের চেষ্টায় দূর হ'বার নয়, একের প্রায়শ্চিত্তে সকলের পাপ কখনো কাটে! কিছুক্ষণ স্বামীজির মুখে কোন উত্তরই শোনা যায় না। হয়ত সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়িয়াছে—যে দিন এই গ্রামের পথে পথে ধূলা উড়াইয়া, চীৎকার করিয়া ছুটী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে···হয়ত স্বামীজির কঠিন চোখ দু'টি এতক্ষণ জলে ভরিয়া গিয়াছে,—কে জানে!

—না, এ' ছাড়া পথ নেই। এ' বেশ আছি—একটা উত্তেজনার মধ্যে, কাজের ভিড়ে নিজের কথা মনে রাখবার অবকাশ পাই না। কিন্তু আর সকলের মত ঘর বাঁধতে গেলে আমি বাঁচবো না। আমি বিলেত যেতে না যেতে কেন তুমি আর একজনকে······?

চুপ করো, নইলে আমি উঠবো।

কিন্তু চুপ করিবে কে! স্বামীজি তখন সাগরের মত উচ্ছ্বসিত—অবাধ।

—কিসের জন্যে চুপ করবো গীতার মা? তোমার অপমান আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু তুমি আমায় ফাঁকি দিয়েচ—এ' কথা আমি চিরকাল বলবো। আমাকে তুমি কি দিলে! কিছু না। কে রাখবে এই আশ্রমের উত্তরাধিকার···কে রাখবে আমার স্মৃতি? বুঝতে পারো, এ কত বড় অন্যায়, ফাঁকি?

চাপা কান্নার স্বর শুনা যায়,—অনুসূয়ার।—বিশ্বাস করো, এর মধ্যে আমার এতটুকু হাত ছিল না। বাবাই এক রকম জোর ক'রে···কিন্তু, এ'কথা তোমায় অনেকবার বলেচি। তুমি তা' বিশ্বাস করোনি। নাই করো, আমার তা'তে ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। আমি জানি, তুমি যা' চেয়েছিলে তা' তোমায় দিতে পারিনি বটে, কিন্তু···থাক, সে কথা তুমি বুঝবে না। আমি উঠি। প্রতিবারের মত এবারও ব'লে যাই অসিত, বিয়ে করো, এ' পাগলামী তোমায় সাজে না। বেঁচে থাকা একটা খেয়াল নয়।

—এ' কথা অনেকবার শুনেচি অনুসূয়া, তুমি যাও। আলো দেখা দিয়েচে।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিলাম, অনুসূয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু ভিতরে যাওয়ার কথা হঠাৎ আর মনেই পড়িল না; নদী, আশ্রম, গাছপালা ···সব যেন একাকার হইয়া গেল এবং হঠাৎ চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল। সে দিন এ' জিনিষের দাম দিবার

বয়স হয় নাই, তবু চোখ দিয়া জল ঝরিয়াছিল। আজ বয়স বাড়িয়াছে, সংশয়ের দেখাশুনাও হইয়াছে অনেক, অত সহজে চোখে জল আর আসে না, কিন্তু এ কথা ভাল করিয়াই জানি যে, সেদিন দৈবাৎ যে মহামূল্য বস্তুর পরিচয় মিলিয়াছে, তাহার আর তুলনা নাই। বিধবা অনুসূয়া আজ বাঁচিয়া নাই, তাঁহার মেয়ে গীতাও যে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর কোন প্রান্তে গিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, তাহাও জানি না; শুধু এইটুকু মনে মনে বলি, হঠাৎ কাহাকেও যেন বিচার করিতে না যাই; এত বড় পাপ খুব কমই আছে।

আশ্রমের জন্ম-তিথি উপলক্ষে সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তুমুল উৎসবের স্রোত বহিল। ঢাক বাজিল, পশু বলি হইল,—চীৎকারও বড় কম হইল না। দু'পহরে স্বামীজি আশ্রমের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কত কি বলিতেছিলেন!—ভারতের আশা ও আকাঙ্খার কথা, দুঃখ ও তাহার প্রতিকারের কথা।

সকলের সহিত আমিও সেই অদ্ভুত লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া থাকি, কাল রাত্রের অসিত লাহিড়ী কোন মন্ত্রে এমন হইয়া গেল কে বলিবে। কথা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু স্বামীজির দুই চোখের কোলে তখন জল ভরিয়া উঠিয়াছে। আজ বুঝিতে পারি, সেদিনের সেই চোখের জল দেশের জন্য নয়, জাতির জন্য নয়,—নিজের জন্য, নিজের উপবাসী আত্মার জন্য। অমন করিয়া কাজের ভিড়ে নিজেকে হারাইয়া না দিলে তাঁহার বাঁচিবার আর পথ ছিল না। এক সময় দেখিতে পাই, ভিড়ের মধ্য হইতে অনুসূয়া যেন দেবতার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন! সে চোখে কামনা নাই, অশ্রু নাই···শুধু বিশুদ্ধ এবং অপূর্ব্ব শূন্যতা!

দিনের আলো ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিল; ছুটাছুটি, চীৎকার, লোক-জন—সব কমিয়া গেল।

দালানের এক কোণে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিলাম। পাশ ফিরিয়া দেখি গীতা আসিয়া কখন পাশটিতে বসিয়াছে।

আজই নাকি তোমরা যাচ্চ—?

তুমি কি ক'রে জানলে?

জানি। বলো খপর ঠিক কি না?

গীতা উত্তর দেয় না, ক্ষণকাল নিঃশব্দে আমার দিকে চাহিয়া, হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া লয়।

কথা কইচো না যে—?

কথা জানি না।

তখন ইহার অর্থভেদ করিবার মত বুদ্ধি ছিল না, ভাবিলাম, হয়ত অন্যায় করেচি। বলিলাম, রাগ করেচো?

কই না, কেন—?

তারপর কিছুকাল দুইজনেই চুপ-চাপ। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ গীতা বলিয়া উঠে, চলো নৌকায় ঘুরে আসি।

হঠাৎ—?

হঠাৎ কিসের? আজ চ'লে যাব যে! চলনা—

না, থাক। স্বামীজি রাগ করবেন।

তবে থাক।···তুমি আমাদের সঙ্গে চলো না?

না, স্বামীজি যেতে দেবেন না। আমিই বা যা'বো কেন?

গীতার আয়ত চোখ দু'টি হঠাৎ যেন মেঘমেদুর হইয়া উঠে। কহে, বেশ যেয়ো না। কিন্তু গেলে ভারি মজা হ'ত।

কি মজা?

কেমন একসঙ্গে যেতাম—রেলে চড়ে, ডিঙ্গিতে ভেসে! যা'বে?

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দেখি—স্বামীজি। গোধূলির অবসন্ন আলোতেও বুঝা যায়, চোখ দু'টি আবার পশুর মত হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে।

—গীতা ট্রেণের সময় হ'ল তোমাদের, তৈরী হয়ে নাও।

সেই দীর্ঘ ঋজু দেহের দিকে চাহিলাম, কিন্তু ব্যাকুলতার আভাস মা

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমশঃ গাঢ় হয়—দুঃসহ বেদনার মত আশ্রমের চারিদিকে ধীরে ধীরে রাত্রি ঘনায়।

গরুর গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল, মা ও মেয়ে উঠিয়া

বসিলেন, স্বামীজির পাশটিতে দাঁড়াইয়াছিলাম, অনুসূয়া হঠাৎ হাতে ক'টা টাকা গুঁজিয়া দিলেন। কি বলিব ভাবিতেছি, স্বামীজিও বোধ হয় প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু গাড়ী তখন চলিতে সুরু করিয়াছে। গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে এত'বড় একটা বিদায় ব্যাপার শেষ হইয়া গেল। কেহ একটি কথা বলিল না, অনুসূয়া স্বামীজির মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিলেন, তিনিও হাসি দিয়াই তাহার উত্তর দিলেন, মাঝখান হইতে আমিই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলি—

আমিও যা'ব!···

না।

ধূলায় ধূলায় পথ তখন ঢাকিয়া গিয়াছে। গীতাদের গাড়ী আর দেখা যায় না।

আশ্রমে ফিরিয়া আসি। মৃত্যুর মত গাঢ়, নিঃশব্দ রাত্রি! স্বামীজির ঘরে প্রথম দিনটির মত আলো জ্বলিতে থাকে।

স্বামীজি বসিয়া বলিলেন, এ' পথে এমন ছেলেমানুষী শুধু দোষের নয়, মারাত্মক। তা ছাড়া, গীতা বিধবা।

* * * *

দিন রাত্রির স্রোত বহিয়া যায়।

এক বৎসরের মত কাজ বুঝিয়া লইয়া প্রায় সবাই সরিয়া গিয়াছে। স্বামীজি, আমি এবং আরও দুইজন ছাড়া এতবড় আশ্রমে আর কেহই নাই।

কিন্তু, ভাল লাগে না কিছুই। এ যেন একটা প্রকাণ্ড কারাগারে স্বেচ্ছায় বন্দী হইয়াছি। স্বামীজির রূঢ়তা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলে; রাত্রের নিঃসঙ্গ শয্যায় পড়িয়া কতদিন তাঁহার বীভৎস চীৎকার শুনিতে পাই, গভীর অন্ধকার রাতে কতদিন তাঁহাকে নদীর তীরে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি! নিজেকেও অসিত লাহিড়ীর মত দরিদ্র মনে হয়। অথচ, লোকটাকে ছাড়িয়া যাইতেও কোথায় যেন ব্যথা বোধ করি! মার কথা মনে পড়ে—লুকাইয়া বিছানায় চোখের জল ফেলি।···কিন্তু, স্বামীজি নিজেই একদিন সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন। নিবিড় স্নেহের সঙ্গে পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, এ' পথ তোমার নয় কিশোর, আমি বুঝেছিলুন। তোমার কান্না আমি শুনেচি,—

নির্ব্বিবাদে বিদায় লইয়া আসি। আমার কান্না শুনিয়া স্বামীজি আমায় বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাত্রির বীভৎস চীৎকার শুনিয়া কে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে কে জানে!

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়



বিচিত্রার দপ্তর

[বিশ্বামিত্র]

পরলোকের বার্তা

দম্ভেই পতন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহার উদাহরণের অন্ত নাই। 'টিটানিক' জাহাজের কথা অনেকেরই স্মরণ আছে। 'আর ১০১' নামক বিমানের শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা সংবাদপত্রে সকলেই পড়িয়াছেন।

এই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে ভবিষ্য-বাণী প্রাপ্ত হন শ্রীমতী হিঙ্কলিফ্। ইঁহার স্বামী আর এক বৈমানিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পর হিঙ্কলিফ্ পত্নীকে পরপার হইতে যে সকল সংবাদ প্রেরণ করেন তাহা লইয়া শ্রীমতী 'আর ১০১' বিমান-চালক জন্সনের নিকট গমন করেন। ইনি কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দেন।

১৯এ জুলাই, ১৯২৮ সালে শ্রীমতী স্বামীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পারলৌকিক সংবাদ পান—"অতি প্রকাণ্ড নূতন একখানি বিমান তৈয়ার হইতেছে, এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। ইহা 'একপেশে' হইয়া পড়িয়া যাইবে। দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে ইহা না ভাবিয়াই তাহারা যাত্রা করিবে। এই বিমান নিরাপদে কখনই বাহিতে পারিবে না। আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে ইহাদের সে দুর্ভাগ্য না ঘটুক্, ইহাই চাই।"

১লা আগষ্ট আর এক সংবাদ আসে—"আমার মনে হয় উহারা বড় তাড়াতাড়ি করিতেছে। যদি এইরূপ চলিতে থাকে বিমানের দুর্ঘটনা অপরিহার্য্য। যে সকল তার সমগ্র জাহাজখানিকে ধরিয়া রাখিতেছে তাহা যথেষ্ট শক্ত নয়, উহা নিশ্চয় ছিঁড়িবে।"

যেদিন 'আর ১০১'—বিমান যাত্রা করিল সেদিনও ঐরূপ সংবাদ আসে। তাহার পর যেদিন দুর্ঘটনা ঘটিল সেদিন শ্রীমতী এগার্টন নাম্নী এক মহিলা হিঙ্কলিফের নিকট হইতে পারলৌকিক সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণেই পান—"ঝড় উঠিতেছে, নিস্তার নাই।" দুর্ঘটনার পরে সংবাদ আসিল—"বিমানের যত নাবিককে আমি গুলি করিতে চাই। সন্দেহ-সংশয় তাহাদের মনেও যে ছিল।"

বৃহস্পতিবার-দ্বীপে বালখিল্য সংবাদপত্র

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় বৃহস্পতিবার-দ্বীপে। আকারে ইহা এগার ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে আট ইঞ্চি চওড়া অর্থাৎ সাধারণ গ্রন্থের একপৃষ্ঠা মাত্র। ইহার নাম 'ডেলি পাইলট্,' সাপ্তাহিক মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য দশ আনা, অথচ প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য পাঁচ আনা। এই দৈনিক পত্র সম্পাদন করেন জনৈক মহিলা, এবং তাঁহার সহকর্ম্মী মাত্র একজন। তিনি একাধারে কম্পোজিটর, প্রেস-চালক জমাদার, রিপোর্টার ও ম্যানেজার। হাণ্ড-প্রেসে সুস্পষ্ট অক্ষরে এই কাগজ ছাপা হয়। প্রতি সংখ্যায় রয়টার প্রদত্ত পৃথিবীর সংবাদ ও স্থানীয় সংবাদ প্রকাশিত হয়। বৃহস্পতিবার-দ্বীপ ও শুক্রবার-দ্বীপ নামক দুইটি দেশ অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা মোট দুই হাজার মাত্র। বড় বড় মানচিত্রেও এই Thursday Island ও Friday Island নামক স্থান-দ্বয়ের উল্লেখ নাই—উহার আয়তন এতই ক্ষুদ্র। মুক্তার জন্যই বৃহস্পতিবার-দ্বীপের খ্যাতি, অধিকতর প্রসিদ্ধি ক্ষুদ্রতম দৈনিক সংবাদপত্র এখানেই প্রকাশিত হয় বলিয়া এবং তাহাও আবার নারী কর্ত্তৃক পরিচালিত! এই স্থানে একটি মাত্র রাজপথ—নদীর তটে। মুক্তা ব্যবসারের জন্য ব্যবসায়ী সভা, রাজ-মন্ত্রণা সভা প্রভৃতি সবই আছে। বাসিন্দা অথচ দুই হাজার মাত্র! পার্শ্ববর্ত্তী শুক্রবার-দ্বীপে শুধুই কুষ্ঠ ব্যাধি-গ্রস্ত লোকের বাস।

এই দুই স্থানের অদ্ভুত নামকরণ করিয়াছিল কে এবং কি কারণে, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এ পর্য্যন্ত সে তথ্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

আবার জার্ম্মাণ সমর

জার্ম্মাণীতে 'ইস্পাত-শিরস্ত্রাণ' নামীয় প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ বলশালী হইয়া উঠিতেছে। ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ এবং তাঁহার বহু সহচর ও অনুচর মিলিয়া এই প্রতিষ্ঠান গড়িতেছেন। সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষদিগের দীক্ষায় দশ লক্ষ সৈনিক ইতিমধ্যেই নাকি রণ-কৌশলে সুশিক্ষিত হইয়াছেন। উদ্দেশ্য অবশ্যই সমর-ক্ষেত্রে বলপরীক্ষা এবং জার্ম্মাণীর নষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্ধার-সাধন। সমগ্র জার্ম্মাণ জাতির প্রত্যেক নর-নারীকে সৈনিকে পরিণত করিয়া সেই সঙ্গে পীত ও কৃষ্ণবর্ণ জাতিগণের সহায়তায় ভয়াবহ সমরানল প্রজ্জলিত করাই ইহাদের মুখ্য অভিপ্রায়। জার্ম্মাণী যদি তাহার স্বাধিকারে বঞ্চিত থাকে ছয় কোটি লোক 'যুদ্ধং দেহি' রব তুলিয়া পৃথিবী রসাতলে দিবে। ইহা শুধুই আস্ফালন কি না, কে জানে! তবে 'ইস্পাত-শিরস্ত্রাণ' দলের শাখা-প্রশাখা বর্ত্তমানে সারা জার্ম্মাণীতে নাকি আট হাজার স্থাপিত হইয়াছে এবং সভ্য-সংখ্যা বর্ত্তমানে দশ লক্ষ।

কিন্তু অনুষ্ঠানের ত্রুটি পূর্ব্বে সংগ্রামের সময়েও কম ছিল না! বিধাতার বিধান যাহা তাহাই ঘটে ও রটে।

পক্ষীর ঘণ্টাধ্বনি

নিদাঘে বাংলার গ্রামে বাগানে বাগানে নির্জ্জনে গাছের ছায়ায় আরাম উপভোগ সম্ভব কতক্ষণ? ঘুঘুর উদাস ডাক প্রাণটাকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া দেয়, কাঠ-ঠোক্‌রার বিকট চীৎকার বিরক্তি উদ্রেক করে। বাংলার এই ক্ষুদ্র বিহঙ্গগুলার অতিকায় আদিপুরুষ বিরাজমান দক্ষিণ আমেরিকায়—আমাজন নদীসৈকতে। ইহারা 'ঘণ্টাপক্ষী' নামে অভিহিত। গান সে গাহে না, গাহিতে জানে না—সুমিষ্ট সুর-লহরীতে সে বঞ্চিত; বৃক্ষ শাখায় বসিয়া শুধুই বিকট ঘণ্টাধ্বনি করে—ঢং ঢং ঢং। নিভৃত সুবিস্তীর্ণ বিজন বনে এই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া ভীষণতা উৎপাদন করে। পাখীর ডাক ত সে নয়—বৃহদাকার ঘণ্টার উৎকট নাদ। শব্দকালে পাখীটা নিজ শির পিছনে বাঁকাইয়া দেয়, দেহ-যষ্টি উপর দিকে তুলিয়া ধরে, রাক্ষসের মুখব্যাদানের ন্যায় চঞ্চু প্রচুর ফাঁক করিয়া রাখে।

পাখীটা কিন্তু বড়ই লাজুক, লোক-লোচনের সম্মুখে আসিতে চায় না। সাধারণতঃ ইহারা শ্বেতবর্ণ, গাছের ঘন পাতার আড়ালে লুকাইয়া রয় ও মধ্যাহ্নে নীরব থাকে।

পোষ্টকার্ডের ষষ্টিতম জন্মদিন

মনে হয় পোষ্টকার্ড চিরকালই, অন্ততঃ বহুকাল ধরিয়া, চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইংলণ্ডে পোষ্টকার্ড প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল মাত্র ষাট বৎসর পূর্ব্বে। পোষ্টকার্ড বাহির হইলে ডাকঘরগুলি নমুনা-ক্রয়াভিলাষী জনতায় ভরিয়া উঠে, মফস্বলে অনেক স্থানে পোষ্টকার্ড পাইবার প্রতিযোগিতায় মারপিট পর্য্যন্ত হইয়া যায়। প্রথম বৎসরে পোষ্টকার্ড বিক্রয় হয় সাড়ে সাত কোটির অধিক; কুড়ি বৎসরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় পঞ্চাশ কোটীতে! জর্ম্মান-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রতি বৎসর পোষ্টকার্ড গড়পড়তা শত কোটিরও অধিক বিক্রীত হইত। মাশুল বাড়িতে এই সংখ্যা হ্রাস পায়। মাশুল হ্রাস পাইলে সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে কিন্তু প্রাক্‌যুদ্ধ-কালের চেয়ে এখনো অনেক কম।

সার্দ্ধশতাধিক বর্ষ আয়ু

'শতায়ু হও'—ইহাই আমাদের দেশে আশীর্ব্বচন। ইহারও রদ-বদল প্রয়োজন। আশ্বিন সংখ্যায় ১৫৩ বর্ষ বয়স্ক জারো আঘার কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহাকেও পরাস্ত করিতেছেন ব্রেজিলের এক নারী। ১৬০ বৎসর বয়সে সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নাম, রোজা ডি-কোষ্টা। এত বয়সেও অঙ্গের বিকৃতি বা শৈথিল্য তাহার আদৌ হয় নাই। ইহার ১৪ টি পুত্র ও ৪টি কন্যার প্রত্যেকে একশত বর্ষ পরমায়ু অতিক্রম করিলেও এখনও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। রমণীর বংশাবলী এই :—

পুত্র—১৪

কন্যা—৪

পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী—১২৪

প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী, প্রদৌহিত্র ও প্রদৌহিত্রী—২৩০
প্র-প্রপৌত্র ইত্যাদি—১৪
এই প্র-প্রপৌত্রাদির মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠের
বর্ত্তমান বয়স—১৩

আমেরিকাবাসী রেড্-ইণ্ডিয়ান জুপ্লো বলেন জারো আঘার বয়স ১৫০ আমার ১৮০, প্রমাণ প্রয়োগ চান লউন।

উষ্ট্রের নেশা

উষ্ট্রেরা কথোপকথনে খুব দড়। চতুষ্পার্শে যাহা কিছু ঘটনা ঘটে তাহারই উপর তাহারা মন্তব্য প্রকাশ করে, গৃহপালিত অপর সকল পশু অপেক্ষা রকমারী আওয়াজ করে। উষ্ট্রের কণ্ঠস্বর অবশ্যই বীণাবিনিন্দিত নয়, কিন্তু তা' বলিয়া তাহারা যে সর্ব্বদাই অভিযোগ করে তাহা নয়। বোঝা চাপাইলে, যন্ত্রণা দিলে বা আঘাত করিলে ইহারা অবশ্যই চীৎকার করে। ইহাদের ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে কিন্তু বেশ বুঝা যায় যে, আহারের জন্য উহারা ভদ্রভাবে প্রার্থনা জানায়, খাদ্যদ্রব্য প্রদত্ত হইলে দাতার প্রতি কৃতজ্ঞভাবে চাহে। কিন্তু যখন নেশা হয় তখনই ইহাদিগের সহিত মানুষের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিশেষজ্ঞ মিঃ গিলবার্টের অভিমত এই। তিনি বলেন,—মঙ্গোলিয়ার স্থানবিশেষে এক প্রকার মাদক তৃণ জন্মে, চীনা ভাষায় তাহার নাম—সুইমা শাও অর্থাৎ মাদক শোণ; যে উষ্ট্র কখনও উহার স্বাদ না পাইয়াছে সেও আঘ্রাণ পাইলে সেইদিকে ছুটিবেই, এজন্য মাহুতেরা যেখানে ঐ তৃণ বর্ত্তমান সেদিকে উষ্ট্র লইয়া যায় না। কোনক্রমে ঐ তৃণ ভক্ষণ করিলে উষ্ট্রের বিকট নেশা হয়। লম্বা পাগুলি টলিতে থাকে, সে পড়িয়া যায়, ভূমিতে লুটোপাটি খায়, মুখ হইতে ক্রমাগত 'গাজলা' উঠিতে থাকে। তখন নানা-ভাবে সে উল্লাস-বাহুল্যের পরিচয় দেয়। এই নেশা ৩।৪ দিন হইতে কয়েক সপ্তাহ অবধি থাকে, ফলে কিছু-কালের জন্য সে ভার বহন করিতে অশক্ত হইয়া পড়ে।

"মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান"

'মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান'—কবির উক্তি এই। সত্যই কি তাই? মৃত্যু-যন্ত্রণা দুর্ব্বিষহ বলিয়াই অথচ চিরন্তন ধারণা। পরপার হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি কেহ সাক্ষ্য দেয় তবেই ইহার সুমীমাংসা হইতে পারে। সে সম্ভাবনা আকাশকুসুম, লোকান্তরের বার্ত্তাও বিশ্বাস্য নহে—এই বিচার করিয়া ব্রাইটনের খ্যাতনামা ডাক্তার হাণ্ড্স্ বিষপান করেন; উদ্দেশ্য—মৃত্যুকালে মানসিক অনু-ভূতি কিরূপ হয় তাহার যথাযথ বর্ণনা করিয়া যাইবেন। তাঁহার বয়স ৬৩। বিষপানের পূর্ব্বে দুইজন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করেন, স্ত্রীর সহিত খোসগল্পে বহুক্ষণ ব্যাপৃত ছিলেন। বিষ গ্রহণ করিয়াই মনে যেমন যেমন ভাব ও দৈহিক যাতনাদি হইতে লাগিল তাহা লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তিনি লিখিলেন—"আধ আউন্স একোনাইট খাইয়াছি, ক্লোরেল হাইড্রেট এক আউন্স, দুটিই উপাদেয় দ্রব্য। আমি এখন অন্তিমের অপেক্ষা করিতেছি, প্রচুর সুখ বোধ করিতেছি,—আপনাকে দুশ্চিন্তাহীন ও সম্পূর্ণ স্বাধীন এই প্রথম অনুভব করিতেছি। প্রাণের স্পন্দন এখনও সতেজ, শীঘ্র থামিবে বলিয়া বোধ হয় না। আমার প্রবন্ধগুলি সকলেরই অবশ্যপাঠ্য। জীবন-রক্ষার পন্থা নির্দ্দেশে অতুল-নীয় উহা। না, এইবার শ্রান্তি বোধ হইতেছে। বহুক্ষণ লাগিল, বড় ধীর-মন্থর-গতি মৃত্যুর আগমন।"

আরও—"জাপানীদের কথাই ঠিক। মৃত্যু প্রকৃতই সুন্দর। সুখের অনুভব অতি চমৎকার—যাতনা বিলকুল নাই!...... আমার শিরা কাটিয়া দিও। শবাধারেও হয়ত চেতনার চিহ্ন থাকিবে!—যদি ইহা সত্য হয়, ইস্! কি ভীষণ সেই অবস্থা!"

ডাক্তারের পুত্র শব-ব্যবচ্ছেদকালে বলেন যে, পিতা কয়েক বৎসর স্কন্ধের ব্রণে যথেষ্ট শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, অর্থকৃচ্ছ্রের কষ্ট পাইয়াছেন। ডাক্তার নিজেও মৃত্যুকালে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—"সাড়ে এগারটায় বিষ খাইয়াছি। আমার মনে হইতেছে, কুষীদজীবীগণকে ফাঁকি দিলাম।"

পত্নীকে আর এক পত্রে লিখিতেছেন—"এইবার সব শেষ। আমার ঋণের অন্ত নাই। পরিশোধের চেষ্টা বারবার করিয়াছি, সব ব্যর্থ।—অদৃষ্ট বিরূপ.....আমার সমাধির উপর ফুল দিও না, শবানুগমনও যেন না হয়, শোকচিহ্ন কেহ ধারণ না করে—কারণ দেহে যাহাই ঘটুক্ তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমার স্কন্ধের ব্রণটা যে কি তাহা পরীক্ষার জন্য লণ্ডন হাঁসপাতালে যেন পাঠান হয়।"

নিজ অস্ত্রোপচার-কক্ষে চৌকিতে উপবিষ্ট অথচ প্রাণ-বায়ু বহির্গত কিন্তু লিখন-রত এই অবস্থায় তাঁহার মৃতদেহ সকলে দেখিয়া অবাক্। করোণারের সিদ্ধান্ত—"মস্তিষ্ক-বিকৃতি হেতু আত্মহত্যা।"

মূকে দিলে ভাষা!

অন্ধের দৃষ্টি, মূকের ভাষা দুই অমূল্য দান বলিয়া নিশ্চয় গণ্য, কিন্তু দিবে কে? বিজ্ঞান অবশ্যই। অন্ধের দৃষ্টি-দানের দিন গণিতেছি, কিন্তু মূকের ভাষার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এখন আবিষ্কৃত!

অধ্যাপক গ্লাক্ পঁচিশ বৎসর কাল এই যন্ত্র-নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও উদ্যম যে অবশেষে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে ইহা তাঁহার নিজের ও মূকদিগের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। যাহারা আজন্ম বোবা তাহাদের জন্য এ যন্ত্র নয়। রোগ-পীড়ায় যাহাদের বাক্‌রোধ হইয়াছে এই যন্ত্র-সাহায্যে তাহাদের কণ্ঠস্বর ফুটিবে।

যন্ত্রটি ক্ষুদ্র ব্যাটারি মাত্র—এরূপে ধাতু-আচ্ছাদিত যে, তাহা হইতে সরল ও ক্রমিক স্বর নির্গত হইতে থাকে। পরিচালনার গুণে ইহা হইতে মনুষ্য-কণ্ঠের স্বর বাহির হয়। এই শব্দের সহিত পাতলা রবারের নল মুখবিবরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। সেখানে জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ ও মুখ-গহ্বরের উপরি-ভাগের সহিত সংস্পর্শে আসায় স্বর ও বর্ণের উদ্ভব হয় অর্থাৎ বাকশক্তির বিকাশ-প্রাপ্তি ঘটে।

অধ্যাপক তাঁহার এই অদ্ভুত যন্ত্রটির আরও উন্নতি-সাধনে এক্ষণে সচেষ্ট! যাহাতে মুখের মধ্যেই অনায়াসে রাখা যায় এরূপ ক্ষুদ্রাকার যন্ত্র প্রস্তুত করিতে তিনি এখন প্রাণপাত করিতেছেন। তাঁহার কামনা পূর্ণ হউক ইহাই সকলের প্রার্থনা।

নূতন জগৎ সৃষ্টি

জ্যোতির্ব্বিদগণের বিশ্বাস, নূতন আর এক জগতের সৃষ্টি সম্ভবতঃ চলিতেছে। কথাটা যে ভিত্তিহীন নহে পণ্ডিতেরা তাহার যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাহা এই।

সূর্য্যের পারিপার্শ্বিকদের মধ্যে বৃহস্পতি সর্ব্ববৃহৎ গ্রহ। এই বৃহস্পতি এক্ষণে পূর্ব্ব চক্রবালের সন্নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। ছোট একটা দূরবীণ সাহায্যেও তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিষীরা উপলব্ধি করেন যে, পৃথিবীর ন্যায় বৃহস্পতি-গ্রহ কঠিন অবস্থায় নিশ্চয় নাই, বরং বায়বীয় বা অর্দ্ধ-তরল অবস্থায় আছে, সুতরাং জীবজন্তু কোন কিছুই সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে একটা দাগ পরিষ্কার দেখা যায়—ইহাকে রক্ত-চিহ্ন বলা হয়—ইহার দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার ক্রোশ। আরও পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহা নির্ণীত হয় যে, দাগটি অগ্রসর হইতেছে, গ্রহের উপরিভাগ হইতে আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া পড়ে, আবার দেখা দেয়। এক এক বৎসরে ১৭ হাজার ক্রোশ ইহা পরিভ্রমণ করে।

জ্যোতির্ব্বিদেরা বহুকাল অকূল পাথারে পড়িয়া ছিলেন; সম্প্রতি কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতিষী আর, মুরো নূতন তথ্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৃহস্পতি ভীষণ উত্তাপে উত্তপ্ত প্রধানতঃ বায়বীয় পিণ্ড, বসুমতী অপেক্ষা বহু প্রকাণ্ড, বহু কোটী বৎসর বিদ্যমান থাকিলেও শীত-লতা প্রাপ্ত হইবার এখনও তাহার সময় আসে নাই, তবে রক্ত-চিহ্ন হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঠাণ্ডা হইবার অবস্থা সুরু হইয়াছে মাত্র—যে যে অংশে লাল-চিহ্ন পড়িয়াছে সেই সেই অংশের তরলাবস্থা ঘুচিয়া কঠিনাকার ধারণ করিতেছে—তাহাকেই নূতন জগৎ বা জীবের নব বাসস্থান বলা যায়।

এই নব-ভবনের আরও সংবাদের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব থাকিতে পারি, কিন্তু কবে তাহা সম্পূর্ণ ও বাসযোগ্য হইবে, কে বলিবে? অগণিত কাল পরে? আমাদের ভবিষ্য বংশধরেরা তাহার হিসাব লইবেন।

চন্দ্রগুপ্ত কি পার্শী ?

স্যর জীবনজী মোদী বোম্বাই সহরে বিপুল জনসভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রসিদ্ধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক প্রভৃতিরা পার্শী ছিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত ধারণার স্বপক্ষে তিনি পুরাতত্ত্ব-বিদ ডাঃ স্পুনারের নজীর দেখাইয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রথিতনামা সম্রাটগণের সমসাময়িক কালে ভারতে ইরাণী প্রভাব প্রবল ছিল এবং ইরাণী সভ্যতার ছাপ স্থাপত্য ও নানাবিধ কলাশিল্পে যথেষ্ট পরিদৃষ্ট হয়।

স্যর মোদী বিশিষ্ট ভূপতিগণকে স্বদলে টানিয়া কৌতুকেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। মোগল-পাঠানের বংশধরেরা আসরে নামিলে প্রখ্যাত রাজন্যবর্গ কোন্ দিন বা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইয়া যান, তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা রহিলাম। ঐতিহাসিকেরা কি বলেন ?

জীবে ও উদ্ভিদে প্রভেদ কৈ ?

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলসূত্র একই। মানুষে পশুতে, জীবে-উদ্ভিদে একই ধারা, সম নিয়মানুবর্ত্তিতা। বাহ্যদৃষ্টিতে দৈহিক ভিন্নতা, এই মাত্র। জীবে-জীবে দেহ-সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ, কিন্তু জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে সুস্পষ্ট নয় ; এজন্য উদ্ভিদের শারীর যন্ত্র ও গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গগৌরব স্যর জগদীশ চন্দ্র বসু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সাহায্যে চাক্ষুষ প্রমাণ দেখাইয়াছেন যে, জীবে ও জড়ে প্রাণীতে ও উদ্ভিদে সেই একই ধারা—সেই মাংসপেশী, সেই স্নায়ুমণ্ডলী, সেই রক্ত-সঞ্চালন ও নাড়ীর স্পন্দন, সেই সন্তান-প্রজনন পর্য্যন্ত। জীবদেহে একস্থানে আঘাত করিলে তাহার বেদনা যেমন শরীরের অন্যস্থানেও পৌছে, উদ্ভিদেরও ঠিক তাহাই হয় ; প্রাণীমাত্রেরই মাংসপেশীতে উত্তেজনার বশে যেরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটে উদ্ভিদেরও তদনুরূপ। সুতরাং সম্প্রতি বক্তৃতাকালে বৈজ্ঞানিকবর যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ ঘুচিবার কথা। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—উদ্ভিদ্-জগতের ভিতর দিয়া প্রাণী-জগতের প্রকাশে জীবনের ঊর্দ্ধমুখী গতি সুপরিস্ফুট, দুইটি সমপ্রাকৃতিক ব্যাপার এ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার চলিয়া আসিতেছিল, সেই ভ্রম দূর হওয়ায় ইহা স্পষ্টীকৃত যে জীবনরূপ মহাসমুদ্রের শুধুই বিভিন্ন প্রবাহ মাত্র এই জীব ও উদ্ভিদের জীবন। প্রকৃতই এই তথ্য আবিষ্কারে বিজ্ঞান আধ্যাত্মিকতার মূলে কুঠারাঘাত করে নাই, বরং জাগতিক অসীম রহস্যের প্রতি বিস্ময় আরও জাগাইয়া দিয়াছে, বিচিত্ররূপার অন্তর্নিহিত ঐক্যতানে হৃদয়মন আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়।

*   *   *   *

পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতার দুইমাস পূর্ব্বে বিলাতে ব্রিষ্টল সহরে উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক বাওয়ারের বক্তৃতাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বক্তৃতার বিষয়—"উদ্ভিদের আকৃতি ও গঠন।" 'প্রকৃতি'-পত্রে প্রকাশ,—অতি-সাধারণ প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমানের জটীল ও বহুধা বিভক্ত প্রাণী-জগতের ক্রমবিকাশ অবলম্বন করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ জীবজগৎ ও উদ্ভিদ্জগতের মূলে একই কারণ বর্ত্তমান, ক্রমশঃ এই উভয় জগৎ নানাবিধ জটিল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে ; বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে ক্রমশঃ অবশ্য সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত ঘটে ; সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত কোন কোনটি বংশবৃদ্ধি না করিয়াই দেহ-ত্যাগ করে, তাহারা তখন অপর উদ্ভিদের কাণ্ড অথবা মূলের বিবর্দ্ধমান অংশের শীর্ষে পুঞ্জীভূত হয় এবং ক্রমবিকাশে সহায়তা করে। অধ্যাপকের সিদ্ধান্ত—এইভাবে বিভিন্ন উদ্ভিদের আকার ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বিশাল বনস্পতির সমান হয় এবং সঙ্ঘবদ্ধ উদ্ভিদসমূহের মধ্যে যাহারা বংশবিস্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহাদের বিভিন্ন গঠন এই আকার অবলম্বনেই নির্ণয় করা যাইতে পারে।

এই কথায় উপনিষদ-বর্ণিত সেই পুরাতন প্রসঙ্গ মনে উদিত হয়। মৃত্যুর পর জীবাত্মা কিছুকাল পরে বৃষ্টিরূপে পতিত ও শস্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়—যে প্রাণী সেই শস্য ভক্ষণ করে রেতে রূপান্তরিত হইয়া অবশেষে তাহারই সন্তানরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে।

বিশ্বামিত্র

পরকীয়া

—কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

১

অরুণকুমার বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

অবশ্য গৌরী সে নহে; রূপের বিদ্যুৎপ্রভা নয়নকে বাঁধিয়া নেয় না; কিন্তু তাহার শ্যামদেহে—করুণ ও কমনীয় মুখমণ্ডলে এমন একটা বিচিত্র সুষমা ও মাধুর্য্যের আকর্ষণ ছিল যে! অরুণকুমার পলকহীন নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়াই রহিল।

তাহারই বসিবার ঘরের সম্মুখে একটা ঘোড়ার গাড়ী হইতে ফুটপাথে নামিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ট্যাক্সিতে উঠিয়া তরুণী সমভিব্যাহারীদিগের সহিত মুহূর্ত্তে তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিল। ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়া অরুণকুমার জানিল তাহারা কলিকাতা হ্রদ হইতে আসিতেছে কোথায় যাইবে তাহা সে বলিতে পারে না। আশ্চর্য্য! গাড়ী বদলাইবার জায়গাটি তাহার সৌভাগ্যক্রমে তাহার ঘরের সম্মুখেই স্থির করিল! তাও মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর ট্যাক্সি ছুটিল। বিমনা হইয়া অরুণকুমার কলিকাতা হ্রদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তীরবর্ত্তী শ্যামল তৃণাসনে বসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা রবির শেষ আলোকশিখা পশ্চিমের আকাশে রক্তরাগ ছড়াইতেছিল। অরুণকুমার বিরস চিত্তে উদাসদৃষ্টি মেলিয়া হ্রদের জলে চাহিয়া রহিল। এই অপরিচিতা তরুণীর মুখচ্ছবি তাহাকে এমন অভিভূত ও আকৃষ্ট করিল কেন?

গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে কত অনুপমা সুন্দরীকে সে পথে, মাঠে, মেলায়, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ভবনে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার চিত্ত কোন দিনই রূপমাধুর্য্যের আকর্ষণে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে নাই।

এই তরুণী তেমন সুন্দরী নহে, কোনও অপূর্ব্ব বিশিষ্টতাও তাহার যৌবনপুষ্পিত দেহে যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও নহে; কিন্তু তাহার মুখখানি এমনই মধুর বোধ হইয়াছে যে, অরুণকুমারকে বিচলিত করিয়াছিল।

অরুণকুমার ভাবিতে লাগিল।

কলিকাতা বিশ্বালয় হইতে সে এম, এ ডিগ্রি পাইয়াছে। আইনের শেষ ডিগ্রির পরীক্ষাতে সে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য বহু সাহিত্য; কাব্য উপন্যাস, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি তাহাকে গভীর আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। তাহার এই পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সে—পরিপূর্ণ যৌবনে, সুস্থ সবল দেহের অন্তরালে অবস্থিত মনে কোনও দিন প্রেমদেবতার পূজার আহ্বান মন্ত্রধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। আজ অকস্মাৎ তাহার হৃদয়মন্দিরে রত্নরাজির দিব্য আলোক-দীপ্তি কোথা হইতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

কাব্যে বর্ণিত যে অশরীরী দেবতার কথা সে পড়িয়াছে, ইহা কি সেই প্রেম? অজ্ঞাত কুলশীলা, জীবনে সর্ব্বপ্রথমদৃষ্টা এই তরুণীর প্রতি তাহার এ চিত্তবিকার যে নিতান্তই অশোভন অস্বাভাবিক—

অরুণকুমার চিন্তা করিতে লাগিল। অস্বাভাবিক?—না, আর যাহাই হউক, সে মনের এই অবস্থাকে অস্বাভাবিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। শত শত তরুণীর রূপশিখার আলোকতরঙ্গের আঘাত যাহার চিত্তকে কোনও দিন বিচলিত করিতে পারে নাই। বালিগঞ্জের রাজপথে মুহূর্ত্তদৃষ্টা এই শ্যামা তরুণীর মুখচ্ছবি তাহাকে এমন বিচলিত করিল কিরূপে? ইহা কি যৌবনের ধর্ম্ম? তাহাই যদি হয়, তবে এত দিন কি তাহার যৌবন মায়াদণ্ডের স্পর্শে নিদ্রিত ছিল? আজ দেবতার সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছে?

কি করুণ এই তরুণীর মুখখানি। যেন কোন অনাগত জগতের কত কাব্য, কত কাহিনী, কত সুখ, কত দুঃখ, কত আঘাত ও বেদনার ইতিহাস তাহার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। হ্রদের চারিদিকে বৈদ্যুতিক

আলোক সমূহ জ্বলিয়া উঠিল। শত শত নরনারী দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদের অস্পষ্ট মূর্ত্তি আলোক ও অন্ধকারের তরঙ্গ দোলায় আসিতেছে, যাইতেছে।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি অরুণকুমারকে সহসা কশাহত করিয়া তুলিল। পূর্ব্ববঙ্গের সুদূর পল্লীর কোনও ধনী তালুকদারের দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহে সর্ব্ব প্রকারে পঞ্চদশ সহস্র টাকার আমদানী তাহাদের গৃহে হয়। অর্থ-প্রাপ্তির আশায় লুব্ধ হৃদয়ে জ্যেষ্ঠাগ্রজের সহিত সে স্বয়ং পাত্রী দেখিতে গিয়াছিল। কন্যাটি সুন্দরী না হইলেও রজত কাঞ্চনের বিচিত্র রূপপ্রভা এবং মধুর নিক্কণ তাহার তরুণ চিত্তকে আকৃষ্টই করিয়াছিল। পাত্রী দর্শনের আট মাস পরে বিবাহসভায় শুভদৃষ্টির সময় সে বধূর প্রতি চাহিয়া ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছিল। অবশ্য তাহার শ্বশুর মহাশয় বলিয়াছিলেন যে; দুইমাস পূর্ব্বে নিদারুণ টাইফয়েড পীড়ার প্রকোপে স্বাস্থ্য ও লাবণ্য ফিরিয়া আসে নাই।

কিন্তু সে যুক্তি, সে কৈফিয়তে অরুণকুমার বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। সে মনে করিয়াছিল, কন্যার পিতা তাহাকে প্রতারিত করিয়াছেন, অন্য কন্যা দেখাইয়া তিনি এই কুৎসিতা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। শ্বশুরালয়ে সে একথা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও, মাতা ও পিতার কাছে ফিরিয়া আসিয়া সে কথা বলিতে ইতস্ততঃ করে নাই। দশ দিন পরে বধূ যখন পিত্রালয়ে গেল, তখনই সে জননীকে জানাইল যে, বধূকে যদি তাহারা চাহেন, তবে পুত্রের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। এই হীন প্রতারণা সে কখনও ক্ষমা করিবে না।

জ্যেষ্ঠাগ্রজ ও জননী তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন। ব্যাধির প্রকোপে এমন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর; কিন্তু অরুণকুমার তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। বিশেষতঃ তাহার পিতাও এ বিষয়ে তাহাকে উৎসাহ দেওয়াতে সে আরও জোর পাইয়াছিল। অরুণকুমার শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশে জন্মগ্রহন করিয়াছিল, এজন্য অরুণের পিতা বৈবাহিককে অরুণের জন্য একটা তালুক লেখাপড়া করিয়া দিতে বলিয়াছেন। তাঁহার সে প্রস্তাব প্রতিপালিত না হওয়ায় বৈবাহিককে তিনিও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। অরুণকুমার পিতার অনুমোদন লাভ করিয়া পত্নীর সংস্রব সেই সময় হইতেই ত্যাগ করিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত পত্নীর কোন সংবাদ না লওয়া পর্য্যন্ত সে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে নাই। শ্বশুরের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিয়া এই পাঁচ বৎসর সে শুধু ছাত্র-জীবনকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

হ্রদের কালো জলে বাতাসের চঞ্চল আঘাতে উর্ম্মি-লীলার সঙ্ঘাত চলিতেছিল। নাগিণীর ন্যায় আলোক রশ্মিগুলি নৃত্য করিতেছিল। অরুণকুমারের অধীর চিত্ত সান্ত্বনার কোনও চিহ্ন কোথাও দেখিতে পাইল না।

সে বিবাহিত—কিন্তু এ বিবাহকে সে কখনই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু যে তরুণীকে দেখিয়া তাহার চিত্ত সাড়া দিয়া উঠিল, সেই নারী অপরের পত্নী কিনা তাহাও ত সে জানে না।

কিন্তু যুক্তি কোনও দিন জাগ্রত যৌবনের প্রবল অভিলাষের গতিরোধে সমর্থ হয় না। অরুণকুমার যুক্তির দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিতে পারিল না।

২

কয়দিন ধরিয়া অরুণকুমার প্রত্যহ হ্রদের তীরে হাজিরা দিতে লাগিল। কোনো সকাল ও সন্ধ্যা সে ব্যর্থ হইতে দেয় নাই। পরীক্ষার তাড়া নাই। অন্য কোনও কাজও ছিল না, সুতরাং সে প্রত্যহ সেই অজ্ঞাতকুলশীলা তরুণীকে আর একবার দেখিবার আশায় উৎকণ্ঠাবিক্রন্ত হৃদয়ে হ্রদতীরে গতায়াত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কামনা সার্থক হইল না। আর একদিনও সে ঈপ্সিত মূর্ত্তি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিল না।

অরুণকুমার আপনার এই উন্মত্ত অধীরতায় অনেক সময় এমন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িত যে, পথের লোক তাহাকে কেন পাগল ভাবে নাই, ইহাই সে বিস্ময়কর বলিয়া মনে করিত।

ভবানীপুর কালীঘাট অঞ্চলের বাঙ্গালী পল্লীতে পল্লীতে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যদি কোন গৃহের গবাক্ষপথে

সেই শ্যামা সুন্দরীর দেখা পায়। পথে মোটর, ট্যাক্সি অথবা গাড়ী দেখিলেই তাহার আরোহীদিগের প্রতি সে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিত; কিন্তু তাহার মানসী সুন্দরীকে সে একবারও দেখিতে পাইল না।

তাহার শিক্ষিত হৃদয়, মার্জ্জিত বুদ্ধি, সামাজিক শিষ্টাচার-জ্ঞান অনেক সময় তাহাকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিত, তাহার এই ব্যবহার সমর্থনের অযোগ্য; কিন্তু কোনও মতেই সে আপনার অধীর বাসনাকে শৃঙ্খলিত করিতে পারিত না।

মাসাধিক কাল এই ভাবে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ক্রমে অরুণকুমার দেহ ও মনে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। নিজের এই উদ্ভট পাগলামীর কথা মনে করিয়া এক এক সময় তাহার নিজেরই হাসি পাইত। কিন্তু মানব মনোবৃত্তির এই জটিলতম রহস্যটিকে অতিক্রম করিবারও কোন উপায় খুঁজিয়া পাইত না।

দেশ হইতে পিতা ও মাতা পত্র লিখিয়াছিলেন। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ তখন কলিকাতায় থাকিবার আপাততঃ প্রয়োজন নাই। পদ্মার তীরের বিশুদ্ধ বায়ু, প্রচুর দুগ্ধ ও মৎস্য, পল্লীর শান্ত শীতল আবহাওয়ার মধ্যে ফিরিয়া আসা তাহার কর্ত্তব্য। জননীর আগ্রহ আশ্বাস তাহার মনকে বিচলিতও যে না করিয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু অরুণকুমার যাই যাই করিয়া আরও কয়েকদিন কলিকাতায় কাটাইয়া দিল।

এমন সময় একদিন সতীর্থ বিমলাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ-পত্র আসিল। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাহার পিতামাতা প্রভৃতি পুরীধামে সমুদ্রতীরে একটী বড় বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন। অরুণকুমার যদি এখানে কয়েক দিন তাহার আতিথ্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে পরম আনন্দিত হইবে। পুরী সে পূর্ব্বে দেখে নাই—সমুদ্রের বিচিত্র দৃশ্যে তাহার কবি-হৃদয় বিমুগ্ধ ও পুলকিত হইবে।

বন্ধুর এই আমন্ত্রণ তাহার শ্রান্ত চিত্তকে নূতন উত্তেজনায় অভিভূত করিল। সে পুরী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। দেশে জনক জননীর কাছে লিখিয়া দিল দুই তিন সপ্তাহ পুরীধামে বাস করিবার পর সে দেশে যাইবে।

যাত্রার আয়োজন করিয়া পরদিবস পুরী এক্সপ্রেসে অরুণকুমার কলিকাতা ত্যাগ করিল।

৩

অরুণকুমার স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সমুদ্র সে পূর্ব্বে কখনও দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই। নানা গ্রন্থে সে শুধু তাহার বর্ণনাই পাঠ করিয়াছিল। কিন্তু সসীম মানুষের ভাষা অসীম বিচিত্রকে রূপরেখায় কখনও মূর্ত্তি দিতে পারে? স্তব্ধ বিস্ময়ে অরুণ শুধু তাহাই চিন্তা করিতেছিল। ফেনোর্ম্মিশীর্ষ তরঙ্গ বিপুল উৎসাহে ছুটিয়া আসিয়া বেলাভূমিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। মুহুর্মুহুঃ বজ্রের গর্জ্জন অতলস্পর্শ সমুদ্রের আলোড়িত হৃদয়ের অভিব্যক্তি। প্রভাত সূর্য্যের দীপ্ত আলোক-প্রবাহ দিক-চক্রবালে কোন্ সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত করিতেছে, মানুষের মন তাহা কল্পনাও করিতে পারে না।

অরুণ দেখিল, তাহার বন্ধুর বাড়ীর মহিলারা বেলাভূমিতে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের আনন্দ-ভ্রমণে বাধা দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। সে আরও দূরে চলিয়া গেল—তাহার মনে যেন অননুভূতপূর্ব্ব বৈরাগ্যের আনন্দ অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল। এই বিচিত্র দর্শন, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অনন্ত আধার সমুদ্রের উদাস বাতাস তাহার সমগ্র চিত্তকে বিচিত্র রসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল।

হে বিরাট, আজ তুমি এ কি অভাবনীয় রূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছ! সে কোন দিন এমন ভাবে তোমাকে কল্পনা করিতেও পারে নাই। মনে পড়িল, দেশ বিদেশের মহাকবিরা এই সমুদ্রের বর্ণনায় তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও এই অপূর্ব্বকে রূপে রসে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। বিশ্বস্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের আধারকে মানবের ভাষা সম্যক প্রকাশ করিতে পারে না।

পশ্চাৎদিক হইতে মনুষ্যকরস্পৃষ্ট হইয়া অরুণকুমার চাহিয়া দেখিল। বন্ধু বিমলাপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কবি কি সৌন্দর্য্যের ধ্যানে তন্ময়? চল, মন্দিরে বেড়িয়ে আসি।"

অরুণকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এখন গেলে বিগ্রহ দেখা যাবে ?"

"নিশ্চয়, এই ত দেখবার উপযুক্ত সময়।"

বন্ধুযুগল মন্দিরের পথ ধরিল।

সিংহদ্বার পার হইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে পড়িয়া অরুণকুমার বিস্ময়ানন্দে পুরীর মন্দিরের চিত্রিত শিল্পের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু বিগ্রহ দেখিবার আগ্রহে মন্দিরের কারু-সৌন্দর্য্যের প্রতি মনোযোগ দিবার সময় হইল না।

পুরীর মন্দির-প্রহরীরা যাত্রীদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভিতরে পাঠাইতেছিল, আবার দর্শনতৃপ্ত যাত্রীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বাহিরে আসিবার ব্যবস্থা করিতেছিল।

বন্ধুযুগল এই নিয়মানুবর্ত্তী যাত্রীদলের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

সহসা অরুণকুমার চমকিয়া উঠিল। ঐ না সেই তরুণী ? হ্যাঁ—সেই শ্যামা সুন্দরী—মুখে সেই ক্লিষ্ট করুণ শান্ত দীপ্তি। লক্ষ নারীর মাঝে অরুণকুমার তাহাকে দেখিলেই চিনিতে পারে। আজ প্রায় দুইমাস কাল ঐ মুখের স্মৃতি তাহার মানসপটে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

যে যাত্রীদল দেবদর্শনের পর বাহিরে আসিতেছিল, তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে এই তরুণী ও তাহার সমভিব্যাহারীরা ছিল। হাঁ, ঐ প্রৌঢ়কেও ত সেদিন সে দেখিয়াছিল।

সমগ্রচিত্ত নয়নে কেন্দ্রীভূত করিয়া অরুণকুমার তরুণীর দিকে চাহিল। ঠিক সেই সময় শ্যামা সুন্দরীও তাহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার আয়ত লোচনদ্বয়ে কি গভীর ব্যথাভরা দৃষ্টি! অরুণ বিমুগ্ধ হইল।

সহসা সে তরুণীর ললাটদেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখিল, তথায় নারী জাতির শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ—সিন্দুরবিন্দু জ্বল জ্বল করিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে অরুণের আশাপ্রদীপ্ত হৃদয়ে কে যেন মসীর প্রলেপ ঢালিয়া দিল।

যাত্রীদলের চাপে সে সহযাত্রীবর্গসহ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। তরুণী ও তাহার সঙ্গীরা মন্দির-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। অরুণকুমারের পক্ষে তখন দেবদর্শন করিবার পূর্ব্বে শ্রেণীভেদ করিয়া বাহিরে আসা অসম্ভব। কাজেই সে ক্ষুব্ধচিত্তে যাত্রীদলের সহিত গর্ভ-গৃহে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল।

সে দেবাদিদেব জগন্নাথের দিকে চাহিয়া হৃদয়ের চাঞ্চল্য দমন করিবার চেষ্টা করিল। মনের প্রান্তে এই কয় মাস ধরিয়া সে যে শঙ্কিত আশাকে পোষণ করিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত—ক্ষীণ আলোক-রশ্মির কোনও প্রকাশ কোথাও নাই।

অবরুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া অরুণকুমার যুক্তকরে দারুব্রহ্মের উদ্দেশে প্রণাম করিল। এতদিন সে কখনও কোনও দেব বিগ্রহকে এমনভাবে অন্তরের বেদনা নিবেদন করে নাই। অরুণকুমারের মনে হইল, তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি যেন অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, সে যেন বড় দুর্ব্বল, অত্যন্ত অসহায়। আজ তাহার অন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে সেই অনাথশরণের চরণতলে লুটাইতে চাহিতেছিল।

বিমলাপ্রসাদ বন্ধুকে ঠেলা দিয়া বলিল, "চল, এখন এখানে আর দেরী ক'রে লাভ নেই। সমুদ্রস্নানের সময় হয়েছে।"

সুপ্তোত্থিতের ন্যায় অরুণকুমার দেবতার আসন হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গর্ভগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। জনস্রোতের মাঝে চরণ আপনা হইতে তাহাকে বাহিরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। আবিষ্টভাবে অরুণকুমার যাত্রীদলসহ বাহিরে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপনীত হইল।

ব্যাকুল আগ্রহে সে তখন বিস্তৃত প্রাঙ্গণের চারিদিকে চাহিতে লাগিল; কিন্তু যাহাকে দেখিতে চাহে, তাহার মূর্ত্তি কোথাও দেখা গেল না। আর দেখিতে পাইলেই বা তাহার কি ? কোনও আশা ত নাই। তথাপি লুব্ধ মন অনিশ্চিতের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াই পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। বিধিলিপি!

৪

স্বর্গদ্বারের অনতিদূরে, বেলাতটে অপরাহ্নের বিচিত্র আলোকে অরুণকুমার যাহা দেখিল তাহাতে তাহার সমস্ত অন্তর তীব্র পুলকে শিহরিয়া উঠিল। একটী প্রৌঢ় ও আর

একজন মহিলার সহিত সেই অপূর্ব্বদর্শনা তরুণী নিবিষ্ট-চিত্তে সমুদ্রতরঙ্গের লীলা দেখিতেছিল।

অরুণের শুব্ধ চরণ আর উঠিল না, তাহার মুগ্ধদৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হইয়াই রহিল। না, আর বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি নাই, এই তরুণী নিশ্চয়ই অপরের গৃহলক্ষ্মী। ললাট ও সীমন্ত প্রদেশে যে নিষেধাজ্ঞা উজ্জ্বল হইয়া আছে, তাহাকে লঙ্ঘন করিবার কোনও উপায় নাই।

তথাপি অরুণকুমার অবাধ্য দৃষ্টিকে সংযত করিতে পারিল না, দুরন্ত মনকে নিষিদ্ধ পদার্থ হইতে আকৃষ্ট করিয়া লইতে সমর্থ হইল না। অন্যায়, সহস্রবার অসঙ্গত, অশোভন; কিন্তু বন্যার প্রবল উচ্ছ্বাসকে বাঁধ দিয়া রাখিবার মত শক্তি তাহার কোথায়?

তরুণী একবার দৃষ্টি ফিরাইতেই অরুণকুমারের সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। তখনই তন্বী মুখ ফিরাইয়া লইল। অরুণকুমার বুঝিতে পারিল না, তাহার এই নির্লজ্জ ক্ষুধিত দৃষ্টি দর্শনে তরুণীর মুখে ক্রোধ অথবা লজ্জার রেখা ফুটিয়া উঠিল কিনা।

অরুণকুমার দৃষ্টি ফিরাইয়া সমুদ্রতরঙ্গের প্রতি নিবদ্ধ করিল সত্য; কিন্তু তাহার চিত্ত পাখা মেলিয়া এই তরুণীর দিকে উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে নিজের মনের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় আপনাকে অত্যন্ত বিপন্ন বলিয়া মনে করিল। সে শিক্ষিত ভদ্র সন্তান হইয়াও অপরের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি এমন মনোভাব পোষণ করিতেছে কেন? কেন, তাহা সে জানে না; কিন্তু চিত্ত-বৃত্তিকে নিরোধ করিবার তাহার সাধ্য ছিল না, ইহা সে মনের কাছে অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

অরুণ দেখিল ভদ্রলোকটি অদূরে বেলাভূমির উপর উপবেশন করিলেন। তাঁহার সঙ্গিনীগণও তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

অরুণকুমার তাহার অশান্ত চিত্তকে সমুদ্র তরঙ্গ লীলায় বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিল। তরুণীর দিকে বার বার চাহিবার সাহস তাহার হইল না। তাহার ভদ্রতাজ্ঞান তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন অপরাহ্নের আলোক ম্লান হইয়া আসিতেছিল। ধীরে ধীরে অরুণকুমার আপনা-বিস্মৃত হইয়া অনন্ত রহস্যের মায়াজালের মধ্যে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল।

কতক্ষণ সে এই ভাবে আত্ম-সমাহিত ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারিল না। সহসা একটা প্রকাণ্ড তরঙ্গ অদূরে বেলাভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুরুগর্জ্জনে সে আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল।

আকাশের দিকে চাহিবা মাত্র সে বুঝিল, জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ-আকাশে মেঘের জটাজাল বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ঘন মেঘের অন্তরালে দামিনীর দীপ্ত বিকাশ আসন্ন ঝটিকার সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। সমুদ্রের জল কালো হইয়া উঠিয়াছে। তরঙ্গশীর্ষে ক্রুদ্ধ সমুদ্রের ফেনপুঞ্জ প্রতি মুহূর্ত্তে পুষ্পিত হইয়া উঠিতেছে—কিন্তু সে যেন রুদ্র লীলার পূর্ব্বাভাস।

অরুণকুমার পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল, কেহ নাই। ভ্রমণ-কারীরা বেলাভূমির সান্নিধ্য বহুক্ষণ ত্যাগ করিয়াছে। সমুদ্রতট জনশূন্য।

অরুণকুমার তাড়াতাড়ি বাসার অভিমুখে ফিরিবার জন্য উঠিল; অনেকটা দূর তাহাকে যাইতে হইবে। ফ্লাগষ্টাফের কাছাকাছি তাহাদের বাসা। ততক্ষণ ঝটিকা অপেক্ষা করিবে কি?

অরুণকুমার দ্রুত চলিতে লাগিল; কিন্তু বালুকার উপর দিয়া তাড়াতাড়ি চলাও দুরূহ ব্যাপার।

প্রবলবেগে একটা দমকা হাওয়া ছুটিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা শোঁ শোঁ শব্দ সমুদ্রবক্ষ হইতে তীব্র বেগে যেন তীরাভিমুখে আসিতেছিল।

অরুণকুমার দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

মেঘের অন্ধকার অকস্মাৎ চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অরুণকুমার আত্মবিস্মৃতির জন্য মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিল। আজ তাহাকে ঝটিকার কাছে নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

দৌড়াইতে দৌড়াইতে অরুণকুমার সম্মুখে একটা অট্টালিকা দেখিতে পাইল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল। বারাণ্ডায় বোধ হয় কেহ দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিপন্ন অরুণ-

কুমারকে তিনি ডাকিলেন, "তাড়াতাড়ি ভিতরে আসুন। জোরে ঝড়বৃষ্টি আসছে।"

দ্বিতীয় অনুরোধের জন্য অরুণ অপেক্ষা করিল না। দাবাণ্ডায় উঠিবামাত্র আহ্বানকারী তাহাকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইলেন।

দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিতেই অরুণকুমার তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তিনি অপরিচিতা শ্যামা সুন্দরীর সঙ্গী—সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

অজ্ঞাতসারে অরুণ অন্তর মধ্যে একটা শিহরণ অনুভব করিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাহাকে সম্মুখস্থ আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

ঝটিকা বাহিরে প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ করিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি গম্ভীর, স্বল্পভাষী; কিন্তু কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্ট এবং ব্যবহারে শিষ্টাচার ও সৌজন্যের কোনও অভাব ছিল না।

অরুণকুমার বলিল, "আশ্রয় পেতে আর একটু দেরী হলে, বিষম বিপদে পড়তে হত।"

প্রৌঢ় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এ অঞ্চলের ঝড় এমনি আকস্মিক দেখা যায়। আপনি পূর্ব্বে কখনও পুরী আসেন নি বুঝি?"

অরুণ জানাইল, না, এই তাহার প্রথম এ অঞ্চলে আগমন।

দুই একটি করিয়া কথার সূত্রে উভয়ের মধ্যে আলোচনা জমিয়া উঠিল।

ঝটিকার বেগ অনেকটা শান্ত হইয়া আসিলেও বৃষ্টির ধারা তখনও থামে নাই। ঘরের মাঝে যে দ্বারটি মুক্ত ছিল, তাহার অপর দিকের কক্ষে মানুষ চলাফেরা করিতেছিল। অরুণকুমার চকিত নেত্রে এক একবার সেই দিকে চাহিতে-ছিল, অবশ্য ভদ্রতা যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া।

ভদ্রলোক বলিলেন, "এ সময়ে একটু চা মন্দ লাগ্‌বে না; আপনার আপত্তি নাই ত?"

অরুণকুমারের বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না; বিশেষতঃ নব পরিচিত ভদ্রলোকের সান্নিধ্য তাহার কাছে যেন পরম আকর্ষণের বস্তু বলিয়া মনে হইতেছিল।

পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে এইটুকু জানিতে পারিল, অবিনাশচন্দ্র গুহ এলাহাবাদে থাকেন, সেখানকার কলেজের তিনি ইংরাজীর অধ্যাপক। বেশীর ভাগ বিদেশে থাকেন। গ্রীষ্মের উত্তাপ অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি তিন মাস ছুটী লইয়া দেশে আসিয়াছিলেন। পুরীর সমুদ্র তাঁহার বড় প্রিয়, তাই মাসাধিককাল এখানে আছেন। আলাপ প্রসঙ্গে সে ইহাও জানিতে পারিল, তিনি নিঃসন্তান, সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও একমাত্র মাতৃহারা ভাগিনেয়ী।

স্পন্দিত বক্ষে অরুণকুমার ভদ্রলোকের পরিচয় শ্রবণ করিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, তাঁহার ভাগিনেয়ীর সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ জানিয়া লয়। কিন্তু একদিনের পরিচয়ে একজন মহিলার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ নিতান্ত অসঙ্গত এবং অশোভন হইবে বলিয়া সে নীরবে রহিল।

অবিনাশবাবুও ভদ্রতার অনুরোধে অরুণকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অকপটে তাহার পিতার পরিচয় দিল। পদ্মার তীরবর্ত্তী কোনও গণ্ডগ্রামে তাহাদের পৈতৃক ভবন। সহরের কাছেই বিলাসপুর গ্রাম। সে এম্‌, এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আপাততঃ কলিকাতার মেসে আছে। গৃহের সকল সংবাদই সে প্রদান করিল। শুধু সে যে বিবাহিত সে কথাটা সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া গেল।

ভৃত্য একখানা ট্রের উপর দুই কাপ্‌ চা ও কিছু আহার্য্য লইয়া প্রবেশ করিল। অবিনাশবাবুর গম্ভীর মুখে মৃদু হাস্য উদ্ভাসিত। তিনি স্নিগ্ধ, মিষ্ট কণ্ঠে বলিলেন, "একটু চা পান করুন অরুণবাবু।"

অরুণকুমার অন্যমনস্কভাবে প্রজ্বলিত আলোকাধারের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। অবিনাশবাবুর আহ্বানে সে চমকিত হইয়া ফিরিল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া অবিনাশবাবু বলিলেন, "লেখাপড়া ত শেষ করেছেন। এরপর কোন পথে যাবেন?"

এখনও অরুণকুমার সে কথা ভাবিয়া দেখে নাই। যাহা হউক, একটা দিক্ অবলম্বন করিতেই হইবে।

অধ্যাপক বলিলেন, "বিবাহ হয়েছে কি?"

এই প্রশ্নটাকেই সে এড়াইতে চাহিয়াছিল। একটু

স্তব্ধভাবে থাকিয়া সে বলিল—"বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে আমার ভাল ধারণা নেই। ও ব্যাপারে আগ্রহও এখন কম।"

উত্তর সরাসরি হইল না। কিন্তু সে যে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে অনিচ্ছুক এ কথা প্রবীন অধ্যাপক বুঝিলেন।

অন্যের অলক্ষ্যে বার কয়েক সে ভিতরের ঘরের দিকে চকিতে চাহিয়া দেখিয়াছিল, ইহা অবিনাশবাবুর দৃষ্টিপথে পড়ে নাই ত?

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। অরুণকুমার শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া বিদায় লইল। কিন্তু যাইবার সময় সে ভিতরের ঘরের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভুলিল না।

৫

অবিনাশবাবুর সহিত পরিচয়ের পর অরুণকুমার তাঁহার অত্যন্ত ভক্ত হইয়া পড়িল এবং প্রত্যহ তাঁহার বাসায় হাজিরা দিতে লাগিল। এক একদিন বিমলাপ্রসাদও তাহার সঙ্গে থাকিত। অবিনাশবাবুর সহিত বিমলাপ্রসাদের পূর্ব্বেই জানাশুনা হইয়াছিল, এ সংবাদটুকু অরুণকুমার বন্ধুর কাছেই জানিতে পারিয়াছিল।

চায়ের নিমন্ত্রণ প্রত্যহই ছিল। কিন্তু এই গম্ভীর প্রকৃতি স্বল্পভাষী প্রৌঢ় অধ্যাপকের পার্শ্বে বসিয়া অরুণকুমার কি আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিত তাহা সেই জানে। চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় তাহার চিত্ত স্বর্গদুয়ারের এই বাড়ীর দিকে যে ধাবিত হইত তাহা মিথ্যা নহে।

একদিন সকালে অরুণকুমার নিয়মিত ভ্রমণ শেষে অবিনাশ বাবুর বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল। অবিনাশবাবু তখনও ফিরেন নাই। সে অপেক্ষা করিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় "মামাবাবু" বলিয়া তরুণী সহসা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অরুণকুমার তাহার দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল আরক্ত মুখে তরুণী মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া দ্রুত ঘরের ভিতর ফিরিয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তে অবিনাশবাবু বাহির হইতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"এই যে আপনি এসেছেন, বেশ।" বলিয়া অধ্যাপক অন্দরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

চায়ের পর্ব্ব যথা সময়ে আরম্ভ হইল।

কথা প্রসঙ্গে অবিনাশবাবু বলিলেন, "লেখাপড়া শিখে আমাদের দেশের পুরুষরা ঠিক মানুষ হয়ে উঠ্‌ছে কি অরুণবাবু?"

এ প্রশ্নটা গম্ভীর প্রকৃতি অধ্যাপকের মুখে যেন অভিনব বলিয়া অরুণের মনে হইল। সে মৃদুভাবে বলিল, "কিন্তু এ বিষয়ে আপনার মত পণ্ডিত ব্যক্তির সন্দেহের কারণ ত বুঝতে পারছি না?"

মৃদু হাসিয়া অধ্যাপক বলিলেন, "আমার ভাগিনেয়ীকে দেখে থাক্‌বেন বোধহয়। ওঁর স্বামীটি—আমাদের জামাই—একটি পণ্ডিতমূর্খ ব্যক্তি। খুব লেখাপড়া তিনি শিখেছেন; কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে একেবারে উদাসীন।"

কম্পিতকণ্ঠে অরুণ বলিল, "আপনার ভাগিনেয়ী ত চমৎকার মেয়ে। তাঁর প্রতি কোন মানুষ কর্ত্তব্যপালন না ক'রে থাকতে পারে এটা ত বিশ্বাস হয় না।"

অবিনাশবাবু বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মেয়েটিকে আমার কাছে রেখে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়েছি। এমন চমৎকার মেয়ে হাজারে একটা মেলে না।"

মনে মনে অরুণকুমার সেকথা সহস্রবার স্বীকার করিল। তাহার ভাগ্যে এমন পত্নী—

চিন্তাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া অরুণকুমার শুধু বলিল; "মানুষের অদৃষ্ট।"

"অদৃষ্ট নয়, অরুণবাবু, আহাম্মুখী।"

বেলা হইতেছে দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অরুণকুমার বাসার দিকে ফিরিল।

সপ্তাহ খানেক পরে নিয়মিত বেড়াইতে গিয়া অরুণকুমার জানিতে পারিল, অবিনাশবাবু সপরিবারে সেইদিনই পুরী ত্যাগ করিতেছেন।

অধ্যাপক বলিলেন, "ছুটী ফুরিয়ে এসেছে। তাছাড়া মা-লক্ষ্মীকে তার শ্বশুরশাশুড়ী স্মরণ করেছেন। ফের্‌বার

পথে ওকে শ্বশুর বাড়ী দিয়ে আমি এলাহাবাদে যাব। আপনার সঙ্গে এ কয়দিনের আলাপ আমার স্মরণ থাকবে, অরুণবাবু।"

অধ্যাপকের উজ্জ্বল দৃষ্টি অরুণকুমারের উপর স্থাপিত হইল।

সংবাদ শ্রবণে অরুণের মুখের দীপ্তি সহসা যেন নিভিয়া গেল। তাহার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। কোন লাভের প্রত্যাশা কোথাও ছিলনা, তবু মরীচিকার সন্ধানে এই যে উন্মত্ত অভিযান, ইহাতে একটা মাদকতা ছিল।

বাসায় ফিরিবার সময় অরুণের মনে হইল, তাহার সম্মুখ হইতে পৃথিবীর সমস্ত আলোক-দীপ্তি যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

বিমলাপ্রসাদ তাহাকে প্রশ্ন করিল, "আজ এত বিরস দেখাচ্ছে কেন বন্ধু?"

তাহার দৃষ্টিতে কৌতুকের ইঙ্গিত দেখিয়া অরুণকুমার মুখ ফিরাইয়া লইল। সতীর্থ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেও অরুণকুমার বিমলাপ্রসাদের কাছে তাহার অন্তরের এই গূঢ় কথাটা প্রকাশ করিতে পারে নাই—পারাও সম্ভবপর ছিল না।

৬

পিতা লিখিয়াছিলেন, "তুমি বাড়ী ফিরিয়া এস। তোমার জন্য আমি অন্য পাত্রীর ব্যবস্থা করিতেও প্রস্তুত। এমনভাবে তোমাকে ছন্নছাড়া হইয়া থাকিলে চলিবে না।" জ্যেষ্ঠভ্রাতা লিখিয়াছিলেন, "তুমি অন্যায় করিতেছ। স্বয়ং যাহাকে দেখিয়া বিবাহ করিয়াছিলে, এখন কোনও অজুহাতে তাহাকে পরিত্যাগ করা ন্যায় ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। এতদিন পড়াশুনা করিতেছিলে বলিয়া তোমায় আমরা বিরক্ত করি নাই। কিন্তু অগ্নি সাক্ষী করিয়া যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছ তাহা খেয়ালের বশে অস্বীকার করিবার অধিকার তোমার নাই।"

উত্তেজিত চিত্তে সে তৃতীয় পত্র উন্মোচন করিল। উহা তাহার জননীর পত্র। তিনি মাতৃহৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন, "ফিরে আয় বাবা! অনেক দিন তুই আমার কোল ছাড়া। আশীর্ব্বাদ করি, তোর মনের দুঃখ থাকবে না। তুই কারও কথা শুনিস না। তোর ভিতরে যিনি আছেন, তাঁরই কাছে সব নিবেদন ক'রে কর্ত্তব্যের পথ বেছে নিতে পারবি। তিনি সবাইকে কোল দিয়ে তাদের কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ ক'রে দেন। আমি তোর আসার পথ চেয়ে রৈলুম। বঞ্চিত করিস না।"

অরুণকুমার ভাবিতে লাগিল।

আজ প্রায় আট দিন সে একা সমুদ্রতটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। অবিনাশবাবুরা চলিয়া যাইবার পর সে বন্ধু বিমলাপ্রসাদের সঙ্গও ত্যাগ করিয়া একাই তাহার অশান্ত-চিত্ত লইয়া অনন্তের কূলে সান্ত্বনার ভাষা অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছে। আজ স্নেহময়ী জননীর আহ্বানে তাহার প্রাণ সাড়া দিয়া উঠিল।

না, মার প্রাণে ব্যথা দিতে সে পারিবে না। দেশে ফিরিতেই হইবে।

বন্ধু বিমলাপ্রসাদকে সে কথা বলিতেই পরম উৎসাহভরে সে তাহাতে অনুমোদন করিল। বলিল, "এখানে হয়ত অনেক দুঃখ পেয়ে গেলে, বন্ধু, বাড়ীতে গিয়ে সুখের দিনে একটু আধটু মনে করো।"

বিমলার নয়নে উজ্জ্বল আলোকদীপ্তি।

ম্লান হাসিয়া অরুণ বলিল, "তোমরা সুখী লোক, কাজেই পৃথিবীর সব কিছুই তোমাদের কাছে আনন্দে ভরা। আশা করবার যাদের কিছু নেই, তাদের দুঃখ তোমরা বুঝবে না।"

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বিমলা বলিল, "তোমার কবিমনের নাগাল পাওয়া আমাদের সাধ্যের অতীত। তবু, বন্ধুর কথাটা বাড়ীতে গিয়ে একবার স্মরণ করো।"

হাসিতে হাসিতে সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

বহির্ব্বাটীতে পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ বন্দনা করিয়া অরুণকুমার অন্দরে প্রবেশ করিল। জ্যেষ্ঠ বিনয়কুমার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার কনিষ্ঠের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাল ছিলে ত?"

মাথা নাড়িয়া দ্রুত অরুণকুমার ভিতরে চলিয়া গেল।

"মা"!

অরুণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই মাতা তাড়াতাড়ি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পদধূলি গ্রহণ করিয়া মাথা তুলিতেই সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল।

চঞ্চল হস্তে ঐ যে তরুণী মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল, তাহার মূর্ত্তি যে কখনই ভুলিবার নহে। এখানে সে আসিল কেমন করিয়া?

সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? জাগিয়া স্বপ্ন দেখা ত বিজ্ঞানের কোথাও লেখে না। তবে কি তাহার অন্তরের মূর্ত্তি রূপ ধরিয়া এখানেও তাহাকে ছলনা করিতেছে?

পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জননীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুহাসির রেখা উদ্ভাসিত হইল কি?

অকস্মাৎ জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে অরুণের চমক ভাঙ্গিল।

কম্পিতকণ্ঠে অরুণ বলিল, "মা!—"

বক্তব্য শেষ হইল না। মাতা বলিলেন, "তুই এখানে বস, আমি আসছি।"

সঙ্কোচনম্রা, ব্রীড়া-বিকলিতা তরুণীকে অরুণকুমারের কাছে ধরিয়া আনিয়া ভ্রাতৃজায়া সহসা তাহার অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া বলিলেন, "একে চিন্‌তে পার, ঠাকুর-পো? ছোট বউ, তোর দেবতার পায় গড় ক'রে নে এইবার।"

উচ্ছ্বসিত হাস্যতরঙ্গ কক্ষমধ্যে অনুরণিত হইতে লাগিল।

সত্য?—মিথ্যা নহে? যাহাকে কয়মাস পূর্ব্বে পরকীয়া ভাবিয়া সে তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়াছিল সে তাহারই সহধর্ম্মিণী, বিবাহিতা পত্নী? কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল?

তাহার সমস্ত শরীর দিয়া তড়িৎ নির্গত হইতে লাগিল। চরণে লুণ্ঠিতা তরুণীকে কম্পিত বাহুর সাহায্যে যখন তুলিয়া ধরিল, কক্ষ তখন জনশূন্য।

পত্নীর আরক্ত আননে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া অরুণকুমার মনে মনে জগন্নাথের চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, তুমি আছ, ভগবান, সত্যই তুমি আছ।

স্পন্দিত তনুলতাকে বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনে টানিয়া লইয়া অরুণ বলিল, "তুমি আমায় চিন্‌তে পেরেছিলে, আশা?"

সলজ্জ হাস্যে আশা বলিল, "কোন্ দিনের কথা বলছ? বালীগঞ্জে তোমার বাসার সম্মুখে ফুটপাথে?"

সবিস্ময়ে অরুণ বলিল, "সেদিনও তুমি আমাকে দেখে-ছিলে না কি?"

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আরক্তমুখে আশা বলিল, "তোমাকে দেখ্‌বার জন্যেইত সে-দিন তোমার বাসার সামনে গাড়ী বদল করা।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া অরুণ বলিল, "তাহলে আগা-গোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই চক্রান্ত?"—বলিয়া বাহু বন্ধনটা আর একটু দৃঢ় করিয়া দিল।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়



ছোটনাগপুরের 'বন্যমৃগ' *

শ্রীরামেন্দু দত্ত

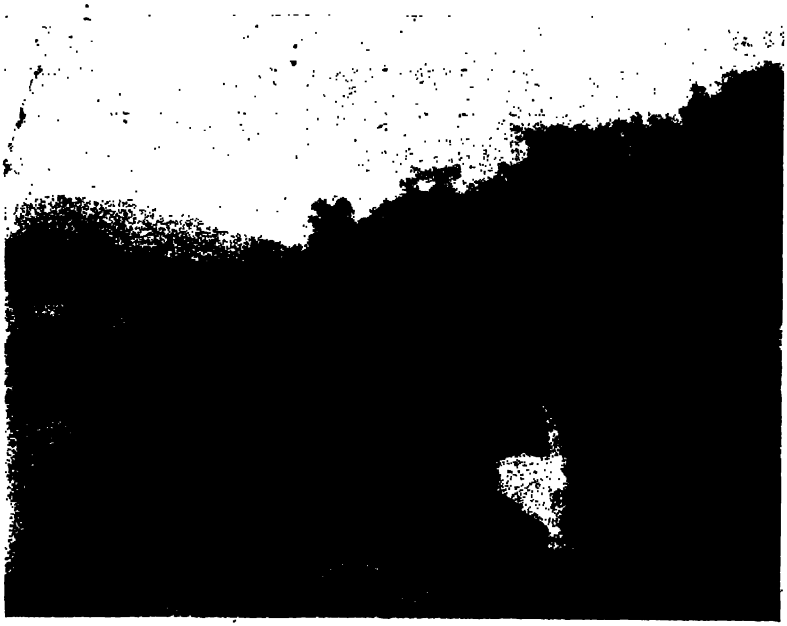
প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া যেন ভাবিবেন না যে, আমি পশুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াছি। বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্গত, গহন বনকান্তার, সহস্র গিরিদরী, কলহাস্যময় অসংখ্য জলপ্রপাত, স্বাস্থ্যসঙ্গীতবাহী সমীরণ-সেবিত এই চির-চমৎকার প্রদেশ **ছোট নাগপুর!** করবী, শান্তিলতা, পুঁটুশ, নাম-না-জানা পথপ্রান্তবর্ত্তী শত শত বনফুল, আজও আমার মন ভরিয়া আছে। এই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের, অপূর্ব্ব স্বাস্থ্যের, পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক শোভার আবাসভূমির অধিবাসী ও এই প্রদেশের বর্ণ-বৈচিত্র্যের সহিত অভিন্ন একদল প্রাচীন ঔপনিবেশিকদের



মুণ্ডাদের নট ও নটী

এখানে আমার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছে, কৈশোরের মঞ্জুল স্বপ্নাঞ্জন ইহারই অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্যের মহিমানু-রঞ্জিত ;—এই ছোট নাগপুরের উচ্চাবচ কঙ্করবহুল বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ইহার মহুয়া-শাল-পিয়ালের মধু-মঞ্জরী-সৌরভ, ইহার পাথর-ছড়ানো নদীকূল, বর্ষাজলের খরধারায় ক্ষতবিক্ষত রক্তবর্ণ মাটি, ইহার নীলাকাশ, বন্যবিহঙ্গ-কাকলী, গুঞ্জা, কথাই আজ বলিব। ছোটনাগপুরের নাগ-শার্দ্দূল-সেবিত গহন বনভূমির মধ্যে, প্রকৃতিদেবীর নিবিড় অন্তরালের অঞ্চলাবেষ্টনীর মধ্যে ইহারা প্রকৃতির দুলাল, বনের শোভা, বন্য-মৃগের মতই এক সময় বিচরণ করিত। ইহাদের গতিভঙ্গীতে সৌন্দর্য্য ছিল, স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা ছিল ; ইহারা ভদ্রতর কাহাকে বলে জানিত না ; আমাদের,

* লেখকের বিনা অনুমতিতে এই প্রবন্ধের অন্তর্গত চিত্রগুলির পুনর্মুদ্রণ নিষিদ্ধ।



শৈলারণ্যশায়ী জলপ্রপাত

এই 'সম্বর' নামটি অধুনা-প্রচলিত ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদের 'সাম্বর' নামের সংস্কৃত রূপ বলিয়াই মনে হয়। হস্তহীন 'কুণারু', যাহাকে ইন্দ্র ধ্বংস করেন,† তিনি যেন আমাদের সময়কার কুরার মুণ্ডারই কেহ হইবেন। রাঁচি জেলার মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত "অশিব" নামটি ঋগ্বেদে উল্লিখিত দস্যু "অহিশুভ" (ক) নামকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়।(খ)

তথা নাগরিকদের সভ্যতার ধার ধারিত না; সম্পূর্ণরূপে তথাকথিত সভ্যতার স্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহারা নিজেদের এক চমৎকার সমাজ, জীবনতন্ত্র, শাসনতন্ত্র, ভূম্যধিকার-প্রণালী গঠিত করিয়াছিল। ইহারা ইতিহাসে "মুণ্ডা" নামে খ্যাত।

ঋগ্বেদে রাজা সুদাসের সহিত বিভিন্ন অনার্য্য জাতির এক ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহার সহিত প্রাচীন মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত এক যুদ্ধের পুরাকাহিনীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের এই যুদ্ধ-বৃত্তান্তে যে কয়জন দস্যু-দলপতির নামের উল্লেখ আছে তাহাদের অধিকাংশের সহিত বর্ত্তমান মুণ্ডাদের নামকরণের ঐক্য আছে। অতিথিগ্ব নামক এক কৌরব বীরের সাহায্যার্থ দেবরাজ ইন্দ্র একশত নগরের অধীশ্বর দাস 'সম্বর'-কে একটি সু-উচ্চ পর্ব্বতচূড়া হইতে মাটিতে নিক্ষেপ করেন।*



মুণ্ডাদের তৈল-নিষ্কাসন যন্ত্র

* ঋগ্বেদ, ১ম খণ্ড, ৫১ পৃঃ, ৬ সূক্ত; ২য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ, ২ সূক্ত; ৪র্থ খণ্ড, ১৩০ পৃ, ১৩ সূক্ত ইত্যাদি। † ঋগ্বেদ, ৩য় খণ্ড

(ক) ঋগ্বেদ VIII, ৩২, ২৬, VIII ৩২, ২ ও ২৬; VIII ৬৬, ২। (খ) কয়জু, পর্ণয়া,—কার.জুন্না, কালাও, পার্ণা।

ভঙ্গ্দ—বঙ্গ।

দস্যু 'দাসু'—দানা, দাসু, দাণ্ডু।

ওঝা—ওঝা।

ভাষাতত্ত্ব অনুসারে ইহা আমাদের অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, মুণ্ডারা আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বে পঞ্চনদের চির-আতিথ্য-প্রসারী উর্ব্বর ভূমির অধিকারী ছিল। ইতিহাসে যাহারা 'কোলেরিয়ান' নামে খ্যাত, মুণ্ডারা তাহাদেরই একটি শাখা। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সকলে বর্ত্তমান রোহিলখণ্ড এবং অযোধ্যা হইয়া বিহার, ও সেখান হইতে অবশেষে ছোটনাগপুরের স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যময় অন্তরালের আশ্রয়ে বিশ্রাম লাভ করে। সমস্ত ভ্রাম্যমাণ জাতির মত ইহাদেরও পথের কষ্ট, বিপদ-আপদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অনাহার-উপবাস, যথেষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।



মুণ্ডা উপনিবেশের সৌন্দর্য্যভূমির একটি অংশ

প্রথমে একত্র বাস করিত, পরে তাহারা পৃথক হইয়া পড়ে। একটি বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত অনুসারে ইহারা সকলে পঞ্জাব প্রদেশ হইতে ক্রমে দক্ষিণদিকে বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারত অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে; পরে রাজপুতানার পূর্ব্ব অংশ দিয়া আবার উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং তথা হইতে ছোটনাগপুরে চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে মুণ্ডারা ইহাদের সহচর কোল, সাঁওতাল, ওরাঁও, হো প্রভৃতি অন্যান্য 'কোলেরিয়ান' গোষ্ঠী হইতে চিরকালের মত পৃথক হইয়া পড়ে। মুণ্ডাদের সহিত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতির ভাষাগত ও আকৃতিগত অনেক ঐক্য দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ভ্রম সংশোধন—বিচিত্রার বর্ত্তমান সংখ্যায় ৬৪ পৃষ্ঠার পর হইতে ১১৩ পৃষ্ঠার পূর্ব পর্য্যন্ত ৪৮টি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাপিতে ভুল হইয়াছে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত পৃষ্ঠাগুলির সংখ্যা যথাক্রমে ৬৫ হইতে ১১২ করিয়া লইবেন।

মন-উদাসী

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

১

"নৈশ অন্ধকারের মাঝে দূর প্রান্তরের নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গতার মাঝ থেকে কোন্ একলা পথিকের কণ্ঠ থেকে ভাটিয়ালের সুরে ভেসে এল

'আমার মন উদাসী হ'তে চায়,
তার ডাক নাহি, হাঁক নাহি গো,
সে যে আপনি আপনি চলে যায়।'

অশ্রুময় বেদনাকরুণ ভাটিয়ালের সুর আমার ঘরের বাতাসকে বেদনাময় ক'রে তুলল, একনিমেষে এই জগতের কত না প্রয়োজনের দাবী দাওয়া কোথায় মিলিয়ে গেল, আমি যে মর্ত্যলোকের অধিবাসী সেই কথা বিস্মৃত হ'য়ে গেলাম। মনে হ'ল অনন্ত আকাশব্যাপ্ত বিশাল নিস্তব্ধতাকে পরিপূর্ণ ক'রে আছে ওই উদাসী ব্যথা। কোন্ সেই পরম প্রার্থিত যার সন্ধানে উদাসীর চিত্ত গৃহহারা হয়ে চলেচে অনন্তকাল ধ'রে ওই অনন্ত আকাশের লোক লোকান্তর বেয়ে। সংসারের সহস্র কামনা-বাসনার কোলাহলের অন্তরালে কোন পরমতৃষা মানবচিত্তের গুহায় সুপ্ত হয়ে থাকে? কখনো কখনো প্রান্তরের অন্ধকার থেকে কোন্ উদাসী কণ্ঠের আবেদন এসে আমাদের অন্তরের সেই তৃষিত মানুষটিকে জাগিয়ে দিয়ে কাঁদিয়ে তোলে?"

বহুকাল আগেকার পুরানো ডায়ারীর পাতায় আমার বন্ধু এই কটি কথা লিখেছিল। আজ পড়তে পড়তে ওই কটি কথা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেচে আমার কাছে। কথাগুলো আরো কতবারই পড়েচি, কিন্তু এমন যে তার অর্থ, তার অন্তরে যে এতখানি ব্যথার সম্পদ তা ভাবিনি।

২

সব কথাই বোধ হয় এমনি ধারা অর্থবান হবার জন্য এক একটি মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় থাকে। আকাশের মাঝ দিয়ে কত সুরের ধারাই তো বয়ে চলেচে, সব সুর এক সময়ে ধরা চলে না। বেতার যন্ত্রের এক একটি অবস্থায় এক একটি সুর এসে তাতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আমার বাদ্যযন্ত্রটাকে আমি একটি বিশেষ সুরে বেঁধে রেখেচি। হাজারো রকমের সুর বাজিয়ে গেলেও আমার যন্ত্র নীরব থাকে, কিন্তু একটি সুর অকস্মাৎ আমার যন্ত্রে ঝঙ্কার তোলে। কথাও তেমনি; কত কথাই নিত্য শুনি, পড়ি, বলি-ও; কিন্তু ওসবই আমার মনের ওপর দিয়ে ভেসে চ'লে যায়, অন্তরে ঝঙ্কার তোলে না, অনুভূতির স্পন্দনে কথা বাণী হয়ে ওঠে না।

আমাদের প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক, জীবনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মিলে অন্তরকে একটি বিশেষ সুরের উপযোগী ক'রে তোলে, যদি তখন কোথাও থেকে সেই সুর আসে সমস্ত চিত্ত তাতে স্পন্দিত ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, তখন যে কথাটি বলি সেই কথাটি যেন দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। সত্যকার কবির সৃষ্টিতে আর অনুকরণে তাই তো এত তফাৎ। ভাড়াটে উপদেষ্টা আর সত্যকার ঋষি মহাপুরুষে তাই তো এত প্রভেদ।

কথাটা বড় নয়; কথা যে-সুর নিয়ে আসে, তার যে একটা অদৃশ্য বর্ণ আছে তাই চিত্তকে আকৃষ্ট করে মুগ্ধ করে। কথার যেটা ব্যবহারিক অর্থ সেটা তার একটা স্থূল অংশ মাত্র; কথার আসল অর্থ তার সুরে আর সেই সুর ধরা পড়ে চিত্তের এক একটি বিশেষ অবস্থায়।

'পণ্ডিত'দের প্রধান ভুলই হচ্চে এইখানে যে, তাঁরা সব অবস্থায়ই সব কথা বলতে প্রস্তুত। তাঁরা কথার বহিরঙ্গ-টাকে ধ'রে মনে করেন বুঝি সবটা কথাই তাঁদের আয়ত্ত। বাস্তবিক তা হ'তে পারে না। তাই কবিকে ফরমায়েস দিয়ে কবিতা লেখানো চলে না, পয়ার চলতে পারে। যাক্ সে কথা।

৩

বলছিলাম বন্ধুর ডায়ারীর কথাগুলোর কথা। ওই কথাগুলো আজ কি কারণে জানি না আমার চিত্তকে আবিষ্ট করে তুলচে।

সম্প্রতি সহরের ব্যস্ততা ছেড়ে প্রকৃতির নিস্তব্ধ লীলাক্ষেত্র পাহাড়ের দেশে গিয়েছিলাম। ঢেউ খেলানো পাহাড়ের দেশে গিয়ে রাত্রিবেলা অকস্মাৎ আকাশ ব'লে যে একটা অপার রহস্যলোক রয়েচে তাকে আবিষ্কার করলাম। আশ্চর্য্য লাগতে লাগল ওই রহস্যলোকের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে; কিন্তু আরো আশ্চর্য্য লাগতে লাগল আমার এই ভেবে যে, কেমন ক'রে ওই আকাশকে আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম। নগরের পথে ঘাটে দিবারাত্রি চলাফেরা করেচি, কই কখনো ওই মাথার ওপরকার অনন্ত বিস্ময় তো চোখেও পড়ে নি'! এমনি ধারাই হয়ে থাকে! চোখ খোলা থাকলে কি হবে, মনের বাতায়নটি যে ওদিকে বন্ধ ছিল; কিম্বা মনের বাতায়নে যে-জন দেখে সে যে আরেক বাতায়নে বসে ছিল, আমার কাছে তাই এই আকাশটা এতকাল মিথ্যা হয়ে ছিল। ওই ভাটিয়াল সুর আজ তেমনি ধারা আমার চিত্তের যে-বাতায়নটি অসীমের দিকে খোলা যে বাতায়নটি আমার কাছে অস্তিত্বহীন হয়ে ছিল, তাকে আমার দিকে উন্মুক্ত ক'রে দিলে। এতকাল ধ'রে সদর দরজা দিয়ে সংসারের রাজপথের ব্যস্ত চলাচলের দিকে চেয়ে ছিলাম, মন সেই সঙ্গে কেবলি ছুটছিল। আজ অকস্মাৎ কেমন ক'রে ওই বাতায়ন দিয়ে দৃষ্টি আমার পড়ল সেই অসীম লোকের পানে যে-দিকে চেয়ে চেয়ে সমস্ত জীবন আমার আজ একটি সকরুণ দীর্ঘনিশ্বাসের মত নক্ষত্র লোকের দিকে মিলিয়ে যেতে চায়।

সারা জীবন ধ'রে জল্পনা-কল্পনা কতই না চলেচে! জীবনের কত আদর্শ রচনা করেচি, নিজকে এবং পরকে তার কথা ব'লে লুব্ধ করেচি! সামাজিক রাষ্ট্রীক পারিবারিক কত রকমের আদর্শ নির্দ্দেশ কত রকমের পথের পরিকল্পনা মনকে মাতিয়ে রেখেচে! আজ ওই অন্ধকারের বুক থেকে ভেসে আসা ভাটিয়ালের উদাসী হাওয়া এসে আমার জানা জগৎকে একেবারে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল! আজ তাদের আমি কোথাও খুঁজেই পাচ্চি না। মনে হচ্চে ওই অনন্ত আকাশ আছে আর আছি একমাত্র আমি; পায়ের নীচে থেকে ধরণী যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেছে। ওই যে আকাশের বুকে তারাগুলো ওরা কারা? মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা বুঝি আমাদেরই মত অন্ধকার আকাশপথের যাত্রী, ক্ষুদ্র একটি মাত্র আলোক শিখা হাতে নিয়ে কোন অজানা বন্ধুর ডাকে চলেচে! কখনো কি ওই পথ-চলার নিবৃত্তি হবে?

৪

দেশ দেশান্তরের মানুষের ইতিহাস পড়ি আর দেখি সহস্র সহস্র মানুষ যখন এই ধরণীর বুকে ঘর বেঁধে চিরন্তন কালের জন্য এই রূপরসগন্ধকে ভোগ করবার জন্য ব্যস্ত, তখন তাদেরি মাঝে দুটি একটি মানুষ এই ধরণীর দিকে উদাস উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে না জানি কিসের সন্ধানে বেরিয়ে চ'লে গেছে। আজ মনে হ'ল প্রান্তরের অন্ধকার ভেদ ক'রে ওই ভাটিয়ালী সুরও যেন আমার চিত্তে সেই ঔদাস্য বুলিয়ে দিয়ে গেল। এক নিমেষে তাই মনে হ'ল মিথ্যা এই ধরণীর আশা আকাঙ্খা, এই সংসারের কামনা-বাসনা—সর্ব্বশেষে অন্তর ব'লে উঠচে এ দিয়ে আমি কি করব, এতে যে আমার অন্তরতম পিপাসা মেটে না!

ওই যে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষণিক তৃপ্তির আশায় প্রমত্ত হয়ে ওই মাটীর বুকে ছুটোছুটি করচে তারাই মরীচিকার পেছনে ছুটচে, না, স্বল্পসংখ্যক মানুষ ক'টি যারা এপার ছেড়ে ওপার পানে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেচে?

এপারের মানুষ যারা তাদের শুধাই, কিছু কি পেলে? এই ধরণী, এই জীবন, সব সুন্দর, রহস্যময়, মোহন মায়ায় এর সবই আমাকে মুগ্ধ করে, মানি। কিন্তু যখনি একে পরিপূর্ণ ক'রে গ্রহণ করতে চাই পেতে চাই, তখনি ছায়ার মত সব মিলিয়ে যায়। তাই এই ধরণীর বন্ধুদের শুধাই, বলতো একি শুধু আমারি অদৃষ্টের পরিহাস! তোমরা কি এই ধরণীর পাওয়া নিয়ে পরিতৃপ্ত হয়েচ?

এ কথার উত্তরে কেউ বললে না, হ্যাঁ। কারু মুখে নিশ্চিত পরিতৃপ্তির আভাস তো দেখতে পেলাম না!

একজন বললে, "এই ধরণীর, এই জীবনের অনিত্য দান সম্বন্ধে যেমন কোন ভ্রান্ত ধারণাও রাখিনে, তেমনি নিত্য-কিছুর মিথ্যা মায়াতেও মনকে প্রলুব্ধ করতে চাইনে। ক্ষণিক ব'লেই কি ফুলের গন্ধ কম মধুর, সূর্য্যাস্তের রঙের খেলা কম সুন্দর, মানুষের ভালবাসা কম কামনার! স্রষ্টার সৃষ্টি অন্য রকম হ'লে হয়ত ভালোই হ'ত; কিন্তু ও সমালোচনার মূল্য কি-ইবা আছে। এই সৃষ্টির এক কণাও তো আমার সৃষ্টি করবার সামর্থ্য নেই, সুতরাং যা আছে তাকেই স্বীকার না ক'রে বৃথা সমালোচনা ক'রে লাভ কি হবে; তাই ক্ষণিককে আমি ত্যাগ করবার পক্ষপাতী নই। ওই সুন্দর পাখীটি তো আমার শৃঙ্খলে নিত্যকাল বাঁধা থাকবে না, আমার বাতায়ন সম্মুখে ওকে তো নিত্য নিয়ত দেখতে পাব না সুতরাং ওর পানে তাকিয়ে মুগ্ধ হব না ব'লে চোখ বুজে থাকবার মত বোকামী বা বিজ্ঞতা আমার নেই। পথ চলতে চলতে যদি দুদণ্ডের জন্য কারু সঙ্গ আমায় আনন্দ দিয়ে থাকে তো চিরদিন ও হাতে হাত বাঁধা থাকবে না মনে ক'রে হাত গুটিয়ে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবার মত বৈরাগ্যকে আমি বাঞ্ছনীয় মনে করিনে। দুঃখ? হ্যাঁ, পাওয়ার যেমন আনন্দ আছে ছাড়ার এবং হারানোর তেমনি বেদনাও আছে। তাই আমি যেমন আনন্দকে চাই, দুঃখকেও ডরাইনে। জীবন যেমন আনন্দকে ভোগ করবার সামর্থ্য রাখে, তেমনি দুঃখকে বহন করবারও সাহস রাখে, জীবন মানেই তো সুখদুঃখের উত্থান-পতনের ঘাতপ্রতিঘাতের লীলা। আমি জীবনের সাহসী পথিক, কিছুতেই আমি পরাজয় মানব না, এই তো আমার পণ!"

৫

ওই কথাগুলো যে বলেছিল তার কথায় যত জোরই থাক, তার চোখে যে একটি নিরুপায় বেদনা দেখেছিলাম তা বিস্মৃত হ'তে পারি না। বিশেষ ক'রে যখন নীচের পত্রখানা পড়ি তখন সংসারে যাকে আমরা সুখসম্পদ্ বলি ওই পত্র-লেখক বন্ধুটির তার অসদ্ভাব ছিল না, তবু কোনো কিছুই তার চিত্তকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। তাই একদিন সে সব ছেড়ে পাহাড়ের নির্জ্জনতায় আশ্রয় নিয়েছিল। সে জ্বালাময় অতৃপ্তি এবং অস্বস্তি তার নিশীথনিদ্রা হরণ করেছিল, যে প্রচণ্ড বেদনা তার কাছে লোকসঙ্গকে বিষময় ক'রে তুলেছিল, পরিপূর্ণ পাওয়ার যে-কামনা তার প্রতিমুহূর্ত্তকে উৎকণ্ঠিত ক'রে রেখেছিল তার সন্ধান এ সংসারে আর কেউ জানে কি না জানি না, আমি তার একজন নীরব সাক্ষী ছিলাম। বহুদিন পর তার সংবাদ পেয়ে তার মানসিক অবস্থা জানতে চেয়েছিলাম—তারই উত্তরে সে এই পত্রখানা লিখেছিল।

"বহুকাল পূর্ব্বে তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে, এবং তখন আমাকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলে তাহাই তোমার মনে জাগিয়া আছে জানি। সেদিন আমার যে ব্যথা তুমি লক্ষ্য করিয়াছিলে, সেই ব্যথার যে সত্যই নিরতিশয় অবসান ঘটিয়াছে তাহা তোমার পক্ষে বিশ্বাস করাও কঠিন হইবে মনে হয়। কিন্তু তথাপি বিশ্বাস করিও যে, আমি আজ পরিপূর্ণ শান্তির অধিকারী হইয়াছি। যাহার সন্ধান করিতেছিলাম, অথচ যাহার কোনই উপায় আমার জানা ছিল না তাহার সন্ধান এতকাল পরে আমি পাইয়াছি। মনে করিও না যে, ইহা শুধু ক্ষণিকের মানসিক বিভ্রম মাত্র। মানসিক বিকারের অনেক ঊর্দ্ধে যে সত্য এবং শান্তি বিরাজমান তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ ঘটিলে সকল সংশয় সত্যই ছিন্ন হইয়া যায়। তোমাকে আমি দেখিতেছি। এখনো সংসারের ছলনা তোমার নিকট সত্য বলিয়াই মনে হয়। একদিন দুঃখের আঘাত যখন তোমাকে সংসার হইতে বিমুখ করিবে তখন হয়ত এ পথের সন্ধান দিতে তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারি।.........."

ও কথাগুলো শুধু একজনেরই কথা হ'লে হয়ত উড়িয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু ওপথে যারা যাত্রা করেচে তাদের সংখ্যা কম হ'লেও তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে তাও তো নয়। কত সাধক উদাসী সংসারের পথ ছেড়ে ওপথ ধ'রে এগিয়ে গেছে তারই মাঝে কতজন ফিরে এসে একথাও তো বলেচে যে, ওপারটা মায়া নয়, বেদনাতুরের স্বপ্ন সৃষ্টি

নয়। তারা বলেচে মানুষের অন্তরের আরেকটি 'আমি'র কথা যে-আমি মুক্ত দীপ্ত, যাকে সুখদুঃখের বন্ধন জর্জ্জরিত করতে পারে না। ওই আমিটীর পানে চেয়েই তো কবি ব'লেচেন,—

এই যে আমি ঐ আমি নই,
আপন মাঝে আপনি যে রই,
যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে—
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি,
শান্ত আমি, দীপ্ত আমি,
ওরি পানে দেখচি আমি চেয়ে।
(প্রবাহিনী)

৬

আমি কিন্তু শান্তও নই, দীপ্তও নই, তৃপ্ত তো নইই। আজ অনন্ত আকাশের কোল থেকে যেন ওই সুর এসে আমায় ক'রে তুলেচে উদাসী। দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে যাদের ক্রমাগত মূল্য দিয়ে এসেচি, তারা আমার দৃষ্টিতে হয়ে উঠেচে মূল্যহীন। আজ কেবলি জীবনের এই পসরা মেলে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আমার অন্তর বলচে এ নিয়ে আমি কি করব, কি করব!

আজ নিজের বোঝাই যেন ভয়াবহ হয়ে উঠেচে। জানি না, চিনি না, তবু এ কোন্ দেবতা যাকে না হ'লে আজ আর চলে না? যে-আপনার নানা দাবী দাওয়া মেটাবার চেষ্টায় এই জীবন সমাপ্ত হ'তে চলেচে, আজ সেই আপনাকেই নিঃশেষে কোথায় নিবেদন ক'রে দিতে চাই!

আজ ওই অন্ধকার, ওই ভাটিয়াল গান অনন্তের কোন্ বাতায়ন উন্মুক্ত ক'রে দিলে! কার সকরুণ মিনতির আহ্বান মরলোকের মানুষকে ব্যাকুল ক'রে তুলেচে। এ পারের মানুষকে ও-পারের কোন্ মানুষ এমন ক'রে ডাকে! মাঝে বিপুল অন্ধকারের খরস্রোতা ব'য়ে চলেচে আর তারই ওপর দিয়ে আজ উদাসীর দৃষ্টি ওপারের দিকে চলেচে—কখনো মনে হয় যেন কার দুটি করুণ চোখে চোখ পড়চে আবার মনে হয় যেন সবই চোখের ধাঁধা মাত্র। বহুকাল পূর্ব্বে আমার বন্ধুকেও এমনি ক'রে সেই অজানা ডাক দিয়েছিল, এমনি ক'রে কি কোনো কোন মুহূর্ত্তে সব মানুষেরই বুকে সেই অনির্দ্দিষ্টের আহ্বান এসে বাজে?

এ ডাক কিসের? কোথায় সে যেতে চায়? উদাসী অন্তর আজ কোন্ সার্থকতার নৈরাশ্যে কেঁদে ওঠে! গৃহ-হারা মানবাত্মা উদাসী হয়ে চলে কোথায়?

শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র রায়

পুস্তক-পরিচয়

মায়া-কাজল

বাংলা সাহিত্যের রসগ্রাহীদের কাছে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় সুপরিচিত। তাঁর সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটি পড়ে নতুন করে তাঁর কবি-প্রতিষ্ঠার পরিচয় পেলুম।

পাঁচমিশেলী কবিতার বই সম্বন্ধে সাধারণভাবে কোনোও অভিমত ব্যক্ত করার বিপদ কম নয়। বিভিন্ন সময়ে ও বিবিধ অবস্থানের মধ্যে রচিত কতকগুলি কবিতার ভেতর থেকে কয়েকটী মূল সূত্র সঙ্কলন করা অসম্ভব না হতে পারে; কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে সমালোচকের প্রতিপাদ্যগুলি যে সব সময়ে অখণ্ডিত থাকবে, একথা নিশ্চয় করে বলা চলে না। অথচ সব ক'টি কবিতার ভেতর দিয়েই রসানুভূতির যে সংহতিসূত্রটি অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত আত্ম-গোপন করে থাকে, সেটাকে অস্বীকার করলে কাব্য বিচারের কোনও অর্থ হয় না। কবি হেমেন্দ্রলালের কবিতাগুলোর ভেতরেও যে এই ধরণের একটা ঐক্য সূত্র আছে, চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে সেটা আবিষ্কার করা শক্ত হবে না। বলাবাহুল্য এই ঐক্যটি বিষয়গত বা ভাব-গত

"মায়া-কাজল"—পাঁচমিশেলী কবিতার বই। প্রকাশক—শ্রীবারিদকান্তি বসু, আর্য্য সাহিত্য-ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নয়। তার স্বরূপটি কবি নিজেই ইঙ্গিতে জ্ঞাপন করেছেন—

ছোট নাওখানি ভাসায়ে দিয়েছি
নীল-সাগরের জলে,
ঘুরে' ঘুরে' সে যে মনের খেয়ালে
মাণিক কুড়ায়ে চলে।
* * * *
হাতছানি দিয়ে ডাকে সাগরিকা—
সাগর তলের বালা,
গলায় যাহার জড়ানো রয়েছে
নীল মুকুতার মালা
যার কেশ-পাশ সুরভিয়া চলে
নীল আকাশের বাও,
তারি ঈশারায় আমি ভাসায়েছি
অকূলে আমার নাও!
* * * *

রূপ-সাগরের ওপর দিয়ে অরূপের উদ্দেশ্যে খেয়ালী অভিযান—এইটেই কবি হেমেন্দ্রলালের কাব্য-সৃষ্টির মর্ম্মকথা বলে আমার বিশ্বাস। তাই স্বর্গের উর্ব্বশী ও মর্ত্ত্যের জীপ্‌সী থেকে সুরু করে নদনদী, ঘাট মাঠ, ফুল ফল, মেঘ-বিদ্যুৎ, মাস-ঋতু—সমস্তই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু জুগিয়েছে!

কবি হেমেন্দ্রলালের কল্পনায় গতি আছে। সনেট-গুলোকে বাদ দিলেও একাধিক কবিতায় তার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু তাঁর কল্পনায় দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রসারতা অথবা শিখরচুম্বী উত্তুঙ্গতা নেই। মানসতুলিতে মায়ালোকের আভাস দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন।

দুই একটি ছত্রে কল্পনার বিপুল লীলার শিহরণ দেখ্‌তে পাই বটে, কিন্তু শুধু দু' একটি ছত্রেই—

কে জানে কি বল আছে চোখের মায়ায়!—
তারায় তারায় দোলে আলোর কাঁপন।
তরঙ্গিত নীল সিন্ধু অন্তরে ফেনায়
নীল চোখে জাগে তারি ছন্দেরি স্বপন!
* * *

কিন্তু অধিকাংশস্থলেই তাঁর কল্পনা ধরা-ছোঁয়ার সীমা-নাকে অতিক্রম ক'রে, স্বর্গমর্ত্ত্যের সন্ধিস্থলে কাব্যের কৈলাস-শিখরে আমাদের রসবোধকে বহন করে নিয়ে যেতে যেন অপারগ। কোনোও বিশেষ ধরণের inhibition কবির কল্পনাকে পঙ্গু করে রেখেছে কিনা সেকথা এখানে আলোচনা করা সম্ভব হবে না। তবে দু' একটি কবিতায়—যেমন "শিশু" ও "উর্ব্বশীর অভিশাপে"—নীতিবাগীশতার যে আভাসটুকু পেয়েছি, সেটা যে কল্পনার বিকাশের পক্ষে মারাত্মক, সে কথা প্রসঙ্গক্রমে এখানে না বল্‌লে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকৃত।

কবি হেমেন্দ্রলালের ভাষায় রূপ আছে। এ যুগের অনেক আধুনিক কবির মত তাঁর ভাষা শুধু শব্দ-ও ভাবা-ত্মক নয়। সেইজন্যেই বোধ হয় এই কাব্যগ্রন্থটির বিষয়বস্তু মামুলী ধরণের হলেও গ্রন্থখানি মোটের ওপর এত সুখপাঠ্য। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। দীপালীর বর্ণনা ক'রে কবি বল্‌ছেন—

আকাশের হাসি মর্ত্ত্যে নেমেছে—ফুটেছে তারার ফুল,
রাতের আঁধার দিন হয়ে গেল বিস্ময়ে বিলকুল!
বাতাসের মাঝে ধূলোর ধোঁয়ায়,
লাল আবিরের আমেজ ঘনায়,
দেয়ালীর রাত খেয়ালী মনের দেয়ালাতে মশ্‌গুল।
* * * *

অধিকাংশ কবিতাই, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। স্বরবৃত্ত ছন্দের নমুনা 'জীপ্‌সী' 'সাকাই' 'মাসপহেলা' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতাতে দেখ্‌লুম। এই ছন্দে কাব্যের গতিবেগ দমকা বাতাসের মত, কী অসম্ভবভাবে বেড়ে যেতে পারে জীপসী কবিতাটি তার প্রমাণ। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এই একান্তভাবে নিজস্ব সম্পদটির ওপর আমার বরাবর একটা পক্ষপাত আছে। কবি হেমেন্দ্রলালের হাতে এই ছন্দের প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হলুম। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিপদ এই যে, সংযমের সঙ্গে ব্যবহার না করলে, এই ছন্দে বাঁধন রাখা বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। অনেক আধুনিক কবিতার অহেতুক ভাষা-বিলাসে তার নমুনা দেখ্‌তে পাই। কবি হেমেন্দ্রলালের ভাষা সরস ও কমনীয়, কিন্তু তাই বলে প্রিয়-বাহু-পাশবদ্ধা প্রেয়সীর মত শিথিল-বিবশ নয়। কবিতাগুলো পড়্‌তে পড়্‌তে কখনও ভাষার অনাবশ্যক আড়ম্বরের মধ্যে ভাব ও রূপ-মূর্ত্তির খেই হারাতে হয় না।

কবি হেমেন্দ্রলালের কাব্য-গ্রন্থটি যে মোটের ওপর সব দিক দিয়ে উপভোগ্য হয়েছে, এ কথাটা অস্বীকার করলে অসত্য-ভাষণ হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা কথা বলে রাখ্‌তে চাই। আজকালকার অনেক কবিতার মত, তাঁর কাব্যও রসসৃষ্টি হিসেবে উপাদেয়; শুধু, তাতে অমৃতের আস্বাদ নেই। এ জন্যে কবির বিরুদ্ধে বিশেষ করে কোনোও অভিযোগ কর্‌ছি নে। কারণ আমার সত্যবিশ্বাস কিছুদিন থেকে আমাদের কাব্য-সাহিত্যে ঘুণ ধরেছে।

আপ্তবাক্যে আমার আস্থা নেই; তাই আমার মন্তব্যটির স্বপক্ষে দু' একটি কথা খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও বল্‌তে হচ্ছে। আমাদের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক একান্তভাবে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আগে কাব্য-সাহিত্যের যে রূপটি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য-সৃষ্টির ভেতর দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছিল, তার সঙ্গে আমাদের বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের গোত্রসাদৃশ্য খুব সামান্যই। এঁদের পরে কী কী অবস্থানের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল সে কথা বলা সহজ হবে না। এ যুগের কাব্যসাহিত্যের Christ যে রবীন্দ্রনাথ সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, কিন্তু John the Baptist কে সে প্রশ্নের কোনোও একটা সঠিক উত্তর সাহিত্যের ইতিহাসে মিল্‌বে না!

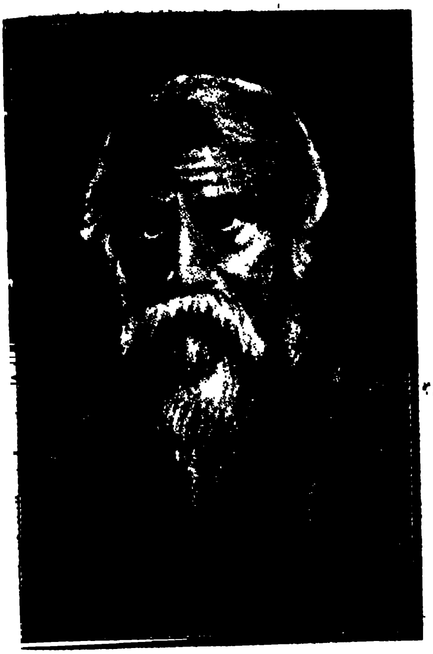
রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভা বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে যে, পরবর্ত্তী কাব্য-সাহিত্যের ওপর তাঁর প্রভাব বিচার করবার সময় এই বিষয়ের একটা দিক সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। রবীন্দ্র-প্রতিভার আওতায় পড়ে সমসাময়িক একাধিক কবির সৃজনীশক্তি যে পরিম্লান হয়ে পড়েছিল, দেবেন সেন ও অক্ষয় বড়ালের কাব্যজীবন তার সাক্ষ্য দেয়। অনুকূল অবস্থানের মধ্যে পড়্‌লে এঁদের কাব্য-সৃষ্টি যে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের বিকাশ-ধারার ওপর সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যেত সে কথা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি। পরবর্ত্তী যুগে সত্যেন্দ্রনাথ-প্রমুখ রবীন্দ্র-শিষ্যেরা তাঁর প্রতিভার তীব্র দাহ সহ্য করেও উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টি কর্‌তে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু এই যুগে রবীন্দ্র-সাহিত্যের দ্রুতবিস্তার ও বর্দ্ধিষ্ণু জনপ্রিয়তা তাঁদের কাব্য-সৃষ্টিকে পঙ্গু করে রেখেছিল। তাঁদের প্রতিভার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে একটা গুরুভারের মত চেপে বসেছিল, সে কথা সে যুগের একাধিক কবির মুখে শুনেছি। সেইজন্যেই বোধ করি সে যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথের সর্ব্ব-গ্রাসী প্রভাব এড়াবার জন্যে কাব্য-সাহিত্যের এক একটা বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের শক্তিকে সংহত করে রাখ্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান, মোহিতলাল প্রভৃতি সে যুগের সমস্ত কবিরই প্রায় এক একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র ছিল। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলা কাব্য-সাহিত্য শিল্প-কৌশলের দিক দিয়ে এতটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠ্‌ল যে, পরবর্ত্তী যুগের কবিদের এদিকে আর বিশেষ কিছু করবার রইল না। রবীন্দ্র-প্রতিভার আওতা কিন্তু তখনও কাটে নি। তাই দেখ্‌তে পাই, এই শতাব্দীর তৃতীয়দশকের প্রারম্ভেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের আত্মা শুধু দেহ বদ্‌লিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে আসর জমাচ্ছে। কিন্তু দেহরূপটিও ক্রমশঃ গতানুগতিক হয়ে পড়্‌ছিল। এই সময়ে নজরুল ইস্‌লাম প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ কবি কবিতায় নাটকীয় উন্মাদনা ও সঙ্গীতের সুর আমদানী ক'রে বাংলা কাব্যকে নতুন গৌরব দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে যুগেরও যেন অবসান হয়েছে। বাংলার কাব্যসাহিত্য তাই কিছু দিন থেকে রুদ্ধগতি পল্বলের মত স্পন্দহীন। অবিশ্যি, আমাদের অত্যা-ধুনিক কাব্যসাহিত্যে সম্প্রতি কয়েকটি নতুন সুরের আভাস পাচ্ছি বটে; কিন্তু সেগুলো শুধু বর্ত্তমান বাংলা কাব্যের গতিমান্দ্যের প্রতিক্রিয়া সূচনা করছে, না নবযুগের উষা-রম্ভের বার্ত্তা নিয়ে আস্‌ছে, সে কথা এখনও নিশ্চয় করে বলার সময় হয়নি। সমসাময়িক বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে এখনও decadent বল্‌তে হবে।

সুতরাং হেমেন্দ্রলালের কবিতায় অমৃতের আস্বাদ নেই বলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনোও রকম বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ কর্‌তে আমি রাজী নই। যুগাতীত নয় বলে কারুর বিরুদ্ধে অনুযোগ করা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের সাজ্‌তে পারে, কিন্তু কাব্য-সমালোচকের সাজে না।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার

[illegible]

অনাদি-কালের বার্তা



পাঠায় বহিয়া অনাদি-কালের বার্তা
যুগে যুগে চলে অনাদি জ্যোতির যাত্রা,
কালের বাধা ভেদি;
অব্যক্তের কুজ্ঝটিজাল ছেদি;
পথে পথে রাখি আলিম্পনের লেখা।
আঁধার রাতের সঘনে গহনে
উজ্জ্বলি উঠি দিক্-প্রাঙ্গণে
বহ্নিচক্ররেখা।

অন্তরীক্ষ গহনতম ছিল মূক বাণীহীন
অবশেষে একদিন
যুগান্তরের প্রদোষ-আঁধারে
শূন্য পাথারে
মানবাত্মার প্রকাশ উঠিল ফুটি;
মহাদুঃখের মহাদ্বন্দ্বের
সংঘাত লাগি চিত্তগুহার
চিরপাষাণের আবরণ গেল টুটি।
মানবেরে দিল দেখা
অসীমের পানে মেলিয়া নয়ন
দাঁড়ায়ে রয়েছে একা।
প্রথম পরম বাণী,
দীনহাতে দীপখানি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'লিবার্টির' সৌজন্যে

আলোচনা

রাত্রির তিমির নাশ

কবি ও ঔপন্যাসিকের বহু সম্বল রাহাজানি করিয়াছে বিজ্ঞান। এইবার প্রকৃতি-বর্ণনার একটা অমূল্য সম্পদ বুঝি অপহৃত হয়! রাত্রির অন্ধকার-বর্ণনা অচল হইয়া পড়ে বা!

বৈজ্ঞানিকপ্রবর স্যর জেম্‌স্ জিন্‌স্ মহাপ্রলয়ের ধূয়া তুলিয়াছেন। গত সংখ্যায় তাঁহার আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি আর এক চমকপ্রদ কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণপক্ষ বা অমাবস্যা আর থাকিবে না, রাত্রির অন্ধকার বলিয়া কোন পদার্থ সুতরাং 'নাস্তি,' বারো মাস ত্রিশ দিন বর্ত্তমান অপেক্ষা বহুলাংশে সমুজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ ও বিমল চন্দ্রালোক যামিনীযোগে বিরাজ করিবে। কিন্তু কবে?—বৈজ্ঞানিকবর সে সময় নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই; বলিতেছেন—সুদূর ভবিষ্যতে, তবে ব্যাপারটি যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দুনিয়ায় ত নাই। স্যর জেম্‌সের ধারণায় এই সুখ ও আরাম উপভোগের পিছনে একটা 'কিন্তু' লাগিয়া থাকিবে—দুঃখ ও বেদনা। একটানা উজ্জ্বলতর চন্দ্রালোকের সঙ্গে সঙ্গে উপদ্রব সৃষ্টি করিবে বহু চন্দ্রের ভগ্নাংশ—শিলাবৃষ্টির মত ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া।

স্যর জেম্‌স্ আত্মপক্ষ সমর্থনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইয়াছেন। শনি গ্রহের চতুঃপার্শ্বে চক্র আছে তিনটি—সুপ্রশস্ত বৃত্তাকার, উহাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দ্র ক্রমাগত আলোক বিকিরণ করে; 'একচন্দ্র' বহুধা বিভক্ত হইয়াছে কোটি কোটি অংশে। আরও বলেন ইহা সুনিশ্চিত যে, চন্দ্র ক্রমশঃ পৃথিবীর সন্নিকটে আসিয়া পড়িবে, তখন নব পর্য্যায় শুরু হইবে, ভাঙিয়া ভাঙিয়া শশিনাথ সংখ্যাতীত আলোকময় ক্ষুদ্রাংশে পরিণত হইবে এবং ক্রমশঃ উহাদের আলোকপূর্ণ একটি বৃত্তও রচিত হইবে—এখন যেমন শনি গ্রহে আছে। ঐ আলোকে ধরিত্রী বর্ত্তমানের চেয়ে উজ্জ্বলতর আলোকে উদ্ভাসিত হইবে—সে আলোকের ক্ষয় নাই, জোয়ার ভাটা নাই, উর্ব্বশীর ন্যায় তাহার চিরযৌবন; তবে দুঃখের বিষয়, সে অবস্থাও নিরঙ্কুশ চন্দ্রের নহে, ভগ্ন অংশ পৃথিবীতে পড়িলে জীবের স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগ ব্যাহত করিবে।

পাটের আদি-কথা

বিন্দু হইতে সিন্ধুর সৃষ্টি। ক্ষুদ্র বীজ হইতে অশথ মহীরুহের উদ্ভব। এক সের পাট হইতে সাড়ে পাঁচ কোটি মণ পাটের উৎপত্তি বিচিত্র কি?

এই পাটের আদি-কথা কৌতূহলোদ্দীপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত জে, সি, সিংহ সেদিন তাঁহার আলোচনা করেন পাটনা সহরে—ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশনের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলাতে স্বদেশীয় বস্ত্র-শিল্প বিবৃতি লাভ করিতে থাকে। তখনও পর্য্যন্ত বিলাতে ভারতজাত বস্ত্রের প্রচুর রপ্তানি চলিয়া আসিতেছিল। ভারত-প্রবাসী ইংরাজ বণিকেরাই ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডে রপ্তানির কার্য্যে রত ছিলেন। কিন্তু বিলাতে ক্রমশঃ স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুত বেশী হইতে থাকায় [illegible]। অগত্যা পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ বণিকদের প্রয়োজন হইল যে, ভারতীয় অপর কোন দ্রব্যের রপ্তানি করিয়া অর্থোপার্জ্জন অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার নির্ণয়। বিলাতের বাজারে পাট চলে কিনা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা সরকার ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ্চ তারিখে এক বাণ্ডিল পাট নমুনা স্বরূপ বিলাতে পাঠান। পর বৎসরে আরও নমুনা প্রেরিত হয়।

বহু বিলাতী সওদাগরেরা অভিমত প্রকাশ করিলেন যে flax-শ্রেণীভুক্ত যত রকমের fibre প্রচলিত আছে এই পাট সকলেরই অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্‌স্ এক হাজার টন (কিছু কম ত্রিশ হাজার মন) পাটের অর্ডার দিলেন। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বোর্ডের মনে এই সংশয় জাগিল যে, এত অধিক পরিমাণ পাট সস্তাদরে মূল্যে জুটান যাইবে কি না। নানাস্থানের কারখানায় মালিকেরা আশ্বাস দিলেন যে, ৩০ হাজার মন মাল ১।০ হইতে ১৸০ দরে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিতে পারা যাইবে। তাহাই হইল।

ইহার মাসকয়েক পরে—১৭৯৪ সালের ডিসেম্বরে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ ডাঃ রক্সবর্গ মত প্রকাশ করেন যে পাট corchorus fibre। ১৭৯৬ সালে পূর্ব্বোক্ত ডিরেক্টর-সমিতি হইতেও এই সিদ্ধান্ত হইল যে, বস্ত্র বয়ন কার্য্যে পাট মিশ্রিত করিবার সুবিধা হয় না, সুতরাং জিনিসটা অচল। অগত্যা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডে পাটের রপ্তানি বন্ধ করাই সাব্যস্ত করিলেন। তাহা হইলেও পাটের রপ্তানি একেবারে বন্ধ হইল না। সওদাগরেরা অল্প অল্প পাট ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসর কাল রপ্তানি করিতে লাগিলেন। এই পাট বিলাতে কার্পেট তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ১৮৩৩ সালে কলকারখানা বসাইয়া পাটে চট্ ও থলিয়া তৈয়ারী সুরু হয়। তাহার পর ডাণ্ডি সহরে ক্রমশঃ চট্‌কল বাড়িতে থাকে।

পাট বাণিজ্যের আদি কথা ঐ। ক্রমশঃ পাট হইতে চট্ ও থলিয়া প্রস্তুতের নিমিত্ত পৃথিবীর নানা দেশে বহু সংখ্যক কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধি হেতু পাটের চাষ, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও দর যথেষ্ট বাড়িয়াছে। সামান্য কয়েক সহস্র মন হইতে এখন প্রতি বৎসর পাট উৎপন্ন হয় ৫।০ কোটি মন—অন্যূন এক কোটি গাঁইট, দর মণ প্রতি পড়ে ১।০—১৸০ স্থলে ১০৲—১৫৲; সময় বিশেষে ৩০৲ পর্য্যন্ত, আবার বর্ত্তমান বর্ষে ৪৲—৫৲। কোটি কোটি লোক পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই পাটের সংশ্রবে থাকিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।



বিচিত্রা

[illegible]

মহাত্মা রামমোহন রায়

জন্ম ১০ই মে, ১৭৭৪ মৃত্যু ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩।



উৎসুক

বিচিত্রা

মাঘ, ১৩৩৭

জাপানী শিল্পী

বিচিত্রা

চতুর্থ বর্ষ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৩৭ | দ্বিতীয় সংখ্যা

জীবন-উৎসব

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যা হয়েচে। উৎসবের দিন অবসান হ'ল। সমস্ত দিন নানা শব্দে নানা দৃশ্যে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েচে, আবার তাকে উৎসবের মূল কথায় ফিরিয়ে আন্‌তে হয়।

আমাদের জীবনও ত নানা বিক্ষেপে পরিপূর্ণ। কিন্তু মোটের উপর জীবন কি একটি উৎসব নয়? এর উৎসবে আকাশে কত আলো জ্বলেচে, পৃথিবীতে ঋতুর পর ঋতু কত ফুলকাটা আস্তরণ বিছিয়েচে! মন যে নানা চিন্তায় এবং শক্তি যে নানা কর্ম্মে ধাবিত হয়েচে তার গৌরব তার আনন্দ কি কম? তার পরে সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদের নানা অভিজ্ঞতায় নিজের চৈতন্যকে যে নানা রঙে রঙিয়ে দেখা গেল সেও ত আমাদের উসংবেরই অঙ্গ।

যে-মানুষ এই জীবন-উৎসবের মূল সুর থেকে দুঃখ বিপদ আঘাত ক্ষতিকে স্বতন্ত্র ক'রে নিয়ে তাকেই আর সব কিছু হ'তে বড় ক'রে দেখেচে তাকেও জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে জীবননাট্যের শেষে যখন মৃত্যুর যবনিকা পড়ল তখন কি সকল দুঃখ স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল না? দুঃখ তাপ আমাদের কল্পনায় যখন চিরস্থায়িত্বের ভাণ করে তখনই সে বিভীষিকা; কিন্তু তার পরে দিনের শেষে? তখন তার চিহ্নই বা কই, তার বেদনাই বা কোথায়?

এই উপলব্ধির শুধু মূল্য নয়, এর একটা নিগূঢ় আনন্দ আছে; সে কথা আমরা বুঝ্‌তে পারি যখন দেখি মানুষ সাহিত্যে সঙ্গীতে চিত্রকলায় এই সমস্ত বেদনাকে নানা রসে নানা রূপে স্থায়ী ক'রে তুলচে। তার কারণ, মানুষ জানে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ একটা বড় উৎসবেরই পালা—তার কোনোটাই নিজের মধ্যেই একান্ত এবং বিচ্ছিন্ন নয়, সমস্তটা জড়িয়ে একটা মস্ত প্রকাশ।

জীবনের সেই মূলগত ঐক্যকে সমগ্রতাকে সংশ্লিষ্ট ভাবে যিনি উপলব্ধি করলেন তিনিই তাকে পূরোপুরি ভোগ করলেন। যে মানুষ আমোদে-প্রমোদে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াল কিম্বা দুঃখশোকে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে গেল, সে পেলে না।

জীবনের সেই আনন্দময় ঐক্যকে কে স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে পায়? যে আপনার জীবনের অর্থকে একটি পরমানন্দময় একের মধ্যে গভীরভাবে জেনেচে। সেইত জোরের সঙ্গে বল্‌তে পারে—

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ

কোনো জায়গায় কোনো গতি বা প্রাণক্রিয়া কিছুমাত্র থাক্‌ত না, আকাশে যদি আনন্দ না থাক্‌ত।

জীবনকে যে-মানুষ নিজেরই মধ্যে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখচে সে জীবনের সূত্র হারিয়ে ফেলেচে, সে জীবনের সব কিছুকেই বিচ্ছিন্ন ক'রে বোধ করচে, এই জন্যেই আঘাত অভিঘাতে সে কেবলই এত বেশী নাড়া খাচ্চে।

পৃথিবীতে যাঁরা উৎসবকে সম্পূর্ণ করেচেন, তার সমস্ত সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদকে অসীমের মহিমায় জ্যোতির্ম্ময় ক'রে দেখিয়েচেন, তাঁদের কাছ থেকেই নিজের জীবনের সুর মিলিয়ে নিতে হবে।

সেই জন্যে আজ যাঁর দীক্ষার সাংবৎসরিক দিন তাঁর জীবনকে স্মরণ করি। মৃত্যুর মহা অবকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণ ক'রে দেখবার সুযোগ আমাদের এসেচে। আজ আমরা স্পষ্ট ক'রেই বুঝ্‌তে পারচি—সত্যং জ্ঞানমনন্তং এই যে মন্ত্রটি আমরা উচ্চারণ করি মাত্র এই মন্ত্রটিকে দিনে দিনে তিনি আপনার জীবনের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত করেচেন। এই মন্ত্রই তাঁর সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত কর্ম্মকে নিয়ে তাঁর জীবনকে এক সূত্রে গেঁথে তুলেচে।

মানুষের প্রকৃতিতে যেমন ভুলভ্রান্তি সম্ভবপর তাও তাঁর ঘটেচে, দুঃখে সুখে তাকে যেমন ক্ষুব্ধ করে তাও তাঁকে করেচে, কিন্তু সে সমস্তকে অতিক্রম ক'রে উঠেচে তাঁর জীবনে এই কথাটি—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন।

এমন ক'রে যাঁর জীবন অখণ্ড হয়েচে, অসীমের সঙ্গে মিলিত হয়েচে, তাঁর সেই জীবন মানুষের ইতিহাস থেকে আর ভ্রষ্ট হ'তে পারে না। সেই জীবন অমৃতের মন্দিরে অর্ঘ্যরূপে আহরণ করা হয়েচে কি-না এই জন্য সেই নৈবেদ্য র'য়ে গেল। এখন হ'তে সমস্ত মানুষেরই সে। তাই আজ আমরা তাঁর সেই জীবন থেকে জীবনের অর্থ লাভ করবার জন্যে এসেচি। সেই অর্থটি মহোৎসবের সাজেই আমাদের কাছে আসুক, মহোৎসবের সুরেই আমাদের কানে বাজুক এবং বাধা কাটিয়ে দিয়ে আমাদের জীবনকেও উৎসবময় ক'রে তুলুক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অশথ পাতা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরোনো বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের একটা কোণ—সেখানে গজালো ছোট্ট একটি অশথ গাছের দুটি পাতা ফাটা ইঁটের পাঁজর জড়িয়ে। ধ্বসে-যাওয়া কানাচে এসে যেন বাঁধলো বাসা একটুকু সবুজ টুনটুনির জুড়ি আষাঢ়ের আরম্ভে।

সেই ভাঙা বাড়ির কানাচ, সেখানে ব'সে এতটুকু মেয়ে খেলে—পরনে তারও সবুজ ঝাব্‌লা; তার সঙ্গে একটি বুড়ি সাদা কাপড় পরা—যেন সে জল-ঝরা শরতের মেঘ, সে থেকে থেকে ছড়া কাটে—"অশথ-পাতা কুন্তলতা শ্যাম পণ্ডিতের ঝি।" অশথ পাতা দোলে, মেয়েটা খেলে।

আমি আমার ঘরে ব'সে এই ছবিটা দেখি আর গজদন্ত ও রেশম গলানো চমৎকার কাগজে তুলে চলি দিনের পর দিন এই ছবি।

ছবি শেষ হয়ে যায়। ভোর রাতের ঘুমের মাঝে হঠাৎ মাটি কাঁপতে থাকে, আকাশে বয় ঝড়, চেঁচিয়ে ওঠে ঘুমন্ত পাখী, ধ্বসে পড়ে পাশের পুরোনো বাড়িটা, আনাচ কানাচ সমস্ত নিয়ে! শুধুই ছবিটা প'ড়ে থাকে আমার কাছে—এতটুকু কাগজে লেখা আষাঢ়ের অনেকগুলো দিনের একটি ছবি।

শীতে মাঘে

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী

শীতে

নিস্তব্ধ নিশীথ,
যেথা গন্ধরাজ করিছে বিরাজ
জাগে চামেলিয়া, নয়ন মেলিয়া
মধুপ চলেছে মধুলোভে,
তার পক্ষ আন্দোলন ক্ষোভে
স্তব্ধতায় রচিয়া সঙ্গীত!

ঘুমন্ত নিশিতে
থেকে থেকে ঝিল্লীর ঝন্‌কার,
শয্যাসাথী গেছে বুঝি কার,
খুঁজিতে কে যাবে এত রাতে?
হয়ত বা দেখা পাবে প্রাতে!
তবু মন কেঁপে ওঠে শীতে॥

মাঘে

মঘা অশ্লেষার যাত্রা বারণ,
তবু এলো নিদারুণ শীত;
নাই ফুল, নাহিক সঙ্গীত,
গেল পিক, এলনা মলয় সমীরণ!

নবপত্র ঘুমায় নীরবে,
এখন জাগিয়া কি বা হবে?
শ্রান্ত প্রজাপতি কামিনীর পাতে
আপনার মরণ-শয়ন পাতে।

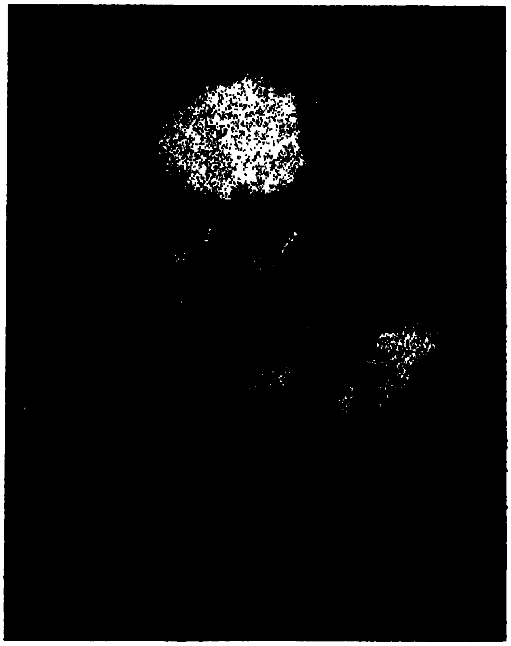
মালতী মালঞ্চে মধুকরে
আসেনাক করিবারে ভিড়,
নীরবতা চৌদিকে নিবিড়,
মধু-যাত্রা-মন্ত্র তাহু জপে শ্লথ করে॥

জড় জগতের প্রকৃতি

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ডি-এস্ সি

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী.কে জড়বিজ্ঞানের যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয়না। এই দুই শতাব্দীর মনীষীদিগের গবেষণার ফলে জড়বিজ্ঞান জড়জগতের রহস্যের নিরাকরণে কতদূর অগ্রসর হইয়া আজ কি অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব। প্রবন্ধের অবতারণা করিবার আগে জড়বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি, সেই সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করিয়া লইলে ভাল হয়। সাধারণ লোকে জড়বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য hypothesis বা theoryর বড় একটা খোঁজ রাখে না। জড়বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে যেটুকু সাহায্য করে তাহারা সেইটুকুর বিষয়ই জানে। তাহারা জানে বিদ্যুতের কাজ পাখা ঘোরান, ট্রামগাড়ী চালান বা ঘরে আলো জ্বালা; তাপের কাজ ষ্টীম্ বা মোটর গাড়ীর এঞ্জিন চালান; রসায়নের কাজ ঔষধ তৈয়ারী, রং তৈয়ারী বা বড় জোর কৃত্রিম খাদ্য তৈয়ারী করা।

বিদ্যুৎ কি? তাপ ও শক্তির মধ্যে সম্বন্ধ কি? বিভিন্ন পদার্থের অণু পরমাণু কি নিয়মে পরস্পরের সঙ্গে মেলে সে সকলের খোঁজ তাহারা রাখেনা—বা খোঁজ রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে করে না। এক কথায় তাহারা ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগটুকু শুধু দেখে। তাহারা বৈজ্ঞানিক ও উদ্ভাবক—scientist ও inventor—এই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পায় না। বৈজ্ঞানিক ও উদ্ভাবকের কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বৈজ্ঞানিক জড়-জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলীর মধ্যে নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যগ্র—আর উদ্ভাবক বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত সেই সব নিয়মগুলি কাজে লাগাইয়া নিজের অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত;—অবশ্য তাঁহার গৃহে অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আবিষ্কৃত জিনিষগুলি মানুষের কিছু কাজে লাগে—কিন্তু সেটা পরোক্ষ বিষয়। প্রমাণ—যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্রের ও বিষাক্ত বাষ্পের আবিষ্কার। এগুলি মানুষের জীবনযাত্রায় যে বিশেষ সাহায্য করে তা বলা যায় না।



গ্যালিলিও

জড়বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি বুঝিবার আগে আর একটা কথা জানিয়া রাখা ভাল। মানুষের জ্ঞানার্জ্জনের উদ্দেশ্য জগতের রহস্য জানা। এই রহস্যের মধ্যে জড় আছে, জীব আছে, শক্তি আছে, মানুষের মন আছে, আত্মা আছে—এই সমস্ত কি, ইহাদের আদিই বা কি অন্তই বা কোথায়, এই সব জানিবার প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক-গণ এই সব লইয়া আলোচনা করেন। জড়জগতের নিয়মা-বলীর জানার জন্য তাঁহারা তত ব্যস্ত নহেন। জড় কি, জড়ের সঙ্গে মন প্রাণ বা জীবনের কি সম্বন্ধ,—এমন কি জড়

আগ্রাতে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর নবম অধিবেশনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

সত্যই আছে অথবা উহা শুধু আত্মার একটা বিভ্রম বা মায়া মাত্র এ কথাও তাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন।

জড়বিজ্ঞানের আলোচ্য ক্ষেত্রের পরিসর দর্শনের অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ। আমরা আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহির হইতে অনবরত অনুভূতি পাইতেছি—এই অনুভূতিগুলির কারণস্বরূপ আমাদের বাহিরে আর একটা জগৎ আছে বলিয়া অনুমান করি আর সেই জগৎকে বলি জড়জগৎ। জড়জগৎ আমাদের কাছে যে অনুভূতি পৌঁছাইয়া দেয় তাহা সংখ্যায় অগণনীয়, বৈচিত্র্যে অবর্ণনীয়। সাধারণ মানুষ এই অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে দিশা হারাইয়া ফেলে। জড়বিজ্ঞান এই সংখ্যাতীত বিচিত্র অনুভূতিগুলিকে অল্পসংখ্যক নিয়মের কোঠায় পুরিয়া আবদ্ধ করিতে চান—বৈচিত্র্যের মধ্যে সমতা খুঁজিয়া বাহির করেন। নিয়ম বা সূত্র-সংখ্যা যত কম হইবে ততই ভাল। যে সূত্র যত বেশী ঘটনাকে এক নিয়মে আবদ্ধ করিতে পারে সেই সূত্রের মূল্য বৈজ্ঞানিকের কাছে তত বেশী। বৈজ্ঞানিকের চরম আকাঙ্খা সেই এক মূল নিয়মের আবিষ্কার করা যাহা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবে।

একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় কথাটা পরিষ্কার হইবে। আমি দেখিতেছি একজন লোক দুইটা কাঠ খণ্ড লইয়া জোরে ঘষিতেছে। কাঠখণ্ড ঘষা—এই ব্যাপার দেখা হইল একটা অনুভূতি। তার পরে কাঠে হাত দিয়া দেখিলাম যে কাঠ দুইটা গরম হইয়াছে। ত্বকে উত্তাপ অনুভব করা এও অপর একটা অনুভূতি। এই ব্যাপার আমি একবার নয়, বহুবারই দেখি—একটা অনুভূতি চক্ষে কাঠ ঘষা দেখা হইলেই আর একটা অনুভূতি —উত্তাপ কাঠে হাত দিয়া পাই। তখন আমি নিয়ম আবিষ্কার করি যে, কাঠে কাঠে অথবা যে কোনও দুইটা বস্তু ঘষিলেই বস্তু দুইটা উত্তপ্ত হয়। এই নিয়মটি আবিষ্কার করিলে পর দুইটা জিনিষে ঘষা দেখিলেই আমি সেই জিনিষ দুইটাতে হাত না দিয়াই বলিতে পারি জিনিষ দুইটা গরম হইয়াছে। এই যে নিয়ম বাহির হইল ইহাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বলা যাইতে পারে। অবশ্য এটা হইল খুব মোটা রকমের আবিষ্কার। এত মোটা যে, অশিক্ষিত বর্ব্বরেরাও আদিম যুগে এই নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ইহাকে কাজে লাগাইয়া অগ্নি উৎপাদন করিত। কিন্তু এই নিয়মের আর কয়েকটা ধাপ উপরে উঠিলেই একটা বড় বৈজ্ঞানিক নিয়ম পাওয়া যায়। কাঠে কাঠ ঘষিলে উত্তাপ পাই; কোনও জিনিষের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হইলেও জিনিষটা উত্তপ্ত হয়—প্রমাণ বিজলীবাতির ফিলামেণ্ট; অথবা বাইসিক্লের পাম্প দিয়া তাড়াতাড়ি টিউবে হাওয়া ভরিলে দেখি পাম্প গরম হইয়া উঠে।

এই যে এতগুলি বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে উত্তাপের অনুভূতি সর্ব্বদা জড়িত, এগুলার পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নিয়ম বা সূত্র কি পাওয়া যায় না? হাঁ, সূত্র আছে। যখন কাঠে কাঠে ঘষি তখন হাতের জোর দিয়া ঘষিতে হয়—কতকটা শক্তি ব্যয় করি—ধাতুদ্রব্যের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে গেলে ব্যাটারী হইতে শক্তি খরচ হয়, বাইসিক্লে পাম্প করিবার সময়েও গায়ের জোর লাগে—সব সময়েই দেখি যে, উত্তাপ পাইতে গেলেই শক্তি ব্যয় করিতে হয়। আরও যদি সূক্ষ্মভাবে অনুভূতিগুলি মিলাইয়া দেখি তা হইলে দেখিব, বিভিন্ন পরিমাণ শক্তির অপচয়ে বিভিন্ন বারে যে উত্তাপ পাই তাহার একটা অনুপাত আছে। এই হইতে আবিষ্কার করি যে, শক্তি ও তাপ একই জিনিষ —শক্তি রূপান্তরিত হইয়া আমাদের কাছে তাপের অনুভূতি জন্মায়। এই আবিষ্কারটা, এই সূত্রটা একটা বেশ উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক সূত্র। পদার্থবিদেরা এই সূত্রকে বলেন, First law of thermodynamics। আমরা এই হইতে শক্তি বলিয়া একটা বস্তুর কল্পনা করি;—শক্তি কি তাহা ঠিক জানিনা, কিন্তু শক্তি বলিয়া একটা সংস্কার হইতে অন্য অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিবার সুবিধা হয়।

উপরে যে সূত্রের কথা বলা হইল, এই রকম কয়েকটা সূত্র বৈজ্ঞানিকের আছে। এক একটা সূত্র এক একটা কুঠরীর মত। কোনও একটা নূতন ঘটনা পাইলে বৈজ্ঞানিকেরা সেই ঘটনাকে কোন্ কুঠরীতে ফেলিবেন তাহা লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যদি দেখেন যে, কোন কুঠরীতেই সেই নবাবিষ্কৃত ঘটনার স্থান হইতেছে না, তখন

হয় নূতন কুঠরী তৈয়ার করিতে হয়। নয় ত পুরাতন কুঠরীকে ভাঙ্গিয়া এমন করিয়া গড়িতে হয় যে নূতন ঘটনাটি তাহাতে স্থান পায়। বৈজ্ঞানিকেরা পুরাতন কুঠরী সহজে ভাঙ্গিতে সম্মত হন না। যখন দেখেন যে আর উপায় নাই—কোন মতেই নূতন ঘটনাকে পুরাতন সূত্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারা যাইতেছে না, তখনই তাঁহারা পুরাতন সূত্র অথবা নিয়মগুলিকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে বাধ্য হন।

যা হউক, আধুনিক জড় বিজ্ঞানের ভিত্তির স্থাপনকর্ত্তা কে বলিতে গেলে গোড়াতেই মহামতি নিউটনের নাম মনে পড়ে। নিউটন গতি বিজ্ঞানের তিনটি নিয়ম আবিষ্কার করেন। জড় বিজ্ঞানে এই নিয়ম তিনটি



আইজাক্ নিউটন্

Newton's three laws of motion বলিয়া খ্যাত। সূত্র তিনটি এত সহজ ও সরল যে, তাহাদের তাৎপর্য্য একজন সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও বুঝিতে পারে। আবার সূত্র তিনটির প্রয়োগ এতই ব্যাপক যে, একবার আশা হইয়াছিল, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় জগতের সমস্ত ঘটনাবলী বুঝি ঐ নিয়ম তিনটির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িবে। নিয়ম তিনটি জড়ের জড়ত্ব, গতি ও শক্তির মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা নির্দ্দেশ করে। নিউটনের নিয়ম আবিষ্কারের পর হইতে প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া এই সূত্রের প্রয়োগে জড় জগতের নূতন নূতন ঘটনাবলীর মধ্যে কার্য্য কারণের সম্বন্ধ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা নিউটনের নিয়ম প্রয়োগে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ঐ তিনটা সূত্রকে মিলাইয়া শুধু একটি সূত্র আবিষ্কার করিয়া জড় জগতের সমস্ত ঘটনাকে তাহাতে গ্রথিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সূত্রের নাম হইতেছে—Hamilton's principle। যদি মানিয়া লই যে, জড় জগতের সর্ব্বত্রই নিউটনের নিয়ম খাটে, আর সমস্ত অণুপরমাণু আজ কোথায় কি ভাবে আছে যদি আমার জানা থাকে তা হইলে হ্যামিণ্টনের সূত্র প্রয়োগে ঐ অণুপরমাণুগুলি দূর ভবিষ্যতে কোথায় কি ভাবে অবস্থান করিবে তা বলিতে পারি।

জড়ের গতি ছাড়া তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ ও চৌম্বক শক্তির বেলাতেও নিউটনের নিয়ম প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু এই সব জটিল বিষয়ে নিউটনের নিয়ম প্রয়োগ করার জন্য পদার্থ বিজ্ঞানকে দুইটা নূতন দিকে প্রসার করিতে হইয়াছিল।

প্রথমে তাপের কথা ধরা যাক্। তাপশক্তি মূলে জড়ের গতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও জিনিষকে উত্তপ্ত করিলে তাহার অণুপরমাণুগুলি চঞ্চল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করে। অণুপরমাণুগুলির চঞ্চল গতিজনিত যে শক্তি, সেইটাই আমাদের কাছে তাপ রূপে প্রকাশ পায়। কোনও একটা জিনিষের মধ্যে তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর ওজন ও তাহারা কোনদিকে কতবেগে ছুটিতেছে তাহা যদি আমার জানা থাকে তা হইলে নিউটনের নিয়ম প্রয়োগে তাপের সঙ্গে গতির সম্বন্ধটা বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু একটা জিনিষের মধ্যে অণুপরমাণু প্রায় সংখ্যাতীত। তাহারা কে কোথায় আছে কে বলিয়া দিবে? আর বলিয়া দিলেও তাহারা ক্ষণে ক্ষণে গতির বেগ ও দিক পরিবর্ত্তন করিতেছে। প্রত্যেকটি

পরমাণুর গতিবেগ বিভিন্ন; ক্ষণে ক্ষণে তাহার হিসাব করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং অণুপরমাণুর গতি নিউটনের নিয়ম মানিলেও নিয়ম প্রয়োগ ব্যাপারটা এত কঠিন হইয়া পড়ে যে আমাদিগকে হার মানিতে হয়। কিন্তু মানুষের মন হার মানিতে চায়না। একজনের বুদ্ধি যেখানে হার মানে আর একজনের বুদ্ধি সেখানে নূতন পন্থা দেখাইয়া দেয়।

এ ক্ষেত্রে নূতন পন্থা দেখাইলেন ম্যাক্সওয়েল। ম্যাক্সওয়েল বলিলেন, প্রত্যেকটি অণুপরমাণুর গতির হিসাব রাখার কোনও প্রয়োজন নাই। অণুপরমাণুগুলার প্রত্যেকটা কখনও দ্রুত ছুটিতেছে, কখনও ধীরে ছুটিতেছে, কখনও বা মুহূর্ত্তের জন্য সংঘর্ষের ফলে স্থির হইয়া যাইতেছে। প্রতিক্ষণে তাহাদের গতির বেগ ও দিক্ না জানিলেও কিছু আসে যায় না। আমি যদি তাহাদের গড়পড়তা গতির বেগ ও বেগজনিত শক্তি জানি তা হইলেই পরমাণুগুলির গতির সঙ্গে তাপের সম্বন্ধ বাহির করিতে পারি। চঞ্চল গতির জন্য জিনিষটার অণুপরমাণুগুলা ক্ষণে ক্ষণে নূতন অবস্থায় আসিতেছে,—নিয়ত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু গড়পড়তা গতি অনুসারে হিসাব করিলে যে অবস্থাটা আমরা পাই সেই অবস্থাটাই বেশী বার হয় ও বেশীক্ষণ থাকে—সুতরাং সেইটাই সব চাইতে সম্ভবপর অবস্থা।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। একটা ঘরে চোখ বাঁধিয়া কতকগুলা লোককে ছাড়িয়া দিয়াছি। তাহারা ইচ্ছামত অনিয়মিত ভাবে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমি যদি লোকগুলাকে দেখি তা' হইলে দেখিব যে, তাহারা সমস্ত ঘরটার ভিতর প্রায় সব সময়ই মোটের উপর সমান ভাবে ছড়াইয়া আছে। এটা অবশ্য অসম্ভব নয় যে, সব লোকগুলা কোনো এক সময়ে ঘরের একটা কোণে জড় হইয়া গেল। কিন্তু অসম্ভব না হইলেও এরূপ ঘটনা বিরল। আর যদিও বা কচিৎ ঘটে তা' ক্ষণিকের জন্য। লোকগুলার সব চাইতে সম্ভাব্য অবস্থান গড়ে সব জায়গায় সমান ভাবে ছড়াইয়া থাকা। একটা জিনিষের তাপজনিত চঞ্চল অণুপরমাণুর সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভাব্য অবস্থায় তাপ বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া বোল্ট্‌জ্‌মান একটা নূতন সূত্রের আবিষ্কার করেন। ম্যাক্সওয়েল প্রবর্ত্তিত গড়পড়তা হিসাব বা Statistical mechanics বোলট্‌জমানের সূত্র প্রয়োগে অনেক প্রসার লাভ করিয়াছে। Statistical mechanics-এর প্রয়োগে তাপবিজ্ঞান নিউটনের নিয়মে ধরা পড়িয়া গতি-বিজ্ঞানের একটা শাখা হইয়া দাঁড়াইল।

Statistics বা গড়পড়তা নিয়মের একটা ভারি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় জীবন বীমা করিবার সময়। আমি যদি ৩০ বৎসর বয়সে ২৫ বৎসরের জন্য Endowment policy করি তা হইলে আমাকে বাৎসরিক কি পরিমাণ প্রিমিয়াম দিতে হইবে তাহা নির্ভর করে আমার ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিবার সম্ভাবনা কত তাহার উপর। আমি নিজে ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিব কি-না তা' বীমা কোম্পানী বলিতে পারেন না বটে কিন্তু তাঁহাদের জানা আছে যে, আমাদের দেশে ৩০ বৎসর বয়সের লোক ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি হাজারে কয়জন বাঁচে। গড়-পড়তা একটা হিসাব তাঁহাদের আছে—আর সেই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা প্রিমিয়ামের হার স্থির করেন। গড়ের নিয়ম কোনো-একটি ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগে হয় ত খুবই ভুল হইবে। কিন্তু অনেকগুলি ব্যক্তিকে জড়াইয়া তাহাদের উপর প্রয়োগ করিতে গেলে হিসাবে নির্ভুল ফল পাওয়া যায়। হিসাব যে নির্ভুল, তাহার প্রমাণ বীমা কোম্পানীগুলি টিকিয়া আছে; গড়পড়তা হিসাবে ভুল থাকিলে বীমা কোম্পানী ফেল করিত।

তাপের বেলা নিউটনের নিয়ম-প্রয়োগ Statistical mechanics-এর সাহায্যে হইল। কিন্তু বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তির বেলা নিউটনের নিয়ম প্রয়োগের জন্য বৈজ্ঞানিকদিগকে আর একটা নূতন জিনিষের কল্পনা করিতে হইল। এই নূতন কল্পনা বা ধারণার (Concept) উদ্ভব কি ভাবে হইয়াছিল তাহার ইতিহাস ভারি কৌতূহলোদ্দীপক।

জড় জগতে আমরা অনেক রকম force বা শক্তির লীলা দেখি। একটা জড় পদার্থ আর একটা জড় পদার্থকে টানে,—তাহাকে বলি মাধ্যাকর্ষণ। আবার গালাকে রেশম দিয়া ঘষিলে গালার ছড়িটা ছোট ছোট কাগজের টুকরাকে আকর্ষণ করে, ইহাকে বলে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ।

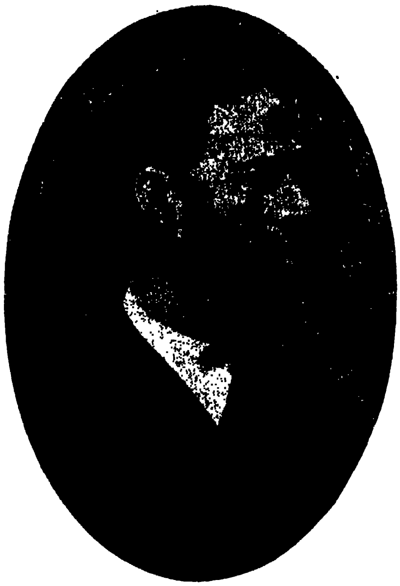
লোহা চুম্বককে টানে—তাহাকে বলি চৌম্বক-শক্তি। একটা তারে যদি বিদ্যুৎ চলে তা হইলে তাহার কাছে চুম্বক আনিলে চুম্বক-শক্তি তারটাকে ঠেলিয়া দেয়, ইহা হইল Electromagnetic force বা বৈদ্যুত-চৌম্বকশক্তি। এই শেষোক্ত ঠেলায় আবার একটু মজা আছে। রেশম-ঘষা গালা কাগজের টুকরার কাছে লইয়া গেলে যে দিকে গালা আছে সেই দিকে আকর্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহিত তারের কাছে চুম্বক লইয়া গেলে তার চুম্বকের দিকে আসেনা—আড়াআড়ি ভাবে পাশের দিকে চলিয়া যায়। যেমন একটা ঘুরন্ত লাটিমে যদি ঠেলা মারি তা হইলে যেদিকে ঠেলা মারি লাটিম সেদিকে টলেনা—আড়াআড়ি ভাবে পাশের দিকে টলে। এই যে কোথাও কিছু নাই, একটা জিনিষের কাছে আর একটা জিনিষ লইয়া গেলে সেটার উপর বল-প্রয়োগ হয়—যে বলকে বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা বিদ্যুৎ-শক্তি, চুম্বক-শক্তি নাম দিই—সেই বলপ্রয়োগ ব্যাপারটা আমাদের কাছে বড় অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়।

আমরা সাধারণতঃ দেখি যে দূর হইতে কোনও একটা জিনিষের উপর বলপ্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলে সূতাই হউক বা লাঠিই হউক কোনও কিছু দিয়া সে জিনিষটার সঙ্গে একটা যোগ থাকা চাই। সূতা বা লাঠি আমার হাতের ও সেই বস্তুর মধ্যে থাকিলে তাহার সাহায্যে আমি হাত হইতে বল ঐ বস্তুতে প্রয়োগ করিতে পারি। যে দুইটা বস্তুর মধ্যে কার্য্য কারণের সম্বন্ধ দেখা যায় সেই দুইটার মধ্যে কোনও একটা জিনিষ দিয়া যোগ থাকা দরকার। অবশ্য সব সময় এই যোগ সহজেই ধরা যায় না। যেমন, আমি এখানে কথা বলিতেছি আপনি ওখানে বসিয়া শুনিতেছেন—এখানে আমাদের উভয়ের মধ্যে যোগ কি? শব্দের বাহক কে? এক্ষেত্রে শব্দের বাহক বায়ু। আমার মুখের বাক্‌যন্ত্র বায়ুতে কম্পন তুলিতেছে। সেই কম্পন তরঙ্গের আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—তরঙ্গের চলিবার পথে আপনার কান আছে। তরঙ্গ কানে ঢুকিয়া কর্ণপটাহে আঘাত করিয়া স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি পৌঁছাইয়া দিতেছে। এই রকম সকল ক্ষেত্রেই আমরা একটা যোগ বা medium দেখিতে পাই যা অবলম্বন করিয়া বল এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায়। সুতরাং স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, যখন বিদ্যুতাশ্রিত বস্তু কাগজকে টানিতেছে বা চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করিতেছে তখন গালা ও কাগজের মধ্যে বা চুম্বক ও লোহার মধ্যে কোনও যোগ আছে কি?

এই যোগের সূত্র সন্ধান করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করিলেন যে, আমরা আমাদের চারিদিকে যে আপাত-শূন্য আকাশ দেখি তা বাস্তবিক শূন্য নহে। ইহা ইথর নামে একটা ঘন কঠিন পদার্থে পূর্ণ হইয়া আছে। বিদ্যুৎতাশ্রিত বস্তুদের মধ্যে বা চুম্বক ও লোহার মধ্যে যে আকর্ষণ হয় তাহার আসল রহস্য ঐ ইথরের মধ্যে পাওয়া যায়। দুইটা বস্তু যখন বিদ্যুতাশ্রিত হয় তখন মাঝের আকাশে টান বা strain পড়ে। আকাশ নিজকে কুঞ্চিত করিবার চেষ্টা করে, ফলে বিদ্যুতাশ্রিত বস্তু দুইটার কাছাকাছি আসিবার চেষ্টা হয়। ঠিক যেন বিদ্যুতাশ্রিত বস্তু দুইটা অদৃশ্য রবারের সূতা দিয়া বাঁধা আছে। ইথরে টানটা আমাদের চর্ম্মচক্ষুর গোচর হয় না। সেই জন্য আমরা মনে করি একটা বিদ্যুতাশ্রিত বস্তু বুঝি দূর হইতে আর একটা বিদ্যুতাশ্রিত বস্তুকে টানিতেছে। বিদ্যুৎ আর চুম্বকের আকর্ষণ বিকর্ষণের সন্ধান আকাশে করিতে গেলে দেখা যায় যে, এখানেও নিউটনের নিয়ম বা হ্যামিল্টনের Principle প্রয়োগ করা যায়। ইথরে আমি যদি জড়ের ধর্ম্ম জড়ত্ব বা inertia আরোপ করি তবে দেখি যে, ইথর নিউটনের নিয়ম মানিয়া চলে।

আকাশে এই টানাটানি ব্যাপার প্রথম পরিকল্পনা করেন মাইকেল ফ্যারাডে, তাঁর মতবাদের সম্প্রসারণ করেন ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ও ইহার পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ দেন হাইনরিক হার্‌ৎজ। আকাশে এই বল-ক্ষেত্রের পরিকল্পনার নাম Field theory। ম্যাক্সওয়েলের Field theoryর মধ্যে অনেক জিনিষ বাঁধা পড়িল। বিদ্যুৎশক্তি, চুম্বকশক্তি, চৌম্বক-বৈদ্যুতিক শক্তি বা Electromagnetic force, তাপ, আলোক সবই ইথরে টানাটানি, মোচড় বা তরঙ্গের ফল স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে লাগিল। প্রমাণ হইল শক্তি যেমন জড়কে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে তেমনি ইথরে আশ্রয় করিয়াও থাকিতে পারে। ইথরে ঢেউ উঠিলে আলোক পাই—

মোচড় পড়িলে চুম্বক শক্তির বিকাশ পাই—হঠাৎ টান পড়িলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়। এক কথায় ইথর বলিয়া যে



হার্ৎজ

বস্তুটি বৈজ্ঞানিকের কাছে একটা কল্পনার বিষয় ছিল সেটা কল্পনা হইতে বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা জোর গলায় বলিতে সুরু করিলেন যে, যেমন জড়ের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি তেমনি ইথরের অস্তিত্বেও আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

কিন্তু এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। ইথরের টানাটানির ফলে ও Maxwell-এর Field theory দিয়া বিদ্যুৎ, চুম্বক আলোক ও তাপের ব্যাখ্যা দেওয়া চলিল বটে কিন্তু আমাদের পুরাতন চিরপরিচিত মাধ্যাকর্ষণ এই Field theoryতে বাঁধা পড়িল না। ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই। শক্তি ইথরের আশ্রয়ে নানা বিচিত্র ভাবে থাকিতে পারে। একই শক্তি বিদ্যুৎ হইতে চৌম্বক শক্তি অথবা তাপ বা আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। কিন্তু ইথরের যে যে ধর্ম্ম থাকিলে বিদ্যুৎ, চুম্বক, তাপ ও আলোকের ব্যাখ্যা করা যায় সে সব ধর্ম্মতে মাধ্যাকর্ষণের ব্যাখ্যা চলে না। মাধ্যাকর্ষণ একটা খাপছাড়া জিনিষই রহিয়া গেল।

এই শতাব্দীর গোড়ায় দিকে জড়, ইথর ও নিউটনের নিয়ম প্রয়োগে বৈজ্ঞানিকেরা জড় জগতের সকল রহস্যের ব্যাখ্যা দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আলো, চুম্বক ও বিদ্যুতের ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই যে Field-theory বা বলক্ষেত্রের পরিকল্পনা করা হইল ইহা শুধু একটা কবির কল্পনা নয়। একটা নূতন কিছু মতবাদ বা পরিকল্পনা হইলেই বৈজ্ঞানিকেরা তাহাকে নানাদিক দিয়া নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া তবে গ্রহণ করেন। ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েলের Field-theoryর ফলে আমরা আজ বেতারবার্ত্তা ও রেডিও পাইয়াছি।



ফ্যারাডে

যে সব বৈজ্ঞানিক মনীষীরা জড় বিজ্ঞানকে এই অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, কেলভিন, হেল্মহোল্‌ৎজ, লাপ্লাস, লাগ্রাঞ্জ, ইত্যাদি। জীবিতদিগের মধ্যে কেম্ব্রিজের জে, জে, টমসন এ বিষয়ে অগ্রণী।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে ও এই শতাব্দীর গোড়ায় যখন ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল ও হার্ৎজের চেষ্টায় Field theoryতে নিউটনের নিয়ম প্রয়োগে জড় জগতের রহস্য-তমসাবৃত আকাশ ধীরে ধীরে আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিতেছিল সেই সময়ে আকাশের এক কোণে দুই খণ্ড মেঘ দেখা দিল। মেঘ দুইটি ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। মেঘ দুইটি কি তাহার পরিচয় আভাসে দিতেছি।



কেল্‌ভিন

নিউটনের নিয়ম অনুসারে গতি মাত্রেই আপেক্ষিক বা relative। কোনও জিনিষ চলিতেছে কি থামিয়া আছে বলিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হয় কোন্ জিনিষের তুলনায় চলিতেছে বা থামিয়া আছে। ট্রেণে বসিয়া আছি, আমার অবস্থানের তুলনায় আমার সঙ্গী, আমার মালপত্র স্থির হইয়া আছে—কিন্তু যদি কেহ ট্রেণের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকে সে বলিবে যে আমার সঙ্গী আমার মালপত্র সবই ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার আমি ঘরে স্থির হইয়া বসিয়া আছি—বাড়ী, ঘর, টেবিল, চেয়ার দেখি সবই স্থির—আমার তুলনায়। কিন্তু কেউ যদি সূর্য্যে বসিয়া দেখে তবে সে দেখিবে যে, বাড়ী ঘর সমেত পৃথিবীর সহিত আমি ছুটিয়া চলিয়াছি।—অর্থাৎ গতি বা গতি বেগ বলিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তুলনায় কাঠামো বা frame of referenceটা কি বলিতে হয়। গতির বেগ absolute বলিয়া কিছুই নাই। আমি absolute গতির বেগ মাপিতে পারি যদি একটা স্থির নিশ্চল absolute frame of reference পাই।

কিন্তু absolute frame of reference কোথায়? পৃথিবী স্থির নয়, সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। গ্রহ উপগ্রহ সমেত সৌর জগৎ-ও স্থির নহে—আকাশের একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে ভীম বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহা হইলে স্থির নিশ্চল তুলনা করিবার কাঠামো পাই কোথায়? হাঁ, একটা referenceএর জিনিষ পাওয়া যায় বটে। Field theoryতে আমরা যে ইথর কল্পনা করিয়াছি সেইটারই তুলনায় অন্যান্য জড় বস্তুর গতি যদি মাপি তা হইলে বোধ হয় absolute গতির বেগ আন্দাজ করিতে পারিব। ইথর যখন সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া আছে তখন ইথর একেবারে স্থির নিশ্চল এইটাই স্বাভাবিক। গতির বেগ মাপার পরীক্ষা সুরু হইল আলোর উপর। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ইথর ভেদ করিয়া আপন কক্ষায় ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবী ইথর ভেদ করিয়া যেদিকে ছুটিতেছে আমি যদি সেই দিকেই আলোর বেগ মাপি তা হইলে দেখিব যে আলোর গতির বেগ অপেক্ষাকৃত কম;—আবার যদি পৃথিবী যে দিকে ছুটিতেছে তাহার আড়াআড়ি মাপি তা হইলে দেখিব বেগ অপেক্ষাকৃত বেশী।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হইবে। দুইটা ট্রেন যদি পাশাপাশি চলে ও যদি একই দিকে যায় তা হইলে এক ট্রেন হইতে মনে হয় অপরটা খুব আস্তে চলিতেছে—দুইটা যদি বিপরীত দিকে চলে তা হইলে মনে হয় যে খুব জোরে চলিতেছে। আলোর গতির বেগ লইয়া এই তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়াছিলেন আমেরিকার মাইকেলসন ও তাঁহার সহকারী মর্লে। তাঁহাদের পরীক্ষায় কিন্তু দেখা গেল যে, আলোর গতির বেগ দুই দিকেই সমান। অর্থাৎ আলো যে দিকে চলে, মনে হয় ইথরও যেন সেই দিকে সেই সঙ্গে ছুটিয়া চলে। কথাটা অসম্ভব শোনায়। যদি একই সময়ে দুইটা জিনিষ দুই বিপরীত দিকে ছোটে তা' হইলে ইথরও সেই সঙ্গে দুই বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। একই ইথর একই সময়ে দুই বিপরীত দিকে ছুটিতে পারে একথা বলাও যা আর ইথর নাই একথা বলাও

তাই। ইথর যদি নাই তাহা হইলে ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েলের বলক্ষেত্র মতবাদের কি হইবে। বিদ্যুৎ শক্তি, চুম্বক শক্তি, আলোক-তরঙ্গ এ সবের উৎপত্তি-স্থল কোথায়?

এই বিরোধের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আইনষ্টাইনের



আইনষ্টাইন্

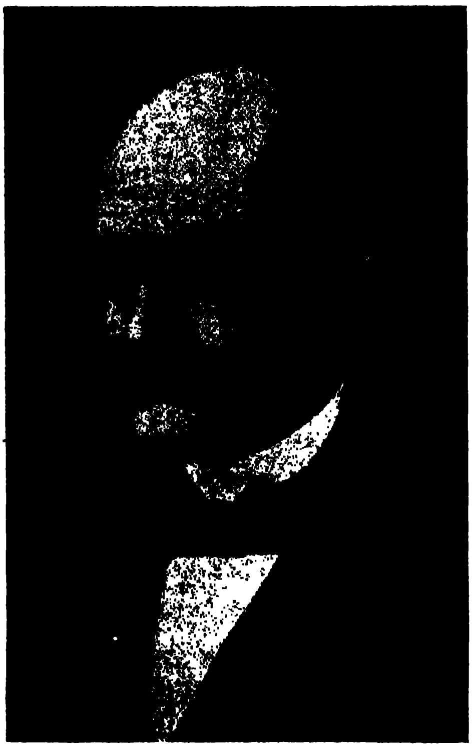
relativity মতবাদের সৃষ্টি হইল। আইনষ্টাইন গোড়াতেই মানিয়া লইলেন যে, আলোর গতির বেগ অপরিবর্ত্তনীয়—invariant। আলোর গতির বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। আমি আলোর গতির বেগ স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়াই মাপি বা ছুটিতে ছুটিতে মাপি সর্ব্বদা ঐ একই ফল পাইব সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। ইথর আছে কি নাই সে প্রশ্নই তিনি তুলিলেন না—আর ইথর যদিই বা থাকে তা হইলে তাহা সচল কি নিশ্চল তা নিশ্চয়রূপে জানার কোনও উপায় নাই। আইনষ্টাইনের মতামতের সব কথা এখানে বলা সম্ভবপর নয়, শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আনইষ্টাইন ও সেই সঙ্গে Minkowski দেশ ও কাল এই দুই conceptকে এক করিয়া এক সঙ্গে দেখিলেন।

আমরা জড়জগতে কোনও বস্তুর দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি দুইটা পৃথকভাবে দেখি। এই পৃথকভাবে অসম্পূর্ণ দেখার ফলেই মাইকেলসন মর্লে'র পরীক্ষার সঙ্গে ফ্যারাডে ম্যাক্সওয়েলের Field theoryর বিরোধ দেখি। দেশ শুধু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধে ত্রিধা বিভক্ত three dimensional নয়। ইহার চতুর্দ্ধা বিভক্ত—দৈর্ঘ্য, বেধ ও প্রস্থ যেমন দেশের তিনটা দিক্, কালও তেমনি ইহার আর একটা দিক। কাল চতুর্থ দিক—এই কালকে লইয়া দেশ জড়াইয়া আছে—ইহা four dimensional। দেশ কালকে মিন্‌কৌস্‌কির মতে এই ভাবে দেখিলে বিদ্যুৎ চুম্বকের বলক্ষেত্র মতবাদের সঙ্গে মাইকেলসন মর্লে'র পরীক্ষার বিরোধটুকু চলিয়া যায়। Filed equation আবার নিউটনের নিয়মে বা হ্যামিণ্টনের principleএ ধরা দেয়। দেখা যায় যে, নিউটনের নিয়ম-গুলির চাইতে আরও একটা ব্যাপক নিয়ম আছে। নিউটনের নিয়ম আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত relativity মতবাদের সেই ব্যাপক নিয়মের একটা অংশ বা একটা special case মাত্র। গতির বেগ যখন অল্প থাকে তখন নিউটনের নিয়ম বেশ খাটে, কিন্তু গতির বেগ যখন খুব বেশী হয় তখন নিউটনের নিয়মে একটু চুক্ থাকিয়া যায়। সেই চুকটুকু আইনষ্টাইনের relativity সূত্রে ধরা পড়ে।

যে দুইখণ্ড মেঘের কথা বলিয়াছিলাম তাহার একখণ্ড এই। বিজ্ঞানাকাশ কি করিয়া এই মেঘ হইতে মুক্ত হইল তাহাও বলিলাম। অপর খণ্ড মেঘের কথা বলিতেছি।

যে পরীক্ষা হইতে এই দ্বিতীয় মেঘখণ্ডের উদয় তাহা অতি সাধারণ। কোনও জিনিষকে গরম করিলে তাহা হইতে আলো বাহির হয় সকলেই দেখিয়াছেন। অল্প গরম করিলে লাল, বেশী গরম করিলে হরিদ্রাভ, আরও বেশী গরম করিলে উজ্জ্বল সাদা আলো বাহির হয়। উত্তপ্ত জিনিষটা যদি কালো হয়, যেমন অঙ্গার, তা হইলে এই সাদা আলো ত্রিশির কাচে বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে সূর্য্য-কিরণের লাল, কমলা, হরিদ্রা, সবুজ, নীল, বেগুনী সব কয়টা রশ্মিই দেখা যায়। প্রশ্ন উঠে, কত উত্তাপে কি রকম আলো বাহির হইবে, আর যে-যে রংএর আলো বাহির হইবে তার কোনটার তেজ কি রকম তা'র কোনও নিয়ম আছে কি? আছে। ম্যাক্সওয়েল-বোণ্টজমান প্রবর্ত্তিত Statistical Mechanicsএর সাহায্যে নিয়ম বাহির করা সম্ভব। অঙ্ক কষিয়া এমন সূত্র বাহিরও করা হইল যার সাহায্যে কত উত্তাপে কি রকম রংএর আলো কি পরিমাণে বাহির হইবে হিসাব করিয়া বলা যায়। কিন্তু

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাবের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণের ফল মেলে না। হিসাব মিলাইবার জন্য জার্ম্মাণীর অধ্যাপক Wien, ইংলণ্ডের অধ্যাপক Jeans ও Lord Rayleigh অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পরীক্ষার সঙ্গে কিছুতেই হিসাব খাপ খাওয়াইতে পারিলেন না। একদিক মিলাইতে গেলে আর একদিক মেলে না। Rayleigh-Jeansএর সূত্র লাল বা অতি-লাল রশ্মির বেলা মেলে, বেগুনীয়া বা অতি-বেগুনীয়াতে মেলে না। আবার Wienএর সূত্র অতি-বেগুনীয়াতে মেলে কিন্তু লালএর দিকে মেলে না। সূত্রের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফল প্রথম মিলাইলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক Max Planck। কিন্তু



ম্যাক্স প্লাঙ্ক

প্লাঙ্কের যে সব পরিকল্পনা লইয়া সূত্রের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফল মিলান হইল সে সব পরিকল্পনা নিউটনের নিয়মের একেবারে বিরোধী। প্লাঙ্ক বলিলেন, জড় বস্তু যেমন অবিচ্ছিন্ন নয়, জড় যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণায় অণু ও পরমাণুতে বিভক্ত, শক্তি বা action-ও তেমনি অবিচ্ছিন্ন নয়—শক্তিও তেমনি অবিভাজ্য কণায় বিভক্ত। এক টুকরা জড় যেমন অণু-পরমাণুর সমবায়ে গঠিত, এক টুকরা শক্তিও তেমনি কতকগুলা শক্তিকণা বা action quantum লইয়া গঠিত। পরমাণু যেমন জড়ের অবিভাজ্য কণা, শক্তিকণা বা action-quantum-ও তেমনি শক্তির অবিভাজ্য কণা। প্লাঙ্কের শক্তিকণা বা action-quantum আজ Planck constant নামে বৈজ্ঞানিকের কাছে সুপরিচিত। এই শক্তিকণাতে স্পন্দন আশ্রয় করিয়া থাকে —স্পন্দমান শক্তিকণাকে quantum বা তেজাণু বলা যাইতে পারে। কোনও জিনিষকে গরম করিলে তাহার অণু-পরমাণুর সঙ্গে এই তাপ-বিচ্ছুরিত তেজাণুগুলির আদান প্রদান চলিতে থাকে। এই কল্পনা ধরিয়া হিসাব করিলে যে সূত্র পাওয়া যায় সেই সূত্রের সঙ্গে উত্তপ্ত বস্তু হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মির রংএর সঙ্গে তাপের সম্বন্ধ লাল বা অতি-লাল হইতে বেগুনীয়া বা অতি-বেগুনীয়া পর্য্যন্ত বরাবরই মেলে। প্লাঙ্কের এই নূতন মতবাদ, Quantum theory, বৈজ্ঞানিক জগতে যুগান্তর আনিয়াছে। জড় জগতের অনেক ব্যাপার যা আগে আমাদের কাছে প্রহেলিকার মত ছিল তা' এখন অনেকটা বোঝা যাইতেছে। প্লাঙ্ক তাঁহার Quantum মতবাদ প্রথম প্রচার করেন ১৯০০ ও ১৯০১ সালে। কিন্তু এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে প্রায় বিশ বৎসর লাগিয়াছিল। ১৯২০ সালে প্লাঙ্ক তাঁহার এই গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্লাঙ্কের মতবাদ পরমাণুর গঠনে লাগাইয়া রাদারফোর্ড ও বর দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া বিদ্যুতিনের সমবায়ে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুগুলি একের পর একটি করিয়া গড়িয়া ওঠে। রাসায়নিকের কাছে Mendeleefএর periodic table এতদিন একটা রহস্যের ব্যাপার ছিল। মৌলিক বস্তু বা elementগুলিকে তাহাদের পরমাণুর ওজনের ক্রমবর্দ্ধিত হারে পর পর সাজাইলে দেখা যায় যে, পরমাণুর ওজন যেমন বাড়িতেছে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রাসায়নিক গুণও বদলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু বরাবর এমন বদলায় না। কতকদূর বদলাইয়া মৌলিক পদার্থটা আবার

আগের একটা কম ওজনের মৌলিক পদার্থের মত গুণ পায়। কেন এমন হয় তার কারণ এতদিন জানা ছিল না। কিন্তু এখন প্লাঙ্কের মতবাদ প্রয়োগে অণুপরমাণুর গঠনের সঙ্গে তাহাদের রাসায়নিক গুণের সম্বন্ধ আমরা এতদূর



মেণ্ডেলিফ্

জানিতে পারিয়াছি যে, মেণ্ডেলিফের periodic tableএর রহস্যের অনেকটা নিরাকরণ হইয়াছে। আবার বর্ণ বিশ্লেষণ শাস্ত্রের বা Spectroscopyর অসংখ্য পর্য্যবেক্ষণ এতদিন স্তূপীকৃত হইয়া ছিল। কোনও একটা ধাতুর আণবিক গঠনের সঙ্গে তাহা হইতে বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণ-ছত্রের কি যে সম্বন্ধ তাহা খুঁজিয়াই পাওয়া যাইত না; quantum theoryতে এই বর্ণ-ছত্রের রেখাগুলির পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ অতি সুন্দর ভাবে বোঝা যায়।

বর ও রাদারফোর্ডের মতে এক একটি পরমাণু এক একটি ছোটখাট সৌর জগতের মত। কেন্দ্রে কয়েকটা ধন তড়িদণু বা proton ও কয়েকটা electron বা বিদ্যুতিন মিলিয়া পিণ্ডাকারে আছে। এইটাকে পরমাণুর কেন্দ্রীন বা nucleus বলা যাইতে পারে। কেন্দ্রীনের চতুর্দ্দিকে কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যুতিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন্ কক্ষায় কয়টা বিদ্যুতিন ঘুরিবে তাহা quantum মতবাদ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কোন একটা পরমাণু যদি বাহির হইতে শক্তি দ্বারা আহত হয় তা হইলে বাহিরের দিকের কক্ষার ইলেক্ট্রনটা লাফাইয়া আরও দূরে একটা কক্ষাতে চলিয়া যাইবে। সেই কক্ষা হইতে ইলেক্ট্রন আবার যখন আগের কক্ষায় ফিরিয়া আসে তখন পরমাণু হইতে আলো বিকীর্ণ হয়। পদার্থ বিজ্ঞান ক্লাসে সকলেই দেখিয়াছেন যে, একটা প্রায়-বায়ু-শূন্য কাচ নলের মধ্যে তড়িৎ চালাইলে তাহা হইতে বিবিধ রঙের আলো বাহির হয়। তড়িৎ শক্তির উত্তেজনায় কাচ নলের ভিতরের অণুপরমাণুর বিদ্যুতিন গুলি কক্ষা হইতে কক্ষান্তরে লাফালাফি করে। কেন্দ্রীন হইতে দূরের কক্ষায় যাওয়ার সময় বাহির হইতে শক্তি আহরণ করে ও কেন্দ্রীনের কাছের কক্ষায় ফিরিবার সময় সেই শক্তি আলো রূপে বিকীরণ করে। কোন্ কক্ষা হইতে কোন্ কক্ষায় যাইবার সময় কি রঙের আলো বিকীরণ হইবে তা' quantum মতবাদ অনুসারে অতি সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়।

প্লাঙ্কের তেজাণুতে জড়ের ধর্ম্ম জড়ত্ব বা inertia ও mass বা গুরুত্ব আছে। তেজাণুর জড়ত্বের একটা সুন্দর পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আমেরিকার অধ্যাপক Compton দিয়াছেন। সকলেই দেখিয়াছি যে একটা বিলিয়ার্ড বল যদি আর একটা বিলিয়ার্ড বলে আঘাত করে তা হইলে সংঘর্ষের ফলে বল দুইটা বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন দিকে যায়। বল দুইটার ওজন ও কি ভাবে কোন দিক দিয়া কত জোরে আঘাত করিল জানা থাকিলে সংঘর্ষের ফলে কোন বলটা কোন দিকে কত বেগে যাইবে তা হিসাব করিয়া বলা যায়। Compton দেখাইয়াছেন যে, তেজ কণার সঙ্গে বিদ্যুতিনের ধাক্কা লাগিলে ঠিক উপরোক্ত দুইটা বিলিয়ার্ড বলে ধাক্কা লাগার মত ব্যাপার হয়। তেজ কণা ঠিকরাইয়া একদিকে যায় আর তেজ কণার কতকটা শক্তি বিদ্যুতিন লইয়া আর একদিকে ছুটিয়া যায়। Compton এই পরীক্ষা সাধন করিয়া ১৯২৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কিছু আগে বিজ্ঞানাকাশে যে দ্বিতীয় মেঘখণ্ডের কথা বলিয়াছিলাম সেটি কি তাহা এইবার বুঝিতে পারা যাইবে। Quantum মতবাদ অনুসারে তাপ ও আলোক যে এই রকম তেজকণার সমষ্টিরূপে কাজ করে ইহা দেখিলে মনে হয় যে, আমরা যেন আবার নিউটনের corpuscular theory বা কণিকা মতবাদে ফিরিয়া আসিতেছি। মনে হয় যে, হুইগেন্স ও ইয়ংএর এত



হুইগেন্স

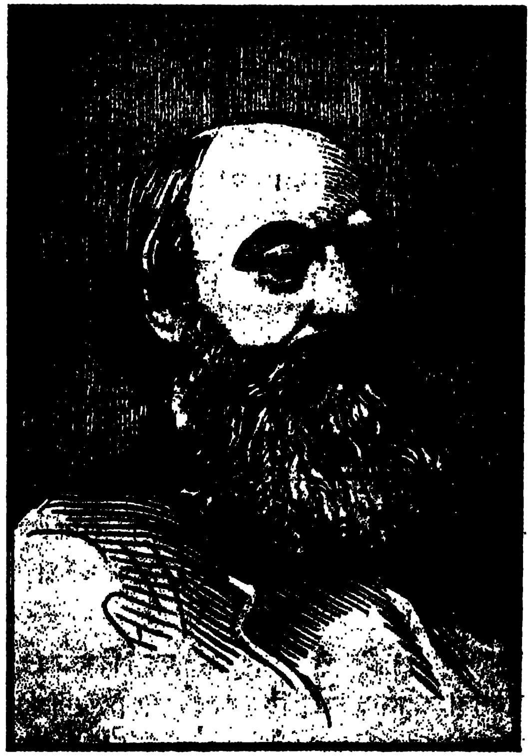
সাধের আলোক-তরঙ্গ মতবাদ বুঝিবা ভুল—আলো তা হইলে ইথরে তরঙ্গ নয়। কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিলে তরঙ্গ মতবাদ ভুল বলা যায় না। আলোয় আলোয় মিলিয়া কাটাকাটি করিয়া যখন অন্ধকার হয়, যাহাকে আমরা interference ব্যাপার বলি, অথবা ছোট ছিদ্রপথে আলো চলিবার সময় আলো যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে যাহাকে আমরা diffraction বলি—এই সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা তরঙ্গ মতবাদ ভিন্ন পাওয়া যায় না—তেজাণুবাদ বা quantum theory এখানে হার মানে। এক কথায় বলা যায় যে, তরঙ্গ মতবাদ interference ও diffraction-এর ব্যাখ্যা দিতে পারে কিন্তু উত্তপ্ত জিনিষ হইতে লাল নীল আলো কেন বাহির হয় তা' বলিতে পারে না; আবার তেজাণুবাদ interference ও diffractionএর কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না বটে কিন্তু উত্তপ্ত জিনিষ হইতে বিচ্ছুরিত বর্ণছত্র বা বর্ণ-রেখার নিদান বলিতে পারে। দুইটা মতবাদের দুইটা বিভিন্ন কার্য্য-ক্ষেত্র। এটার কাজ ওটা করিতে পারে না—ওটার কাজ এটা করিতে পারে না। একবার বল আলোকে তরঙ্গ মাত্র, তরঙ্গের শক্তি যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়, এই অনুমানে অনেকগুলা ব্যাপারের ব্যাখ্যা মিলিবে। আবার বল আলোক-শক্তির কণামাত্র—যত খুসী ইচ্ছা ভাগ করা চলে না—একটা অবিভাজ্য কণায় আসিয়া পৌঁছাইবে —এই রকম অনুমানে আবার অপর কয়েকটা ব্যাপারের ব্যাখ্যা মিলিবে। কোন অনুমানটা, কোন মতবাদটা ঠিক? পদার্থ বিদ্‌গণ আজকাল এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া দ্বিধায় পড়িয়াছেন। সমস্যা পূরণের জন্য নানাদিক্ দিয়া চেষ্টা চলিতেছে। ঠিক যে মীমাংসায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা বলা যায় না, কিন্তু যে রকম সবেগ তদন্ত চলিতেছে তাহাতে মীমাংসা শীঘ্রই হইবে এইরূপ আশা করা যায়। মীমাংসা ও সামঞ্জস্য কোন পথে পাওয়া যাইবে তাহার আভাস দিয়াছেন ফ্রান্সে দ্য ব্রগ্‌লি ও জার্ম্মাণীতে শ্রডিংগার। এই দুইজন মনীষী মীমাংসার কথা কি বলেন তাহা ইঙ্গিতে জানাইতেছি। ইঁহাদের কথা বুঝাইতে হইলে একটু বিস্তারিত ভাবে বলা দরকার।

একটা জড়কণা যদি এক জায়গা হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া আর এক জায়গায় যায় তবে সেটা কোন পথ দিয়া যাইবে তাহা নিউটনের নিয়মে হিসাব করিয়া বলা যায়। যেমন ধরুন, একটা ক্রিকেট বল যদি আকাশে ছুঁড়িয়া দিই তা' হইলে সেটা ধনুকের মত কোন বাঁকা পথে যাইয়া আবার মাটিতে পড়ে তাহা গতিবিজ্ঞান বা dynamicsএর ছাত্র অনায়াসে অঙ্ক কষিয়া বলিতে পারে। কোন্ পথে ক্রিকেট বল যাইবে তাহা বাহির করার আর একটা সুন্দর নিয়ম

আছে। নিয়মটা অবশ্য নিউটনের নিয়ম হইতেই উদ্ভূত, কিন্তু নিয়মটা এত সরল যে ইহার প্রয়োগে গতিশাস্ত্রের অনেক অঙ্ক নিউটনের নিয়মের চাইতেও সহজে মীমাংসা করা যায়। নিয়মটির নাম হইতেছে **Lagrange's Principle of least action**।

আলোক বিজ্ঞানেও এই ধরণের একটা নিয়ম অনেকদিন হইতে জানা ছিল। আলো একজায়গা হইতে আর এক জায়গাতে যাইবার সময় পথে যদি জল বা কাচের ভিতর দিয়া বা আয়না হইতে প্রতিফলিত হইয়া যায়, তবে কোন পথে কোন দিকে কতটুকু বাঁকিয়া চুরিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিবে তাহা সাধারণতঃ পরাগ্‌বর্ত্তন ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তনের নিয়ম (Laws of reflection and refraction) হইতে বলা যায়। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটা নিয়ম আছে যার সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়া আলোর গতি-ভঙ্গী বলা যায়। এই নিয়মের নাম হইতেছে Fermat's Principle of least time। এক কথায় জড়কণার গতির বেলা যেমন Principle of least action আছে, আলোকের গতির বেলা ঠিক সেই রকম Principle of least time আছে। উভয়ের গতির মধ্যে এই একটা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিলটা অনেকদিন আগে হ্যামিল্টন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মিলের তাৎপর্য্য ও তাহার সাহায্যে প্লাঙ্কীয় মতবাদ ও নিউটনীয় মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনার চেষ্টা প্রথম করেন ফ্রান্সে দ্য ব্রগ্‌লি। দ্য ব্রগ্‌লি তাঁর এই গবেষণার জন্য ১৯২৯ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দ্য ব্রগ্‌লি বলেন আলো যেমন তরঙ্গের সমষ্টি জড়ও ঠিক তেমনি তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। আমরা যখন আলোর বেলা ফার্মটের নিয়ম প্রয়োগ করি তখন আমরা ধরিয়া লই যে, আলো সোজা পথে চলে। বাঁকিবার সময় শুধু পরাগ্‌বর্ত্তন বা reflection ও তির্য্যগ্‌বর্ত্তন বা refractionএর নিয়মটুকু মানিয়া চলে। Diffraction বা সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে চলার সময় আলোর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া, সেটা ফার্মটের মোটা নিয়মে বাঁধা পড়ে না। স্থূল চক্ষে স্থূলভাবে আলোর গতি-ভঙ্গী যখন দেখি তখনই শুধু ফার্মটের least time নিয়ম প্রয়োগ করিতে পারি। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে diffraction ব্যাপার বুঝিতে হইলে ফার্মটের নিয়ম অচল হয়, তখন তরঙ্গ মতবাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। তেমনি আমরা যখন জড়কণাতে নিউটনীয় নিয়ম বা লাগ্রাঞ্জের least action নিয়ম প্রয়োগ



জুল

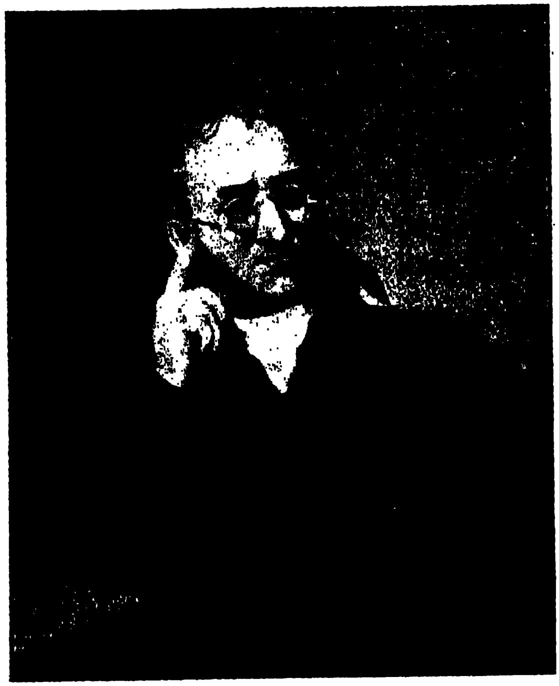
জুলাই সর্ব্বপ্রথম বিভিন্ন পরিমাণ শক্তির অপচয়ে বিভিন্ন পরিমাণ উত্তাপের সৃষ্টির অনুপাত সপ্রমাণ করেন। এই অনুপাতকে Joule's Equivalent বলা হয়।

করিতে যাই তখন সেটা শুধু জড়ের বড় বড় টুকরার প্রতি খাটে। আসলে জড় আলোর মত তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। স্থূলভাবে স্থূল জড় দেখিলে এই তরঙ্গের প্রকৃতি ধরা পড়ে না। সূক্ষ্মভাবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ছোট জড়কণা অণু পরমাণু বা ইলেক্ট্রনের বেলা জড়ের এই তরঙ্গরূপ ধরা পড়ে—তখন আর নিউটনীয় নিয়ম বা লাগ্রাঞ্জের Principleএ ব্যাখ্যা চলে না—তখন দ্য ব্রগলির তরঙ্গ পরিকল্পনা করিতে হয়। জর্ম্মানীতে অধ্যাপক শ্রডিংগার দ্য ব্রগলির এই নূতন তরঙ্গ

মতবাদের অনেক প্রসার করিয়াছেন। এই নূতন মতবাদে নিউটনীয় ও প্লাঙ্কীয় মতবাদের মধ্যে যে বিরোধ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার নিরাকরণের আশা দেখা যাইতেছে। বর্ণছত্রে রেখা বিন্যাসের নিয়ম, উত্তপ্ত জিনিষ হইতে বিচ্ছুরিত রশ্মি, এই সব ব্যাপার যা এতদিন নিউটনীয় নিয়মে বাঁধা যায় নাই সেই গুলিকে আবার এই নিয়মে বাঁধার সম্ভাবনা দেখা যায়। ইলেক্ট্রন যে তরঙ্গের সমষ্টি হইতে পারে তার একটা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। আলোর তরঙ্গ ছোট ছিদ্রপথে চলার সময় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—যদি ছিদ্রটার আয়তন তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি হয়। ইলেক্ট্রনের তরঙ্গগুলা আলোর তরঙ্গের চাইতে অনেক ছোট—কিন্তু সেই আকারের ছোট ছিদ্রও পাওয়া যায়। কোনও জিনিষের অণুপরমাণুর ফাঁকে ফাঁকে যে ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রপথে যদি ইলেক্ট্রন চালান যায় তবে দেখিবে ইলেক্ট্রন ঠিক তরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে অধ্যাপক জি, পি, টমসন সম্প্রতি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন।

আমরা নিউটনকেই আধুনিক জড় বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার আগে ইটালির গ্যালিলিওর নাম করা উচিৎ ছিল। গ্যালিলিও জড়ের গতি ও বল সম্বন্ধে কয়েকটা সূত্র বাহির করিয়া যান। কিন্তু গ্যালিলিওর সূত্রগুলির চাইতে নিউটনের সূত্র বেশি সাধারণ ও বেশি ব্যাপক। তবে এ কথাও ঠিক যে, গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত সূত্র নিউটনের সূত্র আবিষ্কারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত জড় বিজ্ঞান কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল দেখা যাক্। আমাদের বাহিরে একটা বাহ্য জড় জগৎ আছে যা আমাদের কাছে রূপরসগন্ধস্পর্শ সমন্বিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জড় ও শক্তির সমবায়ে এই জগৎ গঠিত। জড়ের অবস্থান বা গতি বুঝিবার জন্য আমরা দেশ ও কালের কল্পনা করি। এতদিন আমরা দেশ ও কালকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখিয়া আসিতেছিলাম। তাহার ফলে নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়মগুলিতে এক-আধটুকু খুঁত দেখা যাইতেছিল। দেশ ও কালকে এক করিয়া দেখিলে এই খুঁতটুকু চলিয়া যায়। দেশ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ সমন্বিত মাত্র



জে, ড্যাল্টন্
আণবিক মতবাদ ইনিই প্রথম প্রচার করেন।

ত্রিধা বিভক্ত three dimensional নয়। কালকে লইয়া দেশ চতুর্দ্ধা বিভক্ত। আমরা সাধারণতঃ উচ্চ নিম্ন, দক্ষিণ বাম ও সম্মুখ পশ্চাত এই তিনটা দিক কল্পনা করি। কিন্তু তাহাতে আর চলিবেনা। ঐ তিনদিকের সঙ্গে কাল-কেও মিলাইয়া চারিটা দিক কল্পনা করিতে হইবে। এই কল্পনা অনুসারে হিসাব করিলে আমরা জড়ের বল, গতি ও গুরুত্বের সঙ্গে যে সব সম্বন্ধ বা নিয়ম পাই সেই নিয়মগুলা নিউটনের নিয়মের চাইতেও বেশী ব্যাপক, বেশী সাধারণ। নিউটনের নিয়ম এই বৃহৎ ব্যাপক নিয়মের অন্তর্গত। নিউটনের নিয়মকে ভুল বলা যায় না। নিউটনের নিয়ম

আইনষ্টাইনের আবিষ্কৃত আরও একটা বৃহৎ নিয়মের একটা অংশ বা special case মাত্র।

জড় কি? জড়ের স্বরূপ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় জড় অতিক্ষুদ্র অবিভাজ্য অণুপরমাণুর মিলনে গঠিত হইয়াছে। এই অণুপরমাণু কতকগুলা ধনাত্মক তড়িদণু বা Proton ও কতকগুলা ঋণাত্মক তড়িদণু, বিদ্যুতিন বা Electron-এর সমবায়ে গঠিত। এক একটা পরমাণু এক একটা সৌরজগতের মত। সূর্য্যের বদলে পরমাণুর মাঝে প্রোটন ও বিদ্যুতিনের একটা পিণ্ড, কেন্দ্রীন বা nucleus আছে। এই nucleus-এর চারিধারে কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যুতিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন কক্ষা কোথায় অবস্থিত, কোন কক্ষায় কয়টা বিদ্যুতিন ঘুরিবে তা প্লাঙ্কের quantum বা তেজকণা মতবাদ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

জড়ের যেমন অবিভাজ্য কণা পরমাণু, শক্তির তেমনি অবিভাজ্য কণা action quantum বা শক্তিকণা। এক টুকরা quantum বা তেজে জড়ের ধর্ম্ম জড়ত্ব বা inertia দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটা জড়কণার সংঘর্ষ যে নিয়মে হয়—যে নিয়মের ফলে জড় কণা দুইটা দুইদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া হইয়া যায়—ঠিক সেই নিয়মে বিদ্যুতিন ও তেজাণুর মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া শক্তির আদান প্রদান হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বিদ্যুতিন ও তেজাণু আসলে একই জিনিষ। উভয়ই আকাশে কম্পন বা তরঙ্গের সমষ্টি মাত্র। অর্থাৎ জড়জগতে শক্তি যেমন কম্পন-প্রসূত, তেমনি জড়ের উপকরণ proton ও বিদ্যুতিনও তেমনি কম্পন-প্রসূত। দুইটা জিনিষ কিন্তু এখনও এই সব গবেষণাতে ধরা দেয় নাই। আগেই বলিয়াছি যে, জড়ের অন্তিম কণা পরমাণু প্রোটন ও বিদ্যুতিন লইয়া গঠিত। প্রোটন ও বিদ্যুতিনের মধ্যে গুরুত্ব কিন্তু আকাশ পাতাল তফাৎ। প্রোটনের ওজন বিদ্যুতিনের চাইতে প্রায় দুইহাজার গুণ বেশী। জড়ের জড়ত্ব বা inertia আসল ঐ প্রোটনের মধ্যেই নিহিত। প্রোটনের এই অত্যধিক জড়ত্বের কারণ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আরও একটা জিনিষ এখনও প্রহেলিকাই রহিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ—আপেল ফল গাছ হইতে ভূমিতে কিসের জন্য পড়ে তা' এখনও আধুনিকতম আবিষ্কৃত নিয়মে ধরা পড়ে নাই।

ফলে দাঁড়াইল যে, আমার সম্মুখে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইট, কাঠ, লোহা, পাথর সব কিছু বিদ্যুতিন ও প্রোটনের সমবায়ে তৈয়ারী—অথবা আরও আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, কতকগুলা স্পন্দনের সমষ্টি মাত্র। আমার শরীরের অস্থি, মাংস, মেদ তাও শুধু আকাশে স্পন্দন মাত্র—আমার মস্তিষ্কও সেই স্পন্দনে গঠিত। অর্থাৎ কতকগুলা স্পন্দনের সমষ্টি, স্পন্দনময় এই যে আমি, সেই আমি, জড় জগতের মূল যে স্পন্দন তাহারই স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। এ একটা প্রহেলিকা। এ প্রহেলিকার নিরাকরণ করিতে গেলে আমাদিগকে জড়বিজ্ঞানের সীমান্তের বাহিরে আসিতে হইবে—সুতরাং আমি এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

বিচারপতি

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

৩

পরাহ্নে ও অপরাহ্নে মেশামেশি করিয়া আছে। সূর্য্যালোকিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল দিবস বিশ্রামের শান্তিতে নিমগ্ন। পথ ঘাট প্রায় জনহীন, গৃহস্থগৃহ নিস্তব্ধপ্রায়, গাছের মধ্যে পাখীরা কেহ শিষ দিতেছে, কেহ ইচ্ছাসুখে নিমীলিত নেত্রে বিশ্রাম উপভোগ করিতেছে, কেহ শাবককে চঞ্চু দ্বারা আহার করাইতেছে। সুদেব ভট্টের গৃহের পশ্চাতের পুষ্করিণী শ্বেত ও রক্ত কমলদলে বিকশিত হইয়া আছে, হংসমিথুন উহাতে ক্রীড়া করিতেছে, একটা মাছরাঙ্গা একটা নীচু ডালের উপর উবুড় হইয়া জলের মধ্যে মাছের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আছে। একধারে গোয়ালঘর, সামনে দড়ি দিয়া বাঁধা বুধি এবং কীয়োদা নামী পরিপুষ্টাঙ্গী গাভীদ্বয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে খৈল ও বিচালী দিয়া মাখা জাব খাইতেছে, একটা কাঠবিড়ালী উহাদের মাথার উপরকার নিমগাছের ডাল দিয়া তড়বড় করিয়া চলিয়া গেল।

ঘাটের রাণার ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া শ্রীলতা গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল। পিছন হইতে কে তাহার চোক চাপিয়া ধরিল।

শ্রীর মুখখানা মুহূর্ত্তে ঐ পদ্মের মতই বিকশিত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে সে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল,—"কি কর, ছেড়ে দাও। আমি যেন এখনও সেই ছেলেমানুষই আছি!"

রাজ্যপাল মুহূর্ত্তে তার চোক ছাড়িয়া দিয়া টপ করিয়া সেই ঘাসের বনেই তার পাশে বসিয়া পড়িলেন। ঠোঁট টিপিয়া হাসি চাপিয়া বলিলেন,—"ওঃ! তুমি বুঝি আর এখন ছেলেমানুষটী নেই?"

শ্রীলতা অন্য দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "না।"

তার মনের আনন্দ-ছায়া সে মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিল।

রাজ্যপাল হাসিয়া কহিলেন, "নাই থাকগে, আমার মালা তো দাও! কই, কোথায় আমার সাদা পদ্মর মালা?"

শ্রীলতার মুখে ঈষৎ আশঙ্কার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সে বিব্রত নতমুখে কহিল,—

"সে হয় নি।"

যুবরাজ কহিলেন "কেন?"

শ্রী কহিল, "হলোনা, আর কখন হবেও না।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

শ্রী উত্তর দিল, "মা বারণ করেচে।"

যুবরাজ পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "কেন?"

শ্রী বলিল, "সে অনেক কথা, সে সব বলা যায় না।"

এবার কুমার ঈষৎ দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "সব না বলা যাক্ দু একটাও তো তার বলা যায়। বল, কেন? না, তোমায় বলতেই হবে।"

স্বরে রাজকীয় অনুজ্ঞায় অলঙ্ঘনীয়তা প্রকাশ পাইল। শ্রীলতা চকিত নেত্রে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তার গলায় এমন গম্ভীর স্বর এর আগে কখন শুনে নাই, মুখেও একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের আভাস পাইল। ঈষৎ ভীত ও বিপন্ন ভাবে সে একটুখানি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

যুবরাজ তার হাত ধরিলেন। "বল, কেন? কেন আমার জন্য মালা গাঁথতে তোমার মা বারণ করেচেন! কি আমি তাঁর কাছে দোষ করেছি যে তিনি বারণ করলেন? বল, শীঘ্র বল।"

শ্রীলতা নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "মা বল্লে আমরা

এখন আর ছেলেমানুষ নেই, আবার এখন তোমায় মালা গেঁথে দেওয়া ভাল দেখায় না।' লোকে নিন্দে করবে, আর তাতে ধর্মের কাছেও অপরাধী হতে হবে, তাই বারণ করে দিলে।"

রাজ্যপাল শ্রীলতার হাত ছাড়িয়া দিয়া স্থির চক্ষে তার অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন ঈষৎ ম্লান মুখের দিকে চাহিল। একটুক্ষণ নীরবে তাহাকে দেখিয়া ডাকিল,

"শ্রীলতা!"

শ্রী নতদৃষ্টি তুলিয়া চাহিল, তার সেই নীল সমুদ্রের মত বিশাল গভীর আয়ত সুন্দর চোকদুটী ঈষৎ সজল।

যুবরাজ কহিল, "শ্রীলতা, তুমি তখনইত তো তাঁকে জানাতে পারতে যে, মালা যা দেবার সে দেওয়া হয়েই গ্যাছে। এখন আর দেওয়া না দেওয়ায় বিশেষ কিছুই আসে যায় না।"

শ্রীলতার মুখে বিপন্নতার করুণ আভা ফুটিয়া উঠিল। ভীতভাবে সে বারেক কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া পুনশ্চ অন্য দিকে চাহিয়া বলিল,

"না, না, ওসব কথা বলো না! মা বলেছে, আমি গরীবের মেয়ে তুমি রাজাধিরাজ পুত্র—"

শ্রীলতার গলা ধরিয়া আসিল। সে কথা শেষ না করিয়াই তার উদগত অশ্রু সম্বরণ চেষ্টায় মুখ ফিরাইয়া পাশ কাটাইয়া বসিল।

রাজ্যপাল সাগ্রহে কহিলেন, "তাতে কি হয়েচে? আমার মাও সামান্য ঘরের মেয়ে, রাজাধিরাজ পুত্রের ঘরণী হয়ে ছিলেন তো!"

শ্রীলতা অশ্রু-স্পন্দিত অস্পষ্ট গাঢ় স্বরে উত্তর করিল, "সে অন্য রকম! আমি মাকে সেকথা বলেছিলুম। মা বল্লে সে অন্য কথা! আমি ব্রাহ্মণ কন্যা, তুমি যে ক্ষত্রিয়।"

"ওঃ! তা হলে সত্যসত্যই অনেক কথাই তোমাকে তোমার মার কাছে শুনতে হয়েচে দেখছি যে! তা সে যাই হোক, যতবড় মান্য-গণ্য-বদান্য-ব্রাহ্মণাবুক্তাই তুমি হয়ে ওঠনা কেন, তবুও তো আর তোমার আমার গলায় মালা দেওয়ার ঘটনাকে তুমি উল্টে দিতে পারবে না! এতই যদি নিজেকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে জেনে থেকেছ, তা হলে মালা দিলে কেন? আমি তো তোমার পায়ে ধ'রে চাইতে আসিনি!"

এই বিদ্রূপের আঘাতে শ্রীলতা রাগিয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিল,—

"সে আমি তোমায় দিতেও যাইনি,—"

যুবরাজ সবিদ্রূপ হাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "তাই নাকি? আমায় নয়? তবে আর কাকে গো? এর মধ্যে কোন শ্রীল শ্রীযুক্ত ব্রহ্মসূত্রশিখাধারী মান্যবর গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন? উৎকলিঙ্গের 'কড়ছি,' 'যাউছি' তারা, নাঃ, তাই বা কই কে ছিল? যাকে স্বয়ম্বরের মালা পরাতে গিয়ে দুর্ভাগা আমাকেই পরিয়ে ফেল্লে!"

শ্রীলতা এবার সত্যসত্যই রাগিল। তার বিষাদিত সজল নেত্র ক্রুদ্ধতেজে মেঘমুক্ত সূর্য্যের মতই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বিদ্যুৎ-শিখার মতই দীপ্তবেগে ফিরিয়া বসিয়া সে রোষতীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—

"আমি সে মালা মহারাজাধিরাজের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেম। যথার্থতঃ কলিঙ্গবিজয়ী তিনিই তো,—তাঁর তুলনায় তুমি কে?"

রাজ্যপালের ব্যঙ্গহাস্যতরা উজ্জ্বল চক্ষুতারক দীপ্ততর হইয়া উঠিল। তিনিও তৎক্ষণাৎ আহত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"সাবধান শ্রীলতা, মিথ্যাকথা বলোনা!"

শ্রী তার মরালগ্রীবা বাঁকাইয়া তীব্রনেত্রে চাহিল,—

"কি? বলি যদি তো আমায় মারবে নাকি?"

যুবরাজ এক নিমেষের মধ্যেই বিপুল বলে আত্মসম্বরণ করিয়া ফেলিলেন। তাঁর কণ্ঠ হইতে একঝলক অগ্নিস্রাবনের মতই তীব্র হাস্য নিঃসৃত হইয়া গেল। পুনশ্চ সেইরূপ আহত ব্যঙ্গোক্তিতেই উত্তর করিলেন,—

"ভয় নেই, পূজনীয়া শ্রীমতী ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণি! রাজ্যপাল যত ছোটই হোক, তবু নেহাৎ হাড়ি, ডোম নয়, অসভ্য বন্য বর্ব্বর নয়,—ক্ষত্রিয়সন্তান নারীর গায়ে হাত তোলেনা।"

শ্রীলতা এই মর্ম্মজ্বালার অর্থ যে না বুঝিয়াছিল তা নয়, তবুও নিরপরাধে আঘাত পাইয়া তারও আহতচিত্ত ঠিক

তখন সুস্থ ছিলনা, সেও তাই আঘাতকারীকে ক্ষমা করিতে পারিল না। রোষ করিয়া বলিল,—

"না, ক্ষত্রিয়কে হাড়ি ডোমের সামিল করিনা, তবে ব্রাহ্মণকে তুচ্ছ করতে শিক্ষাটা কি কলিঙ্গ দেশের রণস্থলে হয়ে এসেছে? এর আগে বর্ণের প্রধান ব্রাহ্মণ এ জ্ঞানটা অন্ততঃ মশাইএর ছিল, এবং ছিল সেটা স্বচক্ষেই দেখে এসেছি!"

রাজ্যপালের মুখ এবার প্রচণ্ড কোপে তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। কঠোরনেত্রে চাহিয়া কঠিন হাস্যের সহিত ঈষদ্রুক্ষকণ্ঠেই বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ ভারী যে ব্রাহ্মণ্যের গুমোর হয়েচে দেখচি! থাক্‌ থাক, আর বামনাই ঝাড়তে হবেনা! ঢের হয়েচে!"

শ্রীলতা উঁহার অন্তর্জ্বালার অসহায় ক্রোধ দেখিয়া একদিকে দুঃখ বোধ করিলেও আর এক দিক দিয়া একটু তৃপ্ত হইল। মার কাছে উপদেশ পাওয়ার পর হইতে তার মনের মধ্যেও একটা জ্বালা ধরিয়াই উঠিয়া ছিল। সেই আগুনের খানিকটা কোথাও ছড়াইয়া দিবার জন্য সেও আজ সকাল হইতে উন্মুখ হইয়া ছিল। সংসারের কাজে আজ তার মন ছিলনা, স্নান হয় নাই, আহার নামে মাত্র, তারপর সারা মধ্যাহ্ন ওই অস্পর্শনীয় শ্বেত পদ্মের দিকেই পদ্মপলাশ সদৃশ দুটি জলভরা কালো চোখকে মেলিয়া দিয়া সে অন্তর্গূঢ় বেদনায় অগ্নিতপ্ত পুটপাকের মতই নিঃশব্দে দগ্ধ হইতেছিল। এতক্ষণে নিজের বুকের আগুন অন্য শিখার মুখে ধরাইয়া দিয়া সে যেন ঈষৎ শান্ত বোধ করিল, তাই এ কথায় তার ক্রোধ আর বেশি উদ্দীপ্ত হইল না, বরং ঈষৎ শান্ত ভাবাবলম্বনপূর্ব্বক কিছু নম্রস্বরে উত্তর করিল—

"কেন হবেনা? তোমাদের কত কি আছে, আমাদের শুধু এই প্রাধান্যের গৌরবটুকু মাত্র, এ'ও আমাদের থাকে সেটুকুও তোমাদের সহ্য হয় না?"

যুবরাজ তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "জগৎ থাকে কথা! ব্রাহ্মণ কিসে ক্ষত্রিয়ের চেয়ে এতই বড়? কেন ক্ষত্রিয়ের ছেলে ব্রাহ্মণকন্যা বিয়ে করতে পারবে না? সেকালেও তার বাধা ছিলনা।"

এই বলিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি স্থানত্যাগ করিলেন। চকিতচকিত হরিণীর মতই সেই শব্দভেদী শরাঘাতে সমস্ত শরীর মনে আহত হইয়া উঠিয়া শ্রীলতা বিস্ফারিত ব্যাকুল চক্ষে তাঁহার বলদর্পিত দৃপ্ত গতিশীল মূর্ত্তির দিকে চাহিল। তার বুক ভরিয়া বাজিয়া উঠিল, "কেন ব্রাহ্মণকন্যাকে ক্ষত্রিয়ের ছেলে বিয়ে করবে না!"

৪

সুদেব ভট্ট মহাভাষ্যের টীকা তালপত্রের পুঁথিতে অলক্তকের রাগ দ্বারা নিপুণভাবে লিখিতেছিলেন, যুবরাজ রাজ্যপাল দ্বারের বাহিরে পাদুকা রাখিয়া নগ্নপদে নতশিরে গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক আচার্য্যের পাদবন্দনা করিয়া চরণধূলি মাথায় লইলেন।

সুদেব রাজকীয় প্রিয় ছাত্রকে অতিশয় স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্যস্তস্বরে ডাকিলেন,

"শ্রীলতা! ওরে, যুবরাজকে একটা আসন দিয়ে যাতো মা!"

উত্তর বা শ্রীলতা কেহই আসিল না। শ্রীলতা উত্তর দিবার অবস্থায় অথবা সান্নিধ্যে ছিলই না, কাজেই সে পিতৃ-আহ্বান শুনিতে পায় নাই। যুবরাজ সে কথা জানিত, তাই সে সবিনয়ে উত্তর করিল,—

"ব্যস্ত হবেন না, আমি নিজেই নিচ্চি,—" এই বলিয়া তাহারই জন্য গৃহপ্রান্তে রক্ষিত একখানি উত্তম কম্বলাসন উঠাইয়া আনিয়া আচার্য্যের পদপ্রান্তে উহা বিছাইয়া সসম্ভ্রমে তাহাতে বসিয়া পড়িল। সুদেব চরণ সরাইয়া লইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলেন।

"কলিঙ্গ-বিজয়ের গল্প শুনছিলাম; অনেকখানিই সঙ্কটাবস্থা হ'তে উদ্ধার হ'তে হয়েচে; শুনলাম তোমারই কূট কৌশলে এ যুদ্ধের জয়সাধন হয়েছে। মহারাজাধিরাজ স্বয়ং প্রচার করেছেন যে, এ যুদ্ধের বিজয়-গৌরব প্রধানতঃ তোমারই প্রাপ্য। শুনে অত্যন্ত সুখী হয়েছি যুবরাজ!"

রাজ্যপাল সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, "সমস্তই আপনাদের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে।"

আচার্য্য সপ্রশংস প্রফুল্লকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "তোমার

মত ছাত্রের শিক্ষক হ'তে পাওয়ায় আমি নিজেকেও ধন্য বোধ করছি রাজকুমার! এমন বিদ্যা বিনয় বীরত্ব একাধারে এক তোমার পিতৃদেবেই দেখতে পাওয়া যায়। এ যেন মহাকবি কালিদাসের অমরলেখনী নিঃসৃত সেই অমূল্য শ্লোকরত্নকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি যেমন রঘুপুত্র অজ সম্বন্ধে বলেছেন—

"রূপং তদোজস্বি তদেববীর্য্যং
তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বম্।
ন কারণাৎ স্বাদ্ বিভিদেকুমারঃ
প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ॥"

আমরাও ঠিক সেই কথাই এখানে বলতে পারি, দীপ হ'তে দীপান্তরে আলোক শিখা প্রজ্বলিত হলে যা হয়, মহারাজাধিরাজ এবং তোমার মধ্যেও সেইরূপ সংঘটনই হয়েছে।"

আত্মপ্রশংসার লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া রাজ্যপাল মাথা নত করিলেন। আচার্য্য কহিতে লাগিলেন—

"শ্রীমন্নারায়ণ তোমায় দীর্ঘ জীবন দান করুন, রাজলক্ষ্মী চির-অচপলা হয়ে তোমাকে সেবা করুন, পিতৃসিংহাসন পিতৃযশ এবং পিতার মত আয়ুলাভ ক'রে পিতৃবৎ সন্তান লাভ করো। আর কি বলবো, কায়মনে এই আশীর্ব্বাদ করছি।"

সুদেবের দৃষ্টি হইতে স্নেহ এবং শুভ ইচ্ছা ক্ষরিত হইতে লাগিল। যুবরাজ বিনীত বিনতির সহিত আশীর্ব্বাদকের পদধূলি পুনশ্চ গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন।

ক্ষণকাল কাটিয়া গেল। ক্ষণপরে সুদেব তাঁর ভবিষ্যৎ রাজাধিরাজ ছাত্রের গৌরবে পরিপূর্ণচিত্ত হইয়া ক্রতহস্তে লেখনি গ্রহণপূর্ব্বক তালপত্রের উপর ইহা স্থাপন করিতে যাইতেই একান্ত বিনীত নম্রকণ্ঠে যুবরাজ উহাতে বাধাস্বরূপ হইয়াই কহিয়া উঠিলেন,

"আমার একটী বিষয় নিবেদন করবার ছিল।"

কোন শাস্ত্রতত্ত্বের জটিলতা সম্বন্ধে প্রশ্ন আশা করিয়াই সস্নেহনেত্রে চাহিয়া অধ্যাপক স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন,

"কি তোমার জিজ্ঞাস্য বল?"

রাজনীতি, মনুসংহিতা, চাণক্যের অর্থশাস্ত্র ইহার মধ্যে কোন বিষয়ে কিম্বা মেধাবী ও বিচারশীল রাজকুমার যে প্রশ্ন তুলিতে চাহিতেছেন, ইহাতে আচার্য্যের কোনই সংশয় ছিল না।

যুবরাজ রাজ্যপাল একবার মুখ তুলিয়া পুনশ্চ তাহা ঈষৎ নত করিয়া সুস্পষ্ট অথচ মৃদুকণ্ঠে কহিয়া ফেলিলেন, "আমি আপনার চরণে আজ শ্রীলতাকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

সুদেব ভট্ট চমকিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় মাথা তুলিলেন, তাঁর হাতের লেখনী মাটিতে পড়িয়া গেল। একমুহূর্ত্ত পরে তাঁর আকস্মিক বিস্ময়াতিশয্যে অপহৃত বাক্‌শক্তি পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বাক্য নিঃসরণে সাহায্য করিলে স্তম্ভিতভাবে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন,

"শ্রীলতার গর্ভধারিণী এই সন্দেহই প্রকাশ করেছিলেন, আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।"

যুবরাজের শুভ্রকপোল ঈষৎ রক্তিম হইল, তিনি সসম্ভ্রমে অথচ ঈষৎ বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"একি এতই অসম্ভব সন্দেহ যে বিশ্বাস করতেও পারা যায় না?"

কণ্ঠে তাঁর আহতের অভিমান ব্যক্ত হইল।

আচার্য্য এবার তাঁর সমস্ত বিহ্বলতাকে সবলে দমন করিয়া লইয়া ঈষদ্দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিলেন,

"এ সন্দেহ আমার পক্ষে এতই অসম্ভব ছিল! যুবরাজ রাজ্যপাল! আমার পুত্রসন্তান নেই, তোমায় শুধু ছাত্র নয়, পরম শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিলোকরঞ্জক রাজার যোগ্যতম পুত্রও নয়, নিজ পুত্রের মতই আবাল্য স্নেহ ক'রে এসেছি, আজ তোমার চরিত্রগৌরবে, তোমার বীরত্ব-খ্যাতিতে, তোমার সহজ সরল অমায়িকতায় আমি মুগ্ধ, আমি গর্ব্বিত। আমি জানি শ্রীলতাকে তুমি স্নেহ কর, ভালবাস, তাতে সুখীই হয়েছি। তার ভাই নেই, তুমি তার সে অভাব পূর্ণ করেচো ভেবে আনন্দ বোধ করেছি। কাল তার গর্ভধারিণী যখন তার সঙ্গে তোমার ব্যবহারকে অসঙ্গতিদোষপূর্ণ ব'লে আমার কাছে অভিযোগ জানালেন, আমি দুঃখিত হয়ে তাঁকেই অনুযোগ করলেম। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, এত বড় অসঙ্গত এবং অন্যায় প্রস্তাব আমায় তোমার মুখ থেকে শুনতে হবে!"

রাজ্যপালের ঈষদারক্ত মুখ আরক্ততর হইল, কণ্ঠদৃষ্টি

উন্নত করিয়া ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে তিনি আচার্য্যের এই বিবাদপূর্ণ অনুযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন;

"অন্যায়? অসঙ্গত? কিসে ব'লে মিশ্র? এ কি এ দেশের লোকাচারে কোনদিন ছিল না? মুনিকন্যা শকুন্তলা আর্য্যাবর্ত্তপতি দুষ্মন্তর মহিষী কি হন নি? দেবযানী শুক্র-কন্যা রাজমহিষীর পদ পেয়েছিলেন ত? তবে আমার প্রস্তাব অন্যায় এবং অসঙ্গত কিজন্য বলচেন?"

সুদেব ভট্ট সঙ্কোচ হাসি হাসিলেন। কহিলেন,—"বৎস! নিতান্ত অল্প বয়সে কতকগুলি কাব্য নাটক পাঠ ক'রে তোমাদের উষ্ণ শোণিত উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি শকুন্তলার যে উপমা দিলে সে কন্যাটী কি যথার্থ ঋষিকন্যা? যার জন্মের মূলেই অন্যায়তা বর্ত্তমান রয়েছে, তার কর্ম্মের ব্যাপারে অসঙ্গতি থাকাই যে স্বাভাবিক! তথাপি ঐ বিবাহটী কি বেশ সুখজনক হয়েছিল? অনেক কিছুই ওর মধ্যে দুর্ব্বিপাক ঘটে যায়নি কি? জীবনের সরল রেখাকে জটিলাবর্ত্তে টেনে নিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তাই বা কি?"

রাজ্যপাল শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু শুক্রকন্যা দেবযানী?"

সুদেব ভট্ট আবার সেই হাসি হাসিলেন, "হাঁ, দেবযানীকে পত্নীলাভ ক'রে রাজা যযাতির অবস্থা যা হয়েছিল, অতিবড় শত্রুতেও যেন সে সুখভোগী না হয়! যৌবনে জরাগ্রস্ত, অভিশপ্ত, শেষকালে অপর রাণীর সন্তানের দয়ায় কথঞ্চিৎ সুস্থ হলেন এবং সেই পুত্রের দ্বারায় বংশ রক্ষিত হলো।

তারপর রাজ্যপালকে কিছু বলিতে উদ্যত দেখিয়া পুনশ্চ সঙ্কোচকণ্ঠে আরম্ভ করিলেন,—

"সে কথা যাক্, তখনকার সকল রীতিই এখনকার দিনে যে চলে না সে কথা তোমার অজ্ঞাত নয়। কলিতে গোমেধ, মধুপর্কার্থ গোবধ, পুত্রার্থ পুরুষান্তর নিয়োগ প্রভৃতির মত বহুকাল হতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শোণিত সম্পর্ক সংস্থাপন রহিত হয়ে গেছে। এই দেখ না কেন, পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রাজকন্যারা তো সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ ঋষিদের হস্তে সম্প্রদত্তা হতেন, জামদগ্নিপত্নী রেণুকা কর্দ্দম পত্নী, গাধিকন্যারা এমন অনেকই তো প্রমাণ আছে। ইদানীং কতশত বৎসর এরূপ বিবাহ বন্ধ হয়েছে তা কি বলতে পারো? কাজেই প্রমাণ হচ্চে তোমার প্রস্তাব এ যুগের পক্ষে একান্তই অসঙ্গত এবং অন্যাষ্য। বিশেষ যখন শ্রীলতা তোমার আচার্য্য কন্যা। তাকে তোমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর দৃষ্টিতেই দেখবে, অন্য সম্বন্ধ তার সঙ্গে তোমার হওয়া কখনই সম্ভব নয়।"

যুবরাজ ঈষৎ ভ্রূকুটি করিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরে অধ্যাপকের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইল না,—কহিলেন,—

"শাস্ত্র যখন বিরোধী নয়, তখন মাত্র আধুনিক দেশাচারের জন্য চিরজীবনের ঈপ্সিত সুখ ত্যাগ করা আমার সাধ্যাতীত। আর আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, স্নেহময়, শুধু প্রথার জন্য দুটী সন্তানের চির জীবনের সুখ বলি দেওয়া আপনার সাজে না।"

সুদেবের মুখে একটা কঠিন রেখাপাত পড়িল, দৃঢ় স্বরে কহিলেন,—

"যুবরাজ! ভেবেছিলাম, তুমি সুশিক্ষিত, তুমি বুদ্ধিমান, তোমায় সহজেই বোঝাতে পারা যাবে, কিন্তু দেখছি লোভ তোমার চোখে ঠুলি দিয়ে দিয়েছে! তুমি যা বলছো তা হয় না, তোমার বংশের এ কুলপ্রথা নয়; ক্ষত্রিয়রাজকন্যাই আবহমান-কাল ধ'রে এই পালবংশের সিংহাসনাধিষ্ঠাতার পট্টমহিষীর পদ গ্রহণ ক'রে এসেছেন। তাঁদের কেউ রাষ্ট্রকূটজা, কেউ কল্যাণবাসিনী, কেউ বা পরবল-হতে সমাগতা। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা গ্রহণ করলে প্রজাবৃন্দ তা' হয়ত অনুমোদন না করতেও পারে, হয়ত প্রজাদ্রোহ হবে। হয়ত তখন রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সেই অভাগী ব্রাহ্মণকুমারীকে তোমায় পরিত্যাগই বা করতে হয়! বিশেষতঃ পালবংশে বহুপত্নীকতা প্রায় দেখা যায় না। কদাচিৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীত অধিকাংশ স্থলেই রাজারা একপত্নীক,—"

বাধা দিয়া রাজ্যপাল কহিলেন, "আমার মা রাজকন্যা নন, কিন্তু তার জন্য কি তাঁর সম্মান এ রাজ্যের কোন ভূতপূর্ব্বা পট্টমহাদেবীদের অপেক্ষা কম? প্রজারা কি তাতে অসন্তুষ্ট?"

সুদেব ভট্ট বিষাদের বিরস হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "বালক! তোমার জননী রাজকন্যা না হলেও ক্ষত্রকন্যা,

ব্রাহ্মণকুমারী নন। তারপর, তোমার পিতা যেভাবে রাজ্যলাভ করেছেন তাতে এ সব প্রশ্ন স্থানলাভ করতে পারে না। শোন, চঞ্চল হয়োনা, এ গেল তোমাদের পক্ষের কথা। এখন আমার পক্ষেও এ বিষয়ে যে মস্ত বড় বাধা আছে সে তোমায় এখনও বলা হয় নি। আমি শাস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ দরিদ্র, পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নিতান্তই অল্প। কিন্তু আমার জন্মসূত্রে পাওয়া পিতৃপিতামহদত্ত অমূল্য সম্পত্তি এই ব্রাহ্মণ্যকে আমি বড় মূল্যবান বোধ ক'রে থাকি, তোমার সমস্ত রাজ্যের বিনিময়েও একে আমি খর্ব্ব হতে দিতে পারি না। শ্রীলতা আমার একমাত্র সন্তান; তাকে জাত্যন্তরে সম্প্রদান করলে তার গর্ভস্থ সন্তান আমায় ভবিষ্যতে জলপিণ্ড প্রদান করতে সমর্থ হবে না, আমার বংশ লোপ হবে। তাকে দরিদ্র পাত্রে অর্পণ ক'রে আমি আমার ঘরে রাখতে চাই। দৌহিত্র আমার পিণ্ডাধিকারী হবে। আরও শোন, আমি ব্রাহ্মণ সনাতনধর্ম্মী তুমি ক্ষত্রিয় এবং বৌদ্ধ। অসম্ভব যুবরাজ! শ্রীলতার আশা তুমি ত্যাগ ক'রে বিষয়ান্তরে চিত্তনিয়োগ কর, মরীচিকার মত অসম্ভবের পশ্চাতে ছুটে বেড়ান জিতেন্দ্রিয় মহাপ্রাণ রামপালাত্মজের উপযুক্ত হবে না। শ্রীলতা সম্পর্কে তোমার গুরুভগ্নী, সোদরা সমতুল্যা,—তোমার অস্পৃশ্যা!"

গৃহ ক্ষণকালের জন্য ঘোর নীরবতায় নিমগ্ন হইয়া পড়িল। অপরাহ্নের স্তিমিতালোক ক্ষুদ্র কক্ষে সুপ্রচুর ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, আনত মস্তক রাজপুত্রের মুখচ্ছবি সেই প্রায়ান্ধকারে অদৃশ্য হইয়া রহিল, কেবল তাঁর স্তব্ধ মূর্ত্তি ঈষৎ একটা ক্ষুব্ধ শ্বাসের মৃদুকম্পনে একবারমাত্র কাঁপিয়া উঠিতে দেখা গেল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া উহার পক্ষ হইতে অপর কোন প্রতিবাদ-চেষ্টা না দেখিয়া ঈষৎ প্রসন্ন ভাবে আচার্য্য সুদেবভট্ট শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে পুনশ্চ কহিলেন,—

"নির্ম্মলবুদ্ধি, সুপণ্ডিত তুমি, কার্য্য কারণের বিশ্লেষণ ক'রে দেখে চিত্ত বেগকে প্রশমিত করাই প্রকৃত বিচারশীল ও বিদ্বানের কার্য্য। সমস্ত অবস্থাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমায় জানিয়েছি। অতঃপর কিছুদিন এ বাড়ীতে আসা যাওয়া স্থগিত রেখে কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করলেই এই যৌবনোত্তেজনার ক্ষুদ্র মোহ দূরীভূত হয়ে যাবে। প্রভু নারায়ণ তোমার কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করুন।"

একটী মাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি ব্যতিরেকে নিঃশব্দে উঠিয়া রাজ্যপাল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। যাত্রাকালে আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা পর্য্যন্ত তাঁর মনে পড়িল না।

বাহিরে সন্ধ্যা নামিয়াছিল, দীপহীন কক্ষে সে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। অন্যদিন এমন সময় শ্রীলতাই দীপ ও শঙ্খ হস্তে মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যার মতই সন্ধ্যাদীপ প্রদান করিতে আসে, আজ সে আসিল না!

সুদেব ভট্ট একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্ব্বক আত্মগতই উচ্চারণ করিলেন;—

"নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুরূপা দেবী

বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌

১

প্রতাপ ও দেবদাসের বাল্যজীবনের মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েই বাল্যকালে প্রতিবেশিনী সহচরীর সঙ্গে প্রেমে পড়িয়াছিল। বাল্য প্রণয়ে একটা অভিসম্পাত আছে। তাই প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর বিবাহ হইল না, আর দেবদাসও পার্ব্বতীকে পত্নীরূপে পাইল না। তারপর উভয়ের জীবনের পরিসমাপ্তিও মৃত্যুর ট্র্যাজেডিতে, আর সেই মরণ উভয় ক্ষেত্রেই বাল্য প্রণয়ের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু উভয়ের জীবনের ও চরিত্রের পার্থক্যও খুব বেশী। প্রথমতঃ, প্রতাপ ইন্দ্রিয়জয়ী; কাজেই শৈবলিনীকে ভালবাসিলেও সে সেই ভালবাসাকে দুর্ব্বলতা মনে করিয়া চিত্তজয় করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, রূপসীর পাণিগ্রহণ করিয়া অন্য পাঁচ জনের মত সংসারধর্ম্ম পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে নারীতে তাহার ধর্ম্মগত অধিকার নাই তাহার জন্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে পাপলিপ্সা বলিয়া দলিত করিয়াছে, এবং যে নারীর সঙ্গে তাহার মিলন শাস্ত্রসঙ্গত তাহাকে নিঃসঙ্কোচে বরণ করিয়াছে।

কিন্তু দেবদাসের কথা অন্য রকমের। যাঁহারা তাহার জন্য সহানুভূতি বোধ করিবেন তাঁহাদের যুক্তি হইবে এই :— ইন্দ্রিয়জয়ে যে পুণ্য হয় তাহার মূল্য কতটুকু? হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া কোন্‌ মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে? আর তাহাকে বাদ দিয়া যে শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মমতাহীন অনুশাসন দিয়া মানব-জীবনের কোন্‌ কল্যাণ সাধিত হইবে? তারপর অন্য নারীকে বিবাহ করা— দেবদাসের কাছে তাহাই ত সত্যকারের পাপ। যাহাকে ভালবাসিয়াছে, লোকের চক্ষে শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে তাঁহাকে পাইল না বলিয়াই হৃদয় হইতে তাহার আসন টলাইবে রূপসী? আর এই আসনই যদি টলে, তবে সেই ঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি করিয়া?

২

প্রতাপ ও দেবদাসের মধ্যে এই যে প্রভেদ ইহার দ্বারাই বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভার পার্থক্য পরিমিত হইবে। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের যে আদর্শ, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত, বিশ্বাসের সহিত মানিয়া লইয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে তিনি কখনও কোন প্রশ্ন করেন নাই, ইহার সঙ্কীর্ণতা লইয়া তাঁহার মন কোন দিন কোন সন্দেহে বিচলিত হয় নাই। ললিতগিরি ও উদয়গিরির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে বাঁধিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল সে কি আমাদের মত হিন্দু? ....এই সকল স্ত্রী-মূর্ত্তি যারা গড়িয়াছিল তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ্‌, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক। এ সকল হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার। তখন মনে করিলাম হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি।"

এই রকম দ্বিধাহীন বিশ্বাস রহিয়াছে তাঁহার সমস্ত রচনার অন্তরালে। ইহারই বলে ভ্রমর গোবিন্দলালকে

প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

বলিয়াছিল, "এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয় বল যে আর আসিবে না। কিন্তু আমি বলিতেছি আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্ত কাঁদিবে। যদি একথা নিষ্ফল হয় তবে জানিও দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী।" দেবীরাণীর মধ্যেও তিনি দেখিয়াছিলেন হিন্দুর সেই সনাতন মূর্ত্তি যাহা সাধুজনের পরিত্রাণের জন্ত, পাপীর বিনাশের জন্ত ও ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছে।

এসব বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি আশ্চর্য্য সঙ্কীর্ণতাও ছিল। তিনি কামলিপ্সাকে খুব ছোট করিয়া দেখিয়াছেন, চোখের প্রেম ও আত্মার প্রেমের মধ্যে চুল চেরা প্রভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর রমণীর সতীত্বকেও তিনি খুব বেশী উঁচু করিয়া দেখিয়াছেন। হেমচন্দ্র পদাঘাত করিলেও মৃণালিনী তাহার দাসীপণার গৌরব করিয়াছে, সূর্য্যমুখীর পতিভক্তি আরও একটু কম হইলে আরও স্বাভাবিক হইত, মনোরমাও স্বামীর অনুমৃতা হইয়াছিল, নন্দা ও রমার স্বামিপ্রেমে আতিশয্য ছিল খুব বেশী। আর একথা মানিতেই হইবে হিন্দুর ধর্ম্ম ও আদর্শের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তিনি মিল্ বা সুইনবর্ণ পড়ায় আপত্তি করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। তবে গীতা ও কুমারসম্ভবের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল তাহা একেবারে পক্ষপাতদোষশূন্ত এমন কথাও বলা যায় না। রমানন্দ স্বামী, সন্ন্যাসী জয়ন্তী ইঁহাদের মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাই তাহা এত অলৌকিক যে, তাহাতে সাধারণ পাঠক বিশ্বাস করিয়াই উঠিতে পারে না। কিন্তু এ সমস্ত অতিশয়োক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও একথা মানিতেই হইবে যে, তাঁহার রচিত অধিকাংশ নর-নারীর মধ্যে একটা প্রবল শক্তি, একটা বিরাট প্রচেষ্টা ছিল, এবং এইজন্তই তাঁহার রচনায় একটা বিশালতা আছে যাহার তুলনা বিরল।

মনের বিপরীতগামী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে শক্তির যে অপচয় হয় তাহা তাঁহার নায়কনায়িকাদের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। যে সংঘাতে হ্যামলেট্ বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল তাহার দ্বারা তাহারা নিপীড়িত হয় নাই। শৈবলিনী যে প্রতাপকে চাহিয়াছিল তাহা তাহার সমস্ত অন্তর দিয়া চাহিয়াছিল, প্রতাপ যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাও তাহার সমস্ত অন্তর দিয়াই করিয়াছিল। এই একাগ্রতা বঙ্কিমচন্দ্রের নর-নারীর একটা প্রধান গুণ। ভ্রমর, সূর্য্যমুখী ইহাদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম;—মতিবিবি, জেবউন্নিসা, রোহিণী—কাহারও মধ্যে কোন প্রকার দ্বৈধতা নাই। শ্রী যখন সীতারামের প্রতি অনুরক্তা ছিল, তখন সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহার পূজা করিত, তখন বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া দিনভোর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মতন মালা গাঁথিয়া ফুলওয়া গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছে তাহাকে পরাইয়াছে, অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটী করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছে তাহাকে খাইতে দিল। আবার যখন সীতারামকে ত্যাগ করিল তখন সম্পূর্ণরূপেই ত্যাগ করিল, সন্ন্যাসিনী রমণী জীবনের সমস্ত আসক্তি বিসর্জ্জন দিয়া ত্যাগ করিল। একবার তাহার মনে হইয়াছিল যে, সে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হইতে পারে নাই, তাহার দ্বাদশ শত্রুর মধ্যে রাজাও একজন। তাই রাজলক্ষ্মী হইয়াও সে রাজপুরী ছাড়িয়া গেল, আবার যখন আসিল তখন সে সম্পূর্ণ অনাসক্ত, সন্ন্যাসীর অন্তরালে রমণীর সমস্ত ভোগলিপ্সা নিঃশেষে মিলাইয়া গিয়াছে। এই বিশ্বাস ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের আর্টও একটা বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সাধারণতঃ প্রত্যেক উপন্যাস ও নাটকেই একটা সংঘাতের ছবি থাকে। স্রষ্টার বিশ্বাস ও আদর্শানুসারে এই সংঘাতের রূপ নির্দ্ধারিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কনায়িকাদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব খুব কম। তিনি দেখিয়াছেন একটা বিরাট মন পদে পদে কিরূপে প্রতিহত হয় বাহিরের অজানা অজেয় শক্তির কাছে। বিশ্বের চক্র আপনার মনে আপনার তালে ঘুরিতেছে, আমি যত বড়ই হই না কেন, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিব কি করিয়া? আমি ভ্রমর,—গোবিন্দলালকে যত ভালবাসাই দিই না কেন, গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভালবাসিবে আমি তাহাতে বাধা দিব কি করিয়া? অথচ মজা এই যে, ভ্রমরের সুখ নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে গোবিন্দলালের উপরে। এমনিই বিশ্বের বিচিত্র বিধান।

গ্রীক্ ট্র্যাজেডিতে নিয়তির বিচারবিহীন অত্যাচারের কথা খুব বেশী করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। নিয়তির বিধান অখণ্ডনীয়, কোন উপায়ে তাহাকে এড়াইবার পথ নাই। Œdipus সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার বাপ মাকে এড়াইয়া চলিতে, আর তাঁহার বাপ মা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার পথ হইতে দূরে থাকিতে। কিন্তু নিয়তিকে ফাঁকি দেওয়া চলে না, দৈবের লিখন মিথ্যা হইতে পারে না। Œdipus তাঁহার পিতাকে বধ করিলেন এবং মাকে বিবাহ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যেও নিয়তির এই বিচারবিহীন পীড়নের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে একটা জিনিস মনে রাখিতে হইবে এই যে, নিয়তি খেচর দেবতার খেয়াল মাত্র নহে, ইহার মূল রহিয়াছে ঘটনার বিবর্ত্তনে আর মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। একজন লোক লইয়া সমাজ হয় না, যেই দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হইল তখন হইতেই সমাজের সৃষ্টি হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাজেডির বীজও বপন করা হইল। কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তির আচরণের উপর আমার সুখ নির্ভর করে অথচ তাহার মনকে আমি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিতে পারি না। আমি যাহাই হই না কেন, তাহার জন্য আমাকে দুঃখভোগ করিতে হইবেই। আর অনেক সময় নিয়তির শক্তির মূল থাকে আমাদের মনের মধ্যেই। গ্রীক্ সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক Cornford বলিয়াছেন যে, আমাদের অন্তর্নিহিত দুই একটা প্রবৃত্তি আছে তাহা এত বেগবান, এত প্রবল যে, তাহারা বাহিরের নিয়তির মত আমাদিগকে লাঞ্ছিত করে। এই যেমন যৌনপ্রবৃত্তি। ইহার মূল রহিয়াছে মনে, কিন্তু ইহার প্রবল গতিবেগ দেখিয়া মনে হয় যেন ইহা বাহির হইতে আসিয়া আমাদিগকে নির্য্যাতিত করিতেছে। সম্মিলিত জনতার মধ্যে যখন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, তখন দেখা যায় যে, যদিও ভয়ের মূল রহিয়াছে মনের মধ্যে, তবু সে যেন বাহিরের ঘূর্ণিবায়ুর মত সবাইকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

এই প্রকারের ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিষবৃক্ষ। নগেন্দ্রনাথ বুঝিতেছে যে তাহার মনের মধ্যে কুন্দর প্রতি যে প্রীতি জন্মিতেছে ইহা বিষবৃক্ষের বীজ, কিন্তু ইহা তাহাকে নিরন্তর নিপীড়িত করিতেছে। ইহার হাত এড়াইবার উপায় নাই, ইহাকে নিরুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই; ইহা যেন বাহিরের এক অনতিক্রমণীয় অভিশাপ যাহার কাছে আশা নাই, ভরসা নাই, ফাঁকি নাই, কোনরূপ বোঝাপড়া পর্য্যন্ত নাই। আর সূর্য্যমুখী—সেই বা তাহার নিয়তিকে ফিরাইবে কি করিয়া? নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে ভুলিবার জন্য যে কত চেষ্টা করিয়াছে তাহা ত সে দেখিয়াছে, ততোধিক বুঝিয়াছে; কিন্তু ইন্দ্রিয়-জয়ে গৌরব থাকিতে পারে, সুখ নাই। তাহার স্বামী ইচ্ছা করিলেও চেষ্টা করিলেও তাহাকে পাইয়া আর সুখী হইতেছেন না, ইহার অপেক্ষা বড় দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে? অথচ ইহাকে এড়াইবার শক্তিই বা সে কি করিয়া আহরণ করিবে? কুন্দর পক্ষেও সেই একই কথা খাটে। নগেন্দ্রনাথ তাহাকে ভালবাসে—ইহা তাহার ইচ্ছাধীন নহে, সূর্য্যমুখী ঘটকালী করিয়া তাহার বিবাহ দিয়া দিল, ইহারই বা সে কি করিবে? সে লজ্জাশীলা, ভীরুস্বভাবা, জোর করিয়া নিজের আসন পাকা করিয়া লইতে পারিলনা। যে বিবাহ সে নিজে অগ্রণী হইয়া করিয়া লয় নাই, তাহারই ফলে তাহার জীবনের সমস্ত সুখ যদি নিঃশেষে নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে যদি তাহার পরমশুভকাঙ্ক্ষিণী সূর্য্যমুখী সংসারত্যাগিনী হয়, আর সেই কারণেই যদি তাহার স্বামী সংসারের উপর তাহার উপর বিরক্ত হইয়া পড়ে, তবে সে তাহার কি উপায় করিবে? সে নগেন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু যে জালে সে ধরা পড়িল তাহাত সে নিজে বুনে নাই। মানুষ যে কত নিরুপায়, তাহার সুখ যে কত ক্ষণভঙ্গুর, তাহার ভবিষ্যতের স্বপ্ন যে কত অলীক, তাহার অন্তরে ও বাহিরে নিয়তির যে কত বড় নিষ্পেষণ চলিতেছে, বিষবৃক্ষ তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অন্যান্য উপন্যাসেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতাপ শৈবলিনীকে ছাড়িয়া বেদগ্রাম ছাড়িয়া তাহার জীবনযাত্রা সুরু করিল, কিন্তু শৈবলিনীর প্রেম যে তাহার কাছে নিয়তির মত দুরতিক্রমণীয়। সে জলে ডুবিয়া দেখিয়াছে, শৈবলিনীকে শপথ করাইয়া দেখিয়াছে, শৈবলিনীকে ছাড়িয়া যাইয়া দেখিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় নাই। লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলে সে কি করিত তাহার আলোচনা রমানন্দস্বামী করুন, কিন্তু প্রতাপ দেখিয়াছে যে, একটি শৈবলিনীর ভালবাসাই নিয়তির মত দুর্ব্বার, নিয়তির মত বিচারহীন। নবাবকের জীবনেও

সেই একই ট্রাজেডি। সে বুঝিত জেবউন্নিসার প্রেমের ও তাহার সহিত কলহের পরিণতি কোথায়, কিন্তু তবু বাদশাহ্‌জাদীকে পরিত্যাগ করিবার সাধ্য তাহার নাই; এই পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইবার শক্তি নাই। আর দরিয়া—সে মবারককে অনন্ত ভালবাসা দিয়াছে, কিন্তু প্রতিদান পায় নাই এবং তাহাতে সে উন্মাদিনী হইয়াছে। বিশ্বাসঘাতক স্বামীকে সে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু প্রতিহিংসায় তাহার দৈবাহত জীবনে কোন সুখ আসে নাই। মবারককে হত্যা করা সহজ; কিন্তু তাহার ভালবাসা—? ইংরেজ কবি Arnold বলিয়াছেন যে, আমরা বিরাট লবণাক্ত সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত, মাঝখানে রহিয়াছে অনন্ত সমুদ্রের ব্যবধান। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই অনন্ত সমুদ্রের ব্যবধান যেখানে ভাঙিয়াছে সেইখানেই কি সত্যকার মিলন হইয়াছে? প্রকৃতিপালিতা কপালকুণ্ডলা আর সংসারপালিতা নবকুমার, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী, মবারক ও দরিয়া, নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী—ইহারা মিলিত হইয়া সত্যকার ব্যবধান কতখানি ভাঙিয়াছিল?

আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও কর্ম্মের অতীত এক শক্তি আছে তাহা শুধু দুর্বশ নহে, দুর্জ্ঞেয়। তাহার কথা আধ আধ জানা যায়, আর জানিলেও কোন উপায় হয় না। বহ্নিমুখ হইতে পতঙ্গকে ফিরাইবে কে? কুন্দনন্দিনী স্বপ্নে জানিয়াছিল তাহার বিষবৃক্ষের মূল কোথায়, কিন্তু লাভ হইয়াছিল কি? মাধবাচার্য্য জানিতেন যে, পশ্চিমদেশীয় বণিক অসিলে যবনের পরাজয় হইবে, কিন্তু সে পশ্চিমদেশ যে মথুরার বহু পশ্চিমে আর সে বণিক যে বাণিজ্য করিবার ছলনা মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হয়না তাহা তাহাকে কে বুঝাইবে? শ্রী শুনিয়াছিল যে, সে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবে, কিন্তু সে প্রিয় যে কে তাহা লইয়াই ত গোলমাল। দলনীর দুর্ভাগ্যও নিতান্ত আকস্মিক নহে, তাহার সমস্ত লজিক নিয়তির কাছে ঠিক করা ছিল। নবাব জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা করিয়া তাহার পূর্ব্বাভাসও পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সে দুর্দ্দৈব প্রতিরুদ্ধ হইল না। মবারক শাহজাদী বিবাহ করিয়াছিল, তাহার পদবৃদ্ধিও হইয়াছিল, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদের ভবিষ্যবাণীর পাদপূরণ করিয়া দরিয়া যে বলিয়া উঠিয়াছিল, "মৃত্যু", সে ইহাকে এড়াইবে কি করিয়া? সর্পাঘাতের চিকিৎসা আছে, কিন্তু দরিয়ার জিঘাংসা—?

মানুষ এমনি উপায়হীন, আবার তাহার শক্তিও অনন্ত। সে পরাজিত হইতে পারে, সে মরিতে পারে, কিন্তু তবু তাহার অপরিমেয় শক্তি, অক্ষুণ্ণ তেজ কখনও বিনষ্ট হয় না। তাহার পরাজয়ের মধ্যেও গৌরবের অম্লান বিজয়মালা দীপ্ত হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের ইহাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা গোড়ার কথা। তাহার সৃষ্ট নরনারীরা যাহা বিশ্বাস করে তাহা জোর করিয়াই বিশ্বাস করে, যাহা করিতে চাহে তাহা জোর করিয়াই করিতে চাহে। ভ্রমর স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং সেই শোকে তিলে তিলে দগ্ধ হইয়া সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে! কিন্তু তবুও মনে হয় যে, এই আখ্যায়িকার মধ্যে ভ্রমরের দুর্ভাগ্য ও তাহার মৃত্যুই শেষ কথা নহে। তাহাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে সতী নারীর অজেয় তেজ ও তাহার অনমনীয় আত্মসম্ভ্রমবোধ। স্বামী যখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে সে তখনও বলিয়াছে, "তুমি আমারই—রোহিণীর নও"। আবার সেই স্বামী যখন কাতরকণ্ঠে কৃপাভিক্ষা করিয়াছে, তখনও অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। পরদারনিরত নারীহন্তার অপরাধ সে কখনও ভুলে নাই, তাহাকে সে গ্রহণ করে নাই। কুসুমনির্ম্মিতা আয়েষা সপত্নীকে নিজের আকাঙ্খাতীর্থ বাসরশয্যায় পাঠাইয়াও আত্মহত্যা করিলনা, কারণ এই যন্ত্রণাই যদি সহ্য করিতে না পারিল তবে তাহার নারীজন্মের সার্থকতা কোথায়? দলনী বেগমকে তকী বিষ খাওয়াইয়াছিল, কিন্তু দলনী সহাস্যমুখে বিষ খাইয়া মৃত্যুকে সানন্দে বরণ করিয়া লইল। মতিবিবি যখন সানুনয়ে প্রেমভিক্ষা করিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল, তখনও সেই নিষ্ফল অভিযানে সে হতাশ্বাস হয় নাই, তাহার দর্পিত তেজ তেমনি অক্ষুণ্ণ, তাহার আকাঙ্খা তেমনি তীব্র রহিয়াছে। বধ্যভূমিতে বীরেন্দ্রসিংহের মধ্যে যে শৌর্য্য ও পৌরুষ দেখিতে পাই, কোন বিজয়ীবীর ততোধিক বীর্য্যের ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার শির ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার আত্মা কখনও বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন শক্তির উপাসক। তাই একটা জিনিষ দেখা যায় যে, তাঁহার নায়কনায়িকারা অনেকেই অনেক বড় কাজ করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু তাই নয়। কিসের প্রবল তাড়নায় মানবের এই কর্ম্মশক্তি অপচিত ও বিনষ্ট হয় তিনি তাহাও দেখাইয়াছেন। বিখ্যাত রুশ-সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গর্কী বলিয়াছেন যে, বিদ্রোহী হওয়া আর বিবাহ করা এই দুইটি কাজ একসঙ্গে করার সুবিধা হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রও দেখাইয়াছেন যে, কামলিপ্সা সর্ব্বপ্রকার বড় কাজের অন্তরায়। বাস্তবিক প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও যৌনপ্রবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা আত্মমুখীন, তাহার লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তিগত সুখ। কিন্তু সব বড় কাজের অন্তরালে রহিয়াছে অজ্ঞাত, অপরিচিত জনসাধারণের কল্যাণকামনা, বহুর জন্য একের স্বার্থবলি। যিনি সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও শৈবলিনীর চিত্র আঁকিয়াছিলেন তিনি প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিতেন না এমন নহে, কিন্তু তাহা যে সকল প্রকার বিরাট কর্ম্মের পরিপন্থী তিনি তাহাও উপলব্ধি করিতেন। তাই সন্তানদলের প্রথম নিয়ম ছিল রমণীর সংস্রবত্যাগ। মৃণালিনী না থাকিলেও মাধবাচার্য্যের অভিযান সার্থক হইত কিনা সন্দেহ, কিন্তু মৃণালিনীর প্রেম আর নষ্টরাজ্যের উদ্ধার ইহা যে কত পরস্পরবিরোধী হেমচন্দ্রের জীবন তাহার সাক্ষ্য। সীতারাম একজন মহামানব আর শ্রী ত অর্দ্ধেক দেবী। কিন্তু এই শ্রী-ই হইল সীতারামের "ডাকিনী"।

যে দ্বৈধতা হেমচন্দ্রের ও সীতারামের মধ্যে ছিল, মাধবাচার্য্য ও চন্দ্রচূড় ছিলেন তাহা হইতে একেবারে মুক্ত। তাঁহাদের অজেয় শক্তি, অফুরন্ত অধ্যবসায়, অবিচলিত প্রতিজ্ঞা। শেক্‌স্‌পিয়রের সমালোচনা করিতে যাইয়া বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন যে, তাঁহার রচনার প্রধান দোষ হইতেছে এই যে, তাঁহার নায়কনায়িকাদের অন্তরে কর্ম্মের স্বতঃপ্রণোদিত প্রেরণা নাই। তাহারা স্রোতের ফুল, অবস্থার দাস। তাহাদের জীবনে কোন মৌলিক আইডিয়া নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা একেবারেই খাটেনা। তাঁহার সৃষ্ট অনেক নায়কনায়িকা একটা মৌলিক আইডিয়া লইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই ব্রতের উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করিয়াছে। এই ব্রত হইতেছে হিন্দুস্থানে হিন্দুরাজত্ব ও হিন্দু আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ইহার জন্য তাহারা উচ্চ, নীচ, করণীয়, অকরণীয়—সব কাজ করিয়াছে। কোন সন্দেহ, কোন সঙ্কোচ, কোন চাঞ্চল্য তাহাদের মনে উপস্থিত হয় নাই। মাধবাচার্য্য, চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার, রাজসিংহ, দেবীচৌধুরাণী, ভবানীপাঠক, সত্যানন্দ—ইঁহারা সবাই একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এই আদর্শ দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের নীতিধর্ম্ম নিরূপিত করিয়াছেন, এই আদর্শের কাছে অন্য সবকিছু কামনীয়, পালনীয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিষ্ঠা সমান নহে, সকলের শক্তিও সমান নহে, কিন্তু সবারই জীবন এই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যাহারা এত বড় কোন কাজ করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যেও এই শক্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে। অবশ্য অবস্থার তাড়নায় তাহা ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহাদের জীবনও সেই বিরাট শক্তির পরিচায়ক। এই যেমন প্রতাপ। সে একজন মহামানব; কিন্তু তাহার শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে নিজের ইন্দ্রিয় জয় করিতে ও শৈবলিনীর সংস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিতে। সেও প্রতিপদে অজেয় পৌরুষের পরিচয় দিয়াছে। সে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, কিন্তু এই বিসর্জ্জন ইন্দ্রিয়জয় ও পরোপকারের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছে। বাহিরে তাহার পরাজয় হইয়াছে, কিন্তু এই পরাজয়ের মধ্য দিয়া তাহার অন্তরের বিজয়গৌরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই রমানন্দস্বামী বলিয়াছেন, "তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে! যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও। যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও, লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসিতে চাহিবেনা।"

৩

এইত হইল প্রতাপের জীবননাট্যের উপসংহার। আর দেবদাসের জীবন যখন সাঙ্গ হইল তখন গ্রন্থকার বলিলেন

"তোমরা যে কেহ এই কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত হতভাগ্য অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হউক যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে—যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া মরিতে পারে।" উভয়ের জীবনের আরম্ভ এক রকমের আবার উভয়ের জীবনের পরিসমাপ্তিও একই রকমের। কিন্তু একজন মরণকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিল, আর একজন মরিয়াছিল মরণ আসিয়াছিল বলিয়া। প্রতাপের চরিত্র মানুষের শক্তির নিদর্শন, আর দেবদাসের জীবনে রহিয়াছে মানুষের অনন্ত দুর্ব্বলতার কাহিনী। আমাদের মনের মধ্যে যে নানা বিপরীতগামী প্রবৃত্তি আছে তাহাদের আঘাত সংঘাতের বিচিত্র ইতিহাস শরৎচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমাজের নীতি ও হিন্দুর সংস্কার—বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই নীতি, এই সংস্কার ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত কীট জমিয়া ইহাকে জীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহার কথা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। আর একটা কথাও তিনি বিচার করিয়া দেখেন নাই। যে সমাজের নীতি সর্ব্বসাধারণের উপর প্রযোজ্য, তাহা নিতান্ত স্থূল। আর তাহার প্রয়োগের ক্ষেত্র হইতেছে মানবের বাহ্য আচরণ। অন্তরে যে অবচেতন আত্মা আছে তাহাকে বাধা দিবে কে, আর সমাজনীতির কোন্ আইন দিয়া তাহার বিচার হইবে? যে নীতি বাহ্য আচরণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল সে যদি অন্তরে প্রবেশ করে তবে তাহার অনধিকারপ্রবেশ মানবের অন্তরাত্মা মানিয়া লইবে কেন? অথচ নীতির এই পাষাণপ্রাচীর—ইহার দ্বারাইত মানব-মনের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, আর ইহাইত সংস্কারের আকার ধরিয়া হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছে। মানবহৃদয়ে নিরন্তর এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘাত চলিয়াছে। বাহিরের চক্ষে সব সময় ধরা পড়েনা, কিন্তু ইহাই ত সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ট্রাজেডি। বাহিরের শক্তি এখানে গৌণ, মানুষ এখানে পরাজিত হইয়াছে আপনার প্রবৃত্তির কাছে। এইখানেই তাহার চরম দুর্ব্বলতা, কারণ তাহাকে জয় করিবার শক্তি রহিয়াছে অন্তরের মধ্যেই। সচেতন সংস্কারের অন্তরালে অবচেতন আকাঙ্ক্ষার যে ফল্গু-ধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইয়াছে শরৎচন্দ্র তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। আর দেখাইয়াছেন, সংস্কারের মরুবালু তাহার স্রোতঃপথ কি ভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মানবমনের সংহত শক্তির গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন, শরৎচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মানব-হৃদয়ের অফুরন্ত দুর্ব্বলতার ইতিহাস। এই দুর্ব্বলতা, এই সংঘাত ইহাইত মানব-মনের গোপনতম কথা আর শরৎ-সাহিত্যেরও ইহাই গোড়ার কথা।

নগেন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা......এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না। পিতাই সন্তানের পালনকর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে।" ইহা শুধু নগেন্দ্রনাথের উক্তি নহে—সমাজ ও সভ্যতার যুক্তি। এ যুক্তি খুব পাকা যুক্তি—স্বীকার করিলাম। "কিন্তু লম্বা লম্বা করিয়া বাহিরের ঘটনা সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।" এই যুক্তি কি অচলার পক্ষেও খাটিবে? সে পড়িয়াছে দুই পুরুষের মাঝখানে—একজন গাছের মত নিশ্চল, পাহাড়ের মত সহিষ্ণু, স্রোতের মত আত্মনিবিষ্ট। আর একজন পুরুষ তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহাকে ভালবাসার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। যে দুর্ব্বার আকুলতার সহিত জলোচ্ছ্বাস তীরের গায়ে ভাঙিয়া পড়ে, সেই আকুলতা ছিল সুরেশের মধ্যে। সে নীচ, কামার্ত্ত, পরস্ত্রীলুব্ধ, বিশ্বাসঘাতক, সম্ভ্রমবোধশূন্য—সব মানিয়া লইলাম। কিন্তু তাহার অফুরন্ত ভালবাসা?—তাহাকে অচলা অস্বীকার করিবে কি করিয়া। এই যে কঠিন, এই যে নিদারুণ সমস্যা ইহা ত দৈনন্দিন জীবনের কথা নয়? এই প্রশ্ন সকল মেয়েকে সমাধান করিতে হয় না। কিন্তু যাহার ডাক পড়িয়াছে ইহার মীমাংসার জন্য সে কি করিবে? Average-এর জন্য যে আইন তাহার দ্বারা ইহার বিচার করিয়া কি

লাভ হইবে? শরৎচন্দ্র ইহাকে কোন আইন দিয়া বিচার করিবার চেষ্টা করেন নাই, তিনি সহানুভূতি দিয়া ইহাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অচলার অন্তরে যে ভীষণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে তিনি তাহাকে ভাষা দিয়াছেন। ভ্রমর কি সূর্য্যমুখীর সম্বন্ধে এই প্রশ্নই উঠিত না, "বড়দিদি" মাধবীর সই মনোরমা আর পার্ব্বতীর মনোদিদি—ইহাদের কাছেও এই প্রশ্ন উঠে নাই। কিন্তু যাহার কাছে উঠিয়াছে, তাহার বিচার হইবে কি করিয়া? হিন্দু রমণীর সতীত্বের মাহাত্ম্য যুগে যুগে কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সব রমণীর পক্ষেই কি একই আইন খাটিবে? সুরবালার পতি আর অভয়ার স্বামী—ইহারা কি একই রকমের ভক্তি দাবী করিবে? পার্ব্বতীর সতীত্বের সত্যিকার মাপকাঠি হইবে কি?—দেবদাসের প্রতি আসক্তি, না ভুবন চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি ভক্তি? শরৎচন্দ্রের রচনা এই সমস্ত প্রশ্ন জাগাইয়া তোলে। তিনি ইহাদের মীমাংসা করেন নাই। তিনি দ্বিধাসংযুক্ত, সংঘাতপীড়িত মানবহৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে সহানুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রোহিণী প্রথম হরলালকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল, পরে গোবিন্দলালের সঙ্গে প্রেমে পড়িল, শেষে গোবিন্দলালের সহিত বহুদিন একত্র থাকিয়া একদিন নিশাকরকে দেখিয়া তাহার পটলচেরা চোখ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহা কি হয়? রোহিণী ত শুধু একটা প্রবৃত্তিমাত্র নহে, সে একটা রক্তমাংসে গড়া মানুষ। একটু গভীরভাবে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, হরলালের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হওয়া বিধবার পক্ষে সহজ নহে। তারপর গোবিন্দলালের ভালবাসা ও সাহচর্য্য পাইয়া ক্ষণিকের দেখা পুরুষের প্রতি তাহার দৃষ্টি যাইবে কেন? আর রোহিণীর পক্ষে ইহা যদি বা সত্য হয়, সকলের মন ত একরকম নহে। রাজলক্ষ্মীও রোহিণীর মত বিধবা। তদুপরি রাজলক্ষ্মী বাইজী। পরিণত যৌবনের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া তাহার সাক্ষাৎ হইল তাহার বহুকালের আরাধ্য প্রেমাস্পদ শ্রীকান্তের সঙ্গে। শ্রীকান্তের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসা ছিল অতুলনীয়, কিন্তু তবু শ্রীকান্তের সঙ্গে তাহার পরিপূর্ণ মিলন হইল না। শ্রীকান্তের সে পরিণীতা স্ত্রী নহে, সে মন্ত্র পড়িয়া শ্রীকান্তকে পায় নাই—তাই গোল বাধাইল মনু পরাশর হইতে আরম্ভ করিয়া রাখাল পণ্ডিত, শিবু পণ্ডিত প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা। আর এ শুধু শাস্ত্রের অনুশাসন নহে—তাহার জন্য ত আইনের বিধান আছে। ইহা অন্তরের সংস্কার—ইহাও হৃদয়ের জিনিষ। এই দুই প্রতিকূলগামী প্রবাহ—ইহার সংগ্রাম চলিল রাজলক্ষ্মীর সমস্ত জীবন ভরিয়া আর ইহাতেই তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি অপচিত হইতে লাগিল। এই ট্র্যাজেডিতে মরণ নাই—ইহাতে বাহিরের পীড়ন নাই। ইহা দেখাইয়া দেয় মানুষ কত দুর্ব্বল; তাহার অন্তরাত্মার মধ্যে রহিয়াছে দুই পৃথক শক্তি আর তাহাদিগকে পৃথক করিয়াছে সেই বিরাট লবণাক্ত সমুদ্র। মানবের ধর্ম্মবুদ্ধি, তাহার সভ্যতা, তাহার cultureকে তাহার অবচেতন আত্মা সহজ করিয়া লইতে পারে নাই। তাই তাহার ধর্ম্ম "প্রীতিহীন," তাহার সমাজ "ক্ষমাহীন", আর মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতার মূলও এইখানে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ইহার আভাসমাত্র নাই। কুন্দনন্দিনীর হৃদয় এই সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয় নাই, তাহা পীড়িত হইয়াছে নগেন্দ্রনাথের বিরূপতায়, সূর্য্যমুখীর দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে। সেখানে টান পড়িলে তাহার নিজের দাম্পত্যজীবনের তারও ছিঁড়িয়া গেল। রাজলক্ষ্মীর ট্র্যাজেডির বীজ কিন্তু রহিয়াছে তাহার নিজের হৃদয়ের দ্বৈধতায়। এমন একটা সংস্কারের বোঝা তাহাকে বহন করিতে হইয়াছে যাহাকে তাহার অন্তরাত্মা আপনার করিয়া লইতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্রের রচনায় দেখিতে পাই দ্বিধা-খণ্ডিত হৃদয়ের এই দুর্ব্বলতা, আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রহিয়াছে মানব-মনের সংহত অপরাজেয় শক্তির বিকাশ। শরৎচন্দ্রের রচনার আয়তন স্বল্পপরিসর কিন্তু তাঁহার অনুভূতির তীব্রতা বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা মানবহৃদয়ের গভীরতম তলদেশে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু তাহার অনন্ত ব্যাপকতা, অপরিসীম স্ফূর্ত্তি; তাঁহার রচনায় মানবমনের বিরাট আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র সম্ভাবনীয়তা, মহান্ প্রচেষ্টার পরিচয় পাই। শরৎচন্দ্রের রচনায় কপালকুণ্ডলা মিলিবে না, বঙ্কিমচন্দ্র রাজলক্ষ্মীর আকাঙ্ক্ষার তলদেশে পঁহুছিতে পারিবেন না

ইঁহাদের মধ্যে এই যে প্রভেদ ইহা বিশেষ করিয়া প্রতিভাত হইবে শ্রী ও ষোড়শীর চরিত্রের আলোচনা করিলে। উভয়েই স্বামীপরিত্যক্তা, উভয়েই সন্ন্যাসিনী আর উভয়েই শেষ জীবনে স্বামীকে হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়া গৃহধর্ম্মকে অবহেলা করিয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদও অনন্ত। শ্রীর জীবনে মানসিক দ্বন্দ্ব নাই বলিলেই হয়—সে স্বামীকে জোর করিয়া চাহিত আবার তেমনি জোর করিয়া পরিত্যাগ করিল। ভোগলিপ্সা ও তিতিক্ষা—ইহার মধ্যে কোন কঠিন সংঘাত তাহার মনের মধ্যে হয় নাই। সীতারাম তাহার প্রণয়ভিক্ষা করিয়া তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটাইতে পারে নাই। জয়ন্তী তাহাকে রাজমহিষী হইতে বলিয়াছে, সীতারাম সকরুণ অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—সন্ন্যাসিনীর আবার সুখাকাঙ্ক্ষা! মাঝে মাঝে তাহার হৃদয় দুর্ব্বশ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার জীবনে এই দুর্ব্বলতা অতিশয় গৌণ, ইহাতে শক্তির কোন অপচয় হয় নাই। সে অক্লেশে অনায়াসে হৃদয়কে বশ করিয়াছে, আর তাহার সংহত শক্তি লইয়া হিন্দুরাজ্যের অভ্যুত্থানের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছে। এই বিরাট অভিযানে সে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, কারণ তাহার মনে কোন দ্বিধা ছিল না, তাহার জীবনে কোন আদর্শবিভ্রাট হয় নাই।

কিন্তু ষোড়শীর জীবনের গতি অন্যরূপ। যতদিন সে স্বামীকে দেখে নাই, যতদিন নারীজীবনের অন্তরতম অন্তস্তলে প্রবেশ করে নাই, ততদিন তাহার ভৈরবী-জীবন বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়াছে। কত সংখ্যাতীত রমণী তাহাদের জীবনের নিভৃততম অধ্যায়গুলি তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়াছে; সে সমস্তই দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখে নাই রমণী-হৃদয়ের কোন্ অন্তস্তল ভেদিয়া তাহাদের অভাব অনুযোগের স্বর উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু জীবানন্দর সংস্পর্শে আসামাত্রই তাহারা সমস্ত অতীত বিমথিত করিয়া বহুদিনের সুপ্তপ্রায় আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। হৈমকে দেখিয়া সে আরও বেশী করিয়া বুঝিতে পারিল রমণীর পক্ষে ভৈরবীর জীবন কত মিথ্যা। বহুদিনের নিদ্রিত অলকা জাগিয়া উঠিয়া তুমুল ঝড় বহাইয়া তুলিল। গৃহিণী হইবার, জননী হইবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তাহার মন আলোড়িত করিয়া তুলিল, সেই সদ্যঃনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের আহার ভৈরবীর জীবনে জুটিবে কি করিয়া? অথচ ষোড়শী—ষোড়শী। বহুদিনের পুঞ্জীভূত সংস্কার—তাহাকে যাও বলিলেই ত সে যাইবে না। জীবানন্দ ষোড়শীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "সন্ন্যাসিনীর কি সুখদুঃখ নেই? সে খুশী হয় পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই?" ষোড়শী উত্তর করিল, "কিন্তু সে ত আপনার হাতের মধ্যে নয়।" চণ্ডীগড় হইতে বিদায় লইবার সময়ও সে পুনরায় জীবানন্দকে বলিয়াছে, "পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের অভাব নেই কিন্তু এর মধ্যে আমাকে তুমি জড়াতে চাইচ কেন?" এই যে ষোড়শী ও অলকার মধ্যে দ্বন্দ্ব—সন্ন্যাসিনী ও গৃহিণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব—ইহা তাহার সমস্ত জীবনটাকে ভরিয়া রাখিল। এই দ্বন্দ্ব ও দুর্ব্বলতার ইতিহাস, ইহার চিত্রণেই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব। ইহাতে কোন বিরাট অনুষ্ঠান, মহান অভিযান নাই। বাহিরের শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ নাই—ইহা অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের গোপনতম কাহিনী। ইহাতে কোন আদর্শকে মহীয়ান্ করিয়া দেখান হয় নাই—আদর্শ, সংস্কার ও আকাঙ্ক্ষা মিলিয়া যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে শরৎচন্দ্র তাহাকেই রূপ দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের পরিচয় দিয়াছেন, আর শরৎচন্দ্র মানবহৃদয়ের অন্তরতম ফল্গুধারাকে আবিষ্কৃত করিয়াছেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

বড় অসময়ে এসেছ বন্ধু

শ্রীযুক্ত জসীম উদ্‌দীন

বড় অসময়ে এসেছ বন্ধু, আজিকার বালুচরে,
শুধু বালু আর গুঁড়ো কঙ্কর উড়িছে পবন ভরে।
শস্য ক্ষেতের রত্নপুরীতে ডাকাত দিয়েছে হানা,
ছিঁড়ে গেছে তারা ধানের জমির সোনার আঁচলখানা।
শুকনো 'নাড়ার' আগুন ধরায়ে কৃষাণ ফিরেছে ঘরে,
সহস্র শিখা উঠিছে জলিয়া মাঠের বক্ষ পরে।
এখন সজনী, কেন এলে হেথা আজিকার অবেলায়?
মোর যাহা কিছু তুলিয়া দিয়াছি সাঁঝের চিতায় হায়!
প্রেম, ভালবাসা, মান, অভিমান, নিবেদন, বিনিময়,
বালুর উপরে বসিয়া বসিয়া আজিকে করেছি ক্ষয়।
প্রত্যয় নাহি আর,
জীবনের পথে মানুষ কখনো সাথী হ'তে পারে কার।
বড় অবেলায় এসেছ বন্ধু, আজি বড় অসময়,
ষোলকলা চাঁদ ঘন বুঝাট গগনে হয়েছে লয়।

ছিল একদিন এই বালুচরে ধানের আঁচল ধরি
তটিনীর লতা দুলিত সোহাগে দুটি ফুল গানে ভরি।
সাদা পাখা মেলি বকের ছানারা এপারে ওপারে ঘুরি'
সেই ধানক্ষেত ভিজায়ে যাইত চঞ্চুতে জল পুরি।
দুধারে উধাও সরিষার ক্ষেত ছুঁইত গগন-ধার,
হলুদ, হলুদ – কেবলি হলুদে দিগন্ত একাকার।
সে হলুদে পশি মাঠের বাতাস, আলু-থালু বেশ-পাশ
এলায়ে হেলায়ে লুটায়ে গায়েতে মাখাইত ফুলবাস।

সরু পথখানি, সে পথখানিরে দুপায়েতে ডলি ডলি,
ভিন গাঁর মেয়ে হেসে হ'ত খুন ছিঁড়িয়া সরিষা কলি।
পাখীর রঙিন পালক কুড়ায়ে কতক গুঁজিয়া কানে,
কতক খোঁপায় গুঁজিত, বাকিটা কি করিত কেবা জানে।

সে-সব এখন ফুরায়েছে সখি, ভাঙা সরিষার ডাঁটা,
সারা মাঠ ভরি দাঁড়ায়ে র'য়েছে—কঠিন তীক্ষ্ণ কাঁটা।
কাটিলে কাটিলে কাটিতেছে মাটি, ফুলের বসন তার
গ্রীষ্মের রোদে পুড়িয়া পুড়িয়া হয়েছে ভস্ম-সার।

এখন সজনী, শুধু সন্দেহ, শুধুই অবিশ্বাস;
রূপালী মেঘের শুভ্র কেতন ছিঁড়িয়াছে নীলাকাশ।
গগন ঘিরিয়া জলিছে অসহ সহস্র রবি জ্বালা;
নিয়ে উথলে গোবী সাহারার তপ্তবালুর থালা।
মাঝখানে আজি মেঘ বলাকার মায়া-মরীচিকা ধরি'
নিঠুর রবির খর দাহ কেহ রাখে নাই সম্বরি।

আজিকে জেনেছি যে রবির করে ফুল ফুটেছিল বনে,
তারি দাহ লাগি সোনার কুসুম ঝরিতেছে এই ক্ষণে।
যে আলোর লাগি পতঙ্গ হয়ে উড়েছিনু পাখা ভরে,
আজি বুঝিয়াছি সে আলো-জ্বালায় মারণমন্ত্র করে।

সেই একদিন আকাশে ঝুলায়ে রামধনুকের রসি
প্রত্যয় ছিল টেনে আনা যায় ওপারের গাঁও শশী।
প্রত্যয় ছিল জলেতে পাতিয়া সাঁপলা লতার ফাঁদ
পল্লীদীঘিতে বেঁধে রাখা যায় 'পূর্ণমাসীর' চাঁদ।
সেদিন সজনী, প্রত্যয় ছিল দুটি কথা ভালবাসা;
তাই দিয়ে বেড়-বাঁধ রাখা যায় জলেতে বালুর বাসা।
সেদিন আমার সকল ধরণী পুরিয়া চিঠির খামে
কোন সন্দেহ হয়নি কখনো ভাবিব যে পরিণামে।
খোদার জগতে নানা ভুল, তাই চিঠির জগৎ গড়ি'
বিনা সঙ্কোচে কাটায়ে দিতাম দিনমান বিভাবরী।

আজি শুধু পড়ে মনে
জীবন মরণ কি ক'রে মিলায় একখানি চিঠি সনে।
একখানি চিঠি—কাগজের গায়ে আখরের আলপনা,
তারি মায়াপাশে কেন বাসা বাঁধে আকাশের কল্পনা!
একখানি চিঠি, নদী ভাঙা চরে গেহ-হীন চাষী তরে,
সোনার তরণী ভাসিয়া আসিত রূপালী পালের ভরে।
সেই চিঠি আজ উবিয়া গিয়াছে, আঁকা-বাঁকা তার লেখা,
বন্দী করিতে পারে না এখন দুই-পরবাস-রেখা।
ভাবিয়াছিলাম, সেই রেখা সনে কালের চক্রপথে
টেনে নিয়ে যাব এই ভালবাসা জীবনের গতি-রথে।
মহাদূরত্ব হানে ব্যবধান, চিঠির পাতার চেয়ে;
দেবনা তাহারে প্রশ্রয় কভু বহুদূরে যেতে বেয়ে।
সেই চিঠি তুমি ছিঁড়িয়াছ সখি, আজিকার ব্যবধান
নহে বিধাতার, এ কেবল তব আপন হাতের দান।

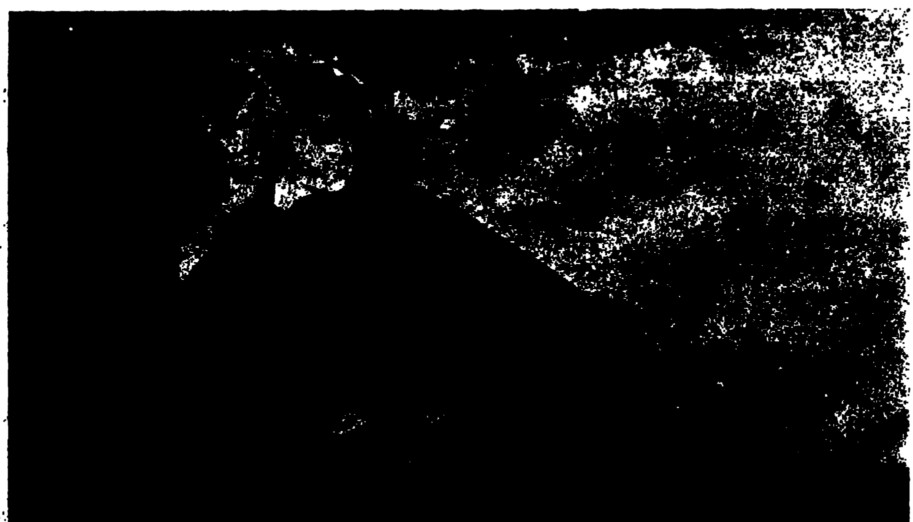
বড় হাসি পায় মনে!
ভালবাসি আমি, হেন কোন কথা কয় কেহ কারো সনে?
কাজল লতার বাঁধনে জড়ায়ে আজো কাঁদে কারো হিয়া,
পরিণয়-লেখা আজো লেখে কেহ সিঁথির সিঁদুর দিয়া?
দু'হাতে বাঁধিয়া দু'খানি কাঁকণ বন্দিনী করে নারী;
মাকড়ের জালে রবিরে বাঁধিবে শুনে হাসি পায় ভারি।
শুনে হাসি রাখা দায়!
অধরে অধর রেখে নাকি কেহ মনের নাগাল পায়।
বড় অসময়ে এসেছ বন্ধু, আজি বড় অসময়,
ধরণীর যাহা কিছু সব হ'তে হারায়েছি প্রত্যয়।

ছিল একদিন তোমার মুখের এতটুকু হাসি তরে
মোর ইহকাল পরকাল দিতে পারিতাম হাতে ধ'রে।
কত হাসি তব গড়ায়ে পড়েছে অকারণে কত খানে
কি এমন হ'ত এতটুকু তার ছড়াইলে মোর পানে।
কত কথা কও, দু একটি কথা মোরে যদি দিতে ধার,
জনম জনম তপ করিতাম ঋণ শোধ দিতে তার।
হায়রে কৃপণ, সেদিন আসনি, আজ এলে অবেলায়;
মেঘ ছিঁড়ে গেছে, এ রবির আলো বিছাইব কার গায়।

আজি এ শ্মশানে হাঁকিছে ডাকিনী, চিতাগ্নি উগারিয়া
ফিরিছে কপিল পিশাচবদনা রজনী কুজ্ঝটিয়া।
নাচিছে ঈশান ডম্বরু নাড়ি, অম্বর ধরাতল
তরাল তাহার চরণদোলায় করিতেছে টলমল।

জসীম উদ্‌দীন

বিচিত্রা



বিমনা হয়ে থাকি একাকী তরুতলে,

চিত্রশালা

জাপানী চিত্র



বন্ধুর পথ চলি তোমারে পাব ব'লে।



কখনো থাকি ব'সে বিজন পথপাশে,



সরায়ে শাখা কভু নেহারি কুতূহলে!



কাহার স্বর পাই, সহসা ফিরে চাই,



সুদূরে চেয়ে থাকি চাপিয়া আঁখিজলে !



সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্নানান্তে হেমচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুহাসিনী অঞ্চল-শায়িতা, ছয় মাসের শিশু শিশির স্তন্যপানে নিরত।



স্নানান্তে হেমচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সুহাসিনী অঞ্চল-শায়িতা, ছয়মাসের শিশু শিশির স্তন্যপানে নিরত।

ভাবপ্রবণ হেমচন্দ্রের এ দৃশ্য বড়ই মধুর লাগিল। ভাবিল, সুন্দর কি? বিকশিত কুসুম সুন্দর, না কুসুমের মুকুল সুন্দর? ঊষার আলোক সুন্দর, না আলোকের রেখা সুন্দর? কি সুন্দর? রূপসী রমণী সুন্দর, না কল্যাণী জননী সুন্দর? স্নেহময়ী মাতা সুন্দর, না মাতার নয়নপুত্তলী শিশু সুন্দর? কে সুন্দর?

হেমচন্দ্র ভাবিতে লাগিল, পূর্ণিমার চাঁদ সুন্দর, এমন সুন্দর কি? কবির প্রাণ সুন্দর, সে প্রাণের কল্পনাসৃষ্টি অতি সুন্দর—এত সুন্দর কি?

কিন্তু নাই কি— এত সুন্দর কিছু নাই? যদি থাকে, কে বলিবে, সে কি? উত্তর কৈ কেহ ত দিতে পারে নাই! আবহমানকাল মানুষ তুলনা খুঁজিতেছে, তুলনা ত কৈ মিলে নাই!

তা মিলে না, বুঝি মিলিবার নয়। নবোদ্ভিন্ন যৌবনে নবানুরাগে প্রণয়ের প্রথম চুম্বনে প্রেয়সীর যে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলে তাহারও তুলনা ত কৈ মিলে নাই! চাঁদের সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, নদীর সঙ্গে, বাঁশীর সুরের সঙ্গে, আগ্রহের বেগভরে কত তুলনাই না দিয়াছিলে, দিয়া তৃপ্তি ত কৈ হয় নাই! না হউক, তাহার পর যতদিন গিয়াছে সেই মুখখানি ততই ত সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, মধুরতর মনে হইয়াছে; কিন্তু মোহের প্রথম ও প্রধান কারণ যাহা—কালপ্রভাবে সে গোলাপী আভা ত ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে, চোখে লাগিয়াছে কি?

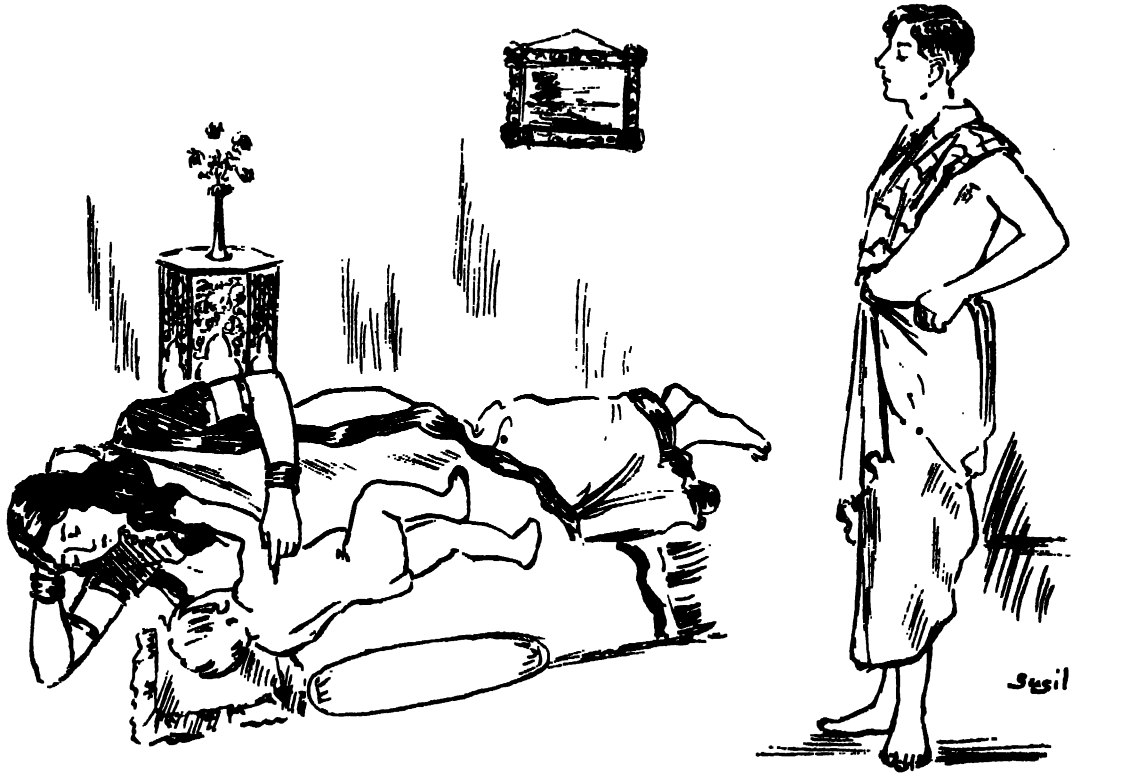
লাগে নাই! না লাগিবারই ত কথা। বয়সের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে নূতন সৌন্দর্য্যেরই অনুভূতি হয়, পুরাতনের মোহ শিরায় শিরায় বদ্ধ, স্মৃতির পবিত্রতায় সদা জাগ্রত, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় আদৌ জন্মে না, ফিরিয়া

তাকাইবার অবকাশও থাকে না। উচ্ছ্বসিত যৌবনের চঞ্চল রূপতরঙ্গের পরে মাতৃত্বের শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি তাই এত সুমধুর।

হেমচন্দ্রও সেই মধুরতায় বিভোর। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শিশু ও জননীর প্রতি চাহিয়াই রহিল। চাহিয়া চাহিয়া সহসা দেখিল, নবীন যৌবনে তরুণাননের যে লাবণ্য প্রাণে বিভীষিকাসন্তপ্তা হয় কেন? খরতর রৌদ্রেও মেঘ গর্জ্জে কেন?

কারণ কি, কেহ জানে না। ঘোর প্রহেলিকা!

হউক সমস্যা, হউক প্রহেলিকা, প্রহেলিকার জীবন কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। হেমচন্দ্রও ক্ষণিক বিচলিত হইয়াছিল। যেমন দেখিল, কায়া নাই, লাবণ্যের ছায়া মাত্র পড়িয়া আছে, সুপ্ত



হেমচন্দ্র দেখিল অবোধ শিশু কচি হাতের কোমল অঙ্গুলি দিয়া জননীর কেশাকর্ষণে ব্যাপৃত।

স্পর্শসুখোৎসব জাগাইয়া দিয়াছিল, সে ভাস্বর লাবণ্য ক্ষীণাভ, শ্রান্তিপরিম্লান। হেমচন্দ্র হৃদয়ে বিষাদের মৃদু কম্পন অনুভব করিল।

রূপ অস্থায়ী সত্য, নারী-সৌন্দর্য্য কায়িক সৌষ্ঠবে নয়, হৃদয়বৃত্তির প্রস্ফুটনে ইহাও সত্য, হেমচন্দ্র যে তাহা না জানিত এমন নয়, জানিয়াও যে বিভ্রান্ত হইয়াছিল তাহাও নয়, তবে সহসা তাহার প্রাণে ক্ষুণ্ণভাব দেখা দিল কেন?

কেন?—অপ্রতিহতগতি বায়ু সহসা গাম্ভীর্য্যাভিনয় করে কেন? আমোদতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতেও রমণী রূপতৃষ্ণা জাগিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল—অভাবের পরিচয় পাইলে, দুর্ব্বল দেখিলে ষড়রিপু এমনই কলরব তুলে! কলরবে হেমচন্দ্রের যেন মতিভ্রম ঘটিল—কাহার না ঘটে? হউক কু, তবু যে রূপ অয়স্কান্ত মণি—আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া ক্ষান্ত হয় না, পরকেও মগ্ন দেখিতে চায়—রূপ-তৃষ্ণা সৌন্দর্য্যপ্রিয়ের কখন কি ঘুচে? অন্তর বাহিরের সুকুমার সৌন্দর্য্যের উপাসক হেম—তাহারই বা ঘুচিবে কিরূপে?

ক্ষুণ্ণ মনে ক্ষুব্ধ নয়নে হেমচন্দ্র আবার চাহিল। দেখিল

অবোধ শিশু কচি হাতের কোমল অঙ্গুলি দিয়া জননীর কেশা-কর্ষণে ব্যাপৃত! কি স্পর্দ্ধা, কি সাহস! যে অলকরাশি স্পর্শ করিবার অধিকার দ্বিতীয় কাহারও ছিল না, ক্ষুদ্র শিশু সে অধিকার অনায়াসে কাড়িয়া লইয়াছে, লইয়া যথেচ্ছা উপদ্রব করিতেছে! হেমচন্দ্র বিভোর হইয়া নবাগত অংশীদারের বিক্রম দেখিতে লাগিল। একবার চাহে শিশুর কচি হাতের দিকে, পরক্ষণেই চাহে শিশুজননীর মুখের দিকে। কি সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্যের মহামেলা! ঐ মুখ—কে বলে, ঐ মুখে যৌবনের লাবণ্য ক্ষীণাভ, সে যে অটুট, অক্ষয়—মাতৃত্বের উজ্জ্বলালোকে সমুদ্ভাসিত। পরিবর্ত্তন—হাঁ, আছে বৈ কি, লালসার স্থানে পবিত্রতা! হেমচন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে আত্ম-হারা হইয়া গেল।

আত্মবিস্মৃত হেমচন্দ্র শিশুর প্রতি চাহিল। দেখিল, অপূর্ব্ব কান্তি, কমনীয়, লাবণ্যযুক্ত। ভাবিল, জীবনের সান্ত্বনা শিশু, আহা! বাঁচিয়া থাক্? বয়স বাড়িতেছে, বয়সের সঙ্গে স্বাস্থ্য স্মৃতি বুদ্ধি সব হারাইতেছি—হারাই না কেন, শিশু ত কুড়াইয়া পাইবে। মাথার কালো চুল সাদা হইতেছে, হইলই বা—শিশুর শিরে ত ঘনকৃষ্ণ নিবিড় হইয়া দেখা দিতেছে। জীবনের কত সাধই না অপূর্ণ, শিশুর হয় ত তাহা পূর্ণ হইবে, কত অভিলাষ কল্পনায় পর্য্যবসিত, শিশু হয়ত কার্য্যে পরিণত করিবে। জীবন-সঙ্গী নির্দ্দয় বৈফল্য-উপগ্রহ শিশুর অদৃষ্টে হয় ত সুপ্রসন্ন হইবে।

হেমচন্দ্র আনন্দাপ্লুত হৃদয়ে ডাকিল, "হাসি।"

হাসি নিরুত্তর।

হেমচন্দ্র আবার ডাকিল, "সুহাস।"

উত্তর নাই।

হেমচন্দ্র তৃতীয়বার ডাকিল, "সুহাসিনী।"

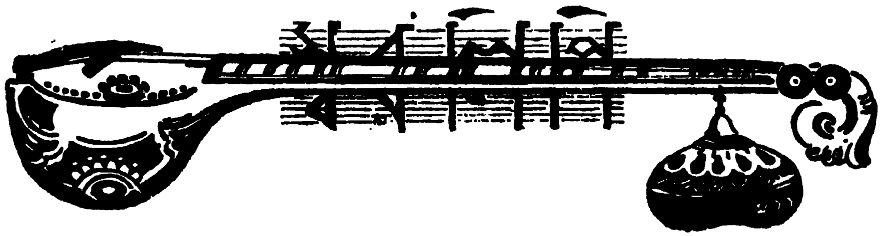
সুহাসিনী নীরব।

বিস্মিত হইয়া হেমচন্দ্র চাহিল। সুহাসিনী নিদ্রিতা নয় অথচ নীরব, নিরুত্তর! হেমচন্দ্র ভাবিতে লাগিল, কারণ কি? কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় নাই!—কেন? মৃদুস্বরে ত সম্বোধন হয় নাই! তবে কি সুহাসিনী কিছু ভাবিতেছে, তাই অন্যমনস্কা। কিন্তু কি ভাবিতেছে, কিসের এত ভাবনা, কাহার ভাবনা?

ভাবনার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া হেমচন্দ্র নিজেও ভাবনায় পড়িল। দুর্ভাবনায় বিষণ্ণচিত্তে হেমচন্দ্র ধীরপদে চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ মিত্র





৮

শীত

আইল শীত ঋতু হেমন্তের পরে
শীতল ধরণী এবে চাহে দিবাকরে।
কুন্দ শেফালিকা ফুলে
নীহার বিন্দু উছলে;
কুসুমকানন মূলে,
শ্রীরাগ বিহার করে।
রাগিণী নবরঙ্গিণী,
শ্রীরাগ অনুসঙ্গিনী,
নাচিছে লাস-ভঙ্গিনী,
গাহিছে মোহন স্বরে॥

—"কয়েকটি গান"—

কথা—শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত সুরসাগর

শ্রীরাগ—একতাল (মধ্যলয়)

	˙			৩			+			২		
II	সা	-ঋা	গা।	গঋা	ক্ষা	গঋা।	ঋপা	-া	-া।	পা	-া	পা I
	আ	-	ই	ল	শী	ত	ঋ	-	-	তু	-	হে
I	পপা	-ক্ষনা	দা।	পা	-া	পদা।	ক্ষা	-গঋা	-গা।	-গঋা	-া	সা I
	ম-	-ন্	তে	র	-	প-	রে	- -	-	-	-	-

I ঋা ঋা ঋা । সসা সগা ঋা । ঋা -গা -ঋা । সা -া -া I
শী ত ল ধ র ণী এ - - সে - -

I র্সা র্সা নর্সর্ঋা । না -দা পা । জ্ঞপা -দা -া । -পঋা -া সা II
চা হে দি - - বা - ক রে - - - - - -

II পা -া পা । পা পদা জ্ঞা । পা -র্সা র্সা । নর্সর্ঋা -নর্সা -া I
কু ন্ দ শে কা- লি কা - ফু লে - - - -

I র্সনা র্ঋা র্গা । র্গর্ঋা -া র্সা । নর্সর্ঋা -নর্সা নদা । দপা -া -া I
নী হা র বিন্ - দু উ - - - - হ লে - -

I জ্ঞা পা পনা । নদা দপা পা । পজ্ঞা -গা -ঋা । সা -া সা I
কু সু ম- কা- ন- ন মূ - - - লে - শ্রী

I সা -র্ঋা ঋা । র্সা -া -া । ঋা -া ঋা । ঋগা -ঋা সা II
রা - গ বি - - হা - র ক - রে

II পা -া পা । পা পদা জ্ঞা । পা -র্সা র্সা । নর্সর্ঋা -নসা -া I
রা গি ণী ন - ব র ঙ গি ণী - - - - -

I র্সনা র্ঋা র্গা । র্গর্ঋা -া র্সা । নর্সর্ঋা -নর্সা নদা । দপা -া -া I
শ্রী রা গ অ - নু স - - -ঙ গি নী - -

I জ্ঞা পা পনা । নদা দপা পা । পজ্ঞা -গা -ঋা । সা -া সা I
না চি ছে লা - - - স ভ- ঙ গি নী - গা

I সা -ঋা ঋা । র্সা -া -া । ঋা -া ঋা । ঋগা -ঋা সা IIII
হি - ছে মো - - হ - ন ম - রে

গান ও রাগ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

এ গানটি শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় আমাকে সুর দিতে দিয়েছেন। সুর সংযোগ করবার অনেক আগেই এ গানটি কবির "কয়েকটি গান" নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। সেই পুস্তকে গানটির সুর সময়োপযোগী হবে ব'লে শ্রীরাগ লেখা হ'য়েছে, এ জন্যে বাধ্য হ'য়ে আমাকে গানটিতে শ্রীরাগ সংযোগ করতে হ'য়েছে।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে শ্রীরাগের পরিচয় লেখা হ'ল।

শ্রীরাগ পূর্ব্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হয়েছে; ইহাতে র ও ধ কোমল, ও ম কড়ি। ইহার জাতি ওড়ব-সম্পূর্ণ; আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত বর্জ্জিত। ইহার বাদী স্বর রিখব ও সংবাদী পঞ্চম। গান গাইবার সময় সূর্য্যাস্তকাল। এই রাগ অত্যন্ত গম্ভীর রসাত্মক।

আরোহাবরোহ স্বরূপ।

সা, ঋা ঋা, সা, ঋা, হ্মা পা, না র্সা। র্সা, নদা, পা, হ্মগঋা, গঋা, ঋা, সা।

পকড় (রাগ পরিচয়াত্মক স্বরবিন্যাস)

সা, ঋা ঋা, সা, পা হ্মা গা ঋা, গঋা, ঋা, সা।

শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

সত্যাসত্য

—উপন্যাস— —শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৪১

উজ্জয়িনী যদি স্বভাবতঃ অভিমানিনী হতো, তবে বাদলের উপর রাগ করে সুধী'র চিঠি ছিঁড়ে ফেল্‌ত, ছুঁড়ে ফেল্‌ত, মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌ত। পৃথিবীর অন্য সবাইকে সেক্রেটারী দিয়ে চিঠি লেখানো যায়, কিন্তু—মরি মরি কী রুচি!—স্ত্রীকেও!

কিন্তু উজ্জয়িনীর মান-অপমান-বোধ তেমন তীব্র ছিল না। বাদলের উপর তার কিসেরই বা অধিকার! বিয়েটা বাদলের পক্ষে বিলেত যাওয়ার সামাজিক পাস্‌পোর্ট; না হলে চলে না বলেই সংগ্রহ কর্‌তে হয়েছে। বিলেতে নিরাপদে পৌঁছবার পর বাদল কি তার পাসপোর্টখানা কোন বাক্সে তুলে রেখেছে তা মনে করে রেখেছে? বিশেষতঃ বাদলের যে ভোলা মন! অল্প কয়েক দিনের পরিচয়ে বাদলের এ দিকটা উজ্জয়িনীকে মাঝে মাঝে হাসিয়েছে—অবশ্য মনে মনে হাসিয়েছে। একথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার আর একবার হাসি পেল। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে কত কথা মনে পড়ে গেল!

যতই মনে পড়ে যায় ততই কান্না পায়। বাদলকে সে ভালোবেসেছিল। অন্ততঃ বাদলকে তার ভালো লেগেছিল। ('ভালোবেসেছিল'—একথা মনে মনে স্বীকার কর্‌তেও তার কী লজ্জা!) বাদল যখন তার স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব লোকে নেমে এসেছিল, তখনকার সেই দিনগুলি কত ছোট ছোট ঘটনা, কথোপকথন ও ভদ্র ব্যবহার দিয়ে এক একটি বছরের মতো সুদীর্ঘ ও সুপূর্ণ বোধ হয়েছিল। বাদল হয় তো পাথর, কিন্তু উজ্জয়িনী কুমারী মেয়ে। বাদলের সান্নিধ্য তাকে কখনো ভাবাবেশময়ী, কখনো সচকিতা, কখনো স্নেহ মমতায় পরিপূর্ণা করে তুল্‌ত। সমস্তই বাদলের অজ্ঞাতসারে। বাদলের পক্ষে যা মামুলী কথা উজ্জয়িনীর কানে তাই কেমন সুধাবর্ষণ কর্‌ত। উজ্জয়িনী মনে মনে সেই সকল এলোমেলো কথাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ্‌ত, বিস্মৃতির মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যেতে দিত না।

কিন্তু বাদল যে দিন চলে গেল সেদিন থেকে উজ্জয়িনীকে বিরহ-বেদনায় উদাস কর্‌ল। বাদলের সঙ্গে তার সেই মধুর অতীত তার যতবার মনে পড়ে যায়, ততই মন টন টন করে—তাজা ক্ষতের উপর আঙুল লাগ্‌লে যেমন করে। প্রকৃতিগত আত্মরক্ষণেচ্ছা উজ্জয়িনীকে শেখালো বিস্মরণের কৌশল। উজ্জয়িনী অতীতকে চাপা দিতে লাগ্‌ল ভবিষ্যতের দোতলা তেতলা চারতলার তলায়। বাদল কাল এডেনে পৌঁছুবে, পৌঁছেই চিঠিখানা ডাকে দেবে, চিঠিখানা চলে আস্‌বে সেই দিনের বোম্বাই-মুখী জাহাজে। তা' হলে একদিন দু'দিন তিনদিন চারদিন······সাতদিনের দিন চিঠিখানা উজ্জয়িনীর হাতে এসে পড়্‌বে। আগ্রহাতিশয্যে উজ্জয়িনী দিনগণনায় গোঁজামিল দেয়। শনিবারের পর সোমবার, বুধবারের পর শুক্রবার, এই তার গণনার রীতি।

বার বার আশাভঙ্গের পর সে আশা কর্‌তে ছাড়্‌ল না বটে, কিন্তু নিরাশার সঙ্গে আপোষ করে নিতে শিখ্‌ল। বাদলের চিঠি আসে তো ভালোই, না আসে তো মন্দ কী! এমন তো একদিন ছিল যখন বাদল তার জীবনে ছিল না। এখন বাদল তার জীবন থেকে চলে গেছে ভাব্‌তে তার প্রাণ সয় না বটে, কিন্তু চলে যাবার অধিকার যে বাদলের আছে সে তো অস্বীকার করা যায় না।

বাদল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এই মুহূর্তে আছে এবং বেশ সুস্থই আছে। সুধী'র চিঠি থেকে এটুকু জান্‌তে পাওয়া তার যথালাভ। এইজন্যে চিঠিখানা খুলে সে অন্যায় করেনি। নইলে পরপুরুষের চিঠি খুল্‌তে তার সংস্কারে পীড়া লাগ্‌ত। হোক না কেন বাদলের অদ্বিতীয় বন্ধু।

সুধীকে সে মনে মনে সাধুবাদ দিল। কিন্তু উত্তর দেবে কি না স্থির করতে তার বহুদিন ও বহু রাত্রি, বহু চিন্তা ও বহু অনিদ্রা লাগ্‌ল। বাদলকে সে একরকম চেনে বলে চিঠি লিখ্‌তে সাহস পেয়েছিল, কিন্তু সুধীন্দ্রবাবু না জানি কত বড় বিদ্বান ও কত বেশী বয়স্ক। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত সম্ভ্রম দেখানো কি সহজ কথা! উজ্জয়িনীর চিঠিগুলি যে তিনি পড়েছেন এই ভাব্‌তে উজ্জয়িনী ঘেমে ওঠে। পড়ে নিশ্চয়ই দুষ্টু হাসি হেসেছেন, ভেবেছেন কী ছেলে-মানুষ! কী নির্ব্বোধ! তাঁর অপরাধ কী! উজ্জয়িনী নিজেও তো তার একমাস আগের আমি'র সঙ্গে আজকের আমি'র তুলনা করতে কুণ্ঠিত হয়। এই দু'এক মাসে সে কী কম বদ্‌লেছে, কম বেড়েছে! চেহারায় তার তেমন পরিবর্ত্তন হয়নি; তবে সিঁথিতে সিঁদুর ওঠা মেয়েদের জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। তাতে কেবল কপালকে রাঙায় না, কপোলকেও রাঙায়। মুখাবয়বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একটি অনির্দ্দেশ্য শ্রী গড়িয়ে পড়্‌তে থাকে, পারদের মতো চঞ্চল। এইমাত্র চোখে তো এইমাত্র চিবুকে, এইমাত্র ভুরুতে তো এইমাত্র অধরে।

সুধী'র প্রথম পত্রের উত্তর দেবার আগে তার দ্বিতীয় পত্র এসে পড়্‌ল। তাই নিয়ে উজ্জয়িনী হলো আরো বিব্রত। বাদল যেন পণ করেছে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখ্‌বে না। না লেখে নাই লিখুক, কিন্তু সুধীকে দিয়ে লেখানোর আবশ্যকটা কী ছিল! উজ্জয়িনী চেয়েছিল চিঠির ভিতর দিয়ে বাদলের সঙ্গ। বড় বড় সমস্যার মীমাংসা তো চায়নি, যদি বা চেয়ে থাকে তবে সে চাওয়াটা কেবল বাদলকে চিঠি লেখার একটা অবলম্বন জোগাতে; পাছে বিষয়ের অভাবে বাদল চিঠি লিখ্‌তে গা না করে। বড় বড় সমস্যার সমাধান তো এলো, কিন্তু কই তার মধ্যে বাদলের গলার সুর, বলার ভঙ্গী, ডান হাতের মধ্যম আঙুলটি দিয়ে মাথার চুলগুলোকে টেনে চোখের উপর নামানো ইত্যাদি মুদ্রাদোষ? সুধী'র পাকা হাতের পরিষ্কার লেখা, শান্ত সমাহিত মনের পরশ, বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর প্রতি প্রচ্ছন্ন গভীর স্নেহ উজ্জয়িনীর স্মৃতিকে সক্রিয় করল না। কে যে সুধী আর কী যে তার বক্তব্য— যেন চিঠি পড়্‌ছে না, একখানা ভালো লেখকের লেখা বই পড়্‌ছে ও বোঝবার চেষ্টা করছে। যেন এ চিঠি লাইব্রেরীতে বসে বাবার সাহায্যে পড়্‌বার, শোবার ঘরে খিল দিয়ে বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দকে বালিশের উপর পিষ্‌তে পিষ্‌তে কখনো হাস্‌তে হাস্‌তে ও কখনো চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে পড়্‌বার নয়। এ চিঠির ক দেখে কৃষ্ণকে মনে পড়ে না, হৃদয়াবেগকে নাড়া দিয়ে মন-কেমন করায় না এ চিঠি।

তবু কর্ত্তব্যের খাতিরে এর জবাব লিখ্‌তে হবে। না লিখ্‌লে যেটুকু বাদলের খবর পাওয়া যাচ্ছে সেটুকুও পাওয়া যাবে না।

উজ্জয়িনী সুধীকে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল।

৪২

লিখ্‌ল :—

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার দু'খানি পত্রই পেয়েছি। আপনার বহুমূল্য সময়ের বিনিময়ে আমার এ বহুমূল্য প্রাপ্তি। এই সৌভাগ্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি কি?

আপনার বন্ধু কেমন আছেন? অবশ্য সেকথা আপনি প্রতি সপ্তাহে বাবাকে লিখ্‌ছেন। সেই একই কথা প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকেও লিখুন এমন অনুরোধ করলে ছেলেমানুষী হবে। একে তো আমার ছেলেমানুষী আপনাকে নিশ্চয়ই কৌতুক দিয়েছে। আমার সম্বন্ধে আপনি কী যে ভেবেছেন, ভাব্‌তে গায়ে কাঁটা দেয়। ছি ছি! ডাকটিকিট সংগ্রহ করার কথা কেন যে লিখেছিলুম। সত্যি আমার ওসব 'হবি' আজকাল নেই।

পশ্চিমের মেয়েদের সম্বন্ধে উল্টো পাল্টা কত কথাই না শুনি। কোনোটাই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার জানাশুনার মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা এত বেশী আমাদের মতো যে তাঁরা কী পরেন ও কী খান সেই প্রমাণের উপর তাঁদের উপর সরাসরি রায় দেওয়া যায় না। বিচার করবই বা কেন? পারি তো ভালোবাস্‌ব। না পারি তো ছায়া মাড়াব না। আমার বাবারও এই মত। মিষ্টার সেন কী বলেন জান্‌তে ইচ্ছা করে। একটা মজার কথা দেখুন, জানি বলেই জান্‌তে ইচ্ছা করে। মিষ্টার সেন

গোঁড়া ইংরেজ বলে জানি। তাই জানতে ইচ্ছা করে তিনি কি তাঁর স্বজাতীয়াদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-বশতঃ আমাদের মতো বিজাতীয়াদের প্রতি বিমুখ? তাঁর বান্ধবীদেরকে আমার প্রণাম জানাবেন কি?

আচ্ছা, বিলেত গিয়ে আপনারা ফটো তোলান নি? আমার ফটো দেখ্‌বার মতো হলে নিশ্চয়ই পাঠাতুম। কিন্তু আপনার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করুন না? আমি নিতান্তই কালো আদমী। এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে ইস্কুলের সিক্‌স্‌থ্‌ ক্লাস্‌। আমার বাবার পাঠাগারে আমার বয়সের মেয়ের পড়্‌বার মতো বই অল্প কিছু আছে, তাই পড়েছি। কিন্তু সেই যৌতুক নিয়ে কি আপনার বন্ধুর যোগ্য হওয়া যায়?

আচ্ছা, আপনি কী করেন? কী পড়েন? আপনি মাসিকপত্রে লেখেন না কেন? লিখ্‌লে আপনার মূল্যবান চিন্তা দেশের কত পিপাসুর পিপাসা মেটায়। না, আপনার বন্ধুর মতো আপনিও এদেশের নন্‌? যে কেউ বড় হলেন তিনিই যদি বিদেশী হলেন তবে এ দুর্ভাগা দেশ কাকে নিয়ে বড় হবে? সত্যি বল্‌ছি, ইংরেজের প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই, তবু ইংরেজ আমি কিছুতেই হবো না। আমার দেশের মহান্‌ অতীত ও মহত্তর ভবিষ্যৎ তার বর্ত্তমানকালের গ্লানি ও লজ্জার থেকে বড়। সেই বড়ত্বের লোভে আমি ভারতীয়া। আমার বাবাও এই কথা বলেন।

আমার প্রীতি ও ভক্তিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি

বিনীতা

শ্রীউজ্জয়িনী দেবী

চিঠিখানা অনেক কাটাকাটি করে অনেক রয়ে বসে লেখা। তবু যতবার পড়ে দেখে ততবার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার নতুন নমুনা আবিষ্কার করে। ভালো কাগজে নকল করতে করতে বিলেতী ডাকের বার অতিক্রান্ত হলো বলে। তখন উজ্জয়িনী মরীয়া হয়ে ডাকঘরে চিঠি পাঠায়। এবং যতক্ষণ না ডাক চলে যায় ততক্ষণ পোষ্ট মাষ্টারকে লিখে চিঠিখানা ফিরিয়ে আন্‌বে কি না ভাবে।

চিঠি পায় না সে এক দুঃখ। চিঠি লিখ্‌তে জানে না সে আরেক। সুধীন্দ্রবাবু ও চিঠি একা পড়বেন না, বাদলকে পড়াবেন নিশ্চয়। দু'জন বয়োজ্যেষ্ঠ বিদ্বান লোক তার অন্তঃকরণকে হাতের মুঠার ভিতর পেয়ে হাস্য পরিহাসের হাতল করবেন। উজ্জয়িনী কল্পচক্ষুতে দুই বন্ধুর লণ্ডনস্থ বৈঠকখানার দৃশ্য দেখ্‌তে পায়্‌ছে। বাদল সেই গৌরবর্ণ কৃশকায় চিরচিন্তিত অস্থির-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাক্‌পটু বালকটি। তার বয়স ষোলো পেরিয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। আর সুধীন্দ্রবাবুর বোধ করি চুলে পাক ধরেছে; বয়সের গাছ পাথর নেই। তাঁর সংযম ও গাম্ভীর্য্য সেকালের মুনিদের মতো। তাঁর প্রতি অনায়াসে শ্রদ্ধা জন্মায়। আহা পিতৃকল্প মানুষ যে!

উজ্জয়িনী মনে মনে হাসে। হাসি পেলে মনে মনে হাসাটাই নিরাপদ। ধরো সুধীন্দ্রবাবুর সাম্‌নে যদি হাসি পায় তবে কি তার হাস্‌তে সাহস হবে? অথচ অদৃষ্ট তাকে এইসব মানুষের দলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একদিন হয় তো বিলেত যাবে তার শ্বশুরের সঙ্গে, ও এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবে। বিষম সমস্যা মানুষের সঙ্গে মেশা। বই পত্রের সঙ্গে মেশা কেমন নির্ঝঞ্ঝাট। ঐ করতে করতে তো সে বুড়ো হয়ে গেল। বুড়ো নয় তো কী। সাম্‌নের ফাল্গুনে সে সতেরোয় পড়্‌বে। এরি মধ্যে সে তার শৈশবকে ভুলেছে। অতীতের কথা বসে বসে স্মরণ করতে ভালোও লাগে না। সেই সময়টা বাদলের চিন্তায় বিভোর থাক্‌তে প্রাণ চায়।

উজ্জয়িনীর দেহে এই প্রথম রং ধর্‌ছে। এত দিন সে নিজের দেহ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। দেহ আছে কি না সে কথা লোকের মনে পড়ে প্রথমতঃ যখন অন্নাভাব ঘটে, দ্বিতীয়তঃ যখন প্রেম জাগে। উজ্জয়িনীরা পুরুষানুক্রমে বড়লোক। এক্স্‌ গুপ্ত তাঁর তিনি পুত্রকে নগদ তিনলাখ টাকার উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। তাঁদের কেউ বা মুর্শিদাবাদের সিবিল সার্জ্জন, কেউ বা রেলের ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, কেউ বা রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার। সুতরাং উজ্জয়িনীরা অন্নাভাবের কথা খবরের কাগজের থেকে যেটুকু জানে সেইটুকু জানে। সেকথা শুনে মোটারকম চাঁদাও পাঠায়; দেশের অন্নকষ্টের সুযোগ নিয়ে গীতাভিনয় কিম্বা নৃত্যাভিনয়ও করে। কিন্তু কিছুতেই দেহ সচেতন হয় না, যতদিন না প্রেম জাগে।

প্রেম আগে অর্থাৎ বিয়ে হয়ে যাবার পরে স্বামীর প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। এদিক দিয়ে উজ্জয়িনীরা গোঁড়া স্বদেশী। তাদের সেট্‌-এর কেউ যে প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে এমন সংবাদ কদাচ শোনা যায়। তারা বিয়ে না ক'রে, অন্ততঃ বাগ্‌দত্ত না হয়ে, প্রেমের নাম মুখে আনে না। মেয়ে কার সঙ্গে মিশ্‌তে পারে এবং কার সঙ্গে মিশ্‌তে পারে না এ সম্বন্ধে মেয়ের মা'রা তাঁদের অলিখিত মনুসংহিতা মেনে চলেন। উক্ত গ্রন্থের বারো আনা অংশ জুড়েছে পোজিশন ও উপার্জ্জন শীর্ষক প্রথম দুই অধ্যায়।

এক কথায় দেহ সচেতন হবার সুযোগ উজ্জয়িনীদের জীবনে বিশ একুশ বছর বয়সের আগে আসে না। উজ্জয়িনীর জীবনে তার আগেই এলো। উজ্জয়িনী তার মা'র ঘরের বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সৌভাগ্যক্রমে তার মা তখন কল্‌কাতায়। নিজেকে দেখে উজ্জয়িনীর বড় আশ্চর্য্য লাগে। সে তো সেই উজ্জয়িনী নয়। সে তো কোনো দিন এত সুদর্শনা ছিল না। এমন কি তার রঙ্‌ও যেন কিছু ফরসা হয়েছে। শীতকাল বলে কি? তার গাল দুটিতে মাংস লাগ্‌ছে ভাব্‌তে তার গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। তার চোখের পাতায় অকারণে জল চুইয়ে পড়ছে ভাব্‌তে তার খেয়াল হলো বালিশে মুখ গুঁজে ঘণ্টা খানেক খুব কাঁদে।

৪৩

একদিন সকালবেলা ডাক খুলে যোগানন্দ বল্লেন, "এ তো ভারি মুস্কিল হলো!"

উজ্জয়িনী মুখে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌ল না, কিন্তু চোখের চাউনিতে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, কেন? কী হয়েছে, বাবা?

যোগানন্দ চিঠিখানাকে আরো একবার পড়্‌লেন, প'ড়ে উজ্জয়িনীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। উজ্জয়িনী হাতের লেখা দেখে বুঝ্‌ল তার শ্বশুরের চিঠি। পড়ে দেখ্‌লে তিনি উজ্জয়িনীকে নিতে আস্‌ছেন; যোগানন্দ এবারও যেন আপত্তি না করেন; যোগানন্দের আরো দুই সন্তান এই দেশেই আছে, যোগানন্দ অনায়াসেই তাদের আনাতে পারেন; কিন্তু মহিমচন্দ্রের একমাত্র সন্তান বিদেশে; উজ্জয়িনীকে কাছে না পেলে তাঁর জীবন দুর্ব্বহ; বিশেষত তাঁর উপরিওয়ালারা তাঁর প্রতি যেমন দুর্ব্যবহার কর্‌ছে তাতে তাঁর সময় সময় ইচ্ছা কর্‌ছে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কাশীবাস করেন। "আর এ পথে সুখ নাই রে ভাই" (ইংরেজীতে লেখা); "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগাবন্তঃ। আর কয়টা দিন বৈ তো নয়। এতদিন ইহকালের কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টায় না করিলাম কী! তবু তো কালিকার নিউইয়ার্স উপাধি তালিকায় আমাকে উপেক্ষা করিয়া আমা হইতে জুনিয়ার ব্যক্তিকে O. B. E. করা হইল। এইরূপ অবিচারের উপর ব্রিটিশ এম্পায়ার টি'কিবে?"

দীর্ঘকাল একস্থানে থাক্‌তে কারই বা ভাল লাগে? নতুন জায়গা দেখ্‌বার সখ, নতুন মানুষের সঙ্গে মেশবার সাধ, বিশেষ ক'রে যে বাড়ীতে বাদল ছিল সেই বাড়ীতে থাক্‌বার সৌভাগ্য উজ্জয়িনীকে পাট্‌নার দিকে টান্‌ল। তবু তার চিরকালের সাথীকে, তার বাবাকে, ছাড়্‌তে পারা যায় না। পিতা ও কন্যার মধ্যে আকর্ষণ সাধারণত নিবিড় হয়েই থাকে। যোগানন্দ ও উজ্জয়িনীর বেলা নিবিড়তর। শুধু নাড়ীর টান নয় মনের মিল, মতের মিল। ওরা যেন দুটি সতীর্থ, দুটি সহাধ্যায়ী। লেখাপড়ায় যে ওদের মন বসে সেটা লেখাপড়ার খাতিরে ততটা নয় পরস্পরের খাতিরে যতটা। ছেলেরা ইস্কুলে যায় ছেলেদের সঙ্গ পাবার জন্যে।

যোগানন্দ হাসির ভাণ করে বল্লেন, "মহিমকে O. B. E. না ক'রে গবর্ণমেণ্ট আমার প্রতি অত্যাচার করলেন।"

উজ্জয়িনী কিছু বল্‌বার মতো কথা পেল না। চিঠিখানাকে আরেকবার পড়্‌তে বস্‌ল। যোগানন্দ তাঁর খবরের কাগজে মন দিলেন, অর্থাৎ মন দেবার ভাণ কর্‌লেন। কিন্তু বেশীক্ষণ পারেন না, মাঝে মাঝে ব'লে ওঠেন, "মহিমের ওখানে একেবারে অন্য চাল···জবরদস্ত হাকিম···আইনের বই ছাড়া অন্য বই রাখে না···ওর বাড়ীতে তোর সময় কাটবে কি করে?···খরচ ক'রে পার্টি দেয় বিস্তর···এও একটা চাল, বুঝ্‌লি না? পার্টি জমবে ভালো যদি তুই থাকিস্‌···হয়তো সম্রাটের জন্মদিনের উপাধিতালিকার উপরে নজর··· সেইজন্য তোকে নেবার জন্যে তাড়াহুড়ো।"

উজ্জয়িনী কোনোদিন পিতার মুখে পরনিন্দা শোনেনি। শুধু পরনিন্দা নয়, বাদলের পিতার নিন্দা। পিতা যে কতখানি

বিচলিত হয়েছেন অনুমান করতে পারল। কিন্তু কেমন ক'রে তাঁর সঙ্গে শ্বশুরের পক্ষ নিয়ে কিছু বলে? বিয়ে করলে মেয়েরা পর হয়ে যায় এ জাতীয় একটা অমূলক জনশ্রুতি তো তার অশ্রুত নয়।

তবু বল্ল, "বাবা, শোনো, ওঁর ছেলের জন্যে ওঁর মন-কেমন-করাটা নেহাৎ অবিশ্বাস্য নয়। ওঁর স্ত্রী নেই ব'লে ওটা আরো দুঃসহ। তুমি একবার নিজের অমন অবস্থা কল্পনা করো না?"

যোগানন্দ বিরক্তি চেপে বল্লেন, "মেয়ে হয়েছিস্, মেয়ের বাপ তো হস্‌নি! কল্পনা ক'রে দেখিস্।" এই ব'লে তিনি উঠে গেলেন স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করতে।

রাত্রের গাড়ীতে উজ্জয়িনীর মা এলেন। ব্যাপার শুনে উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন, "যাবে বৈ কি। যাবে না? পাটনা isn't a bad place; একটা প্রভিন্সের ক্যাপিটল। যদিও রায়বাহাদুর, তবু নেহাৎ কেউ কেটা নয়, এ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। ওঁকে সমাজে তুলতে হবে, সেটা ওঁর পুত্রবধূরই কর্ত্তব্য। ওঁর বাড়ী নিশ্চয়ই মিস্‌ম্যানেজ্‌ড্। ওসব কি আর পুরুষমানুষের কাজ!...তবে খুকিকে যেমন অমানুষ ক'রে তৈরি করেছ আর যা ওর বয়স তাতে একলা ওকে নিয়ে বেয়াই সুবিধা করতে পারবেন না।"

যোগানন্দ বক্তৃতার শেষে টিপ্পনি করলেন, "তার মানে তুমিও যেতে চাও।"

মিসেস বল্লেন, "ভালো দেখায় না। জামাইয়ের সংসার হলে কথা ছিল না, কিন্তু—। যাক্, খুকীর সঙ্গে একটি হাউস্‌কিপার্ পাঠাতে হবে, পাই কোথায়? মিসেস্ স্যামুয়েলস্‌কে পেলে দুইকাজ হয়, মেয়েটাকে কায়দা দুরস্ত রাখতে পারবেন। আহা, বেচারির এখন বড়ই দুর্দ্দিন যাচ্ছে।"

মিসেস্ স্যামুয়েলস্ এক কালে মিসেস্ সেনের বিশিষ্টা বন্ধুনী ছিলেন। উজ্জয়িনীরা তাঁকে আণ্টি ব'লে ডাকত এবং তাঁর কাছে চকোলেট উপহার পেত, উজ্জয়িনীর মনে পড়ে। মহিলাটি খাঁটি ইংরেজ, কিন্তু এক এদেশী খ্রীষ্টান প্রফেসারকে বিয়ে ক'রে অবধি এদেশে আছেন। এই সেদিন তাঁর স্বামী মারা গেছেন। বিলেতে তাঁর বড় কেউ নেই, যাঁরা আছেন তাঁরা তাঁর প্রতি বাম। দুটি নাবালক ছেলে নিয়ে চোখে সরষের ফুল দেখছেন। তবু পরের বাড়ী চাকরী করতে রাজি হবেন্ কি?

যোগানন্দ বল্লেন, "না হয় রাজি হলেন। কিন্তু মহিম ঠিক আমাদের ষ্টাইলে থাকেন না। শুনতে পাই তাঁর বাড়ী ঠাকুর-দেবতাও আছেন। কলেজে পড়বার সময় মহিমের যে কত বড় এক লম্বা টিকি ছিল গো! ঐ টিকি কেটে আমি কেমন বিপদে পড়েছিলুম তোমাকে বলিনি?"

উজ্জয়িনীর মা'র স্মৃতি পঁচিশ বছর পেছিয়ে গেল যখন তিনি উজ্জয়িনীর বয়সী। কিন্তু দেখতে উজ্জয়িনীর চেয়ে বহুগুণ সুন্দর—সেকালের নাম করা সুন্দরী। মহিমচন্দ্রের টিকি-কাটার গল্প মনে প'ড়ে যাওয়ায় তিনি বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ত্যাগ ক'রে সেই সেকালের মতো খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন কন্যার সাক্ষাতেই। বল্লেন, "রোসো, বেয়াই আসুন।"

বেয়াই যেদিন সন্ধ্যার ট্রেণে নামলেন সেদিন টিকি-কাটার গল্প কারো মনে ছিল না। রায় বাহাদুর মজলিসী মানুষ, একাই আসর মাৎ করেন। সরকার বাহাদুর তাঁকে O.B.E. করেননি ব'লে তাঁর ভুঁড়ি আধ ইঞ্চিও কমেনি, সেই ভুঁড়ির উপর যখন হাসির বেগ ব'য়ে যায় তখন যেন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়। তাঁর মাথা জোড়া টাক দেখে তাঁর টিকির কথা কারো মনেই উঠল না। যোগানন্দ ভাবছিলেন তাঁর আসন্ন কন্যাবিরহের কথা; মহিম যতই হাসেন যোগানন্দ ততই কাঁপেন! একজনের যে কারণে এত উল্লাস অপর জনের সেই একই কারণে এত বিষাদ। যোগানন্দ-জায়া ভাবছিলেন মিসেস্ স্যামুয়েলসের কথা কোন সুযোগে তোলা যায়। আর উজ্জয়িনী? উজ্জয়িনী অকৃতজ্ঞ কন্যা। সে বাদলের বাবার মুখে বাদলের আদল খুঁজছিল।

৪৪

কদমকুঁয়ায় রায় বাহাদুরের মস্ত বাড়ী। পুত্র পৌত্রাদি সহ হিন্দু ও মুসলমান ভৃত্যেরা সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। তাদের গৃহিণীরা উজ্জয়িনীকে দেখবার জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিল—বাদল বাবুরা না জানি কেমন মেমসা'ব,

সাদী ক'রে গেছেন। তারা বোধ করি কিছু হতাশ হলো উজ্জয়িনীর রং ও পোষাক দেখে। কিন্তু খুসীও হলো। আহা, বড় ছেলেমানুষ। বাদল বাবুয়ার সঙ্গে একটুও বেমানান হয়নি।

ঘরে তারা ভিড় ক'রে রয়েছে, নড়্‌তে চায় না। উজ্জয়িনীর বাঙ্গালী ঝি-টি বহু অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছে, "তোমরা এখন যাও, বাছা। খুকী বাবা একটু বিশ্রাম করবেন।" কিন্তু ঝি-র ভাষা শুনে ওরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। উজ্জয়িনী গোটা কয়েক হিন্দী ধমক জানে; কিন্তু ব্যবহার কর্‌তে অনিচ্ছুক; অগত্যা এই ময়লা কাপড়া পরা হাস্যমুখরা কৌতূহলী নারীব্যূহ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বিশ্রামের আশা ত্যাগ ক'রে বাড়ীর সমস্তটা পরিদর্শন করতে বের হলো।

অনেকগুলো ঘর। দেশী ও বিলাতী আস্‌বাবের গুদামের মতো দেখ্‌তে। স্থান অস্থান নেই, যেখানে সিন্দুক সেখানে সোফা। কার্পেটের উপর ষ্টোভ প'ড়ে রয়েছে। নববর্ষের ক্যালেণ্ডারগুলো দেয়ালে দেয়ালে লম্বমান। রাধা-কৃষ্ণের পট, বিলাতী রূপসীদের ছবি, রায় বাহাদুরকে কারা বিদায় সম্বর্দ্ধনা করেছিল তার ফটো ও সেই উপলক্ষে রচিত ইংরেজী কবিতা—উজ্জয়িনী যেন একটা আর্ট গ্যালারীতে পদার্পণ করেছে! এই সকলের মাঝখানে কোন কোণে বালক বাদল পুরস্কারের বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে উজ্জয়িনীর চক্ষু জলে ভ'রে উঠ্‌ল।

আপাতত এই তার কাজ, এই সমস্ত ঘরকে ঝেড়ে পুঁছে নতুন ক'রে সাজান গোছান। তারপর দাসদাসীর দলকে যখন তখন যে-ঘরে খুসী ঢুক্‌তে না দেওয়া। সম্ভব হলে ওদের সবাইকে 'লিভারি' (livery) কিনে পরানো। ওদের বাচ্চাগুলোকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যনীতি।

এই সব চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে উজ্জয়িনী একটি ছোট ঘরে তালা বন্ধ দেখ্‌তে পেল।

বেহারা বল্ল, "এটা বাবুয়াজীকী কামরা আছে।"

উজ্জয়িনী বল্ল, "খোল, দেখব।"

বাদলের পড়ার ঘর। আলমারিতে রাশি রাশি ইংরেজী-বাংলা বই। টেবিলের উপর এখনো কালি ব্লটিং পেপার প'ড়ে আছে। তার কোথাও কি উজ্জয়িনীর নাম উল্টো ক'রে ছাপা নেই? টেবিলের উপর একটি মহিলার ফটো-গ্রাফ হেলানো অবস্থায় রয়েছে। ও হরি, ও যে আনা পাভ্‌লোভা। বাদলকে তিনি স্বাক্ষরিত ফটো পাঠিয়েছিলেন বুঝি?

বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে উজ্জয়িনী বাদলের ড্রয়ার খুলতে ব'সে গেল। তাড়া তাড়া চিঠি। পৃথিবীর কত দেশের কত প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ নামের স্বাক্ষর। সাধে কি বাদলের এমন আত্মবিশ্বাস। সে যে বাদলের যোগ্য নয় এজন্যে তার ক্ষোভ নেই। কোন মেয়েই বা যোগ্য?

বাদলের পড়ার ঘরের চাবী উজ্জয়িনী নিজের হাত-ব্যাগে পুর্‌ল। বাদলের শোবার ঘরে নিজের বিছানা পাত্‌ল। ও ঘরে একখানা বড় সাইজের ফটোগ্রাফে সুধী বসেছে, বাদল দাঁড়িয়েছে। উজ্জয়িনী ওখানাকে এমন স্থানে রাখ্‌ল যেখানে ঘুমবার আগে ও ঘুম থেকে উঠে আপনিই চোখ যায়। ভাবছিল ফটোগ্রাফকে রোজ মালা গেঁথে পরাবে, কিন্তু তা হলে যে সে মালা সুধীকেও পরানো হয়। উজ্জয়িনী জিভ্‌ কাট্‌ল। সুধীকে যেমন কল্পনা করেছিল তেমন নয়। বেশ যুবা পুরুষ, মাথার চুল কালোই। বরঞ্চ বাদলেরই কপাল ঘেঁসে টাক পড়্‌বার লক্ষণ। বাদলের থেকে সুধী কালো, কিন্তু ঢের বেশী হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। বাদলের প্রতিভা বাদলের চোখের তারার দীপ্তিতে। সুধীর প্রতিভা সুধীর আভাময় ললাটে। উভয়কেই উজ্জয়িনী নমস্কার কর্‌ল।

দু'দিন পরে শ্বশুর মহাশয় যখন মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের প্রসঙ্গ পাড়লেন উজ্জয়িনী বল্ল, "কাজ নেই বাবা, তাঁকে এ বাড়ীতে বেখাপ হবে। আমাদের অনেক পোষ্য, অনেক অতিথি, এদের নিয়ে আমি বেশ আছি, আমার আর সমাজের জন্যে তৈরি হয়ে কাজ নেই।"

মহিম বল্লেন, "আঃ হাঃ হাঃ হাঃ, বুঝেছি মা বুঝেছি। এই সরল সত্যটা না জানা থাক্‌লে হাকিমী কর্‌তে পার্‌তুম? মেয়েরা তাদের কর্ত্তৃত্বে ভাগ কখনো কাউকে দিতে রাজি হয় না। কিন্তু মা, তুমি যার স্ত্রী তার জন্যে তৈরি হতে হবে

তোমাকে। সে আই-সি-এস্ হয়ে বছর দুই পরে যখন ফিরবে তখন তার চোখে যেন তোমাকে আসল বিলিতী মেয়ের মতো দেখায়।"

উজ্জয়িনী বল্ল, "আমি খাঁটি বাঙ্গালী হতে চাই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এক্ষ গুপ্তর নাত্‌নী বলে খাঁটি বাঙালী হতে চাই। ওরে মেয়ে, তোদের তিন পুরুষ বিলেত ফেরৎ। তুইও একদিন হবি।"

"কিন্তু বাবা, এক্ষ গুপ্ত যে কত বড় স্বদেশপ্রাণ পুরুষ ছিলেন সে কি আপনি জানেন না? বিলেত গেছলেন সেই চোগা চাপকান প'রে।"

রায় বাহাদুর গম্ভীর হয়ে বল্লেন, "তবু আই-সি-এস অফিসারের স্ত্রী, আই-সি-এস্ অফিসারের মেয়ে, সমাজে তোমার অবস্থার মেয়েরা যেমন, তুমিও তেমনি না হলে মানাবে কেন? গান্ধীর স্ত্রী খদ্দর পরেন গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যে।"

উজ্জয়িনীর ইচ্ছা কর্‌ছিল বলে, সঙ্গতির কথা যদি বল্লেন তবে এ বাড়ীর খোল ও নল্‌চে দুই বদ্‌লাতে হয়, মায় আপনাকে পর্য্যন্ত। আপনার স্যুটের সনে আপনার টাই বেমানান, আপনার ঐ পাগড়ীটি ইংরেজী পোষাকের সঙ্গে যায় না, আপনি স্নানের নাম ক'রে স্নানের ঘরের লাগাও ঠাকুর ঘরে ব'সে গুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ করেন, বিদেশী ঢঙের খাবার নামমাত্র মুখে দিয়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ তরকারি খান, আপনি এডগার ওয়ালেসও রাখেন যোগবাশিষ্ট রামায়ণও রাখেন, সিগারেটও ফোঁকেন আলবোলাও গুড় গুড় করেন। মিসেস্ স্যামুয়েলস্ এ বাড়ীতে এসে কেবলি হাসি চাপতে থাক্‌বেন সে আমি হতে দেবো না।

উজ্জয়িনী এতদিন পরে নিজের সংসার পেয়েছে, নিজের মনের মতো ক'রে সাজাবে। ও বাড়ীতে মা'র আধিপত্য, জোর ক'রে কিছু চালাতে পার্‌ত না; তার সাজেস্চনগুলো তার বাবার বেনামীতে মা'র দরবারে হাজির কর্‌ত, তাতেও ফল হতো না। এতদিনে সে স্বরাজ পেয়েছে, তার শুভবুদ্ধি যা বলে সে তাই কর্‌বে, ফ্যাসান কিম্বা প্রথার শাসন মান্‌বে না। এক্ষ গুপ্তের নাৎনী সে, এক্ষ গুপ্তের মতোই সংস্কারক। যোগানন্দের কন্যা সে, যোগানন্দের মতোই বৈজ্ঞানিক। বাদলের স্ত্রী সে, বাদলের মতোই উচ্চমনা।

৪৫

উজ্জয়িনীদের বাড়ীর একটি বিশেষ ঘর থেকে পাশের বাড়ীর একাংশ চোখে পড়ে। একদিন উজ্জয়িনী দেখল একটি আঠারো উনিশ বয়সের তরুণী বধূ তার আপিস্-প্রত্যাগত স্বামীর জুতো খুলে নিয়ে ভিজে গামছায় পা মুছে দিচ্ছে। দৃশ্যটি উজ্জয়িনীর পক্ষে এমন অপূর্ব্ব যে উজ্জয়িনী চুরি ক'রে দেখতে দ্বিধা বোধ কর্‌ল না।

স্বামীটিরও বয়স বেশী নয়, সুধীন্দ্রবাবুর বয়সী হবে। সে ভারি লজ্জিত ভারি কুণ্ঠিত হয়ে স্ত্রীর সেবা নিচ্ছে, মুখ ফুটে আপত্তি জানাচ্ছে না, জানে যে আপত্তি নিষ্ফল।

স্বামীকে খাবার দিয়ে স্ত্রী পাখা হাতে নিয়ে বস্‌ল। পাখার দরকার ছিল না। শীতকাল। তবু স্বামীটি আপত্তি কর্‌তে পারে না, পাখার হাওয়া খেতে খেতে মৃদু মৃদু হাসে। সে যে আপিস থেকে অনেক খেটে অনেক কষ্ট পেয়ে ফিরেছে, স্ত্রীর মতো বাড়ীতে ব'সে ব'সে আরাম করেনি তো। মুখ ফুটে না বল্লেও স্ত্রীর মনোভাবটা যেন এই।

উজ্জয়িনীর অন্যত্র কাজ ছিল ব'লে সে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পার্‌ল না। আবার যখন এলো তখন দেখল স্ত্রীটি স্বামীকে বাবু-বেশে সাজিয়ে দিয়ে বল্‌ছে, "বন্ধুদের বাড়ী বেড়াতে না গেলে ওঁরা যে কুণো ব'লে ঠাট্টা কর্‌বেন, বল্‌বেন বৌ-পাগলা, স্ত্রৈণ।"

স্বামী এর উত্তরে কী একটা বল্‌বার জন্যে ঠোঁট নাড়ল। স্ত্রী তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্ল, "চুপ।" কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্ল, "মা শুন্‌তে পাবেন যে। ছিঃ।"

একদিন উজ্জয়িনী মা-টিকেও দেখল। স্বামীর মা শাশুড়ী। মেয়েটি তার শাশুড়ীকে পাগল হরনাথের তত্ত্ব-কথা প'ড়ে শোনাচ্ছে। উজ্জয়িনী কান পেতে যতটুকু শুন্‌ল ততটুকু তার বিশেষ ভালো লাগল। তাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় আধ্যাত্মিকতা নেই। তার বাবা ভগবান সম্বন্ধে সংশয়বাদী, তার মা ও দিদিরা বিপদে পড়লে ভগবানের নাম করে বটে, কিন্তু তাদের একটা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত নেই। তাদের সমাজের লোক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধন মানের উপাসক। যদিও নামে তারা কেউ বা হিন্দু, কেউ বা ব্রাহ্ম, কেউ কেউ বা

উজ্জয়িনীর মনের খোরাক থেকে যেন একটা উপাদান বাদ প'ড়ে আস্‌ছিল, তাই তার মনের পুষ্টি তার মনের মতো হচ্ছিল না। এইবার যেন সে ভিটামিনের সন্ধান পেল। শ্বশুরের লাইব্রেরী ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে হরনাথের বই পেল না, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ যা-কিছু পেল সমস্ত চুরি করল। রামায়ণ মহাভারত তার পড়া ছিল, ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে নয়, প্রাচীন ভারত সভ্যতার বিশ্বকোষ ব'লে। কিন্তু "চৈতন্য চরিতামৃত," "ভক্তমাল গ্রন্থ," "রামকৃষ্ণ কথামৃত," ইত্যাদি তাকে অনাস্বাদিত রস দিল।

সেই মেয়েটির জীবন উজ্জয়িনীর লোভনীয় লাগে। আহা, উজ্জয়িনীরও যদি একটি শাশুড়ী থাকত! আর উজ্জয়িনীর স্বামীটি যদি থাকৃত কাছে! কেমন অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ সংসার। তাদের তো ঝি-চাকর অগুন্‌তি নয়, একটি মাত্র ঠিকে ঝি। মেয়েটি রান্না করে নিজের হাতে। উজ্জয়িনী লুকিয়ে তার কাজ দেখে। উজ্জয়িনী যদি লেখা পড়া এত না শিখে রান্না করতে শিখত! ফ্যান্সী সেলাইয়ের কাজ না শিখে যদি ফাটা বালিশ রিফু করতে শিখত। পিয়ানো বাজাতে শেখার দুরন্ত দুশ্চেষ্টায় বহু সময় নষ্ট করেছে, সেই সময়টাতে বাজার হিসাবের খাতা লিখলে কাজ দিত।

মহিম দিনে আপিস করেন, রাত্রে সমপদস্থ দেশীয় চাকুরেদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ও তাস খেলতে যান। তাঁর ইচ্ছা আছে পদমর্য্যাদা আরেকটুখানি বাড়লে ইউরোপীয় ক্লাবের মেম্বার হবার জন্যে দেহপাত করবেন।

উজ্জয়িনী আহারের সময় ছাড়া শ্বশুরের সঙ্গ পায় না। সেজন্য ওর আফশোষ নেই। রবিবারে তিনি তাকে পীড়াপীড়ি করেন অমুক সাহেবের বাড়ী সঙ্গে নিয়ে যেতে। সে বলে, আজ নয়, আরেক দিন। কারুর সঙ্গে তার আলাপ করবার সাধ নেই, আছে শুধু ঐ প্রতিবেশিনী মেয়েটির সঙ্গে। কিন্তু ওদের বাড়ী যে নিজের থেকে যাওয়া যায় না। ওরা তো বড় চাকুরে নয়। কলেজের লেক্‌চারার। একটা পুরো বাড়ীর এক চতুর্থাংশ ভাড়া নিয়েছে। ওদের বাইরের ঘরে দরোয়ান নেই। স্বামীর কোনো বন্ধু এলে হাঁক দেন, "কমল বাড়ী আছ হে?" কেরোসিন তেলওয়ালা এলে ডাক দেয়, "মাইজি।"

উজ্জয়িনীর ভারি হিংসা হয়। তাকে কেউ "মাইজি" বলে না? এত কাল ছিল "খুকী বাবা"। এখন "ছোটা মেম সাব্।" তা নইলে স্বামী ও শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গতি হয় না। মহিমকে সাহেব না বলে বাবু বল্লে তিনি কেবল মনে মনে নয় মুখেও বড় চটেন। একদিন কাকে যেন বল্‌ছিলেন, "রায় বাহাদুর উপাধিটা, মশাই, উপাধি তো নয় উপদ্রব বিশেষ। ওটা না থাক্‌লে সিবিল লিষ্টে আমার নামের আগে মিষ্টার ছেপে দিত। ওর চেয়ে, মশাই, রায় সাহেব উপাধি ভালো। তবু তো সাহেব।"

ও বাড়ীর মেয়েটিও এ বাড়ীতে পা দেবার কথা ভুলেই থাকে। ওর কিসের অভাব? ওর স্বামী যতক্ষণ থাকেন না ততক্ষণ শাশুড়ী থাকেন। কোনো কোনোদিন শাশুড়ীকে নিয়ে সে তাদেরই সমান অবস্থার কোন উকীলবাবু বা ডাক্তারবাবুর বাড়ী গল্প করতে যায়। তাঁরা এলে তাদের বস্‌বার জন্যে মেজেতে সতরঞ্চি পেতে দেয়, পান সেজে আনে। বেশীর ভাগ কথা উঠে স্বামী সংক্রান্ত—কার স্বামী কত ভালো, কার স্বামীর আপিসের কাজ কত বেশী সময়-সাপেক্ষ, উপর-ওয়ালাদের কেন মরণ নেই, কোথায় বদলি হলে দুধ-ঘির সুবিধে। বাজার খরচের কথা উঠে। ঝি-চাকরগুলোকে বিশ্বাস করবার জো নেই, দোকানদারগুলো ভেজাল দেয়, পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। পুলিশ থেকে আসে দেশের প্রসঙ্গ। গান্ধী মহারাজ কী করছেন, সি-আর-দাস মারা যাবার পর থেকে আন্দোলনটাও মরে রয়েছে, সাহেবরা কি কিছুতেই রাজত্ব ছাড়্‌বে, কেই বা নিজের জমিদারিখানি বিলিয়ে দিতে চায় বলো?

থেকে থেকে বেশ একটু অশ্লীল আলোচনাও হয়। অমুকবাবুর স্ত্রীর ক'মাস চল্‌ছে, অমুকবাবুর স্ত্রী আর পারে না, প্রত্যেক বছর একটি। ভগবানের দান। তাঁর উদ্দেশ্য বোঝে, ছার মনুষ্যের এমন সাধ্য নেই। "আচ্ছা, সকলের হয়, আমাদের বীণার কেন হয় না?"

উজ্জয়িনী সেই থেকে জান্‌ল মেয়েটির নাম বীণা। মেয়েটির চোখ ছলছল করে উঠ্‌ল, মেয়েটি মুখ নীচু করে বল্ল "যাও!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

গীতি-কবিতায় বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস

শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন ঘোষ

কবি নবীন চন্দ্র লিখিয়াছেন "কবিতা অমৃত, আর কবিরা অমর।" কিন্তু কবিতা বিশেষে অমৃত, কবি বিশেষে অমর। কবি কালিদাস অমর, কবি সেক্সপিয়ার অমর, শেলী, কীটস্, বায়রণ অমর, তাঁহাদের কবিতাও অমৃত।

আর বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার আদি কবি, তাঁহারও অমরত্বের দাবী কে অস্বীকার করিবে? বাংলার সাহিত্য-আকাশের উদয় শিখরে তিনি প্রভাত সূর্য্যের মত উঠিয়া বাঙ্গালীর মুখমণ্ডলে নবীন দীপ্তি, নবীন গরিমা দান করিয়া গিয়াছেন; বাংলার ভাব, বাংলার ভাষাকে নূতন পথে চালিত করিয়া এই সুললিত বাংলা সাহিত্যের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনিই বঙ্গ সাহিত্যের গুরু। ইংরাজি সাহিত্যে Chaucerএর যে স্থান, বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাসের স্থানও সেইরূপ।

কবি চণ্ডীদাস প্রচলিত মতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কবি। অনেকের মতে তিনি কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক। তাঁহার পূর্ব্বে বাংলা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল সে বিষয় বর্ণনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। বাংলা সাহিত্য তখন কেবল শৈশব অবস্থায় পদার্পণ করিয়াছে। তখনও তাহার পরিপুষ্টি হয় নাই। তাহার উপর সে সময়ের সামাজিক অবস্থা। দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলার ও উড়িষ্যার দুর্দ্দিন চলিয়াছিল। ভাব বিকার, রুচি বিকার সমাজের উচ্চতর সোপান হইতে নিম্নতম স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছিল। সে যুগের বাংলা ভাষার রূপ ছিল অমার্জ্জিত; রুচি ও ইঙ্গিত ছিল বিকৃত। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' যতই উচ্চভাব ও লালিত্য থাকুক না কেন তাঁহারও রুচিবিকার উপেক্ষা করিয়া যাওয়া যায় না। এই অমার্জ্জিত সাহিত্যক্ষেত্রে কবি চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় বড়ই মঙ্গলসূচক। সেই প্রাচীন বিকৃত-রুচি গীতিকা-সাহিত্যের উপর আপনার অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভা বলে চণ্ডীদাস নূতন আলোকপাত করিলেন। বর্ত্তমান যুগের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়া তিনি ভবিষ্যতের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহার মন্ত্রপূত অঙ্গুলিস্পর্শে বাংলা ভাষায় নবজীবন সঞ্চার হইল, সাহিত্যের এক নূতন অধ্যায় গড়িয়া উঠিল। প্রথম হইলেও কবি চণ্ডীদাস বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবিদের মধ্যে অন্যতম।

চণ্ডীদাস প্রেমের কবি। প্রেমই তাঁহার কবিতার প্রাণ, সৌন্দর্য্য, সৌরভ। তাঁহার রচনাবলী প্রায়ই গীতি-কবিতা। গীতি-কবিতাতেই চণ্ডীদাস-প্রতিভার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি। গীতি-কবিতাই বঙ্গ সাহিত্যে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ দান, তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। কবি চণ্ডীদাস বলিতে আমরা শুধু গীতি-কবিতাতেই তাঁহাকে বুঝি।

এখন গীতি-কবিতা সম্বন্ধে আমাদের দুই একটি কথা জানিতে হইবে। গীতি কবিতা বলিতে আমরা সাধারণতঃ (১) নাতি দীর্ঘ, সহজ, সরল আবেগপূর্ণ কবিতা বুঝি। (২) ঐ কবিতার প্রাণ ব্যক্তিগত কোন বিশেষ ভাব বা আবেগের পূর্ণ বিকাশ (emotionalism.) (৩) ইহার বর্ণনীয় বিষয় প্রেম, তাহার বিভিন্ন অবস্থা—মিলন, বিরহ, সুখ, দুঃখ, অভিমান, অনুযোগ, নিবেদন ইত্যাদি। (৪) এই কবিতার রূপ, গতি ও ভঙ্গি অতি সহজ ও সরল। এখানে শব্দের সুললিত ঝঙ্কার, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, সুরের আলাপ বাঁধা থাকে। এই জন্যই ইহাকে গীতি কবিতা বলা হয়। (৫) গীতি কবিতায় সাধারণতঃ একটি ভাবের পূর্ণ বিকাশ থাকে; সেইভাবে একেবারে ব্যক্তিগত মনের, হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রাণপূর্ণ উচ্ছ্বাস। এখানে অপরের কথা লইয়া বর্ণনা করিবার সুযোগ নাই, অপরের কার্য্যাবলী কীর্ত্তনের স্থান নাই। শুধু কবির নিজ

হৃদয়ের প্রবল দুর্নিবার আবেগ 'প্রেমের তাড়িত স্পর্শে ও প্রবল উচ্ছ্বাসে স্বতঃই বাহিরে আসিতে চায়, কখনও আপনার রূপেই ধরা দেয়, কখনও বা অপরকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। গীতি-কবিতায় কবি-হৃদয়ের ছবি পাই। কবির অন্তরাত্মা এখানে সহস্ররূপে বাহির হইয়া আসে। এখানে আছে কবির সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন, আপনার প্রেমের আনন্দের দুঃখের সঙ্গীত-রসাস্বাদ।

বঙ্গসাহিত্যে গীতি-কবিতার উৎপত্তি জয়দেবের সুললিত, সহজ রাধাকৃষ্ণমূলক সঙ্গীতগুলির মধ্যে। তাঁহার সময় হইতেই বাংলা দেশে গীতি-কবিতার স্রোত প্রবাহিত হইল; সেই স্রোত বাংলা সাহিত্যে কলনাদিনী তটিনীর রূপ ধারণ করিল বৈষ্ণব কবিদের রচনাবলীর মধ্য দিয়া। আর সেই রচনার প্রথম গুরু কবি চণ্ডীদাস। তাই চণ্ডীদাস বাংলা গীতি-কবিতার আদি কবি।

গীতি-কবিতা শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নিজস্ব নয়। প্রত্যেক দেশেরই সাহিত্যের মধ্যে গীতি-কবিতার (lyrics) একটি বিশেষ স্থান আছে। ইংরাজ কবি Shelly, Keats, Byron, Scott, Browning, প্রভৃতি সকলেই আপনাদের বিভিন্ন রচনাবলীর মধ্যে অনেক গীতি-কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশেও চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কবিরাও গীতি-কবিতায় আপন আপন কবি-প্রতিভার বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। চৈতন্যপর বৈষ্ণব কবিগণ, বিহারীলাল, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ সকলেই অল্প বিস্তর গীতি-কবিতাতে আপন আপন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এমন কি আধুনিকতম বাংলা সাহিত্যেও গীতি-কবিতার ছড়াছড়ি। এই সকল রচনাবলীর সহিত চণ্ডীদাসের রচনা আলোচনা করিলেই গীতি-কাব্যে চণ্ডীদাসের স্থান কতকটা নিরূপণ করা যাইতে পারে।

চণ্ডীদাসের রচনার মধ্যে 'পদাবলীই' অমৃত ভাণ্ডার। পদাবলী রচনা ছাড়াও চণ্ডীদাসের আরও রচনা আছে। আর একখানি গ্রন্থ 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' অনেকের মতে তাঁহারই রচিত। চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহিত তুলনা করিলে 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' অনেক লঘু ও বিকৃত রুচি পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য অনেকেই বলেন যে, 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' ও 'পদাবলী' একই চণ্ডীদাসের লেখা নয়। দীনেশবাবুর মতে দুইটিই চণ্ডীদাসের রচনা; 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' চণ্ডীদাসের অল্প বয়সের রচনা ও 'পদাবলী' তাঁহার পরিণত বয়সের লেখা। বাস্তবিকই "কেনা বাঁশী বড়ায়ি কালিনী এই কূলে"—'কৃষ্ণ কীর্ত্তনের' এই পদটি শুনিয়া কবির আর একটি অমর সঙ্গীত মনে পড়ে—"সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!"

চণ্ডীদাসের রচনাবলীই তাঁহার গীতি-কবিতার মালা। চণ্ডীদাসের গীতি-কবিতা প্রেমের কবিতা, আত্মানুভূতির কবিতা, আত্মনিবেদনের সঙ্গীত। তাঁহার রচনায় যে ব্যাকুলতা আছে, যে আবেগ আছে, যে গভীর মর্ম্মস্পর্শী হৃদয়-ঝঙ্কার আছে তাহার তুলনা আছে কিনা বলা যায় না! চণ্ডীদাসের বর্ণনা নিখুঁত। যদিও তাঁহার ভাষা অনেক রূপান্তরিত হইয়া আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তথাপি তাহার মধ্যেই আমরা তাঁহার ভাষা-লালিত্য বেশ বুঝিতে পারি। চণ্ডীদাসের ভাষা সহজ, সরল, স্বচ্ছ। উদ্দাম তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, উন্মত্ত ঝটিকাবেগ নাই, নির্ম্মল স্বাভাবিক গতিতে এ ভাষা আপনার মনে আপনি বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও চিরবিরহী হৃদয়ের করুণ অশ্রু নির্ঝর, কোথাও অপূর্ব্ব মিলনের নির্ম্মল আনন্দ ধারা, কোথাও বা মান অভিমানের মধ্য দিয়া বাঞ্ছিতের সহিত মিলিত হইবার দ্বিগুণ বাসনা চিরঅমৃতময় সঙ্গীত ধারায় ভক্তিমার্গে তরঙ্গিয়া চলিয়াছে। চণ্ডীদাসের ভাষার মধ্যে কোথাও চেষ্টা নাই, জোর করিয়া নানা উপমা অলঙ্কারে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়াস নাই। এখানে দুর্ব্বোধ্য কিছুই নাই; এ ভাষার মধ্যে অস্পষ্ট, ঝাপ্সা, কুয়াশা ভাব নাই; এ সঙ্গীতের চ্যুতি নাই, পতন নাই। সমস্তই অখণ্ড, সরস, সরল হইয়া হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে ভরিয়া আছে। এই ভাষার দিক দিয়া, এই সরলতা মাধুর্য্যের দিক দিয়া চণ্ডীদাসের গীতি-কবিতা বাংলা সাহিত্যের নব-জীবন-রস-ধারা।

চণ্ডীদাসের গীতি-কবিতাগুলি এক একটি ক্ষুদ্র, নাতি-

দীর্ঘ কবিতা, এক একটি ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি, এমন সুর-তাল-লয়যুক্ত যে প্রত্যেকটি একটি অখণ্ড, প্রকৃত সঙ্গীত। এই এক একটি সুকুমার সুরভি-ফুলে কবি চণ্ডীদাস বঙ্গবাণীর অঙ্গ ভূষিত করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণস্পর্শী সজীবতা, যে আবেগ আছে তাহার তুলনা নাই। সরল, সত্য, সাধারণ কথায় মধুর সঙ্গীত-রসে যে গান বাংলার দীন, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, গ্রাম্য কৃষকের প্রাণে একটা মর্ম্মস্পর্শী আবেগ আনিয়া দেয় সেই ভাষায়, সেই সঙ্গীতেই কবি চণ্ডীদাস কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে সুরুচিপূর্ণ সমাজের উচ্চতর শিক্ষার উপযোগী করিবার কোন চেষ্টা নাই। তাই চণ্ডীদাসের সঙ্গীত, গীতি-কবিতা পাশ্চাত্য কবিতা হইতে বিভিন্ন। চণ্ডীদাসের কবিতা বুদ্ধিকে নাড়া দেয় না, একেবারে মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তোলে। তাই Swinburne-এর 'Trimph of Time,' Shellyর Epipsychidion, প্রভৃতি গীতি-কবিতা ঠিক একরূপ নয়। চণ্ডীদাসের মধ্যে এত বিচিত্র, বাহুল্য বর্ণনা নাই। তাঁহার কবিতা এত দীর্ঘও নয়। পাশ্চাত্য কবিদের অপেক্ষা চণ্ডীদাসের কবিতা পবিত্রতায় অনেক উচ্চে। তাঁহার গভীর, আকাশস্পর্শী পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা পাশ্চাত্য গীতি-কবিতায় পাওয়া যাইবে না। চণ্ডীদাস শুধু কবি নহেন; তিনি সাধক, ভক্ত, চির-বিরহী, চির-তৃষ্ণার্ত্ত, পরমাত্মার মিলন পিয়াসী ব্যাকুল মানব-আত্মার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

তাহার পর চণ্ডীদাস-কবিতার ভাব, আবেগ ও রস। চণ্ডীদাস ভাষাকে ভাবের একান্ত অনুগত, আজ্ঞাবহ মনে করিতেন। তাঁহার রচনায় নানাবিধ শব্দবিন্যাস নাই, উপমা-প্রাচুর্য্য নাই, ভাষার উত্থান, পতন, দুরূহতা নাই, প্রাঞ্জল স্বচ্ছ হৃদয়ের ছবিটি ছত্রে ছত্রে আপনি বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার কবিতাগুলি বাস্তবিকই বাক্যময় চিত্র-মালা। অনেকে বলেন চণ্ডীদাস অশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া ভাষাকে তিনি নানা রূপ দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস অশিক্ষিত ছিলেন একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তাঁহার শব্দ-সম্পদ তেমন না থাকিলেও তাঁহার পদ-লালিত্য কে অস্বীকার করিবে?

"ধনি! তোমায় রহিয়া জানে কে?
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাহিয়া করিতে নারি শেষ,
* * *
গঞ্জন বচন তোর, শুনি মুখে নাহি ওর
সুধাময় লাগয়ে মরমে,
তরল কমল আঁখি তেরেছ নয়ন দুটি
বিকাইনু জনমে জনমে।"

আবার

"মিলন দুঁহু তনু কিবা অপরূপ!
চকোর পাইল চাঁদ পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ,
কমলিনী পাওল মধুপ;
* * *
আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ
ভাব ভরে গদ গদ চামর ঢুলায়ত
পাশে রহি চণ্ডীদাস।"—

প্রভৃতি পদগুলি এত সরল ভাবে প্রাণের কথা বহিয়া আনিতেছে যে কাহার না হৃদয় এ সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইবে?

চণ্ডীদাস ভাবের কবি। কবিতা পড়িতে তাঁহার হৃদয়টিই আগে দেখিতে পাই। চণ্ডীদাসের যে 'অন্তর সহিত প্রেম-বিজড়িত' রহিয়াছে তাহাই সহস্ররূপে বাহির হইয়া আসে। এমন গভীর প্রাণপূর্ণ আবেগ বুঝি আর কোন কবিতাতে নাই। চণ্ডীদাস নিজেই প্রেমিক, সাধক, রজকিনীর 'কাম-গন্ধহীন' 'নিকষিতহেম' তুল্য প্রেমের চির পূজারী। কবি চণ্ডীদাসের এই আত্মানুভূতি, এই ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস রজকিনী রামীর প্রেম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই প্রেমই আবার রাধাকৃষ্ণের হৃদয়-ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া আপনার পূর্ণ বিকাশ, অবাধ স্বাভাবিক লীলা দেখাইয়া চলিয়াছে। চণ্ডীদাস কখনও রাধা রূপে, কখনও বা কৃষ্ণ রূপে প্রেমের আবেগ, উত্তাপ, সুখ, দুঃখ অনুভব করিয়াছেন; ভাবের পূর্ণ প্রবাহে, কল্পনার নির্ম্মল করস্পর্শে তাহাকে চির-সুন্দর স্বর্গীয় সৌরভময় করিয়া তুলিয়াছেন। তাই চণ্ডীদাস এত সুন্দর, তাই তাঁহার কবিতা এত অমৃতরসস্বাদ পূর্ণ।

এই যে ব্যক্তিগত ভাবোৎকর্ষ, এই আত্ম-নিবেদন ইহা পূর্ব্ব যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যাইবে না। Shelleyর কথায় "The Worship the heart lifts above and the Heavens reject not"—এই ভাবের এই প্রেম-বর্ণনার প্রথম কবি চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস আদি রসের কবি, ভক্তি রসের সাধক।

চণ্ডীদাসের কবিতার ছত্রে ছত্রে স্বাভাবিক ভক্তি-প্রবণতা, 'বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ' 'বঁধু কি আর কহিব আমি, জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইয়ো তুমি' 'শীতল বলিয়া শরণ লইনু ওদুটি কমল পায়'—এই মর্ম্ম-বেদনা নিবেদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। চণ্ডীদসের প্রেম-গীতি বৈষ্ণব সাধনার রাধাভাবের চরম উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণ বিকাশ। দীনেশবাবুর মতে চণ্ডীদাসের রচনায় নায়িকা রাধা অপেক্ষা 'রাধা-ভাবে'রই অধিকতর বিকাশ। পদাবলী সাহিত্যে সর্ব্বত্র আবার এই আধ্যাত্মিক ভাব তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই।

অনেক স্থলে নায়ক নায়িকার পূর্ব্ব-রাগ, বিরহ, মান, সম্ভোগ মিলন প্রভৃতি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভক্ত ভগবানের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ ও লীলা ভাব তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি চণ্ডীদাসকে ছোট করা যাইতে পারে? কবিতা দর্শন নয়, নীতি-শাস্ত্রও নয়। গীতি-কবিতায় মনের ভাবকে বাহিরে আনিতে হইবে। যাহা সহজে স্বাভাবিক ভাবে যে রূপ নিতে চায় তাহাকে তাই দিতে হইবে। জোর করিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিকতায় সুন্দর করা প্রকৃত কবির কাজ নয়। তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের সমস্ত রচনা পাঠ করার পর মনে হয় যে তিনি দেহ-বর্ণনা, রূপ-বর্ণনা, দেহের সম্বন্ধ, দেহের মিলন অপেক্ষা ভাববিহ্বল প্রাণের প্রাণারামের রূপদর্শন ও মিলনের আনন্দকে সুস্পষ্ট-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। দেহের মিলন অপেক্ষা মনের মিলনকেই চণ্ডীদাস বড় বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাই চণ্ডীদাসের রাধিকা ভাবময়ী, উন্মাদিনী, প্রেম-বিহ্বলা; প্রথম হইতেই তিনি নাম শুনিয়া পাগল—'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম? কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ। না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে, জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সখি, তারে?" তাই চণ্ডীদাসের কবিতার পদে পদে আত্মবিসর্জ্জন, স্বাধিকার-লোপ, তন্ময়তা ও মধুর ভাব। তাই Shellyর মত চণ্ডিদাসও "Innocent is the heart's devotion with which I worship thine"—এই প্রেম-মন্ত্রেরই কবি। দেহের মিলনকে তিনি যতদূর সম্ভব উচ্চস্তরে লইয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস-কাব্যের চরম উৎকর্ষ ভগবানের পদে আত্ম-বিসর্জ্জনে। পুনর্মিলনে রাধিকার মুখ দিয়া তাই কবি বলিয়াছেন—

"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ,
দেহ মন আদি তোমাতে সঁপেছি কুলশীল জাতি মান।
অখিলের নাথ তুমিহে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন।
পীরিতি রসেতে ঢালি তনুমন দিয়াছি তোমার পায়
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন চায়।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত, ভালমন্দ নাহি জানি
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম তোহারি চরণ খানি।"

নায়িকার এই প্রেমোচ্ছ্বাস ভক্তের আত্ম-নিবেদনে পরিণত হইয়া মানুষের সাধারণ সহজ স্বাভাবিক প্রেমকে স্বর্গদ্বারে লইয়া গিয়াছে। জগতের গীতিকাব্যে এমন মধুর আনন্দময় প্রেমের পরিণতি আর নাই। এ সঙ্গীত শুধু কবি চণ্ডীদাসের মনের কথা নয়, রাধা-কৃষ্ণের প্রাণের ব্যথা নয়—ইহা বিশ্বমানবের মর্ম্মের কথা, চিরবিরহী মানবাত্মার আশার বাণী,—তাই সকলের মর্ম্মস্থল এমন করিয়া স্পর্শ করে।

চণ্ডীদাসের রূপ বর্ণনায়ও সংযম আছে। অকারণে তিনি শ্লীলতাকে সুরুচিকে আঘাত করেন নাই। দেহের সৌন্দর্য্য-বর্ণনার মধ্যেও তাঁহার ভক্তির মধুর বিহ্বলভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। "দুইটি মোহন নয়নের বাণ দেখিতে পরাণ হানে, পশিয়া মরমে ঘুচায় ধরমে পরাণ সহিতে টানে"; আবার 'চাহনি বিভঙ্গী যেমনি তিখিনী, তিখিনী শর, দেখিয়া অঙ্কুর উপজিল জর, মদন পাইল ডর,"; "দুহু কোলে

দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" সম্ভোগ-মিলন-অধ্যায়েও "পরশে অবশ," "ভাবে ভরল মন" ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা দেহের মিলনকে তিনি যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ও সৌরভ-ময় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় খণ্ড নগ্ন সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সমস্ত সৌন্দর্য্যটিই চিত্র-পটের মত প্রকাশিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস প্রেমের একটি অবস্থা বর্ণনা করেন নাই, প্রেমের সকল অবস্থাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বরাগের শ্যামনাম তাঁহার মরমে প্রবেশ করিয়াছিল, 'মোহন চাহন নয়নের বাণ' তাঁহার পরাণ টানিয়াছিল, তাঁহার হৃদয়ের ভাষা বিরলে বসিয়া 'সদাই ধেয়ানে' মেঘের পানে চাহিয়াছিল, স্বপ্নসম প্রেম তাঁহার হৃদয়ে জড়াইয়া গিয়াছিল। নাম জপিতে জপিতে তাঁহার তনু অবশ হইয়া গেল, সম্ভোগ মিলনে মন ভাবে ভরিয়া উঠিল, শয়নে স্বপনে শ্যামরূপ দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া কাঁদিতে জনম গেল;" পুনর্মিলনে বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। প্রেম-ভিখারী চণ্ডীদাসের মনে রোষ নাই, ক্রোধ নাই, বরং তাহাতে প্রেমের দ্বিগুণ আকর্ষণ। চণ্ডীদাসের রাধিকা হিয়ার মাঝারে যতনে মনের কথা বিরলে রাখিতে চান, 'শ্যাম চিকন ধন'কে ছাড়িতে পারেন না। তিনি সদাই মনে মনে ভয় করিয়াছেন "সে রূপ-লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে, হিয়া হইতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে।" ভাব-সম্মিলনে চণ্ডীদাস উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধকের সহানুভূতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—রাধিকা হইয়া তিনি গাহিয়াছেন :—

"শ্যাম সুন্দর, শরণ আমার, শ্যাম শ্যাম সদা সার,
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণমন, শ্যাম সে গলার হার,"
"তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।"

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—গীতার এই ভাবে রাধিকা উন্মাদিনী, কবি চণ্ডীদাস আত্মহারা। কৃষ্ণ হইয়া আবার তিনি বলিয়াছেন—"উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী··· ইত্যাদি"—"গৃহ মাঝে রাধা কাননেতে রাধা সকলে রাধারে দেখি—শয়নে, ভোজনে, গমনে রাধিকা, রাধিকা সদাই মতি।" এখানে রাধিকা জগতের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় রাধিকা 'যুগে যুগে যেন তৃণে জলে ধূলির তলে"—এক হইয়া রহিয়াছেন। 'বিটপী লতায় জলদের গায়' জড়াইয়া রহিয়াছেন। রাধাভাবে বিরাট বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে। এই তন্ময়তা বিশ্বব্যাপী প্রেমভাব চণ্ডীদাসের শেষ বাণী।

বিদ্যাপতির গীতিকাব্যে ভাষা-সম্পদ চণ্ডীদাসের অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু এত ভাবের ঐশ্বর্য্য নাই। দৈহিক বর্ণনায় তিনি অনেক সময় শ্লীলতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তবুও তাঁহার ভাবোল্লাসের অনেক পদই মনোরম। "আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়িনু" র মত পদ গীতি-সাহিত্যে অতি বিরল। ভাবোচ্ছ্বাসে তিনি এক-এক স্থানে চণ্ডীদাসকেও অতিক্রম করিয়াছেন। তাহার নিদর্শন তাঁহার অমর সঙ্গীত—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের মত তত নির্ম্মল স্বাভাবিক, সহজ সরল ভাবোচ্ছ্বাস—বিদ্যাপতির ছত্রে ছত্রে মিলিবে না। বিদ্যাপতি সময়ে সময়ে চণ্ডীদাসের সমান উঁচু হইয়া উঠিয়া এক একবার ছাড়াইয়াও গিয়াছেন, কিন্তু বেশী ভাগই তিনি চণ্ডীদাসের অপেক্ষা নিচু হইয়া চলিয়াছেন। চণ্ডীদাস-কাব্যে যাহার একান্ত প্রাচুর্য্য, বিদ্যাপতি-সাহিত্যে তাহার কচিৎ প্রকাশ।

চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী যুগে গীতি-কবিতায় তাঁহার সমান প্রতিভাশালী কেহ জন্মান নাই। আধুনিকতম যুগে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ একমাত্র চণ্ডীদাসের সহিত একাসনে বসিতে পারেন। চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহার ও বিদ্যাপতির অনুকরণে কবিতা লিখিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের কবিতায় ভাষার সরলতা সত্ত্বেও ভাবের দারিদ্র্য লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে কবি মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে চণ্ডীদাসের মধুর স্বরলহরী ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু তাহাকে বিচিত্র রূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই—তবুও তাঁহার রচিত—

"হায় রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর,
তব প্রিয় সৌদামিনী কাঁদে নাথ, একাকিনী
রাধারে ভুলিলে কিহে রাধা মনোহর ?"
"কেন এত ফুল তুলিলি সজনি ! ভরিয়া ডালা
মেঘাবৃত হ'লে পরে' কি রজনী তারার মালা ?"

ইত্যাদি পদগুলি চণ্ডীদাসের কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভক্ত মাত্রেরই প্রাণে আঘাত করে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও গীতি-কবিতার মধ্যে 'রাধা ভাবের' নানা রূপ দেখিতে পাই। বৈষ্ণব-সাহিত্যের কাছে যে তিনি তজ্জন্য ঋণী একথা অস্বীকার করা যাইবে না। তাঁহার কবিতায় চণ্ডীদাসের মত সহজ, সরল, স্পষ্টভাব বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-প্রতিভা শতমুখী, চণ্ডীদাসের মত গীতি-কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার কবিতাতেও আধুনিক নূতন বিচিত্র ছন্দে, শব্দ-সম্পদে, বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের আত্মত্যাগী প্রেম, ঘরবাড়ী-ছাড়ান জীবন-বিসর্জন করান ব্যাকুলতা আছে। তাঁহার কবিতায় "তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার" এ ভাব আছে, তাঁহারও হৃদয়-কুটিরে এখনও 'কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা,' এখনও 'ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে অন্ধ মনোরথ,' তাঁহার নায়কও নায়িকার জন্য কাঁদিয়া বলিয়াছেন 'আমার প্রেয়সি, আমার দেবতা, আমার বিশ্বরূপী "রয়েছ বিশ্বজুড়ে' ! সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছ তবুও আপন অন্তঃপুরে।" তাঁহারও অন্তরাত্মা প্রেমমার্গে চির প্রেমময়ের সহিত মিলিত হইবার আশায় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত চণ্ডীদাসের তুলনা এত অল্প কথায় করা যাইবে না। গীতি কবিতায় চণ্ডীদাসকে রবীন্দ্রনাথের পথ-প্রদর্শক একথা বলিতে বোধ হয় দোষ নাই।

চণ্ডীদাস চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অমর কবিতা এখনও জাগিয়া আছে। এখনও বিশ্বের চিরবিরহী চিত্ত সহস্র সংসার বন্ধনের মধ্যেও মাঝে মাঝে কাহার বাঁশী শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া ওঠে, এখনও বলে 'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম ?" এখনও নিঃসঙ্গ হৃদয় মিলনের আশায় বাঁচিয়া আছে, এখনও মানবাত্মা মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে,

"এখনও বাঁশী বাজে যমুনার তীরে,
এখনও প্রেমের খেলা, সারা নিশি সারা বেলা
এখনও কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন ঘোষ



বিলাসিনী

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চলন-বিলের ধারেই বিলাসিনী বোষ্টমীর ঘর, ছেঁচা বেড়ায় ঘেরা, মাটি দিয়ে নিকনো পরিচ্ছন্ন কুটীরটি সবারই মন ভোলায়। তার বেড়ার গায়ে সজ্‌নে ফুল ফুটে থাকে; একটা কৃষ্ণ-চূড়ার গাছ খড়ের চালের উপর তার পুষ্প-সম্ভার বিস্তার ক'রে একটি ঘন লাল চন্দ্রাতপের সৃষ্টি ক'রেছে।

বিলাসিনী যৌবনের সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে; যৌবনের প্রখর দীপ্তির পরিবর্ত্তে একটি স্নিগ্ধ কোমলতায় তার সারা দেহ মন পরিপূর্ণ, যেন মেঘলা দিনের স্থির আকাশ, মেঘের উদ্দাম খেলা নেই—বর্ষণও সুরু হয় নি। কিসের ভাবে যেন তার সারা দেহ সদাই ঢল ঢল করে; অজানিত আনন্দের আবেশে তার মুখ নিয়তই উজ্জ্বল; সে চলে দুলে দুলে, কি সুর যে তার মনে জাগে তা সেই জানে। কথা কয় ঘাড় নেড়ে, নিজের মনেই সে কথার জবাব পায়; পানের রসে তার ঠোঁট দুটি সর্ব্বদাই রাঙা; সে পরে চিকণ কাপড়, চুল বাঁধে পরিপাটি করে; চলন-বিলের অথই জলে গা ভাসিয়ে স্থির হ'য়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কি আবেশে তার চোখ বুজে আসে।

সবারই সঙ্গে সে হেসে কথা কয়; পুরুষ মানুষের সামনেও মাথায় ঘোমটা টানতে ভুলে যায়; কত লোকেই ছি ছি করে। সে খেয়াল করে না। ভোর বেলা অন্ধকারের আবরণে সে খঞ্জনী বাজিয়ে গ্রামের পথে চলে কালাচাঁদের মন্দিরের দিকে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে সে ব'সে থাকে পাথরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে, যেন কঠিন পাথরের শীতল স্পর্শে আপনার অন্তর্দাহ জুড়িয়ে দেয়। আপন মনে গুন্ গুন্ ক'রে কি গান করে বোঝা যায় না।

রোদ বাড়লে আম কাঁঠালের ছায়ায় ঢাকা গ্রামের পথ ধরে ফেরে নিজের ঘরের দিকে। আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে স্নেহ-ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে "গোপাল! গোপাল!" একটি নধর বাছুর বেরিয়ে আসে পাশের চালাঘর থেকে; তার গায়ে হাত বুলতে বুলতে ভাব-নিসিক্ত স্বরে বিলাসিনী বলে, "খেয়েছ তো গোপাল? ফেলে রাখনি তো কিছু?" বাছুরটি তার গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বড় বড় দুই চোখে স্থির দৃষ্টি নিয়ে।

কতদিন ঐ পথে চল্‌তে কত লোক দেখেছে, মধ্যাহ্নে বিলাসিনী তার আঙ্গিনায় কৃষ্ণ-চূড়ার গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটি হাত গাছের শাখাকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে; নিমীলিত চোখে ভাব-গদগদ কণ্ঠে সে থেকে থেকে ব'লে উঠছে "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ও আমার কৃষ্ণ!" এই আলোতে ছায়াতে মেশা নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তার ভাবে মধুর গলার স্বর অনেকেরই মনে একটি সহজ ভক্তির সৃষ্টি ক'রত। বিলাসিনী যেন সন্তুজ বনের নিরালা পাখী, আপন মনেই কূজন ক'রছে—বিরাম নেই।

সে থাকে একলা, সংসারে আর কেউ নেই। স্বামী বিবাহের পর চ'লে গেছে কাশীতে গুরুর কাছে শাস্ত্র শিক্ষা ক'রতে; আর ফেরেনি। বিলাসিনীর বয়স তখন খুবই কম, স্বামীকে তার ভাল মনে পড়ে না। কেবল এইটুকুই মনে আছে—অন্ধকার রাত্রে কোনও দিন স্বপ্নে ভয় পেয়ে জেগে উঠে দেখেছে—স্বামী পড়ছেন শাস্ত্রের বই তেলের আলোর সামনে বসে। তাঁকে কাছে ডাকতে সাহস হয়নি; দুরু দুরু বুক নিজের হাতেই চেপে ধ'রে ঘুমিয়ে পড়েছে।

স্বামী যাবার পর সংসারে রইল কেবল বুড়ি শাশুড়ি, তাও বেশী দিন নয়। মরবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও শাশুড়ি বৌকে শাসিয়ে গেলেন—"তোর ভাল হবে না।"

এত বেদনাতেও বিলাসিনীর মুখের হাসি মেলায়নি। সে তার পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে ভেসে রইল এই দুঃখের সরোবরে যেন আনন্দের লীলা-কমল। তার হাব-ভাব দেখে গ্রামের লোকে ভয় পেলে—বুঝি মেয়েটা এইবার কলঙ্কের সৃষ্টি করে। তারা চাইলে বিলাসিনীকে তার নিজের গ্রামে পাঠিয়ে দিতে। সে তাতে নারাজ। সে গাঁয়ে তার আপনার বলতে এমন কেউ নেই যে তাকে আশ্রয় দিতে পারে।

নিজে হাতে সে কুটীর সংস্কার ক'রলে, ঘর সাজালে পরিপাটি ক'রে, সামনের অল্প একটু জমিতে ক'রলে শাক্ সব্‌জির বাগান। রোজই সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জেলে ঘরের মধ্যে পরিচ্ছন্ন বিছানা কোরত; দুয়ারের গোড়ায় প্রণাম ক'রে নিজে শুতো ছেঁড়া মাদুর পেতে বাইরের দাওয়ায়; রাত্রের সাজানো বিছানা সকালে সে তুলে ফেলত, সন্ধ্যাবেলা আবার করত। নিত্য তার এই যে আয়োজন —এ কার জন্য? তাকে দেখলে মনে হ'ত যেন নিয়তই সে কার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় আছে।

চলন-বিলের স্থির জলের মতই বিলাসিনীর জীবন চলে আপনার ধীর মন্থর গতিতে। হঠাৎ এল তাতে আলোড়ন। সেদিন কালাচাঁদের মন্দির থেকে সে ফিরছে ঘরের দিকে, এমন সময় গ্রামের ডাক হরকরা তার হাতে দিলে একখানা খামে ভরা চিঠি। বিলাসিনীর জীবনে এই প্রথম চিঠি এল। সেখানি হাতে ক'রে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে দেখলে; তারপর ডাক হরকরাকে জিজ্ঞাসা কোরলে, "কোথাকার ছাপ দেখ তো"। হরকরা খাম দেখে বল্লে, "কাশীর ছাপ রয়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছে; খুলে পড়ে দেব নাকি?" বিলাসিনী বল্লে, "না থাক।" এই ব'লে কাপড়ের খুঁটে চিঠি বেঁধে সে চল্ল ঘরের দিকে।

চিঠি না প'ড়েও বিলাসিনী বুঝলে যে স্বামী লিখেছেন, দেশে ফিরছেন। চিঠিতে যাই থাক, সে ঠিক ক'রলে এ চিঠি সে খুলবে না। এ চিঠিকে সে ঠিক তার স্বামীর চিঠি ব'লে মনে আনতে পারলে না; এ যেন শীতের শেষে মেঠো ফুল অনাগত বসন্তের আগমনী বহন ক'রে এনেছে।

এই চিঠি আসার পর বিলাসিনী আর কালাচাঁদের মন্দিরে আসেনা; গ্রামের পথেও আর তাকে দেখা যায় না। চলন-বিলের ধারে ধারে খঞ্জনী বাজিয়ে গান ক'রে বেড়ায়।

বিলাসিনীর স্বামী ব্রজসুন্দর সত্যিই একদিন গ্রামে ফিরে এলেন—কিন্তু একলা নয়; সঙ্গে একটি বছর তিরিশের গৃহিণী আর গুটি পাঁচ সাত ছেলে মেয়ে। গ্রামের লোকে দেখলে ব্রজসুন্দরের গরুর গাড়ি গ্রামের পথ ছাড়িয়ে চলন-বিলের দিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ব্রজসুন্দরের আর সে রোগা চেহারা নেই। পুণ্য বারাণসীর জল হাওয়া, আর পাক-প্রণালীর কৌশলে শরীর বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হ'য়ে উঠেছে। মাথায় কাঁচা পাকা বড় বড় চুল ঘাড়ের কাছে ঝুঁটি কোরে বাঁধা। আত্ম-গরিমার প্রসন্ন হাসি মুখে সদাই বিরাজ ক'রছে।

গরুর গাড়ীর চাকার শব্দে বিলাসিনী আঙ্গিনায় নেমে এল দাওয়া থেকে। ব্রজসুন্দর এসে দাঁড়াতেই সে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম ক'রলে; স্বামী তার দু' পা' পিছিয়ে গিয়ে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁর এ সঙ্কোচ বিলাসিনীর চোখ এড়ালো না। সে নিজের মনেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লে। যখন প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো তখন তার সমস্ত দেহটি যেন কোন্ মুক্তির নির্ম্মল আনন্দে ঋজু হইয়া উঠেছে। তার দুই চোখে একটি উদার প্রসন্ন দৃষ্টি পরিস্ফুট হোয়ে উঠলো। ব্রজসুন্দরের নতুন স্ত্রীকে সে হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল; তারপর সব চেয়ে ছোট ছেলেটাকে কোলে ক'রে চলে গেল চলন-বিলের দিকে চান করিয়ে আনতে।

সেইদিন রাত্রে তার স্বামীর ঘরে যখন কপাট বন্ধ হ'লো, বিলাসিনী আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াল; তার মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে; হাতের প্রদীপের মৃদু আলোয় তার কোমল দেহটি অর্দ্ধেক আলোকিত আর অর্দ্ধেক অন্ধকারের আবরণে আচ্ছন্ন।

ধীরে ধীরে গোয়াল ঘরের কাছে গিয়ে সে চাপা গলায় ডাকলে, "গোপাল আমার! এখনও জেগে আছ?" ঘরের মধ্যে থেকে জীব-শিশু সাড়া দিয়ে উঠলো এই মাতৃ-কণ্ঠের আহ্বানে। তারপর বিলাসিনী গেল তার কৃষ্ণচূড়া গাছের কাছে। গোটা কয় ঝরা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে চুলে গুঁজে দিলে। প্রদীপটি সেইখানে নামিয়ে রেখে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো গাছের গুঁড়িতে হাত রেখে।

ক্ষণেক পরে গাছ-তলায় প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল বেড়ার গায়ের আগল খুলে।

গাছ তলায় প্রদীপ জলতে লাগলো যেন বিলাসিনীর জীবনের শেষ আরতির শিখা।

তার পরদিন থেকে বিলাসিনীকে আর সে গ্রামে কেউ দেখেনি। সবাই বলে সে ডুবে মরেছে চলন-বিলের গভীর জলে।

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেনার মঞ্জরী

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী

শ্রাবণ-যামিনী কবে শেষ হ'ল
হেনার মঞ্জরী?
শিশিরে শিশিরে ফুটিছ কি আজো
তিমির গুঞ্জরি'?
সে বাঁশী পরাণে কেন বাজে জানো?
ভোরের স্বপনে কি মধু-মেশানো—
থর-থর হিয়া থর-থর ভাবা
এসেছে সন্তরি!
রুদ্ধ দুয়ারে অতিথি কি তুমি
হেনার মঞ্জরী?

ম্লান চাঁদ, আর কুয়াশা কি জানে
শীত-নিশীথিনী!
কাঁকণে কি সুর বাজিল সে রাতে—
নূপুর-শিঞ্জিনী!
কত রাত আসে, দীপ জলে যায়—
সে রাতের হাঁসি সে রাতে মিলায়!
তারা-ছল-ছল কাঁদিছে আকাশ
শীত-নিশীথিনী!
ছিঁড়েছে সে তার, বাজিবে না আর
কনক-কিঙ্কিণী!

আজো কি দুলিছ সমীরে সমীরে
হেনার মঞ্জরী!
শুনিছ সে ঘরে গুঞ্জন কা'র
হেনার মঞ্জরী!
সারা রাত জেগে ঢুলেছে কি আঁখি?
শুধায়েছে কেহ?—লুকায়েছে তা'কি?
হাসিয়া মুছেছে নয়ন-কাজল
কেবা সে সুন্দরী?
কেন উন্মুখ বাতায়নে আজো
হেনার মঞ্জরী?

মিথ্যার অভিযান

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও ধীরাজের বাড়ীতে আমাদের আড্ডা জ'মে উঠেছিল, সেদিন রবিবার, বন্ধুসমাগম হয়েছিল অনেক, চায়ের পেয়ালার উপর দিয়া রাজনীতি, সমাজসমস্যা, সাহিত্য-আলোচনা—সকলই পুর দমে অগ্রসর হচ্ছিল! হঠাৎ কালবৈশাখীর জলঝড় আমাদিগকে একটু বিপর্য্যস্ত করে দিয়ে গেল। সেদিকে সাবধান হ'বার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আলোচনার খেই হারিয়ে গেল। আকাশের নিবিড় কাজল-কালো মেঘের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘরের মধ্যে একটা নিরালা অবকাশ ঘনিয়ে আসছিল। এ মৌন উপভোগ করা যায় কেমন ক'রে এ একটা সমস্যা হয়ে উঠল।

দীনেশ প্রস্তাব করল—তাস জোড়া নিয়ে এস।

কিন্তু বাহিরের সে প্রচণ্ড জলঝড়ের রুদ্রনাচনের মাঝে ভিতরের এ অবকাশ-নীরবতার মাধুর্য্যটুকু এ ভাবে নষ্ট করতে কেহই আগ্রহ প্রকাশ করল না।

পুলিন এতক্ষণ উদাস ভাবে বাহিরের পানে চেয়েছিল, এবার সে মুখ ফিরিয়ে বলল—গল্প শুনবে?

আই, এ পরীক্ষা বার দুয়েক ফেল ক'রে পুলিন অগত্যা সাহিত্যিক হবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছিল। বিশ্ব-সাহিত্যের মোটা মোটা বই নিয়ে সে চলাফেরা করত, এমন কি, চেহারাটাও সাহিত্যিকোচিত করবার জন্য একজোড়া মাদ্রাজী স্যাণ্ডেল আর একটা বেনিয়ান কিনে ফেলেছিল। তার মুখে সুগভীর সাহিত্যের বুলি আর গর্কী থেকে বার্ণার্ড, শ'র বই-এর ফর্দ্দ শুনে আমরা মনে মনে তাকে বেশ একটু খাতির করতাম। এহেন পুলিনের গল্প শোনাবার প্রস্তাবটা আমাদের মন্দ লাগল না, আমাদের এই নিবিড়তা গল্প-গুঞ্জনের উপযুক্তই বটে। সকলে সার দিয়ে বললাম—সেই ভাল পুলিন, গল্পই শোনাও তুমি।

পুলিন সুরু করল—এই কাহিনীটিকে গল্প বললুম বটে কিন্তু আমার জীবনের পৃষ্ঠাতে রক্ত লেখায় সে কাহিনী লেখা রয়েছে—মুছবে না কোনদিনই। যাক্ সে কথা—

তোমরা জান রেখাকে আমি বিয়ে করি 'লভে' পড়ে—সে আজ প্রায় তিন বছরের কথা, সেই যে-বছর আমি কলেজ ছেড়ে দি। সাহিত্যের দিকে ঝোঁক আমার ছেলেবেলা থেকে। পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার পর হতে সেটা আমাকে আরও বেশী আকৃষ্ট করল, আমি লেখক হবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগে গেলাম। রেখা কিন্তু এসব মোটেই পছন্দ করেনি, সে চেয়েছিল—আমি কয়েকটি পরীক্ষা-সাগর পার হয়ে মাতব্বর গোছের একটা কিছু হই। আমি যখন নিজের রচনা সকাল-সন্ধ্যায় রেখাকে শোনাতে সুরু করলাম তখন সে মনে মনে উত্যক্ত হ'য়ে উঠলেও মুখে কিছু বলত না—বল্লেও আমার রচনা শোনা থেকে তাকে আমি কখনো অব্যাহতি দিতাম না।

হঠাৎ একদিন ওয়ালটেয়ারে রেখার মাসীর নিকট হ'তে আমাদের নিমন্ত্রণ এল। এই মাসী ছাড়া রেখার আপনার বলতে কেহই ছিল না। শৈশবেই রেখা মা-বাপকে হারায়, তখন হতে ইনিই রেখাকে মানুষ করেন। তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরা সেখানে গেলাম, ক'টা দিন বেশ আনন্দেই কাটল। কিন্তু ঐ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়াই হল আমাদের কাল। সেখানে হঠাৎ রেখা একটু একটু ক'রে বধির হয়ে যেতে লাগল। এটা তাদের বংশগত রোগ—তার দিদিমার ছিল, তার মারও হয়েছিল, আর তার মাসীরও নাকি ঐ বয়স হ'তেই প্রকাশ পেয়েছিল।

ওয়ালটেয়ার হতে ফিরে এসে বড় বড় কর্ণব্যাধিবিশেষজ্ঞদিগকে দিয়ে রেখার চিকিৎসা করালাম কিন্তু কোন ফলই হোল না, উপরন্তু দিনের পর দিন তার বধিরতা বেড়েই চলল।

নিরুপায় হয়ে আমি বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে সমাহিত করলাম। আমার প্রিয়া কালা, আমার উচ্ছ্বাস, আমার প্রগল্‌ভতা আর তার মনে রেখাপাত করতে পারবে না। জীবনের হাসি, আলো, গান আর ভালবাসায় ভরা যে অপরূপ অধ্যায়টা কল্পনায় ফুটিয়ে তুলেছিলাম নির্ম্মম অদৃষ্ট একরাশ কালি দিয়ে সেটাকে মলিন ক'রে দিলে। বিশ্ব সাহিত্যের সরোবরের মধ্যে আমি সুগভীর ডুব দিলাম।

রেখার জীবনটাই ব্যর্থ হ'তে চলল, জ্যোৎস্না রাত্রিগুলো বিফলে কাটতে লাগল। প্রথমটা মনে সে ভারী বেদনা পেল, চোখের দৃষ্টি তার অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্সা হয়ে এল। আমার পাঠ-কক্ষের পাশে দাঁড়িয়ে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলত, তবু আমার দিক হতে সে কোন সাড়াই পেল না। দু-এক দিন ঐ নিরস বইগুলির সম্বন্ধে সে আমার কাছে অনুযোগ তুলেছিল, কিন্তু স্ত্রীর সহিত অলস ছেলে-খেলায় নষ্ট হ'বার জন্য এ জীবনটার সৃষ্টি হয় নি—এ সহজ সত্যটা তখনি যুক্তিতর্ক দিয়ে সু-উচ্চ কণ্ঠে বেশ ভাল ক'রেই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছি।

হঠাৎ একদিন দ্বারের পাশে রেখা এসে দাঁড়াল। চোখ দুটো তার ফুলে উঠেছে। আমার পায়ের কাছে একখানা ছোট খাতা ফেলে দিয়ে সে তখনি অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে সার্লক হোমসের ডিটেক্‌টিভ গল্পটা শেষ ক'রে আমার হুঁশ হোল, ছোট খাতাখানা তুলে নিয়ে দেখি সেখানা রেখার লেখা ডায়েরী। কৌতুহলের সঙ্গে পড়তে সুরু ক'রে দিলাম। তাতে লেখা ছিল—

জানালাটির ধারে ব'সে বাহিরের দিকে চেয়ে আছি—চারিদিক নিরানন্দ, শুধু কুয়াশায় ঢাকা। জীবনের প্রথম যেদিন বসন্তের উদয় হল সেদিনকার সেই অজস্র অর্থহীন প্রণয়-কাকলী, আজ তার কিছু নাই। কিন্তু কৈ তখন তো এরকম খারাপ লাগে নি, কত সন্ধ্যা সেলাই আর পড়াশুনা ক'রে কেটে গেছে—আর এখন? কতদিন সংসারের কাজ কর্ম্মে সারাদিন অতিবাহিত ক'রে সন্ধ্যার এই অনাবিল নীরবতাটুকু আরামে উপভোগ করেছি, কিন্তু এখন সন্ধ্যা হতে না হতেই স্বামীর পাশে গিয়ে বসতে হয়, তাঁর অনুযোগ অভিযোগ আর চেঁচিয়ে স্বরচিত গল্প পড়ার তাড়ায় সে শান্তিটুকুও নষ্ট হয়ে গেছে।

স্বামী ভালবাসেন খুবই, কিন্তু তাঁর নিজের রচনা শোনাতে না পেলে তাঁর ভাতই হজম হয় না। ওঁর জীবনের প্রধান বিলাসই হচ্ছে সন্ধ্যার সময় উচ্চস্বরে নিজের রচনা প'ড়ে শোনান আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের গল্পের তারিফ্ করা। এই রচনা শোনাটাই আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। এমন এক একদিন হয়েছে যে সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম করেছে, আর্ত্তনাদ করতে গিয়ে আত্মসম্বরণ করেছি। —এ সব আর সহ্য যায় না!

শীতের অস্পষ্ট সন্ধ্যায় বাহিরের পানে চেয়ে এই সব ভাবছি এমন সময় রাস্তার মোড়ে দেখি উনি আসছেন।

খানিক পরেই ডাক শোনা গেল—কই ওগো, শুনছ!

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম, স্বামীর হাতে একখানা চিঠি। চিঠিখানা হাতে দিয়ে উনি বললেন—এই মাত্র এল, তোমার চিঠি।

চিঠিখানা আস্তে আস্তে খুলে প'ড়ে বললাম—মাসীর চিঠি। পূজার ছুটিতে আমাদের যেতে লিখেছেন।

স্বামী অসন্তোষের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ:, গিয়ে কি হবে! মাসীতো বদ্ধ কালা, কানে বোমা মারলেও শুনতে পান না। আর মানুষকে নিমন্ত্রণ ক'রে লাভ, যদি তার একটা কথাও শুনতে না পান? শুনেছি তোমার মায়েরও ও অসুখ ছিল।

ওঁর কথাবার্ত্তাই এই রকম, অথচ যাবার ইচ্ছে ওঁর আমার চেয়ে বেশী—এ আমি বেশ জানি, তাই কোন উত্তর করলাম না। ওঁর সঙ্গে মেসোর সদ্ভাব খুবই। চাকরের জিম্মায় বাড়ী রেখে যেতেও কোন আপত্তি নেই, উপরন্তু পূজার ছুটিতে একটু হাওয়া বদলও হবে। আর মাসীর কানে না শোনার কথা, এ তো তাঁদের বংশগত রোগ, দিদিমাও তো বছর তিরিশে কালা হয়ে যান। তাঁর মায়েরও শুনেছি ঐ বয়সেই এ রোগ ধরে।

আমার মৌন দেখে উনি বললেন—আচ্ছা, বেশ! যাওয়াই যাবে তা হলে, লিখে দাও।

শরতের সন্ধ্যা। মাসীর বাড়ীর খাবার ঘরে ব'সে আছি, মাসী রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত, তাঁর মুখে সর্ব্বদাই মৃদু গম্ভীর হাসি। স্বামী আর মেসো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। জানালার ধারে ব'সে লক্ষ্যহীন ভাবে বাহিরের পানে চেয়ে আছি। বাহিরে টুপ্‌টাপ্‌ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে আর ভিতরে গন্‌গনে আগুনের তেজে বাসনগুলি ঝক্‌ ঝক্‌ করছে। হঠাৎ মেসো ডাকলেন—ওগো শুনছ?

তবু কোন সাড়া নেই। মাসীর ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসি। ভয়ানক চিৎকার ক'রে মেসো বললেন—শুনছ, ওগো?

এইবার মাসী যেন একটু শুনতে পেলেন। মেসো ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন—যাও, উপর থেকে ফটোগুলো চট ক'রে নিয়ে এস তো।

মাসী বললেন—মোটর কি হবে?

—ফটো ফটো!

—কোট্‌? কোন কোট্‌টা?

মেসো ভয়ঙ্কর বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তারপর দুখানা 'এলবাম' হাতে ক'রে ফিরে এলেন। একখানা এলবাম্‌ খুলে ওঁকে একখানা ছবি দেখাতে দেখাতে বললেন—কোন কিছুর জন্যে কারুর উপর নির্ভর করতে নেই—যাক! এই যে ছবিটা দেখছো, এটা আমার ভাই শিলং থেকে পাঠিয়েছে, খাসা জায়গা কিন্তু!

উনি ছবিগুলো হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন, তারপর মাসীর দিকে ফিরে ধীরে ধীরে বললেন—ওঁর অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে, না?

মেসো দাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করতে করতে বললেন—এখনো ওঁর মার মত অত খারাপ হয় নি, তবে তার আর বিশেষ দেরীও নেই। ওঁকে কিছু বলার চেয়ে নিজেই সেটা করা ভাল, সময় নষ্ট কম হয়।

তারপর দরজা খুলে তিনি বললেন—বৃষ্টি থেমে গেছে হে পুলিন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্‌। কি বল?

—চলুন।

দুজনে বর্ষাতি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্দ্র দমকা বাতাস এসে ঘরটাকে কন্‌কনে ক'রে দিল।

—রেখা!

চম্‌কে উঠি। এমন আদর ক'রে কেউ তো আমাকে অনেক দিন ডাকে নি। আস্তে আস্তে বল্‌লাম—আজ কতদিন পরে তুমি আমায় আদর কর্‌ছ, মাসীমা?

—ছিঃ! তাতে কি দুঃখ করতে আছে মা! লক্ষীটি, কাছে এস!

বিস্মিত হয়ে বললাম—আমি অত আস্তে কথা বললাম, তা'ও শুনতে পেলে মাসীমা?

মাসী হাসতে হাসতে বললেন—তোর সব কথাই তো শুনতে পাই মা!

ব্যগ্রভাবে মাসীর হাত ধ'রে বললাম—তবে তুমি সেরে গেছ, মাসীমা?

—সার্‌বো কি মা, আমার কি হয়েছে যে সারবো?

—তবে যে তুমি……

—না, না, আমি কালা নই, কোনকালে ছিলামও না, তোদের নিয়ে একটু মজা করছিলাম বৈ তো আর কি?

বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এল। কিছুক্ষণ পরে নিজেকে একটু সংযত ক'রে বললাম—তবে তুমি সত্যি কালা নও?

—না মা, না, আমি, তোর দিদিমা, আমার দিদিমা—কেউ না।

আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। ঝুপ্‌ ক'রে ব'সে প'ড়ে বললাম—আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না মাসীমা!

মাসী কিছুক্ষণ আমার পানে চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন, তারপর আমাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে বললেন—লক্ষী মা আমার! আজ তোকে একটা উপহার দোব, বুঝলি? তোর বয়সে আমার মা আমাকে সেটা দিয়েছিলেন। শুনেছি তিনিও নাকি দিদিমার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আমার তো আর নিজের মেয়ে নেই—তাই তোকেই দিচ্ছি। তোর বোধ হয় দরকারও আছে, হ্যাঁ আমি তা আগেই বুঝেছি।— শোন তবে, ব'লে মাসী আমার কানে কানে বধিরতার উপযোগিতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বললেন।

—বুঝলি তো! হঠাৎ হ'লেও কেউ আশ্চর্য্য হবে না,

—এ আমাদের বংশগত রোগ। তোর যা খুসী শুনবি, যা খুসী শুনবি না। অনবরত হুকুম আর ফরমাশ হ'তে তো রেহাই পাবি।

আমার সারা দেহ কাঁপছিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম —না, না, মাসীমা! সে আমি পারবো না।

—তা তোর যা খুসী হয় করিস, আমি উপহার দিলাম, ব্যবহার করা তো তোরই হাতে।

মাসীর ঠোঁটের উপর সেই অস্পষ্ট হাসিটুকু ফুটে উঠল।

হঠাৎ দরজা খুলে মেসো আর স্বামী ঘরে প্রবেশ করলেন, আবার একটা আর্দ্র ঠাণ্ডা বাতাস সবাইকে চঞ্চল ক'রে দিয়ে গেল। স্বামী বর্ষাতিটা খুলতে খুলতে বললেন— আমরা বেশীদূর যাই নি, যা বৃষ্টি পড়া সুরু হয়েছে।

মাসী উঠে খাবার আয়োজন করতে লাগলেন।

আমি চুপ ক'রে আগুনের দিকে চেয়ে ব'সে ছিলাম। আমার মনে তখন বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির ঝড় বইছিল। মাসীর কথা মেনে চল্‌বে? মন্দ কি, সন্ধ্যাবেলাকার রচনা শোনার হাত থেকে তো রেহাই পাব!...

হঠাৎ মেসোর কথায় চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। মেসো তখন আমাকে লক্ষ্য ক'রে ওঁকে বলছিলেন—রেখার শোনবার গোলটোল তো কিছু হয়নি এখনও? ওর মাসীর কিন্তু ওই বয়সেই প্রথম হয়েছিল।

—না, তা কৈ কিছু তো এখনো টের পাইনি! ব'লে উনি ডাকলেন—ওগো শুন্‌ছ!

উত্তেজনায় আমার সারা দেহ কেঁপে উঠল, কিন্তু এমন ভাব দেখালাম—যেন আমি কিছুই শুন্‌তে পাইনি।

মেসো অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ওঁর পানে চাইলেন। ওঁর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। মাসী এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর মুখে সেই মৃদু হাসি।... ... ...

এর পর যে মিথ্যার অভিযান আমি সুরু করি, তা তোমার অজানা নয়, কিন্তু যে শান্তি পাবার জন্য এ অভিযান তার বিনিময়ে শুধু অশান্তিই এ এনে দিয়েছে, আর পেয়েছি তোমার অবহেলা আর উপেক্ষা,—যাক্, আজ সে সবের পরিসমাপ্তি......

এই পর্য্যন্ত পড়েছি হঠাৎ দাসী ছুটে এসে বলল— দাদাবাবু, শিগ্‌গীর আসুন, বৌদি যে পুড়ে ম'ল—

ছুটে বাহিরে এসে দেখি ওপাশের একতলার ছাদে অগ্নির লেলিহান নৃত্য সুরু হয়েছে—সে আগুনের লেলিহান বহ্নিশিখা আমার বুকটাকেও নিঃশেষ ক'রে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে!

—এই পর্য্যন্ত ব'লে পুলিন চুপ করল। তার কণ্ঠের সকরুণ বিষাদ ঘরময় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল; চোখে ওর উদাস দৃষ্টি। বিরহী পুলিনের প্রতি আমাদের অসীম করুণা হ'ল।

বাহিরে তখনো ঝঞ্ঝা আর বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে বারিপাত হচ্ছিল—ঝম্ ঝম্ ঝম্!

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে ললিত বলল—কিন্তু এই 'টাইপে'র বাঙালী মেয়ে......

তাকে বাধা দিয়ে ধীরাজ বলল—আরে তুমিও যেমন! ও আবার বিয়ে করল কবে! ওর একবর্ণ সত্যি নয়— গল্পটাই আজগুবি!

আমরা উৎসুক হয়ে পুলিনের মুখের প্রতি তাকাতে ও হেসে বলল—তোমরা তো ভারি 'সেন্‌সিটিভ্' দেখছি, গল্প কি কখনো সত্যি হয়!

আমাদিগকে কে যেন সুউচ্চ পর্ব্বতের উপর হতে একেবারে কঠিন মাটির উপর ফেলে দিল।*

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

* জার্ম্মান লেখিকা Susanne Trautwein-এর একটি গল্পের মর্ম্মানুবাদ।

যুগসন্ধি

—উপন্যাস—

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল্

দ্বিতীয় স্তবক

শয়তানে দেবতা

১

"হায়, হায়! পেয়ে হারালাম!"

টাওয়ারটা যখন মিচেল ফ্লেচার্ডের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তখনও সে উহা হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। তাহার পা অবশ হইয়া আসিতেছিল, তবুও এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে ভাবিয়া সে কিছুমাত্র কাতর হইল না। নারী দুর্ব্বল, কিন্তু জননী শক্তিময়ী। সে চলিতে আরম্ভ করিল।

দিনদেব অস্তমিত হইলেন। প্রদোষের আভাও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে নিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকারে সেই জনহীন কাননভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মিচেল ফ্লেচার্ড তখনও চলিতেছে। অন্ধকারে দূরে কোথায় ঘড়ীতে ৮টা বাজিতেছে সে শুনিতে পাইল। তার পরে ৯টা বাজিয়া গেল। মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ—যেন ঘাত প্রতিঘাতের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি—তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। হয়তো তাহা দূরে প্রবাহিত বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ।

কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত পদযুগল রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। টাওয়ারস্থ আলোকের ক্ষীণ রশ্মিতে পথ দেখিয়া সে চলিতেছিল। অন্ধকার আকাশের গায়ে কারাদুর্গের আলোকোজ্জ্বল অবয়ব-রেখা রহস্যময় দেখাইতেছিল।

উহার সমুন্নতশীর্ষ বিরাট মূর্ত্তি যেন মিচেল ফ্লেচার্ডের হৃদয়ে আশা ও শরীরে শক্তি সঞ্চার করিতেছিল।

ক্রমে ঐ আলোক উজ্জ্বলতর এবং কোলাহল উচ্চতর হইয়া উঠিল; তারপর সহসা সব কমিয়া গেল। আলোক নিবিয়া গেল, অরণ্য একেবারে নিঃশব্দ হইল। না জানি কি দুর্নিমিত্ত ঘটিয়াছে।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে মিচেল ফ্লেচার্ড মালভূমির প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহার পাদমূলে সুগভীর খদ—নৈশান্ধকারে উহার তলদেশ অদৃশ্য। অনতিদূরে মালভূমির উপরে চক্র, ধাতব দ্রব্য ও শৃঙ্খলাদি—এইগুলি সজ্জিত তোপের সারি। সম্মুখে কামান দাগিবার আগুনে ঈষদালোকিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা—যেন নিবিড় কৃষ্ণ ছায়ায় গঠিত। খদের গর্ভে প্রোথিত খিলানের উপরে সেতু ও সেতু-প্রাসাদ, তৎপার্শ্বে গোলাকৃতি সুউচ্চ টাওয়ার বা কারাদুর্গ। সুদূর হইতে সন্তানহারা জননী এই টাওয়ারের অভিমুখেই চলিয়া আসিয়াছে।

টাওয়ারের গবাক্ষ দিয়া আলোকের চঞ্চল গতাগতি লক্ষিত হইতেছিল। ভিতর হইতে সমুত্থিত কোলাহলে মিচেল ফ্লেচার্ড অনুমান করিল তথায় বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইয়াছে। বস্তুতঃ মাঝে মাঝে অভ্যন্তরস্থ জনগণের অতিকায় ছায়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিল।

রমণী মালভূমির কিনারায় সেতুর সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল, সেখান হইতে সেতুটি বুঝি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যাইবে। মাঝখানের সুগভীর খদটার জন্য সেতুর উপর যাইতে পারিতেছে না। অন্ধকারে সে বুঝিতে পারিল সেতুপ্রাসাদটি ত্রিতল। কতক্ষণ সে সেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহা বলা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুর্গের ছায়ামূর্ত্তি ও খদের গভীরতার কথা ভাবিতে ভাবিতে সময়-জ্ঞান আর তাহার ছিল না। কি এটা—এই বিরাট অট্টালিকা? কি হচ্চে উহার ভিতরে? এইটাই কি লাটুর্গ? তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। এই কি তাহার গন্তব্যস্থল, যাহার উদ্দেশ্যে সে সুদূরের যাত্রী হইয়া বিঘ্নসঙ্কুল দুর্গমপথে বাহির হইয়াছিল? মনে মনে সে প্রশ্ন করিল, কেন আমি এখানে আসিয়াছি? সে দুর্গের দিকে চাহিয়া রহিল, আর কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

অকস্মাৎ ঘোর অন্ধকারে সমুদয় পদার্থ আবৃত্ত হইয়া গেল। রমণী ও অট্টালিকাস্তূপের মধ্যবর্ত্তী স্থল হইতে প্রচণ্ড-ধূম্ররাশি উত্থিত হইল। একটা জীমূতমন্দ্রবৎ নির্ঘোষ তাহার কর্ণপটহে আঘাত করিল। সে ভয়ে নয়নযুগল মুদিত করিল। পরক্ষণেই আবার তীব্র আলোকে তাহার মুদিত নেত্রপল্লব রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। সে আবার চোখ মেলিয়া চাহিল।

আর অন্ধকার নাই। দিবসের আলোকের মতো অত্যুজ্জল দীপ্তিতে চারিদিক উদ্ভাসিত। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড।

কৃষ্ণবর্ণ ধূম-যবনিকা এখন রক্তাস্তরণের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। লেলিহান অনলশিখা বিসর্পিত গতিতে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইতেছে। একটা জানালার চৌকাঠ জ্বলিতেছে এবং তাহার ভিতর দিয়া মাঝে মাঝে আগুনের ঝলক বাহির হইতেছে। দেখিয়া বোধ হয় যেন একটা জলন্ত মুখবিবরের মধ্য হইতে অগ্নিজিহ্বা প্রসারিত হইতেছে। এইটি সেতু-প্রাসাদের নিম্নতলের একটি গবাক্ষ। সমগ্র সেতু-প্রাসাদের কেবল এই অংশটিই দেখা যাইতেছিল, আর সমস্তই ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মিচেল ফ্লেচার্ড মূক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার ক্লান্ত মস্তিষ্কে সব গোলমাল হইয়া গেল। কোন্‌টা বাস্তব আর কোন্‌টা অবাস্তব তাহার আর ধারণা রহিল না। তাহার কি এখন পলায়ন করা উচিত? না এইখানেই সে দাঁড়াইয়া থাকিবে? একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মতন কোন উপায় সে দেখিতে পাইল না। সমস্তই অলীক প্রতীয়মান হইতেছিল।

এই সময়ে বাতাস আসিয়া ধূম সরাইয়া লইয়া গেল। লাটুর্গের ভ্রূকুটি-ভীষণ বিরাট মূর্ত্তি আগুনের স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া আঁধারের পৃষ্ঠপটের উপর ফুটিয়া উঠিল, এবং এই নিদারুণ বহ্ন্যুৎসবের অত্যুজ্জল দীপ্তিতে প্রাচীন দুর্গের সমস্ত অংশই মিচেল ফ্লেচার্ডের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

সেতু-প্রাসাদের সর্ব্ব-নিম্নতল জ্বলিতেছিল। উপরের দুইতল এখনও অগ্নিস্পৃষ্ট হয় নাই; সেগুলি যেন আগুনের পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান।

মিচেল ফ্লেচার্ড যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে মাঝে মাঝে ধূম ও অগ্নি-ঝলকের ফাঁকে ফাঁকে সে দুর্গের অভ্যন্তরভাগ দেখিতে পাইতেছিল। বাতায়ন সকল উন্মুক্ত। দ্বিতলের গবাক্ষপথে মিচেল ফ্লেচার্ড দেখিতে পাইল, প্রাচীর গাত্রে সজ্জিত পুস্তকাধারশ্রেণী, তন্মধ্যে রাশি রাশি গ্রন্থ। তাহার চোখে আরও পড়িল, নীড়ের মধ্যে সুখসুপ্ত পাখীগুলির মতো জড়াজড়ি ঘেসাঘেসি করিয়া কয়েকটি অস্পষ্ট আবছায়ার মতো কি যেন মেঝের উপর শয়ান রহিয়াছে। কখনো কখনো ওরা যেন নড়িতেছে, এমন তাহার বোধ হইল। অপলক নেত্রে সে সেদিকে চাহিয়া রহিল।

আঁধারের মধ্যে এই কয়টি কি?

এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, ওরা জীবন্ত পদার্থ। কিন্তু তাহার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। সে জ্বর-কাতর, সারাদিন কিছু খায় নাই, বিশ্রাম না করিয়া কত পথ চলিয়া আসিয়াছে; তাহার দেহ অবসন্ন, মাঝে মাঝে মস্তিষ্ক-বিভ্রম ঘটিতেছিল—যদিও নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য সে প্রাণপণে যুঝিতেছিল। সেই একদিকেই তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল; কি জানি কেন তথা হইতে সে চোখ ফিরাইতে পারিতেছিল না। নিশ্চয়ই এগুলি আসবাবপত্রের সমষ্টি—কক্ষমধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া অধিবাসীরা চলিয়া গিয়াছে। কক্ষনিম্নে হুতাশনের বিকট হুঙ্কার ও উল্লম্ফন!

সহসা অগ্নিদেবতা যেন একটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যে বৃহৎ শুষ্ক আইভি লতাটি জানালার চৌকাট বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল তাহারই অভিমুখে শিখা বিস্তার করিল। এই জানালার উপরই মিচেল ফ্লেচার্ডের দৃষ্টি সম্বদ্ধ ছিল।

শুষ্ক লতা পল্লবের ইন্ধন আবিষ্কার হওয়া মাত্র একটি স্ফুলিঙ্গ লুব্ধ আগ্রহে উহার উপর গিয়া পড়িল; অমনি একটি অগ্নিশিখা ভয়ঙ্কর দ্রুততার সহিত ঊর্দ্ধদিকে পল্লব হইতে পল্লবান্তরে ছুটিয়া চলিল, এবং নিমিষ মধ্যে দ্বিতলে উপনীত হইল। তখন সেই পরিব্যাপ্ত বহ্নি-বিভায় দ্বিতলস্থ কক্ষ সম্পূর্ণ আলোকিত হইয়া উঠিল, এবং মেঝের উপর সুষুপ্ত ছোট্ট প্রাণী তিনটির মূর্ত্তি সুস্পষ্ট দেখা গেল,—একটি সুন্দর গ্রুপ—অযত্ন বিন্যস্ত কোমল হস্তপদ, মুদিত নয়ন-পল্লব, সস্মিত বদন, দেব শিশুগুলি।

জননী তাহার সন্তানগুলিকে চিনিল!

তখন তাহার মর্ম্মস্থল হইতে এক অতি ভীষণ চীৎকার নির্গত হইল। তেমন অবর্ণনীয় অরুন্তুদ যন্ত্রণার আর্ত্ত চীৎকার কেবল সন্তান-মাতার বক্ষ হইতেই বাহির হওয়া সম্ভব। এমন অমানুষিক অথচ হৃদয়স্পর্শী শব্দ আর কিছুই নাই। কোনো রমণী এইরূপ চীৎকার করিলে মনে হইবে, ইহা বুঝি বাঘিনীর গর্জ্জন; আর বাঘিনী এইরূপ গর্জ্জন করিলে মনে হইবে, ইহা বুঝি রমণীর ক্রন্দন।

মিচেল ফ্লেচার্ডের এই মর্ম্মভেদী বিলাপ ধ্বনি ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের মতোই শুনাইল।

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক এই চীৎকারই শুনিতে পাইয়াছিল। শুনিয়া তিনি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি তখন সুড়ঙ্গের নির্গমপথ ও খদের মধ্যবর্ত্তীস্থলে। মার্কুইস দেখিলেন, সেতু দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে, আর লাটুর্গ সেই আগুনের রক্ত আভায় রঞ্জিত। মাথার উপরের লতাগুল্ম সরাইয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন, মালভূমির শেষ প্রান্তে, খদের উপর পার্শ্বে, দহ্যমান সেতু-প্রাসাদের সম্মুখে, অতি-বিস্তৃত বহ্নিলীলার পূর্ণ আলোকে দাঁড়াইয়া রুক্ষকেশ, আলুথালু বেশ, যন্ত্রণাপীড়িত, ভয়চকিত এক রমণীমূর্ত্তি!

ইহারই চীৎকারে মার্কুইস আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এই নারীর বদন-মণ্ডল এখন আর মিচেল ফ্লেচার্ডের বদন মণ্ডল নহে—এযে সর্পকেশী অতি ভীষণা মেড্যুসার মুখ, যাহার দৃষ্টিপাত-মাত্র মানুষ পাষাণ হইয়া যাইত। তাহার যন্ত্রণা-ক্ষুব্ধ মুখের দিকে চাহিলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়। বিধাতার তীব্র রোষ যেন এই কৃষক রমণীতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই অজ্ঞাতকুলশীলা, বিচারমূঢ়া, জ্ঞানহীনা গ্রাম্য নারী যেন সহসা মহাকাব্যবর্ণিত নৈরাশ্যের একটা বিরাট মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। বিপুল গভীর বেদনা আত্মাকে বৃহৎ করিয়া তোলে, এখন আর সে সামান্যা জননী নহে,—তাহার ক্রন্দনে নিখিল-মাতৃত্বের অন্তর্গূঢ় বেদনা বিশাল ব্যোম পরিব্যাপ্ত করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। সুগভীর পরিখার পার্শ্বে, বৈশ্বানরের তাণ্ডব লীলার সম্মুখে, এই ঘোরতর পাপানুষ্ঠানের সান্নিধ্যে মূর্ত্তিমতী অতি-প্রাকৃত শক্তির মতো রমণী দণ্ডায়মান—তাহার মহত্ত্বের সুউচ্চশির যেন গগন স্পর্শ করিতেছে। তাহার আর্ত্তনাদ বন্য পশুর মতো, কিন্তু তাহার অবস্থানটি দেবীর মতো। তাহার অগ্নিময় মুখ হইতে যেন অভিশাপের জ্বালাময় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, তাহার অশ্রুসিক্ত অক্ষিদ্বয় হইতে অসহনীয় বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছিল।

মার্কুইস কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন। হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে উৎসারিত করুণ বিলাপের মতো রমণীর হৃদয়বিদারী কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি মার্কুইসের মস্তকের উপর আসিয়া প্রতিহত হইতেছিল।

"হা ঈশ্বর। আমার সন্তানগুলি! ঐযে আমার ছেলে মেয়েরা! কে কোথায় আছ, বাঁচাও, বাঁচাও! আগুন! আগুন! আগুন! গেল, পুড়ে' গেল! হায় পিশাচেরা! জর্জ্জেটি! গ্রোস্ এলেন—রেণিজিন! ওরে আমার বাছারা! হাঁ, এর মানে কি? কে এমন কাজ করেচে? কে ছেলেদের ওখানে রেখেচে? ওরা যে ঘুমিয়ে আছে। ওহো, আমি পাগল হয়ে যাব। না, না, তা' হ'তে পারে না। ওগো, বাঁচাও বাঁচাও!"

লাটুর্গে এবং মালভূমিতে লোকজন ছুটাছুটি করিতেছে, দেখা গেল। শিবিরের সৈন্যগণ সকলেই আগুনের দিকে দৌড়িয়া গেল। আক্রমণকারীগণকে এখন অগ্নি নির্ব্বাণের উপায় দেখিতে হইবে। গভেন, সিমুর্দ্দ্যান, এবং গেচাম্প আদেশ দিতেছিল। কি করা যায়? শুষ্কপ্রায় খদগর্ভের ঝরণা হইতে মাত্র কয়েক বাল্তি জল পাওয়া যাইতে পারে। সকলেই ভীত হইয়া পড়িল। উদ্বিগ্ন মুখে সকলে মালভূমির প্রান্তে দাঁড়াইয়া হুতাশনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতাপ লক্ষ্য করিতেছিল।

ভয়ঙ্কর দৃশ্য। অথচ চাহিয়া থাকা ভিন্ন আর তাহাদের কিছু করিবার উপায় ছিল না।

আইভি লতা জলিয়া জলিয়া অনলশিখা ক্রমে সর্ব্বোচ্চ তলে উপনীত হইল, এবং ক্ষুধিত আগ্রহে তথাকার সঞ্চিত তৃণস্তূপ গ্রাস করিয়া ফেলিল। সমগ্র শস্যাগার নিঃশেষে জলিতে লাগিল। নিষ্ঠুর পবনের সহায়তা পাইয়া লেলিহান বহ্নিশিখা পৈশাচিক আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল—মনে হইতেছিল, যেন ইমানুসের দুষ্ট আত্মা আগুনকে উস্কাইয়া

দিতেছে, আর পৃথিবীতে তাহার সর্ব্বশেষ অনুষ্ঠিত ধ্বংস কার্য্যে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছে।

লাইব্রেরীতে তখনও আগুন ধরে নাই, যদিও তাহার দুই তলই জ্বলিয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরীর ছাদ খুব উঁচু এবং প্রাচীর অত্যন্ত পুরু ছিল বলিয়া সেই সাংঘাতিক মুহূর্ত্ত এখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আর বড় বিলম্ব ছিল না। নিম্নের অগ্নিশিখা প্রস্তরখণ্ডগুলিকে চুম্বন করিতেছিল, আর উপরের অগ্নিশিখা ঘুরিয়া নিম্নাভিমুখী হইয়া মৃত্যুর ভীষণ আলিঙ্গনে তাহাদিগকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছিল। নীচে অগ্নিকুণ্ড, উপরে অগ্নিময় খিলান। যদি কক্ষতল প্রথমে ধ্বসিয়া যায়, শিশুগুলি সেই অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইবে; যদি ছাদ পড়িয়া যায়, তাহারা জ্বলন্ত অঙ্গারের নীচে সমাহিত হইবে!

শিশু কয়টি তখনও ঘুমাইতেছে। ধূম ও অনলশিখা এক একবার সরিয়া গেলে দেখা যাইতেছিল সেই অগ্নিময় গুহার ভিতরে উল্কাজ্যোতির আবেষ্টনের মধ্যে উহারা সুখসুপ্ত শান্ত, সুন্দর, নিস্পন্দ, যেন তিনটি স্বর্গশিশু পরম নিশ্চিন্ত মনে নরকের এক প্রকোষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছে। জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্যে অবস্থিত এই দেবশিশুদের দেখিয়া, সমাধি গর্ভে নিহিত দোলনাশয্যাগুলির দিকে চাহিয়া বোধ হয় হিংস্র ব্যাঘ্রের চোখেও জল আসিত।

আর সেই হতভাগিনী জননী তখনও আর্ত্তনাদ করিতেছে, —আগুন, আগুন! এরা কি সব কালা নাকি, কেউ যে আসচে না? ওরে, আমার ছেলেদের পুড়িয়ে মারলে রে! ঐ যে লোক দেখা যাচ্চে, ওগো তোমরা এস না? কতকাল ধরে' আমি ওদের খুঁজে বেড়াচ্চি, আর এখানে এসে পেলেম ওদের বেড়া আগুনের মধ্যে! হায়, হায়, পেয়ে হারালেম! বাঁচাও বাঁচাও! তিনটি স্বর্গশিশু—তিনটি স্বর্গশিশু জ্ব'লে গেল। কি করেচে বেচারারা? ওরা ত নিষ্পাপ! আমায় গুলি করেছিল, এখন আবার আমার বাছাদের পুড়িয়ে মারচে। কে এই সব করচে? এস, দুঃখিনীর ধন গুলিকে রক্ষা কর! একটা কুকুরের উপরেও লোকের দয়া হয়। এ বেচারাদের উপর তোমাদের কি একটু দয়া হয় না? এরা যে সব ঘুমিয়ে আছে জর্জেট, ও জর্জেট—ঐ যে তার মুখখানা দেখ্তে পাচ্চি। রেণিজিন, গ্রোস্ এলেন—ওদের এই নাম। আমি ওদের মা। কি ভয়ঙ্কর! আমি দিনরাত হেঁটে হেঁটে এখানে এসেছি—আজও সকালবেলা একটী মেয়েমানুষের সঙ্গে ওদের কথাই বল্‌ছিলেম। রাক্ষসেরা কোথায়? সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল! বড়টির এখনও পাঁচ বছর হয়নি, সকলের ছোট্টটির দু'বছরও হয়নি। ওই যে ওদের খালি পা গুলি দেখা যাচ্চে। ঈশ্বর আমাকে ওদের দিয়েছিল, আর শয়তান কেড়ে নিচ্চে! আমি ওদের বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেচি। এই জন্যই কি আমি এত পথ ছুটে এসেচি! দেখ আমার পাগুলি রক্তে মাখামাখি হয়ে গেচে! ওগো দয়া কর, দয়া কর; বাঁচাও। আমার ছেলেদের আমায় দাও—ওদের নৈলে যে আমার চল্‌বে না, একি সম্ভব, এতগুলো মানুষ থাক্‌তে আমার বাছারা পুড়ে' মরবে? ঐ সাংঘাতিক বাড়ীটা কি? ওরে পাষণ্ড, খুনেরা! আমার কাছ থেকে চুরি করে' এনে ছেলেদের ওখানে পুড়িয়ে মারচে! ওরা যদি এমন ভাবে মারা যায়, তবে আমি ঈশ্বরকে অভিসম্পাত দেব!"

অভাগিনী জননীর চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মালভূমির উপরে অন্য কণ্ঠস্বরও শোনা যাইতেছিল।

"একটা মই! একটা মই!"

"মই ত নাই।"

"জল!"

"জল নাই!"

"দোতালায়—টাওয়ারে—একটা দোর আছে।"

"সেটা ত লোহদ্বার।"

"অসম্ভব!"

উন্মাদিনী সন্তানমাতা আরো উচ্চৈঃস্বরে তাহার আর্ত্ত বিলাপ নিবেদন করিতেছিল—

"আগুন! আগুন! বাঁচাও। শীগ্‌গির শীগ্‌গির! আমার ছেলেদের না বাঁচালে আমি মরে যাব। ওদের আগুন থেকে সরাও, নৈলে আমাকে ঐ আগুনে ফেলে দাও।"

মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হুতাশনের ভৈরব গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছিল।

মার্কুইস্ পকেটে হাত দিয়া লোহদ্বারের চাবিটা স্পর্শ করিয়া দেখিলেন। তারপর আবার অবনত শিরে সুড়ঙ্গের

ভিতর প্রবেশ করিয়া যে পথ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন সেই পথেই ফিরিয়া চলিলেন।

২

প্রস্তরদ্বার হইতে লৌহদ্বারে

সৈন্যদলের বৃহৎ বাহিনী কোনো উপায় করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনটি শিশুকে উদ্ধার করিতে তিন সহস্র লোকও অসমর্থ! মানুষের শক্তি কি নগণ্য!

একটা মই পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। জাভেনেতে যে মই-এর জন্য লোক প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আসিয়া পৌছে নাই। জলন্ত জানালা গুলির হাঁ, আগ্নেয়গিরির মুখের মতো ক্রমশঃ বিকৃত হইতেছিল। শুষ্কপ্রায় ঝরণার জলে এই বিপুল অগ্নিদাহ নির্ব্বাণের চেষ্টা, আলোদগারী বিসুবিয়সের গহ্বর মুখে এক অঞ্জলি বারি নিক্ষেপের মতোই বাতুলতার কর্ম্ম হইত।

সিমুর্ ছান, গেচাম্প ও রাড়ুব খদের মধ্যে নামিয়া গেল; গভেন আবার টাওয়ারের সেই কক্ষে আরোহণ করিল যেখানে ঘুরানো পথের, গুপ্ত পথ এবং লাইব্রেরীতে যাওয়ার লৌহদ্বার রহিয়াছে। সেইখানেই ইমানুস গন্ধক-পলিতা প্রজ্জলিত করিয়াছিল এবং সেইখানেই অগ্নিকাণ্ডের আরম্ভ।

গভেন সঙ্গে কুড়িজন লোক লইয়া গেল; লৌহদ্বার ভগ্ন করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। উহার শৃঙ্খল ও অর্গল ভাঙিবার সম্ভাবনা ছিলনা।

তাহারা কুঠারাঘাত আরম্ভ করিল। কুঠার ভাঙিয়া গেল। একজন বলিল, "ইস্পাতের কুঠার এই লৌহ কবাটের উপর পড়িয়া কাচের মতো গুড়াইয়া যাইতেছে।"

পিটানো লোহার ডবল পাতে এই লৌহ কবাট তৈরী। এক একখানা পাত তিন আঙুল পুরু, আর পরস্পর কীলক বদ্ধ।

তাহারা লৌহদণ্ড দ্বারা দরজাটি নাড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উক্ত দণ্ডগুলি দীপশলাকার মতো পট্‌পট্ করিয়া ভাঙিয়া গেল।

বিষণ্ণ মুখে গভেন বলিল, "কামানের গোলা ভিন্ন এই দোর ভাঙ্‌বার আর উপায় দেখ্‌চি না। একটা কামান যদি এখানে তুলে আন্‌তে পারা যেত!"

"কেমন করে' আন্‌ব?" অনুচরবর্গের মধ্যে একজন বলিল।

ভীষণ সঙ্কট। চল্লিশখানা বাহু নিরুপায় হইয়া আপনাদের প্রচেষ্টা স্থগিত করিল। পরাজিত, অভিভূত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কুড়িজন লোক অটল অনড় দ্বারের দিকে চাহিয়া মৌন ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। নিম্ন হইতে একটা রক্তিমাভা বাহির হইল। পশ্চাতে প্রতিমুহূর্ত্তেই হুতাশনের বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে।

ইমানুসের ভীতিজনক মৃতদেহ কক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছে,—বিজয়ী পিশাচের ওষ্ঠ প্রান্তে ক্রূর হাসির রেখা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোধ হয় সমগ্র সেতু-প্রাসাদ ধ্বসিয়া যাইবে। আর আশা নাই।

আবর্ত্তিত শিলাখণ্ড এবং গুপ্ত পথের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি গভেন কহিল, "এই পথেই মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেক পলায়ন করিয়াছে।"

গভেনের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই কে বলিয়া উঠিল, "এবং ফিরিয়া আসিয়াছে।"

গুপ্তদ্বারের প্রস্তর ফ্রেমের মধ্যে পলিত কেশ এক বৃদ্ধের বদনমণ্ডল লক্ষিত হইল। ইনিই মার্কুইস্।

গভেন এই মুখ এত নিকটে বহুদিন দেখে নাই। সে শিহরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। অন্যেরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

মার্কুইসের হাতে এক সুবৃহৎ চাবি। লোকগুলির উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি সোজা লৌহদ্বারের নিকট চলিয়া গেলেন এবং খিলানের নীচে নুইয়া তালাতে চাবি লাগাইয়া ঘুরাইলেন। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া লৌহ দ্বার উন্মুক্ত হইল। দ্বারের অপর পার্শ্বে আগুনের ঢেউ খেলিতেছে। মার্কুইস্ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তক উন্নত—পদক্ষেপ দৃঢ়। দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এই দহ্যমান কক্ষে মার্কুইস্ কেবল কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি মেঝের সেই অংশ ধ্বসিয়া গিয়া লৌহ-

দ্বার ও তাহার মধ্যে এক অগ্নিময় ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। মার্ক্‌ইস্ সেই দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না—অকম্পিতপদে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। ধূমের মধ্যে ক্রমে তাঁহার ঋজু দেহ অদৃশ্য হইয়া গেল।

মার্ক্‌ইস কি আর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন? তাঁহার পদনিম্নে কক্ষতল কি আরও ধ্বসিয়া গেল? তাহার আত্মবিসর্জ্জনই কি সার হইল? গভেন ও তাহার সঙ্গীরা তাহা বলিতে পারে না। তাহাদের সম্মুখে ধূম ও অগ্নির প্রাচীর। তৎপশ্চাতে মার্ক্‌ইস—কে বলিবে, জীবিত না মৃত?

৩

শিশুদের নিদ্রাভঙ্গ

অবশেষে ছেলেরা নেত্র উন্মীলন করিল।

লাইব্রেরীর ভিতরে আগুন এখনও প্রবেশ করে নাই; তবে অগ্নির গোলাপী রাগে কক্ষের ছাদ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন সুন্দর রক্তিম আলো শিশুরা আর কখনো দেখে নাই। ঔৎসুক্যের সহিত তাহারা ইহার দিকে চাহিয়া রহিল। জর্জ্জেট তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা। বিরাট অগ্নিদাহের বিচিত্রোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা তাহাদের প্রশংসমান দৃষ্টির সম্মুখে বিকশিত হইতেছে; উড্ডীয়মান, কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি কখনো সহস্রশীর্ষ কৃষ্ণসর্পবৎ, কখনো বা উজ্জ্বল লোহিত রাক্ষসবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। অগ্নি তাহার মণিরত্ন বিতরণে কোনো কালেই কার্পণ্য করে না। তাহার কারখানায় যে মণিমাণিক্য তৈরী হয় সে তাহা নিঃশেষে বাতাসে ছড়াইয়া দেয়। অঙ্গার ও হীরক যে একই পদার্থ তাহা মিথ্যা নহে।

উপরিতলের প্রাচীর ফাটিয়া গিয়াছে। সেই ফাটলের ভিতর দিয়া মণি-মঞ্জুষা-বিক্ষিপ্ত রত্নরাজির ন্যায় আগুনের ফুল্‌কি সকল বর্ষিত হইতেছিল। শস্যাগারের প্রজ্জ্বলিত তৃণস্তূপ হইতে জ্বলন্ত কণিকাগুলি গবাক্ষপথে উড়িয়া যাইয়া স্বর্ণবৃষ্টি করিতেছিল।

"ছুন্দল্।" জর্জ্জেট মন্তব্য করিল। তিনজনেই উঠিয়া বসিল।

বাহিরে মা বলিয়া উঠিল, "ঐ যে ওরা জেগেছে।"

রেণিজিন উঠিয়া দাঁড়াইল; দেখাদেখি গ্রোস্ এলেন এবং জর্জ্জেটিও তাহাই করিল।

জানালার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া রেণিজিন বলিল, "আমার গরম লাগ্‌চে।"

কপোত কূজনের স্বরে জর্জ্জেটিও বলিল, "আমাল গলম।"

মা চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাছারা! রেণি! এলেন! জর্জ্জেটি!"

ছেলেরা তখন বাহিরের দিকে চাহিল। বয়স্ক লোকেরা যাহাতে ভীত হয়, শিশুদের তাহাতে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। অজ্ঞানতাতেই অনেক সময় সাহস। নিষ্পাপ শিশুরা নরকাগ্নি দর্শন করিলে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বোধ হয় মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিবে।

জননী আবার চেঁচাইয়া উঠিল, "রেণি! এলেন! জর্জ্জেটি!"

রেণিজিন মাথা ফিরাইল। এই স্বরে তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল। শিশুদের স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তাহা আবার জাগিয়াও উঠে সহজেই। সমস্ত অতীতের কাহিনী যেন গতকল্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। রেণিজিন তাহার মা'কে দেখিল। ঐখানে সহসা তাহার মাকে দেখিতে পাওয়া তাহার নিকট কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বোধ হইল না। এই অদ্ভুত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যেন একটা আশ্রয় পাইয়া সে ডাকিয়া বলিল, "মা!"

জর্জ্জেটি বলিল, "আম্-মা!" আর তাহার ছোট্ট হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

ত্রস্ত জননীর ব্যথিত বক্ষ মন্থন করিয়া আবার আর্ত্ত চীৎকার বাহির হইল, "আমার বাছারা!"

তিনজনেই গিয়া জানালা ঘেসিয়া দাঁড়াইল। সৌভাগ্যক্রমে সেদিকে আগুন ছিল না।

রেণিজিন বলিল, "বড্ড গরম; আমার গা যেন পুড়ে' যাচ্ছে।" তারপরে ডাকিয়া বলিল, "মা, এখানে এস।"

জর্জ্জেটি তাহার পুনরাবৃত্তি করিল, "এছো, ম্ মা!"

উন্মাদিনী জননী তখন ঝোপের পর ঝোপ অতিক্রম করিয়া খদের দিকে ছুটিয়া চলিল—তাহার উষ্ক খুষ্ক চুলগুলি মাথার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, হস্তপদ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাপ্লুত। উপরে গভেন, নীচে সিমুর্দ্যান ও গেচাম্প নিরুপায় ভাবে দাঁড়াইয়া। সৈনিকগণ কিছু করিতে না পারিয়া হাত পা কামড়াইতে লাগিল। তাপ ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। তাহাদের দৃষ্টি সেতুর দিকে, খিলানের উচ্চতার দিকে, দুর্গের বিভিন্ন তলের দিকে, দুরধিগম্য জানালাগুলির দিকে। শিশুদের রক্ষা করিতে হইলে এক্ষণই সাহায্য আবশ্যক। বিলম্ব হইলে সে চেষ্টা নিরর্থক হইবে। তিনতলা বাহিয়া উঠিতে হইবে। উপায় নাই! উপায় নাই!

কর্ত্তিতস্কন্ধ, ছিন্নকর্ণ রাডুব মিচেল ফ্লেচার্ডকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গেল—তাহার গাত্র হইতে ঘর্ম্ম ও রক্তধারা ঝরিতেছে।

"এ কি!" সে বলিল, "আরে, এ যে সেই রমণী যাঁকে গুলি করা হয়েছিল। তুমি তা' হ'লে আবার বেঁচে উঠেচ?"

জননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার ছেলেমেয়ে গুলি!"

"ঠিক বলেছ," রাডুব কহিল, "এখন প্রেতাত্মা কি ছায়ামূর্ত্তির কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।"

সে প্রাচীর বাহিয়া সেতুর উপর আরোহণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রস্তরখণ্ডগুলির যোড়ের জায়গা এতই মসৃণ যে, সে তাহাতে নখ বিধাইয়া আঁকড়াইয়া থাকিতে পারিল না; হাত ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গেল। প্রতিমুহূর্ত্তেই আগুন ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল। জানালার ফ্রেমের মধ্যে শিশু তিনটির মস্তক প্রদীপ্ত হুতাশনের রক্তিমালোকে রঙীন ছবির মতো দেখাইতেছিল। ক্ষিপ্তপ্রায় রাডুব আকাশের দিকে স্বীয় মুষ্টিবদ্ধ হস্ত প্রসারণ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেবতার প্রাণে কি দয়া নাই!"

হতাশাপীড়িত জননী জানু পাতিয়া যুক্তকরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "দয়া কর! দয়া কর!"

দহ্যমান্ কাষ্ঠাদির ফট্ ফাট্ শব্দ অগ্নি-গর্জ্জনের উপরে শোনা যাইতেছিল। পুস্তকাধারের কাঁচগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সশব্দে কক্ষতলে পতিত হইতেছিল। স্পষ্ট বুঝা গেল কাঠের কাজ সব ভস্মীভূত হইয়া গেল। ইহার প্রতিবিধান মানবীয় শক্তির সাধ্যাতীত। আর এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বোধ হয় সমগ্র সেতুপ্রাসাদ ভূপতিত হইবে। নিরুপায় সৈনিকগণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই শেষ পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কচি শিশুদের কোমলকণ্ঠের "মা! মা!" ধ্বনি তাহাদের কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে আঘাত করিতেছিল।

সমগ্র জনতা আতঙ্কে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ গবাক্ষপার্শ্বে যেখানে শিশুগণ দণ্ডায়মান সেখানে অনলশিখার লোহিত পৃষ্ঠপটের উপর এক দীর্ঘ মূর্ত্তির কৃষ্ণছায়া নিপতিত হইল।

সকলেই গ্রীবা উত্তোলন করিয়া সোৎসুক দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিল। ওখানে—লাইব্রেরীতে—অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে জনৈক পুরুষ দণ্ডায়মান। তাহার তুষারশুভ্র কেশকলাপ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহারা চিনিল—মার্ক্‌ইস্ ডি ল্যান্টিনেক। একবার তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আবার তাঁহাকে দেখা গেল।

অমিততেজা বৃদ্ধ একটা প্রকাণ্ড মই জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিতেছিলেন, এটা সেই পলায়নের মই, যাহা লাইব্রেরীতে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। মেঝের উপর ওটাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া মার্ক্‌ইস সেটাকে জানালার নিকট টানিয়া লইয়া গেলেন। মইটার একপ্রান্তে ধরিয়া আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত জানালার ভিতর দিয়া গলাইয়া তিনি ওটাকে খদের তলদেশ পর্য্যন্ত নামাইয়া দিয়া প্রাচীর গাত্রে সন্নিবেশিত করিলেন।

মইটা যেমন তাহার হাতের কাছে নামিয়া আসিল রাডুব ওটাকে ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হউক্।"

মার্ক্‌ইস্ উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন, "রাজা দীর্ঘজীবী হৌন্।"

রাডুব কহিল, "যা খুসী তোমার চেঁচাতে পার; ইচ্ছা হয়, আবোল তাবোল বক;—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তুমি দয়ার দেবতা।"

মইটি নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে ন্যস্ত হইল, এবং তদ্দ্বারা প্রজ্বলিত

পাঠাগার ও ভূমিতলের মধ্যে একটা চলাচলের পথ সংস্থাপিত হইল। বিশজন লোক উপরে ছুটিয়া চলিল—রাডুব সকলের অগ্রে। নিমেষ মধ্যে মইএর ধাপে ধাপে তাহারা ঝুলিতে লাগিল এবং তাহাতে এক মনুষ্য সোপান তৈরী হইয়া গেল। সর্ব্বোচ্চ ধাপে রাডুব জানালা, স্পর্শ করিল। সে ঊর্দ্ধমুখে আগুনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সমবেত সৈনিকবৃন্দ পরস্পর-বিরোধী ভাব সংঘাতে সকলেই সম্মুখের দিকে ঝুঁকিল—কেহ মালভূমিতে, কেহ খদে, কেহ টাওয়ারের দিকে ছুটিতে লাগিল।

মার্কুইস্ আবার অদৃশ্য হইলেন, এবং পরক্ষণেই একটি শিশুকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অমনি প্রচণ্ড করতালি শব্দে জনতার আনন্দ চারিদিক নিনাদিত হইল।

মার্কুইস্ হাতের কাছে যে শিশুটিকে পাইয়াছিলেন, তাহাকেই তুলিয়া আনিয়াছিলেন। এটি—গ্রোস-এলেন।

গ্রোস্ এলেন বলিল, "আমার ভয় করচে।"

মার্কুইস্ বালকটিকে রাডুবের হাতে দিলেন, রাডুব তাহাকে তাহার পশ্চাতের সৈনিকের নিকট এবং সে আবার আর একজনের নিকট দিল। গ্রোস্-এলেন যখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে এইরূপে হস্ত হইতে হস্তান্তরে বাহিত হইয়া সিঁড়ির নিম্নে নীত হইতেছিল, তখন মার্কুইস্ আবার গিয়া রেনিজিন্‌কে আনিয়া রাডুবের হস্তে সমর্পন করিলেন। রেণিজিন হাত পা আছড়াইতেছিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সার্জ্জেণ্টকে তাহার ছোট ছোট হস্তে ঘুসি মারিতেছিল।

এদিকে আগুনে কক্ষটি একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মার্কুইস্ ফিরিয়া জর্জ্জেটির নিকটে গেলেন। সে তথায় একাকী। মার্কুইস্‌কে দেখিয়া জর্জ্জেট হাসিতে লাগিল। এই পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিটিও অনুভব করিল, তাঁহার আঁখির পাতা আর্দ্র হইয়া আসিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটি কি?"

মেয়েটি বলিল, "জর্জ্জেট।"

তিনি তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সে তখনও হাসিতেছে। মার্কুইস্ যখন তাহাকে রাডুবের হস্তে দিতেছিলেন, তখন শিশুর নিষ্পাপ সৌন্দর্য্যে এমন উচ্চমনাঃ অথচ এমন কঠোর মার্কুইস্‌ও একেবারে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া গেলেন; বৃদ্ধ শিশুটিকে চুম্বন করিলেন।

সৈনিকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "ওই যে ছোট্ট মেয়েটি!" জর্জ্জেটি সকলের উল্লাসধ্বনির মধ্যে ক্রমে কোলে কোলে মাটিতে নামিয়া আসিল। কেহ করতালি দিল: কেহ লাফাইতে লাগিল; বৃদ্ধ সৈনিকগণের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ শোকাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; মেয়েটি হাসিতে লাগিল।

মইএর পাদমূলে সন্তান-মাতা রুদ্ধশ্বাসে দণ্ডায়মান—এই আকস্মিক অভাবিত, অসম্ভব পরিবর্ত্তনে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। যেন নিমেষমধ্যে নরক হইতে নন্দনে নীত হইয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল: আনন্দের আতিশয্যেও হৃদয় ব্যথিত হয়। সে দুইহাত বাড়াইয়া দিয়া গ্রোস্ এলেন, রেণিজিন ও জর্জ্জেটিকে আপনার ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া উন্মত্তের মতো অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল, তারপর উচ্চ হাস্য করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

উচ্ছ্বসিত সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "ওরা সকলেই রক্ষা পেয়েছে।"

সকলেই রক্ষা পাইল বটে, কেবল সেই বৃদ্ধ মার্কুইস্ ব্যতীত।

কিন্তু তাহার কথা কেহই ভাবিল না—বোধ হয় তিনি নিজেও তাহা ভাবেন নাই। স্বপ্নমুগ্ধের মতো আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ জানালায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া রহিলেন—যেন অগ্নি-দেবতাকে মন স্থির করিবার জন্য সময় দিতেছিলেন। তারপর, কিছুমাত্র চাঞ্চল্য না দেখাইয়া, ধীরে ধীরে জানালার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং উন্নত মস্তকে গর্ব্বিত পাদক্ষেপে মই এর ধাপ অতিক্রম করিয়া মহিমা মণ্ডিত ছায়ামূর্ত্তির মতো নীরবে নামিয়া আসিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বহ্নি তরঙ্গ, সম্মুখে সুগভীর খদ,—কিছুতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। মইএর উপর যাহারা ছিল, তাহারা লম্ফ দিয়া সরিয়া পড়িল; দর্শকেরা শিহরিয়া উঠিল। সু উচ্চ সৌধশিখর হইতে অবতরণকারী এই লোকটিকে ঘিরিয়া যেন একটা দীব্য ভীতির অদৃশ্য ছায়া বিরাজ করিতেছিল। তিনি শান্তভাবে সম্মুখের অন্ধকারে



মোগল যুগের অন্তঃপুর

চিত্রাধিকারী Mr. W. Gregory
এবং 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সৌজন্যে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, লোকেরা যেন ততই পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। তাঁহার মর্ম্মর-গঠিত-বৎ মলিন বদনমণ্ডল সম্পূর্ণ আবেগ-শূন্য। তাঁহার উদ্ধত দৃষ্টি প্রশান্ত এবং তুষারশীতল। প্রতি পাদক্ষেপে তিনি বিস্মিত জনতার যতই সমীপবর্ত্তী হইতেছিলেন, ততই তাঁহার ঋজু, উন্নত মূর্ত্তি উন্নততর দেখাইতেছিল। তাঁহার দৃঢ় পাদক্ষেপে কম্পিত মই হইতে শব্দ নির্গত হইতেছিল।

সিঁড়ির সর্ব্বশেষ ধাপ অতিক্রম করিয়া মার্ক্ইস্ যখন ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন, তখন তাঁহার স্কন্ধে একটি হস্ত অর্পিত হইল। তিনি ফিরিয়া চাহিলেন।

"আমি তোমাকে গ্রেফ্তার করিলাম।" ইহা সিমুর্দ্যানের উক্তি।

প্রত্যুত্তরে ল্যান্টিনেক কহিলেন, "আমি তোমার কার্য্যের অনুমোদন করি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নালন্দা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্ত্তী এম্ এ

১

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার সময়ে বৌদ্ধ বিহারগুলি শিক্ষার কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। কাঞ্চীপুর, নালন্দা, শ্রীধন্যকটক, কাশ্মীর, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, জগদ্দল—এসব বিহারে শিক্ষালাভ করিয়া বৌদ্ধপণ্ডিতগণ দেশে বিদেশে সদ্ধর্ম্মের প্রচার করিতেন। বিদর্ভদেশে কৃষ্ণানদীর তীরে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সুপ্রসিদ্ধ নাগার্জ্জুন শ্রীধান্যকটক মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয়বিধ শিক্ষাদানেরই ব্যবস্থা ছিল (Hindu History. A. K. Majumder p. 830)। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় অনুমান করেন যে, তিব্বতের বিখ্যাত ডাপুঙ্ (Dapung) বিহার শ্রীধন্যকটক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ডাপুঙ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আট সহস্র বৌদ্ধ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করিত এবং তাহার অধীনে ছয়টি কলেজ ছিল (Hindustan Review 1906 as quoted in the Glories of Magadha by Prof. Samadder p. 119)।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন ৩৯৯—৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। তিনি অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পাটনার এক বিহারে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। তাম্র-লিপ্তির বিহারেও তিনি কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পাঞ্জাবে তখনও মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হইত, পূর্ব্বদেশে লিখন পদ্ধতির বহুল প্রচলন ছিল।

ফাহিয়েনের প্রায় দুই শতাব্দী পরে হিউএন্-ৎসাঙ্ (৬৩০—৬৪৪) ভারতবর্ষে ভ্রমণার্থ আগমন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে তৎকালীন শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। তিনি বহু বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে হিরণ্যপর্ব্বতে তিনি দশটি সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন; উহাতে চারিসহস্র বৌদ্ধ বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিত। তাম্রলিপ্তিতেও দশটি সঙ্ঘারাম ছিল; উহাতে সহস্র বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিতেছিল। তিলদকের সঙ্ঘারামে (নালন্দা হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে) বহুদূরবর্ত্তী

স্থান হইতে শিক্ষার্থী আসিয়া অধ্যয়ন করিত। উহাতে এক সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত বৌদ্ধশাস্ত্রের মহাযান শাখা অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

নালন্দা প্রাচীন ভারতের সর্ব্বপ্রধান সারস্বত ক্ষেত্র। ইহা একসময়ে সমগ্র এশিয়াখণ্ডের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। হিউয়েন্-ৎসাঙ্-এর ভারত পরিত্যাগের কিছুকাল পরে ঈৎসিঙ্ (I-Tsing) ভারত ভ্রমণে আসেন এবং ৬৭৩—৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে অবস্থান করেন। হিউয়েন্-ৎসাঙ্ ও ঈ-ৎসিঙ্-এর লিখিত বিবরণীতে আমরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা পাই এবং এতদুপলক্ষে বৌদ্ধযুগের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও আমাদের বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা হইয়া থাকে।

২

রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে (বিহারে রাজগিরের ৭ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান বড়গাঁও নামক গ্রামে) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহা যে ঠিক্ কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সুনির্দ্ধারণ সম্ভব নহে। এরূপ কথিত আছে, কয়েকজন ধনী ব্যক্তি নালন্দা গ্রামটি ভগবান্ তথাগতকে বিহার নির্ম্মাণের জন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এক সময় এখানে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিনির্ব্বাণ লাভের পর শক্রাদিত্য এই স্থানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর তদীয় পুত্র বুদ্ধগুপ্ত উহার দক্ষিণদিকে আর একটি সংঘারাম স্থাপন করেন। বুদ্ধগুপ্তের পুত্র রাজা তথাগত পূর্ব্বোক্ত সংঘারামের পূর্ব্বদিকে আর একটি বিহার প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা তথাগতের পুত্র বালাদিত্য উহার উত্তরপূর্ব্ব কোণে আর একটি এবং তাঁহার পুত্র বজ্র তাহার উত্তরে আর একটি সংঘারাম স্থাপন করেন। মধ্যভারতের এক নৃপতি একটি সংঘারাম ও সকল সংঘারামের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে নালন্দা মহাবিহারের ভবনগুলি পর পর ছয়জন নৃপতি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

"নালন্দা"—নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। হিউয়েন্-ৎসাঙ্ বলেন, প্রাচীন সংঘারামের আম্রবাটিকার মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘিকা ছিল এবং তাহাতে 'নালন্দ' নামে এক নাগ বাস করিত। ঐ নালন্দ নাগ হইতেই উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পুরাকালে তথাগত এইস্থানে বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অনবরত দান করিতে থাকেন, তদনুসারে ইহার নাম "নালন্দা"—(না-অলম্-দা—সর্ব্বস্ব দিয়াও যাঁহার তৃপ্তি হয় না) হইয়াছে। আবার কাহারো মতে 'নালন্দা' নামের ব্যুৎপত্তি 'নাগানন্দে'র নামের সহিত জড়িত আছে।

৩

নালন্দা মহাবিহারে মোট ৩০০টি ক্ষুদ্র ও ৮টি বৃহৎ কক্ষ ছিল। ক্ষুদ্র কক্ষগুলির পরিমাপ ছিল ১২×৮ ফুট্। প্রধান মণ্ডপটি ছিল দীর্ঘ চতরস্র, সুবৃহৎ অষ্ট কক্ষ সমন্বিত ও উচ্চতায় ত্রিতল। প্রতি তল ১০ ফুট উচ্চ ছিল। চতুর্দ্দিকে বারান্দা থাকাতে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা ছিল। বিহারে কতকগুলি সুগভীর দীর্ঘিকা ছিল।

নালন্দায় ছাত্রদের নিকট হইতে কোন বেতন লওয়া হইত না। মগধের নৃপতিগণ ১০০টি গ্রামের উপস্বত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই সকল গ্রাম হইতে প্রায় ২০০ সম্পন্ন গৃহস্থ প্রত্যহ ভিক্ষু ও ছাত্রদের জন্ত খাদ্য সরবরাহ করিত।

প্রতিদিন প্রাতে ঘণ্টাধ্বনি হইলে ভিক্ষু ও ছাত্রেরা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইতেন। সন্ধ্যার সময় ভিক্ষুরা এক গৃহ হইতে অন্ত গৃহে সন্ধ্যাগীত গাহিয়া বেড়াইতেন। সূর্য্যোদয় হইতে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ হইত এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা জটিল প্রশ্নের সমাধান চলিত। হিউয়েন্-ৎসাঙ্-এর লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়—তাঁহার আহারের জন্ত প্রত্যহ ১২০টি জম্বীর, ২০টি জায়ফল, ২০টি খেজুর, ২॥০ তোলা কর্পূর, একপোয়া মহাশালী ধান্তের চাউল, কিছু তৈল ও মাখন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহা হইতে নালন্দার ভিক্ষু ও শিক্ষার্থীদের আহার্য্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। প্রবেশকারী ছাত্রদিগকে দ্বার-পণ্ডিতের নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। শতকরা ২০টির অধিক ছাত্র এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতনা। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ সুনাম ছিল যে, তথাকার ছাত্রগণ সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন। কেহ কেহ সম্মান আকর্ষণের জন্য মিথ্যা করিয়া নিজকে নালন্দার ছাত্র বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইত। হিউয়েন্-ৎসাঙ্ লিখিয়াছেন যে, সহস্র সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ১০ সহস্র বিদ্যার্থী এইস্থানে পাঠার্থ সমবেত হইত। ১০০টি বেদী হইতে অধ্যাপকগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন ও কোরিয়াবাসী বহু বিদ্যার্থী শিক্ষালাভ করিয়াছিল।

প্রথমত নালন্দা হইতে কোন উপাধি বিতরণ করা হইত না। উপাধি বিতরণের প্রথা পরে প্রবর্ত্তিত হয়। কৃতী ছাত্রদিগের নাম উচ্চ ফটকের গাত্রে খোদিত থাকিত। উপাধিপত্রের শিলমোহরে লেখা থাকিত "শ্রী নালন্দা মহা-বিহারী আর্য্য ভিক্ষু সঙ্ঘস্য"। তাহাতে একটি ধর্ম্মচক্র এবং ধর্ম্মচক্রের দুইপার্শ্বে দুইটি হরিণ উপরের দিকে মুখ করিয়া আঁকা থাকিত। নালন্দার মূলমন্ত্র (motto) ছিল;—

অক্রোধেন জিনে ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলীকবাদিনম্ ॥

ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা জয় করিবে; অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে; কৃপণকে দান দ্বারা জয় করিবে; মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।

ঈ-ৎসিঙ্ (I-Tsing) নালন্দার পাঠ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্ব্বে শিক্ষার্থীকে তিন বৎসর যাবৎ ব্যাকরণ লিখিতে হইতে। সাধারণত দশম বৎসর বয়সে ব্যাকরণ পাঠ সমাপ্ত হইত। তৎপর তাহাকে বৃত্তিসূত্র (পাণিনি সূত্রের উপর টীকা বিশেষ) পাঠ করিতে হইত। তৎপর শিক্ষার্থী গদ্য ও পদ্য রচনা শিখিত। ইহার পর হেতুবিদ্যা (Logic), অভিধর্ম্মকোষ (Metaphysics) ও জাতক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিতে হইত। এ সকল পাঠ শেষ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলেজ বিভাগে?) প্রবেশের অনুমতি মিলিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া শিক্ষার্থী পতঞ্জলির মহাভাষ্য, ভর্তৃহরিশাস্ত্র (নীতি ও উচ্চাঙ্গের ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ), বাক্য (উচ্চাঙ্গের তর্কশাস্ত্র), বেদ ও বিনয় গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া নালন্দার ছাত্রগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া নিজেদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার জন্য নানাবিধ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইত। যাহারা এ সকল ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিত তাহারা উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত। কেহ কেহ বা আজীবন বিদ্যাচর্চ্চায় নিরত থাকিত।

নালন্দার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ পরস্পর একান্ত প্রীতি-ভাবাপন্ন হইয়া একত্র বাস করিত। ছাত্রেরা অধ্যাপকদিগের পরিচর্য্যা করিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার নির্দ্ধারিত সময় ব্যতিরেকেও শিক্ষার্থীরা অধ্যাপকগণের নিকট হইতে অধ্যয়নে সাহায্য পাইত।

৪

নালন্দার অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যপ্রভা বহু দূরবর্ত্তী দেশেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং নানা দিগ্‌দেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ তাঁহাদের নিকট পড়িতে আসিত। নালন্দা মহাবিহারের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত,—মহাচার্য্য আর্য্যদেব, ধর্ম্মপাল, আচার্য্য শীলভদ্র, চন্দ্র গোমিন্, পদ্মসম্ভব, শান্ত-রক্ষিত, বুদ্ধকীর্ত্তি, কর্ণশ্রী, সুমতিসেন, কর্ণপতি, মহাযোগী কুমারশ্রী ও স্থিরমতি।

হিউয়েন্-ৎ সাঙ্ এর সময় শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। জ্ঞান ও বিদ্যায় শীলভদ্র তৎকালীন সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া পরম গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিউয়েন্-ৎ সাঙ্ ইঁহারই পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করেন। শীলভদ্র বঙ্গদেশের কোন এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিব্বতরাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ৭৫০ খৃষ্টাব্দে নালন্দার সঙ্ঘস্থবির কমলশীল তিব্বতে যাইয়া সদ্ধর্ম্মের প্রচার করেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে পদ্মসম্ভব ও শান্তরক্ষিত খ্রী-স্রোং-দেনসন্ (Khri-Sron-den-tsan) কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া

তিব্বতে গমন করেন এবং সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। শান্তরক্ষিত তৎকালে নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ও পদ্মসম্ভব একজন অধ্যাপক ছিলেন।

নালন্দার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে ১০ জন পঞ্চাশৎবিধ সূত্রগ্রন্থে ও শাস্ত্রগ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫০০ জন ত্রিংশবিধ সূত্রগ্রন্থে ও শাস্ত্রগ্রন্থে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর সহস্র জন বিংশবিধ সূত্রগ্রন্থে ও শাস্ত্রগ্রন্থে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন। অধ্যক্ষ শীলভদ্র সর্ব্ববিধ সূত্রগ্রন্থ ও শাস্ত্রগ্রন্থেই অভিজ্ঞ ছিলেন।

৫

রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক নামক তিনটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থরাজি সুসজ্জিত ছিল। নবতল বিশিষ্ট রত্নোদধি নামক গ্রন্থাগারে প্রজ্ঞাপারামিতা সূত্র ও সমাজগুহ্য নামক তন্ত্রসমূহ রক্ষিত থাকিত। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন্-ৎসাঙ্ স্বদেশে চলিয়া যান। যাইবার সময় সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে প্রচুর ধনরত্ন দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পাথেয়র অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ না করিয়া পারিতোষিক স্বরূপ অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ প্রার্থনা করেন। কথিত আছে হিউয়েন্-ৎসাঙ ২০টি ঘোড়ার পিঠে করিয়া ঐ সকল পুঁথি নিয়া গিয়াছিলেন।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত নালন্দার গৌরব অব্যাহত ছিল। নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিক্রমশীলার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নালন্দার প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে থাকে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তুরস্ক আক্রমণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু পরে মুদিত ভদ্র নামক জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর উদ্যোগে মহাবিহারের পুনঃ-সংস্কার হয়। কিছুকাল পরে মগধের মন্ত্রী কুক্কুটসিদ্ধ একটি নূতন মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। একদিন নবনির্ম্মিত মণ্ডপে ধর্ম্মালোচনা হইতেছে এমন সময় দুইজন নগ্নপ্রায় তীর্থিক সন্ন্যাসী ঐ স্থানে উপস্থিত হন। কয়েকটি দুষ্টপ্রকৃতি বিদ্যার্থী তাহাদিগকে অপমানিত করে। কথিত আছে উক্ত তীর্থিকদ্বয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া দ্বাদশ বৎসর সূর্য্যের তপস্যা করেন। দ্বাদশ বৎসর অন্তে তাঁহারা এক যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞকুণ্ড হইতে প্রজ্জলিত কাষ্ঠখণ্ড লইয়া বিহারের মন্দিরে নিক্ষেপ করেন। ফলে গ্রন্থভবন সমেত সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়টি ভস্মীভূত হইয়া যায়। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে কোনমতে আত্মরক্ষা করিয়াও পরিশেষে নালন্দার মহাবিহার আত্মকলহের ফলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

বর্ত্তমানে মৃত্তিকাস্তূপ অপসারিত করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নালন্দা মহাবিহারের যে ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতেও অগ্নিদাহের সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিহারের ভবনগুলিতে অগ্নিদাহের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান। বিহারের অভ্যন্তরে ভস্মীভূত তণ্ডুলপরিপূর্ণ স্থালী প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী



বৃহত্তর—মহত্তর

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কম বয়সে অনেকের অনেক রকম সম্পদ জোটে। আমার জুটেছিল কয়েকটি অনাত্মীয়া নারীর স্নেহ। একান্ত সহজ ঘটনার মধ্য দিয়ে এদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, যে পরিচয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিণত হয়েছিল আত্মীয়তায়। এদের মধ্যে কেউ আজ পরলোকে, কেউ আজও বেঁচে আছে, কেউ আমার জীবনপথ থেকে একেবারে স'রে গেছে, কারো সঙ্গে আজও মাঝে মাঝে দেখা হয়। এদের কয়েক জনের জীবনের ইতিহাস অতি বিচিত্র। কিছু দিন আগে আমি একজনের কাহিনী আপনাদের শুনিয়েছি। সে আমার অতসী মামী। আজ মমতাদির কাহিনী শোনাব।

শীতের সকাল। রোদে ব'সে আমি স্কুলের পড়া করছি, মা কাছে ব'সে ফুলকপি কুটছেন। সে এসেই বলল, আপনারা রান্নার জন্য লোক রাখবেন? আমি ছোট ছেলে-মেয়েও রাখব।

নিঃসঙ্কোচ আবেদন। বোঝা গেল সঙ্কোচ অনেক ছিল, প্রাণপণ চেষ্টায় অতিরিক্ত জয় ক'রে ফেলেছে। তাই যেটুকু সঙ্কোচ নিতান্তই থাকা উচিত তাও এর নেই।

বয়স আর কত হবে, বছর তেইশ। পরণে সেলাই করা ময়লা সাড়ী, পাড়টা বিবর্ণ লাল। সীমন্ত পর্য্যন্ত ঘোমটা, ঈষৎ বিশীর্ণ মুখে গাঢ় শ্রান্তির ছায়া, স্থির অচঞ্চল দুটি চোখ। কপালে একটি ক্ষত-চিহ্ন—আন্দাজে পরা টিপের মত।

মা বললেন, তুমি রাঁধুনী?

চম্‌কে তার মুখ লাল হল। সে চমক ও লালিমার বার্ত্তা মার হৃদয়ে পৌঁছল, কোমল স্বরে বললেন, বোসো বাছা।

সে বসল না। অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ আমি রাঁধুনী। আমায় রাখবেন? আমি রান্না ছাড়া ছোট ছোট কাজও করব।

মা তাকে জেরা করলেন। দেখলাম, সে ভারি চাপা। মার প্রশ্নের ছাঁকা জবাব দিল, নিজে থেকে একটি কথা বেশী কইল না। সে বলল, তার নাম মমতা। আমাদের বাড়ী থেকে খানিক দূরে জীবনময়ের গলি, গলির ভেতরে সাতাশ নম্বর বাড়ীর একতলায় সে থাকে। তার স্বামী আছে আর একটি ছেলে। স্বামীর চাকরী নেই চারমাস, সংসার আর চলেনা; সে তাই পর্দ্দা ঠেলে উপার্জ্জনের জন্য বাইরে এসেছে। এই তার প্রথম চাকরী। মাইনে? সে তা জানেনা। দুবেলা রেঁধে দিয়ে যাবে, কিন্তু খাবেনা।

পনের টাকা মাইনে ঠিক হল। সে বোধ হয় টাকা বারো আশা করেছিল, কৃতজ্ঞতায় দু'চোখ সজল হয়ে উঠল। কিন্তু সমস্তটুকু কৃতজ্ঞতা সে নীরবেই প্রকাশ করল, কথা কইল না।

মা বললেন, আচ্ছা, তুমি কাল সকাল থেকে এসো।

সে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে তৎক্ষণাৎ চ'লে গেল। আমি গেটের কাছে তাকে পাকড়াও করলাম।

শোন। এখুনি যাচ্ছ কেন? রান্নাঘর দেখবেনা? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এসো।

কাল দেখবো, ব'লে সে এক সেকেণ্ড দাঁড়ালনা, আমায় তুচ্ছ ক'রে দিয়ে চ'লে গেল। ওকে আমার ভাল লেগেছিল, ওর সঙ্গে ভাব করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, তবু! আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে মার কাছে গেলাম। একটু বিস্মিত হয়েও। যার অমন মিষ্টিগলা, চোখে মুখে যার উপচে পড়া স্নেহ, তার ব্যবহার এমন রূঢ়!

মা বললেন, পিছনে ছুটেছিলি বুঝি ভাব করতে? ভাবিসনা, তোকে খুব ভাল বাসবে। বার বার তোর দিকে এমন ক'রে তাকাচ্ছিল!

শুনে খুসী হলাম। রাঁধুনীপদপ্রার্থিনীর স্নেহ সেদিন অমন কাম্য মনে হয়েছিল কেন বলতে পারি না।

পরদিন সে কাজে এল। নীরবে নতমুখে কাজ ক'রে গেল। যে বিষয়ে উপদেশ পেল পালন করল, যে বিষয়ে উপদেশ পেল না নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করল—অনর্থক প্রশ্ন করল না, নির্দ্দেশের অভাবে কোন কাজ ফেলে রাখল না। সে যেন বহুদিন এবাড়ীতে কাজ করছে বিনা আড়ম্বরে এমন নিঁখুত হল তার কাজ। জল তোলা, মসলা বাটা, চাকরের কর্ত্তব্য; চাকরকে বারান্দায় ব'সে আরামে বিড়ি টানতে দেখেও সে অনুরোধ জানাল না, নিজেই জল তুলে মশলা বাটতে বসল। মার ধমক খেয়ে চাকর কাছে যাওয়ামাত্র শিল ছেড়ে উঠে গেল।

কাজের শৃঙ্খলা ও ক্ষিপ্রতা দেখে সকলেতো খুসী হলেন, মার ভবিষ্যৎ বাণী সফল ক'রে সে যে আমার খুব ভালবাসবে তার কোন লক্ষণ না দেখে আমি হলাম ক্ষুণ্ণ। দুবার খাবার জল চাইলাম, চার পাঁচ বার রান্না ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু কিছুতেই সে আমায় ভালবাসল না। বরং রীতিমত উপেক্ষা করল। শুধু আমাকে নয়, সকলকে। কাজগুলিকে সে আপনার ক'রে নিল, মানুষগুলির দিকে ফিরেও তাকাল না। মার সঙ্গে মৃদুস্বরে দু একটি দরকারী কথা বলা ছাড়া ছটা থেকে বেলা সাড়ে দশটা অবধি একবার কাসির শব্দ পর্য্যন্ত করল না। সে যেন ছায়াময়ী মানবী, ছায়ার মতই ম্লানিমার ঐশ্বর্য্যে মহীয়সী, কিন্তু ধরা ছোঁয়ার অতীত, শব্দহীন অনুভূতিহীন নির্ব্বিকার।

রাগ ক'রে আমি স্কুলে চ'লে গেলাম। সে কি ক'রে জানবে মাইনে-করা রাঁধুনীর দূরে থাকাটাই সকলে তার কাছে আশা করছে না, তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য বাড়ীর ছোট কর্ত্তা ছটফট করছে।

সপ্তাহখানেক নিজের নতুন অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সে আমার সঙ্গে ভাব করল।

বাড়ীতে সেদিন কুটুম্ব এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল একগাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাণ্ড ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাঁড়ার ঘরে গোপন ভাগটা গোপনে মুখে পুরে চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ্ ক'রে হাত ধ'রে ফেলল। রাগ ক'রে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

সে বলল, দরজার পাশ থেকে দেখছিলাম, আর কটা খাচ্ছ গুণছিলাম। যা খেয়েচ তাতেই বোধ হয় অসুখ হবে, আর খেয়োনা। কেমন?

ভৎর্সনা নয়, আবেদন। মার কাছে ধরা পড়লে বকুনি খেতাম এবং এক খাবলা খাবার তুলে নিয়ে ছুটে পালাতাম: এর আবেদনে হাতের খাবার ফেলে দিলাম। সে বলল, লক্ষ্মী ছেলে। এসো জল খাবে।

বাড়ীর সকলে কুটুম নিয়ে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল, জল খেয়ে আমি রান্না ঘরে আসন পেতে তার কাছে বসলাম। এতদিন তার গম্ভীর মুখই শুধু দেখেছিলাম, আজ প্রথম দেখলাম, সে নিজের মনে হাসছে।

আমি বললাম, বামুনদি—

সে চমকে হাসি বন্ধ করল। এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমি তাকে গাল দিয়েছি। বুঝতে না পেরেও অপ্রতিভ হলাম।

কি হল বামুনদি।

বামুনদি শব্দটা কানে বিঁধল ভাই। ছুঁচের মত বিধ্‌ল!

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। বামুনদি শব্দটা কি মন্দ? এক রকমে দিদিই-তো বলা হল! সে এদিক ওদিক তাকাল। ডালে খানিকটা নুন ফেলে দিয়ে এসে হটাৎ আমার গা ঘেষে ব'সে পড়ল। গম্ভীর মুখে বলল, আমায় বামুনদি বোলোনা খোকা। শুধু দিদি বোলো। তোমার মা রাগ করবেন দিদি বললে?

আমি মাথা নাড়লাম। সে ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে আমাকে এত কাছে টেনে নিল যে আমার প্রথমটা ভারি লজ্জা করতে লাগল।

তারপর কিছুক্ষণ আমাদের যে গল্প চলল সে অপূর্ব্ব কথোপকথন মনে ক'রে লিখতে পারলে সাহিত্যে না হোক আমার কাছে সব চেয়ে মূল্যবান লেখা হয়ে উঠত।

হঠাৎ মা এলেন। সে দুহাতে আমাকে একরকম জড়িয়েই ধ'রে ছিল, হাত সরিয়ে ধরা-পড়া চোরের মত হঠাৎ বিব্রত হয়ে উঠল, দুচোখে ভয় দেখা দিল। কিন্তু সে

জন্য। পরক্ষণে আমার কপালে চুম্বন ক'রে মাকে বলল, এত কথা কইতে পারে আপনার ছেলে!

তখন বুঝিনি আজ বুঝি স্নেহে সে আমায় আদর করেনি, নিজের গর্ব্বপ্রতিষ্ঠার লোভে। মা যদি বলতেন, খোকা উঠে আয়,—যদি কেবল মুখ কালো ক'রে স'রে যেতেন, পরদিন সে কাজে আসত না। পনের টাকার খাতিরেও না, স্বামীপুত্রের অনাহারের তাড়নাতেও না।

মা হাসলেন। বললেন, ও, ওইরকম। সারাদিন বক বক করে। বেশী আস্কারা দিও না, জ্বালিয়ে মারবে।

ব'লে মা চ'লে গেলেন। তার দুচোখ দিয়ে দুফোঁটা দুর্ব্বোধ্য রহস্য টপ টপ ক'রে ঝ'রে পড়ল। মা অপমান করলে তার চোখ হয়ত শুকনই থাকত, সম্মানে চোখের জল ফেলল! সে সম্মানের আগাগোড়া করুণা ও দয়া মাখা ছিল, সেটা বোধ হয় তার সইল না।

তাকে আমি নিরক্ষর ব'লে জানতাম। কিন্তু সে যে আমার চেয়েও বিদ্বান পরদিন সে তত্ত্ব জানতে পারলাম। অভিধানে একস্ট্রর্ডিনারী শব্দটার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে রান্না ঘরে গিয়ে আমি জল চাইলাম। সে জল দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, অত ব্যস্ত হয়ে কি দেখচ ওতে?

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, ইংরাজিতে একটা কথা আছে একস্ট্রর্ডিনারী—তার মানে।

মৃদুহেসে সে বলল, ওকথাটার মানে অসাধারণ।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি জান! তুমি স্কুলে পড়েচ?

সে হেসে মাথা নাড়ল, পড়িনি। আমি কিছুই পড়িনি। শুধু ওই কথাটারই মানে জানি, আর কিছু জানি না। কাউকে বোলোনা ভাই, কেমন?

আমি স্বীকার ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, রান্না না ক'রে তুমি মেয়েইস্কুলে মাষ্টারি করনা কেন?

আমায় মাষ্টারি করতে দেবে কেন? আগে বিদ্যা হোক, তবে তো বিদ্যা দেব!

তুমি শিখচ বুঝি? কখন পড়?

রাত্তিরে, তুমি যখন ঘুমাও।

কেন পড়চ? তোমায় বর বুঝি পড়তে বলে?

সে হাসল, না। বর কেন পড়তে বলবে? আমি নিজেই পড়ি। একদিন মেয়েস্কুলের মাষ্টার হব কিনা, তাই।

পরে জেনেছিলাম, আমার চেয়ে খুববেশী বিদুষী না হলেও আমার চেয়ে তাড়াতাড়ি তার বিদ্যা বাড়ছিল। রাত্রে রান্না হওয়ামাত্র মা তাকে ছুটি দিতেন, পরিবেষণের জন্য আটকে রাখতেন না। বাড়ী গিয়ে নিজের সংসার থেকে কতরাত্রে ছুটি পেত জানিনা। কিন্তু যত রাত্রেই মুক্তি জুটুক, প্রদীপ জেলে সে জ্ঞান অর্জ্জন করতে বসত। ঘুমাতে যখন যেত তখন বোধ হয় পাড়ার পরীক্ষার্থী ছাত্রেরাও আলো নিভিয়ে শুয়েছে।

জ্ঞানের পিপাসা তার ছিল, কিন্তু শুধু সেই পিপাসা নিবৃত্তিরই জন্য অত কষ্ট ক'রে লেখা পড়া করত না। কি স্বার্থের খাতিরে সে নিজের মানসিক উন্নতির জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছিল যথাসময়ে আপনারা অনুমান করতে পারবেন।

তিন চার দিন পরে তার গালে তিনটে দাগ দেখতে পেলাম। মনে হল, আঙ্গুলের দাগ। মাষ্টারের চড় খেয়ে একদিন অবনীর গালে যে রকম দাগ হয়েছিল তেমনি। আমি ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, তোমার গালে আঙ্গুলের দাগ কেন? কে চড় মেরেছে?

সে চমকে গালে হাত চাপা দিয়ে বলল, দূর! তারপর হেসে বলল, আমি নিজে মেরেচি। কাল রাত্রে গালে একটা মশা বসেছিল, খুব রেগে—

মশা মারতে গালে চড়! ব'লে আমি খুব হাসলাম। সেও প্রথমটা আমার সঙ্গে হাসতে আরম্ভ ক'রে গালে হাত ঘষতে ঘষতে আনমনা ও গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখ দেখে আমারও হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম, ভাতের হাঁড়ির বুদ্‌বুদ্‌ফাটা বাষ্পে কি দেখে যেন তার চোখ পলক হারিয়েছে, নীচের ঠোঁট দাঁতে দাঁতে কামড়ে ধরেছে, বেদনায় মুখ হয়েছে কালো।

সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম, তুমি মিথ্যে বলচ দিদি। তোমায় কেউ মেরেচে।

সে হঠাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, না ভাই, না। সত্যি বলচি, না। কে মারবে?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে না পেয়ে আমাকে চুপ ক'রে

থাকতে হল। তখন কি জানি তার গালে চড় মারার অধিকার একজন মানুষের আঠার আনা আছে! কিন্তু চড় যে কেউ একজন মেরেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ঘুচল না। শুধু দাগ নয়, তার মুখ চোখের ভাব, তার কথার সুর সমস্ত আমার কাছে ওকথা ঘোষণা ক'রে দিল। বিবর্ণ গালে তিনটি রক্তবর্ণ দাগ দেখতে দেখতে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি গালে হাত বুলিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু সে আমার হাতটা টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

চুপি চুপি বলল, কারো কাছে যা চাইনা, তুমি তা দেবে কেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি দিলাম আমি?

সে বলল, সান্ত্বনা। জান সান্ত্বনাতে আমার বুক ধড়ফড় করে? মনে হয় তাঁর নিন্দে করচ, তাঁর গায়ে কালি মাখাচ্চ এইটুকু ছেলে তুমি, তোমার পায়ের ধুলোর তলে সে ডুবে যাচ্ছে!

সে কে দিদি?

এ প্রশ্নের জবাব পেলাম না। হটাৎ সে তরকারী নামাতে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পিঁড়িতে বসামাত্র খোঁপা খুলে পিঠ ভাসিয়ে একরাশি চুল মেঝে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, কি একটা অন্ধকার রহস্যের আড়ালে সে যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলল।

অবশ্যই রহস্য। গালে চড়ের দাগ; চিরদিন যে ধৈর্য্যময়ী ও শান্ত, তার ব্যাকুল কাতরতা ফিসফিস ক'রে ছোট ছেলেকে শোনানো; তোমার পায়ের ধুলোয় 'সে' ডুবে যাচ্চে! বুদ্ধির পরিমাণের তুলনায় এর চেয়ে বড় রহস্য আমার জীবনে কখনো দেখা দেয়নি! ভেবে চিন্তে আমি তার চুলগুলি নিয়ে বেণী পাকাবার চেষ্টা আরম্ভ ক'রে দিলাম। আমার আশা পূর্ণ হল, সে মুখ ফিরিয়ে হেসে রহস্যের ঘোমটা খুলে সহজ মানুষ হয়ে গেল।

বিকালে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার বরের চাকরী হলে তুমি কি করবে?

তুমি কি করতে বল? হরিলুট দেব? না, তোমায় সন্দেশ খাওয়াব?

দেব, তা বলচি না। তোমার বরের চাকরী নেই ব'লে আমাদের বাড়ী কাজ করচ তো, চাকরী হলে করবেনা?

সে হাসল, করব। এখন করচি যে!

তোমার বরের চাকরী হয়েচে?

হয়েচে, ব'লে সে গম্ভীর হয়ে গেল।

আহা, স্বামীর চাকরী নেই ব'লে ভদ্রলোকের মেয়ে কষ্টে পড়েচে, পাড়ার মহিলাদের কাছে মার এই মন্তব্য শুনে মমতাদির বরের চাকরীর জন্য আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। চাকরী হয়েছে শুনে পুলকিত হয়ে মাকে সংবাদটা শুনিয়ে দিলাম।

মা তাকে ডেকে পাঠালেন, তোমার স্বামীর চাকরী হয়েচে?

সে স্বীকার ক'রে বলল, হয়েচে। বেশী দিন নয়, ইংরাজী মাসের পয়লা থেকে।

মা বললেন, অন্য লোক ঠিক ক'রে দিতে পারচ না ব'লে কি তুমি কাজ ছেড়ে দিতে ইতস্ততঃ করচ? তার কোন দরকার নেই। আমরা তোমায় আটকে রাখব না। তোমার কষ্ট দূর হয়েচে তাতে আমরাও খুব সুখী। তুমি ইচ্ছে করলে এবেলাই কাজ ছেড়ে দিতে পার, আমাদের অসুবিধা হবে না।

তার চোখে জল এল; সে শুধু বলল, আমি কাজ করব।

মা বললেন, স্বামীর চাকরী হয়েছে তবু?

সে বলল, তাঁর সামান্য চাকরী, তাতে কুলবেনা মা। আমায় ছাড়াবেন না। আমার কাজ কি ভাল হচ্চে না?

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, অমন কথা তোমার শত্রুও বলতে পারবেনা মা। সেজন্য নয়। তোমার কথা ভেবেই আমি বলছিলাম। তোমার ওপর মায়া বসেচে, তুমি চ'লে গেলে আমাদেরও কি ভাল লাগবে?

সে একরকম পালিয়ে গেল। আমি তার পিছু নিলাম। রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম সে কাঁদছে। আমায় দেখে চোখ মুছল।

আচমকা বলল, মিথ্যে বললে কি হয় খোকা?

মিথ্যে বললে কি হয় জানতাম। বললাম, পাপ হয়।

গুরুনিন্দা বাঁচাতে মিথ্যা বললে?

এটা জানতাম না। গুরুনিন্দা পাপ, মিথ্যা বলা পাপ। কোনটা বেশী পাপ সে জ্ঞান আমার জন্মায়নি। কিন্তু না জানা কথা বলেও সান্ত্বনা দেওয়া চলে দেখে বললাম, তাঁতে একটুও পাপ হয় না। সত্যি। কাঁদচ কেন?

ঊর্দ্ধমুখে মুখের দিকে চেয়েছিলাম, আমার কপালে কয়েকফোঁটা জল পড়ল। রাগে দুঃখে অভিমানে আমিও অনেকদিন কেঁদেছি, কিন্তু অশ্রু যে তপ্ত হয় সে সংবাদ পাইনি। আজ পেলাম।

পরে জেনেছি, যে দুঃখ আগুনের মত বুকের ভেতরটা ঝলসে দেয় তার অশ্রুর মত তপ্ত কিছু নেই। রক্তের জলটুকু তাপে বাষ্প হয়ে চোখে জমে—তার পর গড়িয়ে পড়ে।

তখনও তার চাকরীর একমাস বোধ হয় পূর্ণ হয়নি। একদিন স্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার সময় দেখলাম জীবনময়ের গলির মোড়ে ফেরিওয়ালার কাছে কমলা লেবু কিনছে।

লেবু কিনচ? ব'লে বাহুল্য প্রশ্ন করলাম। কিছু বলা চাইত!

সে হাসল। না, লজ্জার সঙ্গে লড়াই করছি। লেবু কেনা তার উপলক্ষ্য শুধু। ঘোমটা ছাড়া পথ চলতে গা কাঁপে, জীবনে এই প্রথম ঘোমটা খুলে প্রকাশ্য-পথে জিনিষ কিনচি। পথটা যেন আমার ভাসুর ভাই, এমন লজ্জা করচে। একটু মজাও লাগচে। কি মজা জান? লড়াই-এর আনন্দ। লেবু খাবে?

আমি বললাম, দেৎ, রাস্তায় খেতে নেই।

সে একটু ভেবে বলল, আমাদের বাড়ী আসবে?

আমি খুসি হয়ে বললাম, চল।

এসো, ব'লে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে গলিতে ঢুকল। বিশ্রী নোংরা গলি। কে যে ঠাট্টা ক'রে এই যমালয়ের পথটার নাম জীবনময় লেন রেখেছিল ভেবে আমার হাসি পেল। গলিটা আস্ত ইঁট দিয়ে বাঁধানো, পায়ে পায়ে লাল হয়ে গেছে। দুদিকের বাড়ীর চাপে অন্ধকার, এখানে ওখানে আবর্জ্জনা আর একটা দূষিত গন্ধ। আমি সঙ্কুচিত হয়ে তার সঙ্গে চলতে লাগলাম। সে বলল, মনে হচ্ছে পাতালে চলেছ, না?

ও কথা মনে হলেও ভদ্রতার খাতিরে অস্বীকার করলাম। সে হেসে কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ পথের ধারে ঘেঁসে দাঁড়াল।

গলি দিয়ে দুএকটি লোক চলছিল মমতাদির সর্ব্বাঙ্গে চোখ বোলানোতেই অভদ্রতার সীমা রেখে। একটি মাঝ বয়সী খুব ফর্সা লোক কিন্তু এই সীমা অতিক্রম ক'রে গেল। মমতাদির গা ঘেঁষে যাবার সময় চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ?

লোকটির চেহারা ও পোষাক দুয়েরই দিব্যি জলুষ। এই গলি দিয়ে তার হেঁটে চলা যেন গলিটাকে পরিহাস করা, এমনি।

মমতাদি বলল, হীরক বাবু, একটু দাঁড়ান।

হীরকের মত চক্‌চকে হীরকবাবু দাঁড়াল। তার দিকে আঁচল বাড়িয়ে দিয়ে মমতাদি বলল, আমায় ছুঁয়ে গিয়ে যদি আপনার আনন্দ হয়ে থাকে আর একবার ছুঁয়ে যান। নিন্‌না আমার ময়লা সাড়ীর ছেঁড়া আঁচল থেকে আপনার আনন্দ-সম্পদ লুটে!

হীরক বলল, রাগ করলে মমতা? তুমি চটবে জানলে—

আমার রাগে আপনার কি এসে যায়? সঙ্গে একটি ছোট ছেলে, আমি মেয়ে মানুষ। আপনি নির্ভাবনায় অপমান করুন।

আমি ইচ্ছে ক'রে—

চিঠিগুলিও বুঝি ইচ্ছা ক'রে পাঠান নি? গরীব প্রতিবেশিনীকে দয়া ক'রে অনিচ্ছাতেই লিখেছিলেন? গৃহে পথে অপমান করচেন, সমস্তই অনিচ্ছায়?

হীরক মোলায়েম নালিশের সুরে বলল, তুমি জবাব দিলে না কেন? তাই তো আমার রাগ হল!

মমতাদির হাসিতে নিবিড় ঘৃণা। সে বলল, ও, তাই বলুন। এতক্ষণে বুঝলাম। চিঠির জবাব না পাওয়ায় জবাব প্রকাশ্য পথে দিলেন। আপনার মৌলিকতা আছে। যে দয়া চায় না তাকে নিষ্ঠুর পীড়ন দিতে হয়। আপনার শিক্ষা মনে থাকবে।

আমি ইতিপূর্ব্বেই আপনাদের বলেছি মমতাদির কণ্ঠে যাদু ছিল। কথার চেয়ে তার কণ্ঠস্বর মানুষকে বেশী

অভিভূত ক'রে দিত। সুমিষ্ট স্বরে ভর্ৎসনা—সে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। উদ্ধত চিত্তকে রসে ভিজিয়ে নত করত তার কণ্ঠস্বর, তারপর তার অনুযোগ জেনে না নিয়ে পথ থাকত না। মমতাদির বকুনির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, হীরকের অস্বস্তি দেখে বিস্মিত হলাম না। সে ম্লান মুখে বলল, অমন ক'রে বললে সাধুও চোর হয়ে যায় মমতা। তোমায় ভালবাসি ব'লেই—

এত নির্য্যাতন করেন? অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে মারেন? আপনার ভালবাসাও দয়ার মতই মৌলিক দেখচি!

হীরক মুখ কালো ক'রে বলল, নির্য্যাতন করি? তোমাকে? ঈশ্বর এ কথা বললে আমি তাকে মিথ্যাবাদী বলব।

মমতাদি বলল, ঈশ্বর কৃতার্থ হবেন। কিন্তু আপনি শুধু নির্য্যাতন করেন, কোনদিন নির্য্যাতিত হননি, তাই নির্য্যাতন কাকে বলে জানেন না। আপনি বাঘের মত অজ্ঞান, সাপের মত অচেতন,—নিজের একমাত্র হিংসা-সম্পদের স্বরূপ চেনেন না। আপনার দুচোখের ময়লায় সারাদিন আমার উঠান অশুচি হয়ে থাকে—আমার উঠান! শেষ রাত্রিতে আমার স্নান করতে হয়, নইলে আর ফাঁক পাইনা। আমার ছেলের হাত দিয়ে আপনি প্রেমপত্র পাঠান। ছেলে মাকে এনে দেয় পরের রাশি রাশি প্রণয় সম্ভাষণ! পৃথিবী ফাটেনা, আমি লজ্জায় ফেটে যাই। আমি যে পাড়া ছেড়ে পালিয়ে আপনার হাত থেকে মুক্তি নেব তার পথও আপনি বন্ধ করেচেন। নামমাত্র ভাড়ায় বাড়ী দিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমাকেও খাঁচায় পুরেচেন। পুলিশের চরের মত দিবানিশি আপনার নিষ্ঠুরতা আমার সাথী।

হীরকের মুখে কথা নেই। মমতাদি আবার বলল, আমার সঙ্গে কথা কইবার জন্য পাঁচ ছ'খানা চিঠিতে আপনি ব্যাকুল। আজ কথা কইলাম। আপনার একফোঁটা সুখ হল কি? দশমিনিট আপনি আমাকে সইতে পারবেন না, আমার মনের বয়স এত বেশী। দুদিন আমার সঙ্গে মিশলে আপনার চোখের ঠুলি খ'সে যাবে, দেখবেন আমার চামড়া লোল হয়েচে, মাথার চুল পেকেচে, আমার স্পর্শে মরণের হিমশীতলতার ইঙ্গিত। কি হীন সাধনায় আপনার দিন যাচ্চে হীরক বাবু—কি লজ্জায় আপনি আপনার নিজের অপচয়ে খুসী থাকচেন? আজ থেকে বন্ধ করবেন মিথ্যা তপস্যা?

ভেবে দেখি, ব'লে হীরক জোরে হেঁটে চ'লে গেল। পালিয়ে গেল বলা চলে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে মমতাদি বলল, মেয়েমানুষের কাছে হার মানায় লজ্জায় বোধ হয় বলতে পারল না, বন্ধ করবে। ভেবে দেখি মানেই বোধ হয় আর জ্বালাতন করবে না। তোমার কি মনে হয়?

আমার মনে হচ্ছিল বেশী বয়সের নরনারী হেঁয়ালিতে কথা কইতে ভালবাসে। আমি কিছু বলতে পারলাম না। হঠাৎ প্রশ্নের জবাবদাতার বয়সটা খেয়াল ক'রে সে লজ্জিত হয়ে বলল, চল যাই।

সাতাশ নম্বরের বাড়ীটা দোতলা নিশ্চয়, কিন্তু যতক্ষুদ্র দোতলা হওয়া সম্ভব। সদর দরজার পরেই ছোট একটি উঠান, মাঝামাঝি কাঠের প্রাচীর দিয়ে দুভাগ করা। নীচে ঘরের সংখ্যা বোধ হয় চার, কারণ মমতাদি আমায় যেভাগে নিয়ে গেল সেখানে দুখানা ছোট ছোট কুঠরির বেশী কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। ঘরের সামনে দুহাত চওড়া একটু রোয়াক, একপাশে একশিট করোগেট আয়রণের ছাদ ও চটের বেড়ার অস্থায়ী রান্নাঘর। চটগুলি কয়লার ধোঁয়ায় কয়লার বর্ণ পেয়েচে।

সে আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে টুলে বসাল। ঘরে দুটি জানালা আছে এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই শোবার ঘর ক'রে অন্য ঘরখানার চেয়ে বেশী মান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জানালা দুটির এমনি অবস্থান যে, আলো যদিও কিছু কিছু আসে বাতাসের আসা যাওয়া একেবারে অসম্ভব। সুতরাং পক্ষপাতিত্বের যে খুব জোরালো কারণ ছিল তা বলা যায় না। সংসারের সমস্ত জিনিষ প্রায় এঘরে ঠাঁই পেয়েছে। সব কমদামী শ্রীহীন জিনিষ। এই শ্রীহীতার জন্য সযত্নে গুছিয়ে রাখা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে বিশৃঙ্খলতার অন্ত নেই। একপাশে বড় চৌকী, তাতে মলিন বিছানা গুটানো। চৌকীর তলে একটা চরকা আর ভাঙা বেতের বাস্কেট চোখে পড়ে, অন্তরালে হয়ত আরও জিনিষ আছে। ঘরের এক কোণে পাশাপাশি রক্ষিত দুটি ট্রাঙ্ক

—ছুটিরই রঙ চ'টে গেছে, একটির তালা ভাঙ্গা। অন্য কোণে কয়েকটা মাজা বাসন, বাসনের ঠিক উর্দ্ধে কোণাকুণি টাঙ্গানো দড়িতে খান কয়েক কাপড়। এই দুই কোণের মাঝামাঝি দেওয়াল ঘেঁষে পাতা একটি ভাঙ্গা টেবিল, আগাগোড়া দড়ির ব্যাণ্ডেজের জোরে কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলে কয়েকটা বই খাতা, একটি অল্পদামী টাইমপিস, কয়েকটা ওষুধের শিশি, একটা মেরামত করা আর্সি, কয়েকটা ভাঁজ করা সংবাদ পত্র, এই সব টুকিটাকি জিনিষ। টেবিলের উর্দ্ধে দেয়ালের গর্ত্তের তাকে কতকগুলি বই।

ঘরে অরে একটি জিনিষ ছিল—একটি পাঁচ ছ বছরের ছেলে। চৌকীতে শুধু মাদুরের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে সে ঘুমিয়ে ছিল। মমতাদি ঘরে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে ছেলেটির গায়ে হাত দিল, তার পর গুটানো বিছানার ভেতর থেকে লেপ আর বালিস টেনে বার করল। সন্তর্পণে ছেলেটির মাথার তলে বালিস দিয়ে লেপ দিয়ে গা ঢেকে দিল।

বলল, কাল সারারাত পেটের ব্যথায় নিজেও ঘুমায়নি, আমাকেও ঘুমাতে দেয় নি। উনি ত রাগ ক'রে—কই, তুমি লেবু খেলে না?

আমি একটা লেবু খেলাম। সে চুপ ক'রে খাওয়া দেখে বলল, মুড়ি ছাড়া ঘরে কিছু নেই, দোকানের বিষও দেবনা। একটা লেবু খাওয়াতে তোমাকে ডেকে আন্‌লাম, আমার মত লজ্জাহীনা কাউকে দেখেচ? ব'লে লজ্জা ও বেদনার করুণ হাসি হাসল।

আমি বললাম, আর একটা লেবু খাব দিদি।

সে হেসে লেবু দিল, বলল কৃতার্থ হলাম। সবাই যদি তোমার মত সান্ত্বনা দিতে জানত! নিজের ভারে আমার পা মাটিতে ব'সে যায়, আমি লঘু হয়ে উঠতাম।

প্রশংসায় প্রচুর আনন্দ পেলাম। যদিও, সত্য কথা বলতে সান্ত্বনা দেবার জন্য অথবা লেবুগুলি খুব মিষ্টি ছিল ব'লে আর একটা চেয়ে খেয়েছিলাম সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত আমার রীতিমত সংশয় র'য়ে গেছে।

ঘরে আলো ও বাতাসের দীনতা ছিল। খানিক পরে সে আমায় বাইরে রোয়াকে মাদুর পেতে বসাল। কথা বলার সঙ্গে সংসারের কয়েকটা কাজও ক'রে নিল। ঘর ঝাঁট দিল, কড়াই মাজল, জল তুলল, তারপর মসলা বাটতে বসল। হঠাৎ বলল, তুমি এবার বাড়ী যাও ভাই। তোমার খিদে পেয়েচে।

খিদে পায়নি। স্কুলে টিফিন খেয়েচি যে!

তোমার মা ভাববেন।

কেন ভাববে? আমি কতদিন ছুটির পর বন্ধুর বাড়ী যাই, আজ তাই গিয়েচি ভাববে।

এটা বুঝি তোমার বন্ধুর বাড়ী? ব'লে সে হাসল। হাসল কিন্তু কি একটা অস্বস্তি তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে স্পষ্ট অনুভব করলাম।

ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করতে যাব, রাজা যেন রাজধানীতে প্রবেশ করলেন এমনি ভঙ্গিতে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের একটি লোক বাড়ী ঢুকল। গৃহ প্রবেশের রকম দেখেই আমি তাকে চিনলাম। মমতাদির বর নগেন।

যেমন রোগা তেমনি ঢ্যাঙ্গা। এত লম্বা লোক কোন দিন আমার চোখে পড়েনি। লম্বাও আবার এক অদ্ভুত রকমের। দেহের দীর্ঘ কাঠামোর সঙ্গে খাপ খেতে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও যেন লম্বাটে হয়ে গেছে। আজানুলম্বিত না কি বলে, বাহু দুটি তেমনি অস্বাভাবিক দীর্ঘ, দুদিক চাপা ফজলি আমের মত লম্বাটে মুখে খাঁড়ার মত নাক, চিবুকটা ঠেলে নেমে ডগার দিকে চোখা, মাথার চুলও বেজায় লম্বা। গায়ের কোটটা পর্য্যন্ত বালিশের ওয়াড়ের মত সরু আর দীর্ঘ। সদর দোর থেকে তিনবার পা ফেলেই রোয়াকে পৌছল। নীচু হয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে নিরীক্ষণ ক'রে বলল, তুমি কে হে?

মুখে তামাকের দুর্গন্ধ, দাঁতগুলির গায়ে কালো কালো কোট। আমি মুখ সরিয়ে নিয়ে বললাম, আমি সুরেশ।

সুরেশ নাকি? বেশ দাদা বেশ। তা আমার বাড়ীতে হঠাৎ সুরেশের আমদানি কি জন্য? এ বাড়ীতে সুরের রেশটুকুও যে নেই দাদা! ওর জন্যে নাকি? আমার ইস্তিরির এইটুকু প্রেমিক! ব'লে উদ্ভট হাসির সঙ্গে তামাকের গন্ধ বিস্তার করল।

মমতাদি বলল, এসব কি বলচ ছেলেমানুষকে? আমি

ওদের বাড়ী কাজ করি, ওকে আমি ডেকে এনেচি। ওকে ভয় দেখাচ্চ কেন?

নগেন চট ক'রে সোজা হয়ে গেল, ভয় দেখাচ্ছি? বড় যে লম্বা চওড়া কথা শিখেছ! আমি ভূত নাকি যে ভয় দেখাব?

মমতাদি কথা না ক'য়ে মসলা বাটতে লাগল। নগেন লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে ধরাল। আচমকা নীচু হয়ে আমার মুখে ধেঁায়া ছেড়ে হা হা ক'রে হাঁপানির মত হাসল। বিড়ির কড়া ধেঁায়ায় আমি কেশে ফেললাম।

ছি! ওকি কর? ব'লে মমতাদি শিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নগেন ফের ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে গেল, তুমি ফোঁড়ন কাটছ কেন? ঠোঁট দুটো বন্ধ ক'রে রাখতে পার না? ব'লে ঠোঁটে এতজোরে টোকা দিল যে ব্যথায় সে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

বেড়ে দেখাচ্ছে তোমায় মাইরি—খাসা। গালে টোকা দিলে আরও বেড়ে দেখাবে। দেব?

মমতাদি পিছু হটল। বলল, খোকার টনিক বুঝি নিজেই গিলে এসেচ?

আলবৎ। খোকা টনিক দিয়ে করবে কি? এখনও খোকার টনিক খাওয়ার বয়স হয় নি। টনিক লাগে এই আমাদের—ব'লে সগর্ব্বে নিজের বুক ঠুকে দিল। তারপর হঠাৎ মুখের জ্বলন্ত বিড়িটা আমার জামার পকেটে পুরে দিয়ে দুই কোমরে হাত রেখে সামনে পিছনে দুলে দুলে হাসতে লাগল।

আমি গম্ভীর মুখে পকেট থেকে বিড়িটা বার ক'রে ফেলে দিলাম। নগেন বলল, ফেলে দিলি? একটান খেলিনে দাদা? পয়সায় মোটে আটটা বিড়ি - হায় হায়।

মমতাদি আমার দিকে চেয়ে বলল, তুমি বাড়ী যাও ভাই। চ'লে যাও এখান থেকে।

স্থানত্যাগ ক'রে বাড়ী যাওয়াই সঙ্গত বিবেচনা ক'রে আমি উঠে দাড়ালাম। কিন্তু চাণক্যনীতি পালনে ব্যাঘাত উপস্থিত হল। দুর্জ্জন আমার দু কাঁধে হাত দিয়ে জোরে চেপে বসিয়ে দিল, বলল, আরে আরে, কোথায় যাবি? বোস দাদা একটু। দুটো কথাবার্ত্তা ক'। আমার তৃষিত তাপিত চিত শেতল ক'রে চ'লে যা।

মমতাদি বলল, এসব কি করচ তুমি?

কি করছি? আচ্ছা বলছি কি করছি। রসিকতা করছি একটু। ওকে তুমি ভাই বললে না? বললে—আমি শুনেছি। তোমার ভাই আমার কে? শালা। আদরের শালার সঙ্গে একটু রসিকতাও করব না? কি বলহে?

ব'লে এত জোরে পিঠ চাপড়ে দিল যে পিঠ জ্বলে গেল। রাগ ক'রে বললাম, আপনি তো আচ্ছা ছোটলোক মশাই!

মাইরি যাদু? ব'লে সে আমার চিবুক ধ'রে নেড়ে দিল।

মমতাদি বলল, তুমি ওর সঙ্গে অমন করচ, এর ফল কি হবে জান?

জানি। হাত দিয়ে আমার মাথাটা কচাং ক'রে কেটে নেবে! ব'লে ভেংচি কাটার মত হাস্‌ল। পরে জেনেছি, সেটা নগেনের ব্যঙ্গ।

মমতাদি বলল, তোমার মাথার কিছু হবে না, চাকরী যাবে আমার। তুমি কি মনে কর ও বাড়ী ফিরে তোমার ব্যবহারের কথা ব'লে দিলে আর একদিনের জন্যও ওর মা আমাকে রাখবেন? যা খুসী তোমার কর। কিন্তু কাজ গেলে আমায় দুষোনা।

একথা মন্ত্রের মত কাজ করল। নগেন মুহূর্ত্তে দ'মে গিয়ে বলল, ইস! সেটাতো খেয়াল করিনি! আগে বলতে হয়। আচ্ছা হাঁদারাম তুমি যাহোক!

তারপর মুখখানা করুণ ক'রে বলল, তা খোকাবাবু বাড়ীতে বলতে যাবে কেন? আমি ঠাট্টা করছিলাম বৈত নয়! ঠাট্টা শুনে রাগ করবে বাড়ীতে নালিশ করবে, খোকা বাবুকে তুমি এত বোকা ভাব নাকি? ত্যাখোনা, খোকা এক্ষুনি আমায় ক্ষমা ক'রে ফেলবে। খোকার মত লক্ষী কে আছে? কার এমন বুদ্ধি বিবেচনা? খোকা গরীবের অন্ন মারবে, তুমি কি পাগল হয়েছ? হেঁ হেঁ—

কি জানি। কাল চাকরী থাকবে কি যাবে দেখেই

সেটা বোঝা যাবে। খোকার রাগ তুমি জান না। ব'লে মমতাদি ঘরে চ'লে গেল।

নগেন ধপ ক'রে আমার পাশে ব'সে পড়ল। গলা নীচু ক'রে বলল, চুপি চুপি না হয় তোমার পা ধরছি ভাই, রাগ রেখোনা। আমি না বুঝে বড্ড দোষ করেছি। অনুতাপে এখন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মাইরি বলছি। কালীর দিব্যি।

তার চোখ ছল্ ছল্ করতে লাগল! আমার অবশ্য আর রাগ রইল না, কিন্তু কি বলব ভেবে না পেয়ে চুপ ক'রে রইলাম। নীরবতাকে রাগ মনে ক'রে সে হঠাৎ নিজের কান ম'লে কাতর স্বরে বলল, বাড়ীতে বোলোনা ভাই, ম'রে যাব। তোমার দিদি পর্য্যন্ত যে উপোস করবে রে দাদা।

আমি তাড়াতাড়ি জানালাম যে রাগ করিনি, বাড়ীতেও বলব না। শোনামাত্র তার সব কাতরতা দূর হয়ে গেল। বরং অনুযোগ দিয়ে বলল, তুমি বড় নিষ্ঠুর ভাই! পায়ে ধরালে কান মলালে তবে ক্ষমা করলে। তুমিই বল, শুধু ক্ষমাতে কি এখন আমার মন ওঠে? ক্ষমার সঙ্গে একটু দয়াও ক'রে ফ্যালো, আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাক। বেশী নয় ভাই, একটু দয়া। যৎসামান্য।

কি বলুন?

বলছি। কিন্তু মনে রেখো আমার জন্যে চাইছি না দয়া। তেমন পাত্র আমি নই। আমি নিজের দুঃখের কথা কাউকে বলি না। কার জন্যে দয়া চাই জান? তোমার ওই দিদির জন্যে। ওর বড় লজ্জা, তাই মুখ ফুটে বলতে পারে না, আমার কাছে কাঁদে আর বলে, পনের টাকায় কুলোয় না, কি করি আমি, একদিন বিষ খেয়ে ম'রে যাব। মাইরি, ও কথা বলে আর হাউ হাউ ক'রে কাঁদে। সে কান্না দেখলে পাষাণেরও বুক ফেটে যায়। মা কালীর দিব্যি। টাকার জন্যে কাঁদে, বিষ খাবে বলে! আমি ব্যথিত হলাম।

নগেন বলল, ছটাকা মাইনে বাড়িয়ে না দিলে ত ওকে বাঁচানো চলে না ভাই। ভয়ে মরি দুঃখের জ্বালায় কবে সত্যি সত্যি বিষ খেয়ে ফ্যালে। তুমি যদি মাকে ব'লে ওর ছটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে পার তবেই সর্ব্বরক্ষে হয়। নইলে রোজ ওর বুকফাটা কান্না আর সয় না। নগেন মাথা নাড়তে লাগল।

আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলাম মাকে বলব। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে নগেন আচমকা আমায় সশব্দে চুম্বন ক'রে ফেলল। আমি আঁৎকে উঠে ছিটকে স'রে গেলাম। নগেন হাত জোড় ক'রে বলল, চটোনা দাদা। তোমায় বড় ভালবাসি কিনা, তাই সামলাতে পারলাম না।

আমি একটু হেসে তাকে অভয় দিলাম।

যুক্তকর মুক্ত ক'রে সে ফের মুখখানা করুণ করল, কি ভাবছি জান দাদা? ভাবছি ছটাকায় কি তোমার দিদির কান্না ঘুচবে! অভাবের সমুদ্রে ছটাকা ছ'ফোটা শিশির বইত নয়। তুমি বরং পাঁচটা টাকার কথাই বোলো। কেমন? তোমরা হলে রাজামানুষ, পাঁচটা টাকা তোমাদের কাছে পাঁচটা পয়সা। এ্যাঁ?

আমি স্বীকার করলাম। নগেন বলল, ওকে বলোনা কিন্তু। ওর বড় লজ্জা কিনা, কেঁদে কেটে অসুখ ক'রে ফেলবে। হয় ত লজ্জায় বিষও খেয়ে ফেলবে। জান, ওর কাছে আধ ভরি আফিং আছে।

শুনে আমি ভীত হয়ে বললাম, না, বলব না। সে খুসী হয়ে শিস দিতে আরম্ভ করল। মমতাদি বেরিয়ে আসতে সে আবার আমায় চোখ টিপে ইসারায় বারণ করল। তাতে লাভের মধ্যে এই হল যে, মমতাদি চোখটেপা দেখতে পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে আমাদের দুজনের দিকে তাকাতে লাগল।

নগেন বলল, ওকে বোলোনা খোকা, তোমায় আমি কি ছবি দিতে চেয়েছি। ব'লে ফের চোখ টিপল। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, আগের মত চোখ টেপার বুঝে প্রশ্নটা সামলে নিলাম। কিন্তু অনভ্যস্ত ছলনাটা চোখের বালির মত মনের মধ্যে কির্ কির্ করতে লাগল।

মমতাদি বলল, চল খোকা, আমরা যাই।

নগেন সুধাল, তুমি কোথা যাবে শুনি?

দুবেলা যেখানে রাঁধতে যাই সেখানে, আবার কোথা?

কী! চোপা হোতা হায়? উনুন ধরাবে কে, ভাত চাপাবে কে?

তুমি। আমার আজ সময় নেই।

তোর সময়ের নিকুচি করেছে! রোজ ভাত নামিয়ে নিই তাই তোর বাবার ভাগ্যি তা জানিস? উনুন ধরা ভাত চাপা, তারপর যেখানে খুসী মরবি যা। খোকার দাদার কি তর সইছে না নাকি? মমতাদি উঠানে নেমে পড়েছিল, রোয়াকে উঠল। বলল, বেশ, সব ক'রে দিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু কাল চাকরী গেলে আমায় মারতে উঠোনা যেন!

জোঁক ফণা ধরেছিল, মুখে নুন পড়া মাত্র নরম হয়ে গেল।

চাকরী যাবে কেন?

কেন? বেশ! সময় মত কাজে না গেলে কে পয়সা দিয়ে লোক রাখে? নটা বাজতে না বাজতে নাকে মুখে ভাত গুঁজে আপিসে ছোট কি জন্যে? তোমার চাকরী, আমার চাকরী নয়?

নগেন একরম কাদা হয়ে গিয়ে বলল, তোমার কাজে যাওয়ার সময় হয়েছে নাকি? তবে তুমি যাও। দেরী কোরোনা, চলে যাও। এদিকে যা হবার হবে।

মমতাদি হাসল, এদিকে সব হবে, তুমি ভেবোনা। খোকার অসুখ, আমি শীগগির ফিরে আসব।

নগেনও দাঁত বার ক'রে হেসে বলল, তুমি বেড়ে স্ত্রী বট মমতা! রূপবতী গুণবতী—অহো, কি একখানা চিজ মাইরি তুমি! কিন্তু শীগগির তো আসবে, খোকার দাদা রাগ করবে না?

মমতাদির মুখ লাল হয়ে গেল, সে বলল, রোজ একবার ক'রে খোকার দাদাকে নিয়ে ইঙ্গিত কর। রোজ তোমায় আমি বলি খোকার দাদা নেই, খোকাই বাড়ীর বড় ছেলে। খোকার বাবা বুড়ো মানুষ, তিনি ছাড়া বাড়ীতে আর কোন পুরুষমানুষ থাকে না। সে কথা অবিশ্বাস কর কেন? খোকাকেই না হয় জিজ্ঞাসা ক'রে সন্দেহ মিটিয়ে নাও। ও আজও মিথ্যে বলতে শেখেনি। হঠাৎ কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলল, কেন তুমি ওসব বল? এমন করলে আমি কাজ ছেড়ে দেব। খুন ক'রে ফেললেও আর বাড়ীর বাইরে পা দেব না।

নগেন দ'মে গিয়ে বলল, আহা রাগ কর কেন! তোমায় চাকরী ছাড়তে কে বলছে? একটু ঠাট্টা করেছি বৈত নয়। মাইরি ঠাট্টা। কালীর দিব্যি।

পথে নেমে আমি বললাম, তোমার বরটা ভয়ানক বজ্জাত তো!

তার মুখ কালো হল। বলল, ফের যদি ও কথা বল, তোমার সঙ্গে আমি কথা কইব না।

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। একটু রাগও হল। বজ্জাত লোককে বজ্জাত বললে কথা কইবে না, একি বিষম আব্দার। চ'টে আমি নীরবে পথ চলতে লাগলাম, সেও কথা কইলনা। বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল।

দিদি, রাগ করেচ?

সে হাসল। ভাই, হার মেনেচ? আগে কথা কয়েচ? না রাগ করিনি। দেখাচ্ছিলাম যে রাগ করেচি। ভাণ করছিলাম। স্বামীর নিন্দে শুনে সতি দেহত্যাগ করেছিলেন, অন্ততঃ একটু রাগের ভাণ না করলে আমার চলবে কেন?

সতী পতির চিতায় পুড়ে মরত। হিষ্ট্রীতে পড়েচি।

আমি নিজের চিতায় পুড়ে মরচি। জীবনীতে পড়বে। তুমি যদি লেখক হও কোনদিন, আমার জীবনীটা লিখো। খাসা গল্প হবে। একদিন শীতের সকালে রোদে পিঠ দিয়ে স্কুলের পড়া করছিলে, এমন সময়—ব'লে সে হাসল।

আমি বললাম, তোমার বর কাদের বাড়ী চাকরী করে দিদি?

বাড়ীতে নয়, আপিসে।

আপিসে! তবে তো অনেক টাকা মাইনে পায়।

বেশীনা, পঞ্চাশ।—ব'লে সে আমার আগে আগে বাড়ীতে ঢুকে গেল।

কোন কাজ ফেলে রাখা আমার স্বভাব নয়। আমি দেরী না ক'রে মমতাদির মাইনে বাড়িয়ে দেবার কথা মাকে বললাম। একেবারে পাঁচটাকা বাড়িয়ে দেবার কথা শুনে মা ভাবতে আরম্ভ করলেন।

আমি বললাম, বাড়িয়ে দিও মা। পাঁচ টাকাতো মোটে। নইলে ও বিষ খাবে।

ও বলেচে তোকে ?

না। ওর বর। তুমি কি ভাবচ ? বাড়িয়ে দেবেনা ?

মা হাসলেন, দেব। কিন্তু ওর বরটাতো আচ্ছা ঠ্যাটা রে ! একেবারে পাঁচটাকা দাবী ! ডাক ত মমতাকে।

আমি তাকে ডেকে আনলাম। মা বললেন, সামনের মাস থেকে তোমায় পাঁচটাকা ক'রে বেশী দেব মেয়ে।

সে প্রথমটা বিস্মিত হল, শেষে সন্দিগ্ধ ভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, আমি তো মাইনে বাড়াবার কথা বলিনি !

ও বলেচে, ব'লে মা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন।

মমতাদির মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বলল, আপনাকে পরে বলচি বেশী মাইনে নেব কিনা। তুমি একটু শুনে যাওতো ভাই। ব'লে আমায় রান্নাঘরে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল এবং এমন জেরা আরম্ভ ক'রে দিল যে আমি সব ব'লে ফেললাম ! ব'লে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বর বলছিল একথা শুনলে তুমি লজ্জায় বিষ খাবে। সত্যি খাবে ?

খেতে ইচ্ছে করচে। দেখি ভেবে।

শুনে আমি কেঁদে ফেলার উপক্রম করলাম। সে সময় তার মুখ দেখে কারো সাধ্য ছিলনা সন্দেহ করে বিষ খাওয়া সে ঠিক ক'রে ফেলেনি। অন্ততঃ আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছিলাম বাড়ী গিয়েই সে আধভরি আপিংটা খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু হঠাৎ সে হাসল। না, না, বিষ টিস খাবনা। আধভরি আপিং ? কোথায় পাব আপিং ! ও নগেন বলেচে। নগেনের কথা বিশ্বাস করোনা, ও মিথ্যুক। তবু বলে বিষ খাব ! খাবনা, খাবনা, খাবনা। তিন সত্যি করলাম।

মাকে গিয়ে বলল, পনের টাকার বেশী সে নেবেনা, নিলে মহাপাপ হবে। পরে নিজে থেকে মা যদি দু' এক টাকা বাড়িয়ে দেন সে খুসী হয়ে নেবে, এখন নয়। এখন নিলে ভগবান রাগ করবেন, তার সর্ব্বনাশ হবে।

মা বললেন, মমতা, তোমার মত একটি বৌ যেন আমি পাই। স্বামীকে ভগবানের ক্রোধ থেকে সকলে বাঁচিয়ে চলতে পারে না।

আমিও পারিনা মা, শুধু ব্যর্থ চেষ্টা করি। ব'লে মাথা নীচু ক'রে সে রান্নাঘরে চ'লে গেল। সে বড় ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি এখানে রান্না শেষ ক'রে বাড়ী গিয়ে রাঁধবে। তার খোকার অসুখ। বাড়ীতে মন ফেলে এসে পরের বাড়ী কতক্ষণ থাকা যায় ! আমি মাকে ছুটি দিতে বললাম। মা নিজে গিয়ে রাঁধতে বসলেন, তাকে বাড়ী যাওয়ার জন্য বকলেন, কিন্তু সে নীরবে কাজ ক'রে গেল, রান্না শেষ না ক'রে গেল না।

মা বললেন, এটা তোমার বাড়াবাড়ি। ছেলের অসুখ—

সে বলল, বেশী নয়, সামান্য অসুখ।

মা বললেন, তাই তুমি বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছ। তাই তাড়াতাড়িতে আজ তোমার হাত পা কাঁপচে, বেশী দেরী হচ্ছে। মনে মনে তুমি কি রকম উতলা হয়েচ বুঝিনা আমি ? আমি মা নই ? কি জেদ তোমার !

সে ম্লান হাসল।

রান্না শেষ হওয়া মাত্র সে চকিতে চ'লে গেল। চাকরটা বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসে, তাকে সঙ্গে নেবার জন্যও দাঁড়াল না।

পরদিন স্কুলে যাবার সময় দেখি জীবনময়ের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে নগেন বিড়ি টানছে। আমাকে দেখে সে একগাল হাসল।

মাকে বলনি যে ? ভুলে গিয়েছিলে বুঝি ?

বলেচি ত ! ব'লে আমি স্কুলের দিকে চলতে আরম্ভ করলাম।

সে আমার সঙ্গ নিল। বলেছ ! মাইনে বাড়লনা কেন তবে ? তোমার মা বুঝি খুব কৃপণ খোকা ? এ কথায় বেজায় চ'টে আমি তাকে সব ব'লে ফেললাম। ব'লে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে স্কুলে চ'লে গেলাম। লোকটা যে স্ত্রীর মহত্ত্বে পুলকিত হবে না তা জানতাম।

বিকালে মমতাদির গালে আঙুলের দাগের পুনরাবির্ভাব দেখে চমকে গেলাম।

কালকেও তুমি বুঝি নিজের গালে মশা মেরেছিলে ?

সে হাসল। হাসি নিশ্চয়ই, কিন্তু ওই বয়সেও আমি সে হাসির স্বরূপ চিনতে পারলাম। বলল, এবার মশা নয়

তাই—ঋণ পরিশোধ। একজনের পাঁচটা টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, সে চড় মেরে শোধ তুলেচে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, তোমার বর মেরেচে।

সে স্বীকার করল, হ্যাঁ সেই। আমরা খুব গরীব কিনা, আমার বরের রাগ তাই একটু বেশী। কাউকে বোলো না কিন্তু। বলবে?

তোমার বরকে আমি খুন করব।

আজ বুঝি এ কথায় সে হাসতে পারত, হাসিই এ কথার স্বাভাবিক জবাব ছিল। কিন্তু হেসে সে আমাকে আহত করল না। গম্ভীর হয়ে বলল, তাহলে আমি যে বিধবা হয়ে যাব? বিধবা হলে আমার ভারি কষ্ট হবে। মাছ খেতে পাব না, গয়না পরতে পাব না—

তোমার গয়না কই?

গয়না কি গায়ে থাকে বোকা ছেলে? গয়না বাক্সয় আছে। আমার বাক্স দেখনি তুমি? যে বাক্সটার তালা ভাঙা সেইটেতে।

৩

মাস চারেক পরে আমিও বুঝলাম তার ছেলে হবে। আরও মাসখানেক সে কাজ করল, তারপর বাধ্য হয়ে আসা বন্ধ করল। দশবার দিন পরে আমি খবর নিতে গেলাম। দেখলাম রোয়াকের যে প্রান্তটা খালি ছিল সেখানে চাঁচের বেড়ায় আঁতুড় ঘর নির্ম্মিত হয়েছে। ছাদটাও চাঁচের তবে তার ওপরে একটা ছেঁড়া সতরঞ্চি বিছানো। ছেঁড়া মলিন বিছানায় সে শুয়ে ছিল, পাশে একটা কাঁথা জড়ানো পুঁটলি। পুঁটলিটা চোখ বন্ধ ক'রে ঘুমোচ্ছে, আর মাঝে মাঝে কল্পিত স্তন চুষছে।

লুব্ধ হয়ে বললাম, কোলে নেব দিদি?

কাশিতে তার গলা ভেঙে গিয়েছিল, বিশ্রী শব্দ ক'রে বলল, আজ নয় ভাই। ওটা আজ অস্পৃশ্য, ছুঁলে নাইতে হবে। আঁতুড় উঠুক তখন কোলে নিও। সোমবারের পরে একদিন এসো, কেমন?

বৃহস্পতিবার গেলাম, কিন্তু ছেলেটাকে কোলে নিতে ঘেন্না হল। আঁতুড় ঘরটা অদৃশ্য হয়েছিল, রোয়াকে কাঁথায় শিশু শুয়ে ছিল। রোগা কালো, পেটটা টিম্‌টিমে, গলায় লাল লাল ঘা। প্রথম দিন শুধু ফুলের মত মুখখানা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম; আজ সম্পূর্ণ অবয়ব দেখে দারুণ বিতৃষ্ণা হল।

সে বলল, নেবে কোলে?

আমি বিপদে প'ড়ে অনিচ্ছার সঙ্গে বললাম, দাও। ওর গলায় কি হয়েচে দিদি?

শিশুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে বলল, কুষ্ঠ।

আমি চমকে বললাম, কুষ্ঠ?

সে চোখ তুলে তাকাল। দুচোখে নিবিড় ব্যথা, নিবিড় মমতা। তারি সঙ্গে কি একটা অস্বাভাবিক জ্যোতি।

না ভাই, কুষ্ঠ নয়। গরম তেলে পুড়ে গেচে। কিন্তু ওকে তোমার কোলে নিয়ে কাজ নেই। ওর শরীরে অনেক ফোস্কা, লাগবে।

কে গরম তেল ফেলে দিয়েছে দিদি?

সে নীরবে চোখ মুছল, জবাব দিল না। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। মমতাদি রোগা হয়ে গেছে, মুখের জ্যোতি নিভে গেছে। চোখের নীচে গভীর কালো দাগ, চোখ দিয়ে যেন দুঃখের কালি গড়িয়ে প'ড়ে শুকিয়েছে। আমার নিজের চোখে জল এল। একদিন একটা কমলা লেবু চেয়ে খেয়ে সান্ত্বনা দিতে পেরেছিলাম সে কথা মনে পড়ায় তেমনি ভাবে আজও সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। বিতৃষ্ণা জয় ক'রে বললাম, আমি কোলে নেব দিদি, তুমি তুলে দাও। খুব আস্তে ধরব, লাগবে না।

সে মাথা নাড়ল, না মামার কোলে ছেলে দেবার মত ভাগ্যবতী আমি নই ভাই। তুলে দিতে গেলে আমার হাত কেঁপে প'ড়ে ম'রে যাবে।

আমি আর কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

আরও তিন মাস কাটল। সে মা হবার ধাক্কা সামলে প্রায় আগের মত সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল, কিন্তু কাজ করতে এল না। একদিন স্কুল যাবার জন্য ঠিক সময়ে বাড়ী থেকে বার হয়ে রাস্তায় আমার মনে পড়ল ইংরাজী মাষ্টারের জ্বর হয়েছে, প্রথম ঘণ্টা ক্লাস হবে না। বাড়ী না ফিরে আমি মমতাদির ওখানে গেলাম।

নগেন আপিসে যাবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে রোয়াকে টুলে ব'সে পান চিবোচ্ছিল, আর গর্জ্জন ক'রে কি সব বলছিল। ছোট খোকাকে স্নান করিয়ে কাজল পরাতে পরাতে মমতাদি নির্ব্বিকার চিত্তে শুনে যাচ্ছিল।

উঠানে উপুড় হয়ে শুয়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল মমতাদির বড় ছেলে পাঁচু।

আমায় দেখে নগেন গর্জ্জন বন্ধ ক'রে সাদরে অভ্যর্থনা করল। নিজে মমতাদির পিঁড়িটা একটানে কেড়ে নিয়ে ব'সে আমায় টুলে বসাল। বলল যে, আমার জন্ত তার বড্ড মন কেমন করছিল। মমতাদি শুধু একটু হেসেই আমায় স্বাগত জানাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, পাঁচু কাঁদচে কেন?

নগেন বলল, ও শূয়ারকা বাচ্চার কথা বোলোনা ভাই। হারামজাদা দু'একবছরের মধ্যে জেলে ঢুকবে। এই বয়সে এমন পাকা চোর হয়ে উঠেছে যে, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। চুপ করলি পাষণ্ড ইষ্টুপিড নারকী? চুরি ক'রে মার খেয়ে কাঁদিস, তোর লজ্জা নেই?

আমি পাঁচুর দিকে চেয়ে দেখলাম, চোরের সাজাই হয়েছে বটে। পিঠময় অসংখ্য শাস্তির চিহ্ন, পাশে প'ড়ে আছে একটা ভাঙ্গা বাখারি। নিজের চোখকানকে আমার বিশ্বাস হল না। মমতাদির ছেলে চোর!

বললাম, কি চুরি করেচে?

নগেন বলল, পয়সা। খাবার নয়, খেলনা নয়, পয়সা। তাও কি আমাদের পয়সা? ওই ওদের—ব'লে আঙ্গুল দিয়ে দোতালাটা দেখিয়ে দিলে। বালিশের তলা হাতড়ে পাঁচসিকে চুরি ক'রে পালাচ্ছিল, যাদব বাবু দেখতে পেয়ে চোর ছেলে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন—সঙ্গে যাচ্ছেতাই গালাগালি। কি কি বলেছিল শুনবে একটা? ব'লে এমন একটা কথা বললে যার কদর্য্য ইঙ্গিত আমাকে গভীরভাবে পীড়ন করলে।

আমি চকিতে মমতাদির দিকে তাকালাম। সে মাথাটা এত নীচু করেছিল যে মুখ দেখতে পেলাম না। শুধু চোখে পড়ল, তার কাগজের মত সাদা কপাল, আর খোকার চোখে কাজল দিতে আঙুলের থর থর কম্পন। দেহ তার নিস্পন্দ, নতমুখী মর্ম্মর মূর্ত্তির মত।

যা, দূর হয়ে যা সামনে থেকে কুলাঙ্গার!

নগেনের গর্জ্জন শুনে চমকে ফিরে চেয়ে দেখলাম, পাঁচু কখন উঠে দাঁড়িয়েছিল, এখন গুটি গুটি বাইরের দিকে চলেছে। তার সেই ধীর চলন দেখে নগেনের বোধ হয় ধৈর্য্যচ্যুতি হল, হাতের কাছে খড়ম ছিল একপাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল। খড়মটা পাঁচুর গায়ে লাগল না, ওদিকের দেয়ালে ঠেকে বোলা ভেঙ্গে পাঁচুর পায়ের কাছে ছিটকে এল। পাঁচু দাঁড়াল। খড়মটা তুলে নিয়ে জিভ বার ক'রে ভেংচি কাটল। তারপর বাপের মাথা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিয়েই চকিতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। পিতাপুত্র দুজনেই লক্ষ্যভেদে বিশেষ অপটু দেখলাম। খড়মটা নগেনের মাথায় না লেগে শোবার ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে চ'লে গেল।

নগেন তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু উটের মত লম্বা পা থাকা সত্ত্বেও তখনকার মত অদৃশ্য পলাতককে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা নেই জেনে ফের বসল। পকেট থেকে বিড়ি বার ক'রে ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ক্রোধবিকৃত মুখে এমন একটা উদাসীন ভাব এনে ফেলল যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিড়ির ধোঁয়া যে রাগের এমন ভাল ওষুধ তা জানা ছিল না।

খানিক বিড়ি টেনে নগেন বলল, ঠাকুর কেমন রাঁধছে গো সুরেশ বাবু? ওর রান্নার মত হচ্ছে?

ঠাকুর পালিয়েচে।

নগেন সোজা হয়ে ব'সে ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, সত্যি পালিয়েচে? তবে ওকে আবার রাখনা?

আমি সংশয় ভরে বললাম, দিদি কি আর কাজ করবে?

দিদি মুখ তুলল। ভাবলেশহীন মুখ। ভাবের শুধু অভাব নয়, ভাবগুলি যেন মুখেই মরেছে এমনি। নীরস স্বরে বলল, না ভাই, দিদি আর কাজ করবে না।

নগেন চ'টে বলল, কি করবে তবে শুনি? ব'সে ব'সে গিলবে? যার তার বাড়ী নয়, আত্মীয়ের বাড়ীর মত। সেখানে কাজ করতে তোমার আপত্তিটা কি শুনি? ওসব বজ্জাতি চলবে না, বুঝলে? আমি কুড়েমির প্রশ্রয় দেবনা! কাল থেকে তুমি কাজ করতে যাবে। মাসে পনেরটা টাকা সহজ নাকি? এবার বরং দুটাকা বেশী হবে। হবে না খোকা?

আমি সায় দিলাম, হবে।

মমতাদি কথা কইল না। রাগে আগুন হয়ে নগেন বলল, যাবে না তুমি?

না।

না? বটে? আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করব আর তুমি ব'সে ব'সে খাবে, না? নির্লজ্জ বেহায়া বেয়াদব মেয়েমানুষ!

স্বামীর রোজগার খেলে স্ত্রী বুঝি বেয়াদব বেহায়া হয়? ওমা, কি লজ্জা! এমন কথা আর বোলোনা, মানুষ হাসবে। জান, জগতে তুমি আর কিছুই নও, শুধু স্বামী? একটা মেয়েমানুষের স্বামী এ ছাড়া পৃথিবীতে পরিচয় দেবার তোমার কিছু নেই। সে স্বামীত্ব দু'পায়ে দলতে তোমার মমতা হয় না? তোমার না হোক, আমার হয়। আমি মান্‌বনা তোমার খেয়ে প'রে আমি বেয়াদব মেয়েমানুষ। মাইরি, কালীর দিব্যি। ব'লে মমতাদি হাসল।

তোমার ঘাড় মানবে। তুমি বেয়াদব, তোমার মা বাবা বেয়াদব, তোমার চোদ্দপুরুষ বেয়াদব!

মমতাদি মাথা নাড়ল, উহুঁ, কেউ বেয়াদব নয়। আমার মা আমার মত সতী, আমার বাবা তোমার ঈশ্বরের মত মহৎ, আমার চোদ্দপুরুষ অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী। কি জালা, দুটি খেয়ে প'রে আমি তোমার স্বামীত্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাচ্ছি ব'লে গাল দিচ্ছ? তুমি কি অকৃতজ্ঞ গো! আর দশ রকমে তুমি তো স্বামী নও যে ভরণ-পোষণের স্বামী না হলেও স্বামীই থেকে যাবে। আমি যেই নিজের রোজগারে খাব পরব তুমি অমনি পরপুরুষ হয়ে যাবে! পরপুরুষের ঘর করতে বল নাকি আমায়? ওমা, কি লজ্জা!

ঠাট্টা! নগেনের মুখ দেখে আমার ভয় হল, মমতাদির মুখ কিন্তু শান্ত নির্বিকার—বেশীর ভাগ ঠোঁটে একটু হাসির আভাস।

নগেন বলল, হুঁঃ, বজ্জাতি হোথা হায়। শুনবে তবে? শুনবে তবে? দু পয়সা রোজগার ক'রে স্বামীর একটু সাশ্রয় করার সুযোগ যে মেয়েমানুষ হেলা করে সে শুধু বেয়াদব নয়, সে- সে—

সে?

সে বেশ্যা! ব'লে নগেন ফের একটা বিড়ি ধরাল।

মমতাদির ধৈর্য্য ও সাহস দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে সে চুমা খেল, গাল টিপে আদর করল, খোকার হাসির জবাবে হাসল, শেষে অবসর মত বলল, তাই নাকি? তা বেশ। চরম গালটা দিয়ে খুসী হলে ত? তোমার সুখেই আমার সুখ।

স্পষ্ট বুঝলাম, নগেন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না! মমতাদির দিকে কট মট ক'রে তাকিয়ে এত জোরে জোরে বিড়ি টানতে আরম্ভ করল যে শেষে কাশতে কাশতে বেদম হয়ে পড়ল। সে কি কাশি! একবার আরম্ভ হল তো কিছুতেই যেন থামবে না। ওর মুখ লাল হয়ে গেল, চোখ ঠিকরে আসতে চাইল, দুহাতে বুক চেপে সে রোয়াকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

মমতাদি খোকাকে নামিয়ে দিয়ে নীরবে শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হল। কয়েকটা লবঙ্গ এনে মুখে গুঁজে দিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

নগেন সুস্থ হলে বলল, কাশি হয়েছে, ছাই ভস্ম বিড়ি খাও কেন?

বেশ করি! তুমি কাজে যাবে কিনা বল। না গেলে ফের কাশতে আরম্ভ করব। কেশে কেশে পটল তুলব।

মমতাদি হেসে বলল, কাজটাজ আমি জানিনে। আমি কাজ করব না।

নগেন উঠে বসল। কেন করবে না শুনি? মারবো নাকি একটা চড়?

মমতাদি হাসল, মারো। নতুন নয় যে কাঁদব। কিন্তু আমার জিদ তুমি জান না? মেরে ফেল্লেও সারাদিন আমি বাড়ী ছেড়ে থাকতে পারব না। আমার ছেলের অযত্ন হবে, আমার স্বামী সময়ে ভাত জল পাবেনা। তাছাড়া বেশী টাকা পেলেই তো তুমি বেশী ক'রে মদ খাবে!

মমতাদি আবার খোকাকে বুকে তুলে নিল।

নগেন অসহায় ক্রোধে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তোকে দূর ক'রে দেব বাড়ী থেকে, বজ্জাত মাগী!

মমতাদি ফোঁস ক'রে উঠল, কেন খামাখা অপমান করচ? দূর ক'রে দেবার চে—তো অনেকবার করেচ,

পেয়েচ? সদর দোরে আমি ঠায় ব'সে থাকব, দরজা খোলা পাওয়া মাত্র ভেতরে চ'লে আসব। কদিন কমাস ক বছর দরজা বন্ধ ক'রে ভেতরে বন্দী হয়ে থাকবে? মারবে? কত মারবে? মার খেতে কষ্ট হয়, মারতে কষ্ট হয় না? আমার জোর বেশী, তুমি দুর্ব্বল। আমি মার খাওয়ার কষ্ট সইব, তুমি মারার কষ্টে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। যেদিন চোখ বুজব সেদিনের আগে আমাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। বুঝলে? স্বামী ব'লে তুমি বিধাতা নও!

মমতাদি ঘরে চ'লে গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে ক্রোধে মুহ্যমান স্বামীর গা ঘেঁষে ব'সে পড়ল। নগেন খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে ব'সে রইল, তারপর ন'ড়ে চ'ড়ে বার করেক আড়চোখে তার দিকে চেয়ে দেখল। সে সময় তার মুখখানা এমন অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছিল যে, আজও সুস্পষ্ট হয়ে আমার মনে পড়ে। মনে মনে বোধ হয় কাঁদছিল, চোখ দুটি সে কান্নায় করুণ, চোখের পাতা ভারি। সমস্ত মুখে একটা চাপা বেদনার বিকৃতি। কিন্তু এগুলি বাইরের স্থূল দৃষ্টিতে দেখেছিলাম কিম্বা অন্তরের অনুভূতি দিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম আজ সঠিক বলতে পারি না। কারণ, তার বসার ভঙ্গিটা ছিল বিচ্ছিরি—আদুরে গোপাল হ্যাংলা মেয়ের মত, মাথাটা একদিকে কাত ক'রে সে দুষ্টামির হাসি হাসছিল, আবার এটাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, সে ইচ্ছে ক'রে লজ্জায় একেবারে অভিভূত হয়ে গেছে। নগেনকে লুব্ধ ক'রে সে যেন কি ভিক্ষা চাইছিল। এসবের সঙ্গে বেদনার পূর্ব্বোক্ত মৃদু বিকাশের সামঞ্জস্য ছিলনা, তাই সমস্ত মিলে সে আমার কাছে হয়ে উঠেছিল দুর্ব্বোধ্য ও অপূর্ব্ব।

আমার অস্তিত্ব সে বোধ হয় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ আমার ওপরে চোখ পড়ায় স'রে বসতে গেল। নগেন খপ ক'রে তার হাত ধ'রে ফেলল। তারপর এতক্ষণ যত রাগ জমা হয়েছিল তার সবটুকু ঝাল ঝাড়ল নির্দ্দোষী আমার ওপরেই!

হাঁ ক'রে কি দেখছিস শুনি? মজা লাগছে দেখতে, না? বেরো আমার বাড়ী থেকে, বেরিয়ে যা!

মমতাদির চাকরীর খাতিরে আমার খাতির, সে যখন চাকরী করবেই না তখন আর কিসের খাতির! তিলেক বিলম্ব না ক'রে আমি বেরিয়ে গেলাম। সদর দরজাটা ভেজিয়ে দেবার সময় দেখলাম মমতাদির শুভ্রশীর্ণ হাত নগেনের গলা জড়িয়ে ধরেছে।

সেদিন রহস্য ছিল, আজ বুঝি। ওমনি ভাবে সে অভিমান হত্যা করত, ওমনি ভাবে নিজের বুক চাপা দিয়ে সে অশান্তির আগুন নিভাত। আগুন যে নিভত তার প্রমাণ সেদিন স্বচক্ষে দেখেছিলাম, কিন্তু তার বুক জুড়ে ফোস্কা পড়ত কিনা ভেবে পাই না আজও। স্বামীর আদর পাওয়া স্ত্রীর ভাগ্য, কিন্তু অমন ক'রে কেড়ে নেওয়া ওই আদর পাওয়া কি? বিশেষ গালাগালি খাওয়ার পরক্ষণে?

যে ঠোঁট বেত্রা শব্দ ছুঁড়ে আত্মার ক্ষত করল, তার স্পর্শ সে ক্ষতে অনুলিপ্ত ক'রে দেয় লজ্জার রস। এটা অতি সহজ সত্য। কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য একটা আছে যার কল্যাণে লজ্জার ঝালে খানিক জ্ব'লে আত্মার ক্ষত পর্য্যন্ত মিলিয়ে যায়। মমতাদির জীবনে এই বড় সত্যটির অস্তিত্ব আমি সন্দেহ করেছি, কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণ পাইনি। বোধ হয় তা পাওয়াও যায় না। কারণ, অনেক হিসাব ও বিশ্লেষণের পর যে সিদ্ধান্ত খাড়া করা যায় তাও অনেক ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ হয়ে থাকে।

গলির মোড়ে পৌছে দেখি শ্রীমান পাঁচু খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে মস্ত একটা ঠোঙা।

কি খাচ্চ পাঁচু?

সন্দেশ আর গজা। খাবেন? মাকে ব'লে দেবেন না কিন্তু!

কোথায় পয়সা পেলে যদি বল তাহলে মাকে ব'লে দেবনা। কে পয়সা দিয়েচে?

সে সয়তানী হাসি হাসল। কেউ দেয়নি। যাদববাবুটা এমন বোকা সুরেশ দা! বালিশের তলে একটা টাকা দুটো দুয়ানি আর একটা আধুলি ছিল, যাদববাবু শুধু টাকা আর দুয়ানি কেড়ে নিল, আধুলিটা নিলনা! নেবে কি, এমন ক'রে লুকিয়ে ফেললাম যে খুঁজেই পেল না! ভাবল পাঁচ সিকে ছিল বুঝি মোটে। সন্দেশ খাবেন?

আমি মাথা নেড়ে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। মমতাদির ছেলে শুধু চোর নয়, পাকা সুশিক্ষিত চোর!

হাতে খড়ি হল কবে?

দিন কাটল।

মাঝে মাঝে দুপুর বেলা মমতাদির কাছে যাওয়া বজায় রাখলাম বটে, কিন্তু সেটা ক্রমেই ক'মে এল। বয়স বাড়ার সঙ্গে নানাদিক দিয়ে আমার জীবনের বৈচিত্র্য বাড়ল। স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে উঠলাম। বন্ধু, বান্ধবী, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ক্রিকেট, টেনিস, সভাসমিতি এই সব আমার মন ও সময় ভাগ ক'রে নিল। বছর দুই পরে মমতাদিরা আমাদের পাড়া থেকে কলকাতার একেবারে অন্য প্রান্তে উঠে গেল। একবার মোটে সে বাড়ীতে গিয়ে আমি মমতাদির সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তারপর আর যাওয়ার সুযোগ হয়নি।

সেই একদিন গিয়েই একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম, তার পড়ার চাড় বেড়েছে। উনুনে ভাত চাপিয়ে সে পড়ছিল।

এই গেল গল্পের ভূমিকা। একটু দীর্ঘ হল; কিন্তু তা তো হবেই।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত আনাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ফুলের ফসল ফলিয়ে গেছে ফুলের কবি কোন্‌খানে,
গেছে কি সে ফুল-বিলাসী পারিজাতের সন্ধানে?
কাব্যবাগে ফুটতো তাহার বস্‌রা গোলাপ গুলরাণী,
গাইত সদা বুলবুলিরা গজল্ ঠাটের সুরখানি।
পঞ্চমে তা'র থাক্‌ত বাঁধা দিল্ মাতানো দিল্-রবাব,
প্রতি তানেই উঠ্‌তো ফুটে গভীর মধুর সুরে প্রভাব।
পদ্ম-মধু ছিলো যে গো তাহার মনের মৌচাকে,
মৌলোভীদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে কোন্ ফাঁকে।
ডালিম ফুলি চিন্তা গেছে, ভাব গেছে হায় জাফ্‌রাণী,
কল্পবনের প্রজাপতির গেছে রঙীন্ দিল্‌খানি।

'লালপরী' আজ আল্‌পনা দেয় তাহার গৃহ-অঙ্গনে,
'সবুজ-পরী' দুলায় চামর বাজিয়ে কর-কঙ্কণে।
'জরদা-পরী' তারায় তোড়ায় সাজায় নিতি ফুলদানি,
'নীল-পরী' দেয় সন্ধ্যাবেলায় পদ্ম-রাগের দীপখানি।
ক্ষুধার সময় সুধার গেলাস্ এগিয়ে দে যায় অপ্সরী,
মন্দারেরি মোহন মালা কণ্ঠে রতি দেয় গড়ি'।
মন্দাকিনীর তীরে কবি বেড়ায় আজি উল্লাসে,
দেব-শিশুরা লুকোচুরি খেলায় তাহার চার পাশে।
সেথায় কবি বাজায় বীণা দেবদেবীদের মজ্‌লিসে,
রেশ্‌টী তাহার আস্‌ছে ভেসে সান্ধ্য হাওয়ার গায় মিশে

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতাবাসীর প্রথম প্রচেষ্টা

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

রামমোহন স্মৃতি-রক্ষা-সমিতি-সংগৃহীত অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক অবগত নহি। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র মহোদয়গণ সম্পাদিত 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক দ্বিভাষী সংবাদ-পত্রের প্রথম ভাগের পঞ্চম সংখ্যায় (১৮৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে) উক্ত স্মৃতি-সভার কার্য্য বিবরণীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সম্পাদকগণ লিখিয়াছিলেন :—



স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র

"প্রায় ৮ বৎসর গত হইল উক্ত সভা স্বাক্ষরকারি ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ঐকমত্য ও অতিশয় উৎসাহপূর্ব্বক তদ্বিষয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল কিন্তু আমাদিগের আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত বিখ্যাত মহাশয়ের নাম চিরস্মরণার্থে ঐ সভা যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন অদ্যাবধি তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ফল দৃষ্ট হইল না। মেং টরটন সাহেব যৎকালে ঐ খ্যাত্যাপন্ন মহাশয়ের স্বাধীন স্বভাবের বিষয়ে বক্তৃতা করেন তৎকালে তিনি কহিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় ভারতবর্ষে গবর্ণর এডম্ সাহেবের রাজত্বকালে মুদ্রা করণের প্রতিবন্ধক আইনের প্রতি সাহস পূর্ব্বক দোষোদ্ভাবন করিয়াছিলেন কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির ঐ বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে আপত্তি করিতে অগ্রসর হয় নাই অতএব যদি এতৎসভাস্থ ব্যক্তিরা এতাদৃশ খ্যাতিমান প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে যত্নবান না হয়েন তবে পৃথিবীস্থ লোকদিগের সমীপে তাহাদিগের মানের হানি হইবেক এইরূপ বক্তৃতায় যে ফল হইয়াছিল বোধ হয় তাহা ক্ষণিক মাত্র। যে বিষয়ের নিমিত্তে উক্ত সভা আহূত হইয়াছিল তাহার কার্য্য অবশ্যই ধার্য্য হইবে।

এতদ্দেশস্থ লোকদিগের মধ্যে রামমোহন রায় দ্বেষ ও মাৎসর্য্য রহিত ছিলেন। তিনি এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন এবং বঙ্গভাষায় নানাবিধ পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ঐ সকল পুস্তক এমত উৎকৃষ্ট যে অদ্যাবধি কোন ব্যক্তিকে তাদৃশ লেখনে সক্ষম দেখা গেল না। স্বদেশীয় মনুষ্যদিগের জ্ঞান ও সুনীতির বৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার অধিক যত্ন ছিল এবং সর্ব্বদা সত্যের অনুসন্ধান ও দেশের মঙ্গলার্থে মনোযোগ করত স্বাধীনতায় কালযাপন করিয়াছেন। গত চারটরে ভারতবর্ষের পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ

মঙ্গলজনক বিষয় যাহা ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে উক্ত মহাশয়ের বিস্তর সাহায্য ছিল তন্নিমিত্তেও আমরা তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ করিতে বাধিত আছি। অতএব এতাদৃশ হিতৈষী মহাপুরুষের প্রতি আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তদ্দারা



স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ

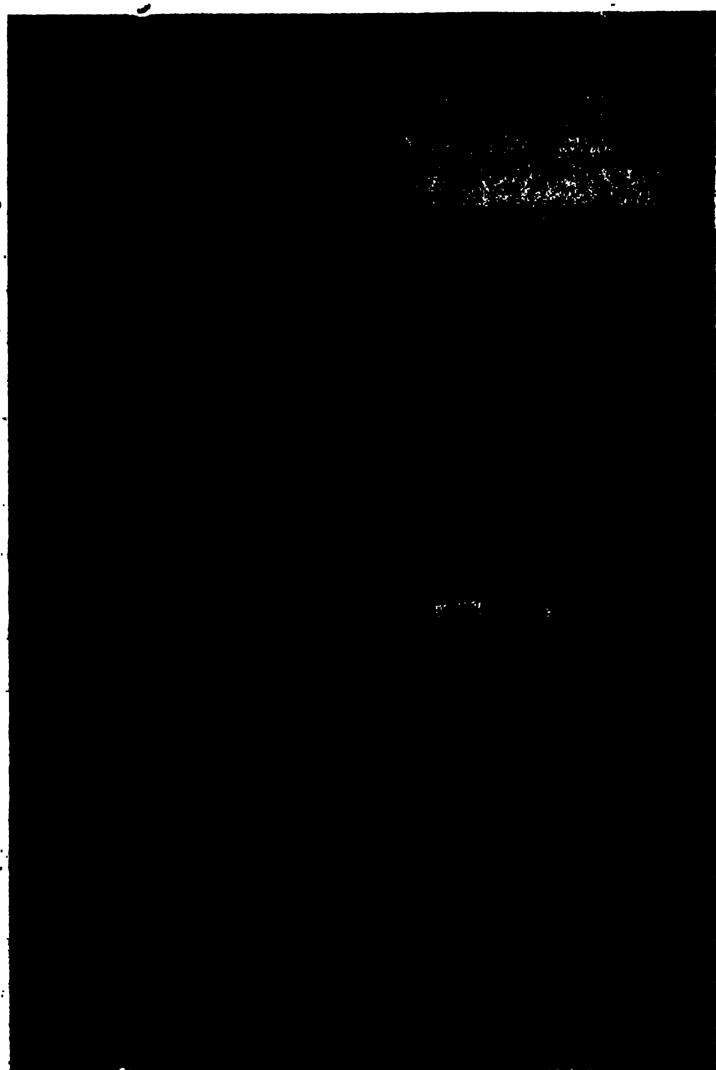
উত্তেজিত হইয়া উক্ত সভার নিকটে মিনতি পূর্ব্বক আমরা এই প্রার্থনা করি যে তাঁহারা ঐ মহাত্মার নাম যাহাতে চিরস্মরণীয় হয় তদ্বিষয় সম্পন্ন করিতে আর কালবিলম্ব না করেন; আমরা আশ্বাস করি যে অন্যান্য সংবাদপত্র প্রকাশক মহাশয়েরাও আমার দিগের এই প্রার্থনা সিদ্ধির নিমিত্তে ঐ সমাজকে অবশ্য অনুরোধ করিবেন। রামমোহন রায় সর্ব্বদা কেবল যথার্থ গুণ বিবেচনায় রত থাকিতেন বাহ্য শোভায় তাঁহার স্পৃহা ছিল না অতএব ঐ সভা বহুদিবস হইল যে ৮০০০ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে যদ্যপি স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি দিগের সম্মতিক্রমে এক্ষণে অতি দুষ্প্রাপ্য তন্মহাশয়ের কৃত পুস্তক সকল ক্ষুদ্র ২ খণ্ডে পুনর্মুদ্রাঙ্কিত করেন এবং অবশিষ্ট মুদ্রা ও ঐ সকল মুদ্রিত পুস্তক বিক্রয়ের জন্য বঙ্গভাষার বৃদ্ধির নিমিত্তে এতদ্দেশীয় কতিপয় বিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত মনুষ্যের হস্তে সমর্পণ করেন তবে আমার দিগের বোধ হয় যে ইহাতে তাঁহার মনোনীত চিরস্মরণ হয়। আর এদেশে বঙ্গভাষায় রচিত ব্যাকরণ ইতিহাসাদি ব্যুৎপাদক গ্রন্থ ও দর্শন বিদ্যার উত্তম পুস্তক সকলের অতিশয় অভাব আছে অতএব কৌন্সেল আব এডুকেশন তদ্দূরীকরণার্থে যেরূপ যত্নবান্ হইয়াছেন সেইরূপ যদি অত্রত্য কতিপয় ব্যক্তিরা সচেষ্ট হয়েন তবে অনুমান হয় যে অতি শীঘ্র বঙ্গভাষার উন্নতি হইতে পারে।

আমাদিগের এই প্রস্তাবে যে ফল সম্ভাবনা তাহা বিস্তারিত করিয়া বর্ণনে লিপিবাহুল্য মাত্র অতএব আমরা ভরসা করি উক্ত সভা প্রস্তাবিত বিষয় বিবেচনা করিবেন, আর যদ্যপি এই প্রস্তাব সভায় গ্রাহ্য হইয়া আমার দিগের প্রতি সেই সকল গ্রন্থানুসন্ধানের ভারার্পণ হয় তবে রামমোহন রায়ের কৃত পুস্তক সকলের তালিকা, যাহা আমরা প্রস্তুত করিয়াছি ও যে ২ পুস্তক পাওয়া যায় তৎসমুদয় আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমীপে প্রেরণ করিব।"

স্মৃতিরক্ষা সমিতির নিকট হইতে কোনও উত্তর না পাওয়ায় "বেঙ্গল স্পেক্টেটর"-সম্পাদকগণ পুনরায় দ্বিতীয় ভাগের ২৩ সংখ্যক পত্রে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই)

"মৃত রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"আমাদিগের স্বদেশীয় মান্য মৃত রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ চিহ্ন প্রস্তুত করণার্থ প্রায় ৮ বৎসর অতীত হইল শ্রীযুত স্যার জে, পি, গ্রাণ্ট, টারটন, এল ক্লার্ক, জে সদরল্যাণ্ড, জি টি গার্ডেন, জে এইচ এইচ এস্‌মোল, রোস্তমজী কাওয়াসজী এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও বিশ্বনাথ মতিলাল কমিটীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইঁহাদিগের দ্বারা উক্ত বিষয়ের কোন কার্য্য দৃষ্ট না হওয়াতে আমরা গতবর্ষীয় জুলাই মাসের স্পেক্টেটর পত্রে কিঞ্চিৎ লিখিয়া ঐ সকল মহাশয়দিগকে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; বেঙ্গাল হরকরা, ফ্রেণ্ড আব ইণ্ডিয়া ও চর্চ্চ আব ইংল্যাণ্ড মেগিজিন সংবাদপত্র সম্পাদকেরাও আমাদের সহিত একমত হইয়া এ বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের আশ্বাস হইয়াছিল যে কমিটী সতর্ক হইয়া উক্ত বিষয় সম্পাদনার্থ যে যে উপায় করণ আবশ্যক তাহাতে নিযুক্ত হইবেন অথবা তদ্বিষয় কি পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়াছেন



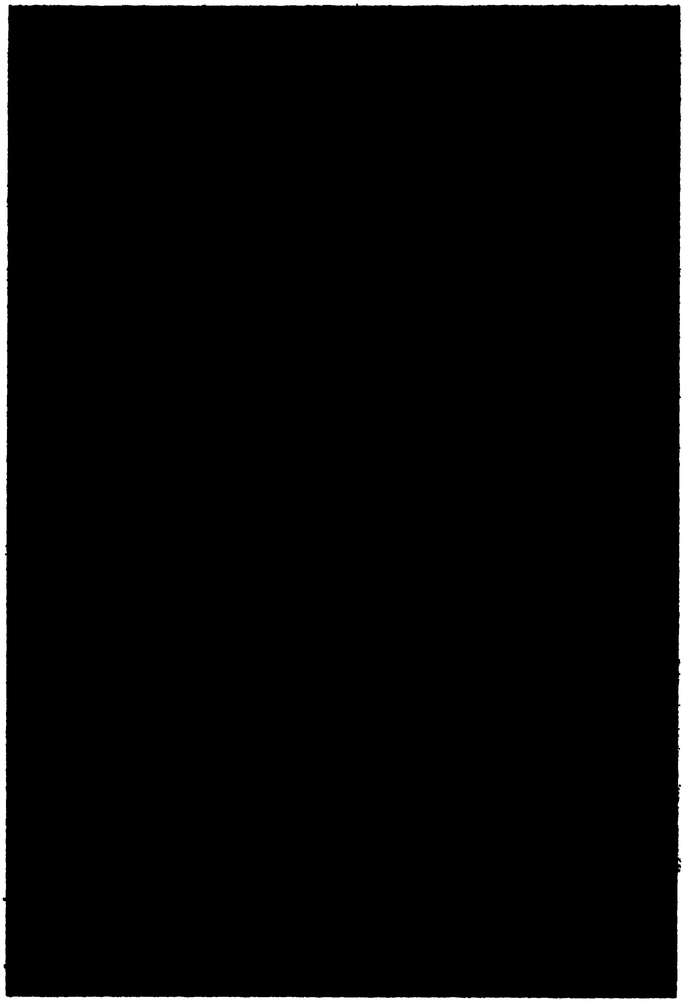
রামমোহন রায়ের [illegible]

স্বাক্ষরকারিদিগকে তাহার রিপোর্ট দিবেন, কিন্তু আমরা খেদ-পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের যে যে বিষয়ে আশ্বাস ছিল তাহার কোন অংশে কমিটী কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করেন নাই।

কমিটী কি নিমিত্ত উক্ত বিষয়ে অমনোযোগী হইয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি, যাহা হউক কমিটী স্বাক্ষরকারী মহাশয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ যত টাকা আদায় ও ব্যয় করিয়াছেন ও যাহা প্রাপ্য আছে তাহাদিগকে এ সকলের হিসাব দিতে হইবেক, অতএব তাহারা অর্পিত ভারের সম্পাদনার্থ কি পর্য্যন্ত করিয়াছেন তাহার রিপোর্ট প্রকাশ করা উচিত। সাধারণ লোকেরা কমিটীর অমনোযোগের কারণ এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। আমরা ভরসা করি, যদবধি উক্ত বিষয়ের কোন কার্য্য না হয় তদবধি অন্যান্য সংবাদ সম্পাদকেরা স্ব স্ব পত্রে এতদ্বিষয়ের আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হইবেন না।

পাঠকবর্গ সন্নিধানে এতদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করাতে

আমাদের মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান হইতেছে, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে পরিশ্রম ও দেশের সভ্যতা ও দেশস্থ জনগণের রাজ-সম্বন্ধি সম্বন্ধো বৃদ্ধির যত্ন বিষয়ে আমরা যত চিন্তা করি ততই



স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র

আমাদের বোধ হয় যে তাঁহার নাম অস্মদ্দেশীয় সাধারণ লোকেরা তাৎকালীন অজ্ঞতাহেতু উক্ত মহাত্মার সদাশয়তা ও অন্তঃকরণের মহত্বের কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারেন নাই তথাচ ইংলণ্ডীয়েরা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কএক সপ্তাহ ফ্রান্স দেশে বাস করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজা লুইস ফিলিপের সহিত অনেক-বার ভোজন করিয়াছেন। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখের আপনার মিনুট বহিতে লিখিয়াছিলেন যে "রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় জ্ঞানী হিন্দুধর্ম্মের ভ্রম ও দোষ প্রদর্শন পুরঃসর সতীধর্ম্ম নিবারণার্থ বিশেষ যত্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার মত এই যে ব্রহ্মজ্ঞানই হিন্দুদিগের বাস্তবিক ধর্ম্ম"। এইরূপ বহুতর ব্যক্তিরা উক্ত মহাত্মার প্রশংসা করিয়াছেন জেরিমি বেন্থেম সাহেব ঐ মহাশয়ের মহাগুণের প্রশংসা করত কহিয়াছিলেন যে "রাজা রামমোহন রায় ৩৫ কোটি দেবতা মানিতেন না, তিনি অস্মদাদি হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যধর্ম্মের যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন" ঐ সাহেব উক্ত মহাত্মার এতাদৃশ সদ্গুণ গায়ক হইয়াছিলেন যে এক সময়ে তাঁহাকে মনুষ্যজাতির উপকারের প্রধান সহকারী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।"

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট দিবসের 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রে নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"ব্রিষ্টলের নিকট ষ্টেপলটন গ্রো নামক স্থানের এস এইচ ক্যাস্টল সাহেবের বাটীতে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় এবং সেই বাটীর সমীপে তাঁহার মৃত শরীরের কবর হইয়াছিল আর্ণোবেল নামে ডিসেন্টরদিগের গোর-স্থানে তাঁহার ঐ গোর উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহার উপরে স্তম্ভ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতে কিঞ্চিৎ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। ঐ স্তম্ভ উচ্চে ৩০ ফিট এবং হিন্দুদিগের রীত্যনুসারে হইবেক।"

'আর্ণোজ ভেলে' রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থসংগ্রহার্থে আর কোনও সাধারণ সভার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং আমরা অনুমান করি যে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আহূত স্মৃতিসভার চেষ্টায় যে অর্থ সংগৃহীত

হইয়াছিল, তাহাই রাজার সমাধিমন্দির নির্ম্মাণার্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের শেষ জীবনের ইতিহাস-রচয়িত্রী কুমারী মেরী কার্পেণ্টার কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"এই মহাত্মার দেহাবশেষের প্রতি আর একটী শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হইতে বাকী ছিল। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন এবং ভাল বাসিতেন তাঁহাদিগের নিকট বিশাল বৃক্ষচ্ছায়াসমন্বিত পবিত্র সমাধিস্থানটীতে কোনও মর্ম্মরময় স্মৃতিচিহ্নের প্রয়োজন না থাকিলেও, সাধারণ যাহাতে তাঁহার সমাধিস্থানে যাইতে পারে এবং তথায় তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত দেখিতে পায় তাহার আবশ্যকতা ছিল। ষ্টেপল্‌টন গ্রোভ্‌ কাস্‌ল্‌ পরিবারের নিকট হইতে হস্তান্তরিত হইয়া যাওয়ায় তথায় উহা করা সম্ভব হয় নাই। রাজার বন্ধু বিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতির প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে বৃষ্টলের নিকট-বর্ত্তী আর্ণোজভেলের সুন্দর সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহাবশেষ স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মে এই কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং পরবৎসর বসন্তকালে তদীয় বন্ধু উচ্চ শিক্ষিত ও সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি পরে ঐ স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া যান এবং সম্প্রতি তাঁহার পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ স্থান পরিদর্শন করিতে আসেন।"

কুমারী সোফিয়া ডবসন্ কলেট তদ্বিরচিত রাজা রাম-মোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্তে এতৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বোধ হয় কুমারী কার্পেণ্টারের গ্রন্থ হইতেই গৃহীত :—

"যে স্থানে তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানেই তাঁহার দেহাবশেষ চিরদিনের জন্য রক্ষিত হয় নাই। দশ বৎসর পরে বৃষ্টলের নিকটবর্ত্তী আর্ণোজভেলের সমাধি ক্ষেত্রে তাঁহার দেহাবশেষ স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে রাজার বিশিষ্ট বন্ধু ও সহচর দ্বারকানাথ ঠাকুর, যিনি ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার গুরুর তিরোধানের পবিত্র স্থানে তীর্থদর্শনে আসিয়াছিলেন, একটি মর্ম্মরময় স্মৃতিসৌধ করিয়া দেন।"

কুমারী কার্পেণ্টার ও কলেট যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যেন দ্বারকানাথই নিজ ব্যয়ে স্মৃতি-মন্দির রচনা করিয়া দেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিরক্ষা সমিতি সংগৃহীত অর্থেই রাজার স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল —এবং উক্ত সমিতির অনুরোধে দ্বারকানাথ বিলাতে স্মৃতি-মন্দির রচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন মাত্র। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পে রাম-মোহনের স্মৃতি মন্দিরের চিত্র সম্বলিত রাজার এক জীবন চরিত প্রকাশিত হয়, তাহাতে দ্বারকানাথ যে মন্দির নির্ম্মাণ



জন ক্লার্ক মার্শম্যান

করিয়া দিয়াছিলেন এরূপ কোনও কথা নাই, অথচ তত্ত্ব-বোধিনী সভার মুখপত্রে তথ্য সংগ্রহে সুনিপুণ সম্পাদক মহাশয় যে উক্ত তথ্য প্রদানে বিরত থাকিবেন ইহা মনে হয় না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনীকার মনীষী কিশোরী চাঁদ মিত্র বহু অনুসন্ধানে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া এবং দ্বারকানাথের ভ্রাতা মহারাজ রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ বন্ধুগণের নিকট হইতে বহু অজ্ঞাত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনচরিত খানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উহাতেও তিনি দ্বারকানাথের সৎকীর্ত্তি সমূহের পরিচয় প্রদান কালে তাঁহার

এই কীর্ত্তিটির উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইবেন ইহা সম্ভবপর নহে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ যখন প্রথমবার ইংলণ্ড গমনের উদ্যোগ করেন তখন জন ক্লার্ক মার্শম্যান তৎসম্পাদিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, রামমোহনের দেহাবশেষ কোনও সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে স্থানান্তরিত ও তদুপরি সমুচিত স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য দ্বারকানাথকে সাধারণ কর্ত্তৃক অনুরোধ করা হউক এবং পুরাতন সংবাদপত্র দৃষ্টে প্রতীত হয় যে, উক্ত বৎসর ৭ই জানুয়ারি দ্বারকানাথকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান উপলক্ষে কলিকাতার টাউনহলে যে সাধারণ সভা হয় তাহাতে কয়েক জন বক্তা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছিলেন। কলিকাতার তদানীন্তন করোনার মিষ্টার হেন্‌রি পিডিংটন সভায় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন। তাহার মর্ম্ম এই :—

"রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বহুদিনের সহচর যখন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের চির-প্রিয় জন্মভূমিতে যাইবার আয়োজন করিতেছেন তখন তাঁহাকে বিদায়দানের পূর্ব্বে আমরা কি এই আশা করিতে পারি যে দ্বারকানাথ ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই চেষ্টা করিবেন যাহাতে সেই মহাত্মার অবহেলিত সমাধির উদ্ধার-সাধন হয় এবং তদুপরি এরূপ কোন স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হয় যদ্দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ তীর্থযাত্রিগণ তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে সহজেই উপনীত হইতে পারে? ব্রিষ্টলের নিকটবর্ত্তী ষ্টেপ্‌লটনে—যেখানে রামমোহন রায় দেহরক্ষা করেন সেইখানে এই পত্রের অন্যতম পরিচালক যখন শেষ বার গমন করিয়াছিলেন তখন তিনি দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, যেখানে তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন সেই স্থানের বর্ত্তমান অভদ্র অধিকারিগণ সেই স্থানটী অপবিত্র মনে করিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন একবারে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। রামমোহন রায় যে ইংলণ্ডে এক অপরিচিত স্থানে সমাহিত থাকিবেন ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে গৌরবের কথা নহে। আমাদের ইচ্ছা যে, অদ্য দ্বারকানাথের সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সভা আহূত হইতেছে তাহাতে জনসাধারণ এই বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করুন। এবং যদি সম্ভব হয় সেই প্রথিতযশা ব্যক্তির সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে উহার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে অনুরোধ করা হউক। দ্বারকানাথ যে সানন্দে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।"

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা ও গবেষণায় নিযুক্ত তাঁহাদিগকে আমরা এই বিষয়টী অনু-সন্ধান করিতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা তাঁহাদের গবেষণার ফলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত করিতে পারিবেন যে, রামমোহনের স্মৃতিস্তম্ভ কেবল তাঁহার স্বদেশের একজন অনুরক্ত বন্ধুর দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই পরন্তু উহার নির্ম্মাণকল্পে তাঁহার বহু স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গুণমুগ্ধ ভক্ত তাহাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

বিদ্রূপ

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত

পাঁচের এক নম্বর ভবনের নূতন অধিবাসীরা আসিয়াছিলেন। কোথাকার কোন এক জমিদার অনেক লোকজন, লটবহর লইয়া আসিয়া একদিন পাঁচের একে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উমেশচন্দ্রের বাড়ীর নম্বর পাঁচ, পাঁচের এক তাহার পাশেই অবস্থিত,—এবং এ গৃহের মালিকও তিনিই। পাশাপাশি খানসাতেক বাড়ী, সবগুলাই উমেশ বাবুর। গঙ্গার তীরে গৃহগুলি,—অতএব অবস্থান খুব ভালো নহে। কালীঘাটের গঙ্গার পারত্রিক ব্যাপারে অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু দৃশ্য-সৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য তাহার প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা হয় ত কম। কিন্তু পুণ্যালোভাতুর নরনারীর সংখ্যা বাংলাদেশে তাই বলিয়া অল্প নহে,—ভগবৎ-চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে যাহারা প্রস্তুত, তাহারা স্বাস্থ্যের ভয়ে ঘাবড়ায় না।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র এঞ্জিনীয়ার,—তাঁহারই সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া পলতাগাঁয়ের জমিদার প্রিয়নাথ পাঁচের একে তাঁহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার লইয়া উঠিলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "মা'র অবস্থা খারাপ, গাঁয়ের ডাক্তাররা বল্‌ল যে, আর বাঁচবেন না।—ওঁর আবার গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের ইচ্ছে। তাই নিয়ে এলাম কালীঘাটে। তা আপনার খরচ পড়ল অনেক—শুধু ওঁকে আন্‌লেই হ'ল না,—একান্নবর্ত্তী পরিবার কিনা, তাই আন্‌তে হ'ল বাড়ীসুদ্ধ সবাইকেই কালীঘাট দেখাবার জন্যে। আপনার রেলগাড়ী ভাড়াতেই খরচ প'ড়ে গেল ঢের,—একবার হিসেব করুন না—"

ভদ্রতার খাতিরে উমেশচন্দ্র বলিলেন, "তা খরচ একটু বেশী পড়বেই ত—"

প্রিয়নাথ কহিলেন, "আমি কিন্তু মরব দেশে,—নিজের বাগানের কাঠ যত খুসী নিলেই হ'ল, কানাকড়িটি খরচ নেই, গাড়ী ভাড়ার চিন্তা নেই,—নিজের জমিজায়গা, মন্দির বানাও আশ্রম বানাও, যা তোমার ইচ্ছে, নিজের জমিদারীর ভেতর, কে তোমাকে ঠেকাচ্ছে?—আর এখানে কত অসুবিধে!—"

প্রিয়নাথের মাতার সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইলেন তাহাতে উমেশচন্দ্রের মনে হইল, আর দু'চার দিনের মধ্যেই হয়ত বৃদ্ধা গঙ্গাতীরে দেহ রাখিবেন।—তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইবার কথা এবং হইয়াছেও,—উত্থানশক্তি এবং বাক্‌শক্তি রহিত, শরীরের বামপার্শ্ব পক্ষাঘাতে অবশ, জীবনের গভীরতম অমানিশা তিনি পার হইয়া আসিয়াছেন, এইবার নবসূর্য্যোদয়ের পানে যাত্রা আরম্ভ করিলেই হয়।—কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে অপরাহ্ণ বেলায় যে দিবাকর ম্লান মৃত্যুপাণ্ডুর, মানুষ তাহার জন্য শ্লোক রচনা করে না।

প্রিয়নাথ বলিলেন, মাতাঠাকুরাণীর ত গত হওয়ার সময় হ'য়ে এল,—ওঁর চিতার ওপর একটা মঠ দিতে চাই,—এই ছোট্টখাট্ট একটুখানি। কিন্তু বাইরেটা বেশ বাহারে হওয়া চাই, পলতাগাঁয়ের যেন তাতে মুখ রক্ষে হয়! ভেতরে কিন্তু আমি থার্ড ক্লাস ইঁট দেব তা ব'লে রাখ্‌ছি,—আপনি একটু সস্তায়-টস্তায় ক'রে দেবেন,—দেখুন্ দিখিনি হিসেব ক'রে কত পড়বে—"

বৃদ্ধা পুত্র, কন্যা, নাতি, নাত্নী এবং পুত্রকন্যাদের নাতিনাত্নীদিগের অবধি সকলেরই "কর্ত্তা মা"।

প্রিয়নাথের বাড়ীর কয়েকটি ছেলেমেয়েকে তাঁহার বাড়ীর উঠানে খেলা করিতে দেখিয়া উমেশচন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের 'কর্ত্তা মা' কেমন আছেন?"

একটি ছোট মেয়ে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "খারাপই ত ছিলেন, এখন ভালো হ'য়ে উঠ্‌ছেন। দেশ থেকে আস্‌বার সময় বাবা বলেছিলেন, 'কর্ত্তা মা'র একটা কিছু হ'য়ে গেলেই আমাদের চিড়িয়াখানা, মরা-সুসাইটি

দেখিয়ে নিয়ে দেশে ফিরবেন,—তখন বলেছিলেন, সবসুদ্ধ, একমাসও লাগবে না,—এখন এদিকে আমার গঙ্গাজলের ছেলের সঙ্গে পুতুলের বিয়ের তারিখ পার হ'য়ে গেল—" বলিয়া মেয়েটি মুখ ভার করিয়া কহিল, "সই যে কি ভাবছে!—"

প্রিয়নাথ বলিলেন, "লোকসানী বরাত মশাই, আপনার একমাসের বাড়ীভাড়া পাওনা হ'ল,—ওদিকে কাজকর্ম্ম সব রইল প'ড়ে। ব'লে এসেছিলাম মাসখানেকের মধ্যেই ফিরব,—অথচ এদিককার কোনও বন্দোবস্তই এখন পর্য্যন্ত হ'ল না,—হয়ত সবাইকে নিয়েই শেষ অবধি দেশে ফিরতে হ'বে! আবার হয়ত কিছুদিন পরেই সবাইকে নিয়ে এখানে আসতে হ'বে!—লোকসানী বরাত ছাড়া কখনও এমন হয় শুনেছেন?"

একটু থামিয়া বলিলেন, "আমি ভাবছি প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত করব, বেশী খরচ পত্তর ক'রে নয়, এই অল্পেস্বল্পে। যাই হক, একটা কাজ ত' এগিয়ে থাক—আপনি কি বলেন?—"

উমেশচন্দ্র সংবাদ পাইলেন, বৃদ্ধা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন,—আজকাল বিছানায় উঠিয়া বসিতে পারেন! হাত নাড়িয়া, মুখ নাড়িয়া ধীরে ধীরে কথা কহিবার চেষ্টা করেন!

প্রিয়নাথ কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের সমস্ত আয়োজন করিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার মাতার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল।

সকালবেলা প্রাতর্ভোজনে হাত দিবামাত্রই পাঁচের এক হইতে কোলাহল উত্থিত হইল। উমেশচন্দ্র স্ত্রীকে বলিলেন, "প্রিয়নাথ বাবুর মা বোধ হয় মারা গেলেন।"

—পাঁচের এক নম্বরে আসিয়া উমেশচন্দ্র ডাকিলেন, "প্রিয়নাথ বাবু—"

প্রিয়নাথের কনিষ্ঠা কন্যা বাহির হইয়া আসিল; কান্নার আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া বলিল, "বাবা ম'রে গেছে—"

উমেশচন্দ্র কহিলেন, "প্রিয়নাথ বাবুকে ডেকে দাও ত খুকী,—তোমার 'কর্ত্তা মা' মারা গেলেন কখন?"

মেয়েটি কহিল, "বাবা ম'রে গেছে—"

বিস্ময়স্তম্ভিত উমেশচন্দ্র বলিলেন, "কি বল্লে?"

বিষয়টা পরিষ্কার হইল যখন প্রিয়নাথের মেজভাই ভূতনাথ বাহিরে আসিয়া দেখা দিলেন। উমেশচন্দ্র শুনিলেন, 'কর্ত্তা মা' বেশ ভালোই আছেন, কবিরাজ ভরসা দিয়া গিয়াছেন যে ভালো রকম তদ্বির হইলে হয়ত দু'চার দিনের মধ্যেই একটু আধটু চলিয়া ফিরিয়াও বেড়াইতে পারিবেন।—কিন্তু মারা গিয়াছেন প্রিয়নাথ। কলতলায় মুখ ধুইতে গিয়া সেই যে হঠাৎ শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িলেন, আর উঠিলেন না! ডাক্তার ডাকা হইয়াছে; তিনি বলিতেছেন, সন্ন্যাসরোগে পলতাগাঁয়ের জমিদার পরলোকগত হইয়াছেন!

প্রিয়নাথের শ্রাদ্ধের দিন উমেশচন্দ্র নিমন্ত্রণ খাইলেন।—'কর্ত্তা মা' বেশ নীরোগ হইয়া উঠিয়াছেন, মুখে কথাও ফুটিয়াছে মন্দ নয়। একখানা লাঠিতে ভর দিয়া সমস্ত আয়োজনের তত্ত্বাবধান নিজেই করিলেন। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া উমেশচন্দ্রকে বলিলেন, তিনি আসিয়াছিলেন কলুষ-নাশিনী ভাগীরথীনীরে নিজের দেহাবশেষ সমর্পণ করার জন্য, অথচ তাহার পরিবর্ত্তে আপন সন্তানকে রাখিয়া চলিলেন! বৃদ্ধা সংস্কৃত জানিতেন না, উমেশচন্দ্রও অবশ্য জানিতেন না, কিন্তু উমেশচন্দ্র শুনিয়াছিলেন একটা কথা, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে,—মনে মনে একবার তাহাই স্মরণ হইল, মুখে কিছু বলিলেন না,—অদূরে পরিচিত এক সংস্কৃতের অধ্যাপক ভোজনে বসিয়াছেন,এবং নিজের সংস্কৃত জ্ঞানকে বিশ্বাস নাই!

অত্যন্ত মৃদুস্বরে, অনেক অশ্রুপাতের মধ্য দিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "আমরা দেশে ফিরছি, বাবা, দিন দশ পনেরোর ভেতরেই। প্রিয়র চিতার ওপর একটা মঠ দিতে চাই, এই ছোটখাট, অল্প খরচে,—তুমিই করিয়ে দিয়ো বাবা, একটু কমে সমে। কাল থেকেই আরম্ভ ক'রে দাও, দেশে ফিরবার আগে যেন দেখে যেতে পারি—"

উমেশচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি কিছু ভাববেন না, সে সব যা করবার আমি আপনার ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করব—"

'কর্ত্তা মা' কহিলেন, "চার পাশে চারখানা পাথর দিয়ো

না বাবা,—পাথর-টাথরের হাঙ্গাম না করাই ভালো, ওসবের বড় দাম। একদিকে একখানা পাথর দিয়ো, বড় ক'রে লিখে দিয়ো, পল্‌তাগাঁয়ের জমিদার। অক্ষরগুলো যেন পষ্ট পষ্ট হয়,—মা'র নাম শ্রীনেত্যকালী দেবী, বাপের নাম ৺অমুক বাঁড়ুয্যে, ওরে ভূতো বল্‌না,—নেত্যকালীটা একটু ডাগর ক'রে লিখো—"

গঙ্গাতীরে যেখানে চিতার আগুন আকাশপানে উঠিয়াছিল, সেখানে একটি ছোট স্মৃতিস্তম্ভ উঠিল। 'কর্ত্তা মা' নিজে তদারক করিলেন; কহিলেন, মাতা শ্রীনৃত্যকালী দেবী, যত বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে তাহার চেয়ে আরও কিছু বড় হইলেই যেন মানানসই হইত। উমেশচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি ওটা উঠিয়ে বড় ক'রে লেখাবারই বন্দোবস্ত কর বাবা, খরচ যা দু' একটাকা বেশী লাগে দেব'খন, ওতে আর হিসেব ক'রে কি হবে!"

'কর্ত্তা মা' সকলের সহিত দেশে ফিরিলেন, কালীঘাটে রহিলেন প্রিয়নাথ! বৃন্দা যাওয়ার সময় উমেশচন্দ্রকে কহিয়া গেলেন, "তোমার সব টাকা দেশে গিয়েই পাঠিয়ে দেব—"

—বাড়ীভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতিস্তম্ভের মালমশলার দাম অবধি একটি পয়সাও পাওয়া যায় নাই।—উমেশচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা—"

দিন কয়েক পরে উমেশচন্দ্রের নামে প্রিয়নাথের মেজ ভাইয়ের নিকট হইতে একখানা পত্র আসিল,—'কর্ত্তা মা' দেশে পৌছিয়াই মারা গিয়াছেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা তাঁহার অপূর্ণ রহিল, কত দুঃখ লইয়াই যে তিনি মরিলেন!—তাঁহার শ্রাদ্ধের ব্যাপারে কতকগুলা টাকা ব্যয় করিতে হইবে, উমেশচন্দ্রের প্রাপ্য টাকা দিতে কিছুদিন বিলম্ব হইতে পারে, তিনি যেন ত্রুটি গ্রহণ করেন না।

উমেশচন্দ্র সে টাকার কথা ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার অপেক্ষা ঢের শীঘ্র ভুলিয়া গেলেন প্রিয়নাথের ভাইয়েরা। গঙ্গার তীরের সেই স্মৃতিস্তম্ভটি সেদিন হঠাৎ উমেশচন্দ্রের চোখে পড়িল,—বড় অক্ষরে লেখা, পল্‌তাগাঁয়ের জমিদার, এবং তার চেয়েও বড় অক্ষরে লেখা, মাতা শ্রীনৃত্যকালী দেবী।—অক্ষর এখনও বড়ই, কিন্তু মানুষের অতীত জীবনের অসম্মানের স্মৃতির মত ঝাপ্‌সা হইয়া গেছে।

শ্রীআশীষ গুপ্ত



শেলীর হারানো চিঠি

শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার ধর

সেদিন পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত সাহিত্য-রসিকই জানিত যে, কবি শেলী তাঁহার প্রথমা পত্নী হ্যারিয়েটকে ত্যাগ করিয়াছিলেন—একটা বিশ্রী সন্দেহের বশে। হ্যারিয়েটকে ত্যাগ করিয়া মেরী গডউইন্‌কে বিবাহ করিবার ইহাই নাকি প্রধানতম কারণ। অধিকাংশ সমালোচকেরা ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক কবিকে লোকচক্ষে নির্দ্দোষী ও পবিত্র প্রমাণ করিতে গিয়া তাপসী হ্যারিয়েটের ললাটে নির্ব্বিবাদে কালির আঁচড় দিয়া কলঙ্কের যে জালরেখা টানিয়াছিলেন, কে জানিত যে, এতদিন পরে তাঁহাদের সে কালিরেখা হ্যারিয়েটের ললাট হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে। আর যাঁহারা হ্যারিয়েটকে সহানুভূতি জানাইয়া শেলীকেই এর জন্যে দোষী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহাদের সকলেই জীবিত থাকিলে আজ হ্যারিয়েটের এই কলঙ্ক-মোচনের দিনে যে আনন্দে আত্মহারা হইতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু শেলীর কাঁধে অপরাধের যে বোঝা তাঁহারা চাপাইয়াছিলেন, লেশ্‌লি হটসনের মুখ চাহিয়া তাঁহাদের তাহা পুনরায় নামাইয়া লইতেই হইত।

লেশ্‌লি হটসন্ আজ সাহিত্যসেবীর অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ১৯২৫ সালে মার্লোর মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করিয়া তিনি সাহিত্য-জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, শেলীর হারানো চিঠির আবিষ্কার তাঁহাকে অমরতা দিল।

যাঁহারা শেলীর পক্ষ হইয়া ওকালতি করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন—শেলী যে হ্যারিয়েটকে ত্যাগ করিয়া মেরী গড্‌উইনকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার জন্যে বেশী দায়ী হ্যারিয়েট নিজে, শেলী নয়। তাঁহারা কারণ অনেক দেখাইয়াছেন কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই কাল্পনিক ও ভুল। সত্য তাঁহারা যে-টুকু বলিয়াছেন তাহা এই যে, হ্যারিয়েটের ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়াই শেলী তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু সে ভালবাসা যখন আপনা হইতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত না হইয়া অন্তর্দ্ধারা (এলিজা) পরিচালিত হইতে লাগিল, তখন শেলীর মত একটা বিরাট প্রতিভা এবং বিবাহ বন্ধনের উপর যাঁহার মোটেই বিশ্বাস ছিল না তাঁহার পক্ষে ইহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকা একেবারে অসম্ভব। শেলীর বদ্ধমূল ধারণা এবং বিশ্বাস ছিল যে, বিবাহিত দম্পতির মধ্যে যখন ভালবাসা কমিয়া আসে বা অন্য কোন নারী বা পুরুষের প্রতি ইহা অপেক্ষা বেশী ভালবাসা জন্মে তখনই ঐ বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা উচিত। নহিলে সংসার চলিতে পারে, কিন্তু সুখ শান্তিকে চিরকালের জন্যে বিদায় দিতে হয়।

ইহা ছাড়া আর একটি কারণ তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, প্রেম চিরকালই একজনের প্রতি সমান ভাবে উগ্র ও আবেগময় না থাকিতেও পারে, পৃথিবীর সকল বস্তুর মত তাহারও পুষ্টি এবং ক্ষয় আছে।

প্রথম কারণটি যাচাই করিয়া সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। ইহা ঠিক যে, হ্যারিয়েটের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও, তাহার রূপ-গুণে আলাপ-ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেও তাহাদের পলায়ন এবং বিবাহে শেলী অপেক্ষা হ্যারিয়েটের বেশী উৎসাহ ছিল—কারণ হ্যারিয়েটই শেলীকে নানা রকম ভাবে ভঙ্গিমায় নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল (The University Mag. Feb, 1878)। তাহা হইলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শেলীরও এ বিবাহে এবং পলায়নে খুব বেশী আপত্তি ছিলনা। এমন কি এই সময়ে বিবাহ প্রথার প্রতি তাঁহার আর কোন বিদ্বেষই ছিল না (Hogg, Vol. i pp 387-418 and His letter to Hogg Aug 18, 1811).

সুতরাং শেলীকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিতে গিয়া হ্যারিয়েটের ললাটে কলঙ্ক-রেখা না টানিলেও যে চলিত, সেই

টুকুই আজ লেশলি হট্‌সনের আবিষ্কৃত শেলীর হারাণো চিঠি হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

শেলী ও হ্যারিয়েটের ভিতর (মেরী গডউইন্‌কে লইয়া) যখন পূর্ব্বের অনাবিল ও আবেগময় ভালবাসার স্রোতে আবিলতা আসিয়াছে, এবং যখন শেলী বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তিনি ঠিক যেমনটি চাহেন হ্যারিয়েট ঠিক তাহার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিমা নয়—তখনও আমরা দেখিয়াছি শেলী তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের পুরাণো ভালবাসা ফিরাইয়া আনিতে।

"O trust for once no erring guide!
Bid the remorseless feeling flee;
'Tis malice, 'tis revenge, 'tis pride,
'Tis anything but thee;
O deign a nobler pride to prove,
And pity if thou canst not love".

কিন্তু হ্যারিয়েটের অন্তরের পূর্ব্ব অনুরাগের স্বতোৎসারিত স্রোতে কি জানি কেমন করিয়া ভাঁটার টান সুরু হইয়াছিল, তাহাতে আর জোয়ারের ঢেউ জাগিল না! হ্যারিয়েট পূর্ব্বের মত শেলীর আহ্বানে সাড়া দিতে পারিল না, ভাবিল এমনি করিয়া শাস্তি দিলে শেলী বুঝি অনুতপ্ত হইয়া তাহার নিকট ফিরিয়া আসিবে!

নিজে যাচিয়া মিটমাট করিতে গিয়া বারে বারে প্রত্যাখ্যাত হইয়া শেলী পাগল হইয়া উঠিলেন, হ্যারিয়েট কেন বুঝিতেছে না! ইহা ছাড়াও মেরীর সঙ্গ পাইবার জন্য তিনি তখন একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। মেরী হ্যারিয়েট অপেক্ষা সুন্দরী না হইলেও সে উদারহৃদয়া, তাহার নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব ছিল—যাহার হ্যারিয়েটে একান্ত অভাব, এবং ইহা ছাড়া হ্যারিয়েট অপেক্ষা মেরী শেলীর কবিপ্রতিভা ও তাঁহার বিপ্লবী মত গুলিকে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত। শেলী এতদিন যেন অন্তরে অন্তরে ঠিক এমনিটিই চাহিতেছিলেন।

নিজের মানসী প্রতিমাকে নিকটে পাইয়া শেলী হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ভুলিয়া গেলেন এবং মেরীকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই মিলনের পথে প্রধান বাধা হইলেন মেরীর পিতা, মিঃ গডউইন্‌। শেলী অবশ্য নানা উপায়ে সে বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া মেরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের পূর্ব্বে তিনি হ্যারিয়েটকে মেরীর প্রতি তাঁহার গভীরতম ও সত্যিকারের ভালবাসা এবং তাহার প্রতি স্নেহের ব্যাখ্যা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন যে, হ্যারিয়েটকে তিনি এখনও ভালবাসেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা একটুও কম নয়, বরং বেশী; এবং হ্যারিয়েট যদি তাঁহাদের নিকটে আসিয়া একত্রে বাস করিতে রাজী হয় তাহা হইলে তিনি বিশেষ সুখী হইবেন এবং তাহাকে চিরকাল "Sister of his soul" রূপে ভালবাসিবেন।

অনেকের জীবনেই হয়ত এমনি সমস্যা আসিয়াছে, কিন্তু শেলীর পূর্ব্বে আর কোন মানুষই একথা প্রকাশ করিতে যা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, "Sister of the soul" রূপে সত্য-সত্যই কোন মেয়েকে ভালবাসা যায়। শেলীই প্রথম মুখ ফুটিয়া বলেন যে, কোন মেয়েকে কামনা-বাসনা বিরহিত হইয়া "Sister of the soul" রূপে ভালবাসিলে, একটুও কম ভালবাসা হয় না—বরং নিজের প্রিয়ারূপে ভালবাসা অপেক্ষা ইহাতে আনন্দ বেশী, সান্ত্বনাও বেশী। হ্যারিয়েটকে বিবাহ করিলেও, তাহার সন্তানের জনক হইলেও প্রথম হইতেই শেলী যেন হ্যারিয়েটকে ঠিক তাঁহার পত্নীর মত ভালবাসিতে পারেন নাই, হ্যারিয়েটের আকর্ষণেই বিবাহ করিয়াছিলেন। একথা প্রথমে বুঝিতে পারিলে জগতের চোখে তাঁহাকে অযথা এক ধাপ নীচে নামিয়া যাইতে হইত না, আর হতভাগিনী হ্যারিয়েটকেও হয়ত এমনি ভাবে অকালে ও নিষ্ঠুর ভাবে আত্মহত্যা করিতে হইত না।

হ্যারিয়েটকে লইয়া একটা নূতন আদর্শ গড়িবার ইচ্ছা ও আশা শেলীর প্রথম হইতেই ছিল এবং হ্যারিয়েটেও তাহার কোন কোন লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু মেরীর সঙ্গ পাইয়া শেলী বুঝিলেন এতদিন তিনি ঠিক যেমনটি চাহিতেছিলেন, মেরী তাঁহার সেই অন্তরের নিখুঁত প্রতিমা।

মেরীকে লইয়া পলায়নের পূর্ব্বে তিনি হ্যারিয়েটকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাই হইল এই হারানো চিঠির প্রথম পত্র।

নিজের অন্তরের সত্যিকারের পরিচয় পাইয়া শেলী মনে করিলেন যে, হ্যারিয়টকে যদি সকল কথা খুলিয়া প্রকাশ করিয়া লেখা যায়, তাহা হইলে সেও নিশ্চয় এতদিনে নিজের অন্তরের সত্যিকারের পরিচয় বুঝিতে পারিবে এবং এই পরিবর্ত্তনের আঘাতে নিশ্চয়ই দমিয়া যাইবে না। তাই মেরীর প্রতি নিজের প্রগাঢ় এবং সত্যিকারের আবেগময় ভালবাসার কথা বলিয়া তিনি হ্যারিয়েটকে লিখিয়াছিলেন—"আবার বলছি, বিশ্বাস কর, কেননা আমি অকপট, তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি। মনে হয় সেটা যেন আরও গভীর ও স্থায়ী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। খেয়াল বা ছলনার ভয় আর নেই। আমাদের বন্ধন কোনদিন কামনা-বাসনার ছিল না, বন্ধুত্ব ছিল তার ভিত্তি আর এই ভিত্তির ওপর সেটা বেড়েছে এবং বল পেয়েছে। তুমি কোনদিন সর্ব্বগ্রাসী আকর্ষণ দিয়ে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন করনি, এটা আমার তিরস্কার নয়। হয়ত সে বাসনার সঙ্গে তোমার নিজেরও আজ পর্য্যন্ত পরিচয় হয়নি, আমার চেয়ে যোগ্য এবং মহত্ত্বের সংস্পর্শে হয়ত' তা তোমার মধ্যে জাগ্‌বে। প্রার্থনা করি তুমি এমনি একজন বিশ্বাসী ও কামনা-ব্যাকুল ব্যক্তিকে প্রেমিকরূপে পাও—যেমন আমি তোমার বন্ধু স্নেহশীল, অকৃত্রিম। আমি কি তোমার বন্ধুর চেয়ে বড় হব না? না, তার চেয়ে আরও বেশী! ভাই, তোমার সন্তানের জনক!"

শুধু আমাদের দেশই নয়, সারা পশ্চিম আজ অবাক হইয়া গিয়াছে এই কথা কয়টিতে। শেলীর চিঠির সঙ্গে সঙ্গে আজ যদি সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেলীকে ফিরাইয়া পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ইহার জন্য সাধারণে কৈফিয়ৎ দিতে হইত। এর ফলে ইহার পূর্ব্বে যাঁহারা শেলীর প্রেমের কথা লইয়া বড় বড় বই লিখিয়াছেন, সেগুলি পুনরায় নূতন করিয়া না লিখিলে চলিবে না। আমরা শুধু তাঁহার চিঠি হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব যে, শেলী হ্যারিয়েটকে কোন দিনই সন্দেহের চোখে দেখেন নাই, এবং তাহাকে সন্দেহের বশে ত্যাগ করেন নাই—যদিও তিনি চাহিয়াছিলেন হ্যারিয়েট তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিয়া সুখী হয়। শেলী নিজের অন্তরের সত্যিকারের পরিচয় পাইয়া হ্যারিয়েটকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং হ্যারিয়েট শেলী ভিন্ন আর কোন দ্বিতীয় পুরুষকে স্বামীরূপে কোনদিনই ভালবাসে নাই। হ্যারিয়েট শেলীকেই শেষ পর্য্যন্ত ভালবাসিয়াছে এবং শেলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হওয়ার দুঃখে এবং তাঁহাকে ফিরাইয়া পাইবার কোন আশা না দেখিয়াই আত্মহত্যা করিয়াছে; মেজর রায়ানের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্কই ছিল না।

হ্যারিয়েট শেলীকে বুঝিল না, তাঁহাকে ক্ষমা করিতেও পারিল না, এবং শেলী যে তাহাকে ত্যাগ করিলেন তাহার জন্য দায়ী করিল মেরীকে।

হ্যারিয়েট তাহার বন্ধু ক্যাথ্‌রিণ নাজেন্টকে লিখিল—"* * মেরী প্রাণপণে চেষ্টা করেছে শেলীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এবং শেলী যে আমায় ত্যাগ করেছে তার জন্যে মেরীই দায়ী। প্রতিদিন নিজের মায়ের সমাধি-পাশে ব'সে নিজের ভালবাসা নিবেদন ক'রে ক'রে সে তাকে ক্রমে ক্রমে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও করুণ অনুরোধ ক'রে জানিয়েছে শেলী যদি তাকে বিয়ে না করে তা হ'লে সে আত্মহত্যা করবে। * * শেলী লিখেছে কেন আমরা তিন জনে (মেরী তার স্ত্রী এবং আমি তার ভগ্নীরূপে) একত্রে বাস কোরতে পারব না? সে পাগল, তাই সে এ সম্ভব ব'লে ভাব্‌তে পেরেছে!" (Thomas J. Wise p. 57)

হ্যারিয়েটের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া শেলী ট্রয়েজ হইতে দুই সপ্তাহ পরে তাহাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাই হট্‌সনের এই আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হ্যারিয়েটকে লিখিত শেলীর একমাত্র চিঠি। তাহাতে শেলী হ্যারিয়েটকে সুইট্‌জারল্যাণ্ড-এ যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন—"* * হ্যারিয়েট, লক্ষীটি, চ'লে এস! এখানে এসে তুমি এমন একজন বন্ধু পাবে যে তোমার শুভাশুভের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র; যে কোন দিনই তোমার মনোবৃত্তিকে কোনরকমেই আহত করবে না। * * আমি শীঘ্রই তোমার কাছে যাব, এবং তোমাকে পাহাড়ের একটি সুন্দর কুটিরে অভিনন্দিত ক'রে আনব।"

শেলী স্বপ্ন দেখিতেছিলেন হ্যারিয়েটকে নিকটে পাইয়া

পাহাড়ের সুন্দর একটি গৃহে তাঁহার গ্রন্থি-ছেঁড়া জীবনের গ্রন্থি নূতন করিয়া জুড়িয়া পুনরায় জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবেন, কিন্তু একমাস পরেই দেখা গেল শেলী নিজে ভিখারীবেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন হ্যারিয়েটের দুয়ারে মাত্র কুড়ি পাউণ্ডের জন্য!

হ্যারিয়েট শেলীর আহ্বান বার বার প্রত্যাখ্যান করিল, কারণ অন্যের মন্ত্রণায় তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মেরীর প্রতি শেলীর এই প্রেম সাময়িক, দুই দিন পরেই শেলী পুনরায় তাহার নিকট ফিরিয়া আসিবেনই। হ্যারিয়েটের মনে যদি এমনি কোন ধারণা থাকিয়াই থাকে, তাহার জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না—সে নারী, শেলী তাহার জীবন-আকাশের একমাত্র সূর্য্য; সে সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইলেও, তাহার মুক্তির কল্পনা ছাড়া নিজের সান্ত্বনা ত আর কিছুই ছিল না।

তাহার পরিপার্শ্বিক আবহাওয়ার আবর্ত্তে হ্যারিয়েট তখন নিজেকে এবং শেলীর প্রতি তাহার অসীম ভালবাসার খানিকটা অংশ হারাইয়া ফেলিয়াছে! শেলীর বিষয়ে সে আজকাল আর নিজের মত দিতে পারে না, প্রতি পদে এলিজা এবং তাহার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে—এবং তাহাদের উপদেশ মতই কাজ করে। ইহা জানিতে পারিয়া শেলীর অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভ হইল যে, যে হ্যারিয়েট কিছুদিন পূর্ব্বেও তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও চিনিত না, আজ সে অন্যের উপদেশ ছাড়া তাঁহার সহিত চিঠি ও মতের আদান-প্রদান করিতে পারে না! তিনি হ্যারিয়েটকে লিখিলেন—** "আমার চিঠিগুলি তুমি যদি নিজের নিকটে অন্যের কাছ থেকে গোপন ক'রে না রাখতে পার—তা হ'লে আমি তোমায় বিশ্বাস ক'রে চিঠি লিখতে পারব না।** আমি জানিনে আমাদের মধ্যে এর পরে কোন্ ধরণের চিঠির আদান-প্রদান হবে—যাই হোক না কেন, আমার অনুরোধ অন্য কারও নিষ্ঠুর ও নীচ মন্তব্য দিয়ে একে কলঙ্কিত ক'র না—অন্য কাউকে আমাদের দুজনের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব করতে দিওনা। তুমি নিজে এর বিচার ক'র, যারা ভালবাসাকে সম্মান করতে জানে না, কোন দিন ভালবাসেনি—তাদের সহানুভূতির উপর নির্ভর ক'র না!** এই সব বন্ধুদের অপেক্ষা আমি নিজেকে তোমার ঢের বেশী বিশ্বাসী ও শুভানুধ্যায়ী ব'লে মনে করি—কিন্তু আমার এ বন্ধুত্বের একটা দাম আছে।** তুমি ভাবছ আমি তোমার ক্ষতি করেছি। যেদিন আমি তোমায় প্রথম দেখি, তার পর থেকে তোমার শুভকামনাই আমার প্রধান ব্রত। আজ আর একজনের প্রতি আকৃষ্ট, আমি তার সঙ্গ-প্রার্থনায় ব্যাকুল; তবুও এই কথাটি আমি সব সময় ভাবছি যে, কি ক'রলে আমি সত্যিই তোমার উপকার করতে পারি।"**

হ্যারিয়েট এ চিঠির কোন উত্তর না দিয়া বন্ধু বান্ধবীদের উপদেশানুযায়ী গোপনে কোন এক উকিলকে শেলীর ঠিকানা দিয়া আসিল।

হ্যারিয়েটের চিঠি না পাইয়া শেলী তাহার পরদিন পুনরায় তাহাকে চিঠি লিখিলেন—** "আমি আজ খুবই আশা ক'রে ছিলাম যে তোমার কাছ থেকে কালকের চিঠির উত্তর পাব—কালকের চিঠির উত্তর যে আমার বিশেষ দরকার। মেরী ও আমার প্রতি তোমার সত্যিকারের মনের ভাব আমি জান্‌তে চাই।** আমি তোমার চিঠির জন্যে বিশেষ ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত আছি। আমি আশা করি তুমি তোমার অন্তরের বিবেক-বুদ্ধির দ্বারাই আমাদের দুইজনকে একসঙ্গে বিচার করবে (কেননা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা থেকে মেরী ও আমাকে পৃথকভাবে ভাবাই যায় না)। বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখবে, তুমি আমাকে বিশ্বাস ক'রে ভবিষ্যতে আমার নিকটে বন্ধু হ'য়ে বাস করতে পারবে কি না** না, এই খানেই আমাদের বন্ধুত্বের উপর চিরকালের জন্যে যবনিকা টান্‌বে! তোমার উপরই সমস্ত নির্ভর করছে।"

শেলীর এই বন্ধুত্বের উপর হ্যারিয়েট এবং তাহার তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীদের কোনদিনই সহানুভূতি বা বিশ্বাস ছিল না। যাঁহাকে সে একদিন একান্তভাবে আপনার মনে করিয়া একেবারে নিজের অন্তরের নিকটে পাইয়াছে—আজ তাঁহার এ ব্যবহার হ্যারিয়েট কোন দিক দিয়াই বরদাস্ত করিতে পারিল না। বন্ধুত্ব! সর্ব্বস্ব লইয়া—আজ তাহার পরিবর্ত্তে বন্ধুত্ব!

হ্যারিয়েট শেলীর এ চিঠিরও কোন উত্তর না দিয়া

শেলীর এটর্ণি মিঃ অ্যামরির নিকটে গিয়া তাহাদের এই আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সমস্তই খুলিয়া বলিল। এবং কানা-ঘুসা শোনা গেল যে, হ্যারিয়েটের পিতাও নাকি শেলীর বিপক্ষে কোর্টের সাহায্য লইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। শেলী ইহা জানিতে পারিয়া হ্যারিয়েটকে লিখিলেন—"তুমি ত' চিঠিপত্র লেখা একেবারে বন্ধই কোরেছ, এমন কি টাকা-কড়ি সম্পর্কে আমার প্রশ্নেরও জবাব দিল না।* * অ্যামরির নিকটে আমাদের এই বিচ্ছেদের কথা ব'লে ভাল করোনি, এবং শুন্‌লাম যে তোমার বাবাও নাকি আমার চরিত্র সম্বন্ধে কোর্টে মকর্দ্দমা আন্‌বেন। বেশ, এই যদি সত্যি হয়—এবং তোমার অপরিণামদর্শী অন্তর যদি এতখানি উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তুমি তোমার নিজের পথ নিজেই বন্ধ করছ। * * এখনও আমাদের অতীতের ভালবাসার স্মৃতিতে এবং তোমার ভবিষ্যত যাতে একেবারে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্যে এমন অনেক কাজ কোরতে পারি—যা তুমি কোনদিনই আইনের সাহায্যে পাবে না। আমার এ চিঠি পাওয়ার পরও তুমি যদি আমায় আইনের প্যাঁচে বাঁধতে চাও, তা হ'লে বুঝ্‌ব তুমি আমার শত্রু, যে এতদিন বন্ধুর ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে নির্ব্বিবাদে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে এসেছে! * * * তোমার কাছ থেকে বড় এবং মহৎ কিছু আশা করাই আমার পক্ষে মস্তবড় একটা বোকামী হ'য়েছে। আমি কোনদিনই আশা করিনি যে, যখন উদারতা দেখাবার সময় আস্‌বে তখন তুমি নিতান্ত নীচ স্বার্থপরের মত নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাক্‌বে—অথচ তুমিই একদিন নিজেকে একজন পবিত্র এবং মহৎ আদর্শের প্রতিপালিকা ব'লে গর্ব্ব প্রকাশ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হওনি। এখন মনে হ'চ্ছে তা' শুধু বাহিরের, অন্তরে অন্তরে তুমি চিরকালই কুসংস্কারে অভিভূত, এবং জগতের আর সকলের মতই তুমিও জগতের ছোট গণ্ডি নিয়েই ব্যস্ত। সাদা কথায়, তুমি আমার কাছে চিরদিনের মত হারিয়ে গেছ। আমি আমার এ মনোভাব পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাই দেখ্‌ছি নে।"

এ চিঠি হতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শেলী খুব রাগিয়া গেছেন—এমন কি হ্যারিয়েটকে চিঠিতে সম্বোধন করিতেও ভুলিয়া গেছেন!

শেলী পুরুষ, নারী-চিত্তের অন্তরতম অন্তরের মণিময় সিংহাসনে যে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, তাহাকে যে নারী কোনদিনই সহজে বিদায় দিতে পারে না, একথা শেলীর যদি একবারও মনে হইত তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে হ্যারিয়েটের মনোভাব বুঝা কঠিন হইত না।

শেলীর এই চিঠি পাইয়া হ্যারিয়েট্ অন্তরে অন্তরে চম্‌কাইয়া উঠিল—তাইত' এ সে কোন পথে চলিয়াছে! শেলীর সঙ্গে বিবাদ! কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় জীবন পাইয়া যে কালসাপিনী তাহার দরদী অন্তরের আড়ালে একটু একটু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে—সে আজ ফণা তুলিয়া বলিল, কই, আমিত আজ পর্য্যন্ত কোন অন্যায়ই করি নাই—কেবল নিজের পথভ্রষ্ট দয়িতকে ঘরের পথে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছি!

এই বিষে হ্যারিয়েট মরিল।

শেলী লিখিলেন—"তুমি নিজেকে সমর্থন করতে প্রস্তুত হ'য়েছ দেখে সুখী হ'লাম। * * তুমি যদি আমার উপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে থাক, তা হ'লে এটর্ণির পরামর্শ নিতে পার একথা আমি তোমায় পূর্ব্বে লিখেছিলাম; দেখ্‌ছি, তুমি তাই কোরেছ। এতে কিন্তু তুমি আমার কাছ থেকে একেবারে দূরে চ'লে গেলে! * * তুমি লিখেছ, এটর্ণি নিযুক্ত করলেও তুমি আইনের কোন সাহায্য নেবেনা—কিন্তু এটর্ণি নিযুক্ত করাই যে আইনের সাহায্য নেওয়া। ** যে সমস্ত মত ও উদ্দেশ্যকে তুমি পূর্ব্বে ঘৃণা করতে এবং কলঙ্ক ব'লে মনে করতে আজকাল সেই সব মত ও উদ্দেশ্যই হ'য়েছে তোমার প্রধান অবলম্বন। যতদিন না তুমি এসবের প্রভাব এড়াতে পারবে ততদিন তোমাকে আমি আর চিঠি লিখব না।** আমাদের ভিতর ভালবাসার যে বন্ধন ছিল তুমিই প্রথম সে বন্ধন ছিন্ন করেছ—এবং এমন একজন বন্ধুকে তুমি আজ হারালে জীবনের পথে ঠিক তেমনি আর একজনের সঙ্গে আর কোনদিনই তোমার পরিচয় হবে না। মেরীর প্রতি তুমি যে কর্কশ ও কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ কোরেছ তা ঠিকই তোমার বর্ত্তমান মনোভাবের মতই নীচ ও দুর্ব্বল! * * * তোমার পারিপার্শ্বিক স্বার্থপর ছোটদের নিয়ে যে অহঙ্কারের জগত তুমি সৃষ্টি করেছ

এখনও যদি তুমি তার গণ্ডি ছাড়িয়ে আস্‌তে পার, আমি তোমার বন্ধু হবো। বন্ধুর অন্য কোন অর্থ করনা—সত্যিকারের বন্ধু বল্‌তে যা বুঝায় আমি হব তাই।

আমি এতকথা লিখ্‌ছি, কিন্তু আশা করতে পারছিনে যে, এ সব কথা তোমার মনে একটু আঁচড় কাট্‌তে পারবে। * * তোমার কাছ থেকে কোন সদুত্তর ও মহত্ত্ব আশা ক'রতে পারছি নে, তবুও তোমার উত্তর চাই।"

এর উত্তরে হ্যারিয়েট বোধ হয় শেলীকে লিখিয়াছিল—"আমাকে ত্যাগ ক'রেও শুধু আমার জন্তে অতীতে তুমি যে অর্থব্যয় ক'রেছ তারই জোরে আমার উপর অবিচার কোরেও আধিপত্য ছাড়তে চাইছ না।" হ্যারিয়েটের এই চিঠি হইতেই অনেকে ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে, হ্যারিয়েট এই সময়ে আর একজনকে ভালবাসিয়াছিল। হ্যারিয়েট শৈশব হইতে নিজে স্বাধীনভাবে কিছু করিতে বা ভাবিতে শেখে নাই, এলিজার প্রতিপত্তির আওতায় সে শেলীকে ক্ষমা করিতে পারে নাই।

শেলী পুনরায় হ্যারিয়েটকে লিখিলেন—"হ্যারিয়েট, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, ইচ্ছা কোরেই ভুল বুঝেছ। তোমার জন্তে যে অর্থ ব্যয় করেছি সেজন্তে তোমার উপর আমার একটা দাবী আছে এমন কথা কোনদিনই আমি বলিনি। * * আমি বেশ বুঝ্‌ছি যে রাগের বশে তুমি আমার প্রতি এ অবিচার ক'রেছ। আমার বন্ধুত্বকে তুমি যদি এম্‌নি ভাবে প্রত্যাখ্যান করো—তা হ'লে চিঠির আদান-প্রদানে যে কোন লাভ হবে এ আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না।** আজ আমি অন্যের প্রতি অনুরক্ত, এবং তুমি আমার স্ত্রী নও, কিন্তু তাতে আমি বোধ হয় তোমার খুব বেশী ক্ষতি করিনি; যদি কিছু ক্ষতি হ'য়ে থাকে তা তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে না হ'য়ে উপায় ছিল না। * * নিজেকে ভাল কোরে বুঝবার চেষ্টা করো, আমার অনুরোধ—মনে কোর আমি কি, আমার চরিত্র সম্বন্ধে অতীতের কথাও স্মরণ কোর। সম্পত্তির ব্যবস্থা নিয়ে তুমি আমায় যে খোঁচা দিয়েছ তাতে প্রমাণিত হচ্ছে তুমি আমাকে কতটুকু চিনেছ বা বুঝেছ। * * আমি জানি তুমি আবার মা হ'তে যাচ্ছ, সে জন্ত আমার মিনতি নিজের শরীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখ।"

শেলী বরাবরই নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত কিন্তু নিজের মতকে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করিতে গিয়া আর একজনের অন্তরে যে আঘাত বাজিতেছে তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। হ্যারিয়েটকে ত্যাগ করিয়া কোন অন্যায় করিয়াছেন—এ কথা শেলীর একবারও মনে হয় নাই, সেই জন্তই হ্যারিয়েট তাঁহার মতে মত দিতে চাহিতেছিল না বলিয়া এত দুঃখ।

হ্যারিয়েট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি না দিলেও শেলী কোনদিনই তাহাকে কলঙ্কিনী বলিয়া সন্দেহ করেন নাই। উপরন্তু তাঁহার প্রতি চিঠিতেই যে স্নেহজাত উদ্বেগ লুকাইয়া আছে, তাহা দেখিলে মনে হয়—শেলীর অন্তরে হ্যারিয়েটের জন্ত একটুখানি স্থানের অভাব কোনদিনই ছিল না।

হ্যারিয়েট শেলীর এ চিঠির উত্তর বেশ ভাল ভাবেই দিয়াছিল, কিন্তু শেলী তাহার উত্তর দিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের দুই জনের পরিচয় ও ভালবাসার মাঝখানে এতবড় একটা ফাটল ধরিয়াছে যাহাকে আর কোন ক্রমেই অতিক্রম করা যায় না। জুলাই মাসে যাহাকে "Sister of the soul" রূপে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, আজ দেখিলেন সে তাঁহার এক অতি সাধারণ বন্ধু ও তাঁহার সন্তানের জননী ছাড়া আর কিছু নয়!

শেলী লিখিলেন—* * "তোমার চিঠির সুরে আমার আশা হ'য়েছে এবং মনে হ'চ্ছে তুমি সত্যসত্যই আমার বন্ধুত্ব চাও। আমি জানি, এ বন্ধুত্বের অর্থ কি। * * আমি কোনদিনই তোমার মঙ্গলের জন্ত কার্পণ্য করব না। তুমি আমার স্ত্রী ছিলে, তুমি আমার সন্তানের জননী—আমার আর একটি সন্তানের জননী হ'তে চ'লেছ—কিন্তু এ সব বন্ধন শুধু মানুষকে ছোট জগতের অতি তুচ্ছ জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট করে, মানুষের বৃহত্তর সুখের জন্ত সহানুভূতির সেখানে একান্ত অভাব! * * আমাকে ভুল বুঝ না, আমি তোমার বন্ধু, এবং চিরকালই বন্ধু বল্‌তে যা বুঝায় তাই থাক্‌ব। আমি বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পারি যে, আজ পর্য্যন্ত তোমার প্রতি নির্দ্দয়ভাব বা তোমার অনিষ্ট করার কোন ইচ্ছাই আমার মনে কোনদিনই জাগে নি! * * যতদিন না আমি তোমার কাছ থেকে জান্‌তে পারছি যে,

তুমি আমায় ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছ—ততদিন আমি তোমায় আর চিঠি লিখ্‌ব না।"

এই চিঠি লেখার কিছুদিন পরেই শেলী খুব পীড়িত হ'ন ও দিকে হ্যারিয়েটও পীড়িতা এবং তাহার এই দুঃসময়ে লণ্ডনের আবহাওয়া সহ্য হইতেছেনা বলিয়া এলিজা তাহাকে লইয়া সাউদাম্প্‌টনে চলিয়া গেছে। নিজের এত অশান্তির ভিতরও শেলীর অসুস্থতার কথা জানিতে পারিয়াই হ্যারিয়েট শেলীকে অনেক অনুরোধ করিয়া নিজের শরীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লিখিলেন। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, হ্যারিয়েটের অন্তরে অন্তরে শেলীর প্রতি ভালবাসা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল। শেলীর জীবনও এই সময় নানারকম অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ৫ই অক্টোবর তাঁহার বহু শ্রমে নির্দ্ধারিত যে চারি শত পাউণ্ড পাওয়ার কথা ছিল তাহা কোন কারণে পাইলেন না। হ্যারিয়েটকে লিখিলেন—"* * তুমি কেমন আছ জানার জন্তে বিশেষ উৎকণ্ঠিত, সত্য ক'রে লিখ তুমি কেমন আছ। * * শুন্‌লাম তোমার দিদি এখন সহরে নেই, তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি যে তোমার জন্তে তাঁর সকল স্নেহের কথা ভুলে ছেড়ে গেলেন এইটাই আশ্চর্য্য! হ্যারিয়েট, আমি বলছি, তোমার জন্তে আমার যে ভালবাসা তার উপর তুমি চিরকাল নির্ভর করতে পার। * * নভেম্বরের পূর্ব্বে যদি টাকার যোগাড় কোরতে না পারি তাহ'লে আমাকে নিশ্চয়ই জেলে যেতে হ'বে। অনেক কষ্টে আমায় টাকার সংস্থান কোরতে হবে, যদি পারি তা থেকে তোমায় কিছু পাঠাব—কিন্তু সে কথা তোমার বাবাকে বোল না। * * আমি জানি, যতদিন না আমি টাকার বন্দোবস্ত করতে পারছি ততদিন তিনি নিশ্চয়ই তোমায় প্রতিপালন করবেন—কিন্তু ওই স্বার্থপর লোকটির উপর তোমায় যে নির্ভর ক'রে থাক্‌তে হবে—একথা ভেবে আমি বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত। কিন্তু বর্ত্তমানে অন্ত কোন উপায়ই নেই! * * আমি জানি তোমার অসুখের জন্তে অনেক বাজে খরচ হ'য়েছে এবং আসন্ন আর একটা বাজে খরচও আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে তোমাকে সাহায্য করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।"

একেবারে নিরুপায় হইয়া ২৫শে অক্টোবর শেলী হ্যারিয়েটকে লিখিলেন—* * "কিছুতেই টাকার সংস্থান ক'রতে পারলাম না। তুমি যদি শীঘ্রই কিছু যোগাড় করতে না পার তা হ'লে আমায় জেলে যেতে হবে! আমি আর কোন উপায়ই দেখছিনে! ৬ই পর্য্যন্ত আমি কোনরকমে লুকিয়ে থাক্‌ব এবং তুমি যদি তার ভিতর টাকার যোগাড় কোরতে না পার তা হ'লে জেলে গিয়ে আমায় জামিনে মুক্ত ক'রে নিয়ে এস। এখনও তুমি প্যানক্রাশে এসে আমায় ব'লে যেতে পার, কবে এবং কত টাকা তুমি দিতে পারবে। আমার নিজের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে!** যদি আমায় জেলে যেতে হয়, তা হ'লে সামান্ত দেনার দায়ে হয়ত' আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী হ'য়ে যাবে! * * যা পার তাই পাঠাবে, একেবারে বেশী না পার ক্রমে ক্রমে পাঠিও। আমি কোন দিনই টাকার জন্তে তোমায় এমন নির্দ্দয়ভাবে উৎপীড়ন করতাম না—যদি না আমাদের দু জনের বিপদ সমান হোত। * * শীঘ্র একটা বেয়ারাকে দিয়ে চিঠির উত্তর পাঠাবে এবং তার ভিতর অন্ততঃ ত্রিশ পাউণ্ডও যেন থাকে!"

হ্যারিয়েটকে শেলী যে নয়খানা চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার কোনখানির ভিতরই হ্যারিয়েটের চরিত্রের উপর তাঁহার সন্দেহের ছাপ বা উল্লেখ নাই। প্রত্যেক চিঠিতেই তাঁহার ভালবাসা, তাঁহার উপকার করিবার এবং কোন রকমে উপকারে আসিবার বাসনা প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহারা শেলীকে বাঁচাইতে গিয়া হ্যারিয়েটের মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মিঃ ডাউডেন অন্ততম। তিনি তাঁহার এই মতকে তিনখানি লেখার দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম, মেরীকে লিখিত (?) (১১ই জানুয়ারী, ১৮১৭) শেলীর একখানি চিঠি। দ্বিতীয়, মিঃ ডব্লিউ, টি, বাক্স্‌টার (W. T. Baxter)-কে লিখিত গড্‌উইনের চিঠি (১২ই মে, ১৮১৭); তৃতীয়, মিস্ ক্লেয়ারমণ্টের প্রবন্ধ (১৮৩২)।

শেলী যাহাতে হ্যারিয়েটের ছেলে মেয়ে দুটিকে তাঁহাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইতে না পারেন, এই জন্তে ওয়েষ্টব্রুক্ হ্যারিয়েটের মৃত্যুর পর শেলীর বিরুদ্ধে চ্যান্সারিতে

মকর্দ্দমা রুজু করিয়াছিলেন—একথা আশা করি সকলেই জানেন।

১২ই জানুয়ারী, ১৮১৭ তারিখে শেলী মেরীকে লিখিয়াছিলেন— "এইমাত্র গডউনের নিকট শুন্‌লাম যে, তোমার সঙ্গে ইংলণ্ড ছেড়ে যাওয়ার চারমাস আগে থেকে হ্যারিয়েট আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হ'য়েছিল, গডউইন এর প্রমাণও দিতে পারে বলেছে। যদি আমরা এ কথা প্রমাণ করতে পারি তা হ'লে আমাদের সম্বন্ধ পাকা করার একটা মস্তবড় উপায় হবে।" কিন্তু যখন মকর্দ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল শেলী নিজেকে সমর্থন করিবার জন্যও এ কথার কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই।

১২ই মে গডউইন লিখিয়াছিল—"আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্রে জানি যে, বিচ্ছেদের পূর্ব্বেই হ্যারিয়েট তাহার স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হইয়াছিল (যদিও এ বিষয়ে মতামতের জন্য আমাকে দায়ী করা চলিবে না)।"

পরে জানা গিয়াছিল যে, গডউইন কোন এক অজ্ঞাত ও অখ্যাত লোকের মুখে এ কথা শুনিয়াই শেলীকে লিখিয়াছিল।

১৮৩২ সালে মিস্ ক্লেয়ারমণ্ট লিখিয়াছিলেন—" 'হ্যারিয়েট আর আমাকে ভালবাসে না। মেজর রায়ান নামে কোন ব্যক্তিকে ভালবাসে এবং শীঘ্রই তার যে সন্তান হবে তাও আমার নয়' এই সমস্ত কথা ব'লেই শেলী নাকি মেরীর ভালবাসা জয় করিতে সক্ষম হয়েছিলেন; এ সব কথা মেরী আমাকে নিজে ব'লেছে।"

মিস্ ক্লেয়ারমণ্টের এ কথাগুলো যেমন মিথ্যা তেমনি কুৎসিত। এ বিষয়ে মিস্ ক্লেয়ারমণ্টের কোন প্রমাণই নাই। তাহার পর হ্যারিয়েটের দ্বিতীয় সন্তান যে শেলীর ঔরসজাত এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই—কারণ শেলী নিজেই শিশুর জন্ম সম্ভাবনা লইয়া বন্ধুদের সঙ্গে অনেক গল্প করিয়াছেন, তিনিই তাহার নাম রাখিয়াছিলেন চার্লস্, এবং হ্যারিয়েটের আত্মীয়রা যখন তাঁহার ছেলে মেয়েকে দিবেন না বলিয়া মকর্দ্দমা করিয়াছিলেন, শেলী তখন চার্লস্‌কেও বার বার তাঁহার নিজের সন্তান বলিয়াই দাবী করিয়াছেন। হ্যারিয়েটকে লিখিত শেলীর চিঠির মধ্যে এই শিশুর আগমন সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে।

১৮১৬ সালের ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যায় নিজের একান্ত পরিচিত গৃহ এবং প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সন্তানদের ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে হ্যারিয়েট্ এলিজাকে যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা পড়িলে এমন কেহ নাই যে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে।

শেলী স্বীকার করিতে চাহেন নাই যে, মেরীর সঙ্গে তাঁহার মিলনই হ্যারিয়েটের আত্মহত্যার কারণ, কেন না তিনি জানেন, তিনি বরাবরই নিজের অন্তরের সত্য কথাই অকপটে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। এদিক হইতে তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেও, তাঁহার অদূরদর্শী দৃষ্টির জন্য ভর্ৎসনা না করিয়া পারা যায় না! কেন তিনি এলিজার কুহকে ভুলিয়া হ্যারিয়েটের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন—এবং নিজের অন্তরের পরিচয় না লইয়া কেন শুধু হ্যারিয়েটের মুখের দিকে চাহিয়াই তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যদিও এ কথা সত্য যে, শেলীকে যদি বাধ্য হইয়া হ্যারিয়েটের সঙ্গে চিরজীবন স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতে হইত (মেরীকে দেখিবার এবং ভালবাসিবার পরেও) তাহা হইলে তাঁহাদের দুই জনের জীবনই বিষময় হইয়া উঠিত—এবং তাহার ফলে যে বিবাহবিচ্ছেদ হইত না, এ কথা বলা শক্ত!

শ্রীসুনীলকুমার ধর

বিচিত্রার দপ্তর

[বিশ্বামিত্র]

সাহিত্যিকের অমূল্য বাণী

অনেক দিনের কথা। পল্লীগ্রাম হইতে কৃষক আসিল সহরে বেড়াইতে। স্বগ্রামে ফিরিলে শত মুখের সাগ্রহ প্রশ্ন—"কল্‌কাত্তা দেখ্‌লে কেমন?" "কি আর বল্‌ব দাদাভাই! কোঠা আর কোঠা—কোঠার বাঁশবন।" সেকালের সাহিত্যিক একালে আবির্ভূত হইলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবেন—"ছাপার আখরের কী ধুম! লেখা আর লেখা—কাগজ আর কেতাব!" সত্যই বাজে বই, অপাঠ্য রচনার অন্ত নাই! বীণাপাণির অর্চ্চনা-দিনে লেখকেরা সাহিত্য-রথী ভিক্তর হুগোর বাণী স্মরণ করিলে উপকৃত হইবেন—"একটি ভাল কবিতা রচনার জন্ত লোকে যদি আমাকে টিট্‌কারি দেয় দিক্, অম্লানবদনে সহিব; কিন্তু আমার কোন খারাপ কবিতার সুখ্যাতি শুনিলে চটিয়া খুন হইব।"

কবির ভাগ্যে কি?

কথা-সাহিত্য রচনায় লক্ষ-লক্ষাধিপতি হওয়া যায়, কিন্তু কবিতা লিখিলে মরিতে হয় অনাহারে। কবিতা-ব্যাধিগ্রস্ত বাঙলার কথা নয়, সুদূর পাশ্চাত্যের অবস্থা এই। বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী-কবি এডিথ্‌ সিট্‌ওয়েল্‌ কবিদিগকে উপদেশ দিতেছেন—"কেরাণী হও, দারবান হও, গোমস্তাগিরি দর্জ্জি-গিরি কর, শুধুই কবি হইয়া দুঃখদৈন্তে পৈতৃক প্রাণটা অকালে হারাইও না।" খাস বিলাতের হাল এই—টীকা টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। বিখ্যাত কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রথম মুদ্রিত হয় তাঁহারই জীবিতকালে—পাঁচ শত মাত্র; নিঃশেষ হইতে লাগে পাঁচ বৎসর। প্রথম কাব্য-গ্রন্থ বিক্রয়ে কবি টেনিসন পান মাত্র দেড়শত মুদ্রা! অর্থকৃচ্ছতা হেতু সাহিত্যিক জীবন আরম্ভের দশ বৎসর পরে তিনি বিবাহ করিতে সাহসী হন। ঔপন্তাসিক ও গদ্য-লেখকেরা তখন কিন্তু অগাধ ধন অর্জ্জন করিতেছিলেন। বর্ত্তমান কালের জনপ্রিয় কবি রবার্ট গ্রেভ্‌স্‌ বহু বৎসর কবিতা-দেবীর আরাধনা করিয়া দেখিলেন অন্ন হয় না, অগত্যা যুদ্ধ-বিবরণী লিখিলেন—এক গ্রন্থের উপলক্ষে সকল অভাবের মোচন! সৈনিক কবি সিগ্‌ফ্রেড্‌ সেস্থনেরও হইল তাই। অথচ শত বৎসর পূর্ব্বে বায়রণ ও মূর কবিতা লিখিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করেন। মূরের "Lalla Rookh" এখন অনাদৃত, অথচ এই কাব্য-রচনার পূর্ব্বেই প্রকাশকেরা গ্রন্থস্বত্বের জন্ত তাঁহাকে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা লইয়া সাধ্যসাধনা করেন। সেদিন আর এদিন—কবির ভাগ্যে কি পরিবর্ত্তন! প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি ইয়েট্‌স্‌ রবীন্দ্রনাথকে প্রতীচ্য খণ্ডে প্রথম পরিচিত করেন। ছেঁড়া মোজার গর্ত্তে কালী মাখাইয়া দৈন্ত ঢাকিয়া লণ্ডনের পথে পথে পদব্রজে কয়েক ক্রোশ প্রত্যহ তাঁহাকে ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে—এখনও শুধু কবিতা-পুস্তকের উপর নির্ভর করিলে অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয়। তবুও কবি অসংখ্য দেশে দেশে—কাব্যের নাই লেখাজোখা!

হা দেবি ভারতি! কি ক্ষণে দস্যু রত্নাকরের মুখে বাণী ফুটাইলে—"মা নিষাদ!" সেই রেশ এখনও যে লাগিয়া সারা দুনিয়ায়।

ঔপন্যাসিকের দরাজ হাত

মৎস্ত শিকারে রত যে, আরামে ভোজন তাহারই অদৃষ্টে

—ইহাই দুনিয়ার সনাতন রীতি। যত দুঃখ-দৈন্য শুধুই বাণী-সেবকের। লিখিলে পড়িলে দুঃখেই মরিতে হয়, কচিৎ কাহারও ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ে। মার্কিণ ঔপন্যাসিক সিন্‌ক্লেয়ার লুইস্ সৌভাগ্যশালী ক্ষুদ্র দলের একজন। ইনি এ বৎসর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। প্রাইজের মূল্য লক্ষ টাকা। এই টাকাটা সমস্তই দান করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন জনৈক দুঃস্থ সাহিত্যসেবী যুবককে। এই যুবকের আর্থিক অসচ্ছলতার অন্ত নাই। আর্থিক অনাটনের জন্য তাঁহার অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ হইতেছে না। অর্থচিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া এইবার তিনি নিজ শক্তির পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিবেন এই উদ্দেশ্যেই স্বনামধন্য লুইস মুক্তহস্ত। সেই সঙ্গে দারিদ্র্য-পীড়িত সাহিত্যিকদিগকে সাহায্যদানের প্রবৃত্তি দেশে জাগিয়া উঠে ইহাও হয়ত তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু হইবে কি? লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই ভগিনীতে যে চিরবিরোধ।

শুক্রগ্রহে অভিযান

লঙ্কার রাজা রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন। বিখ্যাত আখ্যায়িকাকার জুলস্ ভারণে হাউই সাহায্যে চন্দ্রলোকে জয়যাত্রার বর্ণনা করিয়াছেন। ঔপন্যাসিক ওয়েল্‌স্ মাধ্যাকর্ষণের গর্ব্ব-খর্ব্বকারী ধাতুর সহায়তায় কল্পনা-ঘোটকীর মুখে লাগাম কষিয়াছেন। কথা-সাহিত্যিকগণের স্বপ্নভঙ্গীতে বৈজ্ঞানিকেরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন। বিজ্ঞানবিদের গবেষণায় ঔপন্যাসিকেরা হাসিয়া আকুল হন কি না তাহা বস্তুতঃই লক্ষ্যের বিষয়।

বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সম্প্রতি নির্ণীত হইয়াছে যে প্রতি পরমাণুর ভিতরে আছে বালখিল্য বিশ্ব, অর্থাৎ এক একটি অণুকণা ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। গ্রহের চতুর্দ্দিকে যেমন উপগ্রহ ঘুরে সেইভাবে মধ্যগত গর্ভবীজ বেড়িয়া ইলেক্ট্রনের আবর্ত্তন-ক্রিয়া চলিয়া থাকে—ভূতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ইলেক্ট্রনের সংখ্যার তারতম্য ঘটে। অমিশ্র জলজন-বাষ্পীয় পরমাণুর চতুর্দ্দিকে একটি মাত্র ইলেক্ট্রন ভ্রাম্যমাণ; কিন্তু ইউরেনিয়াম সকল পরমাণু অপেক্ষা গুরুভার, এজন্য ইহার চারিদিকে আটটি সুস্পষ্ট চক্রে ৯২টি ইলেক্ট্রনের পরিভ্রমণ দৃষ্ট হয়। ধনাত্মক বৈদ্যুতিক প্রবাহে উপরোক্ত গর্ভবীজের উৎপত্তি—ইহাকে প্রোটন বলে; ইলেক্ট্রন বা বিদ্যুতিন সমূহ বিজলীর সূক্ষ্মতর কণা মাত্র। ঋণাত্মক জটিল গঠন প্রাপ্ত হইলে অণুর (molecule) উদ্ভব হয়। বৈদ্যুতিক কম্পনের দ্বারা ভবিষ্য বৈজ্ঞানিক যদি উহাদিগকে এমন ভাবে চালনা করিতে পারেন যে তাহারা একই দিকে নড়িতে থাকে তাহা হইলে সমস্ত দেহ-যন্ত্রেরও সেই প্রকারের স্পন্দন অবশ্যই হইবে। মহাকাশ বিজয়ের ইহাই গোপন রহস্য।

এইভাবে মহাকাশ জয় করিতে পারিলে নক্ষত্রলোকে গমনাগমনের বাধা-বিঘ্ন তিরোহিত হইবে—ইহাই বৈজ্ঞানিকদের স্বপ্ন। তাঁহাদের মতে বিমান বা উড়োজাহাজে যে সকল অনতিক্রমণীয় অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে এবং যেজন্য বৈমানিক দুর্ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া উঠিতেছে সেই বায়ুর সহিত পেট্রোল গ্যাসের সংঘর্ষ দূরীভূত হইবে, ভবিষ্য অভিকায় হেরিককটার সাহায্যে ঘণ্টায় ৩০০ ক্রোশ অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় আকাশ-মার্গস্থ বন্দরগুলির নিকট-সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। তখন শনি, চন্দ্র ও মঙ্গল লোক প্রভৃতি অনায়াসগম্য হইয়া উঠিবে; তবে বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, চন্দ্রলোক পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকটে, সেখানে যাইবার আমাদের কোনই প্রয়োজন হইবে না, কারণ বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব সেখানে নাই।

যন্ত্রচালিত মিডিয়ম

প্রেততত্ত্ববিদেরা নরনারীকে মধ্যস্থ করিয়া প্রেতাত্মার আবির্ভাব দেখাইয়া থাকেন, উহাকে 'মিডিয়ম' কহে। হস্ত-চালনা প্রভৃতি নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা মিডিয়মের বাহ্য চৈতন্য প্রথমতঃ অপহরণ করা হয়। সকলেই জানেন ইহাকে 'মেসমেরিজম' বলে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা 'যোগবল' আখ্যা দিতেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখরে' দুইয়েরি উল্লেখ করিয়াছেন।

সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা একার্য্যে জীবন্ত নরনারীকে বরখাস্ত করিতেছেন, যন্ত্রচালিত মিডিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন, যন্ত্রটির নাম দিয়াছেন 'ভল্টকেমাস্'। এই যন্ত্রের আকৃতি

মনুষ্যের অনুরূপ হইলেও অদ্ভুত রকমের। মাথায় ধাতুনির্ম্মিত টুপি। টুপির মধ্যস্থলে একটি বোতাম। এই বোতাম টিপিলেই মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা উহাতে ভর করে ও কথা কহিতে থাকে। প্রেতাত্মার বৈঠকে যেমন আলো নিভাইয়া দেওয়া হয়, ইহাতে তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। অন্ধকারে কি জুয়াচুরি চলিতেছে এ সম্বন্ধে লোকের মনে অবিশ্বাস চলিয়া আসিতেছিল। উজ্জ্বল আলোকে পরলোকবাসীর বাণী ভলকেনাস্ হইতে নির্গত হওয়ায় অবিশ্বাসের আর কোনই কারণ রহিল না—মিঃ সুইজার বানকোম্ (Swidzer Buncombe) সদর্পে এই কথা ঘোষণা করেন সমবেত বহুসংখ্যক নরনারীর সমক্ষে—বৈঠক বসিবার প্রারম্ভে। ৩০ টাকা দিয়া এক একখানি টিকিট কিনিয়া গত মাসের বৈঠকে প্রত্যেককে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক এক একবার বোতামটি টিপিয়া দেন, আর এক একজন স্বর্গীয় মহারথী আসিয়া জীবিতকালের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বরে বক্তৃতা করিতে থাকেন। মহামতি গ্লাডষ্টোন, লর্ড স্যালিসব্যারি, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, লর্ড ক্লাইভ, কবি ও ঔপন্যাসিক সার ওয়াল্টার স্কট সেদিন ভলকেনাস্ যন্ত্রে আবির্ভূত হন। কবিবর তাঁহার 'নারী' শীর্ষক কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

পুরুষ বা নারী মিডিয়মেরা অসত্য কথনে পটু ও চাতুরিরত বলিয়া অনেকে যে প্রেততত্ত্বের প্রতি বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসের হাসি হাসেন যন্ত্র-সাহায্যে পারলৌকিক বার্ত্তা বাহিত হওয়ায় হয়ত তাহার অবসান এইবার ঘটিল, কারণ যন্ত্রটি ফটো তোলার ক্যামেরা অথবা বাক্‌যন্ত্র গ্রামোফোণের মতই যন্ত্রমাত্র—চাতুরি প্রবঞ্চনার স্থান ইহাতে নাই। কি কি উপাদানে যন্ত্রটি প্রস্তুত, নির্ম্মাতা তাহার সঠিক সন্ধান দিতে এখনও নারাজ। ইষ্টেরিয়মের সহিত ট্রাইসিয়ম ও ও ভার্ভোনিয়ম সংস্পর্শে যে ইহা প্রস্তুত তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, তবে কি পরিমাণে কোন্‌টি আছে তাহা জানিবার উপায় নাই।

বিজ্ঞানের জয় হউক। গোপন যাহা, রহস্যাবৃত যাহা সমস্তেরি ত' প্রায় অন্তিমকাল উপস্থিত। দুঃখ-দারিদ্র্য নিবারণের স্পর্শমণির উদ্ভাবন কত দূরে?

বিজ্ঞানাগারে জীবসৃষ্টি

না পিতা না মাতা অথচ জীবের সৃষ্টি! ইহাও বিজ্ঞানের নব উদ্ভাবন। আমেরিকার ক্লিভ্‌ল্যাণ্ডে ক্লিনিক সমিতির সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ ডাঃ ক্রাইল ইহার আবিষ্কর্ত্তা। রাসায়নিক পরীক্ষাগৃহে ব্যবহৃত কাঁচের নলে (test tube) জীবন্ত প্রাণী তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সদ্যনিহত পশুর মস্তিষ্কপেশী তড়িতশক্তি বলে প্রথমতঃ ভস্মে পরিণত করিলেন। সেই ভস্ম হইতে কতকগুলি ক্ষার এবং অন্যান্য মূল উপাদানের উদ্ভব হইল; তাহাতে আরো কয়েকটি ঐরূপ উপাদান, জন্তু ও উদ্ভিদ শরীরের কয়েকটি সার পদার্থ এবং রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগ করা হইল। সমুদয় পদার্থ তাহার পর বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার বলে বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর সম্মুখে অপূর্ব্ব দৃশ্য উপস্থিত করিল। সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেলেন। নলের ভিতর সত্যই ত' একটি জীবন্ত কোষ—কোষ-বিভক্তি হেতু প্রজননশক্তিবিশিষ্টও বটে, খাদ্যের সারাংশ ভোজনে উহা পুষ্টি লাভ করিতেছে, সুস্পষ্ট দেখা গেল। মাদক-বিশেষের সংস্পর্শে আসিলে নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং পরে আবার সজীবতা লাভ করে, ইহাও লক্ষিত হইল। বলা বাহুল্য যে, কোন জীবন্ত প্রাণীর পূর্ব্বোক্ত মিশ্রিত উপাদানের ভিতর প্রবেশের উপায় ছিল না।

কে হারে জিতে!

দেবতারা নাকি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাদেরও কিন্তু অবিদিত দুটি তথ্য। প্রাচীন প্রবচনের ভাষায়—পুরুষের ভাগ্য ও নারীর চরিত্র। দেবতারা যেখানে হারি মানেন মানুষ আমরা তাহার কি কিনারা করিব? পঞ্চাশ টাকা বেতনের কেরাণী মৃত্যুকালে সত্তর কোটি টাকা রাখিয়া গিয়াছেন. সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কি? মার্কিণ ধনকুবের হেন্‌রি ফিপ্‌সের ভাগ্যে প্রকৃতই তাহা ঘটিয়াছে।

নিউইয়র্কের এই ভাগ্যবান পুরুষ প্রথম জীবনে সাপ্তাহিক এক পাউণ্ড বেতনে কেরাণীগিরিতে ভর্ত্তি হন। স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়িল তাঁহার শিরে—ইস্পাতের কারবারে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে প্রতি মিনিটে তাঁহার আয় দাঁড়ায় সাড়ে সাত শত টাকা।

পৃথিবীতে ফিপ্‌সের জোড়া নাই। কোন একই ব্যক্তিকে এত অগাধ ধন রাখিয়া যাইতে মাতা বসুমতী এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। এণ্ড্রু কার্ণেগী অবশ্য আরো বড় ধনী ছিলেন, এক সময় ১৩০ কোটি টাকার মালিক হন, কিন্তু তাঁহার দান খয়রাত ছিল অসাধারণ, কাজেই মৃত্যুকালে তিনি কয়েক কোটি মাত্র ছাড়িয়া যান। ভেণ্ডারবিল্ট রাখিয়া যান বায়ান্ন কোটি; ফিপ্‌স তাঁহাকেও পিছনে ফেলিয়া যম জিনিতে গেলেন।

মার্জ্জার-রাজ

কুসংস্কারের দৌড় কতদূর, নিম্নের কাহিনী তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। 'বিড়ালের গল্প' নামে ইংরাজি গল্প-পুস্তক হইতে এটি গৃহীত; গ্রন্থখানি এই মাসেই প্রকাশিত।

বোম্বাই প্রদেশের লাটসাহেব সার রবার্ট গ্রাণ্ট পুনা সহরের লাটপ্রাসাদে লোকান্তর গমন করেন। তিনি সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া বিশিষ্ট কতকগুলি পথ বাহিয়া সন্ধ্যার পর পরিভ্রমণ করিতেন। প্রহরীরা দেখিল যে, সাহেবের মৃত্যুর পর একটা বিড়াল তেমনই করিয়া সদর দিয়া বাহির হইয়া সেই সেই অলি-গলির পথ বাহিয়া চলিয়া গেল। উহারা তখন তাহাদের গুরু-পুরোহিতের ব্যাখ্যা শুনিতে গেল। তিনি মাথা নাড়িয়া টিকি দুলাইয়া গুরুগম্ভীরভাবে বুঝাইলেন যে, সাহেবের প্রেতাত্মা প্রাসাদের কোন প্রিয় মার্জ্জারের স্কন্ধে ভর করিয়াছে। কিন্তু কোন্ বিড়ালটির এই সৌভাগ্য ঘটিল প্রহরীরা তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না, অগত্যা বাড়ীর প্রত্যেক বিড়ালকে লাট-সম্মান দেখাইত—অস্ত্র নামাইয়া ও কুর্ণিশ করিয়া, অবশ্য যখনই কোন বিড়াল সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহিরে যাইত। ২৫ বৎসর কাল একাদিক্রমে এই রঙ্গ চলিয়া আসিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে জঙ্গী লাট হোয়াইটের কথা। বীর-চূড়ামণি বলিয়া তাঁহার প্রভূত খ্যাতি ছিল; নানা তুমুল সংগ্রামে শৌর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, অথচ বিড়াল দেখিলেই ইনি ত্রাসে অধীর হইতেন। সুতরাং মানসিক দৌর্ব্বল্য অশিক্ষিত প্রহরীদেরই একচেটীয়া নয়।

নরবলির কাহিনী

কুসংস্কার হইতে কত কুপ্রথা যে ধরণীকে কলঙ্কিত করিয়াছে, কে বলিবে? নর-শোণিতে জগজ্জননী কালিকা দেবী পরিতুষ্টা—এই ধারণায় কাপালিকেরা ও ডাকাইতেরা বাঙ্গালায় কত নরহত্যা করিয়াছে, তাহা কে গণিবে? উড়িষ্যার খোন্দজাতিও এ বিষয়ে সমান অপরাধী। সম্প্রতি পাটনা সহরে ঐতিহাসিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত কালিপদ মিত্র এ সম্বন্ধে লোমহর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

খোন্দেরা পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে বালক বলি দিত; উহার নাম মেড়িয়া। উদ্দেশ্য বালকের রক্তে বসুমতী তুষ্টা হইয়া শস্যাদির প্রচুর ফলনের সহায়তা করিবেন এবং রোগপীড়া ও দৈবদুর্ঘটনা হইতে অব্যাহতি দিবেন। মেড়িয়া জনকজননীর সন্তান না হইলে দেবী গ্রহণ করিবেন না এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। সুতরাং বলির বালক মেড়িয়াদের ভিতর হইতে খরিদ বা অপহরণ করা হইত, চা-বাগানে কুলি চালান দেওয়ার জন্য যেমন একদল চামুণ্ডার উদ্ভব হইয়াছে, উড়িষ্যায় সেইরূপ একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। শিশুকে ভুলাইয়া বা চুরি করিয়া গোপনে খোন্দদিগকে বিক্রয় করাই ইহাদের কর্ম্ম-পদ্ধতি ছিল।

এই অসহায় শিশু দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, এইরূপ ধারণা চলিত ছিল। সুতরাং তাহার প্রতি যথেষ্ট যত্ন ও ভালবাসা দেখান হইত। ভক্তিভরে সকলে প্রণামও করিত। দশ হইতে ষোলো বৎসর বয়সের মধ্যে একদিন ঢাক ঢোল পিটিয়া, পূজা অর্চ্চনা করিয়া বলিদান করা হইত। বলিদানের পর শব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করা হইত। যে শস্যক্ষেত্রে উহার সামান্য একটু টুকরাও পড়িবে তাহাতে প্রচুর ফসল হইবে এই ধারণায় একটু টুকরা পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। এ কার্য্যে কোন পাপ নাই, ইহাই খোন্দদিগের বিশ্বাস ছিল। অনেকেই বলির বালককে দেবতা মনে করিয়া পূজা করিত। 'ধনং দেহি,' 'রূপং দেহি' বলিয়া প্রার্থনা না করিলেও লোকে দৃঢ় বিশ্বাস করিত যে, বালকরূপী এই দেবতাই

তাহাদিগকে সুশস্য, সুস্বাস্থ্য, সুবৃষ্টি প্রভৃতি দান করিতে একমাত্র সমর্থ এবং ইহার রক্ত ব্যতীত হরিদ্রার বর্ণ ঘোর লাল কিছুতেই হইতে পারে না।

একশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উক্ত কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮৪০ সালে ইংরাজ সরকার এই কুনীতি দমনের চেষ্টা করেন। নানা খোন্দ সর্দ্দার ও রাজা প্রভৃতিকে শাল, কিংখাব ও নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্র উপঢৌকন দিয়া এই কুরীতির উচ্ছেদসাধনের সূত্রপাত করা হয়। ক্রমশঃ নরপিশাচদিগের হস্ত হইতে বহুসংখ্যক বালকের উদ্ধার হইতে থাকে। কটকের পাদ্রী সাটন সাহেব উহাদের ভার গ্রহণ করিতে থাকেন। প্রত্যেক বালকের জন্য সরকারী তহবিল হইতে তিন টাকা করিয়া মাসিক ব্যয়ের বরাদ্দ হয়। সৈন্য-সামন্ত লইয়াও অনেক স্থল হইতে অসহায় মেড়িয়া বালকগণের উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। এই ভীষণ প্রথা সমূলে উৎপাটন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। সরকারী কাগজ-পত্র হইতে সমুদয় বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

নব-পর্য্যায়ে নিরো

আগুন লাগিয়া রাজধানী রোম পুড়িয়া ছাই হইতেছে, ত্রাসে আতঙ্কে নগরবাসী নরনারী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটাছুটি করিতেছে, নৃপতি নিরো অগ্নিশিখার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাসাদের উচ্চতম ছাদে উঠিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন; অর্থাৎ কারও সর্ব্বনাশ কারও বা পৌষমাস!—বহুকাল হইতে এই কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে 'রোমনগরীর দাহনকালে নিরোর বংশীধ্বনি'—প্রবাদবাক্যে পরিণত।

বস্তুতঃ কি সম্রাট এতই হৃদয়হীন ছিলেন? মিঃ আর্থার উইগল্ গ্রন্থ রচনা করিয়া নানা যুক্তিপ্রমাণ দেখাইয়া বলিতেছেন—কখনই নয়, বৃদ্ধ দয়ার্দ্রচিত্ত নৃপতির নামে যুগযুগান্তর ধরিয়া অকারণ কুখ্যাতি রটনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার নিরোর অপবাদ খালন করিতে গিয়া বলিতেছেন—সেকালে রীতি ছিল যে, কেহ পরলোকগমন করিলে ভাড়াটিয়া লোক ধরিয়া ক্রন্দন করান হইত, বৈতালিকের মুখে শোক-সূচক ছড়া কাটান হইত। নগরের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া সম্রাট উক্ত প্রথানুযায়ী বংশীধ্বনি করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছিলেন মাত্র, উল্লাসের উচ্ছ্বাস তাহা আদৌ নয়।—বিচিত্র কি? এমন কলঙ্কের ডালি অনেককেই মাথায় লইতে হয়। বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেন এমনই করিয়া কাপুরুষাধম বলিয়া চিত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ প্রয়োগে এই দুর্নাম ঘুচাইয়াছেন।

ট্রয়ধ্বংসের সহিত তুলনা করিয়া রাজা যে বিনাইয়া বিনাইয়া শোক প্রকাশ করিতেছিলেন, ইহা দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 'তষ্টিদার' প্রভৃতি দ্বারা মৃত ব্যক্তির বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে দিবারাত্রি গুণকীর্ত্তন আমাদের এই বাঙলায় এখনও প্রচলিত আছে। মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের মধ্যে মাসাধিক কাল রোদনের জন্য রোদনকারিণী ভাড়া করার প্রথাও চলিতেছে। সুতরাং গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত অকাট্য যুক্তিপূর্ণ না হইলেও সারবান নয় ইহাও বলা চলে না।

দুই হাজার বৎসরের রোমক মুদ্রা

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে নানা দিক দিয়া। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে ভারতীয়ের সহিত রোমানদিগের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল তাহার পর্য্যাপ্ত নিদর্শন সম্প্রতি মিলিয়াছে।

ভেল্লালোর কইমবাতুর হইতে মাত্র ৩ ক্রোশ দূরে। গ্রামের প্রান্তভাগে খেলা করিতে করিতে এক মান্দ্রাজী বালক এক হাত একটা গর্ত্ত খুড়ে। গর্ত্তের ভিতর মৃণ্ময়পাত্র দেখিতে পায়—ঐ পাত্রে ১২০টিরও অধিক রৌপ্য মুদ্রা। পরীক্ষান্তে স্থির হইয়াছে যে উহা রোমক মুদ্রা—দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইতালীতে প্রচলিত ছিল। এই গ্রামে বহুবার রোমক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তারের ইহা সুপরিস্ফুট পরোক্ষ প্রমাণ। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-রথী ৺অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধে যথোচিত উল্লেখ আছে। অক্ষয়কুমারের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রজনীনাথ দত্ত এই প্রবন্ধ "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার" নামে পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। কৌতূহলী পাঠকগণ এই পুস্তকে অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত দেখিতে পাইবেন।

বিশ্বামিত্র

পৃথক ফল

শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল্

প্রথম পর্ব্ব

উকিল, অ্যাটর্নি ও গভর্মেণ্ট আফিসের কেরাণী, এই তিন বিভিন্ন শ্রেণীর বন্ধু মিলিয়া আমরা একত্রে যাত্রা করায় হাতে হাতে ত্র্যহস্পর্শের ফল ফলিল।

ব্যাপারটা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক।

দুর্গা পূজার মহাষ্টমীর দিন সকাল বেলা ঠিক্ হইল যে, আজ আর বাড়ীতে বসিয়া না থাকিয়া কলিকাতার বাহিরে কিন্তু অনতিদূরে কোন পূজার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া যাক্। কিন্তু যাওয়া যায় কোথায়! সকলেরই বন্ধুবর হরেন্দ্র বাবুর নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়িল। বন্ধুবরের বাসস্থান খন্যান, কলিকাতা হইতে বেশী দূরে নয় এবং তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা একটা কর্ত্তব্যের মধ্যেই বোধ হইল; সুতরাং, একটু ভ্রমণজনিত সুখলাভ ও বন্ধুবাৎসল্যের রসাস্বাদন এবং তৎসঙ্গে মহাষ্টমীতে পূজাসন্দর্শনের আগ্রহ আমাদের সংকল্পকে তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিতে কাল বিলম্ব করিল না। হরেন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণ লিপিতে হাবড়া হইতে খন্যান্ যাতায়াতের সুবিধামত ট্রেনের সময় নির্দ্দেশ করা ছিল। স্থির হইল, সকাল ৯টা কয়েক মিনিটের ট্রেনে রওয়ানা হইয়া যথাকালে তথায় পৌছান যাইবে এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতাবাসী ট্রেনে প্রত্যাবর্ত্তন ম্যালেরিয়ার কথা স্মরণ করিয়া অসমীচীন হইবে না। সময় অল্প ছিল, তাড়াতাড়ি গোচ্‌গাচ্ করিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। একখানি জরুরি চিঠি লিখিতে গিয়া আমার স্নান আর হইল না, বন্ধুদ্বয় স্নান সারিয়া লইয়াছিলেন।

পথের ভিড়ে মাঝে মাঝে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ষ্টেসনে পৌছিতে একটু বিলম্ব ঘটিল। ফলে আমাদের অভীষ্ট ট্রেন আমাদের পঁহুছিবার সঙ্গে সঙ্গেই সবিদ্রূপ মৃদুমন্থর গতিতে প্ল্যাট্‌ফর্ম্ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

ষ্টেসনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিভৃত একটি স্থানে বসিয়া আমরা তিনবন্ধু আশাভঙ্গজনিত বৈরাগ্যের সহিত ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বাদানুবাদ ও কল্পনাজল্পনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কখন কখন দুঃখের মধ্যে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। অপ্রত্যাশিত বিপর্য্যয়—শারীরিক কষ্ট অথবা মানসিক দুঃখের কারণ হইলেও—সময়ে সময়ে মানুষের মনে কৌতুক উৎপাদন করে। পিছলে হঠাৎ পড়িয়া যাওয়া, ভুল ট্রেনে উঠিয়া অনভিপ্রেত স্থানে উপস্থিত হওয়া প্রভৃতি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল অসঙ্গতির কারণ নির্ণয়ের ভার মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের উপর দিয়া আমাদের কথাই বলি।

নানারূপ গবেষণা ও আলোচনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল যে, বাড়ী আর ফেরা হইবে না, তবে খন্যান্ যাওয়াও সম্ভবপর নহে, কেননা পরবর্ত্তী ট্রেন ২টা কয়েক মিনিটে। অনেক তর্কবিতর্কের ফলে শ্রীরামপুর আমাদের গন্তব্যস্থান নির্দ্ধারিত হইল। কিহেতু এতস্থান থাকিতে শ্রীরামপুর নির্ব্বাচন করা হইল, তাহা জানিবার অধিকার পাঠক পাঠিকার নিশ্চয়ই আছে এবং আমিও সে অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিনা।

আমাদের কেরাণীবন্ধুর আফিসের সহকর্ম্মী ও সুহৃদ পঞ্চাননবাবুর কথা সহসা মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার নিবাস শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাতরায়। তাঁহার বাড়ীতে পূজা, সেও এক অভিনব ব্যাপার। গ্রামের কয়েকটি দুষ্ট ছেলে প্রতিমা ফেলিয়া গিয়াছে, সুতরাং পূজা করা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর

নাই। আমার মনে একটু খট্‌কা লাগিল। পঞ্চাননবাবু ত' আমার পরিচিত নহেন, তাঁহার বাড়ীতে পূজার দিনে গিয়া উঠিব এটা যেন ঠিক্ সঙ্গত বোধ হইতেছিল না। তবে শীঘ্রই ইহার সমাধা হইয়া গেল, আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। শ্রীরামপুরের গোস্বামী বাড়ী হইতে প্রতিবৎসর নিয়মিত পূজার নিমন্ত্রণ হয়, এবারও হইয়াছিল। ভাবিলাম কোনবার নিমন্ত্রণ রক্ষা হয় না, এই সুযোগে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলে হানি কি? আমাদের এটর্নিবন্ধু এ সম্বন্ধে উদার। তিনি 'সবান্ধবে' সর্ব্বত্র যাইতে সম্মত।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামপুর যাইবার একখানি ট্রেন পাওয়া গেল। গাড়ীতে উঠিয়া আমার মনের কথা বন্ধুদ্বয়কে ব্যক্ত করিলাম। তাঁহারা একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও অবশেষে আমার মতে সায় দিলেন। ট্রেন আন্দাজ বারটার সময় শ্রীরামপুর ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেসনের পশ্চাৎদিকের পথে পড়িতেই R. M. S. রেলওয়ে মেল সার্ভিসের একটি ছোট ঘরে অ্যাটর্নি বন্ধু আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ইত্যবসরে তিনি পঞ্চাননবাবুর বাড়ী দেখিয়া আসিবেন, তাহা পর যাহা কর্ত্তব্য করিবেন। মোটের উপর তিনি কি গোস্বামী মহাশয়, কি পঞ্চানন বাবু, কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন না। কাজকাজেই আমি রেলওয়ে মেল সার্ভিসের একটি ছোট ঘরে টুলের উপর বসিলাম এবং বন্ধুদ্বয় চাতরা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তৃতীয় পর্ব্ব

অগত্যা আমি R. M. S. বাবুর সহিত গল্প জুড়িয়া দিলাম। এই পূজার দিনেও রেহাই নাই, দাসত্বের অপরিসীম বিড়ম্বনা ইত্যাদি নানারূপ দুঃখের কথা তিনি পাড়িলেন। অজ্ঞাতসারে মাইকেলের সেই প্রসিদ্ধ কবিতাংশ আমার মনে উদয় হইল।

"বরিষার কালে সখি, প্লাবন পীড়নে
কাতর, প্রবাহ ঢালে তীর অতিক্রমি
বারিরাশি দুইপাশে, তেমতি যেমন
দুঃখিত দুঃখের কথা কহে সে অপরে।"

এটা চিরন্তন সত্য যে, দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতে না পারিলে দুঃখ অসহনীয় হইয়া উঠে। কাহাকেও বলিতে পারিলে বর্ষণলঘু মেঘের মত প্রাণটা হাল্কা হইয়া যায়। ভদ্রলোকটির দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যথার্থই ব্যথিত হইতেছিলাম, কিন্তু এদিকেও প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে অথচ বন্ধুদ্বয়ের দেখা নাই। শরতের প্রখর রৌদ্রকিরণ আমার অস্নাত দেহকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। আমি ভদ্রলোকটির নিকট বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পর্ব্ব

প্রথম চিন্তা হইল, স্নান করিতে হইবে, কিন্তু করি কোথায়? একটু পথ অতিক্রম করিয়া একটি বাড়ী নজরে পড়িল। বাড়ীর বহির্ভাগে একতলায় একটি ঘর, ভিতর দিকে দোতালা। মধ্যে প্রশস্ত উঠান। উঠানের এক প্রান্তে একটি মাত্র দরজা, দরজার পার্শ্ব দিয়া একটি উচ্চ প্রাচীর বাহির মহলকে অন্দরমহল হইতে পৃথক করিয়াছে। সেই প্রাচীরের বাহির দিকে অপরপ্রান্তে একটি চৌবাচ্চা-জল কানায় কানায় পূর্ণ, এবং তৎসংলগ্ন ঝাঁঝরিওয়ালা একটি কলের জলের পাইপ লম্ববান রহিয়াছে। বুভুক্ষু ব্যক্তির সম্মুখে সুখাদ্য পড়িলে সে যেমন নির্ব্বিচারে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, আমারও সেইরূপ দশা ঘটিল।

ঐরূপ পরিপূর্ণ জল দেখিয়া আমি স্নানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া অসঙ্কোচে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি সম্মুখে একটি প্রিয়দর্শন যুবক। পরিচয়ে জানিলাম তাহারা জাতিতে কামার। তখন আমার অবস্থা তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইলাম এবং বুঝিলাম সে আমার দুঃখ বুঝিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ অন্দরে প্রবেশ করিল, এবং একটি তেলের বাটী হাতে লইয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিল অধিকন্তু সঙ্গে আসিলেন তাহার বৃদ্ধা পিতামহী, হাতে একখানি নূতন ধুতি ও গামছা।

বৃদ্ধা মহিলাটি ভক্তিভরে আমাকে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া ও পদধূলি লইয়া বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ মহাষ্টমীর দিনে একজন ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা

এখানে পড়িল। এ কাপড় ও গামছা নূতন, অন্যের ব্যবহৃত নহে; এইরূপ প্রয়োজনের জন্য আমি রাখিয়া থাকি। আপনি তেল মাখিয়া তৃপ্তির সহিত স্নান করুন।"

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে একতলার ভিতরকার রকে বসিয়া দিব্য করিয়া তেল মাখিয়া ঝাঁঝরি খুলিয়া বিশেষ তৃপ্তির সহিত স্নান সমাপন করিলাম। স্নানান্তে আমার পরিধেয় ছাড়া কাপড় পরিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া একেবারে চমৎকৃত হইলাম। দেখি, সম্মুখে একখানি সুন্দর কারপেটের আসনপাতা, জল দিয়া খাবারের স্থানটি মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত এবং তথায় নূতন থালায় নানাবিধ মিষ্টান্ন ও নানাবিধ সুরসাল ফল। একটি শ্বেত পাথরের বাটীতে সরবৎ, একটি নূতন গ্লাসে কর্পূরসুবাসিত সুশীতল পানীয় এবং একটি পানের ডিবায় এক ডিবা পান। যুবকটি আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। কিছু বলিবার অপেক্ষা ছিল না, ক্ষুধারও বেশ প্রাবল্য হইয়াছিল। আমি আসনে বসিয়া পানীয় ও আহার্য্যের সদ্ব্যবহার করিলাম। তাহার পর, পান চিবাইতে চিবাইতে খাটের উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় সম্মুখের জানালা দিয়া পথের দিকে বন্ধুদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম এবং সেই যুবকটির সহিত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। স্নান ও জলযোগে শরীর ও মন উভয়ই তখন স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সেই মহিলাটিকে আর একবারও দেখিতে পাইলাম না। তিনি অন্তরালে থাকিয়া আমার সর্ব্ববিধ আরামের ব্যবস্থা করিয়াই তৃপ্ত, ধন্যবাদ লইবার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর দিবার কোনরূপ স্পৃহা তাঁহার নাই,—এ যেন তাঁহার একটা কর্ত্তব্য কার্য্য, না করাই প্রত্যবায়। ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া আমার যেরূপ বিশেষ সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল, আমি তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র কিনা সে সম্বন্ধে মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়া আপনাকে অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই সুমিষ্ট আতিথেয়তা ভারতীয় সেবাধর্ম্মের প্রতীক। কোন দেশে ইহার তুলনা নাই। আমি মনে মনে শ্রদ্ধাভরে মহিলাটির প্রতি মস্তক অবনত করিলাম।

পঞ্চম পর্ব্ব

অর্দ্ধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়াও যখন বন্ধুদের দর্শন মিলিল না, তখন যুবকটির নিকট বিদায় লইয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া গোস্বামী বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে বসিয়া একটি চিন্তা মনকে অধিকার করিল। গোস্বামী বাড়ীর যাহারা আমার পরিচিত তাঁহারা ত এখন লোকান্তরে, ছেলে ছোকরারা আমাকে জানে না, এক রাধিকা বাবু চেনেন; তিনি যদি না থাকেন তাহা হইলে কি উপায়?

সহসা মনে হইল সব উপায়ই ত আজ আমি নিজে করিতেছি! অলক্ষ্যে অবস্থান করিয়া যে অদৃষ্ট ব্যক্তি উপায়হীনের সকল উপায় করিতেছেন, মনে মনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, হে রুদ্র, সন্ধ্যাকালে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে পৌছিয়া তোমাকে একেবারে বেশী করিয়া ধন্যবাদ দিব। অতএব সে পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া আমার উপর তোমার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাক। মুখে মৃদু গুঞ্জনে গান আসিল, দোষ কারো নয় গো মা! আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। অবচেতন মনে বন্ধুদের কথা স্মরণ করিয়াই বোধহয় এ গানের আবির্ভাব।

গাড়ী গোস্বামী বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দরওয়ান সেলাম করিয়া ভিতরের দিকে লইয়া চলিল, এবং গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিল। আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দরওয়ান যখন জানাইল যে, রাধিকা বাবু আছেন, তখন মুখে গুণগুণ করিয়া গান আসিল, দোষ কারো নয় গো মা ইত্যাদি।

গৌরকান্তি, সুদর্শন, সুস্মিতানন রাধিকা বাবুর দর্শন মিলিল দোতালার বারান্দায়। তিনি অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে, আরে, শ্যামচাঁদ যে! সহসা তোমার প্রকাশ বড় আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার!" আমি উত্তরে বলিলাম, "বছরের পর বছর নিমন্ত্রণ করেন, অথচ একবারও নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হয় না, এবার ভাবিলাম নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব,—তাই সহসা আগমন।" তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বেশ! বেশ!" আসল কথা তাঁহাকে ভাঙ্গিলাম না এবং আসল কথা জানান এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক বোধ করিলাম।

রাধিকা বাবু তখন উপরের একটি ঘরে আমার খাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পৌত্রের উপর ভার দিয়া নীচে লোকজন খাওয়ান পর্য্যবেক্ষণ করিতে চলিয়া গেলেন। উপরে উঠিবার সময় দেখিয়াছিলাম তাঁহাদের নিম্নের সুপ্রশস্ত অঙ্গনে কাতারে কাতারে লোক বসিয়া গিয়াছে—বৃদ্ধ, যুবা, বালক বালিকা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, অন্যান্য জাতি কেহই বাদ পড়ে নাই। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ উপাদেয় রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্যের ত্রুটী ছিল না এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

আহারান্তে আচমনের পর বালকটি আবাকে একটি প্রশস্ত দালানে লইয়া গেল। সেখানে মেজেতে মল্লিকাফুলের মত শুভ্র ফরাসে ছোট বড় নানাবিধ তাকিয়া পড়িয়া আছে। আমাকে সেখানে বিশ্রামার্থে রাখিয়া সে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর নিদ্রাকর্ষণ হইল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি, তখনও একটি ভৃত্য ব্যজন করিতেছে। হস্তমুখ প্রক্ষালনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে জলঘর দেখাইয়া দিল এবং তাহার পর ফিরিয়া সুস্নিগ্ধ ডাবের জল ও সরবত পান করিবার সময় রাধিকা বাবু আসিলেন এবং নানারূপ গল্প করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। রাধিকা বাবু Time table দেখিয়া ফিরিবার ট্রেনের সময় বলিয়া দিলেন। আমি দেবীকে প্রণাম করিয়া রাধিকাবাবুর নিকট বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ফিরিবার ট্রেনেও বন্ধুদের সাক্ষাৎ পাইলাম না, তাঁহারা আমার পরে ফিরিয়াছিলেন। পরদিন আমি তাঁহাদের কাহিনী শুনিয়াছিলাম। বন্ধুদ্বয় যা-ই বলুন না কেন, অদৃষ্ট পুরুষ সেদিন যে আমাদের এক যাত্রায় পৃথক ফলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়

আশা

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

না-দেখা প্রিয়া
না-শোনা বাণী
না-পাওয়া ভালোবাসা;
তা'দেরি লাগি
এ-মোর হিয়া
ভরিয়া রাখে আশা।
সে যবে ওগো আসিবে মোর ঘরে,
বসিতে দিব রতন-বেদী 'পরে;
নয়ন হ'তে বুঝিয়া ল'ব গোপনতম ভাষা!

বলিব তা'রে হে মোর রাণী,
হে মোর মহারাণী,
তোমারে জানি, তোমারে জানি,
তোমারে আমি জানি।
তোমারে চিনি অনাদিকাল হ'তে,
কাটে যে দিন শুধু না-পাওয়া ব্রতে,
আজিকে তা'র করোগো শেষ
লহগো কাছে টানি'।
হে মোর মহারাণী!

জাপানের কথা-শিল্পী ও কথা-সাহিত্য

শ্রীজগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বিশ্বের নরনারীর জীবন-কথার মালা গাঁথা যাঁদের বেসাতি বিশ্বজনের হাটে কথা-শিল্পী বলে' তাঁরা পরিচিত। সাধারণ মানুষের যেমন দুটী মাত্র চোখ তেমনি এঁদেরও বাহ্যত দুটোই চোখ। তবুও এঁদের অন্তরলোকের নিগূঢ়তম স্থানে এমন একটা নেত্র বিদ্যমান, যা নিরীক্ষণ করে এমন সব বস্তু সাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচরের বহুদূরে যা অবস্থিত থাকে। বর্ত্তমানের গণ্ডীতেই এঁদের সূক্ষ্মতম অন্তর্দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে না—অনাগত দিনের ভবিষ্য নর-নারীর আশা-উজ্জ্বল কল্পনার আলো এঁদের নেত্রপটে প্রথম বিভাসিত হয়। মানব-মানবীর জীবনের হাসিকান্নার গানই হচ্ছে এঁদের বীণা-তন্ত্রের একমাত্র সুর; তাই এঁরা মানুষের মর্ম্মস্থলে এতখানি প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকেন। সাধারণের কাছে এঁরা প্রণম্য, যে-হেতু এঁদের কণ্ঠে মানুষ শোনে তার জীবন-বেদের সামগান—অনাগত ভবিষ্যের অরুণোদয়ের জয়গান উত্থিত হয় এঁদেরই মর্ম্ম-বীণায়।

অন্যান্য দেশের কথা যাক্। আমরা এখন জাপানের কথাশিল্পীগণের একটু পরিচয় দেব—যে জাপান নবজাগ্রত প্রাচ্যে সর্ব্বপ্রথম যৌবনের রাজটীকায় বিভূষিত হ'বার বিপুল গৌরবের অধিকারী। রাষ্ট্রে জাপানের প্রতাপ, বিজ্ঞানে তা'র প্রভাব, বাণিজ্যে তা'র প্রতিপত্তি আজ সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু মানব-সভ্যতার আর একটা প্রধান সম্ভার সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে নব্য জাপানের প্রচেষ্টা কোন্ পথ অবলম্বন করে' কতখানি অগ্রসর হ'য়েছে সে-বিষয় অবগত হ'বার জন্য মনে যে স্বাভাবিক কৌতূহলের উদ্রেক হয় তা'র অল্প-বিস্তর পরিতৃপ্তিসাধন এই সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

গদ্য-সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ হ'ল কথা-সাহিত্য। সুতরাং কথা-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে জাপানের মোটামুটি সাহিত্য সাধনার একটুকু বিবৃতি দেওয়া দরকার।

২

জাপানের গদ্য-সাহিত্যে গল্প-লেখার প্রথম রেওয়াজ উঠল দশম শতাব্দীতে। এই সম্পর্কে একটা বেশ মজার কাহিনী আছে। জাপানে তখন প্রবল সংগ্রাম চলেছে—বাইরের কোন জাতির সঙ্গে নয়, আপনার ঘরেই ভিন্ন ভিন্ন সামন্ত সর্দারগণের মধ্যে। আত্মকলহ ছাড়া এ-কে আর কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। পুরুষেরা তাই তখন রণক্ষেত্রে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে মেতে গেছে, ঘরের লক্ষ্মীর অর্চ্চনার মনোনিবেশ করবার অবসর তাদের নেই—বীণাপাণির আরাধনাতেও না। একটা জাতির পক্ষে এ চরম দুর্দ্দশার দিন বৈ আর কী? কিন্তু জাপানের ভাগ্যলক্ষ্মী নীলাম্বু-পরিবেষ্টিত প্রাচ্যভূখণ্ডের ঐ ছোট্ট উপদ্বীপটুকুর প্রতি একেবারে অপ্রসন্ন ছিলেন না। বাণীর দেউল সেখানে একেবারে অন্ধকারে নিমগ্ন থাকবে জাপানের ভাগ্যলক্ষ্মীর তা' ইচ্ছা নয়। পুরুষের অভাবে জাপানের পুরনারীগণ দলে দলে বাণীর দেউলে দীপ জ্বালাবার মঙ্গল-ব্রত গ্রহণ করে' জন্মভূমিকে এই দুর্দ্দশার অমানিশা হ'তে মুক্ত করলেন। জগতের ইতিহাসে সাহিত্য ও জ্ঞান রাজ্যে এমন ভাবে পথ-প্রদর্শক হ'বার অক্ষয় গৌরবের অধিকারী হ'তে আর কোন দেশের নারী-সমাজকে দেখা যায়নি। এ-দিক থেকে জাপানের মহিলাকুলের কীর্ত্তি সত্যই অতুলনীয়।

কঠিন বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায় জাপানের নারীসমাজ জাতীয় সাহিত্য-সাধনায় অগ্রণী হ'লেন। জাপানের তৎকালীন সম্রাজ্ঞী গেম্মিয়ো (Gemmyo) ৭১২ খৃষ্টাব্দে বিরচিত "কোজিকি" নামক সুপ্রাচীন পুরাতত্ত্ব-লিপির অনুলিখনের ব্যবস্থা করলেন। তার কয়েক বছর পরে অপর এক

সম্রাজ্ঞীর তত্ত্বাবধানে "নিহোন্‌জী" (Nihongi) নামক সুপ্রসিদ্ধ পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হ'ল। এই পুরাবৃত্তের এবং সে-সময়কার বহুবিধ সাহিত্যের লিখন-ভঙ্গীতে ও অন্তর্নিহিত ভাবধারার মধ্যে প্রাচীন চৈনিক শাস্ত্রের ও চৈনিক সভ্যতার অনেকখানি ছাপ পড়েছিল।

৩

জাপানে কথা-সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হ'ল একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এর মহিমান্বিতা রচয়িত্রী ছিলেন শ্রীমতী মুরসকি নো শিখিবু (Murasaki No Sikhibu) নামে রাজসভার এক বিদুষী মহিলা। জাপানের সাহিত্য-ভারতীর দেউলের ব্রতচারিণীগণের মধ্যে এঁর নাম অমর হ'য়ে থাকবে; কারণ ইনিই হ'লেন সে-দেশের কথাসাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক। এঁর রচিত জাপানের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাসখানির নাম—"গেন্‌জি-মোনোগোতরি" (Genji Monogotori) অর্থাৎ গেন্‌জির উপাখ্যান। এখানি একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস। আধুনিকযুগের পাঠকপাঠিকার কাছে এখানি স্থানে স্থানে হয়ত একঘেঁয়ে ঠেক্‌তে পারে, তবুও এই গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকর্ত্রীর শক্তিমণ্ডিত লেখনীর প্রভাবে জাপানের তদানীন্তন নরনারীর জীবন-ধারা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে; সে-জন্য এর বিষয়-বস্তুর মর্য্যাদা অনেকখানি। পরবর্ত্তীযুগের কথাশিল্পীগণের মধ্যে জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক্ "গেন্‌জি মোনোগোতরি" সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১০০৪ খৃঃঅব্দে প্রণীত এই গ্রন্থটী হচ্ছে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম কথা-সাহিত্য—বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এই দিক থেকে এর নাম স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

মুরসকি নো শিখিবুর পরেই ঐ সময়কার সি-ই সোনাগোন্ (Sei Sonagon) নামে আর একজন সাহিত্য-সেবিকার রচিত "মকুরো নো সোশী" (Pillow Sketches), "যে-সব বস্তুকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি", এবং "যা আমি সব চেয়ে ঘৃণা করি" প্রভৃতি ব্যঙ্গকাহিনীর মধ্যে জাপানের তদানীন্তন নরনারীর, বিশেষ করে' অভিজাত মণ্ডলীর ও রাজন্যবর্গের, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গোপনীয় রহস্য অতি সরস ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই রকম আরও বহুবিধ রচনা ও উপন্যাস প্রকাশের মধ্য দিয়ে জাপ-সাহিত্যের "ক্লাসিক" যুগের অবসান হ'ল। এর পর কিছুদিন যাবৎ সে-দেশে উপন্যাস রচনা অবহেলিত হয়ে আসছিল বললেই চলে।

৪

ক্লাসিক যুগের পর "টকুগওয়া যুগ" (১৬০৩—১৮৬৭) জাপসাহিত্যের ইতিহাসে আর একটি নব অধ্যায় সূচিত করলে। টকুগওয়া যুগের (Toku Gawa Era) প্রথম ভাগে জাপ-সাহিত্যে কয়েটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রথমতঃ, এ যুগে নাট্য-সাহিত্য অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং সাহিত্যের অপরাপর বিভাগে নাট্য-সাহিত্যের এই নব প্রবর্ত্তন যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল। আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে যে, এই সময় জাপানের শিক্ষিত সমাজের অন্তরে মানসিক জ্ঞানের এবং চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধনের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। এই জ্ঞানপিপাসার প্রেরণায় জাপানের বড় বড় চীন-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ফুজিওয়ারা, সিকোওরা প্রভৃতির নেতৃত্বে পরিচালিত "কঙ্গকুশ" অর্থাৎ চীন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণা মণ্ডলী প্রভৃতি নবগঠিত অনুষ্ঠানের সাহায্যে চীনের শব্দকোষ, চীনের দর্শন এবং চীনের ধর্ম্মশাস্ত্র হ'তে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ ক'রে জাপানের ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্যের নব সংস্করণের কাজ দ্রুতগতিতে চলতে লাগল। ইতিমধ্যে সেখানকার সামন্তসরদারগণের পরাভবের সঙ্গে সঙ্গে আত্মকলহেরও যবনিকা পড়ে গেল;—১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মেজী সাম্রাজ্য জাপানের সিংহাসনে সুদৃঢ় ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। যদিও মেজী সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পিছনে জাপানের প্রাচীন শাস্ত্রের নব-প্রবর্ত্তন ("revival of Japanese traditions during the Toku Gawa era") অনেকখানি সাহায্য করেছিল, তা' সত্ত্বেও মেজী যুগের (Meji Era) প্রতিষ্ঠার পর হ'তেই সেখানকার নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনতার উপর একটা বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ হ'তে সুরু হল। সারা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার চয়ন ক'রে সর্ব্বদিক দিয়ে জাতির অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করবার আকাঙ্ক্ষার নবীন জাপান চঞ্চল হয়ে উঠল।

ইউরোপ ও আমেরিকা তখন সারা বিশ্বে জ্ঞানে

বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। প্রতীচ্য সভ্যতার—প্রতীচ্য স্বাধীনতার—প্রতীচ্য চিন্তাধারার আলোকে তখন নিখিল ভুবন উদ্ভাসিত। নবজাগ্রত জাপানও সেই আলোর রসে মাতাল হয়ে উঠল। যে সকল জাতির প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারে কিছু রত্ন সঞ্চিত ছিল তারা প্রতীচ্য সভ্যতার এই আলোর আস্বাদ উপভোগ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল সত্য, কিন্তু বিশ্বসভ্যতার নবজাত শিশু জাপানের মত সে-আলোর রসে মাতাল হয়ে ওঠবার প্রয়োজন মনে করেনি। পূর্ব্বে যেমন জ্ঞানবৃদ্ধ চীন ছিল জাপানের জ্ঞান-সঞ্চয়ের কেন্দ্রস্থল, এখন তেমনি নব-জ্ঞান-বিমণ্ডিত ইওরোপ ও আমেরিকা হয়ে দাঁড়াল নবীন জাপানের শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ। যা'তে সাধারণের প্রাণে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা প্রবেশ করতে পারে তার জন্যে জাপানী ও ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্যের সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচুর অনুবাদ কার্য্য সম্পাদিত হতে আরম্ভ হ'ল। রুশোর "সোস্যাল কনট্রাক্ট", মিলের "প্রতিনিধি-মূলক শাসনতন্ত্র", গিজো ও বাক্‌লের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ, লিটন্, ডিজ্‌রেলি, বাইরণ্, শেলী, সেক্সপীয়র, মিল্টন্, হার্বার্ট স্পেন্সর, তুরগেনিভ্, কার্লাইল, ইমার্শন, বেকন, ভিক্টর হুগো, মোপাসাঁ, কীটস্, হেইন্ এবং দাঁতে প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য পাশ্চাত্য মনীষীগণের মূল্যবান গ্রন্থাদির অনূদিত সংস্করণ সমগ্র জাপানে নবযুগের বিপ্লবের বার্ত্তা প্রচার ক'রে দিয়েছিল। এমন কি ঐ সময় জাপানে ইংরাজীকে জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করবার জন্যে বিশেষ আন্দোলনও দেখা দিয়েছিল। মেজী যুগের শেষ ভাগে জাপানের নবীন সম্প্রদায় বৈদেশিক ভাষায় ও বৈদেশিক জ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনের অভিপ্রায়ে "নিউ রোমানাইজেশন সোসাইটী" (সিন্ রোমানজাই কাই), "বিদেশী ভাষা অনুশীলন সমিতি", এবং "জাপানী বর্ণমালা প্রবর্ত্তন সমিতি" প্রভৃতি বহুবিধ পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত করলেন। মেজী যুগের গোড়ার দিককার অনুবাদ-সাহিত্যে যতখানি উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধতা পরিস্ফুটিত হয়েছিল শেষের দিককার রচনায় তা' দেখা যায়নি।

৫

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পর সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর হ'তেই জাপানে বর্ত্তমান যুগোপযোগী কথা-সাহিত্য রচনার প্রচেষ্টা প্রচলিত হ'ল। এই দিকে বিদেশী-সাহিত্যের অনবদ্য মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য নব্য জাপানকে প্রচুর প্রেরণা জুগিয়েছে—সমাজ এবং মানুষের অন্তরকে নূতন ক'রে বিচার করতে শিখিয়েছে। এ-সময়কার কথা-সাহিত্য-রচনায় জাপানের কথাশিল্পীগণ পরিপূর্ণ মৌলিক রচনা যে প্রকাশ করেছিলেন তা' নয়, বিশ্ব-সাহিত্যে সমাদৃত বিদেশী গল্পের ও উপন্যাসের অনুবাদ অথবা সেই সব সাহিত্য অবলম্বনে রচিত রচনার মধ্য দিয়ে সমগ্র দেশে কথা-সাহিত্যের স্রোত বহিয়ে দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বুলওয়ার লিটনের "Ernest Maltravers" নামক উপন্যাসটী জাপানের সর্ব্বপ্রথম অনূদিত কথা-সাহিত্য। ১৮৭৯ খৃঃঅব্দে "ফাগুন-দিনের লতাপাতার গান" আখ্যা সহকারে উক্ত গ্রন্থখানি অনূদিত হয়েছিল। ঐ সময়ে শ্রীমতী ইওরা মো তো কর্ত্তৃক অনূদিত "লিট্‌ল লর্ড ফউণ্টলিরয়" গল্পটীর বাজারে ভয়ানক কাট্‌তি হয়েছিল। শ্রীমতী ইওরা মোতোর আরও বহুবিধ অনুবাদ-সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর জাপ-সাহিত্যের আভাস পাওয়া যায়। এর ঠিক অব্যবহিত পরেই কতকগুলি অভিনব ধরণের রাজনীতি ও সমাজ-নীতি-মূলক "রোমান্স" (Politico-social romances) জন-সাধারণের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠল। এরূপ একখানি কথা-সাহিত্যে গ্রীস-দেশীয় ইপামিনোনদাস ছিলেন প্রধান চরিত্র; এবং এর বিষয়-বস্তু ছিল থিবিয়ানদিগের রাজনৈতিক ঘটনাবলী। এ-রূপ কাহিনী অবলম্বনের হেতু এই যে, থিবিয়ানগণের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তৎকালীন জাপানের রাজনৈতিক অবস্থার কতকটা সৌসাদৃশ্য ছিল।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে সুবোচি নামক একজন চিন্তাশীল লেখক কথা-সাহিত্য রচনা সম্পর্কে "The Essentials of Novel Writing" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকা পাঠে সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাপানে জাতীয় সাহিত্য সম্ভাবনার বেশী বিলম্ব নেই। পূর্ব্বের যুগে সাহিত্যের মধ্যে যে নীতি-মূলক ও গোঁড়ামী-পূর্ণ রূপক অলঙ্কারের ছড়াছড়ি দেখা যেত, এখন জাপানের কথা-শিল্পীগণ যে তা' পরিহার ক'রে সত্যন্যায়ের বাস্তবকে সম্মুখে রেখে

কথা-সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হ'তে চান তাঁ'র সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় উক্ত গ্রন্থখানির মধ্যে। * "ছাত্র-জীবন" এঁ'র একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ছিল। জাপ-সাহিত্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ এই জ্ঞান-বৃদ্ধ লেখক এখনও জীবিত আছেন। ইনি অনেক মৌলিক সাহিত্যও রচনা করেছেন। তা' ছাড়া এঁ'র অনূদিত মহাকবি সেক্সপীয়রের গ্রন্থরাজির "Standard Translation" হিসাবে খ্যাতি আছে।

স্থবৌচির প্রিয়তম শিষ্য ফুতাবতী-ইর (Fwta batei) অনুবাদ-সাহিত্যে বিশেষ যশ ছিল। রুষ সাহিত্য অনুবাদে ইনি প্রধানতঃ মনোনিবেশ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি অনেক মৌলিক রচনাও বেশ দক্ষতাসহকারে প্রণয়ন করে-ছিলেন। ফুতাবতীর আসল নাম কিন্তু ছিল হাসে গাওয়া (Hase Gawa)—প্রথমোক্ত ছদ্মনামে সাহিত্যিক সমাজে ইনি আপনাকে প্রচার করেন। জীবনে অনেক তিক্ততা ইনি পেয়েছেন—এঁ'র চরিত্র অতি ভাবপ্রবণ ছিল। এঁ'র রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে একটু আধটু বিদ্রূপাত্মক সমা-লোচনার (Satirical criticismএর) দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়॥ আজীবন মাতৃভাষার পুষ্টি-কল্পে আত্মনিয়োগ ক'রে অকালে ইনি ইহলোক হ'তে বিদায় গ্রহণ করেছেন; তা' না হ'লে বোধ হয় আজ জাপান এঁ'র লেখনী হ'তে আরও অনেক কিছু সম্পদ লাভ করতে পারত।

একদিকে আর্ত্ত মানবের সেবায় নিয়োজিত-প্রাণ সেনা-কুলের সার্জ্জেন জেনারল্, অপরদিকে বাণীর একনিষ্ঠ সেবক, এই উভয় গুণেরই অধিকারী ছিলেন আধুনিক জাপানের শক্তিমান কথা-সাহিত্যক ৺মোরি ওগাই (Mori Ogai)। এই কর্ত্তব্যপরায়ণ সাহিত্যসেবী আজ আট বছর হ'ল পর-লোক গমন করেছেন। রুষের সঙ্গে যখন জাপানের সংগ্রাম চলছে অবিরাম, সে-সময় ইনি রণক্ষেত্রের আতুরালয়ে সারা-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, আর রাত্রি বেলা মাত্র তিন চার ঘণ্টা কোন রকমে নিদ্রায় যাপন ক'রে বাকি সবটুকু প্রহর সাহিত্য রচনায় বিভোর হয়ে থাকতেন। বাণীর দেউলে এমনতর আত্মভোলা তাপস বড় বিরল। এঁ'র সাহিত্যিক অবদানের মধ্যে এঁ'র অপর্য্যাপ্ত অনুবাদ-সাহিত্য হচ্ছে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। এঁ'র মত পাশ্চাত্যের এত অধিক সংখ্যক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অনুবাদ আর কেউ জাপানে করেন নি। গেটে, লেসিং, হফট্‌ম্যান্, সুড্যারম্যান্, উইডিকিণ্ড, স্নিথ্‌স্লার, সেক্সপিয়র, ইবসেন, ষ্ট্রিন্‌বার্গ, হানস্ এণ্ডারসন, মেতারলিঙ্ক, ড আনানাজিও, ওস্কার ওয়াইল্ড এবং বার্ণার্ড শ প্রভৃতি ইওরোপের বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থকার ও কথা-শিল্পীগণের উৎকৃষ্টতম রচনা হ'তে অমৃত সঞ্চয় করে' জাপ-সাহিত্যের সুধাভাণ্ড পূর্ণ ক'রে সমগ্র জাতিকে অমৃতের আস্বাদ বিতরণ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকখানি নাটক নাটিকাও এঁ'র লেখনী হতে বেরিয়েছিল এবং অন্ততঃ পক্ষে ষাটখানি উপন্যাসের ইনি ছিলেন স্রষ্টা। বড় কম শক্তির পরিচয় নয়! পিতা ও পুত্র—যথাক্রমে পুরাতন আর নূতন যুগের এই দুই বিভিন্ন প্রতীকের পারস্পরিক চিন্তাধারায় যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মোরি ওগাই তাঁর লেখায় দিয়েছিলেন। নবীন জাপানের অন্তর্বিপ্ল-বের সুতীব্র অনুভূতিকে ইনি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে এঁ'র রচনার ভিতর ব্যক্ত করেছিলেন।

মেজী যুগের পর তাই শো যুগের (Taisho Era) সঙ্গে সঙ্গে জাপানের কথাসাহিত্যে অতি-আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এ যুগের প্রধান বিশেষত্ব যে, এখন ইওরোপের অন্যান্য দেশের, বিশেষ ক'রে ইংরাজী সাহিত্যের, পরিবর্ত্তে রুষ-সাহিত্যের প্রতি জাপানের নবীন লেখকলেখিকাগণ বড় বেশী রকম আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। এর কিছুকাল পূর্ব্বে টলষ্টয় জাপানের সাহিত্য-সেবীগণ কর্ত্তৃক যথেষ্ট অনূদিত ও আলোচিত হয়েছেন। কিন্তু টলষ্টয়কে এখন পুরাতন যুগের পর্য্যায়ে ফেলা হয়েছে। সেই কারণে টলষ্টয়ের পরবর্ত্তী যুগের রুশ-সাহিত্যিক মণ্ডলীর কাছ হতে নবীন জাপানের কথা-শিল্পীগণ নবীনতার বাণী সংগ্রহ করবার জন্য ব্যাকুল।

১৯২৫ সনে রুষ ও জাপানের নূতন সন্ধি-সর্ত্ত স্বাক্ষরিত হ'বার পর হ'তে আজ তিন বৎসর যাবৎ রুষের কথা-সাহিত্য, রুষের নাটক জাপানের তরুণ সমাজের কাছে আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহিত্যানুশীলনে যেখানে এই নূতন গতি

* This was a short treatise called "The essentials of Novel Writing—" a plea for realism as against an outworn convention of allegoiy and moralising"—William Plomer.

সুরু হবার পর হতে আন্দ্রিভ্, ব্যালমণ্ট, সোলোগাব, পুশকিন্, Zinaida Hippiws, লারমণ্টভ্, গোগল্, শেখভ্ এবং তুরগেনিভ্ প্রভৃতি রাশিয়ার অমর লেখকগণের শ্রেষ্ঠ রচনা ও গল্পের বহুপ্রকার অনুবাদ অথবা ঐ সমস্ত অবলম্বনে নবভাবে প্রবর্ত্তিত চিত্তগ্রাহী উপন্যাস এবং গল্প প্রকাশ হয়ে আসছে। রুশের দরদী লেখক গোগল তাঁর গল্পের ভিতরে সাইবেরিয়ার জনহীন প্রান্তরে নির্ব্বাসন প্রাপ্ত, শত লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত বন্দীর অন্তরের যে মর্ম্মভেদী ক্রন্দন শুনিয়েছেন সেই কান্নার সুর তরুণ জাপানের ভাব-প্রবণ অন্তরে ঘা দিয়েছে। সেই কারণে আধুনিক জাপানের সামাজিক উপন্যাসে গোগলের রচনা প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি-আধুনিক জাপানের জনপ্রিয় কথাশিল্পী আরিসিমা তকিওর (Arishima Takeo) লেখার মধ্যে এই সত্যটা বিশেষ করে' ফুটে উঠেছে। নারী সমস্যা সমাধানেও জাপানের আধুনিক লেখকগণ পাশ্চাত্ত্যের "র‍্যাডিকাল" পন্থার পক্ষপাতী। শ্রীমতী যযোয় নোগমী (Mrs Yayoi Nogami) আধুনিক কালে জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা লেখিকা। মুরাসকি নো শিখিবুর পর সে-দেশে এত বড় মহিলা কথা-শিল্পী দেখা যায় নি। "কাইশিন মারু" (The Sea God Ship) অভিহিত মিসেস নোগমীর একখানি উপন্যাস সাহিত্য-সমাজে জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্য বলে' পরিগণিত হয়েছে।

৬

এবার সংক্ষেপে কয়েকটী মধ্যশ্রেণীর সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা দরকার, কারণ কোন কোন দিক দিয়ে সে-সকলেরও মূল্য কিছু আছে। এই দলের মধ্যে ন্যাতসিউম সোসেকীর (Natsume Soseki) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এঁকে প্রথম শ্রেণীর লেখকের পর্য্যায়ভুক্ত করলে খুব বেশী ক্ষতি হয় না। এঁর দুটী শ্রেষ্ঠ গল্পের নাম হচ্ছে—"ওয়াগাহাই ওয়ানিকো দি অরু (I am a Cat) এবং "Botchaw" (The Boy)। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় শাস্ত্রেই ইনি বেশ সুপণ্ডিত ছিলেন। সে-কারণে ন্যাচুরালিষ্টিক স্কুলের একদলের সাহিত্য রচনায় অতিরিক্ত ভাববিলাসিতাও ইনি ভালবাসতেন না, আবার বস্তুতন্ত্রবাদী-গণের মধ্যে অতিরিক্ত অসুন্দর মত প্রকাশও তিনি অনু-মোদন করতেন না। ইনি বেশ একটা মাঝামাঝি পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিকুচাই কান্ এবং কিতুচাই যুহো (Kikuchi Kan and Kituchi Yuho) এই দুটী কথা-সাহিত্যিকের পুস্তকে নারী-সমস্যা সমাধান ও নারী-প্রগতি সম্বন্ধে আধুনিক যুগোপযোগী মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। কুরাতা হয়কুজু (Kurata Hyakuzu) বর্ত্তমান যুগে জাপানের শ্রেষ্ঠ নাট্য-সাহিত্যিক বলে' বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। "The Priest and His Disciples" নামক তাঁর অন্যতম নাটক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ইওরোপে আধুনিক যুগে এক শ্রেণীর লেখকগণ অতি খোলাখুলিভাবে তাঁদের গ্রন্থাদিতে যৌন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে থাকেন —বহুপূর্ব্ব হতেই জোলা, মোপাসাঁ, বালজাক্ প্রভৃতির উপন্যাসে ও গল্পে এর ইঙ্গিত প্রদর্শিত হয়েছিল। তানিজাকি (Tanizaki), জুনিচাইরো (Juni Chiro) এবং মোরিতো সোহি (Morito Sohei) প্রভৃতি যৌনতত্ত্ব আলোচনার পক্ষপাতী জাপানের আধুনিক কথা-শিল্পী ও লেখকগণ উপরোক্ত পথ অনুসরণ করেছেন।

বোলশেভিক ও সোসালিজমের ভাবধারা বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। বিশেষ ক'রে আধুনিক জাপানের তরুণ লেখকগণ এর দুরতিক্রম্য প্রভাব এড়াতে পারেন নি। শাসক সম্প্রদায়ের আদেশে সেখানে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রমূলক মতবাদ প্রচার একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু একটা বিরাট সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে যে নবীন চেতনা সজাগ হয়েছে তাকে বাইরের বিধি নিষেধ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। মানুষের মুখ কোনরকমে বন্ধ ক'রে রাখা যায়, কিন্তু তার মনের স্রোতের গতিরোধ করা অসম্ভব। তাই শত বিধি নিষেধ সত্ত্বেও আধুনিক জাপানের তরুণ-তরুণীগণ চারিদিকে ছোট ছোট পাঠাগার স্থাপন করেছেন,—এই সকল পাঠাগার কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রমূলক দর্শনশাস্ত্রের মৌলিক ও অনূদিত বহুবিধ সংস্করণে পরিপূর্ণ।

এই সকল অনুষ্ঠানের উত্তমে রুশের বিপ্লববাদী ভাবধারা সেখানে তরুণ-সমাজে বিশেষ ভাবে আলোচিত হতে আরম্ভ হয়েছে। আধুনিক লেখকগণ পাশ্চাত্যের সকলপ্রকার আধুনিকতম চিন্তাধারা তাঁদের জাতীয় সাহিত্যে প্রবাহিত করাবার জন্ম খুব বেশী আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এই নব প্রচেষ্টার ফলে Proletarian novels এবং drama (শ্রমিকসমস্তা সমাধান মূলক সাহিত্য) বর্ত্তমান জাপানের কথা-সাহিত্যে এবং নাট্য-সাহিত্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে।

এই হ'ল জাপানের সাহিত্য সাধনার মোটমাট পরিচয়। কথা-সাহিত্য প্রকাশের দিক থেকে নব্য জাপানের গ্রন্থ-প্রকাশের সংখ্যা সত্যই প্রশংসার্হ। বিশ্বসাহিত্যের বহুমুখী স্রোতকে বরণ ক'রে নেবার উদ্দেশ্যে নবীন জাপানের সাহিত্য-সেবীগণের দুর্নিবার প্রচেষ্টা ও অসীম আগ্রহ আজ সমগ্র-জাতিকে প্রাচীনতার সকল রকম সঙ্কীর্ণতা পরিহার করতে এতখানি উৎসাহিত করেছে। সকল দিক দিয়ে তরুণ জাপান নবযুগের স্পন্দনে আলোড়িত হতে চায়। পাশ্চাত্য-জগৎ আজ এ স্পন্দন অনুভব ক'রে আপনার শক্তির জয়কেতন উড্ডীন করেছে। জাপান তাদের কাছ হ'তে পিছিয়ে থাকতে চায়না। যাত্রাপথে এগিয়ে চলার বাণীকে তরুণ জাপান মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে। সমাজ সমস্তা—সাহিত্যসমস্তা—অর্থনৈতিক সমস্তা—রাষ্ট্রসমস্তা সমস্তেরই সমাধানে জাপান প্রতীচীকে বড় বেশী রকম অনুকরণ করছে। অবশ্য প্রতীচীর জ্ঞানরাজ্য হতে যে-সকল রত্ন তারা সংগ্রহ করেছে তার সদ্ব্যবহার ক'রে' এ পর্য্যন্ত সার্ব্বজনীন সাফল্যই অর্জ্জন ক'রে এসেছে। বিশেষ ক'রে অনুবাদ-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে জাপানের কথা-সাহিত্যে কতখানি ঐশ্বর্য্য বিমণ্ডিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

তবুও যে-জাতি আজ সমগ্র এসিয়ার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে বরণীয় তার কাছ হ'তে একটা বৈশিষ্ট্যসূচক মৌলিক রচনা কামনা করা কিছুই অন্যায় নয়। পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল চিন্তাধারা হতে তারা এ-পর্য্যন্ত অনেক ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করেছে, এখন আমরা জাপানের কাছে এই সকল চিন্তাধারার সমন্বয়ে একটা মৌলিক চিন্তাস্রোত তাদের সাহিত্যের মধ্যে প্রবাহিত হ'তে দেখতে চাই। জাপানের প্রাচীন কথা-সাহিত্যে যে অনাড়ম্বর মৌলিকতা ছিল এখানকার সাহিত্যে তার ছাপ পাওয়া যায়না। আদিম যুগের গ্রাম্য সরলতার পরিবর্ত্তে আধুনিক জাপান জটিল সমস্তার সম্মুখীন হওয়াকে শক্তির পরিচায়ক ব'লে মনে করে। তবুও আজ নবীন এসিয়া নবীন জাপানের কাছ হতে সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে কতকগুলি অখণ্ড মৌলিক রচনা কামনা করে, যার স্থান ভবিষ্য যুগে চিরস্মরণীয় হয়ে' থাকবে।

শ্রীজগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



[সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক Sir Edmund Gosse, D. Litt. ও A. Neville J. Whymant, Ph. D. এবং W. Plomer প্রভৃতির জাপ-সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনাদি হ'তে এই প্রবন্ধের কিছু কিছু উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে।]

রাজপুতানা ভ্রমণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার এম-এ, বি-এল

জয়সমন্দ

২৪শে অক্টোবর।—কাল এই বিড়ম্বনা ভোগের পর আমাদের রাত্রের পরামর্শ-বৈঠকে জয়সমুদ্র দেখার আশা এক রকম ত্যাগ করাই হইয়াছিল, আজ আবার যাওয়ার চেষ্টা করার মত উৎসাহ কারুর ছিল না। পূর্ব্ব প্রোগ্রাম মত আজ আমাদের নাথদ্বার যাওয়ার কথা—তার জন্য বাস্ চাই, ফুলচাঁদজীর বাসেই যাওয়া হইবে আগে অবশ্য এই কথা ছিল, কিন্তু তাকে ত কাল উদয়সাগরের তীরে ফেলিয়া আসিয়াছি। রাত্রেই একজন মোটর মিস্ত্রী তার ব্যবস্থা করিতে গিয়াছে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বড় ভরসা ছিল না। সকালে উঠিয়াই তাই শৈলবাবু আর আমি দ্বিতীয় বাসের সন্ধানে বাজারে মোটরষ্ট্যাণ্ডে হাজির হইলাম। সেখানে দেখি, আমাদের জয়সমুদ্রের পাশ জোগাড়ের কাহিনী এবং কালকের ব্যর্থ অভিযানের কথা সহরে—অন্ততঃ মোটরচালক মহলে—কারুর জানিতে বাকী নাই। সকলেই প্রথমে ফুলচাঁদজীর একচোট নিন্দা করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল যে, পাশ যখন জোগাড় আছে তখন আমাদের আবার যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত এবং তাদের মোটর ভাড়া করিলে কোনও 'তকলিফ্' হইবে না—ইত্যাদি। বেশ অনুভব করা গেল যে, পাশের কল্যাণে আমরা আর উদয়পুরে বড় কেউকেটা নই, জয়সমুদ্রের পথও তেমন বিপদসঙ্কুল মনে হইল না। সুতরাং ভাল গোছের একখানা বাস্ ভাড়া করিয়া আমরা দোকানে ফিরিলাম। পাশ ছিল ফুলচাঁদজীর পুত্রের কাছে—তিনি আমাদের বাস আসিতে দেখিয়া অদৃশ্য হইলেন। শেষে যখন তাঁর দর্শন মিলিল তখন শোনা গেল—পাশ তাঁর পিতার কাছে এবং পিতামহাশয় রাজদরবারে জরুরী কাজে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে আমাদের উদয়সাগরে পরিত্যক্ত বাস সশব্দে আসিয়া গেটে লাগিল, তিনিও সুর বদ্‌লাইলেন। কালকের দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ করিয়া তার জন্য কোনও ভাড়া চার্জ্জ করিবেন না বলিয়া, তাঁর লোকসানের কথা জানাইয়া তাঁর বাসেই যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অভিজ্ঞ বন্ধুরা পরীক্ষা করিয়া সার্টিফিকেট দিলেন—আজ বাসের অবস্থা ভালই, সুতরাং আমরা আর আপত্তি করিতে পারিলাম না। আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজী হইবামাত্র ফুলচাঁদজীর দরবারের কাজ মিটিল, পাশও হাজির হইল। মোটর মিস্ত্রীটিকে কিছু বক্‌শীশ কবুল করিয়া সঙ্গে লইয়া বেলা এগারটার সময়ে আমরা যাত্রা করিলাম, সঙ্গে চলিলেন শালুম্ব্রার সেই মহাজন চতুষ্টয়—তাঁরা কাল সমস্ত রাত্রি উদয়সাগরের তীরে পড়িয়া কাটাইয়াছেন।

জয়সমুদ্র উদয়পুর হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণে এবং পূর্ব্বে—তার মধ্যে ১২।১৪ মাইল গভীর জঙ্গল—মহারাণার 'রিজার্ভ ফরেষ্ট'। এর জন্যই এ পথে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। প্রথম কয়েক মাইল রাস্তা সমতল ভূমির উপর দিয়া—তার দুই পাশে কেবল অজস্র খেজুরের বাগান আর মাঝে মাঝে বিরলবসতি ছোট ছোট গ্রাম। দুতিন মাইলের পর এক জায়গায় মোটর থামিল—শুনিলাম সেটি একটি থানা, নাম ধলীমুংড়ী। ডান দিকে উচু এক টিলার উপর থানা, সেখানে খবর পৌঁছিতেই কিছুক্ষণ গেল, তার পর থানাদার মহাশয় গজেন্দ্রগমনে নামিয়া আসিলেন—ধীরে সুস্থে আমাদের পাশ পরীক্ষা করিলেন, তবে আমরা যাইবার অনুমতি পাইলাম। শুনিলাম পথে এ রকম অনেক থানা আছে, সর্ব্বত্রই এই কর্ম্মভোগ করিতে হইবে।

আট মাইলের মাথায় যে থানা তার নাম হলদুঘাটি। প্রতাপ মানসিংহের সমরক্ষেত্র, চৌদ্দ হাজার রাজপুতবীরের সমাধিস্থল হলদিঘাট তীর্থ যে হঠাৎ ফাঁকি দিয়া এ পথে দেখা

যাইবে তা আগে কেউ বলে নাই, সুতরাং মনটা খুব নাচিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হায়, আমাদের গাইড্ সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। সে হলদীঘাট অনেক দূরে মেবারের পশ্চিমপ্রান্তে আরাবল্লী পর্ব্বতমালার মধ্যে। হলদুঘাটির পরেই রিজার্ভ ফরেষ্ট আরম্ভ। তার প্রবেশপথে মস্ত নোটিশ দিয়া এই ১৪ মাইলের মধ্যে পশুপক্ষী মারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে নিষেধ ষ্টেটের ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের জন্য নয়, তাঁরা small game বা ছোট ছোট শীকার করিতে পারেন।

আট মাইল হইতে বাইশ মাইল পর্য্যন্ত এই অরণ্য। এইখান হইতে পথের যে দৃশ্য আরম্ভ হইল তা সুন্দর এবং ভীষণের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। একদিকে সুউচ্চ পর্ব্বতমালা, আর এক দিকে অরণ্যসমাকুল অতলস্পর্শ নিম্নভূমি বা খাদ। খাদের অপর পারে আবার কখনও দূরে কখনও কাছে স্তরবিন্যস্ত গিরিশ্রেণী দৃষ্টিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া। পাহাড়ের কোল দিয়া পথ বরাবর নামিয়া গিয়াছে—মনে হয় আমরা যেন বসুন্ধরার কোন্ নিভৃত অন্তঃপুরের মধ্যে কোন্ এক অপরিজ্ঞাত রহস্যের সন্ধানে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় চলিয়াছি। সম্মুখে পাশে নিবিড় অরণ্য—তার মধ্যে লতাজাল-বেষ্টিত বড় বড় বনস্পতির দল যেন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই একই ভাবে মৌনবিস্ময়ে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ যেন ঘুমের রাজ্য—স্বপ্নের দেশ, কিন্তু এ স্বপ্ন চঞ্চল বা ক্ষুদ্রের স্বপ্ন নয়, লঘু পরীরাজ্যের স্বপ্ন নয়; অতলস্পর্শ গভীরতার বুকে বিপুল বিরাটের ক্রোড়ে উদ্ভিদরাজ্যের এ মহাসুষুপ্তি। সেই সুষুপ্তির রাজ্য মথিত করিয়া আমাদের মোটর কখনও সগর্জ্জনে কখনও নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া চলিল।

তের মাইলের পর পাহাড়ের মধ্যে দোবারীর তোরণের মত একটি তোরণ দেখা গেল—তার অপর দিকে কেওড়া গ্রাম। এখানে দুই পাশের পাহাড় কাছাকাছি আসিয়া একটি গিরিবর্ত্মের সৃষ্টি করিয়াছে, তারই মাঝখানে এই তোরণ। তোরণের উপর যথারীতি দুই পাহাড় হইতে দুইটি প্রাচীর নামিয়া মিশিয়াছে। কেওড়া নাকি একটি জিলার রাজধানী। একটি ছোট প্রাসাদ বা মহলও আছে—মহারাণারা এ দিকে শীকারে আসিলে এখানে বিশ্রাম করেন। থানা ত আছেই—পাশ দেখাইতে হইল। অধিকন্তু তার একটি নকলও দিতে হইল।

কেওড়া ছাড়াইয়া আবার নিবিড় জঙ্গল। বাইশ মাইলের পর আমরা সমতলভূমিতে পড়িলাম, উৎরাইও শেষ হইল। এখানেও একটি থানা আছে, নাম কালোড্রা। কেওড়ার মত ছোট একটি মহল আছে, দুই চারিটা বসতিও দেখা গেল। এখান হইতে দুইটি রাস্তা জয়সমুদ্রের দিকে গিয়াছে, তার মধ্যে একটিতে সাধারণের যাতায়াত নিষিদ্ধ। কালোড্রার থানাদার মহাশয় আমাদের কাছে চা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গে না থাকায় তাঁকে বাধিত করিতে পারি নাই। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ফিরিবার সময় তাঁকে সঙ্গে করিয়া উদয়পুর পৌঁছাইয়া দিতে হইয়াছিল।

আটাশ মাইলে যে গ্রাম পাইলাম তার নাম পিলাধরা। শালুম্ব্রাওয়ালারা সগর্ব্বে জানাইল যে, এইখান হইতে তাদের রাওজীর অর্থাৎ শালুম্ব্রা সর্দ্দারের রাজ্য আরম্ভ। মেবারের সামন্ত সর্দ্দারেরা এক একটি স্বাধীন রাজা বিশেষ। তাঁদের নিজেদের সৈন্যসামন্ত, আপিশ আদালত প্রভৃতি সবই আছে। তাঁদের অধিকারের রাজস্ব প্রায় তাঁরাই ভোগ করেন, তাই মহারাণার নিজের আয় এত কম। পিলাধরায় আমরা মহারাণার খাসরাজ্যের সীমা ছাড়াইলাম। দুই চারিটা প্রাচীন আমলের পাকা বাড়ী দেখা গেল, এখন জীর্ণাবস্থা। এখান হইতে জয়সমুদ্র পর্য্যন্ত পথের দৃশ্য ভিন্নরূপ—দুই পাশে বরাবর 'এভিনিউ'এর মত বৃক্ষের সারি—ঘনসন্নিবিষ্ট জঙ্গল নয়। রাস্তা সমতল, কাছে পাহাড় নাই, গাছগুলিও মহান্ মহীরুহ নয়। এতক্ষণ ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়া আসিয়া এই দৃশ্যে চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

জয়সমুদ্রের মাইল খানেক দূর হইতে উচ্চ গিরিশীর্ষে জয়সিংহের শ্বেতবর্ণ প্রাসাদ চোখে পড়ে। যখন সেই গিরির পাদমূলে পৌঁছিলাম তখন সম্মুখে হ্রদের বিস্তৃত উঁচু বাঁধ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইতে হইল। এই বাঁধ প্রায় হাজার ফিট লম্বা এবং একশত ফিট উঁচু; বাঁদিকে মোটর উঠিবার মত বেশ ঢালু রাস্তা আছে, তার উপর দিয়া উঠিবার সময় মনে হইতেছিল এ যেন কোন্ পাহাড়ের উপর উঠিতেছি। বাঁধের দুই পাশে পাহাড় আর সামনের দিকে মার্ব্বেল

পাথরে বাঁধান সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণীসংবলিত ঘাট, এক পাহাড়ের কোল হইতে আর এক পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঘাটের উপর যখন দাঁড়াইলাম তখন সম্মুখে হ্রদের যে রূপ চোখে পড়িল তা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। নিরুদ্ধ করিয়া এই হ্রদের সৃষ্টি করেন এবং নিজের নামে তার নামকরণ করেন। তাই ইহার নাম জয়সমন্দ বা জয়সমুদ্র।

সমস্ত হ্রদটির দৈর্ঘ্য নয় মাইল এবং প্রস্থ পাঁচ



জয়সমুদ্র ঘাট

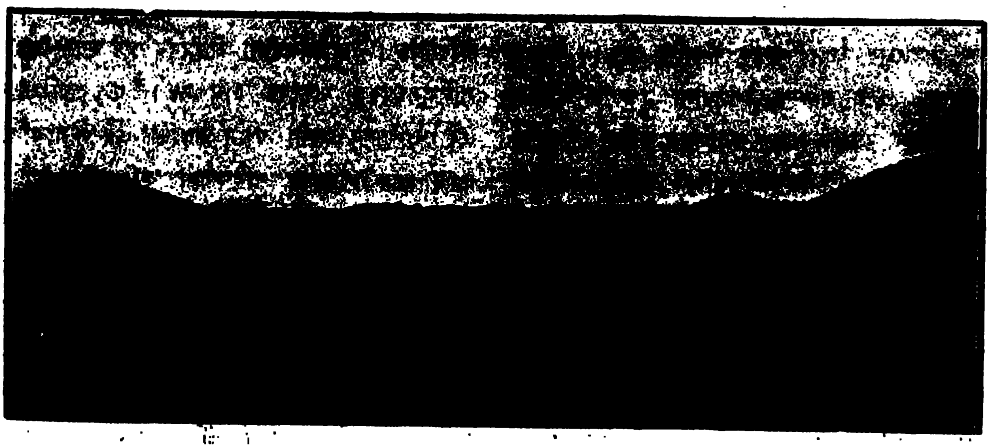
মাইল। পৃথিবীতে এত বড় কৃত্রিম হ্রদ অল্পই আছে—হয়ত বা আর নাই। জয়সমুদ্র মানুষের সৃষ্টি বটে কিন্তু এর তীরে দাঁড়াইয়া মনে হয়—মানুষ এর জন্য কতটুকুই বা করিয়াছে। এ শৈলমালা মানুষের সৃষ্টি নয়—এর অপর্য্যাপ্ত সলিলসম্ভারও মানুষের দান নয়। তবু জয়সিংহের কৃতিত্ব এই যে, এমন একটা স্থানে প্রকৃতির এই লীলাভূমিতে তিনি এমন একটা হ্রদের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। শুধু কি হ্রদ? হ্রদের তীরে এই মর্ম্মরে বাঁধান ঘাট, এই সোপানশ্রেণী, ঘাটের উপর মর্ম্মরের চবুতরা বা বিশ্রামের স্থান, হ্রদতীরবর্ত্তী গিরিশীর্ষস্থিত এই বিরাট প্রাসাদ—এ সমস্তই সেই অসাধারণ নৃপতির শিল্পীমনের পরিচয় দেয়। মেবারের বড় বড় বীরদের পাশে রাণা জয়সিংহের স্থান নাই, মেবারের ভট্ট কবিরা তাঁকে ক্লৈব বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, রাণী কমলা দেবীর জন্য তাঁর শেষজীবন সুখের হয় নাই, পুত্র অমর পর্য্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল—কিন্তু তবুও জয়সমুদ্রের স্রষ্টা ও শিল্পীকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারা যায় না।

জয়সমুদ্র ত সমুদ্রই—সার্থক ইহার নাম সমুদ্র রাখা হইয়াছিল। বাতাসে হ্রদের নীলাভ জলরাশি অল্পবিস্তর আন্দোলিত হইয়া যে গম্ভীর কল্লোলের সৃষ্টি করিতেছিল তা সমুদ্রের অশ্রান্ত জলকল্লোলের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। উত্তরে ও দক্ষিণে স্তরে স্তরে সজ্জিত শৈলমালা হ্রদবক্ষে নামিয়া আসিয়া যেন আকুল আগ্রহে তাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছে, হ্রদের জলও যেন আকুলি ব্যাকুলি করিয়া তাদের পাদমূলে আপনাকে বিলাইয়া দিতে চায়। হ্রদের বক্ষ ভরিয়া দ্বীপের আকারে পর পর অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড়—মনে হয় যেন তারা বহুদিন এই হ্রদের গর্ভেই আত্মগোপন করিয়া ছিল, কোন্ এক ভূকম্পনে একদিন হঠাৎ সলিলবক্ষ ভেদ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পাহাড়গুলির অন্তরালে হ্রদের সীমারেখা অদৃশ্য থাকিয়া যায়, শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছায় না, তবু মনে হয় তাদের জন্যই যেন হ্রদের সৌন্দর্য্য আরও খুলিয়াছে, তার রহস্য গভীরতর হইয়াছে। এই সব পাহাড়ের নীচে বরাবরই জল সঞ্চিত থাকিত—পশ্চিম দিক দিয়া খানিকটা জল স্রোতের আকারে বাহির হইয়াও যাইত, রাণা জয়সিংহ তার মুখে বাঁধ দিয়া সেই প্রবল স্রোত

হ্রদে বেড়াইবার জন্য সরকার হইতে নৌকার বন্দোবস্ত আছে—আমরা এইরূপ একটি নৌকা ভাড়া করিলাম।

নৌকা যখন সামনের পাহাড় ঘুরিয়া অপর দিকে পৌছিল তখন উত্তরে ও দক্ষিণে হ্রদের অনেকদূর দেখা গেল বটে, তবুও অন্যান্য পাহাড়ের জন্য তার সীমারেখা দৃষ্টির বাহিরেই রহিয়া গেল। আমাদের আরও একটু দূরে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মাঝি বলিল এর বেশী অগ্রসর হইবার 'হুকুম নেহি'। হুকুমের অভাবে আমরা অবশ্য তেমন দুঃখ বোধ করি নাই কারণ এপর্য্যন্ত আসাই দুঃসাহসের ব্যাপার মনে হইতেছিল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি ঘাটের উপর অনেকগুলি কৌতূহলী ভীল বালক এবং বালিকা জড় হইয়াছে। তারা বেশ সপ্রতিভ, শৈলবাবু তাদের ছবি তুলিবার প্রস্তাব করিতে সকলে বিনা আপত্তিতে বেশ একত্র দাঁড়াইয়া গেল। এ বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশে ভীলবালার দর্শন না পাইলে আমাদের ভ্রমণকাহিনীর একটা অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইত—অন্ততঃ তাতে কবিত্বের একটা মস্ত উপাদানের অভাব ঘটিত। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কল্যাণে ভীলবালার গান আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে—আমাদের সে বিষয়েও কোনও ত্রুটি ঘটে নাই। ছবিতোলার পর ভীলবালারা তান কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল! খানিক পরে খোঁজ পড়িল আমাদের টিফিন বাক্স কোথায়, মোটরই বা কোথায় গেল। ফুলচাঁদজীর পুত্রের মারফৎ শোনা গেল যে মোটর তাঁর আত্মীয়দের পৌঁছাইতে শালুম্ব্রা গিয়াছে। শালুম্ব্রা যে কতদূরে তার কোনও সঠিক খবর পাওয়া গেল না—তবে ২০ মাইলের মধ্যে এইটুকু নিশ্চিত জানা গেল। ২০ মাইল হইলেও মোটরের ফিরিবার সময় অতীত হইয়াছিল, সুতরাং তার কলকব্জা ঠিক আছে কিনা এবং যদি না থাকে তা হইলে আমাদের আজ কি উপায় হইবে (দোবারী ষ্টেশন অনেক দূরে) এইসব ভাবনায় জয়সমুদ্র পর্য্যন্ত আমাদের চোখের সম্মুখে মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিল। প্রথম রাগটা পড়িল ফুলচাঁদ নন্দনের উপর; তিনি বেগতিক দেখিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। তারপর রাগ হইল মেবার-সরকারের উপর, কেন তাঁরা এ পথে রেল খুলেন নাই, এখানে হোটেল বা ডাকবাংলার ব্যবস্থা করেন নাই ইত্যাদি। তখনই কোনও হোটেল খোলানর যখন সম্ভাবনা ছিল না তখন সামনের রাজপ্রাসাদের অতিথিশালাটিও যদি আজকের দিনের মত খোলা পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে আমরা অবশেষে



জয়সমুদ্র

সঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলিয়া উত্তর দিকের শৈলমালার উপর দিয়া দূরে মিলাইয়া গিয়াছিল।

আমরা ঘাটে এক চবুতরা আশ্রয় করিয়া বসিয়া পড়িলাম—অল্প অল্প বাতাসের সঙ্গে হ্রদের অশ্রান্ত জলকল-

এক প্রাসাদ-রক্ষীর শরণাপন্ন হইলাম। তার নিকট এইটুকু ভরসা পাওয়া গেল যে, যদি নিতান্তই আজ মোটর না আসে তা হইলে প্রাসাদের পাথরের মেজেতে ভূমিশয্যার অভাব হইবে না এবং নৈশাহারের জন্য বাজরার রুটি আর অড়হর

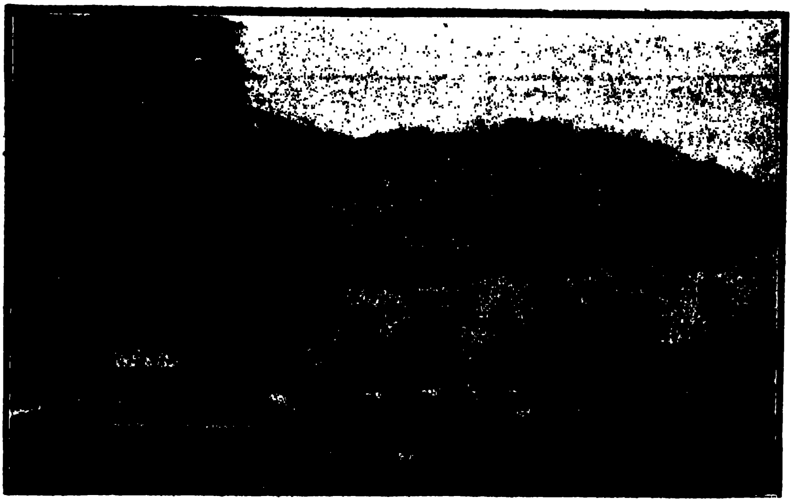
কি দাল কাছের গ্রাম হইতে মিলিলেও মিলিতে পারে। ঘাটের উপর এক শঙ্করজী দেবতা আছেন; তাঁর মন্দিরদ্বারে প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া জানা গেল যে প্রভুরও ভিক্ষার দশা, চিনি ছাড়া আর কোনও ভোগ কদাচিৎ তাঁর অদৃষ্টে জুটিয়া থাকে। দেবতার যখন এ অবস্থা তখন মানুষের আর 'কা কথা' সুতরাং নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে সকলে ঘাটের উপর অঙ্গ মেলিয়া দিলাম।

বেলা ৫টা নাগাদ দূরে মোটরের হর্ণ শুনিয়া আবার আমাদের রক্ত-চলাচল আরম্ভ হইল। চালক মহাশয় শাগুম্বায় কিছুক্ষণ আরাম ভোগ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া এত বিলম্ব। তখনই মোটর ছাড়া যাইত কিন্তু ফুলচাঁদজীর পুত্র মহাশয় নিরুদ্দেশ। তিনি নাকি মোটরের সন্ধানে যাইবার জন্য কোন্ গ্রামে সাইকেলের চেষ্টায় ঘুরিতেছেন। এই অবসরে টিফিন বাক্সটা খুলিয়া ফেলা গেল—তিনিও হাজির হইলেন! বাক্সটা খালি হইবার পর তবে আমরা বহির্জগতের দিকে মন দিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম।

আবার সেই পথে প্রত্যাবর্তন—সেই পিলাধরা, কালোত্রা, কেওড়া, সেই অরণ্য, সেই গিরিশ্রেণী। যাইতে যাইতে দিনের আলো নিবিয়া গেল, দূরে নিকটে সমস্ত গিরিশ্রেণী, অরণ্য, বনস্পতি, নির্ঝর, শিলাখণ্ড সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে মিশিয়া একাকার হইয়া গেল। আকাশে তারা ফুটিতে আরম্ভ করিল; এই সুগভীর পাতালপুরী হইতে ঊর্দ্ধে অনন্ত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন স্তিমিত নেত্রে স্তব্ধ কৌতূহলে আমাদের এই কয়টি প্রাণীর নিরুদ্বেগ যাত্রা চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দিনের আলোয় এ অরণ্য-পথের এক রূপ দেখিয়াছি, অন্ধকারে তার আর এক রূপ দেখিলাম।

একলিঙ্গজী—নাথদ্বার—কাঁকরোলী

পরদিন (২৫শে) সেই মোটরেই নাথদ্বারের পথে যাত্রা করা গেল। আর উদয়পুরে ফেরা হইবে না—তাই ফুলচাঁদজীর হিসাব চুকাইয়া, আমাদের তিনদিনের ঘরকন্না ভাঙিয়া, মালপত্র বাসের মাথায় বোঝাই করিয়া রওনা হইলাম। ফুলচাঁদের 'মোকানে' কিছু কিছু অসুবিধা থাকিলেও মোটের উপর উদয়পুরে সুখেই ছিলাম, বিদায়ের সময় একটু কষ্ট হইতে লাগিল। বিজয়দার কষ্ট বেশী, কারণ তাঁর অমন বাতের বেদনাও উদয়পুরের জলহাওয়ায় প্রায় আরাম হইয়া গিয়াছিল।



জয়সমুদ্রে নৌকা-বক্ষে

নাথদ্বার উদয়পুর হইতে ৩০ মাইল উত্তরে। পথে এগার মাইলে একলিঙ্গজীর মন্দির পড়ে। এ পর্য্যন্ত রাস্তা বেশ ভালই, তার পরে যা তা না বলাই ভাল। এবার ভিন্ন পথে রেসিডেন্সীর পাশ দিয়া উদয়পুরের সীমানা ছাড়াইলাম—আমাদের পিছনে পেশোলার তীরের শুভ্র রাজপ্রাসাদগুলি সেদিনকার মতই প্রাতঃসূর্য্যকিরণে জ্বলিতে লাগিল।

প্রথম কিছুদূর রাস্তা সমতল—পাহাড় দেখা যাইতে লাগিল কিন্তু দূরে। চার পাঁচ মাইলের পর এক গিরিশ্রেণী আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—সেই পাহাড়ের

গা বাহিয়া পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া উপরে উঠিয়াছে। নীচের উপত্যকাভূমি—গাছপালাশূন্য ঊষর মরুপ্রান্তর—অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল। তিন মাইল পর্য্যন্ত এই চড়াই শেষ হইয়াছে দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী এক রন্ধ্রপথে। রন্ধ্রের মুখে ঠিক কেওড়ার মত একটি তোরণ—পাহাড়ের গা দিয়া দুইটি পাষাণ প্রাচীর তাহার উপর আসিয়া মিশিয়াছে। তোরণের নাম 'চীরউয়া কা দরওয়াজা', অপর প্রান্তে চীরউয়া গ্রাম, তার পরে দুমাইল কেবল উৎরাই। পাহাড়ের পথে সকলের চেয়ে মজার দৃশ্য দেখিলাম উষ্ট্র-পৃষ্ঠযাত্রী পথিকদের দুরবস্থা; উটেরা যে ভাবে দৌড়ঝাঁপ করিয়া পাহাড়ে ওঠে বা নামে তা বাস্তবিকই দেখিবার জিনিস।



চীরউয়াকা দরওয়াজা—একলিঙ্গজীর পথে

একলিঙ্গজী—চীরউয়ার পর যে উপত্যকাভূমি তারই এক নিভৃত অংশে পাহাড়ে ঢাকা একলিঙ্গজীর মন্দির। একলিঙ্গজীর রাজ্য মেবারের অতি প্রাচীন এবং পবিত্র জনপদ—মেবারের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে এর যোগ আছে। তখন এর নাম ছিল পরাশর মহাবন—মেবার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পা রাওয়ের শৈশবকাল এই বনের মধ্যেই কাটিয়াছিল। বাপ্পার শৈশবে ভীলেরা তাঁর পৈত্রিক রাজ্য কাড়িয়া লইলে রাজপুরোহিত ব্রাহ্মণেরা তাঁকে লইয়া এই বনে পলাইয়া আসেন। এর কাছে নাগদা অতি প্রাচীন গ্রাম, সেখানে শৈব ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ছিল। ভীলবালকদের সঙ্গে বাপ্পা এই বনে গরু চরাইয়া বেড়াইতেন এবং প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে এই গোচারণের মধ্যেই তিনি একলিঙ্গজীর দর্শন পান। এক নিভৃত পর্ব্বত কন্দরে লতাগুল্মের মধ্যে একটি গাভীর স্তন হইতে দুগ্ধধারা আপনিই উৎসারিত হইতে দেখিয়া বাপ্পা সেই লতাগুল্মের অন্তরাল হইতে একলিঙ্গজীকে উদ্ধার করেন এবং এক শৈব সন্ন্যাসী হারীতের কাছ হইতে রাজটিকা আর 'একলিঙ্গকা দেওয়ান' এই সম্মানিত উপাধি লাভ করেন। তার পরেই তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। তাই একলিঙ্গ শুধু মেবার-রাণাদের কুলদেবতা ন'ন, সমস্ত মেবার রাজ্যই একলিঙ্গের সম্পত্তি—রাণা মাত্র তাঁর দেওয়ান। একলিঙ্গের বর্ত্তমান পুরোহিতেরা হারীতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

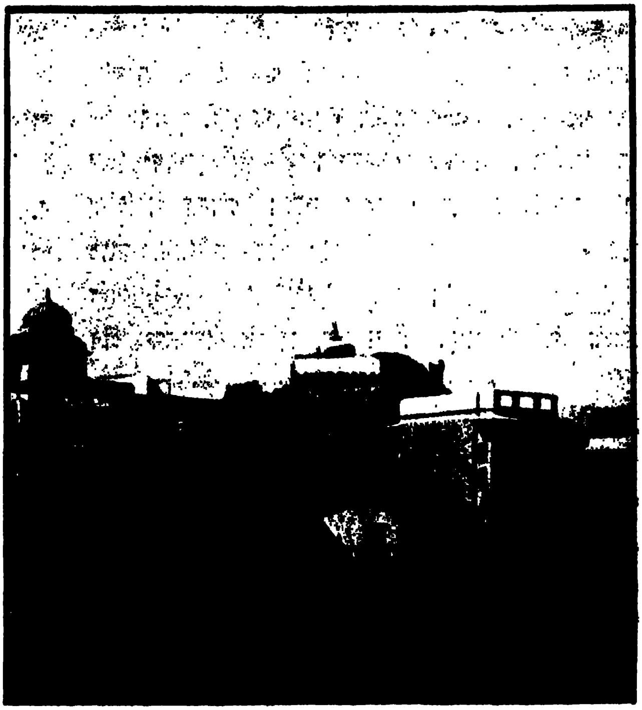
সমস্ত মেবার যাঁর সম্পত্তি এবং মহারাণা যাঁর দেওয়ান তিনি কিন্তু একরকম অরণ্যের মধ্যেই বাস করেন। মন্দির ছাড়া কয়েকটি ধর্ম্মশালা, যাত্রী-নিবাস এবং মহারাণার এক মহল—এই লইয়াই তাঁর গ্রাম; লোকজনের ভীড়, যাত্রীর কলরব এসব বড় নাই। ঐশ্বর্য্যে ও প্রভাবে শ্রীনাথজী এখন একলিঙ্গজীকে অনেক ছাড়াইয়া গিয়াছেন; তাঁর নাথদ্বার মস্ত সহর, তাঁর মোহন্তের সম্মানের অন্ত নাই। শ্মশানে যাঁর বাস, বাঘাম্বর মাত্র যাঁর সম্বল, রাজৈশ্বর্য্য তাঁর ধাতে সহিবে কেন; সে বরং যিনি একদিন মথুরায় রাজ্যপাট লইয়া অভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাঁর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের সমারোহ নাই বলিয়াই একলিঙ্গজীর রাজ্য আরও সুন্দর; নিভৃতে নির্জ্জনে পাহাড়ের কোলে বনে জঙ্গলে ঘেরা এই ছোট গ্রামখানি দেবনিকেতন হইবার যোগ্য। বাড়ী ঘর সমস্তই পাহাড়ের গায়ে—ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। মন্দির যেখানে, তাকে ত পাতালপুরী বলিলেই চলে।

মন্দিরচত্বরের দ্বারে পৌঁছিয়া শুনিলাম দশটার পূর্ব্বে ভিতরে যাইবার অনুমতি নাই। মন্দিরের দ্বার দশটার সময় খুলিবে তা আগেই জানিতাম, কিন্তু তার পূর্ব্বে মন্দির-প্রাঙ্গণে

ঢুকিয়া আশ পাশ দেখিতে কি আপত্তি হইতে পারে তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধগম্য হইল না। মেবার সরকারের আইন-কানুন অবশ্য আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার ধার ধারে না, তাদের উত্তর অতি সোজা—'হুকুম নেহি'। অগত্যা দশটার ঘণ্টাবাজা পর্য্যন্ত গ্রামটি দেখিয়া বেড়াইলাম।

মন্দিরটি নীচু—যেন বসিয়া গিয়াছে মনে হইল। দেওয়ালের শ্বেত পাথরের উপর আগে নানারকম কারুকার্য্য ছিল, এখন চুণের স্তরের নীচে তা অদৃশ্য। দু এক জায়গায় চুণের স্তর ভাঙ্গিয়া পড়ায় কারু-কার্য্যের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল। মেবার সরকারের চুণের উপর যে প্রগাঢ় ভক্তি এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখিলাম না। মন্দিরের মণ্ডপে শয়ান বিশাল শ্বেতপাথরের নন্দী (বৃষ) মূর্ত্তি—মন্দিরের সমানই প্রাচীন। একলিঙ্গদেবের মূর্ত্তি-পরিকল্পনা একটু অভিনব রকমের—কাল পাথরের লিঙ্গ, তাকে বেষ্টন করিয়া চারিটি মুখ। তখন পূজা আরম্ভ হইয়াছে, পুরোহিতের মাথায় এক অদ্ভুত ধরণের উষ্ণীষ—শিরস্ত্রাণের মত উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। এই উষ্ণীষই নাকি পুরো-হিত সম্প্রদায়ের পরিচয়-চিহ্ন। মহারাণা উপ-স্থিত থাকিলে পুরোহিতের সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। পূজার্থীর ভিড় বেশী ছিল না, ভিতরে কেউ আমাদের কোনও বাধা দিল না, প্রণামী ইত্যাদি লইয়াও কোন হাঙ্গাম নাই। মন্দিরচত্বরে আরও অনেক ছোটখাট দেবতার মন্দির দেখিলাম।

নাথদ্বার—দশটার সময় আবার রওনা হইলাম। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, একলিঙ্গজীর দশটার ঘণ্টা আমাদের দশটার অনেক আগেই বাজিয়াছিল; মেবার-রাজ্যের ঘটিকাযন্ত্রের সঙ্গে পৃথিবীর কোনও ঘড়ীরই মিল নাই, তিনি চলেন নিজের এক অদ্ভুত নিয়মে—তা উদয়পুরেই বুঝিয়াছিলাম। একলিঙ্গজীর ফটক পার হইয়া আমাদের আরও খানিকটা নামিতে হইল, তার পরে যে রাস্তায় পড়িলাম তাকে আর রাস্তা বলা চলে না। মনে হইতেছিল যেন এক বন্ধুর উপলময় শুষ্ক নদীর খাতের উপর দিয়া চলিতেছি—এমনি চমৎকার পথ। অনেক কষ্টে মাথা বাঁচাইয়া মোটরের ডাণ্ডা শক্ত করিয়া ধরিয়া যাইতে হইল। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল শিলাখণ্ডের সঙ্গে অবিরত



নাথদ্বার মোহন্তর প্রাসাদ

সংগ্রামে আমাদের মোটর-যানের শক্তি বুঝি বা পরাভূত হইয়া যায়। বন জঙ্গল পাহাড় ছাড়া পথে এক মস্ত সহর পাওয়া গেল, নাম দৈলবারা, মেবারের ঝালাবংশীয় এক বড় সর্দ্দারের রাজধানী। সর্দ্দারের প্রাসাদ এক বিরাট অট্টালিকা—দূর হইতে মনে হইতেছিল যেন সুন্দর একখানি ছবি।

নাথদ্বারও পূর্ব্বে দৈলবারা সর্দ্দারের রাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল। এর প্রাচীন নাম শিয়ার, তারপরে বিগ্রহ শ্রীনাথজীর নামানুসারে এর নূতন নামকরণ হয় 'নাথদোয়ারা' বা নাথদ্বার। শ্রীনাথজী বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত আদি মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অন্যতম, আওরংজেবের অত্যাচারের আশঙ্কায় রাণা

রাজসিংহ তাঁকে মেবারে লইয়া আসেন। উদয়পুরেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে রাণার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু প্রবাদ আছে যে আসিবার পথে এই গ্রামে শ্রীনাথজীর রথের চাকা মাটিতে বসিয়া যায়। দৈবজ্ঞদের পরামর্শে তখন এইখানেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দৈলবারা-সর্দ্দার তাঁর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁর আর রাণার বদান্যতায় শ্রীনাথজী এক মস্ত জমীদারীর মালিক হইয়া পড়েন। এখন নাথদ্বার বৈষ্ণবদের এক বড় তীর্থস্থান—মস্ত সহর। গুজরাট কাথিয়াবাড় এবং অন্যান্য স্থান হইতে প্রতিদিনই অসংখ্য যাত্রী সমাগম হয় এবং গুজরাটী বণিকদের কল্যাণে শ্রীনাথজী আর তাঁর মোহন্তমহারাজের সমৃদ্ধির অন্ত নাই। মোহন্তমহারাজের আয় নাকি বৎসরে বিশলক্ষ টাকা; তাঁর মস্ত প্রাসাদ-দ্বারে সিপাহীশান্ত্রীর পাহারা। আমরা এই পর্য্যন্ত তাঁর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু বড় বড় পর্ব্বোপলক্ষে তাঁর সামিল। কিছুদিন আগেও এমন অবস্থা ছিল যে, তাঁকে প্রণামী দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে যাত্রীদের নাথদ্বারের সীমার বাহিরে যাইবার সাধ্য ছিলনা। আমরা অবশ্য সে সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য শুনি নাই।

নাথদ্বারে যখন প্রবেশ করিলাম তখন বেলা দ্বিপ্রহর। বড় বড় বাড়ী, ধর্ম্মশালা, যাত্রী-নিবাস, দোকান পসার প্রভৃতিতে সহরটি পূর্ণ—একটা ইংরাজী স্কুল পর্য্যন্ত আছে। দিল্লীওয়ালার ধর্ম্মশালায় আমরা ডেরা লইলাম—সেইটিই নাকি ওখানকার মধ্যে সব চেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যাত্রী-নিবাস। এর সামনেই মোটর কোম্পানীর আপিশ—তাঁদের নাথদ্বার রোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত মোটর সার্ভিস আছে। ধর্ম্মশালাটি একতলা—বেশ বড়, বন্দোবস্তও ভালই; তবে অনবরত যাত্রী সমাগমে ঘরে বাহিরে যেন একটা দুর্গন্ধে ভরা।



কাঁকরোলী

সোনার সিংহাসন আশা-সোটা ইত্যাদি যে সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উপকরণ বাহির হয় তা নাকি একটা দেখিবার জিনিস। নাথদ্বারার সীমার মধ্যে রাণার ক্ষমতা খাটেনা। মোহন্তমহারাজের নিজেরই আপিস, আদালত, সৈন্যসামন্ত পর্য্যন্ত আছে—অর্থাৎ সোজা কথায় তিনি একটা বড় রাজরাজড়ার

শ্রীনাথজীর অপূর্ব্ব ভোগের কথা অনেকদিন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম—সত্য কথা বলিতে গেলে দেবদর্শনের চেয়ে সেই ভোগের লোভেই এতদূর আসা। দিনে দুইবার করিয়া ভোগ হয়—সকালে অন্নভোগ আর বিকালে পাকা অর্থাৎ পুরীভোগ। ভোগের পর প্রসাদ একটা নামমাত্র

মূল্যে—জন পিছু দু আনা হিসাবে—বিতরিত হয়। মোহন্তের আপিশে বা গদীতে আগাম মূল্য জমা দিয়া আসিলে ভোগ বাড়ীতে পৌঁছাইয়া পর্য্যন্ত দেয়। আমরা পৌঁছিয়াই দুজনকে ভোগের সন্ধানে মন্দিরে পাঠাইলাম, এক টাকার বিনিময়ে তাঁরা যে দুইটি খাবারের ঝুড়ি আনিয়া উপস্থিত করিলেন তা আমরা ছয় জনে দুই বেলাতেও শেষ করিতে পারি নাই। ভাজাভুজি, তরকারী, ডাল, চাটনী প্রভৃতি চার পাঁচ রকমের করিয়াছিল—তার উপর রুটি, পায়স, দই ইত্যাদি। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য রান্নার কারিকুরি—শ্রীনাজীর কৃপায় পথে বাহির হইবার পর এই প্রথম এখানে খাঁটি দেশীভাবে দেশী রান্না খাওয়া গেল। বৈকালের ভোগে ক্ষীর রাবড়ী মিষ্টান্ন প্রভৃতি থাকে, আমাদের বরাতে এ যাত্রায় তা জুটে নাই, যদিও পাণ্ডার কাছ হইতে কিনিয়া মিষ্টান্নের রসাস্বাদন একটু করা গিয়াছিল।

খাওয়া দাওয়ার পর দেবদর্শনে যাওয়া গেল। এখানে মন্দির একসঙ্গে বেশীক্ষণ খোলা রাখে না, সমস্ত দিনের মধ্যে দুঘণ্টা অন্তর আটবার করিয়া খোলে। এই আটবারই বিগ্রহের নূতন বেশ বা সাজসজ্জা হয়—উত্থান হইতে শয়ন পর্য্যন্ত আটরকম অবস্থার আট রকম বেশ। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, ভোগবিতরণের স্থান প্রভৃতি বেশ জমকালো রকমের—শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্য্যের উপযুক্ত। মোহন্ত মহারাজের প্রাসাদের কথা ত আগেই বলিয়াছি, কিন্তু মন্দির দেখিয়া আমাদের হতাশ হইতে হইল। মন্দির বলিয়া যা দেখান হইল তা একটা সাধারণ হলঘর মাত্র—তার না আছে আকৃতি, না শিখর, না মণ্ডপ,—প্রাচীন মন্দিরের উপযোগী কোথাও কোন শিল্প সৌন্দর্য্যের চিহ্নমাত্র নাই; দেওয়ালের গায়ে দুই চারিটা ছবি যা দেখা গেল তাও কিম্ভূতকিমাকার—অতি সাধারণ রকমের। শ্রীনাথজীর ঐশ্বর্য্যের যা সদ্ব্যবহার তা একমাত্র ভোগ এবং প্রসাদ বিতরণেই।

মন্দিরের বাহিরের দ্বার খোলাই ছিল, কিন্তু যিনি দ্বারী তিনি আমাদের ঢুকিতে দিতে রাজী হইলেন না, তবে বিদেশী বা বাঙ্গালী দেখিয়া খাতির করিয়া বসিবার জায়গা দিলেন। তাঁর নিকট শোনা গেল, মোহন্তের নীচে একজন 'মুখিয়া' বা পূজারী আছেন, প্রত্যেকবার তিনি আসিয়া মন্দিরদ্বার খোলেন। তাঁর আসিবার সময় হইলে শঙ্খনাদ হয়—সেই ধ্বনি শোনা পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। তিনি আসিবার পূর্ব্বেও কিন্তু অনেকে আসিলেন এবং সোজা ভিতরে চলিয়া গেলেন। অনুমান হইল তাঁরাও দেবদর্শনার্থী তবে আমাদের মত দ্বারীর কৃপাপ্রার্থী নন। একটা জিনিস কিন্তু দেখিলাম—কেউ 'সেবা' করিবার ইচ্ছা জানাইলে তৎক্ষণাৎ তাকে ভিতরে যাইতে দেওয়া হয়। 'সেবা' অর্থে-দেবতার কোনও কাজ করা—ফলছাড়ান, নৈবেদ্য সাজান ইত্যাদি। মন্দিরের উঠানে এইরূপ অনেক সেবকসেবিকার ভিড় দেখিলাম—তাদের নাকমুখ কাপড়ে ঢাকা, পাছে নিঃশ্বাস লাগিয়া ভোগের জিনিস অপবিত্র হইয়া যায়। যাহোক অবশেষে শঙ্খনাদ শোনা গেল, পূজারী মহাশয় আসিলেন, আমরা প্রবেশের অনুমতি পাইলাম। মন্দিরের ভিতরের এবং বাহিরের—দুই দিকে—দুই দরজা, বড় বড় লোক ভিতরের দ্বার দিয়া ঢুকিলেন, আমরা বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। দ্বারখোলা হইলে ভিড়ের চোটে পিছু হটিতে হইল। ভিতরে তেমন আলো নাই, তার উপর কালো পাথরের মূর্ত্তি—সুতরাং দেবদর্শন ভাল হইল না। দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ মূর্ত্তি এইটুকু বোঝা গেল। গুজরাটী দর্শনার্থী এবং দর্শনার্থিনীরা মুঠা মুঠা টাকা প্রণামী দিলেন, আমাদের দুই চারি পয়সা কোথায় অন্ধকারে চাপা পড়িয়া গেল। মন্দির দ্বার আবার বন্ধ হইল—আমরাও ফিরিলাম।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীপাঁচকড়ি সরকার

দিল্লীকা লাড্ডু

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত আমিনুল হক্ বি-এ,

বিশ্ববিদ্যালয়কে চিরবিদায় দিবার পরে বিশাল কর্ম্ম-ভূমিতে কে কোথায় ভাসিয়া গেল পরস্পরে তাহার সন্ধান জানিলেও বহুদিন হ'তে অনিল, রণেশ, মুরো ও সাজাহান, এই চারি সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল বড়দিনের ছুটীতে অনিলের তৃতীয় ছেলের তৃতীয় বার্ষিকী জন্মদিন উপলক্ষে সকলেই তাহার কলিকাতার ভবনে সমবেত হইয়াছিল। সেদিন সান্ধ্য-ভোজনের পর অপরাপর আগন্তুকেরা চলিয়া গেলে অনিল বলিল, 'এমন শুভদিন আর সহজে হবে না ভাই,—চার চারটি রত্নের একত্রে সমাবেশ। মনে হচ্ছে যেন আমরা আবার সেই কলেজের ছোক্‌রার দল। ওহে, কা'রও কিছু আপত্তি চলবে না—গিন্নির হুকুম এবং আমার অনুরোধ,—এইখানেই অন্ততঃ এই ৪।৫ দিন তোমাদের বিকেলে চা-পান ও রাত্রে আহার করতে হ'বে।' মুরো (পুরো নাম মুরল হক্) বলিল, "তা মন্দ কি—আমার অন্ততঃ সম্প্রতি কোন দিকেই তাড়াহুড়ো নাই।" রণেশ বলিল, "আমিও 'ডিটো'।" সাজু (ওরফে সাজাহান আলি) বলিল,—"আমাকে না বল্‌লেও চল্‌তো, কারণ আমাদের ইণ্টালী থেকে তোমাদের ভবানীপুর আসা-যাওয়ায় যা' পেট্রল খরচা হয় তা' তোমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষাতে সম্পূর্ণ উসুল হ'য়ে গিয়েও লাভ থাক্‌বে যথেষ্ট।"

সময়টা এদের কাটিতেছিল বেশ—এদের নিবিড় বন্ধুত্বের মধ্যে কোন অশোভন কৃত্রিমতার ছাপ ছিল না। মনে হইত, ভারতের বিভিন্ন জাতের এখানে এমন একটা সমন্বয় ঘটিয়াছিল যা এদেশের জাতি-বর্ণ-ভেদ ও সাম্প্রদায়িক কলহ-কলুষিত ইতিহাসের অন্ততঃ একটা পাতা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। অনিল ছিল ব্রাহ্ম, রণেশ এক মূর্দ্ধণ্য 'ণ' বেণী, আর মুরো ও সাজু মুসলমান—হয় ত একজন মোগল আর একজন পাঠান।

সেদিন তা'দের 'ব্রীজ'ও অনেকক্ষণ চলিল। খেলা সাঙ্গ হইলে মুরো বলিল—"আচ্ছা আজ সিনেমা কিম্বা থিয়েটার যাবার ত কথা নেই, কোন আষাঢ়ে গল্প জুড়ে দিলে হ'ত না?

রণেশ বলিল—আপত্তি কি?

সাজু বলিল,—কিন্তু কি রকম আষাঢ়ে গল্প হে! আমি বলি, এখন ত সবাই আমরা যা'কে বলে গার্হস্থ্যাশ্রমের দুর্গম পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি, এমন কি যে অনিলটা বিবাহরূপ দিল্লীকা লাড্ডু কোন দিন ভক্ষণ না ক'রে "চির-কুমার সভার" মেম্বর হয়ে থাকবে ব'লে কলেজ লাইফে আস্ফালন কোরত, সেও আজ তিন ছেলের জনক। তা'ই মনে হয়, স্ত্রীলোকের স্বরূপটা কে কি রকম দেখলে, বুঝ্‌লে, তা' personal experience থেকে আলোচনা কর্‌লে নেহাৎ মন্দ হ'ত না।

কথাটা শেষ হইতেই সকলের অট্টহাসিতে বাড়ী যেন কাঁপিয়া উঠিল। গৃহকর্ত্রী বিমলা উপর হইতে নামিয়া ইহাদের অজ্ঞাতসারে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "আপনাদের এই হাসির হর্‌রাতে শান্তিভঙ্গের উপক্রম হচ্ছে না ত? কারণ আজকাল চারিদিকেই পুলিশের যে রকম হানা চলেছে তা'তে আপনারা যদি পাক্‌ড়াও হ'ন্ ত বিচিত্র কি। কি বলেন রণেশ বাবু?"

"আজ্ঞে না, আমরা সম্প্রতি আমাদের কলেজ-লাইফে ফিরে গিয়ে সেই কালের অট্টহাসির মহলা দিচ্ছি। আর তা'র সঙ্গে যা একটা আলোচনার উপক্রম হয়েছে, তা'তে আপনি উপস্থিত থাক্‌লে সুবিধা কোন পক্ষেরই হবে না—আলোচনাটা আড়ষ্ট হ'তে বাধ্য।"

"কি আলোচনা, শুন্‌তে পারি কি?"

"বল না হে সাজু, তোমার বিষয়টা কি" বলিয়া রণেশ সাজুকে একটু নাড়া দিল।

"শেষ কালে আমিই ধরা পড়লাম,...আমাদের বিষয়টা ছিল...স্ত্রীলোকের স্বরূপ বর্ণনা।"

"বাঃ বেশ ভাল subjectই বটে; আমিও যে তা' হ'লে interested; এই আলোচনা শুনতে আমার কি কিছু বাধা আছে?"

অনিল বলিল, "ওরে বাসরে, তাও কি হয়? আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না তা হ'লে। বরং তা'র চাইতে তুমি ত শীগ্‌গীর বান্ধবীদের চায়ে ডাকবে শুনছি, তখন না হয় তোমরাও প্রাণভরে পুরুষের স্বরূপ আলোচনা কোরো।"

"উত্তম প্রস্তাব" বলিয়া রণেশ অনিলকে সমর্থন করিল।

বিমলা বলিলেন, "আমি তা' হ'লে outvoted হ'য়ে যাব দেখছি। আচ্ছা, দেখি আমরাও যদি ঐ রকম একটা কিছু করতে পারি",...বলিয়া বিমলা দেবী চলিয়া গেলেন।

'এখন বল দেখি ভায়া, রণেশ, তোমার অভিজ্ঞতাটা কি?' বলিয়া এই সভার অনির্ব্বাচিত সভাপতি সাজু হুকুম করিল।

রণেশ বলিল, "আমিই প্রথমে? আচ্ছা কুছ পরোয়া নেই।...সোজা কথায় আমি ভাই, এমন romantic কিছু পাই নি, যাতে একটা পোরশিয়া ডেস্‌ডেমোনা কি ওফেলিয়া কিংবা তা'দের বাদ দিলেও স্বদেশী সূর্য্যমুখী, শৈবলিনী, ইন্দিরা কি রজনী গড়্‌তে পারা যায়। সত্য বল্‌বো, কবির কথায় আমি দেখেছি "দেবী, গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা পুণ্যবতীরে।" মোটের ওপর কলেজের সেই 'দিল্লীকা লাড্ডু' theoryটা আমি আগেও বিশেষ সমর্থন কোর্‌তাম না, এখনও না। তবে কথাটার ভেতর যে কিছু নাই তাও বোল্‌তে পার্‌ছি না।"

সাজু বলিল, "বাঃ বেশ, তুমি যে দেখ্‌ছি তিনটা বিশেষ্য আর একটা বিশেষণেই কাজ ফর্সা করলে হে! কেন বন্ধু, অভিধানে কি আর বিশেষ্য বিশেষণ নাই? আচ্ছা নুরো ভায়া, কি বল?"

নুরো একটু ত্যাবাচাকা খাইয়া গেল। প্রকাশ্যে বলিল, "আঃ সাজুটা এ কি আপদ সৃষ্টি করলে...দেখ্‌ছি ঘরের কথা ফাঁস হয়ে যায়! আচ্ছা, তবে শুনহ সভাজন—

"আমার অভিজ্ঞতাটা প্রকাশ করবার জন্য রণেশের মত কোন কবিকে আপাততঃ হাতড়িয়ে পাচ্ছি না; তা' যাক্ গে। সত্য বলতে কি, আমি স্ত্রীলোকের তিনটি "স্বরূপ" দেখেছি—প্রথম stage হচ্ছে, খেলার সাথী, দ্বিতীয় stage হচ্ছে wife (wর উপর accent দিয়ে) আর তৃতীয় stageএ মাষ্টার মশাই কিম্বা মুনিব!"

নুরোর কথাগুলোতে এমন একটা স্বচ্ছ উপহাসের ভঙ্গিমা ছিল যে, কেউ না হেসে থাকতে পারল না। সাজু বল্‌লে, Bravo, Bravo! একদম original!'

অনিল বল্‌লে, 'ওহে কিছু বোঝা গেল না ত,—explanatory নোটের একান্ত আবশ্যক। বিয়ে ত তোমার এই দশ বারো বৎসর হ'ল, এরি মধ্যে তিন্ তিন্‌টে stage—'

নুরো আবার আরম্ভ করিল—"আমি যে স্বামী, তা'র পূজনীয়, মাননীয়, মহামান্য প্রভু, এটা সে প্রথম প্রথম গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লে না। না ছিল তা'র ভয়, না ছিল তা'র সঙ্কোচ। Explain কর্‌লে যদি রসভঙ্গ না হয়, তবে বলতে পারি যে, সেই বার বৎসরের মেয়ে, মা'র "বউ মা" হ'য়ে যখন ঘরে এল, তখন সত্যিই সে মনে কোর্‌ল, আমি তার শ্বশুরবাড়ীতে একটা খেলার সাথী। তা'র পুতুল কেনার ফরমাশ আমার উপর দিয়েই হ'ত, তা ছাড়া নির্ব্বিকার চিত্তে আমাকে দেখ্‌তে হ'ত আমার রং বেরংয়ের রেশমী রুমাল গুলো তা'র পুতুলের গায়ে নিত্য নূতন ভাবে চড়্‌ছে। মা বোল্‌তেন মেয়েটার নিঃসঙ্কোচ সরলতা দেখে বড্ড আনন্দ হয়। আমাদের এবাড়ী ওবাড়ীর সমবয়স্কেরা যাঁরা সেয়ানা সোমত্ত বৌ বে করে ঘরকন্না কোর্‌ছেন্—তাঁরা বলতেন—একদম কপালকুণ্ডলা!—আমি মনে মনে কপালে করাঘাত ক'রে বল্‌তাম হায়রে! এই সরলা কপালকুণ্ডলা তা'র পুতুল ঘর ছেড়ে কবে "wife"এ প্রমোশন নিয়ে আমার এই যৌবন-সুখ-স্বপ্নকে একটা বাস্তবতার আকার দেবে। কবে এই আমার নিরস, শুষ্ক, কঠোর দুনিয়াটাকে একটু সরস ক'রে তুলবে। কিন্তু বেশী দিন ভাব্‌তে হ'ল না; সত্যিই যখন বছর কয়েকের মধ্যেই "wife" হ'য়ে

উঠ্‌ল, তখন মনে হ'ত "ডব্লিউর" উপরে একশ accent দিলে বুঝি তা'কে কিছুমাত্র প্রকাশ করা যায়! মনে হ'ত এই আমার সুখের রাজত্ব। যেন জীবনটা এখন একটা মস্ত কবিতা—যেন এই "stage"-টাই চিরস্থায়ী, চিরসত্য। কিন্তু তা'র পরে? কবিতা উবে যাচ্ছে, গদ্যটা নেহাৎ বেমালুম্ ঢুকে পড়্‌ছে—যদি বা কখন-সখন কবিতার এটু আলো গাছের ঘন ডালের ভেতর দিয়ে চাঁদের আলোর মত আস্‌ত!"

অনিল বল্‌লে—"অর্থাৎ?"

'অর্থাৎ আর কি—তা'র পরে যা' হ'য় তাই—"পুত্র কন্যা, ভেসে আসে যেন প্রবল বন্যা"। আজকাল গিন্নি অন্য বুলি আওড়ান—সেই বার বৎসরের ক্ষুদে মেয়ে বড় বড় speech ঝাড়েন।—বুঝ্‌লে ভায়া? এই শ্রীল শ্রীযুক্ত মৌলবী নুরল হক্, ছ'শ টাকার ঘটিরাম প্রবরের উপর সে হুকুম চালায়—মাসকাবারের মুখেই মাহিনার টাকাটা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে আমার পকেটখরচ অতি অনিচ্ছায় ছ'টাকায় বরাদ্দ করে, অর্থাৎ মাহিনার শতকরা এক টাকা হিসাবে। তারপর "ওগো, দেখ বেশী দেরী করো না—আজ এত দেরী হ'ল কেন?—আড্ডায় যাবার কোন দরকার নাই—ক্লাবে বিলিয়ার্ড খেলার নেশা ভাঙবে না কি তোমার" ইত্যাদি নিত্যকার শাসন।—এ যেন ডিমক্রাসির লেশ মাত্র নাই, একদম পুরা অটোক্রাসি! এখন বুঝেছ, সাধে কি বলেছি মাষ্টার মশাই ও মুনিব।"

রণেশ আর থাক্‌তে পারিল না; চেয়ার থেকে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"থ্রি চিয়ার্স ফর লেডি নুরো! এই ত চাই; ভারত-উদ্ধারে এই সব নারীর প্রয়োজন।"

নুরো বলিল—"আঃ রণেশ, গৃহকর্ত্রী হয় ত আনাচে কানাচে কোথাও আছেন, একটু সমিহ ক'রে আহ্লাদ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। এখন সাজু ভায়ার কথাটা শোনা যা'ক্।"

সাজু বল্‌লে—"আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, আমার আবার কথা—তোমাদের এত কবিত্ব, এত লালিত্যের মধ্যে আমার কথা-টথা সব ডুবে গেছে। আমাকে বাদ্ দিতে হ'ল।"

"না, কখনও না, তা' হ'তেই পারে না। অমন অন্যায় আব্দার কোর্‌লে চল্‌বে কেন্?"— বলিয়া অনিল সাজুকে শাসাইল।

"নেহাৎ যখন তোমরা নাছোড়বান্দা তখন আর কি করি" বলিয়া সাজু আরম্ভ করিল—"দেখ, আমি ভাই সত্যি সত্যি স্ত্রীর মাত্র একটী স্বরূপ দেখেছি—আর সেটাই আমার বিশ্বাস তাদের চিরন্তন স্বরূপ—অর্থাৎ জন্মদায়িনী। আমি স্ত্রী সম্বন্ধে unparliamentary language প্রয়োগের অভদ্রতা ক'র্‌তে চাই না, তবে যিনি বৎসরে বৎসরে পুত্রকন্যা প্রসব ক'রে তাদের লালন পালনে কিছু মাত্র কষ্টানুভব করেন না, তিনি শক্তিরূপিনী জন্মদায়িনী নিশ্চয়ই! জান অনিল, এ দেশটায় লোকে খেতে পায় না, লোক সংখ্যাও বেশী, আমার কদর নেই; কিন্তু প্যারিসে থাক্‌লে আমি নিশ্চয়ই একটা মোটা রকমের প্রাইজ পেতাম। আমার বিশ্বাস, আমি record break করেছি—কারণ প্রায় সাড়ে চার বৎসরের মধ্যে পাঁচটি পুত্রকন্যার বাপ হওয়া কম গৌরবের কথা নয়—শেষের দু'টী যমজ কি না! ভাগ্যিস্ পিতৃদেব কিছু রেখে গিছ্‌লেন, নইলে এই একত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর পাঁচটি বংশধরকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হ'তে হ'ত। গৃহিণীটী মা হিসেবে অতি ভাল, তবে স্ত্রী হিসেবে যে কেমন ধারা, সেটা ভাল ক'রে বুঝে ওঠ্‌বার অবকাশ হ'ল কই? আচ্ছা, এখন অনিলের কি রকম বুঝে ওঠ্‌বার অবকাশ হয়েছিল শোনা যাক্। পরস্ত্রীর স্বরূপের কথা বল্‌লে হয়ত বেয়াদবী হয়। তবে অনিল না বল্‌লেও বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে বল্‌তে পারি যে, তা'র গৃহিণী হচ্ছেন যেমনি রূপসী, তেমনি বিদুষী এবং ততোধিক 'আগন্তুক-সেবী'!"

অনিল বলিল, "থাম, থাম। তোমার এত সব compliment শুন্‌লে হয় ত আমাকে আর কেয়ারই কর্ব্বে না। প্রকৃত কথা যদি শুন্‌তে চাও তা' হলে বল্‌তে হয় যে, স্ত্রী জিনিষটা আমাদের একটা অপ্রয়োজনীয় সৌখীনতা—হ'লে মন্দ নয়—না হ'লেও চ'লে যায়। এখন কথা হচ্ছে হ'লে-টার দিকে পাল্লা ভারী, কি না হ'লে-টার দিকে। এই দেখ না, বাবা মা যখন একে একে চ'লে গেলেন, তখন মনে হ'ত এ বিশাল পুরীটা, দাস দাসী, এমন কি বৃদ্ধা পিসীমা থাকা সত্ত্বেও যেন খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে। মনে হ'ত আমি যেন একটা

যেন একটা মরুভূমির মাঝে প'ড়ে গেছি, কোথাও তার একটা oasis নাই। Attorney-গিরিতে নাম জমা করাই রইল—practice কর্‌বার প্রবৃত্তিটুকুও রইল না। কিন্তু ভাই, যখন পিসীমার কল্যাণে স্ত্রী এলেন, রাতারাতিই আরব্যোপন্যাসের রাজপুরীর মত যেন সব বদলে গেল। যে বাড়ীতে অত আসবাব-পত্র থাক্‌তেও মনে হ'ত যেন কিছুই নাই, সে বাড়ীতে একটা প্রাণীর অবির্ভাবে সব ভরাট হ'য়ে গেল—কোথাও আর ফাঁক রইল না। চতুর্দ্দিকে একটা নূতন সাজ-সজ্জার রং চ'ড়ে গেল—বাড়ীর বাগানের ঘাস থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের Buick Carএর গা পর্য্যন্ত।"

"এইবার বুঝি মরুভূমিতে oasisএর দেখা পেলে" বলিয়া নুরো টিপ্পনী কাটিল।

"হাঁ, oasisও বটেই। তবুও ভাব্‌তাম যে, সত্যাই কি এটা জীবনে এতই প্রয়োজনীয়। আমার মনে হয়, মানুষ প্রয়োজন কি, আর কি নয়, তা' নিক্তির ওজনে হিসেব ক'রে চলে না; এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই যেটাকে ভাব্‌ছি না হ'লেও চল্‌ত সেটাও একটা মস্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে এবং জীবনের সঙ্গে জড়ীভূত হ'য়ে যায়।"

হঠাৎ বাধা দিয়া সাজু বলিল—"এ যে তুমি নিছক দর্শন আরম্ভ কর্‌লে হে—তা'র চাইতে সোজা বাংলায় বল না কেন, কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক্‌"।

"ওরে মূর্খ, নিছক দর্শন ত বটেই! দুটো একান্ত সম্বন্ধ-বিহীন প্রাণের চিরসম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে দুজনেরই জীবনের ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে গেল—একি একটা ছোটকথা?"

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। হঠাৎ বিমলা দেবী আসিয়া বলিলেন, "আপনাদের কলেজ লাইফের মহলা শেষ হলো?" অনিলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি যে শুন্‌ছিলাম ভারী বক্তৃতা দিচ্ছিলে। আমার বিবেচনায় এবার নারীসংরক্ষিণী সমিতির পাণ্ডা হ'য়ে Lecture-tourএ বেরিয়ে পড়। উপস্থিত সন্ধ্যা কখন হ'য়ে গেছে, ভদ্রলোকদের নিয়ে একটু বেড়িয়ে আস্‌তেও পার।"

অনিল অমনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "ওহে সত্যিই ত! চল একটু লেকের দিকে বেড়িয়ে আসা যাক্‌।"

২

আজ বিমলা দেবীর বাড়ীতে "চা"। ইচ্ছা করিয়াই তিনি তাঁর "পার্টিকে" সংক্ষেপ করিয়াছেন;—অনেক বন্ধু থাকা সত্ত্বেও তিনি মাত্র তাঁর স্বামীর বন্ধুত্রয়ের পরিবারদিগকে ডাকিয়াছেন—রণেশের স্ত্রী ইন্দুবালা, নুরোর স্ত্রী জমিলা ও সাজুর স্ত্রী হামিদা।

সেদিন নীচের ঘরে বন্ধুদের মধ্যে যা আলোচনা চলেছিল; তা তিনি আড়ালে থাকিয়া প্রায়ই সব শুনিয়াছিলেন। আজ যখন তাঁর বান্ধবী তিন জন আসিলেন, তখন ব্যাপারটা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "ওঁদের পাণ্টা জবাব দিলে মন্দ হয় না কিন্তু!"

জমিলা বিবি বলিলেন, "আমি রাজী, তবে তাঁদের অসাক্ষাতে আমাদের জবাব দিলে ত হবে না। তাঁদের চারটিকে এখানে ডাক্‌তে হবে। কি বল গো হামিদা বেগম? বন্ধুদের সামনে বার হ'তে তোমার কিছু আপত্তি আছে না কি? কি জানি ভাই, তুমি সবে পর্দ্দা ভেঙ্গে বের হতে আরম্ভ করেছ তাই জিজ্ঞাসা কোর্‌ছি?"

হামিদা—"আমার আবার আপত্তি কি ভাই? পর্দ্দা যখন এক রকম ছেড়েইচি, তখন স্বামীর বাল্য সখাদের সামনে বেরুতে আর কি? তবে আজকের পালায় স্বামী-নিন্দাটা ঠিক পছন্দ হচ্চে না।"

রণেশের স্ত্রী ইন্দুদেবী ব'লে উঠলেন, "নিন্দা ত নয়, স্পষ্ট কথা। যদিই বা তা-ই হয়, একদিন একটুখানি নিন্দে কর্‌লে কোন পাপ হবে না, ভয় নেই। না হয় বাড়ী ফিরে গিয়ে খুব ক'রে আদর সোহাগ ক'রে পুষিয়ে দিও।"

কথাটাতে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। এই অবসরে অনিল উপরে আসিয়া নেপথ্য হইতে বলিয়া উঠিল, "বেয়াদপি মাফ কোর্ব্বেন, মেয়েমহলে একটু গোল হচ্ছে। আমাদের ব্রিজ খেলা জমছেনা ভাল; তা ছাড়া পাহারাওয়ালা-দেরও কিছু ভয় আছে।"

জমিলা বল্‌লেন—"কে, মিষ্টার অনিল না কি? আপনি যে অন্তরাল হতেই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া কোর্ত্তে চাচ্ছেন; ভেতরেই আসুন না। সম্মুখ সমরে আপনাদের বুঝি ভয় করে?"

"আজ্ঞে না" বলিয়া অনিল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সকলকে বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করিল। তার নমস্কার শেষ না হতেই মিসেস্ মুরো বলিতে লাগিলেন—"আপনি ত নেহাৎ অরসিক মশায়! আমাদের মত ladies-দের হাসিতে ত গোল হবার কথা নয়। অন্ততঃপক্ষে আমাদের মধ্যে যার হাসিটা সব চেয়ে মিষ্ট লাগ্‌ছিল সেই পরিচিত হাসিতে ত আপনার inspired হওয়া উচিত ছিল।"

আবার সকলের হাসি।

জমিলা বিবি বলিতে লাগিলন, "আপনারা নাকি সে দিন ব'সে ব'সে খুব 'দিল্লীকা লাড্ডু' খাচ্ছিলেন; আজ যদি আমাদের এই মজ্‌লিসে ব'সে আপনার গৃহিণীর তৈরী অখাক্ জলপান কিছু খেতে চান্ তাহলে আপনারা সবাই উপরে আস্‌তে পারেন।"

অগত্যা চারি বন্ধুকে উপরে ড্রয়িং রুমে আসিয়া বসিতে হইল। মামুলি সম্ভাষণ, কুশলাদি জিজ্ঞাসাবাদ হইয়া গেলে নানা উপকরণাদি সহ চা চলিতে লাগিল। বিমলাদেবী মুরোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখুন মিষ্টার মুরো, জমিলা বল্‌ছিল যে, আপনার হাকিম না হয়ে থিয়েটারের অভিনেতা হওয়া উচিত ছিল। কারণ আপনার কল্পনাশক্তি নাকি এত প্রখর যে, বিয়ের পর থেকে আপনি নারীর নানা রূপ দেখতে পান্ এবং সেই অনুসারে মাঝে মাঝে অভিনয় করেন।"

মুরো তার সেদিনকার কথার সঙ্গে এই কথার সঙ্গতি বুঝিতে পারিয়া চমকিয়া গেল; তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "স্ত্রীর তরফ থেকে এত বড় complimentটা আমি মেনে নিতে বাধ্য। সত্যিই হয়ত থিয়েটারের অভিনেতা হলে Sir Harry Lauder-এর মত একদিন নাইট উপাধি পেতে পার্‌তাম। কিন্তু এই ঘটিরামগিরিতে সে ব্যবস্থার কোনও সম্ভাবনা নাই।"

ইন্দুদেবী বলিলেন—"সেদিন নাকি আপনারা নারীর স্বরূপ নিয়ে খুব আষাঢ়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন; আমরা যদি আজ পুরুষের স্বরূপের আষাঢ়ে গল্প জুড়ে দিই, সহ্য হবে ত আপনাদের?"

মুরো কাতর কণ্ঠে বলিল, "অসহ্য হলেও সহ্য কর্‌তে হবে—সে অভ্যাস আমাদের আছে।"

একটা হাসির কলরোল উঠিল।

মিসেস্ মুরো বলিলেন, "আচ্ছা ইন্দু, তুমি ভাই তোমার স্বামীর স্বরূপটা কেমন বুঝেছ, তা এই শীতের ঠাণ্ডায় যদি আমাদের শোনাও, তা'হলে আমরা সকলেই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌ব।"

ইন্দু বলিল, "না ভাই, আমার দ্বারা ওসব কিছু হবে না। আমি মুখ্য-সুখ্য মানুষ—ওসব স্বরূপ-টরূপ বুঝি না। তবে যদি একান্ত পীড়াপীড়িই কর, তাহলে বলব, ঐ যে মূর্ত্তিমান ব'সে আছেন, ওঁর মধ্যে আমি যা দেখি তা অপরূপ।"

সকলেই খুব হাসিয়া উঠিল। সাজু মিঞা রণেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি হে ভায়া, তুমিই যে দেখছি আজ 'hero of the day'! এ যে দেবীর চূড়ান্ত আত্মনিবেদন!"

মুরো এই সময়ে বলিয়া উঠিল, "হায়রে, এই শুভক্ষণে আমারও গৃহিণী যদি স্বামীর এই রকম প্রশংসা কোর্‌তেন, তাহলে হয়ত অবাধে আরও দু'তিন কাপ্ চা মেরে শরীরের তাপটা অনায়াসে রক্ষা কোর্‌তে পার্‌তাম।"

মিসেস্ মুরো বলিয়া উঠিলেন, "শোন কথা, উনি আবার প্রশংসা চান্। প্রশংসার যে কাজ করে প্রশংসা আপনিই তার কাছে আসে; আর যে প্রশংসা চেয়ে বেড়ায়, তার ভাগ্যে গোল আলু। বুঝলি ভাই ইন্দু? তুই ত যা হোক্ রূপ বল, অপরূপ বল, একটা কিছু দেখতে পেয়েছিস্; আমি কিন্তু ভাই, কোন কিছুরই দেখা পেলাম না। আমার সমস্তই অরূপ।"

"অর্থাৎ কি না, স্বামী ওঁর কাছে একটা অশরীরী ভূত-বিশেষ, কারণ যার রূপ নেই, স্বরূপ নেই, যে অরূপ—সে তা ছাড়া আর কি হতে পারে?" বলিয়া মুরো টিপ্পনি কাটিল।

কথাটাতে সবাই খুব হাসিল। হাসি সমাপ্তে মিসেস্ মুরো বলিলেন, "তা সত্যিই ত তোমরা এক রকম ভূত, কোন মূর্ত্তিই নেই, অথচ কত মূর্ত্তিই ধারণ কর!"

অনিল বলিল, "কি কি মূর্ত্তি আমরা ধারণ করি, এটা আপনাকে বোল্‌তেই হবে, মিসেস্ মুরো।"

মিসেস মুরো জবাব দিলেন—"দেখুন বিবাহ-জীবনে আপনারা গোড়ার দিকে যে রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তাকে আদর্শবাদ বলা যেতে পারে; তারপর আপনাদের যা অবস্থান্তর হয় তাকে বোধ হয় বস্তুতান্ত্রিকতা বলা যায়। সময় ক্রমে এই দুই অবস্থার পরিণতি যেটাতে হয়, তাকে সাম্যবাদ বল্‌লে বিশেষ ক্ষতি হয় না। দাম্পত্য জীবনের প্রথম অধ্যায়ে আপনারা স্ত্রীর কাছে সকাল থেকে সন্ধ্যা আর সন্ধ্যা হ'তে সকাল পর্য্যন্ত যে কতরকম কল্পিত, চিত্রিত বচনে নিজেকে নিবেদন করেন, কত রকম অদ্ভুত আদর্শে তাকে দেখ্‌তে পান্‌, তার আর ঠিক্‌ নাই। পুরাকালের সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী ও নাটক নভেলের পোর্শিয়া, জুলিয়েট, ডেস্‌ডেমোনা, সূর্য্যমুখী, শৈবলিনী, দুর্গেশনন্দিনী, আয়েশা ইত্যাদি সকলেই যেন আপনাদের চোখের সাম্‌নে মূর্ত্তিমতী হয়ে ওঠে। নিজেদের মোহে নিজেরাও ভোলেন, আমাদেরও ভোলাতে চান্‌। কিন্তু তার পর আসে যাকে বল্‌ছিলাম বস্তুতান্ত্রিকতা—অর্থাৎ যে ভদ্রলোক কল্পনালোকে উড়ে উড়ে বেড়াতেন, তিনি পুত্র-কন্যাদের আগমনে ও তজ্জনিত সাংসারিক চাপে সব ভুলে যান। এখন সীতা সাবিত্রী ইত্যাদিরা সব উবে গেছেন; তার বদলে যিনি আছেন, তিনি একজন এই আটপৌরে গোছ্‌ মেয়েমানুষ—ঘর-কন্না-করা, ছেলে-মেয়ে-লালন-পালন-করা, স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা-করা—তার তাঁবেদারী-করা একটা "স্ত্রী"। তখন আপনারা প্রমোশন নেন্‌ এক ডিগ্রী ওপরে—কর্ত্তা মশায়; আর স্ত্রী বেচারী, সে যেন একেবারে 'Subordinate Service'এ। ভাগ্যিস্‌ মেয়েরা আজকাল বাইরের আলো বাতাস পাচ্ছেন, লেখাপড়া শিখ্‌ছেন, তাই আপনাদের কর্ত্তৃত্বের আসনটা সময়ে সময়ে বাধ্য হয়ে স্ত্রীর আসনের সঙ্গেসমান level-এ এসে পড়ে, আর আপনারাও তখন অগত্যা সাম্যবাদ ঘোষণা করেন!"

সাজুমিঞা বলিয়া উঠিল—"দেখুন, ঐ যে একটা গোড়ার দিকে আমাদের পরিবর্ত্তনের কথা বল্‌লেন, তার ভেতরে একটা কথা আছে। আমাদের ঐ নাটক উপন্যাসের নায়িকাদের কিন্তু কারুর ছেলে পেলে ছিল কি না, ঠিক মনে পড়ছে না, আর আপনাদের…"

কথা শেষ না হতেই মুরো বলিয়া উঠিল, যে যাই বলুন, আমার একান্ত বিশ্বাস—মেয়েদের subjection মেয়েদেরই পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁরা যতই কেন trans-atlantic flight করুন, যতই Olympian gamesএ জিতুন, পুরুষের সমকক্ষ তারা কোনদিন হতে পারবেন না, প্রকৃতি সে বিষয়ে এমনই অনতিক্রম্য বাধা সৃজন ক'রে রেখেছে।"

বিমলা—"আমরা যদি আপনার theoryটা না মানি?"

মুরো—"আপনাদের অনেক আব্দার, অভিমান ইত্যাদির মত সেটাকেও আমরা পরমাদরে সহ্য কোরবো।

সাজু—"অর্থাৎ আমরা হচ্ছি বটগাছ, আপনারা পাখী—তার সুশীতল ছায়ায় বাস করেন।"

মিসেস্‌ সাজু এতক্ষণ চুপ্‌ চাপ্‌ ছিলেন; এইবার বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু তার ফল মানুষের কোনো কাজে লাগে না—মেয়েমানুষেরও না।"

সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

মিষ্টার মুরো বলিলেন—"আচ্ছা আমাদের মাননীয়া hostess মহাশয়া যে কিছুই বল্‌লেন না। আমাদের খুব খাইয়ে দিলেন ব'লেই যে তিনি রেহাই পাবেন, তা হতে পারে না।"

অনিল বলিল—"তা ত বটেই; বিশেষতঃ স্ত্রীর মুখে প্রশংসা শোন্‌বার জন্য আমার গা-টা সুর্‌ সুর্‌ কোর্‌ছে।"

বিমলা দেবী অনিলের দিকে তাকাইয়াই বলিলেন, "তাই ত মহাশয়ের সব জায়গায় ব'লে বেড়ান হয় যে, বিয়েটা হচ্ছে দিল্লীকা লাড্ডু,—যো খায়া ও পস্তায়া, যো নেহী খায়া ও ভি পস্তায়া। তোমরা বুঝি ভাব যে ঐ পস্তানিটা কেবল তোমাদেরই আছে; তা নয়, দিল্লীকা লাড্ডু আমরাও খাই। তবে কি জান, আমরা তোমাদের মত যখন তখন হাটে মাঠে-ঘাটে সেটা ব'লে বেড়াই না। কারণ তোমাদের কৃপায় আমরা অবলা, সরলা নারী, তোমাদের শ্রীচরণের দাসী।"

অনিল বাধা দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল "এইবার চল হে, ঘরের বাতাস গরম হয়ে উঠ্‌ছে; সকলে একবার লেকের দিকে ঘুরে আসা যাক্‌।"

আমিমুল হক্‌

সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষি-সঙ্ঘ

শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন

রাশিয়া ভারতবর্ষের ন্যায় একটি বৃহৎ দেশ। কৃষি যেমন ভারতবর্ষে জনসাধারণের প্রধান জীবিকা তেমনি রাশিয়ার অধিকাংশ জনসাধারণই জীবিকার জন্য চাষের উপর নির্ভর করে। এতদিন পর্য্যন্ত রাশিয়ার চাষোপযোগী ভূমি জমিদারদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। কৃষকসম্প্রদায় জমিদার-দিগের বেতনভোগী ভৃত্য ছিলমাত্র। তাহাদের গৃহ-সংলগ্ন সামান্য একটু ভূমি ব্যতীত তাহাদের চাষের মত নিজস্ব ভূমি বলিতে তখন কিছুই ছিলনা। ১৯১৭ সালের দেশব্যাপী বিপ্লবের পর রাশিয়ার সর্ব্ববিষয়েই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে, শিক্ষায় বহুদিন-সঞ্চিত পুরাতনের চিহ্ন দেশ হইতে লোপ করিয়া দিয়া তৎস্থানে নূতন আয়োজনে সমস্ত দেশকে গড়িয়া তুলিবার জন্য বিপ্লবী নেতারা বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের এই নূতন আয়োজনের প্রথম চেষ্টায় বাধার আর অন্ত ছিলনা। ঘরের বাধা, বাহিরের বাধা, এমন কি নৈসর্গিক বাধাও তাহাদের এই নূতন আয়োজনকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, দেশ হইতে সমস্ত বাধা দূরে অপসারিত করিয়া দিয়া বিপ্লবী নেতারা সমস্ত দেশকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য যে বিপুল আয়োজনের পত্তন করিলেন তাহা জগতের ইতিহাসে এক অভিনব ব্যাপার।

সেই নানাবিধ বিপুল আয়োজনের একটি আয়োজন নব-প্রতিষ্ঠিত কৃষক-সঙ্ঘ (collective farm)। রাশিয়ার কর্ষণোপযোগী ভূমি এখন আর জারের আমলের জমিদার-দিগের অধিকারভুক্ত নহে। জারের আমলের জমিদারগণ বিপ্লবীদের দ্বারা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের উদ্যানশোভিত বড় বড় বাড়িগুলি এখন কল কারখানা, শ্রমিকদের ক্লাবঘর, নাট্যশালা, শিক্ষালয় ও স্বাস্থ্যনিবাস প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে—বিস্তৃত জমিদারী আজ সরকার ও কৃষকদের হস্তগত।

ককেশাস্ উত্তর সাইবেরিয়ার কাস্পিয়ান সাগরের তীরে একটি বিস্তৃত প্রদেশ। ইহার অধিবাসীরা জারের আমলে সৈনিকবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কসাক-সৈন্যের বিভীষিকা তখন বাংলার বর্গীর বিভীষিকার ন্যায়ই রাশিয়ার জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করিত। আজ সেই দুর্দ্দান্ত কসাক্‌গণ সৈনিকবৃত্তি পরিহার করিয়া সঙ্ঘ-বদ্ধ কৃষক-সমাজে পরিণত হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত রাশিয়ার সোভিয়েট্‌তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ছিল দেশের কৃষক সম্প্রদায়। জমির প্রতি লোভ তাহাদের জন্মগত। সেই জমির স্বত্ব হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিয়া চাষের কাজে সমবায় প্রণালীতে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা নিতান্ত সহজ কাজ ছিলনা। এতদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েটতন্ত্রের এই-রূপ সমুদয় চেষ্টা প্রায় ব্যর্থ হইয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু কসাক্‌দের ভিতর এইরূপ সফলতায় দেশে নূতন তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান বাধা দূর হইল। আজ তাহাদের দৃষ্টান্তে রাশিয়ার অন্যান্য প্রদেশের কৃষকগণ সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া চাষের কাজে নিযুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ককেশাশ্ প্রদেশের কৃষি-সঙ্ঘগুলি এখনো সরকারী কৃষি-শালার ন্যায় সহুরে হইয়া উঠে নাই। বাড়ি ঘর পোষাক পরিচ্ছদে কৃষকদের মধ্যে সহজ সরল পল্লীজীবনের চিহ্ন এখনো বর্ত্তমান। দূর হইতে স্থানে স্থানে ফসল-উত্তোলক যন্ত্রের (Elevator) উচ্চচূড়া, ইষ্টকনির্ম্মিত পশুশালা ও সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ দুই একটি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ব্যতীত ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব অনুমান করা সহজ নহে। দুই একদিন তাহাদের মধ্যে বাস না করিলে এই সঙ্ঘজীবন কৃষক-পল্লীগুলিতে কী পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে তাহা অনুমান করা যায় না।

এই সঙ্ঘগুলির প্রধান বিশেষত্ব এই যে—জমি, চাষের যন্ত্র ও পশু প্রভৃতি কোনো-কিছুই কোন ব্যক্তি-বিশেষের অধিকারভুক্ত নহে—ইহা সঙ্ঘের সাধারণের সম্পত্তি। সঙ্ঘের অন্তর্গত কোন কৃষকের তাহার গৃহ-সংলগ্ন জমিটুকু ব্যতীত অন্যকোন জমির উপর কোনো ব্যক্তি-গত অধিকার নাই। চাষের গরু, ঘোড়া ও যন্ত্রাদি কিছুই তাহার নিজস্ব নহে—এ সমুদয়ই সঙ্ঘের সম্পত্তি। গৃহ-সংলগ্ন নিজস্ব জমিতে সে নিজের দৈনিক প্রয়োজনানুযায়ী তরিতরকারী, ফলমূল প্রভৃতি উৎপন্ন করিতে পারে, দৈনিক প্রয়োজনের ঘি, দুধ, মাখন, ডিম প্রভৃতির জন্য মুরগী কিম্বা গাইগরু প্রভৃতিও পালন করিয়া থাকে। প্রত্যেক কৃষকের নিজস্ব সম্পত্তি বলিতে ইহাই যা, ইহার অরিরিক্ত সমুদয়ই সঙ্ঘের অন্তর্ভূত।

সঙ্ঘের কাজ—যেমন জমিচাষ, বীজবপন, ফসলকাটা ও বৎসর শেষে ফসলবণ্টন প্রভৃতি নির্ব্বাহের জন্য একজন পরিচালক নিযুক্ত হয়। সঙ্ঘই অধিকাংশ ব্যক্তির সম্মতিতে এইরূপ পরিচালক নির্ব্বাচন করে, পরিচালকের কাজ চাষের জন্য জমির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং কোন্ ব্যক্তি কি পরিমাণে চাষ করিবে তাহাও তাহারই নির্দ্দেশানুযায়ী হইয়া থাকে। চাষের জন্য যে সমুদয় যন্ত্র, পশু ও বীজের প্রয়োজন সঙ্ঘই তাহা কৃষকদের জোগাইয়া থাকে। চাষ, মই, বীজ বপন, ফসলকাটা, ফসল মাড়ান প্রভৃতি চাষের সমুদয় কাজ সঙ্ঘের সকল ব্যক্তির সাহায্যে সম্পন্ন হয়। ইহার জন্য নিকটবর্ত্তী সরকারী কৃষিশালা হইতেও অভিজ্ঞব্যক্তিদের ডাকা হয়। সরকারী কৃষিশালা এরূপ সাহায্যের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। বৎসর শেষে সঙ্ঘের সমুদয় শস্য একস্থানে তোলা হয়। তারপর ফসল বণ্টনের পালা।

সে সময় সঙ্ঘপল্লীতে কী উত্তেজনা! সকলেরই মুখে ফসলের কথা। কে কি পরিমাণ পাইবে, কে ফসল লইবে, কে ফসলের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা লইবে পরস্পরের মুখে কেবল এই একই কথা। সমস্ত বৎসরে কে কি পরিমাণ কাজে করিয়াছে, কে কতদিন কাজে কামাই করিয়াছে, কার কাজে বেশী নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে এ সমস্ত তালিকাবদ্ধ হইয়া হিসাবের খাতায় পূর্ব্ব হইতে জমা করিয়া রাখা হইয়াছে। সেই হিসাবদৃষ্টে স্ত্রীপুরুষ সকলের মধ্যে ফসল বণ্টন করা হয়। কাজের পরিমাণ অনুসারে ফসল বণ্টন করা হয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে কাজে ফাঁকি দিবার চেষ্টাও কম। অনেকে আবার অতিরিক্ত প্রাপ্তির আশায় অতিরিক্ত খাটিতেও আলস্য বোধ করে না। সেইজন্য সঙ্ঘের মধ্যে কাজে কুড়েমি, অলসতা মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না. কখন কখন প্রয়োজন হইলে কৃষকদের অগ্রিম মজুরীও দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণতঃ বৎসরের শেষেই মজুরী বণ্টন করিবার নিয়ম। এস্থানে ইহা জানা উচিত সঙ্ঘের প্রতি সভ্যের ও গরু, ঘোড়া প্রভৃতির জন্য সম্বৎসরের খাদ্য ও পর বৎসরের বীজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ফসল সঞ্চিত রাখিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই কেবল সঙ্ঘের সভ্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ইহা ব্যতীত দুর্বৎসরের জন্যও ফসল সঞ্চিত রাখিবার ব্যবস্থা আছে। মনে হইতে পারে সম্বৎসরের খাদ্য ও দুর্বৎসর প্রভৃতির জন্য ফসল সঞ্চিত রাখিবার পর এমন কি ফসল উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে যাহাতে তাহাদের সমস্ত বৎসরের মজুরী পোষায়? হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে কোন আকস্মিক কারণে জমির ফসল নষ্ট না হইলে উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রয় করিয়া বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে তাহাদের যে মজুরী দেওয়া হয় তাহা তাহাদের প্রতিবেশী সাধারণ কৃষকের জমির আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহা ব্যতীত সঙ্ঘে যোগ দিবার সময় যাহারা নিজেদের গরু, ঘোড়া কিম্বা চাষের যন্ত্রাদি সঙ্ঘযুক্ত করিয়াছে তাহার জন্যও তাহারা অতিরিক্ত অর্থ পাইয়া থাকে। ইহা তাহাদের অনেকটা ব্যবসায়ের মূলধনের ন্যায়। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থায় এই মূলধন বাবদ কৃষকদের অতিরিক্ত প্রাপ্যের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন শুধু কাজের পরিমাণ হিসাবে সকলের মধ্যে মজুরী বণ্টন করা হইত। কাজেই তখন সঙ্ঘের অন্তর্গত কৃষকগণ সঙ্ঘে যোগ দিবার সময় তাহাদের নিজস্ব গরু, ঘোড়া, প্রভৃতি সঙ্ঘে দান না করিয়া হয় সেগুলিকে বিক্রয় করিত, নয় সেগুলিকে কাটিয়া খাইয়া ফেলিত; এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে সমস্ত দেশ হইতে চাষের পশু প্রায় উজাড় হইবার

যোগাড় হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে মূলধন বাবদ পৃথক প্রাপ্য প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জন্তুগুলি রক্ষা পাইয়াছে। ইহাতে কৃষকদের আয়ও বৃদ্ধি হইয়াছে, চাষেরও অনেক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থায় কৃষকগণ যে পরিমাণ জন্তু নষ্ট করিয়াছিল সেই ক্ষতিপূরণ করিতে এখনো অনেক সময় লাগিবে।

কৃষি-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইতে দেশে কয়েকটি সমস্যারও সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ কৃষকদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থের সমস্যা। উদ্বৃত্ত অর্থ বলিতে কেহ যেন মনে না করেন রাশিয়ার কৃষকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী হইয়াছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় রাশিয়ার কৃষকগণ এখনো যথেষ্ট পরিমাণে গরীব। উপরোক্ত সমস্যার প্রধান কারণ সঙ্ঘজাত উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করিবার মত দেশে পণ্য দ্রব্যের একান্ত অভাব। কাপড়, জামা, জুতা কিম্বা ঘর বাড়ী তৈরীর জন্য যে সমস্ত জিনিস তাহাদের নিত্য প্রয়োজন, একমাত্র সেই সমুদয় জিনিসই তাহারা বাজারে কিনিতে পায়। অধিক অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ হইলেও ইহার অতিরিক্ত বিলাস দ্রব্য বাজারে ক্রয় করিবার কোন উপায় নাই। কারণ প্রয়োজনীয় জিনিসের অতিরিক্ত বিলাসদ্রব্যের অভাব এখনো দেশ হইতে দূর হয় নাই। কাজেই কৃষকদের হাতে সঞ্চিত অর্থ নিতান্ত সামান্য হইলেও তাহা তাহাদের হাতেই সঞ্চিত থাকে। অথচ দেশে তখন সর্ব্বত্র অর্থের অত্যন্ত অনটন। সঞ্চিত অর্থের ব্যবহারের দ্বারাই দেশের অর্থ বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। সেই জন্য বর্ত্তমান সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কৃষকদের হাতের সঞ্চিত অর্থ দেশের প্রয়োজনে খাটাইবার জন্য সহরের কল কারখানায় উৎপন্ন অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যই কৃষকপল্লীতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আবার সহরেও শ্রমজীবিদের মধ্যে এই সমস্যার আবির্ভাবের একান্ত সম্ভাবনা আছে। কল-কারখানাজাত পণ্য-দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। তাহার আয়োজন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট পরিমাণেই করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমসমস্যা। জারের আমলেও রাশিয়ার কৃষকদের মধ্যে বেকার সমস্যা বর্ত্তমান ছিল। তখন সকলেই জমির কাজে নিযুক্ত থাকিত বলিয়া ইহা অনুভব করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ কাজ তখনও কোন কৃষকেরই হাতে ছিল না। কৃষিকার্য্যে তখন উন্নততর যন্ত্রাদির প্রচলন না থাকায় একজনের কাজ দুইজনে করিত, দুইজনের কাজ চার জনে করিত। কিন্তু তবু প্রতি বৎসরই রাশিয়ার কৃষকপল্লী-সমূহ হইতে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ কল-কারখানায় কাজ করিবার জন্য রাশিয়ার সহর সমূহে গমন করিত। বর্ত্তমান সময়ে কৃষি-সঙ্ঘের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির বাবদ বৎসরে বত্রিশ দিন করিয়া কাজ করিতে হয়। যে কৃষকের পরিবারের লোক-সংখ্যা পাঁচজন তাহাকে বত্রিশের পাঁচগুণ একশত ষাট্ দিন কাজ করিতে হয়। কিন্তু নব-বিবাহিত কৃষকের তাহার স্ত্রীর জন্য বৎসরে বত্রিশ দিনের অধিক কাজ করিবার প্রয়োজন হয় না। বাকি সময় অন্যত্র কাজ না পাইলে তাহাকে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে কৃষি-সঙ্ঘের অনেকেই অতিরিক্ত সময়ে নিকটবর্ত্তী সরকারী কৃষিশালা, কিম্বা সহরের কল-কারখানায় কাজ করিয়া থাকে। ভবিষ্যতে সহরে ও কৃষকপল্লী সমূহে কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বেকার সমস্যাও দূর হইবে এইরূপ আশা করা যায়।

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

নানা কথা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রায় এগার মাস ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় অতিবাহিত করিয়া গত ৩১শে জানুয়ারী শনিবার রাত্রে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। আমেরিকায় অবস্থান কালে কবির শরীর অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, উপস্থিত তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছেন। সুদীর্ঘকাল তাঁহাকে সুস্থ এবং সবল রাখিয়া ভগবান বাঙলা দেশের অশেষ মঙ্গল-বিধান করুন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

রবিবার কলিকাতায় অবস্থান করিয়া পরদিন কবি শান্তিনিকেতনে প্রস্থান করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি শীঘ্রই তথায় একটি পরামর্শ-সভা আহ্বান করিবেন। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ উক্ত সভায় যোগদান করিয়া সর্ব্বপ্রকার বিরোধ ভঞ্জনের উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন।

এ কথা সত্য হইলে আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। জনসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টায় যেখানে কোনও বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে সেখানে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য ব্যতিরেকে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়, বিশেষতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে। মিলনের অভাবই যদি দুর্ব্বলতা হয় তাহা হইলে বিরোধের কথা আর কি বলিব। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সহৃদয় এবং সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় সুফল ফলিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। পরস্পরের প্রতি দোষারোপের দ্বারা বিরোধ ভঞ্জন হয় না, বিরোধ বাড়িয়াই চলে। আপনার ত্রুটি খুঁজিয়া দেখা এবং স্বীকার করা বিরোধ ভঞ্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। শান্তিনিকেতনেই হউক বা অপর যেখানেই হউক, এইরূপ সভার সদস্যগণকে আমরা এ কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। এ কথা আমরা কেবল মুসলমান নেতৃবর্গকে মনে করিয়াই বলিতেছি না, হিন্দুদের সম্বন্ধেও বলিতেছি। হিন্দু মুসলমান বিরোধে হিন্দুদের কোনো অপরাধ সম্ভবপর নহে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।

বোম্বাই সহরে পৌছিয়া রবীন্দ্রনাথ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষ যে সংগ্রাম চালাইয়াছে শুধু তাহাই জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, পরন্তু উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত নৈতিক প্রেরণা জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ বিপ্লব-নীতিতে তাহার আধ্যাত্মিক ভাবধারার অনুগত একটা নূতন প্রবর্ত্তনা আনিয়াছে।

গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলিয়াছেন তাহা সারগর্ভ। তিনি বলিয়াছেন, এঞ্জিন এবং চাকার মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য ব্রেক বিশিষ্ট স্বরাজ্যের একটা জটিল কল পাইলেই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিলাম মনে করা ভুল হইবে। তবে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেই হইবে সে কথাও তিনি বলিতেছেন না; এমন একটা জিনিষ সহসা আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে না, এই কথাই তিনি বলেন।

বাস্তবিকই বর্ত্তমান বিষয়ে গ্রহণ করা-না-করার যে একটা কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে সহসা যে-কোনো একটা দিক হইতে বিচার করিতে গেলে ভ্রম প্রমাদের আশঙ্কা আছে। এ সময়ে দেশের সমস্ত চিন্তাশীল এবং

দেশহিতৈষী ব্যক্তির স্থির বুদ্ধির পরিচালনা একান্ত আবশ্যক। যাহা চাহিতেছি তাহা পাইলাম না বলিয়াই যাহা পাইতেছি তাহা লইলাম না, হয় ত সুসিদ্ধান্ত না হইতে পারে। উপরে উঠিবার প্রচেষ্টায় সোপানের মধ্যে কায়েমী অবস্থান যেমন অবাঞ্ছনীয়, যে কয়টি ধাপ উঠিতে পারিতেছি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করাও হয় ত তেমনি অবিবেচনা-সিদ্ধ।

* * * * * *
* * *

পরলোকগত মৌলানা মহম্মদ আলী

ভারতবর্ষের এই কঠিন সমস্যা ও সঙ্কটের সময়ে মৌলানা মহম্মদ আলীর মত একজন তেজস্বী ও দেশানুরাগী ব্যক্তির মৃত্যুতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি নিজের দেহ এবং স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী কাটাইয়া উচিত কথা বলিতে গিয়া নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহারো কাহারো নিকট অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে সচেতন হইলেও অখণ্ড ভারতের ইষ্ট কখনো তাঁহার দৃষ্টি-পথের বাহিরে যায় নাই, এবং সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্প্রতি বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

গোলটেবিল বৈঠকের সম্মুখে তাঁহার বক্তৃতার একটি অংশ আজ ভারতবাসীদের অন্তরে সকরুণ শ্রদ্ধার সহিত বারম্বার বাজিতেছে:—স্বরাজ যদি পাই তাহা হইলেই ভারতে ফিরিব—নচেৎ দাসভূমিতে পদার্পণ করিব না।

মৃত্যু তাঁহার প্রতিজ্ঞারক্ষণে সহায়তা করিল!

* * * * * *
* * *

পরলোকগতা আনা প্যাভ্‌লোভা

জগতের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী আনা প্যাভলোভা গত ২৩শে জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার পেট্রোগাড সহরে ইঁহার জন্ম হয়।

এই নৃত্যকলাকুশলা অদ্ভুত নর্ত্তকীর সহিত ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়াছিল। দুইবার তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন—এবং ভারতীয়-পদ্ধতি নৃত্যের নমুনা দেখান। সুবিখ্যাত বাঙালী নর্ত্তক উদয়শঙ্করের সহায়তায় তিনি ভারতীয় নৃত্যের পরিকল্পনা নির্দ্ধারিত করেন; এবং দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুললিত প্রকাশ ভঙ্গীতে যে অপরূপ রসানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা উপভোগ করিয়া ভারতবর্ষের রসিক সম্প্রদায় বিমুগ্ধ হন।

মানুষের অন্তরের অতি সূক্ষ্ম এবং কোমল ভাবগুলিকে হস্তপদ এবং দেহের সঞ্চালন-লীলায় মূর্ত্তি প্রদান করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই বিশ্ববিখ্যাতা নৃত্য-শিল্পীর আয়ত্ত ছিল। ইঁহার মৃত্যুতে জগতের কলারসপিপাসু সমাজের যে ক্ষতি হইল তাহা অপরিমেয়।

* * * * * *
* * *

দাতা লক্ষ্মীনারায়ণ—

মধ্যপ্রদেশের সুবিখ্যাত ম্যাঙ্গানিজ্ ব্যবসায়ী রাও বাহাদুর ডি, লক্ষ্মীনারায়ণ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে উইলের দ্বারা তেত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই টাকার আয় হইতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান (applied science) শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই দান এবং দানের উদ্দেশ্য মহৎ। ভারতবর্ষের এই বিবর্ত্তন এবং সংগঠনের কালে উক্ত দানের যথোপযুক্ত প্রয়োগ যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সার্ভেন্ট্‌স্ অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

সার্থক লক্ষ্মীনারায়ণের অর্থোপার্জ্জন!

Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works,



বন্দিনী সীতা

ফাল্গুন, ১৩৩৭

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্রা

চতুর্থ বর্ষ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৩৭ | তৃতীয় সংখ্যা

আমি

আজ ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি
যাহার চালায় মোর তরী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা,
যার সুর বেজে উঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরানে।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা,
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা
সাথী দিয়ে মোর মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে।
ভেবেছিনু সে আমারি আমি
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি'।

তবে কেন পাড়ি দেব, বিরতি হতে
প্রেয়সীর দুরাশা পরশে

বারে বারে
দেখেছিনু তারে
অতল মাধুরী-সিন্ধুতীরে
আমার অতীত সে-আমিরে।
আজি সেই, সে আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরানো দিনের মহিমায়
আপনারে হারায়
তারে পাই আপনাতে দেশকাল বিহীন পারায়।
যে আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে,
মানবের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেরেছে জানিতে।

দিগন্তে ঐদল ময়ূরের
নীল মেঘে
'চৈত্র মাসে নাচি'।
চিনে চিনে তাই
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে॥

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রলেখা

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

১

জনরব যে পাঠিকারা প্রায়ই কাব্যের নায়কদের সঙ্গে ভালবাসায় পড়ে যান। এর কারণও স্পষ্ট। স্ত্রীজাতি সব জিনিষই যাচাই করে নেয় হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে নয়। কাব্য হিসাবে Hamlet যে Romeo Julietএর অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, এ কথা কোনও স্ত্রীলোক মুখে স্বীকার করলেও মনে মানবে না। এর কারণ, Romeoর সঙ্গে সহজেই ভালবাসায় পড়া যায়, এমন কি গুরুজনের অমত উপেক্ষা করেও; কিন্তু কোনও প্রকৃতিস্থ কিশোরী, গুরুজনের আজ্ঞাতেও প্রসন্নমনে Hamletএর গলায় মালা দিতে সম্মত হবে না, অবশ্য সে যদি Opheliaর মত মতিচ্ছন্ন না হয়। Julietএর সঙ্গে Romeoর প্রেমালাপের সঙ্গে Opheliaর সঙ্গে Hamletএর নর্ম্মালাপের তুলনা করলেই, সহজেই বুঝতে পারবেন যে এর কারণ কি?

কাব্যের মনগড়া মানুষের প্রতি মনের টান কিন্তু স্ত্রীজাতির একচেটে নয়। কাব্যরাজ্যের কোনও কোনও নায়িকাও কখনো কখনো কোনো কোনো পাঠকেরও মনকে পেয়ে বসে। আর ভালবাসা শব্দের, আর যে অলৌকিক অর্থই থাক না কেন, মনকে পেয়ে বসা যে তার একটি অভ্রান্ত লক্ষণ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যার কথা দিনে একবার মনে হয় না, যার মুখ যখন তখন চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে না, তাকে যে ভালবাসি, এমন কথা সেই বলতে পারে, যার কথা শুকের মুখের বাণী, অর্থাৎ মুখেরই কথা মনের কথা নয়।

তবে এ ক্ষেত্রে, পাঠিকাদের ভালবাসার সঙ্গে আমাদের ভালবাসার একটু তফাৎ আছে। তাঁরা শুনতে পাই, কাব্যে যে মনোমত নায়কের সাক্ষাৎ পান, জীবনে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবার অলীক আশা মনে পোষণ করেন। Romeoর পূর্ণাবতার না হোক, অংশাবতারের সঙ্গে কোন শুভ পূর্ণিমার রাত্রে যে দেখা হবে এ বিশ্বাস তাঁদের মনে বদ্ধমূল; আর যদি না হয় ত চন্দ্রালোকও বৃথা, জীবনও বৃথা।

আমরা কিন্তু জানি যে, আর্টের রাজ্যে অর্থাৎ রূপলোকে যার সাক্ষাৎ পেয়েছি, জীবনে অর্থাৎ কামলোকে তার সাক্ষাৎ কখনও মিলবে না। আমরা জীবনে তাই তাদের খুঁজিনে, সংসার-ভাবনা থেকে মুক্ত হলেই, মনের আকাশে তাঁদের প্রত্যক্ষ করি। যে সুর, যে রূপ মানুষের মনকে হঠাৎ পেয়ে বসে, সে সুর সে রূপ সব সময়ে যে খুব উচুদরের তা অবশ্য নয়।

২

সকলেই জানেন, এক-একটা গানের সুর অথবা টুকরো, কি কারণে জানিনে, মনে এমনি বসে যায় যে কিছুদিন ধরে তা কানের কাছে যখন তখন গুনগুন করে, এবং হাজার ইচ্ছা করলেও, সেটিকে মন কিম্বা কান থেকে তাড়ানো যায় না। একটু অন্যমনস্ক হলেই দেখা যায় তা আবার কানের কাছে গুনগুন করছে। যদিও তা দরবারী কানাড়া নয় ছিবলে পিলু, রেখাব-পঞ্চমের স্পর্শযুক্ত পবিত্র মালকোষ নয়; কড়িমধ্যম স্পৃষ্ট ভৈরবীর একটা টুকরো মাত্র।

কানের মত চোখেরও এ রকম অযথা পক্ষপাতিতা আছে। এক জায়গায় এক সঙ্গে একশ'টি রূপসী রমণী দেখলে তাদের মধ্যে হয় ত একজনের মুখ আমাদের চোখে এঁকে যায়, যদিচ তার মুখ দস্তুর-মত সুগঠিত নয়, অর্থাৎ তার চোখটি একটু ছোট অথবা নাকটি একটু বড়। সেই অশাস্ত্রীয় মুখটি যখন তখন চোখের সুমুখে এসে হাজির হয় আর তার রূপ চোখ থেকে আলগা করা অসাধ্য হয়ে পড়ে।

কেন যে এক-একটা বিশেষ সুর, এক-একটা বিশেষ রূপ আমাদের মনকে স্পর্শ করে ও বিচলিত করে, এর কারণ আমি জানিনে। সম্ভবতঃ সে সুর সে রূপের অন্তর্নিহিত

প্রাণ আমাদের প্রাণকে গোপনে স্পর্শ করে। এর চাইতে স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয় ত দেহতাত্ত্বিকরা অথবা মনস্তত্ত্ববিদরা দিতে পারেন কিন্তু আমি পারিনে। তবে এ ঘটনা যে ঘটে তার প্রমাণ আমি এ জীবনে একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছি। আর আমার বিশ্বাস যে, চোখ কান নামক মনের দু'টি দুয়োর যাঁর খোলা আছে তিনিই তা করেছেন।

কাব্যরাজ্যও এই একই নিয়মের অধীন। কবিতার এক একটি পদ বা বাক্য আমাদের মনে হঠাৎ এমনি বিঁধে যায় যে, সে কথাটি সময়ে অসময়ে আমাদের মনে খোঁচা দেয়। কবির আঁকা কোনও কোনও ছবিও যখন তখন আমাদের নেত্রপথে উদয় হয়। কবি-কল্পিত নাম রূপের মায়াও আমরা জীবনে কাটিয়ে উঠতে পারি নে। সংস্কৃত কবিদের কল্পিত মানসকুমারীদের মধ্যে একটি কুমারী আমার মনের পটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। তার নাম পত্রলেখা।

৩

প্রথমতঃ হয় ত ঐ নামের গুণেই পত্রলেখা আমার কানের ভিতর দিয়ে মর্ম্মে প্রবেশ করেছিল। নামেরও যে একটা মোহিনী শক্তি আছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ নাম সংস্কৃত সাহিত্যে অপূর্ব্ব। রামায়ণ মহাভারতে এ জাতীয় নাম নেই। এ নামের গায়ে স্পষ্ট আর্য্য মার্কা নেই। একদিকে পত্রলেখা যেমন উর্ম্মিলা মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তির সগোত্র নয়, অপর দিকে অর্ব্বাচীন যুগের তরলিকা, মদনিকা, তমালিকারও স্বজাতি নন। এ নামের গায়ে যেমন আর্য্য রূপ নেই, তেমনি অনার্য্য গন্ধও নেই।

তারপর বাণভট্ট পত্রলেখার যে ছবি এঁকেছেন, সে ছবি যার চোখ আছে, তার চোখ কখনও এড়িয়ে যায় না। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের যে যায় নি, 'কাব্যের উপেক্ষিতার' সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন। রবীন্দ্রনাথ পত্রলেখার যে ছবি বাঙলা পাঠকদের কাছে ধরে দিয়েছেন সে ছবিটি এই :—

"যুবরাজ চন্দ্রাপীড় যখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন, তখন একদিন প্রভাতকালে তাঁহার গৃহে কৈলাস নামে একটি কঞ্চুকী প্রবেশ করিল—তাহার পশ্চাতে একটি কন্যা অনতিযৌবনা, মস্তকে ইন্দ্রগোপকীটের মত রক্তাম্বর অবগুণ্ঠন, ললাটে চন্দন তিলক, কটিতে হেম-মেখলা, কোমল তনুলতার প্রত্যেক রেখাটি যেন সদ্য অঙ্কিত—এই তরুণী লাবণ্যপ্রভা প্রভাবে ভবন পূর্ণ করিয়া কনিত নূপুরাকলিত চরণে কঞ্চুকীর অনুগমন করিল।"

এ হচ্ছে পত্রলেখার রূপের চমৎকারিত্বের first impression।

৪

সংস্কৃত কাব্যের কোন নায়িকারই নাম শোনবামাত্র তার বিশেষ রূপ আমাদের চোখের সুমুখে আবির্ভূত হয় না। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, তাঁরা প্রত্যেকেই সর্ব্বললামভূতা অনবদ্য সুন্দরী। সকলেই এক ছাঁচে ঢালাই হয়েছেন। তাই এঁদের একজনের রূপ আর একজনের রূপ থেকে স্বতন্ত্র নয়।

বাণভট্ট হচ্ছেন একমাত্র কবি যাঁর কাব্যে আমরা নানা রূপের স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাই, কারণ তিনি নানা জাতির নানা শ্রেণীর, এমন কি অস্পৃশ্যা রমণীরও ছবি এঁকেছেন। মাতঙ্গকুমারী যে গন্ধর্ব্বকুমারীর সবর্ণ নয়, এ কথা বাণভট্ট ভোলেন নি। একটি ফরাসী কবি বলেছেন যে, এ জগতটা যে দৃশ্য জগৎ তা এতই প্রত্যক্ষ যে এই স্পষ্ট সত্যকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। এ বিষয়ে বাণভট্টও Theophile Gautierএর সমধর্ম্মী।

স্ত্রীজাতির স্ত্রীত্বের অতিরিক্ত রূপ বলে যে একটি বিশিষ্ট ও একমাত্র নয়নগোচর গুণ আছে, বাণভট্টের চোখ সে বিষয়ে খোলা ছিল। তাই তিনি কোন কোন রমণীকে একমাত্র ছবি হিসেবে দেখেছেন এবং আমাদেরও দেখিয়েছেন। পত্রলেখার চিত্র তাঁর masterpiece, অতএব এই অপূর্ব্ব চিত্রটি আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। বিশেষ পরিচয়ে এ চিত্রের first impression ম্লান হয় না বরং তার মর্ম্ম আরও ফুটে ওঠে।

এ রূপ দেখে আমাদের চোখ ঝলসে যায় না, কেননা পত্রলেখা মহাশ্বেতা নয়। সে চন্দ্রমণ্ডল থেকে রাহুভয়ে ভুবনে অবতীর্ণ একখণ্ড জ্যোৎস্না মাত্র, জমাট জ্যোৎস্নার পরিচ্ছিন্ন আকৃতি; প্রথমেই চোখে পড়ে তার মুখের

মেরুদণ্ড, অর্থাৎ নাসিকা, সম সুবৃত্ত ও তুঙ্গ। তারপর চোখে পড়ে তার দেহ। সে দেহ লতানো নয়, তন্বীর মত চরণের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত। সখী আমায় ধরো ধরো, এমন কথা তার মুখ দিয়ে কখনও বেরয় না। সে অবশ্য চরণের উপর সুপ্রষ্ঠিত হ'লেও চিত্র-পুত্তলিকার মত আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলনা, কঞ্চুকীকে অনুগমন করছিল, মন্দ মন্দ বাহুবিক্ষেপের দ্বারা দেহের লাবণ্য দুহাতে চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়ে। এ মেয়ে যে পরে অবলীলাক্রমে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়বে যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের পার্শ্বে, তার ইঙ্গিত তার সকল অঙ্গে ছিল। বাণভট্ট দুটি চারটি ছোটখাটো জিনিষের উল্লেখ করছেন যাতে করে এ স্ত্রী মূর্ত্তি একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কবি একটি কথায় পত্রলেখার দেহমনের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেছেন। সে রূপ পূর্ণ মুকুলিত নয় স্ফুটোন্মুখ। পত্রলেখার পয়োধর নাতি নির্ভরোদ্ভিন্ন। এর থেকে আমরা অনুমান করতে পারি তার মনও তার স্তনের অনুরূপ নাতিনির্ভরোদ্ভিন্ন। অতিমাত্রায় তাম্বুল চর্ব্বণের ফলে তার অধররেখা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, দেখতে মনে হয় যেন জ্যোৎস্নার প্রান্তদেশে ঈষৎ অন্ধকার লেগে আছে। তার চরিত্রও তার দেহযষ্টির অনুরূপ সরল। প্রমাণ তার তিলক আগের দিন পরা চন্দনের, অতএব ধূসর। সে সেজেগুজে মুখধুয়ে যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের কাছে উপস্থিত হয় নি। তাই তার কপালে বাসি চন্দনের তিলক, রাঙা ঠোঁটে পানের কালো দাগ।

পত্রলেখার কি দেহে কি মনে হাবভাব বিলাস বিভ্রমের ইঙ্গিত মাত্রও নেই। এখনও সে নারীসুলভ ছলকলা শেখে নি। লজ্জা এখনও তার শরীর মনকে অভিভূত করে নি। সে প্রগল্‌ভ অথচ অবিনয়ী নয়, মিতভাষী নয় কিন্তু মিষ্টভাষী। সে অনর্গল বকে কিন্তু যা খুসি তা বলে না। এক কথায় তার চলাফেরা বলাকওয়া সব যেমন সপ্রাণ তেমনি সুন্দর; রাণী বিলাসবতী চন্দ্রাপীড়কে আদেশ করিতেছিলেন যে পত্রলেখার চাপল্য নিজের চিত্তবৃত্তির মত দমন করে।

পত্রলেখা "প্রথমে বয়সি বর্ত্তমানা" উপরন্তু সে রাজার নন্দিনী, রাজনন্দিনী হ'লেও রাজকুলের আদুরে মেয়ে। তাই তার প্রাণের স্ফূর্ত্তি অব্যাহত।

পত্রলেখার কোন ইতিহাস নেই কারণ তার দেহ মনে যৌবনের সূচনা মাত্র আছে পরিণতি নেই। "দিনে দিনে অঙ্গ উথারয়ে অঙ্গ" বিদ্যাপতি ঠাকুরের এ উক্তি রক্তমাংসে গড়া নারীর পক্ষে সত্য কিন্তু ছবির পক্ষে নয়। চিত্রকরের তুলিকা বা লেখনি একটি অনিত্য মুহূর্ত্তকে নিত্য করে। চিত্র হ্রাসবৃদ্ধির নিয়মের অধীন নয়। তাই পত্র লেখা যে একদিন দ্বিতীয় কাদম্বরী হয়ে উঠবে, এ পরিণাম আমি কল্পনাও করতে পারি নে। পত্র লেখা সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র চিরকুমারী।

চণ্ডীদাস বলেছেন,

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে যদি কোনও কিশোরী এ হেন কিশোরী স্বরূপ হয় ত সে পত্রলেখা।

চন্দ্রাপীড় যখন বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভ করে প্রথমে এ জীবন্ত ছবি প্রত্যক্ষ করেন তখন তিনি নির্নিমেষ নয়নে পত্রলেখার প্রতি অনেকক্ষণ চেয়েছিলেন। তার পর তিনি পত্রলেখাকে একদিনের জন্যও চোখের অন্তরাল করেন নি এমন কি কাদম্বরীর নেশায় যখন তিনি বিভোর তখনও নয়। এ তরফের তার তাঁর মনোবীণায় চিরদিনই চড়ানো ছিল।

আমিও যখন কলেজ থেকে বেরিয়ে পত্রলেখাকে প্রথম দেখি তখন আমিও তারদিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়েছিলুম এবং আজ পর্য্যন্ত তাকে চোখের অন্তরাল করতে পারি নি। এর কারণ, পত্রলেখা কামলোকের নয়, রূপ লোকের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ক্ষণিকা

শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র এম্-এ

"ক্ষণিকা" যখন প্রথম পড়ি সে আজ বহু দিনের কথা। মন তখন নবীন, প্রতিদিনের জগত তখন প্রতিদিনের বিস্ময়ের ও আনন্দের খনি। বাইরের পৃথিবী, মানুষের মেলা, কাব্যলোক—সবই নূতন, সবই বিচিত্র রঙে রঙীন। কিন্তু মন যখন সকল ডাকে সাড়া দিল, সব জিনিষকে জানতে বুঝতে, উপভোগ করতে, অনুভব করতে ব্যাকুল, এই অতিপুরাতন ধরণী আর এই চিরন্তন মানবপ্রকৃতি যখন একটি বিকাশোন্মুখ জীবনের কাছে নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়, তখন মনের যে বরাদ্দ মাফিক নিত্যখোরাক বিদ্যালয়ে বা সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে জুটল তাতে প্রাণমন শুষ্ক, তিক্ত, অতৃপ্ত, নিরানন্দ ক'রে তোলার সব উপাদানই ছিল। বিদ্যালয়ে শুধু বস্তা বস্তা বিদেশী ভাব বিদেশী ভাষার ভাঙ্গা নৌকো ক'রে সরবরাহ করা হ'ত, আমাদের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সে সব হয়ে আসত বস্তাপচা। সমাজব্যবস্থায়ও কোথাও আনন্দের সন্ধান পাওয়া যেতনা। চারিদিকে যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, গুরুজন তাঁরা শূন্য জীবনের জীর্ণ পুঁথি ঝেড়ে দিতেন শুধু গোটাকয়েক শুক্‌নো উপদেশ—ব্যবহারিক জীবনে ঠিক বেঠিক সফলতা বিফলতা যাতে সমঝে চলি। আর জীবন ব'লে কোন বালাই ত আমাদের দেশে বড়-একটা থাকেই না, কাজেই জীবনের সদ্য স্পর্শে যে নিজেকে সজীব রাখব সে উপায়ও ছিল না।

চারিদিকে এই জরার অচলায়তনে প্রাণ যখন একান্ত ক্লিষ্ট, ~~এমন সময়ে~~ কোন্ শুভলগ্নে পড়লাম :—

> শুধু অকারণ পুলকে
> নদীজলে পড়া আলোর মতন
> ছুটে যা ঝলকে ঝলকে !
> ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
> ঝলমল প্রাণ করিস যাপন
> ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
> শিরীষ ফুলের অলকে !
> মর্ম্মরতানে ভরে ওঠ গানে
> শুধু অকারণ পুলকে !

মুক্ত প্রাণের দমকা হাওয়ায় যেন জীর্ণ প্রাচীর ভেঙ্গে ধুলিসাৎ হল, রুদ্ধদ্বার খুলে গেল। এতদিন যা খুঁজেছিলাম অতি সহজে হাতের কাছেই তা পেয়ে গেলাম। যে "অকারণ পুলক" চেপে যাওয়াই দুষ্ট প্রকৃতিকে শিষ্ট করার উপায় শুনেছিলাম এ যে তারই জয়গান! সংসারের বাঁধা রাস্তায় হুঁসিয়ার হয়ে, ট্যাঁকের কড়ি সামলে চলার সদুপদেশে বুক বোঝাই হয়ে উঠেছিল, সে পাথরের বোঝা হাল্কা হয়ে গেল। কুটিল দ্বিধা যত সব সিধা হল, বুঝলাম অকারণে অকাজ নিয়ে অসময়ে অপথ দিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও মহাজন অনুমোদিত।

> কত কালের কত মন্দ ভাল
> বসে বসে কেবল জমা করি
> ফেলা-ছড়া ভাঙ্গা-ছেঁড়ার বোঝা
> বুকের মাঝে উঠছে ভরি ভরি,
> গুঁড়িয়ে সে সব উড়িয়ে ফেলে দিক
> দিক্-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া!
> বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ
> মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া!
>
> সংসারেতে সংসারী ত ঢের
> কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
> মেলাই আছে মস্ত বড় লোক,
> সঙ্গে তাদের অনেক সেজো মেজো,
> থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে ;—
> লাগুক্ মোরে সৃষ্টি ছাড়া হাওয়া!
> বুঝেছি ভাই কাজের মধ্যে কাজ
> মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া!

জীবনের অতিপরিচিত প্রতিদিনের গণ্ডীর মধ্যে দূর বনানীর মর্ম্মরধ্বনি শোনা গেল, অর্থহীন তুচ্ছ কাজের দাসত্ব শৃঙ্খল খসে গেল।

ঘরের মধ্যে বকাবকি
নানান মুখে নানা কথা,
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা ;
সময় অল্প ফুরায় তাও
অরসিকের আনা গোনায় ;
ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি
সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় ;
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
একথা সে বিশেষ বোঝে !

এই কথাটাই এতদিন শুনে এসেছিলাম যে যৌবন বড় বিষম কাল, এবং একলম্ফে বাল্য থেকে বার্দ্ধক্যে পৌঁছতে পারলেই মোটের ওপর সুবিধে, কারণ তাতে অনেক ঝঞ্ঝা এড়িয়ে নিরাপদ নিশ্চিন্ত নিয়মিত জীবনের বন্দরেতে আসা যায়। "ক্ষণিকায়" পড়লাম কবির কাব্য তরুণের জন্যে, বসন্তের পুষ্পসম্ভার তরুণ-আঁখির প্রসাদ যাচে, বনে কোকিল গেয়ে মরে তরুণ শুনবে ব'লে, বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভাল চলে, তপস্যা তখনই সার্থক হয় যখন নবীন তপস্বী মধুর বাতাসে বিচঞ্চল নীলাঞ্চলের সন্ধান পায় আর কাঁকন মলের রিণিঝিণি শুনতে থাকে। অজানা জগতের সন্ধানে নব নব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তরুণই সুদূরের, সুন্দরের স্বপ্ন দেখে চলতে থাকে। সে যে-বাণিজ্যের মহাজনী করে তার জন্যে সে অকূলের মাঝে তরী ভাসিয়ে অজানায় চলে যায়।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজ খানি
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন্ নগরে যাব, দিয়ে
কোন্ সাগরে পাড়ি
কোন তারকা লক্ষ্য করি
কুলকিনারা পরিহরি
কোন দিকে যে বাইব তরী
অকূল কালো নীরে !
মরবনা আর ব্যর্থ আশায়
বালু মরুর তীরে !
সাগর উঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে
সূর্য্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেণায় ফেণা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাবত তবু
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রৈবনা আর কভু !

যৌবনের সকল রঙীন কল্পনার, তার আশা আকাঙ্ক্ষার, তার বিচিত্র অনুভূতির এমন অপূর্ব্ব প্রকাশ যখন কাব্যে পেলাম তখন যেন পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেলাম। শঙ্কা সংশয় দূর হল, নিজে যা, তাই হবার সাহস পেলাম ; দশের সঙ্গে নিজের প্রভেদ অস্বাভাবিক মনে করে তার জন্যে লজ্জা পেয়ে সে সব ঘষে মেজে সবার সঙ্গে একাকার হবার ব্যর্থপ্রয়াসে প্রাণপাত করার আর কোন দরকার রইল না। বুঝলাম নিজের যে অনুভূতি সত্য, যা সুকুমার, তা অবজ্ঞার সামগ্রী নয়, তার মূল্য অসীম, তাকে ছেঁটে বাদ দিলে জীবনও পঙ্গু হয়ে পড়ে।

ক্ষণিকা পাঠে অনেকদিন আগেকার সে যৌবনসুলভ চঞ্চল আনন্দ-হিল্লোল এখন অনেকটা হারিয়ে গেছে, স্মৃতির সাহায্যে মাঝে মাঝে তাকে খানিকটা ফিরে পাই। তখনকার মনোভাবের সঙ্গে যে কবিতাগুলির ভাবের বিশেষ ঐক্য পেয়েছিলাম সেইগুলিই তখন বেশী করে ভাল লেগেছিল। কিন্তু বয়সের কোঠায় যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই "ক্ষণিকার" সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য আরও বেশি করে বুঝছি। কবি যখন "ক্ষণিকা" লেখেন তখন তিনি যৌবনের প্রান্তে এসে

পড়েছেন। যৌবনের উদ্দাম প্রবল বাসনা শান্ত হয়ে আসছে, জগৎটাকে একটা বৃহৎ ভোগপাত্র মনে করে নিঃশেষে তার সকল সুধা পান করার ইচ্ছা তখন অন্তর্হিত। যা পাওয়া যায় ভাল, অনেক পাওয়া অনেক চাওয়ায় আর প্রবৃত্তি নেই। সব জিনিষ আলগা মুঠিতে ধরছেন, থাকে থাকুক, খসে যায় যাক। জীবনের যত জটিল কুটিল ব্যথা, মায়া-ঘেরা যত নিষ্ফল ব্যকুলতা, সব ছেড়ে ছুড়ে প্রাণের উৎস মুখে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর মনের ভাবকে বৈরাগ্য বলা চলে না, Cynicism বা world-weariness ত একেবারেই নয়। জীবনের পথে একটা বাঁকে এসে পৌঁছে তিনি থেমেছেন; যে পথ অতিক্রম করেছেন এবং যা এখনও সম্মুখে রয়েছে তা একবার চেয়ে দেখে নিতে চাইছেন। যে আশা আকাঙ্ক্ষা যে হৃদয়াবেগ যৌবনের যে হাজার আকুল বাসনা, যে অসংখ্য অস্ফুট কল্পনা নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন, চলতে চলতে তার অনেক খসে গেছে, যা অবশিষ্ট আছে বুঝেছেন যে তাও এবার পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হবে। জীবনের একটা পর্ব্ব শেষ হয়ে আসছে, তার কাছ থেকে কবি বিদায় নিচ্চেন। অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন, অনেক বুঝেছেন। নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নানা লোকের সঙ্গে মিশে মানুষের মনের কিছুই যেন তাঁর অজানা নেই। মানুষের কোথায় দুর্ব্বলতা, কোথায় তার মহত্ত্ব সবই জানেন। কারো প্রতি ঘৃণা নেই, অবজ্ঞা নেই, রাগ নেই। জীবনে অনেক পেয়েছেন, আবার অনেক এসে জোটেও নি। তার জন্যে কোন খেদ নেই। আঁধার আলোয়, শাদায় কালোয়, দিনটা মোটের ওপরত ভালই কেটেছে, কারো সঙ্গে কোন তাঁর ঝগড়া নেই। এটা কিন্তু ভালই বুঝেছেন যে জীবনের এক নূতন স্তরে তিনি চলেছেন, কোথায়, তা তাঁর ঠিক জানা নেই। দীর্ঘ পথের অন্ত ঠিক দেখাতে পাচ্ছেন না, কিন্তু পথ বেঁকেছে। এত দিনের সাধা যন্ত্রে তাঁর একটি তন্ত্রী বিকল বাজছে, কেন তা জানেন না, জানেন শুধু এই যে মনের মধ্যে যেটা শুনচেন হাতে সেটা আসচে না। বাইরের জগত এবং মানুষের মন এত ভাল চিনেছেন যে সবেরই সত্যরূপটি দেখতে পাচ্চেন, তাদের নানান অলীক মায়ায় ঘিরে আত্ম-বঞ্চনা করা আর তাঁর সম্ভব নয়। কিন্তু জ্ঞানের এই গভীরতার জন্যে কি নিজের দৃষ্টির সূক্ষ্মতা অনুভব করে' কোথাও আত্ম-গরিমা কি আত্মপ্রসাদ নেই। বরঞ্চ একটু দুঃখ আছে যে মোহ সবই কেটে গেল। এখনও যেন দু'চারটিও অবশিষ্ট থাকে, দু'চারটি মিথ্যাও যেন জীবনকে মধুর রাখে—এই ইচ্ছাটুকু প্রকাশ করবেন। সব জিনিষ সুস্পষ্ট আর সংক্ষিপ্ত আর সারবান নাই বা হল, থাকলই বা চারিদিকে একটু বেশী, একটু উপরন্ত, একটু আতিশয্য। দেখচি ত সবই সাদা চোখে; কিন্তু বছরে একটা দিন যদি আসেই যখন দ্বার মুক্ত পেয়ে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা হন, না হয় সেদিন কথার ওজন হারিয়ে ফেলে একটু অতিবাদই করলাম! ভাগ্য ত কৃপণ হয়ে আসচে অনেক দিকেই, একদিনের জন্যে না হয় ভাণ্ডারে অজস্রতাই বিরাজ করল!

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
কারো ইথে আপত্তি নেই,
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে,
এবং আমার কবির গানে,
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে,
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই!

* * *

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,
কণ্ঠ আমার যতই আঁটো,
বলবো তবু উচ্চস্বরে—
আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করচে ভুবন নূতন সৃষ্টি
মুচ্‌কি হাসি সুধার বৃষ্টি
চলচে আজি জগৎ জুড়ে।

* * *

যদি বল আর বছরে
এই কথাটাই এম্‌নি করে’
বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেকজনে—
জেনো তবে মূঢ় মত্ত
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব,
ফুটল নূতন চোখের কোণে!

* * *

আজ বসন্তে বকুল ফুলে
যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে,
কাল সকালে যাবে ভুলে,
কোথায় বাতাস, কোথায় সে ফুল!
হে সুন্দরী তেম্‌নি কবে
এসব কথা ভুল্‌ব যবে
মনে রেখো আমায় তবে,—
ক্ষমা কোরো আমার সে ভুল!
চিত্ত দুয়ার মুক্ত রেখে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই বল্‌বনাক সত্যকথা!

কিন্তু বসন্তে প্রকৃতির আতিশয্যের অনুকরণে কবিরও যে এই অতিবাদ তার সুযোগও কমে আসচে। জীবনের বসন্তকে বিদায় দেবার ক্ষণ এসেছে। শেষ-বসন্তের শূন্য হাওয়া শস্য-শূন্য মাঠে হাহা করে উঠেছে। অনেক তরঙ্গের আঘাতে হাল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া তাঁর জীবনতরীকে ক্লান্ত হয়ে এবার আনাগোনা বন্ধ করতে বলচেন। এখন আর অকূল কালো নীরে ভেসে যাওয়া নয়,

এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি’;
ঘাটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে,
তারি আঘাত সহি!

ইচ্ছা যদি করিস তবে
এপার হতে পারে
যাসরে খেয়া বেয়ে!
আনবে বহি গ্রামের বোঝা
ক্ষুদ্র ভারে ভারে
পাড়ার ছেলে মেয়ে।
ওপারেতে ধানের খোলা
এই পারেতে হাট,
মাঝে শীর্ণ নদী,
সন্ধ্যা সকাল করবি শুধু
এঘাট ওঘাট,
ইচ্ছা করিস যদি!

এতদিনের যে সর্ব্বনেশে স্বভাব সে মাঝে মাঝে এ নূতন বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঝড়ের নেশায়, ঢেউয়ের নেশায়, আবার মাতাল হয়ে মরণ-লুব্ধ হতে ছোটে। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখি মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে এল, উদ্যমের উল্লাস ক্রমে বিরতির শান্তিতে পরিণত হল। ফাল্গুনের সে দখিন হাওয়ার হাল্কা হিল্লোল যখন নেই, আকাশ যখন মেঘে জোড়া, পূবে হাওয়ায় তখন দখিন-হাওয়ার কুল ধরে’ না দিয়ে কবি গাইলেন,—

এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথ অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা!

এই অন্য গানের সুর নিতান্তই সহজ। কবির মন এখন শান্ত, তাতে নানান ভাবের নানান প্রবৃত্তির সংঘাত এখন স্তব্ধ। কোনো গভীর অতৃপ্তি, কি বিরাট আকাঙ্ক্ষা, কি বিপুল প্রয়াস কবির বীণাকে উত্তাল তুমুল ছন্দে ঝঙ্কৃত করছেনা। মনের ভাবটী যেমন নিতান্ত সরল ও স্নিগ্ধ, তার প্রকাশও তেমনি একান্ত সহজ ও মধুর। সকল জিনিষকে স্পষ্ট করে সত্য করে’ দেখছেন, কিন্তু সে চাহনির মধ্যে অশেষ করুণা। মনের ভাব এত সরস, অনুভূতি এত খাঁটি, যে তার প্রকাশকে শ্রেষ্ঠ কাব্য করে তুলতে কোনো প্রয়াস কোনো অলঙ্কারের

প্রয়োজন নেই। এরকম একান্ত প্রাঞ্জল, অনাড়ম্বর, সকল বাহুল্যবর্জ্জিত কবিতা কাব্যের ইতিহাসে দুর্লভ। কবির আর্ট সেই শিখরে পৌঁছেচে যেখানে ভাব, ভাষা, ছন্দ এক হয়ে একটি অনায়াস পরিপূর্ণ রূপসৃষ্টি করে। জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি খুলে জীবনকে মুক্ত, অবাধ, সরল করতে তিনি বারে বারে বলছেন। সকল অসাধ্য সাধন চুকিয়ে দিয়ে, ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম কুড়িয়ে নেবার চেষ্টামাত্র না করে, যে সহজ সমুখে রয়েছে তাকে আদরে বুকে তুলে নিচ্ছেন। কি হবে তর্ক বিবাদ করে, মান নিয়ে, প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে? যদি ক্ষতি হয়ে থাকে, ফাঁকি যদি লোকে দিয়ে থাকে, মনে করলেই ত হয় যে ভবের এই গতিক; কতক আসে, কতক যায়; কতক ধরা দেয়, কতক নাগালের বাইরেই থেকে যায়। মাথা খুঁড়ে ত কারো মন পাওয়া গেল না, আবার অযাচিতে কেউ বিকিয়ে রইল! কামনার সিদ্ধি যখন হল ব'লে, হঠাৎ হয়ত সব আশা চূর্ণ হয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল; বন্দরের কাছে জাহাজডুবী এমনই কি বিচিত্র! এসব সত্ত্বেও কিন্তু

আকাশ তবু সুনীল থাকে
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো!

বিশ্বভুবন এতই ডাগর যে অনেক বাদ দিলেও তার অনেক বাকি থাকে। ক্ষতিক্ষত সব সত্বেও জীবন সরস সুন্দর থাক্‌তে পারে। জীবনের আলো যদি আঁধার হয়ে যায় বুঝতে হবে সেটা নিজেরই দোষে। বেশি আশা করতে নেই, বেশি জানা জান্‌তে নেই। কিন্তু জীবনকে এড়িয়ে 'টলা'র কথা কোথাও নেই। কবি যে ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে জীবন-তরঙ্গে দুর্ব্বল মানুষের হাবু-ডুবু খাওয়া দেখছেন তা মোটেই নয়। তিনি জলেই নেমেছেন, তবে স্রোতে গা ভাসিয়েছেন, টানের বিপরীতে সাঁতার কাটেন নি, তাই মাথা তুলে রেখেছেন। দুটি হৃদয়ের প্রেমে যে মিলন তার ভিতর বিশেষ কোনো তাৎপর্য্য তিনি খোঁজেন নি কারণ সে ত নিতান্তই সোজাসুজি ব্যাপার, বসন্তে ফুল ফোটার মত। তার মধ্যে গভীর তত্ত্ব কি অসীম রহস্যের সন্ধান করতে গেলে এই সোজা কাহিনীটির স্বাভাবিক সৌন্দর্যটুকু মাটি করা হবে, আর যে কিছু বড় লাভ হবে তা নয়—

মধুমাসের মিলন মাঝে
মহান্ কোন রহস্য নেই,
অসীম কোন অবোধ কথা
যায় না বেধে মনে-মনেই!
আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মত নাইক কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি!

* * *

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত,
আকাশপানে বাহু তুলে
চাহিনে ভাই আশাতীত।
যেটুকু দিই, যেটুকু পাই,
তাহার বেশি আর কিছু নাই,
সুখের বক্ষ চেপে ধরে,
করিনে কেউ যোঝাযুঝি।
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি!

এই ভোগবিরত অনাসক্ত মনের কাছে সমাজের হিতসাধন বা দেশোদ্ধারের প্রবল চেষ্টা শুধু ক্লান্তি আর গ্লানি আনে। হাজার তুচ্ছ কাজের বাঁধনে নিজেকে বাঁধাই যদি সুসভ্যতা হয় ত তেমন সুসভ্যতার অলোক তিনি চান না। অর্থহীন কাজের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাচ্চেন তিনি ভারতের সুদূর অতীত যুগের কল্পনায়; কখনো বৃন্দাবনের রাখাল বালকদের গোষ্ঠলীলার মধুর ছবি আঁকছেন, কখনো কালিদাসের কালের প্রসন্ন, আনন্দোজ্জ্বল মন্থরগতি জীবনের সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটাতে রেবার তটে চাঁপার তলে আমাদের নিয়ে যাচ্চেন। কোনো মতেই তিনি ঠেলেঠুলে এগিয়ে গিয়ে নিজেকে দশের চোখে বড় করতে চান না। জ্ঞানী গুণী কর্ম্মী বলে প্রতিপত্তি, একেলে বা ভাবীকেলে

কোনো কীর্ত্তিকলাপেরই তিনি ধার ধারেন না। নেতা হয়ে নবযুগের চালক বলে কোনো নামই চান না, তার চেয়ে বরং অশোকনীপের ছায়ে আবার সেই ব্রজের রাখাল বালক হতে পারলে তাঁর জীবন সার্থক হত। কালিদাসের যুগে যদি জন্মা-তেন, তাও নবরত্নের সভার মাঝে একটেরে রইতেন। দশের এক হয়ে খ্যাতি প্রতিপত্তিই যদি তাঁর লক্ষ্য হত তাহলে কি আর মহাকাব্য না লিখে গীতিকাব্য লিখতেন, না লোকের মনের সিংহাসনের চেয়ে প্রিয়ার মনো-গৃহের চাবী মূল্যবান মনে করতেন!

এই নিতান্ত হাল্কা লঘু মনোভাব নিয়ে তিনি অবলীলায় যে রসসৃষ্টি করছেন তার মধ্যে গভীর তত্ত্ব প্রকাশের চেষ্টা মাত্র না করেও তিনি সকল অনুভূতির সব পর্দ্দাগুলি বাজিয়ে চলেছেন। মানুষের মনের সর্ব্বত্রই তাঁর অবাধ গতিবিধি, তাই বিশেষ করেই সেখানে বলে রাখছেন যে গভীর সুরে গভীর কথা তিনি বলতে চান না, সেখানেও হাল্কা সুরেই গভীরতম কথা প্রকাশ করছেন। প্রিয়জনের ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা মাত্র কল্পনা করেই হৃদয় যে কতদূর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে তা একটি অপূর্ব্ব কবিতায় বলেছেন:—

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।

মনে মনে হাসবি কিনা
বুঝব কেমনকরে?
আপনি হেসে তাই

শুনিয়ে দিয়ে যাই;
ঠাট্টা করে ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই।

হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

সোহাগভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।

সোহাগ ফিরে পাব কিনা
বুঝব কেমন করে?
কঠিন কথা তাই

শুনিয়ে দিয়ে যাই;
গর্ব্ব ছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই।

ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করে নীরব হ'য়ে,
রহিব তোমার কাছে,
সাহস নাহি পাই।

মুখের পরে বুকের কথা
উপলে ওঠে পাছে,
অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।

তোমার ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি ভাই
আপন ব্যথাটাই
ইচ্ছা করি সুদূরে যাই
না আসি তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর
প্রকাশ হয়রে পাছে,
কেবল এসে তাই
দেখা দিয়ে যাই,
স্পর্দ্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই
নিত্য তব নেত্রপাতে
জ্বালিয়ে রাখি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

এই ত চরম আর্ট, যেখানে সরলতা সরসতায় মিশে একটি সৌন্দর্য্যের পূর্ণতা সৃষ্টি করচে। "ক্ষণিকা"র কবিতার পর কবিতায় এই একান্ত দুর্লভ একটি নিরাভরণ নির্ম্মল শ্রী দেখতে পাই। শেষের দিকের কবিতাগুলিতে কবি মনের গভীরতম কথাই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সেগুলিতেও এই একই প্রয়াসহীন স্বচ্ছ সৌন্দর্য্য। গুরুগম্ভীর বিষয় আর মেঘমন্দ্র ধ্বনি না হলে কাব্য হয় না যাঁরা মনে করেন তাঁরা হয়ত "ক্ষণিকা"র দুপাতা উল্টে কবিতাগুলিকে "superficial" বলে অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু যাঁরা যথার্থ রসগ্রাহী, বংশীর চেয়ে যাঁরা বংশকে বেশি মূল্যবান মনে করেন না, তাঁরা বুঝবেন ভাব, ভাষা, ও ছন্দের এই মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, আনন্দিত গতি কি আশ্চর্য্য প্রতিভার ফল। আর প্রথম দিকের কয়েকটি কবিতার বিষয়ের লঘুত্বের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ আসে তাহলে উত্তরে একথা বলা চলে যে কবি একটি সৃষ্টিছাড়া বিশেষ উদ্ভট জীব নন, তাঁর সহজ মানুষ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়! তাঁর জীবনে যে খালি একের পর এক পরম মুহূর্ত্তই আসতে থাকে তা নয়, লঘু গুরু হাজারো ভাব ও কল্পনার লীলায় তাঁর প্রাণমন তরঙ্গায়িত। গভীর ব্যথাই যে তাঁর সকল গানের উৎস তা মোটেই নয় এমন কি sweetest songsএরও নয়। আর-সকলের মতই ছোটখাটো হাসি দুঃখ, রাগ অনুরাগের ভিতর দিয়েই তাঁর জীবন প্রবাহিত হচ্চে। অবশ্য এটা ঠিক জনসাধারণের কবি সম্বন্ধে ধারণার সঙ্গে খাপ না খেতে পারে। যাঁরা মনে করেন চাঁদের পানে চক্ষু তুলে নদীর কূলে পড়ে থেকে কাব্যে একটি বিপুল দীর্ঘশ্বাস না ধ্বনিত করে তুললে আর কবি কি হল, তাঁদের কথা ভেবেই সম্ভবতঃ "ক্ষণিকার" কবি পরম কৌতুকে লিখেছেন :—

সুখে আছি লিখ্‌তে গেলে
লোকে বলে প্রাণটা ক্ষুদ্র!
আশাটা এর নয়ক বিরাট
পিপাসা এর নয়ক রুদ্র!
পাঠক দলে তুচ্ছ করে,
অনেক কথা বলে কঠোর;
বলে, একটু হেসে খেলেই
ভরে' যায় এর মনের জঠর!
সেই কারণে গভীর ভাবে
খুঁজে খুঁজে গভীর চিতে
বেরিয়ে পড়ে গভীর ব্যথা
স্মৃতি কিম্বা বিস্মৃতিতে!

কিন্তু যেহেতু মানুষ মানুষের কাছে একান্ত interesting সেইজন্যে একজনের জীবনের পরমমুহূর্ত্তগুলির প্রকাশই যে অন্যের কাছে আদরের সামগ্রী তা নয়। ছোট ছোট অভিজ্ঞতা, হাল্কা ভারী সকল সত্য অনুভূতি, দৈনিক জীবনের পথ চলার ছোটখাট সুখ দুঃখ, আদর অপমান—এ সকলই কাব্যে প্রকাশের সার্থকতা আছে। তাতে পুরাণ চিত্র বীর চরিত্র না দেখান যেতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যই ত একমাত্র কাব্য নয়। কবির পোষাকী চেহারা যদি লজ্জিত হয়ে তাঁর আটপৌরে চেহারাকে শুধু ঢাকতেই চায় তাহলে তাঁর কাব্যে একটা বড় রকমের গলদ থেকে যাবে—sincerity'র অভাব। মোট কথা যিনি প্রকৃত কবি তিনি বোঝেন যে জীবনই সবার বড় কাব্য-ভিত্তি, সুতরাং সেই জীবনের সকল কথাই কাব্য কথা হতে পারে। "ক্ষণিকার" প্রথমাংশে বিশেষ করেই জীবনের সেই unheroic অথচ একান্ত সত্য অনুভূতিগুলিকে চিরন্তন করা হয়েছে অপূর্ব্ব কাব্যরূপ দিয়ে। এর সত্যতা যেমন চমকে দেয় এর প্রকাশ-নৈপুণ্য তেমনি পুলকিত করে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অন্য কোনো কাব্যে এমন অবাধে ধরা দিয়েছেন কিনা, এমন পরিপূর্ণ আত্মপরিচয় দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। কাব্যে এরূপ একান্ত স্পষ্টবাদ এরূপ মাধুর্য্যে নিষিক্ত করার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল

এমনই হাল্কা সুরে সরস একটা হাসিঠাট্টা প্রথমদিকের অনেক কবিতায় ফুটে উঠেছে। এতে শ্লেষ বিদ্রূপ নেই, কাউকে কোন খোঁচা নেই। নিজেকে নিয়েই ঠাট্টা করচেন, কখনও বা সে হাস্যরস হঠাৎ করুণ হয়ে উঠচে। জীবন এতই ক্ষণিক যে কিছু হারালে, তা সে ধনই হোক আর প্রিয়ার মনই হোক, দীর্ঘবিলাপের কোন অবসর নেই; এই নির্ম্মম সত্য কথাটা যখন কবি হাসতে হাসতে বললেন তখন

প্রথমে মনে হল এ হাসি নিষ্ঠুর, তারপর বুঝলাম যে সত্যটা আরো নিষ্ঠুর বলেই তার ব্যথায় কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে সেটা হেসে উড়িয়ে দেওয়াই কবি ভাল মনে করেছেন :—

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী !
ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্যে বিলাপ করি—
সোনার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার
বসিয়ে রাখি চিত্ত তলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায়
মাল্য গেঁথে অশ্রু জলে,
নিদেন কাঁদি মাসেক-খানেক
তোমায় চির আপন জেনেই—
হায়রে আমার হতভাগ্য !
সময় যে নেই ,—সময় যে নেই !
বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে
ঝরে পড়ে যথায় তথায়,
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দু,—
তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়ই বর্ব্বরতা,—
সময় যে নেই,—সময় যে নেই !

কালিদাসের কালের মন্দালিকা, মঞ্জুলিকা , মঞ্জরিণীদের সঙ্গে কবির মিলন হয়নি বলে যখন তিনি বিচ্ছেদে অন্যমনা হচ্ছেন তখন মনকে প্রবোধ দিচ্ছেন এই ভেবে যে সে সব বরাঙ্গনা এখন হয়ত অন্যনামে মর্ত্ত্যলোকে আছেন। কালের গতিকে তাঁদের যে সব পরিবর্ত্তন হয়েছে তার বর্ণনায় কবি ঠাট্টার সঙ্গে প্রশংসার সুনিপুণ ভাবে মিশিয়েছেন :—

এখন যাঁরা বর্ত্তমানে,
আছেন মর্ত্ত্যলোকে,
মন্দ তারা লাগ্‌তনা কেউ
কালিদাসের চোখে !

পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্ত্তা
অন্য দেশীয় চালে,

তবু দেখ সেই কটাক্ষ,
আঁখির কোনে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা দিত
কালিদাসের কালে !

বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিলনা তাঁর ছবি !

মরবনা ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্ত্যলোকে !

কাজের যখন কোন তাগিদ নেই, কোনোদিকেই হাতে হাতে ফললাভের কোন বাসনা নেই, কোন স্থির লক্ষ্য ধরে জীবন যখন চলছেনা তখন মনের সেই অপর্য্যাপ্ত অবসর নিয়ে কবি বাঙলার শান্ত, নির্জ্জন গ্রামের মধ্যে বাসা বাঁধছেন. গ্রামের প্রকৃতির ও সরল জীবন যাত্রার সকল সৌন্দর্য্য মনের মধ্যে গ্রহণ করচেন। দিন শেষে গাঁয়ের পথে অকারণে বেরিয়ে পড়ে যা দেখছেন তার ছবি এঁকে দিচ্চেন :

দীঘির জলে ঝলক্ ঝলে
মাণিক হীরা
শর্ষে ক্ষেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।

এ পথ গেছে কত গাঁয়ে
কত গাছের ছায়ে ছায়ে
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে!
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে!
আরেক দিন সে ফাগুন মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে, সেই
মনে জাগে।
আমের বোলে গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,
ঘাটের শব্দে বাজ্‌বে কলস
ক্ষণে ক্ষণে!
সে সব কথা ভাবচি বসে
অকারণে।

দীর্ঘ হয়ে পড়চে পথে
বাঁকা ছায়া,
গোষ্ঠ ঘরে ফিরচে ধেনু
শ্রান্তকায়া।
গোধূলিতে ক্ষেতের পরে
ধূসর আলো ধূ ধূ করে,
বসে' আছে খেয়ার তরে
পান্থ জনে।
আবার ধীরে চলচি ফিরে
অকারণে!

বাঙলার গ্রামের এই স্নিগ্ধ পটভূমিতে ছুটি হৃদয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের নিতান্ত সোজাসুজি কাহিনী কবি একটি মধুর pastoral এ বলেছেন—

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
তাহার গানে নাচে আমার বুক!
তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বট-মূলে,
যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া,
কোলের পরে নিই তাহারে তুলে!
আমাদের এই গ্রামের নামটী খঞ্জনা
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম ত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।
আমাদের এই গ্রামের গলিপরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের ক্ষেতে যখন তিসি ধরে,
মোদের ক্ষেতে তখন ফোটে শন।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ ধারা
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।
আমাদের এই, ইত্যাদি।

'চারিদিকের কোন সৌন্দর্য্যই কবির চোখ এড়িয়ে যাচ্চেনা: তাদের আহরণের বাসনা যেদিন ছেড়েছেন আপনি এসে সেদিন তারা ধরা দিল। যেদিন চয়নে ব্যস্ত ছিলেন সেদিন চোখে পড়েনি বসন্ত কত ফুল নিয়ে আসে; বকুল-শয়নে নিলীন হয়ে যখন শুধু বকুল দলিত করেছেন, কুসুম-কান্তি তখন দেখেন নি। এখন না-চাইতেই হাতের নাগালে সবারে পেলেন। এ পাওয়াতে তাঁর লোভ বা বাসনা ফিরে এলনা কিন্তু সকলের সঙ্গে তাঁর একটি আনন্দের যোগ তিনি উপলব্ধি করলেন। নিরাসক্ত, নিরলম্ব মন একটি অচঞ্চল আশ্রয়ের সন্ধান পেল। বুঝলেন যে সবাই যদি তাঁকে ছেড়েও থাকে তবু জনশূন্য বিশাল ভবে হাজার সুরে তাঁর বিশ্ব তাঁকে উদার রবে ডাকতে থাকবে। এ জগতে অনেক দিন থেকেও অনেক কিছুই মিললনা বলে পরকালের মুক্তির আশায় মনকে আশ্রয় খুঁজতে হল না। চারিদিকের সঙ্গে নিজের যোগ যেই অনুভব করলেন তখন পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়োকেও নিজের একান্ত অন্তরঙ্গ সমবয়সী বলে চিনলেন; আর পরকালের ভালমন্দ গণার চেয়ে তাদের মনের কথা নিজের বীণায়

তারে ধ্বনিত করে তোলায় কবিজীবনের পরম সার্থকতা পেলেন। বুক-ভাঙা বোঝা শুদ্ধ সারা মনকেই ফেলে আর তাঁর ছুটে পালাতে হলনা। মনের সকল আনন্দ উল্লাস তিনি আবার পরিপূর্ণ ভাবে ফিরে পেলেন। নববর্ষায় হৃদয় তাঁর ময়ূরের মত নেচে উঠল, আবার শত-বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মত বিকশিত হয়ে উঠল, তাঁর আনন্দিত মন সারা বিশ্বে তিনি প্রসারিত করে দিলেন। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যখন নব কদম্বের মদির গন্ধে চারিদিক আকুল, তখন বিদ্যুৎ-চমকের মত, বাতাসের দুরন্তপনার মত, নবীন পাতার মর্ম্মরের মত, তাঁর সারা দেহ মন আনন্দ-রস-ধারার কলকল্লোলে উতরোল হল। এমনটা যে ফের হবে তা তিনি আশাই করেন নি; হৃদয় তাঁর যে আবার এমন করে খুলে যাবে, বিপুল বিশ্ব যে তাঁর প্রাণমনকে এমন করে আবার প্রচণ্ডবেগে নাড়া দেবে এ যে অপ্রত্যাশিত! বহুদিন হল কোন ফাল্গুনে তিনি যে ভরসা জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন ঘন বরষায় তিনি আবার তা ফিরে পেলেন। যার অস্পষ্ট ধারণায় তাঁর মন একদিন ব্যাকুল হয়েছিল, আজ যখন তাকে কাছে দেখলেন তখন দেখলেন তার অভিনব রূপ। যৌবনস্বপ্নে তিনি যা চেয়েছিলেন এ তাই, কিন্তু আরও অনেক বেশী। এ অভাবনীয় দান তিনি কি ভাবে গ্রহণ করবেন তা জানেন না। তিনি এতদিন ধরে যে ক্ষণিকের পর্ণকুটীর রচনা করেছেন, এতবড় আগমনের পক্ষে তা যে নিতান্তই অনুপযুক্ত! তাই কবি তাঁর এই আয়োজনহীন পরমাদের জন্য লজ্জিত, কুণ্ঠিত। তিনি বুঝলেন যে তাঁর পরাণ ভরে এবার যে নূতন গান বেজে উঠবে তা আর এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে বেতসের বাঁশিতে বাজানো যাবেনা।

এইখানে কবির জীবনের এবং তাঁর কাব্য পরিণতির এক পর্য্যায় শেষ এবং নূতনের পর্ব্বের সূচনা। জীবনের প্রভাতে যে অজানার উদ্দেশে সকল রসারসি কেটে মাতাল হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন, মধ্যাহ্নে শ্রান্ত হয়ে তার অন্বেষণে বিরত হলেন; চিরন্তনকে চিরদিন না খুঁজে শান্ত মনে ক্ষণিকের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজলেন। কিন্তু এর মধ্যে তিনি তৃপ্তির সম্পূর্ণতা পেলেন না। জীবন-অপরাহ্নে যে পরমাশ্রয়ের আহ্বানে তিনি পুনরায় দুর্গমবন্ধুর পথে বেরিয়ে পড়লেন পথশেষে তাঁর সঙ্গে মিলনের আভাস পাই সর্ব্বশেষ কবিতাটিতে—

কখন যে পথ আপনি ফুরাল,
সন্ধ্যা হ'ল যে কবে,
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন
চলিয়া গিয়াছে সবে!
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানিনা কখন পশিনু কেমনে!
অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে!
কখন যে পথ আপনি ফুরাল,
সন্ধ্যা হল যে কবে!

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা?
রুধিয়া দিয়াছ তব বাতায়ন,
বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের
চিহ্ন কি যায় দেখা?

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

Calcutta Poetry Societyতে পঠিত।

যুগান্তরের কথা

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী

১১

বনে

হে বৈরাগী কর শান্তি পাঠ!
উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে যাক্ চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ!
সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্ম্মভেদি যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্বপরে
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে,
অশ্বথ ছায়াতে, সকরুণ তব মন্ত্রসাথে।

চারিদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ ধুধু করিতেছে, কোথাও বা এক একটী বৃহচ্ছায়া বট বা অশ্বত্থ তাহাদের ডালপালা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে শ্যাম বনরেখার মধ্যে বিলীন গ্রামের নিকটে কতকগুলা চষা জমি, কোথাও বা রাখালের দল গরু চরাইতেছে, দূরত্বের জন্য সেগুলিকে যেন ছবিতে আকার মত গতিচাঞ্চল্যহীন দেখাইতেছে।

মাঝখানে একটা ঘন বন খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া মাঠের সবুজ সমুদ্রে যেন দ্বীপের মত দাঁড়াইয়া; তাহার এক পাশে একটা মরা বিল, বুকের স্থানে স্থানে ঘন ঘাস এবং শৈবাল ভরা সামান্য জল লইয়া নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। সেই 'বিলেন জমি'তে কৃষকেরা স্থানে স্থানে আশু ধান্য রোপন করিয়া সেই বিলের "লক্ষ্মী জোলা" নামটি ঈষৎ সার্থক করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বনের মধ্যে ঢুকিলে বুঝা যায় সেটি বন নহে, পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। ইদানীং বসতি বোধ হয় খুব কমিয়াই আসিয়াছিল তাই সেই দীর্ঘবৃক্ষসন্নিবেশের নিম্নে আগাছার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে কয়েকখানি চালহীন মাটির ভিটা তাহাদের বক্ষপঞ্জর উন্মুক্ত করিয়া পড়িয়া আছে। সমস্ত বনটি খুঁজিলে এইরূপ দুই তিন জায়গায় মাত্র দেখা যায়, তাহাদের অধিবাসীরা বোধ হয় অল্প দিন চলিয়া গিয়াছে। বাকি সমস্ত গ্রামের চিহ্ন বনে ঢাকিয়া গিয়াছে, কদাচিৎ কোথাও একটা ইষ্টক স্তূপ, তাহারই এক স্থানে ক্ষুদ্র একটী মন্দির। অনতিবৃহৎ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ মন্দিরটিকে প্রায় নিজের কুক্ষিগত করিয়া লইয়া মন্দিরের মাথার উপরে মহাকাল দেবতার বিজয়-নিশানের মত নিজের সবুজ শাখার পত পত শব্দ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের কপাট নাই, অভ্যন্তরের দেবতার মূর্ত্তিও বাহির হইতে অস্পষ্ট। কতকগুলি দেবদর্শনার্থী যাত্রী অদ্য সেই মন্দিরের সম্মুখের ভগ্ন রোয়াকটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দেবতার উদ্দেশে সকলে প্রথমে সেই ভগ্ন রোয়াকেই মস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিল। তারপরে একজন বাক্য উচ্চারণ করিল "কই কিছুই দেখা যায় না যে।" দলের কর্ত্তা আমাদের বৃদ্ধ রায় মহাশয় বলিলেন "মাঠের রোদ থেকে সদ্য বনে ঢোকা গেছে, গাছের ছায়ায় চোখ এখনো অন্ধকারই দেখচে কিনা। রোয়াকের ওপর ওঠা যাক্।" জুতা নীচে রাখিয়া কোনরূপে তিনি প্রায় ইষ্টকস্তূপেই পরিণত সেই ক্ষুদ্র রোয়াকে উঠিলেন। দলের সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিল।

"ঐতো গৌরনিতাই দেবের যুগল মূর্ত্তি! বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।" আবার তাঁহারা একবার সকলে প্রণত হইয়া দৃশ্য বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর তো বেশ পরিষ্কারই আছেন, মন্দিরের মধ্যেও বেশ পরিষ্কার, বোঝা

যাচ্ছে এখনো নিত্যই পূজা হয়। ঐতো বাইরে ফুলপাতাও পড়ে রয়েছে। এখানা দুয়ারে দেবার ঝাঁপ বোধ হচ্ছে, দুয়োরের অভাবে তৈরী করা হয়েছে। এই জঙ্গলের মধ্যে যতখানি সম্ভব চারিদিক বেশ পরিষ্কারও দেখাচ্ছে। লোক জন যাওয়া আসা করে নিশ্চয়।" দলের মধ্যে আমাদের চপলা কিশোরীও ছিল, সে চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল "এ বনে বাঘ থাকে, না ঠাকুর দাদা?" অনেকে যেভাবে "চুপ চুপ" করিয়া উঠিলেন তাহাতে বোঝা গেল তাঁহাদেরও মনে সে কথাটা উদয় হইয়াছে। রায় মহাশয়ও মৃদুস্বরে বলিলেন "সেটা এমন অসম্ভবই বা কি?" কয়েক জন নারী অস্ফুটে কয়েক বার "বন মধ্যে বরাহঞ্চ" বলিয়া বিষ্ণু-ষোড়শ নামের এক নাম স্মরণ করিলেন। কেবল রাধা প্রতিবাদ করিল "এ রকম জায়গায় সে ভয় খুব কমই থাকে। দেখছনা এখানে মানুষ চলাচলের চিহ্ন রয়েছে।" তাহার কথায় সকলে যেন একটু ভরসা পাইলেন। অসহিষ্ণু কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "চলনা পিসি, একটু এদিক্ ওদিক্ ঘুরে দেখি—" "বাঘ আছে কিনা?" রায় মহাশয় নাতিনীর উদ্দেশে একটি মধুর সম্পর্কের সম্বোধন প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—"তোর একটা বুনো বাঘের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে গেলেই ঠিক্ হয়! যেমন তুই তেমনি বর হয়।" ঠাকুরমাতাও স্বামীর রহস্যে যোগ দিয়া বলিলেন "যে বর ওর জন্যে ঠিক হচ্চে সেতো ওকে 'মেনা বেনা'। সেই যে কোন মোছলমান দুর্গা ঠাকুর দেখতে এসে নাকি বলেছিল যে ওপরের চাল চিত্তিরের আঁকা ঐ ঠাণ্ডা বুড়োটি দুর্গির খসম? ও খসম তো দুর্গিকে মানায় নি! দুর্গি যেমন দজ্জাল্নি আমাদের হান্কে চাচা যদি ওর খসম হ'ত তবেই ম্যানাতো। ওরও তাই হবে বড় বৌমা।" খুড়শ্বশুর ও শাশুড়ীর রহস্যে বড় বৌ মৃদু হাস্য করিলেন, কিন্তু কিশোরী মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়া উঠিয়াছিল। সলম্ফে সেই ভগ্ন রোয়াক হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া "তোমরা বসে বসে এইখানে নমাজ কর ঠাকুমা তোমার হান্কে চাচার সঙ্গে, আমি বাঘ খুঁজ্তে যাচ্ছি" বলিয়া বনের মধ্যের সেই লুপ্তপ্রায় পথরেখা ধরিয়া প্রায় লাফাইতে লাফাইতে একদিকে দ্রুত অগ্রসর হইল। সকলে হাসির সঙ্গে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া আবার বরাহ দেবকে স্মরণ করিতে করিতে বলিল "এ দস্যি মেয়ে একটা ঘটাবে দেখছি! রাধা তুই তোর মেয়ে সামলা। যেমন সখ্ করেছিস্, বল্লাম ওটাকে লুকিয়ে যাই আমরা, তা ওঁর হ'লনা।" রাধা ততক্ষণে কিশোরীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া উভয়ে কয়েকটা গাছের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। শঙ্কিতা বড় বৌ বলিলেন "ওকে কি ফাঁকি দিয়ে আস্বার জো ছিল বাছা?" তিনি ভীত নয়নে তাহাদের গতি-পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন "আমিও যাই খুড়ীমা, কোনদিকে যাবে আবার?"

"ওটাকি পিসি? ঐ যে গাছের ডালে বসে আছে! ও বাবা ছুটো যে! কি গোল্ গোল্ চোখ, কি বিশ্রী চেহারা! প্যাঁচা? হ্যাঁ প্যাঁচা নাকি অতবড় হয়? হুতোম প্যাঁচা? "তুই থুলি মুই থুলি" আবার নাম হয় নাকি? কই ওরা তো তা বল্ছে না! বাবা কি হুম্ হুম্ শব্দ! হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে একদিন জোচ্ছনা রাত্রে যখন তোমাদের দেশের সেক্রা পাখি ঠকর্ ঠকর্ ক'রে কেবলই গয়না গড়াচ্ছিল,—সেও এক রকম প্যাঁচা? সব পাখিই ত প্যাঁচা তাহলে বাপু, তোমাদের দেশে! সেই রাত্রে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, প্রকাণ্ড একটা কি চিলের ছাদের ওপর বসে ছিল আর এই রকম হুম্ হুম্ শব্দ আসছিল। অন্ধকার রাত্রি হলে বাপু ভয় করত কিন্তু। কেমন মজা দেখছ পিসি? একবার গলা ফুলিয়ে এটা ডাকছে আর একবার ওটা ডাকছে! ওরাই সেই "তুই থুলি" পাখী যারা টাকা লুকিয়ে রেখে ঝগড়া কর্তে কর্তে মরেই গেল? তারপরে মরেও এই রকম ধেড়ে ধেড়ে পাখী হয়ে দুজনে দু'জনকে বলে "তুই থুলি, তুই থুলি"! আমাদের দেখে আরও ঝোপের মধ্যে লুকুলো দেখছ পিসি? কাক যদি আসে তো বাছাধনরা টের পান এখনি! ও পিসি, শেয়াল শেয়াল! ওমা, কেমন ছোট্ট ছোট্ট তিন চারটে বাচ্ছা সঙ্গে! আমি ধরব একটা—হ্যাঁ—কেন—কামড়ে দেবে না আরও কিছু? যাঃ পালিয়ে গেল তুমিও একটু দৌড়ুলে না কেন তাহলে ধরা যেত! হ্যাঁ যাও!"

কিশোরীর কলকণ্ঠ বনের দিকে বাজিতে লাগিল শুনিয়া মাতা আর তাহাদের পশ্চাতে অগ্রসর হইলেন না। মন্দিরের অদূরেই দাঁড়াইয়া ছোট জায়ের সঙ্গে বন ও বনের ঠাকুরটীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অপরিসর স্থানে শ্বশুরের ন্যায় গুরুজনের অতি নিকটে তাঁহারা এতক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্য পাইতেছিলেন না, একটু আড়ালে আসিয়া বাঁচিলেন।

"অবধৌত" ! অস্পষ্ট গম্ভীর শব্দে সকলে সচকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল মলিন ধূলী-ধূসরিত ছিন্ন কন্থার আলখেল্লায় সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, রুক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু ও জটায় মস্তক এবং মুখ সমাচ্ছন্ন এক বৃদ্ধ বার্দ্ধক্যের চাপে যেন কুব্জাকার হইয়া সেইদিকে আসিতেছে। সেই নির্জ্জন বনের মধ্যে সেই কুদর্শন অদ্ভুত বেশধারী ব্যক্তির আগমনে সকলেই যেন ঈষৎ শঙ্কিত নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কিন্তু সেখানে তাঁহাদের দেখিয়াও কোন ভাবান্তর প্রকাশ করিল না। রোয়াকের অদূরে সহসা জানু পাতিয়া বসিয়া কাহার উদ্দেশে যেন প্রণাম করিল এবং নত মস্তকে নিস্তব্ধে বসিয়া রহিল। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবাজী কি সাধু মহান্তকে দর্শন করতে এসেছো ?" আগন্তুক কোনই উত্তর দিল না। "আমরাও তাঁকে দর্শন করতে এসেছি, তিনি এই বনের ঠিক কোনখানটায় থাকেন জানো কি ?" আগন্তুক নীরব—যেন সে মূক বা বধির। কিন্তু সে সেখানে আসার সময়ে যে একটা গম্ভীর শব্দ সকলের কাণে গিয়াছিল তাহাতে সকলেই বুঝিল লোকটা অন্ততঃ বোবা নয়। ইহার নিকটেও কোন সন্ধানের আশা নাই বুঝিয়া সকলে একটু যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

"ঠাকুর্দ্দা—ঠাকুর্দ্দা, দেখুন এসে, কাকে খুঁজে বার করেছি। আপনারা তো নমাজ করতে লাগলেন, আমরা ঐ দিকে গিয়ে দেখি—কেমন ডালপালার ছাউনিতে কুঁড়ে ঘরের মতন রয়েছে, তার মধ্যে তিনি চোখ বুজে বসে রয়েছেন। দেখেই চেঁচিয়ে 'সন্নিস্তি ঠাকুর, আমরা তোমাকে যে দেখতে এসেছি ; ঠাকুর্দ্দা এসেছেন' বলতেই তিনি চোখ চাইলেন আর আমি ছুটে পালিয়ে এলাম" বলিতে বলিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিশোরী ছুটিয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যে উপবিষ্ট সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুককে দেখিয়া সহসা তাহার গতিরোধ হইয়া গেল। ঈপ্সিতলাভের সম্ভাবনার সংবাদে আনন্দিত হইয়া সকলে রোয়াক হইতে নামিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় হর্ষোচ্ছ্বাসের সহিত "কইরে কোন দিকে—কোন দিকে" বলিতে বলিতে নামিয়া নাতিনীকে অকস্মাৎ সেই বৃদ্ধ দর্শনে বাক্‌শক্তিহীন দেখিয়া রহস্যেচ্ছা সম্বরণ করিতে পারিলেন না ; বলিলেন "এইবার বাঘ দেখতে পেলি ত ?" সেই বনতলে উপবিষ্ট চিত্রিত ছিন্ন কন্থাবৃত কুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধকে একটা ভীতিপ্রদ বন্য জন্তুর মতই দেখাইতেছিল বটে।

তাঁহাদের আর অগ্রসর হইতে হইল না—একখানা কম্বল হস্তে পূর্ব্বপরিচিত সেই উদাসীন প্রসন্ন হাস্যে তাঁহাদের দিকেই আসিতেছিলেন, পশ্চাতে জোড় হস্তে রাধা। "আসুন—আসুন, কতক্ষণ এসেছেন ?" সকলে প্রণাম করিবার পূর্ব্বেই উদাসীন দূর হইতেই সুদীর্ঘ দেহ অর্দ্ধ-অবনত করিয়া বদ্ধাঞ্জলী ভাবে সকলকে অভিবাদনসূচক নমস্কার করিলেন। সকলে তখন বনের সেই আগাছা জঙ্গলের মধ্যেই হাঁটু পাতিয়া বসিতেছিল, উদাসীন প্রায় ছুটিয়া আসিয়াই সকলকে এরূপ ভাবে বাধা দিলেন যে কেহই আর ইচ্ছানুরূপ কার্য্যটি করিতে সাহস পেল না। তাহাদেরও মস্তক নত করিয়াই প্রণাম সারিতে হইল। সেই ভগ্ন রোয়াকের উপরে কম্বলটি বিস্তৃত করিয়া উদাসীন তাঁহাদের বসিতে আহ্বান করিলেন।

রায় মহাশয় এইবার সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিলেন "আপনার বিছানো আসনেও বসতে হবে ?" "আপনারা আজ গৌরনিতাই দেবের অতিথি যে !" উদাসীনের স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরের আহ্বানে আবার সকলে রোয়াকের উপরে উঠিলেন কিন্তু কম্বলে বসিলেন না। রায় মহাশয় কম্বলটি গুটাইয়া মাথায় ঠেকাইতে গেলে যখন উদাসীন তাঁহার হস্ত ধরিয়া শান্ত অনুরোধের স্বরে বলিলেন "আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতে দেন দয়া করে" তখন তাঁহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ত্ব হইতে মুক্তি দিতে রাধাদাসী অগ্রসর হইয়া কম্বলখানি আবার একবার পাতিয়া দিল। তখনো উদাসীনের অনুরোধে সকলকে প্রথমে বসিতে হইল ; পরে তিনি মন্দিরের ভিতর হইতে একটু ছিন্ন আসন বাহির করিলেন।

বৃদ্ধ ভিক্ষুক এতক্ষণ জোড় হস্তে দাঁড়াইয়াই ছিল, তাহার দিকে মস্তক হেলাইয়া অভিবাদনান্তে সাধু বলিলেন "অবধূত, তুমি কখন ? এঁদের সঙ্গেই নাকি ?" ভিক্ষুক নতমস্তক একটু চালনা করিল মাত্র। রায় মহাশয়ই উত্তর দিলেন "না, উনি এই কতক্ষণ এসেছেন !" "তুমিতো মন্দিরেও উঠবে না, আমার আসনও নেবেনা, ব'স !" বৃদ্ধ আবার প্রণামের ভাবেই সেইখানে হাঁটু পাতিয়া বসিল। সাধুও সেই ছিন্ন আসন টুকু পাতিয়া রোয়াকের একদিকে উপবেশন করিতে করিতে

রায় মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "একাদশস্কন্ধে ভগবান উদ্ধবকে যে-সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন, যার নাম "উদ্ধব গীতা" তার মধ্যে "ভিক্ষুগীত" একটি উৎকৃষ্ট বস্তু! সেই অবন্তীদেশের ব্রাহ্মণের মত এই বৃদ্ধটিও বহুকাল 'অবধূত' পন্থা নিয়েছে। কিন্তু এতকালেও শান্তি পায়নি। এর মন এখনো একে কর্ম্মপাকের স্মৃতিতে অশান্ত রেখেছে, তাই মাঝে মাঝে এখানে আসে।"

এতক্ষণে ভিক্ষুক নিজমনে একটু একটু যেন মাথা নাড়িল —চক্ষু-কোটর হইতে যেন দুই এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া ফেলিল, তারপরে মৃদুস্বরে বলিল "এবার এসে দর্শন পাইনি!" তাহার সেই বার্দ্ধক্য-জড়িত কণ্ঠস্বর যেন একটা জন্তুর গর্জ্জনের মত গোঁ গোঁ শব্দ করিল মাত্র। উদাসীন কিন্তু বুঝিলেন, স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন "আমিও সেকথা ভেবেছি যে অবধূত হয়ত ফিরে গেছেন।" আবার সকলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "এঁকে এইদিকে ভিক্ষা করতে অনেকেই হয়ত দেখেছেন?"

রায় মহাশয় কুণ্ঠিতভাবে "আমিতো গ্রামে থাকি না, বহুদিন পরে এবার এসেছি, আমি" এইটুকু বলিতেই রাধাদাসী জোড় হাতে সকলের হইয়া উত্তর দিল, "হাঁ, ওঁকে গ্রামে ভিক্ষা করতে আমরা ছোটবেলায় দেখেছি। কখনো কথা কইতে শুনিনি। বহুদিন পূর্ব্বে একজন সঙ্গিনীও ওঁর সঙ্গে থাকতেন, শুনেছি তিনি ওঁর স্ত্রী ছিলেন। দুজনেই কথা কইতেন না, একদিকে বেশী দিন থাকতেনও না। দুচার বৎসর পরে পরে আসতেন ব'লে মনে পড়ে। ছেলেরা ধূলো দিয়ে ঢিল ছুঁড়ে বড় জ্বালাতন করত।"

রাধাদাসী নীরব হইলে সাধু স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ভিখারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তারপরে?" ভিক্ষুক আবার মাথা নাড়িয়া এবার একটু স্পষ্ট করিয়া বলিল "অনেক দিন কিছু পাইনি বাবা"! রায় মহাশয় উদাসীনের পানে চাহিলেন, ভিক্ষুকের প্রার্থনার বস্তুটি কি তিনি যেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। উদাসীন এতক্ষণ যেন একটু অন্যমনাভাবে একদিকে চাহিয়া ছিলেন, ভিক্ষুকের কণ্ঠস্বরে দৃষ্টি ফিরাইতেই রায় মহাশয়ের প্রশ্ন বুঝিয়া বলিলেন, "কিছু শুনতে ইচ্ছুক। লোকটি কর্ম্ম-বিপাকে আর্ত্ত,—তাই আধ্যাত্মিকার মধ্যেই তার মনঃশান্তির উপায় খুঁজতে ভাগবত আলোচনাই মাঝে মাঝে করা যায়। আপনি—"

রায় মহাশয় সবিনয়ে জোড় হস্তে বলিলেন, "আমরাও আজ তাহ'লে কিছু লাভ করব। কিন্তু আমিও কর্ম্ম-বিপাকে আমাদের শাস্ত্র পুরাণে একেবারে অনভিজ্ঞ, কিছুই জানিনা,"—উদাসীন সহাস্যে বলিলেন "সেদিন আপনার গৃহের মহিলাদের ভাগবতে যে রকম অভিজ্ঞতা দেখেছি তাতে আপনি একথা বল্লে মানতে তো পারিনা।" "আমি তো আপনাকে সেদিন সেকথা বলেছি। একদিন আমাদের গৃহে তাই ছিল বটে কিন্তু আজ ঐ মহিলারাই যদি কিছু মনে মনে সঞ্চিত বা কাজেও কিছু কিছু রেখে থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়া ছাড়া তাই বা কে আছেন? আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রীটির জীবনও ভয়ানক ঘটনা-বিপাকের সমষ্টি। তাঁরও—" অবান্তর কথা আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া রায় মহাশয় নিজের কথা ফিরাইয়া বলিলেন, "তিনি আজ আমাদের সঙ্গে আসেন নি, এলে হয়ত আপনার কথার একজন যোগ্য শ্রোতা হতেন। তিনি নিজের সাধনা নিয়েই দিনের বেশীর ভাগ আমাদের গ্রামের কালীতলার বনে কাটান। অপরাহ্নে ঘরে এসে হবিষ্য গ্রহণ করেন, সেইজন্য তাঁকে আনতে আমরাও তেমন চেষ্টা করিনি। তিনি তো কোথাও যেতে ইচ্ছা করেন না।" উদাসীন মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "সাধনা-গৃহ নির্জ্জন স্থানেই হওয়া উচিৎ।" "তাঁর গৃহও তো বনের মতই নির্জ্জন। বৃদ্ধ এক পিশি আর এই দাসী, এইমাত্র লোক। সেজন্য নয় বোধ হয়। তাঁর শক্তিমন্ত্রে সাধনা, তাই ঐ দেবীর স্থানেই জপ করার আগ্রহ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।"

উদাসীন তাঁর অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্র উন্মীলন করিয়া পূর্ণ-দৃষ্টিতে রায় মহাশয়ের প্রতি চাহিলেন। দ্বিধার সহিত উচ্চারণ করিলেন "শক্তিমন্ত্র? আপনাদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভই কি আপনাদের বংশের ইষ্টদেব নন? আপনারা বৈষ্ণব বলিয়াই" —তাঁহার স্বর ক্রমে অস্পষ্ট হইল। রায় মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, আমাদের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষরা স্বর্গীয় ভ্রাতারা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন কিন্তু তিনি আমাদের কন্যা। শ্বশুরকুলের রীতিই তাঁর আচরণীয়।" উদাসীন ক্ষণেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া আবার মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন "কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে বলেই মনে হয়েছিল।"

"তাঁর জীবনে ঘটনা-বিপাকের মত ধর্ম্ম-বিপাকেরও মহা দ্বন্দ্ব ঘটে গিয়েছে। শ্বশুররা তাঁকে তাঁদের কুলোচিত দীক্ষা দেন, আবার স্বর্গীয় কর্ত্তারাও তাঁকে নিজেদের রুচি ও ধারণা মত বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সেই সময়েই তাঁকে বহু বৈষ্ণব শাস্ত্র পুরাণ শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি শেষে স্বর্গগত স্বামীর ধর্ম্মই গ্রহণ করেছেন।" বৈরাগী নিস্তব্ধভাবে চক্ষু মুদ্রিত করায় রায় মহাশয় থামিয়া গেলেন, সাধুর স্তব্ধ সমাহিত ভাবকে আর বাক্যশব্দের দ্বারা বিচলিত করিতে সাহস পাইলেন না।

ক্ষণপরেই সাধু নয়ন মেলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে রোয়াকের নিম্নে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট ভিক্ষুকের পানে চাহিয়া গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন—

"নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকামাঃ।
মনঃ পরং কারণ মামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্‌যৎ।
দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি।
সর্ব্বে মনো নিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরোহি যোগো মনসঃ সমাধিঃ।"

ভিক্ষুক নতমস্তকে জোড়হস্তে যেন মূর্ত্তিমান শুশ্রূষুর মত শুনিতেছিল। সাধু সহসা তাঁহার কণ্ঠ থামাইয়া রায় মহাশয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন,—"এই অবধূত। এঁর কথা আমাদের মত সাধারণ সুখদুঃখভোগী জীবের পক্ষে বচনেরও অতীত! যাঁরা এ গ্রামে বাস করেন তাঁরা কেউ কেউ কিছু জানেন হয়ত!" বলিতে বলিতে সাধু সম্মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলেন একটি নারী সেই বনপথের মধ্যে একভাবে দাঁড়াইয়া স্তব্ধদৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া আছে, আর তাহার নিকটে সেই কিশোরী বালিকা, যে ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, সেই চঞ্চলা বালিকাও স্থানকালপাত্রের প্রভাবে তেমনি অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাধু তখনি দৃষ্টি নত করিলেন। ক্ষণপরে ধীরে বলিলেন "কেহ কেহ হয়ত এঁকে জানেন! ইনি এখন কিছুক্ষণ এইখানেই থাকবেন। আপনাদের কিন্তু অনেকটা পথ যেতে হবে, সঙ্গে বালিকা ও মহিলারা রয়েছেন,এপথে সন্ধ্যা না হওয়াই উচিৎ।"

সকলে একে একে উদাসীনকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। রায় মহাশয় দুঃখপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন "ভাগ্যে আর হয়ত দর্শন ঘটবে না, এইবার আমার যথাস্থানে চলে যেতে হবে!" উদাসীন গম্ভীর মুখে সকলকে প্রত্যভিবাদন করিয়া রায় মহাশয়কে যেন সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিলেন "কে বল্‌তে পারে আর ঘট্‌বে না! এই যে ঘটনা এও তো অঘটন ঘটনই! এই রকম ভাবে হয়ত আবারও ঘট্‌তে পারে।" রায় মহাশয় সহসা একটা আশায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আবার হয়ত ছয়মাসের ভেতরই আসার সম্ভাবনা আছে! সেই যে যুবকটিকে দেখেছিলেন আমার বধূমাতার ভ্রাতা, সেই যতীনের সঙ্গে আমাদের এই নাতিনীটির বিবাহের সম্বন্ধ হচ্চে। আপনি যে অঘটন ঘটনের কথা বল্লেন এবারে সত্যই আমরা অনবরত যেন তাই প্রত্যক্ষ করছি! যাদের সঙ্গে সম্পর্কের স্মৃতি আমাদের বংশে কেবল জ্বালাই আনত তাদেরই সঙ্গে পুনঃ পুনঃ এই অমৃতসংযোগের ব্যবস্থা কিসে হচ্চে জানিনা! যতীন ছেলেটি আপনাকে আর একবার দর্শন করতে বড়ই ইচ্ছুক ছিল কিন্তু এই সব ব্যাপারেই বোধ হয় আর সে এখন এদিকে আসতে পারছেনা। আমরা এ শুভ বিবাহটিও এইবারেই সেরে যেতে ইচ্ছুক ছিলাম, সকলেরই সেই ইচ্ছা, কিন্তু মাতৃপিতৃহীনা কন্যার একমাত্র অভিভাবিকা পিসির অনিচ্ছাতেই ঘটতে পারছেনা।" উদাসীন যেন অনিচ্ছাতেও উচ্চারণ করিলেন, "তাহলে একার্য্য না ঘটাই উচিৎ।" "না, তাঁর এই বিবাহেই অনিচ্ছা যে তা নয়! যতীনও তাঁর বংশধর, কন্যাটিও ভ্রাতুষ্কন্যা, এ যোগাযোগ সুখেরই! তবুও তিনি এতশীঘ্র একাজটা সমাধা করতে চান্ না! বলেন, যদিই এরপরে উভয় পক্ষের কোন মনোমালিন্য ঘটে তখন আর উপায় থাকবে না। এই প্রস্তাব কিছুদিন এইভাবে থাকাতে যদি দুই দিকের কোন মতপরিবর্ত্তন না ঘটে তবেই একাজ করা ঘটবে।" সাধু মৃদুস্বরে বলিলেন "যুক্তিতে বিচক্ষণত্ব আছে।" তারপরে কিশোরীর পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, "এই বালিকাটি?" "হ্যাঁ, কিশু প্রণাম কর।" ধীরভাবে কিশোরী সাধুর চরণে আবার প্রণতা হইল এবং তাহার পশ্চাতে কিছু দূরে থাকিয়া রাধাদাসীও আর একবার সাধুর উদ্দেশে প্রণাম করিল।

সকলে অবধূতের উদ্দেশেও মস্তক অবনত করিয়া যখন বিদায় হইয়া ক্রমশঃ বাহিরে আসিয়া পড়িলেন,

তখন শুনিতে পাইলেন সমস্ত বন কাঁপাইয়া সেই উদাত্ত স্বরে গীত হইতেছে—"দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্ত কিমাত্মনস্তত্র নিজস্বভাবঃ। নহ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষাস্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেতকস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে। আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখ হেতুঃ কিমন্যত তত্র নিজ স্বভাবঃ। নহ্যাত্মনোঽন্যদ্ যদি তন্মৃষাস্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখং। কর্ম্মাস্তহেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মন স্তদ্ধি জড়া জড়ত্বে। দেহস্তচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণং ক্রুদ্ধ্যেত কস্মৈ নহি কর্ম্মমূলং। কামস্ত হেতুঃসুখ-দুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ নাগ্নেহি তাপো ন হিমস্য তৎস্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বং।"

রায় মহাশয় সনিশ্বাসে বলিলেন, "উঠে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু ওঁদের পক্ষে আমাদের সঙ্গ বেশীক্ষণ হলে পীড়াদায়ক হয়। আচ্ছা, ও অবধূতকে জান না কি তোমরা কেউ? রাধা যে বল্লে ওঁকে সে দেখেছে এর আগে?" সকলের পশ্চাদবর্ত্তিনী রাধার প্রতি সকলের দৃষ্টি পতিত হইলে রাধা তখন অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। সে এতক্ষণ অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে সকলের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিল মাত্র, কোন কথা বা আলোচনায় যোগ দিতে পারে নাই। রায় মহাশয় পুনরায় রাধাকে অবধূত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে রাধা কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল, "শুনেছি ঐ লোকটিই নাকি সেই 'রামামীরে' ডাকাত।" কর্ত্তা যেন অতিমাত্র বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন, "রামামীরে? এখনো সে বেঁচে আছে? শুনেছিলাম বটে যার নামে একদিন সমস্ত নদে জেলা থরহরি কাঁপত সে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়। সে যে অনেক দিনের কথা! সেই কি এই অবধূত?" রাধা আবার সঙ্কুচিত ভাবে বলিল "সেই লোকটি বলেই তো মনে হয়। ওর স্ত্রীও সঙ্গে থাকতেন, তিনি বোধ হয় এখন নেই।" কর্ত্তা উৎসাহিত ভাবে বলিলেন, "ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি! সেই রামামীর! ওর ভয়ে কর্ত্তারা বাড়ীতে সেকালে একদল পাইক রেখে সড়কি আর লাঠি খেলা শেখাতেন। ও একবার বলে পাঠিয়েছিল যে বড় রায় ঠাকুরের ভুঁড়িটা সড়কি দিয়ে ফাঁসিয়ে দেব আর ঝর ঝর ক'রে মোহর পড়্‌বে।" তাই শুনে বড় কর্ত্তা তাকে সেই মোহর কুড়ুতে ডাক্‌তেও পাঠিয়েছিলেন। এত তাঁদের সাহস ছিল। তিনি বেঁচে থাকতেই সে একবার নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিল, কিন্তু তখন বড় কর্ত্তা রোগ শয্যায়। সিঁড়ির ঐ দরজা ফেলে দিয়ে সকলে ভয়ে কাঁপছে, বড় ঠাকরুণ একখানা বঁটি হাতে ক'রে বেরিয়ে বল্লেন "রাম! বড় অসময়ে নেমন্তন্ন রাখ্‌তে এসেছিস্ রে! ভীষ্মদেব এখন শরশয্যায়! তবু আয় আমিই তোর নেমন্তন্ন রাখি!" রামামীর আর যাই হোক্ সাহসের মর্য্যাদা জান্‌ত, আর স্ত্রীলোককে ভগবতী জ্ঞানে সমীহ কর্‌ত! বড় ঠাক্‌রুণকে মা বলে ডেকে পায়ের ধূলো নিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমাদের ছোট বেলায় এ গল্প শোনা। জান ত সে বড় ঠাক্‌রুণের কথা? তিনিই সতী যান।" গৌরবের স্মৃতি স্মরণ করিয়া রায় মহাশয় সনিশ্বাসে থামিলেন। রাধা মৃদুস্বরে বলিল, "রামমীরের শেষ জীবনের কথা না কি বড় ভয়ানক।"

"কি বল্‌তো? আর কিছু মনে পড়ছে না ত কি হয়েছিল ওর।"

"নিজের একমাত্র ছেলেকেই না কি—" রাধা অর্দ্ধোক্তিতেই থামিল। রায় মহাশয় যেন শিহরিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ ঠিক্! ওঃ—মনে পড়েছে বটে! সে যে বড় ভীষণ কথা! যে কুল-বেড়ের মাঠে ওর দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেতো, যার জন্য নাম হয়েছিল "বিষম কুলবেড়ে!" সেই মাঠেই তার পাপের ফল নিজের হাতে ফলিয়েছিল! অন্ধকার রাত্রে আপনার ছেলের মাথাতেই—যে লাঠিতে পরের ছেলে মার্‌ত সেই লাঠি! ওঃ!" সমস্ত শ্রোতা একসঙ্গে শিহরিয়া উঠিল। রাধা বলিল, "তারপরেই নাকি স্বামীস্ত্রীতে এই ফকিরি নেয়? কতলোকে দিন পেয়ে কত মারত ধরত, দূর দূর ক'রে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিত, কুঁড়ে জ্বালিয়ে দিত, মুখের অন্ন খেতে দিত না, ছেলেপিলেরা কত অত্যাচার করত, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে আর কোন কথা কেউ শুনতে পায়নি।"

সকলে স্তব্ধ ভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। সায়াহ্নের রৌদ্র তখন মাঠের উচ্চ বৃক্ষের শীর্ষে রক্ত-পতাকার মত ঝলসিতেছিল। রৌদ্রদগ্ধ মাঠের শ্রান্তির নিশ্বাসের মত অপরাহ্ণেও বায়ু এক একবার যেন হায় হায় করিয়া উঠিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিরুপমা দেবী

প্রাচীন ভারতের ভাস্কর-শিল্প

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম্-এ, পি-আর্-এস্

ভূমিকা

ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সম্পদ তাহার ধর্ম্ম, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহার ললিত-কলা। সেই আদি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সিন্ধু নর্ম্মদা গঙ্গা গোদাবরীর তীরে তীরে কত রাজ্য গড়িয়াছে, কত রাজ্য ভাঙ্গিয়াছে, কত রাজ-সিংহাসন ধূলায় লুটাইয়াছে, ইতিহাসে সে-সব কাহিনী রচিত হইয়া আছে, কিন্তু মানুষের চিত্তপট হইতে কবে তাহা মুছিয়া গিয়াছে। এমন-যে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার, তাঁহার নাম আছে শুধু পুঁথির পাতায়; এমন বিস্তৃত মৌর্য্যসাম্রাজ্য, এমন বীর সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন, দেবপাল, মহীপাল, রাজেন্দ্র-কোল, এমন স-সাগরা ভারতের সম্রাট আক্‌বর ঔরংজেব, ইতিহাস ইঁহাদের স্মৃতি বুকে করিয়া রাখিয়াছে শুধু কাহিনী হিসাবে, শুধু ঘটনার পর ঘটনা একটির সঙ্গে আর একটি কি করিয়া গাঁথা হইয়া পড়িয়াছে, তাহারই একটা চিত্র হিসাবে। কিন্তু যে-সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোকিত হইয়া উঠে, যাহার মধ্যে একটা দেশ, কাল ও জাতি ভাষা এবং রূপ পায়, এবং যাহার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সমস্ত মূক অতীত শতকণ্ঠে মুখর হইয়া উঠে, সে-সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় এই দিগ্বিজয়ী সম্রাট ও তাঁহাদের আসমুদ্র-হিমাচল সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। এমন কি যাঁহাদের কূট রাষ্ট্রবুদ্ধি সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ বিপ্লব আবর্ত্তনের পশ্চাতে থাকিয়া রাজ্য ভাঙ্গে গড়ে, রাষ্ট্র ও সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেই বৃহস্পতি-চাণক্য-শুক্রাচার্য্য-মানসিংহ-বাজীরাও-ফারনবিশের বুদ্ধি কৌশলের মধ্যেও নয়। আসল কথা, অন্যদেশে যাহাই হউক, ভারতবর্ষের সত্যকার পরিচয় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মধ্যে নাই। আছে তাহার সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে, যে সংস্কৃতির স্পর্শ ও পরিচয় আমরা পাই তাহার ধর্ম্মে ও সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, শিল্পে ও কথায়। এই সংস্কৃতিই ভারতের ও ভারত-ইতিহাসের একমাত্র সম্পদ, একমাত্র ঐশ্বর্য্য; এই ঐশ্বর্য্যই ভারতবর্ষকে জগতের অন্যতম তীর্থভূমি করিয়া তুলিয়াছে, এবং ইহারই দীপ্তি যুগে যুগে সর্ব্বদেশের সর্ব্বলোকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের সর্ব্বজয়ী বীর তাই বুদ্ধদেব আর আমাদের চিত্তপটে অনন্তকালের জন্য বাঁচিয়া আছেন সম্রাট অশোক, কুমারজীব, গুণবর্ম্মণ-শঙ্করাচার্য্য-শ্রীচৈতন্য-নানক-কবীর-রামানুজ। তাই শতাব্দীর সমুদ্র পার হইয়া রামায়ণ ও মহাভারত আজও আমাদের কাছে নিত্যকালের জীবন্ত বাণী বহন করিতেছে, আর কালিদাস আজও আমাদের নিকট হইতে পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছেন। তাই, কুরুক্ষেত্র পাণিপথ কোনদিনই জাতির তীর্থ হইতে পারিল না, হইল সাঁচি, অমরাবতী, সারনাথ, কোনারক, ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো, মহাবলীপুর, তাঞ্জোর, অজন্তা, নাসিক এবং আরও কত গুহা, পর্ব্বত, যেখানে নীরস পাথর লীলায়িত ছন্দে নাচিয়াছে অযুত কণ্ঠে কথা কহিয়াছে, গান গাহিয়াছে। কবে কোন্ অতীতে ভারতবর্ষে কোন্ জাতি আসিয়া প্রথম ঘর বাঁধিয়াছিল, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষ যখন যাহা ভাবিয়াছে, মনে তাহার যে-কথা জাগিয়াছে, অনুভূতিতে যে-সুর বাজিয়াছে, তখনই সে তাহাকে ধর্ম্মে ও জ্ঞানে, শিল্পে ও সাহিত্যে ভাষা ও রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে। আজ তাই শত শত শতাব্দীর পর বৃদ্ধ ভারতবর্ষের ভাণ্ডারে যত ধর্ম্ম যত জ্ঞান, যত শিল্প যত সাহিত্য জমা হইয়াছে, তাহারা সকলে মিলিয়া ভারতবর্ষের একটি পরিপূর্ণ বাণীকে রূপদান করিতেছে। এই বাণীই ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস, যথার্থ পরিচয়।

ধর্ম্মে ও সাহিত্যে যেমন, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে যেমন, তেমনি ললিত কলার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ভারতীয় সংস্কৃতি এক একটি বিশেষ রূপ পাইয়াছে। নৃত্যে তাহা এক রূপে, সঙ্গীতে অন্য রূপে,

তুলির রঙে ও রেখায় এক রূপে, পাথরের উপর ভিন্ন রূপে তাহা ভাষা ও রূপ লাভ করিয়াছে। এই ভাষা ও ভঙ্গির রূপবৈচিত্র্য সকলের চেয়ে বেশী ফুটিয়াছে ভাস্কর-শিল্পে, এবং তাহার ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিও অন্য সকল ভাণ্ডারের সমৃদ্ধিকে অতিক্রম করিয়াছে। যেদিন হইতে ভারতবর্ষের একটা অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে ধরা পড়ে, প্রায় সেই সময় হইতেই স্বাধীন ভারতের ভাস্কর-শিল্পের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী বহিয়া মুসলমানী আমল পর্যান্ত চলিয়া আসিয়াছে, এবং সেইখানে আসিয়া হঠাৎ যেন নিজকে মরুবালিরাশির মধ্যে হারাইয়া ফেলিয়াছে। মহানুভব অশোকের বিরাট মৌর্য্যসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতে প্রায় দেড়হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র এই শিল্পের কত যে অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল, আর মহাদেশের মতন বিশাল এই দেশে কত যে বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী, শিল্পকেন্দ্র এই দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার হিসাবও আমরা করিতে পারি না। এক এক শিল্পীগোষ্ঠীর, এক এক শিল্পকেন্দ্রের যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ; এক এক বিশিষ্ট রূপভঙ্গির আবার বিভিন্ন বিকার। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর-শিল্পের এই রূপ-বৈচিত্র্য পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছে: কত নূতন বিষয়বস্তু, কত নূতন শিল্পভঙ্গিমা, কত বিচিত্র মণ্ডনরূপ ও রীতি, কত অপূর্ব্ব ছন্দভঙ্গি, কত অভিনব বিন্যাস-কৌশল, সর্ব্বোপরি কত নূতন ভাব-দৃষ্টি-যে তাহার নূতন আবিষ্কার, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শুধু শিল্প ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দিক্ হইতেই নয়, ইতিহাসের দিক্ হইতেও ভারতের ভাস্কর-শিল্প অমূল্য সম্পদ। যে-কথা, যে-কাহিনী পুঁথিতে নাই, শিলালেখ-তে নাই, তাম্র-ফলকে নাই, কিংবদন্তীতে নাই, সে কথা সে কাহিনী যুগে যুগে লেখা পড়িয়াছে এই অগণিত শিল্প-সৃষ্টিগুলিতে—তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনো উপায় নাই। বিচিত্র এই দেশের বিভিন্ন যুগের বিচিত্র বেশভূষা, অলঙ্কার আভরণ, বিচিত্র ধর্ম্ম, অসংখ্য দেবদেবীর অসংখ্যতর রূপ, বিচিত্র প্রকৃতি—সমস্ত কিছুর ছায়া পড়িয়াছে ইহাদের উপর; ভাব ও কল্পনার মায়াস্পর্শে, অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যেন ইহাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য সঞ্জীবিত হইয়া আছে। বন্ধুরূপে শত্রুরূপে কত জাতি বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি লইয়া এই দেশের বুকে বিলীন হইয়া গিয়াছে,—না হয়, তাহার বুকের উপর তাণ্ডব নাচিয়া নিজের দেশেই ফিরিয়া গিয়াছে—ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে মাত্র, কিন্তু তাহার অমোঘ ও অব্যর্থ চিহ্ন আঁকা পড়িয়াছে দেশের এই অপূর্ব্ব শিল্প অবদানের মধ্যে। যে সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ লইয়া তাহারা আসিয়াছিল, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বের কোলাহলে তাহাকে তুচ্ছ করে নাই, তাহাকে ব্যর্থ হইতে দেয় নাই; তাই, কত বিভিন্ন ও বিচিত্র সাধনা এবং সংস্কৃতির স্পর্শ ও প্রভাব যে প্রাচীন ভারতের ভাস্কর শিল্পের উপর আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পারসীক আসিয়াছে, গ্রীক, রোম আসিয়াছে, শক হূন আসিয়াছে; সকলের আগমনের পরিচয় ইহার ইতিহাসে আছে। ভারতের সংস্কৃতি তাই এত বিচিত্র; এমন অপূর্ব্ব; ভারতের ভাস্কর-শিল্পের ইতিহাস তাই এত সুন্দর, এত মূল্যবান।

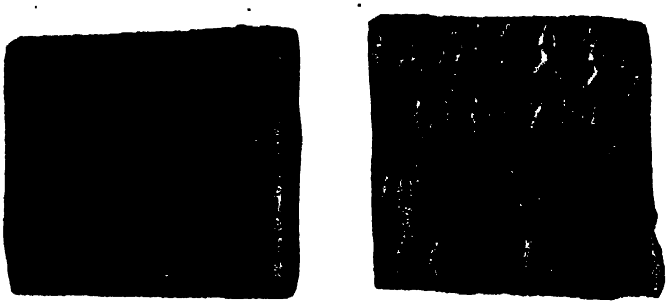
এই অপূর্ব্ব ভাস্কর-শিল্পের বিচিত্র ও অসংখ্য নিদর্শন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে—মাটীর নীচে, পাহাড়ের গায়ে ও গুহায়, মন্দিরের বেদীতে, দেয়ালে ও প্রাচীরে, নদীর গর্ভে, জনবিরল পথে ঘাটে জঙ্গলে। এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের কতকাংশ বিজয়ী মুসলমানের মুষলের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, কতকাংশ পরদেশী সৌন্দর্য্যলোভীদের কবলে পড়িয়া দেশান্তরিত হইয়াছে, এবং অধিকাংশই এখনও মাটির নীচে অথবা লোকলোচনের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছে। অবশ্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় ও উদ্যোগে আজকাল অল্প অল্প করিয়া এই লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের উদ্ধার-সাধন হইতেছে, অনেক গুহা ও মন্দির সংস্কৃত হইতেছে, এবং তাহা হইতেছে বলিয়াই আজ এতদিনে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটা সুসম্বদ্ধ পরিচয় পাওয়া অনেকটা সহজ হইয়াছে।

সূচনা

১। প্রাগৈতিহাসিক যুগ

অশোক কর্তৃক আসমুদ্র-হিমাচল মৌর্য্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ভাস্কর শিল্পের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সূচনা।

কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, আমাদের বাঙলা দেশেরই এক অকালমৃত অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর ভারতের সিন্ধুদেশে জনবিরল মরুভূমিতে —বর্ত্তমান মহেন্-জো-দাড়ো নামক স্থানে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের আনুমানিক (খৃষ্টপূর্ব ৪০০০-৩০০০ বৎসরের) এক বিরাট নগর-পত্তনের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দুই চারিটি মনুষ্যমূর্ত্তি, পোড়ামাটিতে খোদাইকরা কয়েকটি নারী ও পশুমূর্ত্তি, অসংখ্য মাটির বাসন, প্রসাধন দ্রব্য ও অলঙ্কার এবং অনেকগুলি শিলমোহর পাওয়া গিয়াছে। এই শিল-মোহর গুলি প্রায়ই চতুষ্কোণ, এবং হাতীর দাঁত, অথবা এক প্রকার মিশ্র পাথরে তৈরী। মহেন্-জো দাড়ো ও মণ্টোগোমেরি জেলার হরপ্পা নামক স্থানে প্রাক্-বৈদিক ও প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে মোটামুটি ভাবে, একদিকে মেসোপটেমিয়া, কিস্, ও সুসার সুমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, এবং অন্যদিকে বেলুচিস্তান ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সংস্কৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ ঐক্য আছে, পণ্ডিতেরা এইরূপ অনুমান করেন। অবশ্য এই অনুমানের যথেষ্ট কারণও আছে। মহেন্-জো-দাড়োতে যে অসংখ্য মাটির বাসন ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের আকৃতি ও গড়ন এবং



১নং চিত্র—মহেন্-জো-দাড়োয় প্রাপ্ত শিলমোহর

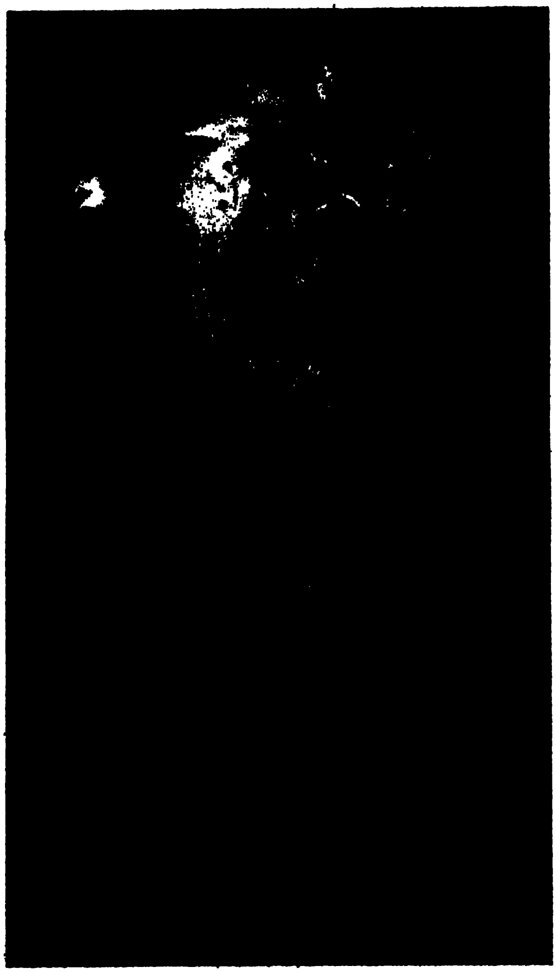
তাহাদের উপর রেখাঙ্কনের নমুনার সঙ্গে মেসোপটেমীয় গড়ন ও নমুনার আশ্চর্য্য মিল আছে। কিন্তু এই ঐক্যের সব চেয়ে বড় পরিচয় আছে শিলমোহরগুলিতে (১নং চিত্র)। ইহাদের উপর ক্ষোদিত লিপির পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই; তবে এই অক্ষরগুলি যে চিত্রাক্ষর এবং সেই হিসাবে ইহাদের সঙ্গে সুমের লিপির নিকট সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া ক্ষোদিত ষাঁড় গণ্ডার ও হাতীর মূর্ত্তিগুলির শিল্প-ভঙ্গীর সঙ্গে সুমের শিলমোহরের উপর ক্ষোদিত এই জাতীয় মূর্ত্তির শিল্প-ভঙ্গিরও অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। জন্তুগুলির দাঁড়াইবার ভঙ্গিতে, মাংসপেশীর গড়নে এবং মোটামুটি আকৃতিতে যে বিশিষ্ট শিল্প-রীতির পরিচয় আছে, সেই পরিচয় মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত সুমের শিলমোহরের জন্তুগুলিতেও পাওয়া যায়, এবং পরে আসীরীয়, বাবিলনীয় ও একিমিনিয় শিল্পেও ইহার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দেহের মাংসপেশীগুলিকে প্রধান করিয়া দেখাইবার চেষ্টা, দেহের বস্তুরূপটির উপরই বিশেষ করিয়া মনোযোগের প্রয়াস, শিল্পের এই দৃষ্টি-ভঙ্গী মহেন্-জো-দাড়ো হইতে আরম্ভ করিয়া সুমের, এবং পরে পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত শিল্পরীতির মধ্যেই কোনো না কোনো রূপে দেখা যায়। এই সব ও অন্যান্য প্রমাণ দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এই বিশিষ্ট শিল্পরীতি যে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ, সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই ভারতবর্ষে সিন্ধুনদীর তীরে মহেন-জো-দাড়ো-হরপ্পাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল, পরে ক্রমে পশ্চিমদিকে সুমের দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং আরও পরবর্ত্তীকালে পশ্চিম এশিয়ার আসীরীয়, বাবিলনীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির সূচনাতেও ইহার প্রভাব ছিল।

কিন্তু শিল্পের যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এই শীলমোহরগুলির মধ্যে দেখিলাম মহেন্জো-দাড়োয় প্রাপ্ত মনুষ্যমূর্ত্তিগুলিতে ঠিক এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই না। প্রায় সবগুলি মূর্ত্তিই ভগ্নাবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে, তবু উপরার্দ্ধ হইতেই ইহাদের শিল্পভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া কঠিন নয় (২নং চিত্র)। ইহাদের মধ্যে শ্মশ্রু ও সুবিন্যস্ত কেশ মণ্ডিত একটী দীর্ঘাকৃতি পুরুষের আবক্ষ মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি চুনাপাথরের তৈরী এবং উপরে বালির প্রলেপ দেওয়া। ছুটীরই দেহভঙ্গী স্থির ও উন্নত, কিন্তু আড়ষ্ট। মুখ ও দেহের দৃষ্টি ঠিক সম্মুখ-স্থানক নয় (frontal) বরং কতকটা

ত্রিকোণ ও অৰ্দ্ধ-স্থানক (three-quarter profile and profile)। ছুটা মূর্ত্তিরই চুল ও দাড়ির বিন্যাস-ভঙ্গী একটু অদ্ভুত; প্রত্যেকটি চুলের গুচ্ছকে পৃথক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা ইহার মধ্যে পরিস্ফুট। সমগ্র মুখটির একটা সহজ সমগ্র দৃষ্টি লইবার প্রয়াস শিল্পীর ছিল না। নাক, মুখ, চোখের পাতা, চোখ, ঠোঁট, কপাল, সমগ্র দাড়িটি, এমন কি প্রত্যেকটি চুলের গুচ্ছও তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সুনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ; একটি অঙ্গের গড়ন সহজ-ভাবে আর একটি অঙ্গের গড়নের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয় নাই। মূর্ত্তিটিতে উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, অৰ্দ্ধমুদিত দৃষ্টি এবং পুরু ভারী ঠোঁট খুবই লক্ষ্য করিবার। হাজার হাজার বৎসর পরেও ভারতীয় ভাস্কর্য্যের কোন কোন বিশেষ শিল্পভঙ্গির হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তিতে অবিকল এইরূপ অৰ্দ্ধমুদিত যোগ-দৃষ্টি এবং এইরূপ ভারী পুরু ঠোঁট দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি বিষয়েও হাজার বৎসর পরের খাঁটি ভারতীয় ভাস্কর্য্যে দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মহেন-জো-দাড়োর এই ভাস্করশিল্পের দৃষ্টি-ভঙ্গির মিল্ আছে। মূর্ত্তিটির মুখ-মণ্ডলের গড়ন ও অপর একটির দেহাংশের গড়ন হইতে বেশ বুঝা যায়, শিল্পী কোথাও দেহের কোনো অংশবিশেষকে, তাহার স্নায়ু ও পেশীগুলিকে প্রধান করিয়া দেখাইতে, কিংবা দেহের বস্তুরূপটাকেই একান্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। প্রত্যেকটি দেহাংশই অন্য দেহাংশ হইতে পৃথক; তৎসত্ত্বেও পৃথক পৃথক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা দেহাংশের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে; দেহের ও মুখমণ্ডলের গড়নের গতিটি সহজ ও অব্যাহত রাখিবার জন্য দেহের কোনো অংশবিশেষের গড়নের উপর অধিক মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। এই মূর্ত্তিগুলির এই বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে শিলমোহরে খোদিত পশুমূর্ত্তিগুলির শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গির সেই জন্যই একটা পার্থক্য আছে।

২। মৌর্য্য-পূর্ব্ব-যুগ

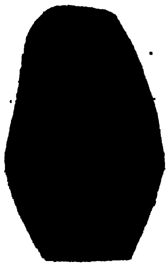
মহেন্-জো-দাড়োর প্রাগৈতিহাসিক যুগের পর হইতে মৌর্য্য রাজত্বের যুগ (খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০ অব্দ) পর্য্যন্ত হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ভাস্করশিল্পের খুব কম নিদর্শনই আমাদের জানা আছে। এই হাজার হাজার বৎসরের কোন সুনির্দ্দিষ্ট ইতিহাসও আমাদের জানা নাই। মৌর্য্য-পূর্ব্ব-যুগের অর্থাৎ শিশুনাগ ও নন্দবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যে নানাপ্রকার শিল্প ও শিল্পীগোষ্ঠীর প্রচুর উল্লেখ আছে, কিন্তু শিল্প-নিদর্শন কমই



২নং চিত্র—মহেন্-জো-দাড়োর প্রাপ্ত পুরুষ-মূর্ত্তি

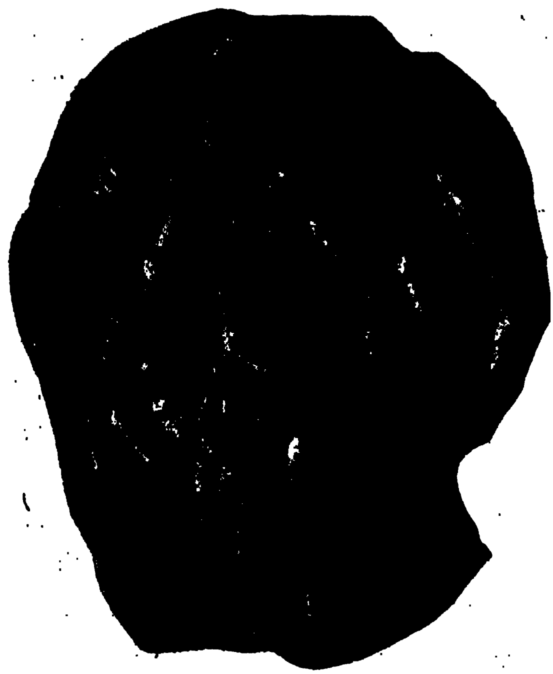
পাওয়া যায়। লৌড়ীয়া নন্দনগড়ে একটা বৈদিক শ্মশান-স্তূপ খননাবিষ্কারের ফলে সোনার পাতে ঢালাই করা একটা ছোট নগ্ন নারী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, বোধ হয় পৃথিবী-দেবীর মূর্ত্তি (৩নং চিত্র)। ঠিক্ এই ধরণেরই আর একটি পোড়া মাটির মূর্ত্তি

পাওয়া গিয়াছে তক্ষশীলায়, ভির্ স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। তাহা ছাড়া অনুরূপ পোড়ামাটির মূর্ত্তি নগরী, ভীটা, বসার, এবং



৩নং চিত্র—লৌড়িয়া-নন্দনগড়ে বৈদিক শ্মশান-স্তূপ হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণপাতের উপর-মূর্ত্তি (অবিকল আয়তন)

পাটলীপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও আবিষ্কৃত হইয়াছে (৪নং চিত্র)। নন্দনগড়ের সোণার পাতের মূর্ত্তিটিতে এবং পোড়ামাটির অন্যান্য মূর্ত্তিগুলিতে যে শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে আমরা ঠিক ভারতীয় ভাস্কর্য্য-রীতির প্রথম সূচনা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। মহেঞ্জোদাড়োর যে শিল্পরীতির কথা আগে বলিয়াছি, তাহা ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একতম এবং প্রাচীনতম রূপ সন্দেহ নাই; কিন্তু যে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং সেই সঙ্গে যে-শিল্পের পরিচয় আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধুদেশে পাই, হাজার হাজার বৎসর অতিক্রম করিয়া তাহার সঙ্গে পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক যুগের খাঁটি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটা সত্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা খুব সহজ নহে। কিন্তু মৌর্য্যপূর্ব্ব-যুগের যে কয়টি শিল্প নিদর্শন আমাদের জানা আছে, তাহার মধ্যে এই সত্য ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আভাস পাওয়া অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটা বিশেষ মুখ ও দেহাকৃতির পরিচয় আছে। মুখমণ্ডলটি গোল ও চ্যাপ্টা ধরণের, তাহারই উপর একটি ভারী চ্যাপ্টা নাক, ভারী পুরু এবং জোড়া ঠোঁট; মুখমণ্ডলটির গড়ন একটু ভারী ও সুডৌল, উঁচু মাংসল গাল দুটির এবং চিবুকের সুডৌল গড়নটি যেন একটি অর্দ্ধমণ্ডলাকৃতির মতন, এবং তাহা যেন ক্রমে ঢালু হইয়া নাক ও ঠোঁটদুটির কোণ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। নারীমূর্ত্তিগুলিতে গোল ভারী স্তনযুগ, এবং ভারী ও সুপ্রশস্ত নিতম্বদেশ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; গোল ভারী কর্ণকুণ্ডল, মেখলার অলঙ্কার এবং বিশিষ্ট কেশ-বিন্যাসের রীতিও লক্ষ্য করিবার। এই বিশেষ মুখ ও দেহাকৃতি, গড়ন-ভঙ্গি এবং কেশ ও অলঙ্কার বিন্যাসের মধ্যে যে শিল্পরীতি ও ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে মথুরা, ভাজা ও বরহুতের সুঙ্গ এবং অন্ধ্র বংশের রাজত্বকালের ভাস্কর্য্যের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। মুখ ও দেহাকৃতি এবং গড়নভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নাই; কেশ ও অলঙ্কার বিন্যাসের রীতির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও দুই রীতির মধ্যে একটা সম্বন্ধ সহজেই চোখে ধরা পড়ে। সোণার পাতের পৃথিবী দেবীর মূর্ত্তিটি সম্মুখ-স্থানক, কিন্তু তাহার পা ও পায়ের



৪নং চিত্র—বসার হইতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্ত্তি (অবিকল আয়তন)

পাতা দুটি দেখাইবার ভাব একটু অদ্ভুত; সে দুটিকে সহজ ভাবে সম্মুখের দিকে না রাখিয়া পাশের দিকে ঘুরাইয়া রাখা হইয়াছে। দেখিয়া মনে হয় সহজভাবে সম্মুখের দিকে রাখিয়া দেখাইবার শিল্পকৌশলটি তখনও শিল্পীর আয়ত্ত হয় নাই। মনুষ্য-মূর্ত্তির দাঁড়াইবার এই বিশেষ ভঙ্গিটি পরবর্ত্তী সুঙ্গ যুগের বরহুত স্তূপের প্রাচীর গাত্রে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যেও দেখা যায়। এই সব সাদৃশ্য হইতে মনে হয়, মৌর্য্য-পূর্ব্ব-যুগের

এই শিল্প নিদর্শনগুলিকে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের প্রথম সূচনার পরিচয় বলিয়া ধরিয়া লইলে খুব ভুল করা হইবে না।

ভাস্কর্য্যের এই কয়েকটি নমুনা ছাড়া এই যুগের অলঙ্কার, চিত্রাঙ্কিত মাটির বাসন ইত্যাদি আরও দুই চারি প্রকারের শিল্প-নিদর্শন আমাদের জানা আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী মৌর্য্য-যুগের ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্প-নিদর্শনের প্রাচুর্য্য এবং ভাস্কর্য্যের বিচিত্র রীতি ও ভঙ্গি, মণ্ডন-শিল্পের নমুনা ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় মৌর্য্য-পূর্ব্ব-যুগেও এই নানাজাতীয় শিল্পের এই বিচিত্র রীতি, ভঙ্গি ও নমুনা ইত্যাদির সমৃদ্ধি কিছু কম ছিল না, এবং ভারতীয় শিল্পীরা তাহাতে অভ্যস্তও ছিল। তাহা না হইলে হঠাৎ মৌর্য্য বংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের এমন একটা শিল্প-সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইত না। বস্তুতঃ মৌর্য ও সুঙ্গ ভাস্কর্য্যে এমন কতকগুলি রূপবস্তু ও মণ্ডন-বস্তুর নমুনা আমরা পাই, যেগুলির উদ্ভব হঠাৎ হইতে পারে না; বহু বৎসর, বহু যুগ ধরিয়া সেইসব রীতি ও নমুনায় শিল্পীর হাত ও মন অভ্যস্ত না হইলে, জাতীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাহা মিশিয়া না গেলে মৌর্য্য অথবা সুঙ্গ যুগে হঠাৎ সেগুলি পাথরের উপর নানান্ বিচিত্ররূপে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিত না। সেইজন্যই একথা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক যে মৌর্য্য-পূর্ব্ব-যুগেও ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতে, অন্যান্য শিল্পের মত ভাস্কর শিল্পেরও একটা সমৃদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল; কিন্তু আজ যে সে-সমৃদ্ধির খুব কম পরিচয়ই আমরা পাই, তাহার একমাত্র কারণ পাথর লইয়া কাজ করিতে শিল্পীরা তখনও ভাল করিয়া শেখে নাই, পাথর খুদিয়া বস্তুকে, মণ্ডন-নমুনাকে রূপায়িত করিবার রীতি তখনও সুপ্রচলিত হয় নাই, কিংবা সে ক্ষমতা তখনও আয়ত্ত হয় নাই। মাটি লইয়া, কাঠ লইয়াই ছিল শিল্পীর কারবার; কাদা মাটি গড়িয়া পিটিয়া এবং পরে তাহাকে পোড়াইয়া কাঠ খুদিয়াই সে তাহার শিল্প-বোধ ও বুদ্ধিকে রূপদান করিত। আজ সেই পোড়ামাটির শিল্প-নিদর্শন যদিই বা কিছু কিছু পাওয়া যায়; সেই কাঠের চিহ্নও আর নাই; হাজার বৎসরের মাটির চাপে তাহা মাটির সঙ্গেই মিশিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, মৌর্য্য ও সুঙ্গ যুগের ভাস্কর্য্যে কতকগুলি বিশিষ্ট মণ্ডন-রূপ ও নমুনার পরিচয় আমরা পাই, এবং এগুলি একান্তভাবে মৌর্য্য অথবা সুঙ্গ ভাস্কর্য্যেরই নিজস্ব বস্তু নয়। এই মণ্ডনরূপ ও নমুনাগুলি পশ্চিম এশিয়ার সুপ্রাচীন বাবিলনীয় ও পারস্যের ভাস্কর্য্যেও সমানভাবে দেখা যায়, এবং পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যেও তাহার পরিচয় কম নয়। মৌর্য্যযুগে অশোকের রাজত্বের ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের উপর এই পশ্চিম-এশীয় ভাস্কর্য্যের প্রভাব খুব সুস্পষ্ট বলিয়া, এবং এই যুগেই উল্লিখিত মণ্ডনরূপ ও নমুনার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সম্রাট অশোকই পশ্চিম এশিয়ার পারসীক শিল্পীকুলকে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন, এবং তাহাদেরই প্রভাবে মৌর্য্য ও পরবর্ত্তী সুঙ্গ ভাস্কর্য্যে পশ্চিম-এশীয় শিল্পের প্রভাব এবং তাহার সঙ্গে এই সকল মণ্ডনরূপ ও নমুনা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু একজন রাজা অথবা সম্রাটের রাজত্বে তাঁহার ইচ্ছায় অপর একটা শিল্পের প্রভাব অন্য একটা শিল্পরীতি ও সংস্কারের উপর হঠাৎ এমন ভাবে সুবিস্তৃত হইয়া পড়া, এবং জাতীয় শিল্প সংস্কারের সঙ্গে এত শীঘ্র এক হইয়া যাওয়া একটু বিস্ময়কর! ধীরে ধীরে বহুদিন ধরিয়া একটু একটু করিয়া তাহা স্বীকার করিয়া না লইলে অন্য একটা শিল্প-রীতি ও সংস্কার সহজে এক হইয়া যাইতে পারে না; কোনো যুগের কোনো দেশের শিল্প-ইতিহাসে তাহা হয় না। সেই জন্যই মনে হয়, মৌর্য্য-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যের সঙ্গে পশ্চিম-এশীয় শিল্পের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এবং ক্রমে পরবর্ত্তী কালে সেই সম্বন্ধ নিকট হইতে নিকটতর হইয়া পড়ে। একথাও অনুমান করা স্বাভাবিক যে পশ্চিম-এশীয় শিল্পের এই ধারা শুধু বাবিলনীয় অথবা পারসীক শিল্পেরই একান্ত নিজস্ব ধারা নয়; কতকটা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পেরও ধারা বটে, এবং পরবর্ত্তী কালের ভারতীয় ভাস্কর্য্য এই সুপ্রাচীন ধারার উপরেই প্রতিষ্ঠিত; সেই ধারারই পরিচয় পরে মৌর্য্য ও সুঙ্গ ভাস্কর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ অনুমান খুব মিথ্যা নয়, কারণ প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন পারস্য একই সাধনা ও সংস্কৃতির সন্তান, একথা বহুদিনই প্রমাণিত হইয়াছে; তাহাদের শিল্প-রীতি ও সংস্কারও যে সেই হিসাবে গোড়ায় এক এবং অভিন্ন ছিল, তাহাও সন্দেহ করবার কারণ নাই। পরবর্ত্তী কালে

ভারতীয় ও পারস্য-শিল্পের বিকাশ বিভিন্ন পথে বিভিন্ন রূপে হইয়াছে, একথা সত্য ; কিন্তু কতকগুলি মণ্ডন-রীতি ও নমুনা একই রকম থাকিয়া গিয়াছে, দুই শিল্পেই তাহার রূপ ও বিকাশ প্রায় একই রকম।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের সঙ্গে পরিচয় করিতে হইলে গোড়ায় এই কথাটি জানিয়া রাখা ভাল ; কারণ, তাহার প্রথম অধ্যায়েই অর্থাৎ মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যেই পারসীয় শিল্পের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো পশ্চিমের কোনো বিশেষ শিল্পরীতির স্পর্শের পরিচয়ও তাহার মধ্যে নিতান্ত অস্পষ্ট নহে। মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যের আলোচনায় এই স্পর্শ ও প্রভাবের পরিচয় আমরা পাইব। সে পরিচয় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

রাজার দুলাল বৈরাগী হ'ল

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

গাঙের কিনারে বেলা ডুবু ডুবু! ঝরা কামিনীর বাসে
হায় অবেলায় রাজ-ঝিয়ারীর তন্দ্রা নামিয়া আসে!
আঁধার ঘনালো ঘন বাঁশবনে, বনছেড়ে সে আঁধার
দাঁড়ালো নিরালা শেষে বটছায়ে শ্মশান ঘাটার পার।
শেষে সে আঁধার চুপি চুপি হায়, পশে গিয়ে কার প্রাণে?
রাজার পুত্র কাঁদিল না, শুধু দুলালীর আঁখি টানে।
রাজার ছেলে সে রাজকন্যার টানিছে নলিন-আঁখি
আর বলিতেছে—"আমারে একেলা ফেলিয়া পালালে নাকি?"
যে দু' চোখে হাসি নাচিত সদাই—হায়, চোখ খুলিল না।
শ্মশান ঘাটায় বেলা ডুবে' যায়, ছড়ায়ে রোদের সোনা!

রাজার পুত্র কাঁদিল না, বলে—"আনিব সোণার কাঠি
আমার সোণার পুতলী আবার জিয়াইব পরিপাটী—।"
দিশা নাই—ছুটে শাওনের মেঘ সারা ভুবনের মাঝ—
মনের কথার সাক্ষী কেবল শ্মশানের বটগাছ।
রাজার দুলাল মাটীর ধূলায় সব ছেড়ে বৈরাগী,
হায়, দুষ্কর একি তপস্যা ঘুমন্ত প্রিয়া লাগি!
এ কেমন ধারা! তবু সে কাঁদে না—বিশুষ্ক দু'নয়ান
বড় ব্যথা বুকে বাজে তাই আরো জোরে জোরে গায় গান।

আজি সে সোণার কাঠি পাইয়াছে, কিন্তু সেজন নাই—
সোণার বরণী শ্মশানের ঘাটে কবে হয়ে' গেছে ছাই।
প্রিয়া নাই, তবু ঐ সে ছুটেছে সোণার কাঠিটি হাতে
কোথা? সব খানে! পথ ঠিক নাই, ঘুম নাই আঁখি-পাতে,
কত গাঁয়ে গাঁয়ে বিলে আ'লপথে উলুর কুটীর মাঝ
আর দীঘি-পাড়ে দীঘল ছায়ায় ছুটিছে রাজাধিরাজ।
প্রিয়া মরিয়াছে, আর সে দেখিল বাংলার ঘরে ঘরে
নারী মরিয়াছে—নারী-কঙ্কাল সারি সারি আছে পড়ে।
যারে পায় তারে ছোঁয়ায় সে তার হাতের সোনার কাঠি
সোণার সীতারা উঠিয়া দাঁড়ালো বাংলার মাটি ফাটি।
এক নারী গেল, তাহারি ধেয়ানে কোটি নারী পায় প্রাণ
রাজার পুত্র শোকেতে কাঁদে না শুধু গেয়ে' চলে গান।

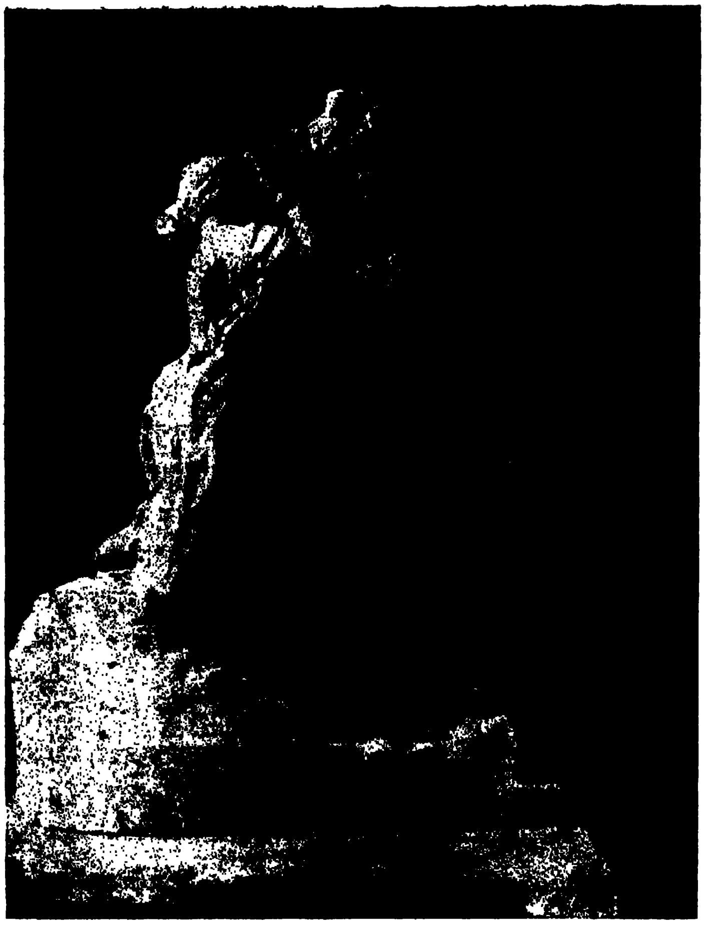
মড়া-জিয়াবার নেশায় পাগল, তার কি নজর আছে
কোটি নারীদের মাঝখানে কবে তারো প্রিয়া জাগিয়াছে?
তিনি বেঁচেছেন!—সতীর মূরতি দেখে এনু দূর গাঁয়ে
গেঁয়ো মেয়েদের সঙ্গে মিতালি বন বন প্রচ্ছায়ে।
তোমার প্রিয়ারে চোখে দেখে এনু, শব-সাধনের ঋষি!
পাতার কুঁড়ের পাশে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে—আঁধার নিশুতি নিশি—

পিদিম আলোর পল্লীর বধূ সেলাই করিছে কাঁথা
আর মনে মনে গুণ গুণ করে তোমাদের প্রেম-গাঁথা।
আমি দেখে এনু, গাঁয়ে সাঁঝ নামে—শাঁখ বাজে ঘরে ঘরে
তোমার প্রিয়ার ছবিটিরে আগে মেয়েরা প্রদীপ ধরে।
এক বিধবারে হাসিতে দেখিনি, দু'চোখ রহিত ভরি'—
তব প্রিয়া তার চোখ মুছালেন, সে যে তাঁর সহচরী।
তোমার হিয়ার কমল আজিকে একেলা তোমার নয়,
আমি দূর গাঁয়ে কুটীরে কুটীরে পেয়ে এনু পরিচয়।
সতী-হারা শিব, তুমি ছড়ালে যে বরতনু প্রেয়সীর
সারা বাংলায় ছড়াইয়া উহা রচিয়াছে মন্দির।
দেখে আসিলাম, যেখানে পড়েছে সতীদেহ এক কুটি;
অপরূপ রূপ শতদল হয়ে অমনি উঠেছে ফুটি'
আজি দেখে এনু দেশ জুড়ে তব বিরহের গাঙ চলে
তার দুই কূলে কত কত ফুল ফুটিয়াছে দলে দলে!

আমি দেখি আর বিস্ময় মানি, উল্লাসে নাচে প্রাণ—
একি অপরূপ তাজ গড়িয়াছ হে বিরহী শাজাহান?
নীলাকাশ চিরে শির তুলে নাহি দম্ভের ভঙ্গিমা
শক্ত পাথরে ঘিরে চারিধার গড়ো নাই কোন সীমা।
এ তাজের কোলে চুপে চুপে যেই অশ্রু-যমুনা বয়,
তার ক্ষীণধারা যাত্রীরা কেহ দেখেনাক নিশ্চয়।
তোমার মতন বুক হ'লো যায়' ব্যথার আগুণে খাঁক,
তব মন্দিরে আসুক অভাগা, আসিয়া হাসিয়া যাক
এসে দেখে যাক বুকে শোক নিয়া হাসা যায় মন খুলে
অশ্রু-পিছল শ্মশান-ঘাটাও ঢাকা যায় ফুলে ফুলে।
হে মহৎ, তুমি শাওনের মেঘ—বক্ষে বাদলরাশি
বাদল কখনো ঝরিতে দেখিনি, দেখি ঝিলিকের হাসি।

শ্রীমনোজ বসু

পরলোকগতা সরোজনলিনীর স্মৃতিতে
শ্রীযুক্ত গুরু সদয় দত্তের প্রতি—

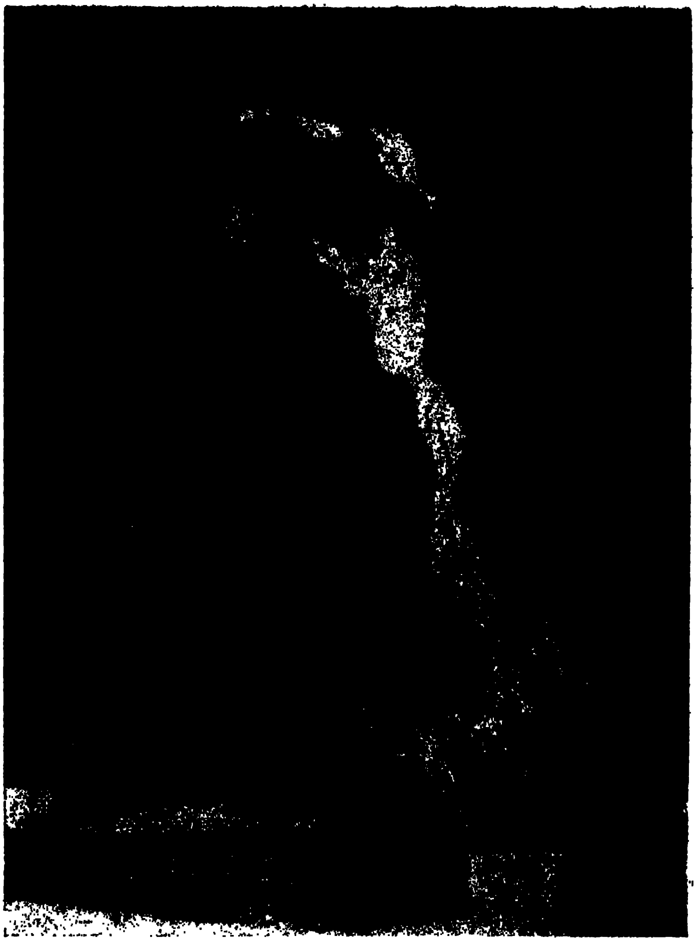


ধরিত্রীর দুহিতা (Daughters of the Soil)

[মাদ্রাজ ফাইন্ আর্ট সোসাইটির ১৯৩০ সালের প্রদর্শনীতে ভাস্কর্যে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত]

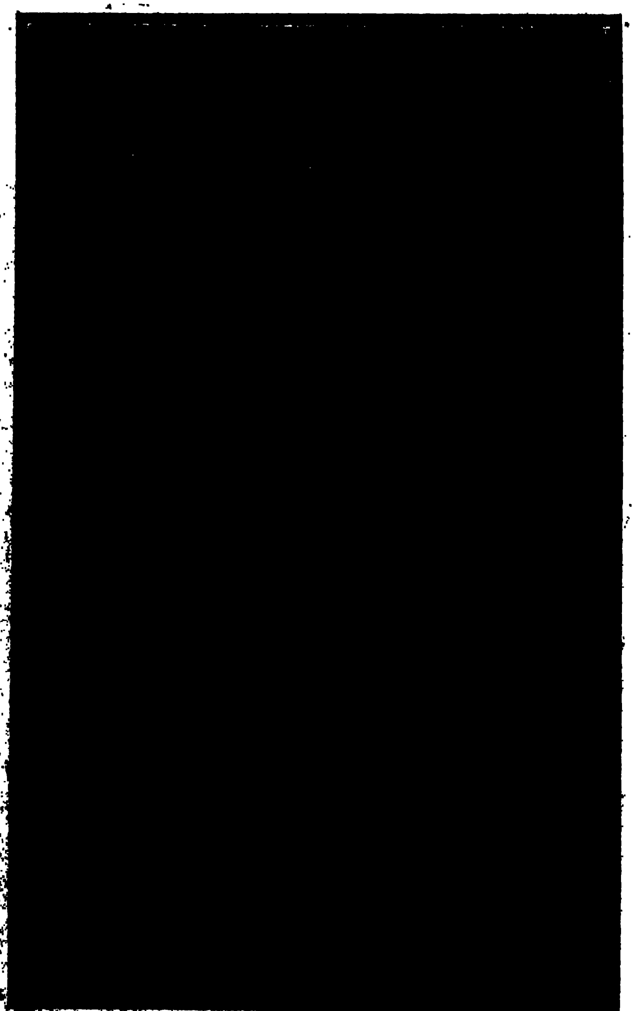
চিত্রশালা

শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগীর গঠিত
কয়েকটি মূর্ত্তির প্রতিলিপি—



ধরিত্রীর দুহিতা (অপর পার্শ্ব)

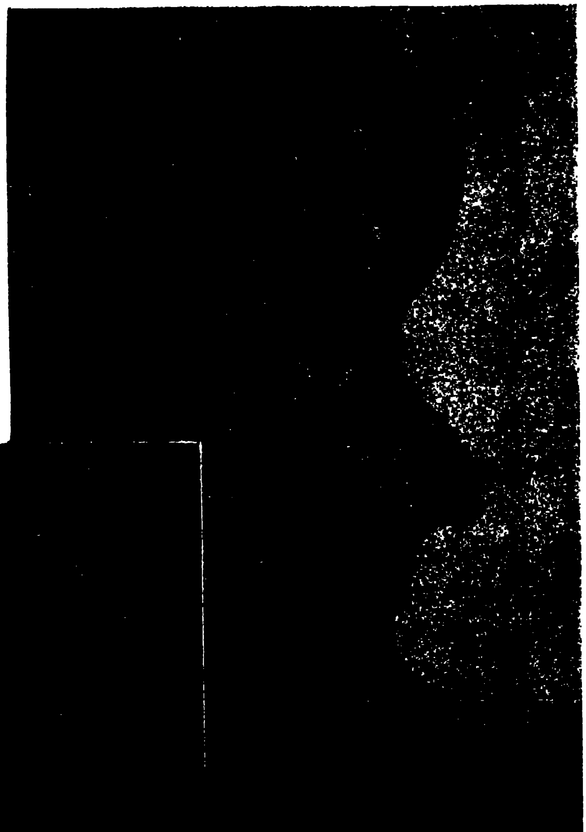
[মাদ্রাজ ফাইন্ আর্ট সোসাইটির ১৯৩০ সালের প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য্যে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত]



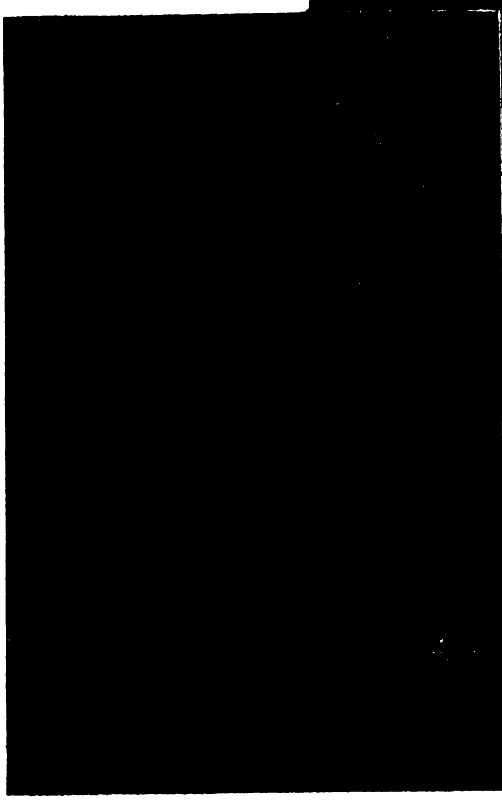
একটি সাঁওতাল রমণীর উচ্চাবচ পরিচিত্রণ (শান্তিনিকেতন)



প্রণতি



মাদ্রাজের জনৈক শিল্পী-বন্ধু



শান্তিনিকেতনের জনৈক ভাস্কর-বন্ধু

বৃহত্তর—মহত্তর

—বড় গল্প—

শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের পাড়া থেকে উঠে যাওয়ার তিন বছর পরে এক দিন নগেনের সঙ্গে পথে দেখা হল। লোকটার চেহারায় না' হোক, পোষাকের খুব উন্নতি হয়েছে দেখলাম। মাথায় চকচকে টেরি, গায়ে শিল্কের পাঞ্জাবী, পরণে কোঁচানো শান্তি-পুরে ধুতি, পায়ে চক্‌চকে ডার্ব্বি। হাতে আবার একটা রিষ্টওয়াচ বাঁধা!

একগাল হেসে পরমাত্মীয়ের মত বল্‌ল, রেষ্টুর‍্যান্টে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, পকেটে হাত দিয়ে দেখি মানিব্যাগটা ভুলে এসেছি। এমন ক্ষিদে পেয়েছে ভায়া!

আশে পাশে রেস্তর াঁর নাম গন্ধ ছিল না, দেশী খাবারের দোকান ছিল; বললাম, খাবার খাবেন?

অগত্যা! ব'লে সে একটা বিড়ি ধরাল। সঙ্গে ক'রে তাকে খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসালাম। সে নিজেই এটা ওটা ফরমাস করল, আমি তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে টাকা তিনটে আর একবার গুণলাম। জিজ্ঞাসা করলাম দিদি কেমন আছে?

জানি না, ব'লে সে একটা রসগোল্লা গিলে ফেল্‌ল।

জানেন না মানে?

মানে আমায় কলা দেখিয়ে শালী ভেগেছে চার মাস!

আমি নীরবে উঠে দাড়ালাম যাবার জন্ত পা বাড়াতেই সে ব্যাকুল হ'য়ে বলল, চললেন যে?

সে কৈফিয়তে আপনার প্রয়োজন?

এহেঃ, চটেন কেন! খাবারের দামটা দিয়ে যান। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। মাইরি বলছি। কালীর দিব্যি।

দাম? দাম আমি জানি না, ব'লে পা বাড়ালাম।

সে উঠে এসে কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলল, এ কোন দেশী ঠাট্টা ভাই? বিপদে ফেলে পালাতে চান কি রকম? প্রতিজ্ঞা করছি আর খারাপ কথা বলব না। খুব সম্মান ক'রে কথা কইব। কি জ্বালা, আপনার পায়ে পড়চি দাদা, হ'ল?

আমি ফিরলাম। সে আবার খেতে আরম্ভ ক'রে অনুযোগের সুরে বলল, রাগের মাথায় একটা বেফাঁস কথা বার হয়ে গেছে ব'লে কি এমন করতে হয় রে দাদা! মাইরি আমার বুক কাঁপছে এখনো।

কাঁপুক। চট ক'রে বলুন দিদির কি হয়েছে।

সে অনেকক্ষণ ধরে যা বলল তার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই। মাস চারেক আগে একদিন সকালে উঠেই মমতাদি বলল, আমি বিদায় হলাম। এ জীবনের ক্ষুদ্রতা আমার সইচে না। আমি মহত্তর বৃহত্তর জীবনে সার্থকতা খুঁজতে চললাম। ব'লে নগেনকে কথাটি কইবার (মানে, চুলের মুঠি ধরে আটকাবার) সুযোগ না দিয়েই ফস্‌ ক'রে চ'লে গেল। নগেন প্রথমটা ভাবল সে বুঝি আমার ভর ক'রে অকূলে ভাসল। (এইখানে সে হাত জোড় করল, পাছে আমি রাগ করি) শেষে শুনল, তা নয়, কি একটা নারী-সমিতিতে যোগ দিয়ে সে দেশের কাজে গেগেছে। চরকা ঘোরায়, ছোট ছেলে মেয়েদের পড়ায়, বাড়ী বাড়ী মেয়েদের কাছে স্বদেশী প্রচার করে। একথা জেনে আমাকে মিথ্যা সন্দেহ করার করার জন্ত দুঃখে লজ্জায় অনুতাপে—

আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম, সে আমার কানের কাছে দুঃখ-লজ্জা অনুতাপের জলন্ত বর্ণনা ক'রে চলল। আমি খানিক শুনলাম, খানিক শুনলাম না। শেষটা কিছুই শুনলাম না।

উদ্গারের শব্দে সচেতন হয়ে দেখলাম তার খাওয়া ও বক্তৃতা শেষ হয়েছে। পুনরায় উদ্গার তুলে বলল, আর খাব না, দামটা দিয়ে দিন।

দিচ্ছি। এত ঘটা ক'রে সাজ করেছেন কেন বলুন ত?

দিদির শোকে না কি? কালো দাঁত বার ক'রে হাসল, আরে রামো, সে বৃহত্তর মহত্তর জীবনে সার্থক হতে গেছে তার জন্যে শোক কি! আবার বিয়ে ক'রে ফেলেছি কি না—বুঝলেন না? দুটো পয়সা দিন ত, পান কিনব।

আমার হঠাৎ ইচ্ছা হল খাবারের দাম না দিয়ে চ'লে যাই; দোকানীর হাতের অনেক মিষ্টি খেয়েছে, একটু প্রহারও খাক্। কষ্টে সে সঙ্গত ইচ্ছা সংযত ক'রে খাবারের দাম মিটিয়ে দিলাম। পান খাবার পয়সা দিয়ে নারী-সমিতির নাম টুকে নিয়ে পথে নেমে গেলাম। পথে মানুষের ভিড়। আমার মনে হল, একই পথ বেয়ে আমিও চলেছি এত লোকও চলেছে কিন্তু প্রত্যেকের মনোবেদনার উৎস কত বিভিন্ন! এতগুলি চিন্তা-জগতের একটিতেও কি মমতাদির মত কেউ নীরব দুঃখের পদচিহ্ন এঁকে চলেছে?

নারীসমিতিটির খোঁজ করে সম্পাদিকার সঙ্গে দেখা করলাম! তিনি জানালেন মমতাদি মাঝে একমাস জেল খেটেছে এবং আবার জেলে যাবার জন্য বাড়াবাড়ি আরম্ভ করায় তাকে মফস্বলে কাজ করতে পাঠান হয়েছে। এই সমিতির কাজ গঠনমূলক, ধ্বংস এর কর্ম্মীদের ব্রত নয়, মমতাদিকে নিয়ে সম্পাদিকার বড় মুস্কিল।

পরদিন আমি মমতাদি যে গ্রামে ছিল সেখানে গেলাম। কলকাতা থেকে চার পাঁচ ঘণ্টার পথ।

বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের পাশে একটা নদী। খোঁজ ক'রে, শোভার প্রাচুর্য্যে নদীতীর যেখানে আপনাতে আপনি মুগ্ধ হয়ে আছে সেইখানে একটি ছোট টিনের বাড়ীতে মমতাদির দেখা পেলাম। মমতাদি এবং তার সঙ্গিদের জন্য গ্রামের কে সদাশয় ব্যক্তি এই বাড়ীখানা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তখন দুপুর। শরতের প্রথম হলেও রোদের তেজ ছিল। সদরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াতে চার পাঁচটী চরকার শব্দ শুনতে পেলাম। মমতাদিকে ডাকতে চরকা থেমে গেল, সে বেরিয়ে এল।

হেসে বলল, এসেচ? আমি জানতাম খোঁজ পেলে তুমি আসবেই, দু'এক ঘণ্টা তর্ক করবেই। তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।

তর্ক করব নিশ্চিত জান?

জানি। যে কাণ্ড করেচি, তর্ক না ক'রে তুমি ছাড়বে?

যদি না করি তর্ক?

বিস্মিত হবো! ভেবে পাবনা বাঙ্গালী হয়েও তর্কের এমন সুযোগ কি ক'রে ত্যাগ করলে। কিন্তু তুমি করবে। তোমার চোখে মুখে তর্ক উঁকি মারচে। অন্ততঃ আলোচনা।

নদীতে নেমে মুখ হাত ধুয়ে আমি বারান্দায় মাদুরে বসলাম। সেও বসল—অর্দ্ধেক মাদুরে অর্দ্ধেক মাটিতে। মেয়েরা অমনি ভাবে বসে, বিনয়ের লক্ষণ ওটা। কথা আরম্ভ হওয়ার আগে আমি একবার ভাল ক'রে তার মুখ দেখে বুঝবার চেষ্টা করলাম এজীবনে সে সুখী হয়েছে কিনা। কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল না। আগের জীবনে সে অসুখী ছিল কিন্তু মুখের একটু ম্লানিমা দেখে তার অসুখের পরিমাণ স্থির করা যেমন সম্ভব ছিল না, আজ সেই ম্লানিমার অন্তর্দ্ধান এবং দেহে স্বাস্থ্য ও চোখে মুখে একটা শান্ত-জ্যোতির আবির্ভাব দেখে বোঝা গেল না সে কতখানি সুখী হয়েছে। বিশেষ, মাঝে মাঝে তার দৃষ্টিতে ব্যথার বিকাশ দেখা যেতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, তুমি কি আমাকে সমর্থন কর না?

আমি বললাম, ঠিক জানি না। ইচ্ছা হয় সমর্থন করি, কিন্তু বাধা পাই। তোমার সিদ্ধান্তে অনেক জটিলতা, সহজে মেনে নেওয়া কঠিন। তোমায় আমি চোখ বুজে সমর্থন করতাম যদি—

যদি?

যদি তোমার দেশ-প্রেম নিজের তেজে স্বামী-পুত্রের প্রেমকে ছাপিয়ে যেত, যদি রাগ আর অভিমানের ভেজাল না থাকত।

সে হাসল! তাপসী নই, মন নির্ব্বিকার নয়। ভেজাল হয়ত আছে। কিন্তু তুমি যে রাগ আর অভিমানের কথা ভাবচ তার ভেজাল নেই। তুমি ভাবচ আমি ঝগড়া ক'রে ঝোঁকের মাথায় চ'লে এসেচি। তা সত্যি নয়। সে ভয় আমারও ছিল। কতদিন ধরে চেষ্টা ক'রে আমি বাড়ী ছাড়তে পেরেছি জান? ছ'সাত মাসের বেশী। রাগের মাথায় চ'লে এসেচি ভেবে পরে পাছে আমার অনুতাপ হয়

এই ভয়ে যখনি সে বেশী রকম খারাপ ব্যবহার করত আমি গৃহত্যাগের সময় পনের দিন পিছিয়ে দিতাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে অন্ততঃ পনেরটা দিন যখন রাগের কোন কারণ উপস্থিত হবে না তখন বাড়ী ছাড়ব, তার আগে নয়। এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে যাবার জন্ম পা বাড়িয়ে থেকেও ছ'সাত মাস যেতে পারি নি। শেষের দিকে তো হতাশ হয়েই পড়েছিলাম যে একবারও খিটিমিটি বাধবে না এমন পনেরটা দিন এ জীবনে আসবে না। কিন্তু হঠাৎ তার কঠিন অসুখ হল—

সেই সুযোগে চলে এলে!

সে হাসল। শোনই আগে, পরে মন্তব্য প্রকাশ করবে। তার ত অসুখ হ'ল, আমি নাওয়া খাওয়া ঘুম সব ছেড়ে দিয়ে এমন সেবাটাই করলাম যে অসুখ ভাল হওয়ার সঙ্গে সেও কিছুকালের জন্ম ভাল হয়ে গেল। ঠিক বিয়ের দিনগুলি যেন ফিরে এল—এত আদর এত সোহাগ এত ভালবাসা! পনের দিন হঠাৎ সদয় অদৃষ্টের দান ভোগ ক'রে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি চ'লে এলাম। রাগ ক'রে এসেচি আমি? ঝগড়া ক'রে এসেচি? তা আর বলতে হয় না।

তবে এলে কেন?

না এলে চলে না তাই।

তার মানেই তুমি হার মেনেচ। নগেন বাবুর সঙ্গে যে বাজী রেখেছিলে তাতে তোমার হার হয়েচে।

কিসের বাজী?

মনে নেই? একদিন বলেছিলে সে নিছক স্বামী; বিধাতা নয়। চোখ বোজার আগে তোমায় বাড়ীছাড়া করার সাধ্য তার নেই, নেই নেই!

নেই তো! আমায় কেউ বাড়ীছাড়া করে নি, আমি নিজে এসেচি। শুধু স্বামীকে সইতে না পেরে চ'লে আসব আমি কি তেমন মেয়ে? নই, নই, নই। এগার বছর ধ'রে তার অবিচার অত্যাচার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—সে জন্ম নালিশ করতেও আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া স্বামী কি সারাদিন অত্যাচার করে? চব্বিশ ঘণ্টায় দিন ক'ঘণ্টা মানুষের নিষ্ঠুরতায় ধৈর্য্য থাকে? যদি কোন বই-এ প'ড়ে থাক অত্যাচারী স্বামীর কথা, জানবে লেখক শুধু চব্বিশ ঘণ্টা দিনের আধ ঘণ্টার হিসাব দিয়েচে, বাকী সময়টা চালাকী ক'রে নেপথ্যে রেখে দিয়েচে! অবশ্য ঐ বাকী সময়টা স্নেহ ভালবাসায় বোঝাই না হ'য়ে একদম ফাঁকা হ'তে পারে—কিন্তু ওসব ফাঁক সংসারী মেয়েমানুষের সয়। শুধু স্বামী যার অবলম্বন, সপ্তাহে একটিও মিষ্টি কথা না শুনলে তার অসহ্য ঠেকতে পারে, আমার তো একমাত্র স্বামীই ছিল না জীবনে অবলম্বন! শুধু স্বামীর হিসাবে অভাগিনী হলে অভাগিনী হয়েই আমি থাকতাম ভাই। তার হীনতা যদি শুধু আমার প্রতি অন্যায় ক'রে নিরস্ত থাকত, যদি আমার বর্ত্তমান জীবনও ভবিষ্যতে যে-জীবন পৃথিবীতে রেখে যাব সমস্ত গ্রাস না করত আমি মুখ বুজে তার সংসার ঘাড়ে ক'রে মরতাম। সুখ শান্তির অভাব আমায় কাতর করত না, অনাহার অনিদ্রা প্রহার নির্য্যাতন উপেক্ষা কিছুই মুছে নিতে পারত না মুখের হাসি। জীবনের আংশিক সফলতা পেলেই আমি তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু তা হল না। কতক স্বামীর জন্মে কতক পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভিশাপে সমগ্রভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম—সম্পূর্ণ ভাবে আমার জীবন হল অকারণ, অর্থহীন। স্বামী নয়, দুঃখ দুর্দ্দশা নয়—ব্যর্থ বেঁচে থাকাটা আমার সইল না। আমার আত্মা আর্ত্তনাদ আরম্ভ ক'রে দিল।

সতীনের ভয়ে?—ব'লে আমি খোঁচা দিলাম।

সে চমকে উঠল। সতীনের ভয়ে আত্মার আর্ত্তনাদ? সতীন? সতীন হয়েচে না কি এর মধ্যে! স্ত্রী ছাড়া তার চলবে না জানতাম, কিন্তু এত শীগ্‌গির! আমার পায়ের আলতার দাগ এখনো বোধ হয় ঘরের মেঝে থেকে মুছে যায় নি। আমি কি তার ঘরের এতখানি স্থান জুড়ে ছিলাম যে বিশাল ফাঁকটা সইল না, তাড়াতাড়ি পূর্ণ করতে হল?

নালিশ! ক্ষুণ্ণ ক্রুদ্ধ অভিযোগ! মনে হল, অভিমানও জেগেছে—ঈর্ষার বসন-পরা অবুঝ অভিমান। মুখে একটা কালো ছায়া ভেসে এসেছে, দুচোখে মানিয়েছে ব্যথা। দেখে আমার বিশেষ ভাল লাগল না। মুখে সমর্থন করি আর না করি মনে মনে তার মানবীত্ব ঘুচিয়ে দেবীর মত জ্যোতির্ম্ময়ী ক'রে তুলেছিলাম—দধীচি থেকে আরম্ভ ক'রেই আজ পর্য্যন্ত সংখ্যাহীন জ্যোতিষ্ক যে-জ্যোতির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে

মানুষের। মানবতার গায় ছায়াপাতে মমতাদির সে ভাস্বর মূর্ত্তি কল্পনার নেপথ্যে হঠাৎ যেন ম্লান হয়ে গেল।

বললাম, এবার আমার পুরো অসমর্থন মমতাদি! ছলনা করেচ নিজেকে। ভেবেচ কর্ত্তব্য ত্যাগ বুঝি সত্যি ত্যাগ। দুঃখের কাছে হার মেনে তুমি পালিয়েচ কর্ত্তব্য পিছনে ফেলে! সে বলল, কর্ত্তব্য মানে? স্বামীসেবা? তনুমন দিয়ে তনু পরিচর্য্যা? শিক্ষা তোমায় উদার করে নি দেখচি! এই নারী-বিদ্রোহের যুগে ওকি কথা বলচ তরুণ? কোন যুগের মানুষ তুমি?

এ যুগের। আমায় টেনো না। আমার শিক্ষা অতি অনুদার। উদার শিক্ষা কোথায় পাব? নাচিকেতার মত যমের বাড়ী না গেলে আর সে শিক্ষা জুটচে না। দুঃখ এই যে যম আমায় বাড়ী ফেরার জন্ম ছেড়ে দেবে না। কিন্তু তনু-পরিচর্য্যার নালিশ পুরোণো, পচা। নিজেই বলেচ ও জন্ম বাড়ী ছাড় নি। একটা অমানুষের মঙ্গল যে করতে পারল না, নিজের লোকের অত্যাচার সইতে পারল না, লক্ষ মানুষের মঙ্গল করার শক্তি সে কোথায় পাবে, পরের অত্যাচার সয়ে কি ক'রে ব্রতরক্ষা করবে?

লাখ মানুষের আশীর্ব্বাদের জোরে। কিন্তু তোমার যুক্তিটা বেশ! লজিকের সেই ফ্যালাসির মত—মানুষ অমর নয়, বানর অমর নয় অতএব মানুষ বানর। একের সঙ্গে লাখের তুলনা চলে? যে বক আঁকতে পারল না, সাহিত্যিক হয়ে সে মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে না এ কথা বলা যায়? একটি মাত্র রত্নাকরের মঙ্গল ক'রে গেলে সে একদিন বাল্মীকি হয়ে উঠবে এমন আশা করা বোকামী। কিন্তু এ আশা অনায়াসেই করা যায় লাখের মধ্যে হাজার বাল্মীকি ঘুমিয়ে আছে! গণ্ডী ছোট হলেই যে ভাল কাষ করা যাবে তার মানে নেই। বাড়ীর বৌ সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে—কিন্তু বাড়ীর সব চেয়ে ছোট ঘরটি পরিষ্কার করার জন্ম ডাকতে হয় মেথরকে? আমি চেষ্টা করি নি ভেবেচ? এগার বছর চেষ্টা করেচি। কিন্তু ঘরের পাকা মেঝেতে আমার চেষ্টার লাঙল আঁচড় কাটতে পারে নি—ফসল ফলাব কি! তাই এসে দাড়িয়েচি এই বিস্তীর্ণ মাঠে। যত আগাছা থাক, মাটী যত শক্ত হোক, অল্প একটু স্থান পরিষ্কার ক'রে আবাদ করতে পারব না? বাকী জীবনের চেষ্টায় একটু সোনা ফলবে না? পারব—ফলবে। সে থামল। একটু ভেবে বলল, এই কথাটা আমি ভাবতাম। রাত্রিদিন ভাবতাম। স্বামী আমার কাছে ছোট নয় তুচ্ছ নয়—কিন্তু পর। সব স্বামীই পর—নিজের চেয়ে মানুষের আপনার কেউ নয়—প্রেমে নয়, স্নেহে নয়। প্রেম দুটি আত্মাকে কাছে আনে কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে-আসা আত্মার দূরত্ব বেশী। তাই আমি ভাবতাম যে, শুধু পরের কল্যাণেই বেঁচে থাকব, আমার আত্মার কল্যাণ নেই? আমার জীবন তাদের কল্যাণে ব্যর্থ হবে যাদের কল্যাণ হয় না? সবাই পরের জন্মেই অবশ্য বেঁচে থাকে, কিন্তু নিজের জন্ম আহরণ ক'রে ওই বেঁচে থাকার সার্থকতাটুকু। ওরি নাম নিজের আত্মার কল্যাণ। নিজেকে দিলাম কিন্তু দেওয়াটা মিথ্যা হল না, এই টুকু। অন্যায়ের বিনাশের জন্ম দধীচির আত্মদান—ইন্দ্র বজ্র নিয়ে খেলা করবে বলে নয়। আমি দধীচির মেয়ে নই। যদি হইও দধীচির মেয়ে, আমার অস্থির বজ্র নিভে গেচে। একটু তাপ শুধু আছে নেভা বজ্রের ভস্মে। সেইটুকু যদি বরফের ঘর গরম রাখতে ব্যয় ক'রে যেতাম মরবার সময় অপচয়ের স্মৃতিতে আমার আত্মা দগ্ধ হত। আজীবন স্বামী সেবার পুণ্যও পুড়ে হত ভস্ম! কারণ, সারাজীবন চোখ বুজে কাটিয়ে মরবার সময় আমি চোখ মেলে দেখতাম দুর্ল্লভ জীবন কার পূজায় কাটল। তখন জীবনব্যাপী দানব-পূজার আপশোষ নিয়ে আমায় পরলোকে যেতে হ'ত। আপশোষ নিয়ে মানুষ কোন পরলোকে যায় জান? নরকে।

আমি বললাম, এটুকু বুঝলাম। কিন্তু আসল কথা এখনো বলি নি। তোমার তো শুধু স্বামী নয়, দুটি ছেলে।

সে সংশোধন ক'রে বলল, দু'টি নয়, ছ'টি। চারটি স্বর্গে গেচে। দুটি গর্ভের অন্ধকার থেকে, দুটি পৃথিবীর আলো দেখে। না, দুটিই আলো দেখে নয়, একটি অন্ধ হয়ে জন্মেছিল।

এ বারতায় ব্যথা ছিল, আঘাত ছিল। আমাদের শিশু জগতে স্থায়ী মড়ক আছে সে কথা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম মানে দৈনিক অথবা মাসিকে পড়েছিলাম। শুধু পড়েছিলাম। কখনো ভেবে দেখি নি শিশুর মরণের শেষ শিশুর মরণে নয়,

মমতাদির মত অসংখ্য মাতার মর্ম্ম-বেদনায়। জগতে যার বাড়া মর্ম্ম-বেদনা নেই।

সে বলল, তুমি ভাবচ এতক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্র তুলে রেখেছিলে, ছেলে দুটির কথা তুলে আমাকে কাবু করবে। ছেলেই বটে! বড় ছেলের বয়স বার—মনের বিকৃতিতে বার শ'। সে চোর, তাড়িখোর, কুটিল, রাগী, বোকা, অলস। ছোটটিও ওমনি ভাবে গ'ড়ে উঠচে—দুজনেই একদিন বাপের মত হবে।

অত খারাপ? ব'লে আমি জিভ কাটলাম।

সে বলল, জিভ কেটোনা। সারা জীবন কথা কইতে হবে এখন জিভ কাটা গেলে মুস্কিল। নিজেই স্বামী নিন্দে জুড়েচি, তোমার কথায় আর কত ব্যথা পাব? আমার ছেলে দুটি বাপের মত অত খারাপ যদি নাও হয়, যেটুকু হবে তাতেই প্রকাণ্ড অমানুষ হবে। সদ্‌গুণে বোঝাই হয়ে করবে ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরি—তাতেই অধিকারী হবে স্ত্রী-পুত্র সংসারের। দশ বছরে দশটা কুকুর ছানার বাপ হবে—আকাল মৃত্যু এড়াতে পারলে যারা বড় হয়ে দশ দশে একশটা শূকর ছানা পৃথিবীকে উপহার দেবে। অবিশ্বাস করচ? পৃথিবী এমনি ক'রে ভারাক্রান্ত হয় ভাই – একটা গলিত আত্মায় হাজার হাজার গলিত আত্মার বীজ কিলবিল করে। এই জন্যে যীশু বলেছিলেন, একটি পাপী স্বর্গের দিকে মুখ ফেরালে স্বর্গরাজ্যে আনন্দের সাড়া প'ড়ে যায়। একটা মানুষ থেকে মানব জাতি হয়েচে—কে বলতে পারে একটি পাপী থেকে একদিন একটা বিরাট পাপীর জাতি পৃথিবীতে দেখা দেবে না? একটি অমানুষের মধ্যে সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংসের সম্ভাবনা নিহিত আছে। ওমনি অমানুষ হয়ে উঠচে আমার ছেলেরা! দশ মাস দেহের মধ্যে ব'য়ে বেড়িয়েচি, নিজের রক্তে পুষ্ট করেচি, দিনের পর দিন বুকে নিয়ে পালন করেচি, স্নেহ করেচি ভালবেসেচি জগতের দুটি অভিশাপকে। জ্ঞানের আলোয় নিজের এই মহৎ দুষ্কর্ম্ম চিনে আমি পালিয়ে এসেচি। পাপে আমার বিরাগ, ব্যর্থতায় অরুচি। প্রাণ-পাত সেবায় দেশের বুকের পাথরকে পাহাড় ক'রে তোলা পাপ।...তোমার দুচোখে প্রতিবাদ কেন? সংস্কার কি তোমায় পাপ আর ব্যর্থতার স্বরূপ ভুলিয়ে দিচ্চে?

আমি বললাম, না। তোমার কথাগুলি এত ছোট বড় কথার চুম্বক যে হঠাৎ শুনে ঠিক মত ধারণা ক'রে উঠতে পারচি না।

সে বলল, সেটা আশ্চর্য্য নয়। বিয়ের পর থেকে এগার বছর শুধু ত জলিনি—তিল তিল ক'রে চিন্তার হিমালয় সৃষ্টি করেচি। আমার কথা তোমার চিন্তাশক্তিকে পীড়ন তো করবেই। এগার বছরের ভাবনা কি দু মিনিটে ভাবা যায়? আমি বললাম, বুদ্ধি থাকলে যায়, বোকা হলে যায় না। আমি সময়মত ভাবব। তুমি বলে যাও, আমি আরও কিছু ভাবনার খোরাক সংগ্রহ করি।

সে বলল, ভেবো। ভেবে দেখো আমি বাড়িয়ে বলিনি, অবস্থা বিশেষে মা হওয়া সত্যই মহাপাপ, মহৎ ব্যর্থতা। তুচ্ছ পয়সা দিয়ে কেনা দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা অন্যায়, দুর্ভাগ্য;—শরীরের রক্ত খাইয়ে সাপ পোষা কতবড় অন্যায়, কতবড় দুর্ভাগ্য? আবার, এই শোচনীয় কৌতুক একমাত্র মায়ের অদৃষ্টে! স্বামীর কাছে জীবনের একটি স্ফুলিঙ্গ ভিক্ষা পেয়ে তিল তিল ক'রে বাড়িয়ে জননীকেই জেলে দিতে হবে একটি সম্পূর্ণ জীবনের চুল্লী—যদি সে চুল্লীতে জগতের কল্যাণে যজ্ঞ করা যায় গৌরব জননীর, যদি তার আগুণে গৃহদাহ হয় কলঙ্কও জননীর। মায়ের দায়িত্ব এতবড় ভাই! তাই পৃথিবীর দুটি গলগ্রহ সৃষ্টি ক'রে আজ আমার অসীম অনুতাপ। আমার মাঝে মাঝে ভয় হয় দেশ আমার সেবা নেবে না। অসুস্থ দেশের মুখে যে দু ফোঁটা বিষ ঢেলে দিয়েচি সে অপরাধ ভুলবে না। এ চিন্তার দাহে আমার শুধু ক্ষেপে যাওয়া বাকী আছে। ভগবান আজ যদি ওদের কাছে টেনে নেন, তবে বোধ হয়—তবে বোধ হয়—

ভগবানের নাম নিয়ে মার মুখে সন্তানের মৃত্যু কামনা! এই অস্বাভাবিক ভীষণ মহত্ত্বে আমি চমকে গেলাম। নিজের অসমাপ্ত উক্তির প্রহারে সেও কেঁদে ফেলল। আমি বুঝলাম এ কান্নার অর্থ কী। অভিশাপের প্রত্যাহার। মুখের কথা নয়, ভগবান যেন মনের কথাটাই কাণে তোলেন এই নিবেদন।

সূর্য্যালোকে নদীতে ঢেউগুলি চমকাচ্ছিল, তীর ঘেঁসে চলেছিল একটি পানসী। বুড়ো মাঝি লগি ঠেলছে, ছেলে

কোলে একটি মেয়ে তীরের শোভায় মুগ্ধ হয়ে ব'সে আছে, একটি দুরন্ত ছেলের হাত শক্ত ক'রে ধ'রে। কিছু দূরে নদীর বাঁক, সে পর্য্যন্ত আমি নৌকার জননীটিকে অনুসরণ করলাম। ততক্ষণ কাছের জননী শান্ত হয়েছে।

বললাম, এভাবে চরমে উঠলে আমাদের আলোচনা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

সে ম্লান হেসে বলল, চরম কীর্ত্তির আলোচনায় চরমে না উঠে উপায়?

বললাম, তুমি শুধু ইঙ্গিত কর, বাকীটা আমি অনুমান করব। নরকের অন্ধকার আর স্বর্গের জ্যোতি টেনে আনলে দুটোই চোখকে খোঁচা দেবে, অসুস্থ করবে। আমরা পৃথিবীর মানুষ আমাদের মাঝামাঝি রকা হওয়াই ভাল।

ভীরু! ব'লে সে হাসবার চেষ্টা করল।

আমি বললাম, নিঃসন্দেহ। কিন্তু আর সমালোচনা নয়। যত রেগে চেঁকেই বল অপমানিত হব। তোমার কথাই হোক্। তুমি যা বললে তাতে একটা প্রকাণ্ড মুস্কিল আছে। বোধ হয় সে মুস্কিলের অবসানও নেই।

কি মুস্কিল?

আমার মত ভীরু অকর্ম্মণ্য থেকে আরম্ভ ক'রে তোমার ছেলেদের মত চোর ছ্যাঁচোরকে জন্ম দিতে সবাই যদি তোমার মত অস্বীকার করে, দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিন দিকের দেয়াল ভেঙে পড়বে। দেশটা তখন জন্মাবে কোথায়?

জন্মাবে না!

শুনে আমি থ খেয়ে গেলাম। সে বলল, ভড়কে গেলে দেখছি। দুর্ভাবনার কারণ নেই। দেশের সুতিকাঘরের সাড়ে তিনদিকের দেয়াল কি আমার মত মায়েরা? দেশ কি জন্মায় কেরাণী আর অপদার্থ ধনীর ঘরে? সহরের বিষপান ক'রে যে কটি মানুষ জ্ঞান হারিয়েচে তাদের বাড়ীতে? কলকাতাতেই অশুস্তি ডালিম বেদানা, আইন ক'রে তাদের সকলকে হত্যা করলে কলকাতার নারী-সমাজের কি আসবে যাবে? বরং লাভ হবে—ক্ষতি নয়। আমার মত মায়েরা মা হতে অস্বীকার করলে সুতিকাঘরের অনাবশ্যক ভিড় কমবে, দেশের উপকার হবে। গান্ধারীর সংযমে কুরুক্ষেত্রের কলঙ্ক রদ হবে। ঘরের মানুষের সঙ্গে লড়াই ক'রে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের শক্তিক্ষয় হবে না;—জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জগতে ছড়িয়ে পড়ার সময় পাবে, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী জগতের স্বাধীনতা মুহূর্ত্তে অর্জ্জন করবে। দুর্যোধনকে সজুত রাখতেই যুধিষ্ঠির আর অর্জ্জুনের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হলে গান্ধারীর কি লজ্জা ভাই? সহজ লজ্জায় কি মা হয়ে ছেলেকে বলেছিল, তোমার নয়, ধর্ম্মের জয় হো'ক।

আমি বললাম, তবে বললে কেন—দেশ জন্মাবে না? কথার সুরে মনে হল দেশ না জন্মালে ক্ষতি নেই। সে বলল, ও যদির কথা। আমরা মা না হলে যদি দেশের সুতিকা ঘরের সাড়ে তিনদিকের দেয়াল সত্যি ভেঙ্গে পড়ে। জন্মানো-টাই কি দেশের চরম সৌভাগ্য? না জন্মানোটা দুর্ভাগ্য? কত দেশ গেছে সমুদ্রের তলে, কত জাতির চিহ্ন লুপ্ত হয়েচে। সে জন্য কে তাদের দোষ দেয়? অবসানে দুঃখ কি? মৃত্যু যদি মানুষের লজ্জা না হয়, মানুষে-গড়া জাতির মৃত্যুতেও লজ্জা নেই। ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে বরং মরণ ভাল।

আমি বললাম, এ সব হতাশার বাণী, ভুল কথা। মৃত্যুতে মানুষের লজ্জা নেই, কারণ মৃত্যু যবনিকা নয়, পটপরিবর্ত্তন। নিজের জীবন মানুষ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে জমা ক'রে রেখে যায়, স্বর্গে নিয়ে যায় না।

জমা করা জীবন যখন প'চে যায়? একমাত্র Noahকে বাঁচিয়ে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে যখন ভগবান ভ্রম সংশোধন করতে বাধ্য হন?

তখন ভগবান অত্যাচারী খেয়ালী। প্রলয় যে এনে দিতে পারে সে সংস্কারে অক্ষম হবে কেন? জীবনের রোগ আছে, ফাঁসি ছাড়া আরোগ্য নেই? ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে মরণ ভাল, কিন্তু রোগ সারিয়ে বেঁচে থাকা আরও ভাল।

সে মৃদু হাসল, তোমার হল কি? আমি পূবে পা বাড়াচ্চি, তুমি হাঁকচ পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি। সুস্থ সবল হয়ে বাঁচা মন্দ আমি তা বলিনি। বলেচি, লয় অপরাধ নয়, লয়ে লজ্জা নেই। এটা আমাদের আলোচনা-গণ্ডীর বাইরের অতিরিক্ত সত্য। আমার সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে

গিয়ে ব্যাকুল হয়ো না। পাগল! হাজার হাজার মানুষের দেহের রক্ত আর জীবনের দিন দিয়ে অসুস্থ দেশের জন্তে ওষুধ তৈরী হ'চ্ছে, আমি করব তার প্রতিবাদ? স্পর্দ্ধায় ধুলো হয়ে যাবো যে! অতিরিক্ত দার্শনিক তত্ত্বকথা থাক, আমার কথাটা নিয়ে আলোচনা চলুক। আমি বলেছি, অসুস্থ দেশের ওষুধের উপযুক্ত জীবন সৃষ্টি হোক, কিন্তু কুপথ্য আর বিষের সৃষ্টি যেন না হয়। তুমি প্রতিবাদ কর?

আমি বললাম, ঠিক প্রতিবাদ নয়। বলতে চাই, সে তো তোমাদেরি হাতে!

মানে?

মানে, সব শিশুই আরম্ভ—পরিণতি নয়। জীবনের ভিত্তির মিস্ত্রীও তোমরা। তুমি ছেলে দুটিকে মানুষ ক'রে গড়ে' তুললে না কেন? স্বামীর মঙ্গল করতে পারলে না, তার কারণ বুঝতে পারি, তার শিক্ষা দীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে। কিন্তু তোমার ছেলেরা ভাল মন্দ কোন শিক্ষা নিয়েই জন্মায়নি। তাদের তুমি মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুললে না কেন? নিজেই বললে তোমার শক্তি সামান্ত। সামান্ত শক্তি এত বড় দেশে ছড়িয়ে দিয়ে কি লাভ হবে? দুটি ঘুমন্ত দেশ-সেবককে জাগাতে পারলে সব চেয়ে বড় দেশসেবা হত না? কেন তা করলে না?

কেন করলাম না? পারলাম কই? খাঁচার শিকে শিকে বাধা পেলাম। কোলের ছেলে যখন এক বছরেরও নয়, গর্ভে ছেলে এলো। সকাল সন্ধ্যা রান্নাঘরে কাটল, বাকী সময় নানা কাজে। অভাবের খোঁচায় মাথায় ঘা হয়ে গেল, চিন্তার বিষে অবসন্নতা ও অবহেলা এল। যেটুকু সময় ও সাধ্য হাতে রইল, স্বার্থপর স্বামী ছিনিয়ে নিল। তবু আমি পারতাম। অতিমানুষ না করতে পারি অমানুষ হতে দিতাম না, যদি ওদের জীবন বিষাক্ত আবহাওয়ায় বিষিয়ে না যেত। চব্বিশ ঘণ্টা পলে পলে যাদের জীবন বিকৃত হয়, পাঁচ মিনিটের চেষ্টায় আমি তাদের কি করতে পারি? জন্ম থেকেই ওরা অভিশপ্ত। বাপের অসংযমে জন্মাল রুগ্ন হয়ে, খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যে দেহ মন কুঁকড়ে গেল বিকাশ হল না, জীবনীশক্তির অভাবে ক্রমাগত রোগে ভুগল, দোষে বিনা দোষে বাপের খোঁচা খেয়ে কুটিলতা শিখল, শিশুমনের তুচ্ছতম আকাঙ্খাটি অতৃপ্ত থাকায় চুরি শিখল, বাড়ীর ভয় ও নিরানন্দের আবহাওয়ায় মন না টেঁকায় বেশী সময় বাইরে কাটাতে ভালবাসল, যার তার সঙ্গে মিশে অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ সঞ্চয় করল, পয়সা আর খাবারের লোভে বজ্জাত লোকের কাছে কামুকতার দীক্ষা পেল। এতো সংক্ষিপ্ত হিসাব, আরও কত আছে! এবার বুঝলে কেন পারলাম না?

আমি কতক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। একি বর্ণনা, একি নালিশ! মনের জ্বালা কি শব্দের রূপ নিতে পারে? অত্যুক্তি মনে করার চেষ্টায় আমি ব্যর্থ হলাম, আমার কোন সান্ত্বনা রইল না। শুধু মুখের কথা তো নয় যে, শোনার সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ কম বেশী ক'রে যতটুকু মানলে মনের স্বস্তি ততটুকু মানব। সন্তানহারা মা আমার সামনেই বসেছিল। অত্যুক্তি যদি, ও কেন ছেলে ফেলে এল! সন্তান হারানোর চরম প্রমাণেই যে ও প্রমাণ করেছে অভিযোগ বাড়িয়ে বলা নয়!

সে বলল, অনেক দুঃখেই বাড়ী ছেড়েছি ভাই। আমি অভিশপ্তা স্ত্রী ও জননী, আমার সন্তান দেশের অভিশাপ, জীবনের এমন অসামঞ্জস্য বরদাস্ত হলনা। আমি মুক্তি নিলাম। এ মুক্তি সময় সময় পীড়া দেয়, এগার বছরের চেনা খাঁচার ডাক আমি শুনতে পাই। আমার বুক ফেটে যায়। আমি যাতনায় ছট্‌ফট্ করি। কতক্ষণের জন্ত দেশের সেবায় দারুণ বিরাগ জন্মে। মনে হয়, ন্যুব্জ হয়ে পথের ধুলোয় চোখ বুলিয়ে চলতে দেশের মানুষ যদি ভালবাসে, ভালবাসুক; সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের দিকে না তাকাতে চায় না চাক্;—আমার কি? আমি কেন মাতৃত্বের আত্মহত্যা দিয়ে এমন নিষ্ঠুর পূজা ক'রে চলি? কিন্তু এ দুর্ব্বলতা কেটে যায়, মুক্তির পীড়ন গর্ব্ব ও আনন্দ হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, দেশে অসংখ্য পুরুষ দিদি। তরুণ তরুণীতে দেশ ভরা। তোমার মত তারা মাটিতে শিকড়-বসা তরু নয়। নিজেকে উপড়ে তুলে এই অস্বাভাবিক ত্যাগ তোমার করতে হবে কেন? তুমি ফিরে যাও।

সে হাসল, সংখ্যার গর্ব্বে দেখি ফেটে পড়ছ! প্রমাণ কই? তুমি আমায় বুঝিয়ে দিতে পারবে যে আমি অনাবশ্যক অতিরিক্ত বাহুল্য? যদি পার, এখুনি ফিরে যাব। সতীনকে

পর্য্যন্ত ভয় করব না! একটু থেমে বলল, তুমিও তো পুরুষ, না ভাই? শিকড়হীন তরুণ পুরুষ! কেবল কলেজ ডিঙ্গিয়ে শিকড় গাড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছ, এই যা আপশোষ। একটি বাড়ী, টুকটুকে একটি বৌ, চাঁদের টুকরো একটি ছেলে। খাসা শিকড়। না? লোভী!

আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, অনেক আগে ঘাট মেনেচি, খোঁচাচ্ছ কেন?

খোঁচাচ্ছি? মাইরি না। কালীর দিব্যি। স্বামীর ভাষাতে প্রতিবাদ করলাম, আর রাগ কোরো না। বলে সে হাসল। আমি গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলাম।

সেও গম্ভীর হয়ে বলল, সত্যি খোঁচাই নি ভাই। খোঁচাবার অধিকার কোথা পাব? যার সে অধিকার নেই সে তা করলে ভেবে নিতে হয় ঠাট্টা করেচে।

খোঁচাবার অধিকার তোমার আছে।

নেই! আমার দেশ-সেবা যে বাধ্যতা-মূলক।

সে সবারি। অধীনতা বাধ্য করে।

করে কি? অধীনতার দুঃখ না স্বাধীনতার লোভ করে কি ক'রে জানলে? না ভাই, জবাব চাই নি। একথার জবাব মানে আধ ঘণ্টা ধ'রে তোমার বক্তৃতা। আমি জানি জবাব। দুই কারণেই। কিন্তু ওরকম দেশ-সেবা বাধ্যতা-মূলক নয় ভাই। তা হলে মাতৃস্নেহকেও বাধ্যতা মূলক-বলতে হয়। আমার এই সেবা কিন্তু সত্যি বাধ্যতামূলক। সে জীবন সইল না বলে আমি এ জীবনে আশ্রয় নিয়েচি—ঝড়ে ভাঙ্গা তরী এসেচি বন্দরে। বেশী নয়, একটা ছেলেকেও যদি মানুষ করতে পারতাম আমি সেখানকার মাটী কামড়ে থাকতাম। আকণ্ঠ নয়, ব্যর্থতায় একেবারে তলিয়ে গিয়ে দম আটকায় ব'লেই না এখানে নিশ্বাস ফেলতে এসেছি! আমি আজ সুখী দুঃখী দুই, কিন্তু এগার বছর যে দেয়ালের অন্তরালে ছিলাম সেখানে থেকে সন্তানের মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে আরও সুখী হতাম। কিন্তু এ কথাটাও ঠিক, আমার এ জীবন আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের বহু ঊর্দ্ধে—আমার এ জীবন তুলনাহীন। ছিলাম যন্ত্র—আজ আমি মানবী, যার আত্মা আছে, যার জীবনের অনেক মূল্য, অনেক প্রয়োজন, অনেক মানে। বেশী কি, আমি আজ তোমার প্রণম্য!

আমি নীরবে তাকে প্রণাম করলাম, পেলাম আশীর্ব্বাদ। তারপর চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। সূর্য্য তখন নদীর অপর তীরে, তরু শ্রেণীর খানিক উর্দ্ধে। নদী দিয়ে একটা ষ্টিমার চ'লে গেল, তীরে আছড়ানো ঢেউএর শব্দ মৃদুভাবে কানে এল। কয়েকটা বক নদী তীরে ব'সে ছিল, হঠাৎ উড়ে গেল।

মমতাদি বোধ হয় ভাবে নি এত শীগগির আমি তাকে রেহাই দেব। স্পষ্ট অনুভব করলাম সে আমার কথা বলার প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আমি আর মুখ খুললাম না। কত কথা তো বললাম, কিন্তু কথা ব'লে লাভ কি? সংসারের জ্বালায় কত মানুষ গেরুয়া প'রে পালিয়েছে, কত মানুষ ক্ষেপে গেছে, কত মানুষ আত্মহত্যা করেছে,—মমতাদি যদি জগতের মধ্যে মহত্তম কর্ম্ম-বৈরাগ্যে আধ-পোড়া মনের আগুন নেভাতে চায়, কথার বিনিময়ে কোন কিছুর এদিক ওদিক হবে না। পরিণয়ের যজ্ঞভস্মে ঘি ঢেলে চলা যত বড় কর্ত্তব্য হোক, সেটা ঘিয়ের অপচয় নিশ্চয়ই; সে অপচয় বন্ধ করা যত বড় অকর্ত্তব্য হোক, স্বাধীনতার হোমানলে ঘি ঢেলে চলা যে ঘিয়ের সবচেয়ে সদ্ব্যবহার তাও নিশ্চয়ই। সুতরাং নানাবিধ ধারণা ও সংস্কারে বোঝাই মন নিয়ে তর্ক করা কথারই অপচয়।

অতএব কথা বন্ধ ক'রে আমি ভাবতে লাগলাম অধুনা-পরিত্যক্ত স্বামী পুত্রের কল্যাণে এই নারীটি একদিন আমাদের বাড়ী রাঁধুনী হয়েছিল,—গভীর রাত্রে ঘুমের কবল থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া কয়েক ঘণ্টা সময় ছাড়া এগারটি বছর এক টানা বেঁচেছিল শুধু স্বামী পুত্রের জন্য।

স্নেহ, প্রেম, মমতা মানুষের নাগপাশ। নাগপাশে মূর্চ্ছার তন্দ্রা। সে নাগপাশে আবদ্ধ থেকেও যে মোহনিদ্রা টুটিয়ে দিল, বাঁধন-শুদ্ধ যে বেড়িয়ে পড়ল পথে, পাশবদ্ধ কর্ম্মশক্তি নিয়ে যে সকলের জন্য যে-বিপুল কাজ পড়ে আছে তার নিজের ভাগটুকু শেষ করতে প্রবৃত্ত হল তাকে বোঝা যায় না। সে দুর্ব্বোধ্য; তাকে ঘিরে রহস্য। মমতাদির শান্ত ও গম্ভীর মুখ দেখে আমার মনে হল, রাঁধুনীর কাজ নিতে এসে যে আমার শেষ শৈশবে স্নেহ-করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে

উঠেছিল, আজ আমার প্রথম যৌবনে সে আবার স্নেহ অস্বীকার করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যার সময় বিদায় নিলাম—প্রদীপ জ্বালার আগে। সে বলল, তোমায় একটা কাজ দেব।

কি কাজ?

সপ্তাহে একখানা কার্ড লিখে ওদের খবর দেবে।

কি খবর? কুশল?

হুঁ, ব'লে সে চোখ মুছতে মুছতে হাসল।

বলচ ওদের। ওদের মানে কি তোমার স্বামীরও?

নিশ্চয়। আধখানা কুশল সংবাদ নিয়ে করব কি?

স্বামী-ভাগ একেবারে আধখানা! একটা স্পষ্ট কথা জিজ্ঞেস করচি। স্বামীকে তুমি ভালবাসতে?—বাস?

সে একটু ভাবল, ভালবাসা? প্রেম? কি জানি ভাই, ওসব বুঝিনা। এইটুকু বুঝি যে না দেখলে মন কেমন করে, খবর জানতে ইচ্ছা হয়। এগার বছর যার ঘর করা যায় তার হীনতা বোধ হয় স্নেহ মমতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

প্রেম নয়—স্নেহ এবং মমতা। এই তিনটি মনোধর্ম্ম আমার কাছে এমন একরূপ প্রতিভাত হয় যে আজও ঠিক করতে পারি না তার স্বামীপ্রেম ছিল কি ছিল না।

মায়া কি নিছক অভ্যাস? প্রেম নয়?

সমাপ্ত

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফাগুন-বিলাস

শ্রীযুক্ত অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

মনে রং ধরিয়াছে সবুজের,
কথা তাই কই যত অবুঝের!

চোখে নীল লাগিয়াছে আকাশের;
কানে শুনি যেন গান বাতাসের;

পুরাতনে দেখি ছায়া নবীনের;
চেনা চেনা লাগে মুখ অচিনের;

পাশে যবে বসি মোর প্রেয়সীর
কেঁপে কেঁপে উঠে কেন এ শরীর?

মুকুরেতে দেখি মুখ আপনার,
দিনে রাতে ঘুরে-ফিরে লাখোবার!

আঙুলের পরশনে ফাগুনের,
আমি জ্বলি যেন শিখা আগুনের!

কাটে দিন দোলে দিবা-স্বপনের;
জাগে নবঘন বুকে গগনের!

সন্ধ্যা-তারা

শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চেনা সুর

প্রতিবেশিনীর পায়ের নূপুর রোজই বাজে সকালে—সাঁঝে। আমার ঘরের এই ছোট্ট জগৎটির বাতাসকে তার ঐ নূপুরের ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল কোরে দেয়।

তার প্রতি পদক্ষেপে যে সুর বেজে ওঠে কেবল সেইটুকুই জানিয়ে দেয় যে সে এই জগতেরই মানুষ। সে যে আছে এই বার্ত্তা বহন করে আনে এই মৃদু আওয়াজটুকু।

দুই বাড়ির মাঝে ছোট নালাটার উপর দিয়ে দিনে রাতে যে সুরের সেতু গড়া হয়—তাই দিয়ে আমার মন তার পাশে গিয়ে পৌঁছায়। তার সারাদিনের কাজ আমার কাছে ধরা দেয় ঐ নূপুরের সুরের রূপে।

সকালে নূপুর বেজে ওঠে—বুঝি সে চলেছে স্নানে। তারপরে নূপুর বাজতে থাকে দ্রুত তালে এঘরে ওঘরে, বুঝি সে ব্যস্ত ঘরের কাজে।

দুপুরে ছাদের কোণে সেই সকালের চেনা সুর ডাক দেয় আমার মনকে—ছাদের পাঁচিলে হেলান দিয়ে সে চুল শুকোতে রত।

বিকেলে আবার নূপুর ব্যস্ত ভাবে বেজে বেড়ায় এঘরে ওঘরে।

পড়সীনীদের কল-কণ্ঠের সাথে তার নূপুরের আওয়াজ সন্ধ্যাবেলা থেকে শোনা যায়। রাত্রে তার নূপুর আর বাজে না।

বছর কেটে গেছে; প্রতিবেশিনী হোয়েছে আমারই গৃহবাসিনী। তার নূপুর এখন আমারই ঘরের মাঝে দিনে রাতে বাজে। কিন্তু তেমন সুরে আর বাজে না; কেন যে তা বোলতে পারিনা। তাই তো থেকে থেকে গিয়ে বসি সেই পুরোনো জানলাটার পাশে।

গান

সেদিন দেবমন্দিরে যে ছেলেটি গান গাইতে এল তাকে আগে কেউ দেখেনি।

তার চন্দ্র-কলার মত কপালটিতে চন্দন। গলায় কুন্দ ফুলের মালা। কানে কুণ্ডল।

আশ্চর্য্য তার গান। ধূপের ধোঁয়ায় মন্থর হাওয়া সুরের মাঘাতে চঞ্চল হোয়ে উঠলো।

গভীর রাতে গান থামলো। তখন চাঁদ উঠেছে। সবাই ফিরে চল্ল ঘরের পথে। কেবল যে মেয়েটি দেবমন্দিরে মন্দিরা বাজাত সে স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকার আঙিনায়।

নবীন গায়কের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দেশ-বিদেশে।

রাজা তাকে ডেকে পাঠালেন, রাজসভায় গান গাইবার জন্যে। তা'তে সবাই হোল খুশী। কেবল যে মেয়েটি মন্দিরা বাজাত, সে বল্লে "যেওনা।"

ছেলে জিজ্ঞাসা করলে "কেন?"

"তোমার গান তো রাজ-সভার গান নয়।"

শুনে ছেলেটি হেসে চলে গেল। মেয়েটি সন্ধ্যা-তারার পানে দুই চোখ মেলে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজার সভায় ছেলেটি গান করে, কিন্তু মন ভরে না। কোথায় যেন ফাঁক পড়ে। কেবলই মনে হয় যেন গান শোনার এই রাজ-আয়োজনের মাঝে কোথায় একটা ফাঁক রোয়ে গেছে। সভাসদের দল গম্ভীর মুখে বসে তার গান শোনে। মনের চারিপাশে রাজনৈতিক বুদ্ধির পাথর দিয়ে গাঁথা যে প্রকাণ্ড পাঁচিল তারই গায়ে তার সুর মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে মরে।

উৎসব রাত্রে রাজপ্রাসাদের হাজার দীপালোকে যখন সে ইমন-ভূপালীতে গান ধরতো, তখন তার মনে পড়তো সেই জীর্ণ মন্দিরের আঁধার ভরা কোণে সেই মাটির প্রদীপটির কথা। আর মনে পড়তো সেই দীপশিখার ক্ষীণালোকে কার চাঁপার কলির মতো আঙ্গুল মন্দিরা বাজাচ্ছে।

সেদিন শরতের প্রথম প্রভাতে মন্দিরের পথ শিউলি ফুলে ঢাকা পড়েছে। যে মেয়েটি মন্দিরা বাজাতো তার মন আজ কেবলই বলছে 'সে আসবে, আসবে, আসবে'।

ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাঁকে যখন সূর্য্যের আলো দেবতার পায়ের কাছে এসে পড়েছে—তখন তরুণ গায়ক প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো।

মেয়েটির চঞ্চল হাতে মন্দিরার তালে তালে ছেলেটি ভৈরবীতে মাঙ্গলিক গান ধরলে।

দান

১

রাজার দ্বারে এসে সকলেই অন্ন নিয়ে যায়। ভোরের আলোর সাথে সাথেই রাজার অতিথ-শালায় লোকের ভিড় জমে। কত দেশের কত পথিক আসে যায়, কেবল একটি মানুষ রোজই আসে দ্বারের পাশে কিন্তু অন্ন নেয় না।

জিজ্ঞাসা করলে বলে "তোমাদের হাতের অন্নে আমার কাজ নেই। আমার অন্ন স্বয়ং রাজকুমারী দেবেন। তিনি যে মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা"।

সে রোজই শূন্য হাতে ঊষার ম্লান আলোয় আসে, আবার সন্ধ্যার মলিন আলোয় ফিরে চলে শূন্য হাতে।

২

রাজার দ্বার হোতে শূন্য হাতে অতিথি ফিরে যায়, এ খবর রাজকুমারীর কানে উঠলো।

সেদিন বেলা দ্বিপ্রহর, পথিক আপন জায়গায় ব'সে এক তারাতে সুর ধরেছে। এমন সময় রাজকুমারী এলেন সোনার থালায় অন্ন সাজিয়ে।

পথিক হেসে বল্লে "ওগো অন্নপূর্ণা, ভুল কোরেছ, ও অন্নে আমার দরকার কি? আমার রাজার রাজ্যে কি অন্নের অভাব? ভুল করেছ দেবী, কাল এসো।"

রাজকুমারী লজ্জা পেলেন, ফিরে চল্লেন অবনত মুখে।

৩

পরের দিন রাজকুমারী সোনার থালায় সাজিয়ে আনলেন ধন, রতন, মণি, মুক্তা।

পথিক হাতে কোরে থালা সরিয়ে দিয়ে বল্লে "আমার রাজার রাজ্যে বাস কোরে আমি কি গরীব?"

রাজকুমারী ফিরে গেলেন আঁচলে মুখ ঢেকে। পরের দিন পথিক এলো রাজার দ্বারে ভোরের আকাশকে গানের সুরে চঞ্চল কোরে দিয়ে।

তারপর রাজার অতিথ-শালায় কত লোকই এলো, কত লোকই গেলো। বেলা বাড়তে লাগল।

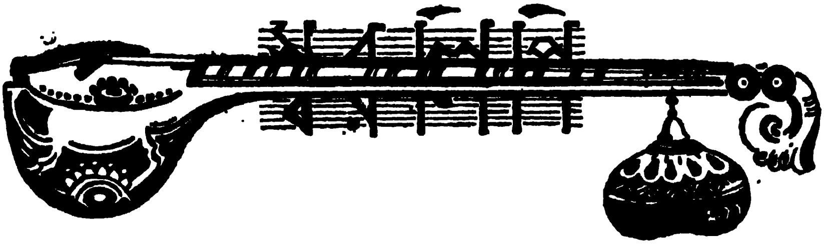
সেদিন রাজকন্যা এলেন শূন্য হাতে। পথিক হেসে বল্লে "দেবী, আজ আমার শেষ দিন। আমি যে-পথের মানুষ সেই পথ আমাকে ডাক দিয়েছে। যাবার আগে তোমার হাতের দান সাথে কোরে নিয়ে যেতে চাই।"

রাজকুমারী আপন চুলের মাঝে লুকিয়ে রাখা শ্বেত করবীর গুচ্ছ নিয়ে পথিকের হাতে দিলেন।

পথিক আপন একতারাটির তারের সাথে ফুলের গুচ্ছ বেঁধে নিয়ে মাঠের পথে ফিরে চল্ল।

রাজকুমারীর আঁচল চোখের জলে ভিজে উঠলো।

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর



মিলন রাত্তি পোহালো বাতি
নেভার বেলা এলো,
ফুলের পালা ফুরালে ডালা
উজাড় ক'রে ফেলো।
স্মৃতির ছবি মিলাবে যবে
ব্যথার তাপ কিছু তো রবে,
সেটুকু নিয়ে গুনগুনিয়ে
সুরের খেলা খেলো।
ফুলের পালা ফুরালে ডালা
উজাড় ক'রে ফেলো॥

ফাল্গুনের মাধবীলীলা
কুঞ্জ ছিল ঘিরে,
চৈত্রবনে বেদনা তারি
মর্ম্মরিয়া ফিরে।
হয়েছে শেষ তবুও বাকি,
কিছু তো গান গিয়েছি রাখি,
সেটুকু নিয়ে গুনগুনিয়ে
সুরের খেলা খেলো।
ফুলের পালা ফুরালে ডালা
উজাড় ক'রে ফেলো।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II না র্সা । র্গা র্ঋা -া I র্সা -দা । না না র্সা I -া -া । -া সমা মা I মা মা । -া মা মা I
মি ল ন রা • তি • পো হা লো • • • বা তি নে ভা র্ বে লা

I মা মপা । -মা - গা -া । মা মা । মা গা গা I মা দমা । দা না র্সা I না র্সা । -র্গা র্ঋা র্সা I
এ লো • • • ফু লে র পা লা ফু রা লে ডা লা উ জা ড়্ ক রে

I না দা । না না -দা II
ফে লো ফে লো •

II র্গা র্গা । র্গা র্মা র্পা I র্গা র্মা । র্গা র্ঋা র্সা নর্সা দা । দা না -র্সা I র্সর্গা র্গা । র্গা র্ঋা র্সা I
স্মৃ তি র ছ বি মি লা বে য বে ব্য থা র তা প কি ছু তো র বে

র্সর্গা র্গা। র্গা র্ঋা র্সা I সা -মা । মা মা মা I মা মা । -া মা মা I মা মপা । -মা- গা -া I
সে টু কু নি য়ে শু ন্ শু নি য়ে সু রে র্ খে লা খে লো •

I মা মা । মা গা গা I মা দমা । দা না র্সা I না র্সা । -র্গা র্ঋা র্সা । না নদা । না না -দা II
ফু লে র পা লা ফু রা লে ডা লা উ জা ড়্ ক রে ফে লো ফে লো •

II র্সা -না । র্সা র্ঋা র্সা I র্সনা র্সা । না দা -পক্ষা I পা -ণা । ণা দা পক্ষা I পা দা । -া -া -া I
ফা ল্ গু নে র মা ধ বী লী লা কু ন্ জ ছি ল ঘি রে • • •

I পা -ণা । ণা ণদা পা I মা পা । পদা মপা মজ্ঞা I পা -া । পণা জ্ঞমা মজ্ঞা I ঋা সা । -া-া-া I
চৈ • • ত্র ব নে বে দ না তা রি ম র্ ম রি য়া ফি রে • • •

I দা দা । দা না -র্সা I র্সর্ঋা র্ঋা । র্সা না র্সা I র্সর্গা র্গা । র্গা র্ঋা -র্সা I না র্সা । র্ঋর্সা নর্সা র্সদা I
হ য়ে ছে শে ষ্ ত বু ও বা কি কি ছু তু গা ন গি য়ে ছি রা খি

I র্গা র্গা । র্গা র্ঋা র্সা I সা -মা । মা মা মা I মা মা । -া মা মা I মপা মগা । -া -া -া I
সে টু কু নি য়ে শু ন্ শু নি য়ে সু রে র খে লা খে লো • • •

I মা মা । মা গা গা I মা দমা । দা না র্সা I না র্সা । -র্গা র্ঋা র্সা I না দা । না না দা II
ফু লে র পা লা ফু রা লে ডা লা উ জা ড়্ ক রে ফে লো ফে লো •

ভ্রম-সংশোধন

মাঘ সংখ্যা বিচিত্রার স্বরলিপিতে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। স্বরলিপি ব্যবহারের পূর্ব্বে সেগুলি সংশোধিত করিয়া লওয়া আবশ্যক।

১। স্বরলিপির তৃতীয় ছত্রে সপ্তম স্বর 'ঋা' -র পরিবর্ত্তে 'জ্ঞা' হইবে।
২। ঐ অষ্টম ছত্রে তৃতীয় স্বর 'ঋা' -র পরিবর্ত্তে 'র্ঋা' হইবে।
৩। ঐ নবম ছত্রে দ্বিতীয় স্বর '-া' -র পরিবর্ত্তে 'পা' হইবে।
৪। ঐ দ্বাদশ ছত্রে দ্বিতীয় স্বর '-ঋা' -র পরিবর্ত্তে '-র্ঋা' হইবে।
৫। ঐ ঐ ঐ তৃতীয় স্বর 'ঋা' -র পরিবর্ত্তে 'র্ঋা' হইবে।

বিঃ সঃ

কুর্কিহারের আবিষ্কার

কুমারী অশোকা চট্টোপাধ্যায়

কুর্কিহার গয়ার সতের মাইল পূর্ব্বে একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান। বুদ্ধদেবের জীবনীর সহিত এই স্থানটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ইহার পুরাতন নাম "কুক্কুট পাদ"। নিকটস্থ কুক্কুট পাদ গিরি হইতেই স্থানটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

বিখ্যাত চৈন পরিব্রাজক হি ওয়েন সাঙ্গ খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই স্থানটি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার অমূল্য ভ্রমণবৃত্তান্তে 'কুক্কুট পাদ' গিরি ও তৎসন্নিহিত কুক্কুট পাদ বিহারের এক নাতিবিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

সম্প্রতি এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত মনোরম স্থানটি দর্শন করিবার আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমার শ্রদ্ধেয় মাতুল বরোদা রাজ্যের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাটনায় ষষ্ঠ প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মিলন হইতে গয়ায় আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত উক্ত স্থানে যাইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। সম্প্রতি কুর্কিহারের মাননীয় জমিদার রায় হরিপ্রসাদলাল কুক্কুট পাদ বিহারের ধ্বংসাবশেষ হইতে অন্যূন দুইশত মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। আবিষ্কারের ইতিহাস এইরূপ। একটি গোশালা নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত হরিপ্রসাদ বাবুর ইষ্টকের প্রয়োজন হয়। তাঁহার বাটীর সংলগ্ন একটী স্থানে পুরাতন ধ্বংসাবশেষের প্রচুর ইষ্টক প্রোথিত ছিল, তিনি ঐ ইষ্টক খনন করাইয়া বাহির করিতে থাকেন। দুই একদিন খনন করাইবার পর তিনি প্রাচীর-বেষ্টিত একটী নাতিবিস্তৃত ঘর দেখিতে পান। ক্রমশঃ সেই ঘরের ভিতর দুই একটী মূর্ত্তিও দেখা গেল। তখন জমিদার মহাশয় ইষ্টক খননে মনোযোগ না দিয়া সেই ঘরের ভিতর হইতে মূর্ত্তি বাহির করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেই ঘর খুঁড়িয়া একটী একটী করিয়া প্রায় দুই শত মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িল।

মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই অষ্টধাতু নির্ম্মিত দেব-দেবীর, তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহার মধ্যে একটী মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিটী বৌদ্ধদেবতা অবলোকিতেশ্বরের। মূর্ত্তিটীর ভিতরদিক অষ্টধাতু নির্ম্মিত, বহির্ভাগে পুরু সোনার পাতে মোড়া। দেবতা ললিতাসনে উপবিষ্ট, বাম পদ পদ্মাসনে স্থাপিত, দক্ষিণ পদ নিম্নে লম্ববান, এবং পদতলে একটী অতি সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত পদ্ম। দুই পার্শ্বে দুই হস্তে পদ্ম স্থাপিত। ইহা বোধ হয় মগধ শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার কারুকার্য্যের তুলনা নাই। ইহার মুখের ভাব, শরীরের ললিত ভঙ্গী দর্শকের মনে এক নিরুপম ভাব আনয়ন করে। অবলোকিতেশ্বর করুণার দেবতা। ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভঙ্গীতে ভাবে সর্ব্বত্রই যেন করুণা বিজড়িত রহিয়াছে।

অবশিষ্ঠ মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটী হরগৌরীর মূর্ত্তি ছাড়া বাকী সমস্তই বৌদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা বড় যেটা সেটা প্রায় তিন ফুট উচ্চ। এই বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলি অনেকটা মথুরা শিল্পের ধাঁচে তৈয়ারী। মাঝারি মাপের মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি। এইগুলি অপেক্ষা ছোট মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধদের সঙ্ঘের নানা দেব-দেবীর। সমস্তই মগধ শিল্পের অভ্যুদয় কালের তৈয়ারী। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পাল রাজাদিগের রাজত্বকালীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বেশীর ভাগ মূর্ত্তি মগধ শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ইহার ভিতর কতকগুলি মূর্ত্তি একেবারে দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তন্মধ্যে কুরুকুল্লার মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেবীর চারিটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। চারিটীতেই দেবী চতুর্ভুজা, এবং পদ্মাসনস্থা। দক্ষিণ দুইটী হস্তের একটীতে বাণ, অপরটীতে অভয়মুদ্রা প্রদর্শিত, দুইটী বাম হস্তে ধনু এবং পদ্ম ধারণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া লোকনাথ, মঞ্জুশ্রী,

তারা, অষ্টভূজা তারা, ধ্যানিবুদ্ধ, বজ্রাসন, মঞ্জুঘোষ, বাগীশ্বর ইত্যাদি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

কুর্কিহারের জমিদার মহাশয় মূর্ত্তিগুলি রক্ষার নিমিত্ত একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। নির্ম্মাণের এক মাসের মধ্যেই নিকটস্থ হিন্দুরা মূর্ত্তিগুলির পূজা আরম্ভ করিয়াছে, এবং মন্দিরে ফুল ও পয়সা অনেক পড়িয়া আছে দেখিলাম। কুর্কিহার মূর্ত্তির একটী মিউজিয়ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উপরিকথিত জমিদারবাটীর নিকটে একটী কালী মন্দির আছে, এই মন্দিরের চাতালের পার্শ্বস্থ প্রাচীরে অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্ত্তি গাঁথা আছে। মন্দিরের গর্ভাগারে প্রাচীর-গাত্রেও প্রচুর বৌদ্ধমূর্ত্তি গাঁথা, বাহিরে অসংখ্য মূর্ত্তি ছড়ান।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সকলগুলিই অক্ষত শরীরে বর্ত্তমান। ইহাতে বুঝা যায় আততায়ীর ক্রুর দৃষ্টি মূর্ত্তিগুলির উপর কখনও পতিত হয় নাই।

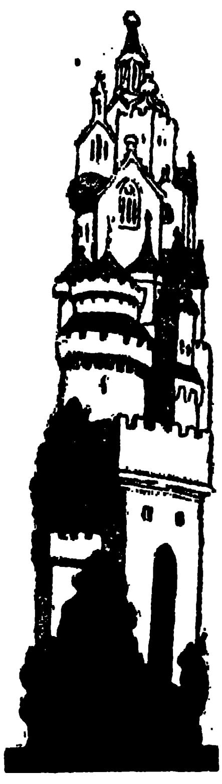
মন্দিরের গর্ভাগারের প্রধান মূর্ত্তিটী যদিও কাপড়ে ঢাকা ছিলো তথাপি উহা যে দুর্গার মূর্ত্তি তাহা চিনিতে বিলম্ব হয় নাই; কারণ, দেবীর পদযুগল সিংহের উপর স্থাপিত, নিকটে মহিষ, তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন, কর্ত্তিত মহিষের দেহ হইতে মহিষাসুর অর্দ্ধ-বহির্গত—দেবীর পাদপীঠে।

মন্দিরস্থ অপর মূর্ত্তিগুলির ভিতর লম্বোদর, জাম্ভোল, মঞ্জুশ্রী, চুন্দা,—এই মূর্ত্তিগুলি দেখিবার যোগ্য।

যাঁহারা মূর্ত্তিতত্ত্ব লইয়া চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে কুর্কিহার তীর্থস্থান স্বরূপ।

এই নূতন আবিষ্কার মগধ-শিল্পের উপর যে নূতন আলোক প্রদান করিবে তাহাতে সংশয় নাই।

কুমারী অশোকা চট্টোপাধ্যায়



সত্যাসত্য

—উপন্যাস—

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৪৬

বীণা মেয়েটির নাম। বেশ নামটি তো। উজ্জয়িনী একটা জবড়জং নাম, ও নাম ধরে কেউ কাউকে ডেকে সুখ পাবে না। কেমন আদরের নাম বীণা। বীণা, বীণু, বীণি!

উজ্জয়িনী মনে মনে বীণার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে লাগ্‌ল। তার বয়সে স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই কিছু স্বজাতিবৎসল হয়ে থাকে। বিয়ে করলেও এর ব্যতিক্রম হওয়া শক্ত। বীণাকে দেখে উজ্জয়িনী প্রথম অনুভব করল যে তার একটি সখী চাই। যেই অনুভব করল অমনি আশ্চর্য্য হলো ভেবে যে এত বড় অভাবটা আগে কেন অনুভব করেনি। ছোট ছেলেরা যেমন থাকে থাকে হঠাৎ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে অনর্থ বাধায় উজ্জয়িনীও তেমনি বীণার সঙ্গে সখ্য পাতাবার জন্যে একাগ্র হয়ে উঠ্‌ল। রোজ তার বীণাকে দর্শন করা চাইই। সেকালের বাদশারা বাতায়নে দাঁড়ালে প্রতীক্ষমান ভক্তরা দর্শন পেয়ে দিন সার্থক করতেন। আমাদের উজ্জয়িনীর কিন্তু উল্টো ব্যাপার। সে বাতায়নে দাঁড়িয়ে দর্শন দেয় না, দর্শন করে।

চুরি করে দর্শন করতে করতে একদিন উজ্জয়িনী ধরা পড়ে গেল। বীণার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই বীণা ফিক্ করে হেসে মাথার কাপড়টা তুলে দিল। তার সময় ছিল না যে দাঁড়ায়। স্বামীর কলেজের বেলা হলো। তিনি প্রাইভেট টিউশনি করতে গেছেন, এখনি এসে আরাম কেদারায় গড়িয়ে পড়বেন। ভাবটা এই যে, আজ নাই বা গেলেম কলেজে। একখানা ছুটীর দরখাস্ত করে দিয়ে প্রিয়ার সঙ্গে দুটো কথা কই। স্বামীটি জানে প্রিন্সিপাল যদি বা সে দরখাস্ত মঞ্জুর করবে স্ত্রী সে দরখাস্ত লিখ্‌তে দেবে না। অতএব অন্যান্য দিনের মতো আজকে রাশি রাশি কথা কইতে হবে, দিস্তা খানেক নোট লেখাতে হবে। এই ভাবতে ভাবতে তার আরাম কেদারায় বসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে।

বীণা ফিক্ করে হেসে রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বস্‌ল। উজ্জয়িনী সম্বন্ধে সে কি মনে করছিল কে জানে! উজ্জয়িনী সটান দৌড় দিল তার পড়ার ঘরে অর্থাৎ বাদলের ষ্টাডি'তে। তার যেমন হাসি পাচ্ছিল তেমনি কান্নাও পাচ্ছিল। হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। তাও বীণার কাছে। পরে যখন বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবে তখন এই নিয়ে বীণা রঙ্গ করবে। এত বড় উচ্চ শ্রেণীর মেয়ে উজ্জয়িনী, সেও গুপ্তচরবৃত্তি করে, বীণা হয় তো এজন্যে তাকে অশ্রদ্ধাও করতে পারে।

বাদলের ষ্টাডি'র দেয়ালে কোনোরকম ছবি টাঙানো ছিল না, তাতে বিদ্যার্থীর চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। ছিল একটি মটো। "Repentance is a sin." উজ্জয়িনী তার মানে বোঝ্‌বার চেষ্টা করল। পৃথিবীতে এত কথা থাকতে বাদলের ঐ একটি কথা মনে ধরল কোন গুণে? সবাই তো ওর উল্টাটাই বলে। অনুতাপ করলে পাপক্ষয় হয় বলেও তার জানা ছিল, বাদলের মতে অনুতাপ করলে পাপ হয়। এ সম্বন্ধে সুধীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখ্‌লে মন্দ হয় না। ভালো কথা সুধীন্দ্রবাবুর একখানা চিঠি এসেছে কাল, একবারের বেশী পড়া হয়নি, অথচ বহুবার না পড়্‌লে ঠিক্ ঠিক্ অর্থবোধ হয় না। উজ্জয়িনী সুধীর চিঠি বের করে পড়্‌তে বস্‌ল।

সুধী লিখেছে :—

প্রীতিভাজনাসু,

বাদলের সংবাদ জানিবার জন্য আপনার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকিবে বলিয়াও বটে, আবার দেশভাষায় কথা

কহিয়া আমিও কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিব, এই বিবেচনার ফলে এই পত্রক্ষেপ। ভাবিতেছি আমার এ পত্রখানি যখন ক্ষুধার্ত্ত দুর্ব্বাসার মতো প্রোষিত-ভর্তৃকার পুরপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আত্ম-পরিচয় ঘোষণা করিতে করিতে ক্ষীণকণ্ঠ হইবে তখনো কি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইবে না, তিনি উত্তর দিতে একান্ত বিলম্ব করিবেন?

দেশে থাকিতে আমরা থার্ডক্লাস্ গাড়ীর যুগল পক্ষিরাজ ছিলাম। দেশের গতির ছন্দে মিল দিয়া আমরা দুই বন্ধুও ধীরে সুস্থে হাঁটিতাম ও আস্তাবলের বাহিরে বন্ধু খুঁজিতাম না। তবে ঠিক অসামাজিকও ছিলাম না। বিলাত দেশটা মাটীর হইলেও মাটীর গুণে ফসলের বাড় বেশী বা কম। দেখিতেছি বিলাতে আসিয়া বিলাতের গতিচ্ছন্দ আয়ত্ত না করিলে মরণং ধ্রুবম্। বাদল বুদ্ধিমানের মতো গাড়ীটানা ঘোড়ার কাজে ইস্তফা দিয়া ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া বনিতেছে। আমিও মোটর গাড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিয়া খোঁড়া হইয়া মরি কেন, পিঁজরাপোলে আশ্রয় লইয়াছি। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এদেশের অনেক সংখ্যক না-মঞ্জুর ঘোড়ার সঙ্গে আমিও জাবর কাটিতেছি।

এদানীং খাঁচার পাখীর সঙ্গে বনের পাখীর মোলাকাৎ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রতি বুধবার। বাদলকে আপনার হইয়া বহু অনুরোধ উপরোধ করি, সে কি কথা শোনে? সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক। গভীর আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মতো প্রশ্ন করে, "এ্যাঁ, কী বলছিলে?" আপনার কথা পাড়িলে বলে, "ওঁকে কিছু নতুন প্রকাশিত বই পাঠিয়ে দিতে রোজই ভুলে যাই, ভদ্র মহিলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম।"

বাদল অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইংরাজের ছেলে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশ বৎসর বয়সে যাহা হইয়া উঠে বাদল বিশ সপ্তাহে তাহা হইতে চায়। অথচ বিশ বৎসরেও তাহা হইবার উপায় নাই, কারণ ততদিনে ইংরাজ সন্তান চল্লিশ বৎসর বাঁচিয়াছে আর ইংলণ্ডবাসী বাদল বাঁচিয়াছে বিশবৎসর। অন্য কথায়, ইংলণ্ডে জন্মাইয়া বাদলের সমবয়সীরা বিশ বৎসর ষ্টার্ট্ পাইয়া গেছে এবং সে ষ্টার্ট্ কোনো মতে হ্রস্ব হইবার নয়। তথাচ বাদল উঠিয়া পড়িয়া দৌড়াইতেছে, ইংলণ্ডের বিগত বিশ বৎসরের দৈনন্দিন ইতিহাস সে সংবাদপত্র হইতে বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত স্মৃতিসাৎ করিতেছে, ইংলণ্ডের তৎকালীন ভাবস্রোতে বাদল উজান বাহিয়া চলিয়াছে। ইংরাজশিশু জন্মলাভ করিয়া দেখে উহার জন্য একটি মাতা ও একটি পিতা অপেক্ষা করিয়া আছেন। ভ্রাতা ও ভগিনী, সঙ্গী ও সতীর্থ, প্রতিবেশী ও দৃষ্টিপথারূঢ় বহুবিধ ব্যক্তি উহাকে নানা সূত্রে শিক্ষায় সংস্কারে ভাষায় ব্যবহারে স্বভাবে ও স্মৃতিতে ইংরাজ করিয়া তুলিতেছে। কিছুটা সে কাণে শুনিয়া শেখে, কিছুটা আবার চোখে দেখিয়া ও অবস্থায় পড়িয়া। একটি শিশুর মানসিক জীবনের উপর উহার দেশ ও জাতির রূপ গুণ কেমন ধীরে অথচ অমোঘভাবে মুদ্রিত হইয়া থাকে আপনি নিশ্চয়ই নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানেন। টাকাকে গলাইয়া নতুন ছাঁচে ঢালাই করা যায়, কাগজের উপরিস্থ লেখাকে মুছিয়া আরেক দফা লেখাও সম্ভব, সুদক্ষ স্থপতি একটা বাড়ীকে বেমালুমভাবে আরেকটা বাড়ীতে পরিণত করিতে পারেন। কিন্তু পুনর্জন্মের পূর্ব্বে বাঙালী কখনো ইংরাজ কিম্বা ইংরাজ কখনো বাঙালী হইতে পারে না। বেশভূষায় আদবকায়দায় সহানুভূতিতে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইয়া বা বহুদিন হইতে একত্র থাকিয়া আইন অনুসারে এক দেশের মানুষ আর এক দেশের মানুষ হইতে পারে সত্য। কিন্তু বাদল যে স্মৃতিতে ও প্রকৃতিতে ইংরাজ হইতে চাহিতেছে। সে যদি ইঙ্গবঙ্গদের মতো আমার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কহিত তবে দুঃখিত হইলেও বিস্মিত হইতাম না, কিন্তু কোন দিন সে বলিয়া বসিবে, "তুমি আমার ভারত-বর্ষীয় বন্ধু, যখন ভারতপ্রবাসী ছিলুম তখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়।"

থাক্ ও কথা। বাদলের বদলে বরফের বর্ণনা করি, অবধান করুন। শুভ্র আকাশ হইতে রাশি রাশি শেফালী অতীব ধীর মন্থর ভাবে ঝরিতেছে! জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া দিলে মুঠার মধ্যে পাই। কিন্তু হাত কন কন করে না। ইংলণ্ডের বর্ষা বর্শার ফলার মতো বেঁধে। বৃষ্টির ফোঁটা যে ভয়ানক ঠাণ্ডা হইতে পারে অনুভব করেন নাই। কিন্তু বরফের থোপা বড় মোলায়েম ও ঈষৎ শীতল-স্পর্শ।

যে বরফ খা'ন সে বরফের কুচি জমাট ও কঠিন। এ বরফের পাউডার ফুঁ দিলে উড়িয়া যায়।

এ বাড়ীতে একটি শিষ্ট বালিকা থাকে, তাহার নাম মার্সেল। বোধ করি তাহার পরিচয় দিয়াছি। লক্ষ্মীকে স্বচক্ষে দেখিতে চান তো মার্সেলকে দেখিয়া যান। আজ রবিবার, আজ আমাকে বাহিরে যাইতে দিবে না, আমাকে তাহার ঘোড়া সাজাইবে। থার্ডক্লাশ ঘোড়াকে সহজেই চেনা যায়, মেয়েদের স্বাভাবিক ইন্‌টুইশন বশত মার্সেল আরো সহজে চিনিয়াছে। চিঠিখানাকে আরেকটু দীর্ঘ করিয়া সেই অশ্বারূঢ়া ঝাঁসীর রাণীর মসীচিত্র আঁকিয়া দেখাইব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু লাগামে টান লাগিতেছে। অগত্যা উঠিতে হইল। নমস্কার জানাই। ইতি। বিনীত

শ্রীসুধীন্দ্র নাথ।

৪৭

মার্সেলের কাণ্ড পড়ে উজ্জয়িনীর কৌতুক বোধ হচ্ছিল। ইংলণ্ডের মেয়েগুলোও কম বাঁদর নয়। সুধীবাবুর মতো একজন দার্শনিক মানুষকে হামাগুড়ি দেওয়ায়। দেয় সপাং করে এক চাবুক। সুধী না হয়ে বাদল হলে কেমন জব্দ হতো! (মার্সেল নয়, বাদল জব্দ হতো!)

কিন্তু বাদল থাকে দূরে, বীণা থাকে অদূরে। বীণার টানই প্রবল। উজ্জয়িনী সুধীবাবুকে কী লিখ্‌বে ভেবে তাঁর চিঠিখানা খুলেছিল ভুলে গেল। একবার বীণাকে দেখে এলে হয় না? এবার কিন্তু খুব সন্তর্পণে, বীণা যাতে টের না পায়। শুধু বীণা নয়। বীণার স্বামীও এতক্ষণে ফিরেছেন, তিনিও টের পাবেন আর মুচ্‌কি হাস্‌বেন। ভারি লাজুক ভদ্রলোকটি। সুন্দর চেহারা, ঋজু ও তন্বু গড়ন, সুকুমার স্বভাব। বীণার স্বামী না হয় বীণার স্ত্রী হলেন না কেন? অসাধারণ ফর্‌সা, তবু প্রসাধনের পারিপাট্য নেই, নম্রতার অবতার। মৌনতারও। কলেজে বেশী বক্‌তে হয় বলে বাড়ীতে শক্তি সঞ্চয় করেন।

উজ্জয়িনীকে বীণার আকর্ষণ কি কমলের আকর্ষণ কোনটাতে টান্‌লে বলা যায় না। উজ্জয়িনী এবার সযত্নে নিজেকে গোপন কর্‌ল। দেখ্‌ল স্বামীটি খাচ্ছে আর স্ত্রীটি এমন ভাবে তার থালার দিকে হাতের দিকে মুখের দিকে অনবচ্ছিন্ন ভাবে তাকাচ্ছে যেন একটি সূর্য্যমুখী ফুল ধীরে ধীরে পশ্চিমমুখী হচ্ছে। যেন স্বামীর আহারলীলা নিরীক্ষণ করার মধ্যে স্ত্রীর নিজের আহার-ক্রিয়া উহ্য রয়েছে। বাদল উজ্জয়িনীকে কোনো দিন এমন সুযোগ দেবে কি? যদি দেশে ফেরে তবে দুর্দ্ধর্ষ জন্‌বুল্ হয়ে ফির্‌বে, স্ত্রীর সেন্টিমেন্টের মর্য্যাদা বুঝবে কি? এমনি করে দিনের তুচ্ছ কাজগুলির ভিতর দিয়ে স্বামীর কাছে স্ত্রী আত্ম-নিবেদন করবার ছল খুঁজবে, কিন্তু পাবে না। উজ্জয়িনী না হয়ে বীণা হয়ে জন্মালেও বীণার ভাগ্য পেলে বুঝি উজ্জয়িনীর ক্ষোভ থাক্‌ত না।

বীণার সঙ্গে বাক্যালাপের জন্যে উজ্জয়িনী উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু সে কেমন করে সম্ভব? উজ্জয়িনীদের সমাজের রীতি এই যে দু'পক্ষেরই কোনো একজন বন্ধু বা আত্মীয় বা পরিচিত লোকে দু'জনকে আলাপ করিয়ে দেবেন। গায়ে পড়ে আলাপ করা অসিদ্ধ এবং আকস্মিক আলাপ পরে অস্বীকার্য্য। উজ্জয়িনী মহিমচন্দ্রকে একদিন জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "বাবা, ও বাড়ীর কেউ আমাদের এখানে আসেন না কেন?"

মহিম বল্লেন, "কমল বাবুদের কথা বল্‌ছ? কই কোনো দিন তো আসেন না। ছোকরা কিসের যেন লেকচারার শুনেছি, কিন্তু স্বভাবটি তাঁর মুখচোরার।"—এই বলে খানিক অট্টহাস্য করে নিলেন!

কিন্তু তাতে উজ্জয়িনীর কার্য্য সিদ্ধ হলো না। তার সঙ্গে মহিমচন্দ্র পাড়ার দু' পাঁচজন ডেপুটী মুন্সেফ ও উকীলের পরিচয় করে দিয়েছেন এবং ওঁরাও ওঁদের "ওঁদেরকে" একদিন পাঠিয়ে দেবেন বলে আপনা থেকেই প্রস্তাব করেছেন। সাহেব-কন্যাকে নিমন্ত্রণ করে দুঃসাহসের কাজ করেন নি। উজ্জয়িনীর একমাত্র আশা যদি ওঁদের কারো "ওঁরা" একদিন আসেন ও দৈবাৎ বীণার সঙ্গে পরিচিতা থাকেন।

সেদিনের প্রত্যাশায় উজ্জয়িনী ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। ইতিমধ্যে বীণার সঙ্গে ঘট্‌তে থাক্‌ল বারম্বার দৃষ্টি-বিনিময়। বারম্বার যা ঘটে তার মধ্যে আকস্মিক কতখানি, কতখানিই

গা চিন্তিতপূর্ব্ব? দৃষ্টি-বিনিময় মাত্রে যে হাস্য-বিনিময়টুকু হয় সেটাও কি আকস্মিক?

সংকোচ কেটে যেতে লাগ্‌ল। উজ্জয়িনী জানালার থেকে সরে যায় না, বীণা স্রস্ত কেশের উপর কাপড় তুলে দেয় না। আহা, উভয়ের বয়স যদি আরো কম হতো! তথন হয় তো দু'জনে একই ইস্কুলে যেত, একই জায়গায় খেলা কর্‌ত। ইস্কুলের কথা মনে পড়ায় উজ্জয়িনীর আফ্‌শোষ হতে লাগল, কেন অবুঝের মতো অকালে ইস্কুল ছাড়্‌ল। তখন কী ভয়ানক লাজুক ও অসামাজিক ছিল সে, কোনো মেয়ের সঙ্গে তার বন্‌ত না, ওরা তাকে মার্‌ত কিম্বা ক্ষ্যাপাত অথচ সে কারো গায়ে হাতটি তুল্‌ত না কিম্বা মুখ ফুটে প্রতিবাদ কর্‌ত না। একদিন বাবাকে বল্ল, "আর ইস্কুলে যাব না।" বাবাও বাধ্য কর্‌লেন না, নিজে কন্যার ইস্কুল-মাষ্টারি কর্‌তে সুরু করে দিলেন। তার ফলে উজ্জয়িনী অল্প বয়সে অনেক শিখেছে। কিন্তু সমবয়সিনীদের সঙ্গ হারিয়ে তাদের জগতে প্রবেশের পথ পাচ্ছে না। তাদের সঙ্গে পড়্‌লে পড়াশুনা হতো না, কিন্তু পড়াশুনার চাইতে যা ঢের বেশী লোভনীয় তাই হতো—হতো সখ্য, হতো অন্তরঙ্গতা।

উজ্জয়িনীর মনে হলো বাদলকে যে সে নিজের প্রতি আকৃষ্ট কর্‌তে পার্‌ল না এর প্রধান কারণ তার বিদ্যার স্বল্পতা নয়—একটা বড় কারণ বটে, কিন্তু প্রধান কারণ নয়। বীণা বিদুষী কি না জানে না, কিন্তু উজ্জয়িনী জোর করে বল্‌তে পারে বীণা বাদলকে এমন করে আপনার করে নিত যে বাদল তাকে চিঠি না লিখে পারত না। বীণার সে নিপুণ হাত যাদু জানে। বীণার স্বভাবে যে মাধুর্য্য আছে উজ্জয়িনীতে তা কই? বীণাকে পেলে বোধ করি বাদল এত একাগ্রভাবে ইংরেজ হবার তপস্যা করত না। তার তপশ্চর্য্যায় বীণার মুখখানি হতো ইন্দ্রপ্রেরিত বিঘ্ন। হয় তো তার জীবনের ব্রত হতো বীণাকে সুখী করা, বীণাই হতো তার ধন ও মান, যশ ও কীর্ত্তি।

কিন্তু বেচারা কমলের তা হলে কী দশা হতো! সে যে বড় বেচারা মানুষ। খুব সম্ভব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, একান্ত স্নেহলালিত পোষা প্রাণীটি, এখন মা'র হাতে থেকে স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়েছেন। নাঃ, বীণা বলেই পারে, উজ্জয়িনী কিছুতেই সইতে পার্‌ত না। বাদল যদি কমল হয়ে থাকৃত তবে উজ্জয়িনীর ক্ষোভ দূর হতো না, এক ক্ষোভের স্থান অপর ক্ষোভ নিতো। স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার থেকে বড় কথা স্বামীকে শ্রদ্ধা কর্‌তে পারা। উজ্জয়িনী বীণার তুলনায় ভাগ্যবতী।

কিন্তু বীণার সঙ্গে প্রাণখুলে এসব কথা না কইলে কাকে কইবে, কেমন করে প্রাণের নিঃসঙ্গতা লাঘব কর্‌বে? বাবাকে যখন চিঠি লেখে তখন এসব কথার ধার মাড়ায় না। বাবা তার মনের সাথী, প্রাণের নয়। একটি সখী তার চাই-ই চাই। এ যে অভাব, এর মতো অভাব বুঝি আর নেই।

উজ্জয়িনীর সংস্কার বিদ্রোহী হলেও সে ঠিক্ কর্‌ল বীণার সঙ্গে যেচে আলাপ কর্‌বে। বীণা যদি তার বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করে তা হলে যে সে কী ভয়ঙ্কর লজ্জা পাবে সেকথা ভাব্‌তে তার মাথা ঘোরে, সেকথাকে সে বলপূর্ব্বক চাপা দিল। না, না, মরে যাবে না, মরার কথাই ওঠে না। কিন্তু আর কখনো এই জানালা খুল্‌বে না এবং আর কখনো কারো সঙ্গে সখীসম্বন্ধ পাতাবে না। জান্‌বে যে তাকে পৃথিবীতে কেউ ভালোবাসে না, এক তার বাবা ছাড়া। পৃথিবীর কারো কাছে কোনো প্রত্যাশা না রেখে সে মীরা বাইয়ের মতো ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ কর্‌বে এবং হিমালয়ের কোনো গুহায় আত্মগোপন কর্‌বার জন্যে সংসার ত্যাগ কর্‌বে। তার বাবা ছাড়া অন্য সকলে ক্রমশঃ ভুলে যাবে যে উজ্জয়িনী বলে কেউ ছিল।

৪৮

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সৌভাগ্য এলো। বীণা নয়, মলিনা মেয়েটির নাম। একদিন মা'র সঙ্গে মহিমচন্দ্রের বৌমাকে দেখ্‌তে এসে বলে গেল, "আমি আবার তো আস্‌বই, এলে আপনাদের লাইব্রেরী থেকে নড়ব না দেখ্‌বেন।" (ইংরেজীতে)

পরিচয়ের ইতিবৃত্ত দেওয়া যাক্।

মহিমচন্দ্রের উকীলবন্ধু সুবল একদিন দুপুরবেলা তাঁর স্ত্রীকে ও কন্যাদ্বয়কে উজ্জয়িনীর সঙ্গে আলাপ করে আস্‌বার

অনুমতি দিলেন। গিন্নীটি বড় ভাল মানুষ। এসেই বল্লেন, "মা, রোজ আসি আসি করে আসা হয়ে ওঠে না, জানোই তো বৃহৎ পরিবারের অসুবিধে। নইলে তোমার এখানে মা নেই, বোন নেই, শাশুড়ী নেই শুনে অবধি প্রাণে যে উন্মাদনা বোধ করছি, মা, সে আর কি বল্‌ব? তুমি আমার মেয়ের মতো, তুমি তো সব বোঝো।" এক নিঃশ্বাসে এই পরিমাণ কথা বলে ধুঁক্‌তে লাগ্‌লেন। উজ্জয়িনী চট্‌ করে একখানা পাখা ও এক গ্লাস জল আনিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিম্ন স্বরে বল্লেন, "বাবা সিবিল সর্জ্জন?

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"ভাই বোন কটি?"

"ভাই নেই, বোন দুটি।"

"আহা, ভাই নেই! একেবারেই নেই!"—ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর থেকে মনে হলো তিনি পরম উন্মাদনা বোধ কর্‌ছেন। উজ্জয়িনীও যেন এই প্রথম একটি ভাইয়ের অভাব বোধ কর্‌ল। তার চোখ ছল ছল কর্‌ল।

মলিনা ও মিনতি মা'র কথাবার্ত্তার সেকেলে ধরণে মনে মনে চটে গেছ্‌ল। মা'কে থামাতেও পারে না। অত্যন্ত অসহায় অথচ অপ্রসন্নভাবে তারা শুনতে লাগ্‌ল মা বল্‌ছেন, "বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, রাজার মেয়ে। দেখে প্রাণ প্রফুল্লিত হলো। আর আমার মেয়ে দুটোর ছিরি দ্যাখো। এখনো বি-এ পাস কর্‌তে পার্‌ল না। হাঁ মা, তুমি তো এম-এ পড়া মেয়ে—

উজ্জয়িনী বাধা দিয়ে বল্ল, "আজ্ঞে না, আমি ম্যাট্রিকও পড়িনি। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমার বিদ্যার দৌড় সিক্‌স্থ্‌ ক্লাস পর্য্যন্ত।"

মলিনাদের মা টিপ্পনি কাট্‌লেন, "স্থাখ্‌ তোরা, দেখে শেখ্‌, বিনয় কাকে বলে। কত জ্ঞান আহরণ কর্‌লে তবে বল্‌তে পারা যায় আমার বিদ্যার দৌড় লাষ্ট ক্লাস্‌ পর্য্যন্ত। কে যেন ইংরেজ কবি বলে গেছেন, আমি বেলা-ভূমিতে বালুকাখণ্ড সংগ্রহ করেছি?"—

মিনতি মা'র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্ল, "কবি নয় মা, scientist। স্যর আইজাক নিউটন, যিনি Laws of Gravitation আবিষ্কার করেন।"

মলিনা উজ্জয়িনীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ক্ষেপণ করে বল্ল, "আবিষ্কার করে কি result হলো; আজ তো আইনষ্টাইন এসে সব explode করে দিলেন?"

উজ্জয়িনী সবিনয়ে বল্ল, "না, ঠিক্‌ উল্টে দেননি। দেখুন, এ সম্বন্ধে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও এত কম বোঝেন যে আমাদের এ-পক্ষে বা ও-পক্ষে কোনো রায় দেওয়া সাজে না।"— বলেই উজ্জয়িনী রেঙে উঠ্‌ল।

মলিনার মা বল্লেন, ঠিক বলেছ মা। দু'পাতা ইংরেজী পড়ে আমাদের বড্ড বাড় বেড়েছে। ঐ যে বলে, 'হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল,' ওই হয়েছে আমাদের দশা। A little knowledge is dangering thing.

মিনতি চোখ টিপে উজ্জয়িনীকে বল্ল, "She is a living proof of that saying.

মলিনা বল্ল, "I should call her a veteran example and a warning."

'মা কিম্বা মেয়ে কারুকেই উজ্জয়িনীর মনে ধর্‌ছিল না। সে টের পেয়েছিল যে মা'তে মেয়েতে বিদ্যা সংক্রান্ত ঈর্ষা ও অভিমান থেকে তাদের সম্বন্ধের স্বাভাবিক মধুরতাকে পরের পক্ষে অনুপভোগ্য কর্‌ছে, যেমন চিনির মধ্যে কাঁকর। মেয়েরা উজ্জয়িনীকে মা'র চেয়েও আপন মনে কর্‌ছে—কিন্তু কেন? সমবয়সীদের মধ্যে একটা দলগত চক্রান্ত আছে অসমবয়সীদের বিরুদ্ধে—তাই কি? প্রাচীন ও নবীন, একের গর্ভে অপরের জন্ম, তবু উভয়ে উভয়ের শত্রু। কথাটা সে কোন্‌ বইয়ে পড়েছিল স্মরণ করতে চেষ্টা কর্‌ল।

উজ্জয়িনী তাঁদের কিছু জলযোগ করিয়ে বাড়ীর নানা অংশ দেখিয়ে বিদায় দিল। তাঁরা বাদলকে ভালো করেই চিন্‌তেন, সুধীকেও। সুধী ও বাদল কেমন আছে, কি পড়্‌ছে, কবে ফির্‌বে ইত্যাদি প্রশ্ন কর্‌লেন। উজ্জয়িনীর ইচ্ছা কর্‌ছিল বীণা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু না প্রথম দিনে অতটা ভালো দেখায় না।

মলিনা ও মিনতি এই দুজনের মধ্যে মলিনাকেই তার যা কিছু ভালো লাগ্‌ল। দুই বোনেরই প্রধান দোষ তারা

উজ্জয়িনীর উপর নিজেদের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ করতে উৎসুক। তারা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষার বিবরণী দিল। মলিনা বি-এ দিচ্ছে আগামী বৎসর, মিনতি এইবার আই-এ দেবে। দুজনেই বাড়ীতে মাষ্টার রেখে পড়ে। পাটনায় মেয়েদের কলেজ নেই। মলিনার মধ্যে কিছু গভীরতা আছে। সে উজ্জয়িনীর লাইব্রেরী দেখে বল্ল, "আপনার সঙ্গে আমার রুচি খাপ খাবে। আমিও বিজ্ঞান ভালোবাসি কিন্তু শেখায় কে? সস্তায় মাষ্টার পাওয়া যায় বলে দু'জনেই হিষ্ট্রী ও সংস্কৃত পড়ি।" (ইংরেজীতে)

মিনতি বল্ল, "আচ্ছা, আপনার কাছে এল্ মুখার্জীর ইংলিশ্ হিষ্ট্রীর নোট্ আছে? নেই? আহা, ভুলে গেছলুম আপনি কলেজে পড়েননি। আমি কিন্তু এইবার কল্‌কাতা গিয়ে ডাইওসিসানে ভর্ত্তি হবোই।" (ইংরাজী)

এমনি করে সুবলবাবুর দুই কন্যার সঙ্গে উজ্জয়িনীর আলাপ পরিচয় হলো। এবং মলিনা আশা দিয়ে গেল যে সে শীঘ্রই একদিন আসছে। মিনতির ভাব দেখে বোধ হলো সে উজ্জয়িনীকে দেখে নিরাশ হয়ে ফির্‌ল। বিলেত-ফেরতের মেয়ে, অন্ততঃ ইংরেজীটা বল্‌তে পারা তার পক্ষে মাতৃভাষার মতো হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মিনতিরা যতবার চার ফেলে মাছটি কোনোবার ধরা দেয় না। উজ্জয়িনী একটিও ইংরেজী কথা ব্যবহার না করে শুদ্ধ বাংলায় বাক্যালাপ কর্‌ল। মিনতি বোধ হয় ভাবছিল যে বাদলটা যাকে তাকে বিয়ে করে ঠকে গেছে, বিশেষ যখন এক পাড়াতেই মিনতির মতো মেয়ে রয়েছিল। কেন, উজ্জয়িনীর চাইতে সে কিসে কম যায়? উজ্জয়িনীকে সে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে তার বাবা হাইকোর্টের ভকিল ও ইউনিভার্সিটির সিণ্ডিক্। মেয়েকে তিনি বিলেত পাঠাতেও পারেন। তবে মা'কে রাজি করানো শক্ত। মিনতি যতক্ষণ বক্ বক্ কর্‌ছিল মলিনা ততক্ষণ তন্ময় হয়ে যোগানন্দ-প্রেরিত "Jesting Pilate" এর পাতা ওল্‌টাচ্ছিল ও মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিল। উজ্জয়িনী যে এ জাতীয় বই পড়ে বুঝতে পারে এ বিষয়ে তার হয় তো সন্দেহ ছিল, তবু স্থানে স্থানে সমঝদারের মতো লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া ও প্রশ্নসূচক চিহ্ন দেখে সে উজ্জয়িনীর বিদ্যার প্রতি মোটের উপর শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিল। অন্ততঃ তার ভাব থেকে উজ্জয়িনীর তেমন অনুমানের কারণ ছিল।

ওরা চলে গেলে উজ্জয়িনী কতকটা আশ্বস্ত হলো। মলিনা বীণা নয়, বীণা বল্‌তে যত কিছু বোঝায় মলিনার মধ্যে তার অল্পই আছে, তবু মন্দের ভালো। বীণা যদি উজ্জয়িনীকে প্রত্যাখ্যান করে তবে মলিনা তার অবলম্বন। আর কিছু না হক্ মলিনার সঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চা তো করা যেতে পারে। যদিও উজ্জয়িনীর মনটা সম্প্রতি জ্ঞানমার্গ ছেড়ে ভক্তিমার্গের প্রতি ঝুঁকে রয়েছে। উজ্জয়িনীর বাল্যকাল হতে অভিলাষ ছিল সিষ্টার নিবেদিতার মতো কোনোরূপ লোকহিতকর কাজে আত্ম-নিয়োগ কর্‌বে। হঠাৎ ভ্রান্তের মতো বিয়ে করে বস্‌ল। বিয়ের স্বরূপ তো এই। উজ্জয়িনী তপস্বিনী হবে লোক চক্ষুর অন্তরালে। এত শীঘ্র নয় অবশ্য। বছর তিন চার স্বামীর প্রতীক্ষা কর্‌বে। তার পরে একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে, যদি স্বামী না ফেরে কিম্বা না ডাক দেয়।

যদি ফেরে কিম্বা ডাক দেয় তবে?—ভাব্‌তে উজ্জয়িনী লজ্জায় থর থর করে কাঁপে। না, সে সুখের তুলনা নেই। উজ্জয়িনী ধন্য হয়ে যাবে। বীণার মতো চব্বিশ ঘণ্টা পাগ্‌লামি কর্‌বে। বাদল যা ভাবে ভাবুক।

কিন্তু দূর হক্ এ সব বাজে চিন্তা। বাদল হয় তো এতদিনে কোনো 'স্বদেশিনীর' প্রেমে পড়েছে।

৪৯

মেল্-ডের একদিন আগে মহিমচন্দ্র বল্লেন, "বাদলকে কিছু লিখ্‌বে, মা? অবশ্য জবাব পাবে সুধী'র।"

উজ্জয়িনী বল্ল, "থাক্, বাবা। তাঁর ধ্যানভঙ্গ করব না। সোজা সুধীবাবুকেই কিছু লেখ্‌বার আছে তাঁর পত্রের উত্তরে।"

মহিম খুসীই হলেন। বাদলের এটা ব্রহ্মচর্য্যের বয়স, গার্হস্থ্যের দেরী আছে। তিনি বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসবান। যদিও নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেননি। তবু গৃহিণীর অভাবে তাঁর গার্হস্থ্যও তো অসিদ্ধ। তাঁর চিত্তে ভোগৈশ্বর্য্যের প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি নেই। পুত্রের শিক্ষার কাঞ্চনমূল্য সংগ্রহ

করতে হচ্ছে কলির অধ্যাপকরা নিষ্ক্রয় দাবী করছে বলে। নতুবা কামিনী কিম্বা কাঞ্চন কোনটাই বা তাঁর প্রেয় ?

উজ্জয়িনী বাদলের চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে চায় না, এজন্যে যোগানন্দের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জাত হলো। কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা তো বহু পিতা দিয়ে থাকেন, এমন চরিত্রশিক্ষা এ যুগে বিরল।

উজ্জয়িনী সুধীকে লিখল :—

"আমি পাটনা এসেছি, খবর রাখেন ? যে সে সহর নয়, পাটলীপুত্র। তিনটি হাজার বছর এর বয়স। তার থেকে একটি হাজার বছর এ নগরী বিশাল ভারতের রাজচক্রবর্ত্তীদের রাজধানী ছিল। আপনাদের লণ্ডনের এত দীর্ঘকাল এরূপ সৌভাগ্য হয়নি।

এর মাটী মাড়িয়ে চিরকালের জন্যে পবিত্র করে দিয়ে গেছেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ, আর রাজর্ষি অশোক। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য ইত্যাদি কত পরাক্রান্ত পুরুষ, কত দার্শনিক কত কবি, কত জ্যোতির্ব্বিদ, এবং হিউয়েনৎ সাং ফাহিয়েনের মতো কত তীর্থযাত্রী। কল্পনাও পরাস্ত হয়, ইতিহাস তো স্মৃতির কঙ্কাল মাত্র। আমি অবসর সময়ে যতবার এই নগরীর অতীত চিহ্নহীন সিন্দুরকঙ্কণহীন বিধবা মাটীর দিকে তাকাই ততবার আমার সমগ্র সত্তা এর পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। এর গায়ে পা ঠেকেছে, সেই কি কম অপরাধ ? অথচ এমন কুৎসিৎ সহর আমি অল্পই দেখছি। যারা একে কুৎসিৎ করে রেখেছে তারাই কুৎসিৎ। এই সব বালখিল্যের কল্পনা অল্প একটুখানি বর্ত্তমান ও অদূর ভবিষ্যৎ অবধি মোরগের মতো ওড়বার ভাণ করে। হয় তো এই পুণ্যভূমির কোনো অদৃশ্য স্থানে কোনো শাক্যসিংহ তপস্যা করছেন। কিন্তু বাইরে থেকে আমরা যাঁদের হাঁক ডাক শুনি তাঁরা ক্ষণজন্মা নন, ক্ষণজীবী। আমার শ্বশুরের সঙ্গে যাঁরা গল্প করতে আসেন তাঁদের হয় তো অন্য সমস্ত গুণ আছে, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আশা ও কল্পনা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের সমতুল নয়।

এত অল্প দেখে এত বড় বিষয়ে মত জাহির করতে আমার সাহস হয় না, তবু আমার যা সত্য ধারণা তাই আপনাকে বললুম। ক্ষমা করবেন তো ? দয়া করে দোষ ধরবেন না।

আপনার বন্ধুর অসাধ্য সাধন তাঁর প্রতি আমাকে সশ্রদ্ধ করেছে। কিন্তু কিসে যেন আমাকে পীড়া দিচ্ছে। প্রত্যেকের জীবন তার নিজের হাত খরচের টাকা, তার উপর অন্যের হাত খাটানো অন্যায়। বিবাহসূত্রেও এক জনের হাত খরচের টাকা অন্য জনের হয় না, হওয়া অনুচিত। কাজেই তিনি তাঁর জীবনের যেমন খুসী বিলি ব্যবস্থা করলে আমার একটি কথা বলবার অধিকার নেই।

আমার বিয়ে আমার জীবনের সমস্ত ওলট পালট করে দিয়েছে। আগে আমি ঠিক করে রেখেছিলুম লোকসেবায় আত্মোৎসর্গ করব, যেমন সিষ্টার নিবেদিতা করেছিলেন। সে আদর্শ কোথায় উঠে গেছে। আমাকে টানছে নামপরিচয়-হীন ভগবদ্‌ভক্তের জীবন। কিন্তু আপনার বন্ধুর প্রতি কী একটা কর্ত্তব্য আমার আছে—এ আমার সংস্কার থেকে বলছে। যুক্তি এক্ষেত্রে খাটছে না। একটি প্রতিবেশিনী মেয়েকে রোজ দেখি, আপনি হয়তো তার স্বামীকে চেনেন। থাক্, নাম করবো না। তার স্বামীই তার ভগবান। শাস্ত্রে লিখছে শুধু তার কেন, সব মেয়ের পক্ষে তাই। এত বড় একটা কথা কি কখনো মিথ্যা হতে পারে ? আমার সাহস হয় না ভাবতে।

পড়েছি দোটানায়। যদি স্বামীর জন্যেই প্রস্তুত হই—যা আমার পিতা, আমার শ্বশুর, আমাদের সমাজ আশা করেন—তা হলে একদিন নিরাশ হবো। স্বামী হয়তো ফিরবেন না এবং তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে দেখব তিনি আমাকে চেনেন না ও চান না। পক্ষান্তরে যদি নিজের আদর্শ অনুসরণ করে পার-মার্থিক জীবনে মনোনিবেশ করি তা হলেও একদিন বিপন্ন হবো। স্বামী ফিরবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন কেন আমি তাঁর জন্য লৌকিক আদর্শ অনুযায়ী প্রস্তুত থাকিনি।

এই সব ভাবি কিন্তু কাউকে বলতে পারিনে। আপনাকে বলে মনটা হালকা হলোও বটে, আবার এই সম্ভাবনাও থাকল যে আপনি প্রসঙ্গটা আপনার বন্ধুর কাণে তুলবেন। বাবাকে লিখেছিলুম কেন এতদিন তিনি আমাকে ভগবান ও ভাগবত-উপলব্ধির কথা বলেন নি। তিনি তার উত্তরে

একখানি চটুল ও চাতুর্য্যপূর্ণ বই পাঠিয়েছেন—"Jesting Pilate". এবং লিখেছেন, 'তোর শ্বশুরের বয়সে যা স্বাভাবিক তোর বয়সে তা morbid. ভূত ছাড়ানোর জন্যে যেমন রোজার দরকার হয় ভগবানকে ছাড়াবার জন্যে হয় বৈজ্ঞানিকের। এই লেখকটি বৈজ্ঞানিকের পৌত্র ও নিজেও বৈজ্ঞানিকমনা। ইনি যদি বিফল হন তবে আমাকে Sthethoscope নিয়ে পাটনা রওনা হতে হবে। তোর শ্বশুর নানা জাতীয় সাত্ত্বিক আহার্য্যের সঙ্গে তোর মস্তিস্কটি-তেও দন্ত-প্রয়োগ করছেন নাকি? এই তো সেদিন এখান থেকে গেলি। এরি মধ্যে ভগবানে পেয়েছে! চলে আয়, চলে আয়।'

যা কোনো দিন আশঙ্কা করি নি তাই ঘটতে যাচ্ছে। পিতাপুত্রীর মতভেদ। আমার বাবা যে আমার কী ছিলেন কেমন করে তা বোঝাবো? আমি শুধু তাঁর দেহের সৃষ্টি নই মনের সৃষ্টিও। তবু দেখ্‌ছি তাঁর কাছে আমাকে বিদ্রোহী হতে হবে।"

কুশল প্রার্থনা করে ও মার্সেল সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করে পরিশেষে উজ্জয়িনী লিখ্‌ল, "চিঠিখানা বড়ই গুরু গম্ভীর হয়ে উঠল এবং আমার বয়স স্মরণ করে আপনি এতে পাকামির গন্ধও পাবেন। কিন্তু জানেন, অল্প বয়স থেকে আমি সঙ্গীমাত্রহীনভাবে একা থেকেছি, তাই আমোদ প্রমোদে ও হাস্যপরিহাসে সময়ক্ষেপ না করে কেবল পড়েছি ও ভেবেছি। অন্যান্য অবয়বের তুলনায় মস্তিস্ক যদি কিছু বেশী পরিণতি পেয়ে থাকে তবে সেটা হয়তো আপনার চোখে বিসদৃশ ঠেক্‌তেও পারে। তা বলে ভাব্‌বেন না যে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র শীর্ণ শুষ্ক খর্ব্ব ক্ষীণ। মাগো, দিনকের দিন এমন মোটা হতে লেগেছি যে আপনার বন্ধু দেখ্‌লে হয় তো এই এক দোষে চিন্‌তে দ্বিধাবোধ কর্‌বেন।"

তাড়াতাড়ি ডাকে না দিলে সে সপ্তাহে যেত না। ডাকে দেবার পর একে একে কত ত্রুটি উজ্জয়িনী স্মৃতিসমুদ্রে নেমে ডুবুরির মতো উপরে তুলল। তাই নিয়ে তার অনুশোচনার অবধি রইল না। নিজের লেখার নিজেই যত কদর্থ করল সব গুলি যে সুধী বাবুও কর্‌বেন তার আর সন্দেহ কী!

এই সময় বাদলের মটো তার চোখের ভিতরে দিয়ে মর্ম্মে প্রবেশ কর্‌ল। "Repentance is a Sin". বটে? উজ্জয়িনী তা হলে পাপ করছে? শাস্ত্রেও বলেছে গতস্য শোচনা নাস্তি। তবু এ দোষ উজ্জয়িনীর স্বভাব থেকে যায় না কেন?

বাদলের দেওয়া বীজমন্ত্রটিকে সে এখন থেকে জীবনের মূলধন স্বরূপ খাটাবে। বাদল তার দীক্ষাগুরু। সে পশ্চাতে ভ্রূক্ষেপ না করে দ্বিধাহীনভাবে এগোতে থাক্‌বে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত। কে কী মনে করবে সে কথা মনে করাই তো অনুশোচনার গোড়ার কথা? আচ্ছা যে যা মনে করে করুক। উজ্জয়িনী যদি ভুলও করে ফেলে তবু অনুশোচনা কর্‌বে না, শুধু ভুলটার সংশোধন যদি সম্ভব হয় তবে কর্‌বে এবং ভবিষ্যতে যাতে অমন ভুল না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখ্‌বে।

৫০

উজ্জয়িনী শ্বশুরকে বল্ল, "বাবা, আমি এখন থেকে নিরামিষ খাবো।"

মহিমচন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। এ মেয়ের মুখে এমন কথা! দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ! এর রক্ত মাংস খুঁড়লে কত রকম অখাদ্য বংশানুক্রমিকভাবে স্তরকে স্তর উদ্ধার করা যায়। এ কিনা বলে নিরামিষ খাবো।

মহিম বলেন, "হা হা হা হা! কে তোমাকে ও মতি দিল, মা? তোমার বয়সে আমরা কী খেতে বাকী রেখেছি? যে বয়সের যেটা। ও সব পাগলামি আরো তিরিশ বছর তুলে রাখো, মা।"

উজ্জয়িনী তার জেদ ছাড়ল না। সে জীবহিংসা কর্‌তে পার্‌বে না, তাতে অশোকের স্মৃতির প্রতি অপমান হয়, বুদ্ধদেবের মহাবোধি-লাভের মর্য্যাদা থাকে না।

মহিমচন্দ্র প্রমাদ গণ্‌লেন। সাহেব সুবোকে বাড়ীতে ডাকার সৌভাগ্য ঘটে উঠ্‌বে না। স্বয়ং হোষ্টেস্ হলেন ভেজিটেরিয়ান। এ মেয়েকে কেউ খেতেও ডাক্‌বে না। সবাই টিটকারী দেবে। বল্‌বে, আই-সি-এসের এমন বৌ? যোগানন্দই বা কী ভাব্‌বেন! ভাববেন, মহিমের কুশিক্ষা।

স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যেতে পারে। বাঘ যদি হঠাৎ নিরামিষাশী হয় তবে কি তার শরীর থাকে?

তবু তিনি মনে মনে খুসীও হলেন। এখন থেকে তাঁকে আর লুকিয়ে সাত্ত্বিক আহার সারতে হবে না।

বল্লেন, "আচ্ছা খাবে খাও, কিন্তু গোঁড়ামি কোরো না। কাউকে খেতে ডাকলে তার সঙ্গে আমিষ খেতে হবে।"

উজ্জয়িনী কথা দিতে না পেরে চুপ করে থাকল। মহিম ভাবলেন ওটা সম্মতির লক্ষণ।

নিরামিষ আরম্ভ করে উজ্জয়িনীর খাওয়া কমে গেল। মুখরোচক হয় না। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে দুধ বা মিষ্টান্নও খায় না। সেই সময়টা ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছিল, উজ্জয়িনীর শারীরিক শক্তিহ্রাসের ছিদ্র পেয়ে উজ্জয়িনীরও হলো।

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। মাথা ব্যথা। অকারণ শীতে গা কাঁপা। উজ্জয়িনী বিছানায় পড়ে না পারে কিছু পড়তে না পারে গুছিয়ে ভাবতে। ডাক্তার দেখে যায়। মহিম বলেন, "নিরামিষ খাওয়া তোমার বয়সে নিরাপদ নয়। এখন থেকে আমি একাই খাবো।"

উজ্জয়িনী চোখ বুজে যাতনায় ছটফট করছিল। বারম্বার পাশ ফিরছিল, গায়ের লেপ পা দিয়ে ঠেলে ফেলছিল ও হাত দিয়ে টেনে তুলছিল। ঝি-রা পা টিপে দিতে আসে, উজ্জয়িনী তাদের ফিরিয়ে দেয়। পরের সেবা নিতে তার প্রবৃত্তি হয় না। আত্মীয়ের সেবা তবু সহ্য হয়।

কে এসে তার শিয়রে বসল ও তার কপালে হাত রেখে উত্তাপের পরিমাপ করল। উজ্জয়িনী চমকে উঠে বল্লে, "কে?" কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় চোখ মেলতে পারল না।

"কে?"

"আমি।"—সলজ্জ কণ্ঠস্বর।

"কে আপনি? মাফ করবেন, চিনতে পারছিনে। মলিনা?"

"বীণা।"

উত্তেজনার আতিশয্যে উজ্জয়িনী এক উদ্যমে উঠে বসল। কিন্তু এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল যে ছিন্নমূল তরুর মতো ভেঙে পড়ল। সেই সুযোগে বীণা তার মাথাটি নিজের কোলের উপর অতি ধীরে তুলে নিল। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করল এবং আবেশে তার শরীর অসাড় হয়ে এলো। তার চুলগুলিকে একত্র করতে করতে বীণা তার মনের কথা নিজের আঙুলের ডগা দিয়ে শুনতে পাচ্ছিল এবং সেই সূত্রে নিজের মনের কথা শুনিয়ে দিচ্ছিল! কোনোপক্ষে বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল। স্বামীর বাড়ী ফেরার সময় হলে বীণা উজ্জয়িনীর কাণের কাছে মুখ নিয়ে তেমনি সলজ্জ স্বরে বল্লে, "কাল আসব।"

উজ্জয়িনীর প্রাণ চাইছিল বীণাকে চিরকালের মতো আটকে রাখতে। বীণার জন্যেই তো তার এই দশা। এ কথা এখনো বীণাকে শোনানো হয় নি। কাল? কালের কত দেরী! সন্ধ্যা হবে, রাত পোহাবে, ভোর হবে, স্বামী শ্বশুরকে খাইয়ে তার পরে বীণা আসবে। অসহ্য। তবু উজ্জয়িনী নির্ব্বিবাদে মাথা সরিয়ে নিল। বল্ল, "বহু ধন্যবাদ।"

বীণা এই হৃদয়হীন ভদ্রতাটুকুর জন্য প্রস্তুত ছিল না। এর উত্তরে যে কী বলতে হয় তাও তার জানা ছিল না। তার শিক্ষা দীক্ষা স্বল্প। কখনো উজ্জয়িনীদের সমাজে মেশেনি। সে ভারি অপ্রস্তুত বোধ করে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। অবশেষে উজ্জয়িনীর মাথার বালিশটা ও গায়ের লেপটা সাজিয়ে দিয়ে মুদিত-নয়নার কাছে করুণনয়নে বিদায় নিল।

পরদিন উজ্জয়িনীর অসুখ অনেকটা সেরে যাওয়ায় উজ্জয়িনী বিছানা ছেড়ে শোবার ঘরেই পায়চারি করছিল। হঠাৎ ঘরের কপাট ঠেলে বীণার প্রবেশ। কপাটে টোকা দিয়ে "আসতে পারি কি?" বলতে হয় একথা বীণার জানা ছিল না। উজ্জয়িনীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখী হয়ে যাওয়ায় সে বিষম অপদস্থ হয়ে চোখ নামালো।

উজ্জয়িনী বল্ল, "বসুন।"

বীণা সংকুচিত হয়ে কোথায় বসবে ঠিক বুঝতে না পেরে উজ্জয়িনীর বিছানার উপর ধপ্ করে বসে পড়ল। বসে একখানা ধর্ম্মগ্রন্থের পাতা উল্টাতে লাগল। দু'একটা জায়গা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়েও ফেল্ল। কিন্তু একটিও কথা বলতে পারল না। "আপনি আজ কেমন বোধ করছেন" পর্য্যন্ত না।

উজ্জয়িনীও কি বলবে ভেবে পেল না। অতিথি

এসেছেন। কিছু খেতে বল্‌বে কি? বস্‌বার ঘরে নিয়ে যাবে? কাল এই অপরিচিতার কাছে একান্ত স্বাভাবিক ভাবে সেবা নিয়েছিল, ভালো ক'রে ধন্যবাদ জানাবে কি? অভাবনীয় ভাবে পরিচয়। কার কাছে খবর পেলেন যে আমার অসুখ করেছে?—কিম্বা এমনি কিছু প্রশ্ন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না। উজ্জয়িনী ঘেমে উঠ্‌ল।

অবশেষে বীণাই কথা পাড়্‌ল। বল্ল, "আপনি বাংলা বই পড়েন?"

উজ্জয়িনী বল্ল, "কেন ও কথা জিজ্ঞাসা করলেন?"

বীণা অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হয়ে মৌন রইল।

উজ্জয়িনী বল্ল, "বাংলা আমারও মাতৃভাষা।"

তবু বীণা কথা বল্ল না। উজ্জয়িনী দেখ্‌ল বীণা আঘাত পেয়েছে। লজ্জিত হয়ে বল্ল, "আপনি বুঝি মনে করেছিলেন আমরা খুব সাহেবীভাবাপন্ন?"

বীণা বল্ল, "লোকে তো তাই বলে।"

"এবার যখন বল্‌বে তখন বিশ্বাস কর্‌বেন না। কেমন?"

"বল্লে আমি বল্‌ব, উনি 'যোগ ও সাধন রহস্য' পড়েন।"

"না, না, ছি, ছি। ও কথা ফাঁস করে দেবেন না আমি বড় লজ্জিত হ'বো।"

"কেন, লজ্জা কিসের? আমিও তো এই রকম বই পড়তে ভালোবাসি। কতগুলো বাজে নাটক নভেল পড়ে লাভ কী!"

"তবে সব নাটক নভেল বাজে নয়। আপনি কি ডিকেন্সের কোনো বই পড়েছেন?"

"আমি ইংরেজী তেমন বুঝ্‌তে পারি নে, ভাই। থার্ড্‌ ক্লাশ অবধি পড়েছিলাম।"

"তবে তো আমার চেয়ে বেশীই পড়েছেন—আমি সিক্স্‌থ ক্লাশ অবধি।"—উজ্জয়িনী ভাব্‌ল এইবার বীণা তাকে সমান ভেবে আত্মীয়তা করবে।

বীণা বল্ল, "তা হলেও ইংরাজী আপনার পরিবারে কুকুর বেড়ালেও ভালো জানে। উনি জানেন কি না আপনার বাবাকে।"

"সত্যি? বাবাকে লিখ্‌ব আমি এ কথা।"

এর পরে দু'জনাতে অনেকক্ষণ ধরে কত যে কথাবার্ত্তা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীলীলাময় রায়

ফাগুনে

শ্রীযুক্ত নবেন্দু বসু

এসেছে ফাগুন গোপনচরণে স্বপনের সম চুপে,
নয়নের পথে ফিরে এলো সে যে অপরূপ নব রূপে।
আজ বরণের শত শত ধার
ছড়ায়ে পড়েছে ভরি চারি ধার,
সহসা নিথর বনভূমি আজ সচকিত পাখীগানে,
মৌন দুপুর নয়ন মেলেছে মৌমাছিদের তানে।
মানবের মাঝে যদি বা রিক্ত, নহি তো জগতে নিঃস্ব—
আছে ফুলভরা শ্যামল ধরণী আলোভরা আছে বিশ্ব।

ভেসে আসে কত স্বপ্ন সুদূর,
কত স্মৃতিকথা গন্ধবিধুর,
আমের মুকুল সৌরভে কত অতীতের কলরোল,
পলাশের বনে আজিকে লেগেছে ফাগুনের ফুলদোল।
মর্ম্মে আমার দোল দিয়ে গেছে উতল বিভোল হাওয়া,
চেয়ে থাকাতেই শেষ হ'ল আজ যত ছিল চাওয়া-পাওয়া।
দৃষ্টি হারায় ঘন নীলিমায়,—
মন ভেসে যায় প্রাণ ভেসে যায়,—

নদী বহে যায় রূপালী ধারায় আজি পূর্ণিমা সাঁঝে,
আজিকে পেতেছি চন্দ্রবাসর আঁধার হিয়ার মাঝে।

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্তা অমিয়া দত্ত

কার্ল্ স্পিট্লার (Carl spitteler)

জন্ম--১৮৪৫ ; মৃত্যু ১৯২৫ ; প্রাইজলাভ—১৯১৯

১৯১৮ সালে সাহিত্যে কাহাকেও নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় নাই। ১৯১৯ সালের নোবেল পুরস্কার সুইট্জারল্যাণ্ডের কবি কার্ল্ স্পিটলার প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে লাভ করেন। লিষ্টালে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর পিতা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। জাতিতে সুইস্ হইলেও ইহাঁর সমস্ত লেখাই জার্ম্মাণ ভাষায়।



কার্ল স্পিট্লার

অল্প বয়সেই সঙ্গীতে ও চিত্রকলায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার নিজের চিত্রকর হইবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও পিতার আপত্তিতে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি এজন্য দুঃখিত ছিলেন। পড়াশুনা শেষ করিয়া স্পিট্লার প্রায় আট বৎসর রুশিয়া ও ফিন্ল্যাণ্ডে দুইটি রুষ পরিবারে গৃহ শিক্ষকের কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য "প্রমিথিয়ুস ও এপিমিথিয়ুস" রচনা করেন ও প্রথমে তাহা ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। প্রমিথিয়ুস একটি মহান্ আত্মার কাহিনী। আদর্শ ও ন্যায়ের জন্য সে আত্মা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করিতে প্রস্তুত। ভাবের গভীরতায় সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে এই কাব্য অতুলনীয়। অনেকের মতে ইহাতে তিনি প্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক নীট্শের **Thus Spake Zarathustra** গ্রন্থখানির অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু স্পিট্লার একখানি পুস্তিকা লিখিয়া ইহার প্রতিবাদ করেন ও বলেন যে প্রমিথিয়ুস লিখিবার পূর্ব্বে তিনি নীট্শের উপরোক্ত পুস্তকখানি পড়েন নাই।

১৮৮৩ সালে স্পিট্লার বিবাহ করেন। ইহার অল্পদিন পরেই "প্রজাপতি" নামে তাঁহার একখানি গীতি-কবিতার পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার ছন্দ-বৈচিত্র্য ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা উল্লেখযোগ্য। বিবাহের বৎসর দুই পূর্ব্বে স্পিট্লার টাকাকড়ি সম্বন্ধে স্বাধীন হন ও চাকরী ছাড়িয়া ল্যুজার্ণে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে থাকেন। এখানকার রমণীয় দৃশ্য তাঁহার কবিচিত্তে নূতন প্রেরণা আনে। "Laughing Truth" এই সময়ের লেখা। ইহা কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। ইহাতে নানাবিষয়ের সমালোচনা আছে। সত্য কথাকে তিনি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আবরণে ঢাকিয়া বলিয়াছেন। বিখ্যাত দার্শনিক নীট্শে প্রবন্ধগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

স্পিট্লারের রচনাবলীর ভিতর "অলিম্পিয়ার বসন্ত" (Olympian Spring) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। এই সুবৃহৎ মহাকাব্যে পাঁচটী খণ্ড ও ত্রিশটী কাণ্ড আছে। ইহাতে পৌরাণিক কাহিনীর সহিত

আধুনিক ভাব ও রূপ, সমস্যা ও ব্যঙ্গ একত্রে মিলিয়াছে। দুঃখ, কষ্ট ও নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া আত্মার বিজয় কাহিনী কাব্যগুলির মূল বর্ণনীয় বিষয়। সমালোচকগণ "অলিম্পিয়ার বসন্ত"কে "নবযুগের ডিভাইন কমেডী" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

গল্পরচনার ভিতর তাঁহার "লেপ্টেন্যাণ্ট কন্‌রাড" ও "ইম্যাগো" সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। জীবনের শেষভাগে তিনি পুনরায় "প্রমিথিয়ুস" নামে একখানি কাব্য লেখেন। মূল বিষয় এক হইলেও ইহা তাঁহার শেষ গ্রন্থ।

"বাল্যস্মৃতি" শিশুমনস্তত্ত্বের সুন্দর ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য চিত্র। তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সের সঙ্গেই গ্রন্থের সমাপ্তি। এরূপ পুস্তক বিশ্বসাহিত্যে অতি অল্পই আছে।

ফ্রান্সে ও জার্মানীতে স্পিট্‌লার যথেষ্ট সমাদৃত ছিলেন। তবে গত ইউরোপীয় মহাসমরের সময়ে বেল্‌জিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করায় তিনি জার্ম্মাণীর বিপক্ষে দু'চার কথা বলেন, ও সেজন্য জার্ম্মানরা তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠে। কিন্তু স্পিট্‌লার ইহাতে বিচলিত হন নাই। নিন্দা ও প্রশংসায় সমান ভাবে অবিচলিত থাকিতেন।

তিনি নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন। রাজনীতি, সাহিত্য বা ধর্ম্ম কোন দলের সঙ্গেই তাঁহার কোন যোগ ছিল না। দুই কন্যা ও পত্নীর সহিত তাঁহার দিনগুলি আনন্দেই কাটিত। তিনি গম্ভীর-প্রকৃতি ও মিষ্টভাষী ছিলেন। নারীজাতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার পুস্তকের অনুবাদ অতি অল্প ভাষাতেই হইয়াছে। ইংরাজীতে তাঁহার মাত্র দু'তিনখানি পুস্তকের তর্জ্জমা পাওয়া যায়। অসাধারণ প্রতিভাশালী হইলেও তাঁহার রচনার সহিত বেশী লোকের পরিচয় না থাকার ইহাই প্রধান কারণ।

১৯২৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর স্পিট্‌লারের মৃত্যু হয়। মনীষী রোম্যা রোলাঁ বলেন "স্পিট্‌লার বর্ত্তমান ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি। জার্ম্মান সাহিত্যে গ্যয়টের পর এরূপ প্রতিভাবান কবি কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইংরাজ কবি মিল্‌টনের সহিত তিনি একাসন পাইবার অধিকারী।"

ন্যুট হাম্‌সুন (Knut Hamsun)

জন্ম—১৮৬০; প্রাইজলাভ—১৯২০

নরওয়ের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ন্যুট হাম্‌সুনের নাম বিশ্ব-সাহিত্যে সুপরিচিত। ইনি কৃষকপুত্র। ইঁহার পিতামহ কর্ম্মকারের কার্য্য করিতেন পিতার অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল থাকায় অল্প বয়সেই পড়াশুনা ছাড়িয়া হাম্‌সুন জুতার দোকানে শিক্ষানবিশী করিবার জন্য ভর্ত্তি হন। সাহিত্যের উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি গোপনে কবিতা ও গল্প লিখিতেন। ১৮৭৮ সালে তাঁহার প্রথম উপন্যাস ও কবিতার বই প্রকাশিত হয়।

অল্পদিন পরেই মুচীর কাজ তাঁহার ভালো না লাগায় তিনি দেশ ছাড়িয়া আমেরিকা যাত্রা করেন। তাঁহার আশা ছিল যে আমেরিকায় তিনি সাহিত্য-সাধনার সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন। সেখানে তিনি ট্রামের কণ্ডাক্টার, ক্ষেতের মজুর, মাংসের দোকানের কেরাণী প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ের অভিজ্ঞতার কিছু কিছু পরিচয় তাঁহার "Wanderer" নামক পুস্তকখানিতে পওয়া যায়।

১৮৮৫ সালে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু অর্থের অভাবে এরূপ বিপন্ন হইয়া পড়েন যে আত্মহত্যারও চেষ্টা করিয়াছিলেন! পরিশেষে সাহিত্যকে উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করেন। কোপেনহেগেনের এক-খানি সংবাদ পত্রে তাঁহার আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস "ক্ষুধা" (Hunger) প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রিষ্টিয়ানিয়ার একটি যুবকের দারুণ অভাব ও কষ্টের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম এই গল্পের বর্ণনীয় বিষয়।

Growth of the Soil হাম্‌সুনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহা লিখিয়াই তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। "পল্লীতে ফিরিয়া যাও" ইহাই এই অনুপম নরওয়েজিয়ান উপন্যাসের মূল কথা। আইজ্যাকের চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিপুণ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিরূপে একটি জনমানবশূন্য অনুর্ব্বর জায়গায় একটি পুরুষ ও একটি নারী কেবলমাত্র

অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়া সেখানে লোক-বসতির সূত্রপাত করিল, তাহার বিবরণ পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ইহা কৃষক-জীবনের অমর চিত্র!

তাহার অন্যতম প্রধান উপন্যাস "Mysteries"এর নায়ক জোহান নাজেল এক পাদ্রীর তরুণী কন্যার প্রেমে পড়ে। নানারূপ দুঃখ ও কষ্ট ভোগের পর সে অবশেষে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়ায়। মানুষ অপেক্ষা প্রকৃতির নিকটেই সে বেশী শান্তি পাইত। হামসুনের মত সেও



নুট্ হামসুন

সমাজের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বিফল-প্রযত্ন হইয়া অসুখী হয়।

"প্যান" একটি মধুর ও করুণ প্রেমের গল্প। ইহার নায়ক নিজের কুটীরে ও নির্জ্জন অরণ্যে সুখী থাকিলেও মানুষের সংস্পর্শে আসিলেই দুঃখ পায়। নায়িকা এড্‌ভারডা চঞ্চল প্রকৃতির নারী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পাঠকের সহানুভূতি উদ্রেক করে।

নাটক রচনাতেও হামসুন যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার "রাণী তামারা" "ধনীর দুয়ারে" "Munken Vendt" প্রভৃতি নাটক দেশবিদেশে সমাদৃত হইয়াছে। কিন্তু নাট্য-কলার উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ নাই।

১৯০৯ সালে প্রকাশিত তাঁহার "Childern of the Ago" বিশেষ জনপ্রিয় হয়। অবসর প্রাপ্ত লেপ্টেন্যাণ্ট Willatyএর চরিত্র ও ধনীকন্যা নিজের পত্নীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত স্বাভাবিক। শেষ দিনগুলির দুর্দ্দম গর্ব্ব ও নিঃসঙ্গতা উচ্চঅঙ্গের কলা নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

হামসুনের উপন্যাসের ভিতর বাস্তবের সহিত ভাবপ্রবণতা ও অজানা রহস্যের মিলন দেখা যায়। মনস্তত্ব-বিশ্লেষণ ও আধুনিক জীবনের দোষ-ত্রুটী নির্দ্দেশ করিতে তিনি যথেষ্ট বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপেও তাঁহার ক্ষমতা কম নয়। দোষের মধ্যে তাঁহার রচনা অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে। একজন সমালোচক বলেন "প্রথম হইতেই হামসুনের রক্তে শিল্পী ও ভবঘুরের প্রভাব সমান প্রবল"। কিন্তু ভবঘুরে হইলেও তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও দেশবাসীদিগের উপর মমতা অত্যন্ত গভীর। তিনি আশাবাদী নহেন। কিন্তু তাঁহার মতে একাগ্রচিত্তে কাজ করিয়া যাওয়া এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও সাহস অক্ষুণ্ণ রাখা প্রত্যেক মানুষের কর্ত্তব্য।

সর্ব্বসমেত হামসুন প্রায় চল্লিশখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী নানা ভাষায় অনূদিত ও বহুলভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার পঞ্চাশৎ জন্ম দিনে নরওয়ের লোক তাঁহাকে ঋষি ও জীবিত লেখকদিগের ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিনন্দিত করে। বিশ্ব-সাহিত্যে তিনি একজন প্রতিভাবান শিল্পী।

হামসুনের ব্যক্তিত্ব, রচনা ও দর্শন সম্বন্ধে অধ্যাপক J. Wiehr এর 'Knut Hamsun; His Personality and his Outlook upon Life" নামক পুস্তকখানি উল্লেখযোগ্য।

আনাতোল্ ফ্রাঁস (Anatole France)

জন্ম—১৮৪৪; মৃত্যু—১৯২৪; প্রাইজলাভ—১৯২১।

জগদ্বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁসের স্থান বিশ্ব-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৮৪৪ সালের ১৬ই এপ্রিল

প্যারী সহরে তাঁহার জন্ম। তাঁহার প্রকৃত নাম জ্যাক আনাতোল তিবো। দেশপ্রীতির জন্য তিনি ফ্রাঁস নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পুস্তকব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি পুস্তক-বিক্রয় অপেক্ষা পুস্তক-পাঠেই বেশী মনোযোগ দিতেন বলিয়া ব্যবসায়ে সেরূপ উন্নতি করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ও ভক্ত ক্যাথলিক ছিলেন। তাঁহার দোকানে গ্রন্থকার, পণ্ডিত, দার্শনিক প্রভৃতি বহুবিধ লোকের সমাগম হইত। বালক আনাতোল্



আনাতোল ফ্রাঁস্

এই আবহাওয়ার মধ্যেই বর্দ্ধিত হন। পুস্তকের উপর তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁহার অনেক উপন্যাসে তিনি বাল্য-কালের ও তাঁহার পিতার পুস্তকালয়ের বর্ণনা করিয়াছেন।

ধনী না হইলেও ফ্রাঁসের পিতামাতা তাঁহাকে উচ্চ-শিক্ষিত করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি সাহিত্য-অনুরাগী। ১৮৬৮ সালে ২৪ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি কবি অ্যালফ্রেড ডি ভিঙ্‌নির জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কথিত আছে যে ইহার দুই বৎসর পরে তিনি যখন সৈনিক হইয়া যুদ্ধে যান, তখন রণক্ষেত্রে অজস্র গোলাগুলিবর্ষণের মধ্যেও ভার্জ্জিলের কাব্যপাঠে মগ্ন থাকিতেন। মাঝে মাঝে বাঁশীও বাজাইতেন।

প্রুশিয়া যুদ্ধের পর তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ১৮৮১ সালে তাঁহার প্রথম প্রসিদ্ধ উপন্যাস "সিল-ভেষ্টার বনার্ডের অপরাধ" প্রকাশিত হয় ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। ইহা হইতেই তাঁহার পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির সূত্রপাত। উক্ত উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু অল্প, গল্পাংশও সাধাসিধা, কিন্তু অত্যন্ত মধুর ও মনোমুগ্ধকর। সুপণ্ডিত, নিঃসঙ্গ ও বৃদ্ধ বনার্ডের চরিত্র অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার সহিত একবার পরিচয় সাধন করিলে তাঁহাকে ভালো না বাসিয়া থাকা অসম্ভব। যৌবনের মানসী ক্লেমেনটাইন তখনও তাঁহার মনের উপর আধিপত্য করিতেছে। তাঁহার কন্যার জন্য তাঁহার স্নেহ ও আত্মত্যাগ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহু সমালোচকের মতে এখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মানবমনের উচ্চতম বৃত্তিগুলি ইহাতে নিপুণতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাস "Thais"এ আত্মা ও বিষয়-বুদ্ধির চিরন্তন সংগ্রাম বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং এক-বার বলিয়াছিলেন যে প্রথমোক্ত উপন্যাসখানি তিনি জন-সাধারণের তুষ্টির জন্য লিখিয়াছেন, কিন্তু শেষোক্তটি তাঁহার নিজের সন্তুষ্টির জন্য রচিত হইয়াছে।

ফ্রাঁসের অন্যান্য প্রসিদ্ধ উপন্যাসের ভিতর "Penguin Island" "The Opinions of Jerome Coignard" "The White Stone" "The Revolt of the Angels" প্রভৃতি পুস্তকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাস ব্যতীত ফ্রাঁস কতকগুলি উচ্চাঙ্গের সমালোচনা-পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি একজন সুদক্ষ সমালোচক। ইংরাজীতে তাঁহার চার খণ্ড সমালোচনার পুস্তক "সাহিত্য ও জীবন" (On Life and Letters) নামে অনূদিত হইয়াছে। এগুলি এরূপ সরস ও সুন্দরভাবে লেখা যে পড়িবার সময় মনে হয় কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত আলোচনা

করিতেছি। ফরাসী-সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে স াঁ বুভের পরেই তাঁহার স্থান বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ফ্র াঁসের দান অল্প নয়। অনেকে তাঁহাকে রেন াঁর শিষ্য ও উত্তরাধিকারী বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার "জোয়ান অব্ আর্কের জীবনী" নানাভাষায় অনূদিত ও প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির ভিতর ইহা অন্যতম।

ফ্র াঁসের জীবনে তাঁহার মাতার পরেই প্যারী সহরের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। অল্প বয়স হইতেই তিনি প্যারীর ছোট বড় রাস্তা, দোকান, উৎসব, সমাজ ও দারিদ্র্য প্রভৃতির সহিত পরিচিত হন। তাঁহার লেখায় প্যারী সহরের ফটোগ্রাফের মত সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

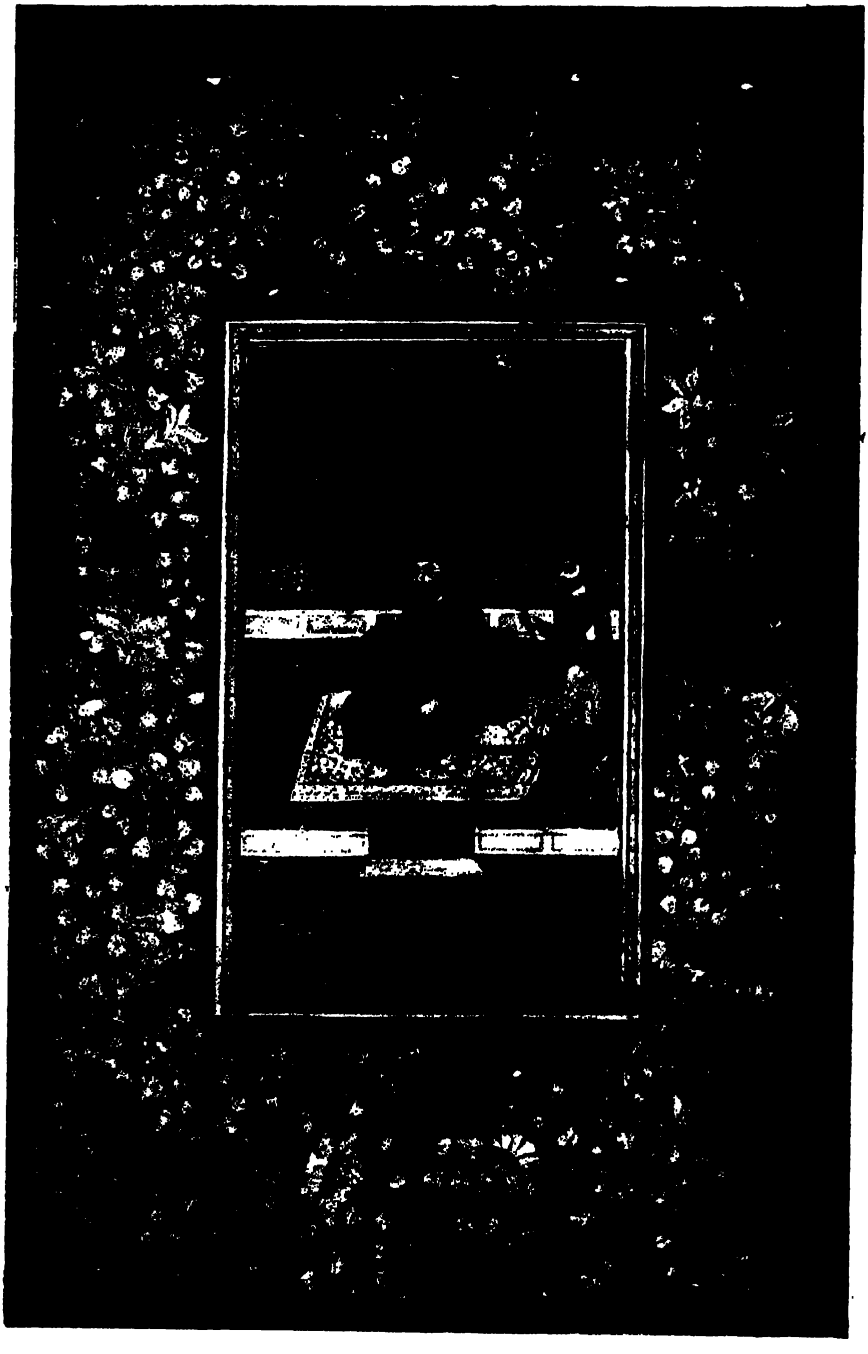
তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। জীবনে তিনি জ্ঞান ও যুক্তিকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্মান করিতেন। কৌতুকপ্রিয়তা এবং ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি সৌন্দর্য্যের পূজারী। ভণ্ডামী ও কপটতাকে একান্তভাবে ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তাঁহার ঘৃণা মৃদুর্ভৎসনা ও পরিহাসেই পর্য্যবসিত, ক্রোধে উত্তেজিত নয়। তাঁহার প্রতিভা সমালোচকের ও তত্ত্বান্বেষীর। উপন্যাসগুলিকে তিনি সুকৌশলে তাঁহার চিন্তা ও মতামত ব্যক্ত করিবার উপায়-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং লিখিবার ভঙ্গী মনোরম। নির্ম্মল মন, অগাধ পাণ্ডিত্য, দীপ্তিশীল কল্পনা, মনোজ্ঞ দর্শন প্রভৃতি গুণ তাঁহার রচনাকে চিরন্তন করিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন।

পরিণত বয়সে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সমর্থন করিতেন। নোবেল পুরস্কারে প্রাপ্ত সমস্ত টাকাই তিনি রুশীয় দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ দান করেন; রুস প্রজাদের উপর তাঁহার অসাধারণ সহানুভূতির ইহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আনাতোল্ ফ্র াঁসের জীবন ও রচনা সম্বন্ধে ইংরাজ লেখক J. Lewis May লিখিত 'Anatole France" উল্লেখযোগ্য। ফরাসী ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে বহু পুস্তক আছে। তন্মধ্যে কয়েকখানির ইংরাজী অনুবাদও পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমিয়া দত্ত





বিচিত্রা

শের-সাহ

[প্রাচীন মোগল চিত্র]

ফাল্গুন, ১৩৩৭

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহ হইতে

সম্রাট অশোকের গিরিলিপি

শ্রীযুক্ত অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস

(অপ্রধান লিপি)

কিছুকাল পূর্ব্বে বিচিত্রায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সম্রাট অশোকের গিরিলিপিগুলির কথা বলিয়াছি। তাহাতে আটটি আবিষ্কৃত এবং একটি অনাবিষ্কৃত শিলালিপির পরিচয় দিয়াছি। ঐগুলি মূল বা প্রধান গিরিলিপি নামে পণ্ডিত সমাজে পরিচিত। এবারে ক্ষুদ্র বা অপ্রধান লিপি নামে পরিচিত অনুশাসন গুলির (Minor Rock Edicts) কথা বলা যাইতেছে। এগুলি সংখ্যাতে ছুইটি; তদ্ভিন্ন ভাবরা লিপি নামে খ্যাত আর একটি অনুশাসনকে এই পর্য্যায়ে ধরা যাইতে পারে। অপ্রধান লিপিগুলি নিম্নকথিত সাতটী বিভিন্ন স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে,—জয়পুর রাজ্যে বৈরাট, সাহাবাদ জেলায় সাসেরাম, জব্বলপুর জেলায় রূপনাথ, মহীশুর রাজ্যে ব্রহ্মগিরি, সিদ্ধপুর ও জটিঙ্গা-রামেশ্বর এবং নিজাম রাজ্যে মস্কি। নাম হইতেই প্রকাশ, ভাবরা অনুশান ভাবরা (বা বৈরাট) নামক স্থানে আবিষ্কৃত। প্রথমে এইটির কথাই বলা যাইতেছে।

ভাবরা :—বৈরাট নগরে অশোকের ছুইটি অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী প্রথম অপ্রধানলিপির অন্যতম সংস্করণ এবং দ্বিতীয়টী অপর এক স্বতন্ত্র অনুশাসন। শেষেরটাই প্রথম পাওয়া গিয়াছিল এবং প্রথমটী হইতে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ইহা ভাবরা অনুশাসন নামে অভিহিত।

রাজপুতানার জয়পুর রাজ্যে তোড়বাটি তালুকে বৈরাট নামে একটি প্রাচীন নগর আছে। জয়পুর হইতে ৪১ মাইল উত্তরে এবং আলোয়ার হইতে ২৫ মাইল পশ্চিমে ইহার অবস্থান। ভাবরুর (ভাবরা নামটী চলিয়া গেলেও প্রকৃত নাম ভাবরু) ছাউনী হইতে ইহার দূরত্ব ১২ মাইল। তাই ঐ নামেই এথানে প্রাপ্ত প্রথম লেখাটী পরিচিত। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের নিকট এ কথা অজানা নয় যে, রাজপুতানার এতদঞ্চলই প্রাচীন মৎস্যদেশ। আধুনিক যুগের এই বৈরাট নগরকেই প্রাচীন মৎস্যরাজধানী বিরাটপুরীর বর্ত্তমান নিদর্শন বলিয়া পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রাচীন বিরাট নগরীর যে ধ্বংসাবশেষ এখন দৃষ্ট হয় তাহা দৈর্ঘ্যে এক মাইল, প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল এবং পরিধিতে প্রায় আড়াই মাইল হইবে। ইহার চতুর্থাংশ পরিমিত স্থানে বর্ত্তমান নগর অবস্থিত। তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টক খণ্ড, ও তাম্রপাত্রের ভগ্ন খণ্ডসমূহে পরিব্যাপ্ত। উপত্যকার সাধারণ দৃশ্য রক্তাভ তাম্রবর্ণ। এখানকার মাটিতে তাম্রের অস্তিত্ব সহজেই অবগত হওয়া যায়। কিম্বদন্তী অনুসারে প্রাচীন বিরাট নগরী বহুকাল পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছিল। দীর্ঘকাল জনশূন্য থাকার পর আবার আকবর সাহের আমলে এখানে মনুষ্যবসতি আরম্ভ হইয়াছে। "আইন-ই-আকবরী"তে বিরাটনগরের এবং তত্রস্থ তাম্রখনির উল্লেখ পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পর্য্যটক হিউয়েন সঙ্গ বিরাট নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বিবরণ হইতে বৈরাটের তাৎকালীন অবস্থা জানা যায়। তাহার পর বৈরাটের নাম পাওয়া যায় গজনীর সুলতান মামুদের সময়ে। তাঁহারই সময়ে এই সুপ্রাচীন নগরের ধ্বংস সাধিত হয়। মামুদের অন্যতম সেনানায়ক আমীর আলি কর্তৃক এই নগর অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয় এবং অধিবাসীরা নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। আবু রিহান বা অল্-বেরুণী ও উৎবী নামক ছুইজন খ্যাতনামা সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকের রচিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নগর লুণ্ঠনকালে আমীর আলি একটী পুরাতন শিলালিপি দেখিয়াছিলেন। আবু রিহান বলেন তাহাতে লেখা ছিল

যে, ঐ নগরে অবস্থিত নারায়ণদেবের মন্দির চল্লিশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য তখন ঐ প্রাচীনলিপি কেহই পড়িতে পারিত না—আমীর আলি যাহাকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সে একটা মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিল। বৈরাটে প্রাপ্ত অশোক অনুশাসন দুইটির কোনটাই আমীর আলি-দৃষ্ট শিলালিপি কিনা তাহা সঠিক বলিবার কোনই উপায় নাই। দেববিগ্রহ ও মন্দিরধ্বংসব্রতী মুসলমান সেনার হস্ত হইতে ঐ পুরাতন লিপিটী রক্ষা পাইয়াছিল কিনা তাহাও জানা যায়না।

বৈরাট নগরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় একমাইল দূরে "বিজক পাহাড়" নামে একটি ছোট পাহাড় আছে—তাহার উচ্চতা প্রায় দুইশত ফুট হইবে। "বিজক" কথাটার অর্থ লেখা-যুক্ত। এই পাহাড়েই অশোকের প্রথম লিপিটী আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাই ইহার এরূপ সংজ্ঞা হইয়াছে। ধূসর বর্ণের সুবৃহৎ গ্রাণাইট প্রস্তরের চাঙ্গড়ে এই পাহাড়টী গঠিত, মধ্যে মধ্যে ঈষৎ লালাভ বর্ণের অপেক্ষাকৃত ছোট প্রস্তরখণ্ডও দেখা যায়। পাহাড়ের উপরে দুইটি বিস্তীর্ণ ইষ্টকচত্বরের ভগ্ন নিদর্শন দেখা যায়। চত্বর দুইটিই দৈর্ঘ্যে প্রায় একশত হস্ত হইবে, ইষ্টকখণ্ড এবং প্রাচীরের ভগ্নাবশেষে চত্বর দুটি সমাকীর্ণ। দেখিলে স্বতঃই এদুটিকে কোন বিশাল হর্ম্মের ভগ্নাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ইষ্টকগুলিও খুব বড়, প্রায় ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৪ ইঞ্চি পুরু হইবে। ইহাও ইহাদের প্রাচীনত্বের অন্যতম নিদর্শন। পর্ব্বতগাত্রে এখনও সোপানশ্রেণী এবং প্রবেশপথের চিহ্ন দেখা যায়। একটি চত্বর অপরটী অপেক্ষা প্রায় ২০ হস্ত উর্দ্ধে পর্ব্বত-পৃষ্ঠে অবস্থিত। পাহাড়ের উপরে নীচে চারিদিকই ইষ্টকখণ্ড এবং ভগ্ন প্রাচীরাদির ধ্বংসাবশেষে সমাচ্ছন্ন। তাই মনে হয় এককালে এখানে বহুসংখ্যক সৌধহর্ম্ম্যাদি ছিল। হিউয়েনসঙ্গ বিরাট নগরে আটটি সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বিজাক পাহাড়ের উপরের ধ্বংসরাশি তাহারই দুইটির নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বা অপেক্ষাকৃত নিম্নের চত্বরটীর উপরে স্থাপিত রক্তাভ ধূসর বর্ণের একখণ্ড গ্রাণাইট পাথরে উৎকীর্ণ এই অনুশাসনটি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মেজর বার্ট নামক জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার গৃহীত প্রতিলিপি হইতে বর্ণুফ এবং উইলসন উভয়ে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন ; বর্ত্তমানে তাহার অনেকাংশ ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ভাবরা অনুশাসনটি অন্যান্য অশোক-অনুশাসনের ন্যায় পর্ব্বত বা গণ্ডশৈলগাত্রে উৎকীর্ণ নহে ; একখণ্ড প্রস্তরপৃষ্ঠে ইহা ক্ষোদিত হইয়াছিল। জয়পুরের মহারাজা বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিকে ঐ প্রস্তরখণ্ড উপহার প্রদান করেন ; বর্ত্তমানে উহা এসিয়াটিক সোসাইটির কলিকাতায় পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে রক্ষিত আছে। এ কারণ ডাঃ হুলজ্ সম্পাদিত আধুনিকতন "অশোক অনুশাসন" গ্রন্থে (১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) ভাবরা অনুশাসন নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং উহা "কলিকাতা বৈরাট শিলালিপি" নামে অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাবরা কথাটী অশুদ্ধ এবং বৈরাট হইতে ভাবরু অনেকদূরে অবস্থিত। এইজন্য ভাবরার নামে অনুশাসনটী পরিচিত হওয়া অনুচিত হইলেও, প্রায় শতবর্ষ ধরিয়াই যে নাম চলিয়া আসিতেছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহার সেই নামই প্রদত্ত হইল।

আর এক বিষয়েও ভাবরা লিপির অভিনবত্ব আছে ; অদ্যাপিও অপর কোন স্থান হইতে ইহার আর এক সংস্করণ বাহির হয় নাই। এটি সম্রাট অশোকের প্রথম ক্ষুদ্র বা অপ্রধান গিরিলিপির সমসাময়িক। সে হিসাবে রাজত্বের ত্রয়োদশবর্ষ ইহার প্রচারকাল। অশোক প্রথম ক্ষুদ্র গিরিলিপিতে স্বকীয় ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস এবং ভাবরার অনুশাসনে শ্রমণগণের পরিচালনের বিধিব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবের তথা তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রতি অশোকের যে কিরূপ ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ ছিল, ভাবরালিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অশোকের মতামতও ইহাতে বেশ পরিস্ফুট। বৌদ্ধধর্ম্ম অশোকের হৃদয়ে যে কিরূপ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল এবং ভগবান তথাগতের উপদেশবাণীই যে তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল তাহা ভাবরা অনুশাসন পাঠে বেশ বুঝা যায়। এই অনুশাসনে অশোক বুদ্ধদেবের সুভাষিত, ধর্ম্মের সোপান

বলিয়া উল্লিখিত, বৌদ্ধশাস্ত্রের কয়েকটা পাঠ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকাগণের পর্য্যালোচনা ও তদ্বৎ আচরণের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ভক্তি এবং বিশ্বাসের সহিত অশোক বুদ্ধদেব এবং তাঁহার বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন জগতের ইতিহাসে তাহা একান্তই দুর্ল্লভ। বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণ অশোক নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রসমূহের স্বরূপ এইরূপে নির্ণয় করেন।

বিনয়সমুকসে—পণ্ডিতগণ প্রথমে কোন্ বিশেষ শাস্ত্রাংশ অশোক এই পদটী দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রীজ ডেভিড্‌সের মতে বিনয়সমুকসে কথাটি কোন ধর্ম্মগ্রন্থের অংশবিশেষের নামরূপে অথবা কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। অন্য অনেকে আবার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের জন্য নিয়মাবলীযুক্ত বিনয়পিটকের অন্তর্গত কোন সূত্ত অশোক নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে "তুবট্‌ঠক সূত্ত" বিনয়সমুকসের নামান্তর বলিয়া স্থির হইয়াছে।

অলিয়বসানি—অঙ্গুত্তার নিকায় ২.২৭
অনাগতভয়ানি—অঙ্গুত্তারনিকায় ৩.১০৩
মুনিগাথা—সুত্তনিপাৎ—২০৬-২২০ শ্লোক
মোনেয়সুতে—সুত্তনিপাৎ ১৩১-৩৪
উপতিসপসিন—মঝ্‌ঝিমনিকায় ১.১৪৬-১৫১
লাঘুলোবাদ—রাহুলোবাদসুত্ত—মঝ্‌ঝিমনিকায় ১.৪১৮-২০.

পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ অশোকনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রাংশগুলিকে নানারূপে নির্ণয় করিতেন। কিন্তু সে সকল সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়া বর্ত্তমানে যে মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারই কথা শুধু এখানে বলা গেল।

অশোক-অনুশাসন মধ্যে এই সকল বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের নাম দেখিয়া পূর্ব্বতন পণ্ডিতসমাজ বড় বিপদেই পড়িয়াছিলেন। তখনকার দিনে পণ্ডিতেরা বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহকে অতটা প্রাচীনত্ব দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন—অথচ এরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণকে অস্বীকার করাও শক্ত ছিল। তাঁহাদের বড়ই বিপদ তখন হইয়াছিল। এক্ষণে আর কেহ একথা বলিতে সাহস করে না যে অশোকের সময়ে বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ রচিত হয় নাই। ভাবরা লিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মগধদেশীয় সঙ্ঘকে অভিবাদন করিয়া প্রচারিত এই অনুশাসন হইতে কোন কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিত মনে করেন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান সকল সঙ্ঘেই বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত মার্গে অশোকের দৃঢ়ভক্তির পরিচায়ক এই অনুশাসনের এক একটী প্রতিলিপি রক্ষিত হইয়াছিল। কালক্রমে হয়ত অপর কোন স্থান হইতে এই অনুশাসনের অপর এক সংস্করণ বাহির হইতেও পারে; কিন্তু বর্ত্তমানে শুধু ভাবরার অনুশাসনটীই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লেখাটী সম্বন্ধে পরলোকগত ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথেরও নিজস্ব একটি মত ছিল। তাঁহার মতে বৌদ্ধভিক্ষুর পক্ষে সংসারে আবার ফিরিয়া যাওয়া খুবই সহজ; রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া সম্রাট অশোক মধ্যে মধ্যে সঙ্ঘে প্রবেশ করিতেন এবং কিছুকাল পরে রাজদণ্ড পুনর্গ্রহণ করিতেন। ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে এইরূপ কোন এক সময়ে ভাবরার বিহারে অবস্থানকালে অশোক প্রথম অপ্রধান গিরিলিপিতে নিজ ধর্ম্মজীবনের বিবরণ এবং ভাবরালিপিতে শ্রমণগণের পরিচালনের বিধিব্যবস্থা প্রচার করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য বৈরাটের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে উভয় অনুশাসনের আবিষ্কার এবং ভাবরার লেখামধ্যে মাগধসঙ্ঘের উল্লেখ ব্যতীত এ প্রকার অনুমানের স্বপক্ষে অপর কোন বলবৎ প্রমাণ দেখা যায় না।

এবারে বৈরাটে প্রাপ্ত অশোকের দ্বিতীয় লিপির কথা বলিব। এটী অশোকের প্রথম ক্ষুদ্র বা অপ্রধান গিরিলিপির অন্যতম সংস্করণ। এ ধরণের লেখা সাসারাম, রূপনাথ প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিরাট নগরের এক মাইল উত্তরে "ভিজগিরি" নামে অভিহিত দীর্ঘ অনুচ্চ একটি গণ্ডশৈল আছে। পাহাড়ে বৃক্ষলতার অস্তিত্ব দেখা যায় না। নিতান্ত ভীষণদর্শন ঘন কৃষ্ণবর্ণ কঠিন প্রস্তরের সুবৃহৎ খণ্ডসমূহ স্তরে স্তরে ন্যস্ত দেখিলেই মনে হয় যেন কোন অতিকায় দৈত্যশিশু ক্রীড়াচ্ছলে এই পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়াছে। সাধারণের নিকট পাহাড়টী পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস-কাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট। পাহাড়ে প্রকাণ্ড

একটী কৃত্রিম গুহা আছে, তাহা "ভীম কা গোকা" নামে পরিচিত। অপরাপর পাণ্ডবভ্রাতৃগণের নামে অভিহিত অপেক্ষাকৃত ছোট আরও কয়েকটী গুহা এখানে ছিল বলিয়া শুনা যায়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তদানীন্তন ডাইরেক্টর জেনারেল সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম অপর কোন প্রাচীনলিপি এখানে আছে কি না দেখিবার জন্য এই পাহাড়ের উপরের প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ড বিশেষ যত্ন-সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্যতম সহকারী কারলাইল সাহেবের ভাগ্য তাঁহার অপেক্ষা ভাল। পাহাড়ের দক্ষিণস্থিত বৃহৎ এক প্রস্তরখণ্ডের গাত্রে উৎকীর্ণ অশোকের এই অনুশাসনটী আবিষ্কারের যশোলাভ তাঁহারই অদৃষ্টে ঘটে। প্রস্তরখণ্ডটী খুব বড়; উহা দৈর্ঘ্যে ১৬ হাত, উচ্চতায় প্রায় ১২ হাত এবং বিস্তারে ১০ হাত হইবে। উহার দক্ষিণগাত্রে আট লাইনে লেখাটী উৎকীর্ণ। অক্ষরগুলি বেশ বড় বড়, প্রায় ২॥০ ইঞ্চি দীর্ঘ হইবে। দীর্ঘ দ্বিসহস্রবর্ষেরও অধিক কাল ধরিয়া রৌদ্রবৃষ্টিতে পড়িয়া থাকার ফলে প্রস্তরগাত্রের বহুলাংশে ক্ষতি হইয়াছে। তজ্জন্য লেখাটীর মধ্যভাগের প্রায় একফুট পরিমাণ অংশ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একই প্রস্তরখণ্ডে দুইটি বিভিন্ন অনুশাসন ক্ষোদিত রহিয়াছে। প্রথম আবিষ্কারকালে কারলাইলও তাহাই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া কানিংহাম বুঝিতে পারিলেন যে তাহা নহে, একই লেখার মধ্যদেশ নষ্ট হওয়ায় এরূপ দাঁড়াইয়াছে; এবং এই নবাবিষ্কৃত অনুশাসন সাসারাম ও রূপনাথ লিপিরই মূলতঃ অপর এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র; পদবিন্যাসে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও তজ্জন্য তাৎপর্য্য গ্রহণে কোনই বাধা বা অসুবিধা হয় না।

সাসারাম:—বিহার প্রদেশের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলার সাসারাম মহকুমার সদর ষ্টেসনের নামও সাসারাম। গয়া হইতে মোগলসরাই যাইবার পথে গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে সাসারাম একটি ষ্টেশন। গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোডও সাসারাম হইয়া গিয়াছে। সাসারামে পাঠানকুলতিলক সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট সের সাহের সমাধিসৌধ অবস্থিত বলিয়া অনেকেই জানেন। সেরসাহ এখানকার এক সামান্য জায়গীরদারের পুত্র ছিলেন। নিজ অলোকসামান্য প্রতিভা এবং অধ্যবসায়গুণে তিনি দিল্লীর রাজসিংহাসনে বসিলেও, বাল্যলীলাভূমি সাসারামের কথা বিস্মৃত হন নাই। সাসারামেই তিনি জীবদ্দশায় নিজ সমাধি-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহাতে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহও তাঁহার অপরাপর আত্মীয়পরিজনবর্গের শেষ-শয়নস্থানের অদূরেই আশ্রয়লাভ করিতে পারে। বিশাল এক জলাশয়ের মধ্যে নির্ম্মিত সেরসাহের সমাধি-সৌধটী পাঠানস্থাপত্যের অন্যতম সুন্দর নিদর্শন। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে এবং গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে ভ্রমণকারিদিগের মধ্যে অনেকেরই নয়নপথে এই সমাধিভবনটী পতিত হইয়া থাকিবে।

কিন্তু সাসারামে যে আরও একটী বহু পুরাতন যুগের কীর্ত্তি—মৌর্য্যকুলতিলক অশোকের কীর্ত্তি—আছে সে কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। সাসারামের সন্নিকটে যে গণ্ডশৈলশ্রেণী দেখা যায়, তাহা কাইমুর গিরিমালার সর্ব্ব উত্তরপূর্ব্ব প্রান্ত। সহরের এক ক্রোশ দক্ষিণে চন্দনপীর পাহাড়। চূড়াদেশে পীরচন্দন সহিদ নামক এক মুসলমান ফকিরের কবর থাকায় উহার এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। চূড়ার কিছু নিম্নে গিরিগাত্রে একটি গুহা দেখা যায়; গুহাটি মনুষ্যহস্ত ক্ষোদিত এবং সাধারণের নিকট "পীরসাহেবের চিরাগদান" নামে পরিচিত। গুহাটীর প্রবেশপথ পশ্চিমমুখী এবং চার ফুট উচ্চ। অশোকের লেখাটী এইস্থানে উৎকীর্ণ। দীর্ঘ এক প্রস্তরখণ্ড উপরে বিস্তৃত থাকিয়া গুহাটীর সম্মুখবর্ত্তী স্থানে ছাদের কার্য্য করিতেছে। এ কারণ রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার ফলে লেখাটী অনেকটা ভাল অবস্থাতেই আছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পাথরের চটা-উঠার ফলে ইহার শেষাংশের কতকটা ক্ষতি হইয়াছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কানিংহামের "অশোক অনুশাসন" সম্বন্ধীয় গ্রন্থের জন্য গৃহীত এবং উক্তপুস্তকে প্রদত্ত ইহার প্রতিলিপি ও ফটোর সহিত মদৃষ্ট অনুশাসনের পাঠ মিলাইতে গিয়া তাহা সহজেই বুঝিতে পারা গেল। লেখাটি আট লাইনে সম্পূর্ণ।

সাসারাম অনুশাসনের অস্তিত্ব অনেককাল হইতেই জানা ছিল। কিন্তু প্রথমটায় এদিকে কেহই মনোযোগী হয়েন

নাই। সাসারামে একটি পুরাতন শিলালিপি আছে শুধু এইটুকুই জানা ছিল। প্রিন্সেপ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মী বর্ণমালার পাঠোদ্ধারের পর এই লেখাটীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সাহ কবিরুদ্দিন নামক জনৈক স্থানীয় কর্ম্মচারীর নিকট হইতে নকল পাইয়া E. L. Ravenshaw ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে এই প্রাচীন লিপিটির কথা সাধারণের গোচরীভূত করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন "সাসারামের নিকট চন্দন সহিদ পাহাড়ের চূড়ায় লেখাটী ক্ষোদিত। বেতিয়া এবং এলাহাবাদ স্তম্ভের গাত্রে যেরূপ অক্ষর দেখা যায়, ইহার গাত্রেও সেই ধরণের অক্ষর আছে। লেখাটী এত অসম্পূর্ণ এবং গোলমেলে যে পণ্ডিত কমলাকান্ত ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইতে সক্ষম হয়েন নাই।" (J. A. S. B, Vol. IX. p. 354)

পণ্ডিত কমলাকান্তের পাণ্ডিত্যের অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তখনকার দিনে প্রাচীন বর্ণমালা এবং পালি-প্রাকৃত ভাষায় তিনি সম্ভবতঃ কতকটা অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু সুপ্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারের জ্ঞান তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক পণ্ডিত কমলাকান্ত না পারিলেও অপরাপর পণ্ডিতরা লেখাটির পাঠোদ্ধার করিয়া বুঝিলেন, এটিও সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের প্রচারিত অনুশাসনসমূহের অন্যতম, কারণ ইহার প্রথমেই আছে "দেবানংপিয়ে হেবং আহ"—"দেবপ্রিয় এইরূপ বলেন।"

সাসারামের স্থানে স্থানে এখনও প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসনিদর্শন দেখা যায়। তাই মনে হয় বৌদ্ধযুগে এইস্থান এতদঞ্চলে একটি প্রধানকেন্দ্র ছিল এবং সম্ভবতঃ সাসারাম সহস্রারামেরই অপভ্রংশ।

রূপনাথ ঃ—মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলায় সিহোরা তহসিলে স্লীমানাবাদ রেলষ্টেসনের ১৪ মাইল পশ্চিমে রূপনাথ নামে একটি হিন্দু তীর্থস্থান আছে। তীর্থস্থান বলাতে কেহ যেন কাশী, গয়া, পুরী, প্রয়াগ, মথুরার মত বলিয়া মনে না করিয়া বসেন এই অনুরোধ। তীর্থস্থানটি ছোট,—উহার মাহাত্ম্য এতদঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অধিকদূরে আর যাইতে পারে নাই। রূপনাথ জব্বলপুর সহরের প্রায় ৩৫ মাইল উত্তরে হইবে। রূপনাথের নিকটে যে সকল গণ্ডশৈল আছে তাহা কাইমুর গিরিমালার সর্ব্ব দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত। পাহাড়ের উপর হইতে একটী ঝরণা নামিয়াছে, তিন বিভিন্ন স্থানে তাহার জল জমিয়া তিনটি পৃথক কুণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ তিনটি যথাক্রমে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর নামে পরিচিত এবং সাতিশয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সীতাকুণ্ডটিই সর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। তাহার সন্নিকটে পাহাড়ের গায়ে এক ফাটলে রক্ষিত একটি শিবলিঙ্গ আছে। তাহার নাম "রূপনাথেশ্বর মহাদেব"। কুণ্ডের বামপার্শ্বে অবস্থিত ঘোর রক্তবর্ণ এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের গাত্রে অশোকের অনুশাসনটী উৎকীর্ণ। পূর্ব্বে প্রতিবৎসর শিব-রাত্রির দিন এখানে একটি মেলা বসিত। সেই সময় কুণ্ডে স্নান করিতে এবং রূপনাথেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে বহু লোক-সমাগম হইত। কিন্তু বিগত ৭০ বৎসরের মধ্যে মেলাটী আর হয় নাই। শিবরাত্রির দিন কিছু যাত্রী সমাগম এখনও হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মেলাটী বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পাথরখানার উপর পৃষ্ঠে লেখাটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বহু শতাব্দীর রৌদ্রবৃষ্টির প্রভাবে এবং মেলার সময়ে সমাগত লোকেদের ইহার উপরে বসার ফলে লিপিটীর সমূহ ক্ষতি হইয়াছে; স্থানে স্থানে অক্ষর একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রস্তরখণ্ডটী ভাল করিয়া মসৃণ করাও হয় নাই। গাত্রের স্বাভাবিক দাগের জন্য পংক্তিগুলি সরল বা পরস্পর সমান্তরাল নহে। অনুশাসনযুক্ত অংশটী দৈর্ঘ্যে ৩ হাত এবং প্রস্থে প্রায় এক হস্ত হইবে। লেখাটি ছয় লাইনে সম্পূর্ণ। সাসারাম অনুশাসনের মত ইহার ভাষা মাগধী নহে; গির্ণার, সাঁচি, ভরহুত প্রভৃতি পশ্চিম এবং মধ্যভারতের স্থান সমূহে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রাচীনলিপিতে যেমন, রূপনাথেও তেমনই "র" অক্ষরের প্রচলন দেখা যায়। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পাঠকের নিকট একথা অজানা নহে যে "মাগধী প্রাকৃতে" 'র' এর স্থানে 'ল' এর প্রয়োগ আছে। মাগধীর সহিত এই ভাষার ব্যাকরণগতও কতকটা পার্থক্য দেখা যায়। কানিংহাম এই ভাষাকে (dialect) "উজ্জৈনীয়" ভাষা আখ্যা দিয়াছিলেন।

কর্ণেল এলিস নামক জনৈক সামরিক কর্ম্মচারীর এক

ভৃত্য কর্ত্তৃক লেখাটি সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উক্ত কর্ণেল লেখাটির এক নকল এসিয়াটিক সোসাইটিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা এতই ভ্রমপ্রমাদ-পরিপূর্ণ এবং কদর্য্য হইয়াছিল যে পড়িবার কোনই উপায় ছিল না। সলিমাবাদ পরগণার রূপনাথে উহা পাওয়া গিয়াছে, শুধু এইটুকু পরিচয় তাহার সহিত দেওয়া ছিল। বহুকাল পরে এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মে অব্যবহৃত দ্রব্যাদি পূর্ণ একটী বাক্সের মধ্যে ঐ প্রতিলিপিটী দেখিতে পাইয়া কানিংহাম এ বিষয়ে কৌতুহলী হয়েন এবং এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন।

পরগণা সলিমাবাদ কোথায় তাহা উক্ত প্রতিলিপির পরিচয়পত্রে বলা ছিল না। গয়া এবং মুঙ্গেরের মধ্যে ঐ নামে এক পরগণা আছে। এ কারণ কানিংহাম মনে করিয়াছিলেন যে বিহার সরিফের অদূরে কোন স্থান হইতে উহা বাহির হইবে এবং সেজন্ত তিনি প্রথম ঐ স্থানেই সন্ধান আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। তখন হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে হইল যে জব্বলপুরের "সীমানাবাদ" সাধারণ লোকের মুখে 'সলিমাবাদ' দাঁড়াইয়াছে,—সুতরাং রূপনাথ ঐ দিকে হওয়াই সম্ভব। এই কথা মনে পড়ায় কানিংহাম তাঁহার অন্যতম সহকারী বেগলারকে ঐ স্থানে সন্ধান করিতে পাঠাইলেন। এবারে অল্প অন্বেষণের পরই অনুশাসনটী বাহির হইল।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত অনুশাসনগুলি সর্ব্বশেষ বাহির হইয়াছে। মহিশুর রাজ্যে অবস্থিত তিনটী অনুশাসন ১৮৯২ এবং নিজামরাজ্যে প্রাপ্ত লেখাটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পাওয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে অশোকের অনুশাসন আবিষ্কৃত হইবার পর সুদীর্ঘ ষষ্টিবর্ষের মধ্যেও দক্ষিণ ভারতবর্ষের কোন স্থান হইতে তাঁহার লিপি বাহির না হওয়ায় পূর্ব্বে সকলেই মনে করিতেন দক্ষিণাপথে অশোকের আধিপত্য ছিল না, তাঁহার সাম্রাজ্য শুধু উত্তরাপথেই সীমাবদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ পরলোকগত ঐতিহাসিক পণ্ডিতবর সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের কথা বলা যাইতেছে। তাঁহার Early History of the Deccan গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন "সাম্রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত লিপিগুলি হইতে দেখা যায় পূর্ব্বদিকে কলিঙ্গ বা উত্তর সরকার প্রদেশ এবং পশ্চিমদিকে কাথিয়াবাড় প্রদেশ অবধি অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইহার দক্ষিণে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ অনুশাসনসমূহে অশোকের সাম্রাজ্য 'বিজিত দেশ' নামে অভিহিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে যে সকল জনপদে তাঁহার আধিপত্য ছিল না তাহাদের নাম ধরিয়াই উল্লেখ দেখা যায়। অতএব রাষ্টিক, ভোজ, পেতেনিক, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি জনপদ তাঁহার অধীন ছিল না। মহারাষ্ট্র বা ডেকানদেশে তাঁহার আধিপত্য থাকিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থান হইতে তাঁহার একখানি ঘোষণা পত্র বাহির হইত।" (পৃঃ ১১)

ভাণ্ডারকর এই কথা লিখিবার অল্প পরেই, এমন কি তাঁহার গ্রন্থের সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, ক্যাম্বেল এবং পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী সোপারা গ্রামে অষ্টম গিরিলিপির অংশ-বিশেষ আবিষ্কার করেন। ইহাতে ভাণ্ডারকর অশোকের সাম্রাজ্য সোপারা অবধি বিস্তৃত ছিল মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেও মহারাষ্ট্রদেশ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রহিল বলিয়া মনে করেন।—(পৃঃ ১২, ফুটনোট)

সুতরাং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মহিশুর রাজ্যে জরীপকার্য্যের সময় পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী তিনটী বিভিন্ন স্থান হইতে যখন অশোকের অপ্রধান গিরিলিপির তিনটী বিভিন্ন সংস্করণ বাহির হইল এবং আরও দেখা গেল যে সম্পূর্ণ নূতন আর একটী অনুশাসনও তাহার সহিত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন সকলেই নিরতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। অশোকের সাম্রাজ্য যে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা তখন কেহই মনে করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ মনে করিতেন যে, অশোকের গিরিলিপিতে দাক্ষিণাত্যের জাতিবৃন্দের এবং জনপদসমূহের যে উল্লেখ দেখা যায় তাহা শুধুই সম্রাটের আত্মশ্লাঘার ফল। আসলে ঐগুলির সহিত তাঁহার কোনই নিকট-সম্বন্ধ ছিল না, কারণ তাঁহার রাজ্যসীমা উহাদের নিকট হইতে বহুদূর দিয়াই গিয়াছিল।

অশোক যে শুধু দর্পভরেই দাক্ষিণাত্যের জনপদসমূহের নাম করেন নাই তাহা তখন সকলেই দেখিতে পাইলেন। এইরূপে ভারতেতিহাসের একটি পরম মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইল। তাই ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যখন নিজাম রাজ্যে মস্কি নামক স্থানে এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশের কুর্ণুল জেলায় অশোকের অনুশাসন আবিষ্কৃত হইবার সংবাদ পাওয়া গেল তখন আর কেহই ততটা বিস্মিত হন নাই।

যাহা হউক এবারে দক্ষিণাপথে আবিষ্কৃত অনুশাসন গুলির কথা বলা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহিশুর রাজ্যে তিনটী বিভিন্ন স্থান হইতে অপ্রধান গিরিলিপি দুইটির তিনটি বিভিন্ন সংস্করণ বাহির হইয়াছে। মহিশুর রাজ্যের উত্তরাংশে চিত্তলদ্রুগ জেলা; তন্মধ্যে "মোলকালমুরু" নামে একটি তালুক আছে। উক্ত তালুকের মধ্য দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে "জনগিহল্ল" নদী বহিয়া গিয়াছে। নদীর উভয় পার্শ্বে কতকগুলি গণ্ডশৈল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পরস্পরের অনতিদূরে অবস্থিত তিনটী গিরিগাত্রে অশোকের অনুশাসন দুইটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মহিশুর রাজ্যে জরীপ কার্য্যের সময় ঐগুলি L. B. Rice কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তিনিই প্রথম এ গুলির পরিচয় সাধারণের গোচরীভূত করেন। প্রথম পাঠোদ্ধারের পর দেখা গেল যে বৈরাট, সাসেরাম এবং রূপনাথের লিপি এবং নবাবিষ্কৃত লেখত্রয়ের ভাষা ও বলিবার ধরণে কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিলেও মূলতঃ উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় একই। আরও একটি সম্পূর্ণ নূতন অনুশাসন মহিশুরে দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বে আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা ঐতিহাসিক মহলে অশোকের দ্বিতীয় সংখ্যক অপ্রধান গিরিলিপি নামে পরিচিত। ইহাতে অশোকের ধর্ম্মবিধির সংক্ষিপ্তসার প্রদত্ত হইয়াছে। অশোকের প্রধান চতুর্দ্দশ গিরিলিপির তৃতীয়, চতুর্থ, নবম ও একাদশ সংখ্যক অনুশাসনে এবং সপ্তম সংখ্যক স্তম্ভলিপিতে যে কথা বলা হইয়াছে, ইহাতে সেই ভাবেরই সার সঙ্কলিত দেখা যায়।

মহিশুরে আবিষ্কৃত লিপিত্রয়ের আরম্ভভঙ্গীতেও কতকটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। অন্যান্য স্থানের লিপিগুলির আরম্ভ অনেকটা সাধাসিধা ধরণের,—"দেবানং পিয়ে হেবং আহ" অর্থাৎ "দেবপ্রিয় এইরূপ বলিলেন।" ইহা অশোকের নিজের মুখের বাণী, স্বয়ং সম্রাট নিজ ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন। প্রথমোক্তগুলির আরম্ভ অন্য ধরণের। উহা হইতে জানা যায় যে, ইসিলার রাজকর্ম্মচারিদিগের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সম্রাটের অনুজ্ঞা সুবর্ণগিরির রাজপুত্র এবং তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দের নিকট প্রথম প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাঁহারা উহা যথা স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইসিলার রাজকর্ম্মচারিদিগের সরাসরি ভাবে সম্রাটের সহিত পত্রব্যবহারের অধিকার ছিল না—সুবর্ণগিরিতে অবস্থিত রাজপুত্র এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণের সহযোগিতায় তাহা তাঁহাদের করিতে হইত। ইহা হইতে জানা যায় যে, ইসিলার কর্ম্মচারিগণ সুবর্ণগিরির রাজপ্রতিনিধির অধীনস্থ ছিলেন। তাহা হইলে উভয় নগর একই অঞ্চলে—অর্থাৎ দক্ষিণাপথে—অবস্থিত ছিল এবং সে ক্ষেত্রে বলিতে হয় যে, সুবর্ণগিরিই মৌর্য্যসাম্রাজ্যের এতদঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র ছিল। অনুশাসনসমূহ হইতে জানা যায় যে, শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে অশোকের সাম্রাজ্য পাঁচটী বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে স্বয়ং সম্রাট কেন্দ্র বা মধ্য বিভাগের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। অপরাপর চারিটী প্রদেশের শাসনভার রাজবংশ হইতে নির্ব্বাচিত কুমার বা আর্য্যপুত্র অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধির উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ চারিটী প্রদেশ যথাক্রমে উত্তর (প্রধান নগর তক্ষশিলা), পশ্চিম (প্রধান নগর উজ্জয়িনী), দক্ষিণ (প্রধান নগর সুবর্ণগিরি) এবং পূর্ব্ব (প্রধান নগর তোষলি) প্রদেশ নামে অভিহিত হইতে পারে। পিতা বিন্দুসারের জীবদ্দশায় অশোক ক্রমান্বয়ে উজ্জয়িনী এবং তক্ষশিলার রাজপ্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন সে কথা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অজানা নহে। সুবর্ণগিরির অবস্থান সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে, এবারে লেখা তিনটী সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

ব্রহ্মগিরি ঃ— মহিশুরে আবিষ্কৃত লিপিত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মগিরি নামক স্থানে প্রাপ্ত লেখাটিই সর্ব্বাপেক্ষা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। একারণ প্রথমে তাহার কথাই বলা গেল। ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের উত্তর পশ্চিম কোণের

পাদমূলে অবস্থিত সুবৃহৎ এক প্রস্তরখণ্ডের উপরপৃষ্ঠে লেখাটী উৎকীর্ণ। ঐ প্রস্তর দীর্ঘকাল হইতে স্থানীয় অধিবাসিদের নিকট "অক্করগুণ্ডু" (কানাড়ী ভাষায় গুণ্ডু অর্থে প্রস্তর বুঝায়) নামে পরিচিত। উহার নানা কঠিন দুরারোগ্য রোগ আরাম করিবার দৈবশক্তি আছে বলিয়া গ্রামবাসিদের বিশ্বাস। কারণ মনুষ্য বা গবাদি পশুর সকল প্রকার রোগেই প্রথমে ঐ পাথর ধোওয়া জল তাহারা রোগীকে পান করিতে দিয়া থাকে। দিবসের আতপতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পর্ব্বতের ছায়াশীতল কোলে অবস্থিত সুবিশাল এই প্রস্তরখণ্ড দীর্ঘকাল হইতেই গোমেষ-চারণকারী রাখালগণের এবং নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহের শস্য রক্ষানিরত কৃষককুলের প্রিয় বিশ্রামস্থানরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহার ফলে প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ লেখাটীর বহুলাংশে ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষোদাই করিবার পূর্ব্বে বন্ধুর প্রস্তর গাত্র ভালরূপে মসৃণ করিয়া লওয়া হয় নাই, তাহার ফলে পংক্তিগুলি পরস্পর সমান্তরাল বা ঋজু ভাবে উৎকীর্ণ হয় নাই। বামদিকে প্রস্তর গাত্রে একটা ফাটল থাকার জন্য তন্মধ্যে বর্ষার জল সঞ্চিত হইয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তির আরম্ভের কয়েকটী অক্ষর একেবারে বিনষ্ট করিয়াছে। ত্রয়োদশ লাইনে সম্পূর্ণ অনুশাসনটী প্রস্তর খণ্ডের প্রায় দশহাত দীর্ঘ এবং আটহাত আয়ত স্থান জুড়িয়া উৎকীর্ণ।

সিদ্ধপুর:—ব্রহ্মগিরির প্রায় এক মাইল পশ্চিমে সিদ্ধপুর "যেবমন তিম্মযান গুণ্ডু" অর্থাৎ মহিষপালক তিম্মযার পাহাড় নামে অভিহিত এক গণ্ডশৈল গাত্রে লেখাটী উৎকীর্ণ। প্রায় নয় হাত দীর্ঘ এবং ছয় হাত বিস্তৃত জায়গায় বাইশ লাইনে লেখাটী সম্পূর্ণ। বন্ধুর প্রস্তরগাত্রের জন্য পংক্তিগুলি পরস্পর সমান বা সরল নহে। সুবিশাল এক প্রস্তরখণ্ড উত্তরদিক হইতে লেখাটীর উপর ছাতের ন্যায় হেলিয়া থাকার ফলে স্থানটী বেশ ছায়াশীতল, তজ্জন্য মনুষ্য এবং গবাদি পশুর রৌদ্র বৃষ্টি হইতে আশ্রয় লওয়ার ফলে লেখাটীর সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সিদ্ধপুরার অবস্থান অনুমান ১৪°৪৭´ এবং ৭৬°৫১´ রেখা মধ্যে। ইহার অদূরে ভূগর্ভে প্রোথিত এক প্রাচীন নগরের ধ্বংসনিদর্শন আজও বিদ্যমান। প্রচলিত প্রবাদানুসারে ঐ নগরের নাম ছিল "চন্দ্রাবলী"। বহুকাল হইতেই এখানকার কৃষকেরা ভূমিকর্ষণকালে পুরাতন মুদ্রা ও শিলমোহর, অস্থিখণ্ড, ইষ্টকাদি এবং স্বর্ণালঙ্কারখণ্ড প্রভৃতি পাইয়া থাকে। পরে নগর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে খননের ফলে বিস্তৃত প্রাচীর ও গৃহাদির ভগ্ননিদর্শন, বহুসংখ্যক পুরাতন যুগের শিলমোহর ও মুদ্রা বাহির হইয়া পড়িল। মুদ্রাগুলির মধ্যে অন্ধ্রাজগণের এবং রোমক সম্রাট অগষ্টস সিজারের মুদ্রাও দেখা যায়। বিধ্বস্তনগরীর এক মাইল পশ্চিমে গিরিগাত্রে খোদিত এবং ভূগর্ভেস্থিত কতকগুলি গুম্ফা বা গুহা আছে। বৌদ্ধ যতিগণের নির্জ্জন বাসের জন্য ঐগুলি তাৎকালীন ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতিবৃন্দ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ গুলিতে এককালে মনুষ্যবাসের বহু নিদর্শন আজও দেখা যায়। ঐ প্রাচীন নগরীটীর নিদর্শনকেই অনুশাসনোক্ত ইসিলার ধ্বংসাবশেষ বলিয়াই মনে হয়।

জটিঙ্গা-রামেশ্বর:—ব্রহ্মগিরির প্রায় তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে জটিঙ্গা-রামেশ্বর পর্ব্বত। প্রবাদ এইখানেই সীতাহরণকালে বাধা দিতে গিয়া রাবণের হস্তে জটায়ু প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছিল। পাহাড়ের উপরে জটিঙ্গা-রামেশ্বর-মহাদেবের এক মন্দির। যে চত্বরে অশোকের অনুশাসনটী উৎকীর্ণ তাহা মন্দিরে উঠিবার সোপানশ্রেণীর ঠিক সম্মুখেই পাহাড়ের পশ্চিম চূড়ার প্রান্তভাগে অবস্থিত। লেখাটীর দক্ষিণে বিশাল এক পাষাণখণ্ড ছাতের ন্যায় উপর হইতে লম্বমান রহিয়া রৌদ্র জল হইতে লেখাটীকে রক্ষা করিতেছে। যে প্রস্তরে লেখাটী উৎকীর্ণ তাহার বহুলাংশ অতীতে গ্রামবাসিগণ ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। চারিদিকেই প্রস্তরগাত্রে এখনও কারিগরের লৌহাস্ত্রের দাগ দেখা যায়। মন্দিরে যাইবার সোপানশ্রেণীর ঠিক সম্মুখে উৎকীর্ণ থাকার ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়াই যাত্রিগণ অনুশাসনটীর উপর দিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে লেখাটীর বহুলাংশে ক্ষতি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন উপরে লম্বমান প্রস্তরখণ্ডের প্রদত্ত ছায়ার জন্য ঠিক এই স্থানটীতেই প্রতি বৎসর মেলার সময় বালাবিক্রেতাগণ নিজ নিজ মাল সাজাইয়া বসিবার জন্য নির্ব্বাচন

করিত। এ কারণ সাধারণের নিকট ঐ শিলাখণ্ডটী "বালেগার গুণ্ডু" (বালাবিক্রেতার পাথর) নামে পরিচিত। প্রস্তরখণ্ডের বিভিন্ন অংশে উহারা নিজ নিজ সামিয়ানা ও আটচালা টাঙ্গাইবার বংশদণ্ড পুঁতিবার গর্ত্ত করিয়াছে। এই সকল কারণে লেখাটীর আজ নিতান্তই চরম দশা। উহার প্রায় সবটাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতি সামান্য পরিমাণ অংশমাত্র পাঠযোগ্য আছে ; এমন কি পংক্তিগুলি কোথা হইতে আরম্ভ এবং কোথায় শেষ হইয়াছিল তাহাও নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। তবে যতদূর মনে হয় লেখাটী আটাশ লাইনে সম্পূর্ণ ছিল।

ইতিহাসানুরাগী পাঠক শুনিয়া তৃপ্ত হইবেন, বৎসর কয়েক হইল লিপিত্রয়ের সংরক্ষণ সম্বন্ধে মহিশুর দরবার অবহিত হইয়াছেন। স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম সর্ব্বপ্রকার ধ্বংস-চেষ্টা হইতে রক্ষার জন্য ঐগুলির উপরে ছোটছোট কুঠরী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের মোড়লের উপর উহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত—তাহারই নিকট কুঠরীতে প্রবেশ পথের চাবী রক্ষিত থাকে।

মস্কিঃ—এতদিন পর্য্যন্ত এইটিই সর্ব্বশেষ আবিষ্কৃত অশোক অনুশাসন বলিয়া গণ্য হইত , কিন্তু প্রায় দুই বৎসর হইল মান্দ্রাজ প্রদেশের কুর্ণুল জেলায় অশোক অনুশাসন বাহির হওয়ার ফলে ইহার সে গৌরব গিয়াছে।

নিজাম রাজ্যের দক্ষিণাংশে রায়চুড় নামে একটী জেলা আছে। উক্ত জেলার লিঙ্গসুগুর তালুকে মস্কি নামে একটি গ্রাম আছে। রায়চুড় সহর হইতে ইহার দূরত্ব দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ৪৬ মাইল হইবে। মস্কি অতি প্রাচীন স্থান। এখানে অনেকগুলি পুরাতন যুগের শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার অদূরে হুট্টির পুরাতন স্বর্ণখনির খাতসমূহ অবস্থিত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এতদঞ্চল স্বর্ণোত্তলনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে M. C. Beadon নামক জনৈক খনিজ-ভূতত্ত্ববিদ কর্ত্তৃক এই প্রাচীন লেখাটী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তিনি তখন সন্নিকটবর্ত্তী শৈল সমূহে সুবর্ণের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। একটা গুহামুখে অবস্থিত বিশাল একখণ্ড পাষাণগাত্রে কতকগুলি অদ্ভুত ধরণের চিহ্ন তিনি দেখিতে পান। তাঁহার মনে হয় সম্ভবতঃ ঐগুলি প্রাচীনযুগের কোনপ্রকার বর্ণমালার অক্ষর হইবে। সন্দেহ নিরাকরণের জন্য কতকগুলি অক্ষরের নকল লইয়া তিনি ভারতগভর্ণমেণ্টের প্রাচীনলিপিপাঠকের নিকট পাঠাইয়া দেন। তখন পণ্ডিত কৃষ্ণশাস্ত্রী ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি দেখিবামাত্র ঐগুলিকে সুপ্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালার অশোকযুগের অক্ষর বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কালবিলম্ব ব্যতিরেকে অতঃপর তিনি মান্দ্রাজ ও নিজাম সরকারের অনুমতি লইয়া মস্কিতে আগমন করিলেন। লেখাটী পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত হইল। এটিও যে মৌর্য্য সম্রাট অশোকের অপর একটি অনুশাসন এবং অপ্রধান গিরিলিপি পর্য্যায়ে ধৃত তাঁহার অপরাপর লেখের সহিত ইহা যে সমশ্রেণীর সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

মস্কি গ্রামের অনতিদূরে অবস্থিত একটি গণ্ডশৈলগাত্রে স্বাভাবিক একটি গুহার দক্ষিণাভিমুখী প্রবেশপথে রক্ষিত ধূসরবর্ণের একটি গ্রানাইট প্রস্তরখণ্ডের ভিতরের পৃষ্ঠে অশোকের লেখাটী উৎকীর্ণ। ঐ প্রস্তরখণ্ডটী ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৫ ফুট আয়ত। স্থানে স্থানে প্রস্তরগাত্র ঝরিয়া যাওয়ার ফলে লেখাটীর কতকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মস্কিগ্রাম সান্নিধ্যে কতকগুলি পুরাতন শিলালেখ দেখা যায়। এগুলি মধ্যযুগের। উহাতে মস্কি নামেরও উল্লেখ আছে। মস্কির প্রকৃত নাম লইয়া এখানকার অধিবাসিদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় এই গ্রামকে অভিহিত করে। অজ্ঞ কৃষিজীবীদের 'মশগি', বা 'মশিগি', স্থানীয় ব্রাহ্মণদের 'মস্কি' এবং মুসলমানদের 'মসগি' এই স্থানেরই নাম। চালুক্যরাজ জগদেকমল্লের এক লিপিতে (৯৪৯শক—১০২৭ খৃষ্টাব্দ) এই স্থানের "রাজধানী পিরিয় মোসঙ্গি" আখ্যা দেখা যায়। গ্রাম মধ্যে আবিষ্কৃত উক্ত নৃপতির আর একটী শিলালিপিতে ঐ অঞ্চলকে "মোসঙ্গির ব্রহ্মপুরী" বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। মস্কিতে প্রাপ্ত অচ্যুতরায় এবং সদাশিব রায়ের দুইটি লেখে "মোসগে নাড়ু"র (নাড়ু অর্থে তামিল ভাষার দেশ) প্রধান নগর "মোসগে"র উল্লেখ

আছে। এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, তামিল প্রাচীনলিপি হইতে জানা যায় চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জয়সিংহকে "মুশংগি" যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়াছিলেন Epigraphia Indica, Vol. IX, P. 230)। সেই মুশংগিও বর্ত্তমান মস্কির সহিতই অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। এই সকল পুরাতন লিপি হইতে বেশ বুঝা যায় যে প্রাচীন মৌর্য্যযুগ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ পর্য্যন্তই মস্কি এতদঞ্চলের এক সমৃদ্ধ জনপদের কেন্দ্রস্থল ছিল।

মস্কি লিপি হইতে কয়েকটি নূতনতর তথ্য অবগত হওয়া যায় যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুশাসনসমূহ হইতে সুপরিস্ফুট হয় নাই। সমগ্র অশোক অনুশাসন মধ্যে শুধু এইটিতেই তাঁহার নিজ নাম ব্যবহার দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও, এ কথা সত্য যে, সমগ্র অনুশাসন মধ্যে কুত্রাপি অশোকের নিজ নাম দেখা যায় না। সর্ব্বত্রই 'দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী' নামে অশোক নিজ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এ কারণ অনুশাসনোক্ত প্রিয়দর্শী এবং সংস্কৃত ও পালিসাহিত্য বর্ণিত অশোক নৃপতির অভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু মস্কিলিপি আবিষ্কারের পর হইতে তাহা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, কারণ ইহাতে স্পষ্টই লিখিত দেখা যায় "দেবানং পিয়স অসোকস।"

এবারে অশোকের অনুশাসনগুলির সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, নচেৎ প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভাবরা অনুশাসন এবং দ্বিতীয় অপ্রধান গিরিলিপির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। একারণ এখানে শুধু প্রথম লিপিটীর পরিচয় দিব এবং ইহা হইতে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায় সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঐতিহাসিকের নিকট এই অনুশাসনটী সবিশেষ মূল্যবান। ইহা অশোকের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস। এ বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে নমুনাস্বরূপ একটী লিপির অনুবাদ দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নানা-কারণে লিপিসপ্তকের মধ্যে সাসারামে আবিষ্কৃত পাঠের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"দেবপ্রিয় এইরূপ বলেন—আড়াই বৎসরের অধিক কাল হইল আমি উপাসক হইয়াছি। বিশেষ কিছু করি নাই। এক বৎসরের অধিক হইল (কিছু কার্য্য করিয়াছি)। ইহার মধ্যে জম্বুদ্বীপে যে-সকল অমিশ্র (অপ্রচলিত) দেবতা ছিলেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্যের সহিত মিশ্রিত (অর্থাৎ প্রচলিত) করিয়াছি। ইহা চেষ্টার ফল। ইহা যে কেবল মহৎগণের প্রাপ্তব্য তাহা নহে। ক্ষুদ্রও চেষ্টার দ্বারা বিপুল স্বর্গসুখ লাভ করিতে (সক্ষম হয়)। এতদুদ্দেশ্যে এইরূপ ঘোষণা করা যাইতেছে—ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেই চেষ্টা করিতে থাকুন। পার্শ্ববর্ত্তী (জনপদসমূহের অধিবাসীরাও) জানুক। এই চেষ্টা চিরস্থায়ী হউক। এই উদ্দেশ্য বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, ইহার বিপুল বৃদ্ধিই হউক। অন্ততঃপক্ষে দেড়গুণ বৃদ্ধি হউক। এই ঘোষণা (আমার) প্রবাসের (ব্যুথেন) দ্বিশত ষটপঞ্চাশৎ (২৫৬) রাত্রে প্রচার হইল। এই অর্থ পর্ব্বতে লেখান হউক। যেখানে যেখানে শিলাস্তম্ভ আছে। তাহাতেও লেখান হউক।"

অন্যান্য অনুশাসনে ঐ ২৫৬ সংখ্যাটি শুধু অঙ্কচিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে, কিন্তু কেবল সাসারামেই অঙ্কচিহ্ন ব্যতীত বাক্যদ্বারাও ঐ সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে দেখা যায়। এই ২৫৬ সংখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বহুপ্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে, এবং অদ্যাবধিও এ সম্বন্ধে সকল রহস্যের সমাধান হয় নাই। পূর্ব্বে জর্ম্মন পণ্ডিত ডাক্তার বুলার বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের ২৫৬ বর্ষপরে এই অনুশাসন প্রচার হইয়াছিল এইভাবে ঐ অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ পণ্ডিত সমাজে তাঁহার কৃত অর্থই গৃহীত হইত। তদনুসারে নানাজনে নানাভাবে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের এবং এই অনুশাসন প্রচারের অব্দ নিরূপণের প্রয়াস পাইতেন। কেহ কেহ বা ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতেন। Senart ইহাতে ২৫৬ জন প্রচারক প্রেরণের সংবাদ পাইয়াছিলেন। Boyer-এর মতে বুদ্ধদেবের গৃহপরিত্যাগের পর ২৫৬ বর্ষ অতীত হওয়ায় বৃত্তান্ত

ইহাতে পরিস্ফুট। কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার টমাসই সর্ব্বপ্রথম ইহার প্রকৃত অর্থভেদ করেন। সাসারাম লিপিতে "দুবেসপংনা"র পর "লাতি" (রাত্রি) শব্দের অস্তিত্বের প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এতকাল ধরিয়া কেহই ঐ শব্দের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন নাই। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতেও যে "যে ষটপঞ্চাশে রাত্রি শতে" (এখানে 'শতে' কথাটার প্রয়োগ পুনরুক্তি দোষদুষ্ট হইলেও) ইত্যাকার পদের প্রচলন একেবারেই অজানা নহে তাহাও তিনি দেখান। "ব্যুথেন" বা প্রয়াত কথাটী মৃত বুদ্ধদেবের নির্দ্দেশক এ অর্থে গ্রহণ করা অপেক্ষা বিবাসিত বা প্রবাস-যাত্রার গত স্বয়ং সম্রাট অশোকের দ্যোতক এই ব্যাখ্যাই যে অধিকতর সঙ্গত তাহাও তিনি সেই সময়ে সবিশেষ যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এখানে বলা ভাল যে অধুনাতন বিদ্বৎ-সমাজে টমাসকৃত ব্যাখ্যাই গৃহীত হইয়াছে।

এই লিপিটার আর একস্থলেও পূর্ব্বতন ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথমে সকলে মনে করিতেন যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই অশোক এই আদেশবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। "জম্বুদ্বীপে যাঁহারা এতদিন সত্য-দেবতা বলিয়া গৃহীত হইতেন তাঁহাদিগকে আমি মিথ্যা ও মনুষ্যসমান করিয়াছি," এইরূপে দীর্ঘকাল যেখানে জম্বুদ্বীপ কথাটার প্রয়োগ আছে সেই অংশের ব্যাখ্যা করা হইত। কিন্তু এক্ষণে সে ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কি কারণে সে কথা বলিতে গেলে পালি প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হয়। সাধারণ পাঠকের তাহা ভাল লাগিবে না বলিয়া সে চেষ্টা হইতে বিরত হইতে হইল।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের কালনির্ণয় লইয়া পণ্ডিত-গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। একমতে রাজত্বের নবমবর্ষে কলিঙ্গবিজয়ের পর তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন; সে হিসাবে রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (৯+২৷৷০ +১) প্রথম অপ্রধান গিরিলিপির প্রচারকালে তিনি রীতি-মত বৌদ্ধ। আর একমতে রাজত্বের শেষভাগে বা অন্ততঃ ৩০-৩২ বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধ হন। ডাক্তার বুলার এবং ডাক্তার ফ্লীট এই মত পোষণ করিতেন। বুলারের মতে অশোক বরাবর বৌদ্ধ ছিলেন না। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর ব্যথিত হইয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই রাজত্বের ২৯শ বর্ষে তিনি আবার উহা পরিত্যাগ করেন। সাড়ে তিন বৎসর পরে অর্থাৎ রাজত্বের ৩২৷৷০ বর্ষে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য এ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোন বলবৎ যুক্তিই দেখা যায় না।

ডাক্তার ফ্লীটের ক্ষুদ্র গিরিলিপি সম্বন্ধে এক নিজস্ব মত ছিল। এবং তাহা তিনি বহু বিভিন্ন প্রবন্ধে সবিশেষ যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মতে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮২ অব্দে বুদ্ধদেবের দেহাবসান হওয়ার ২৫৬ বৎসর পরে এই অনুশাসন প্রচার হয়। অশোকের রাজ্যাভিষেকের আটত্রিশেরও অধিক বৎসর পরে উহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল—তখন তিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশ করতঃ সুবর্ণগিরিতে পূর্ণ বৌদ্ধভিক্ষুজীবন যাপন করিতে-ছিলেন। রাজগৃহ বা রাজগিরকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত শৈলপঞ্চকের অন্যতম, বর্ত্তমান সোনে্গিরি পাহাড়ই সেই সুবর্ণগিরি বলিয়া ফ্লীট মনে করিতেন।* নানা কারণে ফ্লীটের এ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। অশোক রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণ ও ভিক্ষুজীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহার স্বতন্ত্র কোন প্রমাণ নাই। এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে দ্বীপবংশ, মহাবংশ, দিব্যা-বদান, অশোকাবদান প্রভৃতি পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থগুলির মধ্যে কোনটাতে কি তাহার প্রসঙ্গক্রমেও আভাস থাকিত না? স্বতন্ত্র কোন দৃঢ় প্রমাণ ব্যতিরেকে শুধু এই অনুশাসনের "সুবর্ণগিরির রাজপুত্র" এই কথা দুইটির জোরে গঠিত ফ্লীটের সিদ্ধান্ত শুধুই কষ্টকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে বলিয়াই আমার মনে হয়। রাজগৃহের অন্যতম নগণ্য সোণ্‌গিরি পাহাড়কে এতটা প্রাধান্য দিবার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অশোকের কালে বর্ত্তমান সোণ-

* ফ্লীটের অভিমতের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য, Imperial Gazetteer of India, Vol. II, pp. 42, 435; J. R. A. S., 1904, p. 355.

গির যে সুবর্ণগিরি নামে অভিহিত হইত, তাহাও প্রমাণ-সাপেক্ষ। জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের নানাগ্রন্থে রাজগৃহের শৈলপঞ্চকের বিভিন্ন যুগে প্রচলিত বিভিন্ন নাম দেখা যায় না। ফ্লীটের সিদ্ধান্ত যদি সত্যই হয় তাহা হইলে অনুশাসনে অশোক সুবর্ণগিরির পরিবর্ত্তে রাজগৃহের নামোল্লেখ করিতেন বলিয়াই মনে হয়। রাজগৃহের সোণ্ গিরি যদি নামসাদৃশ্যবশতঃ সুবর্ণগিরি হইতে চাহে তবে সে দাবী করিবার অধিকার আরও অনেক স্থানেরই আছে। ধীর-ভাবে সকল কথার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ফ্লীটের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোনই বলবৎ যুক্তি নাই।

সুবর্ণগিরি অশোকের সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল সে কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। উত্তর ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত এবং স্বয়ং সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক প্রচারিত লেখ-গুলিতে সুবর্ণগিরির নাম নাই। আর দাক্ষিণাত্যে মহিশুর রাজ্যে আবিষ্কৃত এবং অশোকের আদেশে সুবর্ণগিরির রাজ-পুত্রের সহযোগিতায় ইসিলার রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রচারিত লিপিগুলিতে সুবর্ণগিরির উল্লেখ আছে। ইহাই কি সুবর্ণগিরির দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের যথেষ্ট প্রমাণ নহে? সত্য বটে দাক্ষিণাত্যে সুবর্ণগিরির প্রকৃত অবস্থান এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই। সিদ্ধপুর এবং মস্কি এতদ-ঞ্চলের মধ্যে কোন স্থানে উহা সম্ভবতঃ ছিল। প্রথমোক্ত-স্থানের সন্নিকটে ইসিলার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মস্কি অনুশাসনে সুবর্ণগিরির রাজপুত্রের বা ইসিলা অথবা অপর কোন স্থানের মহামাত্রগণের কোন প্রসঙ্গ নাই; উহা স্বয়ং "দেবানং পিয়স অসোকস" বাণী। এ কারণ সিদ্ধপুরের ন্যায় মৌর্য্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমানার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা কতকটা উত্তর অঞ্চলে মস্কির ন্যায় স্থানেই দক্ষিণপ্রদেশের শাসনকেন্দ্র সুবর্ণগিরির অবস্থিত থাকার সম্ভাবনা অধিক বলিয়াই মনে হয়। মস্কির নিকটে নানাস্থানে স্বর্ণখানি আছে। বহুপ্রাচীন কালেও যে এখানকার সুবর্ণের অস্তিত্ব লোকেরা অবগত ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ এতদঞ্চলে নানাস্থানে এখনও অনেক পুরাতন অব্যবহৃত খাত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত হুটির খনিই পৃথিবীতে গভীরতম স্বর্ণখনি। সুবর্ণগিরি নামেও ঐস্থানে সুবর্ণের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তাই মনে হয় অশোকের সাম্রাজ্যের দক্ষিণপ্রদেশের রাজধানী সুবর্ণগিরি বর্ত্তমান মস্কির সমীপেই কোনস্থানে অবস্থিত ছিল।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগসন্ধি

—উপন্যাস— —শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্‌-এ, বি-এল্‌

পঞ্চম খণ্ড

কর্ত্তব্য-সংঘাত

প্রথম স্তবক

বিজয়ান্তের সংগ্রাম

১

ল্যান্টিনেক ধৃত হইল।

শ্যেন-দৃষ্টি সিমুর্দ্দানের তত্ত্বাবধানে লাটুর্গের নিম্নতলস্থ অন্ধকূপের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং মার্কুইস্‌ তথায় নীত হইলেন। একটা ল্যাম্প, এক কলসী জল ও একটি রসদের রুটি কক্ষমধ্যে রক্ষিত হইল। ভূমিতলে এক বোঝা খড় ছড়াইয়া দেওয়া হইল। পনর মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে এই সকল ব্যাপার সমাধা হইল, এবং অন্ধকূপের দ্বার পুনরায় সশব্দে বন্ধ হইল।

অতঃপর সিমুর্দ্দান গভেনের সন্ধানে চলিলেন। দূরে প্যারিসের গির্জ্জার ঘড়িতে এই সময়ে ১১টা বাজিয়া গেল। সিমুর্দ্দান তাহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রকে বলিলেন, "আমি কোর্ট-মার্‌শাল (সামরিক বিচার আদালত) আহ্বান করতে যাচ্চি; তুমি তা'তে থাক্‌বে না। তুমি গভেন বংশের সন্তান, ল্যান্টিনেকও সেই বংশীয়। তুমি তা'র অতি নিকটতম আত্মীয়, সুতরাং তোমার পক্ষে তা'র বিচারক হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। ক্যাপেটের প্রাণ দণ্ডের আনুকূল্যে ভোট দিয়েছিল বলে' ইগ্যালিটের আমি নিন্দা করি। কোর্ট-মার্শ্যালে তিনজন বিচারক থাক্‌বে:—একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী,—সে পদে থাক্‌বে গেচাম্প; একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী, সার্জ্জেন্ট রাডুবকে নিলেই চল্‌বে; আর আমি। সভাপতির কাজ আমিই করব। এতে তোমার কোনো সংস্রব আর এখন রইল না। আমরা কনভেনসনের ব্যবস্থানুসারে কাজ করব; আমরা কেবল ভূতপূর্ব্ব মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের সনাক্ত সম্বন্ধে প্রমাণ নেব। আগামী কাল কোর্ট-মার্শ্যাল, তারপর দিন গিলোটিন। এই বার ভেণ্ডি মরল।"

গভেন একটি কথাও কহিল না। প্রারব্ধ কর্ম্মের সমাপ্তির চিন্তায় সিমুর্দ্দানও ব্যস্ত ছিল। গভেনকে একাকী রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কখন কোন্‌ স্থানে শেষ কার্য্যটি নিষ্পন্ন হইবে, সিমুর্দ্দানকে তাহার নির্দ্ধারণ ও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তখনকার কালে বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া জল্লাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করা এবং তৎসম্বন্ধে সহায়তা করা বিচারকের পক্ষে সদৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইত। সিমুর্দ্দানেরও সে অভ্যাস ছিল। ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট ও "স্পানিশ ইনকুইজিসন" হইতে তিরনব্বই সালের "বিভীষিকার রাজত্বেও" এই প্রথাটি চলিয়া আসিয়াছিল।

গভেন অন্যমনস্ক।

অরণ্য হইতে একটা শীতল হাওয়া শন্‌ শন্‌ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল; কার্য্যভার গেচাম্পের হস্তে সমর্পণ করিয়া গভেন লাটুর্গের পাদমূলে কানন-পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে আপনার শিবিরে প্রবেশ করিল। সেনাপতির পদ-মর্য্যাদা-সূচক একটা ওভারকোটে সর্ব্বাঙ্গ ও মস্তক আবৃত করিয়া গভেন সেই রক্তাক্ত প্রান্তরে একাকী পাদচারণা করিতে লাগিল। এইখানেই যুদ্ধ হইয়াছিল; তখনও আগুন জ্বলিতেছে, কিন্তু সেদিকে আর কাহারও লক্ষ্য নাই। রাডুব শিশুগণ ও তাহাদের জননীর

নিকট দাঁড়াইয়াছিল—তাহারও বক্ষ সেই জননীর বক্ষেরই মতো মাতৃ-স্নেহে উদ্বেল। সেতু-প্রাসাদ প্রায় ভস্মীভূত। সৈনিকগণ মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য গর্ত্ত খুঁড়িতেছিল; আহতদের শুশ্রূষা করা হইতেছে; প্রতিরোধ-প্রাচীর ভগ্ন করা হইয়াছে: কক্ষ ও সোপান হইতে মৃতদেহগুলি অপসারিত হইয়াছে; যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্রতার সহিত যুদ্ধান্তে সব সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করা হইতেছিল। এই সব কিছুই কিন্তু গভেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

গভীর চিন্তায় গভেন এতই তন্ময় ছিল যে, সিমুর্দ্যাঁনের আদেশে দুর্গরক্ষী সৈন্যগণের সংখ্যা যে দ্বিগুণ করা হইয়াছিল তাহাও তাহার নজরে পড়িল না।

অন্ধকারের মধ্যে বোধ হয় দুইশত ফুট দূরে গভেন দেখিতে পাইল সেই দুর্গ-প্রাচীরের ভাঙনটা, যাহার কালো মুখের ভিতর দিয়া সে কারাদুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ সেই ভূতলস্থ কক্ষ, ঐখানে প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। মার্কুইদের কারাকক্ষের দ্বারও এই তলে। ভাঙনের নিকটে দাঁড়াইয়া সশস্ত্র প্রহরী ঐ দ্বারে চৌকি দিতেছিল।

এই রকম অন্যমনস্ক ভাবে মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কাণের ভিতর মৃত্যু-ঘোষী ঘণ্টা-ধ্বনির মতই এই কয়টি কথা বাজিতে লাগিল:—"আগামী কল্য কোর্ট-মারশ্যাল, তারপর দিন গিলোটিন।"

অগ্নি তখনও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। সমবেত জনমণ্ডলী যতটা জল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল তাহা উহার উপর ঢালিতেছিল। তবু থাকিয়া থাকিয়া বহ্নি তাহার শিখা বিস্তার করিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটা তল সশব্দে ধ্বসিয়া পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল, আর যেন প্রলয়-দেবতার তাণ্ডব নৃত্যে আলোড়িত বিরাট মশাল হইতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গের ঘূর্ণিবৃষ্টি ব্যোমপথে ঝরিয়া পড়িতেছিল। বিদ্যুচ্ছটার মতো তীব্র জ্যোতিতে দূরতম দিক্‌প্রান্ত আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং তন্মধ্যে লাটুর্গের ছায়ামূর্ত্তি অকস্মাৎ অতিকায় দৈত্যের মতো কানন-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখাইতেছিল। সেই ভাঙনের সম্মুখে অস্পষ্ট অন্ধকারে গভেন ধীরে ধীরে পাদচারণা করিতেছিল। সময় সময় সে দুই হাতে মাথার পশ্চাদ্ভাগ চাপিয়া ধরিতেছিল। গভেন ভাবিতেছিল।

২

গভেনের আত্ম-জিজ্ঞাসা।

অতলস্পর্শ চিন্তাসাগরে সে মগ্ন। একটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে।

মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকের এ কি রূপান্তর!

অথচ এই পরিবর্ত্তন গভেন স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। জটিল ঘটনাজালের পরিণতি যে এমন অদ্ভুত হইয়া দাঁড়াইবে সে তাহা কখনো কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, এমন ব্যাপার সম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব আজ সম্ভব হইয়াছে। শুধু তাই নয়, তাহা আজ নিতান্তই প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট, অপরিহার্য্য সত্যরূপে সম্মুখে উপস্থিত।

ইহাকে এড়াইবার যো নাই। সঙ্কল্প এখন স্থির করিতে হইবে। যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তাহার উত্তর না দিয়া উপায় নাই। কে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিল?—ঘটনা-চক্র।

কেবল ঘটনা-চক্রই বা বলি কেন? ঘটনা পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু বিবেক অপরিবর্ত্তনীয়। ঘটনা-চক্র যখন আমাদের অন্তরাত্মার নিকট কোন প্রশ্ন উপস্থিত করে, আমাদের অন্তরস্থ চিরজাগ্রত বিবেক তখন আমাদিগকে তাহার উত্তর দিতে বাধ্য করে।

আকাশের মেঘ আমাদিগকে ছায়ায় আবৃত করে, কিন্তু মেঘের উপর হইতে নক্ষত্র-নিচয় তাহাদের কিরণরেখা আমাদের দিকে প্রেরণ করে। ছায়া কিংবা আলো—ইহাদের কোনটাকেই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

গভেন যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া; নির্দ্দয় বিচারকের কঠোর প্রশ্নের জবাবদিহি করিতেছে। বিচারক—তাহার নিজেরই বিবেক।

গভেন অনুভব করিল তাহার অন্তরাত্মা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প, পবিত্র শপথ, সুচিন্তিত

সিদ্ধান্ত—সমস্তই তাহার অন্তরস্থ এই ভীষণ ভূমিকম্পে ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে। এই মাত্র সে যাহা দেখিয়াছে যতই সে তাহা চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে সমস্ত ওলট পালট হইয়া যাইতে লাগিল।

গুরুতর সমস্যা! আর গভেন তাহার সহিত সংসৃষ্ট। সির্মুর্দ্যান যতই কেন বলুন না, "এর সঙ্গে তোমার আর কোন সংস্রব নাই," গভেন কিছুতেই এ ব্যাপার হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিতে পারিল না। প্রভঞ্জনের বেগে মহান্ মহীরুহ যখন সমূলে উৎপাটিত হয় তখন তাহার বক্ষে যে বেদনা বাজে গভেনও বুকের মধ্যে সেইরূপ বেদনা অনুভব করিল।

মনুষ্য-চরিত্র মাত্রেরই একটা ভিত্তিভূমি থাকে। তাহা টলিয়া উঠিলে বড়ই বিপদ। গভেনের এখন সেই দারুণ বিপদ সমুপস্থিত। দুই হাতে মাথা চাপিয়া সে এই সমস্যার মধ্যে সত্যের সন্ধান পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। এই রকম একটা ব্যাপার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা সহজ নহে; মানসিক যন্ত্রণা তাহাতে খুবই বেশী। তাহার সম্মুখে যেন রাশীকৃত অঙ্ক সংখ্যা, সে গুলির সমষ্টি তাহাকে করিতে হইবে। গণিতের নিয়মে যেন মানুষের অদৃষ্টকে কষিয়া দেখিতে হইবে। গভেনের মাথা ঘুরিতে লাগিল। বিষয়টা সে ভাবিয়া দেখিতে বিশেষ চেষ্টা করিল; চিন্তা-সূত্র একত্রিত করিয়া ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে করিতে অন্তরমধ্যে উদ্ভূত বিদ্রোহ-ভাবকে সংযত করিতে প্রয়াস পাইল; মনের সম্মুখে সমস্ত ঘটনাবলী সে যেন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সজ্জিত করিল।

এই রকম প্রশ্ন সময় সময় কাহার না মনোমধ্যে উদিত হয় যখন জীবন-পথে অগ্রসর হওয়া কি পশ্চাৎপদ হওয়া —ইহাই সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়?

গভেন এইমাত্র এক অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। পার্থিব সংগ্রামের সমাপ্তি হইতে না হইতেই এক স্বর্গীয় সংগ্রামের সূচনা—সু ও কু-এর দ্বন্দ্ব। অবশেষে পাষাণ হৃদয় পরাস্ত হইয়াছে।

সমস্ত অনর্থের মূল—সমস্ত অকল্যাণের আশ্রয়, হিংস্র; ভ্রান্ত, অন্ধ; গর্ব্বিত, আত্মম্ভরী, একগুঁয়ে এই লোকটার অকস্মাৎ একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! মানব-প্রেম মানবত্বকে ছাপাইয়া উঠিল। কিরূপে ইহা সম্ভব হইল? ক্রোধ ও জিঘাংসার অভ্রংলিহ পর্ব্বতশৃঙ্গ কিরূপে ভূমিসাৎ হইল? কোন্ অস্ত্রে কোন্ যুদ্ধোপকরণের সাহায্যে? সে যে শিশুর দোল্‌না শয্যা।

গভেনের চোখে ধাঁধা লাগিল। সামাজিক বিরোধের সংঘর্ষ যখন দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কৃষ্ণ মূর্ত্তি যখন পৈশাচিক উল্লাসে অট্টহাস্য করিতে করিতে দারুণ বিষ উদ্গীরণ করিতেছে, যখন প্রতিদ্বন্দ্বীগণের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি কামানের গোলার মতো প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতেছে, আর ন্যায় সাধুতা ও সত্যের ধারণাও একেবারে তাহাদের চিত্তপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই কিনা অজ্ঞেয় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অদৃশ্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চিরন্তন সত্যের মহতী জ্যোতিতে চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!

মিথ্যা ও আপেক্ষিক সত্যের অন্ধ দ্বন্দ্বের মধ্যে সহসা যেন সার সত্যের শান্ত মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। দুর্ব্বলের অকথিত আবেদনই যেন সন্ধি স্থাপনের সুযোগ ঘটাইল।

অতি অল্পকালের মধ্যে গভেন পর পর কত চিত্রই না দেখিল। সে দেখিল, তিনটি অসহায় জীব—সদ্যঃপ্রসূত বলিলেই হয়—অনাথ, পরিত্যক্ত অনুন্মেষিত-বিচারবুদ্ধি, এখনও ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না, মহাবিপদের মুহূর্ত্তেও হাস্যময়—এইরূপ তিনটি শিশুও প্রতিহিংসা, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি গৃহ-যুদ্ধের সর্ব্বপ্রকার ভীষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে জয়ী হইল। সে দেখিল পাপ-যজ্ঞের আহুতির জন্য প্রজ্বলিত ভীষণ নরকাগ্নিও অবশেষে নির্ব্বাপিত হইল এবং সমস্ত সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রই নিষ্ফল হইল। সে আরও দেখিল, প্রাচীন আভিজাত্যের দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কার ও নিষ্ঠুরতা, দীর্ঘকালের সামরিক অভিজ্ঞতা—যাহা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সকল প্রকার অন্যায়েরই সমর্থন করে, বৃদ্ধ বয়সের পাষাণ-কঠিন কূট রাজনীতি—সমস্তই শিশুর সরল দৃষ্টির সম্মুখে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা —শিশু যে এই সকলের সমষ্টি। শিশু-আত্মাকে ঘিরিয়া দেববালাগণ বুঝি নিঃশব্দ-চরণপাতে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

যুদ্ধের ভৈরব হুঙ্কার, হত্যার গুপ্ত মন্ত্রণা, বজ্রপাণি মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য—এই সকলের মধ্যে সহসা শিশুর

শুভ্র নির্ম্মলতা পুঞ্জীভূত পাপরাশিকে পদদলিত করিয়া সগর্ব্বে শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, আর সেই শিরে বিজয় মুকুট।

তখনকার মতো মনে হইতেছিল বুঝি অন্তর্বিপ্লব আর নাই; বর্ব্বরতা নাই; বিদ্বেষ নাই; পাপ নাই; অন্ধকার নাই। শিশুহাস্তের উষালোকে এইসব বিকট প্রেতছায়া বুঝি মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

এই দ্বন্দ্বে ভগবান ও শয়তানের উভয়েরই হস্ত যেমন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল, ইতিপূর্ব্বে বুঝি আর তেমন হয় নাই। মানুষের বিবেকেই এই দ্বন্দ্বের সংগ্রামের ক্ষেত্র। এতক্ষণ সংগ্রাম চলিয়াছিল ল্যান্টিনেকের বিবেকে। এখন আবার সেইরূপ সংগ্রাম—বুঝি তদপেক্ষাও গুরুতর তদপেক্ষাও কঠিনতর সংগ্রাম—আরম্ভ হইল আর এক বিবেকে। তাহা গভেনের।

গভেন ভাবিতে লাগিল।

শত্রু-পরিবেষ্টিত, দণ্ডিত, আইনের আশ্রয়বঞ্চিত মার্কুইস সার্কাসের বন্য জন্তুর মতো পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও লৌহ ও অগ্নি-বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ যে অলৌকিক ব্যাপার। এরূপ সংগ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ যে-পলায়ন তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অরণ্য আবার তাহার অধিকারের মধ্যে আসিয়াছিল, কাননের নিভৃত নেপথ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবার তাহার সুযোগ ঘটিয়াছিল; অরণ্যের ভূনিম্নে আত্মগোপন করিয়া আবার নবশক্তিতে যুদ্ধারম্ভ তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয়লক্ষ্মী গভেনকে বরণ করিয়া থাকিলেও ল্যান্টিনেকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি অচিরেই পুনরায় অসংখ্য-দুর্গ-স্বামী, অসীম-কান্তার-বিহারী, অদৃশ্য, অনভিগম্য, দুর্দ্দান্ত, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-দলপতি হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ জাল ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, মুক্ত পশুরাজ আবার জালের ভিতর ফিরিয়া আসিয়াছে। মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক স্বেচ্ছায় বিপদকে পুনরায় বরণ করিয়া লইয়াছেন।

তিনি যখন অগ্নি-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, তখন গভেন লক্ষ্য করিয়াছিল, তিনি কী নির্ভীক। নিজে পুড়িয়া মরিতে পারেন, কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। আবার যখন কাঠের মই দিয়া নামিয়া আসিয়া কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া শত্রুহস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন তখনও তিনি কেমন নির্ভীক্।

কেন তিনি এরূপ করিলেন? তিনটি শিশুকে বাঁচাইবার জন্য। তাহারা—সাধারণতন্ত্রের দল—তাহারা এই লোকটার সম্বন্ধে কি করিতে যাইতেছে? গিলোটিনে তাহাকে হত্যা করিতে?

এই শিশুত্রয় কি মার্কুইসের নিজের সন্তান? না। তাহার বংশের দুলাল? না। তাহার সমাজের? তাও নয়। অজ্ঞাত-কুলশীল, জীর্ণচীর-পরিহিত, নগ্নপদ, কুড়িয়ে-পাওয়া, তিনটি ভিখারী ছেলেমেয়ের জন্য এই অভিজাত বংশীয় বৃদ্ধ সামন্তরাজ বিপন্মুক্ত, স্বাধীন নিরাপদ হইয়াও আপনাকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়াছেন! শিশুদিগকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি আপনার গর্ব্বোন্নত শির—যাহা এতাবৎ কাল জনগণের ভীতিস্থল ছিল, কিন্তু অধুনা আত্মত্যাগে মহান্, সেই শির—অনায়াসে শত্রুর উদ্যত খড়্গতলে পাতিয়া দিলেন। তার তাহারা সেই বলি গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত হইয়াছে।

আত্মরক্ষা ও অপরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, এই দুইএর মধ্যে বাছাই করিয়া লইবার সমস্যা যখন উপস্থিত হইল তখন মহাপ্রাণ মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেক স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন। আর তাঁহার এই উদার নির্ব্বাচনই বিনা দ্বিধায় মঞ্জুর করিয়া তাহাকে বধ করা হইবে। বীরত্বের কি অদ্ভুত পুরস্কার! মহত্বের প্রতিদান বর্ব্বরতায়! রাষ্ট্রবিপ্লবের পক্ষে কি কলঙ্কের কথা! সাধারণতন্ত্রের কি মহাপতন!

কুসংস্কারপূর্ণ, দাস-মনোভাবাপন্ন এই লোকটা সহসা যেন রূপান্তরিত হইয়া মনুষ্যসমাজে ফিরিয়া আসিল; আর জগতের মুক্তি ও স্বাধীনতাকামীরা এখন ভ্রাতৃবিরোধ, রক্তপাত প্রভৃতি গৃহযুদ্ধের মলিন পঙ্কেই ডুবিয়া থাকিবে? ক্ষমা, ত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণাবলীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে ভ্রান্তির পক্ষীয়েরা, কিন্তু সত্যের সৈনিকগণের নিকট তৎসমুদয়ের আদর নাই!

তবে এই পরাজয়কেই মানিয়া লইতে হইবে? মহাপ্রাণতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জগতের চক্ষে প্রবলতর পক্ষই কি নিজেদের দুর্ব্বল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে? বিজয়-গৌরব-দীপ্ত ললাট কি হত্যাপরাধে কলঙ্কিত হইবে? লোকে বলাবলি করিবে, রাজপক্ষীয়েরা শিশুদের রক্ষা করিল, আর সাধারণতন্ত্রীরা বৃদ্ধদের প্রাণসংহার করিল!

মুগ্ধ জগৎ চাহিয়া দেখিবে,—এই বীর, অশীতিবর্ষীয় শক্তিমান্ বৃদ্ধ, এই নিরস্ত্র যোদ্ধৃপুরুষ, যাহাকে শৌর্য্যাভিভূত করিয়া ধৃত করা যায় নাই, পরন্তু কাপুরুষসুলভ পন্থাবলম্বনে আটক করা হইয়াছে, একটা সুমহৎ কার্য্য সমাপনের পরক্ষণে যিনি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—জগৎ দেখিবে—নির্ভীক্ পাদক্ষেপে বধ্যমঞ্চের সোপান আরোহণ করিতে করিতে তিনি কোন্ মহিমামণ্ডিত জ্যোতির্লোকে মহাপ্রস্থান করিতেছেন। সেই শির, যাহাকে ঘিরিয়া হুতাশনের কবল হইতে সদ্যঃরক্ষিত শিশুত্রয়ের সকৃতজ্ঞ মূক আবেদন নিঃশব্দে ব্যক্ত হইবে, কোন্ প্রাণে তাহারা সেই শির ঘাতকের কুঠার নিম্নে স্থাপন করিবে! কসাইয়ের পক্ষেও নিন্দনীয় এইরূপ শাস্তিতে মার্কুইসের বদনমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল, আর সাধারণতন্ত্রের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিবে! পরিতাপের কথা আরও এই যে, এমন একটা নৃশংস কাণ্ড সাধারণতন্ত্রের সেনাপতি গভেনের সম্মুখেই অনুষ্ঠিত হইবে!—যে ইহা বারণ করিতে পারিত, সে-ই চুপ করিয়া থাকিবে। "ইহাতে তোমার আর কোনও সংশ্রব নাই"—এই সদম্ভ অভয়বাণীতেই সে কি নিজেকে পাপমুক্ত মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে? এরূপ স্থলে স্বীয় ক্ষমতার অব্যবহারই কি দুষ্কার্য্যের সহায়তা নহে? গভেনের মনে এই কথা না উঠিয়া পারিলনা যে, এই পৈশাচিক কার্য্যে লিপ্ত যাহারা তাহাদের মধ্যে অনুষ্ঠানকারী অপেক্ষাও যে বিনা আপত্তিতে উহা অনুষ্ঠিত হইতে দিতেছে, তাহার আচরণই অধিকতর ঘৃণ্য, কারণ সে ত কাপুরুষ!

কিন্তু এই প্রাণদণ্ড—সে নিজেই কি এই প্রাণদণ্ডের ভয় দেখায় নাই? গভেন, দয়াশীল গভেনই কি ঘোষণা করে নাই যে, ল্যান্টিনেকের প্রতি কোনো দয়া দেখানো হইবে না—যে, ল্যান্টিনেক্ ধৃত হইলে সে নিজেই তাঁহাকে সিমুর্দ্যানের হস্তে সমর্পণ করিবে? গভেন তো সেই মস্তক সিমুর্দ্যানকে দিতে বাধ্য। তাই হৌক্। কিন্তু,—বাস্তবিক, ইহা কি সেই মস্তক?

এতদিন গভেন ল্যান্টিনেকের কেবল একটা দিকই দেখিয়া আসিয়াছে। সে নিষ্ঠুর যোদ্ধা, রাজ-কেন্দ্রীয় সামন্তপ্রথার উন্মাদ ভক্ত, বন্দীর হত্যাকারী, রক্তপিপাসু দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ। এরূপ লোককে গভেন ভয় করে নাই। তাহার প্রাণদণ্ড ঘোষণা করিতে গভেনের কিছুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। দুর্দ্দান্তের প্রতি সেও কঠোর হইতে পারিত। যাহারা হত্যা করে, সেও তাহাদিগকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। পথ সরল ও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার অনুসরণ করা কিছুমাত্র কঠিন হইত না। কিন্তু সহসা সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে পথের ঋজুরেখা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটা বাঁক,—ঘুরিবামাত্র চক্ষে নূতন জগৎ, দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্ত্তন, রঙ্গমঞ্চে ল্যান্টিনেকের এক অপরিচিত মূর্ত্তির আবির্ভাব। রাক্ষসের স্থলে বীরপুরুষ, তাহার চেয়েও বেশী, মানুষ—হৃদয়বান্ মানুষ। আর এ তো হত্যাকারী নহে, এযে রক্ষক। স্বর্গীয় জ্যোতিতে গভেনের চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল। মহানুভবতার বজ্রাঘাতে গভেন আহত হইল।

এই আলোকের আঘাত কি আলোকের প্রতিঘাত উৎপন্ন করিবেনা? অতীতের প্রতিনিধি কি ভবিষ্যতের প্রতিনিধিকে পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবে? বর্ব্বরতা ও কুসংস্কার-যুগের মনুষ্য সহসা দিব্যপক্ষ বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধব্যোমে উড়িয়া যাইবে, আর দেখিবে যে, আদর্শের পূজারী নিম্নে তমসাচ্ছন্ন পঙ্কিল ভূপৃষ্ঠে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছে! অতীতের শোণিতার্দ্র পঙ্কে গভেন গড়াগড়ি দিবে, আর ল্যান্টিনেক মহান্ ভবিষ্য-নবজীবনের অরুণ-কিরণে মণ্ডিত হইয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিবে!

আর একটা কথা—বংশের দাবী! সে যে রক্তপাত করিতে যাইতেছে—রক্তপাত হইতে দেওয়া এবং রক্তপাত করা একই কথা—তাহা কি তাহার নিজেরই রক্ত নহে? গভেন বংশেরই রক্ত নহে? তাহার পিতামহ মৃত কিন্তু তাহার খুল্ল-পিতামহ এখনও জীবিত। মার্কুইস ডি ল্যান্টিনেকই সেই খুল্ল-পিতামহ। গভেনের মনে হইল,

যেন তাহার পিতামহের প্রেতাত্মা সমাধিগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিয়া স্বীয় ভ্রাতার এই যে বলপূর্ব্বক সমাধির ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। যেন তিনি দিব্য-জ্যোতির্মণ্ডিত স্বীয় মস্তকের অনুরূপ সেই শুভ্র শিরের সম্মান করিতে গভেনকে আদেশ করিতেছেন। গভেন ও ল্যাণ্টিনেকের মাঝখানে যেন এক অশরীরী মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া—চক্ষে তাহার তিরস্কারসূচক সরোষ দৃষ্টি।

মানুষকে অমানুষ করাই কি রাষ্ট্রবিপ্লবের লক্ষ্য? সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক বন্ধন ছেদন করা এবং অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক সংস্কারকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা—এই করিতেই কি রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎপত্তি? কখনই নহে। এই সকল চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করিবার জন্য নহে, পরন্তু সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্যই '৮৯ সালের অভ্যুদয়। ব্যাষ্টিল-ধ্বংস মানব জাতির মুক্তিরই সূচনা করিয়াছে; সামন্ত-প্রথার উচ্ছেদ বংশ প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছে।

প্রশ্ন এই, ল্যাণ্টিনেক যখন পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উদার মানব-প্রেমের প্রশস্ত ভিত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইল, গভেন কি তখন সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে ফিরিয়া যাইবে? খুল্ল-পিতামহের অগ্রগতি কি ভ্রাতুষ্পৌত্রের পশ্চাদ্-গমন দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবে? না, উভয়েই আসিয়া আলোকের উচ্চস্তরে মিলিত হইবে?

স্বীয় বিবেকের সহিত লড়াই করিতে করিতে এই প্রশ্নই এখন গভেনের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার উত্তরটাও যেন মন হইতে স্বতঃই বাহির হইয়া আসিল, ল্যাণ্টিনেককে বাঁচাইতেই হইবে। হ্যাঁ, তা তো বটেই; কিন্তু—কিন্তু ফ্রান্স?

সমস্যা এইখানে। ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। ফ্রান্সের মহাবিপদ উপস্থিত—জার্মাণী রাইন নদী অতিক্রম করিয়া আসিতেছে; ইটালী আল্‌সের এবং স্পেন পিরে-নীজের গিরিশিখর উল্লঙ্ঘন করিয়া ফ্রান্সের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত। একমাত্র ভরসা—সাগর। পরিখীকৃত-সাগরা ফরাসীভূমি সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু সেই সাগর এখন আর তাহার আয়ত্তের মধ্যে নহে। সেখানে ইংলণ্ডেরই প্রভুত্ব। সত্য, ইংলণ্ড এই সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না। কিন্তু একজন ইংলণ্ডের জন্য এই সমুদ্রে সেতুবন্ধনের উদ্যোগী; সে আপনার অনুকূল হস্ত ইংলণ্ডের দিকে প্রসারিত করিয়াছে; পিট, ক্রেগ, কর্ণ-ওয়ালিশ, ডাণ্ডাস প্রভৃতি জলদস্যুগণকে সে সাদর আহ্বান জানাইয়া বলিতেছে, "এসো ইংলণ্ড, ফ্রান্স্‌কে আসিয়া অধিকার কর।" এই ব্যক্তিই মার্ক্‌ইস্‌ ডি ল্যাণ্টিনেক্‌।

সে এখন ধরা পড়িয়াছে। তিন মাসের উন্মত্ত প্রচেষ্টা ও অনুসরণের ফলে অবশেষে শিকার জালে পড়িয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের হস্ত এই মাত্র এই দেশ-বৈরীকে ধরিতে পারিয়াছে; '৯৩ সালের বজ্রমুষ্টি এই মাত্র এই রাজপক্ষীয় হত্যাকারীর গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। বিধাতার রহস্যময় অমোঘ বিধানে—দেশমাতৃকার এই কুসন্তান এখন স্ববংশেরই অন্ধকূপে অবরুদ্ধ হইয়া শাস্তির প্রতীক্ষা করিতেছে। স্বদেশের শত্রুতাসাধন করিতে যাইয়া এই কুলাঙ্গার এক্ষণে স্ব-বাসের পাষাণ কারায় নিজেই বন্দী। ইহাতে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের হস্ত স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে। কালের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের মহাশত্রুনিপাতের সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। এত হত্যা, এত রক্তপাতের পর সে এখন শৃঙ্খলিত। আর তাহার যুঝিবার শক্তি নাই, আর সে কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এইবার তাহারই বুদ্ধিতে পরিচালিত ভেণ্ডির বিদ্রোহানল চিরতরে নির্ব্বাসিত হইবে। যে এতদিন নির্দ্দয় ভাবে নরহত্যা করিয়া আসিয়াছে,—এইবার তাহার মরিবার পালা উপস্থিত। এমন লোককেও কি কেহ বাঁচাইতে চেষ্টা করে?

সিমুর্দ্যান অর্থাৎ '৯৩ সাল, ল্যাণ্টিনেক অর্থাৎ রাজতন্ত্রকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। কে তাহার বজ্রমুষ্টি হইতে শিকার ছিনাইয়া লইবে? সর্ব্বপ্রকার অন্যায় ও অবিচারের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ল্যাণ্টিনেক আজ স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মন্দিরে। বাহির হইতে কেহ আসিয়া সেই দ্বার অর্গলমুক্ত করিবে কি? এই সমাজদ্রোহী আজ মৃত—তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবিরোধ, জিঘাংসা ও গৃহবিবাদের অবসান হইয়াছে। তাহাকে পুনর্জীবিত করা কি সঙ্গত হইবে? মৃতমুখে ক্রূর হাসি কি তাহা হইলে পুনরায় ফুটিয়া উঠিয়া বিদ্রূপ করিবে না, "বেশ তো আবার বাঁচিয়া উঠিলাম, —ওরা কি নির্ব্বোধ!"

আবার সে দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, আবার গৃহদাহ, গ্রাম ধ্বংস, নরহত্যা, নারী-হত্যা, শিশুহত্যা অবাধে চলিতে থাকিবে।

তারপর, ল্যাটিনেকের যে কার্য্য গভেনকে এত মুগ্ধ করিয়াছে বাস্তবিক বলিতে গেলে গভেন সেটাকে একটু বেশী বাড়াইয়া দেখিতেছে নাকি? তিনটি শিশুকে ল্যাটিনেক ভীষণ অপমৃত্যু হইতে উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্কটের মুখে কে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছিল? ল্যাটিনেক নিজেই নয় কি? সজ্জিত ইন্ধনের মাঝখানে শিশু-শয্যাগুলিকে স্থাপন করিয়াছিল কে? ইমানুস্ নয় কি? আর সেই ইমানুস্ কে? সে তো মার্কুইসেরই তাঁবেদার। তাহার কার্য্যের জন্য তাহার প্রভু মার্কুইসই তো দায়ী। ল্যাটিনেকই অগ্নিদ এবং হত্যাকারী। কি এমন বাহাদুরীর কাজ সে করিয়াছে? তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি সে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত করে নাই—এই মাত্র। নিজেরই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভীষণ পরিণামে শেষটায় সে নিজেই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। মহাপাপীরও অন্তরে কিছু না কিছু করুণার লেশ প্রচ্ছন্ন থাকে—আতঙ্কিতা জননীর মর্ম্মভেদ ক্রন্দনে ক্ষণেকের জন্য মার্কুইসের অন্তরে সেই সুকুমার বৃত্তিটি জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহারই প্ররোচনায় সে অন্ধকারের গর্ত্ত হইতে আলোকে ফিরিয়া আসে, প্রারব্ধ অপকর্ম্মের সমাপ্তি ঘটিতে দেয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত সে রাক্ষসের কাজ করে নাই—এইটুকুই তাহার স্বপক্ষে বলিবার। এই যৎসামান্য কর্ম্মের প্রতিদানে তাহাকে সব ফিরাইয়া দিতে হইবে? জীবন, মুক্তি, অরণ্যের আধিপত্য, প্রান্তরের অবাধগতি, শস্তক্ষেত্রের প্রাচুর্য্য সব তাহাকে দিতে হইবে? আর সে তৎপরিবর্ত্তে দাসত্বের ভিত্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে এবং ধ্বংস ও মৃত্যুর বিস্তারে তাহার সমগ্র শক্তির প্রয়োগ করিতে থাকিবে?

এই উদ্ধত লোকটার সঙ্গে কোনো আপোষ মীমাংসা, বোঝাপড়াও হইতে পারেনা। আর সে বিদ্রোহ করিবে না এবং সকল প্রকার দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইবে এইরূপ সর্ত্তে যদি তাহার নিকট মুক্তির প্রস্তাব উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ঘৃণাভরে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রস্তাবকারীর মুখের উপরই বলিবে—"এরূপ লজ্জা তোমাদেরই থাক্, আমাকে হত্যা কর।"

এক কথায়, উহাকে বধ করা কিংবা মুক্তি দেওয়া ভিন্ন আর তৃতীয় পন্থা নাই। সে যেন এক উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে দণ্ডায়মান—ঊর্দ্ধে উড়িয়া যাইতে কিংবা নিম্নে ঝম্প প্রদান করিতে সে সর্ব্বদাই সমান প্রস্তুত। অদ্ভুত লোক! তাহার প্রাণ নেওয়া?—ইহাতে কত না উদ্বেগ! তাহাকে ছেড়ে দেওয়া?—কত বড় দায়িত্ব! ল্যাটিনেক রক্ষা পাইলে ভেণ্ডির সংগ্রাম আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইবে; নির্ব্বাপিত অগ্নি মুহূর্ত্তমধ্যে পুনঃপ্রজ্জ্বলিত হইয়া দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইবে। সাধারণ-তন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করিয়া, ফ্রান্সের বুকের উপর ইংলণ্ডের আসন না পাতিয়া ল্যাটিনেক নিরস্ত হইবে না। সুতরাং ল্যাটিনেকের প্রাণরক্ষা মানে ফ্রান্সের বলিদান—নির্দ্দোষ নরনারী, বালকবালিকার জীবন-বিনাশ, রাষ্ট্র-বিপ্লবের সংহার! পরস্পর-বিরোধী চিন্তাসংঘর্ষের অনিশ্চিতা-লোকে গভেন দেখিল, তাহার সম্মুখে এই দুরূহ সমস্যা—শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রের মুক্তিদান!

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই প্রথম প্রশ্ন তখন গভেনের মনে উত্থিত হইল,—বস্তুতঃই কি ল্যাটিনেক এক হিংস্র ব্যাঘ্র? হয় তো সে ইতিপূর্ব্বে সেইরূপ ছিল কিন্তু এখনও কি তাই? গভেনের উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কে চিন্তার ধারা ওলট পালট হইয়া গেল। বিবেকের সহিত বুদ্ধির আভ্যন্তরিক সংগ্রামে তাহার আত্মা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ল্যাটিনেকের অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, মহান্ আত্মত্যাগ, এবং অসাধারণ নিঃস্বার্থপরতা অস্বীকার করা যায় না। এই গুলিই আসল সত্য। রাজত্ব, রাষ্ট্রবিপ্লব, পার্থিব সকল ব্যাপারের বহু ঊর্দ্ধে মানবতার মহাসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সবলমাত্রই দুর্ব্বলের আশ্রয়স্থল, পিতার মতো শিশুদিগকে রক্ষা করা সকল বয়স্ক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য—ল্যাটিনেক নিজের জীবন বলিদান দিয়া তাহাই প্রমাণিত করিয়াছে। সে একজন সমরকুশল সেনাপতি হইয়াও উপস্থিত-প্রতিহিংসার সুযোগ হেলায় পরিত্যাগ করিয়াছে। রাজতন্ত্রের এক বিশাল স্তম্ভ হইয়াও

সে তিনটি অজ্ঞাতকুলশীল কৃষকশিশুর তুলনায় দেড় হাজার বৎসরের রাজতন্ত্র তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে। ইহার পরেও কি তাহাকে ব্যাঘ্র বলা চলে? এখনও তাহার প্রতিহিংস্র পশুবৎ ব্যবহার করা কি সঙ্গত হইবে? গৃহযুদ্ধের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরতল যে সুমহৎ আত্মত্যাগের দিব্যালোকে আলোকিত করিয়াছে, সে রাক্ষস নহে। কৃপাণপাণি নরঘাতক এখন দেবত্বের জ্যোতিতে মণ্ডিত। স্বর্গভ্রষ্ট শয়তান আবার অমরায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি মাত্র ত্যাগের কার্য্যদ্বারা ল্যান্টিনেক তাহার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। পার্থিব জগতে হারিয়া গিয়া সে অধ্যাত্ম জগতে জয়ী হইয়াছে। সে আজ নিষ্পাপ, সে আজ মুক্ত। এখন হইতে সে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

সাধারণ মানুষ যাহা করিতে পারে না ল্যান্টিনেক এইমাত্র তাহাই করিয়া আপনার অসাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে। এইবার গভেনের পালা। এই ঘাতপ্রতিঘাতময় যুগসন্ধির অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল নিদারুণ নিষ্পেষণ হইতে ল্যান্টিনেক মানব-শিশুকে রক্ষা করিয়াছে। এখন সেই স্ববংশীয়কে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গভেনের। এমন অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য কি? বিধাতা তাহার উপর যে ভার অর্পণ করিয়াছেন সে কি সেই ন্যায়-রক্ষার পশ্চাৎপদ হইবে? কখনই নহে। তাহার মুখ হইতে অনুচ্চস্বরে এই কথা বাহির হইল, "ল্যান্টিনেককে বাঁচাইতেই হইবে।" অমনি তাহার মনের ভিতর কে যেন বলিয়া উঠিল,—"বেশ, ভাল। তাই কর। ইংরেজদের তাহাতে খুব সুবিধা হইবে। শত্রুর সহায় হও। ল্যান্টিনেককে বাঁচাও, আর ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ কর।" গভেন কাঁপিয়া উঠিল। "হায়, স্বপ্নমুগ্ধ! তুমি যেরূপে সমস্যার সমাধান করিতে চাও, তাহা কোনো কাজের সমাধানই নয়।"

অন্ধকারে গভেন দেখিল, দুর্জ্জেয় মহাকালের আননে যেন বিদ্রূপের হাসি। সে তখন এক সঙ্কটময় ত্রি-পথে উপস্থিত—একদিকে মানবপ্রেম, একদিকে গোত্র, একদিকে স্বদেশ। প্রত্যেকেই সত্য—অথচ সকলেই পরস্পরের বিরোধী, এ বলে এইটে কর, ও বলে, এইটে কর। সে কি করিবে? যুক্তি বলে এক, হৃদয় বলে আর। এ যেন দুই প্রতিপক্ষ কৌসুলির বক্তৃতা। তর্কশাস্ত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; ভাবাবেগ বিবেকের উপর। যুক্তি আসে মানুষের মন হইতে; অন্যটি—আরও গভীরতর উৎস হইতে। এইজন্য ভাবাবেগ যুক্তি অপেক্ষা অস্পষ্ট হইলেও অধিকতর ক্ষমতাশালী।

তবুও নিরেট যুক্তির প্রভাব কম নহে। গভেন দ্বিধায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে কি পাগল হইয়া যাইবে? দুইটি অতলস্পর্শ গহ্বর তাহার সম্মুখে। সে কি মার্কুইসকে মরিতে দিবে? না তাহাকে বাঁচাইবে? হয় এই, না হয় ওই গহ্বরে তাহাকে ঝম্প প্রদান করিতে হইবে। কে বলিবে, ইহার কোনটির ভিতর দিয়া কর্ত্তব্যের পথ?

৩

সৈন্যাধ্যক্ষের শিরচ্ছেদ

এই বিজেতৃগণকে এখন 'কর্ত্তব্য' লইয়াই বুঝাপড়া করিতে হইতেছিল। কর্ত্তব্যটি সিমুর্দ্যানের চক্ষে কঠোর মাত্র; কিন্তু গভেনের চক্ষে ভয়ঙ্কর। একজনের নিকট উহা সহজ; অপরের নিকটে জটিল, বক্র, বিভিন্নমুখী।

রাত বারোটা বাজিয়া গেল; তারপর একটা।

নিজের অজ্ঞাতসারে গভেন ক্রমে ক্রমে দুর্গ প্রাচীরের ভাঙনের দিকে অগ্রসর হইল। নির্ব্বাসিতপ্রায় অগ্নি থাকিয়া থাকিয়া আলোকের ঝলক নিক্ষেপ করিতেছিল। সেই আলোকে কারাদুর্গের অপর পার্শ্বস্থ ভূমি ক্ষণে ক্ষণে পরিদৃশ্যমান হইয়া উঠিতেছিল, আবার ধূমে আবৃত হইয়া যাইতেছিল। এই আলো আঁধারের সংমিশ্রণে শাস্ত্রীগণকে ছায়ামূর্ত্তির মতো দেখাইতেছিল। চিন্তামগ্ন গভেন পুত্তলিবৎ দাঁড়াইয়া এই ধূম ও অগ্নিশিখার লড়াই দেখিতেছিল। তাহার মনের ভিতর যে সংগ্রাম চলিতেছিল, উহা তাহারই অনুরূপ।

নিভন্ত চুল্লী হইতে সহসা একটি দীর্ঘ বহ্নিশিখা বহির্গত হইয়া মালভূমির শীর্ষদেশ আলোকিত করিয়া তুলিল, এবং তাহাতে সিন্দুর-রাগরক্ত পটের উপর একটা মালগাড়ীর কৃষ্ণ ছায়া ফুটিয়া উঠিল।

গভেন বিস্ফারিতনেত্রে ইহার দিকে চাহিয়া রহিল। শকটের চতুষ্পার্শে অশ্বারোহী—তাহাদের মস্তকে মিলিটারী পুলিশের শিরস্ত্রাণ। সূর্য্যাস্তকালে গেচাম্পের দূরবীণ দিয়া সে দূরদিগন্তে যে শকট লক্ষ্য করিয়াছিল ইহা তাহাই বলিয়া গভেনের অনুমান হইল। কেহ কেহ গাড়ীতে উঠিয়া উহা হইতে একটা বোঝা নামাইতেছে। বোঝাটা খুব ভারী বোধ হয়। মাঝে মাঝে লৌহঝনৎকার শব্দ শোনা যাইতেছিল। জিনিষটা কি ঠিক ঠাহর করা কঠিন। কাঠের ফ্রেমের মতো যেন কি। দুইজন লোক একটা বাক্স নামাইল, তন্মধ্যে, যতদূর দেখা যায়, একটা ত্রিকোণ পদার্থ।

আলোকরেখা মিলাইয়া গেল। আবার সব গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। গভেন সেই আঁধারে ঢাকা পদার্থটার দিকে চাহিয়া চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

লণ্ঠন জ্বালা হইল। মালভূমির উপর লোক সকল আনাগোনা করিতে লাগিল। গভেন যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে সব স্পষ্ট দেখা যায় না। কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে, কিন্তু কথা বুঝা যায় না। কখনো যেন কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি হইতেছে, এরূপ শব্দ শোনা যায়। কাস্তে ধার দেওয়ার মতো ধাতবপদার্থের ঘর্ষণজনিত এক প্রকার শব্দও মাঝে মাঝে তাহার কাণে আসিয়া পৌছিতেছিল।

দুইটা বাজিল।

ধীরে ধীরে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি-পরিচালিত হইয়া গভেন সেই ভাঙনের নিকট উপস্থিত হইল। অন্ধকারের মধ্যেও সৈন্যাধ্যক্ষের ওভার-কোট চিনিতে পারিয়া শান্ত্রী তাহাকে সামরিক অভিবাদন জানাইল। গভেন কারাচুর্গের নিম্নতলে প্রবেশ করিল। উহা এখন রক্ষীগৃহে পরিণত হইয়াছে। ছাদ হইতে একটা লণ্ঠন ঝুলিতেছে। তাহার ক্ষীণালোকে তৃণাবৃত মেঝের উপরে শয়ান সৈনিকগণকে না মাড়াইয়া কোনরূপে কক্ষতল অতিক্রম করা যায়।

ইহাদের অধিকাংশই নিদ্রিত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহারা লড়াই করিতেছিল; এখন ক্লান্ত হইয়া যেখানে সেখানে শুইয়া পড়িয়াছে। এই কক্ষে কি প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছিল—ভীষণ আক্রমণ ও সংঘর্ষ! কত আঘাত, কত প্রতিঘাত; কত হুঙ্কার, কত আর্ত্তনাদ। এখন সব শেষ হইয়াছে। এই সৈনিকগণের কত সাথী এখানে অন্তিম-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছে; আর এখন তাহারা সেইখানেই সুপ্তিমগ্ন। এই ত যুদ্ধ! আগামী কল্য হয়তো আবার সুপ্ত ও মৃত একই নিদ্রায় নিদ্রিত হইবে।

গভেন প্রবেশ করিলে কয়েকজন উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের মধ্যে একজন সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। গভেন অন্ধকূপের দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে বলিল, "খোলো"।

অর্গল অপসারিত হইল; দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

গভেন সেই কারাকক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহার পশ্চাতে দ্বার আবার রুদ্ধ হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী



√

পঞ্চাগ্নিতত্ত্বে ক্ষরাক্ষর প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ

ব্রহ্মগতপ্রাণ ঋষিদের মনোবীণায় অনিশ দীপক রাগিণীর ঝঙ্কার উঠিত—তাঁহারা ভোগ-বিলাসের সংসারে হোমানল-শিখা জ্বালিয়া নিত্য কামনার মুখাগ্নি করিতেন, ইন্দ্রিয় লালসাকে ভস্মীভূত করিয়া যজ্ঞের অঙ্গারে পরিণত করিতেন এবং আহিতাগ্নি হইয়া জীবন-অধ্বরে মূর্ত্ত পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেন। অগ্নি তাঁহাদের জীবনের কতখানি নির্ভর হইয়াছিল, অগ্নিতে তাঁহাদের প্রাণের মন্ত্র কিরূপ নিপুণতার সহিত লেখা হইয়াছিল তাহা ছান্দোগ্যের রহস্যময় পঞ্চাগ্নিতত্ত্বে সুব্যক্ত। বেদে যেরূপ তিন অগ্নির কল্পনা বেদায়তন জুড়িয়া আছে, ছান্দোগ্যে তেমনি পাঁচটি অগ্নির পরিকল্পনা সৃষ্টিরহস্যটিকে একটি অপরূপ রূপ দিয়াছে। ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম, Napoleon - a name that deserves a volume to itself, নেপোলিয়নের নাম লইতে যদি volume লিখিতে হয় তবে নেপোলিয়নের যিনি স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করিতে কত volume-এর প্রয়োজন ঘটিবে ইহা ত সহজ চিন্তার বিষয়। কিন্তু ছান্দোগ্য কি অতুলনীয়, কি অচিন্ত্যনীয় শক্তির প্রভাবে এই আকাশের মত মহাবিশাল বিষয়টিকে কয়েকটি মাত্র মন্ত্রের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন! ধন্য সেই ঋষির তপোবল—যাঁহার মানস-সরোবরে এই অপরাজেয় সৃষ্টিরহস্যটি কমলের ন্যায় দল মেলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহার সহিত তুলনায় মানুষের সাহিত্য মানুষের ভাষা কত দুর্ব্বল, ভাববহনে কত অপারগ।

আরুণির পুত্র আরুণেয় শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রবাহণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যায় শ্বেতকেতুর অধিকার জন্মিয়াছিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস; তাই যখন ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষি জীবলনন্দন প্রবাহণ, কুমারকে প্রশ্ন করিলেন 'কুমারানু ত্বাশিষ্য পিতেতি'—পিতা তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন কি? কুমার উত্তর করিলেন, 'অনু হি ভগব ইতি'—ভগবন্ অনু, অর্থাৎ হাঁ অনুশাসন করিয়াছেন।

কুমারের এই উত্তরে জৈবলি প্রবাহণ তখন তাঁহাকে পরলোক বিষয়ক পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন—

১। বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তীতি?—মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধে কোথায় প্রাণিগণ গমন করে জান কি?

২। বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি—ইহলোকে কিরূপে ফিরিয়া আইসে?

৩। বেত্থ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্ত্তনা—দেবযান পিতৃযানের বিয়োগস্থান কোথায়?

৪। বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যত ইতি—পিতৃযানগত প্রাণিদের দ্বারা সেই চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না?—

৫। বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি,—তুমি জান কি পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল কিরূপে পুরুষরূপে পরিণত হয়? এই পাঁচটির উত্তর একই হইল—'ন ভগব' ইতি।' প্রবাহণ এই উত্তর পাইয়া বুঝিলেন এমন প্রয়োজনীয় তত্ত্বের খবর না-জানা ব্রহ্মবিদ্যার নিগূঢ় কক্ষটিকে দেখিতে না-পাওয়া—তাই বলিলেন,—.

অথানু কিমনুশিষ্টোঽবোচথাঃ, যো হীমানি ন বিদ্যাৎ কথং সোঽনুশিষ্টো ব্রুবীতেতি।

প্রবাহণ-বাক্যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার আসন কত ঊর্দ্ধে তাহাই প্রমাণিত হইল। চক্ষু থাকিয়া যদি কেহ আকাশ ও তদঙ্গে সূর্য্যচন্দ্রতারকার দীপাবলী দেখিতে না পায়, তাহার দর্শন-শক্তির সার্থকতা যেমন অত্যন্ত পরিমিত হইয়া পড়ে, ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু কাহারও চক্ষুও তেমনি পঞ্চাগ্নির আকাশভুবন-জোড়া পঞ্চশিখা দেখিতে না পাইলে, তাহার ব্রহ্মদৃষ্টিও যে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল তাহা বলাই বাহুল্য। প্রবাহণ এমনি করিয়া শ্বেতকেতুকে চক্ষুহীন প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। যে-বিষয়টিকে জানিলে ব্রহ্মতত্ত্বে চক্ষুষ্মান্ হওয়া যায় এবং যাহার প্রয়োগ জীবনের উপর ফলাইতে পারিলে 'পরশ পাথর' পাওয়া ঘটে তাহার

আলোচনা সাধকের মনে 'পরশ পাথর' ছুঁয়াইতে পারে সত্য, কিন্তু পাঠকের মনে একটুকু হইলেও তাহার ঝিলিক লাগিতে পারে, কেননা লেখকের মন ইহার চমকে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে।

পিতা প্রবাহণ-সমীপে সমাগত হইয়া সেই প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করিলেন এবং যে-বিদ্যা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়-জ্ঞানের বিষয়ীভূত ছিল তাহার বিবৃতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা তখন সেই বিদ্যা দান করিলেন। পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে শেষোক্তটির প্রাধান্যই সুপরিস্ফুট। ইহার সহিত বাকী চারিটির শাখা-সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাই প্রথমে মূল ধরিয়াই আলোচনা সুরু হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহার মধ্যে সৃষ্টির গোপন সঙ্কেত ও অজ্ঞাত সৃষ্টিপরিচালনার সকল তথ্য নিহিত রহিয়াছে। দৃক্‌পাতেই প্রশ্নোত্তরটি একটি যজ্ঞের ফটোগ্রাফ বলিয়া অনেকের নিকট প্রতীয়মান হইবে এবং নীরস যজ্ঞীয় সেকেলে করণকারণ জ্ঞানে ইহাকে হয়ত অনেকে anachronism ভাবিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে চাহিবেন। কিন্তু লেখকের সানুনয় প্রার্থনা এই যে, মানুষের সহিত মানুষের যেমন যুগ-যুগান্তব্যাপী একই সম্বন্ধ, বর্ত্তমান ঋষিপ্রবচনের সহিতও বিংশ শতাব্দীর আমাদের সেই একই সম্বন্ধ। যজ্ঞের আবরণ উন্মোচন করিলে আমরা দেখিতে পাইব শুধু মানুষের কথাই বলা হইয়াছে। যে-নিয়মপদ্ধতি হোমধূমের মধ্যে যজ্ঞাঙ্গের ন্যায় সজ্জিত দেখা যায় উহার বাহিরের রূপটি হুবহু যজ্ঞীয় হইলেও ইহার ভিতরের কথাটি অতি সরল ও সত্য—সেই কথাটি হইতেছে এই:—প্রতি মানুষের জীবন একটী যজ্ঞের অনলের ন্যায় জ্বলিতেছে, তাই সহজ কথায় বলা চলে প্রতি মানুষের জীবনই একটি যজ্ঞ বিশেষ, তাহার আশে পাশে ছড়ান উপাদানে তাহারি জীবন-যজ্ঞের নিত্যকার অনুষ্ঠান চলিতেছে। এই ব্যক্তিগত জীবন-যজ্ঞের ছবিটি মনে আঁকিয়া যেন নিতান্ত বিমুখ পাঠকও পাঠে মনোযোগী হয়েন ইহাই ঐকান্তিক অনুরোধ।

পুরাকালে ঋষিরা যজ্ঞ-গত প্রাণ ছিলেন—তাঁহাদের প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন হোম করিত, হবন ক্রিয়া দ্বারা তাঁহারা এমনি মণ্ডিত হইয়াছিলেন যে আহুতি যেন তাঁহাদের প্রাণ স্বরূপ হইয়াছিল। যে দেবতার উদ্দেশে তাঁহারা হোম করিতেন সেই দেবতার নিকট যেন তাঁহাদের আহুতি তন্মুহূর্ত্তেই পৌছিত। সেই সেই দেব সমীপে আহুতির পৌছান যে-কথা, সেখানে তাঁহাদের সশরীরে পৌছানও সেই কথা, কারণ আহুতি ছিল তাঁহাদের অভিন্ন অভিব্যক্তি। আচার্য্য শঙ্কর পঞ্চম প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বাজসনেয়কের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চান,—জীবনব্যাপী যজমানের যে যজ্ঞাহুতি তাহারই ঠিক অনুকরণে তাঁহার নিজেরও জীবন দেহান্তে উর্দ্ধলোকচারী হয়।

অগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ কার্য্যারম্ভো যঃ, স উক্তো বাজসনেয়কে—'তং প্রতি প্রশ্নাঃ। উৎক্রান্তিরাহুত্যোর্গতিঃ প্রতিষ্ঠা তৃপ্তিঃ পুনরাবৃত্তির্লোকং প্রত্যুত্থায়ী ইতি।

আহুতির গতি কোন্ কোন্ লোকে পৌছিত এবং কি ভাবে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইত তৎসম্বন্ধে বাজসনেয়ক একটি নির্দ্দেশ আঁকিয়া দিতেছেন—

'তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ, তেঽন্তরিক্ষমাবিশতঃ, তেঽন্তরিক্ষমেবাহবনীয়ং কুর্ব্বাতে······তে অন্তরিক্ষং তর্পয়তঃ, তে তত উৎক্রামতঃ····· এবমেব পূর্ব্বদ্দিবং তর্পয়তস্তে ততঃ আবর্ত্তন্তে।'

বাজসনেয়কের উক্তি এতৎপ্রসঙ্গের পূর্ব্বাভাষ রূপে দাঁড় করাইয়া আচার্য্য শঙ্কর ইহার সহিত ছান্দোগ্য বর্ণিত বিদ্যার এই পার্থক্য করিতেছেন—

ইহ তু তং কার্য্যারম্ভমগ্নিহোত্রাপূর্ব্ববিপরিণামলক্ষণং পঞ্চধা প্রবিভজ্য······বাজসনেয়কে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে আহুতিদ্বয়ের কার্য্যারম্ভ আর এখানে সেই আহুতিদ্বয়ের পরিণাম স্পষ্টরূপে ফুটাইবার জন্য সেই কার্য্যারম্ভকেই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করিয়া পাঁচ অগ্নি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাই ছান্দোগ্যের মন্ত্র এইরূপ আরম্ভ হইয়াছে—

অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্ রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চ্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রানি বিস্ফুলিঙ্গাঃ, ৫. ৪. ১

যজমানের প্রাতঃসন্ধ্যায় 'অগ্নিহোত্র' নামক যজ্ঞানুষ্ঠানে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, উহাই আহবনীয় অগ্নি—উহাতে যজমান হোম করেন। মর্ত্ত্যের অগ্নির স্বরূপ হইতেছে দ্যুলোকের আদিত্য—এ অগ্নিতে হবনাদি ক্রিয়া চলিলে ইহার বিস্তৃতি

তত্দূর পর্য্যন্ত পৌছে। ভূলোকে অগ্নির যেমন সমিৎ, ধূম, অর্চ্চিঃ, অঙ্গার ও স্ফুলিঙ্গাদি থাকে, দ্যুলোকের সূর্য্যেরও সেই সব আছে। আচার্য্য শঙ্কর এই উপমানস্থ উৎসরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন।

তস্যাগ্নের্দ্যুলোকাখ্যস্য আদিত্য এব সমিৎ, তেন হি ইন্ধোঽসৌ লোকা দীপ্যতে……রশ্ময়ো ধূমঃ, তদুত্থানাৎ, সমিধো হি ধূমো উত্তিষ্ঠতি। অহরর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ… চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ অহ্নঃ প্রশমেঽভিব্যক্তেঃ, অর্চ্চিষো হি প্রশমে অঙ্গারা অভিব্যজ্যন্তে। নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ চন্দ্রমসোঽবয়বা ইব……ইহাতে সুনিপুণ কবিত্বই প্রকাশিত হইয়াছে—আদিত্য জলন্ত কাঠের ন্যায় জ্বলিতেছে, অগ্নি হইতে ধূমের ন্যায় সূর্য্যরশ্মি নির্গত হইতেছে, অগ্নির প্রকাশবৎ সূর্য্যের প্রকাশ হইল দিবা, অগ্নি নিভিলে যেমন অঙ্গার প্রকাশ করে তেমনি সূর্য্যাস্তে চন্দ্র প্রকাশমান হয় এবং নক্ষত্রগুলি অঙ্গারের স্ফুলিঙ্গবৎ দিগদিগন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অতি সুষ্ঠু উপমা।

এইরূপে ভূর্লোক ও দ্যুলোকে দুই অগ্নি পাইলাম, ইহারা দুই এ এক। যজমান যখন মর্ত্ত্যাগ্নিতে হোম করিবে ইহা তখনি উপরি-উক্ত দিব্যাগ্নিতে অর্পিত হইবে। সুতরাং এখানেই পঞ্চাগ্নির প্রথমটিকে পাইলাম। যজমান এই অগ্নিতে হোম করেন—

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি।

এই অগ্নিতে যজমান (দেবাঃ) শ্রদ্ধাকে আহুতি স্বরূপ প্রদান করেন। শ্রদ্ধা কাহাকে বলি?—'অগ্নিহোত্রাহুতি-পরিণামাবস্থারূপাঃ সূক্ষ্মা আপঃ শ্রদ্ধাভাবিতাঃ শ্রদ্ধা উচ্যন্তে।' আহুতির সাধন স্বরূপ সোমঘৃতাদি সংযুক্ত জলই শ্রদ্ধা শব্দে অভিহিত। তাহা হইলে দাঁড়াইল—দেবগণ বা যজমানেরা জলরূপ শ্রদ্ধার হোম করিয়া থাকেন, 'তাং শ্রদ্ধাং অবরূপাং জুহ্বতি'। পাঠকের দৃষ্টি 'সূক্ষ্ম অপ্' কথাটির প্রতি আকর্ষিত করিতেছি, কারণ আগন্তু 'অপের' মধ্যে সমগ্র পঞ্চাগ্নিতত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। শ্রদ্ধাখ্যা এই অপেরই ক্রমিক পরিণতি দেখান শ্রুতির অভিপ্রেত।

শ্রদ্ধাখ্যা অপ্ আহুত হইলে ইহার ফল কি হইল? সোমো রাজা সম্ভবতি। ইহার অর্থ কি? সোম হইল চন্দ্র, যজমানগণ এই সংসারে থাকিয়া কিরূপে চন্দ্রলোকে যাইবে? পূর্ব্বভাষ্যাংশে দেখিয়াছি আহুতির গতি ইত্যাদি আলোচনার বিষয়, যজমানের স্বয়ং উৎক্রান্তি নহে। এখানে শঙ্কর তাহা পরিষ্কার করিয়া কহিতেছেন—'ন যজমানানাং গতিঃ।' তবে চন্দ্রলোকে কে যায়? 'ঋগ্বেদাদিপুষ্পরসা ঋগাদিমধুকরোপনীতাঃ তে আদিত্যে যশ আদি কার্য্যং রোহিতাদিরূপলক্ষণমারভন্তে' ইত্যুক্তম—ঋগ্বেদ পৃথিবীতে প্রচারিত অবস্থায় যেমন উহার জ্যোতিঃ আদিত্যলোকে জ্বল জ্বল করে সেইরূপ এখানে কৃত আহুতি ও চন্দ্রলোকে দীপ্তি জাগায়—তথা ইমা অগ্নিহোত্রাহুতিসমবায়িন্যঃ সূক্ষ্মাঃ শ্রদ্ধা-শব্দবাচ্যা আপঃ দ্যুলোকমনুপ্রবিশ্য চান্দ্রং কার্য্যমারভন্তে…।

আহুতিকে আমরা পূর্ব্বে যজমানের স্বরূপ বলিয়াছি। যদি আহুতি সূক্ষ্মভাবে চন্দ্রমণ্ডলে পৌছিতে পারে তবে যজমানের মনেও সেই স্বর্গলোকের ঝঙ্কার উঠিবে। শঙ্কর কহিতেছেন—'যজমানাশ্চ তৎকর্ত্তারঃ আহুতিময়া আহুতিভাবনাভাবিতা আহুতিরূপেণ কর্ম্মণা আকৃষ্টাঃ শ্রদ্ধাপ্সমবায়িনো দ্যুলোকমনু প্রবিশ্য সোমভূতা ভবন্তি।'. যজমান মর্ত্ত্যধামে থাকিলেও তাঁহার মন আহুতি সহযোগে চন্দ্রলোকে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তিনি চন্দ্রদ্যুতিসম্পন্ন হয়েন। শঙ্কর এই যাহা বলিলেন 'যজমান আহুতিভাবভাবিত হইয়া……সোমস্বরূপ হন…।' কিন্তু যজমান প্রত্যুত চন্দ্রলোকে গমন করেন না—"অত্র তু আহুতিপরিণাম এব পঞ্চাগ্নিসম্বন্ধক্রমেণ বিবক্ষিত, উপাসনার্থম্, ন যজমানানাং গতিঃ।' এখানে শুধু আহুতির পরিণাম দেখানই লক্ষ্য।

আমরা জানি মনের অধিদৈব চন্দ্র, মন আহুতি দ্বারা চন্দ্রময় 'সোমভূত' হয়—ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে আহুতি ক্রিয়া দ্বারা যজমানের মন অধিদৈব চন্দ্রের পূর্ণাধিষ্ঠানে যায় অর্থাৎ মন যজ্ঞসঙ্কল্পময় হয় —যথা 'ক্রতুময়ঃ পুরুষ।' ক্রতু যজ্ঞবোধক, যেমন শতক্রতু। সেই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—'অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথা ক্রতুরস্মিন্ লোকে তথেতঃ প্রেত্য ভবতি।' শ্রদ্ধাখ্যা অপ্‌কে হোম করিলে যজমানের মন ক্রতুময় হয়, ইহাই 'সোমো রাজা সম্ভবতি।'

প্রথমাগ্নিতে হোম করায় ফলে আহুতির পরিণাম কি

দেখাইতে হইলে আর একটি রসাত্মক শব্দ আনা প্রয়োজন অথচ যজ্ঞের অর্থও যেন তাহাতে স্ফুট থাকে। সোমরস যজ্ঞের সেরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ ব্যঞ্জনা আছে—১ম ব্যাপক যজ্ঞার্থ, ২য় অপজনিত রসের বিশেষার্থ। সর্ব্বোপরি ওষধীশ-রূপে সোম ত চন্দ্র হইবেই।

এক্ষণে আমরা দ্বিতীয় অগ্নির স্মরণ করিতে পারি। ছান্দোগ্যোক্ত মন্ত্রটি এইরূপ :—

পর্জ্জন্যোবাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদ-প্রাণো ধূমো বিদ্যুদর্চ্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

আচার্য্য ইহার উপর লিখিতেছেন—'পর্জ্জন্যো নাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানী দেবতা বিশেষঃ,...বায়ুনা হি পর্জ্জন্যোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে......' পর্জ্জন্য প্রসিদ্ধ বৈদিক দেবতা, ইহা দ্বিতীয় অগ্নি, বায়ু, সমিধের ন্যায় কার্য্য করে; ঝড়ের সময়ের চিত্র মনে আনিলে'ই ইহার উত্তম প্রতীতি জন্মে। জমকাল মেঘের কোণে যে পাতলা মেঘ খেলে ইহা যেন পর্জ্জন্যরূপ অগ্নির ধূম বিশেষ—আর যে বিদ্যুৎ ঝলসায় উহা যেন পর্জ্জন্যের প্রভা, ঝড়ে কড়্ কড়্ যে বাজ পড়ে উহা হইল কিনা অঙ্গার এবং হুঙ্কারটি হইল বিস্ফুলিঙ্গ।

অগ্নি দেখা গেল—এখন আহুতির পালা।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্যাহুতে র্বর্ষং সম্ভবতি।

ভাষ্যঃ—'শ্রদ্ধাখ্যা আপঃ সোমকারপরিণতাঃ দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে পর্জ্জন্যাগ্নিং প্রাপ্য বৃষ্টিত্বেন পরিণমন্তে।'

পূর্ব্বে শঙ্কর কহিয়াছেন—'শ্রদ্ধাই জলস্বরূপা এবং অপ্ই শ্রদ্ধাবলম্বনে সংস্কার সম্পন্ন হইয়া গমন করে!'—'শ্রদ্ধা বা আপঃ শ্রদ্ধামেবারভ্য প্রণীয় প্রচরন্তি।' ইহার ফল স্বরূপ দাঁড়াইল ক্রতুময় মন; সেই মনকে ক্রতুশীল যজমান পর্জ্জন্যে হোম করেন। সে কিরূপ? যজমান অচঞ্চল মহামন লইয়া পর্জ্জন্যে হবন করেন। সহজ সরল কথায় ইহার অর্থ বৃষ্টির জন্য পর্জ্জন্যদেবকে তপস্যা করা। শ্রদ্ধাসংজ্ঞক জলের পরিণাম হইল 'সোম' বা ক্রতুময় মন—সেই সোমের পরিণাম হইল 'বৃষ্টি'।

তৃতীয় অগ্নির শরণ লইতেছি—

পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদাকাশো ধূমো রাত্রিরর্চ্চির্দ্দিশোঽঙ্গারা অবান্তর দিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ।

পৃথিবী অগ্নি, সংবৎসর তাহার কাষ্ঠ, আকাশ তাহার ধূম, রাত্রি হইল অর্চ্চি, দিকসকল অঙ্গার এবং অবান্তর দিক সমূহ (কোণ সমূহ) যেন বিস্ফুলিঙ্গ। সংবৎসর কিরূপে সমিৎ হইতে পারে তদ্ধেতু শঙ্কর নির্দ্দেশ করিতেছেন—'সংবৎসরেণ হি কালেন সমিদ্ধা পৃথিবী ব্রীহ্যাদিনিষ্পত্তয়ে ভবতি'—সমিৎ দ্বারা যেরূপ অগ্নি জ্বলে, সময় দ্বারাও সেইরূপ শস্য জন্মায় ও আহারযোগ্য হয়। আর আকাশ?—'পৃথিব্যা ইবোত্থিত আকাশো দৃশ্যতে যথা অগ্নের্ধূমঃ' আগুণ হইতে যেমন ধূয়া উপর ছাইয়া যায় আকাশও যেন ঠিক তেমনি পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে মনে হয়। কি অপরূপ কবিত্ব! এই পৃথিবীরূপ অগ্নিতে ক্রতুশীল যজমান বৃষ্টিকে আহুতি দেন। শ্রদ্ধাখ্যা অপ্ই ক্রমে বৃষ্টিতে পরিণত হইল। দ্যুলোকে শ্রদ্ধা আহুত হইয়া ফল প্রসব করিল 'সোম,' আবার সোম পর্জ্জন্যে আহুত হইয়া প্রসব করিল—এইবার বৃষ্টিকেও আহুতি দেওয়া হইল মৃত্তিকাতে।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি।

চতুর্থ অগ্নি হইতেছে পুরুষ—

পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ, প্রাণো ধূমো জিহ্বার্চ্চি শ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ। এই অগ্নিতে অন্নকে আহুতি দেওয়া হয়—তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি।

সেই অন্ন পুরুষাগ্নিতে আহুত হইলে উহার ফলে রেতঃ সঞ্চার ঘটে। ক্রমে আমরা শ্রদ্ধাখ্যা অপ্কে রেতোরূপে পরিণত হইতে দেখিলাম। ইহার পরে পঞ্চমাগ্নি আসিতেছে যোষা।

যোষ বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্, যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গরা অভিনন্দং বিস্ফুলিঙ্গাঃ॥ এই সর্ব্বশেষ অগ্নিতে যজমান রেতকে আহুতি দেন,—তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতে গর্ভঃ সম্ভবতি।' আচার্য্য শঙ্কর ইহার উপর ভাষ্য করিতেছেন—'এবং শ্রদ্ধা-সোমবর্ষান্নরেতোঽবন পর্য্যায়ক্রমেন আপ এব

গর্ব্ভীভূতাস্তাঃ।' শ্রদ্ধাপদবাচ্য অপ এমনি করিয়া অবশেষে গর্ব্ভীভূত হইল—তবেই পঞ্চম প্রশ্নটি 'ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবতি'—সুমীমাংসিত হইল।

গীতায় শ্রীভগবান পঞ্চাগ্নিকে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছেন :—

অন্নাদ্ভবতি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ।
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি··· ··· ···
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥
৩, ১৪, ১৫।

সমস্ত ব্যাপার যজ্ঞটি হইতে উদ্ভূত বলিয়া গীতা নির্দ্দেশ করিতেছেন, যজ্ঞ অর্থে সেই ক্রতুশীল মন বা সোম—ইহা আসিতেছে কোথা হইতে—'কর্ম্ম' হইতে। ছান্দোগ্যে পাইয়াছি শ্রদ্ধা হইতে। সুতরাং উভয়ে এক। শ্রদ্ধা বা কর্ম্ম আসিতেছে কোথা হইতে—এই প্রেরণা শ্রীভগবান্ জীবব্রহ্মে জাগাইয়াছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।

শ্রীভগবান্ প্রাণাদি করণ সমন্বিত করিয়া জীবকে তাহার কল্যাণকর যজ্ঞে প্রেরণা দিয়াছেন—এই ভগবৎদত্ত প্রেরণাই শ্রদ্ধা বা কর্ম্ম—'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।' সুতরাং মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য দেবোদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করা। কেননা 'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ'—যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর, দেবগণও তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন। 'ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ'—যজ্ঞাহুতির দ্বারা প্রীত হইয়া পর্জ্জন্যদেব বৃষ্টি বর্ষণ করেন ইহা ত পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

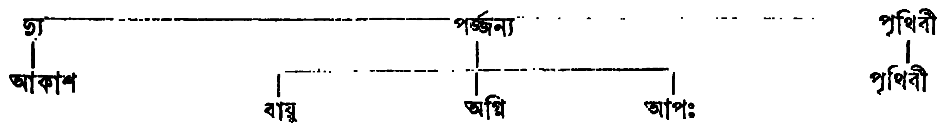
ক্রমে ক্রমে পাঁচটি অগ্নিই জ্বালা হইল এবং পাঁচটি আহুতিই সমর্পিত হইল—সেই সর্ব্বপ্রথম আহুতির অপই রেতোরূপে পরিণত হইয়া নূতন জন্মের কারণ ঘটাইল। ইহার উদ্দেশ্য বোধ করি এইটুকু দেখান যে যজ্ঞ হইতেই সন্তান উদ্ভূত হয়, যেমন যাজ্ঞসেনী। ঋষিরা এইরূপে সন্তানলাভটিকে কামাত্মক না করিয়া ইহাকে যজ্ঞার্থক প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন—কাজেই জন্মটি ছিল পবিত্র এবং ফলেও সন্তানসন্ততিতে ব্রহ্মনিষ্ঠা জাগিত। এখন যদি কেহ প্রশ্ন তুলেন—বর্ত্তমান জগতে ত যজ্ঞ নাই—হোমধূম নাই তবে পর্জ্জন্যদেব কৃপাই বা কেন করেন, কেনই বা অন্ন হয় এবং সন্তান উৎপাদনে কেনই বা বাধা ঘটে না! ইহার উত্তরে উপরি লিখিত মর্ম্মানুসারে এই মাত্র বলা যায় যে জন্মের সে ব্যাখ্যা যেমন লুপ্তপ্রায়, জন্মের ফলাফলও ঘোর জড়প্রীতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন—এখন আর সে মানুষ প্রায় জন্মায় না। যদি কেহ তবু বলিতে চান— 'ও হরি'—এই হইল ছান্দোগ্যের অতি বিখ্যাত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—ইহার অসারত্ব ত অমনি সিদ্ধ হয় যখনই না চাইতেই বর্ষার ধারা আপনি নামিয়া আইসে! ইহার উত্তরে আমি শুধু এই বলিতে চাই,—বর্ষণানুকূল ফসল কি অমনি হয়, প্রতি মানুষের প্রাণে কি বুভুক্ষা নাই এবং সেই বুভুক্ষিত প্রাণের অজ্ঞাত নিবেদন কি বিধাতৃচরণে পৌছে না?—ক্রীশ্চিয়ানেরা বলিয়া থাকে—'O Lord, Give us our daily bread'—এই চাওয়া তাহাদের মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—কিন্তু এই চাওয়া প্রতি জীবের মর্ম্মে গোপনে ধ্বনিত হইতেছে। তাই অন্ন মিলে এবং স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সংসার রচনা সম্ভব হয়। ইহাকে অস্বীকার করা অসম্ভব—সংসারের সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল আহার্য্য, ইহা মুখ্য; অতঃপর গৌণ হইল যৌনাহার। আজ যে ভারতবর্ষ লইয়া অত টানাটানি চলিতেছে ইহার মূল কথাটি 'অন্নম্'। তবেই দেখা যাইতেছে মানুষের জীবনটি একটি রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় অন্নসূয় যজ্ঞ। ক্রীশ্চিয়ানেরা ইহাকে prayer এ দু' কথায় নিবেদন করিয়াছে আর ছান্দোগ্যে ইহা সৃষ্টির মানদণ্ড স্বরূপ হইয়াছে। আমরা এখন সেই সৃষ্টিরহস্যের পরম দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি মনোনিবেশ করিতেছি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লী হইতে সৃষ্টির মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষ-

ধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ॥ ৩

ইহার দিকে এক চক্ষু রাখিয়া অপর চক্ষু যদি পঞ্চাগ্নির উপর ধরা যায় তবে আমাদের মনে ইহাদের উভয়ের অন্তর্নিহিত একই সুর বাজিয়া উঠিবে। তৈত্তিরীয় যে তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে, পঞ্চাগ্নিও যে সেই তত্ত্বেরই সালঙ্কার অবতারণা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। উভয়ের উদ্দেশ্য এক—পাঞ্চভৌতিক দেহে জীবের জন্মপ্রদর্শন। তবে উভয়ের ছন্দ একরূপ নহে—তৈত্তিরীয় দেখাইতেছেন সৃষ্টির ক্রম আর পঞ্চাগ্নি দেখাইতেছে আহুতিক্রম; কিন্তু শেষ কথা উভয়েরই এক—জন্ম। আমরা উহাদের একার্থকতা এইভাবে সাজাইতে চাই :—



উপরিউক্ত সজ্জানুসারে দেখা যায় তৈত্তিরীয় আদর্শ এই পঞ্চাগ্নিতেও অবিকল রহিয়াছে। ছান্দোগ্য শুধু 'পর্জ্জন্য' দ্বারা যে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন এখানে বায়ু, অগ্নি, আপ্ মিলিয়া সেইটি হইয়াছে। তৈত্তির পৃথিবী পর্য্যন্ত আমরা ছান্দোর পৃথিবীও ঠিক সমান তালে পাইতেছি। তৈত্তিতে অতঃপর 'পৃথিব্যা ওষধয়ঃ······পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ;'—এই অংশটুকুতে পুরুষ ও যোষাকে যদিচ লুপ্ত রাখা হইয়াছে তথাপি যৌন প্রক্রিয়াকে অতি পরিষ্কার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই ইঙ্গিত এত সহজবোধ্য যে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে ইহাকে ভাঙ্গিয়া বলা একেবারেই অনাবশ্যক—তাই তৈত্তিরীয়ে ইহার উল্লেখ নাই। পাঞ্চভৌতিক পারম্পর্য্য সাজাইতে রেতঃ পর্য্যন্ত ফুটাইলেই কার্য্য সমাধা হইল, কিন্তু ছান্দোগ্যের উদ্দেশ্য আহুতিক্রম ফুটান, সুতরাং যোষাকে আহবনীয় করিয়া ইহাতে রেতঃসেক প্রদর্শন করান হইয়াছে। কাজেই ছান্দোগ্যের পৃথিবী পর্য্যন্ত পঞ্চভূতের সকলগুলিই বলা হইয়াছে—ইহার পরে পুরুষ ও যোষা আসিতেছে শুধু হবণ ক্রিয়ার সম্যক নির্দ্দেশ করিবার জন্য। ছান্দোগ্যে যেখানে পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টির ক্রমিক বর্ণনা দেখা যায় সেখানে প্রথমেই বলা হইয়াছে—'তত্তেজোঽসৃজত' (৬'২)। তৈত্তির আকাশ ও বায়ুকে ডিঙাইয়া একেবারে প্রথমেই কেন তেজে (অর্থাৎ অগ্নিতে) পৌছিল, ইহা লইয়া গোল দাঁড়াইয়াছে। প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক পাঁচ ভূতের মধ্যে তৃতীয়টি হইতে সুরু কেন করান হইল! আচার্য্য শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে তেজের অন্তর্ভাবরূপ,—রূপাত্মকং জগৎ, তাই রূপটিকে প্রথম ফুটাইয়া সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। 'অন্তর্ভাবতত্ত্ব'টি বেশ একটু জটিল—যাঁহারা ইহার বিশদ আলোচনার পক্ষপাতী তাঁহারা দয়া করিয়া যেন ১৩৩৬ পৌষ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় লেখকের 'পঞ্চপানপাত্র' পাঠ করেন। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের ত্রি-ধারা পাইতেছি—তৈত্তিরীয় দেখাইতেছেন সৃষ্টিক্রম, পঞ্চাগ্নি হইতেছে আহুতিক্রম আর ছান্দোগ্য ফুটাইতেছেন অন্তর্ভাব-ক্রম। কিন্তু এ-তিনেরই লক্ষ্যস্থল জন্ম।

তারপর? নূতন অতিথি যজমানের গৃহে শুভাগমন করিল। সেও সমস্ত জীবন ভরিয়া পঞ্চাগ্নিতপ করিল, তাহার মরণ ঘটিল। তখন?—'তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি, যত এবেতো যতঃ সম্ভূতো ভবতি'—শঙ্কর ভাষ্য যথা—'যত এব ইত আগতোঽগ্নেঃ সকাশাৎ শ্রাদ্ধাদ্যাহুতিক্রমেণ···তস্মৈ এব অগ্নয়ে হরন্তি।' 'যে অগ্নি হইতে শ্রাদ্ধাদি আহুতি পরম্পরায় আগত হইয়াছে সেই অগ্নির উদ্দেশেই লইয়া যায়।' পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে 'অগ্নিহোত্র' যজ্ঞ এখানেই কৃত হয়, ইহার ফল দ্যুলোকাদি পর্য্যন্ত পৌছায়—সেই যজ্ঞীয় অনল হইতেই তাহার দেহের উৎপত্তি, এই অনলেই তাহার দেহের শেষ বিসর্জ্জন ঘটে। এইবার প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা পঞ্চাগ্নির প্রতি বিশেষ-রূপে দৃষ্টি রাখিব—তাই অন্য প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া এখানে সম্ভব হইবে না। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন :—

অন্ত্যায়াঞ্চ শরীরাহুত্যাবপ্সৌ হুতায়ামগ্নিনা দহ্যমানে শরীরে তদুত্থা আপোধূমেন সহোর্দ্ধং যজমানমাবেষ্ট্য······। শরীর ভস্মসাৎ হইলে শরীরোত্থিত জল সমূহ যজমানকে বেষ্টন করিয়া ধূমের সহিত উর্দ্ধে যায়। সেই শ্রদ্ধাখ্যা অপসম্ভূত দেহের পরিণামস্বরূপ এই জল ও সেই শ্রদ্ধাযুক্তঅপ্ এক জিনিষ। তাহার দেহযোনি অগ্নি যেমন শ্মশানাগ্নির সহিত এক তেমনি এক্ষেত্রেও এ দুই অপেও একতা। বেদান্ত দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম পাদে এই প্রশ্নগুলির উত্তর সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে, আমরা একটু চক্ষু বুলাইয়া যাইব মাত্র। 'তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ; প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাম।১'। পরলোকযাত্রায় যে অপ্ যজমানকে বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধলোকে যায় তাহাতে অপের বাহুল্য থাকিলেও ইহাতে অপরাপর ভূত অল্প পরিমাণে থাকে—'ত্র্যাত্মকাত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ।২' যজমানের আহুতি যেমন উর্দ্ধে চন্দ্রলোকে যায় দেহান্তে যজমানও তেমনি ঐ লোকে যায়। আমরা বাজসনেয়ক ও পঞ্চাগ্নিপ্রসঙ্গে দেখিয়াছি সেখানে থাকে ঠিক ততকাল যাবৎ তদুপযোগী কর্ম্মের হ্রাস না ঘটে—কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ যথেতমনেবং চ।৮

কর্ম্মক্ষয়ে যে পথে গমন সে পথেই পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—'তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।' কিরূপে—'যথেতমাকাশম্ আকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমোভবতি ধূমোভূত্বা অভ্রং ভবতি।' তৎপর?—'অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে······যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি।' চন্দ্রমণ্ডলে জীবের পুণ্যভোগান্তে তাহাকে return ticket করিয়া আবার সেই পথেই মর্ত্ত্যলোকে চলিয়া আসিতে হইবে। পঞ্চাগ্নির আহুতি-ক্রম দ্বারা এই পথের নিশানা পাইয়াছি, তবে সেখানে কোনও জীব যে পর্জ্জন্যদেবের সহিত মিশিয়া বর্ষণযোগে পৃথিবীতে নামিতেছে এবং আহার্য্য শাকসব্জীতে যুক্ত হইয়া পুরুষের দেহে উপগত হইয়া রেতঃ সহযোগে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিতেছে, সে তথ্য আমরা সেখানে পাই নাই। সেখানে দেখিয়াছিলাম জীবন-চক্রের অর্দ্ধেক, এখানে পাইলাম বাকী অর্দ্ধেক, উভয়ে মিলিয়া পুরা চক্রটি পাইলাম। ইহারই অনুরূপে বোধ করি বুদ্ধদেবের জীবন-চক্রটি কল্পিত হইয়াছিল।

Rhys Davids "Wheel of life" নামক অধ্যায়ে (Buddhism) জীবন চক্রটির যে আলেখ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন উহা সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতত্ত্বেরই যেন একটি সজীব ছবি। জীবনচক্রটির প্রথম আবর্ত্তন অবিদ্যা হইতে, তৎপরের অর হইতেছে সংস্কার (মহতত্ত্ব), তৃতীয়-চতুর্থ বিজ্ঞান ও নামরূপ (অহঙ্কার), তৎপরের অরগুলি পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়নিচয়, এবং তৎসাহচর্য্যে কৃত সম্ভোগে জীবের জন্ম। জন্ম হইল সেই প্রথম অর অবিদ্যা হইতে। এইরূপে এক একটি অর ছুঁইয়া যখন জীব মরিল তখন আবার তাহাকে প্রথম 'অর' অবিদ্যায় জন্মাইতে হইল। ১,২,৩,৪,৫ একটি চক্রে লিখিয়া দিলে ৫ শেষ হইতেই যেমন ১ আরম্ভ হয়—এও ঠিক্ তেমনি, এই সতত আবর্ত্তমান জীবন-চক্র হইতে রেহাই পাওয়া কখনই সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরে অবিদ্যা বর্ত্তমান আছে। অবিদ্যা অর্থে জীবের অগণিত জন্মের কর্ম্মরাশি। ইহাই, সেই কালরূপ চক্রের উপর জীবকে আরূঢ় করাইয়াছে—'ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া'। এই কালচক্রটিকে বুদ্ধদেব সাংখ্যনয়নে দেখিয়াছেন কিন্তু পঞ্চাগ্নিতত্ত্বটিও সেই কালচক্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত—উহার সার্ব্বভৌমত্বই ইহার বিশেষত্ব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাল যতদূর হু হু করিয়া ঠেলিয়া উঠিয়াছে ততদূরই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা আপনার কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে, কারণ কাল দ্বারা সূর্য্য চন্দ্র সকলি বিধৃত রহিয়াছে। এই কালচক্রেই জীব অনিশ ঘূর্ণিত হইতেছে—ইহার অর্দ্ধেক ঘোরা ইহলোকে, বাকী অর্দ্ধেক পরলোকে। তাই মানুষের সম্বন্ধে বলা হয় ইহকাল পরকাল—কাল ব্যতিরিক্ত তাহার থাকিবার যো নাই সে যে কালচক্রে সমারূঢ়। 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে'—চাকাটি যখন ইহকালে ঘুরিতেছে তখন সে ইহলোকে, আর চাকার নিম্নভাগ যখন উর্দ্ধে উঠিতেছে তখনি সে পরলোকে।

এখন আমরা শেষ অঙ্কে শেষ কথা বলিতে চাই। পঞ্চাগ্নিতত্ত্ব সম্বন্ধে উপোদ্ঘাতে দেখিয়াছি ইহা সকল মানুষেরই জীবনের নক্সা আঁকিয়া রাখিয়াছে; মানুষ জন্মায়, অন্নান্বেষী হইয়া জীবন সংগ্রামে ব্রতী হয় এবং ইন্দ্রিয়াহারে যৌনক্ষুধা

মিটায় ও সঙ্গে সঙ্গে সন্তান লাভ করে। এ কয়েকটি কথা পৃথিবীর প্রায় পৌণে ষোল আনা লোকের জীবনের সারাংশ। কাজেই ইহার পাঠে সকলেরই দাবী আছে, যজ্ঞার্থ না বুঝিলেও যে পঞ্চাগ্নি বুঝা যাইবে না এমন নয়। তবে আমরা যজ্ঞীয় ব্যঞ্জনা পরিহার করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা করিতে পারি না। এই প্রকারে যে উপাসনা, শাস্ত্র ইহাকে সকাম বলেন; ইহাকে সকাম বলার হেতু কি? সেইটি একটু প্রনিধানযোগ্য। অন্ন যখন পুরুষাগ্নিতে আহুত হয় তখন আহুতির ফল হইল রেতঃ, এই রেত যখন যৌনমিলনের ফলে যোষিৎ উপস্থে আহুত হয় তখনই ইহা কামের উদ্দীপনায় নির্গত হয় বলিয়া এতৎ ক্রিয়াটিকে সকাম বলা যায়। রেতঃসেক ব্যাপারটি তাহা হইলে মুখ্য হইয়া দাঁড়াইল, কেননা ইহাই হইল অন্ত্যাহুতি এবং ইহারই ইন্ধন স্বরূপ অন্ন কার্য্য করে, যেহেতু অন্ন না খাইলে কামোদ্দীপন সম্ভবপর নয়। তাই সমস্ত সাধনটি কামের পরিবাহক হইয়া পড়ে। শাঙ্কর ভাষ্যে এতৎসম্পর্কে শাস্ত্রীয় বচন সংগ্রহ করা হইয়াছে। তথাচ পৌরাণিকাঃ—

> যে প্রজামীষিরেঽধীরাস্তে শ্মশানানি ভেজিরে।
> যে প্রজাং নেষিরে ধীরাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে॥

যোষিৎসঙ্গকারী রেতঃসেকের ফলে শ্মশানগতি লাভ করে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মায়, কিন্তু রেতঃসঞ্চয়ী অমৃতলোক প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে প্রতীত হয় জীবের সম্মুখে দুই পথ খোলা রহিয়াছে, রেতঃসিঞ্চনের পথে গেলে সে কালচক্রে 'যন্ত্ররূঢ়ানি' হইয়া সৃষ্টজগতের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেল! কেন বাঁধা পড়িল? রেতঃক্রিয়াকে জীবনের সহিত মিশান আর পঞ্চভূতাত্মক বিশ্বসৃষ্টিকে নিজের জীবনে সুতার ন্যায় পাক খাওয়ান একই কথা। রেতঃ পদার্থটি কি?—রেতঃ হইল বিশ্বজগতের একটি অনুপ্রমাণসংস্করণ—শ্রদ্ধাখ্যা অপ্ দ্যুপর্জন্যপৃথিবীগতা হইয়া রেতোরূপে পরিণত হয়, সুতরাং রেতঃ হইল দ্যুলোকভুবর্লোক, ভূর্লোকের একখানি ক্ষুদ্র আলেখ্য—উহারা যে যে উপাদানে প্রস্তুত ইহাও সেই সেই উপাদানভূত! রেতঃক্রীড়া জীবনে প্রবেশ করিলে জীবের অমর অজর প্রাণে জড়ের ছাপ জরার ছাপ মৃত্যুর ছাপ খাইতে লাগিল। কাদার মধ্যে হীরার গড়াগড়ি দিলে যে অবস্থা 'অত্যনচ্ছংবপু'তে 'স্বয়ংস্বচ্ছের' রতিতেও সেই অবস্থা। রেতঃ ক্রীড়ার ফলে যে অনচ্ছ প্রলেপ প্রাণের পাশে লাগিয়া গেল—ঐগুলিই পুনর্জন্মের হেতুভূত। সহজ সরল ভাবেও যদি চিন্তা করা যায় তবে দেখা যায় জীবদেহ একটি চলন্ত জগৎ—'তিলেষু তৈলম্'বৎ, দেহজ রেতঃও দেহের অর্থাৎ পঞ্চভূতের সার বিশেষ। এই রেতঃ সম্ভোগের অর্থ যে পঞ্চভূতে ডুব্ দিয়া থাকা, ইহাতে আর কি সন্দেহ? ইহাতে সংযুক্ত থাকা আর বিশ্বজগতে আটক থাকা একই কথা। এবং এই আটক এক জন্মের জন্য নয়, জন্ম-জন্মান্তরের জন্য। শেষোক্তটিকে modern interpretation বলা চলে, ইহা সাধারণ দৃষ্টিতে rationalও।

যদি জীবদেহে কাম না থাকিত তবে রেত কখনো পরিজ্ঞাত হইত না, কিন্তু 'কুড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'—দেহের মধ্যে কামের আলোড়ন জাগে, তাই যোষিৎসঙ্গে রেতঃ নির্গত হয়, ইহার পরিচয় মানুষ পাইয়াছে। পঞ্চভূতের অন্তর্ভাব পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে, অনঙ্গের অঙ্গ ভাগ ভাগ রাখা হইয়াছে—সময়ে কামের স্ফুরণ ঘটে। যদি বিধাতা কামকে সৃষ্টি না করিতেন তবে দেহী অক্ষর পুরুষকে ধ্যান করিয়া দেহান্তে অনায়াসে নিঃশ্রেয়স লাভ করিত। কিন্তু কাম হইল দেহের cement স্বরূপ, ইহাই দেহীকে দেহের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখে। দেহ হইল একটি ছোট ব্রহ্মাণ্ড—ইহাতে বাঁধা পড়িয়া যাওয়া অর্থে কালচক্রঘেরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। এবং তাহাও জন্ম জন্মান্তরের জন্য।

আমরা পৌরাণিক প্রবচনের এক পথ দেখিলাম—ইহা মৃত্যুর পথ। যে পথে গেলে মৃত্যুর অধিকার আক্রমণ করে সেই পথ হইতেছে রেতঃসিঞ্চনে। প্রশ্ন উঠিতে পারে রেতঃসেক যদি না করাই বিধি হয় তবে রেতঃসৃষ্টি কেন বিধাতা করিলেন? রেতঃ তবে কোন্ কাযে লাগিবে? এই কথাটিকে বুঝানই বোধ করি পঞ্চাগ্নিবিদ্যার গূঢ় উদ্দেশ্য। রেতঃক্রীড়া আমরা দেখিয়াছি পাঞ্চভৌতিক ভোগ-লীলা—পঞ্চাগ্নির অন্তরালে পঞ্চভূতেরই পঞ্চদীপ জ্বলিতেছে। এই ভোগ-প্রদীপে রেতের আহুতি দিলে মৃত্যুকেই বরমাল্য দেওয়া হয়। তবে কোথায়—আর কোন্ অগ্নিতে রেতঃ সমর্পণ

করা যায়? বেদান্ত বলিতেছেন—'গুণাদ্বালোকবৎ'—(২, ৩, ২৫) গৃহ যেরূপে গৃহস্থ দীপ দ্বারা আলোকিত হয়, দেহ-গেহেও তেমনি এক আলোক-দীপ জ্বলিতেছে। গীতাও সেই জড়াতীত দীপকে বুঝাইতেছেন—

যথা প্রকশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ১৩, ৩৩॥

সেই দীপাগ্নিতে রেতঃ আহুত হইলে মৃত্যুর পথ রোধ করিয়া অমৃতের পথ আপনি খুলিতে থাকে। এই অগ্নিতে রেতঃ সিঞ্চন করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে 'সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি' (গীতা ৪, ২৬)। ফলে তাহাকে 'ঊর্দ্ধরেতস্সু চ শব্দে হি' (বেদান্ত—৩, ৪, ১৭) ঊর্দ্ধরেতা হইতে হয়। রেতঃ হইল 'ব্রহ্ম-হবি'—যজ্ঞ করিতে 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া যে হবি আহুতি দিতে হয়, তাহা হইল 'গব্য-হবি'। যজ্ঞার্থে যে-যজমান লক্ষ কলস গব্য-হবি ব্যয় করে অথচ তাহার 'ব্রহ্ম-হবি'কে ইন্দ্রিয় সেবায় উৎসর্গ করে, তাহার যজ্ঞের সার্থকতা কোথায়? অথচ যে যজমান শ্রুব বা চমস ধারী নহে এবং যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ঘৃত প্রক্ষেপ করে না কিন্তু জীবনযজ্ঞের অন্তরাগ্নিতে অনিশ রেত উৎসর্গ করে, তাহার তপস্যার হোমানল ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দীপ্তি ছড়ায়। এমন যে তপস্বী, গীতা তাহাকে ছবির ন্যায় আঁকিতেছেন—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা। (৪, ২৪)

সূতা যখন পাক খাইয়া যায় তখন তাহাকে প্যাচ খুলিবার জন্য বিপরীত দিকে চালাইতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। অগণিত জন্ম ধারণ করিতে করিতে আমরা দেহের তথা কালচক্র-ঘেরা বিশ্বজগতের সহিত এমনি পাক খাইয়া গিয়াছি যে সে প্যাচ খুলিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের দেহানু-কূলতাকে প্রতিকূলে চালাইতে হইবে এবং এমনি ভাবে চালাইতে চালাইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে দেহাতীত এক অভিনায়ক অক্ষর রহিয়াছেন যাঁহার সহিত আমরা অ-ভিন্ন এবং যাহাকে চিনিতে না পারিয়া আমরা এক অত্যনচ্ছং বপু'কে স্বস্বরূপত্বের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিয়া বসিয়া আছি। আপনার আসল 'আমিত্ব'কে জানিতে হইলে প্রথমে পঞ্চাগ্নির পঞ্চপ্রদীপে নিজকে ভাল করিয়া ঈক্ষণ করা ভাল। তারপর নকল হীরা ধরা পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আসল হীরার অজর অমর আলো চোখে ঠেকিবে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী



চক্রবাক

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত জগৎ মিত্র

প্রকাশ বিয়েতে রাজি হয়েছে। বৃদ্ধ অবিনাশবাবুর মনে তৃপ্তির আর শেষ নেই। যাক্, তা'হ'লে রাণী একবারে তাঁর চোখের আড়ালে চ'লে যাবে না। তাঁর ব্যর্থ জীবনের শেষ সম্বল ঐ রাণী—তাঁর প্রাণের 'রাণু' তাকেও যদি হারাতে হয় বৃদ্ধ তা'হলে বাকি দিনগুলি কা'কে অবলম্বন ক'রে কাটাবেন? অবিনাশ বাবুর কল্পনায় তাঁ'র শেষের শান্তিময় দিনগুলি ফুটে উট্‌লো সুখস্বপ্নের মতো! অবিনাশ বাবু ভবিষ্যতের আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়্‌লেন। তিনি তখুনি কন্যা মণিমালাকে এই সম্মতির সংবাদটা দিতে ছুট্‌লেন।

এই শুভসংবাদে মণিমালা মনে মনে ঈশ্বরকে প্রণাম করলো, হেসে বল্‌লো—কিন্তু বাবা, আশ্চর্য্য এই যে, প্রকাশ তো আমাদের ঘরের ছেলেরই মতো, অথচ ওর কথা সকলের আগে তো আমাদের মনে ওঠেনি। হাতের কাছে এমন একটি সুন্দর পাত্র থাকতে আমরা মিছিমিছি বাইরে খুঁজ্‌ছিলাম, আর সব চেয়ে মজা এই যে, রাণুর জন্যে পাত্র খোঁজার সমস্ত ভার প্রকাশের ওপরই তুমি দিয়েছিলে।

অবিনাশ বাবু হেসে বল্‌লেন—প্রকাশের কথা মনে যে একেবারে ওঠেনি তা' নয় মা, কিন্তু বাইরে তা' প্রকাশ কর্‌তে সঙ্কোচ বোধ করেছি; কেননা গরীবের হা'তে মেয়ে দিতে পাছে তুমি রাজি না হও। তা' ছাড়া প্রকাশ বেশ উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে কর্‌বেনা, এ কথা ওর মুখে আমি আগেই শুনেছি।

—বাবা, প্রকাশ কেন এখন থেকেই অত ক'রে টাকার কথা ভাবছে? আমার বা তোমার যা কিছু ক্ষুদ-কুঁড়ো আছে সে তো ওদেরই হবে। তুমি কেন প্রকাশকে সে কথা বল্‌লে না?

অবিনাশবাবু মাথা নেড়ে বল্‌লেন—না মা, প্রকাশকে সে কথা বলা যায় না, ওর মধ্যে বেশ আত্মসম্মান-বোধ আছে। তা'ছাড়া আমাদের যা-কিছু সে তো প্রকাশের নামে থাক্‌বে না, রাণীরই নামে থাক্‌বে,—সুতরাং বিষয়ের কথা তুললে ওকে ছোট করাই হবে—প্রকাশ তা'তে দুঃখ পাবে। আরো একটা কারণে ওকে আমি অনুরোধ কর্‌তে সঙ্কোচ বোধ করেছি মণি,—পাছে ও মনে করে, আমরা যে ওকে স্নেহ করি তার মধ্যে আমাদের কোন গোপন স্বার্থ আছে। কিন্তু ওকে আমি কি ব'লে রাজি কর্‌লাম জান মা? বল্‌লাম—তোমার প্রতি রাণুর শ্রদ্ধা আছে প্রকাশ, ওকে তো তুমি ছেলেবেলা থেকেই জান? টাকার কথা যদি বল, তুমি ভাল ছেলে, সচ্চরিত্র, পাঁচ জনের সঙ্গে জানা শোনাও আছে, সুতরাং তুমি আইন পাশ করে বেরুলে তোমার যে উন্নতি হবেনা তাই বা কে বল্‌লে? যাক্, প্রকাশকে যখন রাজি করানো গেছে তখন শুভকাজটা যতো শীঘ্র হয় ততোই ভাল।

অবিনাশবাবু তৃপ্তির হাসি হাস্‌লেন। বিধবা মেয়ে মণিমালা, তারই একমাত্র ষোড়শী মেয়ে রাণী এবং অনেক কালের দাসী শান্তকে নিয়ে অবিনাশবাবুর সংসার। স্ত্রী, দুই ছেলে এবং জামাই একে একে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে। রাণীর বাবা যখন মারা যান তখন তা'র বয়স মাত্র এক বৎসর। বিধবা হ'য়ে মণিমালা বাবার কাছেই আছে।

প্রকাশও অতি শৈশবেই পিতৃহীন হয়। মামার কাছে সে বরাবর মানুষ হয়েছে। অবিনাশবাবু তা'র মামার বিশেষ বন্ধু। সেই সূত্রে প্রকাশ এ বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করে, সকলেই ঐ প্রিয়দর্শন মিষ্টভাষী ছেলেটিকে ভালবাসে। প্রকাশের মামার কিন্তু অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তাই পড়াশুনায় প্রকাশের যথেষ্ট যত্ন থাকলেও অর্থাভাবে হয়তো তার উচ্চশিক্ষা হ'ত না যদি-না অবিনাশবাবু নিজের থেকে

প্রকাশের পড়ার ভার নিতেন। কলেজে ঢুকেই প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে এ বাড়ীর ছেলে হ'য়ে গেল। কাজে কর্ম্মে অসুখে বিসুখে সর্ব্বদাই সে এ বাড়ীতে হাজির থাকৃত। অবিনাশ বাবুর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না।

রাণীকে প্রকাশ ছোটটি থেকেই দেখ্ছে। প্রকাশদা'কে পেয়ে রাণীর ভাই-এর সাধ মিটেছিল। ভাইদ্বিতীয়ার দিনে প্রকাশদা'র কপালে ফোঁটা দেবার তার কি উৎসাহ! পড়ানোর ভার প্রকাশের উপরেই। অবিনাশবাবু যখন প্রকাশকে রাণীর জন্যে একটি মাষ্টার দেখ্তে বল্লেন তখন সে নিজেই এই কাজে ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। মাসের শেষে অবিনাশবাবু প্রকাশকে মাইনে দিতে এসে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে টাকাগুলি পকেটে রাখ্লেন।

প্রকাশ বলেছিল—রাণী আমার নিজের বোনেরই মতো, ওকে একটু পড়ানোর জন্যে যদি আপনার কাছে মাইনে নিতে হয় তা'হলে আমাকে স্নেহ ক'রে আপনি ভস্মে ঘি ঢেলেছেন দাদামশাই।

সেই রাণীর সঙ্গে আজ প্রকাশের বিয়ের কথা। এর চেয়ে শুভসংবাদ আর কি হ'তে পারে? বিশেষ ক'রে হিন্দুর ঘরে, যেখানে পাত্রপাত্রীর মধ্যে আলাপ-পরিচয় তো দূরের কথা, বিয়ের আগে একবার চোখের দেখাও হয়তো থাকে না। প্রকাশের মা বা মামা তা'র এ সৌভাগ্যের কথা অবিশ্যি কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। রাণী তাঁদের বাড়ির বৌ হয়ে আসবে এ কি কখনো আশা করা যায়? কিন্তু কথাটা যখন সত্যি, তখন প্রকাশের মামা বিশ্বাস তো কর্লেনই বরং বন্ধুর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু কর্লেন পাঁজি নিয়ে।

বিয়ের কথা উঠ্বার পর ওবাড়ীতে প্রত্যহ যাওয়া প্রকাশের পক্ষে একটু শক্ত হ'য়ে উঠ্লো। রাণীর সঙ্গে তা'র বিয়ে, সে যে স্বপ্নেও কখনো একথা ভাবেনি! রাণীর সঙ্গে দেখা হ'লে প্রকাশ হয়তো মুখ তুল্তে পার্বে না লজ্জায়!

কল্পনাকে সঙ্গী ক'রে প্রকাশ দিন কতক পার্কে মাঠে সন্ধ্যাটা কাটালো। মনের মধ্যে খোঁজ ক'রে দেখ্লো রাণীকে সে বহুদিন থেকেই ভালবেসেছে, কিন্তু দারিদ্র্যের কুণ্ঠায় কোনদিন তা'র অনুভূতি বাইরে ফুটতে পারে নি। কিন্তু রাণীর মনের খবরটাই বা কি? সেও কি প্রকাশকে ভালবাসে? তা'র মতো গরীব স্বামীর ঘরে সে কি সুখী হবে?

ছোট বোনটির আদর আব্দার ঝগড়া নালিশ নিয়ে রাণী প্রকাশের কাছে এমনি সহজ এবং স্পষ্ট ছিল যে আজ তা'কে সলজ্জগুণ্ঠনবতী প্রেয়সীর রূপে কল্পনা করা প্রকাশের পক্ষে শক্ত ঠেক্ছে। রাণীর তৈরী একখানা কাজকরা রুমাল তা'র পকেটে রয়েছে, সেইখানা বার করে প্রকাশ নিবিষ্টচিত্তে দেখ্তে লাগ্লো—যদি রুমালের ফুলগুলির মধ্যে রাণীর আসল রূপটি ধরা পড়ে যায়।

* * *

কথাটা সকলের মতো রাণীও শুনলো। প্রকাশের সঙ্গে তা'র বিয়ে! পরিহাস মনে করে প্রথমে সে কথাটা বিশ্বাস কর্লে না। শেষে তা'র ঝিমা অর্থাৎ বৃদ্ধা দাসী যখন তাই নিয়ে রসিকতা করতে এলো তখন রাণীকে বিশ্বাস করতেই হোল, কিন্তু মুখে সে অবিশ্বাস জানালো; বল্লো—যাঃ, সব মিথ্যে, এ কখনই হোতে পারে না।

শান্ত বল্লো, হ্যাঁ লো হ্যাঁ, তুই সেই খুকীটেই আছিস্ কিনা তাই তোর বিয়ে নিয়ে সবাই তোর সাথে ঠাট্টা কর্ছে! ধেড়ে মেয়ে কোথাকার, এত ঢংও জানিস্! তাইতো বলি প্রকাশদা' যে চট্ ক'রে রাজি হ'য়ে গেল। ভেতরে ভেতরে তোদের সব ঠিক ছেল, না লা?

শান্ত আদর ক'রে রাণীর মুখে চুমু খেলো। হাতে ক'রে সে-ই রাণীকে মানুষ করেছে। রাণীর মঙ্গল কামনায় ঝিমাও প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু শান্তর ঠাট্টায় রাণীর মুখে হাসি দেখা গেলো না। কোন উত্তর না দিয়ে রাণী গম্ভীর মুখে তা'র ঘরে চলে গেলো।

প্রকাশ সেদিন সন্ধ্যায় এ বাড়ী এল। কতদিন আর লুকিয়ে বেড়াবে? বিয়ের কথা উঠেছে বলেই কি পালিয়ে বেড়াতে হবে? অবিনাশ বাবু বল্বেন কি? তা'ছাড়া রাণীর মনের ভাবটাও প্রকাশ একবার জান্তে চায়। অনুপস্থিতির

কারণ দেখাতে গিয়ে বল্‌লো—তা'র কোন বন্ধুর হঠাৎ ভয়ানক অসুখ করেছিল তাই সে আসতে পারেনি।

এ বাড়ীতে এসে রাণীর সঙ্গে দেখা না ক'রে যাওয়াটা ভারি বিশ্রী দেখায়, তাই প্রকাশ নিজেকে যতদূর সম্ভব আগেকার মতোই সহজ ক'রে নিয়ে রাণীর পড়্‌বার ঘরে গেলো। দেখলো রাণী পড়ছে না, টেবিলে মাথা রেখে ব'সে রয়েছে।

—হ্যাঁরে, রাণী পড়ছিস্ না যে বড়? রাণী চম্‌কে উঠে দাঁড়ালো। প্রকাশ চেয়ারে ব'সে সোচ্ছ্বাসে বললো—রাণী, তুই আমাকে সেদিন একটা বুদ্ধির আঁক দিয়েছিলি না? ক'দিন চেষ্টা ক'রে সেটা পারছিলাম না, আজ হঠাৎ আঁকটা হয়ে গেলো। দে, একটা খাতা দে দিকি, দেখিয়ে দি।

প্রকাশ নিজেই একটা খাতা টেনে নিয়ে অঙ্কটা করতে লাগলো কিন্তু একবার রাণীর মুখের দিকে চেয়েই সে বুঝলো রাণী অঙ্ক দেখছে না, প্রকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। মুখে তা'র হাসি নেই।

রাণী গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্‌লো—প্রকাশদা'! প্রকাশ চম্‌কে রাণীর দিকে চাইলো। রাণী বল্‌লো—মা বা দাদুর বিষয়কড়ি তো খুব বেশী নেই; ওতো সামান্যই হবে প্রকাশদা'।

একি অদ্ভুত কথা! প্রকাশ বুঝতে না পেরে বল্‌লো—কি বল্‌ছ রাণী?

প্রকাশ রাণীকে আজ অনেক দিন পরে 'তুমি' বল্‌লো। রাণী বল্‌লো—বল্‌ছি যা' তা' স্পষ্টই। বল্‌ছি আমাকে বিয়ে ক'রে তুমি তো খুব বেশী বড়লোক হ'তে পার্‌বে না—টাকা কড়ি তোমার নামেও কিছু থাক্‌বে না? তবু তুমি রাজি হলে?

রাণীর ইঙ্গিত এতো তীব্র এবং নিষ্ঠুর যে, প্রকাশের সর্ব্বশরীর শিউরে উঠলো। ছিঃ ছিঃ, রাণী তা'কে এমনই মনে করে? শুধু বিষয়ের লোভেই রাণীকে সে বিয়ে করতে চায়? রাণীর আজ এ কি রূপ? এই রাণীকেই সে এতদিন ভাল বেসেছিল, এই রাণীরই কথা ভেবে তার কত রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে? রাণীর মন এত নীচু?

রাণী পুনরায় বল্‌লো, তা'র কণ্ঠস্বরে তেমনি উগ্রতা, তুমিই না ব'লেছিলে উপার্জ্জনক্ষম না হ'য়ে বিয়ে করবে না? আজ হঠাৎ তোমার ক্ষমতা হোল কোথা থেকে? শেষে স্ত্রীর টাকার ওপর নির্ভর ক'রে তুমি বিয়ে করবে?

প্রকাশ তখনো আবেগে কাঁপছে। চেষ্টা করেও সে কিছু বল্‌তে পার্‌লো না—জিব্ জড়িয়ে গেছে। সে কিইবা বলবে। যেখানে তার আসন এমনি ভাবে ধূলিশায়ী হয়েছে সেখানে মুখের কথায় কি ক'রে তা'কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে? প্রকাশ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলো। চোখে তা'র জল এসেছিল কিন্তু রাণী তা দেখেনি।

প্রকাশ চ'লে যাবার পর রাণী স্তব্ধভাবে ব'সে রইলো। সে রাত্রে তার চোখে ঘুম এলো না। কেন সে প্রকাশকে আঘাত দিলো? সত্যই কি প্রকাশ এমনি হীন? সত্যই কি টাকার লোভেই সে রাণীকে বিয়ে করতে চায়? তাই যদি হয় তবে রাণীর পাত্র খোঁজবার ভার প্রকাশ নিজে নিয়েছিল কেন? হায়! প্রকাশকে সে কি বলতে কি ব'লে ফেলেছে? রাণী কেঁদে ফেল্‌লো, তা'র ইচ্ছে হচ্ছিল তখুনি প্রকাশের কাছে ছুটে গিয়ে ক্ষমা চায়। প্রকাশকে যে সে কখন ছোট ভাব্‌তে পারে না। রাণী সারারাত্রি কাঁদ্‌লো, শেষে ভাব্‌লো কাল প্রকাশ এলে সে তার পায়ে ধরবে।

কিন্তু প্রকাশ পরদিন এলনা, তারপরের দিনেও না। প্রতীক্ষার শেষ সীমায় এসে রাণী কঠিন হ'য়ে উঠলো।—বেশ তোমার সঙ্গে আমিও কোন সম্পর্ক রাখ্‌তে চাই না। রাণী মাকে গিয়ে বল্‌লো—মা, প্রকাশদার সঙ্গে নাকি আমার বিয়ে? ছিঃ ছিঃ, ওকে যে আমি দাদা ব'লে জানি। তোমরা কি পাগল হ'লে মা?

মণিমালা বল্‌লো—সে কি কথা রে রাণু? ঝিমা শাশুর কানে কথাটা যাওয়ায় সে এসে বল্‌লো—বিয়ের কথা কি বল্‌ছিলি লা?

রাণী বল্‌লো—এই দেখ না ঝিমা, যাকে রোজ দেখ্‌ছি, যাকে খুব চিনি, সে নাকি আবার বর হয়?

শান্ত মুখ নেড়ে বললো—এত বিদ্যেও জানিস, ধন্যি মেয়ে বাবা তুই। মেয়ে-মানুষের আবার পছন্দ কি লা?

কিন্তু মুখে যা'ই বলুক, শান্তর মনে কথাটা লেগেছে। হিন্দু মেয়ের কাছে বিয়েটা একটা সুখ-স্বপ্নের মতো। বর হয়ে যে আসে সে সেই স্বপ্নলোকেরই মানুষ—ধ্যানের মধ্যেই তা'র অস্তিত্ব। বর হয়ে যে আস্‌ছে তাকে সে জানে না, চেনে না, তাকে সে শুধু কল্পনা ক'রেছে। তা'র বর আসরে চতুর্দ্দোলায় চোড়ে, আগে পিছে তা'র বাজনা বাজবে। ……কিন্তু রাণীর কাছে প্রকাশ একেবারে জানা, ভয়ানক আটপৌরে। তাই বোধকরি প্রকাশকে ওর মনে ধরেনি। শান্ত সেই কথাই ভাব্‌লো কিন্তু মুখে বল্‌লো—ওসব পাগলামি রাখলো রাখ, অমন বর ভাগ্যে জুটলে হয়।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রকাশ অবিনাশ বাবুর সঙ্গে একদিন দেখা করলো। মুখ তা'র শুক্‌নো ফ্যাকাশে, দেখে মনে হয় রাত্রে সে ঘুমোয় না। অবিনাশ বাবু উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের কথা এড়িয়ে প্রকাশ বল্‌লো—আপনাকে একটা শুভ-সংবাদ জানাতে এসেছি।

—কি খবর প্রকাশ?

—রাণীর জন্যে একটি খুব ভাল পাত্র পাওয়া গেছে।

অবিনাশবাবু বললেন—সেকি কথা প্রকাশ, তুমি না সেদিন মত দিয়ে গেছ্‌লে?

প্রকাশ অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বল্‌লো—আমাকে ক্ষমা করুন দাদামশাই। আমি এ কদিন অনেক ভেবেছি, কিন্তু মনের মধ্যে সাড়া পেলাম না—উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা আমার পক্ষে ভারি অন্যায় হবে।

অবিনাশবাবু অধীর হ'য়ে বল্‌লেন—টাকার কথা কেন ভাব্‌ছ প্রকাশ? আমার যা' কিছু আছে সে তো তোমাদেরই হ'বে, তুমি কি তা' জান না?

প্রকাশ স্তব্ধ হ'য়ে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে চাইলো। এঁর মুখেও বিষয়ের কথা! ইনিও কি ভাবেন, বিষয়ের লোভেই প্রকাশ রাজি হয়েছিল?

—না দাদামশাই, পরের ওপর নির্ভর ক'রে বিয়ে ক'রলে আমার আর লজ্জার শেষ থাক্‌বে না। আমি যে পাত্রটির কথা বল্‌ছিলাম, সে খুব ভাল ছেলে, কলেজে দু'বছর একসঙ্গে পড়েছি, এখন সে প্রফেসারি করছে। ইচ্ছে হ'লে তা'দের ওখানে লোক পাঠিয়ে জান্‌তে পারেন সব। আমাকে কিন্তু ভুল বুঝ্‌বেন না দাদামশাই। আপনার স্নেহের ঋণ আমি কখনই ভুলবো না।

প্রকাশ অবিনাশ বাবুকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিল। অবিনাশ বাবু ক্ষুব্ধ হ'লেন বটে, কিন্তু প্রকাশের দৃঢ়-চিত্ততাকে ভুল বুঝ্‌লেন না। আহা, এমন একটি সুন্দর ছেলে কেবল গরীব বলেই দূরে চ'লে গেল! এদিকে রাণীর আপত্তিও তিনি শুনেছিলেন। সেটা ছেলে-মানুষী বলে তিনি হেসে উড়িয়েছিলেন, কিন্তু যখন দেখ্‌লেন প্রকাশ ও রাণী উভয়ের মধ্যেই সঙ্কোচ রয়েছে, তখন তিনি ভাব্‌লেন এ মিলন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশের নির্দ্দেশ মত অবিনাশ বাবু নূতন পাত্রটির সন্ধান ক'রে দেখ্‌লেন ছেলেটি ভালই। প্রকাশের সাহায্যে কথাবার্ত্তা সব পাকাপাকি হ'য়ে গেল। বরের বাড়ী কাছাকাছির মধ্যে, সুতরাং মণিমালাও বিশেষ দুঃখিত হ'লো না। মেয়েকে মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পেলেই তা'র যথেষ্ট।

প্রকাশ নিজেকে সান্ত্বনা দিলো—যাই হোক, নিজেকে সে ছোট করে নি, কিন্তু অন্তরের অন্তরতম স্থলে কি জানি কি একটা কাঁটা বিঁধেই রইলো। যখন রাণী রাণীই ছিল তখন তা'র সম্বন্ধে চিন্তাও সহজ ছিল—এখন রাণীর রূপ বদ্‌লেছে, তা'র কথা ভেবে প্রকাশ এখন ব্যথাই পায়। যে রাণীকে সে এতখানি স্নেহ করেছিল, যার কাছে তা'র কিছুই গোপন ছিল না, সেই রাণী তা'কে এতখানি হীন মনে করতে পার্‌ল কি ক'রে?

রাণীর বিয়ের ব্যাপারে প্রকাশ দূরে থাক্‌বার চেষ্টা করেছে কিন্তু অবিনাশ বাবু একদিন তা'র হাত দুটি ধ'রে বললেন—দাদা, তুমি বাড়ীর ছেলের মতো, তুমি যদি রাণুর বিয়েতে না খাটো তা'হলে আমি বুড়োমানুষ তো পেরে উঠিনে, ভাই!

সুতরাং প্রকাশকে অনেক কাজের ভার নিতে হোল। সেদিন হঠাৎ রাণীর সঙ্গে তার চোখোচোখী হ'য়ে গেল। প্রকাশ একটু ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে—ভাল আছ তো রাণী?

রাণী হাস্‌লো না, বল্‌লো—হ্যাঁ, তুমি যখন আমার মঙ্গল চিন্তায় উঠে প'ড়ে লেগেছ তখন ভাল থাক্‌ব বৈকি। আচ্ছা প্রকাশ দা, তুমিই বা হঠাৎ গায়ে প'ড়ে আমার ভাল কর্‌তে সুরু করলে কেন?·········

রাণীর চোখ ছুটি জলে ভ'রে এল, সে ধরা গলায় বল্‌লো—কেন তুমি আমাকে এ বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও?

প্রকাশ বিস্মিত হ'য়ে রাণীর দিকে চাইলো। তা'র সমস্ত কাজই কি রাণী এমনি ক'রে ভুল বুঝ্‌বে! প্রকাশ কণ্ঠে তীব্র ব্যথা নিয়ে বল্‌লো—রাণী, কেন তুমি আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে চাও? আমি তো তোমার প্রতি কোনই অন্যায় করি নি। তোমার দাদামশাই থাক্‌তে আমি তোমার বিয়ে দোবার কে? এটুকু মনে রেখো রাণী, এ সংসারে যারা সত্যই তোমার মঙ্গল প্রার্থনা ক'র্‌ছেন আমিও তাঁ'দেরি একজন। গরীব ব'লে আমাকে তুমি যত ছোট মনে ক'রে থাক, আমি কিন্তু ততো ছোট নই।·········

পাকা দেখা হ'য়ে গেল। বিয়েরও আর মাত্র দিন পাঁচ ছয় বাকি। সময় অল্প ব'লে গায়ে হলুদ এবং বিয়ে এক দিনেই হবে। প্রকাশকে বেশ খাটতে হচ্ছে। অন্তরে তা'র যাই থাক্‌ অবিনাশ বাবুকে সে দুঃখ দিতে চায় না। প্রকাশের সমস্ত চৈতন্য ঘিরে একটি নির্ম্মল অশ্রুসজল দুঃখ। প্রতিটি নিঃশ্বাস তা'র ভারি হাল্কা। একটি লঘু উদাস বৈরাগ্য তা'র মুখখানিকে কমনীয় ক'রে তুলেছে। তাকে দেখ্‌লে মনে হয় সংসারের কারুর প্রতিই তা'র অভিমান নেই, নিজের দারিদ্র্যের প্রতিও না। তা'র যেন কিছু চাইবার নেই পাবার নেই, কেবল পরের জন্যে খাটতেই যেন এ পৃথিবীতে সে এসেছে।

বিয়ের আগের দিন কিন্তু প্রকাশের জীবনে এক অভূত-পূর্ব্ব কাণ্ড ঘ'টে গেলো। রাণী প্রকাশকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো। প্রকাশ যখন এলো রাণী তা'র পা ছুটি ধ'রে কেঁদে ফেল্‌লো—প্রকাশ দা, এ বিয়ে তুমি ভেঙ্গে দাও, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে দূরে তাড়িয়ে দিও না।······

প্রকাশ পা সরিয়ে নিয়ে রাণীর মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লো—সে কি? এ বিয়েতে তোমার আপত্তি কিসের রাণী? তোমার যিনি স্বামী হবেন তিনি তো খুব ভাল লোক, তবে তুমি এ সব কি বল্‌ছ? ওঠো চোখ মোছ, ছিঃ লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে বল তো?—তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও?

রাণী অধীর হ'য়ে বল্‌লো—না, প্রকাশ দা এ বিয়ে তুমি বন্ধ করো লক্ষীটি। তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি মেয়েদের কথা বুঝ্‌বে কি ক'রে? তা'ই আমি তোমায় সেদিন কটু কথা বলেছি এইটুকুই জান্‌লে আর কিছু জান্‌লে না। বেশ জেনো না, কিন্তু এ বিয়ে তোমায় বন্ধ কর্‌তেই হবে। আর সত্যই যদি তোমাকে হীন ভেবে থাকি তা'র জন্যে তোমার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইছি প্রকাশদা, বলো ক্ষমা করলে·········

প্রকাশের বিস্ময় বাড়্‌তে লাগ্‌লো। রাণী আজ এ সব কি বল্‌ছে? এই কি সেদিনকার সেই গর্ব্বিতা রাণী? প্রকাশ বল্‌লো—তোমার ওপর আমার কোন দুঃখ নেই রাণী, তোমাকে আমি আমার সেই ছোট বোনটি ব'লেই জানি, কিন্তু এ বিয়ে আমি ভাঙ্গবো কি ক'রে? কাল বিয়ে, আজ কি ক'রেই বা তা' সম্ভব? পাঁচজনেই বা বল্‌বে কি?

রাণী কাতর কণ্ঠে বললো—তবে কি হবে প্রকাশদা? একটা ভুলের জন্যে কি সারাজীবন এমনি ক'রে দুঃখ কর্‌তে হবে? প্রকাশদা', কেন তুমি সেদিন চুপ ক'রে রইলে, নিজেকে লুকোলে? কেন তুমি বল্‌লে না ভালবাসার জোরেই বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলে, টাকার লোভে নয়! কেন তুমি আমায় কিছু জান্‌তে দিলে না, কেন তুমি বল্‌লে না, রাণী আমি গরীব—গরীবের মতোই আমার ঘরে এসো···

প্রকাশের চোখে ধাঁধাঁ লাগ্‌লো। তা'র সর্ব্বশরীর কাঁপছে। মনে হোল তা'র ব্রহ্মতল বুঝি এখনি ফেটে যাবে। রাণীর মুখে আজ সে কি শুন্‌লো? রাণী তাকে দুর্ব্বাক্য বলেছে হীন ভেবে নয়, শ্রদ্ধা করে ব'লেই! অসহ

পুলক ও ব্যথায় প্রকাশের বুকে রক্ত তোলপাড় করতে লাগ্‌লো। কিন্তু হায়! এই আশার আলো যে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের মতো—মেঘাচ্ছন্ন ঘনান্ধকারকে চকিতে ঝল্‌সে দিয়ে এযে তা'কে আরো ভীষণ ভয়াবহ ক'রে তোলে। প্রকাশের জীবনে দুঃখব্যথার একটি ম্লান অশ্রুসজল ছায়া ছিল কিন্তু আজ রাণীর প্রকাশোক্তিতে তা' গাঢ় কালিমায় পর্য্যবসিত হোল।

প্রকাশ চীৎকার ক'রে বল্‌লো - রাণী, এ তুমি কি করলে, যা আড়ালে ছিল তা'কে আড়ালেই রাখ্‌লে না কেন? এখন আমি কি করতে পারি? জান ত কিছুই করবার নেই। কেন তুমি আমায় কাঁদাতে চাও? যা হয়ে গেছে ভুলে যাও, নতুন যিনি আস্‌ছেন তাঁ'কেই মেনে নাও······প্রকাশ-দা'কে ভুলে যাও রাণী·········

প্রকাশ দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সমস্ত দিন সে পাগলের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো, এর কোন কি উপায় নেই? সামান্য ভুলের জন্য সত্যই কি এতখানি শাস্তি মাথায় পেতে নিতে হবে? পাত্র তো প্রকাশের বন্ধু, তবে তা'কে গিয়ে সব খুলে বল্‌লে হয় না? ছিঃ ছিঃ,······ প্রকাশ লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌লো। সে কি পাগল হোল? এ সংসারে প্রেমের মূল্য ক'টা লোকেই বা বোঝে? আর অবিনাশ বাবু—তিনি কি প্রকাশকে তা'হলে ক্ষমা করতে পারবেন?

* * * * * *

বিয়ের দিনে প্রকাশের দেখা নেই। অবিনাশ বাবু বার বার লোক পাঠিয়ে জান্‌লেন, প্রকাশ আগের দিনে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে এখনো ফেরে নি। রাণী কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। তা'র কান্নার কারণ কেউ জানলে না, তবে অনেকে অনুমান করলো; কিন্তু বল্‌লো, এও ছেলেমানুষী—এরও কোন মানে হয় না।

বিয়ে হয়ে গেলো। রাণী ভেবেছিলো বিয়ের পরদিনও প্রকাশ একবার এসে শেষ দেখা দিয়ে যাবে - তা'কে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে। রাণী পথের দিকে চেয়ে বসে আছে কখন প্রকাশ আসবে, কিন্তু কোথায় প্রকাশ!

বিদায়ের ক্ষণে শান্তু'র কাঁধে মাথা রেখে রাণী আড়ালে অনেক কাঁদলো। ঝিমা সব জেনেছে, সেও কাঁদলো।

রাণী তা'র হাতে এক টুকরো চিঠি এবং একখানি রুমাল দিয়ে বল্‌লো—এগুলো তোর কাছে রাখ্‌ ঝি-মা, প্রকাশদার সঙ্গে দেখা হলে তা'কে দিস।···

রাণী চ'লে যাবার পর শান্তু সন্ধ্যায় প্রকাশদের বাড়ী গেলো। দেখলো প্রকাশ ফিরেছে—নিজের ঘরে শুয়ে আছে। শান্তু'র ডাকে প্রকাশ উঠ্‌লো—তার মুখ শীর্ণ বিবর্ণ। শান্তু সে মূর্ত্তির দিকে চোখ রাখ্‌তে পারলো না। রাণীর জিনিষ প্রকাশের হাতে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

রুমালটিতে হরেক রকমের ছুঁচের কাজ। লতা-পাতা-ফুলের মধ্যে প্রকাশের নাম লেখা। একটি কোণে ছোট অক্ষরে 'রাণী' লেখা। অনেকগুলি পাতা তা'কে ঘিরে, সহজে লোকের চোখে পড়বে না। প্রকাশ সেই নামটির দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলো।

তারপর চিঠিটি আস্তে আস্তে খুলে সে পড়্‌লো,—মাত্র দু তিনটি লাইন।

প্রণাম নাও। শাস্তি আমরা দুজনেই পেয়েছি, তা' যদি সত্যি হয় দুঃখকে আমি সুখের মতোই উপভোগ করতে পারব। তাহলে এ জীবনের পথচলা আমার সহজ হবে। যদি জন্মান্তর থাকে তোমাকেই যেন বারে বারে পাই—এবারের মতো ক্ষমা করো···ইতি।

প্রণতা রাণী।

প্রকাশ কাঁদলো না। চোখে তা'র বাদল নামেনি, তবে কাল বৈশাখীর প্রচণ্ড গতিবেগ তা'র দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। সেই ভীষণ ঘনায়মান সংহত শক্তি-প্রবাহ কখন্ যে আকুল বর্ষণে ভেঙে পড়্‌বে তা' কে বলতে পারে?

শ্রীজগৎ মিত্র

দুর্দ্দিনে

শ্রীযুক্তা কল্পনা দেবী

কাল রজনীতে
সহসা দিয়েছ দোলা নিস্তরঙ্গ চিতে!
ছিল মন দ্বিধাহারা, ছিনু নিঃসংশয়,
জানি নিত্য কত তৃপ্ত কত যে নির্ভয়
করেছ আমায় তুমি; প্রতি পদে পদে
হাতে ধরে ফিরায়েছ; সম্পদে বিপদে
কখনো করনি ত্যাগ। আমি যদি কভু
ভুলিয়াছি মনে মনে, ভোলনিক' তবু,
আপনি কঠিন করে দিয়েছ চেতনা—
আঘাতে তুলেছ সাড়া, পাছে অন্যমনা
আপন কর্ত্তব্যে ভুলি।
কত কাঁদিয়াছি,
করিয়াছি অনুযোগ—"কেমনে যে বাঁচি
এত যদি ব্যথা দাও?"
তুমি শুনে হেসে
আরো কাছে নেছ টেনে—কত ভালবেসে
মুছায়েছ সিক্ত আঁখি, বলেছ মধুরে—
"ওরে সে আঘাত নয়, অজ্ঞান বিধুরে
সে শুধু জাগায়ে তোলা"—
তাই অসংশয়ে
কাটে রাত্রি কাটে দিন—নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে
বিশ্বাসে সুদৃঢ় চিত্ত। কাল অকস্মাৎ
কে তাতে দিয়েছে সাড়া, কেন সে আঘাত
আমারি বুকেতে এল!

হে চিন্তাহরণ,
কেন কাল আশ্রিতেরে দিলে না শরণ?
আলো, আলো কই?
যে মন জানিত নাক' শুধু তোমা বই,
সে কেন নিঃসঙ্গ আজ? কেন সে লুটায়
ধূলি-ম্লান গৃহতলে—ক্ষুব্ধ বেদনায়
সহসা অধীর হোল! ওই আর্ত্তস্বর
ছুটে তা'র দিকে দিকে ভেদি চরাচর—
"আলো কোথা—আলো কই?"
কই কোথা আলো—
পাখীর মুখর কণ্ঠ আজি কি ভুলিলো
সমস্ত সঙ্গীত তার? স্তম্ভিত আকাশ
কি যেন অজানা ভয়ে, আজি কি বাতাস
থেমে গেল একেবারে?
আলো—আলো কই?
তুমি যার চিত্তে রাজ আঁধার-বিজয়ী
সে আজও আলোক খোঁজে—এও সত্য হোলো
হে নিত্য হে সনাতন, তুমিও কি ভোলো
একান্ত আশ্রিত জনে? চপল, নির্ম্মম
ধরণীর ধূলিম্লান ক্ষুদ্র চিত্ত সম
তোমারো বিচার যদি, তবে কিবা দিয়ে
ভোলাব এ আর্ত্ত প্রাণ—বাঁচিব কি নিয়ে?

শ্রীকল্পনা দেবী

রাগ রাগিণীর ভাব

শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন

১

পুরাণে আছে দেবাদিদেব মহাদেবই আমাদের সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্তা। মহাদেবের নিকট গৌরী কণ্ঠ-স্বর কি ভাবে উৎপন্ন হয় তাহা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; ইহাতে মহাদেব বলেন—

"স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং স্বরজ্ঞানাৎ পরম্ ধনম্
স্বরজ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং ন বা দৃষ্টং ন চ শ্রুতম্।"

"হে দেবি! স্বর-জ্ঞানের অপেক্ষা প্রধান মিত্র, শ্রেষ্ঠ ধন অথবা গুপ্ত বিষয় আর দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় না।" অতএব কণ্ঠ-স্বর কি ভাবে উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের সকলেরই প্রথমে জানা উচিত।

প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকগণ স্বর উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন সেই সম্বন্ধে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র মহাশয় গত ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'বিচিত্রায়' বিশদভাবে লিখিয়া সঙ্গীত-আলোচকদিগের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ বলেন যে, বাক্তন্তুর (vocal chord) কম্পন (vibration) হইতেই স্বরের উৎপত্তি হয় এবং দাঁত, গাল ও তালুতে প্রতিধ্বনিত হইয়া স্বর প্রবল হয়। যেমন—

"It has been proved by observations on living subjects, by means of the laryngoscope, as well as by experiments on the larynx taken from the dead body, that the sound of the human voice is the result of the inferior laryngeal ligaments, or true vocal chords which bound the glottis, being thrown into vibration by currents of expired air impelled over their edges" (Hand Book of Physiology by William Senhouse Kirkes, M.D.)

"জীবিত ব্যক্তির কণ্ঠনালী পরিদর্শন করিয়া ও মৃতদেহের গলনালী পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, মুখ-গহ্বরে নিবদ্ধ স্বরোৎপাদক কণ্ঠনালীর সূক্ষ্ম তন্তুপ্রান্তে ফুস্ ফুস্ হইতে নিঃসৃত বায়ু আহত এবং কম্পিত হইয়া ধ্বনি উৎপাদিত করে।"

এই গেল ঐ দিক্‌কার কথা। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

"আত্মাবিবক্ষমাণোঽয়ং মনঃ প্রেরয়তে মনঃ।
দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরণ্।
নাভিহৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধাস্যেষ্বাবির্ভাবয়তি ধ্বনিঃ॥"

(সঙ্গীত রত্নাকর)

"কোনরূপ ধ্বনি করিবার ইচ্ছা করিলে মন দেহস্থিত অগ্নিকে আঘাত করে। শরীরে ব্রহ্মগ্রন্থি নামে যে গ্রন্থি আছে এবং তাহাতে যে বায়ু থাকে দেহাগ্নি গিয়া সেই বায়ুকে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে চালনা করে। সেই বায়ু ক্রমে ঊর্দ্ধ দিকে আসিয়া যথাক্রমে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক ও বদনে ধ্বনি উৎপন্ন করে।"

নাভি এবং হৃদয়ও (বক্ষ) যে স্বর-উৎপত্তির সহায়তা করে তাহা প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ বলেন না। আমরা কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণের সহিত একমত হইতে পারি। কারণ খাদ সুর গাহিবার সময় বুকের উপর হাত রাখিলে বক্ষের কম্পন বিশেষ ভাবেই টের পাওয়া যায়। তাহাতে মনে হয় বক্ষ স্বর-উৎপত্তিতে সহায়তা করে। অতি-খাদ সুর গাহিতে নাভিও সূক্ষ্মভাবে কম্পিত হয় এবং স্বর-উৎপত্তিতে সহায়তা করে এইরূপ মনে করিতে পারি।

২

আমাদের গীত ভাবপ্রধান এবং তাহা বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু কি ভাবে তাহা ব্যক্ত করে এবং কি তাহার রীতি তাহা জানিবার প্রয়োজন আমাদের হয় না। কারণ গান বাজনা শুনিতে আরম্ভ করিলে তখন এত সব ভাবিবার কথা কাহারও মনেই থাকে না। কিন্তু একটা কথা মনের কোণে উঁকি দেয়, আমাদের কানে যখন একটু সুরের রেশ বা এক টুক্‌রা সুর ভাসিয়া আসে তখন আমরা কান পাতিয়া শুনি কেন? কি রহস্য ইহাতে আছে? কোথায় কোন্ তেপান্তরের মাঠ হইতে একটা অচেনা অজানা গানের সুর কাণে পৌছিতেই আমাদের মন সেইদিকে আকৃষ্ট হয় কেন? প্রতীচ্য বলে যে, আমাদের কাণ স্বভাবতঃ মিষ্ট ধ্বনি অনুকরণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ ইহা কাণের স্বভাবিক ধর্ম্ম। আমরাও পূর্ব্বে অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, সুরের মিল যে যে সুরে আছে মানুষ সেই সেই সুরের একত্র বা পাশাপাশি সমাবেশ শুনিতে ভালবাসে ও তাহাতে সুখানুভব করে। কিন্তু কেন এইরূপ সুখানুভব হয়? আমাদের শরীরে এমন কী আছে যাহাতে এরূপ হইতে পারে? সুরের দূরত্ব, সুরের মিল ও অনুপাত, কি কি অনুপাতের ধ্বনিত সুরের রেশ আমাদের কাণে মিষ্ট লাগে, কানে কি আছে যাহাতে আমরা শুনিতে পাই, এই সব ব্যাপারে পাশ্চাত্য মনীষীগণ অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু সুর কেন মিষ্ট লাগে, এক এক সুর কি ভাব ব্যক্ত করে, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। যাহা হউক, প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের শরীরের স্থানে স্থানে এমন সব সূক্ষ্মতন্ত্রী আছে যাহার আন্দোলনে মানব-প্রকৃতির সঙ্গে প্রাকৃতিক ভাবের মিলন হয়। কাণ সম্বন্ধে যেমন প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে, আমাদের কাণের ভিতর অসংখ্য সূক্ষ্ম তন্ত্রী আছে. বাহিরের ধ্বনির কম্পন সেই সব তন্ত্রীকে কাঁপাইয়া দেয় ও আমরা শুনিতে পাই,—সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্র মতে বলিতে গেলে আমাদের স্নায়ু-মণ্ডলীতে ছয়টী চক্র আছে, সেই সকল চক্রে কতকগুলি সূক্ষ্ম তন্ত্রী আছে, বাহিরের প্রকৃতির ভাব সেই সকল তন্ত্রীতে আঘাত করে ও আমাদের দেহে অনুরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়।

স্বর-উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থে লেখা আছে যে, ব্রহ্মগ্রন্থির বায়ু ঊর্দ্ধদিকে চালিত হয়, সেইখানেই মূলাধার নামে এক চক্র আছে তাহা অধোভাগে coccyx-এ অবস্থিত। সেই চক্রে চারিটি পদ্ম (বর্ণ) আছে। সেই চক্রে 'স' সুর উৎপন্ন করিবার মত তন্ত্রী আছে, তাহা রক্তবর্ণ ও তাহার তত্ত্বের নাম পৃথিবী। এর উপরে এবং প্রজনন স্থানের নিম্নে (lumbarএ) স্বাধিষ্ঠান নামে চক্র অবস্থিত। সেই চক্রে ছয়টি পদ্ম (বর্ণ), সেখানে 'র' সুর উৎপন্ন করিবার তন্ত্রী আছে, তাহার তত্ত্বের নাম বারি। কারণ ইহা বরুণের (জল) স্থান।

তন্ত্রশাস্ত্র হইতে শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় যে তালিকা করিয়াছেন তাহা তাঁহার লিখিত "রাগরাগিণীর মাধুর্য্য" নামক প্রবন্ধ হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনিই প্রথমে হিন্দু সঙ্গীতের মাধুর্য্য কোথায় ও তাহার বিজ্ঞান কি তাহা লিখিয়া সঙ্গীত আলোচকদের যথার্থ উপকার করিয়াছেন।

তালিকাটি এই —

চক্র	পদ্মের সংখ্যা	স্থিতির ক্ষেত্র	তত্ত্বের নাম	আহত স্বরের নাম
মূলাধার	৪	অধোভাগ (Coccyx)	পৃথিবী	ষড়জ——সা
স্বাধিষ্ঠান	৬	প্রজনন স্থানের নিম্নে (Lumbar)	বারি (রস)	ঋষভ——রে
মণিপুর	১০	নাভি (Dorsal)	অগ্নি (রূপ)	গান্ধার——গা
অনাহত	১২	হৃদয় (Cervical)	বায়ু (স্পর্শ)	মধ্যম——মা
বিশুদ্ধ	১৬	কণ্ঠ (Thoracic)	আকাশ (শব্দ)	পঞ্চম——পা
আজ্ঞা	২	কুর্ম্মাখ্য (Medulla)	—	ধৈবত——ধা
সহস্রার	—	মন, মস্তিষ্ক (Cerebrum, Brain)	—	নিষাদ——নি

"সঙ্গীতশাস্ত্র বলে যে, সঙ্গীতের ভিত্তি 'নাদ' (ধ্বনি বা শব্দ)। মূলাধারস্থিতা নাদরূপা কুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগদ্বারা সহস্রারস্থিত বিন্দুরূপ পরম শিবের সহিত সংযোগ করিতে পারিলেই যোগে সিদ্ধিলাভ হয়। এইজন্য কেহ প্রাণায়াম দ্বারা কেহ বা স্বরসাধনা দ্বারা ষটচক্রভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীকে পরম শিবে সংযোগ করিতে সিদ্ধ হয়েন।" সঙ্গীতের চরম লক্ষ্য ভগবৎপ্রেম লাভ। সহস্রার স্থিত পরম শিবের সহিত (সা) কণ্ঠ মিলাইয়া সুর, মন ও ভাবসম্পদ তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতে পারিলেই তৃপ্তি। যেন এইখানেই সুরের, কথার ও ভাবের চিরসমাপ্তি। আমরা ভগবৎ-প্রেম লাভ করিবার জন্য ভিখারী। ভিখারী মাত্রেই করুণ বা ব্যাকুল ভাবে ভিক্ষা পাইবার অপেক্ষা করে। এইজন্য সঙ্গীত মাত্রেই অর্থাৎ সকল দেশের সঙ্গীতই ব্যাকুলতাপূর্ণ। আমাদের সঙ্গীতও ব্যাকুলতার সুর।

সঙ্গীতের মধ্যে তিনটি বস্তু আবশ্যক,—কথা, সুর ও ভাব। কথার ভাবের সহিত সুরের ভাবের ঐক্য হইলেই গায়কের মুক্তি। কিন্তু আমাদের এই তিনটিরই অভাব রহিয়াছে।

এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—"যতই চিন্তা করিয়া দেখিবেন ততই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের তিনটিরই অভাব। সুরের শেষ নাই; কথারও শেষ নাই; ভাবেরও শেষ নাই। ভাবগ্রাহী বলেন ভাবই অবলম্বন কর; কবি বলেন কথাই অবলম্বন কর, ছন্দের সহিত; সঙ্গীতাচার্য্য বলেন সুর অবলম্বন কর, কেন না প্রথম বাণীই ওঁকার, তাহারই মধ্যে কথা ও ভাব। যোগী বলেন প্রাণ সংযত কর নচেৎ তোমার সুর, কথা ও ভাব তিনটিই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। অতএব মাত্রা ও ছন্দ কিংবা তালের দরকার।"

৩

এখন কথার ভাব ও সুরের ভাবের ঐক্য কিরূপ দেখা যাক্।

কথা—

"এস হে এস, সজল-ঘন বাদল-বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এস হে এ জীবনে।"

রবীন্দ্রনাথ

স্বরবিন্যাস—

রা	মা	মা	মা	মা	পা	পা	পা	মা	পা
এ	স	হে	এ	স	স	জ	ল	ঘ	ন
ধা	র্সা	নর্সা	ধা	পা	মা	ধপা	মা	-া	-া
বা	দ	ল	ব	রি	ষ	০	ণে	০	০
রা	গা	মা	ধা	পা	মা	গা	মা	রা	সা
বি	পু	ল	ত	ব	শ্যা	ম	ল	স্নে	হে
সা	রা	রা	রা	রা	গা	রা	গমা	-মা	-গা
এ	স	হে	এ	জী	ব	০	নে	০	০

কথার ভাব—

সজল ও ঘন বাদলকে তাহার বিপুল ও শ্যামল স্নেহ লইয়া এই জীবনে অর্থাৎ হৃদয়ে আসিতে আহ্বান করা হইতেছে, ব্যাকুলতার সুরে বা ব্যাকুল ভাবে।

সুরের ভাব—

পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে যে, মধ্যম (মা) হৃদয়ে অবস্থিত ও তত্ত্বর নাম বায়ু; ঋষভ (রে) বারির স্থানে অর্থাৎ জলে; গান্ধার (গা) অগ্নিতে (তড়িৎ বুঝায়)। স্বরবিন্যাসের প্রথমেই আরম্ভ হইতেছে—রা মা মা মা মা। এস হে এস; কিন্তু কোথায়? হৃদয়ে। অর্থাৎ সুরের কথায় মধ্যমে—সাতটি সুরের হৃদয় মধ্যমে, অর্থাৎ 'মা'তে। 'এস হে এস' গাওয়াতেই সঙ্গে সঙ্গে সুরের ভাব বুঝাইয়া দিতেছে যে, সুরের হৃদয় ('মা') ডাকিতেছে জলকে ('রে') 'এস হে এস'। যেমন—রা মা মা মা মা।

পা পা পা মা পা ধা র্সা র্সা ধা পা মা ধা পা মা মা। সজল ঘন বাদল বরিষণে। আরম্ভ পা সুর হইতে, সমাপ্ত মা সুর পর্য্যন্ত। অর্থাৎ আকাশ (পা) বা ঊর্দ্ধ পথ হইতে

হে সজল ঘন বাদল, ঝর ঝর ধারে হৃদয় (মা) পর্য্যন্ত 'এস হে এস'।

রা গা মা পা ধা পা মা গা মা রা সা সা রা রা রা রা গা রা গা মা মা গা। বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এস হে এ জীবনে। "এস হে এস" রা গা মা পা ধা পা হইতে। অর্থাৎ রা (জল) গা (তড়িৎ) মা (বায়ু) সাহায্যে পা ধা পা (আকাশ) হইতে তুমি এস। সঙ্গীত শাস্ত্রে বলে র স্বর করুণ-রসাত্মক। এখানে শেষের 'এস হে' কথাটিতে একটু বিশেষ করুণভাব প্রকাশ পাইতেছে। স্বর বিন্যাসে র স্বরই ধ্বনিত হইতেছে ,—যেমন সা রা রা রা রা।

এখানে কথার ভাবের এবং সুরের ভাবের মিলন হইতেছে অপূর্ব্বভাবে। গানের কথা বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভের ভাব আনিতেছে। গ্রীষ্মকালের অগ্নিসম-রৌদ্র-দগ্ধ হৃদয় বাদলকে আহ্বান করিতেছে। ইহাতে মল্লার রাগিণীর স্বর-বিন্যাস সংযোজন করা হইয়াছে। এখন ভাবিয়া দেখুন মল্লার রাগিণীতে বর্ষার ভাব আসিতেছে কিনা।

৪

ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণেরও পরিবর্ত্তন হয়। লজ্জায় মুখমণ্ডল লাল হয়, ভয়ে কাল হয়, ক্রোধেও লাল হয়, কাম ভাব রক্ত হইতে পীত পর্য্যন্ত অধিকার করে। এই সবের আভাস আমরা মুখের বাহ্য ভাবেও দেখিতে পাই। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গেও বর্ণের পরিবর্ত্তন হয়। বসন্তে নানা রঙের ফুল ফুটে। বর্ষার প্রারম্ভে পৃথিবী সবুজ হইয়া যায়। কাজেই, প্রাকৃতিক ভাবের সঙ্গে বর্ণে যেমন যোগসূত্র রহিয়াছে তেমনি আবার মানুষের ভাবের সঙ্গেও বর্ণের সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে। প্রতি সুরেও যে এক একটা বর্ণের মিল আছে তাহা ১৩৩৬ সালের 'বিচিত্রা'র চৈত্র সংখ্যায় "হিন্দু সঙ্গীতের মাধুর্য্য" নামক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে দেখান হইয়াছে। কাজেই এখানে সংক্ষেপে লিখিতেছি।

সা = রক্ত (লাল)
রে = কমলা (গোলাপী)
গা = পীত
মা = সবুজ
পা = নীল
ধা = অতি নীল (কাল)
নি = বেগুনী

পূর্ব্বের মল্লার রাগিণীর স্বর-বিন্যাসটি লইয়া দেখা যাক্ উহাতে ভাবের সঙ্গে বর্ণের মিলন হয় কিনা। কথার ভাব— বর্ষার প্রারম্ভে বাদলকে আহ্বাহন। স্বর-বিন্যাস—রা মা মা মা মা এস হে এস।

এখানে আমরা মা সুরই প্রবলতর দেখিতেছি। মা সুর সবুজ বর্ণ। এই ধরাতল সবুজ করিয়া হে বাদল এই হৃদয়ে (মা) এস, অথবা হে বাদল তুমি আসিয়া ধরাতল সবুজ কর। মা গা মা রা সা—শ্যামল স্নেহে। এখানে মা প্রবলতর ও সা-তে বিশ্রাম। মা শ্যামল (সবুজ) স্নেহে পৃথিবীতে (সা) এস। কথায়, সুরে এবং বর্ণে বর্ষার প্রারম্ভ সূচনা করিতেছেন।

৫

সঙ্গীতাচার্য্যগণ বলেন যে, এক একটা সুর এক একটা ভাব প্রকাশ করে। যেমন—

> "মূলং রসানাং ষড়্জাখ্য ঋষভঃ করুণাত্মকঃ।
> গান্ধার স্তথা শান্তাত্মা ভয়ানকোঽস্তি মধ্যমঃ॥
> বীরাত্মকঃ পঞ্চমস্ত ধৈবতঃ করুণাত্মকঃ।
> নিষাদো রৌদ্র বীরাত্মা গন্ধর্ব্বাভিজ্ঞসম্মতঃ॥"

(সঙ্গীত-মহাদধৌ)

অর্থাৎ—

মা = সকল রসের মূল
রে = করুণ রসাত্মক
গা = শান্ত রসাত্মক
মা = ভয়ানক
পা = বীর
ধা = করুণ
নি = রৌদ্র ও বীর

পূর্ব্বের মল্লার রাগিণীর স্বর-বিন্যাসটিতে আমরা রে, মা ও ধা এই কয়টিই প্রবল সুর পাইতেছি। রে সুর প্রবলতম। নি, পা ও গা সুর অল্প ব্যবহৃত হইতেছে। রে—করুণ, মা—ভয়, ও ধা—করুণ। এই প্রবল সুরগুলিতে ভয় ও করুণ ভাব পাইতেছি; করুণভাবই বেশী। নি—রৌদ্র ও বীর, পা—বীর, আর গা—শান্তরসসূচক। মল্লারে বীর ও শান্তভাবের অভাব। ভয় ও করুণ ভাবের আধিক্যে বীর ও শান্তভাব নাই। ভয়ে মন চঞ্চল। আর সা সুর সকল ভাবের মূল; যে কোন ভাব সা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। মল্লারে নি সুর অতি অল্প ব্যবহৃত হয়। স্বর-বিন্যাসে তাহাই আছে। নি সুরের ব্যবহার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নি—রৌদ্র সুর, সুরের আর রৌদ্র ভাব ভাল লাগিতেছে না, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধপ্রায় হইয়া আর প্রাণ রৌদ্র চায় না। তাই রৌদ্র-ভয়ে ভীত সুর করুণভাবে জলের জন্য ও সবুজ মাঠের আশায় বাদলকে আহ্বান করিতেছে। এই জন্যই মল্লার করুণ রাগিণী। মল্লার রাগিণীতে যেমন আকাশ ছাইয়া বাদল আসে, হৃদয়েও সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও করুণ সুর মিলিয়া বাদল আসে। প্রকৃতির বাদল হইতে যেমন ঝর ঝর বরিষণ হয়, মনের বাদল হইতেও ক্রন্দন আসে এবং নয়নের বাদল ঝর ঝর ধারে বরিষণ হয়।

৬

উপরে লিখিত কথাগুলির প্রমাণ পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা এখনও পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা যে বিষয়টুকুর উপরে বেশী ঝোঁক দেন তাহা সুরের harmony (স্বরসম্বাদ)। কম্পনের অনুপাতে যে যে সুরে অধিকতর মিল আছে সেই সেই সুরগুলির একত্র ধ্বনি মিষ্ট লাগে। তাহাই harmony। তাঁহাদের সঙ্গীত harmonyর কড়া গণ্ডীর ভিতরে। আমাদের সঙ্গীতে স্বর-সম্বাদ আইনের বাঁধাবাঁধি খুব বেশী নাই। অর্থাৎ পশ্চিম দেশের মত নাই। তবে আমাদের সঙ্গীতেও স্বর-সম্বাদের মিলন আছে। অবশ্য আমরা ইহার উপর বেশী ঝোঁক দিই না।

আমাদের সঙ্গীতে একটা সংজ্ঞা আছে 'বাদী সংবাদী সুর'। প্রাচীন সঙ্গীতমহারথীগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, রাগের স্বরূপ প্রকাশক স্বর-বিন্যাসের বাদী সুর রাজার ন্যায় ও সংবাদী সুর মন্ত্রীর ন্যায়।

হিন্দুস্থানী কথায় বাদী সুরকে 'জান্' বলে। জান্ অর্থ প্রাণ। বাদী সুরই রাগের প্রাণস্বরূপ এইরূপ বুঝায়। জান্ সুর ব্যতীত রাগের রূপ প্রকাশ করা অসম্ভব। রূপ প্রকাশ করিতে সংবাদী সুর বাদী সুরকে সাহায্য করে।

আমাদের বাদী সংবাদীর মিলনই প্রকৃত স্বর-সম্বাদ (harmony)। সাধারণতঃ, যে সুর বাদী হইবে তাহার পঞ্চম সুর সংবাদী হয়। গা বাদী হইলে নি সংবাদী হয়। কারণ গা-কে সা ধরিলে তাহার পঞ্চম সুর অর্থাৎ পা সুর নি হইবে। কম্পনের অনুপাতে কোন্ কোন্ সুরের সঙ্গে কোন্ কোন্ সুরের মিল আছে ও আমাদের সঙ্গীতে তাহা কিরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত এবং আমাদের সঙ্গীত সুরের মিল অনুযায়ী কিরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ তাহা 'হিন্দু-সঙ্গীতের মাধুর্য্য' নামক প্রবন্ধে একবার লেখা হইয়াছে। এখানে পুনরায় ইহার আলোচনা করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

মল্লার রাগিণীর স্বর-বিন্যাস লইয়া দেখা যাক্ তাহার বাদী সংবাদী কি ভাব প্রকাশ করে। মল্লার রাগিণীর রে সুর বাদী ও তাহার পঞ্চম ধা সুর সংবাদী। রে সুর করুণ রসাত্মক, ধা সুরও করুণ রসাত্মক। মল্লার এই জন্যই খুব করুণ রাগিণী। ইহা শান্ত ও বীর রসে গাওয়া যায় না।

৭

দেখা যাক্ এই গানটির 'অন্তরা' কি ভাব ব্যক্ত করে, এবং কথায়, ভাবে ও সুরে মিলন কতটুকু হয়।

কথা—

'এস হে, গিরিশিখর চুমি' ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি,
গগন ছেয়ে এস হে তুমি গভীর গরজনে।

স্বরবিন্যাস

পা পা	পা নধা না	র্সা র্সা	র্সা র্সা র্সা	র্সা র্সধা
এ স	হে, গি রি	শি খ	র চু মি	ছা য়া

না র্সা র্রা	র্সা না	র্সা ধা পা	মা মা	মা মা মগা
য় ঘি রি	কা ন	ন ভূ মি	গ গ	ন ছে ড়ে

রা পা	মা পা পা	ধা র্সা	নর্সা ধা পা
এ স	হে, তু মি	গ ভী	র গ র

পা মা	ধা পা মগা	রা গা	মা ধা পা	মা গা
জ ০	নে ০ ০	বি পু	ল ত ব	শ্যা ম

মা রা সা	সা রা	রা রা রা	গা রা	গা মা মগা
ল স্নে হে	এ স	হে, এ জী	ব ০	নে ০ ০

গিরি-শিখর অনেক উঁচু। কথায় বলিতেছে— এস হে গিরি-শিখর চুমি। কিন্তু গিরি-শিখর চুম্বন করিতে হইলে অনেক উচ্চে আরোহণ করিতে হইবে। সুর বিন্যাসেও ঐরূপই আছে—পা পা পা নধা না র্সা র্সা র্সা র্সা র্সা।

সা-ই মূলাধার সুর। এক তারার সা সুরে সুর মিলাইতে পারিলেই আমাদের তৃপ্তি। এখানে সা সুরে বা পরম-শিবে সুর মিলিতেছে। এইজন্য আমরা এইটুকু স্বর-বিন্যাসেই বিশেষ আনন্দ পাইতেছি। গিরি-শিখর বা সুরের শিখরে আরোহণ করিয়া আবার ফিরিতে হইবে। যেমন তেমন করিয়া ফিরিলে চলিবে না, কাননভূমি ছায়ায় ঘিরিয়া তবে ফিরিতে হইবে। সুরও চড়া র্সা হইতে অবরোহণ করিতেছে—যেমন র্সা র্সা ধা না র্সা র্রা র্সা না র্সা ধা পা। এই কয়টি সুরের মধ্যে ধা সুরেই ঝোঁক্ পড়িতেছে বেশী। সা সুরও বেশী ব্যবহৃত হইতেছে, কারণ সা মূলাধার সুর। ধা সুরই এখানে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধা—কালবর্ণ। বাদল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া না আসিলে কাননভূমি ছায়ায় ঢাকা পড়িতে পারে না। সুরই তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। এই স্বর-বিন্যাসটুকুর স্বর পা সুরে সমাপ্ত। পা সুর পর্য্যন্ত আসিয়াই অর্থাৎ আকাশ পর্য্যন্ত আসিয়াই সমাপ্ত। এই ধরাতল ছায়ায় ঢাকা দিতে হইলে কৃষ্ণবর্ণ বাদলের আকাশেই পরিভ্রমণ করিতে হইবে। তারপর—গগন ছেয়ে এসে হে তুমি গভীর গরজনে। বাদল গগন ছেয়ে আসে আবার হৃদয় ছেয়েও আসে। গগন এখানে হৃদয়ের গগনও হইতে পারে। স্বর বিন্যাসে আছে—

মা মা	মা মা মগা	রা পা	মা পা পা
গ গ	ন ছে ড়ে	এ স	হে তু মি

স্বর-বিন্যাসে মা সুরের প্রাধান্য ও পা সুরে সমাপ্ত। মা সুর হৃদয়। হৃদয়েও বাদলের ভাব আসুক তাহাই এখানে সুরে বুঝাইতেছে। 'গগনে বাদল' এখানে হৃদয়ের বাদল। সুর পা সুরে সমাপ্ত। যেন পা সুর ধ্বনিত হইয়া বলিতেছে, হে বাদল, হৃদয় ছেয়ে তুমি এস আকাশ (পা) হইতে। কাতর স্বরে যেন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছে ও তাহাই বুঝাইতেছে। গর্জ্জন এবং গভীর গর্জ্জন হইলেই সুর চড়ায় উঠিবে। স্বর-বিন্যাসের সুরও চড়া হইয়া গিয়াছে। যেমন—ধা র্সা নর্সা ধা পা পা মা ধা পা মগা।

উপরের স্বর-বিন্যাসে রে-মা, ধা-র্সা, মা-ধা, র্সা-ধা, মা-রে, পা-নি, রে-পা প্রভৃতি সুরের মিল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। কম্পনের অনুপাতে উপরোক্ত সুরের বিশেষ মিল দেখা যায়। কাজেই স্বর-বিন্যাসের সুর 'হারমণি'-বর্জ্জিত এইরূপ বলা যায় না। সুরের চলনভঙ্গী অতি স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ভাবে কোথায়ও সুর চলাফেরা করে নাই। কাজেই স্বর-বিন্যাসে সুরের মিল নাই বা স্বর-বিন্যাস নেহাৎ 'হারমণি' বর্জ্জিত এ কথা বলা যায় না।

হিন্দী গানেই কথার, সুরের ও ভাবের মিলন বিশেষভাবে দেখা যায়। আমাদের যত উৎকৃষ্ট গান সবই প্রায় হিন্দী ভাষায় রচিত। সব দেশের ওস্তাদগণই হিন্দী গানগুলি শিক্ষা করেন ও তাহাই গান করেন। Hindu classical music বলিতে আমরা এখনও হিন্দী গানকেই বুঝি। বাংলা ভাষায় হিন্দীর অনুকরণে মাত্র সামান্য কয়েকটী গান আছে। এখানে একটি হিন্দী গানের সামান্য পরিচয় দিয়া তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেছি। এ গানটিতে পূর্ব্বোক্ত গানটীর পরবর্ত্তী সময়ের ভাব।

কথা—

পাতুরা সম নিরতত
বিজরী সঘন গরজে গরজে।
আইরে পাওয়াসদল সাজে
বরখত কোটি কোটি শিল।
পুরবাইয়াঁ চলত পবন
কঠিন সঘন দলত দ্রুম,
অতি আঁধিয়ারী রএনা একেলি
পিয়া বিন ডর লাগে মুঝে।

ভাব—

নর্ত্তকীর মত নৃত্যশীলা বিজলী ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে; আর আকাশে সাজ-সজ্জা করিয়া মেঘরাশি আসিতেছে এবং কোটি কোটি শিল বর্ষণ করিতেছে।

পূবের হাওয়া বহিতেছে এবং গাছপালা কঠিনভাবে দলিত হইতেছে। এই অতি ঘন ঘটা ও অন্ধকারে—পিয়া ছাড়া আমি একা—আমার ভয় করিতেছে।

স্বর-বিন্যাস—

| ধা ধা | ধা ধা | ধা ধা | নর্সা ধা ‖ +পা মা | মা মা |
| পা • | • • | • • | • তু ‖ রা • | • • |

| মা মা | মা রা | পা পা | পা পা | পা পা ‖ মা পা | ধা র্সা |
| স ম | নি • | • র | ত • | ত • ‖ বি জ | রী স |

| নর্সা ধপা | মা মা | গা মা | মা মা | মা‿রা ‖ রা মা | রা রা |
| ঘ ন | গ র | • জে | গ র | • জে ‖ আ ই | রে পা |

রা রা | সা সা | রা রা | সা সা | সা সা || ধা ধা |
ওয়া স | দ ০ | ০ ল | সা ০ | জে ০ || ব র |

ধা নসা | ধা পা | মা মা | গা মা | মা মা | মা রা |
০ ০ | খ ত | কো ০ | ০ টি | কো ০ | ০ টি |

মা গা | রা রা | রা সা ||||
শি ০ | ০ ০ | ০ ল ||||

\+
পা পা | র্সা ধা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা |
পূ র | বা ০ | ই য়া | চ ল | ০ ত |

র্সা র্সা | র্সা র্সা || মা পা | ধা র্সা | র্রা র্রা | র্সা র্সা | না র্সা |
প ০ | ব ন || ক ঠি | ন স | ঘ ন | দ ল | ০ ত |

র্সা র্সা | নর্সা ধপা || মা পা | ধা র্সা | ধা পা | মা মা |
ক্র ০ | ০ ম || অ তি | আঁ খি | য়া রী | র এ |

মা মা | মা মা | মা মরা || মা মরা | পা পা | পা পা |
০ না | এ কে | ০ লি || পি য়া | ০ ০ | বি না |

মা মা | মা মা | মা মা | মা মা || মা মা | রা রা |
ড ০ | র ০ | লা ০ | গি ০ || মু ০ | ০ ০ |

রা সা ||||
০ ঝে ||||

কথার ভাবে—

নর্ত্তকীর মত বিজলীর চমক ও গর্জ্জন, ধারাবাহী বাদল ও শিলা-বর্ষণ, পূবের হাওয়ার কঠিনভাবে গাছপালা দলন, প্রকৃতির ঘনঘটায় ও অতি অন্ধকারে পিয়া ছাড়া একা নারীর কাতর উক্তি ও ভয়ই প্রকাশ পাইতেছে।

সুরের ভাবে—

সেইরূপ নর্ত্তকীর মত সুরের এক সুর হইতে অন্য সুরে নৃত্য, ধারাবাহী সুরের রেশ পা ধা র্সা ধা পা ইত্যাদি আকাশে সুরের দলন; সর্ব্বশেষে ব্যাকুলতার সুর রহিয়াছে। ব্যাকুলতার ও ভয়ের সুর মিলিয়া ইহা অতি করুণ রাগিণীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই গানে ভয়টুকু বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন—

মা	পা	ধা	র্সা	ধা	পা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা
অ	তি	আঁ	ধি	য়া	রী	র	এ	০	না	এ	কে	০	লি
মা	রা	পা	পা	পা	পা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা
পি	য়া	০	০		না	ড	০	র	০	লা	০	গে	০

এখানে মা সুর অতি প্রবল। মা সুর ভয় সূচক। মা সুর ধ্বনিত হইয়া 'ডর লাগে' (ভয় করে) গীত হইতেছে। কথার ও সুরের কি অপূর্ব্ব মিলন! এই 'ডর লাগে' কথাটি অন্য যে কোনরূপে গীত হউক না কেন এমন মধুর হইবে না।

স্বর-বিন্যাসের প্রতি চরণে বা আওয়ার্দ্দায় মা ধা ও রে সুর বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়াতে ভয় ও করুণভাব প্রকাশ করিতেছে। কথাতেও বর্ষা, ভয় এবং করুণভাব। সুরেও তাহাই। ইহা মল্লার রাগিণীর গান। এখন দেখুন গানে বর্ষার ভাব আসে কিনা। এই গানটি আর যে কোন রাগিণীতেই গীত হউক না কেন, এমন ভাব কথা ও সুরের মিল হইবে না।

৮

পাশ্চাত্য কম্পনের অনুপাতে মিল অনুযায়ী সুরের একত্র ধ্বনি করিয়া আনন্দ পায়। কিন্তু আমাদের আনন্দ আসে কথার ভাবের সঙ্গে সুরের ভাবের মিলনে। সুরের মিল বাদী-সংবাদী ইত্যাদি গীতের ভাব প্রকাশের সহায়তা করে মাত্র। সুরের মিল বা বাদী-সংবাদী, কম্পন, অনুপাত ইত্যাদি আমাদের সঙ্গীত শিক্ষায় বর্ণপরিচয়ের ন্যায়। এই সব প্রথমেই শিক্ষা করিতে হয়। প্রকৃতির ভাবের সঙ্গে সুরের ভাবের ঐক্য করিবার ও সহস্রারস্থিত পরম শিবে মনের সুরের মিলন করিবার মত মনের অবস্থা পরে আসে। পাশ্চাত্যের সঙ্গীত কিন্তু বর্ণ পরিচয় লইয়াই ব্যস্ত। এই জন্যই তাহাদের গান আমাদের গীতের মত ভাবময় নয়। খ্যাত-নামা গ্রন্থকার এড্‌ওয়ার্ড মুর্ সাহেব 'হিন্দু প্যানথিয়ন' নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একস্থলে হিন্দু ও বিলাতী সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে অল্প কথায় এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

"কতকটা আত্মহীনতা বোধ, কতকটা লজ্জার সহিত আমি স্বীকার করিতেছি যে, ললিত মধুর সঙ্গৎ সহকারে বীণা কিংবা সারঙ্গ যন্ত্র হইতে একধারাবাহী যে সরল স্বরলহরী সমুত্থিত হয় উহা আমার হৃদয়কে যেরূপ স্পর্শ করে 'ফ্যাশা-নেব্‌ল্' কণ্ঠগীতি সহযোগে ইতালীয় বাদ্যভাণ্ড বিনিঃসৃত বহুবিকৃত জটিল স্বরসমূহের ঐক্যতান আমার নিকট সেরূপ মর্ম্মস্পর্শী বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুসঙ্গীত শ্রবণে শ্রোতার মনে লেশমাত্র বিস্ময় উৎপন্ন হয় না সত্য, কিন্তু কি জানি কেন, একপ্রকার আত্মহারা ভাব উপস্থিত হয়, হৃদয় উদ্বেলিত হয়, চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। ইতালীয় অর্থাৎ 'ফ্যাশানেব্‌ল্'

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের আভ্যন্তরিক জটিলতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয় সত্য কিন্তু উহার দ্বারা অন্যান্য উচ্চতর প্রীতিকর রসভাবের উদ্রেক হয় না।"

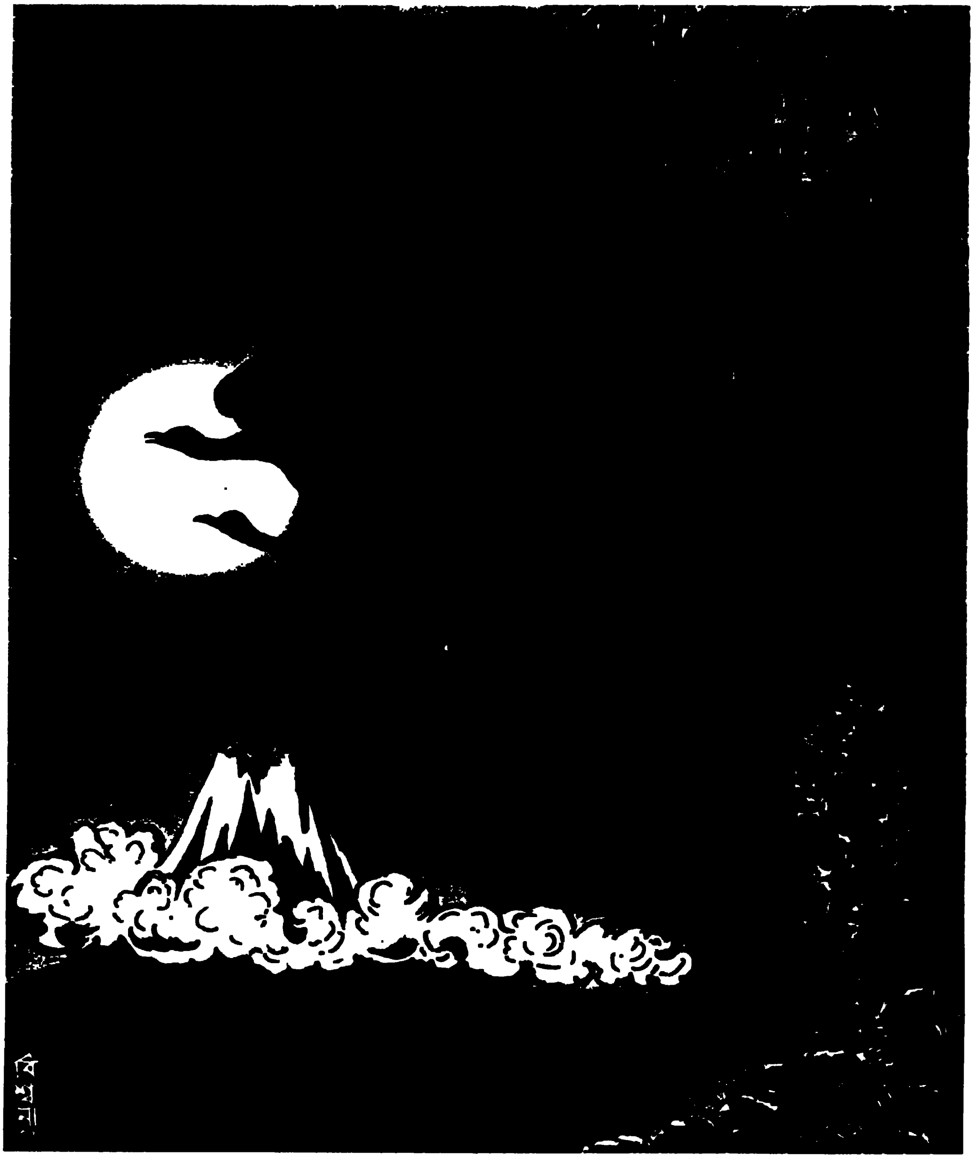
আমাদের সঙ্গীত কি কি ভাবে দেখিলে তাহার রসের সম্পূর্ণ বিচার করা যায় তাহারই ইঙ্গিতে এই প্রবন্ধ লেখা হইল। আমাদের সঙ্গীত সার্ব্বজনীন ভাব ব্যক্ত করে কি না ও তাহাতে কাল অনুযায়ী ভাব আসে কি না তাহার মধ্যে বোধহয় তর্কের স্থান নাই। বসন্তরাগে বসন্তের ভাব, মল্লারে বর্ষার ভাব ও ভৈরবে শরতের ভাব আসে এ সব কথা নেহাৎ অযথা নয়। আমাদের সঙ্গীত ভাব প্রধান। প্রকৃতির ভাবের সঙ্গে সুরের ভাবের মিলন হইলেই গায়কের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠে। তবে আমাদের সঙ্গীতও অভাবের সুর। আমাদের সুরেরও শেষ নাই, কথারও শেষ নাই, ভাবেরও শেষ নাই।

শ্রীমণিলাল সেন

জোনাকী

শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জোনাকী, তোমার বুক-ভরা ঐ আলো—
না জানি এমন সহজ সাধনে কেমন করিয়া জ্বালো।
আঁধার যে তোরে পারে না ত্রাসিতে, প্রবেশিতে তোর্ প্রাণে,
প্রাণের দুয়ারে জাগে উৎসব আঁধার জয়ের গানে॥
বনের আঁধারে, ঝিল্লীর ডাকে, আঁধার ঘুমায়ে ঢুলে,—
তুমি তারি বুকে খেলো উল্লাসে জয়ের পতাকা তুলে॥
সারা নিশি ধরি আলোক মেলিয়া কোথায় লুকাস্ ভোরে?
প্রভাত-অরুণ সে আলো চুমিয়া তুলে নিল বুঝি তোরে?



বিচিত্রা

"কোথা আশ্রয়-শাখা" ?

ফাল্গুন, ১৩৩৭

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

"উদিতা"

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম্‌-এ

প্রত্যেক রসসৃষ্টির মূলে দুটি জিনিষ আছে, চিত্র এবং সঙ্গীত। এই দুটি উপাদানের একটিকে বাদ দিয়া কখনো প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচিত হইতে পারে না। চিত্র আনিয়া দেয় বস্তুর চোখে-দেখা রূপ, সঙ্গীত তাহাতে যোগ করিয়া দেয় অপূর্ব্বতা।

শিল্পীর নিকট বস্তুজগতের মত চিন্তার জগতেও এই উপাদানই বর্ত্তমান। চিন্তারও রূপ এবং ধ্বনি দুইই আছে। কারণ শিল্পীর চিন্তা যুক্তির ঘাত প্রতিঘাত হইতেই উৎপন্ন হয় না—তাহা উচ্ছ্বিত হইয়া উঠে বস্তুজগতেরও অসংখ্য সৌন্দর্য্যানুভূতির ব্যঞ্জনারূপে। কবির চিন্তা রূপবান চিন্তা—তাহা concrete, এই রূপটিকে বাদ দিয়া নিছক চিন্তা যেখানে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেইখানেই কবিতা তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—রসসৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারে নাই। আবার শুধু কেবল রূপ দিয়া চিন্তাকে প্রকাশ করিলেও তাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা হইয়া উঠিতে পারে না। তাহার সহিত চাই সঙ্গীত। তাই দেখা যায় চিত্রহীন ভাব একদিকে যেমন তত্ত্ব হইয়া উঠে; সঙ্গীতহীন ভাব অপর দিকে তেমনি স্থূল এবং সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর 'উদিতা' নামক কাব্য গ্রন্থখানি পড়িয়া এই কথাটাই বার বার মনে পড়িয়া গিয়াছে। ইনি তত্ত্বের জগতেই ঘুরুন আর রূপের জগতেই ঘুরুন, ইঁহার মধ্যে শিল্পীর সেই রস-দৃষ্টিটি পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে যাহা তাঁহাকে বার বার করিয়া এই গোপন সত্যটি জানাইয়া দিয়াছে যে এই দুইটি জগতের মূলে একই উপাদান বর্ত্তমান,—চিত্র এবং সঙ্গীত, রেখা এবং রং।

'উদিতার' মধ্যে আমরা দুই শ্রেণীর কবিতা পাই,—তত্ত্বাশ্রয়ী এবং রূপাশ্রয়ী, কিন্তু কবির রসবোধ এই উভয়কেই একটি বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে মিলাইয়া দিয়াছে।

তাই কবি যেদিন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন—

> "নাই কোনো অবসান শেষ নাহি হেরি,
> ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি নাচে পুরাতনে ঘেরি"

তখন দেখি এই তত্ত্বটি রূপ-জগতের বাহিরের তত্ত্ব নয়,—একেবারে অন্তরের। এ তত্ত্ব খণ্ড খণ্ড চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত হইতে উৎপন্ন নয়,—এ তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে খণ্ড খণ্ড রূপ-দৃশ্যের ব্যঞ্জনা রূপে। ইহার মূলে যে সকল উপাদান রহিয়াছে তাহা চিন্তা-জগতের অশরীরী মালমসলা নয়, তাহা বস্তুজগতের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় রূপবস্তু। ইহার মূলে রূপজগতের যে অপূর্ব্ব ক্ষণটুকু বর্ত্তমান, কবি তাহাকে তাঁহার কবিতার মধ্যে কি চমৎকার করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

> পত্রহীন শুষ্ক বৃক্ষ আছিল দাঁড়ায়ে,
> সে আজিকে আপনারে ফেলিল হারায়ে
> সবুজের রঙিন আভাতে,
> লাল হ'ল কৃষ্ণচূড়া
> যেন কার হৃদিরক্তপাতে।"

এমন দিনে প্রকৃতির পানে চাহিয়া মুগ্ধ কবি বলিতেছেন—

> "আজ পার্শ্বে চেয়ে দেখি শুধু মনে হয়
> এ বিপুল ধরণী যে মহাপ্রাণময়।"

ধরণী যে মহাপ্রাণময়, তাহার মধ্যে যে মৃত্যু নাই, অবসান নাই—সৃষ্টি যে নিত্য নূতন জন্মলীলার চিরনবীনতার মধ্যে বারে বারে আপনাকে রূপান্তরিত করিয়া লীলা করিতেছে, এই তত্ত্বটি কবির গবেষণার ফল নয়। সৃষ্টি নিজেই এই তত্ত্বটি জীবনের পর্য্যায় পর্য্যায় রূপে রসে শব্দে গন্ধে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে,—মুগ্ধ কবি তাহাই উপভোগ করিয়াছেন, এবং তাঁহার কবিতা সেই উপভোগেরই বহিঃপ্রকাশ। কবি

এই তত্ত্বটিকে সমাধান করিতে বসেন নাই,—সৃষ্টির মধ্যে যাহার সমাধান আপনা হইতেই হইয়া গিয়াছে তাহাকেই উপভোগ করিয়াছেন। এক কথায় এই তত্ত্বটি কবির নিকট সৃষ্টির একটি বিশেষ রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়,—শব্দ গন্ধ স্পর্শের মতই concrete। এই কথাটী অনেক শিল্পী ভুলিয়া যান, তাই তাঁহারা তত্ত্বকে যখন কবিতার জগতে আনিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন তখন তত্ত্বও হাঁপাইয়া উঠে কবিতারও প্রাণান্ত হয়। কবিতার মধ্যে তত্ত্বও যে একটা রূপবস্তু একথাটি অনেক নামজাদা কবিকেও ভুলিতে দেখা যায়;—কিন্তু 'উদিতার' কবির মধ্যে এমন একটি সত্যকারের রসগ্রাহীর সন্ধান পাওয়া যায়,—যিনি তত্ত্বকে রূপের বাহির হইতে ভাড়া করিয়া আনেন না,—তাকে রূপের ব্যঞ্জনার হিসাবে রূপের ভিতর হইতেই উচ্ছ্রিত করিয়া তুলেন। তাই 'উদিতার' তাত্ত্বিক কবিতাগুলি রূপজগতকে ছাড়াইয়া গেলেও তাহার বৃন্তটি রূপজগতের মাটি হইতেই রস শোষণ করিয়া নিজেকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

সৃষ্টির এই চিরনবীনতা, সৃষ্টির অন্তরের এই নিত্য জন্ম-লীলা,—সৃষ্টির প্রথম দিনের সেই জীবন-স্পন্দন কবি যেদিন রূপজগতের অণুতে পরমাণুতে অনুভব করিলেন সেদিন তাঁর কি উচ্ছ্বাস!—কবি তখন বলিতেছেন—

"আজ মনে হয়
যারে শেষ মনে করি সে ত শেষ নয়।
সে ত শুধু জনমের নানা মুগ্ধ ছল
আপন প্রকাশ লাগি নূতন কৌশল,
চারিদিক হতে এসে নানা সৃষ্টি ধারা
এ জন্ম জলধি তলে হল আত্মহারা।"

চিত্র দিয়া যে কবিতার আরম্ভ হইয়াছিল সঙ্গীতে তাহা সম্পূর্ণ হইল। রূপের মধ্য দিয়া যাহা যাত্রা করিয়াছিল অরূপের মধ্যে আসিয়া তাহা অপূর্ব্ব হইয়া উঠিল। ইহাকেই বলে সার্থক রস-সৃষ্টি। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিতা খুব বেশী পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

'উদিতার' অন্তর্গত তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতার একটি মাত্র নমুনা দিলাম। এই শ্রেণীর আরও অনেক কবিতা গ্রন্থখানির মধ্যে আছে। পাঠকগণ নিজেরা সেগুলি পড়িয়া রসগ্রহণ করুন ইহাই আমার ইচ্ছা, বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের সমগ্রতার সুরটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাই না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'উদিতার' মধ্যে আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে যাহা সম্পূর্ণরূপে রূপাশ্রয়ী। এই সকল কবিতার ভিতর দিয়া কবি রূপজগতকেই উপভোগ করিয়াছেন —কোন তত্ত্বকে নয়। এই কবিতাগুলি আমার নিকট অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইয়াছে। যেমন ভাষা, তেমনি ছন্দ, তেমনি বলিবার ভঙ্গি। এই কবিতাগুলির ভিতর দিয়া কবির রসপিপাসু অন্তরের কি আন্তরিক একটি দরদ অনায়াসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'বর্ষার আয়োজন' কবিতাটি যখন প্রথম পড়িলাম তখন সত্য সত্যই মনে হইয়াছিল আমার অন্তর্লোকেও কোথায় যেন আসন্ন বর্ষার আয়োজন চলিতেছে, তার সজল স্নিগ্ধ হাওয়া যেন হৃদয়ের কোন্ খোলা বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিয়া চিত্তলোকে একটি নবমায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। এমন চমৎকার নিসর্গ কবিতা আমি খুব কম পড়িয়াছি। কবিতাটির কতকাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"বিজলী থেকে থেকে চমকি যায় মন,
বর্ষা নাই, তার রয়েছে আয়োজন।
গভীর কালো মেঘে আকাশ গেছে ঢেকে
এ জল নাহি জানি কাহার অভিষেকে।
দুয়ার খুলে রেখে বসিনু তারি পাশে,
ও ধারে ছেয়ে গেছে সবুজ ঘন ঘাসে।
একটি পাশে জমী এসেছে নীচু নেমে,
সকাল হতে জল রয়েছে থেমে থেমে।
আকাশ কালো হোলো গভীর ব্যথা লয়ে,
তাহারি ছায়া জলে পড়িল কালো হয়ে।
অশথতলে গরু গোয়ালা গেল বেঁধে,
বাছুর কোথা ওর ফিরিছে কেঁদে কেঁদে,
সবুজ কচুবন জলের বুকে বুকে
দুধারে হেলে হেলে পড়িছে ঝুঁকে ঝুঁকে।
মলিন রঙ্গে আজ মেলেছে নবমায়া,
আমার বুকে তার ফেলেছে ঘন ছায়া॥"

কি চমৎকার একটি চিত্র! পড়িতে পড়িতে মনে হয়

যেন হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতির প্রতি কি আন্তরিক একটি অনুরাগ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

'সপ্তপর্ণ' কবিতাটির মধ্য দিয়াও প্রকৃতির প্রতি কবির আন্তরিক দরদটুকু কি চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে! কবি সম্ভবতঃ প্রবাসে কোথাও একটি 'সপ্তপর্ণ' বৃক্ষের সহিত পরিচিত হইয়া উঠেন; তারপর একদিন বিদায়ের ক্ষণটি যখন আসন্ন হইয়া আসিল তখন কবি বড় দুঃখে বলিতেছেন :—

"আজকে যাবার কালে
সেই প্রেমেরি পরশ ছড়াক তোমার ডালে ডালে,
সেই দিনেরি গন্ধখানি ভোরের আলোয় মাখি
আমি আমার বক্ষে নেব আঁকি।
তোরও কিরে পাতার নীচে
কঠিন মর্ম্মতল
আমার স্মৃতির বেদন ভরে
করবে না টল মল?"

সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য হইলাম একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়া। 'উদিতার' কবি যখন তাঁর কবিতাকে তন্দ্রাশ্রয়ী করিয়া তুলিয়াছেন তখন তাঁর কাব্যের মধ্যে একদিকে যেমন সার্ব্বভৌমিক বিরাট একটি সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি আবার অপরদিকে তিনি যখন শুধু কেবল রূপকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন তখন তিনি তাঁর দৃষ্টিকে কি অদ্ভুদ ভাবে সীমাবদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন! তখন অতিবড় খুটিনাটি ব্যাপারটি পর্য্যন্ত কবির দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। আসল কথা কবির মধ্যে চিত্র এবং সঙ্গীত—দুই সমান তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। অথবা এক কথায় কবি জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন চিত্র এবং সঙ্গীত, রেখা এবং রং ইহারা একই সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তাই রূপের প্রত্যেকটি খুটিনাটি তাঁহার নিকট অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়; তাই রূপকে যখন তিনি ভোগ করিতে চান তখন রেখাকে যত সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলেন তার ব্যঞ্জনা ততই বাড়িয়া যায়,—রূপের ধর্ম্মই যে তাই। কবি যখন রূপের পানে চাহিয়াছেন তখন একেবারে চিত্রকরের দৃষ্টি লইয়া চাহিয়াছেন;—তাই প্রকৃতির যেখানটিতে তিনি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন সেখানটি সুনির্দ্দিষ্ট একটি ছবি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এইস্থানে কবির ভাষা-চিত্রের গুটি কয়েক উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"যেখানে বটগাছে দুইটি জটা নেমে
কে জানে কবে হতে জড়ায়ে আছে থেমে।"

কি চমৎকার একটি ছবি!

আবার একস্থলে পাই—

"ছড়ান সাদা কাল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
আকাশ থেকে থেকে প্রকাশে আপনাকে।"

একবারে চমৎকার!

আবার এক স্থলে কবি লিখিতেছেন :—

"একটা বটগাছ একটা ডোবা আছে
তাদের মাঝখানে ধানের ক্ষেত নাচে,"

অথবা—

"শুক্ল পক্ষ স্তব্ধ আকাশ ছেয়েছিল ছেঁড়া মেঘে
ঘন কাশ বন করে শন্ শন্ উত্তর বায়ু লেগে।"

শুক্ল পক্ষের আকাশের বর্ণনা করিতে বসিয়া কবিরা সাধারণতঃ নির্ম্মেঘ গগনকেই পছন্দ করেন। 'উদিতা'র কবি কিন্তু তাহা করিলেন না, তিনি আকাশে গুটিকতক ছেঁড়া মেঘ ছড়াইয়া দিবার লোভ সামলাইতে পারিলেন না। এইখানেই বোঝা যায় কবির মধ্যে একটি চিত্রকর লুকাইয়া আছে, যে চিত্রকরটি তাঁহাকে দিয়া শুধু লেখায় না—ছবি আঁকাইয়া লয়। অর্থ এবং সঙ্গীতের দিক দিয়া পূর্ণিমা রাত্রের সহিত ছিন্নমেঘের সম্পর্ক যতই দূর হউক না কেন রূপের দিক হইতে, চিত্রের দিক হইতে জ্যোৎস্নার সহিত ছিন্ন মেঘের সম্পর্ক যে কত নিকট তাহা চিত্রকর ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। এইখানেই 'উদিতার' কবির বিশেষত্ব। তিনি যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সময় চিরাচরিত সংস্কার মানিয়া চলেন না—নিজের চোখ দিয়া রূপকে উপভোগ করেন, এই সকল টুকরা চিত্রগুলি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ গুণটি বড় কম কবির মধ্যেই পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

বিচিত্রার দপ্তর

[বিশ্বামিত্র]

সনাতন সমস্যা

স্ত্রী-চরিত্র বুঝিয়া উঠা দুষ্কর, নারী-মনের অন্ত পাওয়া ভার—এই পুরাতন তথ্যে নূতন বেশবিন্যাস করিয়াছেন জনৈক চিকিৎসক। লণ্ডন রঞ্জন-রশ্মি হাঁসপাতালের ডাঃ জর্জ্জ ভিল্‌ভগুর্‌ তাঁহারই এক বন্ধুকে প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া বলেন—হাঁসপাতালটি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ, এখানে রঞ্জন-রশ্মির সহায়তায় সকলই চাক্ষুস দেখিতে পাইবেন, বাদ শুধুই রমণীর মন!

এক গানে ধনকুবের

মিঃ জোস্‌ পাদিল্লা স্পেনদেশীয় সঙ্গীত-রচয়িতা। 'Valencia' নামক একটি সঙ্গীত-রচনায় ও তাহারই সুর সংযোগে অর্জ্জন করিয়াছেন ২৫ লক্ষ মুদ্রা! গানটির রচনায় মাত্র ১২ মিনিট সময় লাগে। সম্প্রতি ইনি কলিসিয়ম্‌ থিয়েটারে আবির্ভূত হইতেছেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী লিডিয়া ঐখানে পতির রচিত আরও কয়েকটি গান গাহিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন।

জাপানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ব্যক্তি কে?

কাগ্‌ওয়া এই ভাগ্যবান পুরুষ। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারক। তাঁহার একখানি গ্রন্থ—'মৃত্যু-পারে' তিন মাসে দুই লক্ষ বিক্রীত হইয়াছে। দুই বৎসরে তাঁহারা গ্রন্থাবলী অন্ততঃ ৫০ লক্ষ বিক্রয় হইবে, বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। জাপানী সরকার কিন্তু বহুকাল ইঁহাকে আদৌ আমল দেন নাই। মার্কিণের কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ইঁহাকে 'ডক্টর' উপাধি প্রদত্ত হয়। তখন স্বদেশীয় গবর্ণমেন্টের টনক নড়িল—নানা সম্মানে তাঁহাকে ভূষিত করিতে লাগিলেন। স্বদেশে মনীষীর দুর্দ্দশা এমনই হয়। নোবেল-প্রাইজ লাভের পর রবীন্দ্রনাথেরও আদর ভারতে—এমন কি বাংলায় ঐ ভাবে বাড়ে। ইহাতে সেই পুরাণো কথাই মনে জাগে—'A prophet is not honoured in his own country'.

বাস্তু কুমীর

বাস্তু সাপ চলিত কথা। কিন্তু বাস্তু কুমীর—নূতন জিনিস। কুমীরটি যে অতি বৃহৎ তাহা নয়, দৈর্ঘ্যে ৮ হাত, বয়সে বৃদ্ধ, নাম লুতেম্বি, ভিক্টোরিয়া হ্রদে বাস। নাম ধরিয়া ডাকিলেই ভাসিয়া উঠে, তটের দিকে দ্রুত আসিতে থাকে—প্রকাণ্ড মুখ হাঁ করিয়া। একটা মাছ কেহ দেখাইলে মাছ খাইবার লোভে তীরে হাজির হয়। মুখের কাছ হইতে দুই হাত দূরে দাঁড়াইলেও নরনারীকে আক্রমণের কোন চেষ্টাই করে না। অধ্যাপক জুলিয়ন হাক্সলি সস্ত্রীক অতি সন্নিকটে খাড়া হইয়া নির্ব্বিঘ্নে উহার আলোক-চিত্র উঠান।

ঐ অঞ্চলে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহাকে হ্রদের তটে লইয়া যাওয়া হয়, লুতেম্বিকে ডাকিয়া তাহার মুখ-বিবরের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়, অভিযুক্তকে যদি সে কামড়ায় সাব্যস্ত হয় যে লোকটা দোষী, নহিলে নির্দ্দোষ বিবেচনায় তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। ইহাই ঐ প্রদেশের প্রথা। দুই বৎসর পূর্ব্বে চুরির অপরাধে অপরাধী সন্দেহ করিয়া একজনকে ঐভাবে খাড়া করা হইলে লুতেম্বি তাহার এক বাহু কাটিয়া লয়।

আইন আদালত, বিচার বিতর্ক, সকলই বরখাস্ত করিয়া বিচারমূলক সেকালের সহজ পন্থা অধিবাসীরা আঁকড়িয়া আছে, আর সেই সঙ্গে কুম্ভীরের মত কদাকার বিকট জন্তুকে 'বাস্তু'রূপে পরিণত করিয়াছে—দুইই সমান অদ্ভুত।

বেশ বিন্যাসে বাহাদুর

বেশবিন্যাস সভ্যতার একটা মাপকাঠি। বেশের পারিপাট্যে পৃথিবীর সকলকে অধুনা টেক্কা মারিয়াছেন নিম্নের কয়েকজন। মেত্র্ নামে এক বিশেষজ্ঞ এই তালিকা তৈয়ারী করিয়াছেন, সারা বিশ্বে অবশ্যই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

১। প্রিন্স অফ্ ওয়েলস—আমাদের যুবরাজ। ২। এম্ পেরুগিং—প্যারি সহরের বিনামা প্রস্তুতকারক ধনকুবের। ৩। ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্—বিখ্যাত বায়োস্কোপ অভিনেতা। ৪। ইতালি-নেপ্‌লস্ সহরের কাউণ্ট ক্যারা কিত্তললো। ৫। জ্যাক ইলিয়ট্—ইংরাজ অভিনেতা। ৬। উইলিয়াম ষ্টুয়ার্ট—মার্কিণ নিউইয়র্ক নগরবাসী। ৭। ক্লাইভ ক্রুড। ৮। এ্যাডাঅল্‌ফ্ রিন্ গেঁজ—ব্রেজিল বাসী। ৯। জন্ ব্যারি মোর। ১০। ডিউক অফ্ কনাট্—রাজভ্রাতা। ১১। হেন্‌রি লেত্তোলিয়র—প্যারি সহরের অধিবাসী। ১২। জেনি মার্কি—ছোট গল্প লেখক ও নাট্যকার। ১৩। মার্কুইস্ ডি পোটেগো। ১৪। কর্পূরথালার মহারাজা।

নর্ত্তকী পাভলোভার স্থলে মেরি উইগম্যান্

পরলোকগতা বিখ্যাত নর্ত্তকী আনা পাভলোভার স্থান অধিকার করিবেন কে? বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে বলিতেছেন মেরি উইগ্‌ম্যান। ইনি জাতিতে জার্ম্মাণ মোটেই সুন্দরী নন—চোয়ালের হাড় উঁচু, চোক বসা, মুখ প্রকাণ্ড, মোটা নাসিকা, কেশহীন ভ্রূ—এই তাঁহার আকৃতি। নর্ত্তনকালে অঙ্গের সকল গ্রন্থি যেন খুলিয়া গেল এমনই মনে হয়। নৃত্যকলার ধাঁজ ধরণ, লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী অরসিককেও চমৎকৃত করে, অপ্সরা উর্ব্বশীকে নাকি স্মরণ করাইয়া দেয়।

বেবিলনের ইতিহাস উদ্ধার

বাগদাদের নিকটে খনন কার্য্যের ফলে ভূগর্ভপ্রোথিত এক নগরী আবিষ্কৃত হইয়াছে—ছ'হাজার বৎসরের পুরাতন। মরুভূমির বালুকা রাশির নিম্নে বৈজ্ঞানিকেরা একটি নরকঙ্কাল পাইয়াছেন। বিবিধ প্রমাণ বলে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, উহা একটি ক্রীতদাসের। জীবন্ত অবস্থায় কক্ষের তলদেশে গলা পর্য্যন্ত গাঁথিয়া উহাকে হত্যা করা হয়। জানলা-বিহীন একটি কক্ষে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং ঐ কক্ষেরই এক স্থানে বহুমূল্য নেক্‌লেস্ ব্রেসলেট চিরুণী প্রভৃতি পাওয়া যায়। অনুমান করা হইতেছে যে, ঐ অলঙ্কারের মালিক কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার আদেশক্রমেই এই পৈশাচিক হত্যা অনুষ্ঠিত হয় এবং যখন অভাগা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল নিষ্ঠুর নারী তাহাকে বিদ্রূপ করিতে থাকে।

সামান্য কারণেই ক্রীতদাসের নৃশংস হত্যা সংঘটিত হইত, বেবিলনের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বর্ত্তমান নরকঙ্কালটির আবিষ্কার নৃশংসতারই চূড়ান্ত নিদর্শন।

দীর্ঘায়ু কিসে হয়?

অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও চিন্তার পোষণ (Plain living and high thinking) দীর্ঘায়ুর পক্ষে সহায়ক বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। প্রকৃতই কি তাই? জাপান টোকিয়োর স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞেরা ৮০ হইতে ১০০ বৎসরের অধিক বয়স্ক উনিশ হাজার লোকের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতেছেন। গবেষণার ফলে নির্ণয় করিয়াছেন যে, (ক) উঁহাদের অধিকাংশই দীর্ঘজীবীর বংশ হইতে জাত ও মধ্য-বিত্ত পরিবার ভুক্ত, (খ) শতকরা পঞ্চাশজনের প্রধান খাদ্য চাউলের অন্ন, প্রধানতঃ নিরামিষ আহার—কতকাংশ আমিষ, (গ) শতকরা পঞ্চাশজন পুরুষ এবং নব্বই জন স্ত্রীলোক জীবনে কখনও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন নাই বলা চলে, তবে ধান্যজাত সুরা স্বল্প পরিমাণে পানের অভ্যাস কাহারও কাহারও আছে। এই জন্যই নাকি জাপানে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশ অপেক্ষা দীর্ঘজীবীর সংখ্যা অধিক এবং শিশু-মৃত্যু বিরল। জাপানের পরেই বুল্‌গেরিয়ার খ্যাতি। জাপানীদের আহার শাক-সব্‌জি ও মৎস্য। বুল্‌গেরিয়ার অধিবাসীরাও বিশেষ মাংসাশী নহে, বিলাসিতার পক্ষপাতীও নহে। অধিকাংশেই মাদক-দ্রব্য স্পর্শ করে না। এক-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি মাত্র ধূমপান করে। ইহাদেরও প্রধান খাদ্য তরী তরকারী, দুধ রুটি ও পনীর।

বর্ত্তমানে বুলগেরিয়ার এক শত বৎসরের অধিক বয়স্ক ৩১৩৯ জনের সন্ধান মিলিয়াছে। বুল্‌গেরিয়া অপেক্ষা গ্রেট-বৃটেনের লোক সংখ্যা অনেক অধিক। এখানে কিন্তু ১৪৫

জনের অধিক লোক পাওয়া যায় না। আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের লোক সংখ্যা গ্রেট বৃটেনের এক-পঞ্চমাংশ, অথচ এখানে ১১৬ জন শতাধিক বর্ষ বয়স্ক লোক আছে। বুলগেরিয়ার পরেই এ বিষয়ে স্পেন দেশের গৌরব—এখানে ৩৫৫ জন শতাধিক বর্ষ বয়স্ক লোক পাওয়া গিয়াছে। বুলগেরিয়ার ৩১৩৯ শতাধিক বর্ষ বয়স্ক লোকের মধ্যে মাত্র ১৪ জন এ পর্য্যন্ত চিকিৎসকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। বাকি ৩১২৫ জন কখনও কোন ব্যাধিগ্রস্ত হন নাই।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য যে সুরা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য বর্জ্জন, মাংসাদি-আহার পরিহার, মিতাচার, শাকসব্জী ভক্ষণ ও বিলাসিতাবিহীন জীবন-যাপন দীর্ঘায়ুর কারণ। পুরাকালে হিন্দুরা এই ভাবেই জীবন অতিবাহিত করিতেন, সুতরাং বল বুদ্ধি ভরসা চল্লিশেই যে ফর্সা হইত না তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

দশ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে নর-বানরে সাদৃশ্য

নরের আদি পুরুষ বানর—মনীষী ডারুইনের সিদ্ধান্ত এই। ইহার মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা সন্ধান করিয়া আসিতেছেন। এ পর্য্যন্ত দুইটি মাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের মনুষ্যের মাথার খুলি পাওয়া যায়—জাভায় ও সাসেক্সে, কিন্তু এই দুইটির কোনটিই পূরা নয়—ভগ্নাংশ মাত্র। চীন দেশের পিকিনে মিলিয়াছে শিলীভূত সম্পূর্ণ একটি খুলি। বানরের খুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য চমৎকার অথচ প্রকৃতপক্ষে ইহা মানুষেরই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিদ্যার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ ইলিয়ট স্মিথ পিকিনে উহা দেখিয়া আসিয়া স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বলিতেছেন—"আমার স্থির বিশ্বাস অদ্যাবধি যে যে খুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে পিকিনের এইটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।"

পিকিন নগরের সন্নিকটে চাউ কাউটিয়েন নামক গুহায় খুলি পাওয়া গিয়াছে। দশ লক্ষ বর্ষের প্রাচীন মানবের মাথার খুলি উহা, এইরূপ অনুমান করা হইতেছে। বানরের সহিত সাদৃশ্য ক্রমশঃ কিরূপে কমিয়া গেল এবং কত কত বৎসর ব্যবধানে কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া উভয়ের বর্ত্তমান অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার নির্ণয়ে বৈজ্ঞানিকেরা এইবার আরও উদ্যোগী হইবেন। ইতিমধ্যেই সাজ-সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে।

বরাহ অবতার

বিগত মে মাসে বগুড়া-সেলিমপুর নিবাসী সেখ নজমৎ আলি মণ্ডল একটি বহু প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিতে-ছিলেন। খননকালে অতি সুন্দর বরাহ-অবতারের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। দৈর্ঘ্যে ইহা দুই হস্ত পরিমিত, প্রস্থে প্রায় দেড় হাত। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, ইহা দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত, অর্থাৎ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর দেখা গেল যে কাল উহার বিশেষ হানি করিতে পারে নাই। রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে বাঙ্গালা সরকার উহার আপাততঃ রক্ষার ভার দিয়াছেন।

সূর্য্য-কিরণ হইতে বিদ্যুত

সূর্য্যকিরণ হইতে সিধা বিদ্যুৎ প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ ব্রুনো লঙ্গী বিবিধ পরীক্ষা-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। রৌদ্রজাত বিজলী ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্য্যে নিয়োগ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বায়োস্কোপের ফিল্ম তুলিবার যন্ত্রে ফটো টেলিগ্রাফি ও টেলিভিশন প্রভৃতিতে এই বিদ্যুতের ব্যবহার বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। পরীক্ষা কার্য্য সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিলে বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে ইহাই বুধগণের দৃঢ় বিশ্বাস।

সারা পৃথিবীতে এক ভাষা

সারা দুনিয়ায় একই ভাষা প্রচলনের বহু চেষ্টা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নূতন ভাষা তৈয়ারের প্রচেষ্টাই প্রধানতঃ হইয়াছে—সম্পূর্ণ ব্যর্থপ্রয়াস না হইলেও যত্ন আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। কৃত্রিম ভাষা যে কখনও সজীব ও সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে সে আশা সুদূরপরাহত। পৃথিবীতে যদি একটি ভাষা সত্যই কখন চলিত হয় তাহার সুবিধা অবশ্য প্রচুর। ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে, জাতিতে

জাতিতে মানুষে মানুষে ভাবের আদান প্রদানের দিক দিয়া ইহাতে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। একখানা বই বা একখানা সাময়িক পত্র সেই ভাষায় মুদ্রিত হইলে বিশ্বের সকল সভ্য দেশে একই সময়ে প্রচারিত ও পঠিত হইবে এই কথা ভাবিলেও মনে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়।

অধ্যাপক জাক্সনের মতে ইংরাজী ভাষার কতকগুলা উপদ্রব দূরীভূত করিলে এবং ভাষাটিকে আরো সহজ করিলে বিশ্বের ভাষা রূপে ইহা অনায়াসে গণ্য হইবে। কারণ দর্শাইতেছেন যে, ইংরাজী ব্যাকরণ অপর সকল ভাষার ব্যাকরণ অপেক্ষা সহজ—দৃষ্টান্ত যথা—পুরুষ পুংলিঙ্গ, স্ত্রী স্ত্রীলিঙ্গ, পদার্থ ক্লীবলিঙ্গ ; কিন্তু জার্ম্মাণ ভাষায় 'হুলো বিড়াল' স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রীলোক ক্লীবলিঙ্গ, আবার ফরাসী ভাষায় প্রহরী (sentry) বা নবসংগৃহীত সৈনিক (recruit) স্ত্রী লিঙ্গ।

অধ্যাপক সহজীকৃত ইংরাজী ভাষার খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। কুড়িটি মাত্র পাঠে উহা সমাপ্ত। উহা এতই সহজ হইয়াছে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা দেড় ঘণ্টা মাত্র সময়ে এক একটি পাঠ সমাপ্ত করিতেছে এবং কুড়িটি মাত্র পাঠ সমাপ্ত করিবার পরেই অনর্গল ঐ ভাষায় কথা কহিতে ও প্রচলিত বানানের পুস্তকও সহজে পড়িতে শিখে। এই নূতন ইংরাজী ভাষায় দীর্ঘ বা জটিল বাক্য বা পদ নাই, বানান ব্যাকরণ ও বাক্যের গঠন অতি সহজ। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল—

Heer iz æ spesimen sentens in Anglic so that yue mae see for yuerself how simpl the speling iz ; any forjner is not puz!ed by wurdz spelt in won wae and pronownsed in another."

ভাষার নাম দেওয়া হইয়াছে Anglic। গ্রেট ব্রিটেনে, উত্তর আমেরিকার সর্ব্বত্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জিলাণ্ড, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু স্থানে ইংরাজী ভাষা পঠিত ও ব্যবহৃত। পৃথিবীর মোট অধিবাসী ১৮০ কোটি তন্মধ্যে ২০ কোটি লোকের ভাষা ইংরাজী, অর্থাৎ অপর যে কোন একটি ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষাবিদ্ দ্বিগুণ।

প্রেমের দায়ে

প্রিন্স লেনার্ট সুইডেনের নৃপতির পৌত্র—রাজসিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। আইন অনুসারে অভিজাত বংশেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে হয় ; প্রিন্স কিন্তু স্বদেশীয় এক ব্যবসাদারের কন্যার পাণিগ্রহণে দৃঢ়সংকল্প। ধনদৌলত, রাজতক্ত তাঁহার কাছে তুচ্ছ। তাঁহার বয়স ২১, ভাবী পত্নীর ২০। হিতৈষীরা সদুপদেশ দানের চূড়ান্তই করিয়াছেন, সকলই নিস্ফল। প্রিন্স বলেন—সম্বন্ধ পাকা, তবে ২ বৎসর পরে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে ; ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীতে যাইয়া কৃষিবিদ্যা শিখিব, ভাবী ভার্য্যাও দেশান্তরে তাহাই করিবেন, কারণ কৃষিকার্য্যে উভয়ে জীবনযাপন করিব এই অভিলাষ।

প্রেমের দায়ে অনেকেই ঠেকে। কিন্তু দায়ে ঠেকিয়া দুই বৎসর অপেক্ষা করে, রাজতক্ত হেলায় হারাইয়া চাষা বনিতে চায়, নূতন নিশ্চয়ই।

বাঙ্গলার লোক সংখ্যা

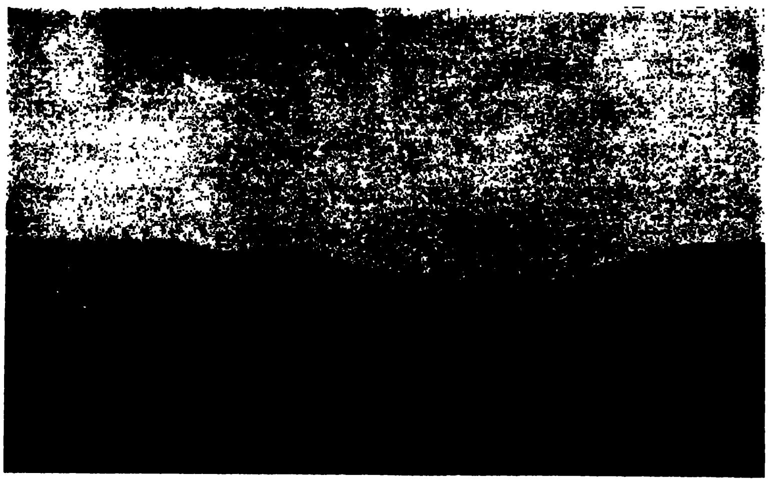
সম্প্রতি যে লোক-গণনা হইয়া গেল তাহার বিবরণে প্রকাশ যে, সারা বাংলার মোট লোক সংখ্যা এক কোটি বিশ লক্ষ। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে গণনা হয় তাহার তুলনায় শতকরা প্রায় ৮ জন বেশী। শিশু-মৃত্যু, ব্যাধিবাহুল্য, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সত্বেও।

বিশ্বামিত্র

রাজপুতানা ভ্রমণ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার এম্‌-এ, বি-এল্‌

কাঁকরোলী—নাথদ্বার হইতে দশ মাইল উত্তরে কাঁকরোলী—বেলা প্রায় চারিটার সময় আমরা রওনা হইলাম। নাথদ্বার ছাড়িয়াই বানাশ নদী (পুল নাই) পার হইতে হইল। বানাশ মেবারের সব চেয়ে বড় নদী, আরাবল্লী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বে চম্বল নদের সহিত মিশিয়াছে। আমাদের এই ভ্রমণপথে বানাশের সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ হইয়াছে—এই প্রথম সাক্ষাৎ। নদী-গর্ভ গভীর নয়, প্রায় সবটাই বালুকারাশি—এক-দিকে একটু অগভীর জলস্রোত ছোট ছোট উপলখণ্ডের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। তার পরে রাস্তা অতি সুন্দর, প্রায় সমতল, মোটর হু হু শব্দে ছুটিল। কাঁকরোলী পৌছিতে যখন আরও দু'তিন মাইল আছে তখন দূরে তার মোহন্তের প্রাসাদ এবং ঘরবাড়ীগুলি ছবির মত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। বাঁদিকে দুটি পাহাড় —একটির উপর এক প্রাচীন জৈনমন্দির আর একটার উপর রাণা রাজসিংহের প্রাসাদ, এখন ভগ্নাবশেষ মাত্র। বারী নামে আর একটি নদী পার হইয়া আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাঁকরোলী পৌছিলাম।



কাঁকরোলীও বৈষ্ণবদের এক তীর্থস্থান। এখানকার বিগ্রহ দ্বারকানাথ বা দ্বারকাধীশকেও নাকি রাজসিংহের আমলে বৃন্দাবন হইতে আনা হয়। এখানেও এক মোহন্ত আছেন—খুব বড় দরের না হইলেও তাঁর সম্পত্তির আর লক্ষ টাকার উপর। তাঁরও নিজের আপিশ আদালত আছে, সাইনবোর্ড দেওয়া আদালত-গৃহ মন্দিরের পথেই চোখে পড়ে।

রাজসমন্দ হ্রদের তীরে পূর্ব্বদিকের প্রকাণ্ড বাঁধের উপর কাঁকরোলী গ্রাম। এখানে দুটি ধর্ম্মশালা আছে, তার একটি দ্বিতল একেবারে হ্রদের উপরেই, আমরা সেখানে আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্মশালাটি একজন গুজরাটির। তাঁর আর যাই হোক সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে। হীরালাল মাণিকলাল নামে এক পাণ্ডা (নামটি তার অনুরোধেই প্রকাশ করিতে হইল) ধর্ম্মশালার রক্ষক—তার অবিশ্রান্ত বক্তৃতার জ্বালায় আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেও সে আমাদের আদর যত্নের ত্রুটি করে নাই। এখানে বোধ হয় আমাদের মত যাত্রী বড় আসে না—আমরা পৌছিবামাত্রই তাই সমস্ত গ্রামে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। মাণিকলালের 'ভিজিটার্স বুকে' দেখা

গেল যে দুই বৎসর পূর্ব্বে আর এক দল বাঙ্গালী হাওড়া হইতে এখানে আসিয়াছিলেন—তার পরেই বোধ হয় আমরা। সে দল আমাদের পরিচিত—কাঁকরোলীর খবর আমরা তাঁদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ধর্ম্মশালার দ্বিতলে একটি সুন্দর বড় হলঘর আমরা দখল করিলাম, হ্রদের দিকে তার বারান্দা, সমস্ত হ্রদটি সেখান হইতে চমৎকার দেখা যায়। উদয়সাগরের তীর হইতে আশ্রয়াভাবে পাঁচ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া পলাইতে হইয়াছিল, জয়সমুদ্রের তীরে বাজরার রুটি আর অড়হর কি দালের সন্ধান লইতে হইয়াছিল, আর রাজ-সমুদ্রের তীরে হঠাৎ এমন প্রাসাদ আর তদুপযুক্ত খাতির যত্ন মিলিবে তা একবারও মনে করি নাই।



রাজনগর ঘাট

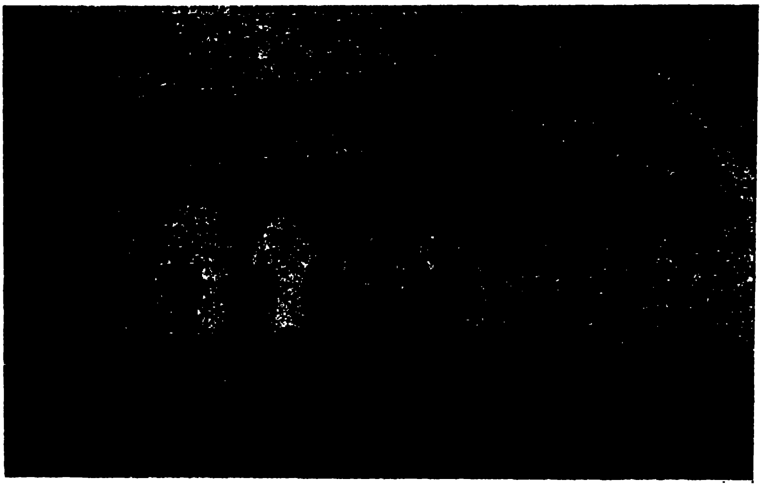
আহারাদির আয়োজনও প্রাসাদের অনুরূপই হইয়াছিল। মাণিকলালের কৃপায় এ হেন স্থানেও বন্ধুদের চায়ের মৌতাতের বন্দোবস্তে ত্রুটি হয় নাই। দ্বারকানাথজীরও ভোগ হয়, এবং কাঁকরোলীর অতিথিরা তা হইতে বঞ্চিত হন না। মোহন্তের গদীতে টাকা জমা দিয়া আমরা প্রসাদের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। আরও দুই তিনটি ছোটখাট দেবতা—ছোট দ্বারকাধীশ, মথুরাধীশ ইত্যাদি এখানে আছেন, আমাদের মত যাত্রীদের তাঁরাও উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। রাত্রে তাঁদের মন্দির হইতে অযাচিত ভাবে বড় বড় প্রসাদের থালা আসিয়াছিল। এর জন্য শেষে অবশ্য আমাদের সব মন্দিরেই কিছু কিছু প্রণামী দিতে হইয়াছিল, তবু অযাচিত সম্মানের একটা মূল্য আছে। তিন মন্দিরের ভোগের উপকরণ একত্র করিয়া আমাদের সে রাত্রের ভোজ মন্দ হয় নাই।

দ্বারকানাথের মন্দিরেও আমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নাই। মন্দির বলিয়া অবশ্য আলাদা কিছু নাই—মোহন্ত মহারাজের প্রাসাদের মধ্যেই দ্বারকানাথের আস্তানা। আমরা যখন প্রাসাদে গেলাম তখনও মন্দিরদ্বার খোলে নাই, এই অবসরে মোহন্তজীর দেওয়ানের কৃপায় প্রাসাদটি দেখা হইয়া গেল। প্রাসাদটি না কি সপ্ততল, আমরা উপরের তিনটি তল দেখিলাম। একটি তলে ভোগের এবং ফুলের ঘর—প্রথমটিতে স্তূপাকার খাবারের রাশি, দ্বিতীয়টাতে তেমনি স্তূপাকার পুষ্পের স্তবক। প্রাসাদের ছাদ হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যায়।

দ্বারকানাথজীর আরতিটিও বেশ। দেওয়ালীর আসন্ন উৎসব-উপলক্ষে দেবমূর্ত্তি মন্দির হইতে বাহির করিয়া এক খোলা ছাদে রাখা হইয়াছিল। ছাদের উপর চন্দ্রাতপঘেরা বড় একটি ছোট রূপার সিংহাসনে দেবমূর্ত্তি জমকালো বেশ-ভূষায় সজ্জিত। মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। শুনিলাম দেওয়ালীর কয়দিন রোজই সিংহাসন এবং বেশ বদলান হয়—যেমন কোনও দিন বা রূপার, কোনও দিন কাচের, কোনও দিন হাতীর দাঁতের, কোনও দিন বা পাথরের সিংহাসন বাহির করা হয়। দেওয়ালীতে নাথদ্বারে অন্নকূটের খুব ঘটা হয়, তখন আগে নাকি রাজবারার যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের সপ্তমূর্ত্তি আছে সে সমস্তই নাথদ্বারে একত্র করা হইত, এখন মাত্র দ্বারকানাথের নিমন্ত্রণ হয়। সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলায় মস্ত শোভাযাত্রা

করিয়া তিনি ভ্রাতৃভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, কিন্তু সন্ধ্যায় আবার ফিরিয়া আসেন। মাণিকলালের মতে রাধিকাকে ছাড়িয়া রাত্রিবাস দ্বারকানাথ বড় পছন্দ করেন না। রাধামূর্ত্তি এখানে কোনও মন্দিরেই নাই কারণ তিনি পর্দ্দানশীন—অর্থাৎ তাঁকে বাহিরে আনার প্রথা নাই। দ্বারকানাথের আরতি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছিল, খোলা আকাশের তলে দেবপূজার পরিকল্পনাটিও অতি সুন্দর মনে হইল।

কাঁকরোলী সম্বন্ধে শেষ কথা—রাজসমুদ্র হ্রদ। উদয়সাগর বা জয়সমুদ্রের চেয়ে আমাদের রাজসমুদ্রই বেশী ভাল লাগিয়াছিল, তার একটা কারণ ঐ দুইটি হ্রদের অনেকটাই পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা থাকে, কোনটিরই বিশাল জলরাশির শেষ দেখা যায় না, কিন্তু রাজসমুদ্রের মাঝখানে কোনও পাহাড় না থাকায় সমস্ত হ্রদবক্ষটিই এক দৃষ্টিতে চোখে পড়ে; বাঁধান তটভূমি হইতে দূরে দিক্‌চক্রবালে যেখানে নীল জলরেখা নীল আকাশের নীচে মিশিয়াছে হ্রদের সেই শেষ প্রান্তটি পর্য্যন্ত কোথাও দৃষ্টি রুদ্ধ হয় না। পাহাড়ের অভাবে জয়সমুদ্রের অপরূপ সৌন্দর্য্য ইহাতে নাই, কিন্তু দেখার একটা তৃপ্তি আছে। আর একটা কারণ এমন করিয়া দিনে রাত্রে সকাল সন্ধ্যায় আর কোনও হ্রদ দেখিবার অবসর পাই নাই।



রাজনগর ঘাট—চবুতরা

রাজসমুদ্রের পরিধি প্রায় বার মাইল, আর বাঁধটি লম্বায় প্রায় তিন মাইল—, দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক পর্য্যন্ত অর্দ্ধবৃত্তাকারে হ্রদ বেষ্টন করিয়া গিয়াছে। বাঁধের সমস্তটাই মর্ম্মরে বাঁধান, বরাবর সুবিস্তৃত সোপানশ্রেণী জলের নীচে পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকের বাঁধের উপর রাজসিংহের প্রতিষ্ঠিত রাজনগর প্রাসাদ এবং দুর্গ, আর পূর্ব্ব দিকের বাঁধের উপর কাঁকরোলী গ্রাম। কাঁকরোলী ঘাটটি মোহন্তের প্রাসাদ, ধর্ম্মশালা এবং আর কয়েকটি বড় বড় অট্টালিকায় ঘেরা; ঘাটের নীচের দিকে ছোট ছোট চবুতরাও আছে। জয়সমুদ্র বা উদয়সাগরের তীরে লোকালয়ের অভাব, এখানে তা পূরণ হইয়াছে কিন্তু তাতে হ্রদের নির্জ্জনতা বা সৌন্দর্য্য একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

রাণা রাজসিংহ যখন সবে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন তখন মেবারে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের কাজ যোগাইবার জন্য (অর্থাৎ relief work হিসাবে) রাণা এই হ্রদসৃষ্টি আরম্ভ করেন। এখানে গোমতী নামে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ছিল, তার স্রোত এই বাঁধ দিয়া রুদ্ধ করা হয়। সাত বৎসর বাঁধিয়া এক কোটী টাকা ব্যয়ে হ্রদের কাজ শেষ হয়। রাজসমুদ্রের সৃষ্টির মধ্যে প্রজার কল্যাণও নিহিত আছে, তাই রাজসিংহ শুধু শিল্পী মাত্র ন'ন মানব-প্রেমিকও বটেন। এইটুকু রাজসমুদ্রের সঠিক ইতিহাস, কিন্তু জনপ্রবাদ তাতে সন্তুষ্ট নয়। মাণিকলালের কাছে শোনা গেল সাত বৎসরের পরিশ্রমেও রাজসিংহ হ্রদ জলে ভরাইতে পারেন নাই, অবশেষে কোন এক 'ঘিওর মাতার' প্রসাদে হ্রদ ভরিয়া উঠে। রাজনগরে একটি ছোট মন্দিরে 'ঘিওর মাতার' বাস—এখন তাঁরই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত

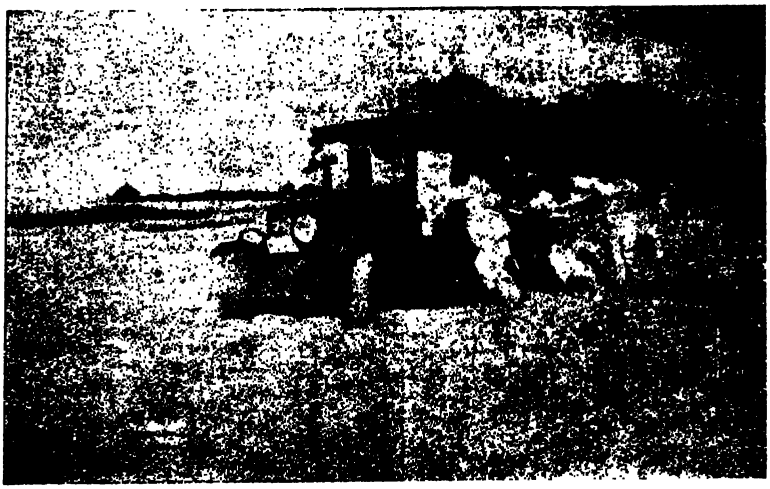
অবশ্য, মাণিকলালের এই বক্তৃতার পরও আমরা তাঁর অনশন-ক্লেশ দূর করিবার কোনও চেষ্টা করি নাই।

রাজসমুদ্রের গভীরতা খুব বেশী; আর একটা জিনিস দেখিলাম—ঘাটের কাছে এবং দূরে নানারকমের অসংখ্য মাছের নির্ভয় বিচরণ। এখানে মাছ মারা নিষেধ তাই মৎস্যকুলের বংশবৃদ্ধিতে কোনও বাধা নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে হ্রদে বেড়াইবার জন্য নৌকার অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল কাঁকরোলীতে নৌকা রাখার 'হুকুম নেহি'। হুকুমের অভাবে কাঁকরোলীর লোকের কোনও দুঃখও নাই। তাই মনে হয় এমন সব হ্রদ যাদের দেশে, তারা এর মর্য্যাদা কিছুই বুঝিল না। জয়সমুদ্র বা উদয়সাগরের তীরে বুঝিবার মানুষই নাই, এখানে মানুষ আছে কিন্তু তাদের দৃষ্টি নাই। হ্রদের এমন মর্ম্মর-বাঁধান ঘাট, তা ধূলিমলিন, দুর্গন্ধে পূর্ণ। গোমতী-সলিল গঙ্গাযমুনার মত পবিত্র, হ্রদের জলে স্নানে গঙ্গাস্নানের পুণ্য—এ কথা অনেকবার শুনিলাম, কিন্তু এর অতীত যে রাজসমুদ্রের কোনও মূল্য আছে তা কেউ জানে না।

মন্দিরের আরতি শেষ হইয়া গেলে আমরা ধর্ম্মশালার দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি, আকাশে চাঁদ ছিল না। নক্ষত্রপুঞ্জের মৃদু আলোকে হ্রদবক্ষ অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, দুই চারিটি নক্ষত্রের আলো হ্রদের জলে প্রতিফলিত হইয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। দূরে হ্রদের জলরেখা দিক্‌চক্রবালে অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। চারিদিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ, শুধু হ্রদের মৃদু জলকল্লোলটুকু শোনা যায়; রাত্রে যতবার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ততবারই সেই শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। রাজসমুদ্রের তীরে এই এক রাত্রি বাস অনেক দিন স্মরণে থাকিবে।

রাজনগর—পরদিন (২৬শে) প্রত্যাবর্ত্তনের পালা—কাঁকরোলী হইতে নাথদ্বার, তার পর নাথদ্বার রোড ষ্টেশনে ট্রেণ ধরা। সকালে উঠিয়াই আমি আর বিজয়দা গোমতী-স্নানের পুণ্য অর্জ্জন করিয়া লইলাম, তার পর সকলে রাজনগর যাত্রা করা গেল।

রাজনগর হ্রদের তীরেই কিন্তু মোটরে খানিকটা ঘুরিয়া যাইতে হয়। পথে হ্রদের জল ছোট ছোট নালা দিয়া ক্ষেতের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইতেছে দেখিলাম। রাজনগরের ধারে ছোট ছোট কয়েকটি পাহাড়—তার একটির উপর এক জৈন-মন্দির, আর একটির উপর রাজসিংহের দুর্গ বা প্রাসাদ, সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। রাজসিংহের সময়ে রাজনগর



কাঁকরোলী হইতে নাথদ্বারের পথে বানাশ নদী

হয় ত নগরই ছিল—এখন দুই চারিটা কুটির মাত্র তার পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষী, আর নূতনের মধ্যে দেখিলাম একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। এখানকার প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি 'নচৌকি'—সেটি একটি ঘাট। প্রাচীরে ঘেরা একটা বাগানবাড়ীর মত—বাগানের কোনও চিহ্ন নাই—তার গেট দিয়া ঢুকিতে হইল। ঘাটটি খুব চওড়া, সুন্দর; ঘাটের এক সোপান-বক্ষে কয়েকটি সুদৃশ্য কাজ-করা মর্ম্মর-তোরণ, আর নীচে একেবারে জলের উপরে—তিনটি বড় বড় মর্ম্মর চবুতরা। চবুতরা তিনটি বাস্তবিকই দেখিবার জিনিস—তাদের স্তম্ভে, ছাদে, খিলানে যা কারুকার্য্য দেখিলাম তা সূক্ষ্ম তক্ষণশিল্পের

অপূর্ব্ব নিদর্শন। চবুতরার ভিতর সমস্তটাই পাথরে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি এবং চিত্রে ভরা, পাষাণবক্ষে এমন ফুল ফোটান, ছবি সাজান বড় সামান্য শক্তির কথা নয়। চিতোরের জয়স্তম্ভে যে শক্তির উন্মেষ, এখানে তার পরিণতি। মাণিকলালের মতে, জলের নীচে আরও ছ'টি এরকম 'চৌকি' বা চবুতরা আছে—তাই ইহার নাম 'নচৌকি'। ন্যায়শাস্ত্রে মাণিকলালের দখল আছে বোঝা গেল।

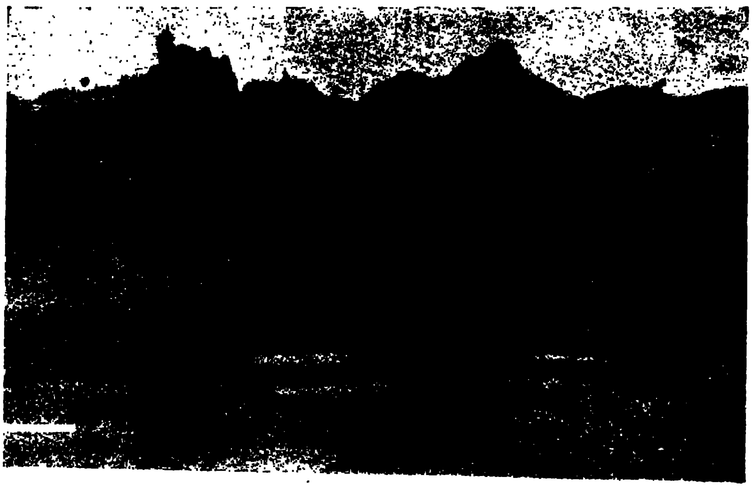
রাজনগর দেখিয়া নাথদ্বারের পথে ফেরা গেল। বানাশ নদীতে পৌছিয়া আমাদের মোটর বালি এবং পাথরের মধ্যে আটকাইয়া গেল। তখন বেলা দশটা—বন্ধুরা এই অবসরে নদীর শীর্ণ জলধারায় স্নান সারিয়া লইলেন। আমি গোমতী-সলিলস্পৃক্ত সুতরাং দাঁড়াইয়া দেখিলাম, কিন্তু মনে হইতেছিল গোমতী-তীর্থের অবমাননা করিয়াও এখানে একবার নামিয়া পড়ি।

নাথদ্বারে পৌছিয়া আর একবার শ্রীনাথজীর প্রসাদ খাইয়া তিনটার সময় নাথদ্বার রোডের বাসে উঠিলাম, তার পর সন্ধ্যায় ট্রেণ ধরিয়া আবু পাহাড়ের পথে আজমীর রওনা হইলাম।

আবু পাহাড়

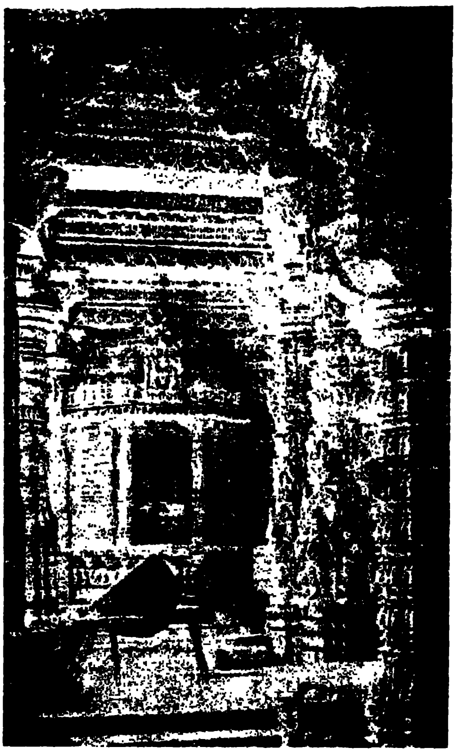
পরদিন (২৭শে) আজমীরে যখন গাড়ী হইতে নামিলাম তখন ভোর ছ'টা। এখানে গাড়ী বদল করিয়া বোম্বাই মেল ট্রেণ ধরিতে হইবে—তার তখনও তিন ঘণ্টা বাকী। আজমীর আমাদের সকলেরই পূর্ব্বে দেখা ছিল, একজনের শুধু ছিল না; যাঁর ছিল না তাকে এই ক'ঘণ্টার মধ্যে সহরটা দেখাইয়া আনিবার জন্য আমরা একদল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলাম।

আজমীরেও একটি চমৎকার হ্রদ আছে—নাম অনাসাগর, প্রাকৃতিক হ্রদ নয়, অনাসিং নামে এক রাজপুত রাজার কীর্ত্তি। সহরের প্রান্তে মোগল বাদশাহদের আমলের দৌলতাবাগ উদ্যান, তার নীচেই এই হ্রদ। হ্রদের তীরে উদ্যানের যেটুকু তা শ্বেতপাথরে বাঁধান রেলিং ঘেরা, তার উপর সাজাহানের তৈরী তিন-চারিটি মর্ম্মরের সুন্দর বিশ্রাম-কক্ষ আছে। হ্রদের তিন দিকে পাহাড়; একদিকে তারাগড় পাহাড়, তার উঁচু শৃঙ্গের উপর আজমীরের চীফকমিশনারের বিরাট প্রাসাদ, আর সামনে অপর পারে স্তরবিন্যস্ত গিরিশ্রেণী—তার গায়ে পুষ্করে যাইবার শুভ্র পথটি যেন একটি সরু সুতার মত ঝুলিতেছে দেখা যায়। সেবার অনাসাগর দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এবার কিন্তু তা চোখেই লাগিল না। মনে পড়িল—সেবার বায়ুহিল্লোলে হ্রদবক্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তার উচ্ছলিত জলরাশি যেন এক চঞ্চল কলহাস্যময় শিশুর মত ও পাহাড়ের কোল হইতে এ পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। এবার দেখিলাম হ্রদের জল শান্ত—হ্রদবক্ষ নিস্তরঙ্গ—পাহাড়ের কোলে সে শিশু ঘুমন্ত। তার ঘুম ভাঙ্গিলেই বা কি; অনাসাগর তাই-ই আছে, কিন্তু জয়সমুদ্র রাজসমুদ্রের মোহ যাদের চোখে তাদের কাছে এর বিস্ময় আর কতটুকু।


নাক্কি হ্রদ—মাউণ্ট আবু

তার পর জৈনমন্দির, সেলিম চিস্তীর দরগা, 'আড়াই দিন

কা ঝোপরা' প্রভৃতি দেখিয়া ষ্টেশনে ফিরিলাম। স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইতেই গাড়ী আসিয়া পড়িল—আমরাও চাপিয়া বসিলাম। আজমীরের সীমানা পার হইয়া মাড়বার রাজ্যের মরুপ্রান্তর ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিল; মাড়বার আমাদের প্রথম প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন সকলেরই মন ভ্রমণশ্রান্ত, আবু পাহাড়ে দুই চারিদিন বিশ্রাম করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত, তাই রাজপুতানা-ভ্রমণের অঙ্গহানি করিয়াও এ যাত্রা আমাদের মাড়বার বাদ দিতে হইল।



দিলবারা মন্দিরের মণ্ডপ এবং দালান

আবুরোড ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখন অপরাহ্ন। এখান হইতে মাউন্ট আবু ১৭ মাইল রাস্তা—মোটর সার্ভিশ আছে। প্রথম তিন মাইল সমতল—তার মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত বানাশ নদী পার হইতে হইল। তার পর বরাবর চড়াই। মাউন্ট আবু প্রায় চার হাজার ফিট উঁচু, তার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গুরুশিখর সাড়ে পাঁচ হাজার। রাজপুতানার পাহাড়ও তার মরুভূমির মত—কেবল শুষ্ক কঠিন স্তূপ। গাছপালা, জঙ্গল আছে বটে—কিন্তু তার মধ্যে হিমালয়ের গিরি-অরণ্যের সে শ্যামলিমা নাই, তেমন বড় বড় বনস্পতির শ্রেণী নাই, পাহাড়ের গায়ে সে ফার্ণ বা মসের শ্যাম শোভা নাই, তার বুকে সাদা সাদা মেঘের সে খেলাও নাই। এক জায়গায় খুব ঘন জঙ্গল দেখা গেল—তার অপর প্রান্তে এক সুবিস্তৃত পর্ব্বত শ্রেণী পশ্চিম দিগন্ত পর্য্যন্ত সব আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। আর এক মজা দেখা গেল—সন্ধ্যা সাতটার সময়েও গোধূলির আলো রহিল, আবুতে সন্ধ্যাবাতি জ্বালিবার অনেক আগে তার নীচের আলো নিবিয়া গিয়াছিল।

এখানে এক গুজরাটী হোটেলে উঠিতে হইয়াছিল—সেটি মোটর-ষ্টেশনের পাশেই—তার সম্বন্ধে স্মরণীয় তার খাওয়া-দাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। ঘর বাড়ীগুলি ভাল কিন্তু যত গোল খাওয়া-দাওয়ার বেলায়। হোটেলে মাছ মাংসের প্রবেশ নিষিদ্ধ; আমাদের তাতে আপত্তি ছিল না, যদি অন্য উপায়ে অভাব পূরণ হইত। মাউণ্ট আবুর বাজারে আনাজ তরকারীর অভাব নাই কিন্তু হোটেলের 'মেহুতে' যেহেতু এক রকমের বেশী 'শাক্' লেখে না আমাদের পক্ষে তরকারীর প্রাচুর্য্য তাই কোনও কাজের হয় নাই। তিন দিন বকাবকির পর শেষে বন্ধুরা নিজেদের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

রাজপুতনার এজেন্ট জেনারেল এখানে বাস করেন—সুতরাং আবু রাজধানী। আবার তিনি থাকেন বলিয়া সমস্ত রাজপুত সরকারের এখানে এক একটা 'ভকালত' বা দপ্তরখানা আছে, তার কর্ত্তা এক একজন 'ওয়াকিল' বা ভকিল সাহেব। প্রত্যেক রাজার আবার এক একটা প্রাসাদও আছে—নাই কেবল মেবার রাণার। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে মেবারের ভূতপূর্ব্ব মহারাণা ফতেসিংহের আবু পাহাড়ে আসিবার সঙ্কল্প কোন কালেই ছিল না, আর একটা বোধ হয় এই যে আবু আগে মেবার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন সিরোহী রাজ্যের মধ্যে। এই পাহাড়ে রাণা কুম্ভের অনেক কীর্ত্তি আছে—কোথায় তা জানিতে পারি নাই।

এত রাজন্য-অধ্যুষিত আবু নগরী কিন্তু নিঝুম, জনবিরল,

প্রাণহীন। রাজাদের প্রাসাদ ছাড়া বড় বড় বাড়ী কম, এক আছে রাজপুতানা হোটেল আর সেনানিবাস বা অসুস্থ সৈন্যদের জন্য sanatorium। সহরে রাস্তা অনেক, কিন্তু বাড়ীগুলি ছাড়া ছাড়া। বাজারে লোকের ভিড় নাই, রাস্তায় জনকোলাহল নাই, হিলষ্টেশনের শোভা সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধি সবেরই এখানে অভাব।

হ্রদ ছাড়া রাজপুতানার কোনও সহর হয় না, আবুতেও এক হ্রদ আছে তার নাম নাক্কী। তার এক কোণে পাহাড়ের উপর এজেন্টের প্রাসাদ আর এক কোণে জয়পুর-রাজের প্রাসাদ। এক দিকের পাহাড় খালি, তার মাথায় লম্ফ-খাড়া চড়াই যে উঠিবার কথা আমরা মনে স্থানও দিলাম না।

দিলবারা মন্দিরগুলির তত্ত্বাবধান করেন সিরোহীরাজ, তার জন্য একজন কর্ম্মচারী এখানে থাকে। শুনিয়াছিলাম এখানে নাকি নোটিশ দেওয়া আছে যে ইউরোপীয় আর সন্ন্যাসী ছাড়া আর সকলকে পাঁচশিকা করিয়া মন্দিরদর্শনী দিতে হয়। নোটিশ আমরা দেখি নাই, কিন্তু দর্শনী দিতে হইয়াছিল। তা' লওয়াও যেন মন্দির কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহ এমনি ভাব। নোটিশে কেবল আছে, মন্দির দর্শনের জন্য আবুর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাশের দরখাস্ত করিতে হয়। দর্শকদের



একটি গম্বুজের অভ্যন্তর—দিলবারা

প্রদানোদ্ধত ভেকের আকারে একটি পাথর খাড়া। হ্রদে একটি ঘাটও আছে—তার উপর দুই তিনটি ছোট মন্দির। নৌকাভাড়া পাওয়া যায়—আমরাও সকালে (২৮শে) ঘণ্টাখানেক বেড়াইলাম। জল অপরিষ্কার—শৈবালে ভরা।

আবুর প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি জৈনদের দিলবারা মন্দির, খাওয়া-দাওয়ার পর সেখানে যাওয়া গেল। দুই মাইল রাস্তা হাঁটিতে হইল—মোটর পাওয়া যায় কিন্তু চার্জ্জ ভয়ানক। পথে বিকানীর এবং আলোয়ার রাজের প্রাসাদ দেখা গেল—দেখিবার মত বাড়ী বটে। রাস্তার বাঁ-পাশে উঁচু পাহাড়ের উপর অধর দেবীর মন্দির—৪৬০০ ফিট উঁচু, আর এমন

বিধি-নিষেধের মধ্যে আছে চামড়ার জুতা পরা থাকিলে খুলিতে হইবে, মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষ তার বদলে অন্য পাদুকার ব্যবস্থা করিবেন। আমরা জুতা অবশ্য খুলিয়াছিলাম কিন্তু অন্য পাদুকা সরবরাহের জন্য কারও আগ্রহ দেখি নাই। জুতার পর আমাদের অঙ্গে আর কোনও চামড়ার জিনিষ আছে কিনা তার খোঁজ সুরু হইল এবং অবশেষে যখন বন্ধুদের বেল্ট ধরিয়া টানাটানি চলিল—আমরা হাফপ্যাণ্ট-পরা ছিলাম—তখন আর ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হইল; এর উপর রাজ-কর্ম্মচারীটির মেজাজ এবং ভাষা—হিন্দি ভাষার ভদ্রতা-সূচক পদগুলি যে আবুর পাহাড়ে অপ্রচলিত তা' আগে জানা

ছিল না। নোটিশের দোহাই দিয়া শুনিতে হইল এ সব বিধান কালা আদ্‌মীর জন্ম নয়। অতঃপর আমাদের ভাবা এবং মেজাজও আর নরম রহিল না, সিরোহীরাজকে নিছক সাড়ে সাত টাকা দান করিয়া শেষে আমরা মন্দির না দেখিয়াই ফিরিলাম।

অতঃপর কি করা উচিত রাত্রে তার জল্পনা চলিল। মন্দিরে এক নোটিশে আছে যে মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষ যদি কোনও দুর্ব্যবহার করেন তা যেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানান হয়। একদল বলেন জানানই উচিত, আর একদল বলেন তা নিষ্ফল। প্রথম দলেরই জিত হইল এবং পরদিন সকালে তাঁরা ম্যাজিষ্ট্রেট সন্দর্শনে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য ভাল ব্যবহারই করিয়াছিলেন, সিরোহীরাজের 'ওয়াকিল'কে ডাকাইয়া এজন্য বকিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন এবং আমাদের সেদিনের জন্য একখানা পাশও দিয়াছিলেন।

২৯শে অক্টোবর—অপরাহ্নে আবার মন্দিরে যাওয়া গেল। পথে মন্দিরের সেই কর্ম্মচারীটিকে সামনে দেখিলাম—আমাদের দেখিয়া পাশ কাটাইয়া অন্য পথে গেলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি 'ওয়াকিল' সাহেবের দরবার হইতে ফিরিতেছেন এবং সেখানে তাঁর অভ্যর্থনাটা সুখের হয় নাই। মন্দিরে আজ ভিন্ন ব্যবস্থা—কানাকানি শুনিলাম যে আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের 'আদ্‌মী' সুতরাং সম্মানার্হ। কর্ম্মচারী মহাশয় আগেই পৌঁছিয়া সব বলিয়া কহিয়া রাখিয়াছিলেন—আমাদের আর দর্শন দিলেন না। আজ জুতা খুলিতেই সকলে সন্তুষ্ট, একজন আগাইয়া আসিয়া গাইড্ হইলেন। হায় আমাদের নেটিভ ষ্টেট!

দিলবারায় মন্দির অনেকগুলি। সমস্ত চত্বরটা প্রাচীরে ঘেরা। বাহির হইতে মন্দিরগুলি কিছুই নয়—নূতন চুণকাম-করা, মন্দির-শিখরের মধ্যে কোনও কারুকার্য্য নাই, অতি সাধারণ রকমের। ভিতরে ঢুকিয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। দুইটি মন্দির প্রধান—একটির নির্ম্মাণ-তারিখ ১০৩১ খৃষ্টাব্দ, নির্ম্মাতা রাজা ভীমদেবের বিমল নামে এক অমাত্য, আর একটির ১২৩০ খৃষ্টাব্দ, নির্ম্মাতা তেজপাল—বোধ হয় একজন শ্রেষ্ঠী। এ সব কথা শিলালেখে লেখা আছে—তাতে খরচের যা অঙ্ক দেওয়া আছে তা ভয়ানক—হয়ত অতিরঞ্জিত—৩০ কোটি টাকার উপর। একটি মন্দির তীর্থঙ্কর নেমিনাথের, আর একটি—যেটি বড়—আদিনাথের বা ঋষভনাথের। যেখানে তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত—তাকে

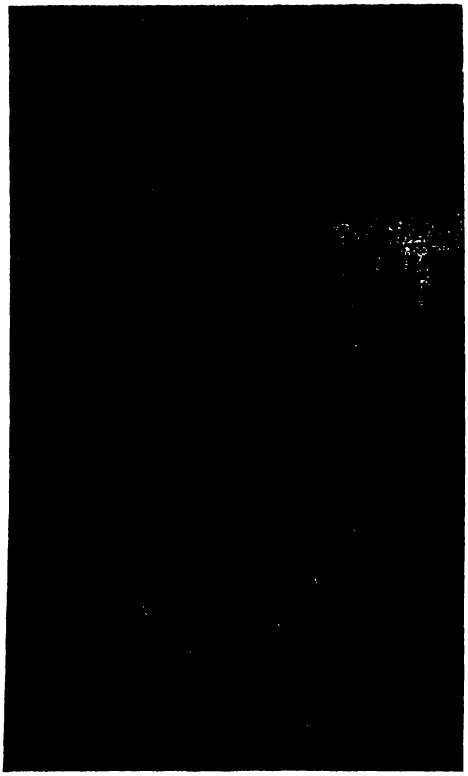


দিলবারা মন্দির —গর্ভগৃহের সম্মুখ

মন্দিরের গর্ভগৃহ বলা যাইতে পারে—তা স্বল্পালোকিত, কাচের দরজা দেওয়া, মূর্ত্তি অস্পষ্ট দেখা যায়। গর্ভগৃহের সামনে মণ্ডপ, তার পরে দালান—বড় বড় থামের উপর প্রতিষ্ঠিত—সমস্ত শ্বেত মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত।

মন্দির প্রাঙ্গণ ঘেরিয়া চারিপাশে প্রাচীরের গায়ে আবার ছোট ছোট কক্ষ। বড় মন্দিরটিতে এই রকম ৫২টি কক্ষ আছে—তার সামনে দুটি সারি করিয়া থামওয়ালা দালান। প্রত্যেক কক্ষে এক একটি শ্বেত পাথরের জিন মূর্ত্তি বসান—সব মূর্ত্তিগুলিই প্রায় একরকম। একদিকে কক্ষ শেষ হইবার পর কয়েকটি বেশ বড় প্রকোষ্ঠ, তার মধ্যে কতকগুলি

দণ্ডায়মান শ্বেত হস্তীমূর্ত্তি। মন্দিরের এবং এই সব কক্ষের দালানে—তার ছাদে, খিলানে এবং থামের গায়ে—পাথরের উপর খুদিয়া যে কারুকার্য্য ফোটান হইয়াছে তা এক অপূর্ব্ব



দিলবারা মন্দিরের শ্বেতহস্তী মূর্ত্তি

বিস্ময়। দালানের ছাদ গম্বুজের আকারে গঠিত, তার নীচে কত রকমের ফুল, কতরকমের কাজ যে আছে তার তুলনা নাই। কোথাও অসংখ্য পাপড়িযুক্ত পদ্ম ফুটিয়া আছে, কোথায়ও বা অন্য ফুল, কোথায়ও ফুল নয় অন্যরকমের আর কিছু। দুই থাকের মধ্যে ঢেউ-খেলান খিলান—তার কাজ এত সূক্ষ্ম যেন হাতীর দাঁতের বলিয়া মনে হয়। থামের কোণে আবার সূক্ষ্ম আস্তরণের মত পাথরের কাজ—তার সৌন্দর্য্যও অপরূপ। থামের গায়ে এবং ছাদে নানা মূর্ত্তির লীলাও আছে—যেমন নৃত্যপরায়ণা নারীর চিত্র। অন্যান্য আখ্যানের ছবিও আছে, তবে মূর্ত্তির মুখে তেমন ভাবের ব্যঞ্জনা নাই। পাষাণের কঠিন বক্ষ চিরিয়া যে শিল্পী ফুল ফোটাইয়াছেন—ছবি তুলিয়াছেন, যাঁর সূক্ষ্ম যন্ত্রের যাদুস্পর্শে পাষাণ প্রাণ পাইয়াছে তাঁর অসাধারণ শক্তিকে আমরা অভিনন্দন জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তার পর দিন (৩০শে) ভাঙ্গনের পালা। আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিতেছিল, আরও কয়েকজন ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। আবুর পাহাড়ে আমাদের দল ভাঙ্গিয়া দুই দল হইল, দুই জন রহিয়া গেলেন—চারজন ফিরিলাম। দশটার সময় মোটর ধরিয়া বেলা একটায় আবুরোড ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিলাম। আমি দিল্লী চলিয়া গেলাম, বন্ধুরা নামিলেন জয়পুরে। পিছনের বন্ধুরাও পরে জয়পুরে নামিয়াছিলেন এবং ভোপালের ঘোষাল মহাশয়ের চিঠির খাতিরে রাজ-অতিথির সম্মান পাইয়াছিলেন। আমার জয়পুর আগেই দেখা ছিল, এ যাত্রা আর হইল না। দিল্লীতে একদিন কাটাইয়া পয়লা নভেম্বর ফেরা গেল—পথে আগ্রায় জয়পুরের বন্ধুরা আসিয়া মিলিত হইলেন।

(সমাপ্ত)

শ্রীপাঁচকড়ি সরকার

শান্তিহারা

৺উমা দেবী

শান্তি যবে ম্লান হেসে, ছল ছল চোখে,
কহিল স্বামীরে তার—"বৃথা মোর শোকে
হয়োনা কাতর তুমি, হে আমার প্রিয়,
তুচ্ছ এ জীবন মম—নহে স্মরণীয়
চির জন্ম কারো কাছে ; নাহি কোনো দুখ্
আমারে ভুলিয়া তুমি পাও যদি সুখ।"
অসহ্য ব্যথায় শমী মুখ চাপি কহে—
"বলিতে দিবনা ইহা ; এ হৃদয় দহে
অন্তহীন যাতনায় ; তুমি যাও যদি,
মৃত্যু শুধু কাম্য করি, রব নিরবধি।"
প্রিয়া হাসে, সোহাগেতে ঢলি প'ড়ে বুকে,
বলে—"ছি, ছি হেন কথা নাহি এনো মুখে।"
অবশেষে একদিন মৃত্যু এল দ্বারে,
সমস্ত উপেক্ষা করি নিয়ে গেল তারে।

"কিছুই চাহিনা আর, দেহ অনুমতি
তোমার করিতে সেবা"—কহিল আরতি
দুয়ারের কাছে এসে। শমী তারে কয়,
"প্রয়োজন নাই কিছু"—অসীম বিস্ময়
দেখে তবু দূর হতে—নীরব সেবায়
সমস্ত বেদনা ওর মুছে নিতে চায়।
বিরক্ত চিন্তিত মনে বৌঠানেরে ডেকে
বলে শমী, "বোনটিরে কেন গেছ রেখে
আমার সেবার লাগি ? অতিথি হেথায়
সমাদর কর তারে যতনে সেবায়,
আমারে বাঁচাও তুমি"—বউঠান হেসে
বলে—"আমি মরি কেন মাঝখানে এসে ?"
কর্ম্ম শেষে সন্ধ্যা বেলা, আপনার মনে
আরতি একেলা বসি ছিল গৃহ কোণে
সহসা প্রবেশি' সেথা শমী তারে বলে
"সুখী হই, এইবার যাও যদি চলে—

আপনার গৃহে ফিরে"—হাসিয়া যুবতী
বলে, "আমি বাঁচিলাম, দিলে অনুমতি।"
সত্যই গেল সে চলি ; শমী চমকিয়া
দেখে কবে অজানিতে ভরেছিল হিয়া,
শান্তি-হারা শূন্যতায় এক বিন্দু সুখ
আপন অজ্ঞাতে আসি জুড়েছিল বুক !
অধীর হইয়া উঠে বলে, "ওগো প্রিয়া
সত্যই কি গেছ চলে সবটুকু নিয়া ?"
মনে পড়ে—শেষ ক্ষণে উঠেছিল ভাসি
শান্তির প্রশান্ত মুখে তৃপ্তিভরা হাসি।

বহুদিন লাগি শেষে চলিল প্রবাসে,
চিত্ত যদি শান্ত হয়—একান্ত এ আশে
ঘুরিল সে দেশে দেশে, কত মত কাজে,
আপনারে স'পি দিল নূতনের মাঝে।
একদা ফিরিল ঘরে, পুলকিত মন
নূতন জীবনে আজি সাথী প্রয়োজন ;
আরতিরে দিল চিটি—বহু অনুনয়ে
মার্জ্জনা মাগিয়া লয়ে, অতি ভয়ে ভয়ে
জানালো বাসনা তার। দুই দিন পরে
উত্তর আসিল এক সুস্পষ্ট আখরে—
"বৈশাখের শেষে বিয়ে ; আপন ইচ্ছায়
বরণ করেছি তাঁরে। একদা বিদায়
করেছিলে বি'না দোষে যারে অনাদরে
আশীর্ব্বাদ মাগে সেই আজি জোড় করে।"



অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুহাসিনী কি ভাবিতেছিল? ভাবিতেছিল, নারীসৃষ্টি গল্পের কথা, আর ভাবিতেছিল গল্পরচয়িতার কথা।

গল্প কেন এত ভাল লাগিল প্রথমতঃ তাহাই মনে হইল। তাহার প্রাণে রেখাপাত কেন? কারণ আর যাহা হউক, রূপতৃষ্ণা নয়—হেমচন্দ্র যে সুশ্রী, সুপুরুষ। কারণ ভালবাসার অভাবজনিত ক্ষুধা নয়—হেমচন্দ্র স্ত্রীগতপ্রাণ। তবে কারণ কি? জটিল স্ত্রী-হৃদয় যিনি গড়িয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন।



নিদ্রিত শিশুকে শয্যায় শোয়াইয়া সুহাসিনী হাঁফ ছাড়িতে যেমন জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, প্রিয়নাথও ঠিক সেই সময়ে ফুলগাছগুলি বায়ুভরে কেমন সুন্দর দুলিতেছে দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইল—দুইজনেই চিত্রার্পিত।

নারীচরিত্রে সত্যই কি তবে সামঞ্জস্য নাই, আছে কেবল সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যতা গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ? হয়ত, কে জানে! নহিলে সুহাসিনী—স্বামী-সোহাগে সোহাগিনী হইতে পারে, একটা কারণ—সৌভাগ্যের আতিশয্য, সম্ভোগ-বাহুল্য। মানুষ ভয় করে দুঃখকে, গালি পাড়ে দুঃখের প্রতি—

দুঃখের কষাঘাত যে বড়ই নির্দ্দয়। এই অভিশপ্ত দুঃখই কিন্তু জীবনের কেন্দ্র; দুঃখ আছে তাই সুখের সম্মান। নিরবচ্ছিন্ন সুখ—সুখ এবং সম্ভোগ মানুষ সহিতে পারে না, বিরক্ত হয়, ধৈর্য্য হারায়, কি চায় জানে না, নূতন কিছু খুঁজিয়া মরে।

সুহাসিনীও সৌভাগ্য সম্ভোগের একটা স্রোতে পড়িয়া নূতন কিছু খুঁজিতেছিল কিনা কে বলিবে? স্পষ্ট করিয়া খুঁজিতে না পারে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে অজ্ঞাতসারে হয়ত অমনই একটা বিরক্তির ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল। চাহিবার যাহার কিছু নাই, চাহিবামাত্র যাহার অভাব ষোল কলা পূর্ণ হয় সে বড় গরীব—দুঃখের অভাবে!

সুহাসিনীর এত সুখ—চাহিবার কিছু নাই! তবে কি সুহাসিনী রাজরাণী? রাজরাণী!—হাঁ, পতির আদরে যে আদরিণী, সে রাজরাণী বৈ কি! স্বাচ্ছন্দ্য যাহার সঙ্গিনী, বসনভূষণাদির প্রাচুর্য্য যাহাকে আকাঙ্ক্ষার অবকাশ দেয় না, রাজরাণী নয়ত সে কি!

রাজরাণী হইলেও সুহাসিনী এখন ভিখারিণী, নূতনত্বের কাঙ্গালিনী। প্রিয়নাথের স্ত্রী-বিচ্ছেদ-ঘটিত সকল কথাই সে স্বামীর নিকট শুনিয়াছিল, খেয়ালীর খেয়াল বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল। রচনা বর্ণ বৈচিত্র্যে বিষাদের সুন্দর নক্সা আঁকিয়া দিল! সুহাসিনী এই প্রথম অনুভব করিল—দুঃখের কষাঘাত; পরের বুকের ব্যথা নিজের প্রাণে স্থান দিল। ভাবিল, বিশ্লেষণ সমালোচনে যাহার এমন শক্তি, অন্তর্দৃষ্টি এত প্রখর, বিধাতা তাহাকেও নির্ম্মম অঙ্কুশাঘাতে সংক্ষুব্ধ করেন কেন? কণ্টকাকীর্ণ হৃদয়ের একটী কণ্টকও উৎপাটন করিবার উপায় কি নাই? আহা! সহানুভূতি সহস্রমুখিনী হইয়া অবলার সরল প্রাণ ঘেরিয়া ফেলিল। প্রথম রোষ প্রতিমার উপর পড়িল। ভাবুক, প্রেমিক, এমন স্বামীকেও সে সুখী করিতে পারে নাই! ধিক্ তাহার নারী-জন্মে! তাহার পর পতির প্রতিও রুষ্টা হইল—এমন বন্ধুর প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য ঐকান্তিক যত্ন কৈ? স্ত্রীপুত্র লইয়া আত্মসুখে মগ্ন—অপরের স্থান বুঝি নাই! ছিঃ!

পরের দুঃখে সুহাসিনী প্রাণ ঢালিল। অভাবহীনার প্রাণে অভাব দেখা দিল অপরের জন্য। কাঙালিনী 'সাত রাজার ধন মাণিক রতন' কুড়াইয়া পাইলে যেমন উত্তেজিত হয়, সুহাসিনী তেমনই আবেগ অনুভব করিল।

তখন শিশু ঘুমাইয়াছে। তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া হাঁফ ছাড়িতে যেমন জানালার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রিয়নাথও ঠিক সেই সময় বায়ুভরে ফুলগাছগুলি কেমন সুন্দর দুলিতেছে



প্রিয়নাথের চিত্রই পূর্ণভাবে হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল। প্রাণের অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া সরমে সঙ্কোচে সুহাসিনী মরমে মরিয়া গেল।

দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইল—দুইজনেই চিত্রার্পিত। প্রিয়নাথ সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ, সুহাসিনী সহানুভূতি-আকৃষ্টা, কৌতূহলাবিষ্টা!

মুহূর্ত্তে চারিচক্ষের মিলন। পরমুহূর্ত্তেই চৈতন্যোদয়—স্ত্রী-সুলভ সরম সঙ্কোচে সুহাসিনী দ্রুত পলায়িতা।

পরবর্ত্তী ঘটনা—প্রিয়নাথের মনোবিকারাদি ডায়েরিতেই সুপ্রকাশ।

নবম পরিচ্ছেদ

ফাঁকি আঁখির ছল—প্রাণের নয়। পলাইয়া চোখের আড়াল হইলেও সুহাসিনী মনের অন্তরালে আপনাকে নিয়োগ করিতে পারিল না। গৃহকর্ম্মে, শিশুর হাসি খেলায়, সুদূর পল্লীগ্রামস্থ আত্মীয় স্বজনের ভাবনায় সুহাসিনী মন নিবিষ্ট করিতে প্রয়াস পাইল। বৃথা চেষ্টা। প্রিয়নাথের চিত্রই পূর্ণভাবে হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল। প্রাণের অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া সরমে সঙ্কোচে সুহাসিনী মরমে মরিয়া গেল।

প্রিয়নাথ কোণাকার কে? তাহার জন্য কাহার দুঃখ, কেন দুঃখ? এ দুঃখে ফলই বা কি? সন্তাপ লাঘবের উপায়ও নাই।

না যাক্! একি বিড়ম্বনা! ঐ ভাবনা, ঐ ছবি—দূর হোক্, বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যাক্ না কেন?

কিন্তু যায় কৈ? যাহা ভুলিতে চাও তাহাই মানসপটে জলন্ত অক্ষরে ফুটিয়া উঠে, যাহা চির-জাগরূক রাখিতে চাও তাহারই উদ্দেশ মিলা ভার। একি জটিল রহস্য!

সুহাসিনী যত ভুলিতে চায়, ভাবনা ততই নানা বর্ণে নানা মূর্ত্তিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনোমন্দিরে 'উঁকি' মারে।

সুহাসিনী অগত্যা বুঝিল, নিস্তার নাই, অনাহুত যে আসে ছুটিয়া পালাইবার উদ্দেশে সে আসে না। বটবৃক্ষের ন্যায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া মাটির ভিতর শিকড়ের পর শিকড় চালাইয়া দাঁড়াইতে চায়।

সুহাসিনী অগত্যা রণে ভঙ্গ দিল, অবুঝ মনকে বুঝাইতে না, পারিয়া স্রোতের টানে তৃণের মত ভাসিয়া গেল।

সুহাসিনী নিত্য সন্ধ্যায় জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়ায়। প্রিয়নাথও অনিমেষনয়নে চাহিয়া থাকে। সুহাসিনী কেন আসে, কেন কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না, আবার কেনই বা দ্রুত পালায় তাহাও স্থির করিতে পারে না। প্রিয়নাথেরও অবস্থা ঠিক তাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীচরণ মিত্র

যাদুকর

শ্রীযুক্ত তারাপদ সাহা এম্‌-এ

১

তিন দিন আগে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রা বলে—"ড্যাম ইয়োর মুন্সেফী, এমন জায়গায় মানুষে থাকে! না আছে সিনেমা, না আছে থিয়েটার, দুটো কথা বলব যে এমন একটি লোক নেই। এর চাইতে কল্‌কাতায় এক গরীব কেরাণীর বউ হওয়া ঢের ভালো ছিল।"

রজত চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক বসাইয়া বলিলেন—"বাই দি বাই,—তুমি সেদিন দুঃখু কর্‌ছিলে না—কিছু দেখতে পাও না বলে? এক সার্কাস পার্টী এসেচে এখানে, যাবে দেখতে? প্রোফেসার বাগ্‌চীর ম্যাজিক নাকি তার মাঝে দেখবার জিনিষ।"

চন্দ্রা কোন কথা না বলিয়া একটু কেক্ ভাঙ্গিয়া মুখে দিলেন।

রজত চন্দ্রার ডানায় একটা ঝাঁকুনী দিয়া বলিলেন—"হ্যালো,—তোমার অভিমান এখনও ভাঙ্গেনি দেখচি।"

"কি জানি,—তোমার যদি আবার মান যায়, আমার যাওয়া ঠিক হবে কিনা কি করে বলব?"

রজত হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"এই দেখ, ঠিক ধরেছি, অভিমান এখনও ভাঙ্গেনি তোমার।" তারপর একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"না, আমরা যেতে পারি এতে, ডেপুটি বাবুর মেয়েরাও যাচ্ছে কিনা।"

সেদিন সন্ধ্যায় ডেপুটী বাবুর হুইপেট্ গাড়ীখানা মুন্সেফ বাবুর ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একখানা স্কারলেট্ রেড্ বেনারসী পরিয়া চন্দ্রা যখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখন ডেপুটি-পত্নী তার বাঁ হাতে একটা ঝাঁকুনী দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ—কি চমৎকার মানিয়েচে আপনাকে—ঠিক যেন একটা দীপশিখা!"

লজ্জায় চন্দ্রার মুখখানা আরও একটু লাল হইয়া উঠিল। ওঁরা যখন তাঁবুতে পৌছিলেন, তখন খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। একটা আঠারো বছরের মেয়ে সর্ব্বাঙ্গে গেঞ্জির পোষাক আঁটিয়া দড়ির উপর খেলা করিতেছে। কলিকাতার সার্কাসে চন্দ্রা বহুবার এ সব খেলা দেখিয়াছে, সুতরাং এ খেলা তাহার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, সে ডেপুটী-পত্নী বিভা দেবীর সঙ্গে গল্প করিয়া চলিল।

তাহাদের গল্পের মাঝে দড়ির খেলা কখন যে শেষ হইয়া গিয়াছে, চন্দ্রা তার খোঁজ রাখে না। সে শুনিল দলপতি আসিয়া বলিতেছেন—'এইবার প্রোফেসার বাগ্‌চী তাঁর অদ্ভুত ইন্দ্রজাল দেখাবেন। প্রেফেসার হিপনোটিজম্ দেখাবার সময় তাঁর নিজের মিডিয়মই ব্যবহার করবেন,—তবে তাঁর শক্তি পরীক্ষা করতে আপনারা কেউ যদি মিডিয়ম্ হতে চান তা'হলে সানন্দচিত্তে তাঁকে গ্রহণ করবেন।' অসংখ্য করতালির মধ্যে দলপতি প্রস্থান করিলেন।

সাজঘরের কালো পর্দ্দাটা সরিয়া গেল। যাদুকরকে দেখিয়াই চারিদিকে আবার ঘন করতালি পড়িল। দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ যুবক, মাথায় লম্বা চুল, লাল রঙের সিল্কের আলখেল্লায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। ললাটে সুন্দরীর সিন্দুরটীপের মত একটী রক্তটীকা। সুতীক্ষ্ণ চক্ষু দুইটাতে অতলস্পর্শ দৃষ্টি। যাদুকর ডান হাতে আয়নার মত স্বচ্ছ একখানা তরবারি লইয়া প্রবেশ করিলেন। তারপর দর্শক মণ্ডলীর চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইলেন। সেই শ্যেনদৃষ্টির সম্মুখে সকলের বুকই একবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রা ত চেয়ার হইতে পড়িতে পড়িতে কোনওরূপে সামলাইয়া লইল। যাদুকরের রূপের সঙ্গে চন্দ্রার যেন কোনখানে সাদৃশ্য ছিল। বিভাদেবী চন্দ্রার গা টিপিয়া বলিলেন—"তুমি ও যাদু জানো

না কি ভাই, পোষাকে যে অবিকল মিলে গেছে—ঠিক যেন যাদুকরী।"

চন্দ্রার বুকটা এক অজানিত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

যাদুকর দ্রুত-পদক্ষেপে রঙ্গভূমির মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পায়ের নীচে একখানা মস্তবড় রুমাল পড়িয়াছিল; যাদুকর তাহাতে পদাঘাত করিতেই—এক সুন্দরী যুবতী বাহির হইয়া আসিল—মাথায় এলোচুল, লাল রঙের একটা জ্যাকেট গায়। যাদুকর তাহার দিকে তাকাইতেই সে একবার প্রদীপের শিখার মত কাঁপিয়া উঠিল।

যাদুকর তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলিয়া—গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজী?"

"হাঁ, রাজী।"

দর্শকেরা বুঝিলেন এ মৃন্ময়ী প্রতিমা নয়—জীবন্ত।

যাদুকর তরবারি ঘুরাইয়া বাঁ দিকে লইলেন, দর্শকেরা কেহ কেহ হয়ত চোক বুজিল,—কিন্তু পরমুহূর্ত্তে চোখ মেলিয়াই দেখিল স্ত্রীলোকটীর ছিন্নদেহ মাটীতে ছট্‌ফট করিতেছে, আর যাদুকর তার ছিন্নমুণ্ডটী চুল ধরিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন—এবং তাহা হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। এক দারুণ ভয়ে সকলের দম্ আটকাইয়া আসিতেছিল। চন্দ্রার মাথা ঘুরিয়া গায়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরিতে লাগিল।

যাদুকর ছিন্নমুণ্ডটা দেহের পাশে রাখিয়া তাড়াতাড়ি বড় রুমালখানা চাপা দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। এইবার তিনি চন্দ্রার দিকে ফিরিলেন। চন্দ্রার সারা শরীরের ভিতর দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিয়া গেল। যাদুকরের চোখদুটী যেন অত্যধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দর্শকদের ক্ষণকাল চিন্তার অবসর না দিয়া যাদুকর বাঁ হাতে রুমালটা ধরিয়া টান দিতেই সেই ছিন্নমুণ্ড মেয়েটা সশরীরে বাহির হইয়া আসিল।

ইহার পর পাঁচখানা উন্মুক্ত তরবারির উপর যাদুকরকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর তাঁর বুকের উপর একখানা দশমণি পাথর রাখিয়া চা'রজন লোক লোহার হাতুড়ি দিয়া পিটাইয়া ভাঙ্গিল। যাদুকর অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসিলেন। চারিদিকে ঘন করতালি পড়িল।

ইহার পর যাদুকরের নির্দ্দেশ মত দলপতি আসিয়া বলিলেন—"প্রোফেসার বাগ্‌চী একসঙ্গে দশজনকে হিপনোটাইজ্‌ড্ করতে চান। দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা ইচ্ছা করেন আসতে পারেন।"

দশজন তরুণ যুবক পরস্পর গা টেপাটেপি করিয়া হাসিয়া সামনের বেঞ্চে আসিয়া বসিল। প্রফেসার তাহাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন—"আমার এ বাঁশীর স্বর শুনলেই আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই জেগে থাকতে পারবেন না।"

যাদুকর একটি কালো মিশমিশে বাঁশী লইয়া ফুঁ দিলেন। কি রাগিণী বাজিল,—বুঝা যায় না, কিন্তু বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী; শুনিলে ভয় হয়। দেখিতে দেখিতে দশটা মিডিয়ামের চক্ষু ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রার মনটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। এখনই হয়ত কত বীভৎস দৃশ্য দেখিতে হইবে, হয়ত এই দশটি তরুণের মুণ্ড লইয়া ভাঁটা খেলা সুরু হইবে। তারপর যদি সেই ছিন্নমুণ্ড জোড়া না লাগে? চন্দ্রা আর ভাবিতে পারিল না, উঠিয়া বাহিরে চলিল। বিভাদেবী সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া শুধাইলেন—"কি ভাই, উঠে এলে যে?"

"আর পারছি না—বাড়ী যেতে চাই।"

বলিতে বলিতে রজত রায় আসিয়া দাঁড়াইলেন,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বেয়ারাটাও।

পাঁচমিনিটের মধ্যে ডেপুটী বাবুর হুইপেট্ গাড়ীখানা মুন্সেফ বাবুর ফটকের সামনে আসিয়া থামিল।

২

চন্দ্রা বিছানায় ছট্‌ফট করিতেছে। পাশে রজত অকাতরে ঘুমাইতেছে। চন্দ্রা স্বকর্ণে শুনিয়াছে এই কিছুক্ষণ আগে তাহাদের বড় ক্লক্‌টা ঢংঢং করিয়া দুইটা বাজাইয়া দিয়াছে। একরাশ চাঁদের আলো জানালার ফাঁকে আসিয়া তাহাদের শুভ্র বিছানায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হয়ত জোছনার আলো চোখে লাগিয়া ঘুম আসিতেছে না—চন্দ্রা জানালা বন্ধ করিয়া আসিল। কিন্তু অন্ধকারে ভয় করে—

পাশের আলনা থেকে তার লাল বেনারসী সাড়ীখানা যেন যাদুকর হইয়া সামনে দাঁড়ায়। চন্দ্রা জানালা খুলিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

…ঐ সেই বাঁশীর সুর না? অনেক দূরে। চন্দ্রার বুকটা যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল। বাঁশীর সুর যেন ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বংশীওয়ালা হয়ত ক্রমেই কাছে আসিতেছে। সেই যাদুকর নয় ত? ভাবিতেই চন্দ্রার গা ঘামিয়া উঠিল। সলিলদা নয় ত? চন্দ্রার কেমন কান্না পাইতে লাগিল। সলিল দা…! ভয়ে চন্দ্রার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। এই যাদুকর যদি সলিলদা হয়! বাঁশীর শব্দ ক্রমেই কাছে আসিতেছে। সাম্‌নে গেটের মালতী ঝোপের পাশে কি যেন নড়িয়া উঠিল। চন্দ্রা সভয়ে চক্ষু মুদিল। বংশী-রব থামিয়া গিয়াছে। চন্দ্রা ভয়ে চক্ষু মেলিতে পারিতেছে না—পাছে দেখে জানালার পাশে যাদুকর দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রা তবু ও ভয়ে ভয়ে একবার চোখ মেলিল,…ঐ…ঐ যে পর্দ্দার পাশে ঐ যে দুটি চোখ জ্বল জ্বল করিতেছে। হাজার চেষ্টা করিয়াও চন্দ্রা চোখ ফিরাইতে পারিল না। হাতে শক্তি নাই—স্বামীকে জাগাইয়া দেয়, কণ্ঠে স্বর নাই যে চেঁচায়।

পর্দ্দা সরিয়া গেল। সেই যাদুকর—পরিধানে সেই রক্ত বসন, কপালে সেই রক্তটীকা। চন্দ্রার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইল।

পর্দ্দার পাশে ঐ প্রভাতের শুকতারার মত উজ্জ্বল চক্ষুদুটী কি এক নিষ্ঠুর আকর্ষণে যেন টানিতেছে। চন্দ্রা কিছু বুঝিল না, ভাবিল না—দোর খুলিয়া বাহিরে আসিল। হাঁ—এই ত সেই যাদুকর; বাঁ হাতে সেই কালো বাঁশীটী, কটীতে খাপ সমেত একখানা ভোজালী ঝুলানো। যাদুকর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চন্দ্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। চন্দ্রার মনে হইল—যাদুকর যেন বলিতেছে 'ঐ রক্তবর্ণ সাড়ীখানা পরে এস'। চন্দ্রা লাল রঙের সাড়ীখানা পরিয়া বাহিরে আসিল। যাদুকর তাহার দিকে তাকাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে অনুসরণ করিতে বলিল। চন্দ্রা তাহার পিছু পিছু চলিল।

ছোট আদালতের ধার দিয়া নদীর ধার, তারপর বাঁশের সাঁকোটা পার হইয়া ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া যাদু-কর চলিয়াছে, পশ্চাতে চন্দ্রা। দু'দিকে কেবল মাঠ ধূ ধূ করিতেছে—মাঝে মাঝে দু'একটা বিরাটকায় বটগাছ কালো দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রা অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিতে চেষ্টা করিল—'আর কতদূরে আমায় নিয়ে যাবে'—কিন্তু মুখে কথা সরিল না।

যাদুকর তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল—'ঐ যে ডাইনে ভবানী মায়ের মন্দির—ঐখানে'। চন্দ্রার কত শোনা গল্প মনে পড়িল—তবে কি যাদুকর আমায় বলি দিতে চায়? এ কি তান্ত্রিক? ভয়ে তার সারা গা পাথর হইয়া গেল। কিন্তু বাধা দিবার শক্তি নাই—চন্দ্রা যাদুকরের পিছু পিছু চলিল।

লোকের বিশ্বাস ৺ভবানী মা জাগ্রত দেবতা। চন্দ্রা স্বামীর সঙ্গে একবার এখানে আসিয়াছিল। মন্দিরের সেবাইতেরা অচেতন ঘুমাইতেছে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া সাম্‌নে আসিতেছিল, যাদুকর তাহার দিকে তাকাইতেই সে চুপ করিল। মন্দিরের সামনেই একটী পুষ্করিণী; বাঁধা ঘাট—তারই দুপাশে দুটী বকুল গাছ পত্রবহুল দুটী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাছ দুটীর নীচে দু'খানি বেঞ্চ পাতা, তারই একখানিতে যাদুকর গিয়া বসিল এবং চন্দ্রাকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিল।

যাদুকর চন্দ্রার দিকে তাকাইয়া তার গ্রীবা হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনী পর্য্যন্ত কয়েকবার অঙ্গুলি চালনা করিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"চন্দ্রা"।

চন্দ্রা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। এ যাদুকর যে—সলিল দা! যাদুকর লালরঙের আঙ্‌রাখাটা খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"ভাখো,—এবার চিন্‌তে পেরেচ?"

চন্দ্রার দুই চোখে অশ্রুর বান ডাকিল। দুই হাতে চোখ ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিতে লাগিল—"তুমি আবার কেন এলে সলিলদা, এই তিন বছর ধরে……আমি আর বাঁচব না, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চলে যাও, আমায় বাঁচাও—আমি আর সামলাতে পারছি না।"

যাদুকর ধীরে চন্দ্রার মাথাটী নিজের কোলে তুলিয়া লইল। ভাবের আবেশে চন্দ্রা তখনও ফোঁপাইতেছিল। যাদুকর তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ডাকিল—"চন্দ্রা, আমার চন্দ্রা—আমার…!"

চন্দ্রা দুই হাতে যাদুকরের মুখ আটকাইয়া ধরিয়া বলিল—"বলো না, আর বলো না—চুপ"।

যাদুকর জোরে চন্দ্রার হাত সরাইয়া বলিল—"কেন বলব না? আজ তিন বছর ধরে মনের কথা বলতে না পেরে আমার দম্ আটকে এসেছে, পাগলের মত এই তিন বছর দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, সে কার জন্তে? তোমাকে ফিরে পাবার বিদ্যা লাভ করতে আমি কামরূপ গিয়েচি, হিমালয়ে গিয়েছি, আসন প্রাণায়াম মুদ্রা করে আমার হাড়গোড় জরজর হয়ে গেছে, ম্যাজিক শিখতে আমি সাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় গিয়েচি। সাগর পারের শত শত সুন্দরী আমাকে তোমায় ভোলাতে পারে নি। দেশে ফিরে তোমার খোঁজে তোমাদের বাড়ীতে গেলাম, কেউ তোমার ঠিকানা দিলে না—তাই ত সার্কাসে ঢুকে দেশে বিদেশে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্চি। আর তোমায় ছাড়ব না চন্দ্রা—বলো তুমি আমার হবে। বিয়ের আগে তুমি আমায় যে কথা দিয়েছিলে—বলো তাই সত্যি, সমাজ সংসার সব মিছে, বলো—বলো।"

চন্দ্রা কাঁদিতে কাঁদিতে পদ্মের পাপড়ির মত করতলে যাদুকরের মুখ আটকাইয়া বলিল,—"আর বলো না সলিল দা, আমায় বাঁচাও,—তুমি এখান থেকে চলে যাও—আমি যে এখনও তোমায় ভালবাসি—।"

"ওরে হতভাগী, তবে কি হবে আর মিথ্যার অভিনয় করে—চলে আয়! তাঁবুর ধারে আমার আরাব ঘোড়া সাজানো আছে, তুই আমায় আঁকড়ে ধরে থাকবি। এই ত চার মাইল গেলেই ষ্টেশন, রাত থাকতেই আমরা পৌঁছে যাব।"

চন্দ্রার বুকের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিল। স্বামী? তিনি যখন সকালে উঠিয়া দেখিবেন চন্দ্রা পাশে নাই, আর শুনিবেন সার্কাসের দলে যাদুকর নাই—তখন? হয়ত বা ষ্টেসন-ফেরতা কোন যাত্রী আসিয়া বলিবে যাদুকর চন্দ্রাকে লইয়া ট্রেনে উঠিল। ছ্যা-ছ্যা, ছ্যা,—না, সে ইহা পারিবে না। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া একটু তেজের সঙ্গে কহিল, "আমি পারবো না সলিল দা। আমি তোমায় ভালবাসি বলে তুমি আমায় এমনি করে অপমান করতে পারো না,—আমি যাবো না। রাত ভোর হয়ে এল, আমায় বাসায় রেখে এস।"

মুহূর্ত্তে যাদুকরের মুখ কঠোর হইয়া উঠিল; লাল সিল্কের আঙরাখাটা গায়ে পরিয়া যাদুকর একদৃষ্টে চন্দ্রার দিকে তাকাইল। চন্দ্রার সমস্ত শরীর ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, ক্রমে সে সংজ্ঞা হারাইল।

যখন আবার জ্ঞান হইল—সে দেখিল তাহাদের বাসার সম্মুখে সেই মালতী-বিতানের পাশে সেই রক্তাম্বর যাদুকর তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। নিজের কোন ইচ্ছা বা শক্তি আছে বলিয়া তাহার বোধ হইল না। যাদুকর তাহাকে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"আমি বলছি—তুমি এই ভোজালী তোমার ঘুমন্ত স্বামীর বুকে বসিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে চলে আসবে। তুমি ইচ্ছা করলেও এর অন্যথা করতে পারবে না।"

চন্দ্রার দক্ষিণ হস্ত চন্দ্রার অজ্ঞাতে সেই ভোজালী গ্রহণ করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। স্বামীর মুখের দিকে তাকাইতেই দারুণ ঘৃণায় চন্দ্রার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল।…এ-ই ত সলিলদার হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়েচে……এই তার উপযুক্ত শাস্তি। এক হাতে রূপার মত চক্‌চকে ভোজালীখানা সে রজতের বুকে বসাইয়া দিল। রজত একটা ঝাঁকুনী দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। পাশের ঘর হইতে একটা ভীতিসূচক শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে হুড়্‌কো খোলার শব্দও বোধ হয় চন্দ্রার কানে আসিয়া পৌঁছিল, তারপর একদৌড়ে সে যাদুকরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। যাদুকর তাহার হাত ধরিয়া বলিল—

"খতম?"

"খতম।"

"তবে এইবার চলে এস আমার সঙ্গে।"

কিছুদূর আসিয়া চন্দ্রা চোখে অন্ধকার দেখিল। যখন আবার সে চোখ মেলিল;—দেখিল যাদুকর নাই। চন্দ্রা নিজের সত্ত্বা যেন ফিরিয়া পাইয়াছে। তার বুকের ভিতর যেন একটা প্রলয় হইয়া গেল। সে কি করিয়াছে! নিজের হাতে দেবতার মত স্বামীকে সে বধ করিয়াছে। চন্দ্রা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদার শব্দে জাগিয়া রজত স্ত্রীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "দুঃস্বপ্ন দেখেছ চন্দ্রা? ভয় নেই, এই যে আমি রয়েছি।"

পূর্ব্বাকাশ থেকে এক ঝলক সোনালী আভা বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রা তার হারানো মাণিক বুকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

শ্রীতারাপদ রায়

নানা কথা

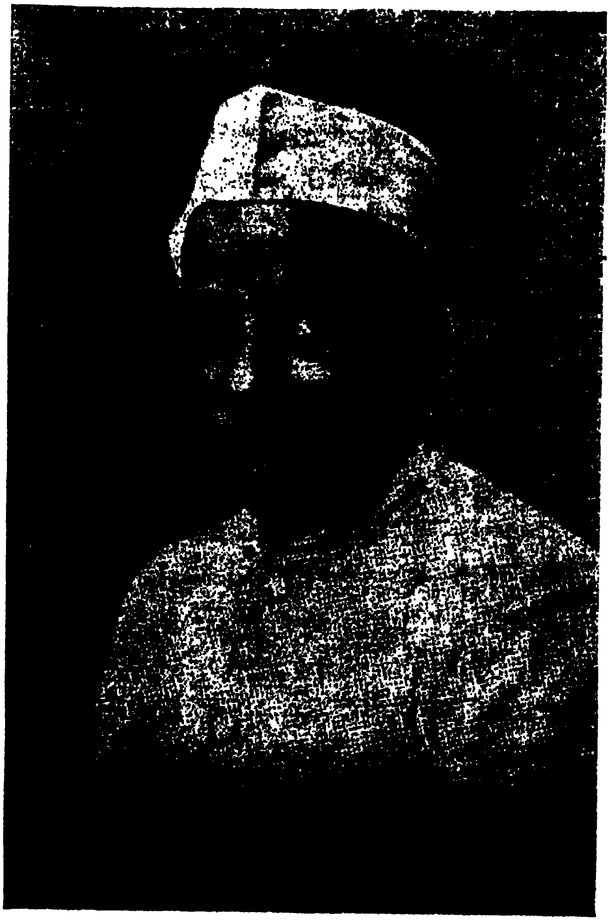
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মত একজন সর্ব্বত্যাগী বিচক্ষণ এবং নির্ভীক নেতার মৃত্যু দেশের যে কোনো অবস্থার পক্ষেই দুর্ঘটনা,—কিন্তু দেশপ্রীতির দুর্ব্বারতার সহিত বিবেচনার সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে যুক্ত করিয়া যখন কিংকর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার সঙ্কটকাল উপস্থিত, তখন তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ নেতার মৃত্যুর মত গুরুতর দুর্ঘটনা আর নাই।

গান্ধী-আরউইন্ সন্ধি দেশের লোকের মনে সার্ব্বজনীন সন্তোষ উৎপন্ন করিতে পারে নাই। কোনো কোনো জায়গায় সভা সমিতি করিয়া ইহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হইতেছে,—একজন নেতা এ কথাও বলিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধেও সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের কল চালাইতে হইবে। অর্থাৎ অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ মহাত্মাজীর স্থির বুদ্ধি এবং বিবেচনা-শক্তির উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান নহেন, তাঁহাদের মতে মহাত্মাজী এ স্থলে অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, নিজের বুদ্ধিকে আঁচলে বাঁধিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়;—কিন্তু সময় বিশেষে, বিশেষতঃ সামরিক কারকারবারের সময়ে, সেই কার্য্য করাই উচিত। যুদ্ধের চরম অবস্থায় সৈনিকেরা যদি সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশের সমীচীনতায় সন্দিহান হইয়া নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্র তর্ক-সভায় পরিণত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। ভারত-ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে সেই প্রকারের গোলযোগের সময়ে পণ্ডিত মতিলালের বর্ত্তমানতা ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয়ের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং ইষ্টানিষ্ট সুবিধা-অসুবিধা ওজন করিয়া নিজের অকপট মত, এবং প্রয়োজন স্থলে পরিবর্ত্তিত মত, ব্যক্ত করিবার সাহস এবং সাধুতা মতিলালের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। বার তের বৎসর পূর্ব্বেও তিনি একজন পাকা মডারেট্ ছিলেন—এলাহাবাদের মধ্যপন্থী



৺পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

সংবাদপত্র লীডারের তিনি ছিলেন পরিচালক। কিন্তু হোম রুল আন্দোলনে যোগ দিয়া তাঁহার যখন মতের পরিবর্ত্তন হইল তৎক্ষণাৎ তিনি লীডারের সংস্রব ত্যাগ

করিয়া নব-প্রকাশিত জাতীয় সংবাদপত্র 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্টে'র পরিচালক সমিতির অধ্যক্ষ হইলেন। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে দেশ যখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল পণ্ডিত মতিলাল সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া ডোমিনিয়ন্ ষ্ট্যাটসের উপযোগী একটি শাসন-প্রণালীর খস্‌ড়া প্রস্তুত করিলেন, এবং বহু বাদানুবাদের পর ১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসে উক্ত খসড়া—"নেহেরু রিপোর্ট"—এই সর্ত্তে গৃহীত হইল যে, এক বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি ভারতবর্ষকে উক্ত প্রণালী অনুযায়ী ডোমিনিয়ন্ ষ্ট্যাটস্ না দেন তাহা হইলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য সিভিল্ ডিস্‌ওবিডিয়েন্স্ পন্থা অবলম্বন করা হইবে। এক বৎসরের মধ্যে গভর্মেণ্ট ডোমিনিয়ন্ ষ্ট্যাটস্ না দেওয়ায় পর বৎসর লাহোর কংগ্রেসে "নেহেরু রিপোর্ট্" বর্জ্জন করা হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হইল। পণ্ডিত মতিলালও অবিলম্বে সদলে লেজিস্‌লেটিভ্ অ্যাসেম্ব্লি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত আইন-অমান্য ব্যাপারে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। অথচ গয়া কংগ্রেসে কাউন্সিল্ প্রবেশের প্রস্তাব স্বয়ং পণ্ডিত মতিলালই করিয়াছিলেন, এবং সে প্রস্তাব কংগ্রেস কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইলে কংগ্রেসের মীমাংসায় অসন্তুষ্ট হইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত মিলিত হইয়া তিনি স্বরাজ্য দলের সৃষ্টি করেন।

মতিলালের জীবনী স্মরণ করিলে চিত্তরঞ্জনকে মনে পড়ে। ত্যাগে, তেজে কর্ম্মপরায়ণতায় উভয়েই উভয়ের সমতুল্য;—বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া উভয়ে দেশসেবার কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সাক্ষ্য বহুকাল ধরিয়া দিবে বিলাস-বৈভব হইতে মুক্ত দেশের কার্য্যে নিয়োজিত সেবা-সদন এবং আনন্দ-ভবন। যে মতিলালের পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রতি মেলে প্যারিস্ হইতে ধৌত হইয়া আসিত—যাঁহার সর্ব্বদা-ব্যবহৃত বিদেশী বস্ত্রের মূল্য দশ হাজার টাকা ছিল, তিনি সামান্য খদ্দর পরিধান করিয়া আনন্দ-ভবনের আরাম-কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দেশ-প্রীতি প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, এ কথা উপন্যাসের মধ্যেও বিস্ময়কর!

চরিত্র-মাধুর্য্যে এবং সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠায় প্রতিপক্ষের মনেও পণ্ডিত মতিলাল শ্রদ্ধা এবং প্রীতি উদ্রিক্ত করিতেন। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী লেজিস্‌লেটিভ্ অ্যাসেম্ব্লিতে স্যার্ জর্জ রেণী তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার কালে বলেন— * * * However the value of his work may be assessed, no one will question his whole-hearted devotion to the interests of India as he conceived them or impute to him any motive other than an unsparing desire to serve his country. * * * He had a personality which impressed itself on the most unobservant. * * * An endearing courtesy, ready sense of humour, freedom from malice and bitterness and a wide and deep culture rendered him unrivalled as a host and the most charming of companions.

স্বভাবতঃ কোমল এবং মধুর প্রকৃতির হইলেও চরিত্র এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তায় পণ্ডিত মতিলাল অনন্যসাধারণ ছিলেন। গত দশ বৎসর তিনি একজন অতি পরিশ্রমী যোদ্ধার মত দেশোদ্ধারের মহাযুদ্ধে কায়মনোবাক্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন—এবং এই সর্ব্বস্বপণ-করা যুদ্ধ যে পণ্ডশ্রম নয়, ইহার পরিণামে ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবেই—সে বিষয়ে তাঁহার অবিচল বিশ্বাস ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনে মহাত্মা গান্ধী মতিলালকে বলেন, "আপনি যদি স্বাস্থ্য ফিরে পান, তা হ'লে আমি আমার স্বরাজ পাবই।" মৃদু হাসিয়া পণ্ডিত মতিলাল উত্তর দেন, "স্বরাজ ত' পাওয়াই গেছে। ষাট্ হাজার পুরুষ, নারী আর ছেলে-মেয়েরা যখন এত বড় আত্মোৎসর্গ করেচে, লোকে যখন ধৈর্য্যসহকারে লাঠি এবং গুলি সহ্য করেচে, তখন তার পরিণাম স্বরাজ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে?"

আমরাও বলি, হে আত্মোৎসৃষ্ট মহাপুরুষ, তোমার উক্তি সফল হউক। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্পদ হইতে রিক্ত হইয়া অবশেষে তোমার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিলে তাহা যেন সফল হয়।

মতিলাল শক্তিশালী কর্ম্মী ছিলেন—অথচ শক্তিকে সংযমের দ্বারা, বিচক্ষণতার দ্বারা সুপরিচালিত করিয়া প্রবল অস্ত্রের মত কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, সে রহস্যও তাঁহার অবিদিত ছিল না। এ শক্তি শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই নয়, সর্ব্বদিকেই প্রকাশ পাইত। সামাজিক কুসংস্কার বর্জ্জনে তিনি অকুতোভয় ছিলেন। কাশ্মীরী সারস্বত-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রথম জীবনেই তিনি তাঁহার আত্মীয়বর্গের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তাঁহার শিক্ষক Principal Harrisonএর সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন।

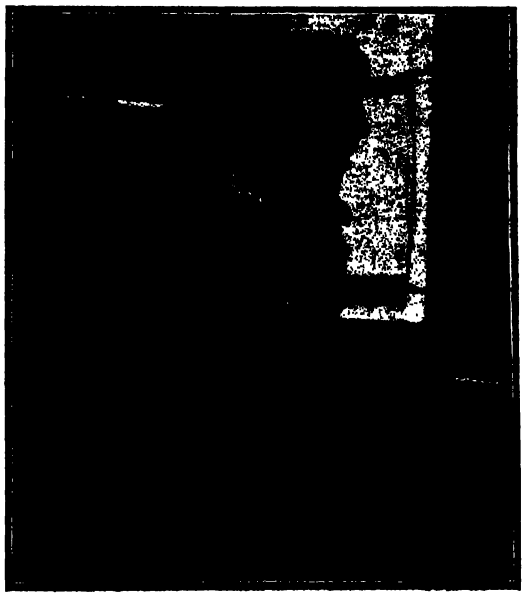
সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬১ সালের ৬ই মে তারিখে দিল্লী সহরে মতিলাল নেহরু জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বৎসরে ঠিক ঐ তারিখেই বাংলা দেশের কলিকাতা সহরে আর একজন মহা-মনীষীর জন্ম হয়;—তিনি আমাদের কবিবর রবীন্দ্রনাথ। পরস্পর-বিরুদ্ধ ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা গঠিত এবং উন্মিষিত উভয়ের জীবনধারা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে পরিণতি একই ভাবে হইয়াছে,—শুধু একজনের কর্ম্মজগতে এবং আর একজনের চিন্তাজগতে। সে কি একই গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের ফলে?

পরলোকগতা উমা দেবী

বিগত ১০ই ফাল্গুন, রবিবার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি উমা দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ২৬ বৎসর। আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনার সহিত এই মর্ম্মন্তুদ সংবাদ বিচিত্রার পাঠকপাঠিকা সমীপে বহন করিতেছি।

মৃত্যু ত সংসারের প্রতিদিবসের ঘটনা, জীবনের অনিবার্য্য পরিণতি—তাহার অনতিক্রমণীয়তাকে না মানিয়া লইয়া উপায় নাই—কিন্তু তাই বলিয়া ২৬ বৎসর বয়সে?—জীবন-পুষ্প যখন তাহার দলগুলি মেলিয়া পূর্ণতা লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন? যাঁহারা উমা দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত ছিলেন তাঁহাদের মনে বিশেষ করিয়া বেদনার এই সুরটি বাজিতেছে। বাঙলার সাহিত্যভাণ্ডারে তিনি যে সম্পদ রাখিয়া গেলেন তাহার পরিমাপে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল সে দুঃখ ত সর্ব্বসাধারণের,—কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির অমায়িকতা, সৌজন্য, বন্ধু-বাৎসল্য, অতিথি-পরায়ণতা স্মরণ করিয়া তাঁহার বান্ধব-বান্ধবী আত্মীয়-স্বজনেরা বিষাদে বিমূঢ় হইয়াছেন।

বিচিত্রার প্রারম্ভ হইতে উমা দেবী বিচিত্রার একজন হিতৈষিণী ছিলেন। বিচিত্রাকে তিনি ভালবাসিতেন এবং সে ভালবাসার অভিব্যক্তি শুধু মুখের কথাতেই প্রকাশ পাইত না, মূল যেমন অন্তরালে থাকিয়া বৃক্ষকে রস যোগায়, তিনি তেমনি অগোচরে অনুপরোধে বিচিত্রার উপকার-সাধন করি-



পরলোকগতা উমা দেবী

তেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি কবিতা এবং কাজলী নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সে কথা বিচিত্রার পাঠকপাঠিকাগণের নিশ্চয়ই মনে আছে।

'বাতায়ন' নামে একটি কবিতার পুস্তক কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বাতায়নের কবিরূপে তিনি বাঙলা সাহিত্যের মহিলা-কবিদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন।

শুধু সুলেখিকা হিসাবেই নহে, অন্য বহুবিধ গুণেরও তিনি

অধিকারিণী ছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীতে তিনি সুনিপুণা ছিলেন এবং অভিনয়কলাতেও তাঁহার পারদর্শিতা কম ছিল না। সুর ও ভাবের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া রবীন্দ্রনাথের গানগুলি গাহিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল, এবং তাহার মধ্যে স্বকীয় ব্যঞ্জনা প্রয়োগ করিয়া অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিতে পারিতেন। এই সকল গুণের জন্য উমা দেবী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

সামান্য একটু দুর্ব্বলতা ভিন্ন রবিবার সকালেও তাঁহার কোনো প্রকার অসুস্থতা ছিল না। ঘণ্টা দুয়েক অসুস্থ হইয়া বেলা দুইটা আন্দাজ সহসা হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চৈতন্য বিলুপ্ত হয় নাই, এবং মৃত্যু তাঁহার মুখমণ্ডলে যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে নাই। বাঙলা দেশের একটী কোমলহৃদয়া মহিলা কবির অদীর্ঘ জীবনের এই সকরুণ পরিসমাপ্তি।

স্বর্গীয়া উমা দেবী প্রথিতনামা অধ্যাপক ৺ মোহিত-কুমার সেনের কন্যা এবং বার্ড কোম্পানীর এঞ্জিনীয়র শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্তের পত্নী ছিলেন। অল্পবয়স্কা একটি কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারকে ও কন্যাটীকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গান্ধী আরুইন সংবাদ—

শুধু ভারতবর্ষের নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেই গান্ধী-আরুইন সংবাদটি একটা স্মরণীয় ঘটনা। মনে হয়, এইখান থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হইল। ইহার ফলাফল যে কী হইবে,—এখনো সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। কিন্তু একথা ঠিক, যে সারা পৃথিবীর লোক আজ আকুল আগ্রহে যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহা অভূতপূর্ব্ব, পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত কোনো দেশে কোনো দিন তাহা ঘটে নাই। এই যে আমাদের দেশের ইতিহাসের একটা নূতন পরিচ্ছেদ লিখিত হইতে চলিল,—না জানি, তাহাতে থাকিবে, পূর্ব্ব-পশ্চিমের মহামিলনের কী অমর বাণী, রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষে ও বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় কী নূতন আলো এবং কোন্ নূতন মন্ত্র, মানুষের সেই এক চির-জাগ্রত, চিরন্তন অথচ চির-নবীন মহান্ আদর্শের প্রতি কেমন নূতন অভিযান! বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস তাহার পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে এই এক বিরাট্ সম্মিলনের ধারায় অবিচ্ছিন্ন; যুগে যুগে ভারতের মাটিতে কত বিভিন্ন জাতি আসিয়া কলহ করিয়াছে আবার মিলিয়াছে,—সেজন্য এই হিন্দুস্থান কত আঘাত সহিয়াছে; তবুও নিবিড় বেদনা বহন করিয়া কখনো বলিতে ছাড়ে নাই,—আয়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। আজও ভারতের কবি সেই কথাই বলিতেছেন,—

> "সেই সাধনার, সে আরাধনার
> যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
> হেথায় সবারে হ'বে মিলিবারে,
> আনত শিরে,
> এই ভারতের মহামানবের
> সাগরতীরে" ॥

আজও ভারতের কর্ম্মীর মধ্যে সেই অনুপ্রেরণা। চিরদিন ভারতের কর্ম্ম, ভারতের সাধনা সেই অনুপ্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। যুগে যুগে ভারতবর্ষ তাহার জ্ঞানের আলো দেশে দেশে ছড়াইয়া দিয়াছে। আজ যদি সে তাহার শান্তি-মন্ত্র সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দিতে পারে, তবে মুক্ত কণ্ঠে বলিব,—যে আমাদের এই সহস্রবর্ষব্যাপী পরাধীনতার দুঃখও সার্থক।

তবুও একথা গোপন করিয়া কোনো ফল নাই যে যে-সন্ধে মহাত্মা গান্ধী সরকারের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপন করিয়া গোল টেবিল বৈঠকের আগামী অধিবেশনে কংগ্রেসের যোগ দেওয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহাতে দেশের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে-প্রাণে সায় দিতে পারেন নাই। এমন কি প্রয়োজন হইলে, মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধেও সত্যাগ্রহের অস্ত্র পরিচালনা করিতে হইবে,—এমন রবও কোথাও কোথাও উঠিতেছে। আমরা অবশ্য এ ইঙ্গিতের বেশী মূল্য দিই না। যদি ইহার কোনো মূল্য থাকে, তবে তাহা এই যে, দেশ যে আজ সত্যসত্যই জাগিয়াছে, এই কথাটা ইহা হইতে আমরা

বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারি। মনে হয় ইহার ভিতরে প্রকৃত তেজ অপেক্ষা যৌবন-সুলভ অধৈর্য্য ও চাঞ্চল্যের অনুপ্রেরণাই বেশী। সত্যের শ্রেষ্ঠতম পূজারী যে মহাত্মা গান্ধী, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র-চালনা শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইবে,—সত্যাগ্রহ না অসত্যাগ্রহ,—সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন এখন ত নাই-ই,—ভবিষ্যতেও যে কোনো দিন হইবে না,—এমন কথা কোনো দ্বিধা না করিয়াই বলা যাইতে পারে। তবে কথা হইতেছে যে, এই যে বিরুদ্ধ মনোভাব—ইহার কি কোনো গভীরতর তাৎপর্য্য নাই? ভারতের যজ্ঞশালায় মহামিলনের ঝঙ্কারের মধ্যে ইহা কি বেসুরো বাজিতেছে না? হয়-ত বাজিতেছে,—কিন্তু ইহাও ঠিক যে এই বেসুর ভারতের গোপনতম অন্তরাত্মার নয়,—ইহা চেতনার সেই উপরিতলের জিনিস, যেখানে কি ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে, কি দেশাত্মার মধ্যে নানাবিধ বিরুদ্ধ ভাব নিরন্তর ক্রমাগতই যাতায়াত করিতে থাকে। বস্তুতঃ যাহা কিছু মহান্, আমরা তাহার সন্ধান পাই, বিরুদ্ধতা অতিক্রম করিয়াই। মিথ্যারও এ জগতে একটা সার্থকতা আছে, সত্যের পথ আমাদের সে-ই দেখায়। অথবা এই নিত্য-গতি-শীল জগতে কোনো কিছুই বুঝি-বা নিছক সত্য বা নিছক মিথ্যা নয়। মহাত্মা গান্ধীও তাঁহার রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন সহযোগিতা দিয়া,—তারপর এই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অসহযোগিতার পথ অতিক্রম করিয়া আবার এই যে আজ সহযোগিতার মন্ত্র গ্রহণ করিলেন,—এ মন্ত্র নিশ্চয়ই নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধতর, বেদনায় গভীরতর, আশায় প্রবলতর। তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিভিন্ন স্তরে,—যে মতই তিনি পোষণ করুন না কেন, যে পথেই তাঁহার রথ চালনা করুন না কেন,—সকল সময়েই তাঁহার অন্তরের সত্যের আলোক-সম্পাতে সেই পথ যে উজ্জ্বল হইয়া সমস্ত দেশের লোককে আকর্ষণ করিয়াছে, দীর্ঘনিদ্রাজনিত আড়ষ্টতা দূর করিয়া সেই সত্য যে তাহার রহস্যময় স্পর্শে নির্জীব দেশবাসীর মধ্যে আবার জীবনীশক্তির দ্রুত স্পন্দন জাগাইয়া দিয়াছে,—একথা ত কোনো গান্ধী-বিরোধীই,—কি ইংরাজ, কি ভারতবাসী, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কি ব্যক্তি-বিশেষে, কি দেশাত্মার,—সত্য, সৌন্দর্য্য, কল্যাণ বিরাজ করে তাহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্যের মধ্যে,—অর্থাৎ অন্তর-বাহিরের পরিপূর্ণ সঙ্গতির মধ্যে,—একথা স্বতঃসিদ্ধ। দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতির মধ্যে আমাদের অন্তরের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার কোনো পরিতৃপ্তির সন্ধান এতদিন পাওয়া যাইতেছিল না,—তাই মহাত্মা এতদিন দেশের মধ্যে অসহযোগের আন্দোলন বহাইয়াছেন। আজ সেই পদ্ধতির পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে,—হউক ইহা সূচনা মাত্র,—তবুও এই যে নূতন হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা আমাদের অন্তরে মলয়ের শীতল স্পর্শ বুলাইয়া দেয় কিনা, অন্ততঃ সেইটুকু দেখিবার জন্যও সেই হাওয়াতে আমাদের মণপ্রাণ মেলিয়া দিতে হইবে,—দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আজ মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে যাঁহারা প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন,—তাঁহারাও বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে তাঁহাদের এই প্রতিবাদ মহাত্মারই প্রজ্জ্বলিত আলোকের শেষ বিলীয়মান রশ্মি; হয়ত এ আলোক আবার প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে, হয় ত বা হইবে না;—কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের কথা, মানুষের এখন হইতে তাহা জানা সম্ভব নয়। আপাততঃ এইটুকু দেখিতেছি যে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, হাওয়া দিতেছে,—এখন এই হাওয়ায় এই জ্যোৎস্নায় তনুমন মেলিয়া দিয়া প্রভাতের জন্য কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে। যদি প্রভাত হয় ভালই, যদি না হয়, যদি এই দীর্ঘরাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যেই এই ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু আবার মিলাইয়া যায়, তবে আবার আগুন জ্বালাইতে হইবে।

মহাত্মার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইতেছে এই যে, দেশের যে-সকল তথা-কথিত হিংসা-পন্থী রাজবন্দীদের বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখা হইয়াছে,—তাহাদের দিকে তিনি তেমন দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাহাদের কেন মুক্তি দেওয়া হইল না? অবশ্য একথা ঠিক যে তাহাদেরও মুক্তি দিলে দেশের শান্তি আরও নিবিড়তর হইত, এবং গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশনে সুবিধা ছাড়া কোনো অসুবিধা হইত না, কিন্তু এই মুক্তি-দান ত মহাত্মার হাতে নহে। বলা যাইতে পারে যে এই মুক্তির স্বত্ব গ্রহণ না করিয়া তিনি কেন সন্ধি-স্থাপন করিলেন। ইহার উত্তর সহজ। এই যে

মহাত্মা পুনরায় সহযোগিতার মন্ত্র গ্রহণ করিলেন,—ইহা ত ক্ষণিকের বিবেচনা-হীন প্রবৃত্তির জন্যও নয়, কিংবা দুঃখ-ভোগের শ্রান্তির জন্যও নয়। লর্ড আরুইনের সহিত দীর্ঘ আলোচনার ফলে তিনি অন্তরের মধ্যে যে নূতন বিশ্বাসের আলোক লাভ করিয়াছেন, সেই আলোকেই তিনি আপনাকে আবার নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। এ আলোক মহাত্মার অন্তরেরই আলোক,—মধ্যে নিভিয়া গিয়াছিল,—লর্ড আরুইন আবার তাহা জ্বালিয়া দিয়াছেন,—হয় ত ক্রমশঃ তাহা উজ্জ্বল-তর হইয়া জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু যে সকল দেশপ্রাণ যুবকেরা হিংস-পদ্ধতির দ্বারা দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখেন, তাঁহাদের নিকট মহাত্মার অন্তরের এই আলোক ত কোনোদিনই পৌঁছায় নাই; গত দশবৎসরের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের আকাশ-ব্যাপী অনল-শিখাও না। বস্তুতঃ এই হিংস-পদ্ধতি ভারতবর্ষের জিনিষই নয়,—ইহা বিদেশ হইতে আমদানী,—এখনো ভারতবর্ষের শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়া যায় নাই,—বোধ হয় কোনো দিনই যাইবে না,—ভারতবর্ষের পূর্ণ উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রযুক্ত হইলেও হিংস পদ্ধতি এবং অহিংস পদ্ধতির মধ্যে কেমন একটা দুর-পনেয় ব্যবধান আছে; লর্ড আরুইনের সহিত আলোচনায় মহাত্মার পক্ষে সেই ব্যবধান লঙ্ঘন করা সম্ভব হয় নাই; কেন-না তাঁহার অস্ত্র যে প্রেম, সমবেদনা, সত্যাগ্রহ—শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে বিশ্বের কল্যাণ-কামনা। অতি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সাধিত হইলেও অসৎকাজ সেই উদ্দেশ্যকে একটু কলুষিত না করিয়া যায় না। অন্তরে প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও মহাত্মা যে হিংসা-পন্থী রাজবন্দীদের মুক্তি দান করাইতে পারেন নাই,—এইখানেই,—তাঁহার এই মূলমন্ত্রের মধ্যেই তাহার কারণ নিহিত রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা হিংসাপন্থীদের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য: "Let them preserve their precious lives for the service of Motherland to which all will be presently called and let them give the Congress an opportunity of securing release of all other political prisoners and may be, even rescue from the gallows those who are condemned to the gallows being guilty of murder."

বস্তুতঃ বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যাটাই যদি চ ছিল গান্ধী-আরুইন সংবাদের আলোচ্য বিষয়,—মূলতঃ কিন্তু ইহার অনুপ্রেরণাটি অনেক বেশী ব্যাপক ও অনেক গভীরতর। বিজ্ঞানের কল্যাণে জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভৌগলিক ব্যবধান আর নাই, সকল জাতিই আজ ক্রমশঃই পরস্পরের সহিত নিবিড়তর সংস্পর্শে আসিতেছে। পূর্ব্ব-পশ্চিম আজ মিলিয়াছে প্রধানতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে। পূর্ব্বের প্রতিনিধি মহাত্মা আর পশ্চিমের প্রতিনিধি আরুইন এই যে দিনের পর দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গভীর নিশীথিনী পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও প্রেমের মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমের মধ্যে একটা মৈত্রীর সূচনা করিলেন,—মনে হয় যেন বিংশ শতাব্দীর নূতন বিশ্ব-রচনার বীজমন্ত্রটি এইখানেই নিহিত রহিয়াছে। তাই বলিতে ছিলাম গান্ধী-আরুইন সংবাদটি শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেই একটি স্মরণীয় ঘটনা।

জয়ন্তী উৎসব

আগামী ১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। তদুপলক্ষে শান্তি-নিকেতনে আশ্রমবাসীগণ একটি জয়ন্তী উৎসব করিবেন স্থির করিয়াছেন। এ সংবাদে বাঙালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সঙ্কল্পিত উৎসবটির পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

উৎসবটি যাহাতে যথোপযুক্ত সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য আশ্রমবাসীগণ রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনু-রাগী ব্যক্তিগণের সহায়তা পাইতে চাহেন। তদুদ্দেশ্যে সর্ব্ব-সাধারণকে সম্বোধন করিয়া বিচিত্রায় প্রকাশের জন্য তাঁহারা যে পত্রখানি আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। আশা করি এমন একটি শুভ এবং আন-ন্দের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে কেহই অবহেলা করিবেন না।

শান্তিনিকেতন

যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,

আগামী ১৩৩৮ সনের ২৫শে বৈশাখ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে তদুপলক্ষ্যে আমরা শান্তিনিকেতনে সুচারুভাবে একটি জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহাতে কবি এবং তাঁহার অনুষ্ঠানের প্রতি প্রীতিযুক্ত সহৃদয়বর্গের শুভেচ্ছা ও সহযোগ লাভ করিব, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা।

এই সময় বিশেষভাবে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক কর্ম্মী, অথবা যাঁহারা যেকোনোভাবে আশ্রমের সঙ্গে মনে মনে যোগযুক্ত, তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান ঠিকানা জানাইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

প্রাক্তন আশ্রমবাসীদের ঠিকানা, এবং জন্মোৎসব সম্পর্কে চিঠিপত্রাদি শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি,—
১৩ই ফাল্গুন ১৩৩৭ সন।

নিবেদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
শ্রীনলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীনেপালচন্দ্র রায়
শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীপ্রমোদারঞ্জন ঘোষ
শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ
শ্রীআশা অধিকারী
শ্রীহেমবালা সেন

আকবরের আমলে গ্রন্থকার-হত্যা

কাল্পনিক কাহিনী অপেক্ষাও বাস্তব ঘটনা যে অদ্ভুত নিম্নের বিবরণে তাহা প্রকট। মোগল যুগে কলাবিদ্যার উৎকর্ষও ইহাতে স্পষ্টীকৃত। সম্রাট আকবরের আমলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ভেদ-জ্ঞান ছিল না তাহারও পরিচয় ইহাতে বিদ্যমান।

"তারিখ-ই-অল্ ফি" সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত। নামের অর্থ—"আমাদের সহস্র বর্ষের ইতিহাস।" প্রকৃতই ইহা আরবীয় ও পারস্য-দেশীয় ইতিহাসের সার-সংগ্রহ। হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ৬৩২ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দের ইহা নিখুঁৎ ও সুলিখিত ইতিহাস—অতি সুন্দর বহু চিত্র সম্বলিত। মৌলিক পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ মাত্র সম্প্রতি উদ্ধার করিয়াছেন শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ। পাণ্ডুলিপি অবশ্যই পারস্য ভাষায় রচিত। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মহাফজ-উল্ হক্ এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে সম্প্রতি এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

এই মূল্যবান অথচ স্বল্প-পরিচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষে বা ইউরোপে কোথাও নাই, অথচ ইহা সম্রাট আকবরের অনুজ্ঞাক্রমে প্রণীত হইয়াছিল। নিজ পরিষদের সাতজন বিখ্যাত পণ্ডিতের হস্তে প্রথমতঃ তিনি এই গ্রন্থ রচনার ভার দেন। কিছুদিন পরে মোল্লা আমেদ নামক অপর একজন শিয়াসম্প্রদায়-ভুক্ত গ্রন্থকারের উপর ইহার সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত হয়।

মোল্লা উৎসাহের সহিত এই গুরুভার সম্পাদন করিতে থাকেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুস্তকের প্রায় হাজার পৃষ্ঠা রচনা করেন, কিন্তু বিধি বাম, ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। রাত্রিকালে কোন দুর্বৃত্ত তাঁহাকে বাড়ীতে গিয়া ডাকিল, রাজপথে আনিয়া নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিল! লাহোর সহরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে। হত্যাকারী সুন্নি-শ্রেণীভুক্ত ও ধর্ম্মোন্মত্ত। পুস্তকে বর্ণিত মতামতের সহিত লোকটার বিরোধ ছিল, ইহাই হত্যার মূল কারণ। খুনের সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইলে হত্যাকারীকে মুসলমানেরা 'গাজী' নামে অভিহিত করিল এবং যাহাতে তাহার প্রাণদণ্ড না হয় বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাজপরিষদের ওমরাহেরা ও অন্তঃপুরের মহিলারা পর্য্যন্ত সম্রাটকে নানাভাবে অনুরোধ ও উপরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, অবিলম্বে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। হত্যাকারীকে তখন হস্তীর পদতলে বাঁধিয়া

লাহোর নগরের সারা রাজপথে ঘষড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয় —তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

প্রারব্ধ ইতিহাসের বাকি অংশ রচনার ভার অতঃপর অর্পিত হয় আর একজন মনীষীর উপর। ইঁহার নাম নকীব খাঁ। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি রাজকীয় চিত্রগৃহে প্রেরিত হইলে বহুলোকে মিলিয়া ইহা নকল করে। তাহার পর চিত্রশোভিত করিবার পর্ব্ব সুরু হইল। সুদক্ষ চিত্রশিল্পীরা অতি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিলেন। শ্রীযুক্ত ঘোষের নিকট যে পুস্তকখানা রক্ষিত তাহা রাজচিত্রশালায় অঙ্কিত মৌলিক পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ। ইহার লিপিকর্ম্ম যেমন চমৎকার বর্ণবৈচিত্র্যাদিও তেমনই মনোমদ। রাজ-*পরিষদের চিত্রকরগণের শিল্পনৈপুণ্যে প্রকৃতই মুগ্ধ হইতে হয়।* কালবশে চিত্রগুলির কোন বৈলক্ষণ্য সাধিত হয় নাই। মোগল কলাকুশলতার বিশিষ্টতা উহাতে সুপরিস্ফুট।

দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপির শেষাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চিত্রকরগণের নামের তালিকা অবশ্য ঐখানেই সন্নিবিষ্ট ছিল। দপ্তরীর দোষেই তালিকা অসম্পূর্ণ। শুধু পাঁচজন চিত্রকরের নাম পরিদৃষ্ট হয়, যথা—শঙ্কর, গুজরাতী, সারোয়ান, ত্রিখিয়া, সুরদাস ও বৃহস্পৎ। মুসলমানী পাণ্ডুলিপিতে হিন্দু নামের উল্লেখে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই, কারণ সম্রাট আকবরের রাজসভায় বহু হিন্দু চিত্রকর নিযুক্ত ছিলেন—প্রকৃতপক্ষে প্রতি দশজন হিন্দু চিত্রকরের ভিতর একজন করিয়া মুসলমান। ইঁহারা মুসলমান চিত্রকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন, কিন্তু পরে দক্ষতায় গুরুকেও ছাড়াইয়া উঠেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির চিত্রকরের একত্র সম্মিলনেই চিত্রবিদ্যার পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। মোগল যুগের চিত্রকলা যুগযুগান্তর মানবচিত্তে বিস্ময় উদ্রেক করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

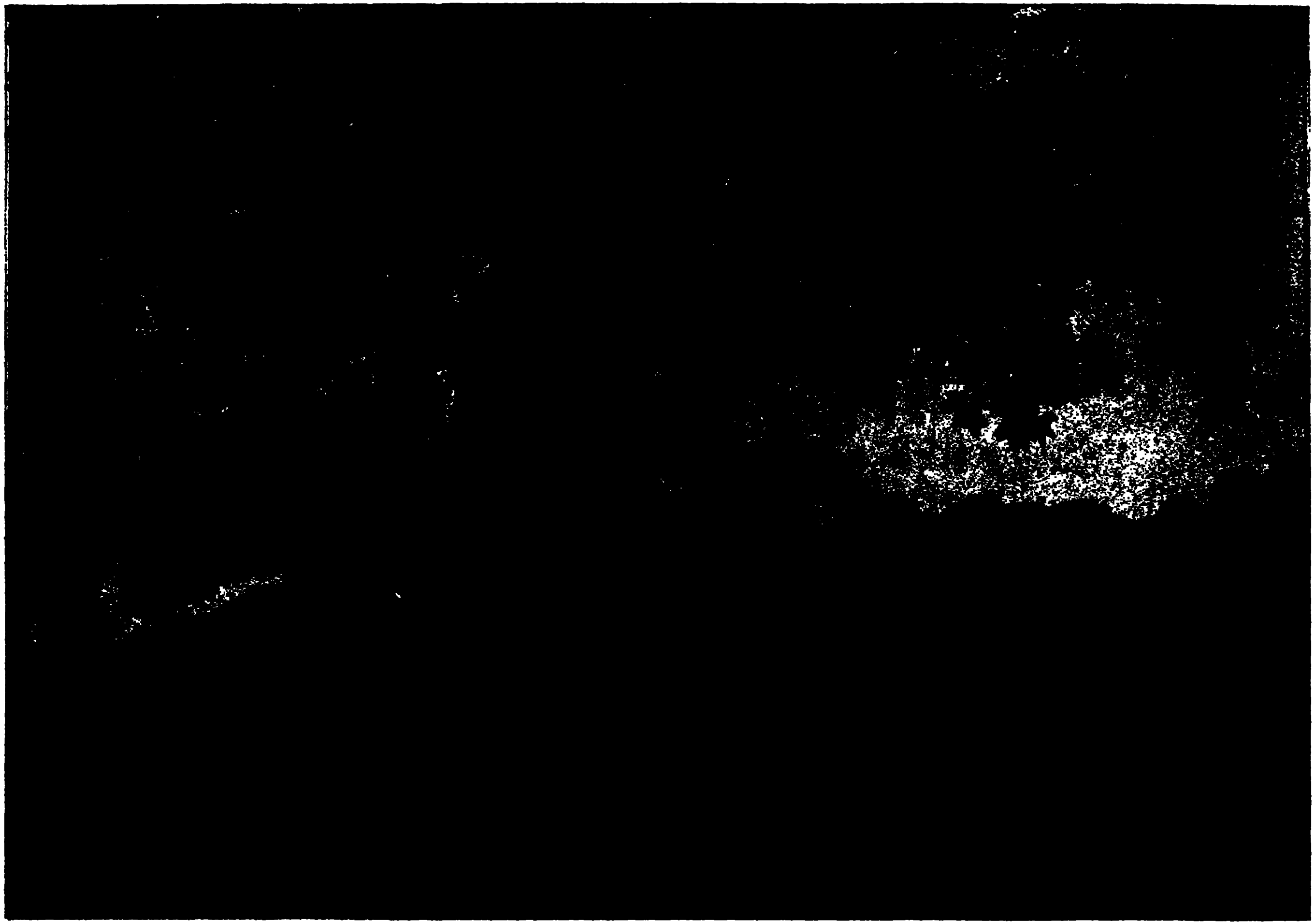
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের পঞ্চম জর্জ্জ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিযোগী ছিলেন শ্রীযুক্ত বেনেট্ট রামচন্দ্র রাও এবং দেওয়ান বাহাদুর স্যর্ ভেঙ্কটনম্ নাইডু। উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিয়া অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। গুণীর যথোচিত সম্মাননায় আমরাও সন্তুষ্ট হইয়াছি।

১৯২৭ সালে বোম্বাই সহরে Indian Philosophical Congress-এর তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ সাধারণ সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দানের জন্য ইয়োরোপ এবং আমেরিকার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক কয়েকবার আমন্ত্রিত হইয়া তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন।



Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 6A, Bhim Ghosh Lane, Calcutta.



তরুণ কবি

বিচিত্রা
চৈত্র, ১৩৩৭

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সরল উপায় আত্ম-বলের বৃদ্ধি

বিশুদ্ধ "শঙ্কর ঘৃত"

সেবন করিলে তাহা লাভ করিবেন।

কারণ

"শঙ্কর ঘৃত" রাসায়নিক পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম এবং বিশুদ্ধতায় অদ্বিতীয়।

পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করুন।

ক্রেতাগণের সুবিধার জন্য আধ মণ, দশ সের, পাঁচ সের ও আড়াই সের ওজনের টিন পাওয়া যায়।

টিনের উপর আমাদের মোহর দেখিয়া খরিদ করিবেন।

শিউনারায়ণ রামনারায়ণ এণ্ড কোং

১৪নং বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

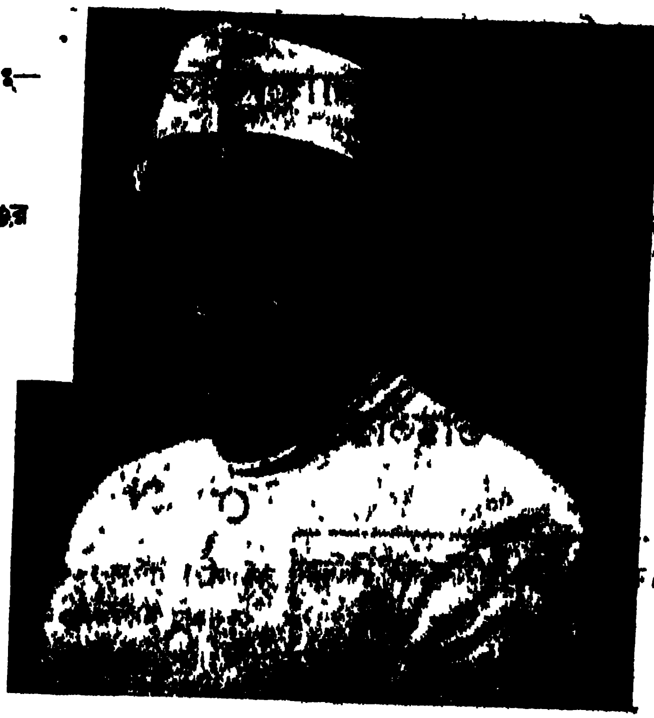
ফোন——বড়বাজার ৮০২।

ভারতের জন-নায়ক

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বলেছেন ঃ—

ভারতবর্ষে প্রস্তুত যাবতীয় সুগন্ধি
দ্রব্যের মধ্যে এইচ্, বসুর সুগন্ধিগুলি
নিঃসন্দেহে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইংলণ্ডের
ও ফরাসীদেশের উৎকৃষ্টতম
সুগন্ধিগুলির সমকক্ষ।

৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২৯। স্বাঃ মতিলাল নেহেরু।



আমরা সুবাসিত কেশতৈল, ল্যাভেণ্ডার,
অডিকোলন, হেয়ার লোশন, স্নো, ক্রিম,
সাবান, আতরিণ ও যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত
করিয়া থাকি।

এইচ্, বসু পারফিউমার

বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(স্থাপিত—১৮৮৮)

"বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট পত্র লেখার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক বিচিত্রার নাম উল্লেখ করিবেন।"

জাতির উন্নতি কিসে?

আজ আমাদের জাতীয় জীবনে সাড়া আসিয়াছে। জাতি কিসে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইয়া গৌরবময় আসন লাভ করিতে পারে উহাই আজ ভারতের মনীষিগণের বিবেচ্য। জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল জাতীয় ধন সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি অর্থাৎ—



সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কলিকাতা

মূলধন তিনকোটি টাকারও উপর
রিজার্ভ ও কণ্টিন্‌জেন্সী ৮৬ লক্ষের উপর

দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিতেই জাতির উন্নতি এবং দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উপরই এই শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি নির্ভর করে। সুতরাং দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করাই দেশ মাতৃকার প্রকৃষ্ট সেবা।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্ ই

—ভারতীয়গণ পরিচালিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান—

আমাদের "ক্যাস সার্টিফিকেট" কিনিয়া পুত্র কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হউন।

কলিকাতা অফিস ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট
বড়বাজার অফিস ৭১ নং ক্রসষ্ট্রীট
কলিকাতা।

লক্ষীর ভাণ্ডারেরই মত আমাদের "গৃহ সঞ্চয় বাক্স" আপনার পরিবারে প্রতিষ্ঠা করিয়া বার্দ্ধক্যের সংস্থান করুন।

"বিজ্ঞাপনদাতাগণের নিকট পত্র লেখার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবাসীর নাম উল্লেখ করিবেন।"

বিচিত্রা

চতুর্থ বর্ষ, ২য় খণ্ড	চৈত্র, ১৩৩৭	চতুর্থ সংখ্যা

বিদায়খনে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে
জাগার বেলা হোলো,—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো।
ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো—
বেদনা হবে পরম রমণীয়,
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়খনে খনেক তরে যদি
সজল আঁখি তোলো॥

নিমেষহারা এ শুকতারা
এমনি উষাকালে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশভালে।
রজনী শেষে এই যে শেষ কাঁদা
বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা,
হারানো মণি স্বপনে গাঁথা র'বে,
হে বিরহী, আপন হাতে তবে
বিদায় দ্বার খোলো॥

সমালোচনার ধারা

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্র]

কল্যাণীয়েষু,

সত্যেন্দ্র, তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের রসের কারবার বড় ছোট। নিতান্ত মুদির দোকানের ব্যাপার। ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙার বন্দোবস্ত। সমালোচনার ভঙ্গী দেখলেই সেটি বোঝা যায়—নিতান্ত গেঁয়ো রকমের। সমালোচকেরা সাহিত্য-কারবারীদের মুচ্ছদ্দি—তাদের নিজের পুঁজি-পাটা থাকা চাই, এবং জগতের বাজার যাচাই করবার মতো অভিজ্ঞতা ও শক্তি না থাক্‌লে তাদের চলে না। আমাদের মূলধন কেবল, আমার কি ভাল লাগে এবং না লাগে সেইটুকু। সে-টুকুর মূল্য কেবলমাত্র আমার ঘরের পাঁচ দশ জনের কাছে, কিন্তু বড় বাজারে সে টাকা একেবারেই চলে না—এই দৈন্যটি বোঝবার পর্য্যন্ত শক্তি আমাদের নেই।

তাই ত আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বল্‌চি, মাঝে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাব না কেন?—কাব্যকে সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন? যে কবি সেই ত দ্রষ্টা এবং অন্যকে দেখিয়ে দেবার ভার ত তারই। —প্রভৃতি কাগজের সমালোচনা দেখলে আমার বড় কষ্ট বোধ হয়। এ সমালোচনা ত সাহিত্য-পথের মশাল নয়, এ কেবল চক্‌মকি ঠোকা—ছোট্ট ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ কিন্তু তার খটাখট্ শব্দটাই বেশি। এতে কি পথিকদের কোনো সুবিধা হয়? ইতি, ২ মাঘ, ১৩১৯।

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



অনির্ব্বাচন

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়

যাহা আছে রেখে যাই, বাছিতে সময় নাই,
বুঝিনা জমেছে গীত যত ;
কি যে তার দামী, কি যে খেলো,
কি যে শুধু কথা এলোমেলো,
কতটুকু প্রাণহীন কতটুকু বাঁচিবার মতো।

আছে কিছু চিরন্তন সর্ব্বদেশে কালে
মানব প্রাণের অন্তরালে,—
কখনো ধ্বনিয়া উঠে ছন্দে আর সুরে
শুনিতেই স্বতঃ প্রাণে প্রতিধ্বনি জাগে,
জানে যাহা জানে নাই আগে,
আঁধার আলোকে যায় পূরে।

সেইটুকু অজানার চাবি,
সেটুকুতে সকলেরি দাবী ;
নিজস্বতা কারো তাতে নাই।
যদি মোর কোনো ক্ষুদ্র গীতে
প'শে তাহা থাকে কোনো চিতে,
সব-কটা তাই রেখে যাই।

আমার ভাষণ

আমার ভাষণ যদি না লাগে মধুর,
আমার গানেতে যদি নাহি পায় সুর,
পদ্যে মোর নাহি পায় পদের ঝঙ্কার,
অনুপ্রাসহীন গদ্য রিক্ত-অলঙ্কার
যদি লাগে, সেই ভয়ে নব ছন্দে লেখা
নহে চেষ্টা। এ বয়সে যায় কিছু শেখা ?
যে কথা এসেছে মনে লিখিয়াছি সোজা
মনের সহজ সুরে ; শব্দ বোঝা বোঝা
করি নাই স্তূপাকার ; মিলের সন্ধানে
ভাবে করি নাই শ্রান্ত দীর্ঘ-পদ টানে।

কাহারো লেগেছে ভালো সেই সোজা সুর
করুণ, নিভৃত-ব্যথা করিয়াছে দূর
সমবেদনার রসে। তার বেশি কিছু
ছিলনা প্রত্যাশা কভু। জনতার পিছু
ছুটি নাই যশোলুব্ধ। আড়ালে বিজনে
যা পেয়েছি—আশা তারো ছিলনা ত মনে।
যা পেয়েছি নম্র শিরে লয়েছি তুলিয়া
দূরাগত শ্রদ্ধা প্রীতি বেদনা ভুলিয়া।

খেয়া

শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র মিত্র এম্-এ, ডি-লিট্

খেয়ার কবিতাগুলো পড়তে পড়তে একটা কথা আমার কেবলই মনে হ'য়েছে,—যে আজ পর্য্যন্ত কোনো কবিতা-সঙ্কলনের বইএর নামকরণ বোধ হয় এর চেয়ে বেশী সার্থক হয়নি। টম্সনের বইখানাতে দেখলাম যে কবি নাকি কোনো সময়ে তাঁকে বলেছিলেন,—"বোধ করি তখন মৃত্যু ও পার হওয়ার চিন্তা আমার মনকে পেয়ে বসেছিল,—তাই হয়ত বইখানার নাম দিয়েছিলাম 'খেয়া।'" টম্সন সাহেব কিন্তু কবির মুখে এই কথাটি শুনেও যে খেয়ার কবিতাগুলির ভিতরকার সুরটি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন,—এমন কোনো প্রমাণ তাঁর বইয়ে দিতে পারেন নি। অবশ্য এ কথা স্বীকার করি,—যে খেয়ার অন্তর্নিহিত সুরটি ঠিক ধরতে পারা নিতান্ত সহজ নয়; তার কারণ মনের যে-অবস্থায় খেয়ার কবিতাগুলো লেখা,—কোনো সাধারণ মানুষের মনের সে রকম অবস্থা হয়-ই না। কবির মন তখন পাড়ি দিয়েছিল, এক জগৎ থেকে আর এক জগতে। এই উধাও-হওয়া মনের যে পরিচয় খেয়ার পাতায় পাতায় পাই,—তার নাগাল পাওয়া যে কঠিন হ'বে,—তা' কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়; কেন-না উধাও হ'য়ে কবি যে জগতে গিয়ে উঠ্লেন,—সেই গীতাঞ্জলির জগৎ,—সেখানে আজ পর্য্যন্ত আর কোনো কবি যেতে পেরেছেন ব'লে ত জানি নে।

'খেয়ায়' প্রথম কবিতা থেকেই বোঝা যায় যে শুধু যে একটা পার-হওয়ার চিন্তা তখন কবির মনকে পেয়ে বসেছিল,—তা-নয়', তখন তাঁর মন সত্য সত্যই একটা ঘুমের দেশের মায়ায় ভুলে' পাড়ি দিয়েছিল:

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোম্টা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ও পারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।

তাই কাজ ভাঙ্ল। কণিকার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে কবি যে কর্ম্ম-জগতের পথে চল্ছিলেন, সে পথেও আর চলা হ'ল না। তাঁকে নূতন পথ ধরতে হ'ল। এ পথ যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে,—তাও জানা নেই,—শুধু পথই তার বিচিত্র সৌন্দর্য্য নিয়ে তাঁকে বারবার ডাক দিতে লাগল।

দিনে কতবার ক'রে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোত-কূজন করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে—
আমি বাহির হইব বলে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।
তাই কানাকানি পাতায় পাতায়—
কালো লহরীর মাথায় মাথায়
চঞ্চল আলো দোলে।

আগেই বলেছি,—এ পথে আর কেউ কোনদিন চলে নি; এ যেন কোন্ মায়াপুরীর পথ,—আলো-ছায়ার চিত্রণে অপরূপ, গন্ধে আমোদিত, পাখীর গানে, বাঁশীর তানে, পল্লবের মর্ম্মরে মুখরিত। তবুও এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় কবি নিঃসঙ্গ। তাঁর সঙ্গীদের ছেড়ে দিয়ে তিনি পিছিয়ে পড়ে' এই নূতন পথ ধরেছেন। তাই দেখতে পাই প্রথমটায় একটা অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ও বেদনায় কবির মন একটু অবসন্ন।

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নহে পারেও নহে যেজন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তা'রে!

ফুলের বাহার নাইক যাহার, ফসল যাহার ফল্‌ল না,
অশ্রু যাহার ফেল্‌তে হাসি পায়;
দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁজের আলো জ্বল্‌ল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায়!

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্ম্ম-কোলাহল থেকে কবি এখন বিদায় নিয়েছেন। 'নানা দিনের নানা পথিক চলা, আঁকা বাঁকা রাঙা মাটির লেখা, ঘরছাড়া ঐ নানাদেশের পথে' কবি অনেক দূর চলে এসেছিলেন,—ভেবেছিলেন, পথের বাঁকে বাঁকে নব নব ভাগ্য বুঝি তাঁকে ডাকবে,—হঠাৎ যেন কাকে দেখতে পাবেন, নূতন সুর শুনতে পাবেন; কিন্তু তা' ত হ'ল না। ফসল ফল্‌বার আগেই তাঁর দিনের আলো ফুরালো,—সাজের আলো জ্বল্‌ল না,—তাই—

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটা পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।

খেয়ার তরী ভাস্‌ল। আর সঙ্গে সঙ্গে এই অবসাদটুকুও কেটে গেল। চারদিকে কোথাও কোন কূল দেখা যাচ্চে না। তবুও প্রাণের মধ্যে একটা অকারণ আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্চে। মনে হ'চ্চে যেন সেই বহুদিনের আকাঙ্খিত,—সেই বারে বারে পাওয়া আবার বারে বারে হারাণো,—সেই চিরন্তন অথচ চির-নবীন 'এক'টীকে আবার ফিরে পাওয়া যাবে;—সেই অজানার সঙ্গে আবার বুঝি মিলন হ'বে,—গোধূলি-লগন বুঝি কাছে এসেছে:

আমার গোধূলি-লগন এলো বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হ'য়ে আসে
সোনার গগন রে।
শেষ ক'রে দিল পাখী গান গাওয়া,
নদীর উপরে পড়ে' এলো হাওয়া,
ও পারের তীর ভাঙা মন্দির
আঁধারে মগন রে।
আসিছে মধুর ঝিল্লি-নূপুরে
গোধূলি লগন রে।

এই গোধূলি-লগনে যাত্রা সুরু হ'ল যে-অজানার দিকে, খেয়ার মধ্যে তার একটা আভাসমাত্র আছে,—তার জন্য অপরিসীম ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু তার সঙ্গে কবির নিবিড় পরিচয় নাই। খেয়ায় শুধু—

বারে বারে ঘুরে ঘুরে
মৌমাছিদের গুঞ্জ সুরে
কার চরণের নৃত্য যেন
ফিরে আমার বুকের মাঝে।
রক্তে আমার তালে তালে
রিমি ঝিমি নূপুর বাজে।
ঘন মহুল শাখার মত
নিশ্বাসিয়া উঠেছে প্রাণ,
গায়ে আমার লেগেছে কার
এলোচুলের সুদূর ঘ্রাণ।
আজি রোদের প্রখর তাপে
বাঁধের জলে আলো কাঁপে,
বাতাস বাজে মর্ম্মরিয়া
সারি-বাঁধা তালের বনে।
আমার মনের মরীচিকা
আকাশপারে পড়্‌ল লিখা,
লক্ষ্যবিহীন দূরের পরে
চেয়ে আছি আপন মনে।

"সমুদ্রে" কবিতাটি পড়্‌লেই কবির এই পাড়ি-দেওয়া মনের অবস্থাটা যে ঠিক কী রকম, তা আরো স্পষ্ট করে বোঝা যাবে:

সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন
ভাসিয়ে দিলেম নৌকাখানি,

কোথায় আমায় যেতে হবে
সে-কথা কি কিছুই জানি?
শুধু শিকল দিলেম খুলে,
শুধু নিশান দিলাম তুলে,
টানি নি দাঁড়, ধরি নি হাল,
ভেসে গেলেম স্রোতের মুখে;
* * * *
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
মুখে আমার রইল চেয়ে,
সিন্ধু-শকুন উড়ে গেল
কূলে আপন কুলায় পানে।
দুলুক্ তরী ঢেউয়ের পরে
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ।
গাওরে আজি নিশীথরাতে
অকূল-পাড়ির আনন্দ-গান।
যাক্ না মুছে তটের রেখা,
নাই বা কিছু গেল দেখা
অতল বারি দিক্ না সাড়া
বাঁধনহারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লওরে বুকে দু'হাত মেলি
অন্তবিহীন অজানাকে।

এই অকূল-পাড়ির আনন্দ-গানই হ'ল খেয়া-কাব্যের মূল সুর। কবির মন এখন এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উঠে আসছে। স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্ত্তী যে সর্ব্বানুভূতিকে রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর বলে নির্দ্দেশ করেছেন, সেই সর্ব্বানুভূতিই এখন চিত্রা-সোনারতরী-যুগের ভোগের আনন্দ ও সৌন্দর্য্যকে ছেড়ে দিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে একটা কঠোর ত্যাগের মন্ত্রে আপনাকে সমৃদ্ধতর করে একটা গভীর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আপনার পরিণতি অন্বেষণ করছে। কবির মনের এই চরম পরিণতির পরিচয় আমরা পাই,—গীতাঞ্জলি ও তার পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে; 'খেয়া'র মধ্যে দেখি, এই পরিণতির প্রক্রিয়াটুকু,—দেখ্‌তে পাই কেমন করে কোন্ দিক দিয়ে কবির মন অগ্রসর হ'চ্ছে। তাই খেয়ার মধ্যে আমরা শুনতে পাই মোটামুটি তিনটে বিভিন্ন সুর। প্রথম সুর হচ্ছে, নৈবেদ্যের রুদ্র সুরের একটা মোলায়েম রেশ,—দ্বিতীয় সুর হ'চ্ছে, কোলাহল-মুখরিত কর্ম্ম-জগতের নিকট ক্ষোভে ও সান্ত্বনায় মেশানো একটা বিদায়ের বাণী, আর তৃতীয় সুর হ'চ্ছে, এই অকূল-পাড়ির একটা আনন্দ-গান—অন্তর্বিহীন অজানাকে যেন কখনো পাওয়া যাচ্ছে, কখনো যাচ্ছে না,—কবির মন যেন মাঝে মাঝে তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না,—এই রকম মনোভাবের একটা আনন্দ-বেদনা-মিশ্রিত আভাস। এই তিনটে সুরই কিন্তু বাজ্‌ছে একই তারে, উঠ্‌ছে একই জায়গা থেকে,—কবির মনের সেই অন্তরতম কোণ থেকে যেখানে তাঁর জীবনদেবতা আপনাকে গোপন রেখে কবির বীণার তারে বিশ্বমানবের জীবনের সমস্ত বিচিত্র সুরগুলিই বাজিয়ে বাজিয়ে একটা বিরাট ঐক্যতানের সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-কাব্য সমগ্রভাবে যিনিই অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন, তিনিই জানেন যে এ একটা পরিপূর্ণ, গম্ভীর, দিগন্ত-ঝঙ্কৃত ঐক্যতান;—তার মধ্যে মানুষের প্রাণের সমস্ত সুরগুলিই সমান আকুলতায় বেজেছে। ভোগ ও ত্যাগ, মিলন ও বিরহ, আসক্তি ও অনাসক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও পরিতৃপ্তি, আনন্দ ও বেদনা, জীবন ও মরণ, অনন্ত ও সান্ত, চিরন্তন ও ক্ষণিক, মুক্তি ও বন্ধন সমস্তই বিচিত্র সুরে, বাধাহীন ছন্দের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ভিতর রবীন্দ্র-সাহিত্যে এসে মিলিত হ'য়েছে। এ সব কথার বিস্তৃত আলোচনা করা অবশ্য আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখন তার সময়ও নেই;—এবং এখানে তার জায়গাও নেই। আমার উদ্দেশ্য—এইমাত্র 'খেয়া'-কাব্যের মধ্যে যে তিনটে সুরের উল্লেখ করলাম, সেই তিনটে সুর কেমন ক'রে কবির বীণার তারে বাজ্‌তে বাজ্‌তে তাঁকে নিয়ে গিয়ে তুলল গীতাঞ্জলির জগতে,—তারই একটু আলোচনা করা; এবং সেই উদ্দেশ্যেই সেই সুরগুলির আদি উৎস যে কতখানি সমৃদ্ধ, তার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একটু প্রয়োজন মনে করলাম।

নৈবেদ্যের মধ্যে দেখ্‌তে পাই, কবির বীণার তার খুব চড়া সুরে বাঁধা। শিলাইদার প্রকৃতির ক্রোড়ে সেই শান্তিময় দিনগুলিতে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো অভিজ্ঞতাগুলির ভিতর মহান্‌ অসীমকে অনুভব করে কবি যে অপূর্ব্ব জগৎ রচনা করেছিলেন, এখন সেখান থেকে চলে এসেছেন। তখন বীণার তারে যে কোমল সুর বাজত, এখন আর তা' বাজে না। শিলাইদা থেকে একখানা চিঠিতে কবি লিখেছিলেন,—"সন্ধ্যাবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সাম্‌নে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দ্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন মানুষটির মতো নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আসে যে আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীররেখা পর্য্যন্ত সমস্তটি একটি নিভৃত গোপন গৃহের মত হ'য়ে ঘিরে দাঁড়ায়—* * * এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশুপক্ষী প্রাণী আমাদের অন্তর্গত হ'য়ে যায়—কানে জলের কলশব্দ আস্‌তে থাকে, মুখের উপর মাথার উপর জ্যোৎস্নার শুভ্র হস্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, আকাশে চকোর পাখী ডেকে চ'লে যায়, জেলের নৌকো পদ্মার মাঝখানে খরস্রোতের উপর দিয়ে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে পিছলে বহে যেতে থাকে, আকাশ-ব্যাপী স্নিগ্ধ রাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ ক'রে ধীরে ধীরে উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়—চোখ বুজে কান পেতে দেহ প্রসারিত ক'রে প্রকৃতির একমাত্র যত্নের জিনিসের মত পড়ে থাকি. তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে।" নৈবেদ্যের মধ্যে আর এ সুর নেই। এখন কবি বল্‌ছেন,—

আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হ'য়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে,—
কোনো দুঃখ নাহি। পল্লী হ'তে রাজপুরে
এবার এনেছে মোরে—দাও চিত্তে বল!
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল!

কর্ম্মী এখন কবির উপর টেক্কা দিয়েছে। কবির বীণা এখন রুদ্রসুরে কর্ম্মের জয়গানে ব্যস্ত। এখন আর চোখ বুজে, কান পেতে প্রকৃতির সহস্র সহচরীর সেবা-উপভোগ নয়; এখন আগুয়ান হওয়া চাই; অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অপমানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া চাই: কা'কেও ভয় ভয় নেই,—ত্যাগের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে,—এক অনন্ত সত্যের মধ্যে আবার আপনাকে ফিরে পাওয়া,—এইটেই এখন কবির আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি বলছেন,—

"রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র! তুমি যার বিরাজ অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়",—* * *

মৃত্যুভয়ই বা কারজন্য?

"দু'দিনের প্রাণ
লুপ্ত হ'লে তখনি কি ফুরাইবে দান
এত প্রাণদৈন্য প্রভু ভাণ্ডারেতে তব!
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব?
কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার?
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার!"

এখানেও সেই সর্ব্বানুভূতি! নৈবেদ্যের পাতায় পাতায় দেখি কর্ম্ম-জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে কবির এই সর্ব্বানুভূতিতে একটা নূতন রঙ লাগ্‌ছে; তাকে বলা যেতে পারে নীতিধর্ম্মের রঙ। এই সর্ব্বানুভূতি এখন intellectual ও æsthetic স্তর থেকে নৈতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়ে আপনাকে আরও বিশালতর ও সমৃদ্ধতর করে ক্রমশঃ একটা গভীরতর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে প্রবেশ করছে। নৈবেদ্যের মধ্যেই এই আধ্যাত্মিকতার সূচনা আছে,—পরিণতি গীতাঞ্জলিতে। মাঝখানকার মনোভাবগুলি 'খেয়া'র মধ্যে আত্ম-নিবেদন করেছে।

কিন্তু কবির এই যে সর্ব্বানুভূতি, রাজনীতির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে এর স্থান সঙ্কুলান হ'বে কেন? অথচ শিলাইদার প্রকৃতির ক্রোড়ে সেই ভোগের জীবনেও কবির হৃদয় আর তুষ্ট থাকৃতে পারছিল না। জীবনের একটা দিক যেন অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। সর্ব্বকে অনুভব করবার জন্য কবির অন্তরে যে দুর্নিবার ঝোঁক,—সেই ঝোঁকই কবিকে ঠেলা দিতে লাগল,—কর্ম্মের ক্ষেত্রে আপনাকে ত্যাগ ক'রে, সর্ব্বের

মধ্যেই আবার আপনাকে ফিরে পাবার জন্য। তাই কবি কর্মক্ষেত্রে নাম্‌লেন। এবং নাম্‌তেই যা' অবশ্যম্ভাবী তাই ঘট্‌ল। তাঁর সর্ব্বানুভূতিতে লাগ্‌ল নীতিধর্ম্মের রঙ। তার ফলে তাঁর অন্তরের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল,—তা' আর রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে তাঁকে টিঁক্‌তে দিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, যখন কোলাহল আর সংঘর্ষের মধ্যে ক্রমাগতই উঠ্‌তে লাগ্‌ল ঘৃণার বিষ, তখন নীতিধর্ম্মের প্রভাবে সর্ব্বানুভূতির ভিতর দিয়া কবির অন্তরে জাগতে লাগল ঠিক তার উল্টো মনোভাব,—বিশ্ব-প্রেমের অমৃত। তাই তাঁর অন্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হ'তে লাগল যে বিশ্বমানবের মহা-মিলনের বাণী,—তার সুর তাঁর চারদিকের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশ খেল না। 'খেয়া'র মধ্যে দেখতে পাই এই অসঙ্গতি কবিকে কী রকম পীড়া দিচ্ছে :—

"আমার এই যে নূতন-গড়া
নূতন-বাঁধা তার
নূতন সুরে করতে সে যায়
সৃষ্টি আপনার।
মেশে না তাই চারিদিকের
সহজ সমীরণে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
স্তব্ধ আলোর সনে।

জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে,
যত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে।
ঘটিয়ে তুলি কত কি যে
বুঝি না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অনায়াসে
হয় না সুরের মিল।

কবি এখনও জানেন না যে তাঁর এই নূতন-বাঁধা তার কী বিরাট সৃষ্টি করতে চলেছে। সে-সৃষ্টির বেদনা প্রাণের মধ্যে আরম্ভ হ'য়েছে,—কিন্তু তার কোনো বিশিষ্ট আকার এখনো প্রাণের মধ্যে পরিস্ফুট হয় নি, তাই এই আক্ষেপ। তার একটা অস্পষ্ট রূপ মধ্যে মধ্যে যেন প্রাণের ভিতর ভেসে উঠছে,—তাই তাঁর আনন্দও যেমন অকারণ উচ্ছ্বসিত, ব্যাকুলতাও তেমনি গভীর।

পাছে দেখি তুমি আস নি, তাই
আধেক আঁখি মুদিয়ে চাই
ভয়ে চাই নে ফিরে।
আমি দেখি যেন আপন মনে
পথের শেষে দূরের বনে
আস্‌চ তুমি ধীরে।
যেন চিন্‌তে পারি সেই অশান্ত
তোমার উত্তরীয়ের প্রান্ত
ওড়ে হাওয়ার পরে।
আমি একলা ব'সে মনে গণি
শুন্‌চি তোমার পদধ্বনি
মর্ম্মরে মর্ম্মরে।
* * *
তখন মিথ্যা সত্য কেই বা জানে,
সন্দেহ আর কেই বা মানে,
ভুল যদি হয় হোক।
ওগো জানি না কি আমার হিয়া
কে ভুলাল পরশ দিয়া,
কে জুড়াল চোখ?
সেকি তখন আমি ছিলেম একা,
কেউ কি মোরে দেয় নি দেখা?
কেউ আসে নাই পিছে?
তখন আড়াল হ'তে সহাস আঁখি
আমার মুখে চায় নি না কি?
একি এমন মিছে?

এমনিতর মনের অবস্থায় যখন সঙ্গীদের ছেড়ে দিয়ে কবি সোণায় কূলের মায়ায় ভুলে নূতন পথে অকূল-পাড়ি দিলেন, তখন সেই অকূল-পাড়ির গানে, যে তিনটি সুর রয়েছে ব'লে আগেই উল্লেখ করেছি,—সেই তিনটি সুরই বেশ সহজেই

পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রাণের যে অনুপ্রেরণায় কবি একটা কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন,—সেই কর্ম্মক্ষেত্র থেকে যে আবার স'রে এলেন, তা' সেই অনুপ্রেরণার অভাবে নয়,—অন্য কারণে। তাঁর অকূল-পাড়ির পথেও তাঁর প্রাণের মধ্যে ছিল সেই অনুপ্রেরণা,—তাই 'খেয়া'র মধ্যেও তার সুর শোনা যায়। এখানেও শেষ কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে শেষ দানেতে আপনাকে বিকিয়ে দেবার কথা আছে। যে-আদর্শ তিনি মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন, কর্ম্মক্ষেত্রে সে আদর্শকে তিনি পেলেন না। রাজার দুলাল তাঁর ঘরের সমুখপথ দিয়ে স্বর্ণশিখর রথে চ'লে গেল,—তিনি তার পথের ধূলার উপর মণিহার ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন; সে হার-ছেঁড়া মণি সে কুড়িয়ে নেয় নি, রথের চাকায় তা' গুঁড়িয়ে গিয়েছে;—

"চাকার চিহ্ন পথের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা।

তাঁর আদর্শ এমনি ক'রেই যে কর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিল,—'আগমন' কবিতাটিতেও সেই আক্ষেপের সুর অস্পষ্টভাবে শোনা যায়। মহারাজ যখন এলেন, তখনো তাঁর অভ্যর্থনার কোনো আয়োজনই হয় নি:

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,
কোথায় আয়োজন!
রাজা আমার দেশে এল
কোথায় সিংহাসন!
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা!
দু-এক জনে কহে কানে—
বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্ত করে শূন্য ঘরে
কর অভ্যর্থন!

ওরে দুয়ার খুলে দে রে—
বাজা শঙ্খ বাজা

গভীর-রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা!
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা'
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখরাতের রাজা!

এ রাজা দুঃখ-রাতেরই রাজা! দুঃখের সঙ্গে কবির বেশ নিবিড় পরিচয়ই হ'য়ে গিয়েছে। মৃত্যুর দূত তাঁর দুয়ারে এসে তাঁর প্রভাত আঁধার ক'রে দিয়ে গিয়েছে। তিনি তাকে তাঁর পরাণের ধন সঁপে দিয়েছেন,—এ কথা আমরা নৈবেদ্যের মধ্যেই শুনেছি। 'খেয়া'র মধ্যেও এই দুঃখরাতের রাজার বাণী কবি আমাদের একটু শুনিয়েছেন।

"দুঃখের বেশে এসেছ ব'লে
তোমারে নাহি ডরিব হে
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় ক'রে ধরিব হে। * * *
তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে
বেদনা তাহা জানাক্ মোরে,
চা'ব না কিছু, ক'ব না কথা,
চাহিয়া র'ব বদনে হে!
নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক জল নয়নে হে!

দুঃখের এই মূর্ত্তি গীতাঞ্জলিতে কী অনির্ব্বচনীয় রস-রূপ ধারণ করেছে, সৃষ্টির গভীর বেদনার মধ্যে প্রকাশের নিবিড় আনন্দ সেখানে কেমন ক'রে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে—তা' সকলেরই জানা আছে। এই অপরূপ সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হ'য়েছিল কবির মনের যে-অবস্থায়, সেইখানথেকে 'খেয়া'র কবিতায় আরম্ভ ধরা যেতে পারে। তাই 'খেয়া'র মধ্যে আমরা যে-মনের পরিচয় পাই, সেই মনের মধ্যে তখন এমন একটা বিরাট পরিপূর্ণতা নিয়ে জেগেছিল,—যার তুলনা এ জগতে আর একটা মেলে না।

মনের এই গতিশীল অবস্থায় সহসা একদিন কবি দেখ্‌লেন,—এক রজনীর বর্ষণে কেমন ক'রে তাঁর ঘরের সরোবর ভরে উঠেছে :

নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই
ঘন নীল জল করে থই থই
কূল কথা এর, তল মেলে কই
কহ গো মোরে—
এক বরষায় সরোবর দেখ
উঠেছে ভরে! * * *
হের হের মোর আকুল অশ্রু-
সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমল কান্তি
কেমনে রাজে!
একটি মাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঢল ঢল্‌
কখন্‌ ফুটিল বল্‌ মোরে বল্‌
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিল মাঝে!
আজি একা ব'সে ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি,
দুখ-যামিনীর বুক চেরা ধন
হেরিনু এ কি!
ইহারি লাগিয়া হৃদ্‌-বিদারণ,
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন
বক্ষে লেখি!
দুখ-যামিনীর বুক চেরা ধন
হেরিনু এ কি!

শিলাইদার সেই শান্তিময় জীবন ছেড়ে জীবনের নানা স্তরের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে কবি এখন কতদূর চলে এসেছেন! বাইরের জগৎটাকে তিনি কতদিক দিয়ে দেখেছেন, কত রকমে কত রসে সেটাকে উপলব্ধি করেছেন! মনের মধ্যে সেটা কতবার ভাঙ্‌ল, চুরল,—আবার নূতন নূতন রূপে ও রঙে গড়ে উঠ্‌ল। এখন দেখ্‌লেন,—দুখ-যামিনীর এ কী বুক-চেরা ধন! কর্ম্মক্ষেত্রে ভুল ভাঙার পর সেই জগৎটা ওলট্‌ পালট্‌ হ'য়ে গিয়ে আবার তাঁর মনের মধ্যে নূতন করে গড়ে উঠছে। খেয়ার 'অনাহূত' কবিতাটির মধ্যে আমরা এই মনোভাবটিরই পরিচয় পাই। আধেক-খোলা বিজন ঘরে ঘোম্‌টা-ছায়ায় ঢাকা একলা বাতায়নে নূতন বধূর চোখের উপর স্বপন দিয়ে গড়া ছায়াময় বিশ্ব কেমন আঁকা পড়ে,—তাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে কবির মনে হ'ল—

হঠাৎ যদি
বৈশাখের এক দিন
বাতাস বহে বেগে—
লজ্জা ছেড়ে নাচে নদী
শৃঙ্খে বাঁধন হীন,
পাগল উঠে জেগে— * * *
তীব্র তড়িৎ হাসি হেসে
বজ্র ভেরীর স্বরে
তোমার ঘরে ঢুকি'
জগৎ যদি এক নিমেষে
শক্তি মূর্ত্তি ধরে'
দাঁড়ায় মুখোমুখি— * * *
তখন তোমার ঘোম্‌টা-খোলা
কালো চোখের কোণে
কাঁপে কিসের আলো,
ডুবে তোমার আপন-ভোলা
প্রাণের আন্দোলনে
সকল মন্দ ভালো।
বক্ষে তোমার আঘাত করে
উত্তাল নর্ত্তনে
রক্ত তরঙ্গিণী
অঙ্গে তোমার কী সুর তুলে
চঞ্চল কম্পনে
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।

নৈবেদ্যে যে রুদ্রসুর বেজেছিল, এই সব কবিতার মধ্যেও সেই রুদ্র সুর বাজ্‌ছে; সন্ধ্যাবেলায় যে-মালাটী সাহস ক'রে চাওয়া হয় নি,—কবি দেখলেন,—

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে' ওঠে আগুন যেন,
বজ্র হেন ভারি—
এ যে তোমার তরবারি
তরুণ আলো জান্‌লা বেয়ে
প'ড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে,
ভোরের পাখী শুধায় গেয়ে
"কী পেলি তুই নারী?"

এ দান লুকিয়ে রাখ্‌তে গেলে যে বুকে ব্যথা লাগে,—

তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান।
আজকে হ'তে জগৎ মাঝে
ছাড়ব আমি ভয়
আজ হ'তে মোর সকল কাজে
তোমার হ'বে জয়—
আমি ছাড়্‌ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর ক'রে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ ক'রে
রাখব পরাণময়,
তোমার তরবারি আমার
ক'রবে বাঁধন-ক্ষয়।
আমি ছাড়্‌ব সকল ভয়।

সকল ভয়ই ছাড়তে হ'বে। ত্যাগের মধ্যে কোনো রকম কুণ্ঠা থাকলে চল্‌বে না। নৈবেদ্যের এই বাণী 'খেয়া'র মধ্যে কবি কোমলতর অথচ অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী সুরে বাজিয়ে চলেছেন। মানুষের অন্তরের চির-জাগ্রত আদর্শ অহর্নিশি তার দাবী জানাতে থাকে; সে দাবী মেটাতে একটুও কুণ্ঠিত হ'লেই পরে তার জন্য অনুতাপ করতে হ'বে; কারণ তার জন্য আমরা যা' ত্যাগ করি,—সোণা হ'য়ে তা' আবার আমাদের কাছে ফিরে আসে। এই কথাটাই 'কৃপণ' কবিতাটিতে কবি বলেছেন। রাজাধিরাজ "আমায় কিছু দাও গো" ব'লে হাত বাড়িয়ে দিলেন,—কবি ঝুলি হ'তে তাঁকে তুলে দিলেন একটি ছোট্ট কণা। তারপরে যখন—

পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—একি
ভিক্ষা মাঝে একটি ছোটো
সোণার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ ভিখারিরে
স্বর্ণ হ'য়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে'
তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল শূন্য করে'।

'খেয়া'র মধ্যে এই সমস্ত ত্যাগের সুর যখনই বেজেছে, তখনই সেটা নৈবেদ্যের চড়া পর্দা থেকে একটু নরম পর্দায় নেমে এসেছে। নৈবেদ্যের মধ্যে দেখেছিলাম কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী কবির উপর টেক্কা দিয়েছে,—খেয়ার মধ্যে দেখি, কর্ম্মী যেন আবার একটু হ'ঠে গিয়েছে। কাজের অবসানের মধ্যে একটা অকারণ আনন্দের হিল্লোল কবির প্রাণের মধ্যে ব'য়ে যাচ্ছে। শুধু একটী বেলা খেলা করবার জন্যে কবি এখন তাঁর জীবন-দেবতার কাছে বাঁশিখানি চাইছেন; শরৎ প্রভাত বয়ে গেল, ক্লান্ত দিন শেষ হ'য়ে এল, অলস-ভরে বাঁশি-বাজা যদি সাজ হ'য়েই থাকে,—তবে ক্ষণেক তরে একটু খেলা করবার জন্যে কবির বাঁশিখানি চাই;—তারপরে—

রাতে উঠবে আধেক শশী
তারার মধ্যখানে,
চা'বে তোমার পানে।
তখন আমি কাছে আসি
ফিরিয়ে দেব' তোমার বাঁশি,

তুমি এখন বাজাবে সুর
গভীর রাতের তানে
রাতে যখন আধেক শশী
তারার মধ্যখানে
চা'বে তোমার পানে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন কর্ম্ম-জগতের মধ্যে দিয়ে এসে এখন গভীরতর হ'য়ে উঠছে। আগেই বলেছি, খেয়া-কাব্যের মধ্যে তিনটে সুর প্রধানতঃ শোনা যায়, এবং সেই তিনটে সুরই একই তারে বেজেছে। যে-হৃদয়ের তন্ত্রীতে এই তিনটে সুর বেজেছে, সে হৃদয় ভোগের আনন্দও যেমন জেনেছে, ত্যাগের মহিমাও তেমনি বুঝেছে; এখন একটা নির্লিপ্ত নিরলস অবস্থায় এই ভোগ ও ত্যাগ উভয়ের মধ্যে একটা পূর্ণতর সামঞ্জস্য ঘটিয়ে একটা গভীর আধ্যাত্মিকতায় আপনার তৃপ্তি ও আশ্রয় অন্বেষণ করছে। সৃষ্টির গভীরতম উৎস যে আনন্দ, কবির অজ্ঞাতসারেই সেই আনন্দ এখন উথ্‌লে উঠছে—ত্যাগের দুঃখের মধ্যে, ভুল-ভাঙার বেদনার মধ্যে, কাজে পিছিয়ে যাওয়ার অগৌরবের মধ্যে। আর এই আনন্দই কবির অজ্ঞাতেই তাঁকে ঠেলে দিচ্ছে, একটা অন্তবিহীন অজানার দিকে। কবির যে গতিশীল, পাড়ি-দেওয়া মনের পরিচয় আমরা 'খেয়া' কাব্যে পাই,—এই অজানিত অকারণ আনন্দই তার ভিতরকার গভীর বাণী; গীতাঞ্জলির জগতের সৃষ্টির এইটেই প্রধান উপকরণ; এইখানেই 'খেয়া'র কবিতাগুলির বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভাবের একটা নিবিড় ঐক্য আমরা খুঁজে পাই।

আগেই বলেছি,—এই পাড়ি-দেওয়া মন পার হ'য়ে তার আশ্রয়ে এসে পৌঁছে যে অমূল্য সম্পদ খুঁজে পেয়েছিল, কবি তা' আমাদের উপহার দিয়েছেন, গীতাঞ্জলি আর তার পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে। 'খেয়া'র মধ্যে আমরা যে-মনের পরিচয় পাই,—সে মন শুধু পাড়িই দিচ্ছে, অপরিচিত পথে, অজ্ঞাতের অন্ধকারের মধ্যে। তাই 'খেয়া'র কবিতাগুলোর মধ্যে অন্ধকার ও রাত্রির কল্পনা এত বেশী। কবির গোধূলি লগ্ন কাছে এসেছিল। গোধূলিতেই বুঝি তাঁর এই নূতন যাত্রা সুরু হয়েছিল।

কাব্য-জীবনের এই গভীর পরিণতি-ক্রিয়ার মধ্যে, সৃষ্টির প্রথম উৎস যে আনন্দ তাঁর অন্তরের গোপনতম কোণ থেকে শতধা বিচ্ছুরিত হ'য়ে তাঁকে কর্ম্মজগৎ থেকে বিদায় নেবার জন্য ক্রমাগতই ঠেলা মারছিল, 'নিরুদ্যম' কবিতাটিতে সেই আনন্দ কী অপরূপ রসমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে,—তা' দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। যখন সঙ্গীরা সবাই আপন মনে ব্যস্ত হ'য়ে ধেয়ে চলেছিল,—কবির মন তখন অকারণ আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে কোন্ অজানা, মায়ার-ঘেরা ঘুমের দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিল।

তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে
পাখীরা গান গেয়ে;
তখন পথের দুটি ধারে
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,
মেঘের কোণে রঙ ধরেছে
দেখিনি কেউ চেয়ে।

তাই তিনি জলের ধারে শ্যামল তৃণাসনে শুয়ে পড়লেন, আর তাঁর দলের সবাই হেসে তাঁর দিকে চেয়ে গেল, আর—

চলে' গেল উচ্চ শিরে
চাইল না কেউ পিছু ফিরে,
মিলিয়ে গেল সুদূর ছায়ায়
পথ তরুর শেষে; * * *
ওগো ধন্য তোমরা দুখের যাত্রী,
ধন্য তোমরা সবে!
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,
মগ্ন হ'লেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে—
পাখীর গানে, বাঁশীর তানে,
কম্পিত পল্লবে।
আমি মুগ্ধতনু দিলাম মেলে
বসুন্ধরার কোলে।
বাঁশের ছায়া কী কৌতুকে
নাচে আমার চক্ষে মুখে,

আমের মুকুল গন্ধে আমার
বিধুর ক'রে তোলে,
নয়ন মুদে আসে মৌমাছিদের
গুঞ্জন-কল্লোলে।
সেই রৌদ্রে ঘেরা সবুজ আরাম
মিলিয়ে এল প্রাণে।
ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হলেম পথের পরে,
ঢেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ার গন্ধে গানে ;
ধীরে ঘুমিয়ে প'লেম অবশ দেহে
কখন্ কে তা জানে।
শেষে গভীর ঘুমের মধ্য হ'তে
ফুট্‌ল যখন আঁখি,
চেয়ে দেখি, কখন্ এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়র দেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্য ঢাকি'।

এই যে চির-ঈপ্সিতের স্পর্শ কবি মাঝে মাঝে পাচ্ছেন, তাঁর কর্ম্মাবসানের মধ্যে, তাঁর ঘুমের মধ্যে—এ তাঁর মনের ব্যাকুল গতিশীলতারই পরিচয়। সচেতন মনের মধ্যে যে-আশা ক্রমাগতই যাতায়াত করতে থাকে, ঘুমের গভীর অচৈতন্যের মধ্যে তা' মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, তাই কবি বল্‌ছেন—

ওগো আমার ঘুম যে ভালো
গভীর অচেতনে,
যদি আমায় জাগায় তারি
আপন পরশনে।
ঘুমের আবেশ যেম্‌নি টুটি
দেখ্‌ব তা'রি নয়ন দুটি
মুখে আমার তা'রি হাসি
পড়্‌বে সকৌতুকে—
সে যেন মোর সুখের স্বপন
দাঁড়াবে সম্মুখে।

সে আস্‌বে মোর চোখের পরে
সকল আলোর আগে,
তাহারি রূপ মোর প্রভাতের
প্রথম হ'য়ে জাগে।
প্রথম চমক্ লাগবে সুখে
চেয়ে তারি করুণ মুখে,
চিত্ত আমার উঠবে কেঁপে
তা'র চেতনার ভরে'।

এমনিতর মনের অবস্থায় কবিকে রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে হ'ল। কাজের পথে তিনি আর ন'ন। কোন্ ফুলের গন্ধঘোরে, সৃষ্টি-ছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে তাঁর হিয়া অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল, তাই তিনি অলক্ষিতে বনচ্ছায়া-তলে পিছিয়ে যেতে চা'ন। সঙ্গীরা আজ যার পাছে ছুটেছে, সে সব তাঁর কাছে মিছে হ'য়ে গিয়েছে :

আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি।
লাগ্‌ল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে
একটি কথা পরাণ জুড়ে বাজে
"ভালোবাসি, হায়রে ভালোবাসি"।
তোমরা তবে বিদায় দেহ মোরে,
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ ক'রে।
মেঘের পথের পথিক আমি আজি,
হাওয়ার মুখে চলে' যেতেই রাজি,
অকূল-ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে।
তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে।

পরাণ জুড়ে এই যে একটা কথা কেবলই বাজ্‌ছে,—"ভালোবাসি, হায়রে ভালোবাসি",—কবি নিজেই বোধ হয় তখনো বুঝতে পারেন নি,—এ ভালোবাসাটা ঠিক কেমনতর। বোধ হয় তিনি নিজেই ঠিক জানতেন না যে এটা সেই বিশ্বপ্রেম, যা' একটা গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে নিবিড়তর হ'য়ে ক্রমেই তাঁর পৃথিবীটাকে ভৌগোলিক সীমা

অতিক্রম করিয়ে বিস্তীর্ণতর ক'রে তুলছিল, আর সেই সঙ্গে তাঁর সর্ব্বানুভূতিকে একটা উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাচ্ছিল। এই ভালোবাসাই তাঁকে সমস্ত বিশ্বের প্রতি আকর্ষণ করে, অকূল-ভাসা তরীর মাঝি করে নিয়ে কেবলই অকারণে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। অথচ কর্ম্মক্ষেত্রেও ত আয়োজন তিনি কম করেন নি। তাঁর কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের স্তব্ধ অতীতকে মুখর করে তুলেছিলেন, গানে ঘুমন্ত দেশকে আবার জাগিয়ে তুলেছিলেন, ওজস্বিনী বক্তৃতায় সমস্ত দেশের লোককে একটা নূতন উদ্যমে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন। এই সমস্ত আয়োজনের মধ্যেও যখন পরাণ জুড়ে একটা কথা কেবলি বাজতে লাগল,—"ভালোবাসি, হায়রে ভালোবাসি," যখন সেই ভালোবাসার বিশ্বমুখী আকর্ষণ তাঁকে আর সেই সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে টি'কতে দিল না, তখন তাঁকে বিদায় নি'তেই হ'ল,—কিন্তু সেই বিদায়ের বাণীর মধ্যে ক্ষোভের ও সান্ত্বনার, বেদনার ও আনন্দের, ব্যাকুলতার ও একটা নূতন অনুপ্রেরণার কী অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ!

"বিদায়-বেলা এখনি কিগো হ'বে,
পথিক, ওগো পথিক, যাবে তবে?"

অথচ পথ অনিশ্চিত ও অজানা—

"এখন এ যে গভীর ঘোর নিশা।
নদীর পারে তমাল-বনভূমি
গহন ঘন অন্ধকারে মিশা। * * *
নয়নে তব কিসের এই গ্লানি,
রক্তে তব কিসের তরলতা?
আঁধার হ'তে এসেছে নাহি জানি
তোমার প্রাণে কাহার কী বারতা?
সপ্তঋষি গগনসীমা হ'তে
কখন কী যে মন্ত্র দিল পড়ি,—
তিমির রাতি শব্দহীন স্রোতে
হৃদয়ে তব আসিল অবতরি।
বচনহারা অচেনা অদ্ভুত
তোমার কাছে পাঠাল কোন্ দূত?

এ সব কবিতা পড়লে আর কোনো কথা বলতে পারা যায় না, নীরব হ'য়ে যেতে হয়! এ কী অননুভূতপূর্ব্ব মনোভাবের কী অনায়াস, অথচ কী অতুলনীয়, অচিন্ত্যনীয়, অভাবনীয় প্রকাশ! আর বেশী কিছু বলতে চাইনে। আমার যা' বলার তা প্রায় শেষ হ'য়েছে। আর দু' একটা কথা বলেই এ প্রবন্ধ শেষ করব।

কর্ম্মজগৎ থেকে ত কবি ছুটি নিলেন, কিন্তু সেই অবসরেরও যেন একটা অকূল পাথার তিনি এখন পার হয়ে চলেছেন। 'দীঘি' কবিতাটিতেও এই সুর:

জুড়াল রে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ,
কাটল সারা দিন।
সামনে আসে বাক্যহারা স্বপ্নভরা রাত
সকল কর্ম্মহীন।
* * * *
তীরের কর্ম্ম সেরে আমি গায়ের ধুলো নিয়ে
নামি তোমার মাঝে;
এ কোন্ অশ্রুভরা গীতি ছল্‌ছলিয়ে উঠে
কানের কাছে বাজে?
ছায়া-নিচোল দিয়ে ঢাকা মরণভরা তব
বুকের আলিঙ্গন
আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাঁধা হ'তে
কাড়িল মোর মন।
শিউলিশাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকলীতে
ক্লান্ত আশার ডাক।
ম্লান ধূসর আকাশ দিয়ে দূরে কোথায় নীড়ে
উড়ে গেল কাক।
মর্ম্মরিয়া মর্ম্মরিয়া বাতাস গেল মরে'
বেণুবনের তলে,
আকাশ যেন ঘনিয়ে এল ঘুমঘোরের মতো
দীঘির কালো জলে।

তাঁর এই অনন্যসাধারণ মনোভাবের তিনি কোনো দিশে খুঁজে পাচ্ছেন না। নীড়ে বসে তিনি এতদিন আলোছায়ার বিচিত্রগান গেয়েছিলেন,—সেই গানে বনভূমির চঞ্চলপ্রাণ মিশে গিয়েছিল। কত দুপুরের গভীর ক্লান্তি, কত রাত্রির

নিবিড় শান্তি, কত প্রভাতের বিজয়-যাত্রা, কত সন্ধ্যার ম্লান মৌন, সেই বিচিত্র গানের সুরে সুরে জড়িত হ'য়েছিল। নীড়ের সেই টান,—সে যে নাড়ীর টান, তা' ত ছেঁড়বার নয়। তবুও কি আজ তাঁকে নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে, মুক্ত পরাণ ছড়িয়ে দিয়ে নীল আকাশের নির্জ্জন গান গাইতে হ'বে?

গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে,
শব্দবিহীন শূন্য পরে,
ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে
সঙ্গিবিহীন নির্ম্মমতায়
মিশে যাব অবাধ সুখে
উড়ে যাব ঊর্দ্ধমুখে
গেয়ে যাব পূর্ণসুরে
অর্থবিহীন কলকথায়?
আপন মনের পাইনে দিশা,
ভুলি শঙ্কা, হারাই তৃষা,
যখন করি বাঁধন-হারা
এই আনন্দ-অমৃত পান।

'খেয়া'র কবিতাগুলিতে এই সকরুণ মর্ম্মস্পর্শী বেদনার সঙ্গে কখনো বা সুপরিস্ফুট, কখনো বা অতি-প্রচ্ছন্ন একটা আনন্দ মিশে কী অপরূপ রসের সৃষ্টি করেছে! ছুটির অবসর তাঁর সামনে যে অকূল পাথার রচনা করেছিল,—সেই পাথার তিনি পার হ'য়ে এলেন,—এই আনন্দ-বেদনায় গঠিত তরীর উপর ভাস্‌তে ভাস্‌তে। এই পার হওয়ার মধ্যে তাঁর কখনো কখনো মনে হ'চ্চে,—তিনি কা'কে যেন পেয়েছেন অথচ ঠিক চিন্‌তে পারছেন না,—

আজ মনে হ'লো কারে পেয়েছি—কারে যে
পেয়েছি সে-কথা জানি না।
আজ কী লাগি উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সারা আকাশের আঙিনা—কিসে যে
পুরেছে শূন্য জানি না।
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে ল'য়েছে,
আলোক আমার তনুতে—কেমনে
মিলে গেছে মোর তনুতে;—
তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল
আমার অণুতে অণুতে।
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
দেহ মন মোর ফুরালো,—যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরালো,—
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো।

কিন্তু এ যেন পেয়েও না-পাওয়া। এ যেন একটা আশার আশ্বাস-বাণীর মধ্যে, সুদূরের একটা অস্পষ্ট আভাসের মধ্যে অশান্ত চঞ্চল মনের ক্ষণেকের জন্য শ্রান্তির অবসান, একটা পুলকময় বিরতি। যে-জগতের পানে কবি তাঁর খেয়ার তরী ভাসিয়েছেন, সেখানে এখনো এসে পৌঁছন নি; শুধু দূর থেকে মাঝে মাঝে তার একটা অস্পষ্ট আভাস পাচ্চেন। তাই সেই আভাসটুকুই তাঁকে আবার চঞ্চল করে তুলছে:

সন্ধ্যাবেলা তুই কি কারো
লিখন পেয়েছিলি?
বুকের কাছে লুকিয়ে রেখে
শান্তি হারাইলি?
নাচে রে তাই রক্ত নাচে
সকল দেহ মাঝে,
বাজে রে তাই কী কথা তোর
পাঁজর জুড়ে বাজে।
আজিকে এই খণ্ড চাঁদের
ক্ষীণ আলোকের পরে
ব্যাকুল হ'য়ে অশান্তপ্রাণ
আঘাত করে মোরে।
কী লুকিয়ে আছে ওরে,
কী রেখেছে ঢেকে,
কিসের কাঁপন কিসের আভাস
পাই যে থেকে থেকে?

কখনো মনে হয়,—

আমাকে আজ কে খুঁজেছে
পথের থেকে চেয়ে ?
জলের বিন্দু পড়ছে রে তার
অলক বেয়ে বেয়ে।
মল্লারেতে মীড় মিলায়ে
বাজে আমার প্রাণ
দুয়ার হ'তে কে ফিরেছে
না গেয়ে তা'র গান ?

*　　　*　　　*

ওরে আজি বহুদূরের
বহুদিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর
ছুটেছে কোন্ খানে ?
হারিয়ে যাওয়ার ছায়াবনে,
ভুলে যাওয়ার দেশে
সকল গড়া সকল ভাঙা
সকল গানের শেষে।
কাজল মেঘে ঘনিয়ে ওঠে
সকল ব্যাকুলতা
এলোমেলো হাওয়ার ওড়ে
এলো মেলো কথা।
দুলচে দূরে বনের শাখা,
বৃষ্টি পড়ে বেগে,
মেঘের ফাঁকে কোন্ অশান্ত
উঠিস্ জেগে জেগে ?

এই অকূল-পাড়ির তরী এসে যখন কূলে ভিড়্‌ল,—তখন কবির বীণা অন্য সুরে বাজ্‌ত লাগ্‌ল। তখন কবির গহন ঘোর অন্ধকার নিশা কেটে গিয়েছে, তাই—

রইল না আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগৎ পানে,
হৃদয় শতদলের সকল
দলগুলি এই ফুটল রে !

তখন কবি বল্‌ছেন,—

তুমি　এসেছ আজ ভুবনে,
তাই　রব উঠেছে ভবনে।

*　　　*　　　*

আমার　ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া
এলে আমার জীবনে।

গীতাঞ্জলির এই যে জগৎ,—তা' একটা কিছু অসাধারণ অতিমানুষিক জগৎ নয়,—সেটা এই চিরকালের সাধারণ মানুষেরই জগৎ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে তাঁর হাসি দিয়ে, কান্না দিয়ে, সুখ দুঃখ দিয়ে, আনন্দ-বেদনা দিয়ে অপরূপ ক'রে গড়ে তুলেছেন। তাই সেখানে তাঁর আনন্দ-বেদনায় মিলে রচিত হ'য়েছে একটা অনির্ব্বচনীয় নিবিড় গম্ভীর শান্তি; কিন্তু তাঁর অচেতন মনের মধ্যে যখন এই অত্যাশ্চর্য্য রচনা-ক্রিয়া চল্‌ছিল, তখন তাঁর জীবনের সেই সব হাসি-কান্না, সেই সব সুখ-দুঃখ সেই সব আনন্দ-বেদনাই ভিতর থেকে তাঁকে কেবলই নিদারুণ ঠেলা মারছিল। তাই 'খেয়া'র কবিতাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা বিরাট্ গঠন-ক্রিয়ার হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি,—একটা অশান্ত আলোড়ন। এমন অনন্যসাধারণ মনোভাব নিয়ে, আজ পর্য্যন্ত কোনো কবি এমন সম্পূর্ণভাবে, আপনাকে কোথাও একটুও গোপন না রেখে,—এমন নিখুঁত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আত্মপরিচয় দিয়েছেন বলে ত জানি নে।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র।

জাতীয় গ্রন্থাগার পঠিত

বাউলের ভিক্ষা

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশ গুপ্ত এম্-এ, বার-এ্যাট-ল

চরিত্র-পরিচয়

গণদেব ঠাকুর	পুরোহিত
রামদাস বাউল	
চিত্রসেনা	পুরোহিতের কন্যা
উদয়	প্রহরীদ্বয়
পুষ্পনাথ	প্রহরীদ্বয়
রাজা	
জয়ন্ত	সেনাপতি

এক

প্রকৃতি-পরিচয় :— বসন্ত-পূর্ণিমা। চন্দ্রালোকের মায়া-স্পর্শে সমস্ত জগৎ মন্ত্রমুগ্ধ।

দৃশ্য-পরিচয় :— কনকপুরে মহাদেব কনকেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণ। মন্দিরের সোপানে পুরোহিত গণদেব বিষণ্ণমুখে উপবিষ্ট। মন্দির অন্ধকার। একটীও প্রদীপ জ্বালা হয় নি।

রামদাস বাউল মন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'য়ে এল।

বাউল

জয় দেবাদিদেব মহাদেব কনকেশ্বরের জয়। নমঃ শিব শম্ভু, শিবশম্ভু, শিবশম্ভু। এ কি! পুরোহিত গণদেব ঠাকুর! আপনি একাকী বিষণ্ণমুখে মন্দির-সোপানে উপবিষ্ট কেন? আজ বসন্ত-পূর্ণিমা অথচ মন্দির অন্ধকার। একি! (প্রণাম)

পুরোহিত

কে? রামদাস? কল্যাণমস্তু। শোন নি বুঝি? জানো না বুঝি কিছু?

রামদাস

না। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। বছরের এই একটি দিন—পঁচিশ ক্রোশ পথ হেঁটে আসি, কনকেশ্বরের প্রাঙ্গণে বসন্ত-পূর্ণিমার মেলা দেখতে। কিন্তু এ কি?

পুরোহিত

মেলা দেখতে চাও? আরও একটু এগিয়ে যাও। ঐ যে দূরে—আলোকরশ্মি উঠেছে, আপন গর্ব্বে এই পৃথিবীটাকে অস্বীকার করে হাত তুলেছে আকাশের পানে—ঐখানে মেলা বসেছে। এখানে নয়।

রামদাস

এর মানে কি? কনকেশ্বরের প্রাঙ্গণে বসন্ত-পূর্ণিমার মেলা যে আদিযুগ থেকে চলে আস্‌ছে—বিশ্ববিখ্যাত। এ বছর বন্ধ হ'ল কেন?

পুরোহিত

রাজার খেয়াল! রাজা যখন আপন গর্ব্বে ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন, তখন ভগবান সে অস্বীকারও বুঝি মেনে নেন—রাজার গৌরব অক্ষুন্ন রাখতে। নিজের রূপ তখন তিনি অন্ধকারেই লুকিয়ে রাখেন। তাই আজ বসন্ত-পূর্ণিমায় এ মন্দির অন্ধকার।

রামদাস

রাজার খেয়াল! রাজার এ অদ্ভুত খেয়ালের অর্থ কি?

পুরোহিত

জান রামদাস—কনকপুরের রাজা কনকেশ্বরে অস্বীকার করেছেন।

রামদাস

অস্বীকার করেছেন?

পুরোহিত

হ্যাঁ অস্বীকার করেছেন। সমস্ত নগরে নগরে, গ্রামে

গ্রামে ঘোষণা করেছেন যে, কনকেশ্বরের মন্দিরে পূজা আরতি সব বন্ধ। ঘোষণা করেছেন—যে রাজাদেশ লঙ্ঘন করবে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। নগরের অপর প্রান্তে নূতন মন্দির স্থাপন করেছেন, নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন; এ বছর মেলা বসিয়েছেন সেইখানে।

রামদাস

অদ্ভুত! কেন—পুরোহিত, কেন?

পুরোহিত

জানি না।

রামদাস

আশ্চর্য্য! এক বৎসরের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন! মনে আছে ত ঠাকুর, গত বৎসর এই দিনে রাজকন্যা চন্দ্রলেখা ও আপনার কন্যা চিত্রসেনা একসঙ্গে আরতির নৃত্যে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে কী পুলকের সৃষ্টি করেছিল? যেন সমস্ত বসন্ত-পূর্ণিমার বিস্ময় ছড়ান রূপ তারা কুড়িয়ে এনে নিবেদন করেছিল কনকেশ্বরের শ্রীচরণে—তাদের নৃত্যে, তাদের গানে, তাদের অঙ্গ-ভঙ্গিমায়। সমস্ত মেলার লোকের চোখে যে কী বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, সে ত আমার আজও মনে আছে। রাজার চোখ দুটো ত আজও ভুলি নি, যখন তিনি একদৃষ্টে চেয়েছিলেন নিজের কন্যার পানে। ভুলি নি ত! তাই ত এ বছর আবার ছুটে এসেছি।

পুরোহিত

সব শেষ হয়ে গেছে—আর দেখতে পাবে না।

রামদাস

কিন্তু রাজকন্যা চন্দ্রলেখা? তিনি ত কিছুতেই কনকেশ্বরকে ভুলতে পারেন না। তাঁর সেই রূপ সেই ভঙ্গিমা—সে যে মিথ্যা হয়ে যাবে তা হ'লে। তিনি যে কনকেশ্বরের শ্রীচরণেরই একটি মূর্ত্তিমতী নিবেদন।

পুরোহিত

না, তিনি ভোলেন নি। তবে তাঁরই জন্য রাজা কনকেশ্বরকে ভুলেছেন।

রামদাস

কি রকম?

পুরোহিত

রামদাস! রাজকন্যা চন্দ্রলেখা আর ইহজগতে নাই।

রামদাস

আহা! সেকি?

পুরোহিত

চন্দ্রলেখা অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই রাজার মস্তিষ্ক-বিকার আরম্ভ হয়। তাঁর কেমন মনে হ'ল কনকেশ্বর এই ঘর চন্দ্রলেখাকে হরণ করতে চান। অনেক অনুনয় বিনয়, পূজা, যজ্ঞ, উপাসনা—কিছুতেই কিছু হ'লো না। রাজকন্যা চলে গেলেন। তারপর থেকেই রাজা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়েছেন। রাগে, দুঃখে, অভিমানে তিনি কনকেশ্বরকে অস্বীকার করে অপমান করলেন।

রামদাস

আহা! বড়ই করুণ! ঠাকুর! একটু ভুল বুঝেছেন। রাজা কনকেশ্বরকে অস্বীকার করেন নি। প্রাণভরে স্বীকার না করলে তিনি তাঁকে এতবড় অপমান করতে পারতেন না। ঠাকুর! আপনি রাজার উপর রাগ করবেন না।

পুরোহিত

না। যখন চন্দ্রলেখার কথা ভাবি, রাজার উপর আমার করুণা হয়। কিন্তু যখনই ঐ মন্দিরটার দিকে তাকাই, দেখি মন্দির অন্ধকার, তখনই আমার বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। দুঃখকষ্টে আমিও পাগল হয়ে যাই।

রামদাস

আপনার কন্যা? সে ভাল আছে ত?

পুরোহিত

হ্যাঁ, সে বেঁচেই আছে। এই ত তুমি আসবার কিছুক্ষণ আগে আমার পাশেই বসেছিল। কত না সান্ত্বনা দিচ্ছিল আমাকে। সেও বলে, "বাবা, রাজার উপর রাগ কোরো না, রাজা বড় দুঃখী।" কিন্তু কনকেশ্বরের অপমানকারীকে আমি ক্ষমা করি কি করে?

রামদাস

আমি একটা কথা বলি ঠাকুর। যাঁর অপমান, বিচার করতে তিনিই জানেন। তা নিয়ে আমরা মাথা খারাপ করি কেন?

পুরোহিত

চিত্রসেনাও ঐ কথাই বলে। কিন্তু আমার প্রাণটাত কিছুতেই সুস্থ হচ্ছে না আজ।

রামদাস

একটা গান গাই ঠাকুর। শুনবেন ?

পুরোহিত

গান গাইবে ? কিন্তু জানত রাজার আদেশ।

রামদাস

আমি ভিখারী বাউল। আমার গান কি রাজার কান অবধি পৌঁছায় ঠাকুর ? আপনার কোনও ভয় নেই।

পুরোহিত

কিন্তু তুমি মেলা দেখতে যাবে না ?

রামদাস

মেলা !

(গান)

আজ তোমায় আমায় মেলা।
সবারে তাই আড়াল করে
আমায় নিয়ে খেলা।
আজ তোমায় আমায় মেলা।
পূর্ণিমার ঐ রূপ-সাগরে দোলে প্রেমের ভেলা,
তোমায় নিয়ে ভেসে ভেসে কাটবে আমার বেলা।
তোমার গোপন পরশ হাওয়ায় হাওয়ায়
আমার গায়ে মিশিয়ে যে যায়,
তাই আমায় নিয়ে পুলক জাগাও
করনি আজ হেলা।
আজ তোমায় আমায় মেলা।

ঠাকুর ! মেলা ? আজ বসন্ত-পূর্ণিমার রাত—বাইরের দিকে একবার চেয়ে দেখুন। রাজা মেলা বসালেন না, তাই কনকেশ্বর আপনার মেলা আজ আপনি সাজিয়েছেন। বসন্ত-পূর্ণিমার রাতে এমন ধারা কি কখনও দেখেছেন এই মন্দির-প্রাঙ্গণে ?

(গান)

আমার প্রদীপ নিভ্‌ল যে তাই
তোমার আলো ফুটল ;
তোমার আমার আড়ালটি আজ টুটল।
আজ হ'তে ঐ আমার পথে
চলবো আমি তোমার রথে—
রথের চূড়ায় প্রদীপ জ্বলি গগন তলে উঠল।
আজকে আমার নাই কিছু আর, তোমার গগন তলে,
ঠাঁই নিয়েছি তোমার রঙে রঙীন হ'ব ব'লে।
ভুবনভরা রূপের মেলায়
তোমার ওরূপ যায় চেনা যায়,
রূপের নেশায় পাগল পরাণ তোমার পানে ছুটল।

পুরোহিত

রামদাস ! তুমি ধন্য। প্রাণের মধ্যে আগুণ জ্বল্‌ছিল, কতকটা যেন শীতল হ'ল।

রামদাস

ঠাকুর ! আপনার মনের আগুণ যদি আজ নেভাতে পেরে থাকি—সত্যিই আমি ধন্য।

পুরোহিত

রামদাস ! তোমার কথা আমি অনেক সময় ভাবি। যখনই তোমার কথা ভাবি তখনই আমার কি মনে হয় জান ?

রামদাস

কি ?

পুরোহিত

তুমি যেন সংসারের সমস্ত সুখ দুঃখের বাইরের একটা সৃষ্টিছাড়া মানুষ। আমি বিস্ময়ে অবাক্ হই।

রামদাস

না ঠাকুর, তা নয়। মিথ্যা আমায় লজ্জা দেবেন না। সমস্ত সুখ-দুঃখের তলায় তলিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি। তাই তাদের অন্তরের রূপটার সঙ্গে আমার এত সহজ পরিচয়। আর কিছু না।

পুরোহিত

তা হবে। তোমায় তুমিই চেন রামদাস। কিন্তু আমার পরম সৌভাগ্য—তুমি আজ এসেছিলে। নইলে বোধ হয় আমি এইখানে অন্ধকারে বসে বসে পাগল হয়ে যেতাম।

রামদাস

ঠাকুর! রাজা আপনাকে নূতন মন্দিরে পৌরোহিত্য করতে ডাকেন নি?

পুরোহিত

না। সেটুকু করুণা রাজা আমাকে করেছেন। কেন—জানি না।

রামদাস

সত্যিই রাজা বড় দুঃখী, ঠাকুর! একটা কথা বলি। আপনার চাইতে রাজার দুঃখ আজ বড় কম নয়।

পুরোহিত

কি বলছ তুমি রামদাস?

রামদাস

হ্যাঁ ঠাকুর! সত্য কথা। গতবৎসর এমন দিনে রাজকুমারী চন্দ্রলেখা এই প্রাঙ্গণে রাজার হাতে তৈরী মেলায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাণময়ী তিনি—চারদিকে নিজের প্রাণের রূপ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, রাজারই চোখের সামনে। আর আজ রাজকুমারী ইহজগতে নাই—আর কি রাজা সইতে পারেন, কনকেশ্বরের প্রাঙ্গণে বসন্ত-পূর্ণিমার মেলা?

পুরোহিত

তাই বুঝি তিনি কনকেশ্বরকে অপমান করে সওয়াটা সহজ করে নিয়েছেন।

রামদাস

তা নয়। তিনি রাজা, সইবার ভারটা তিনি কনকেশ্বরের মাথারই চাপিয়ে দিয়েছেন।

(এমন সময় দূরে মেলার সান্ধ্য আরতির বাদ্য ও ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা গেল)

পুরোহিত

ঐ শোন। শুনতে পাচ্চ রামদাস?

রামদাস

পেয়েছি। নূতন মন্দিরে আরতির উৎসব।

পুরোহিত

আর আজ এ মন্দিরে আরতি হবে না। এত কালের আরতি আজ বসন্ত-পূর্ণিমার বন্ধ হ'ল।

(রামদাস নীরব)

বন্ধ হ'ল—আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই, বন্ধ হ'ল। রামদাস! আমি যে সইতে পারছি না।

(এমন সময় কিছুদূরে গান শোনা গেল। এবং জ্যোৎস্না-লোকে দেখা গেল এক দল মনুষ্য-মূর্তি সারি সারি প্রদীপ হাতে ক'রে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'চ্চে।)

(গান)

মোরা—তোমার প্রণাম করি।

পুরোহিত

ও কি? কে ওরা?

(রামদাস মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল)

পুরোহিত

চিত্রসেনা না? হ্যাঁ, সে-ই ত বটে। রামদাস! আজ আমারই কন্যা মন্দিরে আরতি করবার জন্য এগিয়ে এসেছে। (রামদাস নীরব) রাজার কঠোর আদেশ তার অজানা নেই রামদাস।

রামদাস

ভয় নাই, কোন ভয় নাই। রাজাদেশ অমান্য করবার শক্তি সে আজ পেয়েছে ঠাকুর!

পুরোহিত

কনকেশ্বর! দেবাদিদেব মহাদেব! এ কি নিষ্ঠুর খেলা আমায় নিয়ে!

(চিত্রসেনা ও বালকবালিকাগণের প্রবেশ)

(নৃত্যগীত)

মোরা তোমায় প্রণাম করি।
মোদের হাতে ফুলের ডালা,
মোদের মাথায় মাথায় সোনার থালায়
তোমার প্রদীপ জ্বালা॥
মোদের নয়ন গুলির পরে
তোমার আবেগ উঠল কেঁপে নবীন আলোর ভরে,
সেই সে আলোর নূতন রঙে ঢালা—
সারা ভুবন ঢালা॥

ছন্দ নাচে মোদের গায়ে
নূপুর বাজে পায়ে পায়ে
রিনিঝিনি—ওগো—রিনিঝিনি।
সেই সুরের কাঁপন লেগে
বিশ্বভুবন তোমার রূপে উঠল আজি জেগে,
উঠল কেঁপে বুকের পরে মালা,—
তোমার ফুলের মালা॥

দুই

প্রকৃতি পরিচয়:—সেই বসন্ত-পূর্ণিমা। মন্দির-প্রাঙ্গণে আলো-ছায়ার সংমিশ্রণে একটা মায়ার ছবি সৃষ্টি করেছে।

দৃশ্য পরিচয়:— মন্দির মধ্যে পুরোহিত গণদেব ঠাকুর ধ্যানস্থ। কিছুদূরে একটা বৃক্ষের সন্নিকটে দু'জন প্রহরী,—উদয় ও পুষ্পনাথ—চাপাগলায় কথা বল্‌ছিল। সোপানে চিত্রসেনা উপবিষ্ট—চিন্তামগ্ন ও বিষণ্ণ।

উদয়

যাক! ব্যাপারটা বড়ই মজার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পুষ্পনাথ

মজার! তোর মজা লাগ্‌ছে উদয়?

উদয়

পুরোহিত-কন্যা চিত্রসেনা রাজার আদেশ অমান্য করার জন্য বন্দী—এইবার দেখি রাজা কি করেন।

পুষ্পনাথ

কি আর করবেন? জানিস্ ত রাজা নড়েন তবু আদেশ নড়ে না।

উদয়

তা বলা যায় না। চিত্রসেনা রাজকুমারী চন্দ্রলেখার আশৈশব সঙ্গিনী। একসঙ্গে মানুষ হয়েছে রাজবাড়ীতে। জানিস্ ত রাজা চিত্রসেনাকে মেয়ের মতনই ভালবাসেন।

পুষ্পনাথ

তা হ'ক। রাজাকেও ত চিনিস্?

উদয়

তাই ত বলছি—মজাটা কতদূর গড়ায় দেখি।

পুষ্পনাথ

তোর মজা লাগছে উদয়? আমার মনটা যে কি রকম করছে বোঝাতে পারব না।

উদয়

কেন রে?

পুষ্পনাথ

আমার চোখে ত জল এসেছিল।

উদয়

এঁ্যা!—বলিস্ কি?

পুষ্পনাথ

আচ্ছা ব্যাপারটা যে হ'ল—বড়ই করুণ নয় কি?

উদয়

করুণ? কোন্ ব্যাপারটা?

পুষ্পনাথ

এই যখন সেনাপতি জয়ন্ত ওদের সব বন্দী করলেন রাজাদেশ অমান্য করার জন্য।

উদয়

করুণ? হাঃ—হাঃ—হাঃ—। এতে করুণ রসটা কোথায় রে—খাটী বীররস।

পুষ্পনাথ

তুই কিছু বুঝিস্ না।

উদয়

আচ্ছা—একটু বুঝিয়ে দে করুণ রসটা কোথায়!

পুষ্পনাথ

কেন—যখন সেনাপতি জয়ন্ত ওদের বন্দী করলেন তখন পুরোহিতকন্যার কথাগুলি? আমার মনে যে কী ঘা দিলে আমি বলতে পারি না।

উদয়

তুই সত্যিই হাঁদারাম না-হোক। এইতেই কেঁদে ফেললি?

পুষ্পনাথ

তখনো কাঁদি নি। তারপর যখন পুরোহিত-কন্যার কথায় মুগ্ধ হ'য়ে সেনাপতি জয়ন্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে ছেড়ে দিলেন—

উদয়

হাঃ—হাঃ—হাঃ—। এইতেই চোখ জল এল!

পুষ্পনাথ

যাঃ—তোর সঙ্গে কথা বলে কোন লাভ নেই। তোকে মানুষের মধ্যে ধরাই চলে না।

উদয়

তুই কেঁদে ফেলেছিলি? এঁ্যা? তুই যে আমার এক দিদিশাশুড়ীর মত করে তুললি।

পুষ্পনাথ

চুপ! চুপ! বাজে বকিস্‌নি।

উদয়

শোন্ শোন্ মজার ব্যাপারটা বলি। সে আমার এক দিদিশাশুড়ী ছিল। বছর সত্তর বয়স হয়েছিল। যখনই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বুড়িকে প্রণাম করতাম—অমনি কান্না।

পুষ্পনাথ

তার মানে?

উদয়

আরে, তিনি বছর কুড়ি বাইশের সময় বিধবা হয়েছিলেন। আমার দাদাশ্বশুর এই সোণার চাঁদ নাতজামাইকে দেখলেন না—এ দুঃখ তাঁর আর রাখবার জায়গা ছিল না। ফলে বিরক্ত হয়ে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ছেড়েই দিলাম। তোর দশাটা অনেকটা সেই রকমই হয়ে উঠল।

পুষ্পনাথ

আহা—কি তুলনাই হল!

উদয়

একেবারে ঠিক মিলে গিয়েছে। হরে দরে তোর আর আমার দিদিশাশুড়ীর রসবোধটা একই রকম।

পুষ্পনাথ

যাক! আমার রসবোধটা যে তোর সঙ্গে না মিলে তোর দিদিশাশুড়ীর সঙ্গে মিলেছে—এও আমার পরম সৌভাগ্য।

উদয়

তাতো বটেই। সেটা উভয়তঃ। তোর মত রসবোধ হ'লে আমার দশাটা কি হ'ত ভেবে দেখেছিস্? ঐ ফি বার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আমাকেও দিদিশাশুড়ীর গলা জড়িয়ে কাঁদতে বস্‌তে হ'ত।

পুষ্পনাথ

তা দশাটা তোর যা দাঁড়িয়েছে তার চাইতে কিছু খারাপ হ'ত না। অন্ততঃ শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পথটা খোলা থাকত, বন্ধ হ'ত না।

উদয়

তা যা বলেছিস ভাই। আমার বরাতটাই কেমন শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় না।

পুষ্পনাথ

কেন রে? এখন ত আর দিদিশাশুড়ী নেই—

উদয়

তা নাই বা রইলেন। এক সতেরো-আঠারো বছরের শালাবৌ জুটেছে। দেখতে খাসা। কিন্তু—

পুষ্পনাথ

এঁ্যা। বলিস কিরে? সেও গলা জড়িয়ে কাঁদতে বসে নাকি?

উদয়

আরে না। তা হ'লে ত আমার রসবোধটা এতদিনে কতকটা তোর মতনই করে নিতাম। তার ঠিক উলটো। খালি হাসি। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে পা দিয়েছি কি—আড়াল থেকে খিল খিল হাসি। ভাবি,—কি রে বাবা! আমি কি একটা সঙ্ [illegible], দেখলেই হাসি পায়। তার পর যা করি তাতেই হাসি। পরে পরে এমন বোকা বানিয়ে ছেড়ে যে এবার, [illegible] নিয়েছি—আর [illegible]।

পুষ্পনাথ

তাই ত! এমন তোর রসিক মন—শ্বশুরবাড়ীতেই তার ঠাঁই হ'ল না।

উদয়

তা যা বলেছিস্। তোর মতন মন হ'লে ঠাঁইটা এতদিনে পাকপাকি রকমেরই ক'রে নিতাম। তা হলে কি আর এই দুর্দ্দশা হয়?

পুষ্পনাথ

তা হ'লে কি হ'ত?

উদয়

তা হলে? তা হলে আজ এই এমন বসন্ত-পূর্ণিমার রাতটা কি তোর সঙ্গে অন্ধকারে গাছতলায় বসে মশার কামড় খাই? তা হলে ডাইনে বাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে নিয়ে ঐ কনকপুরের মেলার আমোদে হাসির ফোয়ারা তুলে দিতাম।

পুষ্পনাথ

হাঃ—হাঃ—হাঃ—। তোর কল্পনাশক্তি আছে।

উদয়

হাসি নয়। ভেবে দেখ্ একবার আমাদের দুর্দ্দশাটা। বছরের এমন দিনটা কোথায় মেলায় একটু আমোদ-আহ্লাদ করব—তা না এইখানে সমস্ত রাত পাহারায় বসে থাকতে হবে।

পুষ্পনাথ

সমস্ত রাত কি রে? সেনাপতি স্বয়ং যখন রাজাকে ডাকতে গিয়েছেন—রাজা এখনি এসে পড়বেন।

উদয়

রাজা আর এসেছেন। রাজার অবস্থাটা ত স্বচক্ষে মেলায় দেখে এলি। রাজা আজ মেলার আনন্দে উন্মত্ত। কোথাও একমুহূর্ত্ত স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছেন দেখলি? পাগলের মত সমস্ত মেলাটা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেন এক নেশায় তাঁকে পেয়ে বসেছে।

পুষ্পনাথ

তাত হবেই। নিজের হাতে নূতন মেলা বসিয়েছেন এ বছর।

উদয়

তাই ত বলি বন্দিনীকে সেইখানেই নিয়ে গেলে হত।

পুষ্পনাথ

পুরোহিত-কন্যা যে কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না। তা জোর করে নিয়ে না গিয়েছেন ভালই করেছেন সেনাপতি।

উদয়

আরে দূর। ভাল করতে গিয়ে আমাদের প্রাণ বেরুল।

পুষ্পনাথ

কেন রে? এই ত একটু আগে বলছিলি তোর মজা লাগছে।

উদয়

তা ত বটেই! কিন্তু মজাটা এই অন্ধকারে না হয়ে মেলায় হলে কি রকম জমত বল দেখি?

পুষ্পনাথ

ওরে উদয়! ঐ বুঝি রাজা আসছেন।

উদয়

কিসে বুঝলি?

পুষ্পনাথ

ঐ যে দেখছিস্ না, দক্ষিণ দিকটায় একটা আলো?

উদয়

হ্যাঁ, রাজাই বটে। ক্রমেই এগিয়ে আসছেন।

পুষ্পনাথ

হ্যাঁ। ঐ ত।

(উভয়ে সন্ত্রস্তভাবে কিছুদূরে স'রে দাঁড়াল। রাজার প্রবেশ, সঙ্গে জয়ন্ত ও আরও দুই একজন।)

রাজা

কে? কে, জয়ন্ত? কে আমার আদেশ অমান্য ক'রে এইখানে আরতি করেছে?

(জয়ন্ত নীরব)

রাজা

বল। চুপ করে রইলে কেন? এখানে বেশীক্ষণ থাকবার সময় নেই আমার।

(চিত্রসেনা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।)

চিত্রসেনা

মহারাজ !

রাজা

কে ? চিত্রসেনা ! তুমি এখানে ?

চিত্রসেনা

মহারাজ !

রাজা

চিত্রসেনা। নূতন মন্দিরে আমার আরতি দেখ্‌লে না ?

চিত্রসেনা

মহারাজ ! আমি আপনার শ্রীচরণে অপরাধিনী।

রাজা

কেন ? আরতি দেখলে না বলে ? তা কি হয়েছে ? আরতি ত চিরদিনের মত থেমে যায় নি। আসছে বছর তোমায় নিয়ে আমার আরতি মধুর করে তুলব চিত্রসেনা।

(চিত্রসেনার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল।)

রাজা

কাঁদছ ? ছিঃ কেঁদ না। এমন দিনে কাঁদতে নেই।

চিত্রসেনা

মহারাজ ! আমি ত ভুলি নি আপনি আমায় কতখানি ভালবাসেন।

রাজা

চিত্রসেনা ! শোন। আমি ইচ্ছা করে এবার তোমায় আরতিতে ডাকিনি। নূতন মেলা—তোমার আরতির ভর হয়ত সইতেই পারবে না—ভেঙে পড়্‌বে। আমি বেঁচে থাকতে তোমার সে অপমান ত হতে দিতে পারি না চিত্রসেনা।

চিত্রসেনা

মহারাজ ! সেজন্য নয়—

রাজা

তবে কিসের জন্য ? চিত্রসেনা ! ভুলে যেও না আজ বসন্ত-পূর্ণিমা। আজ আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। প্রাণের তারে আজ বেসুর বাজিও না চিত্রসেনা। যে তারে বেসুর বাজছে সে তার প্রাণ থেকে ছিঁড়ে ফেলে দাও। আজ কনকপুরের বসন্ত-পূর্ণিমা।

(চিত্রসেনা নীরব)

রাজা

জয়ন্ত ! কোথায় তোমার বন্দী ?

চিত্রসেনা

(স্থিরভাবে) মহারাজ ! অপরাধিনী আপনারই সম্মুখে।

রাজা

তুমি ?

চিত্রসেনা

হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা

তুমি—চিত্রসেনা—আজই এ মন্দিরে নৃত্যগীতে আরতি করেছ ?

চিত্রসেনা

হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা

তুমি কি শোননি—আজকের দিনে বিশেষ করে এ মন্দির-প্রাঙ্গণ অন্ধকার হ'য়ে থাকবে—এই ছিল আমার আদেশ ?

চিত্রসেনা

শুনেছিলাম মহারাজ।

রাজা

তবুও আজ এ মন্দিরে আরতি করবার শক্তি তুমি কোথায় পেলে চিত্রসেনা ?

চিত্রসেনা

মহারাজ ! যাঁর আরতি, শক্তি তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। সে আরতি বন্ধ করি কি করে ?

রাজা

শাস্তি—প্রাণদণ্ড—শুনেছিলে ?

চিত্রসেনা

হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা

সে দণ্ড তুমি আমার কাছ থেকে নেওয়ার জন্য আজই প্রস্তুত ?

চিত্রসেনা

মহারাজ ! আমি আপনারই কাছে অপরাধিনী ; তাই আপনার দেওয়া শাস্তি সগৌরবে মাথায় তুলে নেব।

রাজা

ধন্য তুমি—চিত্রসেনা—ধন্য তোমার শক্তি !

চিত্রসেনা

মহারাজ কেমন করে আমি আপনাকে আমার প্রাণের কথা বোঝাব ?

রাজা

চাই না বুঝতে। কারো প্রাণের কথা নিয়ে আজ আমার কোনও প্রয়োজন নেই।

চিত্রসেনা

মহারাজ ! অপরাধিনীকে শাস্তি দিন।

রাজা

হ্যাঁ তাই দেব। তোমাকে শাস্তি দেওয়ার শক্তি আজ আমার বুকের মধ্যে আগুণ হয়ে জ্বলে উঠেছে চিত্রসেনা—তোমার আর রক্ষা নাই।

(কিছুদূরে বাউল রামদাসের গান শোনা গেল)

(গান)

আমার বুকের মাঝে আগুণ জ্বলে,
তাই বুঝি আজ পরাণ গলে ;
তাই বুঝি আজ ধারে ধারে নয়ন ভাসে অশ্রুজলে।
আমার গোপন বুকের ব্যথার পরে,
কোন সে আগুণ গেল ধরে ;
হাওয়ায় হাওয়ায় জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে গেল জলে স্থলে।
ফাগুনে আজ চাঁদ উঠেছে ভুবন ভরে 'রূপ নেমেছে,
তোমায় খুঁজে হে প্রিয় হে আগুণ বেড়ায় নেচে নেচে।
আজকে কি গো দেবে ফাঁকি,
তোমার পরশ পাবে আঁখি ?
বৃথাই কি আজ পূর্ণ শশী রইল চেয়ে গগন তলে ?

(রামদাসের প্রবেশ)

রামদাস

ভিক্ষা দাও আমাকে ভিক্ষা দাও।

জয়ন্ত

কে ? কে তুমি ?

রামদাস

আমি বাউল, গান গাই আর ভিক্ষা করি।

জয়ন্ত

ভিক্ষা ত এখানে নয় বাউল। দূরে বসন্ত-পূর্ণিমার মেলা বসেছে—সেইখানে প্রচুর ভিক্ষার আয়োজন আছে। সেইখানে যাও।

রামদাস

এইখানে...আমার ভিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে।

জয়ন্ত

তুমি বোধ হয় বিদেশী, জান না। উৎসব আজ এখানে নয়। উৎসব ঐ দূরে।

রামদাস

যেখানে রাজা সেইখানেই আমার উৎসব।

রাজা

জয়ন্ত ! বাউলকে বল, মেলায় গিয়ে আমি স্বহস্তে ওকে প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা দেব।

রামদাস

রাজার স্বহস্তের ভিক্ষা ! তা নেওয়ার গৌরব আমি বইতে পারব না মহারাজ—আমি সে ভিক্ষা চাই না।

রাজা

তবে কি চাও তুমি ?

রামদাস

এইখানে, কমলেশ্বরের প্রাঙ্গণে, আজ বসন্ত-পূর্ণিমায় আমার ভিক্ষা।

রাজা

এখানে আজ কোন ভিক্ষা নাই বাউল। তুমি যাও।

রামদাস

মহারাজ ! রাজকুমারী চন্দ্রলেখার নামে আমার ভিক্ষা !

(সকলে চমকে উঠল)

জয়ন্ত

বাউল! তুমি উন্মাদ।

রামদাস

কে দেবে—কে আমায় সেই ভিক্ষা দেবে?

চিত্রসেনা

কি চাও তুমি রামদাস?

রামদাস

আমি চাই রাজকুমারী চন্দ্রলেখার প্রতিশ্রুত ভিক্ষা।

চিত্রসেনা

তা ত আর কেউ তোমায় দিতে পারবে না রামদাস।

রামদাস

এক পারেন দেবাদিদেব কনকেশ্বর। তিনি আজ অন্ধকারে মুদ্রিত-নয়ন, ধ্যানস্থ! আর এক পার—চিত্রসেনা! তুমি।

চিত্রসেনা

আমি!

রামদাস

হ্যাঁ তুমি। আমাকে ভিক্ষা দেওয়ার শক্তি তুমি এখনও হারাও নি।

চিত্রসেনা

কি তোমার ভিক্ষা রামদাস?

রামদাস

আমি চাই সেই মন্ত্র, যে মন্ত্রের শক্তিতে বসন্ত-পূর্ণিমার অন্তরের রূপ গত বৎসর এই দিনে তোমরা দুজনে ছড়িয়ে দিয়েছিলে—এই প্রাঙ্গণে। আমি বাউল—সেই মন্ত্র ভিক্ষা চেয়েছি রাজকুমারী চন্দ্রলেখার কাছে। তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন এবার বসন্ত-পূর্ণিমায় তিনি আমায় দেবেন সেই মন্ত্র। তাই আমি এসেছি। রাজকুমারী চন্দ্রলেখার নামে আমায় ভিক্ষা—ভিক্ষাং দেহি!

রাজা

(কিছুক্ষণ পরে) চিত্রসেনা!

চিত্রসেনা

মহারাজ!

রাজা

চিত্রসেনা!

চিত্রসেনা

মহারাজ! আমি পারব। শক্তি আমার প্রাণের মধ্যে পাগল হয়ে নৃত্য সুরু করে দিয়েছে—আপনি আমায় অভয় দিন।

রাজা

প্রাণের অভয়-বাণী আমি যে চিরদিনের মত হারিয়েছি চিত্রসেনা।

চিত্রসেনা

আমি আজ আপনার প্রাণে নূতন বাণী সৃষ্টি করব, মহারাজ! আমায় অনুমতি করুন।

রাজা

জয়ন্ত! জয়ন্ত!

জয়ন্ত

মহারাজ!

রাজা

জয়ন্ত! ও মেলা কি শেষ হয়ে গেছে?

জয়ন্ত

না মহারাজ।

রাজা

তুমি যাও। সকলকে বল, তাদের পাগল রাজা আবার খেয়াল বদ্‌লেছে, কনকেশ্বরের প্রাঙ্গণে অন্ধকারেই মেলা বসিয়েছে। চিত্রসেনা!

চিত্রসেনা

মহারাজ!

রাজা

চিত্রসেনা!

চিত্রসেনা

মহারাজ!

রাজা

চিত্রসেনা! গাও সেই গান—আজ তুমি একাই গাও। আমি শুনি।

চিত্রলেখা

রামদাস ! রাজকুমারী চিত্রলেখার বাসে ভিক্ষা আজ ব্যর্থ হবে না।

রামদাস

জয় দেবাদিদেব কনকেশ্বরের জয়। আজ বসন্ত-পূর্ণিমা সার্থক হ'ল।

(চিত্রসেনার নৃত্যগীত)

কোন্ সে কালের আদি উষায় তোমার প্রথম গানে,
বলেছিলে ভালোবাস আমার কাণে কাণে—
(ওগো) আমার কাণে কাণে॥
সেই সে মন্ত্র সঙ্গে দিলে,
যাত্রা আমার করিয়েছিলে,
ভেবেছিলাম আমার পথে থাকবে সকল খানে—
(ওগো) থাকবে সকল খানে।
বলেছিলে ভালোবাস আমার কাণে কাণে॥

তাইত আমি ভয় করিনি অজানাকে নিয়ে
কত জীবন কত না পথ এলেম পাড়ি দিয়ে,—
(ওগো) এলেম পাড়ি দিয়ে।
হঠাৎ দেখি জীর্ণ ধরা,
রিক্ত হিয়া দৈন্যে ভরা,
মন্ত্র দিলে হরণ করে, সুর দিলে না গানে,—
(ওগো) সুর দিলে না গানে।
বলেছিলে ভালোবাস আমার কাণে কাণে॥

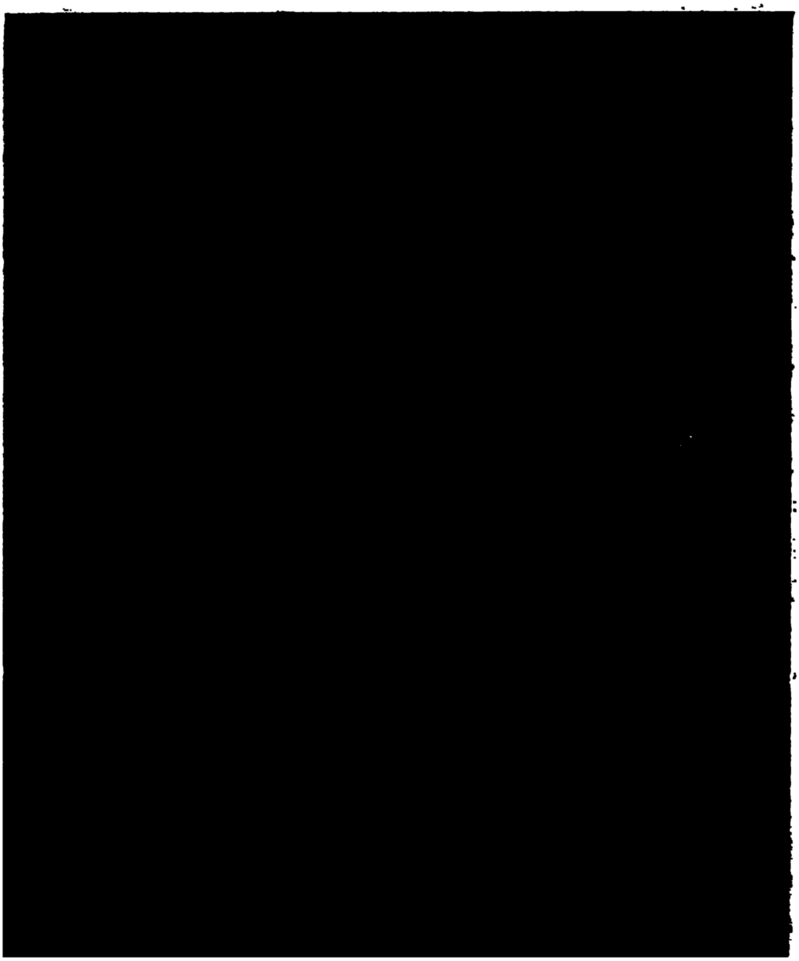
ক্লান্তি ভরে' এলো প্রাণে দুখ এ পথ-চলায়,
বসি এসে ক্ষণেক তরে তোমার তরু-তলায়,—
(ওগো) তোমার তরু-তলায়।
মর্ম্মরিয়া হেনকালে,
পাতায় পাতায় ডালে ডালে
আনন্দেরি বাণ এলো ঐ, আমার সারা প্রাণে—
(ওগো) আমার সারা প্রাণে।
বলেছিলে ভালোবাস আমার কাণে কাণে॥

আজকে আমার গান এসেছে সুর লেগেছে গলায়,
আজকে নূপুর উঠ্‌ল বেজে আমার এ পথ-চলায়—
(ওগো) আমার এ পথ চলায়।
আজকে [illegible] নূতন পাতায়
সবুজ আলোর [illegible] মাথায়,
রঙে তোমার [illegible] হাওয়ার আনে—
(ওগো) [illegible] হাওয়ার আনে।
বলেছিলে ভালোবাস আমার কাণে কাণে॥

পূর্ণিমার আজ [illegible] চলি গগনতলে,
আমার চলায় তোমার বাণী বাজে জলে স্থলে,—
(ওগো) বাজে জলে স্থলে।
সেই সে বাণী [illegible] তারায়
আপন সুরে [illegible] বেড়ায়,
শিরায় শিরায় কাঁপন তুলে তোমার গভীর টানে,—
(ওগো) তোমার গভীর টানে।
বলেছিলে ভালোবাস আমায় কাণে কাণে॥

শেষ হ'ল তাই পথের চলা প্রণাম করি পায়ে,
ধ্রুবতারা তোমায় [illegible] বেঁধেছি আজ গায়ে,—
(ওগো) বেঁধেছি আজ গায়ে।
আজকে [illegible] গানের সুরে
ধরা দিলে [illegible],
মিলন-রাগে গগন [illegible] চাইলে আমার পানে—
(ওগো) চাইলে আমার পানে।
বলেছিলে ভালোবাসি আমায় কাণে কাণে॥

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

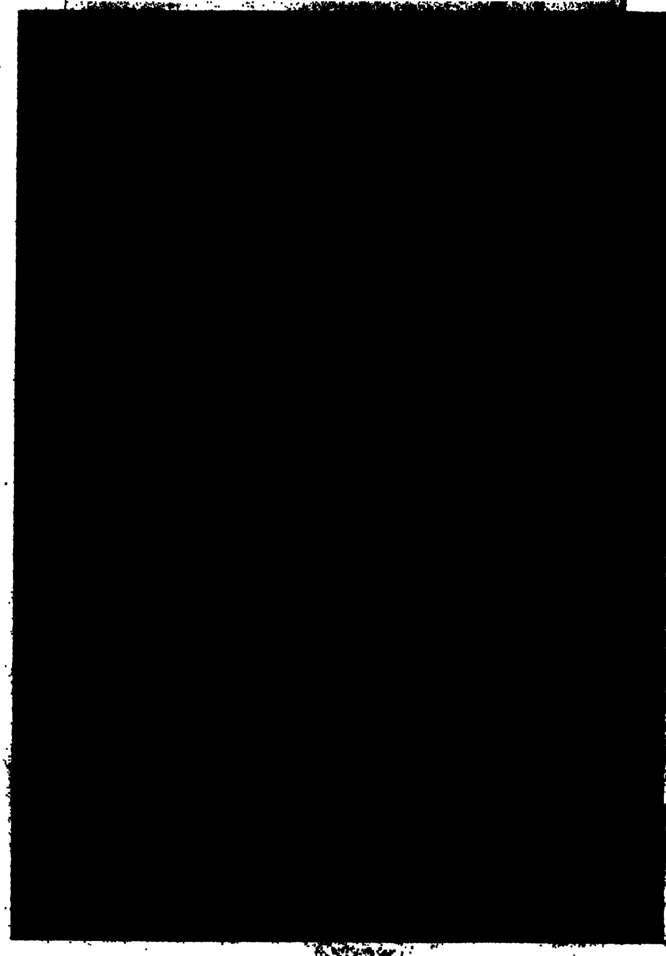


বীণাপাণি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিতাই পাল

গঠিত মূর্ত্তির প্রতিলিপি

চিত্রশালা



বীণাপাণি

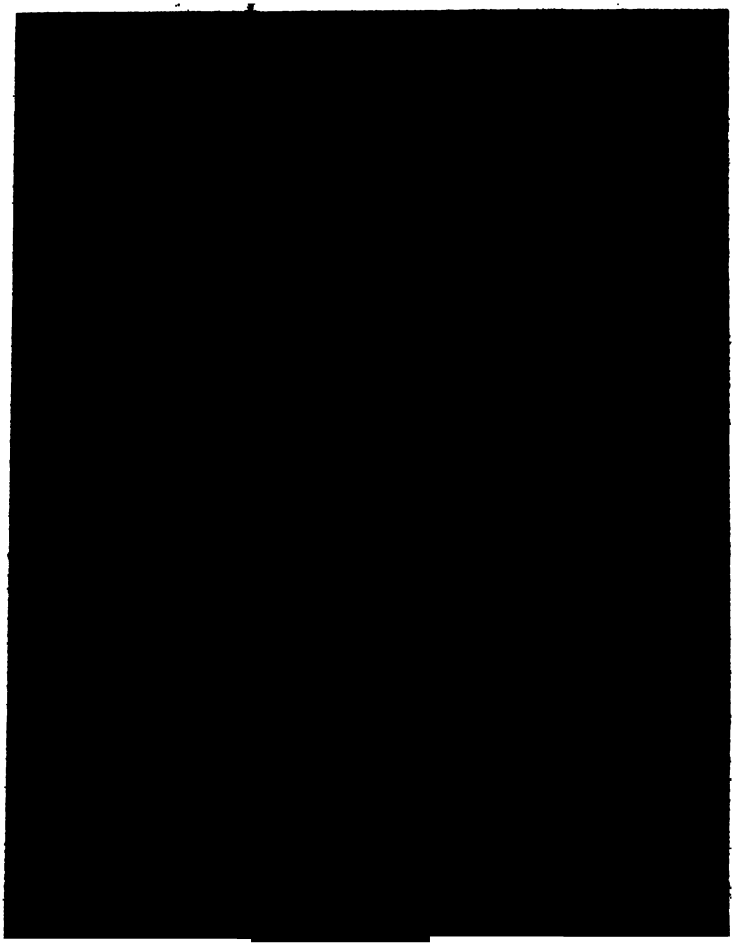
শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিতাই পাল

গঠিত মূর্ত্তির প্রতিলিপি



পূজারিণী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণীষী দে



মন্দিরে
শিল্পী—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গুপ্ত

বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌ম্

শ্রীযুক্ত [illegible]

শ্রীযুক্ত "বিচিত্রা" সম্পাদক মহাশয়-

সমীপেষু

এ মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর "বাঙলা ও ভারতবর্ষ" নামক [illegible] পড়লুম। প্রবন্ধের আসল বক্তব্য যে কি, তা [illegible]। অনেক কথার মধ্যে আসল কথাটি অনেক [illegible] পাওয়া যায় না। বোধ হয় লেখক মহাশয় [illegible] যে ভারতবর্ষের পলিটিকাল ঐক্যের পথে প্রধান [illegible] মূলে অবশ্য বাঙালী জাতের [illegible] তার মন। এতেই ঘটেছে [illegible] না কি পলিটিক্সের [illegible] ভিমানী লোক। বাঙা[illegible] এ জ্ঞানটি তাদের পুরো [illegible] জাতীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানই না [illegible] এখন নির্লজ্জ অহংজ্ঞানে [illegible] আত্মাভিমানী জাত, তা[illegible] Know thyself, স[illegible] ভারতবর্ষে না কি অ-[illegible] বাঙালীর হাম-বড়ামির [illegible] যারা, প্রধানতঃ বাংলা [illegible] যথা রবীন্দ্রনাথ, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি লোক-মান্য লেখক ও বক্তারা। আমিও নাকি উক্তদলের একজন। আমাদের এই ক্ষুদ্র মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ তিনি পাঠক-সমাজের উচ্চ আদালতে অনেক documentary evidence পেশ করেছেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তিনি সুরুতেই একটি গল্প বলেছেন। এ গুজবটি তাঁর পরের মুখে শোনা। আর hearsay যে no evidence এ কথা আশা করি নীরদ-বাবু জানেন। সুতরাং এ গল্পটি না বল্‌লেও তাঁর অভিযোগ তিলমাত্রও কমজোর হত না।

আমার বিরুদ্ধে এই একই অভিযোগ পূর্ব্বেও আনা হয় এবং আমি তখন প্রকাশ্যে guilty plead করি। আমার কবুল জবাবটি [illegible] আগে সবুজ-পত্রে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। আপনি যদি উক্ত পত্রাকারে প্রবন্ধটি পুন-র্মুদ্রিত করেন ত [illegible], কারণ নীরদবাবুর অভিযোগটি [illegible] তা পাঠকসমাজ, আমার [illegible] পারবেন।

[illegible] তার আকার-ইকার অল্প-[illegible] নব-প্রবন্ধের ভিতর থেকে [illegible] পড়্‌ত। মেকলে বহুকাল [illegible] তার প্রকৃতরূপ কিছুতেই [illegible] বাঙালী, তা ত নীরদ-[illegible]

[illegible] আর এক কারণে পুনঃ [illegible] নীরদবাবু বলেন, যে এ [illegible] থেকে মুক্তি লাভ [illegible] এ রূপান্তর যদি ঘটে [illegible]ও দেখতে পাবেন, যে তাঁরা গত দশ বৎসরের মধ্যে নব-ভারত-সভ্যতার পথে কতদূর এগিয়ে এসেছেন, আমাদের পাঁচজনের কথা ঠেলে। নীরদবাবু যে ফরাসী লেখকের দোহাই দিয়েছেন, তাঁর কথার এস্থলে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ অধিকাংশ পাঠক ফরাসী ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন। সুতরাং তাঁদের পক্ষে জুলিয়ঁ বাঁদার La trahison des clercs নামক গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহ দুষ্কর [illegible]।

আমি শুধু একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমি যদি ফরাসী লিখতে পারতুম, অথবা তিনি যদি বাঙলা পড়তে পারতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন "ভাই হাত মিলাও।"

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

[চৌধুরী মহাশয়ের নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নের অংশটি সবুজ-পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল। বিঃ সঃ।]

২

অমৃতশহরের কংগ্রেসের পিঠ পিঠ তুমি আমাকে যে চিঠি লেখ, তার উত্তর আমি দিই নি, কেননা উত্তর যে কি দেব তা তখন ভেবে পাই নি। তুমি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনো যে, আমার অন্তরে যা আছে সে হচ্ছে বাঙালী-পেট্রিয়টিজম। এ অভিযোগে আমি কবুল জবাব দিতে বাধ্য। বাঙালী পেট্রিয়টিজমকে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালীর পক্ষে যদি দোষের হয়, তাহলে সে দোষে আমি চিরদিনই দোষী আছি। আমার গত আট বৎসরের লেখার ভিতর এ অপরাধের এত প্রমাণ আছে যে, সে সকল একত্র সংগ্রহ করলে একখানি নাতিহ্রস্ব পুস্তিকা হয়ে ওঠে।

তবে জিজ্ঞাসা করি, একজন বাঙলা-লেখকের কাছ থেকে তুমি আর কোন্ পেট্রিয়টিজমের প্রত্যাশা কর? আমি যে ইংরাজি লিখি নে তার থেকেই বোঝা উচিত যে অবাঙ্গ পেট্রিয়টিজম আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। যে ভাষা ভারতবর্ষের কোন দেশেরই ভাষা নয়, সেই ভাষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভাষা গণ্য ক'রে সেই ভাষাতে পেট্রিয়টিক বক্তৃতা করতে হলে আমি সেই পেট্রিয়টিজমের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশপ্রীতি ভারতবর্ষের কোন দেশের প্রতি ভালবাসা নয়, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি। মুখস্থ ভাষায় শুধু মুখস্থ ভাবই প্রকাশ করা যায়। তার প্রমাণ আমাদের কনফারেন্স কংগ্রেসে নিত্যই পাওয়া যায়, দেশের যত মুখস্থবাগীশ ও-সকল সভায় তাঁরাই হচ্ছেন যুগপৎ নায়ক ও গায়ক। সে যাই হোক, কোনরূপ ভালবাসার কৈফিয়ৎ চাওয়াও যেমন অন্যায়, দেওয়াও তেমনি শক্ত, তা সে অনুরাগের পাত্র ব্যক্তিবিশেষই হোক, জাতিবিশেষই হোক। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল যে, আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতি-প্রীতি। দেশকে ভালবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালবাসা—কেননা মানুষে শুধু মানুষকেই ভালবাসে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি মানুষকে নয় মাটিকে ভালবাসেন, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি মানুষ নন—জড়পদার্থ, কেননা জড়ের প্রতি জড়ের যে একটা নৈসর্গিক ও অন্ধ আকর্ষণ আছে, এ সত্য বিজ্ঞানে আবিষ্কার করেছে।

যাক্ ও সব অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, স্বজাতি-প্রীতির কৈফিয়ৎ কারো কাছে চাওয়া অন্যায়, কারণ ও হচ্ছে মনের একটা দুর্বলতা। স্বজন-বাৎসল্যরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য যখন অর্জ্জুনেরও ছিল তখন আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর বাঙালী বাঙালী মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ—তাদের যোগ হচ্ছে, মানস কায়ে রক্তের যোগ। সুতরাং বাঙালীদের পরস্পরের প্রতি নাড়ীর টান থাকাই স্বাভাবিক, না থাকাটাই অদ্ভুত।

তার পর এ প্রীতির পুরো কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত, কেননা তার মূল আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। ছেলে বেলায় গুরুমহাশয়েরা আমাদের একটা ভারি শক্ত অঙ্ক কসতে দিতেন, যা আমরা সকলে কসে উঠতে পারতুম না। সে অঙ্ক হচ্ছে এই:—

আছিল দেউল এক পর্ব্বত প্রমাণ
তেহাই সলিলে তার,.........

তার পর কি আছে ঠিক মনে পড়ছে না। কবিতা আমার কণ্ঠস্থ থাকে না। তবে এটুকু মনে আছে যে, সে মন্দিরের মাটির ভিতর কতটা পোঁতা আছে তাঁক কসে তাই আমাদের বার করতে হত। এখন আমার কথা এই যে, মানুষের মন পর্ব্বত প্রমাণই হোক আর বল্মিক প্রমাণই হোক, তার সমস্তটা জেগে নেই। তার অনেকটা স্বজাতির মনের জমির নীচে পোঁতা আছে, আর অনেকটা নিজের অন্তরের তরল ভাবে ডুবে আছে, যেটুকু জেগে আছে সেইটুকু আমরা নিজে দেখতে পাই, অপরকেও দেখাতে পারি; কিন্তু সেই আংশিক মন দিয়ে আমাদের সমগ্র মনের পুরো পরিচয় আমরা দিতে পারি নে। সুতরাং আমাদের রাগদ্বেষের সঠিক কারণ আমরা সব সময় নিজেও জানি

সে, অতএব পরকেও জানাতে পারি নে। এ ক্ষেত্রে নিজের কোট বজায় রাখবার জন্য মানুষে যে সব তর্কযুক্তি দেখায় সে সব ষোলআনা গ্রাহ্য নয়। কেননা যুক্তিতর্কের দোষ এই যে, তার দ্বারা আমরা অপরকে প্রবঞ্চিত করতে না চাইলেও অনেক সময় নিজেকে প্রবঞ্চিত করি। কে না জানে যে, পৃথিবীতে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বড় বড় কথার সৃষ্টি হয়েছে সে সকল অধিকাংশ লোকের শুধু আত্মপ্রবঞ্চনার কাজেই লাগে। আমি একজন মহাধার্ম্মিক, উপরন্তু মহা পেট্রিয়ট, এ কথা মনে ক'রে কে না আত্মপ্রসাদ লাভ করে?

এতক্ষণে বুঝতে পারছ যে আমি আমার বাঙালী পেট্রিয়টিজম সমর্থন করে, তোমার কাছে কোনো লিখিত জবাব কেন দাখিল করি নি। তা করলে নিজের না হোক, নিজের জাতের জাঁক আমাকে নিশ্চয়ই করতে হত।

কিন্তু সেদিন তোমার মুখে যা শুনলুম তাতে ক'রে আমার এই মৌনতার জন্য অনুতাপ করছি। 'সবুজপত্রে' তোমার অনুরোধ মত আমার কৈফিয়ৎ-সহ তোমার পত্র প্রকাশ না করার দরুণ, সে পত্র তুমি হিন্দিতে অনুবাদ ক'রে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রকাশ করেছ। যদি জানতুম, "রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে" সেই ভাবে আমার কৈফিয়ৎ তোমার পত্রের অনুচর হ'য়ে মহাত্মা গান্ধীর কাগজে প্রবেশ লাভ করবে, তাহলে আমার মরচে-পড়া ওকালতী বুদ্ধি মেজে ঘসে তার সাহায্যে এমন একটি বর্ণনাপত্র তৈরী করে দিতুম, যাতে সত্য মিথ্যা একাকার হয়ে যেত, আর যা পড়ে পলিটিক্যাল-হাকিমের দল আমার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী দিতে পারতেন না।

৩

সংস্কৃতে বলে 'গতস্য শোচনা নাস্তি' কিন্তু ইংরাজীতে বলে 'it is never too late to mend,' আমি ইংরাজী-শিক্ষিত অতএব ঐ ইংরাজী বচন শিরোধার্য্য করে, এ কৈফিয়ৎ লিখতে বসেছি এই আশায় যে সেটি হিন্দিতে, অর্থাৎ—আগামী স্বরাজের, lingua franca-য় প্রমোশন পাবে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, বাঙলা দেশে বাঙালীর ঘরে জন্মালেও আমি খাঁটি বাঙালী নই। একছত্র, একদণ্ড, ইংরাজ শাসনের অধীনে বাস ক'রে, আর পাঁচ থেকে পঁচিশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত ইংরাজি-শাসিত স্কুল কলেজে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করে, আমি হয়ে উঠেছি একজন neo-Indian ওরফে non-Indian, অর্থাৎ—কংগ্রেসওয়ালারা যে জাত আমিও সেই জাত। পলিটিক্সের সুরা আমিও যথেষ্ট পান করেছি এবং তার নেশা আজও ছাড়াতে পারি নি, আর ভারতবর্ষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অদ্যাবধি আমি সেই নেশার ঝোঁকে না হোক সেই নেশার চোখেই দেখি। সুতরাং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের স্বপক্ষে ভারতবর্ষীয় পলিটিক্সের দিক থেকে যদি কিছু বলবার থাকে ত তাই বলব। বাঙালী পেট্রিয়টিজমের মূলে আছে বাঙালী জাতির স্বীয় স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান। Self-determination of small nations-এর মতানুসারে বাঙালী-পেট্রিয়টিজমের বিশেষ সার্থকতা আছে। প্রথমত আমরা একটি বিশেষ জাতি, তারপর আমরা একটি ক্ষুদ্র জাতি, সুতরাং আমাদের self-determination-র বিরোধী হচ্ছে Indian Imperialism. আর গতযুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, Imperialism সর্ব্বনেশে জিনিস, তা সে স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। ইংরাজের সাম্রাজ্যের ভিতর বিদেশ আছে জর্ম্মাণীর ছিল শুধু স্বদেশ। আর জর্ম্মাণীর এই স্বদেশী imperialism, জার্ম্মাণ জাতির নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অধঃপাতের যে একমাত্র কারণ, তার খোলা-দলিল ত আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখেই পড়ে রয়েছে। বহুকে এক করবার চেষ্টা ভাল, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেন না তার উপায় হচ্ছে জবরদস্তি। যদি বলো যে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তার উত্তর আমাদের সম্বন্ধে self-determination যদি না খাটে ত ইউরোপে মোটেই খাটে না। ইউরোপে কোন জাতির সঙ্গে অপর কোন জাতির সে প্রভেদ নেই, আমাদের এক জাতির সঙ্গে অপর জাতির যে প্রভেদ আছে। বাঙলার সঙ্গে মাদ্রাজের যে প্রভেদ ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের সে প্রভেদ নেই, এমন কি ফ্রান্সের সঙ্গে জর্ম্মাণীরও সে প্রভেদ নেই। তবে যে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের নাম শুনলে এক দলের পলিটি-

সিয়ানরা আঁতকে ওঠেন তার কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ও মনোভাব জাতীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়। নিজের সন্তানকে স্তন দিলে, কোনও মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর যেহেতু তিনি পাড়া-পড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন তাহলে সে অভিযোগের কি কোনও প্রতিবাদ করা আবশ্যক? মানুষের পক্ষে যা অস্বাভাবিক তাই করার ভিতর যে আসল মনুষ্যত্ব নিহিত, এ কথা বলে অতিমানুষে আর শোনে অমানুষে। ধরো যদি কোনও জননী নিজেকে জগজ্জননী জ্ঞানে পাড়াসুদ্ধ ছেলে-মেয়েদের নিজের স্তনের দুধ যোগাতে ব্রতী হন, তাহলে কাউকে বঞ্চিত না করে সবাইকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিতে হলেও সে দুধে এত জল মেশাতে হবে যে তা পান ক'রে কারও পেট ভরবে না, সকলের পেট ভরবে শুধু যকৃতে। আমার বিশ্বাস আমাদের পলিটিসিয়ানরা অদ্যাবধি পেট্রিয়টিজমের উক্তরূপ জলো-দুধের কারবার করছেন, এবং আর সকলকেও তাই করতে পরামর্শ দিচ্ছেন।

৪

যদি জিজ্ঞাসা করো যে, এই সহজ সত্যটা লোকের চোখে পড়ে না কেন?—তার উত্তর আমাদের অবস্থার গুণে। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বিদেশী রাজার অধীনে, সুতরাং ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশেরই আজ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য নেই। আমাদের পরস্পরের মধ্যে আজ প্রধান বন্ধন হচ্ছে পরাধীনতার বন্ধন, এবং এ অধীনতার পাশ হতে কোনও প্রদেশবিশেষ নিজ চেষ্টায় নিজ কর্ম্মগুণে মুক্ত হতে পারবে না। এ অবস্থায় আমাদের সবারই পলিটিক্যাল-সমস্যা একই সমস্যা। সে সমস্যা হচ্ছে এই যে, অধীনতা কি করে স্বাধীনতায় পরিণত করা যায়। সুতরাং আজকের দিনে ত্রিশকোটি ভারতবাসীকে 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' এই উপদেশ কিম্বা আদেশ দিতে আমরা বাধ্য। আমাদের সকলেরই তাই একই বাদ, সে হচ্ছে অধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর আমাদের সকলেরই গম্যস্থান একই—স্বরাজ্যে।

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের মূল্য যে কি, তা দেশের লোক স্বরাজ্যে পৌঁছিবামাত্র টের পাবে। অধীনতার যোগসূত্র স্বাধীনতার স্পর্শে ছিঁড়ে যাবে। প্রভুত্বের চাপে দাসের দল একাকার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানব তার স্বধর্মের চর্চ্চা ক'রে তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলবে। তখন ভারতবর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবে। আজকের দিনের কংগ্রেসী-ঐক্যের সঙ্গে সে ঐক্যের আকাশ পাতাল প্রভেদ হবে। বাইরের চাপে মিলিত হওয়া, আর প্রীতির প্রভাবে মিলিত হওয়া একবস্তু নয়। এক জেলে পাঁচজন কয়েদির মিলন আর এক সমাজের পাঁচজন স্বাধীন লোকের মিলনের ভিতর যে প্রভেদ আছে, আজকের ভারতের নানা জাতির কংগ্রেসী-মিলনের সঙ্গে কালকের স্বরাজ্যবাসী জাতিদের মিলনের সেই প্রভেদ থাকবে। তখন প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের ভিত্তির উপরেই বাক্যগত নয় বস্তুগত ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজম গড়ে উঠবে।

আমি শুধু এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কংগ্রেসী-পেট্রিয়টিজমের পিছনে যে মন আছে, সে হচ্ছে আমাদের সকল জাতের বিলেতি পুঁথিপড়া মন। সে মন আমাদের সবারই এক। কিন্তু তার নীচে যে মন আছে সে মন প্রতি জাতির নিজস্ব এবং পরস্পর পৃথক। আর আমাদের ভবিষ্যত সভ্যতা গড়ে উঠবে আমাদের মনের এই গভীর অন্তস্তল হতে। বিদেশী-শিক্ষার ফলে এই সত্যটা ভুলে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে বলে আজকের দিনে ভারতবর্ষের প্রতি জাতিকে বলা আবশ্যক know thyself এবং প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের সার্থকতাই এইখানে। স্বজাতীয় স্বার্থসাধনের জন্য আমাদের সকলেরই আজ প্রস্তুত হতে হবে।

৫

আর বেশি এগোবার আগে একটা কথার অর্থ পরিষ্কার করা দরকার, সে কথাটা হচ্ছে স্বার্থ। ও-কথাটা উচ্চারণ করবামাত্র আমাদের চোখের সুমুখে ধন-ধান্যের সোনার ছবি এসে দাঁড়ায়। এ ত হবারই কথা। আমরা যখন প্রাণী ও প্রাণের সর্বপ্রধান চেষ্টা যখন আত্মরক্ষা করা, তখন অন্ন আমাদের চাই-ই চাই।

আর পলিটিক্সের যত বড় বড় কথা আছে তার আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক খোলস ছাড়িয়ে নিলে কি দেখা যায় না যে, তার ভিতরকার মোটা কথা হচ্ছে অন্ন? আজকের দিনে পৃথিবীতে পলিটিক্সের দুটি বড় কথা হচ্ছে capitalism এবং bolshevism, বাদবাকী আর যত রকম 'ism' আছে সে সবই হয় capitalism নয় bolshevism-এর কোঠায় পড়ে। হাল পলিটিক্সের এই দুই ধর্ম্ম এতই পরস্পর বিরোধী যে উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধেক পৃথিবী জুড়ে আজ জীবন-মরণের যুদ্ধ চলছে। অথচ এই উভয় পলিটিক্যাল ধর্ম্মের ভিতর একই জিনিস আছে এবং সে জিনিস হচ্ছে অন্ন। তবে মানব জাতি যে দুভাগ হয়ে পড়েছে সে ঐ অন্নের ভাগ নিয়ে। Capitalism-এর মূল সূত্র হচ্ছে অল্প লোকের বহুঅন্ন আর bolshevism-এর মূল সূত্র হচ্ছে বহুলোকের যথেষ্ট অন্ন। আমার বিশ্বাস এ দুয়ের কোনটিই টিঁকবে না। কেননা Capitalism ভুলে গিয়েছে যে রুটি সকলেরই চাই, আর bolshevism মনে রাখে নি man does not live by bread alone, অর্থাৎ—মানুষের মন বলেও একটা জিনিস আছে, অতএব পেটের খোরাক ছাড়া মানুষের মনের খোরাকও চাই, নচেৎ মানুষ পশুর সঙ্গে নির্ব্বিশেষ হয়ে পড়ে।

এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, স্বার্থের মোটা অর্থ হচ্ছে পেটের স্বার্থ, আর পলিটিক্স ও ইকনমিক্স প্রভৃতি মুখ্যত এই স্বার্থসিদ্ধির মন্ত্রতন্ত্র। মনের স্বার্থের সঙ্গে এ মন্ত্রতন্ত্রের সম্বন্ধ গৌণ। তবে যে পেটের কথাকে আমরা আত্মার কথা বলে ভুল করি, তার কারণ অন্নের সঙ্গে প্রাণের, প্রাণের সঙ্গে মনের, সংক্ষেপে উদরের সঙ্গে হৃদয়ের এবং হৃদয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের সুখ মানুষের উন্নতি এই অন্ন ও মনের যোগাযোগেরই উপর নির্ভর করে। একমাত্র ভৌতিক ভাত খেয়ে মানুষ তার সৎ রক্ষা করতে পারলেও, তার চিৎ ও আনন্দ রক্ষা করতে পারে না। অপর পক্ষে একমাত্র সঙ্গীতানন্দ সেবন করে মানুষ তার আনন্দ রক্ষা করতে পারলেও তার চিৎ ও সৎ রক্ষা করতে পারে না। আর সচ্চিদানন্দ হওয়াই ত মানবজীবনের সার্থকতা। অতএব দাঁড়াল এই যে, মানুষের পক্ষে যেমন লাঙল চাই তেমনি লেখনীও চাই, যেমন হাতুড়ি চাই তেমনি তুলিও চাই, জাতীয় জীবনে যেমন পলিটিক্স ও ইকনমিক্স চাই, তেমনি বিজ্ঞান ও আর্ট, কাব্য ও দর্শনও চাই।

সুতরাং একজাতের nationalism-এর নাম শোনবামাত্র আমরা যখন সেটি অপরের nationalism-এর বিরোধী মনে করে ভীত হয়ে উঠি তখন বুঝতে হবে যে আমরা nationalism শব্দটা তার শুধু ঔদরিক অর্থে বুঝি, কেননা মানুষ মানুষের সঙ্গে শুধু অন্ন নিয়েই মারামারি কাড়াকাড়ি করে, কিন্তু মানুষের মনোজগতের বস্তু হচ্ছে পরস্পরের আদানপ্রদানের বস্তু, এক কথায় বিশ্বমানবের সম্পত্তি কোনও জাতিবিশেষের স্থাবর সম্পত্তি নয়। যখন কোনও ব্যক্তি অপর জাতের সঙ্গে মনের কারবার বন্ধ করবার প্রস্তাব করেন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি হচ্ছেন ঘোর materialist, কেননা তাঁর বিশ্বাস যে mind-ও matter-এর মত দেশের গণ্ডীতে বদ্ধ। এ কথাটা এখানে উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে, এ দেশে নিত্যই দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিকতার বেনামিতে জড়বাদ, যেমন শতমুখে প্রচার হচ্ছে তেমনি দেশময় নির্ব্বিচারে গ্রাহ্যও হচ্ছে। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। ঔদরিকস্বার্থসাধন করবার চেষ্টাটা মোটেই নিন্দনীয় নয়, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও নয়, জাতিবিশেষের পক্ষেও নয়। সুতরাং পলিটিক্সের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে জাতীয় অন্ন-সমস্যার সমাধান করা। আর বলা বাহুল্য, এ সমস্যার মীমাংসা জাতীয় অবস্থার জ্ঞান সাপেক্ষ। কথার রাজ্য থেকে কাজের রাজ্যে নেমে এলেই আমাদের বস্তুজগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অনেকটা আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়। দেশশাসনের ভার যখন আমাদের হাতে আসবে তখন দেখা যাবে যে, প্রতি প্রদেশ তার নিজের সামাজিক ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। তখন যা আমাদের বিশেষ কাজে লাগবে সে হচ্ছে প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজম। যে রুসোর পলিটিক্যাল মতামতের ঘসা-পয়সা নিয়ে আমাদের পেট্রিয়টিজমের আগাগোড়া কারবার তিনিই বলে গেছেন যে, কর্ম্মক্ষেত্রে পেট্রিয়টিজমকে অনেকটা সঙ্কুচিত করে আনতে হয়।

সে যাই হোক আমার বাঙ্গালী nationalism-মূলক

মানসিক এবং গৌণত রাজনৈতিক। আমাদের মনের স্বরাজ্য লাভ করা ও রক্ষা করা এবং তার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমার প্রধান ভাবনা। রাজনৈতিক স্বরাজ্য মনে স্বরাট হবার একটি উপায় মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬

এখন বাঙালীর মনের বিশেষত্ব যে কোথায় তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক্। এ পরিচয় দেওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা বাঙালীর national-self-consciousness কতকটা প্রবুদ্ধ হয়েছে। এই national-self-consciousness কথাটা আমাদের স্বদেশীযুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সেকালে অবশ্য দেশের লোক কথাটা তার পলিটিক্যাল অর্থেই বুঝত। তখন আত্মজ্ঞান অর্থে আমরা বুঝতুম আমাদের পরাধীনতা সম্বন্ধে জাতীয় চৈতন্য ও বেদনা। বলা বাহুল্য, এই সংকীর্ণ অর্থে, সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মজ্ঞান ও বাঙলার আত্মজ্ঞান একই বস্তু। কিন্তু এ বোঝাটা ভুল বোঝা। কেন না তা হলে স্বাধীন জাতের পক্ষে—জাতীয় আত্মজ্ঞান বলে কোনও জিনিসই নেই। কিন্তু তা যে আছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে ঐ সমস্ত পদটি ইউরোপ থেকে এ দেশে আমদানি করা হয়েছে, ও-পদের বিলেতে জন্ম। কথাটা এতই বিলেতি যে, আমাদের কোনও ভাষায় ওটির সঠিক তরজামা করা চলে না।

মানুষমাত্রেই মুখ্যত এক হলেও সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে। আর ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলা, কেন না সেই চেষ্টাতেই তার সুখ সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি। যাতে করে এই স্বাতন্ত্র্য চেপে দেয় তাই হচ্ছে বন্ধন। জীবনের বন্ধনের চাইতে মনের বন্ধন কম মারাত্মক নয়। আর আমাদের মনের যে একটা বিশেষ ধাত আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। একটা জানা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। জাতীয় মনের আসল প্রকাশ সাহিত্যে। বর্তমান ভারতবর্ষে বাঙলা সাহিত্যের তুল্য দ্বিতীয় সাহিত্য নেই। ভারতবর্ষের অপর কোনও জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে এক লোকে বাস করি নে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি ভারতবর্ষের অপর কোনও জাত তদনুরূপ পারে নি।

ইউরোপীয় শিক্ষা যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনের অল্প বিস্তর বদল করেছে এ কথা আমি মানি, কেননা না-মেনে উপায় নেই। আমাদের পলিটিক্যাল-মতামত যে, 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত আগাগোড়া বিলেতি জিনিস, এ ত সবাই জানে। দেশশুদ্ধ লোকের পলিটিক্যাল-আত্মা যে ইউরোপের হাতে গড়ে উঠেছে, এ কথা এক পেশাদার ন্যাসনালিষ্ট ছাড়া আর কারো অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই।

তবে অপর ভারতবাসীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে, আমরা ইউরোপের কাছে এক পলিটিক্স ছাড়া আরো কিছু বিদ্যা আদায় করেছি। ইউরোপের কাব্য বিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। Lafcadio Hern-এর বইয়ে পড়েছি যে সেক্সপিয়ারের নাটক—জাপানিদের মনের কোনখানে স্পর্শ করে না। অপর পক্ষে সেক্সপিয়ারের কাব্য আমাদের মনের সকল তারে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়ে ওঠে।

শুধু কাব্য নয় ইউরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে, ইন্দ্রিয়ের দর্শনের স্পর্শনের, মনের ধ্যান ধারণার বস্তু। আমরা জানি রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে; রূপ খালি আর্টে নেই প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য, তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই বিশ্ব-মানব

মহাকাব্যের রসাস্বাদ করবার কৌতূহল আমাদের অনেকেরই মনে আছে। তাই না বাঙালী-যুবক Einstein-এর নবাবিষ্কৃত আলোক-তত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল, যদিচ তারা সবাই জানে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্ম্মে ভাঙিয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাঙলায় জগদীশ বসু প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালীর এতটা ঝোঁক।

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত বলবেন যে, বাঙালীর জ্ঞান, জ্ঞানমাত্রই থেকে যায়, তা কোনও কাজে লাগে না। বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগ যে বাঙালী ততটা করায়ত্ত করতে পারে নি এ কথা সত্য। আমার বিশ্বাস এ অক্ষমতার জন্য যত না দায়ী আমাদের প্রকৃতি, তার চাইতে ঢের বেশি দায়ী আমাদের অবস্থা। কল কারখানা গড়বার শক্তির অভাব সম্ভবত বাঙালীর নেই, অভাব আছে শুধু সুযোগের। সে যাই হোক যা সত্য ও যা সুন্দর তার প্রতি বাঙালী মনের এই সহজ আনুকূল্যের প্রশ্রয় দিয়েই তার জাতীয় জীবন সার্থক করে তোলা যেতে পারে। যেমন ব্যক্তিবিশেষের তেমনি জাতিবিশেষের প্রকৃতির উল্টো টান টানতে গেলে তার জীবনকে ব্যর্থতার দিকে অগ্রসর করা হয়। আজ ইউরোপীয় শিক্ষা বয়কট করবার যে হুজুগ উঠেছে তাতে যে বাঙালী সোৎসাহে যোগদান করতে পারছে না তার কারণ যে-বাঙালীর চিন্তা করবার অভ্যাস আছে, সেই জানে যে উচ্চ শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় শক্তি উদ্বোধিত করবার সর্ব্বপ্রধান উপায়। কোনও জাতির পক্ষে স্বধর্ম্ম হারিয়ে স্বরাট হবার চেষ্টাটা বাতুলতা মাত্র। ভারতবাসী যখন স্বরাজ্য লাভ করবে তখন ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশই তার শিক্ষা দীক্ষার উপর অপর কোনও প্রদেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। প্রতি স্ববশ সজ্ঞান জাতির একটা না একটা বিশেষ জাতীয় আদর্শ থাকে এবং সেই আদর্শ অনুসারেই সে জাতি তার শিক্ষার ব্যবস্থা করে। যার নিজস্ব বলে কোনও জিনিস নেই, অথবা নিজস্ব যে রক্ষা করতে বিকশিত করতে না চায় তার পক্ষে স্বাধীনতার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু তাই নয়, তার কাছে উক্ত শব্দের কোন অর্থও নেই। স্বভাবব্যক্ত করবার জন্যই ত স্বাধীনতার আবশ্যক।

আমার শেষ কথা এই যে, আমাদের পুঁথিপড়া মনের সঙ্গেও বাকী ভারতবর্ষের পুঁথিপড়া মনের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। সুতরাং আমাদের পলিটিক্যাল-মনও অন্য প্রদেশের পলিটিক্যাল-মনের ঠিক অনুরূপ নয়। মনে রেখো, মানুষের পলিটিক্যাল-মন তার সমগ্র মনের বহির্ভূত নয়, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিতও নয়। অবশ্য একদলের কংগ্রেস-ওয়ালা আছেন যাঁরা এ কথা মানেন না, যদি মানতেন তাহলে তাঁদের দলে টিকিওয়ালা-ডিমোক্রাট-রূপ অদ্ভুত জীবের এতটা প্রাধান্য হত না।

ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের মনের যে বদল আবশ্যক, এ জ্ঞান আমাদের যুবক শ্রেণীর মনে যে প্রবেশ করেছে তার পরিচয় আমি পাঁচজনের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় নিত্যই পাই। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করব না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দেশের অধিকাংশ লোককে দাস ও স্ত্রীলোককে দাসী করে রাখব অথচ পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মত রাজনৈতিক জগতে স্বরাট হব, এরূপ মনোভাব যে যুগপৎ লজ্জাকর ও হাস্যকর, এ ধারণা এ যুগের বহুবাঙালীর মনে জন্মেছে। তবে এ মনোভাব যে আমাদের দৈনিক সংবাদ পত্রে ও বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে গর্জ্জে ওঠে নি, তার কারণ নিজের বিরুদ্ধে হুজুগ করা চলে না। যে ভাব মনে পোষণ করবার জন্য, যে কাজ করবার জন্য আমরা মনে মনে লজ্জিত হই তা নিয়ে প্রকাণ্ড ঢাক পেটানো অসম্ভব, আমরা ঢাক পেটাতে পারি শুধু আমাদের কাল্পনিক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে। কতকটা শিক্ষার বলে কতকটা পরীক্ষার ফলে আমরা আমাদের প্রকৃতি ও শক্তি দুয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করেছি। নিজের ত্রুটির জ্ঞানও আত্মজ্ঞানেরই একাংশ। এবং আত্ম-জ্ঞান আমাদের মনে জন্মেছে বলে, তারই উপর আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের অন্তরের বল আমরা পরিপুষ্ট করতে চাই, তাই আমরা শিক্ষার জাতিবিচার করে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয়ের কোঠায় ফেলতে চাই নে, আর আমাদের দুর্ব্বলতা আমরা পরিহার করতে চাই বলে, আমরা লোকের জাতি বিচার

করে তাকে আচরণীয় কিম্বা অনাচরণীয় করে রাখা, পেট্রিয়টিক কাজ বলে মনে করিনে। কোন জাতির পক্ষে তার চিরাগত সংস্কার থেকে মুক্তিলাভ করে নবজীবন ও নবশক্তি লাভ করা সহজসাধ্য নয় এবং সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবার সাধন-পদ্ধতির নাম রাজনৈতিক হুজুগ নয়, কেননা ক্ষণিক উত্তেজনার পিঠ পিঠ আসে স্থায়ী অবসাদ। জাতীয় ঐশ্বর্য্য অবশ্য জাতীয় কৃতিত্বের উপর গড়ে ওঠে। এবং কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সাহিত্যে ও সমাজে, দর্শনে ও ধনে, বিজ্ঞানে ও আর্টে। মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা—উপাধি কিম্বা ওকালতি, শুনতে পাই মহা কঠিন; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা; অর্থাৎ—কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন, কেননা এ লড়াই চিরজীবন ব্যাপী, এক মুহূর্ত্ত তার বিরাম নেই। দেখতে পাচ্ছ আমি রাজসিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি। একে আমি বৈদিক-তান্ত্রিকসমাজে জন্মগ্রহণ করেছি, তার উপর আবার ইউরোপের রাজসিক সভ্যতার আব্‌হাওয়ায় মানুষ হয়েছি, সুতরাং আমার কাছথেকে তুমি অন্য কোনও মনোভাবের পরিচয় পাবার আশা করতে পার না। রাজসিক মন সাত্ত্বিক মনের চাইতে নিকৃষ্ট কি না বলতে পারি নে, তবে তা যে, তামসিক মনের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, দেশে আজ কাল যে সকল মনোভাব সাত্ত্বিক বলে চলছে, সে সব পুরোমাত্রায় তামসিক। সে সবের মূলে আছে অজ্ঞতা আর ঔদাসীন্য, এক কথায় মনের জড়তা।

আমি বিশ্বাস করতে ভালবাসি যে আমার মন এ যুগের বাঙালীর মন। যদি তাই হয় ত বাঙালীর nationalism-এর আদর্শ যে কি তা অনুমান করা কঠিন নয়। সমগ্র ভারতবাসীকে ডোরকৌপীন পরানো আমাদের আদর্শ হতে পারে না। আজকের দিনে বাঙালীর যদি কোনও আন্তরিক প্রার্থনা থাকে ত সে এই—

"বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

কিন্তু এ প্রার্থনা, কোনও বাইরের শক্তির কাছে নয়। নিজের অন্তরনিহিত শক্তির কাছে। কারণ এ সত্য আমরা আবিষ্কার করেছি যে, বিদ্যা যশ লক্ষ্মী রূপ জয় এ সকলই আত্মবলে অর্জ্জন করতে হয়, প্রার্থনা বলে নয়। যদি কেউ বলেন যে, এ Ideal-এর মধ্যে ত self-sacrifice-এর কথা নেই, তার উত্তর আমি দেব, self-sacrifice কোনও জাতির আদর্শ হতে পারে না, জাতির পক্ষে একমাত্র আদর্শ হচ্ছে self-realisation. আর তার একমাত্র উপায় হচ্ছে বহু-লোকের পক্ষে self-realisation-এর ব্রত অবলম্বন করা।

আমার শেষ কথা এই যে, যে-দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালবাসি, সে বর্ত্তমান বাঙলা নয়, অতীত বাঙলাও নয়, ভবিষ্যৎ বাঙলা, অর্থাৎ—যে বাঙ্‌লা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমার বাঙালী-পেট্রিয়টিজম বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজমের বিরোধী নয়। আর এক কথা, যে-ন্যাসনালিজম বিবেকবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত সে ন্যাসনালিজমের ফলে শুধু পরের নয়, নিজেরও যে সর্ব্বনাশ হয়, গত ইউরোপীয় যুদ্ধ এই সত্য যার চোখ আছে তারই চোখের সুমুখে ধরে দিয়েছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

প্রাচীন ভারতের ভাস্কর-শিল্প

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম-এ, পি-আর্-এস

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩। মৌর্য্য-যুগ

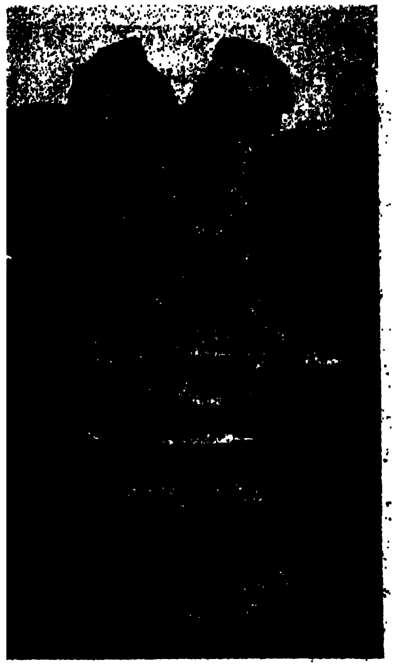
(ক)

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশটি ইতিহাসের সূচনা হইতেই চিরকাল রাষ্ট্র-বিপ্লবের, যুদ্ধবিগ্রহের ভূমিকম্পে আন্দোলিত। বৈদেশিক আগমন ও আক্রমণের কত ঝড়-ঝঞ্ঝা যে এই দেশাংশটির উপর দিয়া বহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মগধের সিংহাসনে যখন শিশুনাগবংশীয় রাজারা আসীন, তখন পশ্চিম সীমান্তের গান্ধার প্রদেশ পারস্তরাজ কাইরাসের অধীনে; এই গান্ধার প্রদেশের যোগেই পশ্চিম-এসিয়া ও ভারতের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এবং রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া পারসীক সাধনা ও শিল্পরীতি ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। কাইরাসের পরবর্ত্তী পারস্ত সম্রাট দরায়ুস ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া (৫১৬-৪৮৬ খৃষ্টপূর্ব্ব) গান্ধার হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুনদীর মোহানা পর্য্যন্ত পারসীক-আধিপত্য বিস্তার করেন। একশো বছরের উপর ভারত-বর্ষের এই পশ্চিমাংশটুকু পারস্তরাজ্যের অন্যতম প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যে যে পশ্চিম-এসীয় তথা পারসীক শিল্পের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাহার মূল কথাটি পশ্চিম-এসিয়া ও ভারতের এই রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। তবে, মৌর্য্য-যুগেই যে তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, আগে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ আগেই বলিয়াছি। মৌর্য্য-পূর্ব্ব যুগে পাথর লইয়া কাজ করিতে শিল্পীরা তখনও ভাল করিয়া শেখে নাই, মাটি লইয়া কাঠ লইয়াই ছিল শিল্পীর কাজ; সে কাঠ ও মাটির এমন কোনো শিল্প-নিদর্শন আজ আর নাই, এবং সেই হেতু সেই যুগের পারস্ত-ভারত মিশ্র শিল্প-ধারা সম্বন্ধে কোনো অনুমানও আর সহজ নয়।

দরায়ুসের ভারত আক্রমণের প্রায় দেড়শো' বছর পর গ্রীক বীর আলেকজান্দারের বিজয়ী গ্রীক-সৈন্যদল গান্ধার প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিপাশা নদীর তীর পর্য্যন্ত ভারতের সমগ্র পশ্চিম প্রদেশ জয় করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ায় প্রাচ্য ও গঙ্গাহৃদি-রাজসৈন্যভীত আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্য লইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন (৩২৭-৩২৫ খৃষ্টপূর্ব্ব)। ভারত-অধিকৃত প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থায় ভার রহিল গ্রীক-শাসনকর্ত্তার হাতে। কিন্তু সে-প্রভুত্বও আর বেশীদিন অটুট রহিল না। আলেকজান্দারের ভারত-সমুদ্র-তীর ত্যাগের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্ত মগধে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং গ্রীক-প্রভুত্বের অবসান করিয়া পারস্ত-সীমান্ত হইতে আসামের প্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের উপর মৌর্য্যাধিপত্য বিস্তার করিলেন। তাঁহারই পৌত্র দেবপ্রিয় রাজর্ষি অশোক সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিদের অন্যতম। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই মৌর্য্য যুগের যত শিল্প-সৃষ্টি; সে যুগের যে শিল্পরীতি, তাহাও তাঁহাকে এবং মৌর্য্য-যুগের রাষ্ট্রধারাকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। এইজন্যেই মৌর্য্যযুগের ভাস্করশিল্পের পরিচয় দিবার আগে ভারতে গ্রীক অভিযান, গ্রীক সংস্পর্শের কথা একটু বলিয়া লইতে হইল। কারণ মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যে একিমিনিয় বা পারসীক প্রভাব যেমন দেখা যায়, অল্প হইলেও গ্রীকেতর (Hellenistic) শিল্পের প্রভাবও যে আছে, একথাও স্বীকার করিতে হয়।

সম্রাট অশোকের দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ, প্রতিভা ছিল অদ্ভুত। তিনি যে শুধু ভারতবর্ষ জুড়িয়া "একরাট্" মহারাজচক্রবর্ত্তী হইবার, আসমুদ্রহিমাচল ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনেরই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা নয়; তাঁহার দৃষ্টি ভারতবর্ষের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার ফলেই অশোকের মৌর্য্য-ধর্ম্মমহামাত্র-দল ভগবান বুদ্ধদেবের করুণা ও মৈত্রীর বাণী লইয়া দিকে দিকে বিজয়াভিযানে যাত্রা করিয়াছিল—সিরিয়ায়, গ্রীসে, মিশরে, পারস্তে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রব্যাপারেও গ্রীকেতর প্রদেশ ও পশ্চিম-এসীয়ার রাজ্যগুলির সঙ্গে মৌর্য্য রাজা ও রাজসভার খুব একটা নিকট সম্বন্ধ ছিল; এবং এই সম্বন্ধের সূত্র অবলম্বন করিয়াই মৌর্য্য-সংস্কৃতির উপর পশ্চিম-এসীয় ও গ্রীকেতর সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজর্ষি অশোক যে নানা প্রস্তর-স্তম্ভের উপর, নানা পর্ব্বত গাত্রে বিচিত্র ধর্ম্মানুশাসন লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এই ধরণের অনুশাসন-লিখন পদ্ধতি যে একিমিনিয়-রাজ দরায়ুসের পর্ব্বত-গাত্রের শাসন-লিপি-রীতি দ্বারাই প্রভাবান্বিত, একথা বহুপূর্ব্বেই পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, মৌর্য্যযুগের অশোক প্রস্তর-স্তম্ভ গাত্রে অথবা অন্যান্য শিল্প-নিদর্শনে যে অপূর্ব্ব সুচিক্কণ উজ্জ্বল মসৃণতা দেখা যায়, পাথরকে এমন করিয়া মসৃণ করিবার রীতিও অশোকের রাজ-শিল্পীকুল একিমিনিয়-শিল্পীদের নিকট হইতেই শিখিয়াছিল। প্রাচীন পারস্যের পারসিপোলিস (Persepolis) ও অন্যান্য স্থানে এইরূপ উজ্জ্বল সুচিক্কণ মসৃণতা-মণ্ডিত অসংখ্য প্রস্তর-স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে।

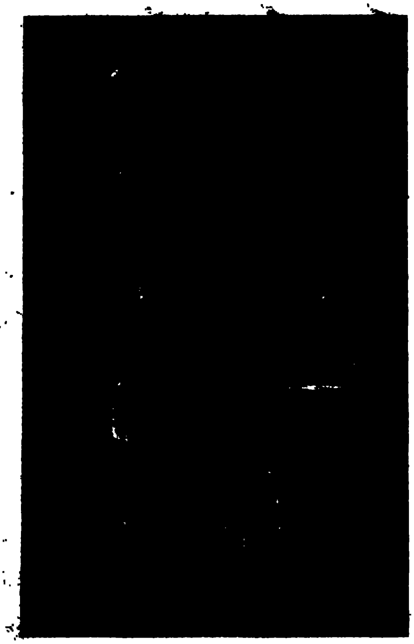
মৌর্য্য-যুগের ভাস্কর শিল্প-নিদর্শন খুব বেশী নাই। এবং যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই প্রায় ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলেই। তবু প্রধান প্রধান কয়েকটি নিদর্শন হইতেই এই বিশিষ্ট শিল্পধারার পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। নন্দনগড়, বসার, সাঁচি, সাঙ্কিস, সারনাথ, রামপুরবা ও অন্যান্য কোনো কোনো স্থানে মৌর্য্যযুগের যে-সব প্রস্তর-স্তম্ভ আছে, তাহার কোনো কোনোটির শীর্ষদেশে সিংহ, ষাঁড়, হাতী প্রভৃতি প্রাণিমূর্ত্তি আছে; এই মূর্ত্তিগুলি উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান দুই অবস্থাতেই দেখা যায়। তাহা ছাড়া কয়েকটি দণ্ডায়মান যক্ষ-মূর্ত্তিও আছে। এই প্রাণী ও যক্ষমূর্ত্তিগুলিই মৌর্য্য-শিল্পের প্রধান নিদর্শন। প্রস্তর-স্তম্ভগুলিতে যেমন, তেমনি এই মূর্ত্তিগুলির প্রস্তর-গাত্রেও খুব উজ্জ্বল সুচিক্কণ মসৃণতা দেখা যায়, এবং মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যের ইহাই একটি প্রধান বিশেষত্ব। সারনাথে অশোকের আমলের যে-স্তম্ভশীর্ষ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে চারিটি সিংহের উপবিষ্ট মূর্ত্তি আছে; সিংহ চারিটি 'পীঠাপীঠি'ভাবে উপবিষ্ট, সেইজন্যই সিংহগুলির সম্মুখার্দ্ধ ভাগই শুধু দৃষ্টিগোচর। (১নং চিত্র)



১নং চিত্র। সারনাথে প্রাপ্ত অশোক-স্তম্ভ-শীর্ষ।

যে-মণ্ডলাকৃতি পাদপীঠের উপর সিংহ চারিটি উপবিষ্ট, তাহার গায়ে চারিটি ধর্ম্মচক্র, এবং তাহার ফাঁকে ফাঁকে ষাঁড়, ঘোড়া, হাতী ইত্যাদির চারিটি প্রাণিমূর্ত্তি আছে। এই পাদপীঠটি আবার একটি ঘণ্টাকৃতি নিম্নমুখী উদগ্র ফুলিত পদ্মকোরকের উপর অবস্থিত। এই ঘণ্টাকৃতি নিম্নমুখী পদ্মটি সমস্ত মৌর্য্য প্রস্তর-স্তম্ভেই দেখা যায়, এবং সমসাময়িক স্তম্ভগুলিতে ইহার রূপ ও আকার প্রায় একই প্রকারের। তবে উপরের প্রাণিমূর্ত্তির শিল্প-রূপ সর্ব্বত্রই

কোথাও বা ইহার আকার একটু বিস্তৃত, কোথাও একটু সংকীর্ণ ও মুদিত; এবং তদনুযায়ী ঘণ্টাগাত্রের রেখাগুলি কোথাও একটু বক্রতর, কোথাও ঋজুতর। স্তম্ভশীর্ষে সিংহের মূর্ত্তি সাঁচী, রামপুরবা ও অন্যান্য স্তম্ভেও আছে; এবং এই ধরণের উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তি পশ্চিম-এসীয় ভাস্কর্য্যে প্রচুর দেখা যায়। শুধু সিংহ-মূর্ত্তিই নয়; এই ধরণের প্রাণীমূর্ত্তিসহ স্তম্ভশীর্ষ পশ্চিম-এশিয়ার সুসা ও পারসিপোলিসের প্রাচীনতর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে অশোকের ঘণ্টাকৃতি শীর্ষাংশও পারসীক স্তম্ভের ঘণ্টাকৃতি শীর্ষাংশ হইতেই উদ্ভূত। এ অনুমান কতকটা সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অশোক-স্তম্ভের গাত্রে ও শীর্ষে মৌর্য্য-শিল্পীর নিজস্ব-সৃষ্টির পরিচয়ও যথেষ্ট আছে, এবং ইহা খুবই সম্ভব যে ঘণ্টাকৃতি শীর্ষাংশের পরিকল্পনা মৌর্য্য-শিল্পীরা নিজেরাই করিয়াছিল, যদিও তাহার কতকটা আভাস একিমিনির শিল্প হইতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। যাহা হউক, স্তম্ভশীর্ষের প্রাণীমূর্ত্তিগুলিতে যে খানিকটা গ্রীকেতর ও পশ্চিম-এসীয় শিল্পের প্রভাব আছে, তাহাতে আর সন্দিহান হইবার কোন অবকাশ নাই। এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় উপবিষ্ট সিংহগুলির স্ফীত শিরা উপশিরা ও পেশীসমূহের অমিত বিক্রমপ্রকাশের ভঙ্গির মধ্যে, প্রত্যেকটি পৃথক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উদ্ধত শক্তি ও বিক্রমলীলাকে পৃথক পৃথক গড়নের মধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টায়। সিংহের কেশরপুঞ্জকে স্তরে স্তরে পৃথক পৃথক গুচ্ছে সাজাইবার যে প্রয়াস, নির্গত-জিহ্ব ব্যাদিত-মুখের যে মুখভঙ্গি ও রূপ, তাহার মধ্যেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এমন যে নিরীহ বৃষ, উপবিষ্ট সিংহ-চতুষ্টয়ের পাদ-পীঠে তাহার যে রূপ তাহাও কি দৃপ্ত ও উদ্ধত! তাহার সমস্ত শিরা ও পেশী যেন শক্তির উল্লাসে নাচিতেছে; প্রত্যেকটি পৃথক অঙ্গের যেন পৃথক গড়ন। পাথরের গায়ে মূর্ত্তিটিকে খুদিয়া তোলা হইয়াছে, কিন্তু মনে হয় যেন সমস্ত মূর্ত্তিটি পাথরটি হইতে পৃথক, শুধু প্রস্তর-বেষ্টনীটির গা' স্পর্শ করিয়া বৃষ-মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান। পাদ-পীঠের উপবিষ্ট সিংহমূর্ত্তিগুলিকে যেমন একটা সুবৃহৎ প্রস্তরাংশ হইতে খুদিয়া একেবারে পৃথক একটা রূপ দেওয়া হইয়াছে (sculpture in the round), পাদপীঠের উপর উৎকীর্ণ বৃষটির মূর্ত্তিটিও যেন মনে হয়, তেমনি একটা পৃথক রূপে রূপায়িত, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রস্তরাংশ হইতে তাহা পৃথক নয়। এই পাদপীঠের অপরদিকে একটি তেজস্বী ধাবমান অশ্বের মূর্ত্তি আছে; ধাবমান অশ্বের যে বাস্তব রূপ উহার মধ্যে তাহাই অবিকল রূপায়িত হইয়াছে। সেই শিরা ও পেশীর স্ফীত মর্জন ইহার মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু রামপুরবা-তে প্রাপ্ত অশোক-স্তম্ভ-শীর্ষের যে দণ্ডায়মান বৃষমূর্ত্তি (২নং চিত্র) তাহাতে কতকটা



২নং চিত্র। রামপুরবা-তে প্রাপ্ত অশোক-স্তম্ভ-শীর্ষ।

স্থির শান্ত সমাহিত ভাব দেখা যায়; তৎসত্ত্বেও দাঁড়াইবার দৃপ্ত ভঙ্গিতে, শিরা ও পেশীর গড়নে, পাথরের উজ্জ্বল মসৃণতায় এবং সর্ব্বোপরি ঘণ্টাকৃতি নিম্নমুখী পদ্মটিতে মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যের স্থির ও নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায়। বৃষের রূপাকৃতিটি হয়ত শিল্পীর ভাল জানা ছিল না; কিন্তু এই অজ্ঞানতা লইয়াও সুবৃহৎ ও সুকঠিন পাথরের উপর ভাস্কর্য 'বাটাল' চালাইয়া তাহাতে একটা বিশিষ্ট রূপদান

করিতে শিল্পীর সাহসের অভাব কোথাও হয় নাই। আগেই বলিয়াছি, শিল্পরীতিতে এই প্রাণীমূর্তিগুলির সঙ্গে সুসানগরে প্রাপ্ত পশ্চিম-এসীয় ভাস্কর্যের প্রাণীমূর্তিগুলির একটা নিকট সাদৃশ্য আছে; কিন্তু পশ্চিম-এসীয় শিল্পে সমসাময়িক গ্রীকেতর শিল্পের প্রভাবের ফলে সেই প্রাণী-মূর্তিগুলির মধ্যে জীবনের যে অদ্ভুত শক্তি-লীলার প্রাচুর্য্য দেখা যায়, মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যে তাহার পরিচয় খুব বেশী নাই। তবু, এই প্রাণীমূর্তি গুলির শিল্পরীতির প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই বেশ বুঝা যায় যে মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যে ভাস্কর-শিল্পের শৈশবাবস্থার পরিচয় কোথাও নাই; শিল্পী যে শুধু পাথর লইয়া কাজ করিবার দক্ষতাই অর্জ্জন করিয়াছে তাহাই নয়, পাথরকে কি করিয়া একটা বিশেষ সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে রূপদান করিতে হয়, তাহার মধ্যে জীবনী-শক্তির প্রাচুর্য্য একটা বিশেষ রীতিতে কি করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়, বিভিন্ন-স্থানক দৃষ্টিতে, বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রাণীদেহকে কি করিয়া উপস্থিত করিতে হয়, এ-সমস্ত কৌশলই মৌর্য্য শিল্পীর আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তাহার শিল্পজ্ঞানের পশ্চাতে একটা বহুদিনের শিক্ষা বহু শিল্পচর্য্যার বিশেষ অভিজ্ঞতা যে ছিল, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। নহিলে সর্ব্ব-প্রথম মৌর্য্যযুগে হঠাৎ এমন একটা সমৃদ্ধ শিল্পের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হইত না।

অশোক-স্তম্ভ-শীর্ষের এই পশু-মূর্তিগুলি ছাড়া মৌর্য্য-যুগের অন্য যে কয়েকটি শিল্প-নিদর্শন আমাদের জানা আছে, তাহার মধ্যে পাটনায় প্রাপ্ত দুইটি দণ্ডায়মান মনুষ্য-মূর্তি, ও দিদারগঞ্জে (পাটনা জেলা) প্রাপ্ত একটি নারীমূর্তিই প্রধান। তাহা ছাড়া কাশীর নিকট সারনাথে প্রাপ্ত একটি মনুষ্যমূর্তির উত্তরার্দ্ধও অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পাটনায় প্রাপ্ত নরমূর্তি দুইটি সাধারণতঃ যক্ষমূর্তি এবং দিদারগঞ্জের নারীমূর্তিটি যক্ষিণীমূর্তি বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে। তিনটি মূর্তিই বৃহদাকার, সাধারণ নর ও নারী-দেহাপেক্ষা কোনো অংশেই ক্ষুদ্রতর বা লঘুতর নয়, বরং তাহার বিপরীত হইলেও হইতে পারে। তিনটিরই প্রস্তর-গাত্র খুব উজ্জ্বল ও মসৃণ, এবং ইহাদের রূপ (form) ও গড়নভঙ্গি (modelling) একই রকমই সমান। ইহা হইতেই মনে হয়, ইহারা তিনজনই মৌর্য্যশিল্পীরই সৃষ্টি। কি পশুমূর্তি কি মনুষ্যমূর্তি, মৌর্য্য-শিল্প-নিদর্শনের একটা খুব বড় পরিচয় ইহাদের বৃহৎ আকার ও আয়তন; সুবৃহৎ সুকঠিন পাথর লইয়া কাজ করিবার শিল্পীদের একটা দুর্জ্জয় সাহস, এবং অবলীলাক্রমে তাহাকে লইয়া রূপ-সৃষ্টি করিবার প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যে কোথাও কোনো দুর্ব্বলতার একটু চিহ্নমাত্র নাই।

পাটনায় প্রাপ্ত যক্ষমূর্তি দুইটির একটি মস্তকবিহীন; অন্যটির মস্তক আছে, কিন্তু জানুর কতকটা নীচে হইতে পা দুইটি ভাঙিয়া গিয়াছে (৩নং চিত্র)। দক্ষিণ কাঁধের খানিকটা ও সমগ্র হাতখানি, এবং বাম হাত-খানিরও বেশীর ভাগই ভাঙিয়া গিয়াছে। মুখ-খানিরও ক্ষতি খানিকটা হইয়াছে; তাহার ফলে ঠিক রূপটি (form) ও ভাব-ইঙ্গিতটুকু (expression) আমাদের ধরিতে পারা কঠিন হই-য়াছে। মূর্তিটি ঠিক সোজা হইয়া দণ্ডায়মান, তবে পা-দুটি ঠিক সম-পদ-স্থানক নয়, ডান পাটি ঈষৎ অগ্রসর, কিন্তু সম্মুখ দিক হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই, এই ঈষৎ ঝুঁকিয়া চলিবার ভঙ্গিটুকু পিছন হইতেই শুধু লক্ষ্য করা যায়। তাহা ছাড়া সম্মুখ হইতে দেখিলে মনে হয়, বাহু ও পাশ যেন প্রায় এক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পিছন হইতে ঐ

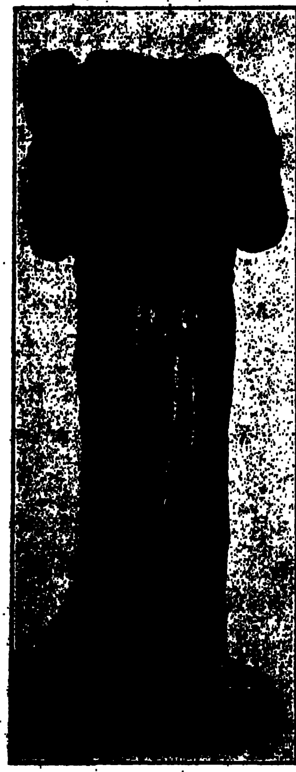


৩নং চিত্র। পাটনায় প্রাপ্ত দণ্ডায়মান যক্ষমূর্তি।

দুটি প্রত্যঙ্গের রূপ খুব স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়, ঘাড় ও গলার রূপাকৃতির (form) মধ্যে সমতাবোধের কোনো অভাব আছে বলিয়া আর মনে হয় না। মূর্ত্তিটির এক-একটি অঙ্গাংশের স্থানক-ভঙ্গি (position) এক-এক প্রকারের, কিন্তু এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের সঙ্গতির একটু অভাব আছে। দেহের উত্তরার্দ্ধ ও মুখটি বেশ একটু মাংসল ও আয়তন-বহুল (heavy); এবং গড়নের ভাবটিও একটু স্থূল ও দৃঢ় বলিয়াই মনে হয়। সেইজন্ত কি মুখ, কি দেহাকৃতি কোথাও একটা সুসামঞ্জস্য দেখা যায় না। শিরা বা পেশীগুলিকে পৃথক ভাবে গড়িয়া দেখাইবার চেষ্টা অল্পই আছে। দেহের উত্তরার্দ্ধের সঙ্গে নিম্নার্দ্ধের আয়তনের সমতাবোধের অভাবও আছে। জীবনের লীলাও যেন ইহার [illegible] স্থির ও স্তব্ধ। এই গতিবিহীনতা ও আকৃতির [illegible]বহুলতার ফলে একটা ভারী গাম্ভীর্য্যের আভাস পাটনার দুটি যক্ষমূর্ত্তিতেই আছে একথা সত্য, কিন্তু এ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে কোনো বিপুলতার, কোনো আভিজাত্যের পরিচয় [illegible]।

পাটনার মস্তকবিহীন [illegible] ঠিক এই ধরণেরই। এবং ইহার সম্বন্ধেও এই কথা[illegible] প্রয়োগ করা যাইতে পারে (৪নং চিত্র)। এমূর্ত্তি[illegible]-স্থানক-ভঙ্গিতে সরল ভাবে দণ্ডায়মান ; কিন্তু পিছু[illegible] হইতে দেখিলে ইহারও ডান পায়ের অগ্রসর ভঙ্গিতে [illegible] চলার ইঙ্গিত আছে। মূর্ত্তিটির মাথা নাই বটে, [illegible], যদিও তাহার গড়ন অত্যন্ত [illegible]। এ মূর্ত্তিটিও মাংসল ও আয়তনবহুল, [illegible] গড়ন স্থূল ও দৃঢ়, এবং আকৃতির মধ্যে সা[illegible] অভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহারও গতি স্থির ও স্তব্ধ। [illegible] উত্তরার্দ্ধের আকৃতির মধ্যে একটা বীর্য্যের আভাস আছে একথা সত্য, কিন্তু গড়নের ভাষার মধ্যে তাহার কোনো পরিচয় ফুটিয়া উঠে নাই।

[illegible] এই দুইটি মূর্ত্তির অলঙ্কার ও বসনবিন্যাস প্রায় একই প্রকার। মস্তকবিহীন মূর্ত্তিটির ডান কাঁধের উপর হয়ত একটি চামরের ভগ্ন অংশ লাগিয়া আছে ; বোধ হয়, অপর মূর্ত্তিটিরও তাহাই ছিল ; এবং দুটি মূর্ত্তিই কোনো রাজা অথবা সম্রাটের পার্শ্ব-প্রহরীর শিল্পরূপ। ইহাদের বাহুতে ভারী স্থূল কুণ্ডলিত বলয়, কণ্ঠেও স্থূল ভারী হার। ইহাদের গড়ন-ও স্থূল এবং দৃঢ়, এবং এই হিসাবে মাংসল দেহের আকৃতি ও আয়তন এবং তাহার স্থূল দৃঢ় গড়নের সঙ্গে ইহাদের একটা সামঞ্জস্য আছে ; এ সামঞ্জস্য ও সমতাবোধ না থাকিলেই বরং অশোভন হইত। বাম কাঁধের উপর হইতে দক্ষিণ কটিদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত উত্তরীয়টির রূপ ও বিন্যাসভঙ্গি, ও তাহার গড়নও একই প্রকার। পদযুগ পর্য্যন্ত বিলম্বিত পরিধেয় বস্ত্রটি কটিদেশে একটি বন্ধনীদ্বারা আবদ্ধ ; সেই বন্ধনী-রজ্জুটি কটিদেশের সম্মুখে সুচারু গ্রন্থিতে যুক্ত ও বিভিন্ন লহরে বিলম্বিত। কাপড়ের ভাঁজগুলি সরুমোটা রেখার গড়নের সাহায্যে দেখানো হইয়াছে ; তাহাতে ভাঁজগুলির বাস্তব রূপ অক্ষুণ্ণ থাকে নাই, কিন্তু শিল্পীর উদ্দেশ্য ভালই সাধিত হইয়াছে। সমগ্র বস্ত্রটির পৃথক কোনো অস্তিত্ব নাই, উহা দেহের রেখা ও আকৃতিকে অতিক্রম করিয়া উহাকে কখনও আচ্ছন্ন করে নাই, বরং উহার রেখা (line) ও আকৃতিকে (form) অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে ; শুধু পায়ের পশ্চাদ্দিকে যেখানে বস্ত্রটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে সেই স্থানে [illegible]


৪নং চিত্র। পাটনায় প্রাপ্ত মস্তকবিহীন দণ্ডায়মান যক্ষমূর্ত্তি।

উহাকে একটা পৃথক সত্ত্বা দান করা হইয়াছে। এই মূর্ত্তি দুইটির কাপড় পরিবার রীতি ঠিক্ ভারতীয়দের মত 'কাছা' দিয়া কাপড় পরিবার মতন নয়; পশ্চিম-এসীয় শিল্পে যে রীতি দেখা যায়, কতকটা যেন সেই রীতিরই অনুকরণ।

এই মূর্ত্তি দুইটিতে মৌর্য্যযুগের সেই উজ্জ্বল মসৃণতা থাকিলেও এবং ইহাদের আয়তনের মধ্যে একটা বিরাটতার আভাস থাকিলেও ইহাদের রূপ ও গড়ন-রীতি দেখিয়া মনে হয়, এই মূর্ত্তি দুইটিতে মৌর্য্য-শিল্পের অবনতির সূচনা দেখা যায়। ইহাদের গড়নের স্থূল দৃঢ়তার মধ্যে, ইহাদের গতিবিহীন স্তব্ধতার মধ্যে, ইহাদের ভারী স্থূল আকৃতি ও দেহ-ভঙ্গির মধ্যে মৌর্য্যশিল্পের বিশিষ্ট রূপ, ভাব ও রীতি অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু দিদারগঞ্জের নারী-মূর্ত্তিটিতে যে শিল্পরূপের পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ খানিকটা তৃপ্ত হয় (৫নং চিত্র)। এই যক্ষিণী নারী সরল ভাবে দণ্ডায়মানা, পা দুটি সমপাদ-ভঙ্গিতে স্থিত, ডান হাতের চামর কাঁধ পর্য্যন্ত উত্তোলিত, বাম হাতখানি ভগ্ন। মাথার চুল লম্বা বেণী করিয়া বাঁধা, এবং সেই বেণী পশ্চাতে সুচারুরূপে বিলম্বিত, এবং সম্মুখ দিকে মুক্তামালায় অলঙ্কৃত। কণ্ঠ বেড়িয়া একগাছি মুক্তামালা, এবং স্তনযুগের মধ্যভাগে বিলম্বিত আর একটি দুই-নহর হার। কানে ভারী গোল কুণ্ডল, মণিবন্ধে অগণিত বলয় এবং পায়ে নূপুর। দেহের উত্তমার্দ্ধে কোনো বস্ত্র নাই; প্রাচীন ভারতে নর ও নারীর [illegible] পরিধানের ইহাই ছিল রীতি। নিম্নার্দ্ধের পরিধেয় বস্ত্রের রূপ ও বিন্যাস প্রায় যক্ষমূর্ত্তি দুটির পরিধেয় বস্ত্রেরই অনুরূপ। বস্ত্রটি কোমরে জড়ান; এবং তাহার প্রান্ত দুইটি দুই পায়ের মাঝখানে বিলম্বিত। কাপড়ের ভাঁজগুলি দেখাইবার ভঙ্গিও একই প্রকার। তাহা ছাড়া, উহা দেহের রেখা ও আকৃতি অনুসারী; পশ্চাৎদিকে দেখিলেই রেখাটিকে কি করিয়া উহা অনুসরণ করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। শুধু অলঙ্কার ও বসন বিন্যাসের দিক হইতেই নয়, ইহার দেহ ও আকৃতির দিক হইতেও যে ইহার সঙ্গে পরবর্ত্তী কালের সাঁচী, উদয়গিরি ও মথুরা নারীমূর্ত্তিগুলির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। ইহার অঙ্গাকৃতি মুখমণ্ডল কুণ্ডলভারে বিলম্বিত কর্ণ, ভারী পুরু ঠোঁট, মাংসল গণ্ডদেশ, ছোট মুখ, গহ্বরস্থিত অর্দ্ধমুদিত টানা চোখ, ভারী পরিপূর্ণ স্তনযুগ্ম, ক্ষীণকটিদেশ, ও ভারী প্রশস্ত নিতম্বদেশ শুধু যে পরবর্ত্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যেই নারীরূপের আদর্শ বলিয়া আদৃত হইয়াছে, তাহা নয়, ভারতীয় চিত্রে ও ভাস্কর্য্যেও নারীদেহের এই আদর্শ শিল্পীদের মন হরণ করিয়াছে। কি সে-কথা ছাড়িয়া দিয়া, এই যক্ষিণী মূর্ত্তিটির মধ্যে না রী দে হে র একটা বাস্তবরূপ আমরা দেখিতে পাই, যাহার কাছে যক্ষমূর্ত্তি দুইটির বহলায়তন গুরুরূপ অত্যন্ত ম্লান হইয়া যায়। যক্ষিণীটির নিম্নার্দ্ধ কতকটা স্থির ও অসাড়; কিন্তু নিতম্বরেখায়, বক্ষতটে এমন একটা সৌকুমার্য্য আছে, এবং অর্দ্ধপ্রস্থ-দৃষ্ট মূর্ত্তিতে দেখিলে তাহার স্তনযুগলের এমন একটা বিলম্বিত ভঙ্গি আছে যাহার মধ্যে দৈহিক লীলা-বিলাসের আভাস সুপরিস্ফুট। ঘাড় ও মেরুদণ্ডের রেখাটির গতি, এবং কটিদেশে ও নিতম্বদেশের নীচে কাপড়ের ভাঁজগুলি অতি



৫নং চিত্র। দিদারগঞ্জের [illegible] যক্ষিণী মূর্ত্তি।

সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে। দেহে মাংসলতার আভাস নাই বলিলেও চলে; শিরা বা পেশীর পৃথক গড়নও কিছু নাই। গড়নটি স্থূল ও দৃঢ় ও নহে, বরং সহজ ও কোমল; উহার মধ্যে যেন কতকটা নরম স্পর্শ সুখের আভাস আছে।

মৌর্য্যযুগের ভাস্করশিল্পের পরিচয় কালে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আমরা যাহাকে সাধারণতঃ মৌর্য্য-শিল্প বলিয়া জানি, এবং মৌর্য্যযুগের যে কয়টি শিল্প-নিদর্শনের পরিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল, এই শিল্পের বিশেষ রীতি ও ভঙ্গির সূচনা ও বিকাশের মূলে রহিয়াছে এক রাজ-বংশের, বিশেষ করিয়া একটি অদ্ভুত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সম্রাটের ইচ্ছা ও প্রভুত্ব। মৌর্য্য-শিল্প মৌর্য্য-রাজসভার শিল্প; সেই রাজসভার আদেশে ও আদর্শে মৌর্য্য-শিল্পের উদ্ভব। মৌর্য্য রাজবংশকে যে গ্রীকেতর ও পারসীক জাতির সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল, তাহাদের সাধনা ও সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে মৌর্য্য সম্রাটেরা খানিকটা প্রভাবাম্বিত না হইয়া পারেন নাই; হয়ত তাঁহারা পশ্চিম-এসীয় ও গ্রীকেতর শিল্পীকুলকে তাঁহাদের রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়াও আনিয়া থাকিবেন, এবং সেই বৈদেশিক শিল্পীরাই হয়ত মৌর্য্য-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সূচনা করিয়া থাকিবে। তাহার পরিচয়ও কিছু কিছু অশোক-স্তম্ভ-শীর্ষের পশু-মূর্ত্তিগুলিতে আছে। কিন্তু এ প্রভাব যে বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, এবং ক্রমে যে তাহা ভারতীয় শিল্পরীতি ও ভঙ্গিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল, পাটনার যক্ষমূর্ত্তি দুইটি এবং বিশেষ করিয়া দিদারগঞ্জের যক্ষিণীমূর্ত্তিটির রূপ ও গড়ন-রীতিই তাহার প্রমাণ।

কিন্তু এই মৌর্য্য-রাজ-সভার শিল্পই মৌর্য্য যুগের ভাস্কর-শিল্পের একমাত্র পরিচয় নয়। রাজসভার বাহিরে, রাজ-বংশের রুচি ও ইচ্ছার বাহিরে বিরাট প্রকৃতিপুঞ্জ ছিল, তাহাদের-ও একটা বিশিষ্ট রুচি ও ইচ্ছা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের একটা বিশেষ শিল্পরীতি ও ভঙ্গিও ছিল। ইহাই প্রকৃতপক্ষে মৌর্য্যযুগের ভারতশিল্পের রীতি ও ভঙ্গি। মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যের পরিচয় লইতে হইলে সেই অধ্যায়টিরও পরিচয় লইতে হইবে।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়



বেল-কুঁড়ি

—গল্প—

—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আষাঢ় মাস। ছুটির দিন। সকাল হইতে আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল, অপরাহ্ণে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বর্ষণ-সিক্ত তরু-লতা মেঘান্তরিত সূর্য্যকিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সমরেন্দ্রনাথের গৃহে নিয়মিত বৈঠক বসিয়াছে,—তবে আজ ছুটির দিন বলিয়া, এবং সমস্ত দিন নিরবসর বৃষ্টি পাতের পর হঠাৎ আকাশ নির্ম্মুক্ত হইয়া সকলের মনে একটা অপ্রত্যাশিত উল্লাস উপস্থিত হওয়ায় বেলা চারটা হইতেই বৈঠকীরা আসিয়া জুটিয়াছে।

দুইখানা বড় তক্তপোষ পাশাপাশি স্থাপিত—তাহার উপর প্রকাণ্ড ফরাস পাতা। চতুর্দ্দিকে সাত আটখানা চেয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। একদিকে টানা-সূতার কাজ করা শুভ্র আস্তরণ আবৃত একটা বেতের গোল টেবিলের উপর কাঠের চারকোণা বারকোষ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে পেয়ালা পেয়ালা চা এবং বর্ষাদিনভোজ্য নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য আসিয়া পড়িতেছে—কাড়াকাড়ি করিয়া সকলে লুটিয়া খাইতেছে। ফরাসের উপর একটা কালো রঙের বক্স হারমোনিয়ম খোলা পড়িয়া আছে; এক ব্যক্তি—এ বৈঠকের ইনি নিয়মিত গায়ক—খাদ্য এবং পেয়র প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ বজায় রাখিয়া অবসর মত হার্ম্মোনিয়মের একটা চাবি টিপিয়া সুর জমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পেয়ালা-পাত্রের টুং টাং ধ্বনি, কথাবার্ত্তার কলরব, হাস্য-পরিহাসের কলোচ্ছ্বাস হার্ম্মোনিয়মের এই একটানা সুরের স্রোতে পড়িয়া ক্রমশঃ যেন বাধ্য হইয়া বাঁধিয়া আসিতেছে।

এমন সময়ে কবীন্দ্র বলিল, "আজ আর গান নয়, আজ কেউ মজার গল্প বল। গরম চা আর ফুলুরীর সঙ্গে খুব মুখরোচক হবে।"

ইহার উত্তর দিল একটি তরুণ যুবক, নাম মলয়। সরকারি তোষাখানার ইনি একজন উচ্চ কর্ম্মচারী, চিত্তভূমি প্লাবিত করিয়া সাহিত্যের মৃদু মন্দাকিনী প্রবাহিত, ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা হিসাবের উত্তাপে এ পর্য্যন্ত যাহা বাষ্পীভূত হইতে আরম্ভ করে নাই। মলয় বলিল, "গল্পই যদি বলতে হয় তা হ'লে এমন ভাবঘন বর্ষার দিনে মজার গল্প কিছুতেই খাপ খাবে না। তার চেয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের গভীরতম অনুভূতির ঘটনা খুলে বলা যাক্। এমন হওয়া চাই যা একটা ছোট গল্পের বনেদ হতে পারে।"

ভূপতি নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিল, "মন্দ নয়, এ ব্যবস্থায় বর্ষার সন্ধ্যাটা জমবে ভাল।" এ ব্যবস্থায় ইঁহার একটু বিশেষ স্বার্থ এই ছিল যে, ইনি একজন মাসিক পত্রের কথা-সাহিত্যিক, যদি কোনো গল্প হইতে প্লটের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তদ্দ্বারা কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন।

এবার কথা কহিল সমরেন্দ্র। বৈষ্ণবতার উদার প্রবাহের সহিত নিজ জীবন-ধারা মিলিত করিয়া ইনি দিনাতিপাত করিতেছেন; নিখিল মানবচিত্ত একীভূত করিবার শক্তি একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং তদন্তর্গত সঙ্কীর্ত্তনের আছে বলিয়া ইনি একান্তভাবে বিশ্বাস করেন। সমর বলিল, "যে জিনিসটা এব জমত সেটা ছেড়ে দিয়ে শেষ কালে বর্ষার সন্ধ্যাটা মাটি না হয়। কীর্ত্তনের চেয়ে বেশি জমে এমন জিনিস কম জানা আছে।"

"অবশ্য, পরনিন্দা ছাড়া।" বলিয়া হার্ম্মোনিয়মটা একটু ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ভূপেন ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া বসিল। গান গাহিয়া এবং জমাইয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার বাসনা তাহার মনের মধ্যে ছিল তাহাতে বাধা পড়ায় সে মনে মনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ভূপেনের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারবান মন্তব্যে সকলে হাসিয়া উঠিল।

বৈঠকীদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁহার নাম হরিপ্রকাশ। সরকারি কৃষি বিভাগে ইনি বড় কর্ম্ম করেন। কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্ম ইঁহাকে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় যাইতে হইয়াছিল, সম্প্রতি অসুস্থতা হেতু দীর্ঘ অবসর লইয়া বিশ্রাম ভোগ করিতেছেন। ইনি কহিলেন,—"প্রথম পালা যদি আমাকে দেন, তা হ'লে আমি যখন সাউথ ক্যারোলিনার চার্লষ্টন্ সহরে ছিলাম—

প্রস্তাবটা শেষ হইবার অবসর পাইল না। একটা ইজিচেয়ারের অদৃশ্য ক্রোড় হইতে সহসা উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিয়া দৃপ্ত স্বরে যতীন্দ্র বলিল, "সে আবার কোথায়?"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে যতীন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হরিপ্রকাশ বলিল, "কেন, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ আমেরিকায়।"

"তা হ'লে চলবে না!" বলিয়া যতীন্দ্রমোহন পুনরায় ইজিচেয়ারের গর্ভে মিলাইয়া গেল।

হরিপ্রকাশ প্রবলভাবে ঋজু হইয়া উঠিল। ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে বলিল, "কেন চলবে না, শুনি? আমেরিকায় কি গভীর অনুভূতির কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না?"

যতীন্দ্র বলিল, "না, না, মশায়, আপনি যে কথায় কথায় আমেরিকার কথা ব'লে আমাদের কাবু ক'রে রাখবেন, তা কিছুতেই চলবে না। দেশের কোনো কথা যদি জানা থাকে ত বলুন যে হাঁ বুঝতে পারি! তা নয়, প্রতি কথায় সাগর পারে লাফ দিলে চলবে কেন?"

কথাটার কি উত্তর দিবে হরিপ্রকাশ বোধ হয় তাই মনে মনে ভাঁজিতেছিল, ইত্যবসরে ভূপতি উত্তর দিল। বলিল, "ক্রম-বিকাশের ফলে যতীনবাবুর একটা দিক কি রকম দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে দেখুন। ওঁর বোধশক্তি পর্য্যন্ত সাগর লঙ্ঘন করতে অনিচ্ছুক, অথচ ত্রেতাযুগে সশরীরে যখন—

যতীন্দ্র পুনরায় স্প্রীংএর পুতুলের মত লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "অ্যান্থ্রপলজি কোনো কর্ম্মে আজ চালাতে পারবেন না, তা বলছি! ক্যাটালগের দু-চার পাতা উল্টে পাল্টে আপনি যে ছলে-ছুতোয় সুবিধা পেলেই আন্থ্রপলজির বিদ্যে ঝাড়বেন তা হবে না। তা ছাড়া রসিকতা জিনিসটা বড় সহজ ব'লে আপনি মনে করেন, সত্যি সত্যিই তত সহজ নয় ভূপতিবাবু। রসিকতার প্রাণ হচ্ছে নূতনত্ব। দোহাই আপনার, ত্রেতাযুগের পচা পরিহাস ক'রে কলিযুগের প্রাণান্ত করবেন না!"

"তা হ'লে পরিহাস পরিত্যাগ ক'রে প্রমাণেরই একটা কথা বলি। ক্রম-বিকাশের গুণে বনমানুষ যে ক্রমশঃ মানুষ হয়ে উঠছে তার প্রমাণ বনমানুষ এখন ক্রমে ক্রমে মানুষের ব্যবহারোপযোগী অনেক জিনিষই ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে—মায় ইজিচেয়ার পর্য্যন্ত।" বলিয়া ভূপতি মৃদুভাবে হাস্য করিল, এবং তাহার সহিত অপর সকলে অপরিমিত হাসিতে লাগিল।

এক পক্ষে যতীন্দ্র এবং অপর পক্ষে পৃথক ভাবে ভূপতি এবং হরিপ্রকাশের মধ্যে যে মানসিক বৃত্তি বর্ত্তমান ছিল ভূপেন তাহার আখ্যা দিয়াছিল অহি-নকুলের সম্পর্ক। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এমন একটা রণ-প্রবণতা ছিল যে দেখা হইবা মাত্র ইহারা মনে মনে তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিত, এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিবার প্রথম সুযোগ পাইলে দ্বিতীয় সুযোগের জন্ম কেহ অপেক্ষা করিত না।

অদূরে একটা চেয়ারে নরেশ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল; এতক্ষণে সে কথা কহিল; বলিল, "আমি একটা গল্প বলতে পারি যার মধ্যে খুব গভীর কোনো অনুভূতির সন্ধান না পেলেও সামান্য একটু পেতে পার। কিন্তু তোমরা পরস্পরে ঝগড়াই করবে, না গল্প শুনবে?"

চতুর্দ্দিকে সমবেত ধ্বনি উঠিল,—"গল্প শুনব, গল্প শুনব নরেশদা!" দলের মধ্যে নরেশ বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সকলে তাহার সহিত জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের মত ব্যবহার করিত।

একজন বলিল, "শিকারের গল্প না-কি নরেশদা?"

নরেশ একজন সুদক্ষ শিকারী—বাঘ ভালুকের মুণ্ড এবং হরিণের চামড়া নির্বিরোধে তাহার বৃহৎ বৈঠকখানার চারটি দেওয়াল এবং কক্ষতল সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া আছে। সে বলিল, "শিকারই একরকম বটে, তবে বনের নয়, মনের।"

কথাটা যে জমাটি, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। "বলুন, বলুন, নরেশদা।" বলিয়া সকলে অজ্ঞাত কাহিনীর কৌতূহলের প্রত্যাশায় নিবিষ্ট হইয়া বসিল।

নরেশ বলিতে আরম্ভ করিল।

সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, তখন আমরা দেওঘরে থাকি, সবে মাত্র এম্-এ পাশ ক'রে ডেপুটিগিরির জন্যে চেষ্টা করছি। গ্রীষ্মকাল, বৈশাখের শেষ। দিনের বেলা ঘরের দোরজানালা বন্ধ ক'রে বন্দী হ'য়ে আর রাত্রে খোলা মাঠে তাপক্লান্ত অবশ দেহকে মেলে দিয়ে কোনো রকমে দিনাতিপাত করছি—এমন সময় সরকারী চিঠি এল যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে মজঃফরপুরে ত্রিহুতের কমিশনার বাহাদুরের কাছে উপস্থিত হ'য়ে চেহারা আর চাল দেখিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ ডেপুটিগিরির চক্করে যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের তাড়নায় কতটা দৌড় দিতে সক্ষম হব কমিশনার সাহেব তার একটা আন্দাজ নেবেন। সেই সরকারী চিঠির সঙ্গেই আর একটি বে-সরকারী চিঠি এল কমিশনারের পার্‌সনাল্ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ পরিতোষ মৈত্রের। ইনি বাবার একজন পুরোণো অন্তরঙ্গ বন্ধু, সরকারী চিঠিখানি রওনা ক'রেই একখানি চিঠি দিয়েছেন যাতে আমি নির্দ্দিষ্ট দিনের কয়েক দিন পূর্ব্বেই, অর্থাৎ অবিলম্বে, মজঃফরপুরে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়ে একটু দলন-মলন গ্রহণ করি, আর চাল-চলন শিখি। বাবার মুখে শুনলাম তাঁর বন্ধুটি একজন নামজাদা সহিস্, স্বয়ং গবর্মেণ্ট তাঁকে বাহাদুর ব'লে স্বীকার করেছেন।

মুখবন্ধেই গল্পটি জমিয়া উঠিয়াছিল। যতীন্দ্র ইজিচেয়ারের গর্ত্ত হইতে উঁচু হইয়া উঠিয়া হরিপ্রকাশের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষক্ষেপ করিয়া বলিল, "কেমন? জমছে না মজঃফরপুরের গল্প? অনুভূতির আমেজ পাওয়া যাচ্ছে না? এমন মধুর দেওঘর মজঃফরপুর ছেড়ে কোথায় হার্মষ্টন, না ফার্মষ্টন!—"

তীব্রকণ্ঠে ভূপতি বলিয়া উঠিল, "No interruption please!"

"Silence!" বলিয়া চিৎকার করিয়া যতীন্দ্র ইজি-চেয়ারের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

হাসির একটা উচ্চ কলরোল উঠিল। নরেশ পুনরায় বলিতে লাগিল।

বাবা বললেন, দেরি না ক'রে বেরিয়ে পড়তে। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে বেরোতে একেবারেই ইচ্ছা হ'ল না। মনে পড়ল সেই রস-ঘন অমৃতময় বাণী:—

অসহ্যবাতোদ্গতরেণুমণ্ডলা
প্রচণ্ডসূর্য্যাতপতাপিতা মহী।
ন শক্যতে দ্রষ্টুমপি প্রবাসিভিঃ
প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধমানসৈঃ॥

প্রিয়াবিয়োগানলদগ্ধ প্রবাসী যে সূর্য্যাতপতাপিতা মহীর দিকে তাকাতে পারে না আমাকে তার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে! বুঝলাম শ্বশুরের আহ্বানের চেয়েও কমিশনারের আহ্বান প্রবল। কিন্তু পঞ্জিকার প্রসাদে একদিন যাত্রা পেছিয়ে গেল, পরদিন পিঠে যোগিনী বেঁধে পকেটে ফুল বেলপাতা পুরে মাহেন্দ্রক্ষণে বেরিয়ে পড়লাম।

শুভক্ষণের অনুরোধে বেরোতে হ'ল সকাল বেলার গাড়িতে। জসিডি পর্য্যন্ত একরকম কাটল মন্দ না, কিন্তু তারপর রৌদ্র বাড়ার সঙ্গে উত্তাপ এমন বাড়তে লাগল যে, মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীতে কে যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বেলা দুটো আন্দাজ যখন গাড়ি মোকামা ঘাটে পৌঁছল তখন সত্যই প্রচণ্ডসূর্য্যাতপতাপিতা মহী।

সুটকেস্ আর হোল্ডলটা একটা কুলির মাথায় তুলে দিয়ে ষ্টিমারে এসে আশ্রয় নিলাম। শুনলাম একটা পূর্ব্ব-গামী গাড়ি এলে তার প্যাসেঞ্জার নিয়ে তবে ষ্টিমার ছাড়বে, তার এখনো প্রায় দু ঘণ্টা দেরি! যে দুঃখ থেকে অব্যাহতির কোনো উপায় নেই সে দুঃখ যতটা সম্ভব নির্ব্বিকারচিত্তে বহন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সাদা রঙে ইণ্টারমিডিয়েট্ ক্লাস্ লেখা একটি বেঞ্চের সামনে আমার আস্‌বাব রেখে কুলি বললে বেঞ্চে অবিলম্বে একটি স্থান অধিকার না করলে সারাপথ দাঁড়িয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। হিতবাক্য অবহেলা না ক'রে বেঞ্চের এক প্রান্তে স্থানাধিকার ক'রে বসলাম।

ইচ্ছে হচ্ছিল একটু ঘুরে ফিরে জাহাজের কল-কব্জা লোক-লস্কর দেখে আসি। কিন্তু সাহস হ'ল না। ফিরে এসে যদি দেখি পরিত্যক্ত স্থানটি অধিকৃত অথবা সুটকেসটি অদৃশ্য হয়েচে তাহ'লে ক্ষোভের অন্ত থাকবে না। অগত্যা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থেকেই সম্মুখে যা দেখতে শুনতে পাওয়া যায় তাই দেখে শুনেই মনকে যথাসম্ভব উল্লসিত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু সময়ের পায়ে কে যেন পাথর বেঁধে দিয়েছিল, সে যেন কিছুতেই চলতে চায় না! দু ঘণ্টার মধ্যে

তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে মনে হচ্চে, এমন সময়ে আপার ডেক্ থেকে সিঁড়ি বেয়ে বিলিতি সুট্ পরা একজন বাঙালী ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি নেমে আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন। "মশায়, ফর্টি-টু ডাউন্ কখন এখানে ডিউ বলতে পারেন?"

মাথা নেড়ে বল্‌লাম, "আমি প্যাসেঞ্জার, গাড়ির নম্বর আর টাইম মুখস্থ নেই ত;—সুট্‌কেস্ থেকে টাইম-টেব্‌ল বার ক'রে বল্‌তে পারি।"

"তার আর সময় হবে না।" ব'লে দ্রুতবেগে তিনি কাঠের পুল দিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে ধাবিত হলেন। গৌর-বর্ণ, স্থূল দেহ, মাথার তিন চতুর্থাংশ জুড়ে টাক,—দেখলেই মনে হয় দেহে বহু ব্যাধি এবং ব্যাঙ্কে বহু অর্থ আশ্রয় পেয়েছে।

মিনিট পাঁচেক পরেই ফর্টিটু ডাউন্ এসে উপস্থিত হ'ল, এবং তার থেকে যাত্রীর দল নেমে পিঁপড়ের সারের মত পুল দিয়ে ষ্টীমারে এসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ভিড় যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন চোখে পড়ল, সেই সুট্-পরা ভদ্র-লোকটি আসছেন, পিছনে একটি উনিশ কুড়ি বছর বয়সের তরুণী, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, গৌরবর্ণ মুখখানি রোদ খেয়ে বেদানার রঙ ধারণ করেচে, তার মধ্যে নীলচে আভার চোখ দুটি অপরিসীম বিহ্বলতায় চঞ্চল।

ইজি-চেয়ারের গর্ভ হইতে পুনরায় উত্থিত হইয়া যতীন্দ্র-মোহন বলিল, "খাসা জিনিস! ব'লে যান সুরেশদা, ব'লে যান!" শুইয়া পড়িবার সময়ে হরিপ্রকাশের দিকে একটা বক্র তীব্র দৃষ্টি ফেলিয়া অর্দ্ধোচ্চস্বরে বলিল, "ব্লাম্ টন্"!

সুন্দরী তরুণীর আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, রসভঙ্গের ভয়ে যতীন্দ্রমোহনের কথায় কেহও সাড়া দিল না। নরেশ সহাস্যমুখে বলিতে লাগিল—

শ্রেয় এবং হেয়র প্রভেদ আমি করিনে, এ অপবাদ আমার পরম শত্রুও দেবে না। সুতরাং অবিলম্বে আমার কৌতূহল প্রৌঢ় অভিভাবকটিকে পরিত্যাগ ক'রে তরুণীর উপর ষোল আনা পড়েছিল। তার প্রমাণ পেলাম যখন তারা আমার পাশ দিয়ে সীঁড়িতে উঠ্‌তে যাচ্ছে তখন দুজনেরই মুখের মধ্যে। একজনের মুখ ক্রোধে লাল, অপরের লজ্জায় রক্তিম।

মনে মনে প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সম্বোধন ক'রে বললাম, "আপনি অবশ্য চটেচেন, কিন্তু কি করা যায় বলুন! আপনার সঙ্গিনীটি যদি কৃষ্ণবর্ণা স্থূলদেহা হ'তেন তা হ'লে ত কোনো গোলই ছিল না। অমন একটি উপাদেয় বস্তু নিয়ে আপনি অবলীলাক্রমে পথে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়াবেন আর গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে চলবে, পৃথিবীকে এত নিরাপদ স্থান মনে করবেন না।"

জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার পর একবার ইচ্ছে হ'ল, আপার ডেক্‌টা একটু ঘুরে আসি। কিন্তু প্রৌঢ় ব্যক্তিটির রোষ উদ্রিক্ত করবার ভয়ে বিরত হলাম। সামান্য অর্থ বাঁচাবার লোভে সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কিনি নি, সেই অনুশোচনায় মন কাতর হ'য়ে উঠ্‌ল। যা হ'ক ভবিষ্যতের গর্ভে সৌভাগ্য হয় ত' একটু বেশি মাত্রায় নিহিত আছে এই সান্ত্বনায় মনকে প্রবোধ দিয়ে বেঞ্চের ওপরই ব'সে রইলাম।

সেমারিয়া ঘাটে ষ্টীমার লাগতেই মাল-সংগ্রহোৎসুক কুলীর দল লাফালাফি ক'রে ষ্টীমারে এসে ঢুকলো। আমার মাল দুটি একজন কুলীর মাথায় তুলে দিয়ে দাঁড়াতেই দেখি ফুলটিকে পিছনে রেখে কাঁটা হ'য়ে ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসচেন,—চোখের দৃষ্টি আমার উপর পড়তে গোলাপের কাঁটারই মত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

নিম্নকণ্ঠে আমার কুলীকে অপেক্ষা করতে বললাম—ভীড় একটু কমুক, তারপর যাওয়া যাবে। পাশ দিয়ে যাবার সময়ে ভদ্রলোকটি বক্রকটাক্ষে একবার আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন,—দৃষ্টি কঠোর, উৎসাহজনক তার মধ্যে কিছুই নেই। কিন্তু পুরস্কৃত হ'লাম পর মুহূর্ত্তেই,—মেয়েটি হঠাৎ চেয়ে দেখ্‌লে, হয় ত' অতর্কিতভাবেই, চোখে চোখে মিলিত হওয়ার পর কিন্তু অতি সুস্পষ্ট ভাবেই গোলাপী মুখখানির উপর একটা রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল—মনে হল তার মধ্যে নিষেধের রক্ত-পতাকা নেই। দেখলাম ভীড় কমেছে। কুলীকে

অনুসরণ করতে ইঙ্গিত ক'রে মেয়েটির পিছনে পিছনে চললাম।

ছেলেবেলা থেকে 'লব্ধং নৈব পরিত্যজেৎ' কথাটা মেনে চলি। ষোল আনা পেলাম না ব'লে আট আনাকে কখনো উপেক্ষা করি নে। বাঘ না পেলে হরিণ শিকার করি, হরিণ না পেলে পাখী। যে ফুলকে সমুখ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হ'ল না, পিছন দিক থেকে তাকে দেখ্‌তে পেলে ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিহীনতা বলেই মনে করি। তা ছাড়া, কোনো সুন্দরী তরুণীকে অনুসরণ করবার সৌভাগ্য তোমাদের কারো যদি কখনো হয়ে থাকে তা হ'লে মনে মনে নিশ্চয় স্বীকার করছ যে, তার চলনের লীলায়িত ভঙ্গি, আল্‌গা-বাঁধা খোঁপার অপরূপ জটিলতা, সুগঠিত কাঁধ দুটির সুমধুর বক্রতা—কোনো কিছুই অবহেলার বস্তু নয়।

একটা যুক্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—"নিশ্চয় নয়, নিশ্চয় নয়!"

নরেশ বলিল, "বেশ কথা। তা হ'লে আর একটা কথাও পরিষ্কার ক'রে নিই। সুন্দর জিনিষের প্রতি আমাদের চোখ যে আকৃষ্ট হয় সেটা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মে। সুন্দরী তরুণী যে সুন্দর জিনিস তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং এই মেয়েটির প্রতি আমি এ পর্য্যন্ত যা মনোযোগ দেখিয়েছি, যে রুক্ষ নীতিশাস্ত্রের মতে তা অসদাচরণ, তাকে কোথায় নিক্ষেপ করা উচিত বল দেখি?"

ভূপেন বলিল, "ভাগীরথী গর্ভে।"

নরেশ বলিল, "ঠিক কথা। সে হিসেবে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকেও ভাগীরথী গর্ভে ঠেলে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তা না ক'রে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে এসে উপস্থিত হলাম। এর মধ্যে ভদ্রলোকটি চার পাঁচ বার ফিরে ফিরে আমাকে দেখেছেন—এবং তাঁর সঙ্গিনীর সহিত আমার সান্নিধ্য লক্ষ্য ক'রে প্রতিবারই আমার প্রতি অগ্নি বর্ষণ করেছেন।

গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্মে লেগে ছিল এবং সমুখেই ছিল ফার্ষ্ট এবং সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাগুলি। ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে একটা সেকেণ্ড ক্লাস্‌ কম্পার্টমেণ্টে তুলে দিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে নিজে উঠে বস্‌লেন। আমি মনে মনে হেসে বল্‌লাম—অত ব্যস্ত কেন হে বাপু! আমি তোমার সঙ্গিনীটিকে হরণ করব না। সে কালও নেই, সে পাত্রও নই।

একখানা কামরার পরেই ইণ্টারমিডিয়েট্‌ ক্লাস ছিল, তাইতে উঠে বসলাম। অপরাহ্ণ তখন সন্ধ্যার আগমনী সূচনায় শান্ত হয়ে এসেছিল। নদী-তটে, নদী-বক্ষে, আকাশে সন্ধ্যার মায়া ছড়িয়ে পড়েছে। মনটাকে সেই ধূসর স্নিগ্ধতার মধ্যে স্নান করিয়ে নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে অবস্থিতা অপরিচিতা সহযাত্রিণীকে মনে মনে সম্বোধন ক'রে বললাম, 'হে মুগ্ধকারিণী, আবার কখনো তোমার দেখা পাব কি না জানি নে। রাত্রির ঘন তিমিরান্তরালে কে কোন্‌ দিকের পথে কখন নেবে যাবে তা কেউ জানে না। কিন্তু এ কথা জানি, আমার উৎসুক চিত্ত-পটে তুমি তোমার অতল নীল চোখ দুটি স্থাপিত ক'রে যে তারকা রচিত করেছ তা কখন অপসৃত হবে না। তোমার নিরতিসাবধানী অভিভাবক যাই ভাবুন, আমি মনে মনেও তোমার প্রতি কোনো অশিষ্ট আচরণ করি নি;—তোমার অপরূপ লাবণ্যের প্রতি অমনোযোগী না হ'য়ে তাকে তার যথার্থ মর্য্যাদায় স্বীকার করেছি। আমার নীরস কণ্টকর যাত্রা-পথে মাধুর্য্যের স্বপ্ন-জাল বিস্তার ক'রে তাকে যে মনোরম ক'রে তুলেছিলে তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ!'

মনটা কিসের বেদনায় ভারাতুর হ'য়ে উঠল। আধ ঘণ্টাটাক পরে গাড়ি ছাড়লে জানালার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ব'সে রইলাম। তখন সামনের বেঞ্চে ব'সে দুটি বেহারী ভদ্রলোকের মধ্যে প্রবল ভাবে আলোচনা চলছিল যে, ইয়োরোপ কর্ত্তৃক, যত আশ্চর্য্য বস্তুই বল না কেন—তা সে গ্রামোফোনই বল আর ফটোগ্রাফীই বল—অপূর্ব্ব কিছুই নয়, সবই একদিন আমাদের মধ্যে ছিল। প্রমাণস্বরূপ নব-উদ্ভাবিত এরোপ্লেনের সঙ্গে পুষ্পকরথের অভিন্নতা দেখানো হচ্ছিল। ভদ্রলোক দুটির আমার প্রতি ঘন ঘন উৎসুক দৃষ্টিক্ষেপ দেখে ভয় হ'ল যে, হয়ত তাঁদের আলোচনায় যোগ দিতে আমাকেও সহসা আহ্বান করবেন। মুখখানা গাড়ীর বাইরে ঝুঁকিয়ে দিলাম।

রাত্রি আটটার সময়ে গাড়ি বারুণী জংসনে পৌঁছিল। বেহারী ভদ্রলোক দুটি নেমে গেলেন। তার খানিকক্ষণ

পরে দেখি সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে তাড়াতাড়ি গার্ডের গাড়ীর দিকে চলেছেন। মনের মধ্যে কোথায় কোন্ কোণে ঔৎসুক্য কেমন ক'রে লুকিয়েছিল জানিনে, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সেকেণ্ড ক্লাস্ গাড়ির দিকে চাইলাম। মনে হ'ল যে-কামরায় মেয়েটির থাকবার কথা তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন ফিরিঙ্গী উত্তেজিত ভাবে কি বলছে। তাড়াতাড়ি নেবে প'ড়ে সেকেণ্ড ক্লাস কামরার সম্মুখে উপস্থিত হ'লাম। দেখলাম অতিশয় উত্তেজিত অবস্থায় মেয়েটি অপর দিকের বেঞ্চে গিয়ে ব'সে রয়েচে—গোলাপ ফুলের মত মুখখানা অশোক ফুলের মত লাল হ'য়ে উঠেছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে উঠে এসে মেয়েটি বললে, "দেখুন, এ লোকটা আমার সঙ্গে ভারী অভদ্র ব্যবহার করেচে।"

আমি ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করেচে?"

"আমি যত বলি আমার কাছে টিকিট নেই বাবার কাছে আছে, ও কিছুতেই শুনবে না—দেখাও! দেখাও! অবশেষে হঠাৎ খপ্ ক'রে"—এই পর্য্যন্ত ব'লে মেয়েটির কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেল।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "খপ ক'রে—? কি করলে? বলুন!"

আরক্ত মুখে মেয়েটি বললে, "খপ্ ক'রে আমার গালে হাত ঘ'সে দিলে!"

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠ্‌ল! চেয়ে দেখি লোকটা এক পা এক পা ক'রে স'রে পড়বার মতলব করছে। ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার বাঁ কাঁধের উপর কোর্টটা শক্ত ক'রে ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে এনে বললাম, "কাপুরুষের মত পালাচ্ছ কোথায় ডেভিল্! আগে হাত জোড় ক'রে মেয়েটির কাছে মাফ্ চাও—তারপর তোমার নিষ্কৃতি।"

আমার আক্রমণ এবং আস্ফালন দেখে লোকটা ভয়ে যতটা না হ'ক বিস্ময়ে প্রথমটা বিমূঢ় হ'য়ে গেল—তারপর সামলে নিয়ে আমাকে আক্রমণের জন্যে ঘুঁসি তুললে। আমি ক্ষিপ্রবেগে দুহাতে তার দুই মণিবন্ধ সজোরে চেপে ধ'রে একটু মোচড় দিয়ে বললাম, "আর একটু মোচড় দিয়ে এমন করতে পারি যে, এ জীবনে হাত দুখানি আর কখনো তুলতে পারবে না। কিন্তু অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হাত দুখানার আমার দরকার আছে। নাও, জোড় হাত কর।" ব'লে তার হাত ছেড়ে দিলাম।

আমার হাতের জোরের একটু পরিচয় পেয়ে সে-যে দ'মে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও সাহস সঞ্চয় ক'রে বললে, "আমি তোমাকে পুলিশে দোবো।" মুখে মদের বিকট দুর্গন্ধ।

আমি বললাম, "রেল-কর্ম্মচারী না হ'য়ে তুমি টিকিট দেখতে চেয়েছিলে, পুলিশে ত' আমি তোমাকে দোবো। কিন্তু তার আগে যা বলছি তা কর!"

সে সময়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে বেশি লোক না থাকলেও একজন একজন ক'রে এক সার কৌতূহলী দর্শক জ'মে গিয়েছিল। তাদের ঠেলে আবির্ভূত হলেন মেয়েটির বাবা—হাতে এক চাঙ্গড় বরফ। ঠাণ্ডায় হাতটা বোধ হয় অসাড় হ'য়ে এসেছিল, তাড়াতাড়ি বরফটা মেয়ের হাতে দিলেন। মেয়েটি কি বলবার চেষ্টা করলে সে দিকে কর্ণপাত না ক'রে জনতার মধ্যে এগিয়ে এসে বললেন, "কি হয়েচে? কি হয়েচে? অ্যাঁ, কি হয়েচে?" তারপর হঠাৎ আমার উপর দৃষ্টি পড়ায় বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে বললেন, "তুমি এখানে এসে জুটেছ? তুমি এখানে কেন?"

লোকটার অকারণ অভদ্রতায় আমি প্রথমটা একটু বিমূঢ় হ'য়ে গেলাম,—তার পর দৃঢ়স্বরে বললাম, "আপনার অসহায় মেয়েকে অপমান থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমি এখানে।"

কে অপমান করলে, আমিই বা কি রক্ষা করলাম—সে সব বিষয়ে সংবাদ নেওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ না ক'রে অতি ইতরের মত খ্যাক্‌খ্যাকে গলায় লোকটা আমাকে ধমকে উঠল, "পালাও এখান থেকে ফাজিল ছোকরা কোথাকার! সেই মোকামা ঘাট থেকে জ্বালিয়ে মেরে উনি এখন এসেছেন আমার মেয়েকে রক্ষা করতে!...পালাও!"

"বাবা! বাবা! তুমি বড্ড ভুল করছ বাবা!" আর্ত্ত-কণ্ঠস্বরে চেয়ে দেখলাম মেয়েটির মুখ অপরিসীম কুণ্ঠায় আর বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন।

বাপ মেয়ের দিকে একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লে, "থাম, থাম! কিছু ভুল করচিনে। এ রকম লোককে—" বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী কদর্য্য গালাগালটা মনে পড়ল না ব'লে কথাটা শেষ হ'ল না।

আমি বল্‌লাম, "দেহের মধ্যে এক বিন্দুও মনুষ্যত্ব থাক্‌লে এ রকম লোককে, ধন্যবাদ না দিন, অন্ততঃ গালাগাল দিতেন না।"

আমাদের কথা যে মিত্রতা-ব্যঞ্জক নয়, বচসাপ্রসূত, তা বুঝ্‌তে পেরে ফিরিঙ্গি লোকটা সাহস পেয়ে এগিয়ে মেয়েটির বাপকে বল্‌লে, "এ লোকটা অত্যন্ত চোয়াড়। আপনি যদি বলেন একে পুলিশে দিই।"

"দেওয়া উচিৎ!"

প্রস্থানোদ্যত ফিরিঙ্গী লোককে হাঁক দিয়ে আমি বল্‌লাম, "দেখ, তুমি যে পুলিশ ডাকতে যাচ্ছ না, ছুতো ক'রে স'রে পড়ছ, তা আমি জানি। কিন্তু যদিই পুলিশ ডাকো, আমি ঐ ইণ্টার ক্লাস কামরায় থাক্‌ব—ওখানে এসো। আমি পুলিশের সাম্‌নে তোমার নাক ভাঙব।"

তারপর মেয়েটির বাপকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লাম, "দেখুন, আমি অনেক লোক দেখেচি কিন্তু আপনার মত অভদ্র, ইতর, অপদার্থ লোক একটিও দেখিনি! অপনাকে যে এখনও আপনি ব'লে সম্বোধন করচি সে শুধু আপনার কন্যার খাতিরে। আপনার মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেম্‌নি সুন্দর! তাঁর প্রতি আমার প্রশংসা আর শ্রদ্ধার অন্ত নেই!"

"ছুঁচো কোথাকার! ড্যাম্‌, ষ্টুপিড্‌, রাস্কেল্‌!"

মনের মধ্যে কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব উল্লাস বোধ করতে লাগলাম! আমার দু-মুখো অস্ত্রের দু-দিক দু রকম! একদিকে লোহার শাণিত ফলক, অন্যদিকে পুষ্পগুচ্ছ;—একদিকে হলাহল, অন্যদিকে সুধা! যে রস মনের মধ্যে উপভোগ করছিলাম তার পরিবর্ত্তে অন্য রস সৃষ্টি করতে ইচ্ছা হ'ল না। শান্তভাবে বল্‌লাম, "আমি ভাবচি, আপনার মত পাঁকের মধ্যে আপনার মেয়ের মত পঙ্কজিনী কি ক'রে হ'ল!"

শুনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো ভাঁটার মত গোল আর জবা-ফুলের মত লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। মুখ দিয়ে কথা কিন্তু বেরুলো আগে মেয়ের—"শুনুন, দেখুন!"—আমি তাকিয়ে দেখলাম দুটি চক্ষে সুগভীর বেদনা!—"আমি জোড়হাতে বাবার হ'য়ে ক্ষমা চাচ্ছি, কিন্তু আর আপনি বাবাকে অপমানিত করবেন না!"

নিমেষের মধ্যে আমার উল্লাস কোথায় লুপ্ত হল। এ আমি কি করছি! এ যে লোহার ফলাই ছদিকে আঘাত করছে। অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে বললাম, "আমি বুঝতে পারি নি, অন্যায় করেছি—আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আর আমি কিছুই বলব না।"

গার্ড হুইস্‌ল্‌ দিয়ে সবুজ আলো দোলাচ্ছিল। গাড়ি হঠাৎ চল্‌তে আরম্ভ করলে। তাড়াতাড়ি উঠ্‌তে গিয়ে ভদ্রলোক টাল সামলাতে না পেরে প'ড়ে যাবার মত হ'লেন, আমি ধ'রে ফেলে গাড়ীর ভিতর ঠেলে দিয়ে দোর বন্ধ ক'রে দিলাম। তারপর আমার কামরাখানা সাম্‌নে এলে উঠে পড়লাম। উঠ্‌বার সময় দেখলাম ফিরিঙ্গীটা কাছাকাছি কোথাও ছিল, টপ্‌ ক'রে লাফিয়ে সেই সেকেণ্ড ক্লাস কামরাটার মধ্যে ঢুকে গেল।

গাড়িতে উঠে মুখের ঘাম মুছে জানালার ধারে ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌লাম। ভারী হাসি পেতে লাগ্‌ল। এ-যে রীতিমত একটা একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় হ'য়ে গেল! যবনিকা পড়েছে কি-না কে জানে,—কিন্তু পড়লেই ভাল। আর ভাল লাগে না,—অমন সুন্দরী চিত্তবিমুগ্ধকারিণী নায়িকা থাকা সত্ত্বেও। না, না,—ফিরিঙ্গীটার হৃদয়বৃত্তি আমি অনেকটা বুঝ্‌তে পারি,—সে আছে মানুষের সেই আদিম যুগের অবস্থায় যখন অধিকারের কল্পনাটা মানুষের মনে সবেমাত্র ফুটে উঠ্‌ছিল, যখন হাতের মধ্যে পাওয়াকেই মানুষ একমাত্র পাওয়া ব'লে মনে করত। তার ভাল লেগেছে, সুতরাং পাশবিক বল প্রয়োগে পেতে গিয়েছে। কিন্তু বাপের এ কি কাণ্ড! মেয়ের অপমানের কথা শুনে জান্‌তে চায় না ব্যাপারটা কি? অথচ যে ভদ্রসন্তান তার মেয়েকে অপমান হ'তে রক্ষা করেচে ব'লে দাবী করচে—অবলীলাক্রমে তাকে অপমানিত করে! ঘৃণায় ও বিরক্তিতে ক্ষুধার উদ্রেক হ'ল—

টিফিন কেরিয়ার থেকে খাবার আর ফ্লাস্ক্ থেকে জল বার ক'রে খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে জানলার ধারে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি একটা ছোট ষ্টেশনে এসে লাগল। অর্দ্ধালোকিত প্লাট্‌ফর্ম্মের দিকে তাকিয়ে ব'সে ছিলাম—হঠাৎ দেখি সেই মেয়েটি আর তার বাবা দ্রুতপদে প্লাট্‌ফর্ম্ম দিয়ে আসচে—মেয়েটির হাতে স্যুট্‌কেস্ আর বাপের হাতে বেডিং। গুরুভারে দুজনই পীড়িত, কিন্তু তা সত্ত্বেও গতি দ্রুত এবং ভঙ্গি উদ্বিগ্ন।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'ল না। চোখো-চোখী হ'লে পাছে মেয়েটি লজ্জা পায় এই ভেবে তাড়াতাড়ি বেঞ্চের মাঝখানে স'রে এলাম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না, একটু পরে দোরটা খুলে গেল, দেখলাম নীচু প্ল্যাটফর্ম থেকে মেয়েটি সুটকেসটা গাড়ীর ভিতর রাখবার চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে মেয়েটির হাত থেকে সুট-কেস্‌টা নিয়ে বেঞ্চের উপর রেখে স'রে এলাম। মেয়েটি আমাকে দেখে আরক্তমুখে এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করলে, তারপর গাড়ীর ভিতর উঠে এসে বাপের হাত থেকে বেডিংটা তুলে নিলে।

গাড়ির ভিতর এসে আমাকে দেখে মেয়ের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বাপ বললে, "দেখে শুনে এই গাড়িতেই উঠ্‌লে?"

মেয়েটি বললে, "তুমি বলেছিলে প্রথম ইণ্টার ক্লাসে উঠ্‌তে। তাই উঠেছি বাবা।" কণ্ঠস্বরে ভর্ৎসনার সুর। মেয়েটি গাড়ির অপর প্রান্তে জানালার ধারে গিয়ে বস্‌ল।

আমি গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে এক হাতে সুটকেস্ অপর হাতে হোল্ড-অল্ নিয়ে অগ্রসর হলাম। মেয়েটি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "উনি কেন যাবেন বাবা, তা হ'লে আমরাই অন্য কামরায় যাই।"

আমি ফিরে চেয়ে বললাম, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, নিশ্চিন্ত হ'য়ে এ কামরায় থাকুন, আমি পাশের কামরায় আছি।" ব'লে জিনিষপত্র নিয়ে পাশের কামরায় গিয়ে উঠলাম।

প্রতি ষ্টেশনে গাড়ির দুপাশে লক্ষ্য রেখে চল্‌লাম, কিন্তু কোন ষ্টেশনেই সে ফিরিঙ্গীটাকে আর দেখতে পেলাম না। সমস্তিপুরে গাড়ি লাগ্‌লে দেখলাম সে সেকেণ্ড ক্লাস থেকে নেমে সোজা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের অপরদিকে একটা ট্রেণে গিয়ে উঠে পড়ল। আমাদের গাড়ি না ছাড়া পর্য্যন্ত তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলাম—তারপর গাড়ি ছেড়ে দিলে নিশ্চিন্ত হয়ে পরিশ্রান্ত দেহকে একটু এলিয়ে দিলাম।

নিদ্রার মোহন অঙ্গুলিস্পর্শে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনে, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি একটা বড় ষ্টেশন। কামরায় একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কোন্ ষ্টেশন মশায়?"

"মজঃফরপুর। আপনি কোথায় যাবেন?"

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে আমি বল্‌লাম, "আমি এখানেই নাব্‌ব!"

ভদ্রলোক ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "তা হ'লে নেবে পড়ুন! গাড়ি অনেকক্ষণ এসেছে।"

একটা কুলী ডেকে নেবে পড়লাম। ষ্টেশনের বাইরে এসে একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া ক'রে ডাক বাঙলায় উপস্থিত হলাম।

প্রাতে উঠে চা খেয়ে পার্সনাল্ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পরিতোষ মৈত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁকে বাবা ডাকে চিঠি দিয়েছিলেন, তা ছাড়া আমার সঙ্গেও আর একটা চিঠি ছিল। হাকিমের বাড়ি বার করতে বেশী বিলম্ব হ'ল না। দেখলাম প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রশস্ত বাংলা—গেট থেকে বাড়ি পর্য্যন্ত সুরকি-ঢালা পথ, দুধারে কেয়ারি করা ফুলের ও বাহারে-পাতার গাছ। গেটের থামে পিতলের পাতে ইংরাজিতে পরিতোষ বাবুর নাম লেখা।

গেট অতিক্রম ক'রে খানিকটা অগ্রসর হয়েচি, হঠাৎ দেখি পথের বাঁ পাশে একটা বড় বেলফুলের গাছের কাছে ব'সে কাল্‌কের রাত্রের সেই মেয়েটি খুরপি দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আল্‌গা করছে। আমাকে দেখতে পেয়ে খুরপি ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, মুখে সলজ্জ হাসি—মুক্তার মধ্যে রঙিন্ আলোর মত—তার মধ্যে আনন্দের আভা।

নিরতিশয় বিস্ময়ে বললাম, "আপনি এখানে?"

অতল নীল চক্ষু দুটির চকিত দৃষ্টি আমার দিকে স্থাপিত ক'রে মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বললে, "এটা আমাদেরই বাড়ি।" একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "কালকের ঘটনার জন্যে আমরা বাড়িশুদ্ধ সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েচি। বাবা আপনার সন্ধানে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েচেন। চলুন, বসবেন চলুন।"

আমি বললাম, "আমার সন্ধানে?—আমি যে মজঃফরপুরেই এসেচি তা কেমন ক'রে জানলেন? আমি কে বলুন দেখি?"

মেয়েটির মুখে মৃদু হাসির ক্ষীণরেখা ফুটে উঠল; বললে, "কাল রাত্রে বাড়ি পৌঁছে বাবা দেখলেন আপনার বাবার চিঠি এসেচে। সে চিঠি পাওয়ার আগেই তিনি মোকামা ঘাট রওনা হয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা আপনার আসবার দিন সময় থেকে বোঝা গেল আপনিই নরেশ বাবু।"

যে বিচিত্র নাটিকার সমস্তিপুর ষ্টেশনে যবনিকা পাত হয়েছিল ব'লে মনে করেছিলাম, এমন অপরূপভাবে তার নূতন অঙ্ক আরম্ভ হল দেখে মনে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। বললাম, "কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটি জানতে পারি কি?"

মেয়েটি মৃদু কণ্ঠে বললে, "গৌরী।"

মনে মনে বললাম, তা একশো বার! যুক্ত করে নমস্কার ক'রে বললাম, "আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি।"

গৌরী ব্যস্ত হয়ে বললে, "বসবেন না? বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না?"

আমি বললাম, "না।"

দুঃখিতস্বরে গৌরী বললে, "আপনি তা হ'লে এখনো আমাদের ক্ষমা করেন নি!"

আমি বললাম, "দেখুন, ক্ষমা করা সহজ, কিন্তু ক্ষমা করার পরে অনেক জিনিষ শক্ত থাকতেও ত পারে। আমি ডেপুটিগিরি চাকরির জন্যে চেষ্টা করব না।"

গৌরী বললে, "কেন?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললাম, "এ কথা শুনে যদি মনে কষ্ট পান তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন—ও চাকরির উপর ঘৃণা হ'য়ে গেচে। কাল ট্রেণের ঘটনা যদি অন্য রকম ঘটত তা হ'লে শুধু কমিশনার সাহেবেরই কাছে চাকরী ভিক্ষে করে যেতাম না, তার চেয়ে অনেক বড় একটা ভিক্ষে আপনার বাবার কাছেও ক'রে যেতাম। আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন।"

আরক্তমুখে আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রেই গৌরী চোখ নত করলে।

আবার নমস্কার ক'রে বললাম, "আচ্ছা, আসি।"

গৌরী বললে, "বাবা জিজ্ঞাসা করলে আপনি কোথায় উঠেছেন বলব?"

আমি ঈষৎ হেসে বললাম, "বলবেন, সে কথা সে অসভ্য লোকটা কিছুতেই বললে না!" ব'লে অগ্রসর হ'লাম।

কয়েক পদ অগ্রসর হ'য়ে দেখলাম একটা বেল-ফুলের গাছে এক ডালে দুটি কুঁড়ি খুব বড় হয়ে উঠেছে। দেখে সে দুটি পাবার জন্যে কেমন প্রলোভন হল। মনের মধ্যে প্রলোভন বৃত্তিটা বোধহয় শাণিত হ'য়ে উঠেছিল, তাই নব-জাত গোখরো সাপের বাচ্ছার মত লোভের বস্তু পেলেই ঠোকোর দিচ্ছিল। পিছন ফিরে দেখলাম গৌরী আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই আছে। বললাম, "ভারি চমৎকার বেল-ফুলের দুটি কুঁড়ি রয়েচে। নিতে পারি?"

"রসুন, আমি দিচ্চি" ব'লে গৌরী এগিয়ে এসে তার কোমরে-বাঁধা ছোটো চামড়ার ব্যাগ থেকে একটা কাঁচি বের ক'রে নত হ'য়ে কয়েকটি পাতা শুদ্ধ ডালের ডগা কেটে কুঁড়ি দুটি আমার হাতে দিলে।

গৌরীকে তার দানের জন্যে ছোট একটি ধন্যবাদ দিয়ে গেটের দিকে অগ্রসর হলাম। মনের মধ্যে একটা উদাস আনন্দ, বৈরাগ্যের স্তিমিত বেদনা;—কাল রাত্রের অধীর উন্মাদনা ফেনা ম'রে স্থির অতল জলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও লোভ নিঃশব্দ-সঞ্চারে কুমীরের মত সাঁতার কেটে বেড়াচ্চে! সে এক অদ্ভুত অনুভূতি!

বন্ধুরা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া এক মনে নরেশের গল্প শুনিতেছিল, এমন সময়ে সাইকেল্ করিয়া কম্পাউণ্ডে ম্যাজিষ্ট্রেটের আরদালী প্রবেশ করিল।

উদ্বিগ্নমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যতীন্দ্র বলিল, "মাটি করলে দেখচি গল্পটাকে! কি খবর নিয়ে আসে কে জানে!"

আকস্মিক রসভঙ্গে সকলেই মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। আরদালী আসিয়া সেলাম করিয়া সমরেন্দ্রর হাতে চিঠি দিল। চিঠি পড়িয়া সমরেন্দ্র বলিল, "জরুরী কাজে সাহেব ডেকেচেন—আমাকে উঠ্‌তে হ'ল। কিন্তু আপনার গল্প চালান নরেশদা, এঁরা সকলে শুনবেন।"

নরেশ বলিল, "ক্ষেপেচ? আর কি চালাতে আছে? দৈব যেখানে ছেদ দিয়ে দিলে সেইখানেই শেষ।"

মণীন্দ্র বলিল, "সে হবে না নরেশদা, আজ না বলুন, আর একদিন এ গল্পটা বল্‌তে হবে।"

নরেশ বলিল, "আর একদিন আর একটা গল্প বল্‌ব।—আজকের ফুল কি দশদিন পরে ফোটাতে আছে?"

একটা অসন্তোষের কলরব উঠিল। মলয় বলিল, "একটা কথা তা হ'লে বলুন নরেশ-দা। এ গল্পের গৌরীই কি আমাদের বউ-দি?"

রহস্যব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া নরেশ বলিল, "সেটা তোমার বউ-দিদিকে জিজ্ঞাসা কোরো একদিন। উপসংহারটা ভাল ক'রেই তিনি শোনাবেন।"

ভূপেন বলিল, "বাজে রহস্য নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। এ গল্পের উপসংহারের দিকে একটি সত্যিকারের রহস্য আছে। রহস্যটি বেলফুলের কুঁড়ি তোলা নিয়ে। নরেশদা যখন কুঁড়ি ছুটি চাইলেন তখন তাঁকে তুল্‌তে না দিয়ে গৌরী যে নিজে এসে তুলে দিলে—তার অর্থ কি? কুঁড়ি ছিঁড়তে গিয়ে গাছ পাছে নষ্ট হয় সেই ভয়ে, না,—নিজের হাতে কুঁড়ি ছুটি নরেশদাকে দেবার লোভে? অর্থাৎ, নরেশদাদার প্রতি প্রেমে, না,—গাছটির প্রতি মমতায়?"

ভূপতি বলিল, "নরেশদার প্রতি প্রেমে।"

যতীন ইজিচেয়ারে উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিল, "কখনো না,—গাছটির প্রতি মমতায়। গাছের প্রতি যার যত্ন আছে সে গাছের ডাল টেনে ছেঁড়া পছন্দ করে না, গাছকে কষ্ট দেওয়ার ভয়ে কাঁচি দিয়ে কাটে।"

হরিপ্রকাশ বলিল, "আর নরেশদার প্রতি যার প্রেম হয়েছে সে নরেশদার হাতে কাঁচি দেওয়া পছন্দ করে না, নিজ হাতে উপহার দেবার লোভে কাঁচি দিয়ে কাটে।"

হরিপ্রকাশের বিচারে সকলে উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়





তৃষ্ণার বারি

চিত্রাধিকারী—সার ফজল ভাই সি ইব্রাহিম

বিচিত্রা
চৈত্র, ১৩৩৭

শিল্পী—শ্রীযুক্ত এম্-ডি ধুরন্ধর

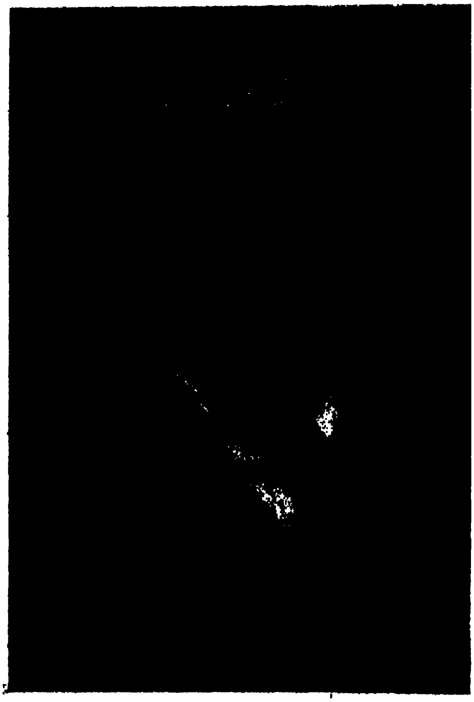
সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্তা অমিয়া দত্ত

জাসিন্তো বেনাভাঁতে (Jacinto Benavente)

জন্ম—১৮৬৬ ; প্রাইজলাভ—১৯২২।



বেনাভাঁতে

নোবেল পুরস্কার পাইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই বেনাভাঁতে পাশ্চাত্য সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। স্পেনের নাট্যসাহিত্য তাঁহার অজস্র দানে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ্ সহরে তাঁহার জন্ম। পিতা মাদ্রিদের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। পিতার ইচ্ছানুযায়ী বেনাভাঁতে যৌবনে কিছুদিন আইন অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। ইহার পর তিনি এক সার্কাসের দলের সহিত কিছুদিন ভবঘুরের মত নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ান। শোনা যায়, উক্ত দলে তিনি বিদূষকের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। পরিশেষে শ্রান্ত হইয়া মাদ্রিদে ফিরিয়া আসেন এবং রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা হইয়া নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন।

১৮৯৩ সালে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের প্রথম উদ্যম—একখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রতিভার কোন পরিচয় ছিল না। পর বৎসর তিনি "Brothers' House" নামে একখানি নাটক লেখেন, ইহাও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত "In Society" নামক গ্রন্থখানিই তাঁহার প্রথম প্রসিদ্ধ নাটক। ইহার দুই বৎসর পরে "বন্য জন্তুর ভোজ" (The Banquet of Wild Beasts) প্রকাশিত হয় এবং এই সাহসী ও ক্ষমতাশালী তরুণ নাট্যকারের উপর সমালোচকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সময় স্পেনের তরুণ সাহিত্যিকগণ সমাজের নানা দোষ-ত্রুটীর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে যে দল গঠন করেন, বেনাভাঁতে ছিলেন তাহার নেতা। তিনি প্রথম হইতেই তাঁহার নাটকের ভিতর দিয়া সমাজের বহু গ্লানি, কলুষ ও কৃত্রিমতাকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও পরিহাসের সহিত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম লেখা সকল নাটকই সমাজের কোন না কোন পাপের চিত্র উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছে। "শাসনকর্ত্তার পত্নী" নামক অতুলনীয় ব্যঙ্গনাট্যখানি প্রকাশিত হইবার পর স্পেনের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া বেনাভাঁতের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক "নিষিদ্ধ প্রেম" (The Passion Flower) ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় অভিনীত হয় এবং যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হয়। নাটকের নায়ক একজন অবস্থাপন্ন কৃষক, স্বীয় পত্নীর প্রথম

পক্ষের কন্যাকে সে ভালবাসে, তাহার সংকন্যাও নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার অনুরাগিণী। কন্যার মাতা এই ঘটনা জানিতে পারিয়া নিজের জীবনের বিনিময়ে কন্যাকে রক্ষা করে। ভাবে ও ভাষায় নাটকখানি অত্যন্ত জোরালো ও শোকাবহ।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া তাঁহার "মানবক"এর নায়িকা Neve সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিখ্যাত নাট্যকার ইবসেনের প্রসিদ্ধ নাটক "Doll's House"এর নায়িকা নোরার সহিত অনেকে Neveএর তুলনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে গল্পটি এই :— Neveএর ভ্রাতা একজন বিবাহিতা নারীর প্রেমে পড়ে ও তাহাকে লাভ করা অসম্ভব জানিয়া অন্য এক রমণীকে বিবাহ করে। ইহাতে তাহার ভগিনী ভ্রাতার সাহসের অভাবে তাহার উপর শ্রদ্ধা হারায় ও তাহাকে নানারূপ তিরস্কার করে। ইহার অল্পদিন দিন পরে ভগিনীও একজন বিবাহিত পুরুষকে ভালবাসে ও তাহারা একত্রে পলায়নের ব্যবস্থা করে। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে সে নিজের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া বলে যে "সত্যকে স্বীকার করার সাহস আমারও নেই, সাধারণ লোকের মত আমিও দুর্ব্বলচিত্ত।"

বেনাভাঁতে দুঃখবাদী নহেন। মানুষের মহত্ত্বে, বিশেষতঃ রমণীর মমতায়, তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। "প্রেমের বৃদ্ধি" নামক নাটকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, কারমেন্ তাহার রোগগ্রস্ত ও বৃদ্ধ স্বামীকে ভালো না বাসিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গুইএর্মোর সহিত যাইতে পারিল না। প্রণয়ীর প্রতি প্রবল প্রেমও রমণী-হৃদয়ের স্বাভাবিক করুণার নিকট পরাজিত হইল।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত তাঁহার "Bonds of Interest", "The School of Princesses" "Field of Ermine" ইত্যাদি নাটকগুলি উচ্চ কল্পনা-শক্তিতে, চরিত্র-চিত্রণে ও রসসৃষ্টিতে সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। বেনাভাঁতে বলেন যে, তিনি জনসাধারণের উপযোগী করিয়া নাটক লেখেন নাই, জনসাধারণকেই তাঁহার নাটকের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার "The Truth," "Autumnal Roses" প্রভৃতি নাটক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে লেখার গুণে তিনি পাঠককে চিন্তা করিতে বাধ্য করেন।

১৯১৩ সালে বেনাভাঁতে স্পেনীয় বিদ্যাপীঠের (Spanish Academy) সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার মতামত বহুলভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। তিনি ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি বহুদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। কৌতুকপ্রিয়তা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তাঁহার বিশেষত্ব হইলেও করুণ রসেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মিলনান্ত, বিয়োগান্ত, এমন কি রূপক নাটকও তাঁহার আছে। সর্ব্বসমেত তিনি শতাধিক নাটক লিখিয়াছেন। বেনাভাঁতে প্রথম শ্রেণীর নাট্যশিল্পী ও স্পেনের নাট্যজগতে নবযুগের প্রবর্ত্তক।

তাঁহার রচনা সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে Walter Starkie লিখিত "Jacinto Benavente" নামক গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

উইলিয়াম বাট্‌লার ইয়েটস্ (W. B. Yeats)

জন্ম—১৮৬৫ ; প্রাইজলাভ—১৯২৩

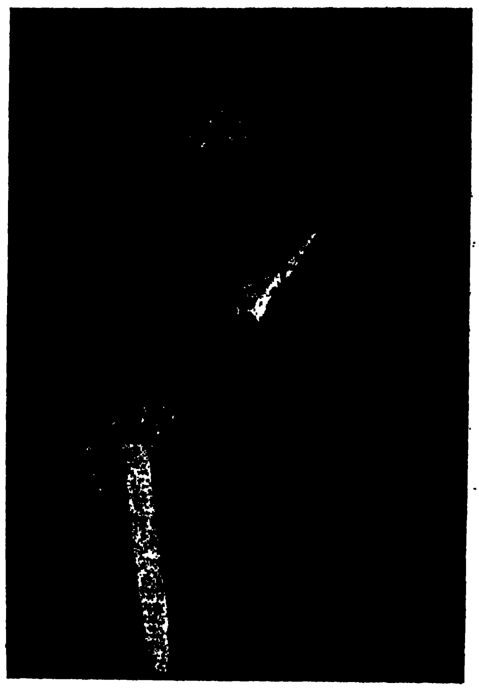
সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার উইলিয়াম্ বাট্‌লার ইয়েট্‌স জীবিত আইরিশ সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় অভ্যুত্থানের বাণীমূর্ত্তি নামে অভিহিত হইয়াছেন। ১৮৬৫ সালের ১৩ই জুন ডব্‌লিনের স্যাণ্ডিমাউণ্টে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা জন্ বাট্‌লার ইয়েট্‌স একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ছিলেন। নয় বৎসর বয়সে ইয়েট্‌স লণ্ডনে যাইয়া হামার স্মিথের গোডোলফিন্ নামক স্কুলে ভর্ত্তি হন। এখানে তিনি বিশেষ সুখী ছিলেন না। কেননা জাতিতে আইরিশ বলিয়া ইংরাজ বালকেরা তাঁহার সহিত ভাল করিয়া মিশিত না এবং তাঁহাকে নানারূপ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিত। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি ডব্‌লিনে ফিরিয়া আসেন। এখানে তিনি ইরাসমস্ স্মিথ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন ও স্লিগোতে তাঁহার মাতামহ ও মাতামহীর সহিত বাস করিতে থাকেন। এই সময়ের অনেক ঘটনা—কল্পনা, কবিত্ব ও পৌরাণিক কাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার "Celtic Twilight" নামক পুস্তকখানিতে ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস "জন সেরম্যান" (John Sherman)এ বর্ণিত

হইয়াছে। "জন সেরম্যান" ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। উক্ত গল্পের নায়কের মত ইয়েট্সও লণ্ডনে প্রবাসের দুঃখ অনুভব করিতেন ও শৈশবের ক্রীড়াভূমি স্লিগোতে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। সেখানকার গাছপালা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সবই তাঁহাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিত।

ইয়েট্সের পিতার ইচ্ছা ছিল যে পুত্রও তাঁহার মত চিত্রশিল্পী হয়। যৌবনে ইয়েট্স কিছুদিন চিত্রবিদ্যা শিক্ষাও করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। চিত্রবিদ্যা শিক্ষা অপেক্ষা তিনি লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়াশুনা করা ও কবিতা লেখা বেশী পছন্দ করিতেন। উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কবিতা 'ডব্‌লিন ইউনিভার্সিটী রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময় তাঁহার রচনায় ইংরাজ কবি শেলী ও স্পেন্‌সারের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। ঈরাস্‌মস্‌ স্কুলে তাঁহার কয়েক জন সহপাঠীও আইরিশ সাহিত্যে সুপরিচিত। ইঁহাদের নাম, চার্ল্‌স্‌ উইক্‌স্‌, জন এগ্লিন্‌টন্‌, চার্ল্‌স জন্‌ষ্টন্‌, ও বিখ্যাত মরমী কবি জর্জ্জ রাসেল (A E.)।

১৮৮৯ সালে অস্কার ওয়াইল্ডের উৎসাহ পাইয়া ইয়েট্স্‌ লণ্ডনে যান ও সেখানে তাঁহার "The Wanderings of Oisin' নামক অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ হইতেই তরুণ কবির যশের সূত্রপাত। সমালোচকগণ একবাক্যে ইহার প্রশংসা করেন ও বলেন যে, এই কাব্যখানি আইরিশ সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করিয়াছে। ১৮৮৮ সাল হইতে ১৮৯৯ সাল পর্য্যন্ত তিনি লণ্ডনেই ছিলেন। তাঁহার এই সময়ের বহু রচনা ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আয়র্ল্যাণ্ডের আচার ব্যবহার পৌরাণিক কাহিনী, জনপ্রবাদ প্রভৃতি লইয়াই তাঁহার অধিকাংশ কবিতা রচিত। গীতি-কবিতার ভিতর তাঁহার "জলটুঙি" একটি গভীর কবিত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় কবিতা। ইহাতে সহরের সুখ সুবিধা ছাড়িয়া "জলটুঙি"তে বাস করিবার জন্য কবির হৃদয়ের একান্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কবি শ্রান্ত হইয়া বলিতেছেন—

এবার আমি নিচ্ছি ছুটি,—ছুটছি এবার জলটুঙিতে—
ছোট্টো আমার পাতার কুঁড়ে তুল্‌বো সেথা কাদার ভিতে;
হোগ্‌লা দিয়ে ছাইব তারে,—কাঠের আড়া, বাঁশের ভাঁশা,
পাহাড়তলীর নিজ্‌ মহলে মৌমাছিদের গুমুর ভাষা!
সুখ নাহি পাই স্বস্তি পাবই,—শান্তি সুখের খেল্‌ব খেলা
ঘোম্‌টা-ঘেরা ভোরটি হ'তে নাগাদ ঝিঁঝি-ডাকার-বেলা;
রাত দুপুরের ঝিক্‌ঝিকি আর দিন দুপুরের আলোর মেলা
দেখ্‌ব;—সাঁঝে আকাশ জুড়ে সবুজ পাখীর হেলা ফেলা।
এবার আমায় উঠ্‌তে হ'ল—ছুটতে হ'ল জলটুঙিতে,
বাঁধা জলে ঢেউ উঠেছে মন্দ মৃদু তটের ভিতে;
শুন্‌তে আমি পাচ্ছি আওয়াজ,—ডাক্‌বে তারে কোন্‌ আওয়াজে
শুন্‌ছি তারে পথের ধারে,—শুন্‌ছি আমার বুকের মাঝে। *



ইয়েট্স্‌

ইয়েট্সের কাব্যগ্রন্থগুলির ভিতর সম্ভবতঃ ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত "Poems" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার কবিতার গভীর ভাব ও সহজ সৌন্দর্য্য অননুকরণীয়। "জলটুঙি" ব্যতীত "When you are old," "The White Birds", "The Rose of the World" প্রভৃতি কবিতা কবির অপরূপ সৃষ্টি। নিম্নে তাঁহার আর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। কবিতাটির নাম "স্বরূপের আরোপ"।

* "মণি মঞ্জুষা"—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সন্ধ্যার আলো লেগেছে নয়নে,—
স্পন্দিত প্রাণ মন ;
চলিতে দীঘির কিনারে কাঁপিছে
জানু ঘিরি' তৃণবন।
ঘুমের নিভৃতে নিশ্বাস পড়ে,
হংস ফিরিছে ঘরে,
শাবকেরা তার ফিরিয়া চলেছে
ডানা হ'তে জল ঝরে।
সহসা শুনিনু কণ্ঠ তুলিয়া
হংস কহিছে ডাকি'—
"চঞ্চুতে ধরা রেখেছে যে ধরি'
আমারি মত সে পাখী,—
মরাল সে জন মরণ-রহিত
রহে সে গগন প'রে,
পাখা ঝাড়িলে সে বৃষ্টি পড়ে গো
চাহিলে জ্যোৎস্না ঝরে।"
আশু বাড়ি' যাই,—শুনিবারে পাই
পদ্ম কহিছে সরে,—
"সৃজন পালন করে যে আপনি
আছে সে বৃন্তভরে।
আপনার ছাঁচে মোরে সে গড়েছে ;
"জগৎ" যাহারে বলে,—
সে তো সেই মহাপদ্মের দলে
হিম-কণা টল্‌টলে।"
ধীরে ধীরে নীরে মুদিল কমল
নিরবিল তার গাথা,
তারার কিরণে দু'আঁখি ভরিয়া
হরিণ তুলিল মাথা ;
সে কহিল "হায়, গগনে যে ধায়
সে এক নিরীহ মৃগ,
নহিলে এমন শান্ত শোভন
জীব সে গড়িত কি গো ?"
হরিণেরে ছাড়ি 'যাই আশু বাড়ি'
ময়ূর ফুকারে কেকা,'
উচ্চে কহে সে "তৃণ পতঙ্গ
সকলি যে গড়ে একা,
সে এক ময়ূর আমারি মতন,
এ শোভা সে দেছে মোরে,—
তারা-ঘেরা পাখা আকাশে দোলায়
সেই সারা রাত ধরে।" *

১৮৯৯ সালে প্রকাশিত "The Wind Among The Reeds" কাব্যখানি সাধারণ পাঠকগণের নিকট দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ, এই সময় হইতে ইয়েট্‌স নিছক কবিতা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বন্ধু, কবি A. Eর ন্যায় তিনিও একজন মরমী (Mystic)।

কীটস্‌ ও উইলিয়াম্‌ ব্লেকের মত তিনিও মানবজাতি ও তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা নদী, ঢেউ, ঝড় ইত্যাদির সহিত বেশী আত্মীয়তা ও সহানুভূতি অনুভব করেন বলিয়া অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয়, যে তাহাতে প্রেমানুরাগ অপেক্ষা কল্পনা-মাধুর্য্য ও ছন্দ-বৈচিত্র্যই বেশী। মানবজাতি হইতে তাঁহার বিচ্ছিন্নতার কারণ সম্বন্ধে বহু সমালোচক বলেন যে ইয়েট্‌স চিন্তা করেন বেশী, কিন্তু অনুভব করেন অতি অল্প। এজন্যই তাঁহার কবিতায় চাঞ্চল্য বা উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। তাহা স্থির, উদার ও গম্ভীর। তাঁহার কবিতার প্রধান সুর দুঃখ। শ্রান্তি, হতাশা, অবসাদ ও নিঃসঙ্গতার সুরই তাহাতে প্রবল।

ইয়েট্‌স শুধুই কবি নহেন, তিনি উচ্চদরের নাট্যকার। কাব্য ও নাটক তাঁহার নাটকে একত্রে মিলিত হইয়াছে। আইরিশ সাহিত্যে নাটকের অত্যন্ত অভাব ছিল। এই অভাব মোচনের জন্য ইয়েট্‌স নাটক রচনায় মনোযোগ দেন। আইরিশ জাতীয় থিয়েটার তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

১৮৯২ সালে তাঁহার প্রথম প্রসিদ্ধ নাটক "কাউন্টেস্‌ ক্যাথলিন্‌" প্রকাশিত হয়। ইহার আখ্যানবস্তু একটি প্রচলিত আইরিশ গল্প হইতে গৃহীত। নাটক হইলেও কাব্য হিসাবেই এখানি বেশী সুখপাঠ্য। এই নাটক

* "মণি-মঞ্জুষা", সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

লিখিবার জন্য তাঁহাকে "নাস্তিক," "স্বদেশদ্রোহী" প্রভৃতি বহু অপযশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইহার প্রথম অভিনয়-রজনীতে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া থিয়েটার-কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকিতে বাধ্য হন। সংক্ষেপে নাটকের গল্পটি এই :—আয়র্ল্যাণ্ডে একবার ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হয়। যখন অন্নের জন্য লোকে হাহাকার করিতেছে, সেই সময় দুইজন শয়তানের অনুচর সওদাগরের বেশে দেশে দর্শন দেয়। তাহারা অর্থ ও খাদ্যের বিনিময়ে লোকের আত্মা ক্রয় করিতে আরম্ভ করে। প্রজাদের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া রাণী ক্যাথলিন অত্যন্ত ব্যথিত হন ও নিজের সমস্ত অর্থ প্রজাদের দান করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই শয়তানের কর্ম্মচারীদ্বয় কৌশলে রাণীর সমুদয় ধনরত্ন অপহরণ করে। তখন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া রাণী আপন আত্মার বিনিময়ে প্রজাদের উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হন। তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শয়তানের অনুচরেরা বহু অর্থের বিনিময়ে রাণীর আত্মা ক্রয় করে। কিন্তু আত্মাবিক্রয়ের পর রাণীর পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হয়। নিজ আত্মার দুর্গতি কল্পনা করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার অসাধারণ আত্মত্যাগে মোহিত হইয়া দেবদূতগণ তাঁহাকে সসম্মানে স্বর্গে লইয়া যায় ও শয়তানের উদ্দেশ্য বিফল হয়। সাধারণ লোকে এই সুন্দর গল্পটির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই উত্তেজিত হইয়াছিল।

তাঁহার পরবর্ত্তী নাটকের নাম "The Land of Heart's Desire।" ইহাও আয়র্ল্যাণ্ডে প্রচলিত একটি পরীর গল্পকে ভিত্তি করিয়া লেখা। নবপরিণীতা বধূর পরীর রাজ্যে যাইবার একান্ত আগ্রহ ও অবশেষে পরীদের তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়ার কাহিনী রূপকের মধ্য দিয়া সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নাটকের ভিতর এইখানিই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। বহু সমালোচক ইহাকে জার্ম্মাণ নাট্যকার হাপ্ট্ম্যানের "মগ্নঘণ্টা" ও মেতার্‌লিঙ্কের "নীলপাখী"র সহিত তুলনা করিয়াছেন। নায়িকা মেরী, তাহার শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী ও পাদ্রী হার্টের চরিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক।

১৯০৩ সালে প্রকাশিত "The Hour-Glass" 'ময়্যালিটি' নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার প্রথমাংশ গদ্যে ও শেষাংশ কবিতায় লেখা। গল্পের নায়ক "বিজ্ঞব্যক্তি" এক ঘণ্টার মধ্যেই নিজের মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়া এমন একটি মানুষের সন্ধান করে, যে-লোক ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাসী। অনেক অনুসন্ধানের পর নির্ব্বোধ টিগ্ ব্যতীত এরূপ কাহাকেও সে খুঁজিয়া পায়না। এই টিগ্ কিন্তু "বিজ্ঞব্যক্তি"র স্কুলে শিক্ষালাভ করে নাই। তাহার শিক্ষা লোকালয়ের বাহিরে, অরণ্যে। নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার একটি অজ্ঞাত গেলিক গাথা ইহাতে সন্নিবেশিত করেন।

উপরোক্ত নাটক ব্যতীত "Cathleen ni Houlihan," "Deirdre," "Shadowy Waters" প্রভৃতি ইয়েট্সের সুপ্রসিদ্ধ নাটকগুলি দেশ বিদেশে সমাদর লাভ করিয়াছে। ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড ও ইতালির শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদিগের ভিতর তিনি অন্যতম। তাঁহার নাটকে ঘটনার স্থান অত্যন্ত অল্প। কিন্তু কাব্যাংশে ও ভাবের গভীরতায় সেগুলি সমুজ্জ্বল।

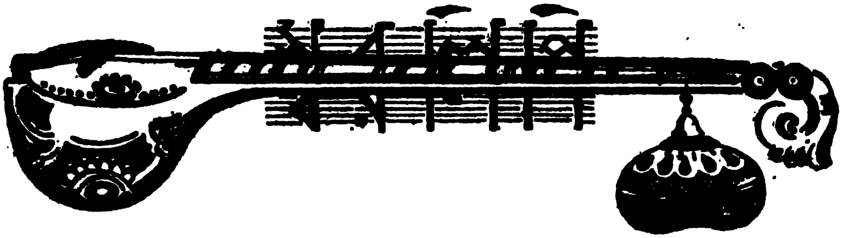
কাব্য ও নাটক ব্যতীত ইয়েট্স ছোটগল্প এবং প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। তাঁহার "The Celtic Twilight"এর গল্পগুলির অধিকাংশই মনোরম। এগুলি ইয়েট্স স্বয়ং স্লিগো ও গাল্‌ওয়ের কৃষকগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। তাঁহার "চুল বাঁধা" নামক গল্পটি আর্টের দিক দিয়া চমৎকারিতা লাভ করিয়াছে।

ইয়েট্সের প্রবন্ধের ভিতর "Ideas of Good and Evil" ও "The Cutting of an Agate" শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি সহজ, সরল ও যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রচনায় মরমী দর্শনবাদের (Mysticism) প্রাচুর্য্য থাকায় তাঁহার আধুনিক কবিতার মত এগুলিও সাধারণ পাঠকের নিকট অস্পষ্ট ও ঝাপ্‌সা বলিয়া বোধ হয়।

কেল্টিক রিভ্যাইভাল বা আইরিশ সাহিত্যকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, ইয়েট্স তাহার প্রধান নেতা। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের বন্ধন হইতে আইরিশ সাহিত্যকে মুক্তিদান করেন, এবং প্রমাণ করেন যে বিশ্বসাহিত্যে দান করিবার মত আয়র্ল্যাণ্ডের নিজস্ব সম্পদ্ও আছে।

তাঁহার জীবনী ও রচনা সম্বন্ধে একাধিক পুস্তক পাওয়া যায়। তন্মধ্যে Forrest Reidএর লেখা W. B. Yeats উল্লেখযোগ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমিয়া দত্ত



সাগরপারের বন্ধু আমার, পরাণ তোমার নাম জানেনা,
তোমারি পথ চেয়ে চেয়ে ওগো, আমার মন মানেনা !
শান্তিহারা প্রাণের জ্বালা—
তাই কি তোমার বরণ মালা,
আমার পানে আমার পানে তোমার কিগো, প্রাণ টানেনা ?
গোপন ফুলের গন্ধ সম—
আভাসে প্রাণ টান্‌লে মম,
নয়ন তোমার পায়না খুঁজে ওগো, আমার মনের-চেনা ॥

কথা—শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

গজল ভীমপলাসী—কার্ফা (বিলম্বিত)

\+ [পা] ২ ।

II { -া পণা ধর্সা -ণধপা । পদপা -মপা মজ্ঞা -া I -া জ্ঞপা -মপা মজ্ঞমা । মজ্ঞা -রা সা -া I
- সা গ --র্ পা-- -- রে র্ - বন্ -- ধু- আ - মা -

I -রা মণ্া সা সমা । মা -া মপা -মা I -জ্ঞা জ্ঞমা -পা পা । মধা -পা মজ্ঞা -মা I
র্ প রা ণ- তো - মা- - র্ না- ম্ জা নে- - না- -

I -পা গণা ধর্সা -ণধপা । পদা -মপা মজ্ঞা -া I -া জ্ঞপা -মা জ্ঞা । জ্ঞা -রা রসা -া I
- সা গ- --র্ পা- -- রে র্ - ব- ন্ ধু আ - মা র্

I (পপা -মপা -জ্ঞমা -জ্ঞরা । -সরা -ণ্দা -জ্ঞমা -পা) } I
আ- -- -- -- -- --- - - }

I -া পা পণা ণা । ণা -া ণা -া I -া ণা -া র্রর্সা । ণর্সা -ণা ণধা -পমা I
- তো মা- রি প - - থ - - - - চে- - - - রে- - - চে - - রে- - -

I -পা পা পণা ণা । ণা -া ণা -া । -া ণা -ধা মপা I -পা -দা মপা -া I
- তো মা- রি - - প - থ - - - চে - রে চে - রে- -

I -া পা -া পদা । পমা -পা মজ্ঞা -া I -া জ্ঞমা -পা পা । মধা -পা পমজ্ঞা -মা II
- ও - গো- আ - মা- - র্ ম- ন্ মা নে- - না- -

II { -া মপা -া পা । মপা -ণপা মজ্ঞা -মা I -া পণা ণর্সা র্সা । র্সা -া র্সা -া I
- শা ন্ তি হা - - - রা- - , - প্রা- ণে- র আ - শা -

I (-ণর্সা -পণা -র্সজ্ঞা -র্রর্সা । -ণর্সা -র্রর্সা -ণধা -পা) } I
আ- - - - - - - - - - - - - - -

I -া র্সা -া সজ্ঞা । জ্ঞা -র্রা র্রা -র্সা I -া ণা ণা র্রর্সা । ণর্সা -ণা ণধা -পা I
- তা ই কি তো - মা র্ - ব র ণ- মা- - লা -

I -া পা পণা ণা । ণা -া ণা -া I -া ণা ণর্রা র্সা । ণা -র্সণা ণা -ধপা I
- আ মা- র গা - নে - - আ মা- র পা - - নে - -

I -া পা পা দা । পমা -পা পমা -জ্ঞা I -া জ্ঞমা -পা পা । মধা -পা পমজ্ঞা -মা II
- তো মা র কি- - গো - - প্রা- ণ্ টা নে- - না- -

II { -া পা পা পা । মপা -ণপা মজ্ঞা -মা I -া পা -ণা ণর্সা । র্সা -া র্সা -া I
- গো প ন ফু- - - - লে- র্ - গ ন্ ধ , স - র -

I (র্সর্সা-ণর্সা-পণা-মপা । -জ্ঞমা-জ্ঞরা-সরা-ণ্সা I -জ্ঞমা-পণা-র্সজ্ঞা-র্রর্সা । -ণর্সা-ণধা-পা-া) } I
আ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

I -া র্সা র্সা র্সজ্ঞা । জ্ঞর্রা -া র্সা -া I -া ণা -ণর্রা র্সা । ণর্সা -ণা ধা -পা I
- আ জা সে- প্রা- - ণ - - টা -ন্ লে ম-- - ম -

I -া পা পণা ণা । ণা -া ণা -া I পণা -পণা -র্সর্রা র্সা । ণর্সা -ণা ণধা -পা I
- ন য়- ন তো - মা য়্ পা- --- -য়্ না খুঁ- - জে- -

I -া পা পণা ণা । ণা -া ণা -া -া ণা -ধা ধপা । পা -দা ণা -া I
- ন য়- ন তো - মা য়্ - পা য়্ না খুঁ - জে -

I -া পা -া পদা । পমা -পা মজ্ঞা -া I -া জ্ঞা মপা পা । মধা -পা পমজ্ঞা -মা II II
- ও - গো আ- - মা- র্ - ম নে র চে- - না- -

দ্রষ্টব্য

গত মাসের স্বরলিপির গানের প্রথম অন্তরার সংশোধিত পাঠ নীচে দেওয়া হইল। উক্ত গানটি নিম্নলিখিত পাঠানুযায়ী গাহিতে হইবে। বিঃ সঃ।

স্মৃতির ছবি মিলাবে যবে
ব্যথার তাপ কিছু ত রবে,
তা নিয়ে মনে বিজন বনে
বিরহদীপ জেলো।

এই গানটি গ্রামোফোনে রেকর্ড করিবার সম্পূর্ণ অধিকার শ্রীমতী সতী দেবীকে অর্পিত হইল। তিনি ছাড়া আর কেহ রেকর্ড করিলে, রেকর্ড নাকচ করা হইবে। —শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

ভেজিটেব্‌ল্‌ ঘি

শ্রীযুক্ত প্রমোদগোবিন্দ মহলানবিশ বি-এস্‌ সি, ডিপ্‌-টেক্‌

উপকরণ ও রসায়ন

মাত্র দশ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে ভেজিটেব্‌ল্‌ ঘি'র কথা সবিশেষ পরিচিত ছিল না। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যেই ইহার ব্যবহার এদেশে এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে গত এক বৎসরে প্রায় এক কোটী টাকার জিনিস আমদানি হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে হলাণ্ড (Holland) হইতে ভাল, মন্দ, নানাপ্রকারের উদ্ভিজ্জ ঘি এদেশে আমদানি হইয়াছে। বর্ত্তমানে উদ্ভিজ্জ ঘি'র প্রচলন এত বেশী হইয়াছে যে, বাজারে খাঁটি ঘি পাওয়া প্রায় দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ব্যবহার স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ভাল কি মন্দ—ইহা লইয়া দেশ-ব্যাপী তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। কৌন্সিলে মাননীগণ তর্কযুদ্ধে মাতিয়া উঠিয়াছেন। মিউনিসিপালিটি ও কর্পোরেশনে সভ্যগণ ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তি উপস্থাপিত করিয়া বহু বিতর্ক করিয়াছেন। বিপক্ষ বলেন—এই বিদেশী ভেজালের প্রবেশ পথে "No admittance" (প্রবেশ নিষেধ) নোটীশ দেওয়া হো'ক, আর সরকার পক্ষ হইতে আইন করিয়া এই অস্বাস্থ্যকর পদার্থের ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়া হো'ক। সপক্ষ বলেন—ঘি'র সমগুণ তুল্য পদার্থ যদি অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পাওয়া যায় তাহা হইলে কেন এই দরিদ্র দেশে ইহার প্রচলন হইবে না? যাহা হো'ক যখন এ সম্বন্ধে এতখানি আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন সাধারণ পাঠকের অবগতি এবং বিচারের জন্য ইহার প্রস্তুতপ্রণালী ও গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করি না।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিৎ, সাধারণতঃ ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশে ঘি'র প্রচলন নাই। অন্যান্য দেশে ঘি'র পরিবর্ত্তে মাখন ব্যবহৃত হয়, এবং রন্ধনের কার্য্যে চর্ব্বি অথবা শোধিত-তৈল ব্যবহার করা হয়। ভারতে ভেজিটেব্‌ল্‌ ঘি আমদানি হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই য়ুরোপ ও আমেরিকায় "মার্গারিন" (Margarine) নামক কৃত্রিম মাখন ব্যবহৃত হইতেছে।

ভেজিটেব্‌ল্‌ ঘি বিশুদ্ধ তৈল হইতে প্রস্তুত করা হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশুদ্ধ পাতলা তৈল ঘি'র মত জমাট ও গাঢ় করিয়া, পরে তিন চারিদিন কোন ঠাণ্ডা যায়গায় রাখিয়া দিলে ইহা ঘি'র মত দানাদার আকার প্রাপ্ত হয়। যে কোন তৈল হইতে ইহা প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু তৈলের দাম অনুসারে ইহার দামের, এবং যদি বিশেষ যত্ন সহকারে তৈল পরিষ্কার ও শোধিত করিয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে আস্বাদেরও প্রভেদ হইয়া থাকে। চিনা-বাদাম, সোয়াবিন (Soyabean), কুসুম ফুল বা কাপাস বীজ প্রভৃতি নানা জাতীয় তৈল বীজ হইতেই সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত করা হয়। সময় সময় মৎস্যের তৈল হইতেও ভেজিটেব্‌ল্‌ ঘি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তৈলের রসায়ন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরিষ্কৃত সকল প্রকার তৈল ও চর্ব্বি দেখিতে একরূপ। অর্থাৎ, উক্ত উপায়ে পরিশুদ্ধ সকল প্রকার তৈলই জলের ন্যায় পরিষ্কার, গন্ধহীন, ও আস্বাদহীন। যন্ত্র সাহায্যে পিষিয়া বা অন্য কোন রাসায়নিক উপায়ে তৈল বাহির করিবার সময় তৈলের সঙ্গে সঙ্গে বীজ হইতে এক প্রকার রং, গন্ধ, ও আস্বাদ নির্গত হইয়া থাকে। এই তিন প্রকার লক্ষণের সাহায্যেই সাধারণ লোকে কোনটি কিরূপ এবং কি তৈল চিনিয়া লইতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নিকট এই সমস্ত বস্তু তৈলের আবর্জ্জনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং তৈল সুপরিষ্কৃত করিতে হইলে প্রথমেই এই সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিতে হয়। এই সমস্ত বাহ্য আবর্জ্জনা ছাড়াও এক প্রকার অম্ল-রসাত্মক পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে প্রায় সকল তৈলেই বর্ত্তমান থাকে। ইহা প্রধানতঃ বীজ-মধ্যস্থ জলের সাহায্যে তৈল

হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং পুরাতন বীজ হইতে নিষ্কাষ্ট তৈলের ভিতর এই অম্লাক্ত পদার্থের পরিমাণ অধিক। যদি তৈল অনেক দিন পর্য্যন্ত গুদাম ভর্ত্তি করিয়া রাখা হয়, কিংবা যদি তৈলে সামান্য পরিমাণেও জল থাকে বা কোন স্যাঁৎ সেঁতে স্থানে বা পাত্রে রাখা যায় তাহা হইলে উক্ত অম্লাক্ত পদার্থের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এই অম্লাক্ত পদার্থ স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর। বাজারের খারাপ ঘি বা তৈল খাইলে অম্লপিত্ত, বুকজ্বালা করা ইত্যাদি নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত অপ্রীতিকর ব্যাধির প্রধান কারণ পূর্ব্বোক্ত অম্লাক্ত পদার্থ সমূহ। এই হিসাবে বাঙ্গালার সরিষার তৈল খাওয়ার পদ্ধতি ভাল, কারণ সরিষার তৈলে সাধারণতঃ শতকরা এক হইতে দেড় ভাগের বেশী উক্ত অম্লাক্ত পদার্থ থাকে না।

প্রস্তুত প্রণালী

ভেজিটেব্‌ল ঘি তৈয়ার করিবার প্রণালী সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) বিশুদ্ধ, সুপরিষ্কৃত তৈল প্রস্তুত করা (২) Hydrogenation Process অর্থাৎ উদ্‌জান বাষ্প যোগে উক্ত বিশুদ্ধ তৈল ঘনীকৃত করা।

তৈল বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। তৈল পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথমেই দেখা উচিৎ তৈলে কি কি আবর্জ্জনা আছে। (১) Free fatty acid, (২) Albuminoids (৩) Mucilage ও (৪) নানাপ্রকার দুর্গন্ধ প্রভৃতি কয়েক প্রকার আবর্জ্জনা সাধাণতঃ তৈলে বর্ত্তমান থাকে। এই সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করাই তৈল পরিষ্কার করিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

তিন প্রকার উপায়ে তৈল হইতে এই সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করা যাইতে পারে। যথা:—(১) Neutralisation (২) Bleaching (৩) Deodorisation। এই তিন প্রকার উপায়ে তৈল বিশুদ্ধ ও পরে গাঢ় করিয়া লইলেই উদ্‌ভিজ্জ ঘি তৈয়ার করা যাইতে পারে। তৈলে কোন প্রকার ক্ষার পদার্থ যোগ করিলে ঐ ক্ষার তৈলে যে free fatty acid থাকে তাহার সহিত যুক্ত হইয়া এক প্রকার সাবান তৈয়ার করে, এবং তৈল neutral অর্থাৎ ক্ষার ও অম্লরস শূন্য হয়। এই সাবান দূর করিয়া তৈল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইতে হয়। পরে ঐ তৈল শুষ্ক করিয়া কোনো বর্ণহারক দ্রব্য যথা:—Tonsil, Frankonite, Fuller's earth অথবা এই জাতীয় কোন পদার্থ সহযোগে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। এই সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যে তৈল পাওয়া যায় তাহা জলের ন্যায় বর্ণহীন ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষার ও অম্লরস শূন্য। এই তৈল পরে ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই পরবর্ত্তী কার্য্যের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এইত গেল প্রথম ও দ্বিতীয় উপায়ের কথা। এখন তৃতীয় উপায়ের সাহায্যে উক্ত প্রকার ক্ষার ও অম্লরস-নিরপেক্ষ বর্ণহীন নির্ম্মল তৈল গন্ধহীন করিয়া লইলেই রসায়নসম্মত বিশুদ্ধ তৈল পাওয়া যায়। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে কি উপায়ে তৈল গন্ধহীন করা যাইতে পারে। তৈলাধারে বিরাট শূন্যতা (High vacuum) সৃষ্টি করিয়া অত্যধিক উত্তপ্ত বাষ্প চালনা করিলে তৈল গন্ধহীন করা যাইতে পারে। ইহাতে তৈলে যে সমস্ত জিনিষ গন্ধ ও আস্বাদ দান করে সেই সমস্ত জিনিষ বাষ্প দ্বারা দূরীভূত হয়। ঐ তৈল পরে ঠাণ্ডা করিয়া পুনরায় উত্তমরূপে ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। এই প্রকার বিশুদ্ধ তৈল কার্য্যতঃ বর্ণহীন, গন্ধহীন ও আস্বাদহীন। যদি যত্ন ও নিপুণতার সহিত উপরোক্ত উপায় অবলম্বনে তৈল পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়, তবে সাধারণ বাহ্য উপায়ে এক জাতীয় তৈল হইতে অন্য জাতীয় তৈলের কোন রকম প্রভেদ দেখান অসম্ভব হইয়া উঠে। ইহা সহজে নষ্টও হয় না। সাধারণতঃ ভারতবর্ষে কারখানাসমূহে যে ভাবে তৈল গুদামজাত করিয়া রাখা হয় তাহাতে অন্ততঃপক্ষে ৪।৫ মাসে ঐ তৈলের কোন প্রকার অনিষ্ট হইবে না।

এই প্রকার বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত তৈল হইতে উদ্‌ভিজ্জ ঘি তৈয়ার করিতে হইলে প্রথমেই এই তরল তৈল ঘি'র মত গাঢ় করিতে হইবে। ঘি'র মত জমাট ও গাঢ় করিতে হইলে ঐ তৈলে বিশিষ্ট-উপায়ে-নির্ম্মিত নিকেলের (Nickel) সমক্ষে উদ্‌জান বাষ্প (Hydrogen gas) চালনা করিতে হয়। ঐ নিকেল জল পাইয়া নিয়ে যা হওয়া পর্য্যন্ত

অনেক বার ব্যবহার করা যাইতে পারে। উক্ত উপায়ে তৈল গাঢ় করা ব্যয়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। বিশিষ্ট উপায়ে নির্ম্মিত নিকেল ও উদ্জান বাষ্প যোগাইবার খরচই হইতেছে প্রধান ব্যয়। কলিকাতার মত বড় সহরে—যেখানে যথেষ্ট বড় বড় কারখানা ও যন্ত্রশালা আছে—একটি ছোট যন্ত্র দ্বারা বৈদ্যুতিক উপায়ে উদ্জান বাষ্প তৈয়ার করিবার যথেষ্ট সুবিধা আছে।

উদ্জান বাষ্প সংযোগে তৈল গাঢ় করিবার প্রণালী

নিম্নলিখিত উপায়ে উদ্জান বাষ্প পরিচালনা করিয়া তৈল ঘি'র মত গাঢ় ও জমাট করিয়া লওয়া যায়। একটি অটোক্লাভের (Autoclave) ভিতরে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত গরম তৈল ও নিকেল রাখিয়া কিঞ্চিৎ চাপের সহিত কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ উদ্জান বাষ্প পরিচালনা করিলে তৈল ক্রমে গাঢ় হইয়া উঠে। ঐ গাঢ় তৈল পরে ঠাণ্ডা করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয় এবং খাওয়ার জন্য ব্যবহার করিতে হইলে আর একবার পরিষ্কার করিয়া লইলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

উদ্ভিজ্জ ঘি ব্যবহার করিবার বিপক্ষে একটি গুরুতর সন্দেহজনক কারণ থাকিতে পারে। যদি কোন উপায়ে বিন্দুমাত্র নিকেল ঐ তেলে বর্ত্তমান থাকিয়া যায় অথবা উদ্জান বাষ্প সংযোগে গাঢ় করিয়া লইবার সময় যদি উক্ত কারণে কোন প্রকার গন্ধ ও আস্বাদ ঐ তৈলে আসে তাহা হইলে উদ্ভিজ্জ ঘি ব্যবহার করিতে আপত্তি উঠিতে পারে। কিন্তু যদি বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত উদ্ভিজ্জ ঘি তৈয়ার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সন্দেহজনক কারণ কোন রকমেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে না।

ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের মনে এক প্রকার ভ্রান্ত ধারণা আজ পর্য্যন্তও বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে বিশুদ্ধ তৈল হইতে যে কোন প্রকারের ঘি বা উক্ত নামীয় তদনুরূপ পদার্থ শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এই হেতু এ দেশীয়গণের মনস্তুষ্টির জন্য উদ্জান বাষ্প সংযোগে বিশুদ্ধ তৈল গাঢ় করিয়া ভেজিটেব্‌ল্ ঘি নামে এক প্রকার গাঢ় তৈল বিদেশীয়গণ বাজারে চালাইতেছেন। যদি জনসাধারণকে কোন প্রকারে জানাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, বিশুদ্ধ পাত্‌লা তৈল খাওয়া অপেক্ষা গাঢ় শক্ত তৈল (উদ্ভিজ্জ ঘি) খাওয়ার বিশেষ কোন উপকারিতা নাই, তাহা হইলে আরো অল্প মূল্যে বিশুদ্ধ ও বলকারক জিনিষ পাওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানেই অক্লেশে বিশুদ্ধ তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ তিল তৈল আহারের বিধি এ দেশে পূর্ব্বকালে ছিল। যদি সাধারণের ভ্রান্ত ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া এই প্রকার বিশুদ্ধ তৈল খাওয়ার প্রচলন করা যায় তাহা হইলে এক নূতন ব্যবসার পত্তন করা যাইতে পারে। এই প্রকার ব্যবসার পত্তন করিয়া তাহার উন্নতিকল্পে প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করা উচিত।

এ দিকে ঘি বা ঐ জাতীয় পদার্থ আহার করিতে হইলেও টাট্‌কা মাল ব্যবহার করা উচিত। উদ্ভিজ্জ ঘি প্রভৃতি যে সকল বিদেশী মালে আজ এ দেশের বাজার ভর্ত্তি হইয়া আছে তাহা অন্ততঃ পক্ষেও তিন মাসের পুরাতন; সুতরাং এই সমস্ত জিনিষ স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর নয়।

যদি কোন দেশী কারখানা এ দেশে ভেজিটেব্‌ল্ ঘি তৈয়ার করিয়া টাট্‌কা মাল বাজারে চালাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মরক্ষা কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। আমরা দরিদ্র, উপযুক্ত খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার সংস্থান পর্য্যন্ত নাই। বিশুদ্ধ টাট্‌কা মাল খাইয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করার উপায় নাই। বাজার-ভর্ত্তি ভেজাল। বাছিয়া লইবার অবসর বা ক্ষমতা কোনটিই আমাদের নাই।

শ্রীপ্রমোদগোবিন্দ মহলানবিশ

যুগ-সন্ধি

-উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্‌-এ, বি-এল্‌

দ্বিতীয় স্তবক

সামন্ত প্রথা ও রাষ্ট্র-বিপ্লব

১

পিতামহ

সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে, বায়ু প্রবেশের ছিদ্র পথের পার্শ্বে একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ স্থাপিত। এক পাত্র জল, একটি রুটি এবং এক আঁটি খড়ও তথায় ছিল। পাহাড় কাটিয়া এই ভূনিম্নের কারাকক্ষ তৈরী হইয়াছে। কোন বন্দী তৃণস্তূপে অগ্নিসংযোগের মতলব করিলেও তাহাতে এই কারাগার ভস্মীভূত হওয়ার আশঙ্কা মোটেই ছিল না—বরং বন্দীরই দম আটকাইয়া মরিবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল।

দ্বার যখন উদ্‌ঘাটিত হইল মার্কুইস্ তখন সেই অন্ধকক্ষে পাদচারণা করিতেছিলেন—যেমন করিয়া কোনো আবদ্ধ বন্যজন্তু পিঞ্জর মধ্যে যন্ত্রচালিতবৎ পুনঃপুনঃ একই পদ্ধতিতে সম্মুখে ও পশ্চাতে চলাফেরা করিতে থাকে।

দ্বারোদ্‌ঘাটনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তিনি মাথা তুলিয়া চাহিলেন। ভূনিম্নে স্থাপিত দীপালোকে উভয়েরই বদন-মণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিল।

তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন। প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই বোধ হয় এমন কিছু ছিল যাহাতে উভয়কেই নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

অবশেষে মার্কুইস্ উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভিকোম্‌ত, নমস্কার। দীর্ঘকাল আপনার সহিত সাক্ষাতের সুখ আমার হয় নাই। হুজুরের বহুৎ মেহেরবাণি, আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন। ধন্যবাদ। আমিও একটু আলাপ সালাপ কর্‌তে চাই। একলা একলা বিরক্তি ধরে' যাচ্ছিল। দেখুন, আপনার বন্ধুরা মিছামিছি যত্ত সময়ের বাজে খরচ কর্‌চেন—সনাক্তের প্রমাণ, কোর্টমার্শ্যালের বিচার এই সব ক্রিয়াকাণ্ড পদ্ধতির অনুষ্ঠানে অনেকটা সময় লাগ্‌বারই কথা। দরকার হলে আমি এর চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিতে পারতাম। আরে, ভেতরে এস না? এ তো আমার নিজেরই বাড়ী। ভাল, যা সব হচ্চে, তা'র সম্বন্ধে তুমি কি বল? খুব নূতন রকমের নয়? একটা গল্প বলি, শোন। কোনো সময়ে এক রাজা ও এক রাণী ছিল। রাজা হচ্চে রাজাই, আর রাণী হচ্চে ফ্রান্স। প্রজারা কর্‌লে কি, না রাজার মাথাটা কেটে ফেলে রাণীকে বিয়ে দিয়ে দিলে রব্‌স্পীয়রের সঙ্গে; সেই ভদ্রলোক এবং রাণীর একটি মেয়ে হ'ল, তার নাম গিলোটিন, যার সঙ্গে, দেখা যাচ্চে, আগামী কাল প্রাতে আমার সাক্ষাৎকার হবে। আমি তা'তে খুবই আহ্লাদিত, এই যেমন তোমাকে দেখে আহ্লাদিত হলেম। সেই কাজেই কি তুমি এসেচ? তোমার পদবৃদ্ধি হয়েচে কি? তুমি কি সেনাপতি হ'তে পার্‌বে? আর যদি শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে দেখা কর্‌তে এসে থাকো, তা' হ'লে তোমার সহৃদয়তায় আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হলেম। ভাইকাউণ্ট, তুমি বোধ হয় এখন ভুলে গেছ, একজন অভিজাত বংশীয় সম্ভ্রান্ত লোক কি রকমের হয়। তবে দেখে নাও, এই একজন তোমার সম্মুখেই রয়েচে। সে হচ্চি আমি। নমুনাটি বেশ ভাল করে' দেখে নাও। এ অতি আশ্চর্য্য জিনিষ—এ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, বংশমর্য্যাদার গৌরবে উৎফুল্ল এবং পিতৃপিতামহের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়, পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে, বিশ্বস্ততা, রাজার প্রতি কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়পরতায় আস্থাবান্—অথচ জল্লাদের সহিত তোমাকে গুলি করে' মার্‌তে পারে।

"অনুগ্রহ করে' বোস। শিলাতলেই উপবেশন কর্‌তে হবে, কেন না আমার বৈঠকখানায় তো আরাম-কেদারা

নেই। আর পঙ্কে যার বাস, মাটির উপর বসতে তা'র আপত্তিই বা কি থাকতে পারে? আমি যে তোমাকে অপমান করবার জন্ত এ কথা বলচি, তা নয়। আমরা যাঁকে বলি পাঁক, তোমরা তাকেই বল "নেশন।" তুমি বোধ হয় আশা কর না যে, আমি "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জয়" ব'লে চেঁচাব। আমার ভবনের এটা একটা খুব প্রাচীন কক্ষ। পুরাকালে জমীদারেরা এখানে চাষা প্রজাদের ধরে' এনে আটক ক'রে রাখ্‌ত; এখন চাষারা সেখানে জমীদারদের আটক করচে। এই সব বাঁদরামির আজকাল নাম হচ্চে রাষ্ট্রবিপ্লব।

"বোধ হচ্চে আর ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার মস্তকটি স্কন্ধচ্যুত হ'বে। আমি তা'তে বিশেষ অসুবিধা দেখ্‌চি না। তবে, আমাকে যারা ধরেচে তাদের একটু ভদ্রতাজ্ঞান থাকলে আমার নস্তের কৌটাটা তা'রা পাঠিয়ে দিত। ওটা সেই আয়না-সাজানো ঘরে রয়েচে, যেখানে ছেলেবেলায় তুমি খেলা করতে—যেখানে আমি তোমাকে জানুর উপর বসিয়ে নাচাতাম। একটি কথা তোমায় বলে রাখ্‌চি, বাপু। তুমি গভেন বলে' নিজের পরিচয় দিয়ে থাক, তোমার ধমনীতে অভিজাতবংশের রক্ত প্রবাহিত—হাঁ, সেই রক্ত যা আমারও ধমনীতে বয়ে যাচ্চে, অথচ সে রক্তের প্রভাব আমাকে করেচে আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, তা'তেই তোমাকে করেচে ইতর! ব্যক্তিগত বাতিকই হয় তো ইহার মূলে। তুমি হয় তো বলবে, তোমার এই ইতর বুদ্ধির জন্ত তুমি দায়ী নও। আমি যে ভদ্র লোক তা'তে আমারও হয় তো বাহাদুরি নেই। হ'তে পারে। একজন বদমাসের এ জ্ঞান নাও থাকতে পারে যে সে বদমাস। যে আব্‌হাওয়ার মধ্যে তা'র বাস, তা'তে করেই তা'র স্বভাব হয় ত অমন ধারা হয়ে উঠে। আমরা যে যুগে বাস করচি, এই কালে মানুষকে বোধ হয় তা'র কার্য্যের জন্ত দায়ী করা যায় না। জগতের সমস্ত পাপের জন্ত তোমার রাষ্ট্রবিপ্লবই দায়ী, আর এই তোমাদের বড় বড় অপরাধী যারা তা'রা কেউই বস্তুতঃ দোষী নয়। কি মূর্খের দল! আচ্ছা, ধর না, তোমাকেই প্রথমে। আমি তোমার তারিফ করি। তোমার মতো একজন প্রতিভাশালী যুবক, পরন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, বৃটেনীয় রাজকুলসম্ভূত, একজন ভাইকাউণ্ট, পার্থিব যে সকল বিষয় লোকে আকাঙ্ক্ষা করে তোমার তা' সবই রয়েচে, অথচ সেই সব ছেড়ে তুমি কি নিয়ে মেতে আছ! তোমার শত্রুরা মনে করে, লোকটা কি ধড়িবাজ, আর মিত্ররা ভাবে, কি বোকা! ভাল কথা, পাত্রী সিমুর্ডানকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবে।"

ওয়েষ্টকোটের পকেটে হাত রাখিয়া মার্কুইস অতি সহজে এই কথাগুলি বলিয়া গেলেন। তাঁহার উচ্চ কণ্ঠে চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার লেশ মাত্র ছিল না। কিছুক্ষণ থামিয়া একটু দম লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন:-

"তোমাকে বধ করবার জন্যে আমি বিধিমত চেষ্টা করেচি, একথা তোমার নিকট গোপন রাখ্‌বার প্রয়োজন দেখ্‌চি না। আমি নিজে তিন তিনবার তোমাকে লক্ষ্য করে' কামান দেগেচি। কাজটা হয় তো ঠিক ভদ্রোচিত হয় নি,—কিন্তু সংগ্রামকালে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে প্রীতিকর কার্য্যের প্রত্যাশা করাটা ঘোরতর অন্যায় হবে। মনে রাখ্‌বে দাদা, এখন আমরা নাতি ঠাকুর্দ্দায় পরস্পর লড়াই কর্‌চি। এখন কেবল আগুন আর তলোয়ারের খেলা। উপরন্তু রাজাকেও হত্যা করা হয়েচে। বাহবা শতাব্দী!"

নিজেকে আবার একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া মার্কুইস্ তাঁর বক্তব্যের সূত্রানুসরণ করিয়া চলিলেন:—

"অথচ ভল্‌টেয়ারকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিলে, আর রুসোকে জেলে পুরতে পারলে, এ সবের কিছুই ঘটত না। কি আপদ—এই সব চিন্তাশীল মানুষগুলো!"

মার্কুইস্ একবার কোটের পকেটে হাত দিয়া যেন নস্তের কৌটাটা খুঁজিলেন। তারপর তাঁহার বাক্যস্রোত আবার বহিয়া চলিল:—

"প্রথমে হ'ল দরখাস্তকারীর দাবী, তারপর এল এই সব তথাকথিত দার্শনিকের দল! হুঁ, ওদের না পুড়িয়ে পুড়ানো হ'ল কি না ওদের লেখাগুলিকে! রাজ-পারিষদ-গণের মধ্যেও অনেকে ওদের সঙ্গে গেল; টুরগোঁ, কুইনে প্রভৃতি বোকারাও তা'তে যোগ দিলে, আর অমনি কুপোকাৎ হয়ে গেল। এ সবের জন্তই সেই কলম-পেষা পত্র-লিখিয়ে

ডিডিরো, এলেমবার্ট প্রভৃতি 'বিশ্বকোষের' দল দায়ী। ভাবলে দুঃখ হয় যে, প্রুশিয়ার রাজার মতো একজন বনেদী ঘরের লোকও এদের সঙ্গে যোগ দিলে! আমি হ'লে এই সব কাগজওয়ালাদের একেবারে দাবিয়ে দিতুম। জানো ত আমরা বংশপরম্পরায় দণ্ডদাতা হাকিম। ঘরের দেওয়ালে এখনো সাজা দেবার যন্ত্রগুলির চিহ্ন রয়েচে। আমাদের আমলে কাগজওয়ালারা টিকৃতেই পারত না। যদ্দিন কাগজে লেখা চলবে, তদ্দিন গুপ্ত-ঘাতকেরও অভাব হবে না; যদ্দিন কালি থাকবে তদ্দিন কালো দাগ পড়বেই; মানুষের হাতে হংসপুচ্ছ যদ্দিন থাকবে, তদ্দিন বোকামী ও গুণ্ডামি প্রশ্রয় পাবেই। পুঁথিতেই অপরাধের সহায়তা করে।……
……………হাঁ, কি গান না তোমরা গেয়ে বেড়াও?—'মানবের স্বত্ব।' 'জনসাধারণের অধিকার',—মাথা আর মুণ্ডু! যখন বলি যে, লর্ড অমুক কাউণ্ট অমুকের ভগ্নীকে বিয়ে করলেন, আবার তার ছেলে হ'ল অমুক, যিনি গভেন বংশের আদি পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা—হাঁ, একটা পরিষ্কার কথা, তা'র বেশ মানে বুঝা যায়, এবং ওখানে যে একটা স্বত্ব আছে তা'ও সুস্পষ্ট। কিন্তু তোমার এই সব জুচ্চোর, বদ্‌মাস,—এরা আবার স্বত্ব কি বলে? দেবধ্বংসী রাজহন্তার দল! কি ভয়ঙ্কর!………

"তোমার জন্যে বাস্তবিকই আমার দুঃখ হয়। তুমি গর্ব্বিত বৃটেনী রাজবংশের সন্ততি; তোমার আমার একই পূর্ব্ব পিতামহ! আর তুমি কিনা আমার সইস্ কোচ্‌ম্যানের দলে গিয়ে ভিড়েচ। এটা মনে রেখো, তুমি যখন শিশু মাত্র আমি তখনই বুড়ো হয়েচি, এখনও আমি তোমার ততখানিই উপরে। বড় হয়ে তোমার অধঃপতন হয়েচে। তোমার আমার ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর আমরা যার যার পথে চলেছি—আমি চলেছি সাধুতার পথে, আর তুমি তার বিপরীত দিকে।……

"এ সব ব্যাপারের পরিণাম কিরূপ দাঁড়াবে জানিনে। তোমার বন্ধুবর্গ তো সবাই পাপিষ্ঠ, নরাধম। খুব উন্নতিই হচ্ছে বটে! সিটিজেন, তোমরাই যখন আজকাল কর্ত্তা, কর যা খুসী। কিছুতেই পেছ-পা হয়োনা, চুটিয়ে দেশটা শাসন ক'রে নাও। কিন্তু তবু বলে' রাখচি, ধর্ম্ম ধর্ম্মই, রাজ-মহিমা আমাদের দেশের ইতিহাসের পনেরো শ' বচ্ছর যুড়ে রয়েচে, আর মাথা কেটে ফেললেও ফরাসী অভিজাতবর্গ এখনও তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী উঁচু। মোদ্দা কথাটা হচ্চে এই:—প্রাচীন ফরাসীভূমি ছিল একটি শান্তিপূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত গৌরবান্বিত রাজ্য। তা'তে নৃপতিগণের দেহ পবিত্র এবং প্রভুত্ব সর্ব্বময় বিবেচিত হ'ত; তারপর রাজগোষ্ঠি, তারপর রাজপুরুষগণ, সেনাপতিবৃন্দ এবং রাজন্যসচিবগণ; তৎপরে বিচারকবর্গ এবং শাসনকর্তৃসম্প্রদায়—এইরূপে পর পর সব পদমর্য্যাদানুসারে সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল; তোমরা এই সবই বিনষ্ট করেচ। প্রদেশগুলির তোমরা ধ্বংস করেচ, অথচ তোমরা জানো না এইগুলি বস্তুতঃ ফ্রান্সের কতখানি ছিল। ফ্রান্সের গৌরব, ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্ব সমগ্র ফ্রান্স লইয়াই! তাহার এক একটি প্রদেশে ইউরোপের এক একটি দেশের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত। পিকার্ডিতে জার্ম্মেনীর স্বাধীনতা-স্পৃহা; শাম্পেনে সুইডেনের সদাশয়তা; বারগাণ্ডিতে হল্যাণ্ডের শিল্পকুশলতা; লাঙ্গুইডকে পোল্যাণ্ডের কর্ম্মক্ষমতা; গ্যাস্কনিতে স্পেনের গাম্ভীর্য্য; প্রোভেন্সে ইটালীর বিজ্ঞতা; নরম্যাণ্ডিতে গ্রীসের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান, আর ডফিনেতে সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্বস্ততা। তোমরা এ সব কিছুই জানতে না, অথচ, সব ভেঙ্গে চুরে' গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে' কি কালাপাহাড়ী কাণ্ডই না তোমরা করেচ, নিরেট মূর্খের দল! তোমরা এখন সব নিজেদের গা বাঁচাতেই ব্যস্ত। তোমাদের মধ্যে মহৎ লোক আর জন্মাবে না; বীরপুরুষ আর তোমরা দেখবে না; প্রাচীন ঐশ্বর্য্যকে তোমরা চিরতরে নির্ব্বাসন দিয়েচ। জাতি হিসাবে তোমাদের অস্তিত্ব এখন আর নেই। বেশ, চলুক, চলুক তোমাদের কাজ। তোমরা সব নব্য তন্ত্রী—লোকের চক্ষে যতদূর হীন হবার হও!"

মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া মার্ ইস্ পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

"কিন্তু আমাদের মহত্ত্ব অটুট রহিবে, যতই কেন না তোমরা রাজহত্যা, অভিজাত-হত্যা আর পুরোহিত-হত্যা কর। ভাঙো, ধ্বংস কর, প্রাচীন বিধিব্যবস্থা পদদলিত কর; চূর্ণ কর রাজসিংহাসন; দেবতার বেদীর উপর উঠে যত পার ধেই ধেই নৃত্য কর। যাও, তোমরা গোল্লায় যাও।

তোমরা ভীরু, কাপুরুষ, রাজদ্রোহী—অকৃত্রিম আনুগত্য বা মহান্ আত্মবিসর্জ্জনের যোগ্যতা তোমাদের নেই। আমার কথা ফুরা'ল। ভাইকাউন্ট, আমাকে এখন গিলোটিনে চড়াতে পার—আমি এখন প্রস্তুত, মশায়ের হুকুমের প্রতীক্ষা করচি।"

তারপর আরও বলিলেন,—

"নিছক সত্য কথাটি তোমার সাম্‌নে বলতে আমি একটুকুও দ্বিধা করি নি। কেনই বা করব? আমি ত মরে'ই আছি।"

গভেন শুধু বলিল, "আপনি মুক্ত।"

কমাণ্ডেন্টের ওভারকোট স্বীয় গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া গভেন মার্ক্ইসের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং তাহা মার্ক্ইসের স্কন্ধের উপর ফেলিয়া দিয়া শিরস্ত্রদটি চোখের উপর পর্য্যন্ত টানিয়া দিল। দুইজনের উচ্চতা একই রূপ ছিল।

মার্ক্ইস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কি হচ্চে?"

গভেন উচ্চকণ্ঠে বলিল, "লেফ্‌টানেন্ট, আমাকে দোর খুলে' দাও।"

দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

গভেন পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আমি বেরিয়ে যাচ্চি, সাবধানে দ্বার বন্ধ কর।"

এই বলিয়াই সে হতবুদ্ধি মার্ক্ইসকে ঠেলিয়া দ্বারের বাহির করিয়া দিল। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, গার্ডরুমে পরিণত এই হলটির অন্ধকার শৃঙ্গনির্ম্মিত লণ্ঠনের ক্ষীণালোকে কোনরূপে বিদূরিত হইতেছিল মাত্র। রক্ষীগণের মধ্যে যাহাদের তখনও নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই, তাহারা শুধু অস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করিল, কমাণ্ডার-ইন্-চীফের ওভারকোট ও শিরস্ত্রাণে আবৃত দীর্ঘাকৃতি একজন লোক তাহাদের মধ্য দিয়া প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিল, এবং লোকটি বাহির হইয়া গেল।

মার্ক্ইস্ ধীরে ধীরে গার্ডরুম অতিক্রম করিয়া ভাঙ্গনের ভিতর দিয়া বাহির হইলেন। শাস্ত্রী তাঁহাকে গভেন ভাবিয়া বন্দুক উত্তোলন পূর্ব্বক সম্মান প্রদর্শন করিল। দুর্গের বাহিরে মাঠের তৃণাস্তরণ তাঁহার পদযুগল স্পর্শ করিল; মাত্র দুই শত গজ দূরে নিবিড় অরণ্যানী, আর সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত অবারিত প্রান্তর, নিশীথিনীর গোপন ক্রোড়, মুক্তি, জীবন! মার্ক্ইস্ সহসা থামিলেন। এতক্ষণ তিনি যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো চলিতেছিলেন। বিস্ময়ের প্রথম আবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে তিনি যেন ভাবিতে লাগিলেন, মুক্তদ্বার পথে বাহির হইয়া পড়িয়া ভাল কি মন্দ করিয়াছেন। গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মার্ক্ইস্ দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমাঙ্গুলিতে তুড়ি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ।" তারপর আবার ছুটিয়া চলিলেন।

কারাকক্ষের দ্বার পুনরায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গভেন ভিতরে রহিল।

২

"কোর্ট মার্শ্যাল"

আমরা যখনকার কথা বর্ণনা করিতেছি, তখনও কোর্ট-মার্শ্যালের (সামরিক বিচারের) নিয়মপ্রণালী রীতিমত বিধিবদ্ধ হয় নাই। বিচার-কমিটিতে প্রেসিডেন্টই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কমিটির অন্যান্য সভ্যগণ তাঁহারই ইচ্ছানুসারে নির্ব্বাচিত হইত; ভোট লওয়ার ব্যবস্থাও তিনিই করিতেন; এক কথায় তিনিই ছিলেন বিচারক এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা।

নিম্নের যে হলঘরে প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং যাহা এক্ষণে গার্ডরুমে পরিণত, সিমুর্দ্দান তাহাই কোর্ট-মার্শ্যালের বিচার আদালতের জন্য মনোনীত করিলেন। কারাকক্ষ হইতে বিচারালয় এবং বিচারালয় হইতে বধ্যমঞ্চ—সমস্ত পথই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা, এই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়।

তাঁহার আদেশানুসারে দিবা দ্বিপ্রহরে কোর্টের কার্য্য আরম্ভ হইবে। তিনটি বেতের চেয়ার একটি দেবদারু কাঠের টেবিল, দুইটি প্রজ্জ্বলিত চর্ব্বিবাতি, টেবিলের সম্মুখে একটি টুল—কোর্টের জাঁকজমকের মধ্যে এই মাত্র।

চেয়ারে বিচারকগণ উপবেশন করিলেন। টুলটা আসামীর জন্য। টেবিলের দুই পার্শ্বে আরও দুইটি টুল ছিল—একটিতে কমিশনার অডিটার এবং অপরটিতে রেজিষ্ট্রার বসিবে।

টেবিলের উপর গালার কাঠি, সাধরণতন্ত্রের পিত্তল নির্ম্মিত শীল-মোহর, কয়েক তক্তা সাদা কাগজ, এবং দুইটি মুদ্রিত ইস্তাহার। উহাদের একটিতে ল্যান্টিনেককে আইনের আশ্রয়-বর্জ্জিত করার ঘোষণা, অপরটিতে কন্ভেন্সনের আদেশ।

মাঝের চেয়ারখানির পশ্চাতে একরাশ ত্রিবর্ণের পতাকা। সেই অনাড়ম্বর সারল্যের যুগে সাজসজ্জায় খুব কম সময়ই লাগিত। বন্দীগৃহকে বিচারালয়ে পরিবর্ত্তিত করা বিশেষ আয়াসসাধ্য ছিল না।

মাঝের চেয়ারখানি প্রেসিডেন্টের জন্য। উহা কারা-কক্ষের দ্বারের নিকট স্থাপিত ছিল।

সৈনিকগণই দর্শকের স্থান অধিকার করিয়াছে।

আসামীর কাষ্ঠাসনের পার্শ্বে দুইজন রক্ষী দণ্ডায়মান।

প্রেসিডেন্টের চেয়ারে সিমুর্দ্যান, তাহার দক্ষিণপার্শ্বে প্রথম জজ কাপ্তেন গেচাম্প এবং বাম পার্শ্বে দ্বিতীয় জজ সার্জ্জেন্ট রাডুব উপবেশন করিলেন।

সিমুর্দ্যানের মস্তকে ত্রিবর্ণের 'বো' যুক্ত হ্যাট, কটিতে কৃপাণ, এবং কোমরবন্ধে দুইটি পিস্তল। ললাটের লোহিত ক্ষতচিহ্ন তাহার কঠোর মূর্ত্তিকে অধিকতর কঠোরদর্শন করিয়া তুলিয়াছে।

রাডুবের রক্তস্রাব একেবারে ক্ষান্ত হয় নাই। একটা রুমাল দিয়া তাহার মাথার ক্ষতস্থল বাঁধা। রুমালের উপর একটি রক্তের ফোঁটা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল।

কোর্টের কাজ তখনও আরম্ভ হয় নাই। বিচার-মঞ্চের টেবিলের পার্শ্বে একজন অশ্বারোহী অপেক্ষা করিতেছে। চঞ্চল অশ্ব সম্মুখের পদযুগল দ্বারা ক্ষিতিতল বিমর্দ্দিত করিতেছিল। সিমুর্দ্যান লিখিতেছেন,—এই কয়টি ছত্র তিনি লিখিলেন :—

"কমিটি-অব্-পব্লিক্ সেফ্টি। সিটিজেন-সদস্যগণ, ল্যান্টিনেক ধৃত হইয়াছে। আগামী কল্য তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।"

ডেস্প্যাচ্টিতে তারিখ দিয়া তিনি স্বাক্ষর করিলেন। তারপর উহা ভাঁজ করিয়া শীল মোহরাবদ্ধ করতঃ দূতের হস্তে অর্পণ করিলেন। দূত নিষ্ক্রান্ত হইল।

অতঃপর সিমুর্দ্যান উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "কারাকক্ষের দ্বার উদঘাটিত কর।"

দ্বাররক্ষী সৈনিকদ্বয় অর্গল মোচন করিয়া দ্বার উদঘাটিত করিল এবং কারাকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মুক্ত দ্বারের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি সিমুর্দ্যান মস্তক উন্নত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বন্দীকে আনয়ন কর।"

দ্বারের খিলানের নিম্নে, সৈনিকদ্বয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সে গভেন।

সিমুর্দ্যান চমকিয়া উঠিল। বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিল "এ কি ? এ যে গভেন !"

গভেন বলিল, "হ্যাঁ, আমিই বটে।"

"আপনি ?"

"হ্যাঁ, আমিই।"

"আর, ল্যান্টিনেক ?"

"তিনি মুক্ত।"

"মুক্ত !"

"হ্যাঁ।"

"পালিয়েচে ?"

"পালিয়েচে।"

কাঁপিতে কাঁপিতে সিমুর্দ্যান বলিল,—তাহার কথাগুলি জড়াইয়া আসিতেছিল—"অসম্ভব কি, এই দুর্গ তো তাহারই ভবন ; বহির্গমনের কত পথ হয় তো সে অবগত আছে। সম্ভবতঃ কারাকক্ষের কোন গুপ্ত নির্গম-পথ আছে। আমার ভাবা উচিত ছিল, সে পলায়নের চেষ্টা নিশ্চয়ই করিবে, আর এবিষয়ে অপরের সাহায্য লইবারও তাহার কোনো প্রয়োজন হইবে না।"

গভেন কহিল, "সে সাহায্য পাইয়াছে।"

"পলায়নের সাহায্য ?"

"হ্যাঁ।"

"কে তাহাকে সাহায্য করিল ?"

"আমি।"

"আপনি ?"

"আমি।"

"আপনি স্বপ্ন দেখ্‌চেন ?"

স্থির অকম্পিত কণ্ঠে গভেন বলিল,—

"আমি একাকী কারাকক্ষে প্রবেশ করি ; আমার ওভার-কোট গাত্র হইতে উন্মোচিত করিয়া তাহাকে পরাইয়া দি ; এবং আমার শিরস্ত্রাণে তাহার মস্তক উত্তমরূপে আবৃত করি। তারপর সে বাহির হইয়া গেল, আর তাহার স্থলে আমি এখানে রহিয়া গেলাম।"

"নিশ্চয়ই আপনি ইহা করেন নাই।"

"আমিই করেচি।"

"এ অসম্ভব।"

"ইহা সত্য।"

"ল্যান্টিনেককে আমার নিকট উপস্থিত করুন!"

"সে তো আর এখানে নেই, আমার পোষাক-পরা ছিল বলে' সৈনিকগণ তা'কে আমি মনে করে' চলে' যেতে দিয়েচে। রাত্তির আঁধার ছিল।"

"আপনি ক্ষেপেচেন!"

"যা ঘটেচে আমি তাই বল্‌লাম।"

কিছুক্ষণের জন্য সব নিঃশব্দ। তারপর আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সিমুর্দ্যান অতিকষ্টে বলিল, "জানেন আপনার কার্য্যের সাজা"—

"প্রাণদণ্ড," গভেন বলিল।

সিমুর্দ্যানের বদনমণ্ডল মৃতের মতো বিবর্ণ হইয়া গেল। বজ্রাহতবৎ তিনি নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস যেন আর বহিতেছিল না। ললাটে বৃহৎ ঘর্ম্মবিন্দু।

বিশেষ চেষ্টায় কণ্ঠস্বর কঠোর করিয়া সিমুর্দ্যান বলিলেন, "প্রহরীগণ, বন্দীকে বসাও।"

গভেন টুলের উপর যাইয়া উপবেশন করিল।

সিমুর্দ্যান পুনরায় কহিল, "তোমাদের কৃপাণ উন্মোচিত কর।"

ইতিমধ্যে সিমুর্দ্যানের কণ্ঠস্বর আবার পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হইয়াছে।

তিনি বলিলেন, "আসামী, উঠিয়া দাঁড়াও।"

গভেনের প্রতি আর তিনি "আপনি" ও "আপনার" শব্দ প্রয়োগ করিলেন না।

৩

বিচারক

গভেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তোমার নাম কি ?" সিমুর্দ্যান জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর হইল,—"গভেন।"

সিমুর্দ্যান জবানবন্দী করিতে লাগিলেন :—"পেশা ?"

"আমি উত্তর উপকূলের তল্লাসী বিভাগের সৈন্যাধ্যক্ষ।"

"যে লোকটা পলায়ন করিয়াছে. তুমি তাহার কোনো আত্মীয় বা কুটুম্ব ?"

"আমি তাহার ভ্রাতুষ্পৌত্র।

"কন্‌ভেন্‌সনের হুকুম তুমি অবগত আছ ?"

"সেই হুকুমের ঘোষণা-পত্র একটা আপনার টেবিলের উপর রয়েচে, দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

"এই ঘোষণা সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে ?"

"আমি উহাতে স্বাক্ষর করেছিলুম, আমিই উহা লিখিয়েছিলুম এবং আমিই উহা প্রচারার্থ পাঠিয়েছিলুম।"

"তুমি আত্মসমর্থনের জন্য একজন উকীল নিযুক্ত করতে পার।"

"আমি নিজেই নিজের পক্ষ সমর্থন করব।"

"তোমার যাহা বলবার বলতে পার।"

সিমুর্দ্যানের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ ভাবাভিব্যক্তি-বিহীন। কিন্তু সেই স্থৈর্য্য পাষাণময় পর্ব্বত-শৃঙ্গের কঠোরতার অনুরূপ ; নির্ব্বিকার মানব-চিত্তের প্রশান্তি তাহাতে ছিল না।

গভেন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, যেন সে তাহার বিক্ষিপ্ত চিন্তাসূত্রগুলিকে একত্রিত করিতেছিল।

সিমুর্দ্যান পুনরায় কহিলেন, "স্বপক্ষে তোমার কি বলিবার আছে ?"

গভেন ধীরে মস্তক উত্তোলন করিল, কিন্তু বিচারকগণের দিকে না চাহিয়া বলিল,

"এইটুকু মাত্র। একটা জিনিস আর একটাকে দেখ্‌তে দেয় নি। চক্ষের সাম্‌নের একটা মহৎ কার্য্য দূরের শত পাপকার্য্যকে ঢেকে ফেলেছিল। একদিকে, একটা বৃদ্ধ ; অপরদিকে, তিনটি শিশু।—এরাই মধ্যে আমার কর্ত্তব্যের

পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। ভস্মীভূত গ্রাম, লুণ্ঠিত শস্যক্ষেত্র, বন্দী ও আহতগণের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নারীর উপর গুলি চালানো—এসব আমি ভুলে গেছলাম; বিশ্বাস-ঘাতকতা পূর্ব্বক ইংলণ্ডের হস্তে ত্রান্সের সমর্পণ, এ আমার মনে রৈল না; আমি আমাদের দেশদ্রোহীকে ছেড়ে দিলুম। আমি দোষী। আমার কথা শুনে' মনে হতে' পারে, আমি নিজের বিরুদ্ধে বল্‌চি, কিন্তু বস্তুতঃ তা' নয়। অপরাধী যখন তা'র নিজের দোষ স্বীকার করে, তখন জীবনের যা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ পদার্থ—ইজ্জৎ, সে তাই রক্ষা করে।"

সিমুর্দ্যান বলিলেন, "তোমার আত্মসমর্থনে আর কি কিছুই বলবার নাই?"

"আর একটা কথা আমি বল্‌তে চাই। সেটা এই। আমি যখন এখানকার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ তখন সকলের দৃষ্টান্ত-স্থানীয় হওয়া আমার উচিত; আপনাদের উচিত আদর্শ বিচারকের মতো কাজ করা।

"কি হ'লে তা হয়?"

"আমার প্রাণদণ্ড।"

"সেটা ন্যায়সঙ্গত হবে, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌চ?"

"শুধু ন্যায়সঙ্গত না, আবশ্যকও বটে!"

"বোস।"

অতঃপর কমিশনার-অডিটার উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রথমে, ভূতপূর্ব্ব মার্কুইস্ ডি ল্যান্টিনেককে আইনের আশ্রয়বর্জ্জিত করার ঘোষণা-পত্র এবং তৎপরে, বিদ্রোহীবন্দীর পলায়নের সহায়তা-কারীগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে—এতৎসম্বন্ধীয় কন্‌ভেন্‌সনের হুকুম পাঠ করিল। ইস্তাহারের নীচের দিকে মুদ্রিত এই কয়টি কথা পড়িতে পড়িতে তাহার পাঠ সমাপ্ত হইল—"এতদ্বারা নিম্নলিখিত বিদ্রোহীকে সাহায্য করা বারিত হইল, আদেশ অমান্য করিলে প্রাণদণ্ড—(স্বাক্ষর) তল্লাসী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ—গভেন।" পাঠান্তে কমিশনার-অডিটার পুনরায় আসন গ্রহণ করিল।

বক্ষোপরি হস্তদ্বয় ন্যস্ত করিয়া সিমুর্দ্যান বলিলেন,—"আসামী, মনোযোগ দাও। জনসাধারণ, চাহিয়া দেখ এবং চুপ করিয়া শোনো। আইনের অমোঘ বিধান তোমরা লক্ষ্য কর। এখন ভোট লওয়া হইবে, এবং অধিকাংশের মতানুসারে হুকুম দেওয়া হইবে। আসামীর সম্বন্ধে প্রত্যেক বিচারক তাহার নির্দ্ধারণ উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিবেন। ন্যায় বিচারে গোপন করিবার কিছুই নাই।"

তারপর বলিলেন, "প্রথম বিচারক এক্ষণে তাহার ভোট দিবেন।"

কাপ্তেন গেচাম্প নত দৃষ্টিতে মুদ্রিত ইস্তাহারটির দিকে চাহিয়াছিলেন—যেন তথায় এক অতল স্পর্শ গহ্বর। সিমুর্দ্যান কি গভেন কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। তিনি বলিলেন:—

"আইনের বিধান অমোঘ। একজন বিচারক সাধারণ মনুষ্যের মতো নহে। কোনো কোন বিষয়ে তিনি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট—কেন-না, হৃদয় বলিয়া তাঁহার কিছু নাই; আর কোনো কোনো বিষয়ে তিনি সাধারণ মানুষের উপরে, কেন-না ন্যায়ের তরবারী তাঁহার হস্তে। ৪১৪ রোমীয় অব্দে ম্যানলিউস্ বিনা আদেশে দেশ জয় করার অপরাধে আপন তনয়ের প্রাণ-দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য এরূপ দৃষ্টান্তের প্রয়োজন ছিল। আইন নিয়মানুগত্যের অনেক উপরে। একটা করুণা-প্রণোদিত কার্য্যে আমাদের দেশ আবার বিপন্ন হইল। অবস্থা বিশেষে দয়াও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কমাণ্ডেণ্ট গভেন বিদ্রোহী ল্যান্টিনেকের পলায়নের সহায়তা করিয়াছেন। গভেন দোষী। আমার রায়—মৃত্যুদণ্ড।"

"রেজিষ্ট্রার, লিখে নাও," সিমুর্দ্যান বলিলেন।

রেজিষ্ট্রার লিখিল, "কাপ্তেন গেচাম্প,—মৃত্যুদণ্ড।"

দৃঢ় উচ্চকণ্ঠে গভেন বলিয়া উঠিল "গেচাম্প, তুমি ঠিক রায় দিয়েছ, তোমাকে ধন্যবাদ।"

সিমুর্দ্যান বলিলেন, "এখন দ্বিতীয় বিচারকের পালা। সার্জেণ্ট রাডুব, এইবার আপনি বলুন।"

রাডুব উঠিয়া দাঁড়াইল, গভেনের দিকে ফিরিয়া তাহাকে সামরিক অভিবাদন করিল, এবং তারপর উচ্চৈঃস্বরে, যেন উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল:—

"আইন যদি এমন ধারা হয় তবে গিলোটিনে আমারও প্রাণ যাওয়া উচিত; কারণ জীবনের নামে শপথ করে' বল্‌চি, আমি হলেও বুড়ো যা' করেচে প্রথমে তাই কর্‌তুম,

এবং তারপর আমার কমাণ্ডেণ্ট যা করেচে তা' করতুম্। যখন দেখলুম, ওই আশী বছরের বুড়ো আগুনে ঝাঁপ দিলে তিনটে বাচ্চাকে বাঁচাবার জন্যে, তখন আমার আত্মাপুরুষ বলে উঠ্‌ল', 'সাবাস, বুড়ো, ধন্য তোমার সাহস'। আর যখন শুন্‌লুম আমারই কমাণ্ডেণ্ট তোমাদের ওই গিলোটিন-রাক্ষসের কবল থেকে সেই বুড়োকে রক্ষা করেচেন, তখন আমার বুকটা ফুলে' যেন দশ হাত হয়ে উঠ্‌ল,—ডাক ছেড়ে বল্‌তে ইচ্ছা হ'ল, কমাণ্ডেণ্ট তুমি আমাদের প্রধান সেনাপতি হও, তুমি খাঁটি সোণা, আমি হ'লে তোমাকে "সেণ্ট লুইয়ের ক্রশ" পুরস্কার দিতুম, তবে কি না এখন আর ক্রশও নেই, সেণ্টও নেই, লুইও নেই।

"এরা সব করচে কি! আমরা কি এখন সব বোকা বনে' যাব? এরই জন্যে কি আমরা জেমাপে, ভাসি, ব্রুসের যুদ্ধ জিতেছিলুম? তা' হ'লে তাই বল, একবার বুঝে' পড়ে' নেওয়া যাক্। এই তোমাদের কমাণ্ডেণ্ট গভেন—যিনি আজ ৪ মাস ধরে' রাজপক্ষীয় গাধাগুলিকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, এবং তলোয়ারের সাহায্যে সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করেচেন, যিনি ডল-এ এমন কার্য্য করেচেন, যা' করতে মাথার মতো মাথা চাই—তাঁ'কে তোমরা গিলোটিনে নিকেশ করতে চাও! কোথায় তাঁ'কে তোমরা প্রধান সেনাপতি নির্ব্বাচন করবে, না তোমরা কাট্‌তে যাচ্চ তার গলা! দেখে শুনে' আমার ইচ্ছে হচ্চে সমুদ্রে ঝাঁপ দিই।

"আর আপনি, সিটিজেন গভেন, আপনি আমার অধ্যক্ষ না হলে' আমি বল্‌তুম যে, এই মাত্র আপনি যে সব কথা বল্‌লেন সে সব সেফেক পাগলামি। ছেলেদের বাঁচিয়ে বুড়ো খুব ভাল কাজ করেচে; বুড়োকে বাঁচিয়ে আপনি খুব ভালো কাজ করেচেন; আর এই সব ভালো কাজের জন্যই লোকদের আমরা গিলোটিনে চড়াব না কি? তা যদি হয়, তবে আমি বল্‌চি, আমার আর মাথার ঠিক নেই। গায়ে চিম্‌টি কেটে দেখ্‌চি—এসব কি স্বপ্ন না সত্যি! আমি কিছুই বুঝতে পারচি নে। তা হ'লে বুঝি এই বাচ্চাগুলির পুড়ে' মরাই উচিত ছিল। আর এই বুড়োকে গিলোটিনে চড়ানোই আমার কমাণ্ডেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল! তা'র চেয়ে—দেখুন, আমি একটা কথা বল্‌চি—এই, আমাকেই না হয় গিলোটিনে চড়িয়ে দিন্। ছেলেগুলি যদি মারা যেত, তা হ'লে লাল পল্টনের মান ইজ্জৎ কিছু থাক্‌ত কি? তা'ই কি আপনারা চেয়েছিলেন? তা হ'লে আমরা সকলে একে অপরকে খেয়ে ফেল্‌লেই ত সব চুকে' যায়। আমি দেখচি আমাদের পরিণাম ঘনিয়ে এসেছে। আমি যা বুঝি তাই বল্লুম, অত মারপ্যাঁচ আমার মধ্যে নেই। আরে, আমরা এই লড়াইয়ে প্রাণ দিতে গেছলুম কি জন্যে? সে কি আমাদের সেনাপতিকে আর কেউ হত্যা করতে পারবে বলে?' শুনুন, ও সব হবে টবে না। আমি আমার অধ্যক্ষকে চাই-ই। কাল তাঁর প্রতি আমার যতটুকু শ্রদ্ধা ছিল, আজ তার শতগুণ বেড়ে গেচে। তাঁকে না কি গিলোটিনে দিবে? হুঁ! হাসিও পায়, দুঃখও লাগে! লোকে যা খুসী বলুক। ও কাজটি অসম্ভব!"

রাডুব বসিয়া পড়িল। তাহার ক্ষত হইতে আবার সবেগে রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল।

সিমুর্দ্যান সার্জেণ্টের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

"আসামী খালাস পায়, এই আপনার রায়?"

রাডুব বলিল, "আমার রায়, তা'কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হোক।"

"আমি জিজ্ঞেস করচি, আপনি কি তা'কে খালাস দিতে বলেন?"

"আমি বল্‌চি, তাকে সাধারণতন্ত্রের সর্ব্বাধ্যক্ষ করা হোক।"

"সার্জেণ্ট রাডুব, আপনার ভোট কমাণ্ডেণ্ট গভেনের মুক্তির জন্য?—হ্যাঁ কি না?"

"আমার ভোট এই যে, ওঁর মাথাটা না কেটে আমার মাথাটা কাটা হোক্।"

"খালাস"—রেজিষ্ট্রারকে সম্বোধন করিয়া সিমুর্দ্যান বলিলেন,—"লিখে নাও, খালাস"।

রেজিষ্ট্রার লিখিল—"সার্জেণ্ট রাডুব :—খালাস"। তারপর বলিল "এ যে সমান সমান হ'ল। এক ভোট প্রাণ দণ্ডের পক্ষে, এক ভোট খালাসের পক্ষে।"

এইবার সিমুর্দ্যানের পালা। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাথার হ্যাট খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

তাঁহার বদন-মণ্ডল এখন আর শুধু বিবর্ণ নহে—একেবারে পাংশুটে হইয়া পড়িয়াছে।

উপস্থিত জনতার সকলে যদি আস্তরণাবৃত শবদেহ হইত তবুও বোধহয় তথাকার নিস্তব্ধতা ইহা হইতে অধিক হইত না।

ধীর, গম্ভীর, অকম্পিত কণ্ঠে সিমুর্দ্যান বলিলেন :—

"আসামী তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাহার শুনানি হইল। সাধারণতন্ত্রের নামে এই সামরিক বিচারাদালত অধিকাংশের মতানুসারে"—

সহসা তিনি একটু থামিলেন। সমস্ত জনতা রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রাণদণ্ডের আদেশ জ্ঞাপন করিতে তাহার কি দ্বিধা হইতেছিল? না, প্রাণরক্ষার কথা বলিতে যাইয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন?

সিমুর্দ্যান তাহার প্রারব্ধ বাক্য শেষ করিলেন :—

"—তোমার মৃত্যুদণ্ড বিধান করিলেন।"

একটা ভীষণ আত্মজয়ের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা তাহার বদনমণ্ডলে প্রকটিত হইল।

এ ভাব শুধু মুহূর্তের জন্য। ক্ষণপরেই তাহা আর রহিল না। সিমুর্দ্যান পুনরায় পূর্ব্ববৎ আবেগহীন মর্ম্মর মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। তিনি উপবেশন করিলেন; মস্তকোপরি হ্যাট স্থাপন করিয়া বলিলেন, "গভেন, আগামী কল্য সূর্য্যোদয়ে তোমার শিরচ্ছেদ হইবে।"

গভেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি আদালতকে ধন্যবাদ দিতেছি!"

সিমুর্দ্যান কহিলেন, "দণ্ডিত ব্যক্তিকে এখান হইতে লইয়া যাও।" তাঁহার ইঙ্গিতে কারাকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল, এবং গভেন প্রবেশ করিলে পুনরায় রুদ্ধ হইল। দুইজন শান্ত্রী দ্বারের দুই পার্শ্বে নিষ্কোষিত তরবারী হস্তে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিল।

সার্জ্জেন্ট রাডুব সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী

প্রভেদ

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

মূর্খ বলে,—"আমি ছাড়া, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, আর কেহ নাই!"
জ্ঞানী বলে,—"বেশ ভাই, বাক্য তব সত্য হোক্ আমি চাই তাই!"

শিল্প ও সৌন্দর্য্য

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চরিত্র :—শশী ও জ্যোতি

স্থান—জ্যোতির পাঠগৃহ।

জ্যোতি—(শশীকে দেখিয়া) কি হে শশি, আজ যে আপিসে যাও নি ?

শশী—আজ যে ছুটী। চাকরী তো আর করিলে না। তোমার বার মাসই রবিবার।

জ্যোতি—ভালই হইয়াছে। বাদলার দিন এস দুজনে মিলিয়া তামাকের সদ্ব্যবহার করা যাক। তোমার হাতে ওখানা কি বই ?

শশী—এ একখানা আজ-কালকার গণিকাতন্ত্রের নভেল। আর্টের নামে এই রকম সব ভয়ানক ভাবের আমদানীতে সাহিত্যের হাট ভরিয়া উঠিয়াছে।

জ্যোতি—ভয়ঙ্করত্ব আর্টের একটা লক্ষণ বটে।

শশী—তবে যে শুনতে পাই সৌন্দর্য্যই আর্টের প্রাণ।

জ্যোতি—ভয়ঙ্কর জিনিষের মধ্যে কি সৌন্দর্য্য নাই ? যে-সৌদামিনী সৌন্দর্য্যের উপমা-স্থল তাহা কি স্পর্শ মাত্র প্রাণ হনন করে না ? কালসর্প কি দেখিতে সুন্দর নয় ? আবার একই পদার্থ সকলের পক্ষে ভয়ঙ্কর নয়। যে কামান-গর্জ্জন শুনিলে তোমার আমার মত বীরের আত্মাপুরুষ ভয়ে শুকাইয়া উঠে সেই কামান-গর্জ্জনেই যুদ্ধপ্রিয় বীরের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে। প্রকৃত পক্ষে ভীষণতা-বর্জ্জিত যে ভাব তাহা ভাবের মধ্যেই গণ্য নহে। সকল যুগের সকল স্বাধীন ও নূতন চিন্তার অভিব্যক্তিকে জগৎ ভীতি ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে। আটলান্টিকের পরপারে মহাদেশ থাকিতে পারে কলম্বসের এ কল্পনাকে খৃষ্টান জগৎ অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়াছিল, আত্মার অমরত্ব প্রচার করিতে গিয়া সক্রেটিসকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল, চৈতন্ত দেবের প্রেম-মন্ত্রের প্রচারে নবদ্বীপের প্রেম-ভক্তিহীন পণ্ডিতের দল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আসল কথা ভয়ঙ্করত্ব কোন পদার্থের মধ্যে নাই, যদি থাকে আমাদের মনের মধ্যে।

শশী—তোমার কথা এক হিসাবে সত্য বটে। কিন্তু আর্টের সৌন্দর্য্য কি এত বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে হইবে ? সে কি স্বপ্রকাশ নয় ?

জ্যোতি—আর্টের সৌন্দর্য্য বুঝিবার আগে দেখিতে হইবে শিল্প বা আর্ট জিনিষটা কি। জাগতিক সৃষ্ট পদার্থের নাম প্রকৃতি আর মনুষ্য-সৃষ্ট পদার্থের নাম শিল্প বা আর্ট। ইহাই প্রকৃতি এবং আর্ট বা শিল্পের চরম এবং পরম সংজ্ঞা। প্রকৃতি এবং আর্ট সম্বন্ধে যত প্রকার মত গঠিত হইয়াছে সমস্তই এই সংজ্ঞাকে ভিত্তি করিয়া। সে সমস্ত মতবাদের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই তবে কথা প্রসঙ্গে যেটুকুর দরকার হইবে তাহাই করিব।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রকৃতি এবং শিল্প বা আর্টকে প্রায় অভিন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আর্টকে প্রকৃতির অনুকরণ বলিয়াই মত দিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার জনসনের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বলিয়াছেন,—"Art is the power of doing something which is not taught by nature or instinct",—আর্ট আমাদিগকে এমন শক্তি প্রদান করে যাহা আমরা প্রকৃতি অথবা সংস্কার-বুদ্ধির নিকট শিখিতে পারি না। প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারি বৈচিত্র্য, পরিবর্ত্তন, অনিত্যত্বই তাহার প্রধান লক্ষণ। শিল্প বা আর্টও বৈচিত্র্য এবং পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

শশী—আর্ট যদি অমর হইয়া থাকে তবে সে প্রকৃতিকে

অবিকল অনুকরণ, অনুসরণ করিয়া। যে-শিল্প যতই প্রকৃতির অনুযায়ী তাহা ততই সার্থক এবং সুন্দর।

জ্যোতি—বলিয়াছি তো এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের ইহাই মত। কিন্তু আমার মনে হয়, যে-শিল্প যতই স্বভাবানুযায়ী তাহা ততই ব্যর্থ এবং শিল্প নামের অনুপযোগী। জগদীশ্বর মানুষকে যে সৃজন শক্তি দিয়াছেন তাহাই আর্টের অনুপ্রেরণা। এই আর্টকে অন্য কিছুর অনুকরণ অথবা অনুসরণ বলিলে মনুষ্যত্বের অতি ঘোর অবমাননা করা হয়। মানুষের অসীমশক্তিশালী যে Idea বা ভাব,—তাহার প্রকাশ-ভঙ্গির নাম আর্ট। সাহিত্য (পদ্য এবং গদ্য) সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি আর্টের মূর্ত্ত প্রকাশ। আর্টের জন্মভূমি মনুষ্য-হৃদয়। মানবাত্মার মধ্যে Idea বা ভাবরূপে আর্টের বীজ নিহিত রহিয়াছে। আত্মার যে বহিঃপ্রকাশ তাহারই নাম আর্ট। তাই অস্কার ওয়াইল্ড বলিয়াছেন, আর্ট আপনাকে ছাড়া আর কিছুকে প্রকাশ করে না। বাস্তবিক আর্ট জগতে একমাত্র স্বপ্রকাশ বস্তু।

শশী—তবে আর্টকে বুঝিতে এবং বুঝাইতে যুগে যুগে এত প্রয়াস কিসের জন্য? আজকাল দেখিতে পাই চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে চিত্র-পরিচয়। কেন, চিত্র কি আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না, যে তার টীকা টিপ্পনীর দরকার?

জ্যোতি—মানুষের সংস্কার বুদ্ধি আর্টকে বুঝিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। মানুষ যেদিন সমাজবদ্ধ হইয়া কৃত্রিম বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছে সেই দিন হইতে সে আর্টের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। মানুষ যেদিন স্বীয় আত্মার বিচিত্র লীলাকে সমাজ রক্ষার প্রতিকূল মনে করিয়া নীতি ও সংযমের অস্বাভাবিক পাষাণ প্রাচীরে নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছে সেই দিন হইতে তাহার আত্মার প্রসারের সঙ্গে তাহার উন্নতি ব্যাহত হইয়াছে। ধূর্জ্জটির ন্যায় হৃদয় গোমুখী-নিস্সৃত ভাবভাগীরথীর সহস্র ধারাকে নীতি ও সংযমের জটাজালের মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া মানুষের গৌরব সমাজের কাছে হয়তো অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু মনে করিও না যে তাহার স্বস্তি আছে। ভাবগঙ্গার অবিরল কল কল শব্দে তাহার চক্ষে নিদ্রা নাই; সে বেশ জানে, এই রুদ্ধ প্রবাহকে কোন ছলে মুক্ত করিয়া দিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়। তাই ভক্ত-ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া যুগে যুগে সে তাহার যুক্তি তর্কের কুটিল জাল ছিন্ন করিয়া নিরুদ্ধ ভাবরাশিকে বাহির করিয়া দিয়াছে। আর সমাজ "দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার" উচ্চ রব তুলিয়া আত্মরক্ষার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছে।

শশী—তুমি কি বলিতে চাও নীতি এবং সংযম আর্টের বিরোধী?

জ্যোতি—নিশ্চয়ই তাই। সমাজ যতই সুগঠিত হউক না কেন নীতি ও সংযমের জ্বালায় কিছুকাল পরে তাহা রুদ্ধস্রোত বিষাক্ত পল্বলে পরিণত হয়। তাইযুগে যুগে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন; "Lest one good custom should corrupt the world."। কিন্তু আর্ট খরপ্রবাহিনী পার্ব্বত্য নদী। নীতি ও সংযমের বাঁধ সে মানে না। আপনার পথ আপনি মুক্ত করিয়া দুই কূল ভাসাইয়া ডুবাইয়া সে আপনার অনাবিল জলধারাকে অকূলের উদ্দেশে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। মানুষ যে দিন আর্টকে ছাড়িয়া সমাজের আশ্রয় লইয়াছে, যেদিন ব্যষ্টিকে ভুলিয়া সমষ্টির আদর করিয়াছে, সেই দিন সে গঙ্গাতীরে কূপ খনন করিয়াছে।

শশী—নীতি ও সংযম যে সমাজ-দেহকে বিষাক্ত করিতেছে ইহা অতি ভয়ানক কথা। সকলেই বিশ্বাস করে নীতি ও সংযম ব্যক্তি এবং সমাজের পবিত্রতা রক্ষার প্রধান হেতু। সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি স্ত্রী চরিত্র, লক্ষ্মণ ভীষ্ম প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র আদর্শ হিসাবে চিরদিন সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। ইহা একরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্য যে, সমাজের স্ত্রীপুরুষ যে পরিমাণে উক্ত আদর্শের সন্নিহিত হইতে পারিবে সমাজও সেই পরিমাণে উন্নত সমৃদ্ধ হইবে। আর এই যে সব গণিকা-তন্ত্রের স্ত্রী চরিত্র যাহারা চির-দিনের স্বীকৃত নীতি ও সংযমের মর্য্যাদাকে পদদলিত করিয়া দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিজয় ঘোষণা করিতেছে তাহারাই যে অপরিণতবুদ্ধি নরনারীকে উন্মার্গগামী করিয়া সমাজ-দেহকে কলুষিত করিবে না একথা কি তুমি বিশ্বাস করিতে বল?

জ্যোতি—তোমার এ যুক্তি আর্টিষ্ট বা শিল্পীর কানে

হাস্যকর প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে। সংস্কার বুদ্ধি দুঃস্বপ্নের মত তোমার বুক চাপিয়া ধরিয়া ভয় দেখাইতেছে। যতক্ষণ না জাগিয়া উঠিতেছ ততক্ষণ কি করিয়া বুঝিবে, এ সত্য নহে স্বপ্ন। একি কম বিড়ম্বনা! শিল্পীর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কোন একটা বিশেষ অভিব্যক্তিকে আদর্শ নামে অভিহিত করিয়া সেই আদর্শের জগদ্দল পাথরকে বুকে বাঁধিয়া মানুষ তাহার জীবনের সহজ, স্বচ্ছন্দ ধারাকে রুদ্ধ করিয়া নিজের এবং শিল্পীর ঘোর অবমাননা করিতেছে। শিল্পের কি কোন আদর্শ থাকা সম্ভব যে, শিল্পী আদর্শ সৃজন করিবে? মানবাত্মার অনন্ত বিবর্ত্তন-শীল ভাবতরঙ্গের উদ্দামগমনভঙ্গীকে গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া আদর্শ সৃজন করিবার স্পর্দ্ধা সমাজ কোথায় পাইয়াছে? প্রভাতে মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, নিশীথে বহিঃপ্রকৃতির যে পলে পলে অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকাশ হইতেছে তাহার মধ্যে আবার একটা আদর্শ আছে না কি? নগাধিরাজের দেহ বহিয়া যে অসংখ্য সরিৎ-প্রবাহ নামিয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে আদর্শ কোনটা? তোমার পদ্মফুল ভাল লাগে বলিয়া কি ঘেঁটু ফুলকেও পদ্ম হইয়া ফুটিতে বলিবে? বিশ্বশিল্পীর রচনা দেখিয়া আমরা কি বুঝিতে পারি না যে, শিল্পের কোন আদর্শ নাই। আল্পস্, হিমালয় তাঁহার কাছে পর্ব্বত মাত্র, কিন্তু আমরা হিমালয়ের নাম দিয়াছি দেবগিরি। সীতা সাবিত্রীর সৃষ্টি কর্ত্তা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, সমাজের প্রত্যেক স্ত্রীলোকই সীতা সাবিত্রী হইয়া উঠিবে। সীতাসাবিত্রী থাকিতে অহল্যা দ্রৌপদী প্রাতঃ-স্মরণীয়া হইয়াছেন কেন, সে কথা কি একদিন ভাবিয়া দেখিয়াছ? মানুষ যাহাকে "আদর্শ" করিয়া লইয়াছে তাহা সীমাবদ্ধ এবং বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু আর্ট অনন্ত-বৈচিত্র্যময়। "আদর্শ" মানবজীবনে স্রোতের মধ্যে কঠিন প্রস্তরবাধা। সমাজ যতই আদর্শের সন্নিহিত হইবে ততই তাহা বিবাক্ত বদ্ধজলায় পরিণত হইবে। আদর্শ সৃষ্টি করা যদি শিল্পীর উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে আদি কবি বাল্মীকি এক জনক-তনয়ার ধ্যানেই নিরত হইতেন, তিনি আর সূর্পনখাকে তাঁহার মানস-কন্যার আসন দিতেন না। তোমরা যাহাদের গণিকাতন্ত্রের মধ্যে স্থান নির্দ্দেশ করিতেছ সেই জাতীয়া স্ত্রীলোকদিগকে তোমাদের অগ্রবর্ত্তিগণ প্রাতঃ-স্মরণীয়া করিয়া গিয়াছেন। সীতা দ্রৌপদী, ভীম দশানন, যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন, বশিষ্ঠ দুর্ব্বাসা সকলেরই জন্মভূমি শিল্পীর হৃদয়ক্ষেত্র। সেখানে যদি সতীত্ব থাকে স্বৈরতাও আছে; সংযম থাকে অসংযমও আছে; ধর্ম্ম থাকে অধর্ম্মও আছে; ক্ষমা থাকে অভিসম্পাতও আছে। সেখানে যদি নীতি থাকে দুর্নীতিও আছে। সুতরাং নীতি-শিক্ষার আশায় উৎফুল্ল হইবার কিছু নাই, আবার দুর্নীতির ভয়ে শিহরিয়া উঠিবারও কিছু নাই। সুধা ও হলাহল একই সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিল। যে মেঘ বৃষ্টি দান করে সেই আবার বজ্রাঘাত করে। আসল কথা, শিল্পের উদ্দেশ্য নীতি বা দুর্নীতি শিক্ষা দেওয়া নহে, শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা।

শশী—তোমার এ কথায় আমার বিশেষ শ্রদ্ধা হইল না। শিল্প যে নীতি-দুর্নীতি-নিরপেক্ষ হইয়া শুধুই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে একথা পাশ্চাত্য মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে আছে, "বাক্যম রসাত্মকং কাব্যং।" রসসৃষ্টি বা চিত্তবৃত্তির উদ্দীপনাই কাব্যের উদ্দেশ্য।

জ্যোতি—একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে রসসৃষ্টি বা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি একই কথা। বরং সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি রসসৃষ্টির অপেক্ষা উপরের কথা। প্রথমে বুঝা যাউক সৌন্দর্য্য কি। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তর্নিহিত হইলে চিত্তে তাহাদের যে অখণ্ড অনুভূতি হয় তাহার নাম সৌন্দর্য্য। এই অখণ্ড অনুভূতি উৎপাদনের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদির সামঞ্জস্য এবং সঙ্গতি থাকার একান্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে অসামঞ্জস্য এবং অসঙ্গতি থাকিলে চিত্তের বিক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং সৌন্দর্য্যবোধের ব্যাঘাত জন্মে। সেই জন্য সামঞ্জস্য এবং সঙ্গতিই সৌন্দর্য্যের মূল কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আবার বলিতেছি সৌন্দর্য্য অখণ্ড অনুভূতি। বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে পাওয়া যায় না। সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলটী হাতে পাইলেই তুমি বলিবে, বাঃ, কি সুন্দর। আর এই অখণ্ড অনুভূতি বা সৌন্দর্য্য-জ্ঞান তোমার ঘটিবে গোলাপের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বিচার করিবার বহু পূর্ব্বে। তোমার রসসৃষ্টির দিক দিয়া বলিতে

গেলে বলিতে হইবে সমুদায় রসের যথাযোগ্য ভাবে উদ্দীপনা করিতে পারিলেই কাব্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু কেবল মাত্র রস বিশেষের উদ্দীপনায় তাহা হইবে না। "অজীর্ণ অপাক দ্রব্য উগারী দুর্ম্মতি, পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে" যদি কাব্যসৃষ্টি হয় তবে আমি নিশ্চয় বলিব তোমার কাব্যসৃষ্টির সহিত আমার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে।

শশী—এ পার্থক্য কি তোমার কথাতেই স্বীকার করিতে হইবে? আমি যদি কোন প্রভেদ অনুভব না করি?

জ্যোতি—আমার কথায় কেন? তোমার হৃদয় দিয়া বুঝিয়া দেখ; এ প্রভেদ তুমি অনুভব না করিয়া পার না। কবি বলিয়াছেন, "A thing of beauty is a joy for ever"—সৌন্দর্য্য চিরদিনই আনন্দ দান করে। সৌন্দর্য্যই আনন্দ, আনন্দই সৌন্দর্য্য। মনুষ্যচিত্তই একমাত্র কষ্টি-পাথর। যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অখণ্ড অনুভূতি সেই নিকষে আনন্দের কনকরেখা ফুটাইয়া তুলে তাহাই আর্ট, আর সেই আনন্দদানেই আর্টের চরম সার্থকতা।

শশী—আমি জীবহত্যায় আনন্দ লাভ করি। হত্যার মধ্যে কি আর্টের সৌন্দর্য্য আছে? আর একটা কথা, তুমি এইমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিবিশেষকে আর্ট বলিয়া স্বীকার করিলে। তাহা হইলে আর্ট কি বহিঃপ্রকৃতির মুখাপেক্ষী হইল না?

জ্যোতি—তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রথমে দিবার চেষ্টা করিব। বহিঃপ্রকৃতির সহিত আর্টের যে কোন সম্বন্ধ নাই এমন কথা আমি বলি নাই। আর্ট স্বভাবের অনুযায়ী বটে, কিন্তু স্বভাবের অতিরিক্ত। আর্ট প্রকৃতির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে, কদর্য্যতাকে সুন্দর করে, সৌন্দর্য্যকে অধিকতর সুন্দর করে। কবি আর্টের কার্য্যের কথা অতি চমৎকার রূপে বলিয়াছেন:—আর্ট "সুখ-হাসিকে আরও উজ্জ্বল করে, নয়নের জলকে সুন্দর করে, প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আর একটু মধু ভরিয়া দেয়, শ্রাবণের কালো মেঘকে গাঢ়তর করে, বসন্তের গায়ে বাসন্তী রঙের কাপড় পরাইয়া দেয়, সন্ধ্যার রঙিন মেঘকে আরও একটু রঙিন করিয়া দেয়।" শুক্তি যেমন শুক্তি তুচ্ছ কঙ্করকে বক্ষে ধারণ করিয়া আপনার উজ্জ্বল প্রলেপে তাহাকে বহুমূল্য মুক্তাতে পরিণত করে, ক্ষুদ্র জলকণা যেমন সূর্য্যরশ্মিকে বুকে ধরিয়া রামধনুর অপূর্ব্ব বর্ণৈশ্বর্য্য সৃষ্টি করে, শিল্পীও তেমনি বহিঃপ্রকৃতির সামান্য বিষয়কে আপনার ধ্যানলোকের অমৃত-মধুর আলোকে বিমণ্ডিত করিয়া লোকোত্তর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সে সৃষ্টি স্বভাবের অনুযায়ী কারণ তাহা স্বভাবের ন্যায় চঞ্চল এবং অনন্ত-পরিবর্ত্তনশীল। আবার সে সৃষ্টি স্বভাবের অতিরিক্ত কারণ তাহার কোথাও অপূর্ণতা নাই, অসামঞ্জস্য নাই,হ্রাস বৃদ্ধি নাই; সে সৌন্দর্য্য চিরম্লান, সে জ্যোতিঃ আলো দেয় কিন্তু দাহ করে না। সে প্রণয়ে পাপ নাই, সে রূপে মোহ নাই, সে যৌবনে জরা নাই; সে জীবন ফুলের মত সুন্দর, সে মৃত্যু সুষুপ্তির মত মধুর। শিল্পী যখন তাহার চিত্তের আনন্দ ধারাকে বহির্ম্মুখী করিয়া দেয় তখন জগতের সমস্তই মধুময় হইয়া উঠে। তখন আকাশ, বাতাস, জলস্থল সকলি মধুর, তখন বজ্রনাদে কুহুধ্বনি হয়, রাহু শনি শুভগ্রহে পরিণত হয়। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের সহস্রধারায় মুক্তিস্নান করিতে হইলে হৃদয়কে সর্ব্বপ্রকার সংস্কার-বুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত করিয়া প্রস্ফুট কুসুমের মত উন্মুখ করিয়া রাখিতে হইবে, অন্যথা মরা গাং কেবল কুমীরেই ভরিয়া উঠিবে, বন্যার উচ্ছ্বাস তাহার ভিতর প্রবেশ করিবে না।

প্রতিমা-নির্ম্মাতা তাহার প্রতিমা-নির্ম্মাণের জন্য খড়ের কাঠামোর নিকট যতটুকু ঋণী, শিল্পী তাহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য বহিঃপ্রকৃতির কাছে তাহার অধিক ঋণী নহে। প্রকৃতির অবিকল অনুকৃতির মধ্যে অনুকরণের বাহাদুরী থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও গৌরব নাই। সে বিষয়ে প্রথম যে-শিল্পী মৃৎকলসীর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছিল তাহার সৃষ্টির গৌরব একজন অবিকল মনুষ্যমূর্ত্তি-নির্ম্মাতার অপেক্ষা অনেক বেশী। ভারতীয় চিত্র-শিল্প এই প্রকার ধ্যানলব্ধ সামগ্রী। পশ্চিমের খর জ্যোতিতে আমরা অন্ধ হইয়া অনেক দিন তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই ভারতীয় চিত্র-শিল্পের এই পুনরুত্থানের দিনে চিত্রের পরিচয় দিয়া বুঝাইতে হয়।

তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরও একরূপ দেওয়া হইয়াছে।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে হত্যার মধ্যে সৌন্দর্য্য আছে কি না। স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হয়, আর্টের যাদুদণ্ডস্পর্শে তেমনই সকলি সুন্দর হইয়া উঠে। তোমরা যাহাকে পাপ বল, দুর্নীতি বল, কদর্য্যতা বল, আর্ট সকলইকে সুন্দর করে। আর সেই জন্যই তো তোমরা চিৎকার করিয়া বল, পাপকে দুর্নীতিকে রমণীয়রূপে চিত্রিত করিয়াই আর্টের দোহাই দিয়া সমাজটাকে আমরা রসাতলে দিতে বসিয়াছি। কিন্তু শিল্পীর হাতে পাপ ও দুর্নীতির অগ্নিশুদ্ধি ঘটিয়াছে এবং পাপ ও দুর্নীতিকে যাহারা কদর্য্যরূপে চিত্রিত করে তাহারা যে স্বভাবের অক্ষম এবং অন্ধ অনুকরণকারী এবং মানুষের অতি ঘোর শত্রু একথা তোমরা কবে বুঝিবে?

হত্যার মধ্যে সৌন্দর্য্য নাই! তুমি কি ছেলেবেলায় সোনার কাঠী, রূপার কাঠীর গল্প শুন নাই? শিল্পীর উদ্ভাবিত সেই সুখের মৃত্যুকে কে না দিনের মধ্যে সহস্রবার আলিঙ্গন করিতে চাহিবে। ইন্দুমতীর সেই পুষ্পাঘাতে মৃত্যুর কথা ভাব দেখি, সে মৃত্যু কত মধুর, কত কোমল!

শশী—তোমার আর্টের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা আমার ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু মৃত্যুর মত কঠোর সত্য জিনিষটাকে মিথ্যা কল্পনার সাহায্যে কোমল মধুর করিয়া তুলিবার চেষ্টা হাস্যোদ্দীপক ছাড়া আর কিছুই নহে।

জ্যোতি—আশ্চর্য্য কথা! বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত লোক হইয়াও তুমি কল্পনাকে মিথ্যা বলিতে সাহস কর? জগতের সমস্ত সত্য কল্পনারূপে মানব-চিত্তে নিহিত রহিয়াছে। কল্পনা যাবতীয় স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের কারণ স্বরূপ—কল্পনা কারণ, পদার্থ কার্য্য। কল্পনা স্বরূপ এবং পূর্ণ, পদার্থ বিকৃতি এবং অপূর্ণ। মানুষ কোন কল্পনাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে নাই। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, কল্পনাকে রূপ দিবার প্রয়াস ছাড়া তাহা আর কিছুই নহে।

শশী—কিন্তু কল্পনামাত্রই সত্য? এই ধর, ঘোড়ার ডিম।

জ্যোতি—ঘোড়ার ডিম ঘোড়ার চেয়েও সত্য। অশ্ব ডিম্ব প্রসব করে না এই তো কথা? অশ্ব উন্নতজীব বলিয়া ডিম্ব প্রসব করে না। কিন্তু এমন দিন আসিতে পারে যখন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবনতিশীল অশ্বজাতি ডিম্ব প্রসব করিবে। ভাব বা আইডিয়া চিরদিনই সত্য, কিন্তু আইডিয়ার অনন্ত-বৈচিত্র্যের সহিত সঙ্গতি রাখিতে গিয়া রূপকে পলে পলে সৃষ্ট এবং বিনষ্ট হইতে হইতেছে। বায়োস্কোপের চলচ্চিত্রের মত ভাবের প্রবাহের সহিত সমতা রাখিতে গিয়া রূপকে প্রতিনিয়ত আসিতে যাইতে হইতেছে। শিল্পী সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেও রক্ষণশীল নহেন। তাই শিল্পী কোন সৃষ্টিকে আদর্শ করিয়া তাহার পূজা করে না। তাহার দৃষ্টি সম্মুখের দিকে, পশ্চাতে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে তাহার চলে না। সে যে নিশ্বাসে যুথি মল্লিকা ফুটাইয়া তুলে সেই নিশ্বাসেই তাহাকে ঝরাইয়া দেয়, তুলির যে টানে রামধনুর সৃষ্টি করে সেই টানেই তাহাকে শূন্যে মিলাইয়া দেয়। জন্ম-মৃত্যু, সৃজন প্রলয় সমস্তই মধুর, কোমল এবং সুন্দর; সমস্তই সেই অনন্ত সুন্দর, অনন্ত আনন্দময় আর্ট বা শিল্পের অভিব্যক্তি।

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বোম্বের মোহ

—বড় গল্প—

—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এম্‌-এ

সেবার কলোম্বো ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে আমাকে বহুবার যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। আমি প্রায়ই মালের জাহাজে যাইতাম, তাই আমার সঙ্গী থাকিত মাঝি-মাল্লা আর জাহাজের কর্ম্মচারী। দিনগুলি কষ্টে কাটিত। এমন লোক মিলিত না যাহার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলা যায়। শুধু জল আর আকাশ দেখিতে দেখিতে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত।

এক যাত্রায় এক উপযুক্ত সঙ্গী জুটিল। বেতার-যন্ত্রের কর্ম্মচারী বাঙ্গালী। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সঙ্গে আমার বন্ধুতা হইয়া গেল। সে যুবাবয়সী, কর্ম্মঠ। মনটা ছিল তাহার সতেজ, কিন্তু বিষাদে ম্লান। এক এক সময়ে যখন তাহার কাছে যাইতাম, দেখিতাম, যুবক সমুদ্রের পানে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছে, আর কি যেন একটা গভীর বেদনার ছায়া তাহার সমস্ত মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার কোনও উত্তর দিত না।

কিন্তু সে আমাকে খুব অন্তরঙ্গভাবে গ্রহণ করিল। পরিচয়ের তিন চার দিন পরেই বলিল, "আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন, আর 'রমেন' ব'লে ডাকবেন।"

ধীরে ধীরে সে আমার কাছে তাহার অন্তরটি খুলিয়া বলিতে লাগিল।

ছয়বৎসর আগে সে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িত। হঠাৎ তাহার পিতৃ-বিয়োগ হওয়াতে পড়া শেষ করিতে পারিল না। কলেজ ছাড়িয়া কলিকাতার এক সওদাগরী আফিসে চাকুরী লইল। কিছুকাল পরে তাহার মাও মারা গেলেন। তখন সে বাঙ্গলা ছাড়িয়া বর্ম্মাদেশে চলিয়া গেল, এবং এক কণ্ট্রাক্টারের অধীনে ঠিকাদারি করিতে লাগিল। তখন যুদ্ধ চলিতেছিল। মেসোপোটেমিয়ার কাজের জন্য পাশ ফেল সবরকম লোককেই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে নেওয়া হইত। রমেন্দ্র ছয় মাসের চুক্তিতে ওভারসিয়ারের পদ গ্রহণ করিয়া মেসোপোটেমিয়া গেল। যুদ্ধ শেষে ঈজিপ্টের সামরিক আফিসে কিছুকাল কেরাণীর কাজ করিল। সে কাজ ফুরাইলে বোম্বে আসিয়া রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এক স্থায়ীপদে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু এক বৎসর না যাইতেই সে কাজ ছাড়িয়া জাহাজের বেতার যন্ত্রচালক হইয়া রমেন্দ্র ভারত সমুদ্রের উপর ভাসিল।

এ সকল খবর দিয়া রমেন বলিল, "বাকী জীবনটা সমুদ্রের উপর কেটে গেলেই বাঁচি।"

যুবকের এ উদাস ভাবে আমি বিস্মিত হইলাম। অবশ্য লক্ষ্যহীন ভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে মানুষ মাত্রেরই মনে একটা ক্লান্তি আসে। তখন জলে হউক, স্থলে হউক, কোথাও একটা স্থায়ী ঠাঁই করিতে পারিলে আর নড়িবার ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এ তরুণ বয়সে স্থলের প্রতি বিরাগ ভাবটা আমার কাছে বড়ই বিসদৃশ লাগিল। আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম।

তাহাতে হঠাৎ যুবকের মুখ কালিমায় ছাইয়া গেল। তাহার সুন্দর চোখদুটি বিষাদের আবেশে এক অনির্ব্বচনীয় ধৈর্য্য অবলম্বন করিল। সে যাত্রায় আর বেশী কিছু জানিবার সুযোগ হয় নাই।

ফিরিবার পথে আমি অপর এক জাহাজে আসিলাম। কিন্তু তার পরের যাত্রায় আবার সেই জাহাজে চড়িলাম। রমেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইল। সে আমাকে অতি নিকট বন্ধুরূপে গ্রহণ করিল। তার পর যখন জানিল আমি ইতিপূর্ব্বে বোম্বে গিয়াছিলাম এবং এখন সেখান হইতেই আসিতেছি, তখন কি যেন একটা নিবিড় আকর্ষণে সে আমার কাছে আসিয়া ভিড়িতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে যুবকের সঙ্গে আমার গভীর সখ্যভাব স্থাপিত হইল। দিনের পর দিন সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা

প্রকারে বোম্বের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কি যেন একটা অতৃপ্তি, একটা আকাঙ্ক্ষা ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে জাগরিত হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছিল; একটা গভীর নৈরাশ্য এক একবার তাহার স্বাভাবিক উৎসাহ ক্ষুণ্ণ করিয়া দিতেছিল।

একদিন হঠাৎ সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বহুকালের রুদ্ধ আবেগ ছাড়া পাইল। সে গভীর রাত পর্য্যন্ত তাহার ক্যাবিনে বসিয়া আমার কাছে তাহার প্রাণের গূঢ়তম রহস্য ব্যক্ত করিল।

অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া জলরাশি আলোড়িত করিতে করিতে জাহাজখানা ছুটিয়া চলিতেছিল, আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে এক তরুণ প্রাণের কাহিনী উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্রোতার হৃদয়ের উপর লুটিয়া পড়িতেছিল।

রমেন্দ্রনাথের কাহিনী

১

এক প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক বলিয়াছেন স্বর্গ হইতে একটা আস্ত মানুষকে দুইভাগ করিয়া পৃথিবীতে পাঠানো হয়। পৃথিবীর মানুষ প্রত্যেকে অর্দ্ধেক। একভাগ যখন অপর ভাগকে দেখিতে পায় তখন তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে চায়। এই আকর্ষণের নামই প্রেম।

সেদিন শান্ত অপরাহ্নে বোম্বের সমুদ্রকূলে যখন তাহাকে প্রথম দেখি, তখন সে প্রাচীন কথাটা আমার কাছে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। দৃষ্টি মাত্রেই ভাবিয়াছিলাম, আমি যেন যুগ যুগ ধরিয়া তাহারই অপেক্ষা করিয়া আছি। যেন সে শুধু আমার, আমার সমস্ত কল্পনার, সমস্ত আশার পরিসমাপ্তি।…

কেমন করিয়া এ ভাব হইল জানি না। প্রেমে পড়াতে আমি অভ্যস্ত নই। পূর্ব্বে কোনও দিন কাহারও প্রেমে পড়ি নাই।…কাহারও প্রেমে পড়ি নাই কথাটা নিখুঁত সত্য, যদিও সমস্ত কর্ম্মের মাঝখানে একটা অজানা অচেনা মানসী প্রতিমা দিবানিশি আমার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিত। আজ তাহার মধ্যে সে কল্পময়ী প্রতিমা বাস্তব হইয়া উঠিল। তাহার সুগঠিত তীক্ষ্ণ নাসিকা আমার কাছে নারীত্বের মধুরতম ব্যঞ্জনা দিয়া গেল। তাহার অধরের রেখাটি এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের আভাস আনিল। আর তাহার চক্ষুর দৃষ্টি—জানিনা জগতে এমনটী আর কোথাও আছে কিনা—তাহা হইতে যেন মানব প্রাণের কোন অনাবিষ্কৃত রাজ্যের আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল; তাহা যত সুন্দর তত করুণ, যত গভীর তত নির্ম্মল। যেন মানবের সমস্ত ব্যথা সমস্ত আনন্দ নিঙড়াইয়া এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়া সে চাহনিতে মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

চৌপাটিতে সে একা বেড়াইতেছিল। জনতা ছাড়াইয়া একটু একান্তে ধীরপদে যাইতেছিল। নীলরঙের মারাঠী শাড়ী সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তাহার দেহের রেখা-সমষ্টিকে চিত্রের মত ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। আমি কাছে গিয়া যখন তাহার দিকে চাহিলাম, তখন সে সরল সহজভাবে তাহার স্নিগ্ধ চক্ষুদুটি ক্ষণকাল আমার প্রতি ন্যস্ত করিয়া রাখিল। মনে হইল যেন সেও এক পরিচিতের সন্ধান পাইয়াছে।…

কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ফিরিবার পথে হঠাৎ চোখে পড়িল, সেও পাশ দিয়া চলিতেছে। আমাকে কাছে আসিতে দেখিয়া সে একটু থামিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিতেই তাহা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্ষণেকের তরে আবার তাহার স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ করিল। মনে হইল যেন তাহার অন্তরের সমস্ত নির্ম্মলতা, সমস্ত মাধুর্য্য তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভাবিলাম, হয়ত আমার বাঙ্গালীর পোষাক দেখিয়া নারীসুলভ কৌতূহলের সহিত সে চাহিয়া আছে। যখন কাছে আসিলাম, তখন সে এক বর্ষীয়সী মহিলাকে মারাঠীতে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "আজ এখানে সভা হ'বার কথা ছিল, হ'ল না?" মহিলাটি "সভা? এখানে?" বলিয়া ভাবিতেছিলেন, এবং আমাকে সামনে পাইয়া বলিলেন, "এখানে সভা কখন হ'বে বল্‌তে পারেন কি?" আমি বলিলাম, "সভা ত আজ নয়, আগামী কাল।" মেয়েটী "ও!" বলিয়া,

লজ্জায় মুখ নোয়াইয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। আমি পাশেই চলিতেছিলাম। মেয়েটীর দিকে তাকাইয়া বলিলাম, "আপনি সভায় জন্য এসেছিলেন, বুঝি?" সে খুব সংযত, অনেকটা আড়ষ্টভাবে বলিল, "হাঁ।" কিন্তু পরক্ষণেই সংযম একটু ভাঙিয়া গেল। আমার দিকে ঈষৎ হাসিমুখে চাহিয়া বলিল, "আপনি বাঙ্গালী?"

আমি বলিলাম, "কেমন ক'রে জানলেন?"

সে বলিল, "কেন, জানা কি খুব কঠিন কথা?"

তখন উভয়ে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছি। আমি বলিলাম, "আপনি কাল সভায় আসবেন?"

"হাঁ, আসব" বলিয়া সে দ্রুতপদে রাস্তা পার হইয়া চলিয়া গেল।

২

পরদিন চৌপাটিতে গিয়া দেখি বিরাট সভা। স্বেচ্ছাসেবকরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিপুল জনতা দাঁড়াইয়াছে, বক্তৃতামঞ্চের সম্মুখে মেয়েরা সংঘবদ্ধ হইয়া বসিয়াছে। অধ্যক্ষ ও বক্তারা আসিলেন, জয়জয়কারে আকাশ বিদীর্ণ হইল। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, ইহুদী, খৃষ্টান, মারাঠী, গুজরাতী, কানাড়ী, মান্দ্রাজী, সিন্ধী, পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, সকলের কণ্ঠ সম্মিলিত হইয়া এক অভিনব একতা ঘোষণা করিল। আমি নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, শুনিতে লাগিলাম। একটা অব্যক্ত বিস্ময়ে প্রাণ ভরিয়া গেল। সেখানে আড়াই ঘণ্টা কাল মন্ত্রমুগ্ধের মত কাটিল।

সভা ভাঙিলে যেন হঠাৎ একটা লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল। বক্ষরক্ত আলোড়িত করিয়া মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল একটী নারীমুখ, জ্যোৎস্নার মত রং, দেবপ্রতিমার মত গড়ন······আর তাহাতে গত দিনের একটু লজ্জামাখা মিষ্টি হাসি!

জনস্রোতের মধ্যে সে মুখখানি খুঁজিলাম, পাইলাম না।

৩

ইহার পর মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা মালাবার হিলের শৃঙ্গ উদ্যান হইতে ফিরিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম একজন লোক আমাকে অনুসরণ করিতেছে। তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সে আমার কাছে আসিয়া পড়িল। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মুখ সম্পূর্ণ অপরিচিত। হঠাৎ মনে হইল এ প্রবাসী বাঙ্গালীর অনুচারী গোয়েন্দা নয় তো? ভাবিয়া মনটা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আগন্তুক আমার পাশাপাশি আসিয়া আমাকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পোষাক দেখিয়া মনে হইল, অবস্থাপন্ন লোক, কিন্তু অশিক্ষিত।

চোখে চোখে দৃষ্টি পড়াতে লোকটা থতমত খাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি চাও?" সে মারাঠী হিন্দি মিশাইয়া বলিল, "কিছু না, আপনি কোন্ দেশী লোক তাই দেখছিলাম।" ওরকম সরল সোজা দৃষ্টি গোয়েন্দার হইতে পারে না। আমি সকৌতুকে বলিলাম, "কি দেখলে?" সে বলিল, "আপনি কি বাঙ্গালী?" আমি বলিলাম, "হাঁ।" সে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিল।

তাহাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ইহার মধ্যে কোনও ব্যাপার আছে কি না দেখিবার জন্য একটু দূরে থাকিয়া তাহার পশ্চাতে আবার বাগানে উঠিতে লাগিলাম। সে বাগানের পশ্চিমের সীমায় চলিয়া গেল। আমিও একটু পাশ ফিরিয়া সেদিকে চলিলাম। নীচেই সমুদ্র, অস্তরবির রক্ত-রশ্মিতে কল্পলোকের মত দেখাইতেছিল।

লোকটী যাইতেই বেঞ্চ হইতে একটী সুবেশা মহিলা উঠিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়ে চা হয়া দেখিলাম—সে! লোকটীকে আগ্রহে কি জিজ্ঞাসা করিতে লোকটী নীচের রাস্তার দিক আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

ধীরে ধীরে আমি তাহাদের কাছে গেলাম। আমাকে দেখিয়া তাহারা অবাক হইয়া গেল। মেয়েটি লজ্জায় মাথা নোয়াইয়া দিল। আমি বলিলাম, "আপনি বুঝি এঁকে পাঠিয়েছিলেন?" লজ্জায় মেয়েটীর কানদুটি লাল হইয়া উঠিল।

তাহার সঙ্গী বলিল, "আমরা আপনাকে দূর থেকে নেমে যেতে দেখেছিলাম। রেবা বললে, আপনি নিশ্চয়ই বাঙ্গালী। আমি বললাম, 'তা কেমন করে বলা যায়?' রেবা বললে,

'কাছে গিয়ে দেখে এসো।' তাই আমি দেখ্‌তে গেলাম। আপনি হঠাৎ এখানে এলেন কি করে, বাবু-সাহেব?"

আমি বল্‌লাম, "যাদুবলে।" তিনজনেই হাসিলাম। কারণ এ দেশে প্রবাদ আছে যে বাঙালীরা যাদুকর।

আমি রেবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইনি আপনার কে হন?"

সে মাথা ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভাই।"

আমি বলিলাম, "সেদিন তো সভায় আপনার দেখা পেলাম না।"

সে ধীর সলজ্জ হাসির সহিত বলিল, "সেদিন দামুকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আপনি চলে গেলেন।"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম, "আপনি তা হ'লে সভায় গিয়েছিলেন?"

সে বলিল, "হাঁ। দেরী হয়েছিল, তাই পেছনে বসে ছিলাম।" তারপর একটু থামিয়া বলিল, "এত মেয়েদের মধ্যে আপনি বোধ হয় আমাকে দেখ্‌তে পান্ নি। কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছিলাম। সভা শেষ হ'লেই আপনার খোঁজে পাঠিয়েছিলাম।"

তাহার শেষ কথাগুলিতে সে আমার কাছে এমন পরিচিতের মত, আত্মীয়ের মত লাগিল যে আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রেবা বলিল, "আজ সন্ধ্যা হয়ে গেল। এখন বাড়ী যেতে হ'বে।" বলিয়া সঙ্গীর দিকে তাকাইল।

আমি বলিলাম, "আপনি বুঝি এখানে সর্ব্বদাই বেড়াতে আসেন?"

রেবা বলিল, "আসি, মাঝে মাঝে।"

আমি দামুর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "আপনার পুরো নাম কি?" সে পকেট হইতে একখানা ছোট কার্ড বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। তাহাতে লেখা ছিল,—

দামোদর হরি কড্‌নীস।

কার্পাসের দালাল।

সেই ইটালিক অক্ষরে নাম লেখা কার্ড আর তাহার মালিকের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখিয়া আমি ঈষৎ হাসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের বাড়ী কোথায়?"

দামোদর রাস্তার নাম করিল। রেবা তার সঙ্গে বাড়ীরও নাম করিল। তারপর দামোদরের কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল। দামু বলিল, "বাবু সাহেব, আমাদের বাড়ী কবে আসবেন?"

"আপনাদের বাড়ী?" বলিয়া আমি একটু বিস্ময়ের সহিত তাহাদের দিকে তাকাইলাম। রেবার গাল দুটি জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

এ দীর্ঘ একমাস ধরিয়া যে শুধু কল্পনা-রাজ্যে একটা স্বপ্নের মত খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে, যাহাকে মনে করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তের তরে পাইয়া চিরকালের জন্য হারাইয়াছি, আজ সে সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রণ পাঠাইতেছে, "আমাদের বাড়ী ক'বে আস্‌বেন।"

আমি ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আস্‌ব একদিন।"

তখন উভয়ে যত্ন করিয়া বাড়ীর ঠিকানা, কত নম্বর ট্রামে যাইতে হয় সমস্ত বলিয়া বিশেষ স্পষ্টতার সহিত আমার [illegible] করিল। তারপর বাগান হইতে নামিয়া অতি [illegible] বিদায় লইল।

আমি বিহ্বল চিত্তে গৃহে ফিরিলাম।

৪

সপ্তাহখানেক পরে একদিন খেতওয়াড়ীর এক রাস্তায় ট্রাম হইতে নামিলাম। বোম্বের খেতওয়াড়ীর মত এমন জন-বহুল স্থান পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ ভারতে নাই। সারি সারি ছয়তলা দালান, আর তাহাদের প্রত্যেকটা বহু খণ্ডে বিভক্ত। এক এক খণ্ড লইয়া এক একটা পরিবার বাস করে। আমি "কড্‌নীসদের" খোঁজে ব্যস্ত হ'লাম। কেউ বলিল, "সাম্‌নে যান, পাবেন।" সাম্‌নে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "পেছনে ফেলে এসেচেন।" এরূপ ভাবে ঘোরাঘুরি করিতে করিতে অবশেষে বাড়ী মিলিল, কিন্তু তাহার সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি ভাঙিয়া চারতলায় উঠিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল। সেখানে গিয়া অবশ্য অতি সহজেই দামোদর হরি কড্‌নীসের নামের বিজ্ঞাপনের ফলক পাওয়া গেল। চারতলার [illegible]

একটা ব্লক দখল করিয়া ছিল তাহারা। বারান্দায় নানা রকমের ফুলের টব গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দিতেছিল।

দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিলাম, "মিষ্টার ফড্‌নীস্!" দামোদর ঘরে ছিল না, রেবা ছিল। সে দরজায় আসিল এবং আমাকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ঘরের ভিতর নিয়া বসাইল। ঘরখানি বেশ সুসজ্জিত, যদিও আসবাবের সংখ্যা কম।

রেবা একখানি সাধারণ কাপড় পরিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়াও তারুণ্যের অমল দীপ্তি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে আমাকে একটা কৌচে বসাইয়া সামনে একটা টিপয় রাখিল, তাহার উপর দৈনিক কাগজ ও কয়েকখানা বই ছিল। "আপনি একটু বসুন, আমি আসছি" বলিয়া, পর্দা সরাইয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

আমি বইগুলি দেখিতে লাগিলাম। প্রত্যেক বইয়েতে নাম লেখা ছিল, "রেবাবাই ফড্‌নীস্, ইণ্টার ক্লাস সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ।"

একখানি রঙিন ফিনফিনে সাড়ী পড়িয়া রেবা ফিরিয়া আসিল। দুঃখ করিয়া বলিল, "আপনাকে একা বসিয়ে রাখলাম!" তারপর বলিতে লাগিল, "দামু বাহিরে গেছে; সে মোটেই ভাবে নাই, আপনি আজ আসবেন। আমরা আপনার অপেক্ষা করে করে এক রকম আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।"

কথা বলিতে বলিতে সে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে বাহিরে দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যেন একটু বয়স্কা, বয়স হয়ত কুড়ির উপর হইবে। এখন মনে হইল, অতি তরুণ, আঠারোর বেশী হইতে পারে না। সাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে কেমন একটা বালিকা-সুলভ, কোমলতা দেখিয়া যাইতেছিল।

সেদিন বাহিরে যে সলজ্জভাব দেখাইয়াছিল, ঘরে তার চিহ্নও ছিল না। সে হাসিমুখে, বেশ সহজভাবে, আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। পাশের দেওয়ালে ঝোলানো একটা বড় আয়নাতে তাহার আবক্ষ প্রতিবিম্ব পড়িয়া ছিল।

আমি প্রশ্নের পর প্রশ্নে বালিকাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাড়ীতে আর কে আছে?"

"বাড়ীতে?" বলিয়া একটু থামিয়া রেবা বলিল, "আমার মা আছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার বাবা কি করেন?"

রেবা বিষণ্ণভাবে বলিল, "বাবা মারা গেছেন, অনেক দিন হ'ল।"

আমার মনে যে কৌতূহল জাগিতেছিল আমি তাহা তৃপ্ত করিতেই ব্যস্ত ছিলাম; কিন্তু সে কৌতূহলে নিষ্ঠুরতার পরিমাণ কতদূর ছিল তাহা ভাবিবার অবসর হয় নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে পড়েন বুঝি?"

রেবা বলিল, "পড়্‌তাম, এখন আর পড়ি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

রেবা বলিল, "ইণ্টার ক্লাসে পড়তাম; পরীক্ষায় ফেল হয়ে ঘরে বসে আছি।"

আমি বলিলাম, "সে কি কথা? আবার নিশ্চয়ই পরীক্ষা দেবেন।"

রেবা বলিল, "দেখা যাউক, যদি তৈরি ক'রে উঠ্‌তে পারি।"

আমি বলিলাম, "নিশ্চয় পারবেন।" তারপর বলিলাম, "আপনার ভাই বুঝি কলেজে পড়েন নি।"

রেবা বলিল, "না, সে কার্পাসের কারবার করছে।"

তারপর আমি রেবাকে পড়াশোনা করিতে খুব উৎসাহ দিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে সে বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না।

আমি হঠাৎ বলিলাম, "আপনাকে অবশ্যই মিস্ ফড্‌নীস্ বল্‌ব?"

রেবা সলজ্জভাবে বলিল, "হাঁ।" বলিতে বলিতে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে রেবা ভিতরে গেল এবং কয়েক মিনিট পরে চা এবং জলখাবার লইয়া আসিল।

আমি বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া রেবা হাসিয়া সহজভাবে বলিল, "রোজ তো নিজেদেরই চা খান, একদিন না হয় পরদেশীর হাতেই খেলেন!"

সে কথার সুরে মনে হইল, হয়ত তাহার বয়স বহুদিন পূর্ব্বেই কুড়ির কোঠা পার হইয়া গিয়াছে।

তারপর বাঙ্গলা দেশের কথা, রাজনীতির কথা, আরও কত কি কথা হইল। দেখিলাম রেবা বড় বড় বাঙ্গালীদের সকলেরই নাম জানে এবং তাহাদের সগোত্র বলিয়া আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে।

আমি ভাবিলাম, কোথায় মহারাষ্ট্রের এ ব্রাহ্মণ-কন্যা আর কোথায় এক ভবঘুরে বাঙ্গালী, দুনিয়ার ঢেউয়ে ঢেউয়ে বোম্বেতে আসিয়া ঠেকিয়াছে! কিন্তু এ প্রভেদটা আমার মনে তত গভীরভাবে জাগে নাই, যত জাগিয়াছিল আর একটা কথা—সে অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী কেমন সরল সহজ ভাবে তাহার প্রাণের উচ্ছ্বাস আমার প্রতি ঢালিয়া দিতেছিল!

ফিরিবার পূর্ব্বে রেবাকে বলিলাম, "আপনার মার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন্ না?"

রেবা বলিল, "মা ভারী লাজুক। তাঁকে বলব, আপনি এসেছিলেন," বলিয়া একটু থামিয়া বলিল, "দামুর বন্ধু, বাঙ্গালী।" বলিয়া, আবার আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া বিদায় দিল। বিদায়ের শেষ কথাটা—মারাঠিতে বলিয়াছিল—এখনও আমার কানে বাজে; "হয়া," আসুন!

৫

তাহাকে যখন প্রথম দেখি তখন যদি কেহ চৌপাটির উপর দাঁড়াইয়া বলিত, "দেখ, ঐ যে অপরূপ-সুন্দরী দক্ষিণী মেয়েটি দেখ্ছ, সে দেড়মাস পরে তোমাকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে," তখন আমি ভাবিতাম, ইহা অপেক্ষা উদ্ভট কল্পনা আর হইতে পারে না। ইহা যদি উদ্ভট কল্পনা হয়, তবে তার পর যে দীর্ঘ তিন মাস কাটিয়াছে, তাহাকে কি বলা যায়?

রেবাদের বাড়ী যাবার দুদিন পরে এক প্রভাতে দামোদর কডনীস আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত! সে যে সেদিন বাড়ী থাকিতে পারে নাই তার জন্য কাতর দুঃখ প্রকাশ করিয়া কত কি যে বলিল, তাহা আমার পক্ষে বুঝিয়া উঠাও কঠিন হইল। তার কয়েকদিন পরে সে নিজে আসিয়া আমাকে তাহার বাড়ীতে নিয়া গেল এবং বেশ জাঁকালো রকমে চা'র বন্দোবস্ত করিল।

সেদিন সে রেবার পড়াশোনার কথা তুলিল। কি করিলে সে পরীক্ষা পাশ করিতে পারে, সে বিষয়ে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। আমি যে একজন বড়দরের বিদ্বান লোক এবং আমার সাহায্যে যে সহজেই এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে, এ সম্বন্ধে দামুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না!

আর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল, আমি যেন সর্ব্বদাই তাহাদের বাড়ী যাই, তাহাদিগকে আপনার লোক বলিয়া মনে করি।

রেবা পাশেই বসিয়া ছিল। তাহার মুখের ভাবে বোঝা যাইতেছিল, সে সম্পূর্ণভাবে এ প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছে। আমি যখন উত্তর দিতে যাইব, তখন তাহার কোমল, মাধুর্য্য-ভরা দৃষ্টি আমার সহানুভূতি যাচ্ঞা করিতেছিল।

৬

ধীরে ধীরে খেতওয়াড়ীর সেই ছয়তলা বাড়ীর চতুর্থ তলার কোণের মহলটি বাস্তবিকই আমার অতি আপনার হইয়া গেল। সপ্তাহে দুই তিন বার করিয়া সেখানে যাইতে লাগিলাম। প্রায়ই রেবা একা থাকিত।

কিছুদিনের মধ্যে রেবা আবিষ্কার করিল, আমি গান গাই। আমিও আবিষ্কার করিলাম, রেবা সঙ্গীতে অভিজ্ঞা। তারপর হইতে দুইটি তরুণ প্রাণের গীতিময় উচ্ছ্বাসে কল্যাসদনের একটা প্রান্ত মুখরিত হইতে লাগিল। আমি রেবাকে আমার বাছা বাছা বাঙ্গলা গান শিখাইতে লাগিলাম।

কিন্তু আমি তাহাকে যাহা দিলাম, তাহার শতগুণ প্রতিদান পাইলাম। সেই সুন্দর তরুণ হৃদয়ের ছাপ পড়িয়া আমার ক্লিষ্ট ম্লান চিত্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জীবনকে এত পবিত্র এত সুন্দরভাবে দেখা যায় এতদিন তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। ভাবিলাম যদি আমার মধ্যে সত্য দৃঢ়তর হইয়া থাকে, পবিত্রতা শুভ্রতর হইয়া থাকে, বিশ্বের প্রতি মৈত্রী কিঞ্চিন্মাত্রও সজাগ হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ এই বিদেশিনী তরুণীর সুন্দর নির্ম্মল মুখখানি! রেবা যখন হারমোনিয়মে সুর তুলিত, আর সে সুললিত স্বরে

মধ্যে তাহার রঙিন ঠোঁট দুটি ভাগ হইয়া গানের রূপে একটা অন্তর্নিহিত অমিয় উৎস বহাইয়া দিত, তখন আমি যে বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম, সে বিস্ময় জগতের গূঢ়তম রহস্যভেদেও জন্মে কিনা সন্দেহ। সেতারের ঘাটে ঘাটে যখন তাহার কোমল চাঁপার মত আঙ্গুল খেলিয়া যাইত, তখন যেন কোন্ স্বপ্নলোকের প্রহেলিকা আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত।...

কিছুদিন পরে প্রত্যহই দুজনে একত্র বেড়াইতে যাইতে লাগিলাম। আজও আমার নিকট মালাবার পাহাড়ের সুভোভান চপ্পল-পরিহিতা নীলবসনা এক দক্ষিণী তরুণীর স্মৃতিতে জড়িত। আজও এপোলো বন্দরের কথা মনে হইলে জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যায় নৌকায় দোলায়মানা একটী সুন্দরী তরুণী সহচরীর কথা জাগিয়া উঠে। আমার নিকট চৌপাটির প্রতি রেণু তাহার চরণ-চিহ্নে অঙ্কিত; বোম্বের ট্রামগুলো তাহার সংস্পর্শে মনোরম।...

ধীরে ধীরে আমাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িল।

একদিন তাহাকে বলিলাম, "দেখ, তোমার রেবা নামটার মারাঠী উচ্চারণ আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি এখন থেকে "রেউবা" না ব'লে বাঙলার মত করে "রেবা" বলব।"

সে বলিল, "তা আর কেন? আমার একটা ভাল দেখে বাঙলা নামই রেখে দিন্ না। আপনাদের বাঙলা নামগুলো কি সুন্দর!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এখন আর নাম বদলিয়ে কি হবে? বিয়ের সময় তো আবার বদ্‌লে যাবে।"

সে যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইল। একটু থামিয়া বলিল, "আপনাদের দেশেও কি বিয়ের সময় নাম বদলায়?"

আমি বলিলাম, "না"। তারপর মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "তবে এদেশে যদি কেউ বিয়ে করে তবে সে এ দাবী ছাড়বে কেন?"

ইহার উত্তরে শুধু লজ্জায় তাহার মুখ রাঙিয়া উঠিল।

৭

সেদিনের সে আলাপের পর হইতে আমার মনে একটা নূতন ভাবনা জাগিল। ভাবিলাম, "আমি একেবারে কি করিতেছি? ঐ যে একটী কোমল তরুণ প্রাণে এত যত্ন করিয়া আসন পাতিতেছি, তাহার ভবিষ্যৎ কি হইবে?" আমি আপন নেশার ঘোরে দিনের পর দিন চলিতেছিলাম, তাহার কথা এদিক দিয়া মোটেই ভাবি নাই।

এখন দিনরাত্র একথাটা আমার মনে তোলপাড় করিতে লাগিল। ভাবিলাম, বাড়ীতে আমার আত্মীয় স্বজনেরা আশা করিয়া আছেন, একদিন টাকার বোঝা নিয়া দেশে গিয়া বসিব; তাঁহারা দশ-গাঁ দেখিয়া একটী টুকটুকে মেয়ে আনিয়া বিয়ে দিবেন, সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু ধুমধাম করিয়া নিবেন। অন্ততঃ আমার কাকা তো সে ধারণাই পোষণ করিতেন। কিন্তু আমি কি বাস্তবিক তাই চাই?

নিজেকে কঠোর ভাবে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, "যদি তাই হয় তবে রেবার সঙ্গ ত্যাগ কর।"

তখন মন জেদ করিয়া বলিল, "সে যে আমার!"

আমি বলিলাম, "তুমি কে হে বাপু? তুমি বাঙ্গালী, আর সে মহারাষ্ট্রী।"

মন বলিল, "আমি তাকে ভালবাসি; সে আমায় ভালবাসে।"

আমি বলিলাম, "হলই বা, তা'তে কি এসে গেল? সে ব্রাহ্মণ তুমি শূদ্র।"

মন বলিল, "এটা বোম্বে সহর, ফরিদপুর জেলার আট-গাঁ নয়। এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথায় সমাজ চলে না। এখানে সিভিল ল আছে, আর্য্য সমাজ আছে।"

আমি বলিলাম, "ভবিষ্যৎ?"

মন বলিল, "যেখানে প্রেম, সেখানে ভবিষ্যৎ চিরোজ্জ্বল।"

ভবিষ্যতের কথায় ভাবিলাম হয় ত বাঙলার সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িতে হইবে। তাহাতে মনটা একটু দমিয়া গেল। কেননা, রেঙ্গুন হউক, মেসোপোটেমিয়া হউক, আর ইজিপ্টই হউক, সর্ব্বত্রই একটা আশা লইয়া চলিয়াছি যে, শেষ পর্য্যন্ত একদিন না একদিন বাঙালায় গিয়া পড়িতে পারিবই। বাঙলার ভাষা বাঙলার আহার, বাঙলার জল-বাতাস জীবনের শেষ দিনগুলিকে সার্থক করিয়া তুলিবেই। তাই বাঙলার সঙ্গে

সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হইবার কল্পনায় মনে একটু বে-সুর বাজিল।

কিন্তু নিজেকে বুঝাইলাম, "যদি মা বাঙ্গলার সমাজে গিয়া তাহাকে নিয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে না হয় এদেশেই রহিলাম। শুধু বাঙ্গলাই আমার দেশ, বোম্বে আমার দেশ নয়?"

মনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "সারা ভারতবর্ষই আমার দেশ। তাহার প্রত্যেক ধূলিকণা আমার নিকট প্রিয়। তাহার প্রত্যেক নরনারী আমার আত্মীয়।"

সঙ্গে সঙ্গে মনের এক নীরব কোণে অবস্থিত সমালোচক বলিল, "ওহে ভণ্ড, ঢের দেশভক্তি দেখিয়েচ। বড় বড় কথায় কেন নিজকে ঠকাতে চাও? সোজা কথায় বল, আমি নিজের ইচ্ছার পরিতৃপ্তি চাই।" তখন বলিলাম, "হাঁ, আমি মুক্ত, আত্মনির্দ্দিষ্ট জীবন চাই। সমাজের বা ভূগোলের গণ্ডী আমায় বাঁধতে পারবে না।"

৮

তার একদিন পরে কৃষ্ণাসদনে গিয়া বলিলাম, "রেবা, তোমার বাঙ্গলা নাম ঠিক করেচি, কবে নাম বদলানো যায় বল।"

রেবা বলিল, "তার মানে?" একটা অপ্রত্যাশিত উল্লাসে তাহার চক্ষু দুটি নাচিয়া উঠিয়াছিল।

আমি ধীরে ধীরে তাহার কাছে আমার ভালবাসা নিবেদন করিলাম। বলিলাম, তাহাকে ছাড়া আমার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

রেবা ভাবিতে লাগিল। তাহার মুখ অসম্ভব রকম লাল হইয়া উঠিয়াছিল, চোখ ছল ছল করিতেছিল।

আমি বলিলাম, "আমি বোধহয় তোমার ভাবনার কারণ বুঝতে পেরেচি। আমি বাঙ্গালী, তুমি মহারাষ্ট্রী; আমি শূদ্র, তুমি ব্রাহ্মণ; তাই নয়?"

রেবা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তুমি প্রভু, আমি দাসী।" বলিতে বলিতে তাহার স্বর কম্পিত হইয়া উঠিল। সে অধীর আবেগে তাহার কোমল হাত দুটি বাড়াইয়া আমার পা ছুঁইল।

স্পর্শমাত্রে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমার পায়ে প্রণাম! আমার মত লোক প্রণামের যোগ্য? আর সে প্রণাম করিবে ঐ নির্ম্মল, সুন্দর, দেবকান্তি তরুণী? সে তাহার শুভ্র পবিত্র শিরে আমার পদধূলি নিয়া মাখিবে?

পায়েতে রেবার হস্তস্পর্শে আমার সমস্ত দেহ মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। মনে হইল আমি যেন কত বড় একটা প্রবঞ্চনা করিতে বসিয়াছি।

কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নীরব থাকিয়া বলিলাম, "এ কি রেবা?"

রেবা বিচলিত কণ্ঠে বলিল, "সত্যি তুমি আমায় ভালবাস?"

আমি অতি-আবেগের বোঝা নামাইবার চেষ্টায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "নিশ্চয়! তবে তোমার জাতের ভয় নেই, রেবা?"

রেবা আস্তে আস্তে বলিল, "না,—যদি তোমার না থাকে।"

আমি বলিলাম, "আমার আবার জাত! তা' কোনও দিন ছিলও না, থাক্‌বেও না।"

রেবা সতৃষ্ণভাবে আমার কথা শুনিতেছিল। আমি সহজ, স্ফূর্তিপূর্ণ স্বরে বলিলাম, "বেশ, তা'হ'লে আমাদের বিবাহে কোন বাধা নেই।"

রেবা বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "তোমার মার অবশ্য মত নিতে হ'বে।"

হঠাৎ রেবার মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গেল। ঠোঁটদুটি ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "কি? মা মত দেবেন না?"

রেবা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "তা দেবেন বই কি।"

আমি বলিলাম, "তবে?"

রেবা নীরব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মা কবে আস্‌বেন?" আমার প্রথম আমার কিছুদিন পরেই তাহার মা বোম্বের বাহিরে গিয়াছিলেন বলিয়া সে বলিয়াছিল।

রেবা চেষ্টা করিয়া শক্ত হইয়া বলিল, "তা' তো এখনও বল্‌তে পারি না।"

"তিনি তোমার দিদির বাড়ী গেছেন, না? তুমি তো তাই বলেছিলে।"

রেবা ধীর কণ্ঠে বলিল, "হাঁ"।

"সে তো বহুদিন হয়ে গেচে।"

"তিনি ও রকম থাকেন।" কিঞ্চিৎ থামিয়া বলিল, "দিদির অসুখ করেছিল।"

"তোমাকে একা ফেলে তিনি এতদিন রয়ে গেলেন? সে কেমন?"

সে একটু থামিয়া বলিল, "পূর্ব্বে আমাকে নিয়েই যেতেন। এবার,—"বলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি বলে, আমায় নিয়ে যান নি। আমি তো আর কচি খুকী নই যে আমার জন্য ভাবনা করবেন!"

আমি হাসিলাম। সেও মৃদু হাসিল।

আমি বলিলাম, "তা মোটেই নয়! আচ্ছা তাঁকে শিগ্‌গির আস্‌তে লেখ।"

সে শান্তভাবে বলিল, "লিখ্‌ব।"

আমি বলিলাম, "রেবা, আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তো আর তোমার বোনের বাড়ী যেতে পারবে না?"

সে একটু কৌতূহলের সহিত বলিল, "কেন?"

"তুমি যে অন্যজাতীয় হ'য়ে পড়বে, তারা তোমাকে সমাজে নেবে কেন?"

সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "নাই বা নিল!"

বিদায় নেবার পূর্ব্বে আমি হঠাৎ বলিলাম, "রেবা তোমার ভায়ের মত নিতে হবে না?"

কথাটা বলিয়া আমি হাসিলাম, সেও ঈষৎ হাসিল। তার কারণ এই যে ভাইটার দেহ যেমন, বুদ্ধিটিও তেমন মোটা। এতদিনের মধ্যে দামোদরের সঙ্গে দুচারটা খাপ-ছাড়া কথা ছাড়া বিশেষ আলাপ হয় নাই।

রেবা বলিল, "তার আবার মত কি?"

নীচে রাস্তায় নামিয়া আসিয়া অভ্যাসমত ফিরিয়া উপর দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, চারতলার রেলিং এর উপর ঝুঁকিয়া রেবা যেন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে আমার গতি অনুসরণ করিতেছে।

রাস্তার পরপারে গিয়া আবার তাকাইলাম। তাকাইতেই সে হাতছানি দিয়া উপরে যাইতে ইসারা করিল। ফিরিয়া চার ধাপ সিড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলাম।

উঠিয়া দেখিলাম, রেবা বারান্দায় নাই। ঘরের সামনে যাইতেই দেখিলাম, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। ইহাতে অবাক হইয়া গেলাম। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ভাবিলাম হয়ত তেতলা হইতে অপর কেহ আর কাহাকেও ডাকিতেছিল, আমি দূর হইতে ভুল করিয়াছি।

দরজার কাছে গিয়া ডাকিলাম, "রেবা!"

উত্তর নাই। সে সামনের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে গিয়াছে ভাবিয়া ফিরিয়া চলিলাম। প্রথম ধাপ সিঁড়ি প্রায় নামিয়া শেষ করিয়াছি, এমন সময়ে পেছনে মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দ্বিতীয় ধাপ সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপের শেষভাগে আসিয়াও পশ্চাতে মৃদু পদশব্দ শুনিলাম। আমি থামিতেই তাহা থামিয়া গেল। তৃতীয় ধাপের কয়েক সিঁড়ি গিয়া থামিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, উপরের সিঁড়ি হইতে রেবা নামিয়া আসিতেছে।

আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "একি রেবা?"

তাহার মুখ আরক্ত। সে বলিল "ঘরে এসো।"

দুজনে ঘরে গিয়া উঠিলাম। রেবা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমি যদি কোনও দোষ করে থাকি, তুমি আমার ক্ষমা করবে?"

আমি বলিলাম, "তোমার আবার কি দোষ? বলই না।

সে বলিল, "ক্ষমা করবে কিনা বল।"

আমি বলিলাম, "কেন ক্ষমা করব না, রেবা? আমি যে তোমায় ভালবাসি!"

ইহাতে হঠাৎ রেবার চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল আসিয়া তাহার আরক্ত গাল দুটি বাহিয়া পড়িতে লাগিল।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "একি?"

রেবা মাটিতে জানু পাতিয়া, তাহার মাথাটি আমার কোলের উপর রাখিয়া দুইহাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সত্যি তুমি আমায় ভালবাস?"

আমি হতবুদ্ধি হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। তাহার সঙ্গে এত কালের পরিচয়, কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠ ব্যবহার এ পর্য্যন্ত সে কোনও দিন করে নাই। প্রথম প্রথম বই পেন্সিল হাতে হাতে না দিয়া সামনে টেবিলের উপর রাখিত, এবং একত্র চলাফেরা করিলেও উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা একটা সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব থাকিত। যদিও কালক্রমে সে দূরত্ব চলিয়া যায়, তথাপি আজিকার এই নিঃসঙ্কোচ আত্মসমর্পণে আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

আমি বলিলাম, "রেবা, বল তোমার কি হয়েচে।"

রেবার অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমায় চিরকাল ভালবাস্‌বে?"

আমি বলিলাম, "বাস্‌ব, চিরকাল তোমায় ভালবাস্‌বো, রেবা।"

রেবার অশ্রু থামিল। ধীরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল উভয়ে নীরব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমিই আমায় ডেকেছিলে, রেবা?"

সে বলিল, "হাঁ।"

"ডেকে দরজা বন্ধ করলে কেন?"

রেবা ভীরুকণ্ঠে বলিল, "ভাব্‌লাম, থাক্‌, তোমাকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই।"

"উপরে ডেকে এনে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই?"

"সে কথা মনে করেই তো আবার তোমার পিছু পিছু গেলাম।"

"আমি তোমায় চিরকাল ভালবাসব কিনা একথা জিজ্ঞাসা করতেই ডেকেছিলে?"

রেবা স্থিরনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ।"

তাহার কপালে, মুখে আমার ভালবাসার নিদর্শন রাখিয়া আমি বিদায় লইলাম। ভাবিলাম, "বাস্তবিকই আমি কি এই সুন্দর প্রাণটার উপযুক্ত?"

৯

তারপর তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিনের পর দিন অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম রেবার মায়ের আসার কতদূর। প্রথম কয়েকদিন চিঠির জবাবই আসিল না। তারপর একদিন রেবা বলিল, জবাব আসিয়াছে, মা এখন আসিতে পারিবেন না, দিদির অসুখ সারে নাই। বিশেষ বিমর্ষভাবে সে খবরটা দিল।

আমি বলিলাম, "এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য?"

রেবা বলিল, "তুমি যা বল।"

আমি বলিলাম, "আমি তো এখনও তোমার ভাইকে কিছুই বলিনি, কেননা তোমার মায়ের মত না পেলে এ বিষয়ের আলোচনা করে কি লাভ?" রেবা খুব বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইল। ক্ষণেক পরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "কেন মার মত না নিলে হয় না?"

আমি বলিলাম, "তোমার মার অপেক্ষা না ক'রে তোমায় বিয়ে হবে?"

রেবা বলিল, "হ'লে দোষ কি?"

আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। এতদিন যে খাঁটি ভারতীয় লজ্জা সঙ্কোচ দ্বারা নিজেকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে, আজ কিনা সে বিলাতী "ইলোপমেন্টের" সহায়তা চায়!

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, দোষ আছে বৈকি? তোমার মাকে আস্‌তে দাও। তিনি যখন জীবিত আছেন তখন তাঁর মত না নিলে চল্‌বে কেন? আর তুমি নিজেই বলেচ যে তাঁর অমত হবে না!"

রেবা বলিল, "যদি হয়?"

আমি বলিলাম, "প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি মত না দেন, তখন পরে যা ভাল মনে করি করব।"

রেবা হঠাৎ জেদের সুরে বলিল, তুমি আমায় বিয়ে কর্‌তে চাও না, তাই মায়ের মতের ওজুহাত খুঁজছ।"

আমি তাহার এই আকস্মিক রূঢ়তায় অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম, "রেবা, তুমি কেমন করে একথা বল্‌তে পার?"

রেবা বলিল, "তা না হ'লে তুমি রোজ রোজ মায়ের মতের কথা বল কেন?"

আমি সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "যদি মায়ের মত ছাড়া বিয়ে কর্‌তে তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আমি কেন তার জন্তে অস্থির হব? তবে কর্ত্তব্যও ত আছে?

রেবা হতাশ হইয়া বলিল, "তা হ'লে আমাদের বিয়ে কবে হবে কে জানে?"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, কাল তোমার ভায়ের মত নিয়েই অগ্রসর হব।"

রেবা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "না, তার দরকার নেই। তার মত জিজ্ঞাসা করো না।"

কথার এত অতিরিক্ত দৃঢ়তা দেখিয়া বুঝিলাম, বোনের নিকট ভাইটীর মূল্য অতি কম।

পরদিন তাহাকে মিউজিয়ামে লইয়া যাইবার কথা। বেলা দুইটাতে আফিস ত্যাগ করিলাম। ট্রাম হইতে নামিবার পূর্ব্বে দেখিলাম, দামোদর অপরদিকের ট্রামে উঠিয়া বসিয়াছে। আমার দিকে চাহিল, কিন্তু দৃষ্টিটা যেন অপ্রসন্ন।

দামুর সঙ্গে দেখা খুবই কম হয়। সে সকালে কাজে যায়, দুপুরে ঘরে আসে, কিছু সময় থাকিয়া আবার চলিয়া যায়, সন্ধ্যায় ফিরে। আজিকার এই ক্ষণেকের দৃষ্টি-বিনিময়ে আমার মনে কেমন একটা খটকা বাধিল। ভাবিলাম, দামু কি তাহার গৃহে আমার আনাগোনা অপ্রীতির চক্ষে দেখিতেছে? ভাবিলাম, সে যদি একদিন বলে, "বাবুসাহেব তুমি আমার বাড়ী আর এসো না।"·········যদি একদিন অভিভাবকের কঠোর আদেশ করে, "রেবা, তুই আর বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারবি নে!"

দামু অভিভাবকের মঞ্চে আসীন, রেবা তাহার অনুগতা, আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, একথাটা ভাবিতেই হাসি পাইল!

বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম, রেবা চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমি যাইতেই দাঁড়াইয়া বলিল, "চল"। উভয়ে বাহির হইলাম।

ট্রামে যখন রেবা আমার পাশে বসিয়াছিল, তখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহাতে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি নাই, আনন্দ নাই, কি যেন একটা চিন্তায় সে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। মিউজিয়ামের সব জিনিষ একে একে তাহাকে দেখাইতে লাগিলাম। মনোরম প্রস্তরমূর্ত্তি, বড় বড় তৈলচিত্র, কাঠের নানা রকম কাজ, ঐতিহাসিক স্মৃতি—আরও কত কিছু। এক ঘরের দেয়ালে দেখাইলাম, একশত বছর আগেকার বোম্বের চিত্র। এখন যেখানে বিপুল অট্টালিকার সারি, যেখানে তখন ছিল শুধু সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ, তাহার উপর চাষারা মেষ চরাইতেছে। আর একস্থানে দেখাইলাম, একদল মাটির মানুষ। প্রত্যেকে ভারতের এক এক জাতির চেহারা ও পোষাকের পরিচয় দিতেছে। আরও কতকিছু দেখাইলাম। কিন্তু কোনটাই রেবার চিত্ত আকর্ষণ করিল না। সে শুধু মাঝে মাঝে আমার দিকে চাহিতেছিল, এবং চোখে চোখে দৃষ্টি পড়িলেই চোখ ফিরাইয়া নিতেছিল।

অনেকক্ষণ ঘুরিবার পর বাহিরের বাগানে আসিলাম। মিউজিয়ামের এক পাশে গিয়া পাথরের উপর দুজনে বসিলাম। রেবা গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমাকে একটী কথা বলতে চাই।"

আমি বলিলাম, "বলনা!" বলিয়াই হাসিয়া বলিলাম, "ব্রুচটা তোমার পছন্দ হয় নি বুঝি?" সেদিন সকালে তাহাকে একটা পাথর বসানো ব্রুচ উপহার দিয়াছিলাম, এবং সে তাহা পরিয়াই আসিয়াছিল।

রেবা আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, সেকথা নয়। তুমি বলেছ আমায় চিরকাল ভালবাসবে?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, সেকথা আবার কেন?"

সে বলিল, "আমার সব দোষ ক্ষমা করবে?—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "তা ত বলেইচি।"

সে বলিল, "আমি যদি তোমার কাছে মিথ্যা কথা ব'লে থাকি?"

আমি বলিলাম, "কি মিথ্যা কথা বলেচ?"

সে বলিল, "ক্ষমা করবে কিনা আগে বল।"

আমি বলিলাম, "করব।"

সে বলিল, "সত্য কর।"

আমি একটু অবাক হইয়া বলিলাম, "কেন?"

সে মৃদুভাবে বলিল, "করই না।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা করলাম।"

রেবা গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার মা নেই।"

আমি নেহাৎ সহজভাবে বলিলাম, "তার মানে?"

রেবা বলিল, "আমার বাবার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই মা মারা যান।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে যে তুমি বললে?

রেবা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, তাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তুমি মিছে কথা বল্চ!"

রেবা ধীরভাবে বলিল, "না।"

"সে কি কথা?" বলিয়া আমি বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইলাম।

রেবা বলিল, "তুমি হয়ত ভাব্‌বে, মা ছাড়া, অভিভাবক ছাড়া মেয়ে হয়ত ভাল হবে না, হয়ত তা ভেবে আমায় ভালবাস্‌তে না, তাই আমি মায়ের কথা বলেচি।"

"তবে তোমার মা দিদির বাড়ী যান নি?"

"না।"

"তোমার দিদি?"

"আমার দিদিও নেই। আমি তোমায় মিছে কথা বলেচি।" বলিতে বলিতে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

আমি বিস্ময় রাখিতে পারিলাম না। তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া বলিলাম, "মাও নেই, দিদিও নেই, সব মিথ্যা? চিঠি লেখার কথা সব মিথ্যা? আমি এতদিন যে চিঠির অপেক্ষা করে ছিলাম, তার মূলে সব ঝুটা?"

রেবা ধীর, কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "হ্যাঁ"।

আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিয়া মিউজিয়াম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ট্রাম ধরিলাম। সেদিন ট্রাম হইতে নামিয়া তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত গেলাম, উপরে উঠিলাম না। রেবা উপরে যাইবার সময় শুধু রাখিয়া গেল, তাহার সেই সুন্দর দৃষ্টিটি—কিন্তু আজ অসীম ব্যথা ভরা, কাতরতা মাখা। পূর্ব্বদিনের প্রণামে সে আমার কাছে নিজেকে যত না দীন করিয়া তুলিয়াছিল, আজিকার এ দৃষ্টিতে যেন তার চেয়ে আরও অনেক বেশী করিয়া দিল।

১০

সে রাত, তার পরদিন, তার পরের রাত,—মোট প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা ধরিয়া আমি শুধু তাহার কথা ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, যাহাকে আমি ভাল বাসিয়াছি, যাহাকে নিজের জীবন-সঙ্গিনী করিতে যাইতেছি, সে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী! কথাটাকে অনেকবার কেমন আন্তরিকভাবে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি। মিথ্যা বলা যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের তো কোনও দিন আমার সঙ্গে মিশিতে দিই নাই।

রেবা মিথ্যাবাদী,—দিনের পর দিন এত বড় একটা মিথ্যা কথা দিয়া আমাকে ভাঁড়াইয়াছে। দিনের পর দিন এক মিথ্যায় বহু মিথ্যার সৃষ্টি করিয়া প্রবঞ্চিত করিয়াছে, একথা ভাবিতে ভাবিতে আমার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, "এই শেষ।"

দুইদিন খেতওয়াড়ীর বাড়ীতে গেলাম না।

তৃতীয় দিন প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুমের শেষ সময়টা যেন আধ-স্বপ্ন আধ-জাগরণে কে বলিয়া গেল, "তুমি মানব চরিত্রের কি জান?"

ভাবিলাম, আমি মানব-চরিত্রের কি জানি? যে তরুণী তাহার প্রাণ দিয়া আমায় ভালবাসিয়াছে, একান্তভাবে নিজেকে আমার কাছে লুটাইয়া দিয়াছে, সে ক্ষণেকের ভুলে একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছে বলিয়াই তাহার সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত মনুষ্যত্ব পণ্ড হইয়া গেল?

নিজেকে নিজে বলিলাম, "জগতে শুধু "পিউরিটান"ই (puritan) বাস করে না, আরও অনেকের এতে স্থান আছে। আমার ছুকথা নীতির বলেই জগৎ চল্‌বে এ মনে করা ধৃষ্টতা।"

মনে পড়িল রেবার শেষ চাহনিটি। ভাবিলাম, যদি সামান্য এ ত্রুটিটুকু ক্ষমা করিতে না পারি, তবে কোন্ গুণে অমন একটী তরুণ প্রাণের একনিষ্ঠ ভালবাসা পাবার উপযুক্ত হইব? সে মিথ্যা বলিয়াছিল আমার ভালবাসা যাহাতে না হারায় সেই জন্যে, অন্য কোনো স্বার্থ-সাধনের জন্য ত নয়!

মন তেজের সহিত বলিল, "আমি জীবনকে চাই, নীতি চাই না। নীতি আমার জীবনের বেগ রুদ্ধ করতে পার্‌বে না।"

১১

সেদিন অপরাহ্ণে কলাভবনে গেলাম। সর্পপথে—জানিনা কেন—সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। ধীরে ধীরে

দামোদরের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলাম। দরজা খুলিতেই দেখিলাম, রেবা পাশের ঘরে বসিয়া। পর্দা সরানো ছিল, তাই ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে দেখিলাম। তাহার চারিদিকে কাগজ পত্র ছড়াইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার সম্মুখে একখানা অবাঁধানো ফটোগ্রাফ; কাছে গিয়া দেখিলাম, তাহা তাহার ও আমার একত্রে তোলা একখানা ছবি। রেবা নিবিষ্ট-ভাবে তাহা দেখিতেছিল।

আমার দিকে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত বলিল, "আমায় ক্ষমা করেচ? নিশ্চয়! তোমার মুখেই তা প্রকাশ পাচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "করেচি।"

রেবা তাহার বাহুদুটি দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া ওষ্ঠাধরের নীরব ভাষায় প্রাণের আবেগ ব্যক্ত করিল।

আমি বলিলাম, "বেশ, তোমার মা নেই, এক গোলমাল চুকে গেল। এখন তোমার ভাই আর তুমি দুজনেই কর্ত্তা। বড় বোনের ঝঞ্ঝাটও নেই। কেমন, না?

রেবা মাথা নীচু করিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "তবে ভাইয়ের সঙ্গেই সব ঠিক করা যা'ক, কেমন?"

রেবা বলিল, "সে ঠিক করবে কি! তুমি যা বল্‌বে, তাই হ'বে।"

আজ রেবাদের ঘরটায় বসিয়া একটা নূতন রকমের অনুভূতি জাগিল। এতকাল যখনই এ ঘরে আসিয়াছি তখনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মনে হইয়াছে, 'রেবা, তার মা, তার ভাই।' সচেতন ভাবে না হইলেও, মনের অচেতন বা যা অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সে কথাটা প্রচ্ছন্ন ছিল। আজ সে স্থান হইতে মায়ের সত্তাটি উঠিয়া গিয়াছে। তাই এ ঘর, এ টেবিল, এ আয়না, এ সবের সঙ্গে যেন মনের কেমন একটা অপরিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। বুঝিলাম, রেবার মা নাই, বোন নাই এ ধারণাটা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহাকে শুধু মনের অন্য ধারণাগুলির সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে হইবে তা নয়, তাহার সহিত জড়িত সমস্ত বস্তুসমূহের সঙ্গেও নূতন করিয়া সম্বন্ধ পাতিতে হইবে।

রেবাকে বলিলাম, "রেবা, চল, বেড়াতে যাবে।"

সে বলিল, "কোথায়?"

আমি বলিলাম, "যেখানে খুসী, তবে মিউজিয়ামে নয়, সে জায়গাটা আমার বড় অপ্রিয় হয়ে গেচে।"

রেবা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বলিল, "তবে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে।"

আমি বলিলাম, "তাতেও তো মিউজিয়াম আছে।"

রেবা বলিল, "হলেও তো তা ভিন্ন।"

উভয়ে ট্রামে চড়িয়া ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে গেলাম। সেখানকার মিউজিয়াম-ঘরে ঢুকিতে যাইব এমন সময় দেখিলাম একজন বয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক ছেলে-পিলে লইয়া ভিতর হইতে দেখিতে দেখিতে বাহিরে আসিতেছেন।

তখন জানিনা কি একটা সহজ প্রেরণার বলে মিউজিয়ামে না ঢুকিয়া রেবাকে বলিলাম, "চল, বাহিরে যাই।" তারপর তাহাকে বাগানের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিয়া আমি পিছনে রহিলাম। বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলে তাহার সঙ্গে গিয়া মিশিলাম।

বোম্বে সহরে না আছে, পৃথিবীর এমন কোনও সভ্য জাতি নাই। কিন্তু আমি ভাবিয়া পাই না, অন্য জাতির সম্মুখে নিঃসঙ্কোচে চলিতে পারি, বয়স্ক বাঙ্গালী দেখিলে কেন তেমন পারি না।

কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর রেবা ক্লান্তভাবে এক বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। আমাকে কাছে বসাইয়া বলিল, "আজ আবার মিউজিয়ামে কেন আসিয়াছি জান?"

আমি বলিলাম, "কেন?"

রেবা বলিল, "সেদিনকার মত অপ্রিয় কথা তুল্‌ব বলে'।"

আমি বলিলাম, "সে আবার কি?"

রেবা বলিল, "সেদিন তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলে যে, আমি সব কথা বল্‌বার সাহস পাই নি।"

আমি চকিত হইয়া বলিলাম, "আরও বল্‌বার কিছু ছিল নাকি?"

রেবা শান্তকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ।"

আমি বলিলাম, "কি বল"।

রেবা বলিল, "তুমি উত্তেজিত হবে না?" সে স্বরে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় মিনতি মাখা ছিল। ঘাতকের উদ্যত হস্ত হইতে প্রাণরক্ষার জন্য যেমন করিয়া মিনতি করে, ঠিক সেইরকম।

কণ্ঠে একটা গভীর অসহায় ভাব নিয়া রেবা বলিল, "তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না বল।"

আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার দিকে তাকাইলাম। রেবার চক্ষুদুটি জলভারাক্রান্ত হইল কিন্তু জল আসিল না। সে বলিল, "বলব?"

আমি বলিলাম, "বল।"

রেবা ধীর শান্ত কণ্ঠে বলিল, "আমি বিধবা।"

আমি বিপুল চেষ্টায় নিজের আবেগ চাপিয়া বলিলাম, "রেবা!"

জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড ধরিতে অগ্রসর হয়, রেবা তেমনিভাবে আমার হাতের কাছে হাত আনিয়া বলিল, "তোমার ভালবাসা পাবার জন্য আমি সব গোপন করেচি। যে মুহূর্ত্তে তোমাকে আমি দেখি, সে মুহূর্ত্ত হ'তে আমার মনে হয়, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। সে মুহূর্ত্তে তোমার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করেচি।"

তারপর একটু কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি যদি আমার ভালবাসা গ্রহণ করলে, তবে আমাকে তোমার পায়ে স্থান দেবে না?"

রেবার দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত উত্তেজনা নিবিয়া গেল। তাহার সে করুণ ব্যথাভরা কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল থামিয়া আমি বলিলাম, "রেবা, আমায় একটু একেলা ভাবতে দেবে?"

রেবা নীরবে আমার সঙ্গে উঠিল, এবং বাগান ছাড়িয়া চলিল।

উভয়ে ট্রামে উঠিলাম। রেবার বাড়ীর রাস্তায় তাহাকে দিয়া বলিলাম, "এখন আসি।"

রেবা চক্ষু তুলিয়া চাহিল না। কি একটা দুর্ব্বহ বোঝায় যেন তাহার মাথা ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল।

১২

আমি বাড়ী না গিয়া সমুদ্রতীরে গেলাম এবং সারা রাত্রি সেখানেই কাটাইলাম।

সারারাত সমুদ্রতীরে বসিয়া বসিয়া বহুকালের সংস্কারের বন্ধন একে একে ছিন্ন করিতেছিলাম। বিধবা বলিলেই চিরকাল মনে হইত একটা নিষ্ফল নিঃসার জীবন যাহার শেষ কথা শেষ হইয়া গিয়াছে; যাহার এ পৃথিবীতে আর কিছু কাম্য, কিছু প্রাপ্য নাই। আজ আমার প্রেমপাত্রী বিধবা,—বিধবাকে আজ আমি বিবাহ করিতে উদ্যত,—কথাটা একটা জলন্ত অঙ্গারের মত চিত্ত দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু ধীরে ধীরে নানা চিন্তা আসিয়া সে ভাবনাকে পরাভূত করিয়া দিল। বহু যুক্তি উদিত হইল এবং অবশেষে সমাজসংস্কার এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথাও মনে পড়িল। সর্ব্বশেষে ভাবিলাম, রেবা যদি বিধবা হয়, তবে তাহাকে বিবাহ করা সমাজের কল্যাণ বৈ ত আর কিছু নয়?

মনকে শক্ত করিয়া বলিলাম, "ভালবাসার যদি মূল্য থাকে তবে এ মেয়েটির সামনে পুরোহিত একদিন দুটো মন্ত্র পড়েছিল এ কথার জন্য সে ভালবাসা ব্যর্থ হইতে পারে না।"

এ কথাগুলি একবার দুইবার একশবার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। যুক্তির পর যুক্তি, তর্কের পর তর্ক, একই সিদ্ধান্তে গিয়া পৌঁছাইল।

এই ভাবে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তখন ভাবিলাম, এত রাত্রে আর ঘরে গিয়া গোলমাল বাধাইবার দরকার নাই। সমুদ্রের বালুচরায় পাশে একটা বেঞ্চে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। প্রভাতে যখন উঠিলাম তখন মনের মধ্যে অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মেসে ফিরিয়া আসিয়া কিন্তু লোক-জন সমাজ-সংসারের প্রভাবে বহুযত্নে পরাভূত সংস্কারটা আবার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। বিধবাকে আমি বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছি!

১৩

তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারি...
কিন্তু সহকর্ম্মীদের কথাবার্ত্তা,

সিপাহীদের আলাপ, রাস্তার লোকের কোলাহল, সমস্তের মধ্য দিয়া যেন একটা কথা খেলিয়া যাইতেছিল, "আমি বিধবা।" মস্তিষ্কের ভিতর রক্তের স্পন্দনে স্পন্দনে যেন ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল, "আমি বিধবা।"

বিকালে আফিস হইতে বাহির হইয়া ট্রামে না গিয়া জনস্রোতে গা ভাসাইয়া দিলাম। নিজের শূন্যতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য হৃদয় যেন ঐ বিপুল জনতার আশ্রয় লইতে চাহিল। যেখানে সকলেই সচল, যেখানে কর্ম্মের উল্লাস, সেখানে যেন প্রাণের ব্যথা বেদনা আপনা হইতেই নীরব হইয়া যায়। অন্ততঃ এই আশাতেই জনতার সঙ্গে কোর্টের রাস্তা ছাড়িয়া সাগর-তীরে গেলাম। দুই দিকে খেলার সবুজ মাঠ রাখিয়া রেল লাইন পার হইয়া ষ্টেশনের কাছে গিয়া পড়িলাম।

ষ্টেশন ঘরের দেয়ালে সাদা মোটা মোটা অক্ষরে "চার্চ্চগেট"—শব্দগুলি যেন যাত্রীদের আহ্বান করিতেছিল। হঠাৎ ভাবিলাম, কাল রাত্রের অনিদ্রা, তারপর আজিকার চিন্তা, এর পরে একবার সহরের বাহিরের হাওয়াতে গিয়া বেড়াইলে মন্দ হয় না। এ কথা মনে হইতেই তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে গিয়া টিকেট কিনিলাম—স্যাণ্টাক্রুজের। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ীতে উঠিলাম, এবং দেখিতে দেখিতে সহরের অট্টালিকার ও মানুষের ভিড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

অপরাহ্ণের লোকাল ট্রেনে দিনের কর্ম্মশেষে লোকেরা যার যার ঘরে ফিরিতেছিল। কামরা বোঝাই। আমি একান্তে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ বসিতে বসিতে তন্দ্রা আসিল, বোধ হয় পূর্ব্ব রাত্রের জাগরণের দরুণ। কানের ভিতর গাড়ীর ঝকা-ঝক্-ঝক্ শব্দ ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। এক একবার তাহা উঁচু হইয়া উঠে, আবার নামিয়া পড়ে। হঠাৎ তন্দ্রার ঘোরে মনে হইল কে যেন এ বজ্র-নির্ঘোষের সঙ্গে এক বিরাট ব্যঙ্গ মিশ্রিত করিয়া বলিতেছে, "আমি বিধবা।"

বাণাহতের মত মাথা তুলিয়া বসিলাম। একটা তীব্র যাতনা বৃশ্চিকের মত তিক্ত দংশন করিতে লাগিল।

স্যাণ্টাক্রুজ ষ্টেশনে নামিয়া সোজা জুহুর দিকে চলিলাম। তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছিল। দূরে দেখা যাইতেছিল জুহুর ঘন নারিকেল বন আকাশে একটা গাঢ় কাল আবরণ রচিত করিতেছে।

আমি ধীরপদে নিজ চিন্তায় মগ্ন হইয়া চলিতেছিলাম। কিন্তু কি চিন্তা করিতেছি তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। শুধু মনের উপর এই একটা ধারণা পাষাণের মত চাপিয়া ছিল যে, আমার সম্মুখে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বোধ হয় সমাধান নাই।

তখন জুহুর উপকূল প্রায় জনশূন্য; শুধু এক পাশে একটা তাঁবুতে দু'চারজন সাহেব মেম বনভোজন করিতেছিল। আমি একটা নারিকেল গাছের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে সাগর সৈকতে গিয়া নামিলাম এবং শুভ্র বালুরাশির উপর আসন পাতিয়া বসিলাম। সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল, কিন্তু পশ্চিমাকাশে তখনও তাহার শেষ আভা মুমূর্ষুর হাসির মত খেলা করিতেছিল। সৈকতের পাশে পাশে একটা গাঢ় কৃষ্ণরেখা বাঁকা হইয়া সমুদ্রের তীর নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিল। উত্তর দিকে সে রেখা গিয়া একটা ক্ষীণ অন্তরীপে পরিণত হইয়াছিল, এবং দক্ষিণে এক অনির্দ্দিষ্ট শিলাস্তূপে মিশিয়া গিয়াছিল।

একটা গভীর শান্তির শীতল স্পর্শে আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। আমি নীরব নিশ্চলভাবে সেখানে বহুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কোন সমস্যার কথা ভাবিলাম না। শুধু বিরাট প্রকৃতির নীরব বক্ষে নিজেকে লুটাইয়া দিলাম। তাহার স্নিগ্ধ স্পর্শ সারা অঙ্গে মাখিয়া লইলাম।

সমুদ্রের ঢেউ লুকিয়া লুকিয়া ছুটিয়া আসিতেছিল। সাদা সাদা ফেনাগুলি বালির উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তারপর ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র লবণপুঞ্জে পরিণত হইতেছিল। সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, শুধু জলরাশি—দূরে কুজ্ঝটিকার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। দক্ষিণে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী কালো ছায়ায় মিলাইয়া পড়িতেছে। বামে বোম্বের অস্পষ্ট দীপমালা এক অজানা মায়াপুরী রচনা করিয়াছে।

সেদিনকার সে কয়টি মুহূর্ত আমার কাছে অনন্ত মুহূর্ত। আমি আত্ম-বিস্মৃত হইলাম। যেন আমি এক গৃহহারা যাযাবর নাই, যে নিজের দুরন্ত অবাধ্যতা লইয়া সারা দুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার ভালবাসা, আমার ব্যথা,



কুটীর

চৈত্র, ১৩৩৭

শিল্পী—কুমারী দিবা ভট্টাচার্য্য

সমস্ত লোপ পাইল। শুধু মনে হইল, আমি অসীম প্রকৃতির এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, সমুদ্রের সৈকতের উপর একটি বালুকণা, সমুদ্র তীরের একটি তৃণ মাত্র!

শীতল বাতাসে চক্ষু ঘুমে জড় হইয়া আসিল। তাই উঠিয়া ফিরিয়া চলিলাম। পথে দেখিলাম, সাহেব মেমদের মোটর প্রস্তুত, খানসামারা তাঁবু গুটাইতেছে।

মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াই হউক, কিম্বা স্বাভাবিক কারণেই হউক, আমার মনে আবার পূর্ব্ব চিন্তা জাগিল। ভাবিলাম, জগৎ কত সুন্দর, কত সুখময় হইত, যদি রেবা বিধবা না হইত।

পিছন হইতে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। পূর্ব্বোক্ত সাহেব মেমদের দল চলিয়া গেল।

তখন মনের সহিত পুনরায় যুক্তি করিতে আরম্ভ করিলাম। মনে মনে বলিলাম, যদি সারা ইউরোপ আমেরিকা, এমন কি এ সংসার সমস্ত অহিন্দু জাতি বিধবাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে, শান্ত, পবিত্র ভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে, তবে আমাদের শুধু একটা দেশের এক সমাজের লোকের সে বিষয়ে এত আপত্তি থাকে কেন?

ষ্টেশনে আসিলাম। সিগন্যালের লাল আলো সবুজ হইল। হুহু করিয়া বোম্বের গাড়ী আসিল। গাড়ীতে বসিয়া ভাবিলাম, এ আমাদের সমাজের সঙ্কীর্ণতা বৈ আর কিছু নয়।

হঠাৎ যেন একটা নূতন সত্যের আলোকে মন ঝলসিয়া উঠিল। প্রাণে একটা নূতন উচ্ছ্বাস জাগিল। সেই উচ্ছ্বাস হৃদয়ে বহন করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। সেদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে কে যেন মনের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল, "জীবন দুর্জ্জয়, দুর্ব্বার! মূর্খ, তাকে সমাজের গণ্ডী দিয়ে বাঁধতে চাও?"

১৪

পরদিন আফিসে অসুখের নোট পাঠাইয়া বেলা এগারোটাতে খেতওয়াড়ী গেলাম। কৃষ্ণাসদনে উঠিয়া দেখিলাম, রেবা ও দামোদরে কারওয়ারী ভাষায় তীব্র তর্ক চলিতেছে, এবং রেবার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। আমি দরজায় দাঁড়াইতেই রেবার সুর বদলাইয়া গেল, যেন পূর্ব্বের তর্ক রাখিয়া নূতন বিষয়ে দামুকে রূঢ়তার সহিত কি বলিল। আমি তাহাদের কথার একবর্ণও বুঝি নাই, শুধু সুরের নূতন ভঙ্গী দেখিয়া একথা মনে হইল।

দামোদর চুপ করিয়া ভিতরের ঘরে গেল এবং একটা ষ্টোভ জ্বালাইতে ব্যাপৃত হইল।

রেবা আমার কাছে আসিয়া বিশেষ ত্রস্তভাবে বলিল, "আজ যে এ সময়ে?"

আমি বলিলাম, "আজ শরীরটা ভাল নেই, আফিসে যাই নি।"

রেবার ত্রস্তভাব দূর হইল না। মনে হইল যেন এ সময়ে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে সে অনিচ্ছুক। সেদিনকার কথার পর আমার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না তাহা জানিতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

তথাপি আমি বলিলাম, "রেবা, আমি তোমাকে সেদিনকার বিষয়ে আমার মত জানাতে এসেচি।"

রেবা তাড়াতাড়ি বলিল, "এখন না বললে হয় না? বিকেলে?"

আমি বলিলাম, "এখন তোমার ভাইও উপস্থিত আছে, সব বিষয়েই মিমাংসা করা যাবে।"

গভীর বিরক্তির সহিত রেবা বলিল, "তার সঙ্গে কি?"

আমি বলিলাম, "আপত্তি কি? সে তো তোমার ভাই?"

দামু দরজার ওপাশ হইতে কথা শুনিতেছিল। আমার একথার পর হঠাৎ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। এতকাল যখনই তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে তখনই লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার মুখের স্থূল মাংসপেশীগুলি স্থির, শান্ত; যেন সংসারের একটা সহজ সাধাসিধে তৃপ্তিতে ভরা; তাহাতে চিন্তা বা ক্লান্তির কোনও চিহ্ন নাই; কিছুতে আকৃষ্ট হইবার বা কিছুকে দ্বেষ করিবার শক্তি তাহার নাই; শুধু যেন একটা অর্দ্ধ-জান্তব, অর্দ্ধ-মানব প্রেরণার বশে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু আজ সে মুখে একটা তীব্র হিংস্রভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। দামোদরের ক্ষুদ্র চক্ষুদুটি ছুরিকের

মাংস-স্তূপের নীচে লুকাইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহা হইতে যেন একটা বিশ্রী তীব্র দাহ বাহির হইয়া আসিতেছিল।

সে তার মোটা ঠোঁট ছুটি উল্টাইয়া একটা বিকট ব্যঙ্গের সুরে বলিল, "আমি তার ভাই?" বলিয়াই মুখ অর্দ্ধব্যাদান করিয়া কটমট্ ভাবে চাহিয়া রহিল।

রেবা তাহার দিকে ক্ষিপ্তদৃষ্টি ফেলিয়া বলিল, "তুমি যাও, বল্‌ছি।" দামোদর ততোধিক ক্ষিপ্তভাবে বলিল, "কেন যাব?" বলিয়া নেহাৎ বৈষয়িকভাবে একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া আমার কাছে বসিয়া বলিল, "বাবু-সাহেব, আপনাকে আমার কথা শুন্‌তে হবে।"

আমি বলিলাম, "দামোদর রাও, তোমার সম্বন্ধে কোনও কথা হচ্ছে না। তুমি কেন রাগ করচ?"

দামু আমার মুখের দিকে একবার, রেবার দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "কথা হোক্ বা না হোক, আমার কথা আপনি শুনে নিন্।"

রেবা হঠাৎ অর্দ্ধচীৎকারের সুরে বলিল, "তোর কি কথা, বেরো এখান থেকে।"

দামু দৃঢ় হইয়া চেয়ারে বসিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসিতে যেন একটা দুরন্ত উল্লাস ফুটিয়া উঠিল। ভেক সাপের মাথায় পদাঘাত করিতে পারিলে যেমন উল্লসিত হইত, তেম্‌নি।

দামু বলিল, "বাবুসাহেব, এ'কে আমি দেশ থেকে এনে এতকাল যাবৎ খাইয়ে পরিয়ে রেখেছি—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "তা রাখ্‌বে না? এ'ত তোমার বোন।"

দামুর হাসি ফট্‌কাবাজির মত ফুটিয়া উঠিল। রেবার প্রতি চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিল, "সে আমার বোন?…বাজে কথা! মিছে কথা!" বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল।

রেবা আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি কথা?"

দামু কথার সুরটা কতকটা স্বাভাবিক করিয়া বলিল, "তাকেই জিজ্ঞাসা করুন না, বলবে।" বলিয়াই আবার বলিল, "না বলে তো আমি বল্‌ছি। সে কখনই আমার বোন নয়। সে সোনার-বেনের মেয়ে, আমি সারস্বত ব্রাহ্মণ।"

আমি অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। ইহাতে সে আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, "সে আর আমি এই ইস্কুলে পড়্‌তাম। তাতে আমাতে খুব ভাব ছিল, যদিও সে আমাকে নীচের শ্রেণীতে ফেলে উপরে উঠে গিয়েছিল," বলিয়া রেবার দিকে চাহিল। রেবা যেন দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। সে দামুর চোখে চোখে চাহিতে সাহস পাইল না।

দামু বলিতে লাগিল, "সে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠ্‌তেই তার বাপ মারা যায়। তারপর তাদের বাড়ী ঘর নীলাম হ'য়ে ছারখার হয়ে গেল। রেবার বয়স তখন পনের ষোল? না রেবা?"

রেবা উত্তর দিল কিনা দেখিলাম না। আমি শুধু দামুর ক্ষুদ্র ইঁদুরের মত চোখ আর মোটা উল্টানো ঠোঁট দুইটির দিকে চাহিয়া ছিলাম।

দামু বলিতে লাগিল, "হাঁ রেবার বয়স পনের কি ষোল ছিল। তার মা তাকে বিয়ে দিলেন বুড়ো শঙ্কররাও মানগাওকরের সঙ্গে। এমন রূপসী মেয়েকে বুড়োর হাতে দিলেন দেখে লোকে হায়, হায় করলো। কিন্তু গরীব মা, কি করবে? বেচারী বিয়ে দিয়ে কিছুকাল পরেই মারা গেল।"

ক্ষণকালের জন্য আমি বক্ষ্যমাণ বিষয় ভুলিয়া গেলাম, এবং নির্ব্বোধের মত ঐ বিকৃতমুখ যুবকটীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। দামু বলিয়া যাইতে লাগিল।

"দুবছর পরে প্লেগ হয়ে শঙ্কররাও মারা গেলেন। তার টাকা পয়সা ছিল মন্দ নয়। কিন্তু তা নিয়ে রেবার সঙ্গে তার দেবর আর যায়েরা মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। রেবা পড়ল মহা ফাঁপরে। একদিন আমায় ডেকে, যত্ন করে খাবার খাইয়ে বল্‌লে, 'দামু, তোর তো পড়াশোনা হ'ল না, হবেও না। তুই বোম্বে গিয়ে একটা কাজ কারবার করে খা না।' আমি বল্‌লাম, 'মন্দ কি, তবে পয়সা কই?' সে আমায় অনেক টাকা দিল। বোম্বে রওয়ানা হবার

আগের দিন ডেকে বল্‌ল, "দাদু, কাকেও বল্‌বিনে, তুই তোর সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চল্‌।' গোপনে জাহাজে চড়ে, দুজনে মিলে বোম্বে চলে এলাম।"

বলিতে বলিতে একটা ঢোঁক গিলিয়া দাদু আবার আরম্ভ করিল, "বোম্বে এসে ঠিক হল, আমি কার্পাসের ব্যবসা করব, সে ইস্কুলে পড়বে। রেবা ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'ল, এবং এক বছর পরে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে গেল। কিন্তু আই-এ ফেল করে পড়া ছাড়ল, আর তার সব টাকা পয়সা আমাকে দিয়ে দিল।

"কিন্তু আমিও আমার সমস্ত রোজগার এনে তার হাতে দিয়েচি। এখন কিনা সে আমাকে তার চাকর বলে মনে করে। বলে, আমি যখন তাকে বিয়ে করিনি, তখন আমার সঙ্গে আর ঘর করবে না। বলুন তো বাবুসাহেব, আমি হলাম সারস্বত ব্রাহ্মণ, আর সে সোনার-বেনে, তাতে আমাতে কেমন করে বিয়ে হয়?"

বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া অভিযোগের সুরে বলিতে লাগিল, "আমার সঙ্গে এতকাল ঘর করলে, তা'তে বিয়ের দরকার হ'ল না, এখন বল্‌চে কিনা 'তুমি যখন আমায় বিয়ে করনি, তখন আমি তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি, আমি অপরকে বিয়ে করব।' দেখুন কি নিমকহারাম?"

বলিয়াই সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল এবং হৈ চৈ করিয়া আবার স্টোভ ধরাইতে প্রবৃত্ত হইল।

রেবা নির্ব্বাক, আমি নীরবে বসিয়া। সে নীরবতা শত শত মণ পাথরের বোঝার মত আমার বুক চাপিয়া ধরিল। মনে হইল যেন কোন্‌ এক অজ্ঞাত প্রহেলিকার মধ্যে পথ হারাইতে হারাইতে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি।

আমার কণ্ঠস্বর যে কোনও দিন কাঁপিতে পারে, আর্দ্র, রুদ্ধ হইয়া আসিতে পারে, তাহা ভাবি নাই। কিন্তু এখন তাহাই হইল। অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবা, দাদু যা বলেচে তা সত্য না মিথ্যা?"

সে ধীর কণ্ঠে বলিল, "সত্য"।

"সব সত্য?"

"সব।"

আমি উঠিলাম। দাঁড়াইতেই রেবা তাড়াতাড়ি গিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া মেজের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিল।

আমি বলিলাম, "ছাড়।"

রেবা আরও দৃঢ়ভাবে আমার পা আঁকড়াইয়া ধরিল। তাহার বাহুপাশের বেষ্টন যেন প্রাণের এক অসীম আবেগ নিবেদন করিতেছিল।

আমি ক্ষণকাল মূর্খের মত তাহার লুণ্ঠিত দেহের পানে তাকাইয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে আমার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, "তুমি তার সঙ্গে এতদিন ঘর করেচ?"

রেবা বলিল, "হ্যাঁ"। তাহার কণ্ঠে একটা কৃত্রিম দৃঢ়তা। মনে হইল যেন, সত্য বলিবার একটা প্রবল ইচ্ছা সমস্ত মনকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে।

রেবা তাহার অশ্রুপ্লাবিত চক্ষু দুটি আমার দিকে তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

আমি বলিলাম, "রেবা!"

রেবা পা ছাড়িয়া বসিল। বলিল, "আমি অনন্যোপায় হ'য়ে দামোদরের সঙ্গে ঘর করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। যে মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখি, সে মুহূর্ত্ত হ'তে আমার সমস্ত জীবন বদ্‌লে যায়। আমি ভাবি, তুমি ভিন্ন আমার কেউ নেই। তুমি কেন আমায় ভালবাস্‌লে?" বলিতে বলিতে চোখের জলে আমার পা ভাসাইয়া দিল।

তারপর একটু সংযত হইয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু আমি তোমাকে ঠকাতে চাই নি। যেদিন তুমি আমাকে বিয়ে করবে বলেছিলে সেদিনই তোমাকে ডেকে সব কথা খুলে বল্‌ব মনে করেছিলাম। কিন্তু কেন জানিনা, সেদিন বল্‌তে সাহস হ'ল না।"

তারপর আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "প্রথম দিন যদি তোমাকে সব কথা খুলে বল্‌তে পারতাম, তবে এত গোলমাল হ'ত না।"

তাহার সে কথার সুরে আমার বুদ্ধি জাগ্রত হইল। আমি বলিলাম, "রেবা, এখন আমি আসি, পরে এসব বিষয়ের আলোচনা করা যাবে।"

রেবা যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি সেখান হইতে সোজা মেসে গেলাম। গিয়া ঠর কাগজ খুলিয়া লিখিলাম, "রেবা, তুমি শিক্ষিতা, মতী বালিকা। তোমার আমার বিবাহ যে অসম্ভব হা তোমার বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই। তোমরা দুজনে সুখে থাক, আমি বাকী জীবনে তোমাদের শান্তিভঙ্গ করিতে আসিব না।"

সেদিন সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে গিয়া কলিকাতার টিকেট কিনিয়া ই, আই, আর মেলে উঠিয়া বসিলাম।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

ঝঞ্ঝা-বরণ

শ্রীমান্ অজিতকুমার মিত্র

কাননে নামুক ঝড়ের নাচন
কানন পাগল ক'রে—
গরবী গাছের ফল, পাতা, সব
যাক গো মাটীতে ঝ'রে!
গরবী গাছের গরবিণী পাখী
শাখে সারা হোক ভয়ে ডাকি' ডাকি',
দর্পিত তার কণ্ঠের গান
কণ্ঠেতে যাক্ ম'রে!

ভেঙে যাক্ ঝড়ে মলিন পাখীর
মলিন পাতার নীড়,—
ধুয়ে দি'ক্ তার কলুষের ভার
কাতর নয়ন-নীর।
ঘরছাড়া পাখী নূতন করিয়া
আপনার নীড় লউক গড়িয়া,
নত হ'য়ে যাক্ দর্পী তরুর
গর্ব্বোন্নত শির।

আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষার বাহন

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু

ভূমিকা

এই প্রবন্ধের প্রথম পর্বে বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের অস্বাভাবিকতা ও অসুবিধার এবং মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের সম্ভাবিত সুফলের কথা, এবং দ্বিতীয় পর্বে ইংরাজীর সহিত আংশিক সংস্রবশূন্য হইলে আমাদের ক্ষতি হইবে কিনা ও আমাদের মাতৃভাষার শিক্ষার বাহন হইবার উপযোগিতা আছে কিনা তাহা আলোচিত হইবে। তৃতীয় বা শেষ পর্বে এই সম্পর্কে মুসলমানদিগের বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় বিবেচিত হইবে।

প্রথম পর্ব্ব

প্রত্যেক জাতির শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের পক্ষেও এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হইবে না। বিদ্যামন্দিরগুলিতে আমাদের বালকদিগের মন যে-ভাবে গঠিত হইতেছে,—সেখানে আমাদের বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির বিকাশের, হৃদয়ের প্রসারতা ও কোমলতা বৃদ্ধির, চরিত্রের পবিত্রতা ও দৃঢ়তা সম্পাদনের, পরিবার সমাজ ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে পরিপুষ্ট করিবার এবং মনে ধর্ম্ম ও শ্রদ্ধার ভাবকে জাগ্রত করিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহার প্রভাব ও ফল কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্ব বিভাগে পরিলক্ষিত হইবে।

একান্ত দুর্ভাগ্য ও ভ্রমক্রমে শিক্ষাকে একমাত্র অর্থোপার্জ্জনের উপায়-স্বরূপ জ্ঞান করি বলিয়া আমরা ইহার গুরুত্ব ও জাতীয় জীবনের উপর ইহার প্রভাব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি না। এমন কি আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও সম্পূর্ণরূপে এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। জাতির দুর্ব্বলতা দূর করিয়া তাহার অবনতি রুদ্ধ করিতে হইলে—তাহাকে বলিষ্ঠ ও উন্নত করিতে হইলে,—শিক্ষা-মন্দিরই তাহার একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র।

আমাদের শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতি ও মূল প্রকৃতি, অতীত ও বর্ত্তমানে অনেকটা অভিন্ন হওয়ায় ইহার অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ভবিষ্যতের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এই শিক্ষা আমাদিগকে দেহ ও মনে, কর্ম্মোদ্যমে ও কর্ম্মশক্তিতে, চরিত্রের দৃঢ়তায় ও হৃদয়ের কোমলতায়,—নিজের ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিপূর্ণ সাধনায় এবং সত্যে, সৌন্দর্য্যে, ধর্ম্মে ও কল্যাণে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়াছে কিনা, তাহা আমাদের শিক্ষিত সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে এবং ইহার ত্রুটী বিচ্যুতির অনুসন্ধানও অনেকটা সহজ হইবে।

বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদিগকে সকল দিক দিয়া মানুষ করিবার চেষ্টা বা তাদৃশ ভাণ করে নাই। সেদিক দিয়া ইহার ত্রুটী সংখ্যাতীত ও অপরিমেয়। আমাদের জাতীয় চরিত্রের অনেক দুর্ব্বলতার উদ্ভব এখানেই হইতেছে। ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে নানাদিক দিয়া ইহার সংস্কার-ক্রিয়া অত্যাবশ্যক হইলেও তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি এবং তথ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টাও যে অনেকটা ব্যর্থতা ও জাতীয় শক্তির অপচয়ের ইতিহাস এবং ইহার জন্য যে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি অপেক্ষা ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই অধিকতর দায়ী সে কথাটা জাতির কল্যাণকামীদের বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনীশক্তিতে বাঙ্গালী পৃথিবীর অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। সংখ্যায় অল্প হইলেও আমাদের

যে কয়জন মনীষী বিশ্ব-মানবের বর্ত্তমান জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করিয়াছেন—তাঁহাদিগের দ্বারা উপরোক্ত কথার সত্যতা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সুযোগ সুবিধা ও উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইঁহাদের আরও বহু স্বদেশবাসী যে ইঁহাদের অনুসরণ করিতে পারিতেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। যে সকল বাঙ্গালী পর্য্যটক পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশে যাইয়া তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা অতিরঞ্জিত ও পক্ষপাত দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও—যে সকল বিদেশী বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও নূতন জিনিষ গ্রহণ করিবার শক্তিকে প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা, পদমর্য্যাদা বা পাণ্ডিত্য নিতান্ত অবজ্ঞেয় নহে। বাঙ্গালীরা যে-ভারতীয় মহাজাতির অংশ, অতি প্রাচীনকালেও তাঁহারা যে মানসিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা আজও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। কাজেই, বর্ত্তমান ভারতীয়দেরও যে বড় হইবার শক্তি আছে তাহা অস্বীকার করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। যে সকল বিদেশী অধ্যাপক স্যাড্‌লার কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেও বাঙ্গালী ছাত্রদের প্রশংসা করিয়াছেন।

অথচ, যদি দেখা যায়, অন্য দেশের ছাত্রদের তুলনায় বাঙ্গালী ছাত্রদের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যালাভের আগ্রহ কম, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের সংখ্যানুপাতে গবেষণা বিভাগের ছাত্রদের সংখ্যাল্পতা বিদ্যমান, মানসিক শিক্ষা ও উৎকর্ষের পরিমাপ ছোট, এমন-কি তথ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানও অসম্পূর্ণ ও অপুষ্ট, তাহা হইলে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির কোথাও যে বিশেষ প্রকারের অসঙ্গতি রহিয়াছে তাহা মনে করা যাইতে পারে। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাস-প্রিয়তার আধিক্য, কোনও ঘটনা বা মতবাদকে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবার ক্ষমতার আংশিক অভাব এবং সুসঙ্গত বিচার-শক্তির দৈন্যও ঐ এক কথাই প্রমাণিত করে। প্রায় এক শত বৎসর ইংরাজী শিক্ষার মধ্যে বাঙ্গালীরা তথ্যসম্বলিত গবেষণামূলক বা অন্য যে সকল মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার সংখ্যা ও প্রতিপত্তি একান্তই নগণ্য। কয়েকটী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাদ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের নিকট হইতেও আশানুরূপ কিছু পাওয়া যায় নাই। দারিদ্র্য ও জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা ইহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও, কোন প্রকার নিষ্পেষণই একটী জাতির মানসিক ক্ষুধা ও শক্তি পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। গত যুদ্ধের সময় জার্ম্মানী যখন জীবনমরণের দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত ছিল, তখন সেই সময়ে অর্থাৎ ১৯১৪-১৯ সালের মধ্যে সে দেশে চল্লিশ হাজার মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং ঐ সময়েই সেখানে দুইটী নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক পরাধীনতা ইহার আংশিক কারণ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান পোলাণ্ড দেশটী বহুদিন পরাধীন ছিল। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অষ্ট্রীয়া জার্ম্মানী ও রাসিয়ার দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের ফলে স্বাধীন সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ত্রিশক্তির অধীন ছিল। ইহার লোকসংখ্যা মাত্র তিন কোটি—অথচ এই ক্ষুদ্র দেশটীতে এই সময়ের মধ্যেই সমকালবর্ত্তী গোটা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক বিশ্ববিখ্যাত মনীষী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার কথা ও কাব্যসাহিত্যের যে আকস্মিক উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে এবং সে ক্ষেত্রে যে কয়েকজন জগত-বরেণ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষা প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার শক্তি যোগাইলেও, পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ ও সংস্পর্শই তাহার অধিকতর শক্তিশালী কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

ইংরাজী শিক্ষা যে আমাদের মানসিক বিকাশকে কতখানি বাধা দিতেছে, সে সম্পর্কে একটী স্পষ্ট প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণ ভাবে কোনও বিদ্যালয়ের ৩০।৪০টী বালক বিশিষ্ট একটী নিম্ন বা মধ্য শ্রেণী পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ৭।৮টী, ৮।১০টী বা তদপেক্ষাও কম সংখ্যক ভাল ছেলে ব্যতীত অন্য ছাত্রদের মানসিক শিক্ষা বিশেষ কিছুই হয় নাই—বুদ্ধিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, অনুসন্ধিৎসা আশ্চর্য্য রকমের কম, কোনও একটি বিষয় সংলগ্নভাবে গোছাইয়া বলিবার ক্ষমতা নাই, মন অত্যন্ত যুক্তি-বিমুখ ও কোনও কিছু গ্রহণে অক্ষম; এবং সেই বয়সের

ছেলেদের নিকট যতটুকু সাধারণ বুদ্ধি আশা করা যাইতে পারে—বেশীর ভাগ ছেলেরই তাহা নাই। আর পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও শীঘ্র কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ক্ষমতার অভাব অল্পবিস্তর প্রায় সকল ছেলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হইবে। অথচ, বিদ্যালয়ের বাহিরে, যাহারা কোনও প্রকারের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে না এরূপ বালকদিগের মধ্যে বুদ্ধি ও কৌতুহলবিহীন বালকের সংখ্যানুপাত অনেক কম। ইহাদের বেশীর ভাগই প্রয়োজনের খাতিরে চারিপাশের লোকজন, প্রকৃতি ও কাজকর্ম্মের মধ্য দিয়া মাঝারি রকমের জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে এবং এই জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টার ফলে ইহাদের পর্য্যবেক্ষণশক্তি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হইয়াছে। অধিক বয়স্কদের মধ্যে এই প্রকার তুলনায় অবশ্য এই প্রকারের ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। নানা বাধা সত্ত্বেও অবিরত মানসিক চর্চ্চা ও চেষ্টার ফলে শিক্ষিত মন ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে এবং অশিক্ষিত মন মাত্র প্রয়োজনের তাগিদে যতটুকু পরিণতি লাভ করিতে পারে তাহাকে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু প্রথম তুলনা দ্বারা বিদ্যালয়ের বালকদিগের মধ্যে যে মানসিক পঙ্গুত্ব লক্ষিত হইবে তাহা প্রত্যেক ছাত্রেরই উৎকর্ষ লাভের পথে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং অনেকের পক্ষে ব্যর্থতার কারণ হয়। এই সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ হইতে একথা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা জাতীয় শক্তির উৎসমুখকে বাধামুক্ত করিতে পারে নাই, মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে খর্ব্ব করিয়াছে এবং আমাদের বুদ্ধি ও মনের আশানুরূপ বিকাশ সাধন করিতে পারে নাই। ইহার জন্য বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান ব্যবস্থা কতখানি দায়ী তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিলে এই অসাফল্যের মূল কারণ নির্ণীত হইবে।

দ্রব্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে আমরা মাতৃভাষা শিক্ষা করি। শিশুরা প্রথমে যে সকল কথা বলিতে পারে, সেই সকল কথা দ্বারা চিন্তা, ভাব ও দ্রব্য সম্বন্ধে যে পরিচয় ব্যক্ত হয় শিশুমন তাহা সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারে না। এ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান প্রথমে আংশিক মাত্র থাকে এবং ক্রমে বয়সের সঙ্গে পুষ্ট হইতে থাকে। নূতন জিনিষ গ্রহণ করিবার সময় বালকদিগের উপরও এই কথা প্রযোজ্য। বিষয় সম্বন্ধে যখন ধারণা অপুষ্ট থাকে এবং নিত্য-পরিচিত কথা মনে যখন আংশিক অস্পষ্ট ধারণামাত্র আনয়ন করে তখন কথা বা প্রকাশ ভঙ্গীটাকে একটু নূতনরূপ প্রদান করিলে 'বিষয়'কে মন আর গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা যখন ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি তখন মাতৃভাষার জ্ঞানই আমাদের অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে এবং চিন্তা ও ধারণা শক্তির সামান্যই বিকাশ হয়। অর্থবোধ জন্য ইংরাজী বাক্যের বাঙ্গালা অনুবাদ শিখান হয়। ইংরাজ ও বাঙ্গালা ভাষার ধাতু-প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় প্রথম শিক্ষার্থীকে ইংরাজীর যে বাংলা অর্থ শিখিতে হয় তাহা শিক্ষার্থীর নিত্য-পরিচিত মাতৃভাষা হইতে একেবারে পৃথক। এই বিকৃত ভাষা তাহার নিকট ইংরাজীর ন্যায় সমানই দুর্ব্বোধ্য। ইহা দ্বারা তাহার মনে কোনও প্রকার ধারণাই জন্মে না। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি বা বস্তুকে আমরা পরিচিত ব্যক্তি বা বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহাকে জানিতে পারি। কিন্তু এই পরিচিত ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধেই যদি আমাদের যথেষ্ট পরিচয় না থাকে অথবা তাহাকে ভিন্ন পোষাকে আমাদের চিনিতে কষ্ট হয়, তবে তাহার সাহায্যে অপরিচিতের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করা অনেকা বাতুলতা। এই কারণে শিক্ষার জন্য বিদেশী ভাষা ব্যবহার অনাবশ্যক, অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাভাবিক। —পৃথিবীর আর কোথাও এ রীতি প্রচলিত নাই। ইহাতে বালকদিগের বুদ্ধি ও মনের উপর এত বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয় যে, তাহাদিগের পক্ষে তাহা বহন করা অসম্ভব। ফলে, তাহাদের একান্ত স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা নষ্ট হইয়া যায়, মন নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে ও তোতা পাখীর মত মুখস্থ করিবার অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া যায়। স্কুলের অধিকাংশ বালকের মধ্যে যে বুদ্ধির জড়তা লক্ষিত হয় ইহাই তাহার প্রধান কারণ। *

ইহাদ্বারা আমাদের শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বিদেশী ভাষা আমাদের চিন্তাশক্তিকে খর্ব্ব

The use of mother tongue in India as an instrument of mental training has long been neglected in the school-system ....The premature use of a foreign and half-understood medium..............tends to produce intellectual muddle.

Sadler Commission Report.

করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহার ফলে জাতির মানসিক শক্তির অসম্ভব অপচয় হইতেছে। যত লোকে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করে তাহার মধ্যে খুব অল্প-সংখ্যক লোকেই ইহা হইতে মন ও চিন্তাশক্তি পুষ্ট করিবার মত জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে। যাহারা ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞানে জাতির মুখোজ্জল করিতে পারিত, ইংরাজী শিখিতে না পারায় তাহাদের সকল সম্ভাবনাই নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে স্বাধীন চিন্তাশক্তি ক্ষুন্ন হইবার আর একটা কারণ এই যে, বিদেশী ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা আয়ত্ব করিতেই আমাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়। তাহা ব্যতীত কোনও নূতন বিষয় শিখিবার সময় বিদেশী ভাষার কাঠিন্য বশতঃ বিষয়ের নূতনত্ব ও আকর্ষণী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ছেলেরা ইংরাজী পড়িলেও প্রায় সব সময়েই বাংলায় চিন্তা করে এবং সেজন্য অনেকখানি জটিলতার সৃষ্টি হয়। ইহা আমাদের কল্পনা শক্তির বিকাশকেও বিশেষরূপে বাধা দিতেছে। যে বয়সের ছেলেদের ভাষার খাতিরে যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করিতে হয় তাহা কখনও তাহাদের কল্পনাশক্তিকে নাড়া দিতে পারে না। ১১।১২ বৎসরের ছেলেদের পশুপক্ষীর গল্প পড়িতে হয় ইহাতে তাহারা কখনই আনন্দ পাইতে পারে না। অন্য দিক দিয়া যে সকল পাঠ্য পুস্তক ইহাদের উপযোগী হইতে পারিত, ভাষা কঠিন হয় বলিয়া তাহা পড়ার সম্ভব হয় না। শিক্ষার এই অসামঞ্জস্য বরাবরই রহিয়া যায় এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু হয় না। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে মনের যে উৎকর্ষ সহজেই সাধিত হইতে পারিত এইরূপে তাহা ব্যাহত হয়। যে সকল বালক অধিক বয়স পর্য্যন্ত বাংলা স্কুলে পড়ে তাহারা যে শিক্ষা এবং মানসিক শক্তিতে ইংরাজী স্কুলের ছেলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—সে কথা শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট অনেক প্রধান ব্যক্তি এবং সমিতি লক্ষ্য করিয়াছেন। ১৮৮২ সালের কমিশন বাংলা সরকারের নিকট হইতে এইরূপ মত প্রাপ্ত হন যে, যাহারা Vernacular Scholarship লইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা ইংরাজী স্কলারসিপ প্রাপ্ত ছাত্রদের অপেক্ষা এট্রান্স পরীক্ষায় অনেক অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। ১৯১৩ সালের গভর্ণমেণ্ট-অব-ইণ্ডিয়া রেজলিউসনে একথা উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে সকল ছাত্র দেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষিত হইয়াছে তাহাদের মানসিক যোগ্যতা অসাধারণ। ১৯১৫ সালের ১৭ই মার্চ Mr. R. Rayaningar-এর Imperial Legislative Council-এ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশীয় প্রবর্ত্তন সম্পর্কীয় প্রস্তাব আলোচনা কালে তৎকালীন শিক্ষা সদস্য Sir Hercourt Butler বলেন যে অনেক যোগ্য শিক্ষা-বিশেষজ্ঞের এবং তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা অনুসারে, যে সকল বালকের শিক্ষা স্কুলের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাতৃভাষায় হইয়াছে, তাহারা, ইংরাজীতে যাহাদের শিক্ষা পরিচালিত হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিতে অনেক শ্রেষ্ঠ হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুত রামানন্দ বাবুর একটী উক্তিও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। স্যাড্‌লার কমিশনের নিকট সাক্ষ্য-প্রদান কালে তিনি বলিয়াছেন,

"My experience is that, at the age of 10 or 11, in the highest class of the Vernacular School where I first received education, my fellow students and myself knew more of History, Geography, Mathematics, Hygiene, sanitation and natural science combined, than any class fellows of 15, 16, 17, 18 or more, knew when I was subsequently in the highest class of a high school preparing for the matriculation examination. Similar has been the experience of many others.

যে অল্প সংখ্যক লোক ইংরাজী ভাল ভাবে শিখিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও ইহা হইতে বুদ্ধি ও মনের খোরাক সংগ্রহ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে অন্ততঃ ১৮।২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে হয়। মনে নূতন নূতন বিষয় মুদ্রিত হইবার ও বুদ্ধির সর্ব্বতোমুখী স্ফূরণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল সময়টাতে গ্রহণ করিবার যোগ্য কিছুই তাহার সম্মুখে ধরা হয় না। ফলে, যখন ইংরাজী সাহিত্য আরম্ভ হয়, তখন মনের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা ও শক্তি নষ্ট হওয়ায় তাহা হইতে খুব সামান্য সংখ্যক লোকই লাভবান হইতে

পারেন। চর্চার অভাবে বুদ্ধির মৌলিকতা ও সৃজনীশক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য বহু বর্ষের ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাসে বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যে এমন উল্লেখযোগ্য কিছু দিতে পারে নাই যাহা কালের ভাণ্ডারে অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বিদেশী ভাষায় বক্তৃতা করা যাইতে পারে, খবরের কাগজ চালান যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে জাতির সত্য প্রতিভার স্ফুরণ সম্ভব নহে।

ইংরাজী শিক্ষা যে আমাদের প্রতিভার সম্ভাবিত বিকাশকেই মাত্র এই ভাবে রুদ্ধ করিতেছে, তাহা নহে। এই শিক্ষা-বিধানের মধ্যে লব্ধ জ্ঞান যে অন্যান্য দেশে অনুরূপ অবস্থায় লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা অনেক কম তাহার কারণও এই অস্বাভাবিক পন্থার অনুসরণ। বাল্যকাল হইতেই ইংরাজী শিখিতে আমাদের এত সময় ও উদ্যম ব্যয় করিতে হয় যে, ইহার জন্য সুশিক্ষাকে বর্জ্জন করা ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। ইংরাজী ভাষা যে জ্ঞানের বাহন মাত্র, এই শিক্ষার প্রবর্ত্তকেরা যে এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারের জন্যই ইহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানেও যে ইহার অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, সে কথা আমরা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। বর্ত্তমানে ইংরাজী ভাষায় অধিকার লাভকেই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ধরিয়া লইয়াছি। কোনও লোকের ইংরাজীতে কিছু জ্ঞান থাকিলেই, জ্ঞান লাভের জন্য অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা যতই অধিক হউক—তাঁহাকে অসঙ্কোচে শিক্ষিত বলি। অপরপক্ষে ইংরাজী না জানা কোনও ব্যক্তি বিশেষরূপে জ্ঞানী হইলেও তাঁহাকে শিক্ষিত পর্য্যায়ভুক্ত করিতে আমরা সঙ্কুচিত হই। এই মোহ আমাদের এতদূরে লইয়া গিয়াছে যে, ইতিহাস এবং ভূগোল শিক্ষায় মধ্যেও মূল বিষয় অপেক্ষা ইংরাজীকে অধিক গৌরব দান করি। সেইজন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় ইতিহাস মাতৃ-ভাষায় পড়িবার অধিকার দিলেও শিক্ষকদিগের প্রভাবে বেশীর ভাগ ছাত্র ইংরাজীতেই ইতিহাস অধ্যয়ন করে। ইতিহাস ভূগোল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য-শিক্ষণীয় না হইলেও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মধ্যশ্রেণীগুলি পর্য্যন্ত ইহা পড়ান হয় * অথচ ছেলেদের ইংরাজী শিখাইবার লোভে অধিকাংশস্থলে ইহা ইংরাজীতে পড়ান হয়; ফলে ইহার উদ্দেশ্য ও ছেলেদের পরিশ্রম উভয়ই ব্যর্থ হয়। প্রবেশিকা পর্য্যন্ত যদি ইংরাজী পড়িতে না হইত অথবা ইংরাজীর উপর এতখানি ঝোঁক না দিয়া সামান্যরূপ ইংরাজী শিখিবার জন্য দ্বিতীয় ভাষারূপে ইহা পড়িয়া অন্যান্য বিষয় মাতৃভাষায় সাহায্যে শিক্ষা করা যাইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা অনায়াসে শেখা যাইত। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও প্রবেশিকা শিক্ষার মাপ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টার মিডিয়েটের সমান। ইহাতে বাঙালী ছেলেদের দোষ নাই। সকল জাতিই অন্যভাষা অপেক্ষা মাতৃভাষায় সাহায্যে অধিক তৎপরতার সহিত শিখিতে পারে। বাংলায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে ছেলেদের বোঝা কমিয়া যাইবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অনেক অধিক জিনিষ শিখান যাইবে।

ইংরাজীর প্রতি পরিমাপ-সামঞ্জস্যহীন পক্ষপাতিত্ব বশতঃ আমরা স্বভাবতঃই মাতৃভাষায় প্রতি কতকটা শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ি এবং আমাদের ছেলেরা নিজেদের সভ্যতা ও জাতীয়তার প্রকৃতির মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। নিজেদের সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল অপরিচিত থাকিয়া যায়। জীবন-যাত্রা ও চিন্তার ধারা কৃত্রিম হইয়া উঠে। আমাদের ধর্ম্ম, জাতীয়তা ও দেশের জন্য, শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান অপরিহার্য্য। যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানের সর্ব্ব-বিভাগে আমাদের স্বাভাবিক উপায়ে প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন কখনই আমরা সত্য প্রতিভা ও বুদ্ধির বিকাশে সমর্থ হইব না।

বাংলাভাষা বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহার মর্য্যাদা বাড়িবে না এবং তাহাতে শিক্ষাপ্রদ উৎকৃষ্ট পুস্তকাদিও রচিত হইবে না। এজন্য জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী লোকদের বাড়িতে পড়িয়া বিদ্বান হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কাজেই অন্যজাতির সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে এবং দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে

* বর্তমান বর্ষ হইতে অবশ্য ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইল, এবং এই সকল বিষয় মাতৃভাষায় পড়িবার সুবিধাও থাকিল,—কিন্তু অনুরূপ কারণে এ বিষয়গুলি বাংলায় পড়িবার সুবিধা খুব কম ছাত্রই পাইবে।

বর্ত্তমান ব্যবধান দূর হইবে না। মাতৃভাষার শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে বাংলার নূতন জীবন দেখা দিবে এবং জাতীয় জীবনে নব-শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

এদেশে ইংরাজী শিক্ষা যাঁহারা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার-সাধন। অশিক্ষা এবং অন্ধ বিশ্বাস-প্রবণতা দূর করিতে না পারিলে এ দেশের উন্নতি সম্ভব নহে মনে করিয়া সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ডেভিড হেয়ার ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেন ও ১৮১৭ সালে প্রথম হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময় দেশীয় ভাষার পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার বহন করিবার অথবা পাশ্চাত্য চিন্তা-রীতিকে প্রকাশ করিবার মত সমৃদ্ধি ছিল না। কাজেই, ইংরাজী ভাষার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। পরে সরকার যখন ইংরাজী শিক্ষার অনুমোদন করেন, তখন তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল, দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধনান্তর সেইগুলিকেই শিক্ষার বাহন করা। ১৮৩৬ সালে পাব্‌লিক ইন্‌ষ্ট্রাকসন্ কমিটি তাঁহাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেন, "দেশীয় ভাষার সাহিত্য সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি ও সেই দিকেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হইবে।" ১৮৫৪ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ বলেন, দেশীয়ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী চালানো তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। ক্রমে ইউরোপীয় পুস্তকাবলীর অনুবাদের দ্বারা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানপুষ্ট লোকদিগের দ্বারা রচিত মৌলিক রচনা দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার সম্ভব হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতারা অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথমে ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতের পরীক্ষা যে কোনও জীবিত ভাষায় দেওয়া যাইত। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই নিয়মের ফলে এমন অনেক স্কুল গ'ড়য়া উঠিবে যেখানে ইংরাজী ব্যতীত অন্যসকল বিষয় দেশী ভাষায় পড়ান হইবে এবং স্কুলপাঠ্য অন্যান্য পাশ্চাত্য পুস্তকের দেশীয় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া সাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার হইবে।

কালক্রমে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার ইংরাজী শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা অভীষ্ট সুফল প্রদান করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের আয়োজন অনুভূত হইতেছে। শুধু পুরাতন ও ইংরাজীর মোহ যেন এ বিষয়ে আমাদিগকে অন্ধ করিয়া না রাখে। সম্প্রতি বঙ্গে শিক্ষা কমিটি বঙ্গের হাইস্কুলগুলিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাও এ বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হইতে পারে।

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্ব আগামীবারে)

শ্রীসুশীলকুমার বসু



খেলা-ঘর

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই চিরপুরাতন কাহিনী!

একটি ছেলে, একটি মেয়ে—মধ্যে মাত্র একটি বাতায়নের ব্যবধান। পাশের বাড়ী ভাড়াটে আসিয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের গৃহস্থালীর মধ্যে দ্রষ্টব্য কিছুই ছিল না; কিন্তু বর্ত্তমানে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমেই গোপেনদের বাড়ীর দিকের জানালা দুইটা ছোট-ছোট কাপড়ের পর্দ্দা দিয়া বন্ধ করিলেন। এত সতর্কতা যখন তখন তাহার অন্তরালে এমন কিছু আছে নিশ্চয়ই, যাহা মানুষের লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোপেন তাহার শয়নকক্ষে জানালার পাশে বিছানার উপর শুইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া অন্ততঃ তাহাই ভাবে।

কিন্তু একদিন যায়, দুদিন যায়,—একটি একটি করিয়া অনেকগুলি দিবারাত্রি পার হইয়া গেল। গোপেনের গোপন-চক্ষুর লুব্ধদৃষ্টি ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া আসিতে লাগিল। রাত্রে পর্দ্দার উপর ছায়া পড়ে বটে, কিন্তু সে ছায়াময়ীর কায়া কোনো দিনই তাহার প্রত্যক্ষীভূত হইয়া ওঠে না। এ দুঃখ যে কত বড় দুঃখ—তাহা গোপেনের মত সৌন্দর্য্যপিপাসু অবিবাহিত তরুণেরা হয় ত বুঝিতে পারে—কিন্তু শান্তা তাহাকে এই লইয়া বারে বারে বিদ্রূপ করিতে ছাড়ে না।

হাসিয়া বলে—কি ছাই দাঁড়িয়ে আছ জানালার ধারে চব্বিশ ঘণ্টা! ওরা কি ভাববে বলত'? চুল আঁচড়াতে হয় ত' ওই দিকে যাও না!

গোপেন ভেংচি কাটিয়া বলে—ভাগ্! তোর কি! ওদের জানালার পর্দ্দা-আঁটা দেখ্‌তে পাস্ না? চোখ নেই?

শান্তা তাহার ঘর হইতে বাহির হইবার সময় বলিয়া যায়—মাকে বলি তোমার বিয়ে দিক।

—খবরদার শান্তা, মেরে খুন ক'রে ফেলব আমি।—বলিয়া গোপেন তাহার হাতের আর্শী-চিরুণী টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া ডাকে—এই শান্তা, শোন্।

শান্তা তখন রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে।

মা হেঁটমুখে ভাতের মাড় গালিতেছিলেন। বলিলেন—যা না, দাদা ডাক্‌ছে শুনতে পা'স্ না?

শান্তা আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল—কি, বলছ কি? শুনি!

গোপেন কহিল—ক্ষেপেই থাকিস্ যে, মারবি না কি? আমার লেটার-প্যাড্-খাম্ কোথায় রেখেছিস্?

—বারে আমি তার কি জানি! তোমার প্যাড্-খাম নিয়ে আমি কি কোরব!

—তুই কি করবি, তা আমি কি জানি; তুই-ই ত নিয়েছিস্!

—নিয়েছি বেশ করেছি। শুনছো মা!—বলিয়া মার কাছে গিয়া শান্তা বলে,—দেখ ত' মা, আমাকে কেমন চোর ধরে!

মা বলেন—আঃ! তোদের জ্বালায় আর পেরে উঠিনে বাপু!

হঠাৎ সেদিন মধ্যরাত্রে যেন শুষ্ক প্রান্তরের উপর জাহ্নবীর ধারা বহিল।

গোপেনের চোখে তখন তন্দ্রা আসিয়াছে। আর একটু হইলেই বোধ করি সে ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু সহসা তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—নারীকণ্ঠের গীতধ্বনিতে [illegible] সেই বাতায়নের যবনিকান্তরাল হইতে ধ্বনি আসিতেছে,—

—'আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায়
কে গো দরদী।
খুলে দাও রং-মহালার তিমির-দুয়ার
ডাকিলে যদি।'

গোপেন তাহার বিছানার উপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সুমুখে তাকাইয়া দেখে,—জানালার পর্দা তেমনি টানা, তাহারই অপর প্রান্তে গান চলিতেছে, অর্গেন বাজিতেছে, আলো জলিতেছে! এ পারে অন্ধকার! কিছুই ভাল দেখা যায় না—পর্দার উপর ছায়া পড়িয়াছে—মাথার খোঁপা, অস্পষ্ট একখানি অবয়ব, লীলায়িত দুটি হাত, হাতের আঙুল—কিন্তু·········গোপেনের মনে হইল, পর্দাটা সরাইয়া দিলেই ত' হয়!

পর্দা সরে না—গানও চলিতে থাকে।

—'তোমারই অশ্রুজলে শিউলি-তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙ্গে দাও দ্বার যদি রোধি।'

গোপেন নিস্তব্ধ প্রস্তর-মূর্তির মত কিয়ৎক্ষণ বিছানার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইল, জানালার কাছে আগাইয়া গেল, গরাদের উপর মাথা ঠেকাইয়া তাহার দর্শনপ্রার্থী দুটি চক্ষুর একাগ্র উন্মুখ দৃষ্টিটিকে যথাসাধ্য প্রসারিত করিয়া দিয়া দেখিল,—সেই অস্পষ্ট অন্ধকার অবয়ব ছাড়া পর্দার আড়ালে ভাল করিয়া কিছুই আর দেখা যায় না। ভাবিল, খুব খানিকটা সাড়াশব্দ করিয়া এই অন্তরালবর্তিনীকে একবার সচকিত করিয়া দেয়, কিন্তু গোপেনের পক্ষে তাহাও সম্ভব হইল না। ধীরে ধীরে গান বন্ধ হইল। না হইলেই যেন ভাল হইত। গানের কথা ও সুর তখন তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ভাবিল—আবার গাহিবে। আশায় আশায় কতক্ষণ যে তাহার তেমনি করিয়া কাটিল কে জানে, হঠাৎ তাহার চোখের সুমুখ হইতে দেখিল, পর্দার আড়ালে আলো কোন সময়ে নিভিয়া গেছে, সে লীলায়িত বাহু নাই, সে অস্পষ্ট অবয়ব নাই,—সাদা কাপড়ের পর্দাখানি মাত্র অন্ধকারের মাঝখানে নিষ্ঠুর নির্মম পাষাণ-প্রাচীরের মত মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গোপেনের ঘরে-বাহিরে সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র মনে হয় যেন তাহার চোখের সুমুখে একখানি পর্দা টাঙানো রহিয়াছে এবং সেই পর্দার পশ্চাতে পৃথিবীর যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তু তাহার কাছে একেবারে অন্ধকার রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। ওই পর্দাটাকে দু'হাত দিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া দেওয়া যায় না?

প্রায়ই দেখা যায়—গোপেন প্রহরের পর প্রহর ধরিয়া বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, কোনো কাজ নাই, উদ্‌ভ্রান্ত উদাস দৃষ্টি তাহার সেই পর্দার উপর নিবদ্ধ; শান্তা হয় ত' কখন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই, শান্তার প্রশ্নে হঠাৎ সচকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়—

'ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে তোমার?'

—কি আবার হবে।

—চব্বিশ ঘণ্টাই ত' দেখি ওইখানে।

—বারে!

—না ত' কি?

—বেশ করি। বেরো তুই এ ঘর থেকে!

শান্তা বলিল—বটে, আমার বেরো বলা, বেশ চল্লুম—বলিয়া কৃত্রিম রাগের ভাণ করিয়া শান্তা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এমনি করিয়া দুইটি ভাই বোনের ঝগড়া-ঝাঁটি দিবারাত্রি চলিতেই থাকে। পূর্ব্বে ঝগড়া হইত অন্য ব্যাপার লইয়া; আজকাল তাহারা যা হোক একটা ছুতা পাইয়াছে।

রাত্রে আহারাদির পর গোপেন তাহার ঘরে আসিয়া বসে। ভাবে হয়ত সেই সুমধুর গীত-ধ্বনি আবার কোন অতর্কিত মুহূর্ত্তে তাহার কানে আসিয়া বাজিবে কিন্তু কোথাও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। পল্লী প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া আসে। দূরে বড় রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার শব্দ আর শোনা যায় না। ঘড়ি খুলিয়া দেখে একটা বাজিয়াছে। নিরাশ হইয়া গোপেন একটা চিঠির কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিতে বসে। কাহাকে লেখে, সে কেমন, কোথায় থাকে কিছুই সে জানে না, তবু লিখিয়া চলে—তোমার জন্য জাগিয়া রাত্রি কাটাই, তোমার আশায় আশায় বসিয়া থাকি। কবে তোমায় দেখিব জানি না! এই পর্য্যন্ত লিখিয়া গোপেন আপন মনেই অতি মৃদু-

কণ্ঠে একটি গান গাহিতে গাহিতে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়ে।

—এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি।

গোপেন সেদিন হঠাৎ শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—হাঁরে! কাল তোর না গলার পাচ্ছিলাম ওদের বাড়ী?

শান্তা মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—কথা ক'য়ো না তুমি আমার সঙ্গে। সেদিন তুমি আমায় বেরো বলেছ।

গোপেনের আগ্রহ যেন আরো বাড়িয়া যায়। শান্তার পিছু পিছু ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার খোসামুদি করিতে থাকে। বল্ না ভাইটি, বেরো আমি আর তোকে কক্ষনো বলব না।

শান্তা বলে—না দাদা, না, তুমি কি পাগল হয়েছ? জানা নেই শোনা নেই, আমি ওদের বাড়ী যাব কেন বলত?

ঠিক সেই সময় মা সেইখান দিয়া পার হইতেছিলেন, গোপেন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম, ও অন্য কেউ হবে। শান্তা দুষ্টামি করিয়া হাসিয়া চুপি চুপি বলিল—বলে দেব মাকে? গোপেন তখন পলায়ন করিয়াছে।

দিন দুই তিন পরে গোপেন সেদিন বাড়ী আসিয়াই দেখে শান্তার সহপাঠী কোন এক বন্ধু তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে এবং দুই বন্ধুতে তাহারই ঘরখানি দখল করিয়া বসিয়াছে। গোপেন দরজায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইতেই শান্তা দরজার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিল—দাদা তুমি অন্য ঘরে বসো ত' ভাই, একটুখানি। ও এক্ষুনি চ'লে যাবে।

—বেশ ত', বেশ ত' বোস্ তোরা—কথাবার্ত্তা বল্। বলিয়া গোপেন একবার এই অপরিচিতা মেয়েটিকে দেখিয়া লইয়া অন্য ঘরে গিয়া বসিল। কিন্তু মন মানে না। গোপেন পুনরায় দরজার কাছে আসিয়া বলিল—শান্তা শোন্!

—কি?

—টেবিলের ওপর থেকে আমার ওই বইখানা দে ত'!

—কি বই? বই ত' অনেকগুলো রয়েছে।

কিন্তু কি বই চাহিবার জন্য গোপেন আসিয়াছে তাহা সে নিজেই জানে না। এদিক ওদিক তাকাইয়া একটুখানি ইতস্তত করিয়া বলিল—ওই যে—ওই বইখানা!

—এইটে?

—না ঐটে—!

—এইটে—

—না, না, ওইটে!

বইখানি শান্তা গোপেনের হাতে দিতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে চলিয়া যাইতে হইল।

শুইয়া শুইয়া গোপেন সেই কথাই ভাবিতেছিল—কিন্তু ভাবনার সূত্রটি সে কোথায় যে হারাইয়া ফেলিল যখন ঐ ঘর হইতে সেদিনকার মতই হারমনিয়মের সুর বাজিয়া উঠিল।

উঠিয়া বসিয়া খানিকটা কি যেন ভাবিয়া গোপেন অজ্ঞ-পদে শান্তার ঘরের দিকে পা বাড়াইল।

হঠাৎ গোপেনকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই মেয়ের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে খাদে নামিয়া আসিল—সঙ্গে সঙ্গে শান্তা বলিয়া উঠিল—কি চাও তুমি এ ঘরে? যাও এখান থেকে!

শান্তার এই অভদ্র প্রশ্নে মনে মনে গোপেন বোধকরি বেশ একটু কুপিতই হইল। কিন্তু সেখানে তাহা মুখে প্রকাশ করিবার শক্তি তাহার কোথায়? বলিল—না, না, পেয়ালা, চা—চার পেয়ালা চাই!

—এখন পেয়ালা নিয়ে কি করবে! চা হোক্ আগে—

—তোদের দেরী আছে, আমি নিজেই ষ্টোভ্ জালিয়ে তৈরী করব। বলিয়া তাক্ হইতে চার পেয়ালা টানিয়া লইতেই গোপেনের হাত হইতে চিনের পেয়ালা মেঝের উপর পড়িয়া ভাঙিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

শান্তা মুখেচোখে এক ভঙ্গি করিয়া উঠিল—ভাঙ্‌লে ত? পারলে ভাঙতে! কোন কাজ যদি করতে পারে!—

এই বিপ্লবে গান কখন থামিয়া গেছে। হারমনিয়ম কোলে করিয়া মেয়ে ছিল পিছন ফিরিয়া বসিয়া।

বসিবারও সে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গি। পা দু'টা ভক্তপোষের বাহিরে ছড়াইয়া আছে। ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি পিঠের পৃষ্ঠদেশ ছাপাইয়া তক্তপোষের উপরও আসিয়া পড়িয়াছে। মাথার

মাথে ঘাড় বাঁকাইয়া সে তখন গোপেনের বিমূঢ় অবস্থা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

গোপেন পেয়ালার ভাঙ্গা টুকরাগুলি কুড়াইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কিন্তু এত কাজের মধ্যেও দৃষ্টি তাহার ঘুরিয়া ফিরিয়া তক্তপোষের উপর যাইয়া পড়িতে লাগিল। বেনুর চোখে চোখ পড়িবামাত্র গোপেন যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ অনুভব করিল।

শান্তা বলিল—ওঠো, ওঠো, খুব হয়েছে; যাও তুমি এখন ঘর থেকে।

—এই যাই, হ'ল বলে।

—না তুমি ওঠো, আমিই কুড়োব এখন।

—হয়ে গেছে—বলিয়া অধিকতর ব্যস্ততার সহিত গোপেন কুড়াইতে কুড়াইতে ভাঙ্গা এক টুকরা তাহার আঙুলের মধ্যে বিঁধিয়া গিয়া একচির রক্ত পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শান্তা বলিল—তুমি কি! শেষে আঙুলও কাটলে? কোন কাজে যদি হাত দাও, একটা না একটা অঘটন ঘটাবেই।

কিন্তু বেনুর বোধকরি অনুকম্পা হইল। বলিল—যা না ভাই, ন্যাকড়া বেঁধে জলপটি দিয়ে আয়—

এতক্ষণে গোপেন যেন তাহার মুখের পানে চাহিবার অবসর পাইল।

চায়ের তৃষ্ণা তখন তাহার মিটিয়া গেছে।

গোপেন সেদিন বৈকালে তাহার প্রতিদিনের অভ্যাস মত জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; দেখিল, ওবাড়ীর জানালার পর্দ্দা একটু ফাঁক, এবং তাহারই পশ্চাতে একখানি মুখ তাহাকে দেখিবামাত্র আকাশের গায়ে বিদ্যুতের মত চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার পর বহুক্ষণ সেইদিক পানে তাকাইয়া থাকিয়াও সে মুখ আর দেখিতে পাইল না। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলে যদি আসে ভাবিয়া বন্ধ করিয়া তাহার ফুটা দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু তথাপি সেই ফাঁক তেমনি ফাঁকই রহিল, সেটা বন্ধ করিবার জন্যও কাহারও একখানি গোপন হস্ত আড়াল হইতে প্রসারিত হইল না।

গোপেনের কল্পনা এবার আর শূন্য বায়ুস্তর অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া বেড়ায় না, এবার সে যেন আশ্রয় পাইয়াছে। গোপেন আশা করে আবার হয়ত সে তেমনি করিয়াই আসিয়া দাঁড়াইবে। আবার হয়ত তাহাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া পালাইবে। কিন্তু বৃথা আশা, একটি দিনের জন্যও চঞ্চল বিদ্যুৎ-লেখার মত তেমনি করিয়া সে মূর্ত্তিখানি তাহাকে দেখিয়া লজ্জায় সরিয়াও যায় না, আসিয়াও দাঁড়ায় না।

শান্তার বন্ধুটি আবার সেদিন আসিয়াছিল। বড় মিষ্টি মুখ। একবার দেখিলে মুখখানি অনেকদিন মনে থাকে।

শান্তার হারমনিয়ম লইয়া সেদিন সে গান গাহিতেছিল। কতকটা যেন সেদিনের সে পাশের বাড়ী হইতে রাত্রে-শোনা কণ্ঠস্বরের মতই বোধ হইল। কিন্তু সে যেন আরো মিষ্ট।

শান্তা বলে—তুমি যেন কেমন দাদা, বেনু বলছিল কেন তুমি ওর মুখের পানে অমন করে তাকাও বলত'? গোপেন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। বলিল—কক্ষনো না, তোর মিছে কথা।

—মিছে নয় দাদা, অমন করলে আর বেনু আসবেনা বলেছে।

কিন্তু বেনু আবার আসে। এবার যে গানখানি গায়, সে গান গোপেনের আগেই শোনা। সেই সুর, সেই গান, সেই কণ্ঠস্বর—এ যেন সেই।

গোপেন কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারে না। ভাবে মেয়েটিকে সে নিজে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু লজ্জায় তাহা আর হইয়া উঠে না। শান্তাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে—তবে যে এতদিন বলিসনি হতভাগী?—ওত এই পাশের বাড়ীতেই থাকে।

—না, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

গোপেন ভাবে—দুই নারীর এক কণ্ঠস্বর হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

আসন্ন সন্ধ্যা। পথে আলো জ্বলিয়াছে। গোপেন কিন্তু তাহার ঘরের আলো তখনো জ্বালায় নাই। চেয়ারে বসিয়া জানালার দিকে পিছন ফিরিয়া কি জানি ভাবিতেছিল, হঠাৎ মুখ ফিরিয়া তাকাইতেই ওবাড়ীর জানালায় যে বস্তু তাহার নজরে পড়িল তাহা যেমন অভাবনীয় তেমনি বিস্ময়কর। দেখিল জানালার পর্দা খানিকটা সরানো হইয়াছে আর সেই শূন্য স্থান অধিকার করিয়া যে মুখখানি অপলক দৃষ্টিতে তাহারই জানালার পানে তাকাইয়া আছে, সে মুখ বেনুর। ইচ্ছা করিল শান্তাকে সে এখনই ডাকিয়া কানে ধরিয়া দেখায়, মিথ্যাকথা বলার জন্য তাহাকে শাস্তি দেয়, কিন্তু মেয়েটি তখনো দাঁড়াইয়াছিল; গোপেন অন্ধকার জানালার পাশ হইতে নড়িতে পারিল না।

মেয়েটি যখন চলিয়া গেল, গোপেন তাহার ঘরে আলো জ্বালিয়া ডাকিল—শান্তা!

শান্তা তাড়াতাড়ি অন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—কোথায় ছিলে দাদা? চা নিয়ে এসে যে ফিরে গেলুম। অন্ধকারে ঘাপ্‌টি মেরে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলে বুঝি?

গোপেন চুপ করিয়া রহিল।

ভাবিয়াছিল, আজিকার আবিষ্কার শান্তার কাছে প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাকে একটুখানি অপ্রস্তুত করিবে কিন্তু তাহা না করিয়া বরং সে ব্যাপারটা চাপিয়া গেল।

পরদিন রাত্রে রান্নাঘরে বসিয়া মা ও মেয়ে কথা বলিতেছিল। তাহারি খানিকটা টুকরা গোপেনের কানে গেল। শান্তা বলিল—কাল ওর বাবা আসবেন বাবার কাছে। বাবা শেষে সব ভণ্ডল ক'রে দেবেন না ত', হ্যাঁ মা?

মা বলিলেন—না, আমি বলেছি তাঁকে।

শান্তা একটুখানি থামিয়া বলিল—বেশ হবে মা; না?

—হ্যাঁ বাছা, ছেলের মত নিয়েই মত। গোপেনের যখন ভাল লেগেছে, তখন আর—

কথাটা বাধা দিয়া শান্তা বলিয়া উঠিল—ওঃ ভাল লাগা বলে লাগা। বলিয়া যে কথাটা সে তাহার মায়ের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল তাহাও গোপেন শুনিতে পাইল। শুনিয়া মুখ কান তাহার রাঙা হইয়া উঠিল। মা হাসিয়া বলিলেন—পাগল! তাই নাকি? জানালার কাছে······ দিন রাত?

হ্যাঁ মা, তুমি দেখো না একদিন লক্ষ্য করে।

গোপেনের হাসিও পাইল; রাগও হইল।

আর কিছু শুনিবার নাই দেখিয়া বিছানার উপর সে পা ছড়াইয়া একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া শুইয়া পড়িল।

বেনুর সঙ্গে বিবাহ—এই কথাটাই তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ ভরিয়া প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং তাহারি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন আনন্দে, হাসিতে, গানে, কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এত আনন্দ জীবনে বুঝি তাহার এই প্রথম। না জানি তাহাকে কাছে পাইলে, এই আনন্দের মাত্রা আরো কতগুণ বেগে উৎসারিত হইয়া তাহার সমস্ত সত্তাটিকে একেবারে বিহ্বল, তন্ময় করিয়া তুলিবে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেদিন আর গোপেনের নিদ্রা হইল না। জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। এতদিন পরে লালায়িত ভিক্ষাবৃত্তির বোধ করি সমাপ্তি ঘটিয়াছে। গোপেনের এমনি মনে হইতে লাগিল—বেনু যেন তাহার নিতান্ত সন্নিকটে, একেবারে বক্ষলগ্ন হইয়া তাহারি মুখের পানে, তাহার সেই টল-টল আয়ত দুইটি চক্ষুর একান্ত, ভীত, সঙ্কুচিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শুইয়া আছে। সুবর্ণ বলয় শোভিত সুনিটোল সুললিত দুটি বাহু তাহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। এ ভুজবন্ধন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে সে চায় না! এ বন্ধন যেন জন্ম-জন্মান্তরের; ইহাকেই যেন সে তাহার সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া এতদিন মনে মনে কামনা করিয়া আসিয়াছে—এমনি একটা অত্যুগ্র সুখের মাদকতায় বিভোর হইয়া গোপেন স্বপ্নের পর স্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিতে লাগিল।

মেয়ের বাবা আসিয়া গোপেনের বাবার সঙ্গে দেখা

করিয়া গেছেন। স্থির হইয়াছে, ছেলে ত' পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে; পরীক্ষায় পাশ যদি হয় ত' বিবাহ এইখানেই দিবেন। শান্তার সঙ্গে বেন্থুর বন্ধুত্ব দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। গরমের ছুটি, ইস্কুল দু'জনেরই বন্ধ। আগের মত বেন্থু এখনও আসে যায়। বিবাহের কথাটা তাহারও শুনিতে বাকি নাই কিন্তু গোপেন একথা কাহাকেও জানিতে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়।

সুখবর এই যে বেন্থুর সঙ্গে তাহারো পরিচয় হইয়া গিয়াছে। কথা বলিতে কাহারও বাধে না; তবে বেন্থু যেন অত্যন্ত লাজুক মেয়ে। বেন্থু প্রথমে কথা বলিতে চায় নাই কিন্তু গোপেন নিজেই সে লজ্জা তাহার ভাঙাইয়া দিয়াছে।

শান্তা সেদিন মায় সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। বেন্থু আসিয়া হঠাৎ তাহার ঘরে ঢুকিয়া শান্তাকে দেখিতে না পাইয়া চলিয়া যাইতেছিল। গোপেন তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কে, বেন্থু, এসো। আসছে শান্তা।

মুখ তুলিয়া সলজ্জ দুইটি চোখের দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বেন্থু জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় গেছে সে?

গোপেন মিথ্যা বলিল। বলিল—যায়নি কোথাও, আসছে। বলিয়াই হঠাৎ যে কাণ্ডটা সে করিয়া বসিল তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অভাবনীয়। খপ্ করিয়া হাতটা তাহার ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—আমায় অত লজ্জা কেন কর বল ত'? শুনেছ ত'—দুদিন বাদেই……

বেন্থু লজ্জায় যেন মরিয়া গেল।

হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া গোপেনের মুখের পানে তাকাইয়া কিছু করিয়া একটু হাসিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল। গোপেন ছাড়িল না, আবার তাহাকে টানিয়া বসাইল। বেন্থু বসিয়া হেঁট মুখে কি যে করিবে কি যে বলিবে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু গোপেন তখন নিজে হইতে আগাইয়া গিয়া তাহার একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়া এমন সব অসংলগ্ন কথা বলিতেছে যাহা শুনিয়া মানুষের হাসি পাইবারই কথা, কিন্তু বেন্থু হাসিল না। বরং না হাসিয়া দু'একটি কথার জবাব দিতেই চেষ্টা করিতে লাগিল।—আসবে ত' রোজ?

বেন্থু ঘাড় নাড়িয়া নীরবে তাহার সম্মতি জানাইল।—এসো যেন লক্ষ্মীটি, তোমায় আমার খুব ভাল লাগে! তোমার লাগে ত'?

গাল দু'টা বেন্থুর সহসা লাল হইয়া উঠিল। জবাব না দিয়া সে চুপ করিয়াই ছিল। গোপেন ছাড়িল না। —বল তোমার বলতেই হবে।

অনেক কষ্টে অনেক পীড়াপীড়ির পর গোপেন তাহার হাত দুইটি ধরিয়া কাছে বসিয়া অনুরোধ করায় বেন্থু ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া বলিল—লাগে!

এমনি করিয়া আলাপ চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন।

দুপুরে শান্তা যায় ইস্কুলে। বিবাহের কথা হইবার পর হইতে বেন্থু ইস্কুল ছাড়িয়াছে। গোপেনের মা থাকেন পাশের ঘরে ঘুমাইয়া। পিতার ত' পাত্তা মেলাই ভার। সুতরাং বাড়ী একরকম ধরিতে গেলে ফাঁকা।

বেন্থু তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে। গোপনে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। বেন্থু যে কখন আসিয়া ঘরে ঢোকে তাহা সে জানিতেই পারে না। আসিয়াই বলে —এই বইখানা ভাল লাগল না, আর একখানা বই দিন্।

বই দেবার কথা গোপেনের মনে থাকে না, দরজা বন্ধ করিয়া তাহাকে পাশে টানিয়া আনিয়া বসায়। তাহার পর তাহাদের বিশ্রম্ভালাপ চলিতে থাকে।

বেন্থু সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—এমন চুরি করে আসা কি ভাল?

গোপেন হাসিয়া বলিয়াছিল—তাতে দোষ কি? বলিয়া সে বিবাহের পূর্ব্বে পরিচয়ের সুবিধা মেলামেশার প্রয়োজন ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি উন্নত জাতির দৃষ্টান্ত তাহাদের সুখ-সৌভাগ্য এমনি সব অনেক কিছু বুঝাইয়া বেন্থুকে একটি নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা শুনাইয়াছিল। বেন্থুও লেখাপড়া জানা মেয়ে, বুঝিতে তাহার দেরী হয় নাই। কিন্তু প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল—যদি কেউ দেখে ত' কি বলব?

—বলবে বই আনতে গিয়েছিলাম শান্তার কাছে।

—শান্তা যে স্কুলে যায়।

—বলবে ভেবেছিলাম আজ ছুটি। তারপর আমি আছি; আমি সব ঠিক ক'রে দেব।

পরিচয় ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। বেণু আর গোপেনকে লজ্জা করে না। গোপেনের ত' কথাই নাই। পরীক্ষার ফলাফলের খবর বাহির হইতে আর দেরী নাই। দিন পনরর মধ্যেই যাহা হউক একটা কিছু স্থির হইয়া যাইবে। এ ক'দিন গোপেন যেন বেণুকে খুব বেশী করিয়া ধরিয়া বসিয়াছে।

সেদিন কি হইল কে জানে?

কথায় কথায় ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ত বা হইতেও পারে। বেণু সেদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বাড়ী ফিরিল। পরদিন হইতে আর তাহার দেখা নাই।

গোপেন জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁরে শান্তা! বন্ধু তোর যে আর আসে না?

শান্তা বলে—কি করে জানবো বল? দেখবার জন্তে পাগল হলে নাকি?

বলিয়াই সে দুষ্টু হাসি হাসিয়া সেখান হইতে পালায়।

গোপেন মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে। ভাবে বোধ করি বেণুর কথাই; কিন্তু কি ভাবে সেই জানে।

দিন দশেক পর পরীক্ষার ফল বাহির হইল। গোপেনের দুর্ভাগ্য সে ফেল করিয়াছে। মা কত তিরস্কার করিলেন; পিতা বলিলেন—হতভাগার পড়াশোনায় মন নাই, কলকাতায় কিছু হবে না দেখ্‌ছি।

স্থির হইল কৃষ্ণনগরে তাহার পিতার এক বন্ধুর বাসায় থাকিয়া গোপেন আর এক বৎসর পড়িবে। মা বলিলেন—হ্যাঁ গা, তা হ'লে বিয়ের কি হবে? ওদের যে কথা দিয়েছি!

পিতা রাগিয়া উঠিলেন—বিয়ে বিয়ে ক'রেই ছেলের মাথাটি তুমি খেলে। হবে, ওইখানেই হবে। আর একটা বৎসর থাক্‌ না!

শেষে শান্তার কথায় বাপের মত ফিরিল। শান্তা কাঁদিয়া কাটিয়া ধরিয়া বসিয়াছিল—না বাবা, বিয়ে হ'য়ে যাক্‌ আগে তারপর পড়তে যাবে। ওদের বাড়ীতে সব কান্না-কাটি

সুতরাং স্থির হইল বিবাহ শেষ করিয়াই গোপেন কলেজে গিয়া ভর্তি হইবে।

কিন্তু এমনি মজা—যাহার আগ্রহ সব চেয়ে বেশী হইবার কথা সেই শেষে অন্য পথ ধরিল। গোপেন বলিল—বিবাহ করিব না। বিবাহ করিতে হয়ত অন্য মেয়ে, ও নয়।

শান্তা ত শুনিয়া অবাক্। মাও কম বিস্মিত হইলেন না, ভাবিলেন—পরীক্ষায় ফেল্ করিয়া ছে'লের হয়ত লজ্জা হইয়াছে; পাশ করিয়া আসিয়া বিবাহ করিবে।

দরজায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গোপেনের জিনিষ-পত্র বাক্স-বিছানা গাড়ীর উপর বোঝাই করা হইয়াছে।

বেলা তখনো দশটা বাজে নাই। স্পষ্ট ঝক্‌ঝকে দিবালোক। কিন্তু আকাশটা কেমন যেন মেঘ্‌লা করিয়াছিল। গাড়ীতে উঠিতে গিয়া জানালাটার দিকে তাকাইতেই দেখে বেণু পরদা সরাইয়া বোধ করি তাহাকেই দেখিতেছে। গোপেনের চোখের উপর তাহার চোখ পড়িতেই [illegible] লজ্জায় পর্দাটা সে তৎক্ষণাৎ হাত দিয়া টানিয়া সরাইয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

গোপেন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কলিকাতার কোলাহল-মুখরিত পথের উপর দিয়া ঘোড়ার গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু [illegible] কোলাহল ছাপাইয়া এই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ জীবন্ত ধরিত্রীর [illegible] মধ্যেও মন তাহার একটি দিনের একটি [illegible] মুহূর্তের কথা স্মরণ করিয়া ক্রমাগতই পীড়িত হইতে লাগিল। কখন যে সে গাড়ী হইতে নামিয়াছে, গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া, গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া ট্রেণের কামরায় উঠিয়া বসিয়াছে কিছুই তাহার মনে নাই। সহসা [illegible] তন্বী তরুণী বধূ সমভিব্যাহারে এক যুবক তাহার কামরায় উঠিয়া বসিতেই তাহার চেতনা ফিরিল। কি পবিত্র, কি সুন্দর সম্বন্ধ ইহাদের। তখন

সে এই বলিয়া নিজের দুর্ব্বোধ্য মনকে বারে বারে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে বেনু অসুন্দর, বেনু অপবিত্র, বেণু দুর্ব্বল···আমারো পূর্ব্বে সে যে আর কাহারো কাছে এম্‌নি করিয়াই ধরা দেয় নাই তাই বা কে জানে!

হঠাৎ এই নবাগত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনুচ্চকণ্ঠে বচসা বাধিল।

—বা টিকিট ত' তোমারই হাতে দিলাম।

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উহুঁ-তোমারই কাছে।

—না—তোমার কাছে।

—না—তোমার কাছে।

—তা হ'লে বোধ হয় তুমি কোথায় ফেলে এসেছো।

মেয়েটি প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না—না—না।

'ও মশাই, বিপিন বাবু, বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্য স্ত্রীষু···' বলিয়া গোপেন সহসা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

যুবকটি ও গোপেন পরস্পর পরিচিত, কিন্তু তাড়াতাড়িতে যুবকটি এ পর্য্যন্ত গোপেনকে দেখিতে পায় নাই। গোপেনের কথায় গোপেনকে চাহিয়া দেখিয়া সে ঈষৎ হাস্য করিল; তাহার পর বলিল, "কোথায় চলেছেন গোপেন বাবু?"

গোপেন সহাস্যমুখে বলিল, "কৃষ্ণনগর। কিন্তু বলুন আমি ঠিক বলেছি কিনা,—বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্য—?" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তিনীর অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে যে দুইটি চক্ষুর তীব্র তীক্ষ্ণ কটাক্ষ তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহসা দেখিয়া গোপেনের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। মনে হইল ওই দুইটি চক্ষের দৃষ্টিতে যেন সমগ্র নারীজাতির ঘৃণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেনুর প্রতি সে যে অপরাধ করিয়া আসিয়াছে এ যেন তাহারও ভৎর্সনা! লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া কষাহত কুকুরের মত গোপেন তৎক্ষণাৎ সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বাহিরে জানালার দিকে তাকাইল।

গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

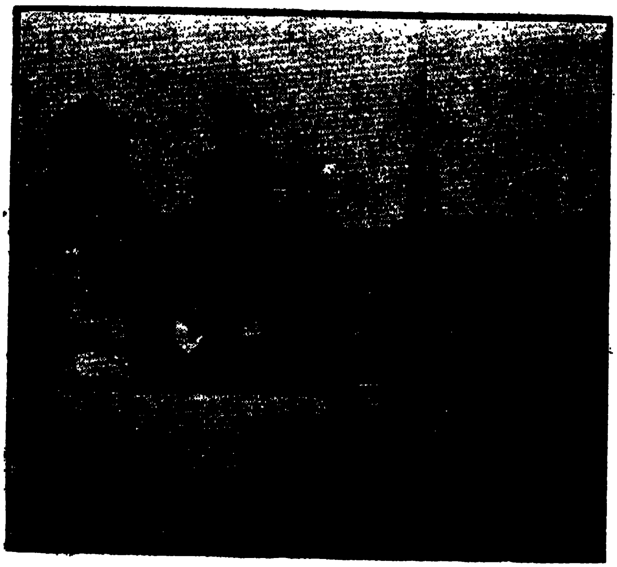
শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



পিরামিডের দেশ

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর

পিরামিডের দেশ বল্‌তে সেই দেশকেই আমরা বুঝি এখন ইংরাজীতে যে-দেশকে বলে ইজিপ্ট, বাংলায় তারই নাম মিশর। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম সভ্যতার আলো যে ক'টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে মিশর তাদের মধ্যে অন্যতম। সভ্যতার আলো এদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল যীশুখৃষ্ট জন্মাবার দশ হাজার বছর আগে।



কায়রো সহরের বাহিরে মহিলারা উটের পাল্কীতে ভ্রমণে বাহির হয়েছেন। সহরের বাহিরে মহিলারা তত পর্দানশীন নন সহরের ভিতরে এরা যতটা পর্দানশীন থাকেন। দূরে অতীতের কোন শাসন-কর্ত্তার সমাধি-সৌধ।

শীতের দিনে নীল নদের উপর দিয়ে যাবার সময় চোখে পড়ে দুপাশে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র। নীল নদের ছোট ছোট খালগুলো এঁকে বেঁকে শস্যক্ষেত্রের পাশ দিয়ে চলে গেছে, রৌদ্রে তার জল ঝলমল করে উঠে আর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সেই খালগুলোর ধারে রঙিন জামা প'রে ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে বেড়ায় প্রজাপতির মত। দূরে কলে তন্দ্রা খেজুর-গাছগুলোর পাশে বড় বড় বালির ঢিবিগুলো রিক্তের মত আশপাশের শ্যামল ক্ষেতের পানে চেয়ে থাকে। এদেশের প্রধান কাজ হচ্ছে চাষ আবাদ আর এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হচ্ছে তুলা; গম, বার্লি, খেজুর ও আখ এখানে ফলে প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু শুধু তুলার চাষই মিশরকে প্রচুর অর্থশালী করে তুলেছে।

সমস্ত মিশরে চাষ আবাদ করবার উপযোগী জমি আছে মোট তের হাজার বর্গমাইল। এদেশে ক্ষেতে এক একটা করে জল যেতে দেবার দরজা—যাতে এক ক্ষেতের জল আরেক ক্ষেতে যেতে পারে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। গ্রীষ্মের শেষে নীল নদ যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে আশপাশের ক্ষেতগুলিকে ডুবিয়ে দেয় তখন এই দরজা খুলে দেওয়া হয় সেই জল যাতে অন্য ক্ষেতে চলে যেতে পারে এই জন্যে। এই বন্যার পর মিশর যে রূপ ধারণ করে মিশরীরা তাকে বলে—'এল খেমি' বা কাল মাটির দেশ। তারপর সেই জমীতে বীজ বপন করা হয়। এদেশের জমীতে ফসল হয় এত শীঘ্র যে পনের মাসের মধ্যে একই ক্ষেতে সাতবার ফসল হওয়া এখানে কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। প্রধানতঃ এদেশে বছরে তিনবার আবাদ করা হয়, প্রথমবারের ফসল পাওয়া যায় নীল নদের বন্যার পর পৌষ মাঘ মাসে, দ্বিতীয়বারের ফসল পাওয়া যায় গ্রীষ্মের প্রথমে, এবং নীল নদের বন্যা আসবার ঠিক আগেই বর্ষার প্রথমে হয় তৃতীয়বারের ফসল।

মিশর যে কৃষি-প্রধান দেশ তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীনকালের 'ক্যারাও' বংশীয় নরপতিগণের শাসনকালীন পঞ্জিকাতে। প্রাচীন পঞ্জিকায় বছরকে তিন ভাগে ভাগ করা

হয়েছে—নীল নদের বন্যা, বীজবপনকাল ও শস্য কাটবার কাল।

কৃষিপ্রধান দেশ হলেও কৃষিকর্ম্মে উন্নতি করতে পারেনি এরা আজও। গ্রীষ্মকালে এরা যত পরিশ্রম ক'রে ক্ষেতে জলসেচন করে, তা অন্য দেশে বড় একটা দৃষ্ট হয় না, এই বিংশ শতাব্দীর কল-কারখানার যুগে।

এদেশে গ্রামগুলো সাধারণতঃ উঁচু জমীর উপর। বন্যার জল আশপাশের ক্ষেতগুলোকে জলমগ্ন করে দিলেও যাতে গ্রামগুলোকে ডুবিয়ে দিতে না পারে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে তুর্কীরা যখন এদেশ জয় করে তখন তারা নীল নদের দু'পাশে বাঁধ তৈরী করিয়েছিল



ফিলিদ্বীপে "আইসিস্" দেবতার মন্দির। বর্ষাস্ফীত জল-তরঙ্গের মধ্যে মন্দিরের নিম্নভাগ ডুবে গেছে।

বন্যা বন্ধ করবার জন্য, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয় নি, সময় সময় নীল নদের জল বাঁধের চেয়ে কয়েক ফিট উঁচু হয়ে বাঁধ ভাসিয়ে দিয়েছে। কয়েক বছর আগে এম্নি একটি বন্যায় ন্যূনপক্ষে পাঁচ হাজার লোককে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

বন্যার পর নীল নদের তীরে এদেশের চাষীরা তরমুজের বীজ বপন করে—তরমুজও এখানে ফলে প্রচুর পরিমাণে। এই তরমুজ সম্বন্ধে এদের একটা কুসংস্কার আছে। গৃহ হতে পিপীলিকা তাড়াবার জন্য এরা যে তরমুজটি সর্ব্বপ্রথম কিনে আনে, সেটিকে কয়েকটুকরো করে তার একটি টুকরো ঘরের কোণে ঝুলিয়ে রাখে। এদের বিশ্বাস এমনি করলে সে গৃহে পিপীলিকা আর প্রবেশ করতে পারবে না, অবশ্য কার্য্যতঃ কতখানি তা ঘটে তা বলাই বাহুল্য।

এদেশের চাষীরা ফসলের জন্য পরিশ্রম করে অসাধারণ, তবে গ্রীষ্মের দুপুরে প্রধানতঃ নিদ্রা দিয়াই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তা বলে এরা অলস নয়। মরুর পাশেই এদের থাকতে হয়, কাজেই দুপুরের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে অল্প কাজ করে পরিশ্রান্ত হওয়া অপেক্ষা স্নিগ্ধ চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রিতে কাজ করাই এরা বেশী পছন্দ করে।

এদেশে সহরের বাহিরে প্রশস্ত পাকা রাস্তা একেবারে নেই বললেই হয়। এক গ্রাম হতে অপর গ্রামে যাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে নদীর তীর কিম্বা খালের ধার ধরে যাওয়া। অধুনা রেলপথ হওয়ায় পথের অসুবিধা অনেকাংশে দূর হয়েছে।

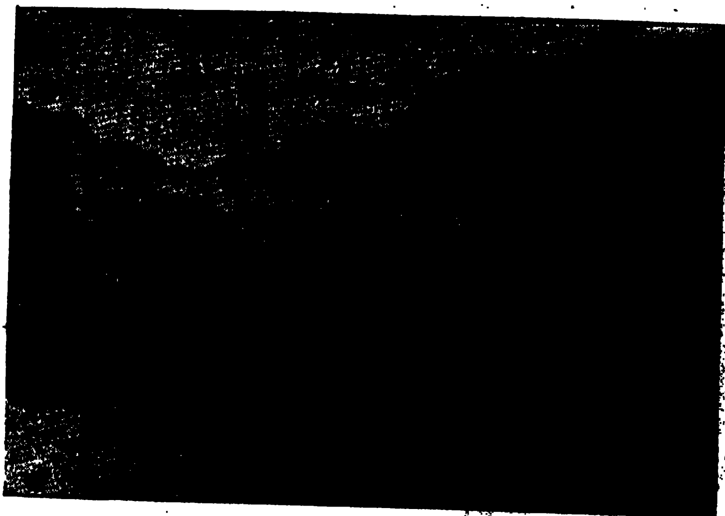
মিশরের পথে ঘাটে এক-ঘোড়ার গাড়ীই খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়, পদস্থ ব্যক্তিরা দু-ঘোড়ার গাড়ীও চড়েন, কিন্তু সহরের বাহিরে ঘোড়ার গাড়ী দেখতে পাওয়া যায় না একেবারেই; গ্রামের পথে স্বচ্ছন্দভাবে গাড়ী চালানোর অসুবিধার জন্যই হয়তো। গ্রাম্য ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ গাধা কিম্বা খচ্চরে চড়ে—উটের পিঠেও চড়ে সময় সময়। উট সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় ভারবহনের জন্য। সময় সময় চাষের জন্যও উট ব্যবহার করা হয়। বার কয়েক ক্রমান্বয়ে মহামারী হয়ে গরু এদেশ থেকে প্রায় লোপ পেতে বসেছে, কাজেই চাষ আবাদের কাজ মহিষ দিয়েই করা হয় প্রধানতঃ, আর মহিষ এদেশে পাওয়াও যায় অসংখ্য।

আলু মিশরে প্রায় জন্মায় না বলিলেই হয়, এজন্য এখানে আলুর মূল্য অত্যন্ত বেশী, সেই কারণে যে কোন চাষা

সুযোগ পেলেই আলুর আবাদ করে। গমের চেয়ে আলুতে লাভও হয় বেশী।

এদেশে যে-সব জায়গায় আবাদ করা হয় না সেখানে একজাতীয় রক্তাভ ঘাস জন্মায়। শুষ্ক খাল বিলে নল খাগড়াই জন্মায় বেশী। এক একটি নলখাগড়া প্রায় দশবার ফিট উঁচু হয়। বর্ষাকালে এই সব খাল বিলে পদ্ম ফোটে নানা রঙের, তার মধ্যে শ্বেত পদ্মই ফোটে প্রচুর পরিমাণে।

এদেশে দুটি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে—মোসলেম ও খৃষ্ট ধর্ম্ম।



এদেশে গ্রীষ্মকালে দুপুরে প্রচণ্ড উত্তাপের জন্য ক্ষেতে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। সেই অবসর সময়ে মহিষেরা নীল নদে নেবে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে। এ দেশে প্রায় আবাদের কাজ হয় মহিষ দিয়ে, কেননা কয়েক বছর উপর্য্যুপরি মহামারী হওয়ায় গরু প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের এদেশে "কোপ্ট" বলা হয়। প্রধানতঃ মিশরীদের আচার ব্যবহারে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই, তা সে "কোপ্ট"ই হোক বা মুসলমানই হোক। সপ্তম শতাব্দীতে আরবেরা যখন এদেশটি জয় করে তখন এই দুই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে একটা বিরোধ বেধে যায়। তারই ফলে তিন চারশো বছর ধরে এদের মধ্যে একটা বিজেতার আধিপত্য লাভ করেছিল। আজকাল "কোপ্ট" ও মোসলেম ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাব আছে যথেষ্ট।

বহুদিন বিজেতা মুসলমানগণের অধীনে থেকে কোপ্টরা নিজেদের বৈশিষ্ট্যটুকু হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃত পক্ষে কোপ্ট ও মুসলমানগণের মধ্যে জাতিগত কোন তফাৎ নেই, কেননা তারা একই জাতির বংশধর। তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কিন্তু বিজিত মুসলমান শাসকগণের পীড়ন হতে নিজেদের আত্মরক্ষা করবার জন্য পরে অনেকেই মোসলেম ধর্ম্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মোসলেম ধর্ম্মাবলম্বীরা নিজেদের আরব বলেই পরিচয় দেয় কিন্তু প্রকৃত আরবের রক্ত তাদের একজনের দেহেও নাই।

মিশর দেশে উৎসব হয় নানা উপলক্ষ্যে, তার মধ্যে জন্ম, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এদেশে ছেলে জন্মাবার সাতদিন পরে একটি উৎসবের আয়োজন হয়। সেদিন রাত্রে বহু নিমন্ত্রিত নারী সমাগত হন এবং বাড়ীর সকল স্ত্রী-পুরুষ সেইসব অভ্যাগতদের সহিত একটি ঘরে জড় হয়। সপুত্র প্রসূতিও থাকে তাদের মধ্যে। একটি ছোট্টো পাত্রকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে তার চারিপাশে তারা বসে। একটি পাত্রকে নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে সেই পাত্রটির মধ্যে রাখা হয়—এই পাত্রটিকে মিশরীরা বলে "গুল্লা"। গুল্লাটিকে সিল্কের কাপড়ে আবৃত ক'রে কণ্ঠহার, স্বর্ণাভরণ, ব্রেস্‌লেট্‌ প্রভৃতি স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করা হয়। মিশরী নারীদের বিশ্বাস যে গুল্লাটি যত বেশী মূল্যবান রত্নালঙ্কারে ভূষিত করা হবে, নবজাত পুত্রটি হবে ততবেশী সৌভাগ্যশালী। সেইজন্য এগুলোকে মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত করতে এরা কিছুমাত্র কার্পণ্য করে না। গুল্লাটিকে সাজাবার সময় "টোমটোম" (ঢাক) বাজানো হয় ও সঙ্গে সঙ্গে এরা "জাগরীৎ" "জাগরীৎ" বলে উল্লাসধ্বনি করে।

গুল্লাটির চারপাশে বৃত্তাকারে বসে তারা আলোচনা

সুরু করে নবজাত শিশুটির নামকরণ সম্বন্ধে। আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পর তিনটি নাম পছন্দ করে নেওয়া হয়। তিনটি এক উপাদানে নির্ম্মিত একই আকারের বাতি পূর্ব্ব হতেই সংগ্রহ করা থাকে, নির্ব্বাচিত নাম তিনটির এক একটি প্রত্যেকটি বাতির উপর আরোপ করা হয়। তারপর গুললার নিম্নস্থ চ্যাপ্টা পাত্রটির কিনারায় বাতি তিনটি রেখে একই সময় জ্বেলে দেওয়া হয়। তারপর আহারাদি শেষ করে আবার তারা পাত্রটির চারিপাশে এসে সমবেত হয় এবং নানা কাল্পনিক সৌভাগ্য-কাহিনী বলতে সুরু করে নবজাত শিশুটির ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে।



কায়রো সহর হইতে পিরামিডে যাবার পথ—দূরে পিরামিড দেখা যাচ্ছে।

জ্বলে জ্বলে ক্রমে বাতিগুলো নিভে এলে সব আলাপ আলোচনা থেমে যায়, সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ করে কোন বাতিটি সকলের শেষ পর্য্যন্ত জ্বলে—সেই বাতিটির নামেই হয় শিশুটির নামকরণ।

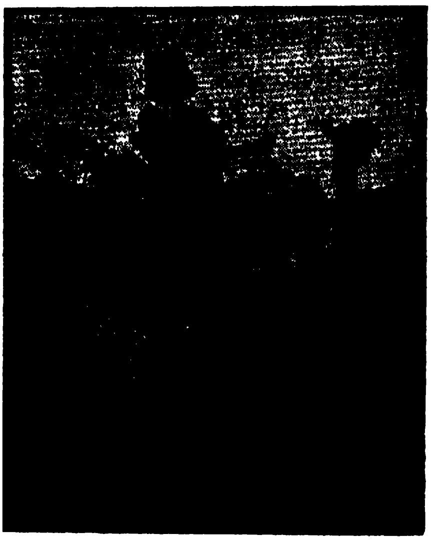
শিশুটির ধাত্রীও থাকে সেখানে। নামকরণ হয়ে গেলে পর সে গুল্লাটী প্রত্যেক নিমন্ত্রিতা রমণীর সামনে ধরে আর রমণীরা গুল্লার নিম্নস্থ ট্রের উপর তাদের আশীর্ব্বাদী স্বরূপ মুদ্রা রাখে।

পরদিন প্রভাতে শিশুটির কাছে একটি পিতলের হামান দিস্তা দিয়া ধাত্রী অবিরত শব্দ করিতে থাকে—শিশুটি যা'তে ভবিষ্যতে বাজনা বা অন্য কোন শব্দে ভীত হয়ে না পড়ে—এই সদুদ্দেশ্যে। তারপর শিশুটিকে একটি চালুনীর মধ্যে বসিয়ে কিছুক্ষণ খুব নাড়াচাড়া দেওয়া হয় এবং প্রসূতিকে সাতবার সেই চালুনী ডিঙিয়ে যেতে হয়। প্রসূতির চালুনী ডিঙাবার সময় প্রতিবার ধাত্রী হামানদিস্তায় শব্দ ক'রে শিশুটিকে বলে—'যখন তোমার মা গৃহকর্ম্মে রত থাকবেন তখন কেঁদো না,' 'যখন তিনি রাঁধবেন তখন তাঁকে জ্বালাতন কোরো না,' 'যখন তাঁর হাতে অনেক কাজ থাকবে তখন চুপ করে ঘুমিও'……আরো অনেক উপদেশ।

তারপর শিশুটিকে নিয়ে বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘরের মধ্যে দিয়া একটি ছোট-খাটো শোভাযাত্রা হয়। প্রসূতি শিশুটিকে কোলে করে সকলের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হন আর তার চার-পাশে তাকে ঘিরে থাকে বালক-বালিকা ও নিমন্ত্রিত নর-নারী সকল—প্রত্যেকেরই হাতে থাকে জ্বলন্ত রঙিন বাতি। শিশুর ধাত্রী একটি মাথায় নিয়ে সকলের অগ্রগামিনী হয়। এই ছোট মিছিলটি যখন এক ঘর হতে অন্য ঘরে প্রবেশ করে তখন সেই ঘরের মেঝের উপর একটু জল ছিটিয়ে সেখানে অগ্নিপাত্রটি মাথা থেকে নামিয়ে খানিকটা নুন সেই অগ্নির উপর নিক্ষেপ করে ধাত্রী বলে—শত্রুর চোখে নুন পড়ুক। তারপর আবার অগ্নিপাত্রটি মাথায় তুলে নিয়ে সে অন্য ঘরে প্রবেশ করে। এমনি ভাবে সব ক'টি ঘর ঘুরে তারা ফিরে আসে পূর্ব্বের ঘরে—যে-ঘর হতে মিছিল যাত্রা করেছিল। তখন শিশুটিকে একখানি সুদৃশ্য মাদুরের উপর বসিয়ে সমবেত রমণীরা শিশুটির দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং সুদৃশ্য সিল্কের রুমালে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা জড়িয়ে শিশুটির হাতে দেয় আশীর্ব্বাদী স্বরূপ। এই হ'ল নামকরণোৎসব।

মিশরী রমণীরা থাকেন 'হারেমে,' স্বামী ও খুব নিকট আত্মীয় ছাড়া অপর কোন পুরুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ এদের হয় না। এদেশে সেজন্য গৃহে নিমন্ত্রণ করে আহারাদি করানোর প্রচলন নেই একেবারেই। কাহারো পরিবারবর্গের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করাও এরা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণের সম্মানহানিকর বলে মনে করে।

এদেশে সাধারণতঃ পনের-যোল বছর বয়সের মেয়েদের বিবাহ-যোগ্যা বলে গণ্য করা হয়। এদেশের বিবাহ ব্যাপারটার মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। বিবাহ-সভায় সমাগত হয় কেবল পুরুষেরা। দুই সারি চেয়ারে কন্যাপক্ষীয়



গ্রাম্য ডাকবাহক। এরা সাধারণতঃ সুদান দেশের বিশারিণ জাতীয় লোক—গ্রামে ডাক বিলি করতে যাচ্ছে।

ও বরপক্ষীয় পুরুষেরা মুখোমুখি হয়ে বসে, বরের সামনের চেয়ারখানি দখল করে কন্যাপক্ষের একজন পুরুষ—তাকেই কন্যার বদলে কন্যা ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়। একজন মুলাজ্জীর উভয়ের হাত একত্রিত করে বিবাহ সম্পন্ন করেন। মোসলেম ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ সম্পন্ন হয় এই ভাবে, কন্যা এ বিবাহে যোগদান করতে পারে না। কোপ্টদেরও বিবাহ হয় অনেকটা এই ভাবেই। বিবাহের প্রারম্ভে কন্যার আসন শূন্য থাকে, পরে বিবাহ সম্পন্ন হবার সময় কন্যা এসে সেই চেয়ারখানি দখল করে। বিবাহ শেষ হলে কন্যার স্নানযাত্রা হয়। কেবল অভ্যাগতা ও আত্মীয়া রমণীগণের সঙ্গে আপাদমস্তক শালে আবৃত করে কন্যা স্নান করতে যায় উপযুক্ত বাদ্য সহকারে।

বিবাহের পর দ্বিতীয় শোভাযাত্রা হয় বরের বাড়ীতে কন্যাকে নিয়ে যাবার সময়। একখানি সম্পূর্ণ ঘেরা গাড়ীতে কন্যাকে বরের বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া হয়। বরের গৃহদ্বারে কন্যা এসে পৌঁছলে উপর হতে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়, আর পূর্ব্ব হ'তেই একটি বাছুর কিম্বা অন্য কোন পশু বরের গৃহদ্বারে রেখে দেওয়া হয়, কন্যা এসে পৌঁছলে কন্যার সম্মুখে সেই অসহায় পশুটিকে বলি দেওয়া হয় এবং তার রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে কন্যাকে সর্ব্বপ্রথম স্বামীগৃহে পদার্পণ করতে হয়। আধুনিক এই পশুবলি প্রথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অচল হয়ে আসছে।

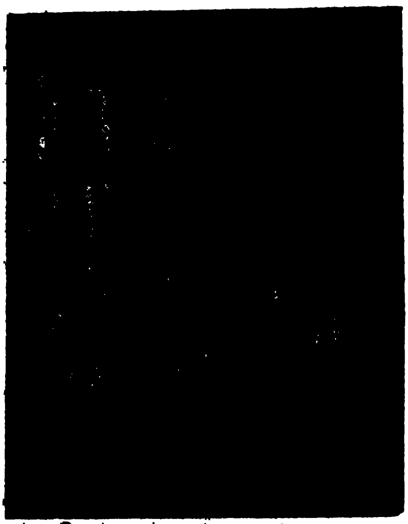
বিবাহে আমন্ত্রিতেরা অভ্যর্থিত হন বরকর্ত্তা বা কন্যা কর্ত্তার গৃহে নয়—গৃহস্বামী নিকটে বড় বড় পটাবাস করে—সেই তাঁবুতে। গৃহস্বামী অর্থশালী হলে বিবাহোৎসব সম্পন্ন হয় উপযুক্ত সমারোহে। বিবাহোৎসবের কয়দিনের মধ্যে কোনো একদিন সমাগত ব্যক্তিমাত্রকেই—তা তিনি নিমন্ত্রিত হোন বা না হোন সে বিচার না করে—সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়।

মিশরীদের মধ্যে চারটে বিবাহের ব্যবস্থা আছে কিন্তু একটি বিবাহের প্রচলনই এদেশে বেশী। তবে প্রথম পত্নীর পুত্র না হলে স্বামী দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করে, আর যদি কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কাজে দুটি বিভিন্ন সহরে বসবাস করতে হয় তা' হ'লে বাসস্থান ও আহারাদির সুবিধার জন্য সে দুটি সহরে দুটি বিবাহ করে। স্ত্রীকে এদেশে পরিত্যাগ করা যায় উপযুক্ত কারণের অভাবেও—কেবল বিবাহের যৌতুকে প্রাপ্ত অর্থের এক-তৃতীয়াংশ ফিরে দিলেই হোল।

কোপ্টরা "কফিন" শুদ্ধ শবকে কবরস্থ করে, মুসলমানগণ কিন্তু কেবল বস্ত্রদ্বারা শব আচ্ছাদিত করেই কবর দেয়। মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও কয়েকটি রত্নাভরণ শবের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তি যাতে পরলোকে সঙ্গী পায় এজন্য ছোট ছোট মাটির পুতুলও শবের সঙ্গে কবরস্থ করা হয়। কবরকালীন সমবেত ব্যক্তিরা সমস্বরে বলে—

'এমন সৎলোক আমরা জীবনে কখনো দেখিনি।' তারপর ঈশ্বরের নিকট আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা ক'রে শবটি সমাধিস্থ করা হয়। শবের সঙ্গে ভাড়া-করা ক্রন্দনকারীও যায়, এরা "টোমটোম" বাজিয়ে চীৎকার ক'রে শোক প্রকাশ করে। মৃতের আত্মীয় ও আত্মীয়ারা ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ প'রে ও আলুলায়িত চুলে, মাথা নাড়তে নাড়তে শবের অনুগমন করে। মুখে ও গায়ে নীল রঙ মাখে দুঃখ প্রকাশ করবার জন্য।

শবের শোভাযাত্রার প্রথমেই চলে কতকগুলো



রাণী নেফার্তারির সমাধি-গৃহের অভ্যন্তর। এই গৃহের ছাদটি নীল রংয়ে চিত্রিত করা, আর মাঝে মাঝে সোনার তারকা বসানো আছে।

পশু—যেগুলোকে সমাধিক্ষেত্রে বলি দেওয়া হয় মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য। তারপর উটের পিঠে কয়েক বাক্স খাদ্য যায়—দরিদ্রদিগকে বিতরণ করবার জন্য। তারপরে যায় যাজক বা মোল্লা এবং একদল ছেলে পতাকা হাতে নিয়ে। সবশেষে যায় শববাহীদল—এদের অগ্রে থাকে পুরুষেরা এবং পশ্চাতে নারীরা। সমাধিস্থানে নিয়ে যাবার পূর্ব্বে মুসলমানরা শব নিয়ে যায় মস্‌জিদে আর কোপ্টরা গির্জ্জায়।

শবের সংকারের পর এরা পশু বলি দেয় এবং ছোট খাটো একটি ভোজের ব্যবস্থা করে। মরণের চল্লিশ দিন পরে কোপ্টরা যাজককে ডেকে আনে; তিনি মৃতব্যক্তির গৃহের প্রত্যেকটি ঘরে পবিত্র জল ছিটিয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেন—মৃতব্যক্তির আত্মা যেন ইহজীবনের সকল বন্ধন ছিন্ন করে স্বর্গে যেতে পারে। কোপ্টদের বিশ্বাস চল্লিশ দিন গত না হলে মৃতব্যক্তির আত্মা স্বর্গে যেতে পারে না, তাই এই ব্যবস্থা।

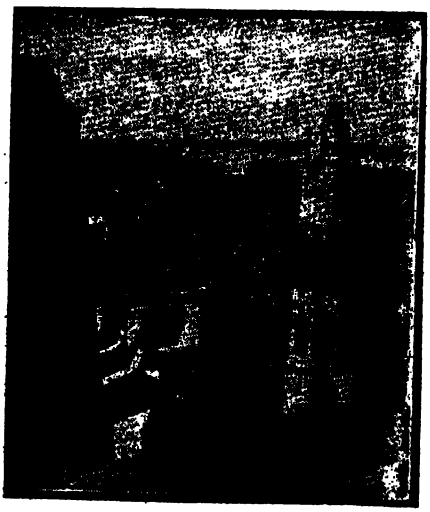
বছরের মধ্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট দিনে মৃত আত্মীয়বন্ধুদের কবর পরিদর্শন করতে যাওয়া মিশরীদের একটি প্রাচীন প্রথা। আজও মিশরীরা প্রত্যেক উৎসবের পূর্ব্বে আত্মীয়-বন্ধুদের কবর পরিদর্শন করতে যায় এবং সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে যায়, এবং সেই কবরগুলোর উপর রেখে আহার করে।

মিশরদেশের দাসদাসীরা সাধারণতঃ "বার্ব্বার" জাতীয় লোক, এরা "নুবিয়া" নামক দেশ হতে আসে বলে এদের "নুবিয়ান" বলা হয়। এরা স্বদেশ ত্যাগ করে কয়েক বছরের জন্য আসে মিশরীদের চাকরী করতে। এই সময়ে এরা প্রত্যেকটি পাই পয়সা পর্য্যন্ত সঞ্চয় করে এবং কয়েক বছর পরে এরা দেশে ফেরে, যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করে নিয়ে। স্বদেশে ফিরে গিয়ে কিছু জমিজমা কিনে উপার্জ্জনের একটি ব্যবস্থা করে এরা আবার মিশরে ফিরে আসে চাকরী করতে। এরা একেবারে অশিক্ষিত। প্রত্যেক বড় বড় সহরে এদের একটি করে সর্দ্দার থাকে, তার কাছে প্রত্যেকটি অন্যায় কাজের জন্য এদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। চৌদ্দ-পনের বছর বয়স হলেই নুবিয়ানরা সহরে পিতার কিম্বা কোন নিকট আত্মীয়ের কাছে চলে আসে। সেখানে কিছুকাল ধরে চলতি আরবী ভাষা বুঝতে ও বলতে শেখে, তারপর রন্ধনের কাজ গ্রহণ করে। রন্ধনে এদের জন্মগত একটা অধিকার আছে। এরা পূর্ব্বে ছিল খৃষ্টান কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে মিশরের "মামেলুক" বংশীয় সুলতানগণের পীড়নে এরা মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এদের এখনো খৃষ্টান নাম রাখা হয় যেমন "যুনিয়াস" "টমাস্" ইত্যাদি। কিন্তু সহরে চাকরী গ্রহণ করবার পূর্ব্বে আমেদ, আলি, প্রভৃতি মুসলমান নামে এরা নিজেদের পরিচয় দেয়। চারিটি বিবাহের প্রথাটা এদের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। এরা স্বদেশে বিবাহ করেই আসে, বিদেশে

চাকরী করতে এবং সেখানে বাসস্থানের সুবিধা করে নেবার জন্য আর একটি বিবাহ করে। এদের আত্মসম্মান-জ্ঞান অত্যন্ত বেশী। যদি কোন বিদেশী কোন কারণে এদের অপমান করে বা প্রহার করে তাহলে সেই বিদেশীর গৃহে অন্য কোন সুরিয়ান কখনও কোন কর্ম্ম গ্রহণ করে না।

মিশরীদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকই শিক্ষিত—এঁরাই হচ্ছেন দেশের মাথা। এঁরাই এদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে মাথা ঘামান এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী পরিচ্ছদ পরেন।

মিশরের বিভিন্ন প্রদেশে ভগ্নপ্রায় গৃহ দেখতে পাওয়া



লুকসর সহরের একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

যায় অনেক। এদেশে একটা কুসংস্কার আছে যে,—যে বাড়ীতে গৃহস্বামী মারা যান সে বাড়ীর আর জীর্ণ-সংস্কার করতে নেই; এজন্য যে সকল দরিদ্র পরিবারের নূতন গৃহ-নির্ম্মাণের সামর্থ্য নাই তারা গৃহস্বামীর মৃত্যুকালে তাকে ময়দানে নিয়ে যায়। গৃহস্বামী স্বগৃহে মারা গেলে সে বাড়ীর আর জীর্ণসংস্কার করা হয় না, কাজেই কয়েক বছরের মধ্যে গৃহটি বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে উঠে, তখন সে বাড়ী ত্যাগ করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। এই কুসংস্কারের জন্য "খেদিভ" বংশীয় নরপতি "টাউফিক" যখন এক নবনির্ম্মিত প্রাসাদে আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন সেই প্রাসাদ রাজপরিবার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। য়ুরোপীয়েরা এখন সেই প্রাসাদটি কিনে নিয়ে একটি বিরাট হোটেল খুলেছে।

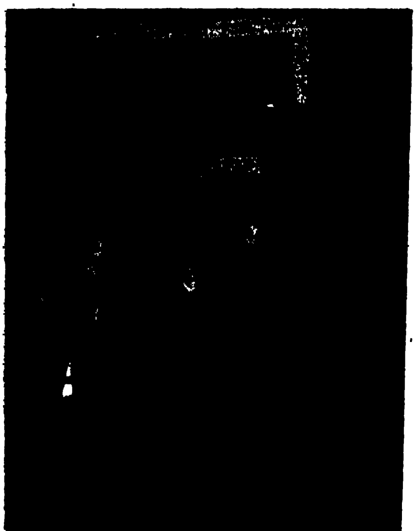
এদেশের চাষারা খুব নিরীহ প্রকৃতির এবং শান্তিপ্রিয়, তবে কলহ করবার সুযোগ পেলে এরা কখনো সে সুযোগ ত্যাগ করে না। গ্রামের বাড়ীগুলো খুব নীচু, সূর্য্যতাপে শুষ্ক ইঁটে এই সব বাড়ী তৈরী করা হয়। প্রতি গ্রামেই একটি করে অতিথিশালা আছে, অপরিচিত কোন অতিথি এলে তাকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয়। অতিথিদের সুখ স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে এরা কোন ত্রুটি করে না, অতিথি-দের খাবারও দেয় প্রচুর পরিমাণে, কিন্তু সে জন্য মূল্য লওয়া ত দূরের কথা বকশিষ পর্য্যন্ত এরা গ্রহণ করে না।

গ্রামের মধ্যে দুটো জিনিষ আগন্তুক মাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে অতিরিক্তভাবে, প্রথমটি হচ্ছে ডিম ফোটাবার জন্য কৃত্রিম তাপপ্রয়োগের গৃহ, আর অপরটি পায়রা-বাড়ী—দূর হতে কেল্লা বলে ভুল হয়। প্রথমে তাপপ্রয়োগের গৃহের কথাই বলা যাক। মিশরীয় মুরগীরা ডিমে তা' দিতে জানে না, বহুদিনের অনভ্যাসের ফলে ও অভ্যাসটা তারা একেবারেই ভুলে গেছে। [illegible] একটি ঘর তৈরী করা হয়, তার দুপাশে [illegible] ডিমগুলো নিয়ে এসে এই ঘরটির মধ্যে রাখা হয় [illegible] ফোটাবার জন্য কৃত্রিম তাপপ্রয়োগের গৃহ। মিশরীয়রা পায়রার মাংস খেতে অত্যন্ত ভালবাসে, সেই জন্য এরা পায়রা পোষে অসংখ্য। এই সব পায়রা রাখবার জন্য প্রতি গ্রামে এরা একটি করে পায়রা-বাড়ী নির্ম্মাণ করে এই পায়রা বাড়ী-গুলো দূর হ'তে দেখায় অনেকটা কেল্লার মত। সংবাদবাহী পায়রাও এরা অতি যত্নে প্রতিপালন করে; তাড়াতাড়ি সংবাদ আদান প্রদানের জন্য, যদিও এদেশে এখন টেলিগ্রাফের প্রচলন হয়েছে।

প্রত্যেক গ্রামে একটি করে প্রধান ব্যক্তি থাকে, তাকে বলা হয়—"ওম্‌দে"। এই পদটি অনেকটা [illegible]। গ্রামবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর এঁকে লক্ষ্য রাখতে হয়, গ্রামবাসীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও দায়ী হতে হয় এঁকে। এরা অধিকাংশই অশিক্ষিত, [illegible] এদের [illegible]

বিলক্ষণ। গবর্মেণ্টের নিকট হতে পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচ একার (acre) নিষ্কর জমী এরা পায়, আর একটা বিশেষ সুবিধা এরা এই পায় যে, এদের বংশধরগণকে কখনো সৈন্যের খাতায় নাম লেখাতে হয় না। মিশর দেশের প্রত্যেক চাষার নামই সৈন্যের খাতায় লেখানো থাকে, প্রয়োজন হলে সৈন্য হয়ে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করবার জন্য। সমস্ত মিশরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার "ওম্‌দে" আছে।

এদেশে দরিদ্র কৃষক-রমণীরা পর্দানশীন হয়ে থাকবার সুযোগ পায়না, তাদের গ্রামের পথে বেরুতে হয় নানা দরকারে। পথে বা'র হবার সময় এরা একখানি শালে



লুকসর সহরে অবস্থিত সম্রাট দ্বিতীয় "র‍্যামসেসের" প্রস্তর মূর্ত্তি।

আপাদমস্তক ঢেকে বা'র হয়, শালের কিয়দংশ মাথার উপর এমন ভাবে তোলা থাকে যে প্রয়োজন বোধ করলে দু'পাশ হতে টেনে নিয়ে তাতে মুখ ঢাকা চলে—অনেকটা আমাদের দেশের ঘোম্‌টার মত। শিক্ষিতা নারীরা অসূর্য্যম্পশ্যা হয়ে থাকেন সহরের মধ্যে, সহরের বাহিরে এঁরা প্রায় স্বাধীন ভাবেই চলা-ফেরা করেন।

মিশরীরা কফি খেতে অত্যন্ত ভালবাসে, কফি এবং তামাকের প্রচলন সর্ব্বত্র। সহরে সিগারেট খাওয়ারও প্রচলন আছে। অতিথিদের কফিপান করবার জন্য এরা নিমন্ত্রণ করে এবং অভ্যাগতদের সমাদর করে কফি পান করিয়ে।

মিশরীরা গল্প শুনতে ও গল্প বলতে বড় ভালবাসে। ব্যক্তি-বিশেষের রূপক নাম বা'র করতে এদের উৎসাহ অত্যন্ত বেশী। একত্রে কফি পান করে গল্প করতে করতে সারা দিনও যদি কেটে যায় তাহলেও এদের কিছুমাত্রও আপত্তি নেই।

আমাদের দেশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যেমন কোলে নেওয়া হয় সে দেশে তেমনি তাদের কাঁধের উপর বসিয়ে নেওয়া হয়।

এদেশে মাটির পুতুল তৈরী হয় সর্ব্বত্র। আগে আবাল-বৃদ্ধের মধ্যে অতিরিক্তভাবে পুতুল খেলার প্রচলন ছিল, এখন "ফুটবল" তার স্থান অধিকার করেছে।

আগে লুণ্ঠতরাজের ভয়ে এরা মাটিতে টাকা পুঁতে রাখতো, এখন ইংরাজ সরকার পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাতে সেই টাকাটা সচ্ছন্দে—দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির সহায়তা করছে।

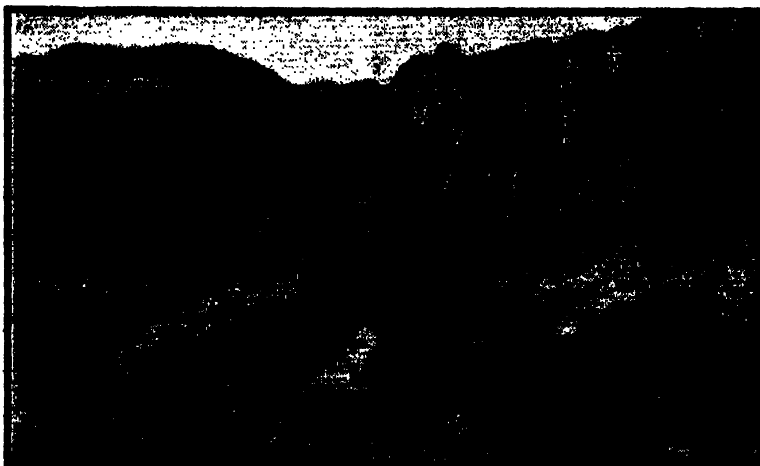
মদ্যপান করা বা অন্য কোন নেশা করা যে মিশরীদের মধ্যে প্রচলন নেই এমন নয়, তবে মিশরীদের মদ্যপান করতে দেখা যায় কদাচিৎ—নৈতিক আদর্শ এদের খুব উচ্চ ধরণের।

এদেশে ছোট ছোট ছেলে অল্প বয়সেই পিতার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয় এবং সে জন্য মনে মনে যথেষ্ট গৌরবও বোধ করে। ছোট ছোট দোকানে অল্পবয়স্ক ছেলেদের দোকানদারী করতে প্রায়ই দেখা যায়।

ভিস্তি এদেশে অতি প্রয়োজনীয়—এদের কাজ হচ্ছে সহরের বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহ করা। অধুনা জলের গাড়ী হওয়ায় ভিস্তির ব্যবসায়ে যদিও যথেষ্ট আয় কমে গেছে তবুও ভিস্তিদের কায়রোর পথে ঘাটে প্রায়ই দেখা যায়। এদেশে সব চেয়ে বদান্যতার কাজ হচ্ছে একটি জলপূর্ণ পাত্র দ্বারপার্শ্বে রেখে দেওয়া তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদের জলপানের জন্য। কায়রো সহরে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবের দিন কয়েকজন ভিস্তি নিযুক্ত করে, তারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায় জল পাত্র ও পিতলের 'কাপ' নিয়ে এবং তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদের দেখলেই তাদের জল দেয়। কায়রো

সহরের পথে পথে সরবৎ বিক্রেতাদের দেখা যায়—রঙীন পোষাকে আপাদ মস্তক আবৃত করে একটি ঠেলা-গাড়ীতে সরবৎ নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

কায়রো মিশরের রাজধানী। দুহাজার বছরের পুরানো এই সহরটির যে-অতীত সৌন্দর্য্যের কথা শোনা যায় আজকাল সে সৌন্দর্য্য আর দেখা যায় না। এখানে কয়েকটি যাদুঘর আছে, সেখানে প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। কায়রো সহরের লোকসংখ্যা প্রায় আটলক্ষ (৭,৯০,৯০০)। প্রাচীন সৌন্দর্য্যের যা' কিছু নিদর্শন কায়রো সহরে ছিল তুর্কী সুলতানগণ তার অধিকাংশই নষ্ট করে দিয়েছে। "এল-মুরী" নামক একটি বিরাট মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনো এখানে দেখতে পাওয়া যায়। "আল-আঝার" কায়রোর শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যালয়। এখানকার ছাত্র-সংখ্যা এখন প্রায় ন'হাজার। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তৈরী হয়েছিল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে।



থেবস দেশের "আমন" দেবতার মন্দিরে যাবার পথ

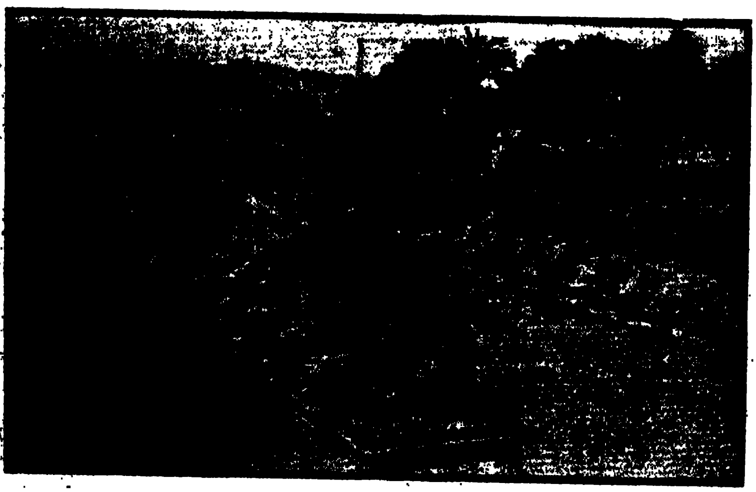
মিশরীরা প্রধানতঃ নীল আলখাল্লা পরে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আলখাল্লার উপর "গাউন" পরে। মাথায় এরা পরে পশমের টুপী, তার উপর একটা সাদা চাদর জড়ায়। সাধারণতঃ এরা জুতা পরে না তবে প্রয়োজন বোধ করলে জুতো জোড়াটা হাতে নিয়ে পথে বার হয় এবং প্রয়োজন মত পরে। হাতে এদের একটি লাঠি থাকে সর্ব্বদাই, সুতরাং সামান্য কারণ থেকে মারামারি সুরু হতেও দেরী হয় না মোটেই।

মিশরে কয়েকটি প্রাচীন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। "শামেল-নাসিম" বা বসন্তোৎসব হয় ইষ্টারের ছুটিতে। "এমবারের" মেলা হয় জুন মাসে। এই মেলাটি হয় সেই দিন স্মরণ করে যেদিন নীলনদ দু'কূল প্লাবিত করে সমস্ত শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন করে দিয়েছিল বহুদিনের অনাবৃষ্টির পর। আর একটি উৎসব হয় আগষ্ট মাসে—সেটি মিশরদেশের সহিত নীল নদের বিবাহোৎসব। নীল নদের জন্যই মিশরের বুকে শ্যামলিমা ফুটে উঠেছে—এই কথা স্মরণ করেই বুঝি এই উৎসবের সৃষ্টি। একটি ছোট পুতুলকে সুসজ্জিত করে সাজিয়ে নীল নদে তাকে বিসর্জন দেওয়া হয় উপযুক্ত সমারোহে—ইহাই নীল নদের সহিত মিশরদেশের বিবাহোৎসব। "মোরমেল-নালিয়" উৎসব হয় যখন নীল নদ বর্ষায় অত্যন্ত ফেঁপে উঠে। তখন নদকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে একটি ছোট সোনার ক্রুশ নীল নদের বক্ষে বিসর্জন দেওয়া হয়। এদেশে আগষ্ট মাসে আরো একটি খুব বড় মেলা হয় "তান্তা"য়। সেখানে সাপুড়ে, মল্লযোদ্ধা, নর্ত্তকী হতে ব্যবসায়ের বহুমূল্য দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত আমদানী করা হয়। আর একটি বড় উৎসব হচ্ছে "রমজানে"র উৎসব। এই সময় একমাস এরা সারাদিন অনাহারে থেকে সন্ধ্যায় সময় আহার করে, কাজেই এই সময়ে ফলমূল ও মাংস বিক্রী হয় বেশী।

উৎসবের দিনে জন কয়েক ক'রে ফকির এক একটি মাঠে জড়ো হয় এবং চক্রাকারে বসে প্রার্থনা করে। প্রার্থনা শেষ হলে কেবল "হু" "হু" শব্দ অনবরত আওড়ায়

ক্রমে এতই অভিভূত হয়ে পড়ে যে অনেকেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

কায়রো সহরে, কার্পেটের শোভাযাত্রা হয় বছরে তিনবার। প্রথমবার "কিশয়ে" অর্থাৎ কার্পেটখানি মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয় নানারূপ জরীর কারুকার্য্য করাবার জন্য। এই কার্পেটখানি তৈরী করান মিশরের শাসনকর্ত্তা, মক্কার "কাবা" মসজিদে বিছিয়ে দেবার জন্য। দ্বিতীয় বার শোভাযাত্রা হয় "খাডিভ্" বা শাসনকর্ত্তাকে কার্পেটখানি দেখাতে আনবার সময়; তারপর কার্পেটখানি মক্কাযাত্রীদের সঙ্গে মক্কার "কাবা" মসজিদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি বছরেই



লুকসরের একটি মন্দির হইতে কার্ণকের একটি মন্দির পর্য্যন্ত একটি পথ—হাজার ফুট লম্বা। এই পথটির দুপাশে সারি সারি পাথরের মূর্ত্তি বসানো আছে।

এক একখানি নূতন কার্পেট মক্কায় পাঠানো হয়। তৃতীয় বারের শোভাযাত্রা হয় যখন তীর্থযাত্রীরা মক্কা থেকে কায়রোতে ফিরে আসে পূর্ব্ব-বছরে পাঠানো পুরাণো কার্পেটখানি সঙ্গে নিয়ে। যে সব তীর্থযাত্রীদল, কায়রো থেকে মক্কার "কাবা" মসজিদে কার্পেটখানি নিয়ে যায় তাদের বলা হয়—"মাহমল্"।

টিনের ব্যবসা এদেশের একটি প্রাচীন ব্যবসা। যারা এই ব্যবসা করে তাদের বলা হয় "মিক্‌গারী।"

মাছের ব্যবসা এদেশে একটি লাভজনক ব্যবসা। মাছ ধরবার জন্য কোন খাজনা দিতে হয় না এবং মিশরের যে-কোনো স্থানে সেই মাছ রপ্তানী করা যেতে পারে বিনা শুল্কে।

মিশরের দক্ষিণাংশে মৃৎপাত্র নির্ম্মিত হয় প্রচুর পরিমাণে এবং নৌকা বোঝাই করে নদীপথে মিশরের বিভিন্ন প্রদেশে সেগুলো চালান দেওয়া হয়।

নৌকা নির্ম্মাণ হয় এদেশে বহুল পরিমাণে এবং নাবিক-সংখ্যা চাষার সংখ্যার ঠিক নীচে। যাদুঘরে এখনো নানাধরণের প্রাচীন নৌকা দেখতে পাওয়া যায়। "বার্ব্বার" জাতীয় লোকেরাই নাবিক হয় বেশী এবং আরবেরা জলের চেয়ে মরুভূমিকেই ভালবাসে বেশী।

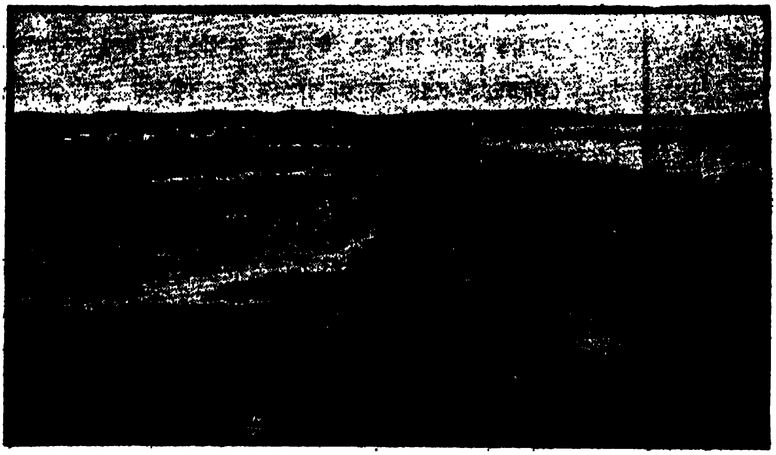
কাঁচের ব্যবসার জন্য আগে মিশর বিখ্যাত ছিল; এখন এই ব্যবসা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে—শুধু যাদুঘরই তার স্মৃতি বুকে করে রেখেছে।

প্রস্তরে কারুকার্য্য খোদিত করা এদেশের একটি প্রাচীন শিল্প। এখনও পুরাণো ধ্বংসপ্রায় মন্দির ও মসজিদের স্তম্ভে নানা ধরণের কারুকার্য্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প ও শিল্পকার্য্যে এদেশের খ্যাতি বড় কম নয়, তবে মুসলমানদের রাজত্বকালে এদেশের শিল্পকলা ও স্থাপত্য-শিল্প নষ্ট হ'য়ে গেছে। তুর্কী সুলতান যখন ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশটি জয় করেন তখন তাঁর অধীনে এদেশের অনেক শিল্পবিদ্যা ধ্বংস পায়। প্রাচীন কালের অঙ্কন-বিদ্যা, কাচ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর কারুকার্য্য, সুচিত্রিত টালি, প্রভৃতি এদেশের বিখ্যাত প্রাচীন শিল্পগুলি আজকাল অনেকাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। মিশরীয়রা এখন নিজেদের শিল্পবিদ্যা হারিয়ে ইংরাজদের অনুকরণ করতে ব্যস্ত। কায়রোর বাজারে এখনো কাঠ-শিল্পের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়—সেগুলো বিক্রী হয় খুব সস্তা দরেই।

এদেশের সিল্ক অতি সুন্দর, তবে দাম অত্যন্ত বেশী বলে দর্শকেরা বাজে সিল্কই কেনে কম দামে।

এদেশে সব চেয়ে প্রাচীন সহর "মেম্‌ফিশ"। খৃষ্ট পূর্ব্ব পাঁচ হাজার বছর আগে এই সহরটি নির্ম্মিত হয়েছিল, এখন সেখানে দ্বিতীয় "র‍্যাম্‌সেসে"র একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ছাড়া প্রাচীন সহরের আর কোন নিদর্শনই নেই।

"বেবিলোন"ও খুব প্রাচীন সহর, কিন্তু এখন সেখানে একটি ধ্বংসপ্রায় গির্জ্জা ও একটি ধ্বংসপ্রায় রোমকদের দ্বারা নির্ম্মিত কেল্লা ছাড়া সেই সহরের অপর কোন চিহ্নই নেই।



আস্‌য়ান দেশের এই জলাধারটি বৃটিশ ইঞ্জিনীয়র তৈরী করেছে। বন্যার সময় নীল নদের স্ফীত জল আশপাশের গ্রামগুলোকে না ভাসিয়ে দিয়ে এই জলাধারটির মধ্যে জমা হয়। বন্যার পর এটি জলে পূর্ণ হয়ে থাকে, তাতে সেখানকার কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

আর একটি প্রাচীন সহর "কোষ্টাট্‌"। 'পুরাণো-কায়রো' নামেই এই সহরটি প্রসিদ্ধ, এটিও প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। এরই উত্তরে তুর্কী সুলতান আহমেদ একটি নূতন নগর গড়ে তোলেন। সেই সহরে যে পয়ঃপ্রণালী তিনি তৈরী করিয়েছিলেন—তা' আজও দেখতে পাওয়া যায়। এই পয়ঃপ্রণালী সেকালের একটি বিস্ময়-কীর্ত্তি।

"আসুয়াট্‌" এদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে নানাপ্রকারের জালি কাপড় ও জরীর কারুকার্য্য করা হয়। "আসুয়াটে"র দক্ষিণে মরুপ্রান্তরে পর্ব্বতপ্রান্তে খোদিত একটি অতি প্রাচীন গির্জ্জা আছে, হয়তো এই গির্জ্জাটিকে ঘিরে কতকগুলি গ্রাম বা একটি ছোট সহর এক সময়ে ছিল কিন্তু এখন তার অস্তিত্বটুকুও নেই।

ছোট সহর "আখ্‌মিনে" প্রাচীন মিশরের অনেক কীর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে অতিপ্রাচীন কতকগুলো "মমির" শবাধার পাওয়া গেছে যা' এত সুন্দর কারুকার্য্য-সম্পন্ন যে দেখলে আজও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এরই অদূরে আরো দুটি ছোট সহর আছে, "কিন্না" ও "বিলিয়ানা।" এখানে নীল নদের তীরে প্রাচীন "অবিদস্‌" সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এরই কিছুদূরে পঞ্চদশ শতাব্দীর নির্ম্মিত "আন্‌বা-সে-নৌতা" নামক সাধুর প্রতিষ্ঠিত 'লাল' ও 'শাদা' মঠ আছে।

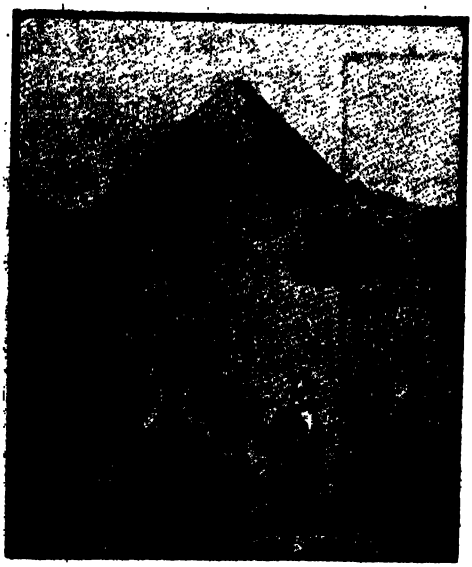
তারপর পথেই পড়ে "জন্‌তেরা" সহর। এখানে অনেক দিনের পুরাণো রোমানদের নির্ম্মিত একটি প্রাচীন মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এই ধ্বংসোন্মুখ মন্দিরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে সর্ব্বধ্বংসী কালকে উপহাস করে।

তারপর "থেবস্‌"। এখন একে "লুক্‌সর্‌" বলা হয়। প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে "কার্ণকের" মন্দির আছে—যা' তৈরী হ'তে দু'হাজার বছর লেগেছিল। এই মন্দিরটা প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্দিরে যাবার একটি পথ আছে সাড়ে দু'হাজার ফিট লম্বা এবং আশী ফিট চওড়া। এই পথটির দু'পাশে সারি সারি সিংহমূর্ত্তি বসানো আছে। "লুক্‌সর্‌" হতে "আস্‌য়ান" নামক সহরের পথে "এসনা" ও "আড্‌কোর্ত্ত" নামে আরো দুটি প্রাচীন মন্দির আছে।

"কবোসকে" সহরের কিছুদূরে একটি প্রাচীরবেষ্টিত বড় সহরের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়। সেনাপতি "সালসেদোলার" অধীনে সাতজন "ভুরিয়ান" এই

সহরটি আক্রমণ করে এবং লুঠতরাজ ও অত্যাচার করে সহরটাকে ধ্বংস করে দেয়।

তারপর "আস্যুয়ান" প্রদেশ। এখানে কয়েকটা পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। "আমেদা"তে সম্রাট "রামসেসের" নির্ম্মিত "আবুসিম্বেল" নামক প্রকাণ্ড মন্দির আছে। এই মন্দিরের তোরণে সম্রাট "রামসেস" নিজের এবং রাজপরিবারের চারিটি বিরাট প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করান। তিন হাজার বছর পূর্ব্বে এই বিরাট চারিটি মূর্ত্তি প্রজাপুঞ্জের পানে তাকিয়ে যেমন ছিল আজও মিশরীদের পানে চেয়ে তেমনি



এই পিরামিডটি প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে তৈরী হয়েছিল—আরব দেশের পাহাড় হতে পাথর কেটে এনে। এর মধ্যে কয়েকটি ঘর ও পথ আছে। এই ঘরগুলোর মধ্যে রাজা ও রাণীর সমাধি আছে।

স্তব্ধ ভাবেই বসে আছে। এই দেশের একটি আধুনিক প্রধান কীর্ত্তি হচ্ছে "আস্যুয়ান দেশের জলাধার।" বন্যায় উচ্ছ্বসিত নীল নদের জল এই জলাধারটির মধ্যে জড়ো হয়, পরে নীলনদ শান্তভাব ধারণ করলে এই জলের দ্বারাই চাষ-আবাদের সুবিধে হয় যথেষ্ট। আরেকটি আধুনিক মিশরের প্রধান কীর্ত্তি হচ্ছে সুয়েজ প্রণালী। ফরাসী ইঞ্জিনীয়াররা এটিকে তৈয়ার করে। এই প্রণালীটি তৈরী হতে দশ বছর লেগেছিল। আগে ভারতবর্ষ হতে বিলাত যেতে হলে "উত্তমাশা অন্তরীপ" ঘুরে প্রায় সাড়ে বার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হোতো, কিন্তু এই প্রণালীটা তৈরী হবার পর সেই পথ সরল হয়ে সাত হাজার মাইলে দাঁড়িয়েছে।

সমস্ত মিশরের লোক সংখ্যা হচ্ছে প্রায় একশো আটাশ লক্ষ এবং চৌদ্দটি প্রদেশে সমস্ত মিশর দেশটি বিভক্ত।

এদেশে মরুভূমি হচ্ছে দু'রকমের,--যেখানে জলাভাবে কোন রকম শস্য জন্মায় না, আর বালুকাময় মরুভূমি। প্রথমোক্ত জমিতে অধুনা চাষ-আবাদের চেষ্টা করা হচ্ছে। মিশরের পূর্ব্বদিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই চোখে পড়ে শুষ্ক স্বর্ণাভ মরুর বুকে শ্যামল মরুদ্যানগুলি। এখানে ফুল ফোটে নানা রকমের, তবে সংখ্যায় খুব অল্প। ফুলগুলি আকারে খুব বড় হয় না আর রং হয় খুব অস্পষ্ট। কিন্তু 'আলেকজেন্দ্রিয়া' নগরের আরো পশ্চিমে বেশ বড় বড় ফুল ফোটে, এত বিভিন্ন রকমের যে এই পথে একঘণ্টা ভ্রমণ করলেই ন্যূন পক্ষে চল্লিশ রকমের ফুল সংগ্রহ করা যেতে পারে। মহাবীর আলেকজান্দার জুপিটার ভ্রমণের ভবিষ্যৎ বাণী শুনে ফিরবার পথে এই সহরটি তৈরী করান, সেই জন্যই এর নাম আলেকজেন্দ্রিয়া।

এই সব মরুভূমির অধিবাসীরা হচ্ছে "বেদুইন"। এদের ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অসাধারণ। এরা সর্ব্বদাই সশস্ত্র ভাবে থাকে এবং মরুভূমির একস্থান হতে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ানোই এদের অভ্যাস। এদের সঙ্গে থাকে কয়েকটি তাঁবু এবং কতকগুলো গৃহপালিত পশু—উট, গাধা, ঘোড়া, ইত্যাদি। এদের একমাত্র আহার্য্য হচ্ছে মাংস দুধ আর ফলমূল। এরা সাধারণতঃ দুর্দ্ধর্ষ এবং দরিদ্র। দুর্দ্ধর্ষতার আনুষঙ্গিক বিশ্বাসঘাসকতা ও নিষ্ঠুরতা এবং দারিদ্র্যের আনুষঙ্গিক কদর্য্যতা ও মিথ্যাবাদিতা এদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে অবিচলিত ভাবে। কিন্তু এদের আত্মীয় স্বজনের মাঝে এরা হচ্ছে সরল-হৃদয়, কোমল এবং স্নেহশীল। এরা কখনো বাড়ী তৈরী করে না বা কোন রকম নেশা করে না। চাষ-আবাদ করা এদের স্বাভাবিক সংস্কারের বাইরে। স্বাধীনতাকে এরা ভালবাসে প্রাণের চেয়ে আর মরুভূমিকে এরা বলে পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্থান।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বিচিত্রার দপ্তর

[বিশ্বামিত্র]

বিশ্ববিদ্যায় মুস্কিল

উভয় সঙ্কট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর। ব্যবসায়ী-মণ্ডলী তাঁহাদিগকে চাকুরী দিতে নারাজ, তাঁহারাও বণিকের চাকুরী স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু সুশিক্ষিতের প্রতি ব্যবসায়ীর বীতরাগ কেন? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ভাব—হেতু কি? লণ্ডনের জনৈক প্রবীণ "বি-এ" সংবাদপত্রে ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—'ভিতরে এক, বাহিরে আর—অন্তরের ভাবে ও বাহ্য প্রকাশে সর্ব্বদাই ভিন্নতা,—বিশ্ববিদ্যালয় এমন শিক্ষা দেয় না, তাই এই দ্বন্দ্ব!'

বণিক-বৃত্তি হেয় বৃত্তি বলিয়া প্রাচীন ভারতেও পরিগণিত। ইহারও মূলে সত্য ও অসত্যের চিরন্তন বিরোধ।

ইউরোপের ধনকুবের

ব্যবসা-বাণিজ্যের দুর্দ্দশায় ধন মুখ ঢাকিয়াছে বটে; কিন্তু ইউরোপে ধনকুবেরের সংখ্যা এখনও কম নয়। জেনেভায় সম্প্রতি একটা তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। রুশিয়ার নাম অবশ্য তালিকাভুক্ত নাই—ধনবান শব্দ সেখানে গালি বলিয়া গণ্য, ধন লজ্জাকর বস্তু বলিয়া ঘৃণিত।

জার্ম্মাণদের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব সম্রাট উইলহেম উপস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। মহাসমরের পূর্ব্বে তাঁহার যে ধন ছিল এখন তার চেয়ে বেশী—রাষ্ট্রবিপ্লব, ব্যবসায়ের দুর্গতি সত্ত্বেও। তাঁহার ধনের পরিমাণ প্রায় ১৫ কোটি টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্বে কাইজরের অপেক্ষা তাঁহার চারিজন প্রজার ধনাধিক্য ছিল, তন্মধ্যে প্রধান—শ্রীমতী বার্থা ক্রুপ। ইঁহার ধন প্রায় এখন অদৃশ্য। তবে দুই জন লৌহ ব্যবসায়ী সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন ক্রিন্ড, অপরের নাম—থাইসেন্।

ফরাসীদেশে সর্ব্বপ্রধান ধনীর নাম মুসেঁ কোটি। সুগন্ধি দ্রব্য ও মুখে মাখিবার পাউডার হইতে ইঁহার প্রভূত ধনার্জ্জন। ইঁহার পরেই বিখ্যাত সিত্রোঁয়া ও রেনো মোটর গাড়ীর নির্ম্মাতাদ্বয়। ধনকুবের কোটির জীবনেতিহাস বিস্ময়কর। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮ বর্ষ বয়সে কোটি কর্সিকা দ্বীপ হইতে ফরাসী প্যারি সহরে আসেন, একটা দোকানে অতি সুন্দর সুগন্ধি দ্রব্য দেখিতে পান, কি কি উপাদানে উহা প্রস্তুত তাহার বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং উহা দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে থাকেন। এই বালক এখন ধনকুবের, অন্ততঃ ১৩ কোটি টাকার মালিক, অথচ এ পর্য্যন্ত সওয়া কোটি টাকা দান খয়রাতে ব্যয় করিয়াছেন। প্যারি সহরের প্রধান দুইখানা সংবাদপত্রের তিনিই স্বত্বাধিকারী—অথচ তাহাতে নিজের কারখানায় প্রস্তুত প্রসাধন দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বাহির হয় না।

হাঙ্গেরীর সর্ব্বপ্রধান ধনী প্রিন্স পল ইস্টের্হেজি। ভূসম্পত্তি প্রচুর, পিয়ানো বাজাইবার সখ যথেষ্ট। ইঁহার গোশালা ও চিনির কারখানা সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান।

পোলাণ্ডের কাউণ্ট পোটোকি ভূসম্পত্তির বিশিষ্ট মালিক। পোলো ক্রীড়ায় ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি। আফ্রিকার পশুশিকারে ইনি ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন। ইঁহার পরেই বড় ধনী প্লেসের প্রিন্স, ইনি জাতিতে জার্ম্মাণ, বৎসরে ৫২ লক্ষ টাকা ট্যাক্স দিয়া থাকেন।

লুথেনিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান রিচার্ড তিলমেনাস্। ইনিও জার্ম্মাণ। স্ক্রু ও পেরেকের তৈয়ারির কাজেই অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার পরেই উল্লেখযোগ্য ধনী ইসায়েব উল্ফ। বয়স ৮২, বিয়ার নামক সুরা প্রস্তুত করিয়াই ভাগ্যোন্নতি করেন। দান ও খয়রাতের জন্য ইঁহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি।

রুমেনিয়ার সর্ব্বপ্রধান ধনী পীহু মিহেল। তাঁহার অগাধ ধন সুবর্ণের ইষ্টকে সংরক্ষিত—প্রায় ২ কোটি টাকা। ইনি বিবাহ করেন নাই, জীবিত-আত্মীয় স্বজনও ইঁহার কেহ নাই। ভ্রাতার নিকট হইতেই ইনি অগাধ ধন প্রাপ্ত হন। সারাজীবন প্রকোষ্ঠবদ্ধ হইয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া যান। পীহু মিহেল সামান্য ভূসম্পত্তিলব্ধ আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। সুবর্ণে আবদ্ধ ধনভাণ্ডার বিনা সুদে দেশান্তরে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

রুশিয়ায় ধনবান কেহ নাই। রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা যিনি তিনি বেতন পান মাসিক চারি শত টাকা মাত্র। কোন কোন ব্যবসায়ীর কাছে গোপন অর্থ আছে, কিন্তু তাহা গুপ্তভাবেই রাখা ভিন্ন উপায় নাই—ভোগ অসম্ভব। সন্ধান পাইলেই রাজকর্ম্মচারীরা মালিকের মুণ্ডপাত করিবে—এই সেখানকার বর্ত্তমান আইন।

আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তা কে?

ক্রিষ্টোফর কলম্বস্ পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া আবিষ্কর্ত্তার সম্মান ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এই সম্মান কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রাপ্য জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুর। ইঁহার নাম হুই সেন্—বাস আফগানিস্থান কাবুলে। Cornhill মাসিক পত্রে মিঃ রোজার পিকক্ সুলিখিত প্রবন্ধে জানাইতেছেন যে, কাবুল নগরই তখন বৌদ্ধ প্রচারকগণের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পাঁচ জন সন্ন্যাসী সঙ্গে লইয়া উপরোক্ত হুই সেন ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে কাবুল হইতে যাত্রা করেন, ক্রমশ চীনদেশের সমুদ্রতটে পৌঁছেন। সেখান হইতে কামস্কাট্‌কায় উপস্থিত হন। তাহার পর পূর্ব্বমুখে যাত্রা করেন এবং উত্তর আমেরিকার তীর দিয়া ফুশাংএ উপনীত হন। ফুশাং শব্দের অর্থ সুদূর পূর্ব্ব—চীন হইতে ৬৫০০ মাইল দূরে।

ঐ সমুদ্র-তট চীনাদের সুপরিচিত ছিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ যে তাহাদের বিশেষভাবেই পরিজ্ঞাত ছিল তাহার প্রমাণ যথেষ্ট। ফুশাং শব্দ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, মধ্য আমেরিকা ও মেক্সিকো উহার অন্তর্গত ছিল।

বুদ্ধের গৌতম নাম হইতেই গোয়াতিমালা দেশের নামকরণ হয় ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহা হইতেই ব্রিজ গোয়াতিমজিন নামের সৃষ্টি তাহাও সুস্পষ্ট। বুদ্ধদেব শাক্য বংশোদ্ভূত। এই শাক্য শব্দ হইতে জাকাতিকব, শাকাতিপেক্, জাকালেন, সাকাপুলস প্রভৃতির উৎপত্তি। বৌদ্ধ পুরোহিতকে লামা বলা হয়, মেক্সিকোর পুরোহিতের আখ্যা তালামা, প্রধান পুরোহিতকে তেশাক্য বলা হয়; শাক্যমুনিই যে মেক্সিকো প্রদেশে শাক্যমল হইয়াছেন ইহা খুবই সহজ।

গোয়াতিমেলায় মায়া বংশের তখন বসতি। চীনা পরিব্রাজকেরা শাসন-পদ্ধতির সংস্কার আচার ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করেন। হুইসেনের নামে এখনও ঐ দেশে স্তম্ভ বিরাজমান। ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনে প্রত্যাগমন করেন এবং সম্রাটকে জ্ঞাপন করেন যে, সে দেশে লৌহ, সৈনিক, দুর্গ বা প্রাচীর বেষ্টিত সহর নাই, তবে তাম্র যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সম্রাট তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ রাজকীয় দপ্তরখানায় খোদাই করিয়া রাখেন।

কাচের আলয়

কাচের ঘরে বাস যাহার ঢিল ছুড়া তাহার সাজে না—প্রাচীন প্রবচন। প্রবচন এইবার বুঝি বা বাতিল হইয়া যায়!

কাচের ইট্, কাচের টালি, কাচের কড়ি বরগা—কাচের ঘর শুধু নয়, কাচের প্রকাণ্ড বাড়ী, রেল ষ্টেশন, কারখানা সকলই তৈয়ার হইতেছে। আজব দেশ মার্কিণে সুরু হইয়া ইউরোপেও কাচের গৃহাদি নির্ম্মাণ চলিতেছে। ঐ সকল আলয়ে রাত্রিকালে আলো জ্বলিলে ইন্দ্রভুবন বলিয়াই অনুমিত হয়। মোটা মোটা কাচের দেওয়াল ও দরজায় পানেল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

মরুভূমির অভিনবরূপ

পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, মরুভূমির মধ্যে সাহারা শ্রেষ্ঠ। ফরাসী অভিযানকারীর দল সাহারাকে নূতন বর্ণে চিত্রিত করিতেছেন। এককালে এখানে উর্ব্বরা ভূমি প্রচুর ছিল, সংখ্যাতীত লোকের বসতি ছিল, অগণ্য বর্দ্ধিষ্ণু নগর ছিল, জলাশয়ও পর্য্যাপ্ত ছিল। নানাভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিভ্রমণ করিয়া এই সিদ্ধান্তের তাঁহারা প্রবল প্রচার

করিতেছেন। স্বপ্ন-কথা অবশ্য কহিতেছেন না। মরুভূমির মধ্যে মধ্যে কূপাদি খনন করিয়া জল বাহির করিয়াছেন এবং ঐ ভাবে সুবিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্র শস্যশ্যামলা করিতে কিরূপ সমর্থ হইবেন তাহারও উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু এককালে যে ঐ বিখ্যাত মরুতে সমৃদ্ধিশালী নগরী পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল খননাদি কার্য্যের ফলে তাহারও নানা প্রমাণ দর্শাইয়াছেন।

সাহারা ফরাসী সাম্রাজ্যের এলাকায়, ফরাসী গবরমেণ্টের অগত্যা টনক নড়িয়াছে। এত বড় ভূখণ্ডের যদি উদ্ধার-সাধন হয়, প্রজাবৃদ্ধি হয়—সাম্রাজ্যবাদী কল্পনায় আকাশ-কুসুম রচনা করিবেন কৈ কি।

বরফ-নদীতে অভিযান

ঔপন্যাসিকের স্বপ্ন বুঝিবা সফল হইতে চলিল! পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত ফরাসী আখ্যায়িকাকার জুল্‌স্ ভারণে কয়েকখানা আজগুবি বর্ণনাপূর্ণ উপন্যাস রচনা করেন। চন্দ্রলোকে গমন, পাতালে প্রবেশ প্রভৃতি বিষয়বস্তু উহার উপাদান। অহিফেনসেবীর খেয়াল বলিয়া লোকে বিদ্রূপের হাসি হাসিল কিন্তু পুস্তকগুলা জনপ্রিয় হইল। বর্ণিত কতক বিষয় এখন বিজ্ঞানের কৃপায় বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি বরফের নদীর তলদেশে সব্‌মেরিণ জাহাজ চালাইয়া অভিযান সুরু করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাকি রহিল শুধুই চন্দ্রলোকে গমনাগমন। তাহাও কোন দিন বিজ্ঞান-বিদেরা সম্ভাবনার গণ্ডীর ভিতর টানিয়া আনিবেন, কে জানে?

অভিযানকারী জিন্ ভারণে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের পৌত্র। ফরাসী ক্র'য়া সহরের বিচারকের পদে ইনি অধিষ্ঠিত। চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া এই অভিযান লইয়া মাতিয়াছেন,—পিতামহের স্বপ্ন সফল করিবার উদ্দেশ্যে। ইঁহার সহকর্মী অষ্ট্রেলিয়ার প্রথিতযশা অভিযানকারী সর্ জর্জ হিউবার্ট উইলকিন্স্। উত্তর মেরুর বরফের নদীর তলদেশ আবিষ্কার করিতে ইঁহারা বদ্ধপরিকর। এজন্য যে সব্‌মেরিণ বা পাতালগামী জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন পিতামহের উপন্যাস-বর্ণিত জাহাজের নামের অনুকরণে তাহারও নামকরণ হইয়াছে—নটিলাস্। জন ভার্ণে বলেন—"সর্ উইল্‌কিন্স্ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সফল অভিযান করেন—এখন আমার পিতামহের কল্পিত পন্থা অনুযায়ী বরফের তলদেশে অভিযান চালাইতে আমার সহায়ক হইয়াছেন। ১৮ জন নাবিক আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। Iceberg বা ভাসমান তুষারশৈল জলের ভিতরেও পাহাড়-প্রমাণ অবস্থিত, Floe-ice বা বৃহদাকার নীহার-ক্ষেত্র কয়েক হস্ত পরিমিত মাত্র। এই দুই রকমের বরফের 'চাঁই'-এর সঙ্গে আমরা তুমুল সংগ্রাম চালাইব। বারুদ সাহায্যে জল মধ্যস্থ চাঁইগুলা ছিন্ন করিব, তখন সেগুলা জলের উপরে ভাসিয়া উঠিবে, আমরাও আমাদের জাহাজটি ৪।৫ ফুট বরফের তল দিয়া বরফ-সমুদ্র বিদীর্ণ করিয়া চালাইব। এইভাবে মেরু প্রদেশে অগ্রসর হইব এবং অজস্র বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয়ে সক্ষম হইব, ইহা সুনিশ্চিত।"

বরফের নীচে এক-একবারে ১২ ক্রোশ করিয়া চলিবেন ইহাই ভার্ণের সঙ্কল্প। জাহাজখানা জলে ডুবিয়া একাদিক্রমে শত ক্রোশ চলাচল করিতে পারিবে। জাহাজে সর্ উইল্‌কিন্সের পত্নীও থাকিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

রূপের নেশায়

সেকালে স্বয়ম্বর-সভায় রাজকন্যাদের প্রাণে যে দ্বন্দ্ব জাগিত, একালে নারী-প্রগতির দিনেও তাই! জার্ম্মাণ যুবতী ক্রায়ডেল্ হায়েরলিন্ বিষম সঙ্কটেই পড়িয়াছেন। তাঁহার চিত্র সম্প্রতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। পুষ্প বৃষ্টির মত নিত্য আবেদন-পত্র তাঁহার কাছে পৌঁছিতেছে। এ যাবৎ ১১২০ জন পাণিপ্রার্থীর দরখাস্ত তিনি পাইয়াছেন। পতি-নির্ব্বাচন লইয়া বিব্রত হইয়াছেন যথেষ্টই; কখন ভাবিতেছেন, কায়িক সৌষ্ঠবই যাহাদের কাম্য সকলেই তাহারা পরিত্যাজ্য।

এদিকে সমাজহিতৈষীগণেরও ঘুম নাই। শেষ পর্য্যন্ত রমণী যদি সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিয়া বসেন, কত পাণি-প্রার্থী না রূপের বহ্নিতে জীবন আহুতি দিবেন—সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া, বিষ খাইয়া,—এই তাঁহাদের ত্রাস!

সেরা বিষ

বহুতর বিষের কথা শোনা যায়। এইবার চরম বিষ আবিষ্কৃত হইল। গোলা-বারুদ-গুলী, বোমা-বিষ-গ্যাস —মানুষ মারিবার কত পন্থাই বৈজ্ঞানিকেরা উদ্ভাবন করিলেন, কিন্তু সন্তোষ কোথায়? শব্দ নাই, ধূম নাই, মৃত্যু-যন্ত্রণাও নাই, মৃত্যুর পরে অঙ্গ-বিকৃতি নাই, অচিরে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে অথচ শবদেহে বিষের কোন চিহ্নই থাকিবে না—এমনই একটা বিষের অনুসন্ধান চলিতেছিল; তাহা এখন মিলিয়াছে।

এই গরলের নাম—আদেনিয়া বিষ। আফ্রিকার গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত। তীব্রতায় ও তীক্ষ্ণতায় ইহা অদ্বিতীয়। যাহার উপর এই বিষ প্রযুক্ত হয় সেই জীবের শরীর-যন্ত্রে বিষের কোন চিহ্নই পরে লক্ষিত হয় না। এক গ্রেণ বিষের সহস্রাংশের এক ভাগে পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর প্রাণহানি ঘটে। ষ্ট্রিক্‌নাইন্‌ বা কুচিলা অপেক্ষা এই বিষের তীব্রতা নাকি পাঁচ হাজার গুণ বেশী।

পুস্তক-সমালোচনা

১। "ক্বণন"—১৬ পৃষ্ঠার ছোট্ট একখানি কাব্যগ্রন্থ। এতে চুয়ান্নটি ছোট ছোট কবিতা বা গান আছে। লেখক—শ্রীআলোকধন গঙ্গোপাধ্যায়। এ লেখকের রচনার সহিত পূর্ব্বে আমার কখনও পরিচয় হয় নি। বোধহয় এই ক্বণনই তাঁর প্রথম রচনা; ক্বণন পড়ে অন্ততঃ তাই মনে হয়। লেখার অনেক স্থানেই ছন্দ-পতন আছে, কিন্তু সেটা মারাত্মক দোষ নয়। মারাত্মক হচ্ছে লেখায় রসের অভাব। কবিতা বা গানগুলি আগাগোড়া সম্পূর্ণ নীরস, প্রাণহীন। শুধু তাই নয়, লেখা অনেক স্থলেই অর্থহীন, স্থানে স্থানে নিতান্ত বালকোচিত, হাস্যকর। এরূপ লেখার বিস্তারিত সমালোচনা অনাবশ্যক।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশ গুপ্ত

২। "পদ্মরাগ"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ, বি-এল প্রণীত। রামধনু কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। দাম চৌদ্দ আনা।

এটি একটি ডিটেক্টিভ উপন্যাস। ছোট ছেলেদের জন্য প্রধানতঃ লেখা। কিন্তু পড়ে দেখলাম, প্রাপ্ত-বয়স্ক পাঠকেরাও এই উপন্যাসটি পড়ে প্রচুর আনন্দ পাবেন। বইখানি পড়্‌তে আরম্ভ করে আর শেষ না করে থাক্‌তে পারি নি। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ যতই এগোতে লাগলাম, আখ্যানবস্তুর রহস্য ততই ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যে-সব ব্যস্ত পাঠকেরা অল্প একটু অবসর কালে চিত্ত-বিনোদন করবার জন্য বইখানি নিয়ে বস্‌বেন, তাঁদের একটু সাবধান করে দেওয়া ভাল,—তাঁরা যেন একটু বিবেচনা করে বইখানি নিয়ে বসেন,—নইলে পরে কাজ পণ্ড হ'বার বিশেষ আশঙ্কা আছে।

মনোরঞ্জন বাবুর ডিটেক্টিভ গল্প লিখ্‌বার বেশ হাত আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। হয় ত বা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কনান্‌ডয়েল্‌ তাঁর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। আশা করি, তিনি বাংলা সাহিত্যকে আরো অনেক ডিটেক্টিভ উপন্যাস দান করবেন। তাঁর এ বইখানি পড়ে আমরা বিশেষ প্রীত হ'য়েছি।

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

এই গাঁয়ে তুমি রহিও গো মেয়ে

শ্রীযুক্ত জসীম্ উদ্দীন

এই গাঁয়ে তুমি ঘুমাইও মেয়ে, ফুল কলিকার পাতে ;
অলস দেহটি সোহাগে মেলিয়া স্বপন গাঁথিও রাতে।
বিদেশী বাতাস আঁচল নাড়িবে, অলক ছড়ায়ে যাবে ;
গায়েতে মাখিবে ফুলের সুবাস তুমি নাহি টের পাবে।
পহেলী উষার নয়া মেঘ ভাঙা সিঁদুর গুঁড়ার রাশি,
তোমার কোমল কমল-অধরে ছড়ায়ে পড়িবে আসি।
তখন তুমিও মেলিও নয়ন, শিথিল বসনখানি ;
ফুলেল বাতাসে ধৌত করিয়া অঙ্গে লইও টানি।
নয়ন মুছিও পদ্মপাতায়, অঢেল কেয়ারে চিরে
রেণুগুলি তার সারাটি অঙ্গে মাখাইও ধীরে ধীরে।

উতলা পবন যদি বহে জোরে বাঁধিও না তবে চুল,
ও বদনশশী অলকে ঢাকিলে হইও না নির্ভুল।
পথে যেতে যদি গাছের শাখায় আঁচল জড়াতে চায়,
না হয় থামিও, সুদীর্ঘ দিন সমুখেতে দোল খায়।
যদি ডাকে পাখী 'বউ কথা কও' তারে গাল নাহি দিও,
যদি পায়ে বাজে পায়ের নূপুর সে কথা কানে না নিও।
অতশত ভাবা তোমারে কি সাজে, মিহি সুরে গান গেয়ে
তুমি চ'লে যেয়ো আপনার মনে গেঁয়ো পথখানি বেয়ে।

এই গাঁয়ে তুমি রহিও গো মেয়ে, এ গাঁয়ের তরুলতা
তোমার সারাটি অঙ্গে জড়াবে যার যত কোমলতা।
কচি সীমলতা বাহুতে বাঁধিও, খোঁপায় দোপাটি ফুল,
মাঠের কুসুম ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পরিও কানের দুল।
নয়ন ভাসায় ডালায় ধরিয়া দূর আকাশের গান
পাখীরা নিতুই আসিবে তোমার ভরিতে ফুলের প্রাণ।
এই পথ দিয়ে চলিবে যখন শাল বীথিকার ছায়,
মৃদু ফুলরেণু ঝরিয়া পড়িবে তোমার সারাটি গায়।

এই গাঁয়ে তুমি রহিও গো মেয়ে, গ্রাম দেবতার কাছে ;
নীরবে কহিও ছোট মনে তব যত না বাসনা আছে।
দেউল তাহার যত না সাজিবে তব পূজা ফুল পেয়ে,
তোমার একটি প্রণামে সাজিবে শতগুণ তার চেয়ে।
রাতে গেঁয়ো ঘরে জ্বালাইও দীপ, ঘর-হারা পরবাসী
বন্ধুর পথে চলিতে চলিতে দেখিবে তাহার হাসি।

ঝরা পাতার বিদায়

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ,

ফুলের কুঁড়ি ! মঞ্জরী লো ! মুকুল ভাই !
আজকে আমি সবার কাছে বিদায় চাই।
মাটীর মায়ের ডাক এসেছে, ব্যাকুল মন—
আজ যে আমার ঝ'রে যাবার লগ্ন-ক্ষণ !
দু'চোক ছেয়ে আসছে নেমে শেষের ঘুম,
চাই যে আজি মায়ের বুকের স্নেহের চুম !
সাজ আমার হাওয়ার তালে দোল-খাওয়া,—
ভোরের আলোয় মন রাঙিয়ে গান গাওয়া।
বক্ষে যনায় বিদায়-ব্যথার কান্না গো,
তবুও আমায় যেতেই হবে—আর না গো।
ঐ যে ধূলো—শুক্‌নো-ঘাসের আস্তরণ,
আমার প্রিয় শয্যা, আমার শেষ শরণ,
ঐ মাটী হায় ওই তো আমার মন টানে,
মায়ের বুকের সোহাগ ঘনায় ওই খানে।
মরণ ! এস, পাগলা হাওয়ার পাল তুলে,
দোলন্ দিয়ে বোঁটার বাঁধন দাও খুলে।
ভোরের বাতাস ! সন্ধ্যাতারা ! পথিক কুল !
পাহাড়-কাটা ঝর্‌ণা ! ওগো বনের ফুল !

আজ যে আমার ডাক এনেছে ফাল্গুনবায়,
তোমরা সবাই হাস্ত মুখে দাও বিদায় !
বিজন ব্যথা ! ভাবনা কিগো ! একটী রাত !
কাল সকালেই মঞ্জরিবে নতুন পাত ;
শুক্‌নো বোঁটা সজীবতার বল লবে,
রিক্ত এ ডাল নাচবে কচি পল্লবে !
স্মৃতির দহন রইবে না'ক আর মনে,
মলয় হাওয়ার শীতল অভিনন্দনে।
আমিই শুধু রইব ঘুমে, হায় গো হায়,
মাটীর মায়ের ডাক এসেছে, দাও বিদায় !
শালিক পাখী ! বন-বুলবুল ! চন্দনা !
গাইবে নাকি আমার বিদায়-বন্দনা !
কতদিন যে মৌন সাঁঝে ভোর রাতে
ভরলে এ বুক বিমল গানের ঝর্‌ণাতে,
শুনব না আর তোমাদের সে মধুর তান—
পাত্-নাচানো—ফুল-ফোটানো—মিষ্টিগান !
আজ তোমাদের ছাড়তে হবে, কি দায় গো !
যাই ঝ'রে যাই মাটীর বুকে—বিদায় গো !

নানা কথা

রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট-বক্তৃতা

বিগত মে মাসে অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথ যে হিবার্ট-বক্তৃতা দিয়াছিলেন—তাহা সম্প্রতি "Religion of Man" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। দেখিলাম, বইখানিতে বক্তৃতার বিষয়টি পুস্তকোপযোগী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া পুনরায় সাজানো হইয়াছে। বক্তৃতার এই নূতন রূপটি পাঠকদের পক্ষে যে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানুষ, বিশ্ব ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া যে সমস্ত গভীর কথাগুলি বক্তৃতায় আলোচিত হইয়াছিল, গ্রন্থাকারে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদের ভিতর সেগুলি অপেক্ষাকৃত অনায়াসেই পাঠকের ধারণা ও আয়ত্তের অধীন হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের মনে হয় শুধু এই বইখানি প্রকাশের জন্য, বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসটা একটা স্মরণীয় তারিখ হইয়া থাকিবে। অক্সফোর্ডে এই বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল এবং মনে আছে তখন ইংলণ্ডের সুধীসমাজ কী রকম চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমাদের সে অভিজ্ঞতা জীবনে কোনো দিন ভুলিবার নয়। সে অভিজ্ঞতা শুধু গভীর কথা গম্ভীর সুরে শোনার অভিজ্ঞতা নয়, মর্ম্মস্পর্শী সত্যকথা শুনিয়া চমৎকৃত হইবার অভিজ্ঞতাও নয়। যাহা শুনিয়াছিলাম,—তাহা আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়াছিল। বিশ্বটাকে যেন নূতন করিয়া দেখিলাম তার সত্যরূপে, এবং সেই রূপের মধ্যে আপনার বৃহত্তর রূপটিও উপলব্ধি করিলাম। এ দৃষ্টি এমনই সহজ ও সরল, যে মনে হইল,—কী আশ্চর্য্য—এতদিন বুঝি নয়ন মেলিবারই অপেক্ষা ছিল। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি,—ইহার মধ্যে কবির কল্পনা-দৃষ্টি ও দার্শনিকের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি কী অবলীলাক্রমে মিলিয়া কত বিভিন্ন ধারার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এই পরিণতির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে!

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কবি,—তা' নয়,—তিনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও বটে,—একথা আমরা চিরদিনই বলিয়া আসিয়াছি, এবং আমাদের কথা যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ তাঁহার বহু গদ্য রচনার মধ্যেই ঝুরি ঝুরি রহিয়াছে। সে সব না পড়িয়াই যাঁহারা আমাদের কথার প্রতিবাদ করিতেন, "Religion of Man" বইখানি পড়িয়া তাঁহারা সে স্পর্দ্ধা নিঃসন্দেহেই হারাইবেন। কিন্তু বইখানির মূল্য শুধু এইটুকু নয়। রবীন্দ্রনাথকে একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করাটা "Religion of Man" বইখানির সব চেয়ে অপ্রধান ও অপ্রয়োজনীয় কাজ।

যে জন্য বইখানি বিশ্ব-সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে,—সে কাজ আর কিছু নয়,—এই······মানুষের চিন্তা-স্রোতের ধারাটি একটুখানি বাঁকাইয়া দেওয়া,—তাহার দৃষ্টি-ভঙ্গিটির এমন একটু পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া যে মানুষ অতি সহজেই বিশ্বের মধ্যে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নির্ব্বিবাদে নূতন নূতন সৃষ্টির মধ্যে আত্ম-প্রকাশ ও আত্ম-প্রসারণ করিতে পারিবে। পৃথক-প্রবন্ধ আকারে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা আশা করি, দেশ-বিদেশে আমাদের চেয়ে অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি এই বিষয়ে আলোচনা করিবেন। তবুও কেমন মনে হয় এমন একখানি বইএর সম্যক্ ধারণা ও আলোচনা এখনই এখনই এই যুগেই সম্ভব না হইতে পারে। যে সৃষ্টির বীজমন্ত্র ইহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহার পরিণতি সময়-সাপেক্ষ। প্রতিকূল বাধাও বিস্তর। তাই আজ কেবল স্বপ্নই দেখিতেছি,—হয় ত বা 'আজি হ'তে শত বর্ষ পরে' কোনো দিন কোনো বিদেশী চিন্তাবীর আমাদের এই বাংলাদেশে আসিয়া মনে করিবেন যে এই সেই দেশ,—যে দেশের কবি এক দিন সাগর পার হইয়া আসিয়া বিংশ শতাব্দীর নূতন যুগের সৃষ্টি-প্রেরণাকে কী প্রাচুর্য্যের দিকেই না ঠেলা দিয়া গিয়াছিলেন!

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

পল্লীসম্পদ-রক্ষা সমিতি

পল্লীর সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনে অক্লান্ত কর্ম্মী দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ মহাশয়ের পরিচয় বাংলা দেশে কাহারো অবিদিত নাই। অবসরহীন রাজকর্ম্মের সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া ইঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত অবজ্ঞাত পল্লীর নিরানন্দ ক্রোড়ে। আধি-ব্যাধি-অভাবপীড়িতা পল্লীজননীকে গৌরব ও সমৃদ্ধির আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত ইনি গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি নবতন উপায়ে দেশসেবা করিবার উদ্দেশ্যে দত্ত মহাশয় বীরভূম শিউড়ীতে "পল্লীসম্পদ-রক্ষা সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত করিয়াছেন। শিক্ষিত এবং সম্পন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনাদৃত পল্লীর অন্ধকার ক্রোড়ে যে সকল সম্পদ অজ্ঞাত এবং অবজ্ঞাত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে সেই সকলের উদ্ধার এবং সংরক্ষণের জন্য এই সমিতির উদ্ভব। সমিতির যে অনুষ্ঠানপত্র আমরা পাইয়াছি তাহাতে সমিতির উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে :— (ক) দেশের প্রাচীন লোকসঙ্গীত (লোক-গীত ও লোক-নৃত্য) উদ্ধার ও সংরক্ষণ, (খ) বিলুপ্তপ্রায় গ্রাম্য কথাসাহিত্য ও আলপনা প্রভৃতি গ্রাম্য সূক্ষ্ম শিল্পকলার পুনরুদ্ধার ও (গ) বিলুপ্তপ্রায় গ্রাম্য ক্রীড়া কৌতুকের পুনঃপ্রচলন। এই উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য একটি কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "পল্লীসম্পদ" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থাও আছে।

আমরা ঐকান্তিক চিত্তে দত্ত মহাশয়ের এই মহৎ অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করি। ইহার জন্য বাংলা দেশের সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ পল্লীবাসীগণের, সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্তভাবে আবশ্যক। পল্লীসম্পদ সম্বন্ধে কেহও কোন সন্ধান বা সংবাদ পাইলে শিউড়ীর কেন্দ্র সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বগলাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্-এর নামে তাহা পাঠাইয়া দিলে সমিতিকে বিশেষ সাহায্য করা হইবে।

শিউড়ী কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত যে অভিভাষণ করেন এবং পরে যাহা "বাংলার পল্লীসম্পদ" নামে প্রবন্ধাকারে ফাল্গুনের "বঙ্গলক্ষ্মী"তে প্রকাশিত হয়, আমরা নিম্নে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম। উহার দ্বারা "পল্লীসম্পদরক্ষা সমিতি"র প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইবে।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের প্রবন্ধের সারাংশ

* * *

লোক-গীত ও লোক-নৃত্য

এগুলি ছাড়া এই প্রদর্শনীতে একটা নূতন বিষয়ের চেষ্টাও আজ বাংলা দেশে নূতন করিয়া করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমি এই নূতন প্রচেষ্টাকে এতই মূল্যবান বলিয়া মনে করি যে, আমি আশা করি, এই বিষয়ে মন্ত্রী বাহাদুর * এবং দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি বিশেষ করিয়া লাভ করিতে সমর্থ হইব। এই নূতন প্রচেষ্টার বিষয় —বাংলার বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন লোক-গীত ও লোক-নৃত্যের (Folk song and Folk dance) পুনরুদ্ধার, রক্ষা ও পুনঃপ্রচলন।

নৃত্যগীত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

নাচগান সম্বন্ধে বাংলা দেশে আজকাল কোন কথা বলিতে, একটু কেন, বিশেষ ভাবেই ভয় হয়। কেন না, দেশের জনমতের মধ্যে এবিষয়ে একটা বিকৃত ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। নৃত্যগীত—বিশেষতঃ নৃত্য আদতেই একটা খারাপ জিনিষ বলিয়া লোকের বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এদেশে প্রাচীন কালে যে এভাব ছিল না তাহা ঠিক। এই দেশের শাস্ত্রে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারের সঙ্গে মহাদেবের তাণ্ডব-নৃত্যের কথা এখনও প্রচলিত আছে। এবং এদেশেই স্বয়ং নারদমুনির নির্ম্মল নৃত্যগীতের উদ্দীপনায় যে মানুষ অনুপ্রেরণা পাইয়াছে তাহার কাহিনীতেও সংহিতা ও পুরাণ ইত্যাদি পরিপূর্ণ। আবার এই দেশেতেই গৌর-নিতাই নাচিয়া গাহিয়া ভক্তি-

* উদ্বোধন সভায় সভাপতি কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী খান্ বাহাদুর মাননীয় কে, জি, এম্, ফারোকি।

রসের প্লাবনধারা বহাইয়া দিয়াছিলেন এবং কত দুরাচার পাপীর জীবন সেই নির্ম্মল ধারায় বিধৌত করিয়া নিতান্ত করিয়াছিলেন। * * *

প্রাচীন নৃত্যগীতে নির্ম্মল ও সহজ আনন্দ

* * * সৌভাগ্যবশতঃ আমার ছেলেবেলা আমি কাটাইয়াছিলাম বাংলার এক সুদূর কোণের নিভৃত পল্লীতে। আজকাল তার কথা মনে হইলে মনে হয়, সে যেন এক অতীত যুগের কথা। তখনও সেই সুদূর পল্লীর কোন লোক আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পায় নাই। আমার বাল্যকালের সেই পল্লীর জীবন ছিল নির্ম্মল নৃত্যগীতে ভরা। বাউলরা গাহিয়া কোন কুৎসিত ভাব মনে স্বপ্নেও আনে নাই। কাজেই আমার ছেলেবেলায় আমি শিখিয়াছিলাম যে, লোকগীত এবং লোকনৃত্য একটা পরম নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ জিনিষ এবং তাহা জাতির জীবনে নানা দিক হইতে আনন্দের স্ফুরণের সহায়তা করে। স্বাস্থ্যের দিক হইতেও যে এই সকল প্রাচীন লোক-নৃত্যের নির্দ্দোষ ভাবে অঙ্গসঞ্চালনের ব্যায়াম হিসাবে একটা বিশেষ মূল্য ছিল, এ বিষয়ে তখন ভাবি নাই কিন্তু এখন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। * * *

নৃত্যগীতে ধর্ম্মসমন্বয়

আর শুধু বাহিরের দিক হইতেই নয়, শিক্ষার দিক হই-



জারি গান ও নৃত্য—সিউড়ী প্রদর্শনী

[সম্মুখের বৃদ্ধ লোকটি 'বয়াতী'—শ্রীযুক্ত দত্ত এবং একজিবিশান-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে পদক-পুরস্কার-প্রাপ্ত]

গাহিয়া নাচিত,—মুসলমানরা মহরমের সময় জারি গান গাহিয়া গাহিয়া নাচিত, এবং সারি গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচিত, এমন কি, হিন্দুদের দুর্গাপূজার সময় তাহারা নৌকা-বাচের অভিনয় করিয়া গাহিত ও নাচিত। ছেলেবেলায় আমরাও তাহাদের সহিত গাহিয়াছি ও নাচিয়াছি। এমন কি, আমাদের গ্রামের ভদ্রমহিলারাও বিবাহ, ব্রত ইত্যাদি নানা পর্ব্ব এবং 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদি উৎসব উপলক্ষে অতি সহজ ও নির্ম্মল ভাবে গাহিয়া গাহিয়া নাচিয়াছেন। তাহাতে কেহ কখনও তেও তাহার মূল্য ছিল খুব বড়। সেই স্বজন-প্রচলিত বাউলের গানে, জারি গানে ও কীর্ত্তনের গানে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মসমন্বয়ের কি যে একটা সুন্দর ভাব ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং জাতির বহুযুগের অর্জ্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডারের বড় বড় সত্যগুলি সহজ কথায় সাধারণের বোধগম্যরূপে গানের সুরের মধ্য দিয়া কি সুন্দর ভাবে ইতরভদ্র সকল নরনারীর মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া উদ্দীপনার সঞ্চার করিত, তাহা এখন বুঝিতে পারি।

আধুনিক শিক্ষায় রুচিবিকার

গ্রাম ছাড়িয়া যখন জেলায় হাইস্কুলে এবং তারপর কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিলাম; তখন দেখিলাম যে, সহরের লোক নাচগানকে কুভাবে দেখে—বিশেষতঃ নাচকে তাহারা খুবই কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছে। সহরে এইরূপ কয়েকটা বছর থাকিবার পর আমার সেই অতীত পল্লীজীবনের সহজ নির্ম্মল নৃত্যগীতের কথা যেন একটা স্বপ্নের মত অপ্রকৃত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমন কি, আমাদের



রাইবিশে (রায়বেঁশে) নৃত্য—শিউড়ী প্রদর্শনী

আধুনিক শিক্ষার ধারার ফলে, সেগুলি একটা বর্ব্বরতা ও কুসংস্কারমূলক প্রথা—মনে অনেকটা এইরূপ ধারণা হইয়া গিয়াছিল।

য়ুরোপে লোক-সঙ্গীতের পুনঃপ্রবর্ত্তন

সম্প্রতি য়ুরোপের নানাদেশ ঘুরিয়া দেখিলাম লোক-সঙ্গীতের স্থান জাতীয় জীবনের শিক্ষাক্ষেত্রের কতবড় একটা সম্পদ। সেখানে দেখিলাম যে, প্রত্যেক দেশে প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় লোক-গীত ও লোকনৃত্যের পুনরুদ্ধারের বিরাট প্রচেষ্টা চলিতেছে, এবং সকলশ্রেণীর লোককে সেগুলি শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। * * *

দেশের এইসব মহামূল্য লোক-গীত ও লোক-নৃত্যের প্রচলন আমাদের দেশে যত ছিল অন্যদেশে তত ছিল না। অন্যান্য দেশে এখন এইগুলি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের মহাসৌভাগ্য বশতঃ দেশের যেসব শ্রেণীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষার ধারা এখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহারা এখনও এইসব মূল্যবান জাতীয় সম্পদকে সযত্নে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। আপনারা এই সম্পদের উদাহরণ পাইবেন আমাদের দেশের হিন্দু ও মুসলমান বাউলের গানে ও নৃত্যে, পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের জারি গান ও নৃত্যে। * * *

এই মুসলমান জারির দলকে সুদূর ময়মনসিংহ হইতে আনাইতে প্রদর্শনী কমিটির প্রভূত ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে যদি এই মহামূল্য পল্লীসম্পদগুলির প্রকৃত পরিচয় দেশের লোক আবার লাভ করে এবং ইহার পুনরুদ্ধার ও ব্যাপকভাবে পুনঃ প্রচলনের প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে

দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়, তাহা হইলে এই ব্যয় সার্থক হইবে।

পল্লীবাসীর যান্ত্রিক কুশলতা

আমাদের পল্লীসম্পদের দুইটি আবিষ্কার এই প্রদর্শনীতে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রথম আবিষ্কার—পল্লীবাসীর যান্ত্রিক কুশলতা। জয়দেব কেন্দুলীর পার্শ্ববর্তী 'টিকরবেথা' নামক একটি গ্রামে একদিন গিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম যে, সেই গ্রামের একজন সামান্য অশিক্ষিত কর্ম্মকার, পাশ্চাত্য বিখ্যাত পেট্রোমাক্স ডেলাইট আলোর অনুকরণে '১০০০ বাতির শক্তিসম্পন্ন' একটি আলো তৈয়ারী করিয়াছে, এবং স্ক্রু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্ট্যাণ্ড, মিটার ইত্যাদি প্রত্যেক অংশ, কাহারও সাহায্য না লইয়া, বা বাজারে না কিনিয়া, নিজেই নিজের ঘরে প্রস্তুত করিয়াছে। ইহার অসাধারণ যন্ত্রকুশলতা দেখিয়া আমি এবং এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান সকলেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলাম এবং বাংলার অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের মধ্যেও যে কত স্বাভাবিক প্রতিভা লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। * * *



বাউল গান ও নৃত্য—সিউড়ী প্রদর্শনী

বাংলার পল্লীতে 'রায়বেঁশে' যোদ্ধার পুনরাবিষ্কার

দ্বিতীয় আবিষ্কার - বাংলার প্রাচীন যোদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়। এখনও যে বাংলায় সহস্রবর্ষ পূর্ব্বের প্রাচীন যোদ্ধাদের বংশধরগণ বাংলায় বর্ত্তমান আছে, এবং তাহাদের মধ্যে যে এখনও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের যোদ্ধৃভাবের জীবন্ত প্রবাহ বর্ত্তমান আছে, এই কথায় অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন। কিন্তু ইহা সত্য। মাসাধিক কাল পূর্ব্বে সৌভাগ্যক্রমে এই আবিষ্কার করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। দশ বছর আগে যখন আমি দীর্ঘকাল একবার এই জেলায় ছিলাম, তখন ইহাদের পরিচয় পাইবার সুযোগ আমার হয় নাই। এবার এই জেলার লোক-নৃত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে এই সুযোগ ঘটিল। অনুসন্ধান করিতে

করিতে জানিলাম, ডোম-বাউরী জাতীয় নিম্নশ্রেণীর একদল লোক একপ্রণালীর নৃত্য করে—ইহাকে 'রাইবিশে' নৃত্য বলে। হিন্দুদের বাড়ীতে বিবাহের আনন্দ-উৎসবে এই শ্রেণীর লোকদিগের নৃত্য দেখাইবার জন্ত ডাক পড়ে। আমি ইহাদের নৃত্য দেখিবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় একটি বন্ধু আমাকে তাহাদের নৃত্য দেখাইবার আয়োজন করিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, সাঁওতাল ভীল ইত্যাদির বর্ব্বর জাতির নৃত্যের মতনই একটা কিছু দেখিব। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইলাম। যে মুহূর্ত্ত হইতেই ইহাদিগকে নৃত্য করিতে করিতে আমাদের দিকে আসিতে দেখিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ভাবিতে এই নৃত্যের এবং ভাবভঙ্গীর ভিতর দিয়া আমাদিগকে বলিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু মুখের ভাষায় তাহা ফুটাইয়া বলিতে পারিতেছে না। কারণ, যদিও তাহারা অতীতের এই নৃত্যকলাকে অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিয়াছে তবু অতীতের সেই রহস্যময় কাহিনী তাহারা নিজেই ভুলিয়া গিয়াছে।

'নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ—'

এই 'রাইবিশে' নৃত্যের রহস্য সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমাকে পাইয়া বসিল, এবং আমি ইহাদের সম্বন্ধে এই নৃত্যের তালে তাল মিলাইয়া একটি গান রচনা করিয়া ফেলিলাম। আর সেই গানে লিখিলাম—



জারি গান ও নৃত্য—শিউড়ী প্রদর্শনী

জাগিলাম—কি দেখিলাম! ইহা ত থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চের কৃত্রিম নৃত্য বা কোন অসভ্য জাতির উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য নয়। ইহাদের নৃত্য দেখিবার প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই মনে আমার সন্দেহ রহিল না যে, এই নৃত্যকলার উৎস জাতির জীবনের এবং জাতির ইতিহাসের একটা বিশেষ উচ্চস্থানে। কি ছন্দের বীরোচিত ভাবভঙ্গী,—কি সংযম,—কি অনিন্দ্য ছন্দচাতুর্য্য, এবং সকলের উপরে কি একটা যেন অনির্ব্বচনীয় রহস্যময় ভাব! যেন অতীতের কি একটা বাণী ইহারা

"নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ—
মহামূল্য জিনিষ এ।"

কেন লিখিলাম?—কি করিয়া জানিলাম? আমার মন যেন স্বতঃই বলিয়া দিল যে, ইহার সঙ্গে দেশের একটা কিছু বড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহারা যে কেবল একটা নৃত্যই দেখাইয়াছিল তাহা নহে, এমন সুন্দর ব্যায়ামকৌশল দেখাইল যাহা অপূর্ব্ব, অসাধারণ বলিয়া আমার মনে হইল। তখন হইতেই আমি অনেক সাহিত্যিক ও পণ্ডিতের কাছে

রাইবিশে' নৃত্য ও ব্যায়ামকলার উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমতঃ কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। তারপর কোন পণ্ডিত বন্ধু বলিলেন, রাজবংশী জাতের নাম হইতেই হয়ত 'রাইবিশে' নামের উৎপত্তি হইয়াছে,—হয়ত রাজবংশী জাতের লোকরাই এই নৃত্য ও ব্যায়ামকলার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। আমি এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কারণ আমি জানিতাম যে রাজবংশীদের মধ্যে এরূপ নাচের প্রচলন নাই। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহারা অনেক সময় বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে



রাইবিশে (রায়বেঁশে) নৃত্য—শিউড়ী প্রদর্শনী

স্ত্রীলোকের বেশ পরিধান করিয়া নৃত্য করে, সেই জন্যই হয়ত এই নৃত্যের "রাই-বেশ" আখ্যা লাভ হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই হয়ত ইহাদের নাম 'রাইবিশে' হইয়াছে—কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে বলিয়া তাঁহার মনে পড়িতেছে না। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই নৃত্য সামরিক নৃত্য জাতীয় এবং ইহার ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি আছেই।

আবিষ্কারের প্রমাণ

আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। [illegible] তাহার ফলে সপ্তাহকাল পরে তিনি তাঁহার 'রতন লাইব্রেরী' [illegible] করিয়া যে সকল প্রামাণ্য তথ্য-সংগ্রহ আমাকে আনিয়া দিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না যে, এই 'রাইবিশে'ই ধর্ম্মমঙ্গলের, কবিকঙ্কণ চণ্ডীর এবং অন্নদামঙ্গলের রায়বাঁশ- (ভল্ল) ধারী অমিতবীর্য্য "রায়বেঁশে" যোদ্ধা যাহারা একাদশ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান জেলার 'তারকেশ্বর' গড় হইতে মহামদ পাত্রের নেতৃত্বে 'ময়না-গড়ে' লাউসেনকে আক্রমণ করিয়াছিল,—যাহারা অতি সুদূর অতীতের গৌরবময় যুগে একদিন কলিঙ্গরাজের [illegible] সুদূর [illegible] আক্রমণ করিয়াছিল, এবং ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা মানসিংহের বিজয়বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের বর্ত্তমান দারিদ্র্য ও সামাজিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিক অবনতি সত্ত্বেও তাহারা যে সেই একাদশ শতাব্দীর বীরোচিত ভাবভঙ্গী ও সামরিক নৃত্যপ্রণালী অটুটভাবে যুগের পর যুগ সযত্নে রক্ষা করিয়া এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে,—এইসকল প্রাচীন পুস্তকে তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য ও যুদ্ধপ্রণালীর পরিচয় পাইয়া, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। এমন কি, অনেক বিষয়েই সেই প্রাচীন

বর্ণনার সঙ্গে তাহাদের বর্ত্তমান ভাবভঙ্গী হুবহু মিলিয়া গেল। * * *

নৃত্যকলার মূল্য

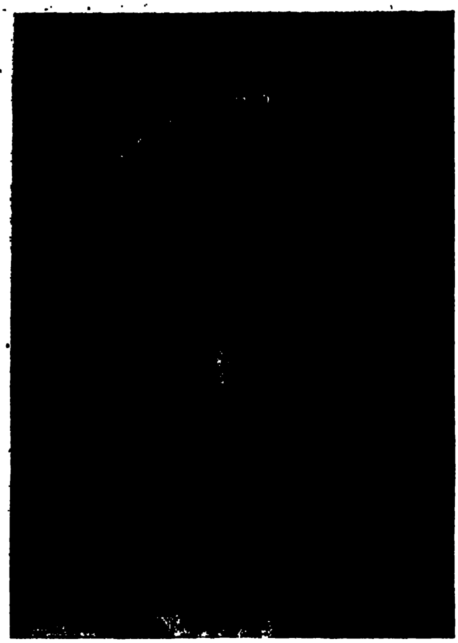
* * * এই নৃত্য প্রণালী এত সুন্দর, এত বীরত্বমণ্ডিত, সূক্ষ্মকলার এত উচ্চ আদর্শে গঠিত যে ইহা আমাদের দেশের লোকনৃত্যের মধ্যে—এমন কি পৃথিবীর লোক-নৃত্যের মধ্যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। * * * আমার অনুরোধ, দেশের লোক যেন, ইহা যে 'ছোটলোকেরাই' দেখাইতেছে এবং ইহাদের নৈতিক স্বভাব-চরিত্র সর্ব্বত্র আদর্শস্থানীয় নয়, তাহা ভুলিয়া গিয়া, সূক্ষ্ম-কলার দিক হইতেই ইহার প্রণালী গ্রহণ করিয়া ও শিক্ষা করিয়া জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধিবান করেন। যদি এখন ইহার পুনরাবিষ্কার সত্ত্বেও, আমাদের দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অবজ্ঞার ফলে ও উৎসাহের অভাবে, ইহা দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে দেশের একটি মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করিবার অপরাধের অভিশাপে আমরা অভিশপ্ত হইব। ইহার শিক্ষাপ্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে বালবৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র জাতির নৈতিক এবং শিল্পকলার আদর্শের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ব্যায়ামের উৎকর্ষসাধন হইবে, ও জাতীয় জীবনে আনন্দের নির্ম্মল ব্যবস্থার আয়োজন হইবে।

আমাদের কর্ত্তব্য

এই প্রদর্শনী-ভূমিতে আপনাদের সঙ্গে বাঙলার প্রাচীন যোদ্ধাবংশধরদের চাক্ষুষভাবে সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের সমাজের বিধানে লাঞ্ছিত-অবনত, দুর্নীতিগ্রস্ত ও দুর্ভাগ্যময় জীবনের ভিতর দিয়াও যে তাহারা দেশের প্রাচীন এই উচ্চ সূক্ষ্মকলাকে আমাদের জন্য সযত্নে যুগের পর যুগ অভ্যাস করিয়া, রক্ষা করিয়া আসিয়া উপহার দিয়াছে, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আমরা তাহাদের কি দিব? আমার মনে হয়, আমরা যদি ইহার প্রতিদানে পুনরায় তাহাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া, তাহাদিগকে আর্থিক ও নৈতিক জীবনের অবনতির দুঃখময় গহ্বর হইতে টানিয়া তুলিতে সাহায্য করিতে পারি, এবং তাহাদের অবজ্ঞাপীড়িত এই মহামূল্য কলাবিদ্যাকে জাতীয় জীবনে উচ্চস্থান প্রদান করিতে পারি, তাহা হইলেই তাহাদের প্রতি এবং দেশের প্রতি দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইবে।

দেবর সূর্য্য-সেন

এই সিংহলবাসী গায়ক বাঙালী সমাজে তেমন সুপরিচিত কি-না জানিনা, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতায় কয়েকটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীতরস-পিপাসুদের বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছেন। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় নানা ভাষায় গান গাহিয়া তিনি অপরূপ রস-সৃষ্টি করিতে পারেন; এবং য়ুরোপের নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া সেখানকার সঙ্গীত-সমাজে তিনি



দেবর সূর্য্য-সেন

প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি সিংহলের একটি বিশিষ্ট অভিজাত বংশের সন্তান; ইঁহার পিতা পরলোকগত সার জেম্স্ পিরিস (Sir James Peiris) সিংহল দেশের একজন সুবিখ্যাত রাষ্ট্রনেতা ও কয়েক বৎসর যাবৎ তথাকার লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লির ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। অল্প

বয়সেই ইনি শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যান, এবং সেখানকার স্কুলেই সঙ্গীতকলার চর্চ্চা আরম্ভ করেন। কেম্ব্রিজ হইতে ইতিহাস ও আইনে বি-এ ও এল্-এল-বি ডিগ্রী লইয়া লণ্ডনে আসিয়া ব্যারিষ্টার হন,—কিন্তু চিরকালই তিনি সঙ্গীত-বিদ্যারই অধিকতর উৎসাহী ছাত্র। সঙ্গীতের নানা পরীক্ষায় প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়া অবশেষে এ-আর-সি-এম্ (Associate of the Royal College of Music) ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি এ ব্যবসা করেন নাই,—বাগ্মীর সম্মান অপেক্ষা গায়কের সম্মানই তাঁহাকে বেশী করিয়া আকর্ষণ করিল। এখন তাঁহার বয়স মাত্র বত্রিশ বৎসর।

সেদিন অকস্মাৎ একটা রেলগাড়ির কামরায় তাঁহার সঙ্গে পরিচয়লাভের সৌভাগ্য হইল। কথায় কথায় তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই আমায় ত্যাগ করিয়াছেন,—কেন না তাঁহাদের বিশ্বাস, ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া গান গাহিয়া গাহিয়া আমি জীবনটাকে নষ্ট করিতে বসিয়াছি।" কথাটা কৌতুকছলে বলা বটে,—কিন্তু ইহার মধ্যে আমাদের দেশবাসীর যে-মনোভাবটির প্রতি কটাক্ষ রহিয়াছে,—সেটি প্রশংসনীয় নয়। আমাদের সমাজ বা আমাদের সরকার আমাদের দেশের সঙ্গীত বা অন্য কোনো কলা-বিদ্যার চর্চ্চার জন্য যথেষ্ট উৎসাহও দেয় না, বা উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যেরও ব্যবস্থা করে নাই, ইহা দুঃখের বিষয়।

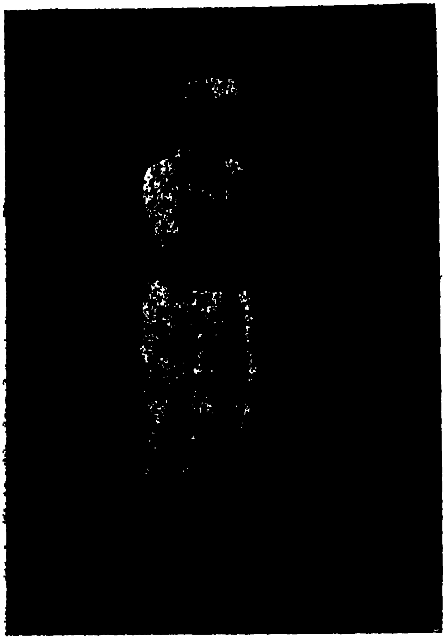
সেদিন তাঁহার সহিত অনেক কথাই হইয়াছিল। সাধারণ পাঠকের সে সব কথা ভালো লাগিতে পারে, এই বিবেচনায় তাহার সারাংশটি এখানে বিবৃত করিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, "আমার দেশের (সিংহলের) জাতীয় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার করাটা আমার জীবনের একটা বড়ো কাজ। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত যে একদিন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল,—প্রাচীন সিংহলী সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বংশানুক্রমে সিংহল-রাজারা সঙ্গীতের প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সভাতেই সঙ্গীতজ্ঞের উচ্চাসন ছিল। সিংহলের প্রাচীন রাজধানীতে নাট্যমঞ্চের বহুল প্রচার ছিল। এমন কি রাজাদের মধ্যেও অনেকেই যে সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতালাভ করিয়াছিলেন,—তাহার অনেক প্রমাণ আছে। রাজারাও তাঁহাদের সঙ্গীত-কৌশলের জন্য তখনকার গুণী সমাজের নিকট হইতে উপাধি গ্রহণ করিতেন।

"কিন্তু হায়!" গভীর বেদনার সঙ্গে সূর্য্যসেন বলিতে লাগিলেন, "লঙ্কার ইতিহাস বড়ই করুণ! দক্ষিণ-ভারতের নানাপ্রদেশ হইতে নিরন্তর আক্রমণে সিংহল বারবার দলিত হইয়াছে, তাই তাহার সাধনার সম্যক ফললাভ হয় নাই। তার উপর আবার বিদেশীর অধিকার। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজরা, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডাচেরা এবং শেষ পর্য্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ইংরাজ আসিয়া সিংহলের ললিত-কলা, সঙ্গীত এবং সাধারণ কাল্‌চার যাহা কিছু ছিল,—সমস্তই বিলুপ্ত করিয়া দিবার সহায়তা করিল। শেষ পর্য্যন্ত আমরা শুনিলাম,—এমন কি সিংহলী পণ্ডিতদের মুখেও শুনিলাম, যে সিংহলী সঙ্গীত যাহা কিছু ছিল,—সমস্তই নিঃশেষে মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের পুনরুদ্ধারের আর কোনই আশা নাই।

"বিশ্বাস হইল না। এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। এবং সৌভাগ্য-ক্রমে কিছু কিছু সূত্র আবিষ্কারও করিলাম। এক সূত্র হইতে অন্য সূত্রের সন্ধান মিলিল। এমনি করিয়া অনুসন্ধান আজও চালাইতেছি,—আমার আশা আছে এমনি করিয়া সূত্রগুলি গাঁথিয়া একদিন একটা সমগ্র সঙ্গীতশাস্ত্র খাড়া করিয়া তুলিতে পারিব। যেটুকু আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, তাহাতে একটা জিনিষ আমার বড় আশ্চর্য্য ঠেকে। আমাদের সিংহলী সঙ্গীতের ঢঙ্ সমস্তই উত্তর-ভারতের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঢঙ্ থেকে নেওয়া, দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটী সঙ্গীতের ঢঙ্ থেকে নয়। প্রাচীনকালে প্রচলিত যে সমস্ত রাগের নাম পুরাণো পুঁথিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই হিন্দুস্থানী রাগের নামের সঙ্গে মিলিয়া যায়।

"এই সঙ্গে সঙ্গে আমি সিংহলী লোক-সঙ্গীতও বিস্মৃতির গর্ভ হইতে পুনরুদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। কাজটি সহজ নয়। পর্ব্বত-প্রমাণ ধূলির মধ্যে কত না রত্ন

লুকানো আছে,—তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে! সম্প্রতি কয়েকটি সাধারণ কন্‌সার্টে আমার স্বদেশবাসীকে এই লোক-সঙ্গীত অনেকগুলি শুনাইয়াছিলাম। সেগুলি শুনিয়া তাহাদের যে উল্লাস, তাহা কল্পনাই করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।



রবাণ হাতে সিংহলী গায়ক সূর্য্য সেন।
সিংহলের লোক-সঙ্গীতে রবাণ প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

"এই সমস্ত কাজের মধ্যে একটি বিষয়ে আমি বিশেষ করিয়া মনোযোগ দিতে চাই এবং সমস্ত ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই,—সেটি হইতেছে কণ্ঠস্বরের যথাবিধি চর্চ্চা। কণ্ঠস্বরের নিয়মিত চর্চ্চা না করিলে সঙ্গীতশাস্ত্রে ভারতের যে দান,—তাহা কোনো দিন সার্থক হইবে না। পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রে কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা ও মিষ্টতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে গায়কেরা ওস্তাদী খোঁচ খাচ গুলি লইয়াই তাহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া ফেলে, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যের দিকে তেমন দৃষ্টি রাখে না। ভারতীয় সঙ্গীতের যে বিশিষ্ট ভঙ্গি গানের মধ্যে একটা মিস্টিক্ ব্যাকুলতা ফুটাইয়া তোলে, তাহার সহিত যদি একটা নিখুঁত সুমধুর কণ্ঠস্বর মিলাইয়া দেওয়া যায়,—তাহা হইলে ভারতীয় সঙ্গীত কী না সাধন করিতে পারে? জোর করিয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে একদিন ভারতীয় সঙ্গীত শুনিয়া সমস্ত পাশ্চাত্যদেশ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া যাইবে।" শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র

নিখিল-বঙ্গ ছাত্র-সম্মেলন

গত মার্চ্চ মাসে বাগবাজারস্থ ৺পশুপতি নাথ বসুর গৃহে উক্ত সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চানসেলার দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সি, আর, রেড্ডী মহাশয় অধিবেশনের উদ্বোধন কালে একটি সারবান বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ছাত্র সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য, এবং ছাত্র-জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন মাদ্রাজের জনাদৃতা দেশনেত্রী হায়দ্রাবাদের কবি শ্রীযুক্ত হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার বক্তৃতার ওজস্বিনী ভাষা, ভাব-সম্পদ এবং সারগর্ভ উপদেশ-বাণী নানা জেলা হইতে সভায় উপনীত ছাত্রবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির অধিনায়ক শ্রীযুক্ত জগদ্ধাত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করেন। কেমন করিয়া বাঙলাদেশে ধীরে ধীরে ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হইল, তাহার পর কেমন করিয়া অবশেষে নিখিল-বঙ্গ ছাত্র-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং দেশের এই যুগসন্ধি-ক্ষণে ছাত্রদের কর্ত্তব্য কোন্ পথে নিহিত তদ্বিষয়ে তিনি সুদীর্ঘ আলোচনা করেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শারীরিক বাধা বশতঃ সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শান্তি-নিকেতন হইতে তিনি সমিতির কল্যাণে যে আশীর্ব্বচন পাঠাইয়াছিলেন আমরা তাহা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।

আশীর্ব্বচন

আপনাদের সমস্ত কথা আমি শুনেচি, কিন্তু আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ এবং সেই কারণে আপনাদের সম্মেলনে আমি যেতে পারবো না। সব কাজেরই সময় আছে, আমারও যখন সময় ছিলো কাজ করেচি। এখন আমার কর্ম্মক্ষেত্রে একটা সীমানার দাগ টেনে দিতে হচ্চে। আমি

যে এখনো আছি এই আশ্চর্য্য। বাংলা দেশের পরমায়ুর তুলনায় আমার আজো বেঁচে থাকা অসঙ্গত, কিন্তু সে জন্যে আমি দায়ী নই। মনুসংহিতার একটা বিধান আমি মানি। বয়স অনুসারে কর্ম্মের বিভাগ এবং পরিশেষ আছে। আপনাদের কাছে যেতে পারলাম না ব'লে মাপ করবেন। আপনাদের ছাত্র-সম্প্রদায়কে আমি আশীর্ব্বাদ করি। ছাত্ররা আমার প্রিয়। আমার এখানে যারা আছে আমার শুভ ইচ্ছার পরে তাদের যতখানি দাবী, এর বাইরে যারা আছে তাদেরও দাবী তার চেয়ে কম হবে কেন। বাইরের দিকে এখানে তাদের সকলের স্থান থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু এই আশ্রমেরই একটি অন্তরের দিক আছে সেখানে তাদের সকলের অধিকার।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বাংলার ছাত্রদের কল্যাণ কামনা করি। তাদের সাধনা মহৎ হোক্, দুর্গম পথে তারা মনুষ্যত্বের সিদ্ধিলাভ করুক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট্ শিল্প-প্রদর্শনী

গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের দ্বিতীয় বার্ষিক কারু-শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। চিত্রকলা বিভাগে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, হেমেন্দ্রনাথ, য়্যালেক্স্ টেলার, ভোলা চট্টোপাধ্যায়, ব্রতীন ঠাকুর এবং অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীর শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহ ব্যতীত ছাত্রছাত্রী কর্ত্তৃক অঙ্কিত বহুবিধ চিত্র রসগ্রাহী দর্শকমণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। শান্তিনিকেতনের শ্রীমতী বাণী দেবীর চিত্র এবং ডায়োসিসন্ কলেজের শ্রীমতী সুরভী চট্টোপাধ্যায়ের শোভন-শিল্প এবং জেসো কার্য্যের (Gesso painting) নমুনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ বিভাগের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া তাঁহারা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। 'চিত্রণ' রচয়িত্রী শ্রীমতী প্রকৃতি দেবীর স্বহস্ত-রচিত ভারতীয় কারুশিল্পখচিত অটোগ্রাফের খাতাগুলি প্রদর্শনীর একটি প্রধান আকর্ষণের বস্তুরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

প্রদর্শনীতে সর্ব্ব-সমেত ৭৪৮ খানি চিত্র এবং ১৫২ প্রকারের সূচি-শিল্প, শোভন-শিল্প এবং কারু-শিল্পের অন্যান্য বিভাগের নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শিল্পকলার উন্নতির জন্য ইন্‌স্টিটিউটের শিল্প-বিভাগের সদস্যগণের এই উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

কলিকাতা নিউ-এম্পায়ারে বসন্ত

এবার আমরা কলিকাতায় বসিয়া বসন্তের সৌন্দর্য্য-সম্ভার প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথের 'নবীন' নামে একটি নূতন গীতি-নাট্য অবলম্বন করিয়া শান্তি-নিকেতনের বালক-বালিকাগণ কর্ত্তৃক নিউ-এম্পায়ার থিয়েটারে বসন্তের অভিনন্দন করা হইয়াছিল। নৃত্য-গীতের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের উপর যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়; স্বপ্নলোকেই কখনো কখনো তাহার সন্ধান মেলে, আমাদের এই কোলাহল-মুখরিত কলিকাতা-নগরীতে তাহা নিতান্তই দুর্লভ।

এই সমস্ত ঋতু-উৎসবের ভিতর প্রাণের মধ্যে একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগাইয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের বারবার প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন, মানুষের অন্তরের সহিত বাহিরের প্রকৃতির কী নিবিড় যোগ! কিন্তু এবারকার অভিনয়টি একটু নূতন ধরণের। রঙ্গ-মঞ্চের পর্দ্দা উঠিতেই দেখিলাম,—এক কোণে কবির বিলম্বিত-শুভ্র-কেশশ্মশ্রু মহিমা-ময় মূর্ত্তি। নগরীর কোলাহল হইতে যে অন্তরলোকে প্রবেশ করিয়াছিলাম,—এ যেন সেই অন্তরলোকই পরিব্যাপ্ত করিয়া বসিয়া আছেন তাহার স্রষ্টা! এই ত কবি! নবীনকে আহ্বান করিতে ত ইনিই পারেন; কেন না, অন্তরে কবি চির-নবীন,—বয়সের কোঠায় তিনি যতই অগ্রসর হউন না কেন। সুরের গুরুর নিকট সুরের দীক্ষা লইয়া প্রথম পর্ব্বের আরম্ভ হইল। সেই সুরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল প্রাণের প্রাচুর্য্যের উল্লাস-বাণী। এই উল্লাসের মধ্যে বর্ণ-রস-গন্ধের মেলায়, নৃত্যের মাতনে আপনাকে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ছড়াইয়া দেওয়ার উদ্দামতায় গীতি-নাট্যের প্রথম পর্ব্বের শেষ হইল।

দ্বিতীয় পর্ব্বে বিদায়ের পালা। বিদায়ের সকরুণ বাণীর মধ্যে সত্যের ও সৌন্দর্য্যের নিবিড় ঐক্যোপলব্ধির আনন্দ আছে। আসা-যাওয়ার ছন্দের মধ্যেই সৃষ্টি-চক্রের পূর্ণতা। নবীনের যে উদ্দাম প্রাচুর্য্য,—তার অবসান ত আকস্মিক নয়, অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ের মধ্যেই নবীনের লীলা পূর্ণ হয়,—সে মুক্তিলাভ করে। এই 'প্রলয়-গানের মহোৎসবের' মধ্যেই দেশ-কালাতীত চিরন্তন 'এক'কে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া মানুষ যুগে যুগে মৃত্যুকে জয় করিয়াছে; জীবন-মরণের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে অনন্তকাল ধরিয়া বাঁচিয়া আছে এবং আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত এই গভীর তত্ত্বটিকে 'নবীন' গীতি-নাট্যের মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় রস-রূপ প্রদান করিয়া রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রত্যক্ষ করাইলেন।

শ্রীসুনীলচন্দ্র মিত্র

ব্লক্ নির্ম্মাণে ক্ষিপ্রকারিতা

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্লকপ্রস্তুতকারক ইউ., রায় এণ্ড সন্স্ বিচিত্রার অধিকাংশ চিত্রের ব্লক্ প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

প্রয়োজন হইলে চিত্রের উৎকর্ষের কিছুমাত্র হানি না করিয়া কত অল্প সময়ের মধ্যে ইঁহারা ব্লক্ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত দেবর সূর্য্য সেনের দুইখানি চিত্রে। ফটোগ্রাফ্ দুইটি আমরা পাঠাইয়া দেওয়ার পর বেলা ১০॥ টার সময়ে ইঁহারা ব্লক্ প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করেন। বেলা ২টার সময় ব্লক্ প্রস্তুত হইয়া যায় এবং প্রুফ তোলার কার্য্য শেষ করিয়া বেলা ২॥ টার সময়ে আমাদের লোককে ব্লক্ ও প্রুফ্ প্রদান করেন। অর্থাৎ ব্লক্ প্রস্তুত করিতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা—ফটোগ্রাফ্ তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া কাঠে আঁটা পর্য্যন্ত। আসল ফটোগ্রাফ্ দুটির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইলেও ব্লকের উৎকর্ষের কিছু মাত্র হানি হয় নাই।

গত ফাল্গুন মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "আমি" কবিতার দুইখানি ব্লক্ প্রস্তুত করিতে ইঁহাদের সময় লাগিয়াছিল পাঁচ ঘণ্টা। তাহার মধ্যে অনেকখানি সময় গিয়াছিল তুলির কাজ করিতে, নহিলে ঐ কবিতার সহিত প্রেরিত "কোথা আশ্রয়-শাখা" নামক পূর্ণপৃষ্ঠ ছবিটির ব্লকেরই মত কম সময় লাগিত। যার মেশিনে প্রুফ্ তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত ঐ ব্লকখানি প্রস্তুত করিতে মোট সময় লাগিয়াছিল তিন ঘণ্টারও কিছু কম।

উল্লিখিত প্রত্যেক বারেই ব্লক্ প্রস্তুত করিতে ক্ষিপ্রকারিতা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা 'জরুরী অর্ডার' পাঠাই।

এই সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়ে। লর্ড কর্জ্জন তাঁহার শাসনকালে যুক্তপ্রদেশের কোনো বিখ্যাত চামড়ার কারখানা পরিদর্শন করিতে যান। লর্ড কর্জ্জন কারখানায় উপস্থিত হইবা মাত্র এক ব্যক্তি আসিয়া অতি যত্নে তাঁহার পায়ের মাপ লইয়া একখণ্ড উৎকৃষ্ট চামড়ার উপর তাঁহাকে দিয়া কালীতে নাম লিখাইয়া লইল। কারখানা পরিদর্শন করিয়া লর্ড কর্জ্জন গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই কারখানার ম্যানেজার তাঁহাকে একজোড়া সুনির্ম্মিত বুট উপহার দিলেন,—বুটের চামড়ায় জায়গায় জায়গায় লর্ড কর্জ্জনের হস্তাক্ষর।

ভাস্কর শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল

বর্ত্তমান সংখ্যার বিচিত্রা-চিত্রশালায় প্রকাশিত ১ম ও ২য় চিত্র দুইটি ভাস্কর শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল গঠিত সরস্বতী মূর্ত্তির প্রতিলিপি। মূর্ত্তি দুইটি শাস্ত্রীয় বিবরণের কল্পনায় ভারতীয় শিল্পকলার উচ্চ আদর্শে গঠিত। মূর্ত্তি গঠনকারীর শিল্প-কুশলতা ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইঁহার বাসস্থান বাংলার মূর্ত্তিগঠনশিল্পের তীর্থক্ষেত্র কৃষ্ণনগরে; কলিকাতায় ২৮২ আপার চিৎপুর রোড কুমারটুলীতে এন্, সি, পাল এণ্ড ব্রাদার্স নামে কারবার আছে। গঠন বিষয়ে সকল প্রকার কার্য্য, যথা :—হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি, অ্যানাটমির মডেল, রিলিফ্ ম্যাপ, উদ্যান-মূর্ত্তি, ফুলদানী, সিংহ-দ্বার, স্তম্ভ-শীর্ষ ইত্যাদি ইঁহারা করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন ভেদে প্যারিস প্লাষ্টার্, সিমেণ্ট, মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান ব্যবহার করেন।

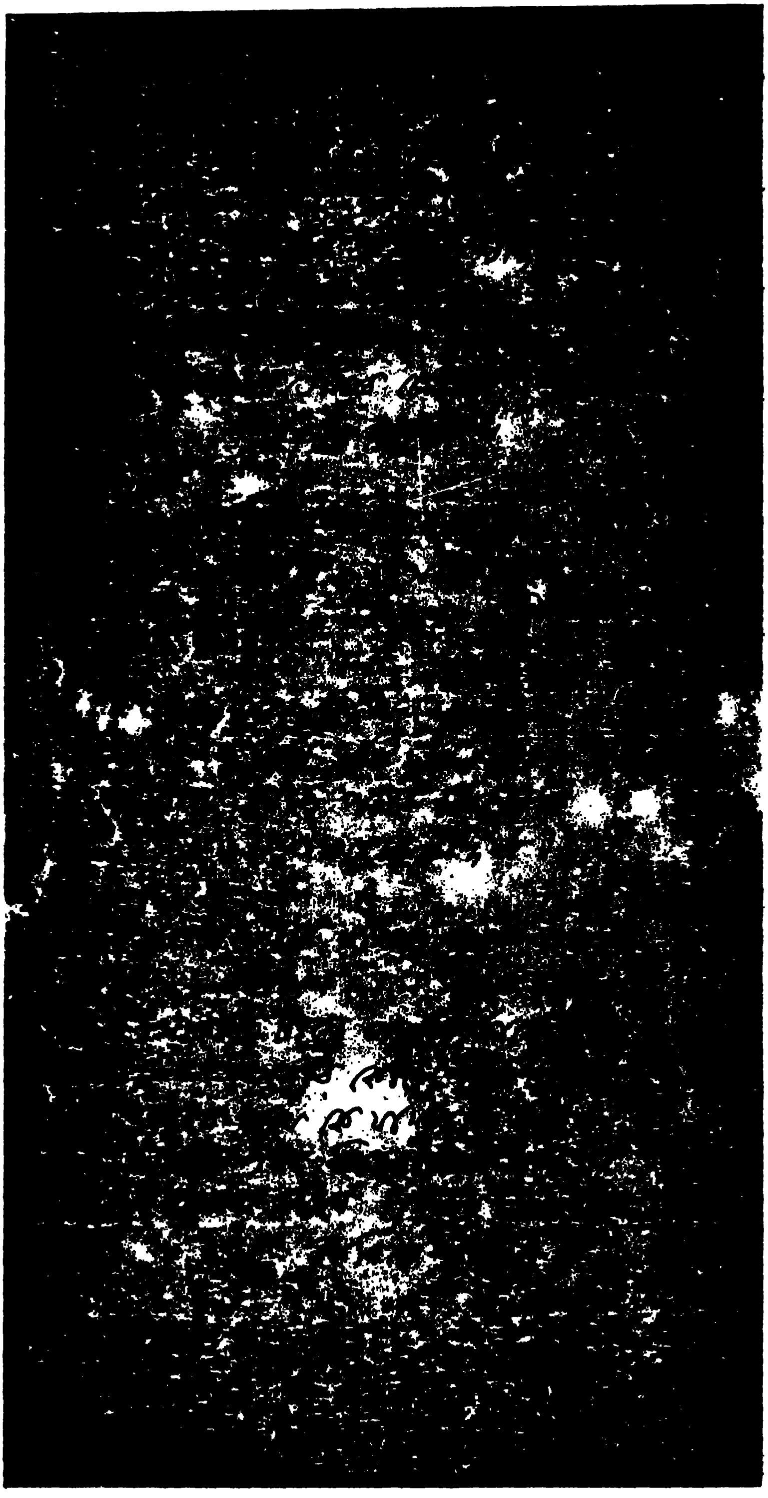
শিল্পকুশলতার হিসাবে ইঁহাদের খ্যাতি ও কর্ম্মক্ষেত্র কেবলমাত্র বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে প্রসারিত হইবার উপযুক্ত।

দেশী বিস্কুট ও বার্লি

বিস্কুট ও বার্লির প্রচলন এখন বহুল। বিদেশী বণিকেরা এই সকল নিত্য-ব্যবহৃত দ্রব্য বেচিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দেশ হইতে লইয়া যাইতেছে। এই শোষণের গতিরোধ করিতে যে কয়জন কর্ম্মী বাঙালী বদ্ধ-পরিকর হন "লিলি বিস্কুট কোম্পানী"র সুদক্ষ পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র শেঠ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অক্লান্ত পরিশ্রম ও বহুমুখী চেষ্টার ফলে তিনি তাঁহার কারখানাটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। বৎসরাধিক ইংলণ্ডে ও জার্ম্মাণী প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্কুট ও বার্লি প্রস্তুত করিবার নানাবিধ কৌশলাদি শিক্ষা করিয়া এবং বহুদেশের কল-কারখানার কার্য্য-প্রণালী পরিদর্শন করিয়া প্রতাপ বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বি, শেঠ ও পুত্র শ্রীযুক্ত পি, শেঠ সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন—নূতন নূতন বহুমূল্য কয়েকটি কলও ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। নিজ প্রতিষ্ঠানটিকে আদর্শরূপে দেশবাসীর সম্মুখে ধরাই পরিচালকবর্গের উদ্দেশ্য। ছত্রিশ প্রকারের বিস্কুট ইঁহারা এ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রস্তুত লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লিও সুন্দর হইয়াছে।

আমরা ইঁহাদের কারখানা পরিদর্শন করিয়াছি ও কারখানাজাত দ্রব্যাদি দেখিয়াছি। দেশী দ্রব্যের এরূপ উন্নতি দেখিলে মনে বাস্তবিকই আনন্দ হয়।

Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 6A. Bhim Ghosh Lane, Calcutta.



বিচিত্রা
বৈশাখ, ১৩৩৮

বিচিত্রার ক্রোড়পত্র

বিচিত্রা

চতুর্থ বর্ষ, ২য় খণ্ড	বৈশাখ, ১৩৩৮	পঞ্চম সংখ্যা

রঙীন্

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভিড় ক'রেছে রঙ-মশালীর দলে।
কেউবা জলে কেউবা তা'রা স্থলে।
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে
পায়ের কাছের পথটি চিনে'
দুঃসাহসে এগিয়ে তা'রা চলে॥

কোন্ মহারাজ রথের 'পরে একা,
ভালো ক'রে যায় না তাঁরে দেখা।
সূর্য্য-তারা অন্ধকারে
তাইতে তাঁরে উঁকি মারে,
আপন আলোয় দৃষ্টি তাদের ঠেকা।

আমার মহারাজ [illegible] ধরি-না-যে,
তাইতো আলো চক্ষে নাহি বাজে।
অন্তরে মোর রঙের শিখা
চিত্তকে দেয় আপন টীকা,
রঙীনকে তাই দেখি মনের মাঝে॥

পাখীরা রঙ ওড়ায় আকাশ তলে,
মাছেরা রঙ খেলায় গভীর জলে ;
রঙ জেগেছে বন-সভায়
গোলাপ চাঁপা রঙন জবায়,
মেঘেরা রঙ ফোটায় পলে পলে ॥

নীরব ডাকে রঙ-মহালের রাজা
হুকুম করেন, "রঙের আসর সাজা,"—
অমনি ফাগুন কোথা হোতে
ভেসে আসে হাওয়ার স্রোতে,
পুরানোকে রাঙিয়ে করে তাজা ॥

তাদের আসর বাহির ভুবনেতে,
ফেরে সেথায় রঙের নেশায় মেতে।
আমার এ রঙ গোপন প্রাণে,
আমার এ রঙ গভীর গানে,
রঙের আসন ধেয়ানে দিই পেতে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রূপদৃষ্টি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরীরের ক্লান্তিবশতঃ এখন আমার প্রতি নিভৃতবাসের বিধান, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাকে দুই দলের কাছে ধরা পড়তে হয়। এক যাঁরা দেখেন আমার নিজের মধ্যে কড়া পাহারা নেই, আত্মরক্ষায় আমি অসমর্থ, তাঁদের দাবী ডাক্তারের নিষেধ লঙ্ঘন ক'রে আমাকে হরণ ক'রে নিয়ে যায়।

অপরপক্ষে আপনারা আমাকে আবিষ্কার করবার ভার নিয়েচেন, শুধু উপর থেকে নয়, আমার কাব্যের খনি খনন ক'রে নিহিতার্থ সংগ্রহ করতে চান। এটা আমার পক্ষে গৌরব, আমার রচনা-সৃষ্টির গভীর দেশ থেকে শ্রম এবং সাধনা ক'রে আপনারা কিছু উদ্ধার করতে উদ্যোগী এতে আমার প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধার পরিচয়। আপনাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আমার উপায় নেই।

আপনাদের পত্রে দেখলাম—রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ। এর দুই অর্থ হতে পারে—আপনারা আমাকে অভিভাষণ দিচ্চেন, অথবা অভিভাষণ দেবার ভার আমার উপর। আমি আশা করচি দুই অর্থই বজায় থাকবে—আমি কিছু বলব, যা সুরু করব তা সারা করতে হবে আপনাদের। আলোচনার ধারা চলুক্, সভা জমাবার জন্যে আমার উপর নির্ভর করবেন না।

দীর্ঘকাল পশ্চিম মহাদেশে ঘুরে এলেম—য়ুরোপের যে-অংশ আমাদের পক্ষে ঔৎসুক্যজনক, যেখানে মানবমন একেবারে নূতন ক'রে ভাবচে, গড়চে, সেই রাশিয়াতেও গিয়েছিলাম। কত ভাঙন, কত পরিবর্ত্তন, নিত্য অনিত্যের আলোড়নে কী বিপুল উদ্দীপনা আজ সমগ্র য়ুরোপ জুড়ে জেগে উঠেচে। বহুকালের পুঞ্জিত সমাজবিধান, সংস্কার আজকের দিনে চোখের সামনে অবলুপ্ত হতে চল্‌ল—য়ুরোপ যে কোন পথে আপনার লক্ষ্য খুঁজে পাবে কারো পক্ষে তা কল্পনা করা শক্ত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমার মনে বারম্বার জেগেচে। য়ুরোপের সমাজে রাষ্ট্রে শিল্পে সাহিত্যে আজ যে অশান্তি দেখা দিয়েচে, যে-উদ্দাম অধৈর্য্য এবং দুর্নিবার আত্মবিপ্লব তা'র চিন্তায় ব্যবহারে ধ্বংসের ধ্বজা তুলে মারীর পথে চলেচে তা'র বীজকারণ য়ুরোপের মনস্তত্ত্ব এবং তা'র সমাজ-ইতিহাসেরই মধ্যে নিহিত। মানব-সভ্যতার অন্তরে শনির রন্ধ্রপথ আছে; কোন্ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে গুপ্ত বিষ তাকে অধিকার ক'রে বসে জানা যায় না, কত প্রাচীন সভ্যতা এইভাবে গেছে তলিয়ে। তা'র প্রধান কারণ সভ্যতার একটা ধর্ম্মই হচ্চে কৃত্রিমতা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা প্রাণধর্ম্মের অনুগত থাকে ততদিন সভ্যতার সৃষ্টিকাজ বিচিত্র-শক্তিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু সমাজের রাষ্ট্রের বিবিধ কৃত্রিম বিধান যখন যুগে যুগে অবিচল হয়ে আবর্জ্জনা জমিয়ে তা'র প্রাণ-প্রবাহে বাধা দেয় তখন আর সয়না, সহসা ভিতর থেকে জীর্ণতা আসে, সাংঘাতিক ক্ষয় এবং ক্ষতির মধ্য দিয়ে নূতন আয়োজনের দিন সমাগত হয়। য়ুরোপের সেই রকম একটা যুগসন্ধির

সময় এসেচে, পশ্চিম দেশ জুড়ে মহাসমুদ্রমন্থনের এই অবস্থা, এর একটা ঐতিহাসিক অনিবার্য্যতা আছে। সমাজের মূলে কোন্ প্রবল রিপুর উৎপীড়নে এই কাণ্ড ঘট্‌ল, এমন ক'রে তাদের ভিত্তি পর্য্যন্ত ট'লে উঠেচে তা'র বিচার আমি এখানে করব না। তাদের এই বিনষ্টির লক্ষণ সাহিত্যে সমাজে শিল্পে আজ কী লজ্জাহীন উন্মত্ততায় দেখা দিয়েচে তা কারো অগোচর নেই। ভাঙ্‌বার নেশায় মরীয়া হ'য়ে ওরা আজ সংগ্রামের পথে অগ্রসর—কী পরিমাণ দুঃখ এবং ক্ষতির মধ্য দিয়ে ওরা কী ভাবে সাম্য-ব্যবস্থা ফিরে পাবে তা আমাদের অজানা।

আমার প্রশ্ন এই যে যে-সকল কারণবশত ওদের সমাজে এই দুর্ব্বিষহ দ্বন্দ্ব অশান্তির উত্তেজনা জাগল সেই কারণগুলিই নেই অথচ আমাদের দুর্ভাগা দেশে ঐ দুর্ভোগের ফলগুলো অবিকল দেখা দিতে চায় এর কারণটা কী? ব্যাধির নকল ক'রতে ক'রতে ভিতর থেকে ব্যাধি সত্যই জেগে ওঠে এও কি তাই? আমরাও ওদের কাছ থেকে যা কিছু শ্রদ্ধেয় তাকে বিদ্রূপ করা এবং একমাত্র জীবনের না-এর দিকটাকেই বাড়িয়ে দেখবার সংক্রামতা গ্রহণ করেচি—ওরা আজ বিজ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে প্রাণের সংসারকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দেখচে আমরা তা'র নকল করচি। অথচ বিজ্ঞানবুদ্ধি আমাদের নেই বল্‌লেই হয়, জীবনের প্রতিদিন আমরা তাকে যে-ভাবে অস্বীকার করি, যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কারে জড়িয়ে থাকি তা আমাদের দেশেই সম্ভব। য়ুরোপ মূর্ত্তি গড়চে, মূর্ত্তি ভাঙচে, আমাদের গড়বার শক্তি সৃষ্টির উৎসাহ নেই, ধ্বংস করবার উত্তেজনাটাই প্রবল।

সাহিত্য-বিচারে য়ুরোপের রুচি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। সকলেই জানেন সমগ্র ইংরেজ জাতি এককালে কবি টেনিসনের স্তবে কতদূর প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল, আজ সেই টেনিসনের প্রশংসা করাই দুঃসাহস। মধ্যে কিপ্লিংএর লেখা ওদের সভা জমিয়েছিল, তিনি ছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যের সভা-কবি, এখন সকলে ওঁর সম্বন্ধে নীরব, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আসরে ওঁকে স্থান দিতে ওদেরও বাধচে। আমাদের মুস্কিল এই যে আমরা য়ুরোপকে থামিয়ে দেখি, পরিবর্ত্তনের ধারা বেয়ে ওদের যে রুচির সচলতা তাকে আমরা খণ্ডকালের মধ্যে একান্ত ব'লে মেনে নিই। চলন্ত রথকে স্থির দেখার ঐ মোহ, কল্পনায় তাকে যেখানে প্রতিষ্ঠিত দেখে আমরা নিশ্চিন্ত হই ইতিমধ্যে সেখান থেকে কোন্ দূরে সে চ'লে গেছে। বালক কালে দেখেচি ডিগ্রীধারী আমাদের সাহিত্যিকের দল Byronএর কাব্যের প্রভাবে কী উদাস, কী বিমর্ষ, জীবনকে রঙীন মরীচিকা জ্ঞান ক'রে তাঁদের কী বেদনাময় আত্মবিলাস, বায়রণী ভঙ্গীতে আপনাকে নাট্যরঙ্গের নায়ক ক'রে তুলে' তাঁদের এই হাহুতাশের অন্ত ছিল না। "উঃ কি দুরন্ত জ্বালা, ঢালো ঢালো ঢালো সুরা" —তাঁরা সে সুরা খেতেনও যথেষ্ট কেবলমাত্র কাব্যের সুরা তা নয়। এখনকার অধ্যাপক আপনারা অনেকে উপস্থিত আছেন—আপনাদের কাছে বায়রণের স্তুতি ক'রলে কী ফল হবে ভাবতে ভয় করে। কে ভালো কে মন্দ তা'র বিচার ক'রতে চাইনা—কথা হচ্চে আমরা যেন য়ুরোপের ফ্যাশানের অন্ধ অনুধাবন ক'রে আত্মবিড়ম্বনা না করি। আজকের দিনে যে সকল সাহিত্যিক দেবতা য়ুরোপে পূজা পাচ্চেন কাল তাঁদের খোঁজ পাওয়া শক্ত হতে পারে—আমরা যেন অর্ঘ্য নৈবেদ্য নিয়ে উত্তেজনার মুখে তাঁদের পিছনে না ছুটি। অপরিণত বয়সে এ ভুল আমরাও করেচি—মনে হত ঐ রকম ঢালো ঢালো সুরা

লিখতে পারলে ধন্য হই। লিখেওছিলাম। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা উপদ্রব না করলে সেই সব লেখা গোর থেকে বার হবার আর ভয় নেই।

সাহিত্য-বিচারের আদর্শ নিজের অন্তরের মধ্যে, হাল আমলের রাশিয়ার কানে-মন্ত্রনেওয়া আধুনিকতার মধ্যে নয় এ-কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। সমুদ্রের ওপারে চক্ষু নিবিষ্ট ক'রে ধার-করা সাহিত্যিকতা নিয়ে আমরা আর কতদিন চলব। অন্যের বুদ্ধি ছাড়া এক পা চলতে যাদের এত ভয় তাদের কী দশা হবে? নিজের দেশের প্রতি এই অবজ্ঞা ঔদাসীন্য অথচ য়ুরোপের বিষয়ে এই সভয় সম্ভ্রমের একটা গল্প এইখানে বলি।

অল্পদিন হল প্রসিদ্ধ রূপকার নন্দলালের কাছে এসে একজন আধুনিক ক্রিটিক মত ব্যক্ত করলেন—"ঐ সব আপনারা কী যে ছবি আঁকচেন আমার একটুও ভালো লাগে না।" এতে দোষ নেই, না ভালো লাগলে স্পষ্ট ব'লে ফেলাই ভালো—বিশেষ ক'রে যেখানে আত্মপ্রত্যয়ের এমন দুর্নিবার গতি। নন্দলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "হাল আমলের য়ুরোপীয় আর্ট আপনার কেমন লাগে?" এতে তিনি ইতস্তত ক'রে বল্‌লেন "কী ক'রে বলি, ওদের আর্টের বিষয় যথেষ্ট চর্চ্চা করিনি, ঠিক বুঝতে পারি না।" এত নম্রতা অন্য দেশ সম্বন্ধে। কিন্তু স্বদেশ সম্বন্ধে উগ্র মতামতের একটুও লজ্জা নেই, চর্চ্চার দরকার নেই, বোঝবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। এইখানেই আমাদের ভুগতে হয়।

ভাববার কথা এই—আর্টের বিচারে কি শাশ্বত কোনো আদর্শ নেই? রুচির নিয়ত পরিবর্ত্তন, কেবলি নূতন নূতন মতামত এবং আন্দোলনের ক্ষণিকতা এবং উত্তেজনা? আমি বলতে চাই গভীরে নিত্যতা আছে, উপরে নিয়তচঞ্চল পরম্পরার প্রবাহ। সেই গভীরে দৃষ্টি পৌছন চাই, তা'র জন্যে সাধনার অপেক্ষা আছে। যিনি পুরাণ—eternal—তিনি গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং—পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখতে হবে। সত্তার গভীরতম লোকে যে-অভিজ্ঞতা জ'মে ওঠে সেইখানে মিলিয়ে নিয়ে আর্টের বিচার চলে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তত্ত্বকে পেতে হলে তথ্যের তলে গিয়ে তা'র অনুসন্ধান ক'রতে হয়, দর্শনেও এই অপ্রমত্ত জ্ঞানদৃষ্টির প্রয়োজন। কেবল কি সাহিত্য বিচারের বেলাতেই উচ্ছৃঙ্খলভাবে আমার ভালো লাগে বা মন্দ লাগে এই কথাই স্পর্দ্ধাভরে জাহির করা চলে। যাঁরা নিত্যরসের রসিক তাঁরা ভালো বা মন্দ লাগার বিচারভার দেন অন্তর্দৃষ্টিকে—যাঁরা চোখ-ভোলানো বাহাদুরিতেই মুগ্ধ তাঁরা গায়ের জোর এবং বাহিরের আস্ফালনকে সাহিত্যে শিল্পে চরম ক'রে দেখেন। Eternalকে সামনে রেখে realityকে দেখাই আর্টের লক্ষ্য—eternal এবং realityর যোগে যে-মূর্ত্তি সৃজিত হয়ে ওঠে আর্ট হচ্ছে তাই। যাকে বলি expression, তা'র সত্যতা মেলে সমাহিত আত্মদানে—প্রমত্ততায় নয়। ছেলেবেলায় ছবি দেখেচি সেজে-গুজে সমারোহ ক'রে ফরাসী মেয়ে রঙচঙে আকাশের তলে ব'সে পূজার ভঙ্গী ক'রচে—লোকে বলে আহা কী expression! ওখানে কৌশল এবং বাহাদুরীর যথেষ্ট বিস্তার আছে, নন্দলালের "সতী" ছবিতে তা নেই। এর মধ্যে যে মহিমা, যে প্রশান্ত আত্মসম্বরণ দেখি তা গভীর অন্তরে গিয়ে নাড়া দেয়। গ্রীকের প্রভাবান্বিত বুদ্ধমূর্ত্তিতে আধুনিক জোর আছে—হাড়-বের-করা নিরানব্বই পার্সেণ্ট রিয়ালিজম্—না খেয়ে মারীগ্রস্ত শরীরের কঙ্কাল উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে;

একদিন ইংরেজ ক্রিটিকের বাগ্ প্রতিধ্বনি ক'রে বলেচি এইটেই শ্রেষ্ঠ শিল্প। আজ যখন দেখি তারাই বলচে বুদ্ধ-মূর্ত্তির মহিমা ওখানে নেই, শান্ত করুণাময় বুদ্ধ-মূর্ত্তির যে অনির্ব্বচনীয় অন্তর্মুখিনতা ভারতের আপন শিল্পে ভাস্কর্য্যে প্রকাশ পেয়েচে তা'র তুলনা নেই—তখন আমাদের বিপদ ঘট্‌ল।

আমাদের ক্রিটিকেরা শান্ত হয়ে সমগ্রকে দেখতে জানেন না। এইটেই হল রূপদৃষ্টি—এরই অভাবে আমাদের দেশে সাহিত্য এবং শিল্প সম্বন্ধে এমন প্রগাঢ় অবজ্ঞা এবং অপবিচার। প্রতিদিনের জীবনের মধ্য দিয়ে যে-সকল সূক্ষ্ম ভাব এবং অনুভূতি মনের গভীরে জ'মে ওঠে আমাদের মধ্যে তা'র এমন একান্ত দৈন্য ঘটেচে যে অবসন্ন মনকে স্থূলরকমের নাড়া না দিলে আমাদের বোধশক্তিই জাগেনা। নৃত্যের মধ্যে উগ্ররকমের হাত পা ছোঁড়া না থাকলে আমাদের চোখেই লাগেনা কেননা যে-ভাবে, লাবণ্যে, নৃত্যের সামঞ্জস্য সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ করে তাকে দেখবার বিশুদ্ধ রূপদৃষ্টি আমরা হারিয়েচি। "বসন্তোৎসবে" নৃত্য দেখে এক ক্রিটিক সেদিন বললেন বাঙালী মেয়েরা খাঁচার পাখী, তাদের নৃত্যে জোর নেই। জোর নেই কেননা তা'রা আধুনিক য়ুরোপীয় নাচের অনুকরণ ক'রে শরীর নিয়ে আস্ফালন করে না। ভাবের অনুগত নৃত্য-সাধনার যে গভীর সংযম তা চোখকে ভোলাবার অপেক্ষা রাখেনা কেননা দেহমনের ঐক্যচ্ছন্দে তা'র আত্মনিবেদন ভিতর থেকে সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, সেইখানেই তার মহিমা। আমি পূর্ব্বদেশের নানা স্থানে বেড়াবার কালে নৃত্যকলা দেখবার সুযোগ পেয়েচি। জাভায় বালীতে, শ্যামে, চীনে জাপানে; আমাদের দেশে কোচিন মালাবার মণিপুরে। য়ুরোপের folk dancing এবং অন্যান্য নাচের সঙ্গে আমি পরিচিত। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে, বলবার অধিকার আছে। এই কথা আপনাদের বলতে দ্বিধা করব না যে আমাদের আশ্রমে নৃত্যকলার ভিতরে যে সকল ধারা মিলেচে তা'র পিছনে যে-সাধনা যে-শিল্পবোধ র'য়েচে এবং সমগ্রের সৌন্দর্য্য-বিকাশ আছে তা যে-কোনোখানেই দুর্লভ।

এখানেও সেই কথা, আর্টকে যে-দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তাকে দেখা যায় আমরা তা হারিয়েচি, অত্যন্ত সুলভ আপাতরমণীয় কৌশল এবং লঘু চাতুরীকেই আমরা য়ুরোপের অনুকরণে পূজা দিতে শিখেচি। যে সব বড়ো ভাবের এবং শিল্পের সাহিত্যের সাধনা চলচে তার আমরা খবরই জানিনা। সিনেমা-দেখা চোখ নিয়ে হাল ফ্যাশানের নভেল-পড়া রুচি নিয়ে আমরা সব জিনিষের বিচারক হয়ে বসি।

ওদের দেশে যাঁরা রস-পিপাসু, যাঁরা চিরন্তনের সন্ধানী তাঁরা আজকের দিনের প্রমত্ততায় কত বেদনা অনুভব করচেন আজ একটা চিঠিতে তার নূতন প্রমাণ পেলাম। পত্রলেখিকা জর্ম্মাণীর সম্ভ্রান্ত ঘরের বিদুষী মহিলা, তিনি আর্ট ও সাহিত্যের গভীর ক'রে সাধনা করেচেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম আধুনিক য়ুরোপীয় আর্ট কোন্ পথে চলেচে তা আমি বুঝতে পারি না। তিনি এর উত্তরে আমাকে কিছু আর্টের বই পাঠিয়ে দিয়েচেন এবং লিখেচেন "আমার ভয় হয় এই ছবি বেদনাপ্রদ হবে, এর মধ্যে মুক্তির atmosphere নেই। যে-গভীরতায় প্রবেশ করলে মন বাহিরের বেদনা-চাঞ্চল্য হতে শান্তির আস্বাদ পায় সেখানে যাবার পথ আধুনিক শিল্পীর জানা নেই।" একজন আর্টিষ্টের কথা বলেচেন তিনি মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে যেন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন তার আভাস তাঁর শেষ দিককার ছবিতে আছে।

লেখিকা বলেচেন "Mozartএর সঙ্গীতে সুগভীর বেদনা আছে সে বেদনা মহৎ এবং বিপুল, তা'র অন্তর্লোকে সুমহান্ harmonyর বিস্তার অনুভব করা যায়। আধুনিক শিল্পীর বেদনা বা সুখ দুইই অত্যন্ত উগ্রভাবে ব্যক্তিগত, তার মধ্যে পূর্ণতার ছন্দ একটুও নেই, তা'র স্পর্শে মন ক্লিষ্ট পীড়িত হয়ে ওঠে, গভীর অতৃপ্তি এবং জ্বালা রেখে যায়। আধুনিক আর্টের তলায় disharmony ; এর প্রকাশে শক্তি নেই, violence আছে।" আমাকে ইনি সৃষ্টিশক্তি এবং violence এই দুইয়ের পার্থক্য বিচার ক'রে বুঝিয়ে দিতে ব'লেচেন।

মনে রাখবেন শিল্পকলায় ঐ দুয়ের পার্থক্য নিয়েই সৃষ্টির উৎকর্ষের তারতম্য। যে-শক্তি স্বাস্থ্যের সঙ্গে মিলিয়ে থাকে, যার প্রকাশ সাবলীল সহজ এবং সুন্দর, আর্টে তারই চরম মূল্য ; সেই নিত্য কালের অধিকারী। আর যে-violence আগ্নেয়গিরির অগ্নিবর্ষণের মতো উৎকট হয়ে প্রকাশ পায় তা'র উত্তেজনা ক্ষণকালীন, তা'র কোনোই বাণী নেই। দীর্ঘকালের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের দিকে চেয়ে দেখুন তবেই সৃষ্টি সত্য হবে। যা-কিছু সাহিত্যে শিল্পে আজ পর্য্যন্ত টি'কে আছে তা'র বিশিষ্টতা কোনখানে ? হাল আমলে যা নিয়ে আস্ফালন চলচে তা'র মধ্যে আগামীকাল পর্য্যন্ত বাঁচবার পাথেয় আছে কিনা সেটা বিচার ক'রে দেখতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



শিল্পে অন্তর্জ্ঞান ও অন্তঃপ্রেরণা

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত

এক শ্রেণীর শিল্পীতে প্রাধান্য পাইয়াছে দেখি অন্তর্জ্ঞান, আর এক শ্রেণীতে প্রাধান্য পাইয়াছে তেমনি অন্তঃপ্রেরণা। এই দুই বৃত্তিকে ধরিয়া দুই ধরণের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু শিল্পীর কথা বলি কেন, সকল শক্তিমান স্রষ্টার—এবং কতকটা হয় ত সকল মানুষেরই—প্রকৃতির গড়নে এই রকমের একটা পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে; এবং সেই অনুসারে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

এক শ্রেণীর মধ্যে প্রস্ফুট জ্ঞান, আর এক শ্রেণীতে প্রস্ফুট প্রাণ; এক শ্রেণীতে প্রধান মস্তক, অন্যটিতে প্রধান হৃদয়। একের বিশেষত্ব স্থিরতা, আর একজনের বিশেষত্ব গতি; একজনের উদারতা আর একজনের তীব্রতা; একজনের কাঠিন্য আর একজনের তারল্য। একজনের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে আলো আর একজনে তাপ। একজন সাত্ত্বিক, আর একজন রাজসিক।

অন্তর্জ্ঞান দিতেছে দৃষ্টি, অন্তঃপ্রেরণা দিতেছে শ্রুতি। তাই শিল্পের মধ্যে প্রথমটির কল্যাণে জন্মিয়াছে কাব্য, আর দ্বিতীয়টির প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে গীত। কাব্যের মধ্যে আবার গীতের চলন যখন প্রাধান্য পায়, তখন তাহার মধ্যে থাকে অন্তঃপ্রেরণার বিশেষ প্রভাব—যেমন গীতিকাব্য; তেমনি সঙ্গীতও কাব্যের গড়ন অনেকখানি পাইতে পারে, তখন তাহাতে থাকে অন্তর্জ্ঞানের প্রাধান্য—প্রমাণ, ওয়াগনের (Wagner)। গীতিকাব্যের পিছনে রহিয়াছে অন্তঃপ্রেরণা, মহাকাব্যের পিছনে অন্তর্জ্ঞান। অন্তর্জ্ঞানের আত্মস্থ শান্ত স্থৈর্য্য মার্গসঙ্গীতের চালে ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেশজ সঙ্গীতে দেখা দিয়াছে অন্তঃপ্রেরণার চঞ্চল লাস্য।

অন্তর্জ্ঞানের প্রভাবে যে শিল্পী সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে সত্যের সুন্দরের বস্তু; অন্তঃপ্রেরণায় চলিয়াছেন যে শিল্পী তাঁহাতে ধরা দিয়াছে সত্যের সুন্দরের ছন্দ। অন্তর্জ্ঞানের সম্মুখে সুষীম পরিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে "স্বরূপ"; অন্তঃপ্রেরণায় অনুভূত, উপলব্ধ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে "স্বভাব"—একে দিয়াছে বলন, অন্যে দিয়াছে চলন।

কালিদাস যখন বলিতেছেন—

ভাগীরথীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃকম্পিতদেবদারু—

তখন তাহাতে পাই সত্যের সুন্দরের রূপায়ন;

আর সেক্সপীয়র যখন বলিতেছেন,—

The shard-borne beetle with his drowsy hums
Hath rung night's yawning peal—

তখন তাহাতে পাই সত্যের সুন্দরের লীলা-নটন।

কালিদাসে যে গতি হিন্দোলিত হইয়া চলিয়াছে, তাহা যেন রূপকেই আরও স্পষ্ট আরও প্রকট করিয়া স্থাপিত করিতেছে। আর সেক্সপীয়রে যে রূপখানি আমাদের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহা যেন একটা গতিকেই সচল তরঙ্গায়িত দূর-প্রসারিত করিয়া লইয়াছে।

ফলতঃ এক হিসাবে বলিতে পারা যায় প্রাচ্যের স্রষ্টা প্রধানতঃ চলিয়াছে অন্তর্জ্ঞানকে ধরিয়া, আর পাশ্চাত্যের স্রষ্টা চলিয়াছে অন্তঃপ্রেরণার সহায়ে। প্রাচ্যের যে স্থিতিশীল কুখ্যাতি আছে তাহার কতকটা ব্যাখ্যা পাই এইখানে, আর পাশ্চাত্য যে সচল চঞ্চল বলিয়া প্রখ্যাত তাহারও অর্থ বুঝিতে পারি এইভাবে। কারণ একজন তাহার সৃষ্টিতে প্রধানতঃ চাহিয়াছে সুষীম রূপকে, আর একজন চাহিয়াছে সলীল গতিকে।

পাশ্চাত্যে মোটের উপর অন্তঃপ্রেরণার ধারা প্রাধান্য পাইলেও ঐ ধারারই মধ্যে আবার অন্তঃপ্রেরণার ও অন্ত-

---

* "অন্তর্জ্ঞানকে ইংরাজীতে বলিব "ইন্‌টুইশন" (Intuition), আর অন্তঃপ্রেরণাকে বলিতে চাই "ইন্‌স্পিরেশন" (Inspiration)।

জ্ঞানের উৎধারা রহিয়াছে। লাতিন প্রতিভায় মূর্ত্ত হইয়াছে অন্তর্জ্ঞান; আর কেল্টিকের, স্লাভের, টিউটনের মধ্যে অন্তঃপ্রেরণার প্রভাব স্ফুরিত। শেক্সপীয়র, ইবসেন, ডষ্টয়-ভেস্কি শেষোক্ত ধারার উদাহরণ; প্রথমোক্ত ধারার উদাহরণ ভর্জ্জিল, পেত্রার্ক, রাসীন।

দেশ বা জাতি হিসাবে ছাড়া, রীতি বা সম্প্রদায় (school) হিসাবেও এই পাশ্চাত্যে আছে উপরোক্ত ধারাদ্বয়। ক্লাসিকাল এবং রোমান্টিক নামে যে দুই পদ্ধতি, তাহাদের পরস্পরের পার্থক্যও ঐ দুইটী ধারার পার্থক্য দিয়াই নির্দ্দেশ করা যায়। ক্লাসিকাল রীতি অন্তর্জ্ঞানে আর রোমান্টিক অন্তঃপ্রেরণায় চালিত।

আবার প্রাচীন ও নবীন হিসাবেও দেখি ঐ একই পার্থক্য। নবীনের মধ্যে পাই অন্তঃপ্রেরণার বেশি প্রকাশ, আর প্রাচীনের মধ্যে অন্তর্জ্ঞানের। প্রাচীনতম হোমর-ভর্জ্জিলের জগৎ ছিল যতখানি অন্তর্জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহার অনুকরণে সৃষ্টি করিতে গিয়াও, রেণাসেন্স আনিয়া দিল কিন্তু অন্তঃ-প্রেরণার যুগ। দান্তের মধ্যে এই যুগধর্ম্মের পাই পূর্ব্বাভাস— ইংরাজের শেক্সপীয়র, ফরাসীর র‍্যাঁসার ইহাকে স্পষ্ট ফুট করিয়া ধরিয়াছেন। আবার দান্তে বা শেক্সপীয়র বা র‍্যাঁসারের অন্তঃপ্রেরণার পিছনে যতটুকু পাই অন্তর্জ্ঞানের ছায়া, রোমান্টিক যুগে—শেলী, বায়রণ, হিউগোর মধ্যে—তুলনায় তাহা আরও হ্রাস পাইয়াছে; শেষে সিম্বলিষ্ট বা ইম্প্রেশনিষ্ট (যথা, ভের্লেন) এবং আধুনিক ও অতি-আধুনিকদের মধ্যে অন্তঃপ্রেরণাই হইয়া উঠিয়াছে সর্ব্বেসর্ব্বা—একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রাচ্যে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যকে বলিতে পারি একান্ত অন্তর্জ্ঞানেরই প্রকাশ। বেদে উপনিষদে মহাভারতে, এমন কি রামায়ণে পর্য্যন্ত, স্পষ্টই দেখি হৃদয়ের আবেগ উৎসাহকে কতখানি সংযত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে জ্ঞানের প্রগ্রহ। ভারতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে টানা রেখার মাহাত্ম্য যতখানি, রঙের ততখানি নয়। রঙ হইতেছে ভাবের প্রাণাবেগের প্রলেপ, রেখায় দিতেছে দৃষ্টির পরিচ্ছিন্ন সুষমা। ভারতের ভাস্কর্য্যের স্থাপত্যের ত কথাই নাই— অন্তর্জ্ঞানের সৌষ্ঠব সেখানে মূর্ত্ত হইয়া আছে।

অন্তর্জ্ঞানকে ছাড়িয়া, অন্তঃপ্রেরণার পথ ধরিতে আমরা প্রথম ধরিতে শিখি বোধ হয় বৈষ্ণবের, ভক্তিসাধকের কল্যাণে। ইঁহাদেরই হাতে, ইঁহাদেরই প্রভাবে অন্তঃপ্রেরণার সাহিত্য গড়িয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একটি কথা বলিয়া থাকেন যে ভারতীয় আর্য্যেরা ছিল বুদ্ধি-প্রতিষ্ঠ, যুক্তিপ্রধান মানুষ, ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষায় হৃদয়ের মীড় টানিয়া দিয়াছে অন্-আর্য্য দ্রাবিড়। আর্য্যদের সাধনা ছিল জ্ঞানপ্রধান, ভক্তিপ্রধান সাধনা ছিল দক্ষিণীদের। কথাটির মধ্যে হয় ত কিছু সত্য আছে। দক্ষিণী ছাড়া ভারতের এই ছন্দপরিবর্ত্তনে বৌদ্ধদেরও কিছু হাত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমে ছিল আর্য্য ধর্ম্মেরই অনুরূপ—জ্ঞান-প্রধান; পরে যখন মহাযান আবিষ্কৃত হইল, তখন আরম্ভ হইল বুদ্ধের পূজা,—অবলোকিতেশ্বরের কারুণ্যই যখন বৌদ্ধ সাধনার প্রধান কথা হইল তখন অন্তর্জ্ঞানকে ছাড়িয়া আমরা অন্তঃপ্রেরণার আশ্রয় লইলাম।*

বাঙলা হইতেছে বিশেষভাবে অন্তঃপ্রেরণার ক্ষেত্র। বাঙালীর শিল্পে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে এই অন্তঃপ্রেরণাই দিয়াছে মুখ্য সুর। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন শিক্ষা-দীক্ষা হিসাবে বাঙালী হইতেছে বার আনা বৌদ্ধ, আর জাতি হিসাবেও সে ঐ অতখানিই দ্রাবিড়—সুতরাং এই দুই ধারার মিলনে সে যে অন্তঃপ্রেরণার প্রয়াগ-তীর্থ হইয়াছে, তাহা আশ্চর্য্যের নয়।

তবে সৃষ্টির মধ্যে কোন জিনিষই একান্ত সমস্ত, একক লইয়া চলিতে পারে না—বৈপরীত্য, দ্বৈধ (Polarity) হইতেছে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম। তাই বাঙালীর মধ্যেও অন্তঃপ্রেরণার সাথে সাথে এখানে ওখানে অন্তর্জ্ঞানের ইঙ্গিত যে না পাই তাহা নয়। বাঙালীর আদি কবি, প্রতিনিধি চণ্ডীদাস যদি হ'ন নির্জ্জলা অন্তঃপ্রেরণা—তবে বিদ্যাপতির মধ্যে ধরা দিয়াছে একটা অন্তর্জ্ঞানের প্রভাব। চণ্ডীদাস যেখানে অনুভবের আবেশে চক্ষু নিমীলিত করিয়া হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করিয়া আপনহারা গাহিয়া চলিয়াছেন—সই, কে বা

* খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবে ইয়োরোপেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল মনে হয়। গ্রীকো-লাতিন শিক্ষাদীক্ষা বিশেষভাবে আর্য্যদেরই মত ছিল জ্ঞানবুদ্ধি-প্রতিষ্ঠ—তাহার মধ্যে খৃষ্ট আসিয়া আবির্ভূত হইলেন, হৃদয়ের ক্ষত পুরুষের অবদান লইয়া।

ভরাইল শ্যাম নাম—বিদ্যাপতি সেখানে দেখি অনেকখানি আত্মস্থ, স্থিরবুদ্ধি—চক্ষু চাহিয়া, দেখিয়া শুনিয়া বলিতেছেন—

শৈশব যৌবন দুঁহু মেলি গেল—

আবার রবীন্দ্রনাথে যদি আমরা পৌঁছিয়া গিয়া থাকি অন্তঃপ্রেরণার কয়েকটি গভীরতম, বিশুদ্ধতম প্রস্রবণের মূলে, মধুসূদনে তেমনি আমরা সাক্ষাৎ পাইয়াছি অন্তর্জ্ঞানের একটা প্রয়াস ও সাধনা।

অন্তর্জ্ঞান বা অন্তঃপ্রেরণা বলিলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঠিক এক বস্তুকে বুঝায় না। উভয়েরই আছে নানা স্তর, নানা ধারা—অতি সূক্ষ্ম হইতে অতি স্থূল, ঊর্দ্ধতন হইতে অধস্তন। উভয়ের মধ্যে তারতম্য দেখিতে হইলে, দেখিতে হইবে কোথা হইতে তাহারা উৎসারিত হইতেছে—নতুবা দুই-এর মধ্যে স্বভাবতঃ বড়-ছোট উত্তম-মধ্যম কোনটি নয়।

তা ছাড়া, এ কথাটি অবশ্য ভুলিলে চলিবে না যে বাস্তবে মানুষের মধ্যে বৃত্তি দুটি প্রায়ই এক সঙ্গে জড়িত ওতপ্রোত হইয়া আছে—তবে কেবল কোনটি কোথাও পিছনে, কোথাও বা সম্মুখে, কোনটি কোথাও মুখ্য কোথাও বা গৌণ। বুঝিবার জন্য তাহাদিগকে আমরা যতখানি বিচ্ছিন্ন করিয়া ধরি—কার্য্যতঃ তাহারা ততখানি নহে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত

এ আকাশ

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী

এ আকাশ দেখিতে আমার ভালো লাগে,
কখনো বা ডরে পাণ্ডু, কভু অনুরাগে
আলতার মত রাঙা, গোধূলি লগনে
মিলনের বেলা, কোন সে আশঙ্কা গণে'
গেরুয়া পরিয়া বসে, বিবাগীর মত;
স্তিমিত আলোক ভারে নয়ান আনত,
মনোমত নয় যেন কোন সুখসাধ,
প্রেমের সম্পদ যত সব অপরাধ॥
কাটে গোধূলির বেলা, আসে নিশীথিনী,
আঁধার বাসর ঘরে একা অনাথিনী,
শিথিল কবরীখসা কালো কেশ হ'তে
তারার হীরার ফুল ঝরে পথে পথে।
কাঁকালের মেখলায় সে বাঁধন নাই,
চাঁদের সোনার থালি লুটে পড়ে তাই
হাঁটুর আগেতে। হাঁটিবার পথে বাধা,
দরদী দয়িত কোথা? পায়ে ধরে সাধা!
ভোরের বাতাস বয়, বাসরের বাতি
একে একে নিবে যায়, পূবে জাগে ভাতি
উষা-প্রণয়ীর জাগা খোলা আঁখি হতে;
বধূবর যাত্রী হল অরুণের রথে।
আসে দু'পহর বেলা রোদে ঝাঁ ঝাঁ করে,
আকাশে ফ্যাকাশে মেঘ শুয়ে শ্রান্তি ভরে,
যেন অতখানি তাপ পারে না সহিতে,
ছায়া খুঁজে ফেরে, বোঝা চাহে নামাইতে॥

ভারত ও চীন-জাপান *

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী এম্‌-এ, দক্তোর এস্‌-লেতর্স

কিছুদিন ধরে আমরা প্রাচ্যজাতি সমূহের ভিতর একটা ঐক্য (unity) আছে শুনতে পাচ্ছি। প্রাচ্যজাতিগুলির মধ্যে চীন, জাপান ও ভারতবর্ষই প্রধান। জাতি হিসাবে এই তিন দেশের মধ্যে কোনই ঐক্য দেখা যায় না—কারণ জাপানীরা মঙ্গোলীয় জাতির শাখাবিশেষ—তাদের সঙ্গে চীনাদের কোনই সমজাতীয়তা নেই। চীনাদের সঙ্গেও ভারতবাসীর জাতিগত পার্থক্য রয়েছে। এই তিন দেশের ভাষাও বিভিন্ন। এই বৈষম্যের ভিতর ঐক্য কোথায় তাই আজ ব্যক্ত করে বলবার চেষ্টা করব।

চীনদেশ ও জাপানের জাতীয় ধর্ম্ম মূলতঃ ভারতের জাতীয় ধর্ম্মের থেকে বিভিন্ন। চীনারা হ'ল তাঁদের আদিগুরু কনফুসিয়সের শিষ্য। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতক থেকে আরম্ভ করে আজ অবধি তারা তার ধর্ম্মই পালন করে আস্‌ছে। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় দু'হাজার বছরের চেষ্টাতেও চীনাদের সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাস থেকে বিচলিত করতে পারেনি। খৃষ্টধর্ম্মও পাঁচশো বছরের চেষ্টাতেও তাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। অথচ চীনাদের এই আদিগুরুর ধর্ম্ম অতি সরল—অন্য ধর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে ধর্ম্মই বলা চলে না। সমাজকে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্য কতকগুলি নিয়মকানুন মেনে চলাই এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। গুরুজনদের ভক্তি করতে হ'বে, তাদের কথা মেনে চল্‌তে হ'বে এবং পিতৃপুরুষদের পূজা করতে হ'বে—এই হ'চ্ছে কনফুসীয় ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ। কনফুসীয়স বলেছেন—"অন্য লোকের যেরূপ ব্যবহারে তুমি মনে দুঃখ পাও, সেরূপ ব্যবহার তুমি কখনও অন্যের সঙ্গে কোরো না। তাদের যে ব্যবহারে মনে আনন্দ পাও তুমি সব সময় সেই রকম ব্যবহারই কোরো।" এই ধর্ম্মমতে ঈশ্বরের বা অলৌকিকের অস্তিত্বে কোন বিশ্বাস নেই, কারণ কনফুসীয়স নিজে সেই সব নিয়ে কোন আলোচনা করেন নি, বরং বলেছেন "এই পৃথিবীতে যে কাণ্ড চল্‌ছে তাই আমরা যখন জানি না বা বুঝি না, তখন এর বাইরে কি চল্‌ছে তা কি করে জান্‌বো?"

কনফুসীয়স তাঁর শিক্ষায় চীনদেশের সমাজকে একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে গেলেন বটে, কিন্তু মানুষের মনের ক্ষুধা মেটাবার কোনো চেষ্টা কোর্‌লেন্ না। যে-দৃষ্টিশক্তির দ্বারা মানুষ তার অন্তরের গভীরতম স্তরে শান্তির খোঁজ পায়, সে দার্শনিক দৃষ্টি কনফুসীয় ধর্ম্ম চীনাদের দিতে পার্‌লো না। ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মই তাদের সেই অভাব পূরণ ক'র্‌লো। সমাজ ও দেশ প্রাচীন মতে চল্‌লো এবং আজও তাই চল্‌ছে। তাদের মন কিন্তু নূতন আদর্শ পেয়ে ভাঙাগড়া শুরু করলো।

বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হ'বার সঙ্গেই চীনাদের ধ্যানের উপর নজর পড়্‌ল। ধ্যানের ভিতর দিয়েই যে মানুষের জ্ঞানদৃষ্টি প্রসার লাভ করে, তার অন্তরে বাইরে যে লীলা চল্‌ছে তা ও আত্মা শান্তির চরমস্তরে উন্নীত হয়, ভারতের এই শিক্ষা চীনারা মেনে নিল। তাই চীনদেশের সহরের নিরালা কোণে, দিগন্তব্যাপী নির্জ্জন মরুভূমির প্রান্তভাগে ও অভ্রভেদী পর্ব্বতের শিখরে বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মিত হ'ল। ধ্যান অভ্যাস করবার জন্য সে সব মন্দিরে বিশেষ প্রকোষ্ঠ নির্দ্ধারিত হ'ল। কোথাও বা নিরত প্রবহমান পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর তটভূমির উপরস্থিত গিরিগহ্বর কেটে চীনা ভিক্ষুর ধ্যান-প্রকোষ্ঠ তৈরী হ'ল ও চীনদেশে ধ্যানী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'ল।

শুধু অধ্যাত্ম বিষয়েই যে ভারতের শিক্ষাকে চীন মেনে নিল তা নয়। স্থপতি তার স্থাপত্যে ভারতীয় আদর্শ অবলম্বন করল—তারবিন্যাসে সে মন্দির বা গৃহ নির্ম্মাণে আনন্দ পেল।

* বঙ্গীয় মহাবোধি পরিষদের পক্ষ থেকে broadcast

ভারতে সে প্রাচীন স্থাপত্য লুপ্ত হয়েছে বটে কিন্তু চীনেরা রাখলে বাঁচিয়ে। প্রাচ্যজগৎ—জাপান, ইন্দোচীন, বর্ম্মা চীনদের থেকে সে স্থাপত্য শিখ্‌লো। তাই বঙ্গসাগর পার হয়ে পূর্ব্বমুখে যেখানেই যাই, বৌদ্ধ প্যাগোডা দেখে ভাবি এ বুঝি চীনই তাদের দিয়েছে। সেখানেও যে ভারতের ছায়াপাত হয়েছে তা ভুলে যাই। ভারতের শিক্ষা চীনা ভাস্কর তার উপাদানে নূতনরূপ দিতে সুরু করল। পূর্ব্বে যেখানে সে বাস্তবকে রূপ দিতে চেষ্টা করছিল, এখন সে শুধু তার ভাবকে পাথরে ফুটিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌লো। ধ্যানস্থ মূর্ত্তিনির্ম্মাণেই সে তার আর্টের চরম পরিণতি মনে করলো। চিত্রকর ঐ আদর্শ অবলম্বন কোর্‌লো তাই তার চিত্র পূর্ণ [illegible] লাভ করলো; ভ্রমর পদ্মের মধু আহরণ করছে [illegible]—এর চিত্র আঁক্‌লো বটে, কিন্তু পদ্ম ও ভ্রমরের [illegible] নিখুঁত করে দেখানোর চেয়ে ভ্রমরের ভঙ্গীকে ফুটিয়ে তোলাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল।

সঙ্গীতের পঞ্চতন্ত্রী আর চীনাগায়কের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে পৌঁছে আনন্দ দিতে পারলো না। ভারতীয়ের সপ্তস্বরী তান তার অন্তরে নব প্রতিধ্বনি জাগালো। নৃত্যে নর্ত্তকী তার করপল্লবের ভঙ্গীতে অরূপকে রূপ দিতে শিখ্‌লো। দর্শক সেই অরূপের খোঁজেই আনন্দ পেলো—নর্ত্তকীর দৈহিক সৌন্দর্য্য তখন আর তার নয়নকে আকৃষ্ট করলো না।

চীনা সাধক উপলব্ধি করলো যে এই দৃশ্যমান জগতের কোন সত্যকার অস্তিত্ব নেই। মানুষের চিত্তে তার যে আভাস পাওয়া যায় তাতেই বদ্ধ তার অস্তিত্ব। অন্য কথায় বল্‌তে গেলে—এই দৃশ্যমান জগত হ'চ্ছে মায়া। তার আকার ও আভাসমাত্রই—সেই আভাস যা'তে করে ধরা পড়ে, সে হ'চ্ছে বিজ্ঞান। সাধক ধ্যানযোগে সমাধিস্থ হ'লেই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন।

এই শিক্ষা চীন তার উপজাতির মধ্যেও ছড়িয়ে দিলে। তাই আজ সাধারণ মঙ্গোলীয় জাতির লোককে যদি দৃশ্যমান জগতের রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায় সে তার উত্তরে বলবে—সাধনার দ্বারাই সে রহস্য উদ্ঘাটিত হ'তে পারে। এই জগত হ'চ্ছে দুঃখময়। জন্মই হ'চ্ছে এ দুঃখের মূল কারণ। এই দুঃখের উচ্ছেদ করতে হ'লে বাসনার উচ্ছেদ্ করতে হবে। এবং এই বাসনার উচ্ছেদ করতে হলে চাই সাধনা।

চীনের মত জাপানেরও একটা জাতীয় ধর্ম্ম ছিল—সে হচ্ছে শিন্তো। এই শিন্তো পূর্ণ ধর্ম্মমত না হলেও জাপান আজও তা' ত্যাগ করেনি। পিতৃপুরুষগণকে পূজা দেওয়াই শিন্তো ধর্ম্মমতের মূলমন্ত্র। সুতরাং এই ধর্ম্মমত নিয়ে জাপানের সমস্ত সভ্যতা গড়ে উঠতে পারলো না, কারণ তা'তে আর্ট, সাহিত্য ও দর্শনের কোন্ স্থান ছিলনা।

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করবার পর থেকেই জাপানী সভ্যতা পল্লবিত হ'য়ে উঠ্‌লো। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করবার পূর্ব্বে চীনের একটা উচ্চ সভ্যতা ছিল, ভারতের প্রভাবে সে সভ্যতা পরিপুষ্টি লাভ করেছিল মাত্র। কিন্তু জাপানের সভ্যতা বৌদ্ধধর্ম্মকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, জাপানীর জীবন আজও এই ধর্ম্মের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। দেড় হাজার বছর পূর্ব্বে যখন জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচার হয়, তখন রাজা তা'কে শাসনতন্ত্রের অঙ্গীভূত করে নিলেন। যা'তে এই ধর্ম্মকে অবলম্বন করে জাপানীরা শিক্ষা পায় তারও ব্যবস্থা করলেন। প্রজাদের উদ্দেশ করে তিনি বল্‌লেন "বৌদ্ধধর্ম্মই হ'চ্ছে সকল মানুষের কাম্য। কোন মানুষই স্বভাবতঃ হীনচেতা নয়। প্রত্যেকেই বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করে সুচেষ্টায় সত্যে উপনীত হ'তে পারে। তাঁর ধর্ম্মের ভিতর যে সত্য নিহিত আছে তা'কে মানুষ অবহেলা করতে পারেনা।" সুতরাং জাপানীরা সেই সত্য অঙ্গীকার করে নিল। এই দেড়হাজার বছর ধরে সেই সত্য অনুসারেই নিজেদের জীবন যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রিত করে আসছে।

তাই যখন জাপানে গিয়ে নগরের কোলাহল ছেড়ে বাইরের আশ্রমে গিয়ে পৌঁছবেন তখন দেখ্‌বেন জাপানী ভিক্ষু আধ্যাত্মিক সাধনাকে বরণ করে নিয়েছে। যে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশে এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলাই হ'ল তার সাধনার প্রধান অঙ্গ। তার সাধনার উপায় হ'ল ধ্যান। তার ধর্ম্মমতে দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে এক মহাশক্তি লুক্কায়িত আছে তার নাম সে দিয়াছে মহাবৈরোচনবুদ্ধ। এতে ঐতিহাসিক বুদ্ধের কোনো-

স্থান নেই। মহাবৈরোচন সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য। তিনি নিজের থেকেই এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

জগৎ তাঁরই গুপ্ত (potential) শক্তির বিকাশ মাত্র। পরমাণু বা জলবিন্দুতে তাঁর প্রকাশ হতে পারে। শব্দ তাঁরই ধ্বনি। তাঁরই ভাবার রূপান্তর মাত্র। মানুষের সকল কাজ যেরূপ তাঁর ধারণা ও চিন্তা থেকেই প্রসূত, দৃশ্যমান জগৎও মহাবৈরোচনের চিন্তার অভিব্যক্তি। মহাবৈরোচনের শরীর, বাক্য ও কার্য্য দিয়েই বিশ্বশক্তি তৈরী।

অদ্বৈতবাদের প্রভাব জাপানীর সাহিত্য ও সুকুমার শিল্পে ধরা পড়েছে। তাই জাপানী আর্ট সম্বন্ধে ওকাকুরা বলেছেন—"Beauty or the life of things is always deeper as hidden within than as outwardly expressed, even as the life of the universe beats always underneath incidental appearances. Not to display but to suggest is the secret of infinity. Perfection like all maturity, fails to impress, because of its limitation of growth."

দৃশ্যমান জগতে যেমন বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তির আভাস মাত্র পাওয়া যায় আর্টে তেমন সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্রই দেওয়া চলে, পূর্ণ রূপ দেওয়া চলে না। সুতরাং আভাস (suggestion) দেওয়াই হ'চ্ছে জাপানী আর্টের মূলমন্ত্র।

শব্দ হ'চ্ছে বিশ্বশক্তির ধ্বনি। সুতরাং সঙ্গীতও জাপানী সাধকের জীবনে একটা উচ্চ স্থান অধিকার করে। ভারতীয় সপ্তস্বরীতেই সেই শব্দের চরম বিকাশ; তাই জাপানী সাধক সেই ভারতীয় সঙ্গীত আজও অভ্যাস করেন। এই সাধনায় নৃত্যেরও আদর আছে। নর্ত্তকী তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসেই সেই বিশ্বশক্তির উদ্বোধন করেন।

বস্তুতঃ এই সাধনা আজও জাপানকে উদ্বুদ্ধ করেছে। জাপানের যে আশ্রমেই যাওয়া যায়—সেখানেই একটা শক্তির ছায়া দেখা যায় ও পবিত্রতার ভাব অনুভব করা যায়। ভারতের চিরন্তন আদর্শ নিয়েই এসব আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। হাজার বছরের উপর ধরে জাপান সে আদর্শ বাঁচিয়ে রেখেছে। অনেকবার এ আদর্শ বিপন্ন হয়েছে। মধ্যযুগের রাজনৈতিক বিপ্লব তা'কে সহ্য করতে হয়েছে। অনেক সম্রাটের কৃপা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা এসে জাপানকে পরিবর্ত্তিত করেছে। বিজ্ঞান এসে তার মনকে আলোড়িত করেছে। কিন্তু যে-আদর্শ তার মনের ক্ষুধা মিটিয়েছিল, সে আদর্শকে আজও জাপান খর্ব্ব করেনি।

সুতরাং দেখা যায় যে জাপান, চীন ও ভারতের ভিতর একটা ঐক্য আছে। সে ঐক্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক বা spiritual। এই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি ভারত থেকেই চীন ও জাপান পেয়েছে। কিন্তু জাপান যেরূপ পুরাণো ও নূতনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছে, চীন তা' পারেনি। বৌদ্ধধর্ম্ম চীন থেকে অন্তর্হিত না হ'লেও চীনের উপর তার প্রভাব ক্ষীণ হয়েছে। অন্তর্বিপ্লবে চীনের সে অধ্যাত্ম-দৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাই সাহিত্য, শিল্পকলার অবনতির যুগ চলছে। বর্ত্তমান চীনকে তাই ভারতের মতই সব নূতন করে গড়তে হ'চ্ছে। এই গঠন-কার্য্যে চীন তার প্রাচীন আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে কিনা তা বলা যায় না। কারণ নবীন চীনের দৃষ্টি পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে নিবদ্ধ—তাই সে রবীন্দ্রনাথের বাণীকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে। বলেছে—বর্ত্তমান চীনের আর প্রাচীন অধ্যাত্ম-জ্ঞানের আবশ্যক নেই। কারণ সে হ'চ্ছে একটা আলো-আঁধারে জ্ঞান বা mysticism। এর চেয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দেওয়া জ্ঞান অনেক বেশী প্রাঞ্জল, সেই হ'চ্ছে জাতীয় উন্নতির মূল। যে-ভারত চীন জাপানকে অধ্যাত্ম-দৃষ্টি দিয়েছিল তার মনেও যে সেই ভাব বদ্ধমূল হয়ে উঠছে না তা' কে বলবে? সুতরাং যে অধ্যাত্ম-দৃষ্টি প্রাচ্য জগতের ঐক্য বিধান করেছিল এবং যার আভাস আজও আমরা পাই—তার শেষ কোথায়, তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

অপরাজিতা

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলেজের মধ্যে মায়া মেয়েটি ছিল যেন একটি ফুলকি,—তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, অথচ সে সবাইকে তার প্রতি আকৃষ্ট ক'রে রাখে। তাকে ঠিক-মতো বর্ণনা করতে হোলে ভাষার যে নিপুণ এবং সূক্ষ্ম চমৎকারিত্বের প্রয়োজন আমার হয়ত তা নেই। তার একমাত্র অভিভাবক মামা, সেই বিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক; এবং দর্শনের অধ্যাপক বলতে যা বোঝায়, পুরোপুরি তিনি তাই। সুতরাং মায়া বড়ো হোয়ে উঠ্‌ল—তার নিজের স্বাধীন সত্তার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামত বিকাশের ভিতর দিয়ে।

তার বয়স যখন ষোলো পার হ'ল, তখন দূর এবং নিকট আত্মীয়বর্গের খোঁচায় সচেতন হ'য়ে মামা তার জন্য পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করলেন। পাত্র অনেক এলো, কিন্তু তেমন মনোমত কারুকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। মায়া তখন মামাকে এই ব'লে নিবৃত্ত করলে—কেন মামা, তুমি পাঁচজনের কথায় নিজেকে সারাক্ষণ অস্থির করছ; এখন ও-সব থাক। যখন দরকার হবে আমি তোমাকে বলব।

মামা তাঁর আদরের ভাগিনেয়ীটিকে বিলক্ষণ চিনতেন; তাই তার কথা শুনে হৃষ্টচিত্তে পুনরায় তাঁর দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে ডুব দিলেন। মায়ার বিবাহের কথা সেইখানেই চাপা প'ড়ে গেল।

তা গেলেও, তার বন্ধুদের মধ্যে সে কথা নিয়ে যে মাঝে মাঝে আলোচনা হ'ত না, তা নয়। সেদিনও সেই রকমই একটা কথা হচ্ছিল।

ইনার কথায় মায়া সহাস্যে উত্তর দিলে—তোমরা ত বলছ, কিন্তু আমি তো কারুকেই দেখতে পাচ্ছি না।

সিতমুখী সুধা বল্লে—সে কি তাই! তোমার ভক্তের সংখ্যা দিন দিন যে কি রকম বেড়ে উঠ্‌ছে তা-কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? তাদের কারুকেই কি তোমার পছন্দ হয় না?

নব-পরিণীতা কৃষ্ণা বল্লে—তোর ক্লাসের নরেশ বোস তো চমৎকার ছেলে। কতদিন ধ'রে তোকে সাধ্য-সাধনা করছে। ওকেই কেন—

মায়া বলে উঠ্‌ল—ওই প্যান্‌পেনে কবি? না ভাই। ওর কবিত্বের জ্বালায় এখনই অস্থির হ'য়ে উঠেছি, এরপর তাহলে একদিনও রাত্রে ঘুমুতে দেবে না।

ইনা বল্লে—বেশ, ও না হয়, বিলোপ? সে তো আর কোন অংশে তোমার অযোগ্য নয়। আর তাকে তুমি যে রকম নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ,—বেচারী তো একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছে!

মায়া ঠোঁট উলটে বল্লে—ও বড্ড মোটা। তা-ছাড়া সব কথায় যারা নাচে সে-সব মহাপুরুষদের নিয়ে আমার পোষাবে না।

কৃষ্ণা বল্লে—তবে কি তুই এমনি ধিঙ্গী হ'য়েই চিরকাল বেড়াবি? ছেলেগুলোও যেমন হ'য়েছে,—খালি ওর পেছু-পেছু ঘুরেই মরে। অথচ অমন যে লক্ষ্মী-মেয়ে শোভা, তার বর জোটে না!

কৃষ্ণা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, সহসা তাকে থামিয়ে দিয়ে মায়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে—নরেনদা', শোন শোন।

কিছুদূর দিয়ে যে ছেলেটি চলে যাচ্ছিল, এই আহ্বানে সে ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল; বল্লে—বেশ তো গল্প চলছিল, মাঝপথে হঠাৎ আমাকে তলব হ'ল কেন?

—কোথায় যাচ্ছ? ইলাদির বাড়ি? সে যাবে'খন বোসো না, একটু গল্প করি। আজ এসেছ বুঝি? কলকাতার খবর কি? তোমার সেই প্রেমাকাঙ্ক্ষা বন্ধুটির কিনারা হ'ল কিছু?

নরেন সেই স্কুলেরই কর্মাধ্যক্ষের পুত্র। কলকাতার একটি আপিসে সাধারণ ক্লার্ক। বিবাহিত। পিতা-

মাতা এবং স্ত্রী এইখানেই বারোমাস থাকে ; নরেন কলকাতার মেসে থেকে পড়া শোনা করে এবং প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে বাপ-মায়ের কাছে আসে। এইটেই তার বাড়ি। মেসের বন্ধু মিলে তাদের একটি ক্লাব আছে—সাহিত্য-শিল্প চর্চ্চার বৈঠক। সেখানকার একটি বন্ধু জনৈকা সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছে এবং তার সেই ভালোবাসার কাহিনী নিয়ে রজত নামে তাদের অপর একটি সাহিত্যিক বন্ধু মাসিকপত্রে এক মজার গল্প লিখে বন্ধুবর্গের কৌতুক বৃদ্ধি করেছে। নরেন মায়ার কাছে এই সব কথা গল্প ক'রে বলেছে এবং নূতন কিছু খবর থাকলে সে এখানে এসে সর্ব্বাগ্রে মায়াকে সে কথা জানিয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

তার প্রশ্নের উত্তরে নরেন বল্লে—না কৈ আর হল! মেয়েটির ইচ্ছে আছে, তবে তার বাপ মা—

মায়া বল্লে—মেয়েটির ইচ্ছে আছে? Splendid!—বাপ-মা-গুলোর জ্বালায় আর পারা যায় না! কি বলছে তারা, আর কাউকে ঠিক করেছে বুঝি?

নরেন বল্লে—প্রায়। মেয়ের বিয়ে দেবার জন্তে তাঁরা ব্যস্ত হোয়ে পড়েছেন। প্রদ্যোত তো ভয়ানক ভেঙে পড়েছে! শক্-টা নিতে পারলে হয়!

মায়া বলে উঠ্‌ল—ওই-গুলো নেহাৎ বাড়াবাড়ি। শক্ কি আবার! বিয়ে হ'ল না—বিয়েই হ'ল না; তার জন্তে অমন সস্তা শক্ খাওয়া—বিশ্রী! মেয়েটা খুব ভাল তাই, পড়তেন ভদ্রলোক আমার পাল্লায়, তাহলে এমন ঘোল খাওয়াতাম যে আর উঠে দাঁড়াতে হত না।

নরেন বল্লে—তুমি তো সবাইকেই ঘোল খাইয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু তোমায় যে কে কবে ঘোল খাওয়াবে—তা তো এখনো জানতে পাচ্ছি না?

মায়া বল্লে—সে পারবেও না কোনদিন। আচ্ছা, তোমার সেই লেখক-বন্ধুটির আর কোন লেখা তো আজকাল দেখতে পাচ্ছি না? বেশ মজার গল্পটি লিখেছিলেন কিন্তু!

নরেন বল্লে—হাঁা, কিছুদিন থেকেই বিশেষ-কিছু লিখছে না। Final M. B. দিচ্ছে কিনা,—তাই বোধ হয় ব্যস্ত আছে।

মায়া আশ্চর্য্য বল্লে—রজত বাবু ডাক্তার হবেন?

নরেন বল্লে—তা তো হবেন-ই ; এবং খুব ভাল ডাক্তার-ই হবেন। চৌকস ছেলে। বাঁশি মড়াও যেমন কাটে, মিঠে গল্পও তেমনি লেখে।

মায়া আপন মনে-মনে বল্লে—সো ইন্‌টারেষ্টিং।

তারপর সুর ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে—এত প্রেমের গল্প যখন লেখেন, নিজে এতদিনে প্রদ্যোত বাবুর দল বৃদ্ধি করেছেন নিশ্চয়ই?

নরেন বল্লে—নিশ্চয়ই না। প্রেমের গল্পই লেখে কিন্তু প্রেম ও মানে না।

মায়া বল্লে—মানেন না! আশ্চর্য্য তো!!

নরেন বল্লে—ও বলে—ময়রা যেমন সন্দেশ খায় না, আমাদেরও তেমনি। ছানাকে যেমন চিনি মিশিয়ে ছাঁচের মধ্যেই মানায় ভাল,—মেয়েদেরও তেমনি সাজিয়ে-গুজিয়ে প্রেমের গল্পের নায়িকা-রূপেই বেশ দেখায়। বাস্তব জগতে ওরা টোকো ছানা।

মায়া ভুরু কুঁচ্‌কে বল্লে—ইস্। ভারী যে চাল!

নরেন হেসে বল্লে—চাল তার মোটে নেই। আমাদের মধ্যে ওর মতো নম্র প্রকৃতির ছেলে খুব কমই আছে।

এমন সময় স্কুলের আর একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে বল্লে—মায়াদি, মাসিমা তোমায় ডাকছেন। সবাই এসেছে। গান আরম্ভ হোয়ে গেছে। আজকে যে ফুল রিহারস্তাল,—তুমি জানো না?

নিজেদের অনুষ্ঠানের সাহায্য-কল্পে মেয়েরা একটি পুরুষ-ভূমিকা-বর্জ্জিত গীতি-নাট্য অভিনয়ের আয়োজন করেছে। অভিনয় হবে আগামী সপ্তাহে কলকাতার কোন এক বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে। সে-অভিনয়ে নৃত্য-গীতের প্রধান অংশ মায়ার উপর ন্যস্ত হয়েছে।

মায়া উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—আচ্ছা নরেনদা, তোমার কলকাতার বন্ধুরা আমাদের প্লে দেখতে আসবে?

নরেন বল্লে—আসবে না আবার! সেখানে তো সবা-মোহ প'ড়ে গেছে! তারা সব্ এর মধ্যেই টিকিট কিনে রেখেছে।

মায়া বল্লে—সত্যি? বেশ তো! আচ্ছা, তোমার ডাক্তার বন্ধুটি বোধ হয় এ-সব দেখতে ভালবাসেন না বুঝি?

—বাসে না!! সে তো সব-কয় রাত্রেরই সীট বুক কোরে রেখেছে। এ-সব বিষয়ে তার মতো উৎসাহী আমাদের মধ্যে আর কেউ-ই নেই।

অভিনয় হোয়ে গেছে। সব-শুদ্ধ অভিনয় হয়েছিল—তিন রাত্রি। শেষ রাত্রির শেষ ট্রেনেই মেয়েরা ফিরে এসেছে। কাজেই, অভিনয় কেমন হ'ল তার বিশদ বিবরণ তারা পায় নি। তাই, সেই সপ্তাহের শেষে, পূজোর ছুটিতে নরেন যখন বাড়ী এলো তখন সবাই তাকে ঘিরে ধরল; —বিশেষ কোরে মায়া। সে বল্লে—এই প্রথম প্রকাশ্যভাবে স্টেজে নাম্‌ছি। তাই নিন্দা-সুখ্যাতি দুটোই আমাদের কাছে মূল্যবান জিনিষ। তোমার বন্ধু-বান্ধবেরা কি বল্‌ল, বল।

নরেন বল্লে—অভিনয় খুব ভাল হয়েছে। দর্শক-বৃন্দ মুগ্ধ হোয়ে গেছে। বিশেষ, একজনের নাচ দেখে কবিতাও রচিত হোয়েছে।

মায়া ব'লে উঠল—ইউরেকা! সে আমি নিশ্চয়! কিন্তু এমন পরম সমজদারটি কে নরেন-দা?

—নাম বলতে বারণ আছে।

—আচ্ছা, নাম জানতে চাইনে, কিন্তু কবিতাটা কি শুনতে পাবো না?

নরেন পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার কোরে বল্লে—শোনাতে আপত্তি নেই। কিন্তু, mind that, নাম বলব না।

দুহাতের মাঝে কাগজ-খানা উঁচু কোরে ধ'রে নরেন পড়তে সুরু করলে—

তোমারে হেরিনু দীপ্ত উৎসব অঙ্গনে
নৃত্য-ছন্দে উচ্ছলিত মায়া......

সহসা বাজ পাখীর মতো ক্ষিপ্র গতিতে মায়া কাগজখানাকে নরেনের হাত থেকে তুলে নিলে। আচম্বিতে এমন ভাবে কাগজ-খানা হাত থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে নরেন কিছু ব'লে গেল।

একটু পিছিয়ে গিয়ে, কাগজ-খানাকে পরিপাটি কোরে ভাঁজ করতে করতে মায়া বল্লে—কবিতা যখন আমাকে উদ্দেশ কোরে লেখা, তখন দরজা বন্ধ কোরে একা আমি প্রথম পড়ব, তারপর তোমরা সবাই। কেমন?

এই ব'লে, ভাঁজ করা কাগজখানা ব্লাউজের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিলে।

নরেন হেসে বল্লে—এমন-তর রাহাজানির ব্যবসায় যায়া কেবল কাগজের টুকরোই পাওয়া যাবে। আর কিছু নয়।

চলে যেতে যেতে মায়া বল্লে—ব্যবসায় এখন সবে সুরু কিনা; তাই এখন যথালাভ।

পরদিন সকাল হোতে না হোতেই মায়া নরেনকে একা পেয়ে বল্লে—তোমার ডাক্তার বন্ধুটি বেশ গুছিয়ে কবিতা লিখতে পারে তো? ভদ্রলোক, দেখছি, জানে না এমন জিনিষই নেই।

নরেন দুই চোখ বড়ো কোরে বল্লে—রজত লিখেছে জান্‌লে কেমন কোরে? নাম দেওয়া ছিল না তো?

মায়া বল্লে—পুরো নাম না থাক, কাগজের কোণে এমন কিছু ছিল, যাতে নামটা জানতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

নরেন হেসে বল্লে—ওঃ! কিন্তু, কৈ, আমার নজরে একেবারেই পড়েনি!

মায়া বল্লে—ও সব সূক্ষ্ম বস্তু তোমাদের নজরে পড়বার জন্য নয়। সে যাই হোক, কিন্তু কী বাড়িয়েই লিখেছেন। অন্য কেউ হোলে এতক্ষণে গ'লে যেতো,—আমি নেহাৎ শক্ত মেয়ে তাই।

নরেন বল্লে—কবিতাটা দাও। পাঁচজনকে প'ড়ে শোনাই। এনেছ সঙ্গে?

মায়া বল্লে—না, আনিনি। পাঁচজনকে প'ড়ে শোনাবার জন্য রজত বাবু কবিতা পাঠান নি। অতটা, পাঁচ-জনকে প'ড়ে শোনাবার মতো নয়ও। পাঁচ-জন কবিতার পাঁচ-ছটা ছন্দ-পতন।

[illegible] হেসে বল্লে—তাই নাকি? তাহ'লে, [illegible] তুমি ঠিক কোরে নিও; আমি ইতিমধ্যে রজতকে চিঠি লিখে দি—দুদিন পরে নয়, পত্রপাঠ, যাতে তুমি এখানে চ'লে এসো। [illegible] তোমার

সম্পত্তি বেহাত হোয়ে গেছে;—নিজের জিনিষ, নিজে এসে আদায় কোরে যাও।

ঈষৎ আগ্রহ সহকারে মায়া প্রশ্ন করলে—রজত বাবু এখানে আসছেন নাকি?

নরেন বল্লে—হাঁ, তার এখানে বেড়াতে আসবার অনেক দিন থেকে ইচ্ছে। এবার আমি ১৫ দিনের ছুটি পেয়েছি;—আসবার সময় অনেক কোরে তাকে বলে এসেছি।—বলেছে—সামনের সপ্তাহে আসবে।

মায়া আরও কিছুক্ষণ নরেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে চলে গেল। তার সামান্য ভাবান্তরটুকু নরেনের নজরে পড়ল না।

ট্রেণ থেকে নেমে নরেনের জিম্মায় তার স্যুটকেস্ এবং নিজেকে সমর্পণ ক'রে অনভ্যস্ত রজত যখন আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করলে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়ে গেছে।

দুই বন্ধুতে বাড়ি যাবার জন্য গাড়িতে উঠে বসতেই রজত ব'লে উঠ্‌ল—ওহে, দেখ দেখ, কী সুন্দর চাঁদ উঠ্‌ছে!

সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের কোলে চাঁদের অনাবৃত কলেবর ভেসে উঠেছে। নরেন বল্লে—তাই নাকি! চাঁদ উঠ্‌ছে? আশ্চর্য্য তো!!

দুজনেই সশব্দে হেসে উঠ্‌ল।

নরেন বল্লে—ওহে রজত, কবিতাটা তো তোমার কাছ থেকে কেড়ে আনলাম, কিন্তু ভাই, সেটা খোয়া গেছে।

রজত হেসে বল্লে—যাক্ গে। এমন কিছু মহার্ঘ বস্তু নয়।

নরেন সস্মিত মুখে বল্লে—ঠিক খোয়া যায় নি,—মায়া আমার কাছ থেকে সেখানা ছিনিয়ে নিয়েছে; কিছুতেই আর ফেরৎ দিচ্ছে না।

কথা শুনে রজত অতিশয় লজ্জিত কণ্ঠে বল্লে—এঃ! কেন তুমি দিলে? কি ভাবছে সে হয়ত। ভালো কোরে যদি লিখতে জানতাম, তাহলে না হয় কথা ছিল। একে অত্যন্ত অক্ষম রচনা, তার তোমার মায়া বোনটির মনস্তুষ্টির জন্য [illegible]—ওর কবিতার [illegible] আর [illegible] না।

বাড়ি এসে নরেন, রজতের জন্য যে-ঘর ঠিক কোরো রাখা হোয়েছিল, সেই ঘরে তাকে নিয়ে গেল। চাকর এসে বিছানা পেতে দিলে। নরেন তার খাবার ব্যবস্থা করতে বাড়ির ভিতর প্রস্থান করলে।

পূব-দিকের জানালাটা খুলে দিতেই সদ্য-ওঠা চাঁদের আলোয় ঘর যেন প্লাবিত হোয়ে গেল। রজতের খুব ভাল লাগছিল। সে জানালার ধারে এসে আলোর বন্যায় গা মেলে দাঁড়াল। এমন-তর বড়ো চাঁদ আর এত আলো সে যেন জীবনে প্রথম দেখ্‌ছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর নরেন বল্লে—দেখ রজত, কাল খুব ভোরে আমি একবার বেরুবো; বেশী দূরে নয়; পরের ষ্টেশনে আমার মাসিমার কাছে। তাঁকে নিয়ে আমি দুপুরের মধ্যেই ফিরবো। সকাল বেলাটা তুমি একাই ঘুরে চারিদিক দেখে বেড়িও। কোন অসুবিধে হবে না।

রজত জানালার ওপর বসে ছিল; হেসে বল্লে—বেশ ভাই; পড়েছি এসে তোমার হাতে,—এখন যা বলবে তাই কোরবো।

নরেন হেসে বল্লে—না হে না, ভাবছ কেন? সকাল-বেলাটা বৈত নয়।

রজত যে অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের সঙ্গ বিশেষ স্বচ্ছন্দ-চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না, তা নরেন ভালই জানতো। সে-কারণে সকালে তার অনুপস্থিতির জন্য সে রজতকে আগে থাক্‌তেই ওয়াকিফ্ কোরে রাখছিল।

রজত বেড়াতে বেরিয়েছে।

পূর্ব্ব-দিগন্তে মাঠের শেষে সূর্য্য তখনো সবখানি উঠে দাঁড়ায় নি। গাছে গাছে পাখীদের জাগার গান শোনা যাচ্ছে। মাঠের বুকে শ্যামল ঘাসের উপর রূপালি [illegible] শিশির-বিন্দুগুলো ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌ছে। মাঠের মাঝখান [illegible] পায়ে-চলার যে-পথটা গ্রাম ছাড়িয়ে পশ্চিমের দিগন্ত-[illegible] গিয়ে মিশেছে তার মাটির গৈরিক রঙ্ সূর্য্যের আলোয় রাঙা হোয়ে উঠেছে। মন্দির থেকে কোন অদৃশ্য-কণ্ঠের একটানা [illegible] ভেসে আসছে।

রজত মুগ্ধ হোয়ে গেছে। ইট্-কাঠ্-ঘেরা মেসের রুদ্ধ-ঘরের বদ্ধ বাতাস, ধুলি-ধুসর রাস্তা আর কৃপণ প্রকৃতির রুক্ষ শোভা,—এরই মধ্যে সে বড়ো হোয়ে উঠেছে। তার বাইরে এক পা-ও সে বাড়ায় নি এর আগে কোনদিন। তাই আজ তার আগল-মুক্ত মন আনন্দে বিভোর হোয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছিল—জন্মাবধি যেন সে কোন্ শত্রুর অন্ধকূপে বদ্ধ ছিল, এতদিন পরে সেখান থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হ'য়েছে; সেই অন্ধকার ঘর ছেড়ে আজ সে যেন এই প্রথম মুক্ত-বাতাসে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে সূর্য্য অনেকখানি পথ ভেঙেছেন। পাখীরাও বাসা ছেড়ে পাখা মেলেছে। সহসা রজত থমকে দাঁড়াল। যে-পথ দিয়ে সে চলছিল তার পশ্চিম-দিকে মাঠের উপর যে ছাতিম-গাছটা দাঁড়িয়ে আছে তারই একটা নুয়ে-পড়া ডালে এক-জোড়া পাখী বোসে। এমন বিচিত্র রঙীন পাখী সে কখনো দেখে নি। প্রথমে মনে হয়—পায়রা; কিন্তু পাখার রামধনু রঙ্ তো পায়রার নয়, আর পায়রার গ্রীবাও অমন সুন্দর হয় না। পাখী দুটো পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে ক্রমাগত এক সুরে কূজন কোরে চলেছে। রজতকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

রজতের যে-হাতে ক্যামেরাটা ছিল, সেই হাত চঞ্চল হোয়ে উঠ্ল। অনেক দিন ধ'রে, অনেক প্লেট্ নষ্ট কোরে সে এখন একজন পাকা ফটো-তুলিয়ে। এমন সুন্দর পশ্চাৎ-পটের সামনে ওই মূর্ত্ত পাখী-দুটোকে ধ'রে রাখতেই হবে। রজত ক্যামেরা খুলে ফেল্লে।

যন্ত্রটা ফিট্ কোরে, সেটা চোখে লাগিয়ে ফোকাস্ ঠিক ক'রছে, এমন সময় কাঁচের ওপর ছায়া পড়ল। মুখ তুলে সে দেখলে, একটি মেয়ে সোজা ক্যামেরার সামনে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেই ছাতিম-গাছটার তলায় যে চওড়া-বেদী আছে, তারি ওপর বসল—রজত এবং তার ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে। তার বসার সঙ্গে সঙ্গে পাখী দুটোও গেল উড়ে।

রজত বড়ো বিরক্ত হোয়ে উঠ্ল। অমন সুন্দর একখানা ছবি,—বেরসিক মেয়েটা একদম মাটী কোরে দিলে। ফোটো-খানা যে খুব ভাল হ'ত সে-বিষয়ে তার তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। কে জানে, হয়ত Kodak-এর প্রতিযোগিতায় ছবিখানা প্রাইজ পেতে পারতো;—ফার্ষ্ট-প্রাইজ—আড়াই-হাজার টাকা! কে বলতে পারে?

পাখী-দুটো যেমন গেছে,—ওই মেয়েটার একটা ছবি নিতে হবে। যেমন কে তেমন! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত ধ'রে রজত চিন্তা কোরে নিলে। তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির পিছনে দাঁড়িয়ে বল্লে—দেখুন।

সহসা পিঠের কাছে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে মেয়েটি চম্‌কে উঠে ঘাড় ফেরালে। তার মুখের উপর দৃষ্টি পড়তেই রজত বিস্ময়ে নির্ব্বাক হোয়ে গেল! এ-মুখ যে একান্ত চেনা, অত্যন্ত পরিচিত! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

মেয়েটি তার ভাব দেখে নিজেই কথা বল্লে—আমাকে কিছু বলবেন?

রজত ভরসা পেয়ে বল্লে—হ্যাঁ, দেখুন, আপনি আমার একটি মস্ত ক্ষতি করলেন।

মেয়েটি বল্লে—সে কি! কেমন কোরে?

রজত বল্লে—আপনি যেখানটায় এসে বসলেন, আমি সেই গাছটার ছবি নিচ্ছিলাম। আপনি আসাতে আমার ছবি নষ্ট হোয়ে গেল।

মেয়েটি হাসল। হাসিটা তাচ্ছিল্যের। বল্লে—আমার বোটানির জন্যে এই গাছের পাতাগুলো আমার আঁকতে হয়। সুতরাং আমার কাজ করতে আমি এখানে এসেছি, অপরের কি ক্ষতি হ'ল, তা দেখবার প্রয়োজন আমার নেই। আর বেশ তো, এ-রকম গাছ আরো অনেক আছে, সেই-একটার ছবি তুলে নিন না।

কথা আরম্ভ কোরে দিয়ে রজত মনে অনেকটা বল পেয়েছে। মনে মনে বলছে—এমন background-এ এ-ছবি যদি না তুলতে পারি তাহলে বৃথাই আমার এতদিনের শিক্ষা।

মেয়েটির কথার উত্তরে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে সে বল্লে—আজ্ঞে, ঠিক তা নয়; গাছের ওপর এক-জোড়া ভারী চমৎকার পাখী বসেছিল,—আপনি আসাতে তারা উড়ে গেল।

মেয়েটির মুখের চাপা-হাসি এবার স্পষ্ট হোয়ে উঠ্‌ল;

বল্লে—ও, তাই। তা কি করবো বলুন; আমি জানতে পারি নি। কিছু মনে করবেন না।

কেশে গলাটা পরিষ্কার কোরে নিয়ে, একটু থেমে রজত বল্লে—তা করব না, যদি আপনাকে একটি অনুরোধ করবার অনুমতি পাই।

রজত মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল; ততক্ষণে তার মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গেছে; এক মুহূর্ত্ত মৌন থেকে গম্ভীর-মুখে সে বল্লে—কি অনুরোধ, বলুন।

কি-ভাবে কথাটাকে প্রকাশ করবে রজত কিছুতেই তা ঠিক করতে পাচ্ছে না; শেষে, এক-নিঃশ্বাসে সে বলে ফেল্লে—যদি আপনার একখানা ছবি তুলতে অনুমতি দেন, তাহলে আর কোন ক্ষোভ থাকে না।

তার কথা শুনেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল; শঙ্কিতচিত্তে রজত ভাবলে—এইবার বোধ হয় সে সে-স্থান পরিত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু না, মেয়েটি দাঁড়িয়ে থেকেই বল্লে—এ কিন্তু আপনার অন্যায় অনুরোধ। আপনার পাখী না হয় উড়ে গেছে, তাই বলে আমার ছবি তুলবেন—এ কেমন কথা।

রজত বুঝলে, মুখে যাই বলুক মেয়েটির মন তার কথায় রাজী হয়েছে। সে একটু পিছিয়ে এসে ক্যামেরার ফোকাস্ ঠিক কোরে নিতে লাগল।

মেয়েটির জরির-পাড় শাড়ীখানার প্রান্ত এসে মাটিতে ঠেকেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে তার সারা গায়ে, মুখে, অবিন্যস্ত চুলের গোছায় ওপর।

কল টেপবার আগে রজত আর একবার মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। সবই চমৎকার, কিন্তু বড্ড গম্ভীর মুখ। ওই সুন্দর মুখখানায় অল্প একটু হাসি ফুটিয়ে তোলা যায় কেমন কোরে?

সহসা মেয়েটি বলে উঠল—আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না। আমি চল্লাম।

রজতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—তাহলে আমার পাখীও গেল, আপনিও গেলেন?

এ-কথায় মৃদু হাসি চেপে রাখা মেয়েটির পক্ষে অসম্ভব হোয়ে দাঁড়াল। হাসি-মাখানো মুখখানাকে ফিরিয়ে নিতে নিতে সে বল্লে—আপনার দুরদৃষ্ট নিশ্চয়, কিন্তু আমি কি করব বলুন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রজত সুকৌশলে কল টিপে দিলে। মেয়েটির ব্রীড়া-রঞ্জিত মুখের সেই অপূর্ব্ব শোভাটি তার ক্যামেরার কক্ষে চিরদিনের মতো বন্দী হোয়ে রইল।

রজতের কাজের এই সাফল্য মেয়েটি জানতে পারলে কিনা, ঠিক বোঝা গেল না। সে তার বই এবং খাতাখানি বুকের কাছে তুলে নিয়ে মন্থর-গতিতে সেখান থেকে চলে গেল।

যতদূর দেখা যায় রজত নির্নিমেষ নয়নে মেয়েটির গমন-পথের দিকে চেয়ে রইল। চলার ছন্দ, গতির মূর্চ্ছনা প্রভৃতি কাব্যিক-কথাগুলো সে এতদিন শুধু পড়েই এসেছিল; আজ জীবনে প্রথম উপলব্ধির মধ্যে তাদের আস্বাদ গ্রহণ করলে।

বারোটার পরেই নরেন বাড়ি ফিরে এল। তারপর খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম অন্তে তারা দুজনে বেড়াতে বার হ'ল।

কয়েক-পা এগিয়েই রজতের নজরে পড়ল—সকালের দেখা সেই মেয়েটি একেবারে তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে। তাকে দেখেই নরেন বলে উঠল আরে, মায়া যে! কতদূর যাচ্ছ?

মায়া ঘাড় ঘুরিয়ে দুজনকেই একবার দেখে নিলে; তারপর নরেনের দিকে চেয়ে বল্লে—তোমাদের বাড়িই যাচ্ছিলাম নরেন-দা—বৌদির কাছে একটা সেলাই-এর নক্সা শিখে নেব ব'লে।

মায়া পা বাড়াইতেই নরেন বল্লে—সে তো বাড়িতে নেই; কোথায় বেড়াতে বেরিয়েছে।

নেই? মায়ার গতি রুদ্ধ হ'ল। তাহলে এখন আর গিয়ে কি হবে? সে ফিরল। সেই অবসরে নরেন তার কাছে গিয়ে বল্লে—মায়া, যে-ভদ্রলোকটিকে আমার সঙ্গে দেখছ, উনিই হচ্ছেন আমার বন্ধু—রজত রায়। রজত, ইনিই হচ্ছেন মিস্ মায়া সেন।

সকালবেলাকার প্রথম দর্শনেই রজত মায়াকে চিনতে

পেয়েছিল। কিন্তু রজতের পরিচয় শুনে মায়া একেবারে অবাক হোয়ে গেল! এই—রজত! সঙ্গে সঙ্গে কি-জানি কোন্ অনির্দ্দেশ্য কারণে রজতের ওপর মায়া তীব্র রাগান্বিত হোয়ে উঠ্‌ল।

রজত হাসিমুখে এগিয়ে এসে তাকে নমস্কার করলে; সে অভিবাদনের মধ্যে পরিচয়ের সুর নিতান্তই সহজ হোয়ে বেজে উঠ্‌ল। কিন্তু মায়া না করলে একটা প্রতি-নমস্কার, না বল্লে কোন কথা। নরেন তখন রজতকে শুনিয়ে শুনিয়ে মায়ার নানাবিধ গুণের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু মায়ার কানে তার একটা কথাও প্রবেশ করলে না। সকালে কেন রজত মায়ার কাছে তার আত্ম-পরিচয় দিলে না? মায়াকে সে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল, তবে কেন সে নিজের পরিচয় গোপন করলে? রজতের এই পরিচয় না-দেওয়াকে মায়া একটা ছুরপনেয় অপরাধ ব'লে মনে করতে লাগল; সে দুষ্কৃতির যেন আর মার্জ্জনা নেই!

মায়ার ভাবহীন রক্তিম মুখ দেখে রজত মনে মনে ভয় পেয়ে গেল। নরেন কিন্তু তার এই ভাবকে নারী-সুলভ লজ্জা বলে গ্রহণ কোরে সোৎসাহে বল্লে—কবিতা তো আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে; কিন্তু কেমন হ'য়েছে, সে-কথা তো একবারো বল্লে না। যে-রকম নির্জ্জলা প্রশস্তি,—খুব খুসী হয়েছে নিশ্চয়?

মায়া এইবার রজতের দিকে চোখ ফেরালে, তারপর নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে বল্লে—আপনি লিখেছেন বুঝি?

রজত লজ্জিত-মুখে মৌন হোয়েই রইল। নরেন বল্লে—বাঃ! এতক্ষণ সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে এখন প্রশ্ন হ'ল—"আপনি লিখেছেন বুঝি"! কেন, তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না, নাকি?

মায়া এইবার হাসবার চেষ্টা কোরে বল্লে বেশ তো লিখেছেন! তা, এ রকম কবিতা সব-শুদ্ধ ক'খানি রচনা কোরেছেন? অনেকগুলি খুব সম্ভব?

কথাগুলো সে বল্লে, না নরেনের দিকে তাকিয়ে, না রজতের দিকে।

সহসা পিছন থেকে মাথার কঠিন লাঠির আঘাত পেলে মুখের যে-অবস্থা হয়, মায়ার কথা শুনে রজতের মুখের অবস্থা বোধ করি তারও চেয়ে খারাপ দেখাল। কিন্তু মনের জোর তার ছিল অসাধারণ। নিমেষ মধ্যে নিজেকে সম্বরণ কোরে নিয়ে সে তার মুখের পূর্ব্বেকার হাসিটুকু ফিরিয়ে আনলে; তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্লে—খুব বেশী নয়, এই নিয়ে পাঁচ-খানা হবে।

নরেন এদের কথা শুনে বিহ্বল হোয়ে গেছে! এরা বলে কি? সে যে কি-কোরে হঠাৎ-ঘনিয়ে-আসা মেঘের মতো এই বিশ্রী অবস্থাটাকে সহজ কোরে তুলবে তার কোন হদিসই খুঁজে পাচ্ছে না।

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই এমন সহজ উত্তর মায়া আশা করে নি; তাই সে রজতের খুব-মিষ্টি-কোরে বলা কথাগুলো শুনে আরক্ত মুখে মুহূর্ত্ত-কাল নীরব হোয়ে দাঁড়িয়ে রৈল। তার পর মুখ ফিরিয়ে বল্লে—সে আমি জানি। চল্লাম নরেনদা। কিন্তু এরপর যখন কলকাতা থেকে কবিতা ব'য়ে আনবে তখন তার ছন্দগুলো অন্ততঃ একটু দেখে শুনে এনো,—তাহলে আর যাই হোক, সে-গুলো পাঠক-পাঠিকার উপহাস থেকে রক্ষা পাবে। মায়া দৃষ্টির বাইরে যেতেই রজত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—কী আশ্চর্য্য মেয়ে!!

নরেনের মনে হ'ল, রজত যেন পরিহাস কোরেই ও-কথা বল্লে। আর, প্রথম দেখাতেই মায়া তার প্রতি যে-রকম ব্যবহার করলে, তাতে পরিহাস সে পারে করতে। তাদের বাড়ীর অতিথি এবং তার পরম বন্ধুর প্রতি তাদেরই কুলের একটি মেয়ের এমন অশিষ্ট আচরণে নরেন লজ্জিত হয়ে পড়ল। খানিকটা ক্ষমা প্রার্থনার সুরেই সে বল্লে—কিছু মনে কোরো না, রজত। ও-মেয়েটা চিরকালই ওই রকম খামখেয়ালী। কাকে যে কি বোলে বসে, তার একটুও জ্ঞান থাকে না ওর।

রজত হাসিমুখে বল্লে—মনে করব কি হে! আমি তো মুগ্ধ হয়ে গেছি; কি দীপ্ত সতেজ চরিত্র! আমাদের সমাজে এ এক অভিনব জিনিব। কিন্তু আমি ভাবছি—খামোকা উনি আমার ওপর অতখানি চটে উঠ্‌লেন কেন?

সঙ্গে সঙ্গে সকালের ঘটনার কথা তার মনে পড়ে গেল। হঠাৎ অকারণ-কোরে [illegible] মায়ার মনের মধ্যে সকাল থেকেই [illegible]

সেটা শুধু উৎক্ষিপ্ত হ'লো মাত্র। কিন্তু না, রাগের কোন লক্ষণই তো সকালে সে মুখে ছিল না। তবে? রজত ভাবতে লাগল। ফটো তোলার কথা সে কি নরেনকে বলবে? থাক এখন; তাড়াতাড়ি কি? সময় মতো বললেই হবে।

দুজনেই এই অসুখকর ঘটনাকে চাপা দিয়ে অন্য নানা কথা আলোচনা করতে করতে তাদের বৈকালিক ভ্রমণ সমাধা করলে। কিন্তু, বলা বাহুল্য যে, সে বেড়ানো তেমন জম্‌ল না।

পরদিন

দুপুর-বেলা রজত তার ঘরের বিছানার ওপর ব'সে জিনিষ-পত্র গোছাচ্ছে। আজ বিকেলের গাড়িতেই সে বাড়ি ফিরবে।

নরেন ঘরে প্রবেশ ক'রে বল্লে—ওহে রজত, তুমি চলে যাচ্ছ শুনে একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন; কিন্তু তোমার অনুমতি না পেয়ে তো ঘরে ঢুকতে পারেন না; তাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

রজত উঠে দরজার কাছে এসেই দুহাত তুলে নমস্কার কোরে বল্লে—আসুন।

কুণ্ঠিত-পদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরে মায়া বল্লে—আপনি আজই চলে যাচ্ছেন নাকি?

এবার আর সে প্রতি-নমস্কার করতে ভুল করলে না।

রজত হেসে বল্লে—হ্যাঁ। দুদিনের জন্যই তো এসেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে—না এলেই বোধ করি ছিল ভাল। শুধু শুধু দুদিন থেকে এঁদের সকলের ওপর খুব খানিকটা উপদ্রব কোরে গেলাম।

এই বোলে, নরেনের বাড়ির গুরুজনদের স্নেহ, প্রীতি এবং আতিথ্যের ওপর এক উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ শেষ কোরে রজত বল্লে—যাই হোক, এখানে এসে এই দু'দিনেই জীবনের অনেক নতুন দিকের পরিচয় লাভ করলাম। অনেক দিক থেকেই এ-স্থানটি আমার স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

[illegible] আকাশে যে ঝিরঝিরে মেঘটা [illegible] পশ্চিমে উঠেছিল, নরেনের মনে হচ্ছে, আজ যেন তা মিলনের হাওয়ায় দিক-চক্রবাল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বিশেষ কোরে, রজতের চলে যাবার কথা শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবার জন্য মায়ার এই প্রচ্ছন্ন আগ্রহ নরেনের মনকে একেবারে হাল্কা নিশ্চিন্ত কোরে দিয়েছে। রজতের প্রতি কালকের ব্যবহারের জন্য মায়া লজ্জিত হয়ে পড়েছে; এবং এই লজ্জাকে নরেন সুদূর-প্রসারী দৃষ্টি দিয়ে অনেক বড়ো কোরে দেখে ভারী আনন্দ লাভ করছে।

রজতের নাতি-দীর্ঘ উচ্ছ্বাস শেষ হ'তেই নরেন বল্লে—ওহে, তুমি জিনিষপত্র গুছাও; আমি তোমার জন্য একখানা গাড়ি ঠিক কোরে আসি।

এই ব'লে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কালকের ঘটনার পর থেকে সারাক্ষণ মায়া অন্তরের মধ্যে সত্যিই একটা গ্লানি অনুভব করছিল; কিন্তু তাই ব'লে, মুখে দুঃখ প্রকাশ ক'রে তাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করবে তেমন মেয়েই সে নয়।

সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজ কোরে নেবার জন্য স্মিত-মুখে সে বল্লে—নরেনদার বাড়ির সকলে সত্যিই খুব চমৎকার লোক; কিন্তু ও তো গেল বন্ধুর সম্বন্ধে আপনার অভিমত। এ জায়গাটা কেমন লাগল, বলুন তো।

রজত তৎক্ষণাৎ বল্লে—এত ভাল লেগেছে যে, খুব চমৎকার, ভারী সুন্দর ইত্যাদি অনেক কথা বল্লেও অতি অল্পই বলা হবে। গ্রামটি যেন ছোট্ট, থাট্টি, একটি সুন্দর সাজানো ফুলের বাগানের মতো স্নিগ্ধ এবং রমণীয়।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিহাস করবার লোভ সে কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলে না, বল্লে—কিন্তু আপনাদের এ বাগানে ফুলই শুধু নেই, কাঁটাও বিলক্ষণ! ব'লে মৃদু মৃদু হাসতে লাগ্‌ল।

কথাটা রজত বল্লে নিছক রহস্যের ছলে, একান্ত হাল্কা-ভাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ নীরব থেকে মায়া যা উত্তর করলে তা যেমন কঠিন তেমনি গভীর; বল্লে—ফুল তুলে তুলে যাদের সাহস নিরন্তর বেড়েই চলেছে, এখানে এসে তারা কিছু শিক্ষা পেয়ে যাবে,—সেই জন্যই এখানকার আয়োজন একটু অন্যরূপ।

কথা শুনে রজতের মুখ পাংশু হোয়ে গেল। সামান্য পরিহাসের উত্তরে একী মর্মান্তিক কটূক্তি! ও-মেয়েটি কি কোন-বস্তুকে কিছুতেই সহজভাবে নিতে জানে না, মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করাই কি ওর স্বভাবের একমাত্র ধর্ম? রজত বায়েকের জন্য মায়ার মুখের পানে তাকিয়ে নীরবে তার কাজ কোরে যেতে লাগল।

ঘরের মধ্যকার বিক্ষুব্ধ মৌনতা মায়ার অসহ্য হোয়ে উঠ্‌ল। বাইরে যাবার জন্য মুখ ফেরালে, কিন্তু পা নড়ল না। তারপর, যা হোক-কিছু-বলবার জন্যই যেন বল্লে—নতুন স্থান থেকে অপরিচিতা মেয়ের ফটো তুলে আনাকে আপনাদের তরুণসম্প্রদায় নিশ্চয়ই একটা মস্ত বড় কৃতিত্বের নিদর্শন বোলে মনে করে; বন্ধুবান্ধবদের কাছে খুব সম্ভব আপনার এই কাজের জন্য অনেক প্রশংসা পাবেন। নরেনদা'কেও ফটো তোলার কথা বলেছেন বোধ হয়?

রজত ধীরে ধীরে উত্তর দিলে—বন্ধুবান্ধবের কাছে ফটো দেখিয়ে বাহাদুরী নেবার স্পৃহা এখনো আমার মনে জাগে নি; নরেনকেও এখনো কোন কথা বলি নি।

রজতের এই কথা মায়ার মনে এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি বহন কোরে নিয়ে এল। সহসা সে বলে ফেল্লে—নরেন-দা'কে ও কথা না জানালেই ভাল হয়।

মায়ার কথার সুরে বিস্মিত হোয়ে চোখ মেলে রজত বল্লে—বেশ। আপনার অনুরোধ রক্ষিত হবে।

মায়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে—ধন্যবাদ।

কিন্তু তারপরেই সে নিজের ওপর বিষম ক্রুদ্ধ হোয়ে উঠ্‌ল। কেন সে রজতকে ও কথা বলতে গেল? ও হয়ত মনে মনে কি ভাবছে, কে জানে! পরক্ষণেই অন্তরের উদ্বেলিত ক্রোধ গিয়ে পড়ল—রজতের ওপর। ওর ফটো তোলার জন্যই তো মায়া ওর কাছে এতখানি বিব্রত হ'ল!

পরমুহূর্ত্তেই তার মুখ দিয়ে যে বাক্য নির্গত হ'ল, রজতের কাছে তা যেমনি অপ্রত্যাশিত, তেমনি রূঢ়! কথাটা বলবার পরেই মায়া নিজেও মনে মনে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হোয়ে পড়েছিল এবং তার সপক্ষে নিজের অন্তরের কাছেও সে কোন কৈফিয়ৎ পেশ করতে পারে নি।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বল্লে—আচ্ছা, আপনি বল্লেন—আমাকে যে-রকম কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, সে-রকম কবিতা আরও চারখানা লিখেছিলেন; মেয়েদের কাছে শুধুই কি কবিতা লিখে পাঠান?

কথার আঘাতে রজত যেন অসাড় নিস্পন্দ হোয়ে গেল। অপমানের বেদনায় তার মুখ আরক্ত হোয়ে উঠ্‌ল; ঠোঁট দুটো বারকয়েক কেঁপে উঠ্‌ল পরক্ষণেই সে বল্লে—না, সময়ে সময়ে তাদের ফটোও তুলে থাকি।

এর উত্তরে মায়া কি বলত, কে জানে। বাইরে নরেনের সাড়া পাওয়া গেল। ঘরে প্রবেশ কোরে সে বল্লে—তোমার গাড়ী ঠিক কোরে এলাম রজত।

তারপর, বৈকালিক জলযোগ সমাপন কোরে বাড়ির গুরুজনদের কাছে বিদায় নিয়ে রজত যখন নরেনের সঙ্গে বাড়ির বার হ'ল তখন বেলা পড়ে এসেছে।

দিন চারেক পরে মায়া একখানা চিঠি পেলে। চিঠিখানা খুলে, পাতা উল্টে, তলায় নামটা দেখেই সে সে-খানা একটা মোটা বই-এর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল;—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের শয্যায় ব'সে সেখানা পড়তে লাগল। চিঠিতে লেখা ছিল—

সুচরিতাসু—

সাধারণত এত সামান্য পরিচয়ে আপনাকে পত্র লেখা হয়ত আমার পক্ষে শোভন হ'ত না; কিন্তু আপনার সঙ্গে যে-যৎসামান্য পরিচয় হ'য়েছে এবং বন্ধুর কাছ থেকে আপনার কথা যা শুনেছি, তাতে এ-কথা নিঃসংশয়ে বুঝেছি যে, কোন সাধারণ নিয়মই আপনার পক্ষে খাটে না। তাই আজ আপনাকে এই পত্র লিখতে সাহসী হলাম। দুঃসাহসিকতা যদি কিছু কোরে থাকি—মার্জনা করবেন।

ভুল করা মানুষের ধর্ম, এ যেমন সত্যি, ভুল করলে সঙ্গে সঙ্গে তার শাস্তিও পেতে হয়, তাও তেমনি সত্যি। মনের খেয়ালে কাগজের বুকে কবিতার যে আঁচড় কেটে-ছিলাম, আমার সে নিতান্ত অন্যায় প্রচেষ্টাকে একেবারে গোপন কোরে রাখাই উচিত ছিল; তা না কোরে তাকে

যে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি, সে আমার ভুলের উপযুক্ত প্রতিদান,—তার জন্ত অনুমাত্রও দুঃখ করিনে।

এখন, আপনার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ আছে। বিদ্রূপের পাত্র হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক বেশী সহনীয়;—আমার কবিতার যে-লাঞ্ছনা প্রাপ্য ছিল তা সে পেয়েছে, তাই, যদি সেটা আজো আপনার কাছে থাকে দয়া কোরে তাকে নষ্ট কোরে ফেলবেন,—ছিঁড়ে কুটি কুটি কোরে পথের আবর্জ্জনার সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দেবেন; সেই হবে তার বিড়ম্বিত জীবনের উপযুক্ত অবসান।

আপনার যে ছবি-খানা তুলেছিলাম, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি তার একখানি-মাত্র ছবি প্রিণ্ট কোরেছি। সেখানি এই সঙ্গে আপনাকেই পাঠালাম। এখন, যে নেগেটিভ্-প্লেটখানি আমার কাছে আছে, সেখানার প্রতি আপনার যদি কোন আদেশ থাকে, জানাবেন। যদি সেখানা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেন, দেব। যদি সেখানা নষ্ট করতে বলেন,—না, নিজের হাতে তাকে আমি ভাঙ্‌বো না; যদি বলেন, আপনার হাতেই তাকে অর্পণ করব।

নমস্কার নেবেন। ইতি

শ্রীরজত রায়

পত্র শেষ কোরেই মায়া খামের মধ্যে থেকে ফটোখানা বার কোরে নিলে। তারপর তাকে আলোর নীচে ধ'রে দুই-চোখের ব্যগ্র-দৃষ্টি নিয়ে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

এ কি! এ কী রকম বেহায়ার মতো তুলিয়েছে সে,—মাগো! নির্জ্জন-ঘরে একাকী মায়া লজ্জায় কণ্টকিত হোয়ে উঠ্‌ল। চকচকে কাগজের ওপর তার দুই-চোখের এ কী সলাজ বিমুগ্ধ দৃষ্টি! সারা অঙ্গ ঘিরে তার নববধূর মতো এমন কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা এলো কেমন ক'রে? ব্রীড়াবনত মুখে এমন মধুর আবেশ কে মাখিয়ে দিলে? ছি ছি! এ-ছবি যদি বন্ধুরা দেখে তাহলে তার লজ্জার আর শেষ থাকবেনা। এ-ছবি সে ছিঁড়ে ফেলবে।

কিন্তু ছবিটি যে তুলেছে তার কি পাকা হাত! মুখের সমস্ত রেখা-গুলি ঠিক স্পষ্ট উঠেছে ফুটিয়ে; এমন-কি বাঁ-গালের নীচে ছোট্ট তিলটি পর্য্যন্ত বাদ যায় নি; ফুটে উঠেছে ছবিখানা! কিন্তু না, একে এই বেলা কুচি-কুচি কোরে ফেলাই ভাল,—বিশ্রী ছবি! আচ্ছা, ছিঁড়ে না ফেলে লুকিয়ে রেখে দিলেও তো হয়? তাহলেও তো কেউ জানতে পারবে না! সেই ভাল। মায়া উঠে তার ট্রাঙ্ক্‌টা খুলে ফেলে। তারপর জামা কাপড়ের সব-তলায়, যেখানে আর একটা ভাঁজ করা কাগজ সযত্নে রক্ষিত ছিল তার পাশে ছবিখানা রেখে দিলে। বাক্সটা বন্ধ কোরে সে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ছবিখানা যতক্ষণ চোখের সামনে ছিল, ততক্ষণ এত লজ্জা লাগছিল তার!

বিছানায় ব'সে চিঠিখনা সে আগাগোড়া বারবার পড়তে লাগল। যতবারই সেখানা পড়লে, ততবারই তার পরিচ্ছন্ন সুডৌল অক্ষরের অন্তরালে একটি মার্জ্জিত এবং আঘাত-ক্লিষ্ট অন্তরের কথা তার কাছে স্পষ্ট হোয়ে ফুটে উঠল। এর কি উত্তর দেবে সে? বলবে কি যে, কবিতা সম্বন্ধে রজতের এতখানি ব্যথিত আশঙ্কার কোন ভিত্তি নেই,—কবিতা সে কারুকেই দেখায় নি? বলবে কি, যে-সব মন্দ কথা সে রজতকে বলেছে তাদের সঙ্গে তার অন্তরের কোন যোগ নেই? বলবে কি—? না না, মায়া কি পাগল হোয়ে গেছে! এমন-তর দুর্ব্বলতাকে সে কোন মতেই প্রশ্রয় দেবে না। একেবারে উত্তর না দেওয়াটা অত্যন্ত অভদ্রতা হবে, তাই সে সোজাসুজি একটা উত্তর লিখে দেবে; আর সে-চিঠি এখনই লিখে ফেলা ভাল। মায়া কাগজ-কলম নিয়ে পত্র-রচনায় প্রবৃত্ত হোলো। প্রথমেই হাঙ্গামা বাধলো—সম্বোধন নিয়ে। কি দিয়ে সে পত্র-লেখককে সম্বোধন করবে? "সবিনয় নিবেদন?"—বড্ড খাপছাড়া! "মহাশয়?"—নাঃ! "শ্রীচরণেষু?"—রামোঃ! শেষে, যে-সম্বোধনটা গোড়াতেই তার মনে হোয়েছিল, এবং যেটা বসানোর বিরুদ্ধে সে এতক্ষণ লড়াই করছিল, সেই সম্ভাষণ দিয়েই পত্র আরম্ভ করলে; এবং তারপর অনেক কাগজ নষ্ট করে, অনেক কাটাকুটির পর সেখানা যখন শেষ করলে তখন রাত আর বেশী নেই।

মায়া লিখ্‌লে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

যথা-সময়ে আপনার পত্র পেয়েছি। যে-কবিতাটি

নরেনদার কাছ থেকে আমি নিয়েছিলাম (নরেনদা আমাকে দেন নি, আমি জোর কোরে কেড়ে নিয়েছিলাম) সেখানা আমার কাছেই আছে। সেখানা আপনি নষ্ট কোরে ফেলতে বলেছেন, কিন্তু ভেবে দেখলাম, জোর-কোরে নেওয়া ও জিনিষটার ওপর আমার সত্যিকার কোন অধিকার নেই; সুতরাং তাকে আমি নষ্ট করতেও পারি না। তাই, সেখানি এই সঙ্গে আপনাকে ফেরত দিলাম। আশা করি, আপনি কুশলে আছেন।

ইতি—

শ্রীমায়া সেন

পত্রের মধ্যে মায়া কেন যে না বললে ফটো সম্বন্ধে কোন কথা, না জানালে একটা নমস্কার,—নারী-চরিত্রের অপার দুর্জ্ঞেয়তাই বোধ করি তার একমাত্র কৈফিয়ৎ।

চিঠি শেষ কোরে, উঠে গিয়ে সে পুনরায় তার সেই ট্রাঙ্কটা খুল্লে; তারপর সেই ভাঁজ-করা কাগজখানি বার কোরে নিয়ে একবার সেখানি প'ড়ে চিঠির সঙ্গে খামের মধ্যে ভ'রে, জল দিয়ে খামের মুখ বন্ধ কোরে দিলে।

খামখানাকে একটা বই-এর মধ্যে চাপা দিয়ে রেখে সে মাথার শিওরের জানালাটা খুলে দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। সারা দেহে সে একটা অপরিসীম বিস্তীর্ণ ক্লান্তি অনুভব করছে। অদূরে গাছের পাতায় পাতায় মর্ম্মর-ধ্বনি তুলে হেমন্তের প্রভাতী বাতাস ব'য়ে যাচ্চে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মায়া ধূসর আকাশের পানে তার দুই-চোখ মেলে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাত্রি শেষ হোয়ে আসছে। অপস্রিয়মান অন্ধকারের বুকে যেন আসন্ন বিরহের একটি করুণ বিধুরতা!—

সহসা সে চকিত হোয়ে উঠ্‌ল,—ইস্‌! নিজের অজানতে তার গাল দুটো কখন একেবারে ভিজে উঠেছে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে ফেলে, অকারণে একটু হেসে, মায়া তার শ্রান্ত দেহ বিছানার ওপর এলিয়ে দিলে।

তিন মাস পরেই এ-আখ্যায়িকার শেষ পরিচ্ছেদের সুরু। সূচনায় এর গতি ছিল যেমন মন্থর, নির্ব্বিকল্প; সমাপ্তির সুর তার বেজে উঠ্‌ল তেমনি ক্ষিপ্র, দ্রুত লয়ে।

মায়াদের স্কুলের ছাত্রীরা আবার একটি অভিনয়ের আয়োজন করেছে। নরেন রজতকে তার টিকিট দিয়েছে; অভিনয়ের সন্ধ্যা।

রজত যখন এসে তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসল, তখন যবনিকা উঠ্‌তে বেশী দেরী নেই। নরেন ভাল বেহালা বাজাতে জান্‌তো। তাই এ-সব অভিনয়ের পক্ষে সে ছিল অপরিহার্য্য। তাকে সারাক্ষণ ভিতরেই থাকতে হোতো।

অভিনয় আরম্ভ হ'ল। রজতের মনে হ'ল, মায়াকে যেন অতিরিক্ত রকম রোগা দেখাচ্ছে; দুই-চোখে তার যেন একটি স্তিমিত অবসাদের অঞ্জন মাখানো; চরণের ছন্দের সঙ্গে আগের মতো তার অন্তরের যোগসূত্র আজ যেন কিছুতেই বাঁধা পড়ছে না। তবুও সে অভিনয়-আসরে মায়াই সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছে।

বিরামের ঘণ্টা বাজলো। রজত বাইরে আসবার জন্য আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময় নরেন এসে উপস্থিত হ'ল।

—কখন এসেছ? তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। কেমন হচ্ছে?

রজত হেসে বল্লে—অভিনয় আরম্ভ হবার ঠিক আগেই এসেছি। অপেক্ষা কোরেও আমার দেখা পাও নি জেনে দুঃখিত হলাম। অভিনয় কেমন হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করা বাহুল্য। কিন্তু, দেখ নরেন, মায়াকে যেন আজ খুব 'ফিট্' ব'লে মনে হচ্ছে না।

নরেন বল্লে—অভিনয় করছে কী কোরে, এই আশ্চর্য্য! সকালেও ওর টেম্পারেচার ছিল একশোর ওপর; এখনো বোধ হয় জ্বর একেবারে ছেড়ে যায় নি।

রজত বল্লে—এ-ভাবে ওকে নামানো তোমাদের মোটেই উচিত হয় নি।

নরেন বল্লে—তা একশো বার, কিন্তু ও-ই জিদ্ করলে। আমরা অনেক বলেছিলাম।... থাক্, শোন—দেখো নরেন, ও দাঁড়িয়ে আছে গ্রীন্-রুমের দরজায়।

রজত এবার হেসে বল্লে—তুমি বলেছ জানি যে আমি ক্ষমা করতে চাই নি।

নরেন হেসে বল্লে—না হে না, তা বলিনি। তবে তুমি এসেছো, তা ও জানে।

রজত ইতঃস্তত কোরে বল্লে—চলো।

দুজনে বাইরে এসে দাঁড়াতেই নরেন রজতের কানে কানে বল্লে—দূরে ওই যে পাকা-চুল ভদ্রলোক, উনিই মায়ার মামা। চল, আলাপ করিয়ে দি।

পরিচয় শুনে অধ্যাপক-মহাশয় সোৎসাহে ব'লে উঠলেন—তোমার কথা তো অনেক শুনেছি। তুমি আমাদের ওখানে গিছলে না? হ্যাঁ। মায়ার কাছে শুনেছি। খুব খুশী হলাম—তোমার সঙ্গে আলাপ কোরে। এই দেখ দিকি—আমার কি এ-সব পোষায়? শুধু ওই মেয়েটার জন্যে। কিছুতেই কোন বারণ শুনবে না। আজ তিনমাস ধরে ক্রমাগত ভুগছে—রোজ অসুখ, রোজ জ্বর। তবুও জল এলো। কাজেই আমাকেও আসতে হ'ল সঙ্গে। তুমি ডাক্তার হয়েছ বুঝি? খুব ভাল। তোমাকে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে পেলে আনন্দিত হব। আচ্ছা, এসো।

গ্রীনরুমের দরজার কাছে এসে দেখা গেল—মায়া সেখানে নেই। আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে একসেট্ আইস্-ক্রীমের সদ্ব্যবহার করছে।

নরেন তাকে প্রশ্ন করলে—এই টুলু, মায়া কোথায় গেল রে?

টুলু তখন মুখ-ভর্ত্তি আইস্-ক্রীম নিয়ে ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে। গাল ফুলিয়ে কি বলতে চেষ্টা করলে, বোঝা গেল না।

নরেন রজতকে বল্লে—বোধ হয় ভিতরে গেছে। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি ডেকে আনছি।

তারপর টুলুর দিকে ফিরে বল্লে—টুলু, এঁকে চিনিস্? চিনিস্ নে। ইনি হচ্ছেন রজত-দা, আমার বন্ধু—

আর বলতে হ'ল না, টুলু সেই এক-মুখ ঠাণ্ডা পদার্থ গলায় চালিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লে—নমস্কার। রজতদা, আমাদের আজকের প্লে কেমন দেখলেন? সেই ও-ই তো।

তারপর রজতের দিকে ফিরে বল্লে—আপনাকে তোমরা জানাই উনি। অনেক আপনার নাম আমাদের কাছে অনেক গল্প করেন। আচ্ছা, মোটরকার চেয়ে এবারকার অভিনয় অনেক খারাপ হচ্ছে, না?

রজত কোন উত্তর দেবার আগেই নরেন মায়াকে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হ'ল। দুই-হাত কপালে ঠেকিয়ে রজত বল্লে—নমস্কার! কেমন আছেন?

যন্ত্র একটু ভঙ্গীতে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে মায়া বল্লে—আমি ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন?

কণ্ঠস্বরের নিস্পৃহতা অতি বড় অমনোযোগী শ্রোতারও কান এড়ায় না।

রজত বল্লে—কিন্তু আপনার আমার মুখে যে অভিনয়—

আগের সুরেই মায়া বল্লে—শুনেছেন বুঝি? ওটা আমার একটা উইকনেস্। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন কিনা, তাই, যার-তার কাছেই মনের উদ্বেগ প্রকাশ কোরে ফেলেন। টুলু, আমায় একটু আইস্-ক্রীম দিবিনে?

আহত রজত তখন টুলুর দিকে ফিরে বল্লে—আপনি বলছিলেন—আজকের অভিনয় তেমন ভাল হচ্ছে না। কতকটা তাই বটে। কিন্তু আপনার পার্টটা হচ্ছে—চমৎকার! এ-রকম স্বাভাবিক এবং আর্টিষ্টিক্ অভিনয় আর খুব বেশি দেখেছি বলে মনে হয়,—ওয়াণ্ডারফুল্! সত্যি বলছি, এ'র কথা প্রত্যেক প্রতিভার ছাপ আছে। আমার অভিনয় এরকম তোমরা ভাল পার্ট দাও নি ভাই, নইলে দেখাতেন ইনি নিজের আজকের মতোই সব-চেয়ে ভাল করছেন।

বেহারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘোরাঘুরী করছে, নরেন বল্লে—রজত, চা খাবে?

রজত ধন্যবাদ দিয়ে জানালে, এমন সময় সে চা খায় না। তারপর টুলুর দিকে ফিরে আর-এক-দফা তার অভিনয়ের সুখ্যাতি কোরে মায়ার পানে তাকিয়ে বল্লে—নমস্কার; চলাম।

মায়া এবার আর প্রতি-নমস্কার করবার চেষ্টাও করলে না।

রজত আর নরেন ওখান থেকে প্রস্থান করতেই টুলু বল্লে—বেশ লোক, না মায়াদি? আচ্ছা, তোমার সঙ্গে তো অনেক দিনের আলাপ, না? তুমি কিন্তু রাজু-দাকে ভাল কোরে দুটো কথা কইলে না। ভদ্রলোক কী মনে

গভীর মুখে চলে গেলেন—আমি দেখেছি। ভিতরে যাই চলো, এখুনি ড্রপ উঠ্‌বে;—ওমা মায়াদি! তোমার জ্বর কিন্তু খুব বেড়েছে; গা যে একেবারে আগুনের মতো হোয়ে উঠেছে—

মায়া শ্রান্ত কণ্ঠে বল্লে—ও কিছু নয়। তুই অতো বকিস না। চল্।

অভিনয় পুনরায় সুরু হ'ল। রজতের তেমন মন লাগ্‌ছে না। অন্তরের কোন্ এক অজ্ঞাত প্রদেশে একটা সূক্ষ্ম বেদনার অনুভূতি জেগে উঠে তাকে মহা অস্বস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। এ-বেদনার মূল যে কোথায়, আর তাকে দূর করতে হলে কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন,—সে-সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা সে আয়ত্ত করতে পাচ্ছে না। এক-বার সে বাড়ি যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল; পরক্ষণেই আবার আসন গ্রহণ কোরে রঙ্গমঞ্চের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে।

ইতিমধ্যে অভিনয় শেষের দিকে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। মাঝখানে, দু তিন জনের সঙ্গে মায়ার একখানি গান ছিল, সেখানি বাদ দেওয়া হ'য়েছে। আরও কিছুক্ষণ পরে শেষ দৃশ্য এল। সে-দৃশ্যে মায়ার একটি নাচ ছিল—একা। রজত ভেবেছিল, হয়ত এটিও বাদ দেওয়া হবে;—কিন্তু না, ওই যে দূরে ওধার দিয়ে ধীরে ধীরে মায়া প্রবেশ করছে!—তার পরণের মেঘ-ছায়া আঁকা শাড়ীর লুটিয়ে-পড়া আঁচল খানি পশ্চাৎ-পটের আকাশের পাণ্ডুর [illegible] সঙ্গে যেন এক হোয়ে মিশে গেছে। বহুদূর থেকে গানের সুর ভেসে আসছে—

ক্লান্ত যখন ফাল্গুন অবসান,
বরণের মালা শুকায়েছে অকারণে,
বন-মর্ম্মর-বন্যা মাধবীর গান
থেমে গেছে বনে বনে।
এলে যদি বঁধু আজি এ লগ্ন-শেষে
রিক্ত-ব্যথায় মন যবে অবসন্ন,
সার্থক কর তুমি শুধু ভালোবেসে,
তব [illegible] আমারে কর গো ধন্য।

রজতের মনে হ'ল, সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মধ্যে মায়া যেন আজ নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিয়েছে। নেপথ্য-বাসিনী দিক্-বধূরা মিলন-বিরহের যে করুণ সুর দিকে দিকে সঞ্চারিত ক'রে দিচ্ছে, মায়ার মধ্যে সে-সুর যেন মূর্ত্ত হোয়ে ফুটে উঠেছে। বর্ষণ-সিক্ত শেফালির মতো তার অন্তরের বেদনা অশ্রান্ত-ধারায় ঝরে পড়ছে—তার অবসন্ন দেহ-ভঙ্গিমায়, তার শ্রান্ত চরণ-বিক্ষেপে।

ধীরে ধীরে গান শেষের কলিতে এসে দাঁড়াল; কিন্তু মায়া আজ আর থামতে চাইছে না। যে-বিরহগাথার সঙ্গে তার নাচের ছন্দ সে এক-কোরে গেঁথে দিয়েছে, তারই মধ্যে সে যেন বিলীন হোয়ে যেতে চায়।

কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যখন যবনিকা নেমে এল, তখন দূর-হোতে-দূরান্তরে-মিলিয়ে-যাওয়া গানের শেষ-ঝঙ্কারের সঙ্গে মায়ার তনু-বল্লরী আশ্রয়-চ্যুত লতার মতোই লুটিয়ে পড়েছে!

প্রস্থানরত মুগ্ধ দর্শক-মণ্ডলীর হর্ষ-ধ্বনিতে প্রেক্ষাগার মুখর হোয়ে উঠ্‌ল। সবার শেষে রজত বাইরে এসে দাঁড়াতেই নরেন ব্যস্ত হোয়ে এসে তাকে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে বল্লে—ওহে, শিগ্‌গির চলো গ্রীনরুমে। মায়া ষ্টেজের ওপর ফেন্ট্ হোয়ে গেছে।

রজত অস্ফুট স্বরে বল্লে—সে কী!

নরেন বল্লে—আর সে কী! এখন, তোমার aid দরকার। চলো ভিতরে।

রজতকে নিয়ে নরেন ভীড় ঠেলে যখন ষ্টেজের মধ্যে প্রবেশ করলে, তখনো মায়ার মূর্চ্ছা ভাঙেনি।

ডাক্তার এসেছে শুনে সবাই অনেকটা আশ্বস্ত হ'ল। ভীড় দেখে রজত বল্লে—সর্ব্বপ্রথম আপনাদের এখান থেকে তফাতে যাওয়া দরকার। ওঁর পক্ষে হাওয়া এখন বড্ড বেশী দরকারী। সেটাকে সবাই মিলে বন্ধ করবেন না।

তারপর নরেনের দিকে ফিরে বল্লে—দেখ, ভিতরে আসবার সময় দেখলাম, একটা ঘরে চা তৈরী হচ্ছে। চট্ কোরে এক কাপ দুধ নিয়ে এসো,—খুব গরম নিয়ো।

কৌচের ওপর মায়ার দেহ শায়িত রয়েছে। চোখ দুটি মুদ্রিত। রক্ত-হীন পাংশু মুখ। কৌচের পাশে [illegible]

খাটিতে পেতে রজত বসল ; তারপর মায়ার শিথিল বাঁ-হাতের মণিবন্ধটি নিজের ডান হাতের আঙুলের মধ্যে তুলে নিলে। মায়ার শিয়রে ব'সে যে-মেয়েটি মায়ার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল তাকে নিম্নকণ্ঠে বল্লে—অমন জোরে নয়, গ্লাসের মধ্যে যে-বরফের টুক্‌রোটা রয়েছে, সেইটে নিয়ে ওঁর কপালে আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিন।

নরেনের পিছনেই অধ্যাপক মহাশয় এসে দাঁড়ালেন। একবার মায়ার পানে তাকিয়ে রজতকে উদ্দেশ কোরেই যেন বল্লেন—এমনি একটা কিছু যে ঘটবে, তা আমি আশঙ্কা করেছিলাম। Anything serious ?

রজত তাঁর পানে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

নরেন রজতের কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে—জ্ঞান হ'য়েছে ?

রজত সম্মতি-জ্ঞাপক ইঙ্গিত করলে। মায়ার হাতখানি তখনো তার হাতের মধ্যে ধরা।

কিছুক্ষণ পরে মায়া ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলে ; তারপর উঠে বসতে গিয়ে দেখ্‌লে—তার একখানা হাত অপর একজনের অধিকারে। সে বিস্মিত হোয়ে গেল ; ব্যাপারটাকে সে এখনো সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পাচ্ছে না। এরা এখানে কি করছে ? অভিনয় কি এখনো শেষ হয় নি ? অভিনয়ের কথা স্মরণ হোতেই সব কথা ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

নাচের শেষ দিকটায় তার সর্ব্ব-শরীর কে যেন সজোরে দুলিয়ে দিচ্ছিল। কান্নার মতো কিসের আবেগে তার গলা যেন বুজে আসতে লাগল। চোখের সামনে ফুট-লাইটের আলোগুলো দূরে থেকে বহুদূরে চলে গেল। তার পরেই তার মনে হল—যেন তার ভারী ঘুম পাচ্ছে !!

মায়া উঠে বসতেই রজত নরেনের কাছ থেকে কাপ্‌টা নিয়ে তার দিকে ফিরে বল্লে—এইবার এই দুধটুকু খেয়ে ফেলুন দেখি।

মায়া চোখ মেলে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে ; আবার কাপ্‌টা ধরবার জন্ত হাত বাড়ালে ; কিন্তু রজতের হাত থেকে সেটা নিতে গিয়ে তার হাত কেঁপে উঠ্‌ল, এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দুধ তার পিয়ালার বাইরে ছিটকে পড়ল। রজত তখন নিজের হাতেই বাটিটা তার মুখের কাছে ধরলে। একবার একটু ইতস্ততঃ কোরে মায়া দুধের বাটিতে মুখ দিলে।

দুধ খেয়ে তার দুর্ব্বলতা যেন অনেকখানি কেটে গেল। এ-ধারে চোখ পড়তেই সে ব'লে উঠ্‌ল—সুধা, তুই ? আছিস তাহ'লে এখনো !!

পরক্ষণেই দুহাত বাড়িয়ে মায়া তার সেই সেবারতা সঙ্গিনীটিকে নিজের কাছে টেনে নিলে।

সুধা মায়ার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্লে—কী ভয়ই যে হোয়েছিল ভাই, সে আর কি বলব ! ভাগ্যিস্ রজত বাবু এলেন !

মায়া মৃদু হেসে বল্লে—তাই নাকি। তোদের বুঝি খুব ভয় হয়েছিল ? আমি কিন্তু খুব আরাম কোরে খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম। এতো ভাল লাগছিল !! আচ্ছা, সুধা ! আমি সত্যিই জেগেছি তো ?

কথাটা রজতের কাণে গেল। মায়ার মুখের দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে সে বল্লে—জেগেছেন বৈকি। এখনো কি আপনার সন্দেহ আছে ?

কথা শুনে মায়ার পাণ্ডুর মুখের উপর দিয়ে ক্ষীণ রক্তোচ্ছ্বাস বয়ে গেল। একবার রজতের পানে তাকিয়েই সে তার মুখ নামিয়ে নিলে।

অধ্যাপক মহাশয়ের অনুরোধে মায়ার চিকিৎসা করবার জন্ত পর পর কয়েকদিনই রজতকে তাঁর বাড়ি যেতে হয়েছিল। উল্লিখিত ঘটনার পর, দিন-দুই মায়া অতিশয় দুর্ব্বল হোয়েছিল ; অধ্যাপক মহাশয়েরও উদ্বেগের অবধি ছিল না। প্রথম দিন রোগী দেখে গাড়িতে উঠবার সময় তিনি রজতকে তার ভিজিট দিতে গিয়েছিলেন ; রজত তাঁকে প্রণাম কোরে বলেছিল—আমি আপনার সন্তান-তুল্য, আমাকে এমন কোরে লজ্জা দেবেন না !

এর-পর তিনি ও-বিষয়ে তাকে আর কোন কথাই বলতে পারেন নি।

রজত প্রত্যহই আসতো ; রুগী দেখতো, এবং আবার

অধ্যাপক মহাশয়ের সঙ্গে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নানা আলোচনায় যোগদান করত। তিনি এই নম্র-প্রকৃতি ছেলেটির চমৎকার ব্যবহার এবং বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতে আরম্ভ কোরেছিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই রজতের চিকিৎসার গুণে মায়া সম্পূর্ণ সুস্থ হোয়ে উঠ্‌ল।

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

মায়া তার ঘরের জানালার ধারে একখানা বই হাতে কোরে বসেছিল। দূরের গাছের মাথায় মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। বই পড়তে মায়ার মোটেই ভাল লাগছে না। সে কোথাও ফাঁকা জায়গায় গিয়ে অনেকক্ষণ অবধি বেড়িয়ে বেড়াতে চায়। এমন অনভ্যস্ত বন্দী-জীবন তার অসহ্য হোয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক মহাশয় ঘরে প্রবেশ করতেই মায়া ব'লে উঠল—বাবা, চলো,—মাঠের ধারে বেড়িয়ে আসবো।

বাবা স্মিত-হাস্যে বল্লেন—না মা, আজ থাক; এখনো তুমি দুর্ব্বল আছে। রজত আসুক। তাকে জিজ্ঞেস্ কোরে কাল তোমায় নিয়ে যাব।

মায়া মুখ ভার কোরে বল্লে—কেন, আমি তো বেশ সেরে উঠেছি! কবে একটু অসুখ কোরেছিল, তার জন্যে চিরদিন এমনি বন্ধ হোয়েই থাক্‌বো নাকি?

এমন সময় বাইরে রজতের আসার সাড়া-পাওয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয় তাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা কোরে ভিতরে নিয়ে এলেন, তারপর মায়ার পানে তাকিয়ে সকৌতুকে বল্লেন—ওহে ডাক্তার! তোমার patient তো আজ বেড়াতে যাবার জন্যে আবদার ধরেছেন; বলছেন, কবে, কোন সুদূর অতীতে একটু অসুখ কোরেছিল তার জন্য তোমরা আমায় চিরকালের মতো solitary imprisonment দিতে চাও?

রজত হেসে বল্লে—না, সে রকম ব্যবস্থা প্রয়োজন হবে না। উনি প্রায় সম্পূর্ণই সেরে উঠেছেন, আজকের নতুন prescriptionটা যদি খাটে তাহলে কাল থেকে উনি স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে আসবেন—আপত্তি নেই।

আরও দু-চার কথার পর অধ্যাপক মহাশয় প্রস্থান করলেন; এবং তারপর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত রজত এবং মায়া দুজনেই নীরব হোয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে মায়া মুখ ফিরিয়ে রজতের পানে তাকাল,—অন্যমনস্ক হোয়ে সে যেন গভীরভাবে কি চিন্তা করছে। ধীরে ধীরে মায়া বল্লে—কৈ, কি প্রেসক্রিপশান লিখবেন, লিখুন। কালকে আমি কিন্তু বেড়াতে যাবই।

রজত সজাগ হোয়ে উঠ্‌ল; তারপর মায়ার চোখের উপর চোখ রেখে সে বল্লে—আজকের prescription আর কাগজের উপর লিখবো না।

মায়া চকিত হোয়ে জানালার বাইরে তার মুখ ফিরিয়ে নিল। অস্ত সূর্য্যের আলো পড়েই ওর মুখটা অতখানি রাঙা দেখাচ্ছে। রজত সে-মুখের পানে বহুক্ষণ অতৃপ্ত-নয়নে তাকিয়ে রইল। তারপর গভীর সুরে বল্লে—দেখুন, আজ আর আমি ডাক্তারি ক'রতে আসিনি। আজ আপনাকে আমার একটি কথা বলবার আছে। সেটি প্রকাশ করবার অনুমতি চাই।

বহুক্ষণ থেকে মায়ার মনে এমনি একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কা উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল; এইবার তার বুক স্পন্দিত হোয়ে উঠ্‌ল। আজকে সে যেন একান্ত দুর্ব্বল হোয়ে পড়েছে; প্রতিরোধ করবার শক্তি তার ধীরে ধীরে লুপ্ত হোয়ে আসছে। ক্ষীণকণ্ঠে সে বল্লে—বলুন।

তখন রজত অনেক দ্বিধা অনেক ভূমিকার পর তার সেই একটি কথা মায়ার কাছে নিবেদন করলে।

ক্রমশ পশ্চিমাকাশের অস্তরাগ অন্ধকারে বিলীন হোয়ে গেল। পৃথিবীর বুকে গোধূলির ছায়া আসন পেতে এল। চাকর এসে ঘরের আলো জেলে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। ঘরের ভিতরকার অধিবাসী-দুটির কাছে তারা রজত সেই অনাদি-কালের একটী কথাই নতুন কোরে বলছে।

তাদের মনের কোণে কিছুদিনের জন্য যা বিরোধের সৃষ্টি হোয়েছিল—সে দূর হোয়ে গৌরব যে আছে, তা আজও পরিপূর্ণরূপে নির্দিষ্ট হয়নি।

রজত নিজের সপক্ষে কোন একটি অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করে। মায়া মাথা দুলিয়ে ব'লে ওঠে—মানবো না ও-কথা। তোমার কথায় রাজী হতাম বৈ কি! মুখ খুলো না। সুযোগ বুঝে আমার দুর্ব্বলতার সুবিধে নিয়ে—

কথাটা সে শেষ করতে পারে না; ভীষণ লজ্জায় আকর্ণ রাঙা হোয়ে উঠে মাঝপথেই থেমে যায়।

একটু হেসে রজত কথাটাকে সম্পূর্ণ কোরে দেয়; তারপর বলে—কিন্তু, মিতা, সে তো আর এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়। তোমায় তো আর আমি জোর কোরে ধ'রে নিয়ে আসি নি। তুমি তো আমায় প্রত্যাখ্যান কোরে সেই বার-র‍্যাট্-লর কাছে চলে গেলেই পারতে?

মায়া প্রতিবাদের সুরে বলে—এ মুখ নিয়ে তখন বুঝি আর অন্য কোথাও যাবার উপায় ছিল?

রজত তার মুখখানাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলে—শুধু মুখ নিয়ে, না মন নিয়েও?

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমায় তুমি কতই ভালোবাসো

শ্রীনীলিমা দাস

দুঃখ-মাখা অগ্নিতিলক পরিয়ে দিলে ভালে,
আমায় তুমি কতই ভালোবাসো!
ব্যথার আঘাত বুকের মাঝে দ্বিগুণ আগুন জ্বালে,
তখন তুমি মধুর হাসি হাসো!

আমার বুকের রক্ত যখন ফিন্‌কি দিয়ে ছোটে,
তখন তুমি অবাক্ চেয়ে থাকো;
প্রাণের মাঝে কান্না যখন আছাড় খেয়ে লোটে
মুচ্‌কে হেসে [illegible] তোমার ঢাকো!

[illegible] আঁচল ছুঁয়ে,
[illegible]
[illegible]
[illegible]!

ঝড়-খেয়ালি! এমন ক'রে খেল্‌লে ঝড়ের খেলা
আগুন-ভরা আমার জীবন দিয়ে;
এম্‌নি কি গো তোমায় আমায় কাটবে সারা বেলা—
এম্‌নিতরো ব্যথার খেলা নিয়ে?

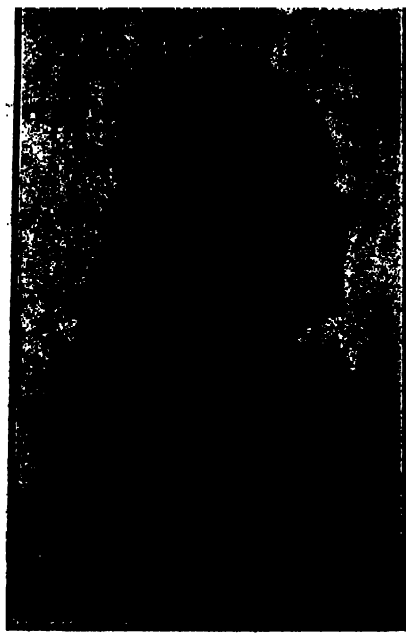
দুঃখ আমার, দৈন্য আমার, পরাজয়ের লাজ—
ফুটিয়ে যদি তুল্‌বে আঁখি-নীরে,
তোমার খেলা জীবনে মোর লুপ্ত কর আজ,
মুক্ত কর সকল বাঁধন ছিঁড়ে।

ওগো প্রতিদ্বন্দি আমার! ওগো আমার সাথী!
সর্ব্বহারার ব্যর্থ-সাধন যত—
এম্‌নি ক'রেই চাবুক্ তবে অন্ধ-অমারাতি—
অন্তরীক্ষে রক্তলেখার মতো।

আমার জীবন এম্‌নি ক'রে ব্যথায় ডুবে' থাক্,
তোমার জীবন উঠুক্ শুধু হেসে;
আমার চোখের অশ্রুধারা সকল ঝরে' যাক্—
খেলার পাগল! তোমার ভালোবেসে।



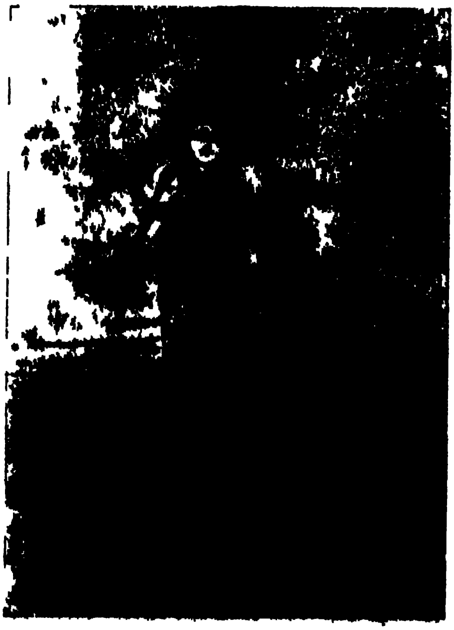
শিল্পী—শ্রীমতী সুরুচি প্রামাণিক



শিল্পী—শ্রীমতী নির্মলাবালা পাল

চিত্রশালা

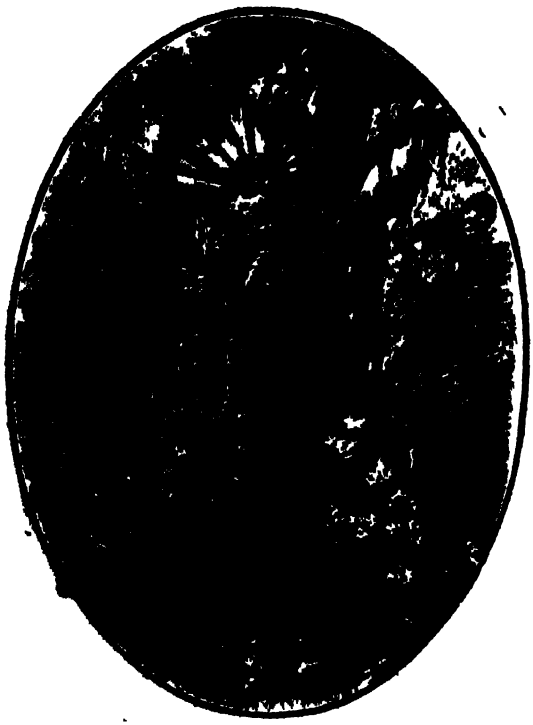
—সূচী চিত্র শিল্প—



শিল্পী—শ্রীমতী [illegible]



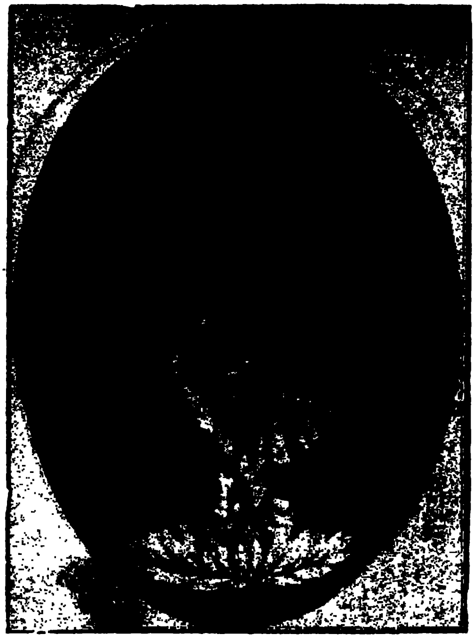
শিল্পী—শ্রীমতী কমলিনী নিয়োগী



শিল্পী—শ্রীমতী নির্মলাবালা খান



শিল্পী—শ্রীমতী রেণুকা সেন



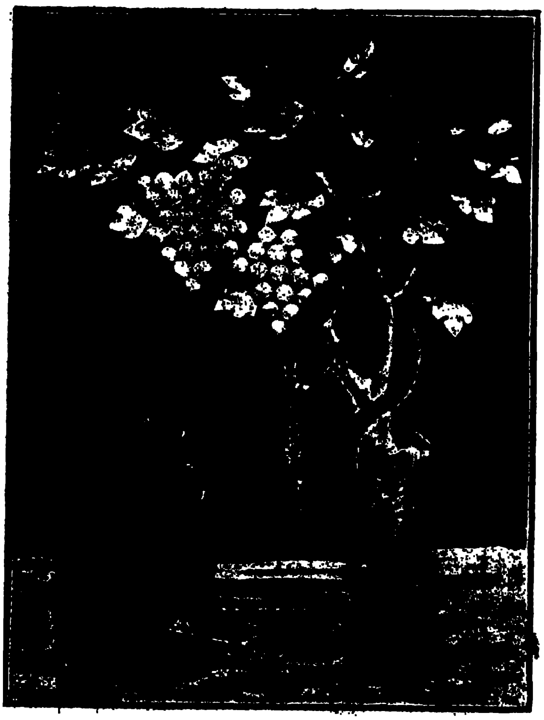
শিল্পী —শ্রীমতী শশীবালা শেঠ



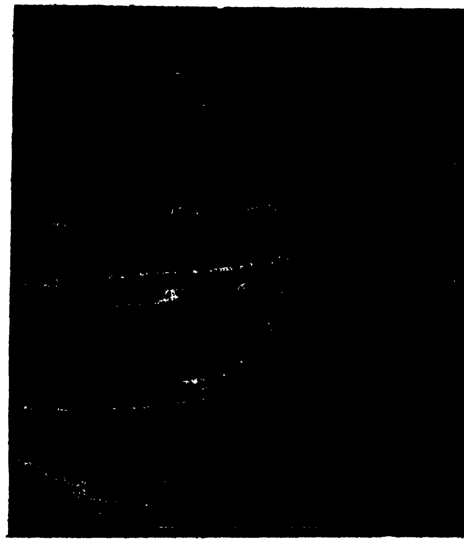
শিল্পী—শ্রীমতী বিভা দত্ত



শিল্পী—শ্রীমতী সুরুচি প্রামাণিক



শিল্পী—শ্রীমতী রেণুকা সেন



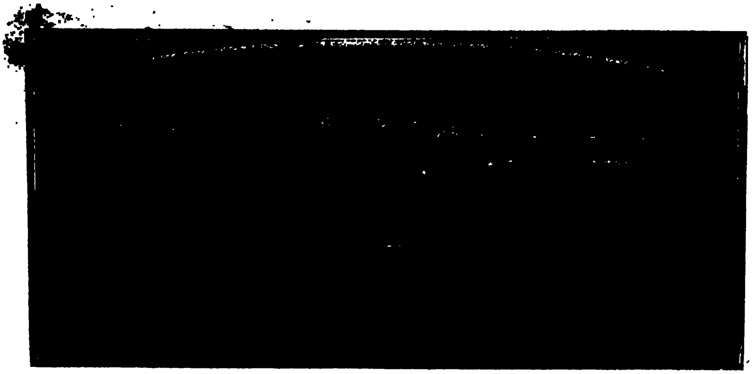
শিল্পী—শ্রীমতী নির্ম্মলা পাল



শিল্পী—শ্রীমতী দুর্গাবতী শেঠ



শিল্পী—শ্রীমতী বিভা দত্ত



শিল্পী—শ্রীমতী বিভা দত্ত

চিত্র পরিচয়

কেবলমাত্র যুগলমূর্ত্তিখানি ভিন্ন সমস্ত চিত্রগুলিই চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরের চিত্রশালায় রক্ষিত তথাকার ছাত্রীদের প্রস্তুত সূচি-চিত্র শিল্পের প্রতিলিপি। চিত্রগুলি তথা হইতে সংগৃহীত। অবশ্য যুগল মূর্ত্তিখানিও সূচি-শিল্প।

বিঃ সঃ

অদৃশ্য ক্ষত

—গল্প—

—শ্রীযুক্তা মমতা মিত্র

ভোর বেলা। প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নি। চাকর খবর দিলে—একজন লোক এসেছেন, তিনি এখনই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে চান, এক মিনিটও দেরী করা চল্‌বে না।

ডাক্তার তাড়াতাড়ি পোষাক প'রে রোগী দেখবার ঘরে এলেন। চাকরকে ডেকে বল্‌লেন, "রোগীকে নিয়ে এস।"

রোগীকে দেখে সম্রান্ত বংশের ছেলে ব'লে বোধ হয়। তার পাণ্ডুর মুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়েছে। ডান হাতখানা বস্ত্র-বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ, নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মুখ থেকে কাতরোক্তি বেরিয়ে পড়ছিল।

ডাক্তার বল্‌লেন, "বসুন। কি অসুখ আপনার?"

"এক হপ্তা আমি ঘুমুতে পারি নি। ডান হাতটা বড় কষ্ট দিচ্ছে। কি হ'য়েছে কিছু বুঝতে পারছি না। 'ক্যান্‌সার' হ'তে পারে, কিম্বা অন্য কোনও ভীষণ রোগও হ'তে পারে। প্রথমে এ জন্যে কিছু ভাবিনি, কিন্তু ক'দিন ধরে ভয়ানক যন্ত্রণা হ'চ্ছে। ক্রমেই বাড়ছে, অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। এক মুহূর্ত্তও স্বস্তি পাচ্ছি না। যদি আর এক ঘণ্টা এই কষ্ট সইতে হয় তা'হ'লে পাগল হ'য়ে যাব। তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনি এখানটা কেটে দিন।"

ডাক্তার রোগীকে আশ্বাস দিলেন যে, সম্ভবতঃ অস্ত্র করবার দরকার হ'বে না

"না, না, অস্ত্র ক'রতেই হবে। হাতের খারাপ অংশটা কাটিয়ে ফেল্‌বার জন্যেই যে এসেছি। আর কিছুতেই সারবে না।"

অনেক চেষ্টার পর বস্ত্র-বন্ধনী থেকে হাতটা তুলে সে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "প্রথমেই ব'লে রাখ্‌ছি আমার হাতে ঘা না দেখতে পেলে আশ্চর্য্য হ'বেন না, এরকম পীড়া সচরাচর দেখা যায় না।"

ডাক্তার বল্‌লেন যে, নতুন ধরণের কিছু দেখে অবাক হ'বার অভ্যাস তাঁর একেবারেই নেই। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে তিনি এত বিস্মিত হ'য়ে গেলেন যে তাঁর হাত থেকে রোগীর হাত প'ড়ে গেল। কই? রোগের চিহ্ন ত' হাতের কোথাও নেই! সম্পূর্ণ অক্ষত হাত, বিবর্ণ পর্য্যন্ত হয়নি। ডাক্তার তার হাতখানা ফেলে দেওয়াতে সে বাঁ হাতে যে রকমভাবে ডান হাতটা ধরলে তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে কী দারুণ যন্ত্রণা সে ভোগ ক'রছে।

"কোন্‌খানে ব্যথা ক'রছে?" ডাক্তার জিজ্ঞেস ক'রলেন।

ছটো বড় শিরার মাঝখানে একটা জায়গা সে দেখিয়ে দিলে। কিন্তু ডাক্তার যখন সতর্কভাবে আঙুল দিয়ে সেখানে মৃদু আঘাত ক'রলেন সে জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিলে।

"এখানেই কি যন্ত্রণা হ'চ্ছে?"

"হ্যাঁ, ভয়ানক।"

"আমি ওখানটা টেপাতে কি চাপ বোধ ক'রলেন?"

সে উত্তর দিল না, তার চোখ জলে ভরে উঠ্‌ল।

"আশ্চর্য্য ব্যাপার! অসুখ কিছু বুঝ্‌তে পারছি না!"

"আমিও পারছি না, কিন্তু যন্ত্রণা সেই রকমই হ'চ্ছে। এ রকমভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল।"

ডাক্তার অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আবার সমস্ত হাতটা পরীক্ষা ক'রলেন, নাড়ী দেখলেন, শেষে মাথা নাড়তে লাগ্‌লেন।

চামড়ায় রোগের চিহ্নমাত্র নেই, ধমনীর গতি স্বাভাবিক। হাত একটুও ফোলেনি। তবে রোগ কোন্‌খানে?

রোগী বললে, "আমার মনে হ'চ্ছে এখানটা লাল হ'য়ে রয়েছে।"

"কোথায়?"

"এই যে এখানে।"

ডাক্তার বিস্মিতভাবে তার দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে হ'তে লাগ্‌ল লোকটি বোধ হয় পাগল।

"আপনাকে এখন সহরে থাকতে হ'বে কিছুদিন। আমি আপনার অসুখ সারাবার চেষ্টা ক'রব।"

"এক মিনিটও আমি অপেক্ষা ক'রতে পারব না। আপনি কি আমায় পাগল মনে ক'রছেন? এই অদৃশ্য ক্ষত অত্যন্ত কষ্ট দিচ্ছে আমায়, সেই জন্যে আপনাকে বলছি এখানটা একটু গভীর করে কেটে দিন।"

"না মশায়, আমি তা পারব না।"

"কেন পারবেন না?"

"কারণ আপনার হাতে কিছুই হয়নি। আমার হাতের মতই সব ঠিক সুস্থ রয়েছে।"

"আপনি ভাবছেন আমার মাথা খারাপ, আর নয়ত আপনার সঙ্গে প্রতারণা ক'রছি।" বলে সে একখানা একশ মুদ্রার নোট পকেট থেকে বের ক'রে টেবিলের উপর রাখলে। "দেখুন আমি ঠাট্টা ক'রছি না। ব্যাপারটা খুবই গুরুতর, এর জন্যে হাজার মুদ্রা খরচ ক'রতে প্রস্তুত আছি। এবার কাজ আরম্ভ করুন।"

"পৃথিবীর সমস্ত অর্থ যদি দিতে চাইতেন তা' হ'লেও আমি নীরোগ হাতে ছুরি চালাতুম না।"

"কেন?"

"কারণ তা'হ'লে সকলেই আমাকে নির্ব্বোধ বলবে এবং আমার এই দোষ দেবে যে আমি এখনও রোগ চিনতে শিখিনি।"

"বেশ। তবে আর এক কাজ করুন। আমি নিজেই কাটছি, যদিও বাঁ হাতে কাটা মুস্কিল। কাটা হ'য়ে গেলে আপনি দয়া ক'রে হাতখানার একটু যত্ন নেবেন।"

লোকটি বাস্তবিকই কোট খুলে ফেললে। সার্টের হাতা তুলে নিজের পকেট থেকে ছুরি বার ক'রলে, কারণ সেখানে আর কোন যন্ত্র ছিল না। ডাক্তার বাধা দেবার আগেই সে হাতে ছুরি বসালে।

"থামুন, থামুন, কি ক'রছেন মশায়।" ডাক্তার চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। তাঁর ভয় হ'ল পাছে সে শিরা কেটে ফেলে। "আপনি যখন কাটবেনই স্থির ক'রেছেন, বেশ আমি দিচ্ছি কেটে।"

কাটবার সময় ডাক্তার রোগীকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বললেন, কেননা সাধারণতঃ লোকে নিজেদের রক্ত চোখে দেখতে পারে না, অভিভূত হ'য়ে পড়ে।

"কিছু দরকার নেই" সে বললে।

স্থির হ'য়ে সে ব'সে রইল, একটুও কাঁপ্‌ল না। কাটা হ'য়ে গেলে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে, যেন তার ঘাড় থেকে বোঝা নেমে গেল।

"এখন আর যন্ত্রণা বোধ ক'রছেন?" ডাক্তার জিজ্ঞেস ক'রলেন।

সে হেসে বললে, "একটুও না। রক্ত খানিকটা পড়ুক। আরাম পাচ্ছি আমি।"

ক্ষত বেঁধে দেওয়ার পর তাকে প্রফুল্ল দেখাতে লাগল। একেবারে বদ্‌লে গেল, সে লোকই যেন নয়। যাবার সময় ডাক্তারের হাত ধরে বললে, "আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলুম।"

তারপর ডাক্তার হোটেলে রোগীকে প্রায়ই দেখ্‌তে যেতেন। লোকটি সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, তার প্রতি ডাক্তারের ক্রমেই শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল।

ক্ষত সেরে গেলে সে নিজের দেশে ফিরে গেল।

তিন হপ্তা পরে সে আবার ডাক্তারের কাছে এল। পূর্ব্বের মত তার হাত বস্ত্র-বন্ধনীর মধ্যে। সে কাতর ভাবে জানালে ঠিক সেই জায়গাতে ভীষণ যন্ত্রণা হ'চ্ছে।

তার মুখ ফ্যাকাসে, কপাল ঘর্ম্মাক্ত। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, "আবার কি হ'ল?"

সে সকাতরে বললে, "আপনি গভীর ক'রে কাটেন নি। আগের চেয়ে বেশী যন্ত্রণা হ'চ্ছে এখন। আমার জীবন শেষ হ'য়ে এল। আবার কাটুন।"

ডাক্তার ভাল ক'রে হাতখানা পরীক্ষা ক'রলেন। যে জায়গাটা কাটা হ'য়েছিল এখন সম্পূর্ণ সেরে গেছে। একটি শিরাও অসুস্থ দেখাচ্ছে না, নাড়ীও স্বাভাবিক। জ্বর নেই, তবু লোকটির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে।

ডাক্তার বললেন, "এরকম কখনও দেখিনি, শুনিও নি।"

পুনরায় অস্ত্র করা হ'ল। প্রথম বারের মত এবারও যন্ত্রণা কমে গেল। রোগী যদিও স্বস্তি পেল খুবই, তবু তার মুখে হাসি দেখা গেল না; ম্লান মুখে ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানালে।

বিদায় নেবার সময় সে বললে, "যদি একমাস পরে আবার আসি ত' আশ্চর্য্য হ'বেন না।"

"আপনি কেন এ রকম ভাবছেন?"

"ওঃ! আমি যে জানি! আচ্ছা আসি।"

ডাক্তার এই অদ্ভুত ঘটনা তাঁর সতীর্থদের বললেন। প্রত্যেকেই বিভিন্ন মত প্রকাশ করলেন, কিন্তু কেউ সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎ দিতে পারলেন না।

এক মাস কেটে গেল, রোগী এল না। আরও কয়েক হপ্তা কাটল, শেষে রোগীর পরিবর্ত্তে তার কাছ থেকে একখানি চিঠি পাওয়া গেল। রোগী নিরাময় হ'য়েছে ভেবে ডাক্তার আনন্দে খাম খুললেন। চিঠিখানি এইরকম:

"ডাক্তার মহাশয়,

আমার অসুখের আসল কারণ সম্বন্ধে আপনাকে সন্দেহে রাখতে চাই না, আমার ভীষণ রোগের ইতিহাস আপনাকে জানাতে ইচ্ছে করি। যন্ত্রণা এখন তিনগুণ বেড়ে গেছে, জলন্ত কয়লা হাতের উপর রেখে আপনাকে চিঠি লিখ্‌ছি।

ছ'মাস আগে আমার মত সুখী কেউ ছিল না। আমি ধনবান, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবকের যা ভাল লাগে সে সবেতেই আনন্দ পেতুম যথেষ্ট। এক বছর আগে বিয়ে ক'রেছিলুম। আমার স্ত্রী শিক্ষিতা, সুন্দরী, রজনীগন্ধার মত শুভ্র ও পবিত্র। আমার দেশের রাণীর সখী ছিল সে। আমার স্ত্রী আমায় ভালবাসত তার সমস্ত প্রাণ দিয়ে। তার ভালবাসা আমার জীবনের পরম সম্পদ ছিল। ছ'মাস সুখে কাটল, প্রত্যেক দিন যেন আগের দিনের চেয়ে অধিকতর আনন্দ বহন ক'রে আনত। আমি সহরে গেলে সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা ক'রত, ফিরে এলে তার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠ্‌ত। সত্যই সে প্রভাতের আলোর মত নির্ম্মল ও শিশুর মত সরল ছিল।

জানিনা কেন কিছুদিন পরে আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল এ সব কেবল ভাণ। পুরুষ তার চরম সুখের মধ্যে থেকে নির্ব্বোধের মত দুঃখ খুঁজে বের করে।

আমার স্ত্রীর একটি ছোট টেবিল ছিল, তার ড্রয়ার সর্ব্বদাই সে চাবি দিয়ে রাখত। এটা আমায় পীড়া দিতে লাগ্‌ল। প্রায়ই লক্ষ্য করতুম চাবিটা সে কোনো সময়ে কাছ ছাড়া ক'রত না এবং ড্রয়ারটায় চাবি দিতে কখনও ভুলত না। এত সতর্কভাবে গোপন রাখ্‌বার তার কী ছিল? সন্দেহে আমি পাগল হ'লুম। তার সরল চোখ, তার আন্তরিক ভালবাসায় আমার সংশয় জন্মাতে লাগ্‌ল। সম্ভবতঃ এ সব শুধুই প্রতারণা।

একদিন রাণী তাকে নিতে এলেন দিনটা তাঁর সঙ্গে প্রাসাদে যাপন করবার জন্যে। আমাকেও যাবার জন্যে অনুরোধ ক'রলেন। সন্ধ্যেবেলায় যাব ব'লে প্রতিশ্রুতি দিলুম।

গাড়ী ফটক থেকে বেরুতে না বেরুতে আমি সেই টেবিলের ড্রয়ার খোল্‌বার চেষ্টা ক'রতে লাগলুম। বহু কষ্টে সেটা খুললুম। অনেক মেয়েলি জিনিস সরাবার পর সিল্কের কাপড়ে জড়ানো এক তাড়া চিঠি পেলুম। একবার দেখ্‌লেই লোকে সেগুলিকে চিন্‌তে পারে। প্রেম পত্র। একসঙ্গে গোলাপি ফিতে দিয়ে বাঁধা।

স্ত্রীর বাল্যকালের গুপ্ত জিনিস দেখা অনুচিত তা' এক-বারও ভাবলুম না। হয়ত আমার সঙ্গে বিয়ে হ'বার পর এই ব্যাপার চলেছে। ফিতে খুলে ফেলে এক এক ক'রে চিঠিগুলি পড়তে সুরু করলুম। স্বামীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিচয়ে চিঠিগুলি পূর্ণ। চিঠির লেখক আমার পরম বন্ধু। নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও গভীর অনুরাগ চিঠির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। ব্যাপারটা গোপন রাখ্‌বার জন্যে সে কী অনুরোধ! নির্ব্বোধ স্বামীর সম্বন্ধে সে কী উক্তি! এ বিষয়ে স্বামীকে অজ্ঞ রাখ্‌বার জন্যে কী সে উপদেশ! সবগুলিই আমাদের বিয়ের পর লেখা। আর আমি ভাবতুম আমার মত সুখী লোক বিরল! আমার মনে কি হ'তে লাগ্‌ল তা' বর্ণনা করতে চাইনা। চিঠিগুলি বাঁধলুম, যথাস্থানে তাদের রেখে ড্রয়ারে চাবি দিলুম।

জানতুম যদি প্রাসাদে না যাই তা' হ'লে আমার স্ত্রী

সন্ধ্যেবেলা ফিরে আস্‌বে। ঘট্‌লও ঠিক তাই। সে সানন্দে গাড়ী থেকে নেমে আমার কাছে ছুটে এল। আমি যেন কিছুই জানিনা এম্‌নি ভাব দেখালুম।

খানিকক্ষণ আমরা গল্প ক'রলুম, তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে শুলুম। আমার স্ত্রী ঘুমিয়ে প'ড়ল। আমার চোখে নিদ্রা নেই, মনে মনে একটা ভীষণ সঙ্কল্প ক'রতে লাগ্‌লুম। রাত ক্রমেই গভীর হয়ে আস্‌ছিল, চারদিক নিস্তব্ধ, আমার নিজের বুকের স্পন্দন ছাড়া আর কিছু শুন্‌তে পাচ্ছিলুম না। অস্থির চিত্তে শেষে উঠে বস্‌লুম। আমার মাথায় খুন চেপেছিল। নিঃশব্দে ডান হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে স্ত্রীর গলা টিপে ধরলুম। একবার সে চোখ মেলে বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চাইলে, তারপর ধীরে ধীরে চোখ ছুটি চিরদিনের জন্যে বুজে গেল। সব শেষ! আত্মরক্ষার চেষ্টা একটুও ক'রলেনা। তার ওষ্ঠ থেকে এক বিন্দু রক্ত আমার হাতের উপর ঝরে প'ড়ল। সে জায়গা ত' আপনি জানেন। পরদিন যখন লক্ষ্য ক'রলুম তখন রক্তবিন্দু শুকিয়ে গেছে। তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ ক'রলুম। কি ক'রে মারা গেছে তা' নিয়ে বিশেষ কেউ তদন্ত ক'রলেনা, এ রকম ব্যাপার ঘট্‌তে পারে তা' কেউ ভাবেও নি, কারণ সে আমার স্ত্রী। তার কোন আত্মীয় বা বন্ধু ছিল না, কাজেই আমার কিছু জবাবদিহি ক'রতে হ'লনা।

আমি কোন কষ্ট বোধ করিনি। অবশ্য নিষ্ঠুরের মত কাজ ক'রেছি, কিন্তু সে ত' এ দণ্ডের যোগ্য।

সমাধিস্থান থেকে ফিরে এসে দেখি রাণী এসেছেন। দেখ্‌লুম তিনি ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছেন। এই অপ্রত্যাশিত খবর তাঁকে বিহ্বল ক'রে দিয়েছে। তিনি নানারূপ কথা বল্‌তে লাগলেন ও আমায় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা ক'রলেন। আমি তাঁর কথা বিশেষ কানে নিলুম না, কেননা সান্ত্বনার কোন প্রয়োজন ছিলনা আমার। তারপর তিনি খুব পরিচিতের মত আমার হাত ধরে জানালেন যে তিনি আমায় একটি গোপন কথা বল্‌তে চান।

তিনি নাকি একতাড়া চিঠি আমার স্ত্রীর কাছে রেখে ছিলেন, চিঠিগুলি একটু বিশেষ ধরণের ব'লে নিজের বাড়ীতে রাখার সুবিধে হয়নি। সেগুলি তিনি ফিরিয়ে নিতে চাইলেন।

জিজ্ঞেস ক'রলুম, "তা'তে কি আছে?"

তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লেন, "আপনার স্ত্রী খুব ভাল লোক ছিলেন, কোনদিন তিনি অভদ্রের মত একথা জিজ্ঞেস করেননি। এমন কি কখনও সেগুলি দেখ্‌বেন না ব'লে কথা দিয়েছিলেন।"

অপ্রস্তুত হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রলুম, "কোথায় আপনার চিঠি আছে?"

"সে বলেছিল তার টেবিলের ড্রয়ারে চাবি বন্ধ করা আছে। চিঠিগুলি গোলাপি ফিতে দিয়ে বাঁধা, সহজেই চিন্‌তে পারবেন। সবসুদ্ধ তিরিশ খানা চিঠি।"

যে ঘরে সেই টেবিল ছিল তাঁকে নিয়ে সে ঘরে গেলুম। ড্রয়ার খুলে চিঠিগুলি তাঁর হাতে দিলুম সাগ্রহে সেগুলি তিনি নিলেন। ভয়ে আমি চোখ তুলতে পারিনি পাছে তিনি আমার মুখ চোখ দেখে সব বুঝতে পারেন।

সেই ভয়ানক রাত্রে ডান হাতের যে জায়গাটাতে রক্ত লেগেছিল ঠিক তার এক হপ্তা পর সেই খানটায় হুল ফোটানোর মত যন্ত্রণা হ'তে লাগ্‌ল তারপর যা হয়েছিল সে সবই ত' আপনি জানেন। সব দিক ভাল ক'রে না ভেবে আমার নির্দোষ ও সুন্দরী স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা ক'রেছি এ তার উপযুক্ত শাস্তি। এটা সারাবার কোন চেষ্টাই আর ক'রছি না। শীগ্‌গিরই তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় সে আমায় মাপ ক'রবে ও ঠিক্ আগের মত ভালবাসবে। আচ্ছা, ডাক্তার, এখন আসি। নমস্কার ও ধন্যবাদ জান্‌বেন।"*

শ্রীমমতা মিত্র

---

* হাঙ্গেরিয় হইতে

সাহিত্যে ভবঘুরেমি *

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ

সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে আমরা সাহিত্যের জীবন্ত দিক্‌টা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। সাহিত্য যে আমাদের সারাজীবনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট অনুভূতিগুলির অভিব্যক্তি মাত্র, ইহা আমরা বিচারবিতর্কের গোলকধাঁধায় পড়িয়া বিস্মৃত হইয়া যাই। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে একটা সূক্ষ্ম বিচারের জাল বয়ন করিবার চেষ্টা করিব না, সাহিত্যের একটা জীবন্ত দিকের সাথে আপনাদের কিছু পরিচয় করাইবার প্রয়াস পাইব। অবশ্য সাহিত্য-বলিতে আমি এখানে বিশ্বসাহিত্যই বুঝি। যে-বিষয়টা লইয়া আমি আলোচনা করিতে চাই তাহা কোন সাহিত্য-বিশেষের সম্পত্তি নহে, তাহা জগতের সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের সাহিত্যেই আছে, কারণ সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের মানব মনে এই অনুভূতির বেদনা নানাভাবে দেখা দিয়াছে।

'ভবঘুরে' শব্দটা একটা গালাগালি। Gipsy এবং vagabondদের একশ্রেণীর অপরাধী বলিয়া ধরা হয়। তবে যে অর্থে ব্যবহারশাস্ত্রে vagabond কথাটার ব্যবহার করা হইয়াছে আমি সে অর্থ ধরিয়া আলোচনা করিতেছি না। যাহার একটা নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, অর্থাৎ এক কথায় যাহার চালচলন একটু সন্দেহজনক, এই শ্রেণীর লোককেই আমরা 'ভবঘুরে' বলিয়া থাকি। আমি যে প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেছি তাহাতে এই সাধারণ নিত্যপ্রচলিত অর্থটা একটু বদলাইয়া লওয়া দরকার। উদ্দেশ্যহীন, অনির্দ্দিষ্ট, অবিচ্ছিন্ন গতি-শীলতাই ভবঘুরেমি। এই গতিশীলতার একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে, ইহা লইয়া অনেক ভাবিবার বুঝিবার আছে।

মানুষের জীবনযাপনকে বলা হয় 'জীবনযাত্রা'। ইহা যেন একটা যাত্রা বা pilgrimage এর মত। Marcus Aurelius বলিয়াছেন, আমরা দুই অনন্তের মধ্যে বাস করি, আমাদের জীবন হইল অনন্ত হইতে অনন্তে যাত্রার মত। Byron নিজেকে 'The pilgrim of eternity' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। মানুষের জ্ঞানোন্মেষের প্রথম হইতেই এই ভাবটি চিন্তাশীল লোকদের মনে স্থান পাইয়াছে,—মানুষ যেন অনন্তের অন্ধকার হইতে এই জীবনের সুস্পষ্ট আলোকের পথ বাহিয়া আবার অনন্তের অন্ধকারেই মিলাইয়া যাইতেছে। জগতের কত না কাহিনী কত না কাব্য এই চিরন্তন যাত্রা অনির্দ্দেশ্য ব্যাকুলতাকে লইয়া সুগভীর ছন্দে রচিত হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনই এক একটা সুবৃহৎ odysseyর মত! বর্ত্তমানে বিজ্ঞানে ও দর্শনে এই যাত্রার অভিনব সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। জীবনকে আমরা একটা নিত্যস্থির কিছু বলিয়া ভাবিতে পারি না।

তবে আর একদিক দিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই এই গতিলীলার মধ্যে এক স্থিতিশীলতাকে। জীবনের একটা বড় দিক হইল সঞ্চয়ের দিক, সংরক্ষণের দিক। মানুষ যদি সঞ্চয়ের দিক না দেখিত তবে এত বড় একটা সভ্যতা, এত বড় একটা ইতিহাস গড়িয়া উঠিত না। আমাদের কর্ম্মৈষণার প্রারম্ভেই একটা উদ্দেশ্য থাকে। সে উদ্দেশ্য হইল অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্য। মানুষ চাহে আপ-নাকে স্থাপিত করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে। সে চাহে প্রকৃতির সম্পদরাজিকে আয়ত্ত করিতে, স্থিরভাবে এবং সুস্থভাবে ভোগ করিতে। সে জগতের নানা বহির্ম্মুখী শক্তির মধ্যে নিজেকে স্থির কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া রাখিতে চায়। সে বিধি রচনা করে, এই প্রতিষ্ঠাকে রক্ষা করিবার জন্য। নানা বাধা ও নানা নিষেধে সে আপনাকে আবদ্ধ করে, নানা

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির সাধারণ অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঠিত।

থাকায়, নানা দেহে, সে আপনার গৃহরচনা করে, গৃহদেবতার প্রতিষ্ঠা করে, আপনার সম্পত্তি ও অধিকারকে রক্ষা করে। এই রক্ষণশীলতার মধ্যে স্বার্থ আছে, বিধি আছে, চিন্তাতর্ক-সমালোচনা আছে, স্থিরলক্ষ্য আছে, সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য আছে। আমাদের সকল উদ্দেশ্যবান কর্ম্ম দিয়া আমরা এই সংরক্ষণের সহায়তা করি, ইহার পুষ্টি সাধন করি, বস্তুর প্রাকারের উপর নূতন বস্তুর প্রাকার গঠন করি। এই কর্ম্মশক্তির মধ্যে যে বিনাশ আছে, ব্যয় আছে, অহং স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের দ্বন্দ্ব মাত্র। তাহা বস্তুতঃ সভ্যতার, স্থিতিশীল জীবনেরই একটা অঙ্গ মাত্র।

এই যে বৃহৎ বস্তুপুঞ্জ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই "স্থূলতনু তন্ত্রবরী বাঁধা"র মধ্যে একটা লক্ষ্যহীন গতিলীলা আছে, যাহার মধ্যে কোন স্বার্থ নাই, কোন সঞ্চয় বা অর্জ্জনের বা বিনাশের উদ্দেশ্য নাই। এই গতিশীলতা জীবনে নানা সময়ে নানারূপে দেখা দেয়। ইহার স্পন্দন যাহার বুকে জাগে, সে হয় ভবঘুরে। তাহার ঘরের বন্ধন নাই, বিধি-নিষেধের মানা সে মানে না, নীতির অনুশাসনকে সে ভয় করে না, তাহার লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই, সঞ্চয়লিপ্সা নাই। সে কেবল এক নিভৃত প্রাণশক্তির অফুরন্ত ক্রিয়াধর্ম্মের মূর্ত্তবিকাশ, সে চাহে অব্যাহত আত্মপ্রচার, অসংবদ্ধ চলনলীলা। বিশেষ করিয়া, ইহার মধ্যে কোন উচ্চ বা অনুচ্চ আদর্শ নাই। আদর্শবাদীরা প্রকৃতপক্ষে রক্ষণপন্থী। তাঁহারা একটা ভাঙিতে চান, আর একটাকে গড়িবার জন্য। কিন্তু ভবঘুরেমির মন্ত্রে যাহারা দীক্ষিত, তাহারা কোন সুনির্দ্দিষ্ট কিছু চাহেনা, কেবল একটা ক্রিয়াশক্তির অফুরন্ত স্ফূর্ত্তি তাহাদের লক্ষ্য। এই ভবঘুরেমি বাল্যের স্বপ্নে ও যৌবনের কল্পনায় বিশেষ ভাবে স্থান পায়। হয়ত ইহা "কদাচিৎ অভাবনীয়ের" "কচিৎকিরণের" দীপ্তিতে কাহারও চিত্তকে "ঝলমল" করিয়া দিয়া যায়, আবার কাহারও কাহারও সারাজীবনের সাধনা হইয়া পড়ে। এই ক্রিয়াধর্ম্ম কি? — ইহা বোধ হয় মানবজীবনের চিরন্তন অসমাপ্তির অনির্দ্দেশ্য ব্যাকুলতা, ইহা মানুষের সামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষার, স্বার্থের ক্রন্দন মাত্র নহে। ইহার কোন স্থির উদ্দেশ্য নাই, কারণ ইহা এক গূঢ় বেদনার, এক অজানিত, অভাবনীয় উদ্দেশ্যবানতার বহির্বিকাশ মাত্র। আমাদের মনের কোণে, আমাদের জীবনের নির্জ্জন অন্তরালে অসমাপ্তির যে অস্পষ্ট বোধ আছে, তাহারই ইহা প্রকাশ। এই অপূর্ণতাকে কেহই আজিও পূর্ণতা দিতে পারিলনা, ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে মানবমনকে পীড়া দিয়াছে এবং আজিও দিতেছে। ভবঘুরেমির ইহাই হইল মূলকথা।

অবশ্য ইহার মধ্যে "ওমরখৈয়ামী ভাব" কিছুমাত্র নাই। বিধিকে "খৈয়ামী ধর্ম্ম" অস্বীকার করে নাই, অতিমাত্রায় স্বীকার করিয়াছে। তবে বাস্তবের সঙ্গে লড়িয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়া, ইহার মধ্যেই একটা সুন্দর অবাস্তব রচনায় মন দিয়াছে। ভবঘুরেমি-ধর্ম্ম সম্পূর্ণ অন্যধরণের। বিধি ও স্থিতিকে ইহা উপেক্ষা করে, কারণ তাহা ইহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বাস্তবের জন্য ইহার একেবারেই মাথাব্যথা নাই।

আর একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল। "খৈয়ামীবৃত্তি" যেমন বেশীর ভাগ একটা মানসিক বৃত্তি মাত্র, বাস্তবজীবনের ঘটনায় ইহার উপযোগিতা কতটা তাহা যেমন অনেকেই বড় পরখ করিয়া দেখিতে রাজী হ'ন না, এই ভবঘুরেমি ধর্ম্মটা তেমনি অনেকটা মানসিক ধর্ম্ম। জীবনের কাজে ইহার প্রকাশ দিবার আগ্রহ বা ক্ষমতা খুব কমলোকেরই ছিল এবং আছে; সাহিত্যের মধ্যেই ইহার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে। মনের মধ্যে ইহা স্বপ্নের মত ছিল, একটা ক্ষীণ কল্পনার মত। জীবনের কাজে অকাজে ইহা সব সময়ে পরিস্ফুট ভাবে দেখা দেয় নাই। তাই বলিয়া মানুষের জীবনে ইহার মূল্য কম নহে, কাজের প্রত্যক্ষ স্থূলতায় ধরা পড়ে নাই বলিয়া এই অশরীরী বেদনা আমাদের কাছে এত সত্য এবং এত রহস্যময়।

এইখানে দুইজন সাহিত্যিকের নাম করিতে চাই, যাঁহারা মনে প্রাণে ভবঘুরে ছিলেন। ইঁহাদের একজন—François Villon আর একজন Robert Louis Stevenson। Villon ছিলেন কবি এবং তস্কর। চুরি করিয়া, ভবঘুরেমি করিয়া বেড়াইবার একটা দুর্জ্জয় ইচ্ছা তাঁহার জীবনকে কতনা অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে। তবুও সে নেশা যায় নাই। Stevensonই ইঁহার চরিত্রটা আজ ভাবে

বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত গল্প—"A Lodging for the Night"এ Villon চরিত্রের অতি সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। Villonএর একটা পরিষ্কার ফিলজফি ছিল, যেমন Stevensonএর ছিল। তবে এই ফিলজফির কথা সংসারের সমস্ত বড় বড় দর্শনশাস্ত্রের একটার মধ্যেও নাই; আভাসেও নাই। Stevenson সারাজীবন যেন এক আলেয়ার পশ্চাতেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। শেষে Tempestএর Prosperoর মত তিনি Samoa দ্বীপে আসিয়া ঘর বাঁধিলেন। তাঁহার "Vagabond" কবিতায় Stevenson নিজের ভবঘুরেমি-ধর্ম্মের অনেকখানি সোজা করিয়া বলিয়াছেন। Stevenson যে এত adventure এর কাহিনী লিখিতেন, সে সবই তাঁহার নিজের ভবঘুরেমি-লিপ্সার ফল। তিনি নিজেও একখানা ছোট গাড়ীতে চড়িয়া দেশবিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, শারীরিক অসুস্থতার কথা ভাবিয়াও দেখেন নাই। কবি Burns-এর কথা বলিতে যাইয়া Stevenson এই ভবঘুরেমি-বাদের অনেক কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন। Burns যেন সারাজীবন ভরিয়া কি একটা খুঁজিতে-ছিলেন; ভোগে, ত্যাগে, শোকে, প্রেমে, কিছুতেই তিনি সেই বস্তুটির সন্ধান পান নাই। ইহা কেবল মাত্র ইতর "Don Juanism"ই নহে। "Don Juanism" আর ভব-ঘুরেমি এক কথা নহে। "Don Juanism" প্রত্যক্ষকে চায় বিশেষ ভাবে চায়, এবং একের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখে না। "Don Juanism" অতিজড় কামনার ধর্ম্ম এবং ইহার লক্ষ্য অতি সুস্পষ্ট।

Rabelais, Anatole France প্রভৃতির উপন্যাসে আমরা নানারকম ভবঘুরে চরিত্র দেখিতে পাই। তবে এই সব চরিত্র-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভবঘুরেমির প্রচার নহে; স্থিতি এবং বিধিকে রক্ষা করিবার ও সমর্থন করিবার চেষ্টাই হইল আসল উদ্দেশ্য। এক একটা চরিত্র মূর্ত্ত বিদ্রূপ স্বরূপ। এই সব চরিত্রে আমরা আসল ভবঘুরেমির পরিচয় পাই না। এই সব ক্ষেত্রে হয় ভবঘুরেমির আস্ফালনগুলি স্থিতির বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকেই ব্যঙ্গ করা হইয়াছে।

এখন আসল ভবঘুরেমির কথা বলা যাক। আগেই বলিয়াছি এই ভবঘুরেমি একটা মানসিক অবস্থা; একটা mood বিশেষ। ইহার অভিব্যক্তি সাহিত্যে নানাভাবে হইয়াছে ও হইতেছে। সাহিত্য বহুক্ষেত্রে জীবনের অভাব গুলি পূরণ করিয়া দেয়। সেই জন্যই বিশেষ করিয়া ভবঘুরেমি-সাহিত্যের আদর বেশী। ইহা কেবল জীবনের প্রতিবিম্ব নহে। জীবনে যাহা অশরীরী কল্পনারূপে ছিল সাহিত্যে তাহা রূপ পাইয়াছে প্রাণ পাইয়াছে।

ইউরোপে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড ও দক্ষিণ ফ্রান্সে ballad literature এ এই ভবঘুরেমির একটা দিক আমরা দেখিতে পাই। Gipsyism হইল অশিক্ষিত মনের একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শিক্ষার চেতনা ও স্বার্থবুদ্ধি দিয়া এই Gipsyismএর emotional দিকটা, জীবন্ত দিকটা, নির্জীব করিয়া ফেলা হইয়াছে। কারণ আমাদের শিক্ষা হইল স্থিতিরাজ্যের শিক্ষা, গতিরাজ্যের নহে। Gipsyদের অনেকেই ঘৃণা করে, তাই বলিয়া Gipsyismকে কেহ অবজ্ঞা করে না। Gipsyism মনের একটা ধর্ম্ম। আজকাল Gipsyদের বিরুদ্ধে আইন আছে, কারণ রক্ষণশীল সভ্যতার ইহারা বিরোধী। আবার Gipsyism লইয়া সাহিত্য রচিত হইয়াছে, কারণ—Gipsyism মানবমনের একটা চিরন্তন ধর্ম্ম; ইহা হইল উদ্দেশ্যবান, রক্ষণশীল জীবনযাপনের মধ্যে উদ্দেশ্যহীন, বিধিহীন গতির স্বপ্ন। Gipsyদের জীবনে অনেক কিছু অসৎ, অসুন্দর জিনিষ আছে, অপরাধের দিকে একটা সাংঘাতিক নেশা আছে, কুৎসিতের দিকে একটা চিরন্তন আকর্ষণ আছে। কিন্তু সাহিত্যের Gipsyismএর মধ্যে আমরা ইহার অনেকখানি বদলাইয়া লইয়াছি, ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ দিয়াছি। জীবনের জড় অসুন্দরকে সাহিত্যে জীবন্ত ও সুন্দর করিবার প্রবৃত্তি মানুষের চিরকালই আছে। Gipsyismএর নেশা কাহার না জীবনে আসিয়াছে? অসতর্ক মুহূর্ত্তে বিধিনিষেধের বেড়াটা দুই হাতে সরাইয়া দিয়া বাহিরের বিপুলতার দিকে কে না ছুটিয়া যাইতে চায়? তবে সতর্ক স্বার্থবুদ্ধি এবং শিক্ষিত বিচারবুদ্ধি পদে পদেই বাধা দেয়। তাই আমাদের এই ভবঘুরেমি প্রবৃত্তিটা চিরকাল মনে মনেই থাকিয়া যাইতেছে; বাহিরের কাজে প্রকাশ পাইতেছে না, সাহিত্যের রাজ্যেই রূপ পাইতেছে। তবুও "ব্যাকুল বাঁশরী"র সুর কানে পশে, মনকে উতলা করিয়া

তোলে, কিন্তু উপায় নাই। Ballad literatureএ আমরা দেখি এই idealisation, জীবনে যাহা সম্ভব হয় না সাহিত্যের স্বপ্নে তাহাকে সম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছে। একটা old balladএর খানিকটা মনে পড়িতেছে—

"Sae rantingly, sae wantingly,
Sae dantingly gaed he,
He play'd a string and danced a round
Beneath the gallows tree !"

ইহাই হইল আসল Bohemian জীবনের ধর্ম। Gallows treeর নীচে, পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও he play'd a string and danced a round !" মৃত্যুটা স্থিতিশীলতার রাজ্যে একটা সাংঘাতিক ক্ষতি, কিন্তু Bohemianismএর রাজ্যে ইহার কোন মূল্যই নাই। এমন ভাবে সংসারিক ক্ষতিকে উপেক্ষা করিয়া চলা, এমনই ভাবে বিধিনিষেধের কড়া শাসনকে নিঃসঙ্কোচে অবহেলা করা, ইহার মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন সত্যের ইঙ্গিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইংলণ্ডে ballad literatureএ Robin Hoodএর যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা সত্য নহে; কিন্তু অশিক্ষিত মন তাহাকে সত্যের চেয়েও বেশী মূল্যবান মনে করিয়াছে। Robin Hood হইল শিক্ষিত ও শক্তিমানদের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে অশিক্ষিতের, দুর্ব্বলের, দরিদ্রের চিরন্তন অভিযোগের মূর্ত্ত ছবি। এই জন্য Robin Hood ও তাহার green wood অশিক্ষিত মনকে চিরকালই সান্ত্বনা দিবে। এই যে দুঃসাহসের, বিচার বিহীন উল্লাসের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা, সাধারণ লোকের পরিবর্ত্তনহীন জীবনের মধ্যে ইহা এক গতি-স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে।

রূপকথার মধ্যে আমরা ভবঘুরেমির আর একটা দিক দেখি। রূপকথার রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্র, ইহারা কি সত্যসত্যই কোন কাঞ্চনমালা মাণিক্যমালার সন্ধানে ইতিহাসের কোন কালে দুর্গম গিরিবনপথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল? মাণিক্যমালাকে কি কোন রাজপুত্র একেবারে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে? আজও কি সে পাতালপুরীতে স্বর্ণপালঙ্কে আমাদেরই অপেক্ষায় নিদ্রা যাইতেছে না? সোনার কাঠির পরশ কি তাহাকে চিরকালের জন্য জাগাইয়া দিয়াছে? শত শত রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র গেল—এখনও সেই গজমতির হার একেবারে লাভ হইল না, এখনও সেই সোনার পাহাড় হীরার পাহাড় বেঙ্গমাবেঙ্গমী কাল-অজগর সাগরপারের সোনার দেশের ছবি আমাদের মনে আছে। আমরাও বাল্য-যৌবনের চিন্তায় ও স্বপ্নে বহুবার সে দেশে যাত্রা করিয়াছি। আমাদের কি উদ্দেশ্য ছিল?—কি লক্ষ্য ছিল?—কেহই বলিতে পারে না। এসব হইল জীবনের অসম্পূর্ণতার যে ব্যাকুলতা তাহারই কল্পিত চিত্র। যাহাকে বোঝা যায় না কেবল অনুভব করা যায়, তাহাকে বুঝিবার রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পরীরাজ্যের জ্যোৎস্না-ধোয়া লালপথটাকে কেহ সত্যসত্য দেখে নাই তবু তাহা সকলের পরিচিত। সে পথে বহুবার আমরা যাত্রা করিয়াছি। এই যে romantic চেষ্টা, বিশ্বসাহিত্যে বড় সৃষ্টি, সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি ইহা হইতেই হইয়াছে। কেবল পরী-জগতের স্বপ্নেই নহে, একটা অশান্ত "Faust-spirit" আমাদের সকলের মনেই আছে। এই "Faust-spirit" কখনও স্থিতিরাজ্যের ভোগ সম্পদে তুষ্ট হয় না, তৃপ্ত হয় না, কারণ তুষ্টি ও তৃপ্তি দৈন্যের লক্ষণ। এই "Faust-spirit"এর আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা কেবল অনন্তকে পাইয়াই শান্ত হয়।

Romantic সাহিত্য হইল আকাঙ্ক্ষার, কামনার, কল্পনার সাহিত্য। কোন্ দেশে এই সাহিত্য নাই? কোন্ দেশের সাহিত্যে 'The Island of the Blessed," অমরাবতী নাই? এই যে Romantic আকাঙ্ক্ষা, ইহাকেও আমি ভবঘুরে ধর্ম্মের একটা বিশিষ্ট অভিব্যক্তি বলিতেছি। কারণ, অনির্দ্দিষ্ট ব্যাকুলতাই Romanticismএর মূল কথা। Classicism হইল রক্ষণশীলতার ধর্ম; ইহা বিধিকে বড় করিয়া দেখে, স্থিতির জয়গান করে। Romantic সাহিত্য চাহে, পরিবর্ত্তন, নূতনতর, গভীরতর, সুন্দরতর জীবন। ইহা চাহে মুক্তি, জীবনের প্রাত্যহিকতা হইতে এক কল্পিত সুন্দরতর জীবনের মধ্যে মুক্তি। এই যে সুন্দরতর জীবন, ইহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবার আকাঙ্ক্ষাই হইল romantic সাহিত্যের প্রাণ; এই আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হইলেই, Romanticismএর রূপ বদলাইয়া যায়। Romantic

সাহিত্যে সেইজন্ত দেখি গতিশীলতার অভাব। Shelleyর Alastor, Keatsএর Endymion, এই সব হইল খাঁটি romantic সাহিত্য। এই শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে একটা final synthesis রচনা করিবার চেষ্টা আছে। তবে সে চেষ্টার পূর্ণফল লাভ হয় না, হইতে পারে না। এই অপূর্ণতার ব্যাকুলতাই romantic সাহিত্যকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। Yeatsএর একটি বিখ্যাত কবিতায় এই ভাবটি অতি সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। কবিতাটির নাম—The Lake Isle of Innisfree। এই Innisfree দ্বীপ কল্পনারাজ্যের রম্যস্থান। এখানে যাওয়া যায় না, তবে যাইবার আকাঙ্ক্ষা ক্ষণেক্ষণেই মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। সেখানে শান্তি আছে, সুখ আছে, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের দাবীদাওয়া হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না, তাই সেখানে যাওয়া চলে না। তবু কবিচিত্ত গাহিয়া উঠে—"I will arise and go now, and go to Innisfree।" আকস্মিক উত্তেজনার মতই একটা নিরুদ্দিষ্ট কামনা আমাদের দেহ মনে সহসা একটা উদ্বেগের অভাবনীয় পুলক-স্পন্দন আনিয়া দেয়। এই যে "Lake Isle of Innisfree" ইহা আমাদের লুপ্ত উজ্জয়িনী, বিস্মৃত অমরাবতী। কবির সঙ্গেই আমরা "পূর্ব্ব-জনমের প্রথমা প্রিয়ারে" খুঁজিতে এই উজ্জয়িনীতে যাত্রা করিতে পারি।

সবদেশেই আর এক শ্রেণীর সাহিত্য আছে দেখিতে পাই, তাহাকে বলা যাইতে পারে "পথ-সাহিত্য," বা "যাত্রা-সাহিত্য"। জীবনকে একটা উদ্দেশ্যহীন যাত্রার মত ধরিয়া কবিরা কতরূপেই না তাহার প্রকাশ দিয়াছেন। এই পথের নেশা কত মনকেই না উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। মনকে আমরা প্রশ্ন করিয়াছি—

"কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা,
শূন্য গগনে পাও কার বারতা?"

এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। এই যাত্রা এক বিন্ধ্যগিরি হইতে এক অমরাবতীতে যাইয়াই শেষ হইল না। অজ্ঞাতে এই "স্বপ্ন-প্রয়াণ" আমাদের মনোরাজ্য দিয়া অনিশ্চিতের দিকে আজও চলিয়াছে। সহসা যেন কিসের আহ্বানে, আমরা কবির ভাষায় সাড়া দিই—

"ওই স্রোত হয়েছে মুখর
তরণী কাঁপিছে থর থর,
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,
তাকাসনে ফিরে—।"

এই "মুখর" স্রোত বাহিয়া আমরা কোথায় যাইব?

"যেখানে ওই কোকিল ডাকে, ছায়াতলে, সেখানে নয়,
যেখানে ওই গ্রামের বধূ নামে জলে, সেখানে নয়।"

আমরা এই যাত্রার শেষ কোথায় তাহা জানি না। শুধু এক অনির্দ্দিষ্টের আহ্বান আসিয়া মনকে দোলা দেয়, মন "উদ্‌ভ্রান্ত মত" সহসা গাহিয়া উঠে—"ওই স্রোত হয়েছে মুখর"। সন্ধ্যার মৌনতার মধ্যে ধরণীর বক্ষ ঠেলিয়া এক ক্রন্দন-ক্লিষ্ট ধ্বনি উর্দ্ধে উঠিয়াছে—"কতদূর, আরো কতদূর।" ইহা কেবল কবিই শোনেন নাই, এই ধ্বনি আমাদের সকলের মনে মনেই সঞ্চারিত হইতেছে। ইহা আমাদের অসমাপ্তির ক্রন্দন, আমাদের অজানিত জীবনরহস্যের ভাষা।

ইউরোপের মধ্য-যুগের সাহিত্যে যে সব Knightদের adventureএর কাহিনী আছে, তাহার মধ্যে আমরা একটা জিনিষ দেখি, সেটা হইল পথ চলিবার দুর্জ্জয় নেশার উন্মাদনা। এই যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত মনোবৃত্তি, ইহাকে ধর্ম্মের chivalryর বিধি দিয়া বাঁধিবার কত না চেষ্টাই হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটা বিবেকবুদ্ধিকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সামাজিক জীবনের দাবীদাওয়ার আধিপত্য স্থাপন করা হইয়াছে। তবুও ভবঘুরেমি-ধর্ম্মের লক্ষণগুলি সব মুছিয়া যায় নাই, অব্যাহত আত্মপ্রচারের লিপ্সাকে একেবারে বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই।

স্পেনীয় সাহিত্য হইতে যে picaresque novelএর উৎপত্তি হইল তাহার মধ্যে আমরা দেখি এই ভবঘুরেমি ধর্ম্মের আর একটা দিক। Fielding, Smollett প্রভৃতি বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিকেরা এই ধরণের ভবঘুরেমি লইয়া অনেক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই সব উপন্যাসে ভবঘুরেমিকে যৌবনের ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সুদীর্ঘ-পথ ও দুরন্ত মন, ইহাই হইল এই সব উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এখানে সুনীতিকে বড় আসন দেওয়া হয় নাই।

বর্ত্তমানে Russian Literatureএ ও অন্যবিস্তর সব দেশের সাহিত্যেই ভবঘুরেমি ধর্ম্মের আর একটা অভিব্যক্তির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে। দুঃসাহসকে বড় করিয়া দেখা, তথাকথিত দুর্নীতিকে নানারূপে প্রকাশ দিবার চেষ্টা, গুপ্তকে তাহার চিরন্তন অন্ধকার হইতে বাহিরের আলোকে টানিয়া বাহির করা, এই সব ভবঘুরেমি ধর্ম্মের একটা দিক। শুধু কুৎসিৎকে লইয়াই এই সব সাহিত্য রচিত হইতেছে না। ইহার মধ্যে দুর্ব্বলতা আছে, (দোষ আছে বটে), কিন্তু তাই বলিয়া ইহার জীবন্ত দিকটাও দেখিতে হইবে। Gorky, Knut Hamsun প্রভৃতির লেখার মধ্যে আমরা একটা romantic প্রেরণার পরিচয় পাই। ইঁহারা প্রকৃতপক্ষে Ultra-realist বা অতিবাস্তব-বাদী নহেন। ইঁহাদের লেখার যে বিফলতা বা অতৃপ্ত কামনাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে—ইহা স্বীকার করা যায় না যে তাহা দুর্নীতির পূজামাত্র। নীতিবোধটা কেবল শাস্ত্রকারদেরই সম্পত্তি নহে, তাহা অল্প বিস্তর সকলেরই আছে। অবশ্য কাহার মধ্যে কি ভাবে লুকাইয়া আছে তাহা আমরা সঠিক জানিনা। প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থাকে খানিকটা টানাহেঁচড়া করিয়া ওলট্‌পালট করিয়া দেখিলে তেমন ক্ষতি কিছু নাই, হয়ত লাভও থাকিতে পারে। সাহিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থাকে এমন ভাবে ওলট-পালট করিবার প্রবৃত্তি কেবল আজিকার প্রবৃত্তি নহে। ইহা বহুকাল হইতেই আছে। এই তথাকথিত অতিবাস্তব কথা-সাহিত্যে যে মনোবৃত্তি আছে, তাহা যে ভবঘুরেমি-বৃত্তি, এ বিষয়ে কোন্ সন্দেহ নাই।

Romain Rolland তাঁহার John Christopher লিখিয়া বিশ্ব-সাহিত্যে এক নূতন শ্রেণীর সাহিত্যের জন্ম দিয়াছেন। তিনি নিজে John Christopherএ মানুষের জীবনকে একটা নদীর মত কল্পনা করিয়া ধাপে ধাপে তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। Christopherএর জীবনে এই ভবঘুরেমির নেশা ছিল। তাই সে সনাতন সত্যগুলিকে লইয়াই তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। সে চাহিয়াছে আরও বড় সত্যকে—সুন্দরতরকে। এমন করিয়া একটি মানব হৃদয়ের পরিচয় Romain Rollandএর পূর্ব্বে আর কেহ দেন নাই। তাঁহার পরে এই শ্রেণীর সাহিত্য দ্রুত বাড়িতেছে। আমাদের দেশেও এই দিকে অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সুফলও দেখা দিয়াছে। মনের বৃত্তিগুলির এমন ভাবে দরদ দিয়া সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার ফলে আমাদের অন্তর্জগতের রহস্যগুলি অনেকটা পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার জটিলতা ও গভীরতা আমরা অনেকটা বুঝিতেছি এবং উদ্দেশ্যবান স্থিরলক্ষ্য কর্ম্মের সাধনাই যে জীবনে বড় কথা নহে, ইহা আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইয়া আসিতেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়



সম্রাট অশোকের গিরিলিপি

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্, পি-আর-এস

বিগত ফাল্গুন মাসের বিচিত্রায় সম্রাট অশোকের অপ্রধান গিরিলিপিগুলি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে বলিয়াছিলাম যে, এগুলি নিম্নকথিত সাতটী বিভিন্ন স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে,—জয়পুর রাজ্যে বৈরাট, সাহাবাদ জেলায় সাসেরাম, জব্বলপুর জেলায় রূপনাথ, মহিশূর রাজ্যে ব্রহ্মগিরি, সিদ্ধপুর ও জটিঙ্গা-রামেশ্বর এবং নিজাম রাজ্যে মস্কি।

কিন্তু ঐ কথা লেখার এত স্বল্পকালের মধ্যেই যে তাহা সংশোধনের প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তখন মনে হয় নাই। আজ ঐতিহাসিকের বড় আনন্দের দিন। কারণ, মৌর্য্য সম্রাট অশোকের অমর বাণী-সম্বলিত আর একটী অনুশাসন আবিষ্কার হওয়ার সংবাদ আজ সাধারণে প্রচারিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারত ক্রমেই নূতন আবিষ্কারের প্রধান ক্ষেত্র হইতে চলিয়াছে। বিগত কয়েক বর্ষমধ্যে তথা হইতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে পরম মূল্যবান বহু বিস্ময়কর দ্রব্য বাহির হইয়াছে। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র," ভামহের "অলঙ্কার শাস্ত্র" এবং মহাকবি ভাসের নামমাত্রে পর্য্যবসিত নাটকাবলীর আবিষ্কার সংস্কৃত সাহিত্যের পক্ষে যেমন মূল্যবান, মান্দ্রাজের কুর্ণুল জেলা হইতে এবং নিজাম রাজ্যের মস্কি এবং কোফাল হইতে অশোকের অনুশাসন বাহির হওয়া তেমনই প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের পক্ষে পরম মূল্যবান আবিষ্কার।

নূতনাবিষ্কৃত অশোকের অনুশাসনটী তাঁহার অপ্রধান গিরিলিপিগুলির অপর এক বিভিন্ন সংস্করণ মাত্র। নিজাম রাজ্যে কোফাল নামে একটী স্থান আছে। ইহা এক্ষণে নবাব সালার জঙ্গ বাহাদুরের তালুকের অন্তর্গত। নিজাম রাজ্যের ইতিহাসের সহিত সালার জঙ্গের নাম অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। প্রথম নবাব সার সালার জঙ্গ নিজামরাজ্যের এক জন সুদক্ষ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং সিপাহীবিদ্রোহের কালে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় নিজামরাজ্যে এবং দক্ষিণভারতে কোন বিপ্লব ঘটিতে পারে নাই। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রও যথাক্রমে নবাব সালার জঙ্গ বাহাদুর নামক গৌরবময় পদের উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকারী হইয়াছেন। বর্ত্তমান নবাব প্রথম নবাবের পৌত্র। ইতিহাসেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। ইঁহারই জমিদারীমধ্যে কোফাল অবস্থিত। এই স্থান দিয়া মান্দ্রাস এবং সাউথ মারহাট্টা রেলপথের ছোট লাইন গিয়াছে। কোফালের প্রায় ৩০ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে মস্কি অবস্থিত।

কোফালের অনেক অধিবাসী একদিন একটী প্রস্তরগাত্রে অদ্ভুত ধরণের অক্ষরে লিখিত একটী লেখা দেখিয়া সে কথা নিজামরাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ গোলাম ইয়াজদানী সাহেবকে জানায় এবং সেই সঙ্গে লেখাটীর একটা অসম্পূর্ণ নকলও পাঠাইয়া দেয়। নবাব সালার জঙ্গের নিকট এসংবাদ পৌঁছিলে তিনিও পরম উৎসাহিত হইয়া উঠেন। ইয়াজদানী নিজে আসিতে না পারায় তাঁহার এক সহকর্মীকে লেখাগুলির প্রতিলিপি লইবার জন্য পাঠাইলেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, এটীও অশোকের একটী অপ্রধান গিরিলিপি এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত মস্কি লিপির সর্ব্বাংশে অনুরূপ।

কোফালে অবস্থিত একটি গণ্ডশৈলগাত্রে স্বাভাবিক একটী গুহার ঊর্দ্ধে রক্ষিত সুবৃহৎ একখণ্ড প্রস্তরপৃষ্ঠে অনুশাসনটী উৎকীর্ণ। লেখাটী আট লাইনে সম্পূর্ণ এবং বেশ ভাল অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে—অশোকের অনুশাসনটী ব্যতীত কোফালে ব্রাহ্মী অক্ষরের আরও তিনটী লেখ আছে।

মস্কির অনুশাসনটী ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে গোলাম ইয়াজদানী কর্তৃক Hyderabad Archaeological seriesএর গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে

প্রকাশিত হয়। কোফালের নবাবিষ্কৃত অনুশাসনটীও প্রকাশের ব্যবস্থা ইয়াজদানী করিতেছেন।

দক্ষিণ ভারতের যে অঞ্চলে নিজামরাজ্যের মস্কি ও কোফাল এবং মহিশূর রাজ্যের ব্রহ্মগিরি, সিদ্ধপুর ও জটিঙ্গা-রামেশ্বর অবস্থিত, তাহা প্রাচীন কর্ণাট দেশের অন্তর্ভূত ছিল। এই অঞ্চলের সর্ব্বস্থানেই প্রাচীন অব্যবহৃত স্বর্ণখাতের নিদর্শন এবং আরও প্রাচীন "নবপ্রস্তরযুগে" (neo-lithic age) মানববাসের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। মস্কির নিকটে পুরাতন স্বর্ণখনির অস্তিত্ব এবং মহিশূর রাজ্যের চিত্তলদ্রুগ জেলায় সিদ্ধপুর ও ব্রহ্মগিরির অশোক অনুশাসনের অদূরে ভূগর্ভমধ্যে প্রোথিত এক পুরাতন নগরের অবস্থানের কথা আমার প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি। ঐতিহাসিকগণের মতে উহাই যে অনুশাসনোল্লিখিত ইসিলা নগরীর নিদর্শন সে কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সম্প্রতি মহিশূর রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হইতে ঐ সকল স্থানে খননকার্য্য চলিতেছে। নিজাম রাজ্য হইতে অশোকের নূতন অনুশাসন আবিষ্কৃত হইবার সংবাদ প্রচারিত হইবার দুই এক দিন পরেই বিগত ৭ই এপ্রিল তারিখে বাঙ্গালোর হইতে এসোসিয়েটেড প্রেস মহিশূরে আবিষ্কারের বৃত্তান্ত সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম দেওয়া গেল—

মহিশূরের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের একদল খননকারী চিত্তলদ্রুগ জেলায় অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহারা দক্ষিণাত্যের প্রাগৈতিহাসিকের যুগের একটি নগর আবিষ্কার করিয়া ঐতিহাসিকের নিকট পরম মূল্যবান বহুসংখ্যক দ্রব্য বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত জিলার ব্রহ্মগিরি পাহাড়ের অশোক অনুশাসনের সন্নিকটবর্ত্তী মৌর্য্যযুগের ইসিলা নগরের সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তা শ্রী এম-এচ-কৃষ্ণ মহাশয় উক্তস্থানে খনন করেন। তাহার ফলে মৌর্য্যযুগের সহরের নিম্নে অপেক্ষাকৃত আরও প্রাচীন যুগের একটী সহরের অবস্থান জানা গেল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মহাশয়ের মতে উহা লৌহযুগ, কিম্বা নবপ্রস্তরযুগ অথবা আরও পূর্ব্বকালের হইতে পারে। খনন-কার্য্য এখনও চলিতেছে। তাঁহার মতে উপযুক্ত খননের ফলে এই নগরীর সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য বাহির হইতে পারে।

সিদ্ধপুরের অশোক অনুশাসনের নিকটও পরীক্ষার্থ সামান্য সামান্য খননকার্য্য করা হয়। ঐ স্থানেও একটী নগরের অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে। উহা চন্দ্রাবলী উপত্যকায় আবিষ্কৃত সহরটী অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মহিশূর জেলায় হেগাদেভাকোট তালুকে পরীক্ষার্থ স্থানসমূহ খনন করায় প্রোথিত ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা পুন্নাদ রাজ্যের রাজধানী কীর্ত্তিপুরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। এই সকল খননকার্য্যের ফলে সুপ্রাচীন মৌর্য্যযুগের দাক্ষিণাত্যের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইবে বলিয়া আশা হয়।

মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সীর নানাস্থানে এবং নিজাম রাজ্যেও অনেক জায়গায় প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের আদিম মানবের বসতির বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিজাম রাজ্যের পুরাতত্ত্ববিভাগ উত্তররাজ্যমধ্যে অবস্থিত এই ধরণের স্থানগুলি প্রদর্শন করিয়া অঙ্কিত একটী মানচিত্র শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন। ইহা হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের জাতিসমূহের অবস্থান ও অভিযান সম্বন্ধে অনেক নূতনতর তথ্য জ্ঞাত হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



শিশুমনের চলচ্চিত্র

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ এম-এ, বি-এল্

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩

ভোজের নিমন্ত্রণ।

ঠাকুরমার বাপের বাড়ী, পাশের গাঁয়ে। আত্মীয় বাড়ী হইতে বাড়ীর সকলকে লইবার আহ্বান আসিয়াছিল। ঠাকুরমার না গেলে চলে না, খুড়ীমারা কেহ বাড়ী নাই কাজেই মাকে বাড়ী থাকিতে হইল।

আমি বলিলাম, "আমি যাব।"

ঠাকুরমা বলেন, "না দাদু, মাকে ফেলে তুমি থাকতে পারবে না।" সে কথা শুনিতে মন চায় না। কল্পনায় নিমন্ত্রণ গৃহের লুচিমণ্ডার ছবি দেখি, চিত্তকে কিছুতেই থামাইতে পারি না।

মা বলেন, "আমার জন্য মন কেমন করবে না অজু?" করিবে জানি, কিন্তু সে কথা স্বীকার করা চলে না, ফলারের কৌতুক ও আমোদ মায়ের ভালবাসা ছাপাইয়া ওঠে। মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলি, "না মা! তুই কিছু মনে করিস না, আসবার সময় তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে আসব।"

আমার পাকামিতে মা হাসিয়া উঠিলেন। সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহ সন্দেশের তুল্যমূল্য নহে, একথা তখন বুঝি নাই।

অনর্থ ও ক্রন্দনের হাত এড়াইবার জন্য বাড়ীর লোকে রাজী হইলেন। পূজার সময় ঠাকুরদা তাঁতের ধুতি ও দোলাই কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাহাই গায়ে দিয়া বিজয়ী বীরের মত দিগ্বিজয়ে চলিলাম।

বাড়ী ছাড়াইয়া গাঁয়ের মনসাতলা।

মনসা পূজার উৎসব দেখিয়াছি, ঠাকুরমার মুখে মনসার ভাসান শুনিয়াছি। চলিতে চলিতে ভয়ে শিহরিয়া উঠি। চাঁদসওদাগরের কথা মনে জাগে। সাপের বিচিত্র বর্ণনা মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলে। ঠাকুরমাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, "ঠাকুরমা! মনসাতলায় কি সাপ থাকে?"

ঠাকুরমা অভয় দিয়া বলেন, "না সাপ থাকবে কেন? যেদিন লোকে দুধকলা দিয়ে যায়, সেদিনই কেবল মা মনসা এসে খেয়ে যান।"

রায়েদের বাড়ী ছাড়াইয়া হাট। হাটের পাশ দিয়া পথ—শূন্য চালাগুলি প্রভাতের রৌদ্রে ঝলমল করে।

একটী গরুর গাড়ী মাল বোঝাই করিয়া সহরে চলিয়াছে। তাহার ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, কোথায় কোন দূরে গাড়ী চলিয়াছে। গাড়ীর গাড়োয়ানকে বলি, "আমায় একটু উঠিয়ে নাও না।" গাড়োয়ান শান্ত শিষ্ট লোক, তুলিয়া লয়। পথের পাশের মোড়ে নামাইয়া দেয়।

ঠাকুরমা পিছনে পড়িয়া যায়, আমি দাঁড়াইয়া পাখীর খেলা দেখি।

গাছের পাতার মাঝে একটী দোয়েল বসিয়া শিস দিতেছিল, তাহাকে তাড়া করিতেই দাঁতন গাছের ঝোপে লুকাইল। যাইয়া দেখি দোয়েলের বাসা, খড়কুটা দিয়া পাখী অতি সুন্দর নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমাকে দেখিয়া দোয়েল ভয়ে উড়িয়া গেল, নীড়ের ভিতর তিনটী ডিম রহিয়াছে, লইবার লোভ হইল, কিন্তু পরদুঃখকাতরা ঠাকুরমা নিশ্চয় বকিবেন, এই ভয়ে ডিম লইলাম না। দাঁতনের ফল কলিয়া রসে ভরপুর ছিল, তাহাই তুলিয়া লইয়া মনের উল্লাসে খাইতে আরম্ভ করিলাম।

ঠাকুরমা আসিয়া পড়িলেন। দাঁতনের ফল আমার কাছে রসগোল্লার চেয়ে মিষ্ট লাগিতেছিল। ঠাকুরমাকে

বলিলাম, "ঠাকুরমা তুমি খাবে?" বৃদ্ধার রসনায় দাঁতনের ফলের কোন মূল্যই ছিল না, আর পথের মাঝে বসিয়া খাওয়ার আনন্দও তাঁহার ছিল না। তাই ঠাকুরমা খাইলেন না। আমার দুঃখ হইল। ছোট বয়সে মানুষ স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে। আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি তাহার অতি প্রবল, তথাপি মাঝে মাঝে দান করিবার ইচ্ছা যে জাগে না তাহা নহে।

ঠাকুরমাকে বলিলাম "এইখানে পাখীর বাসায় ডিম আছে—দোয়েলের ডিম।"

বুড়ীর তাহাতে উৎসাহ জাগে না, দমিয়া যাই। খানিক পরে ঠাকুরমা বলেন, 'না দাছ, পাখীর ডিম নিতে নেই। শোন একটা গল্প বলি,—"সত্যিকালের যুগে একটী বন-চালিতার গাছে এক দোয়েল ডিম পেড়েছিল, এক কাক এসে তার ডিম ভেঙ্গে দেয়, দোয়েল গিয়ে পাখীর রাজার কাছে নালিশ করল। তখন সভা হ'ল, বিচার বসল, পাখীর রাজা ব্যবস্থা করলেন যে কাকের রঙ কালো হয়ে যাবে আর লোকে তাকে দুচক্ষে দেখতে পারবে না।" বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করি "সত্যিযুগে তাহলে কাক সাদা ছিল?"

ঠাকুরমা বলেন, "ছিল বইকি, ক্ষীরের মত রঙ, চাঁপার মতন ঠোঁট, কাক তখন সাদা বকের চেয়েও ধব ধবে আর সুন্দর ছিল, কিন্তু অন্যায় করার ফলে কাকের গুরু শাস্তি হয়েছে।"

যখনই কোন নীতি-শিক্ষা দেওয়ার দরকার হইত, ঠাকুরমা উপদেশ দিতেন না, ঈশপের মত গল্প করিতেন আর আমি স্তব্ধ হইয়া সেই কাহিনী শুনিতাম। কালের স্তব্ধ সমুদ্র পাড়ি দিয়া সেই সমস্ত কাহিনী ঠাকুরমার হারানো কণ্ঠস্বরে মাঝে মাঝে মনের দ্বারে সাড়া দিয়া যায়।

অবশেষে ঠাকুরমার বাপের বাড়ী পৌঁছিলাম। চৌধুরীরা গাঁয়ের বর্দ্ধিষ্ণু লোক, সেকালের দিনে ক্রিয়াকর্ম্ম করিয়া লোকে সম্মান প্রতিপত্তি করিত। বিলাস-ব্যসনের দিন আজ বাড়িয়া চলিয়াছে। নিজের কাজ শেষ করিয়া মানুষ আজ অপরকে আনন্দের অংশ দিতে পারে না।

ভোজের বাড়ী, মানুষে মানুষে সরগরম। কত গাঁয়ের কত লোক আসিয়াছে, মেয়েরা বাপের বাড়ী আসিয়াছে, কুটুম্বিনীর দল দিন কয়েকের জন্য হাতা-বেড়ী ফেলিয়া আনন্দের অবকাশ যাপন করিতে আসিয়াছে। ঠাকুরমা আসিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। আমারই মহামুস্কিল হইল। বহু জনতার মধ্যেও মানুষের মনে নির্জ্জনতার বেদনা জাগে, আমিও অপরিচিত ছেলের দলের মধ্যে নিজেকে মিশাইতে না পারিয়া অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। বাড়ীর জন্য মন উতলা হইয়া ওঠে, মায়ের বেদনা-ভরা অনুনয়ের কথা মনে জাগিতে লাগিল।

কলরব ও কোলাহলের মধ্যে কয়েকদিন চলিয়া যায়। ঠাকুরমা কাজ করেন আর মাঝে মাঝে আমার তদারক করেন। বৈকাল বেলা ভাঁড়ার হইতে সন্দেশ চুরি করিয়া ঠাকুরমার ভাইয়ের ছেলে সঞ্জয় বলিল, "চল, মাঠে গিয়ে লুকিয়ে খাওয়া যাবে।" আমি দলে ভিড়িয়া গেলাম। সাধারণ ভাবে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই মন মুগ্ধ হয় না। মানুষ তাই নিত্যদিন উত্তেজনার সন্ধান করিয়া ফেরে।

ধানের মাঠে ধান নাই, সবুজ ঘাসে ভরিয়া গিয়াছে, তাহারই পার্শে শাখাপ্রশাখায় ভরা বনস্পতি বট, মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। তাহারই তলে সন্দেশ ভাগের আয়োজন হইল। দলের সর্দার সঞ্জয় আমাকে আমলই দেয় না, চোরের দলে নই বলিয়া আমাকে সন্দেশের ভাগ অল্প দিতে চায়।

কিন্তু এ ব্যবস্থা আমার মনঃপুত নয়। আমি কষ্টের ভাগী না হইয়াও পুরস্কারের সমভাগী হইতে চাই ইহা সঞ্জয়ের মতে সমীচীন নয় কিন্তু আমি সে কথা বুঝিতে চাই না।

সঞ্জয় তাই আমায় তাগাইয়া দিল। আমিও রাগে ও ক্ষোভে একলা ফিরিলাম। পথে একটা এঁদো পুকুরে দেখি পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরমার কাছে পদ্মবনের মাঝে শাস্তিতা নায়িকার কাহিনী শুনিয়া পদ্মবনের উপর আমার মনের মোহ জন্মিয়াছিল।

তাই সঞ্জয়ের নিকট অপমানের কথা ভুলিয়া পদ্ম তুলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঘাসে-ছাওয়া পাড়ে নানা বনজ ঘাস ও লতা জন্মিয়া মনোহর আস্তরণ তৈয়ার করিয়াছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া কঞ্চি দিয়া পদ্ম টানিয়া ভাঙিতে বসিলাম।

কঞ্চির 'কোঠা' দিয়া পদ্ম টানিতে কসরতের প্রয়োজন,

সে কসরতে আমি অভ্যস্ত নই, তথাপি মানুষের উৎসাহ মানুষকে কৌশল ও দক্ষতা শিক্ষায়।

উল্লাসে ও আগ্রহে ৪।৫টী পদ্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। তাহার পর পুনরায় যেই তুলিতে গিয়াছি, অমনি কঞ্চিতে বাধিয়া একটা সাপ ডাঙ্গায় আসিয়া পড়িল। সাদা ও হলুদ রঙ্গের ডোরা দেওয়া সে সাপ হয়ত বিষহীন ঢোঁড়া ছিল, কিন্তু সহায়হীন একা আমার প্রাণ যেন উড়িয়া গেল, সাপ পড়িয়া ঘাসের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া গেল। আমি ত্রাসে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। খানিক পরে আত্মস্থ হইয়া হইয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলাম, মরণের ভয়েও পদ্ম ছাড়িতে পারি নাই, পেলব গন্ধ-মধুর পদ্মগুলি হাতে করিয়া, লম্বমান একটা বাঁশ ধরিয়া পাড়ের উপর পৌছিলাম।

কিন্তু মাটীতে পা দিতে সাহস হয় না। সাপের আতঙ্কে চারিদিকে সাপ দেখিতে লাগিলাম। মহাভারত ও মনসার ভাসানে সাপের যে সব বর্ণনা পড়িয়াছিলাম মনের মধ্যে তাহা জাগিয়া উঠিল।

খানিক পরে দেখি সাপ আপন প্রাণ-ভয়ে ঘাসের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে জলে যাইয়া পড়িল। তখন লাফ দিয়া মাটীতে পড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে ঠাকুরমার কাছে পৌছিলাম।

দুঃসাহসিক কাজে আমাদের অভিভাবকেরা পূর্ব্বে কখনও উৎসাহ দিতেন না; সুশীল ও সুবোধ হইবার সাধনা আমাদের ছিল, অকাজ করিতে দিতে কল্যাণার্থী গুরুজন চিরকালই নারাজ, কাজেই ঠাকুরমার নিকট বকুনি খাইলাম।

বকুনি মিষ্টমধুর ছিল, তাই তাহার বেদনার ঝাঁঝ মনের উপর দাগ দিয়া গেল, পদ্মগুলি বাড়ী নিয়া মাকে দেখাইবার লোভ মনে জাগিল, তাই ঠাকুরমা ও আমি যে ঘরে শুইতাম তাহার মধ্যে সিকায় করে হাঁড়ীর মধ্যে সেগুলি লুকাইয়া রাখিলাম। লুকাইবার অন্যস্থান খুঁজিয়া পাইলাম না, এখনকার মত বাক্স ও সুটকেস তখনকার দিনে রেওয়াজ হয় নাই।

সঞ্জয়েরা ফিরিল। তাহাদিগকে আমার পদ্ম আহরণের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। নিজের গৌরব বাড়াইবার জন্য বলিলাম, "জানিস্ সে পদ্মবনে বড় এক সাপ আছে, আমায় ত তেড়ে এসেছিল, আমি কোনক্রমে পালিয়ে এসেছি, আর আসবার সময় তার এক বাচ্চাকে কঞ্চি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছি, ও মুখে তোরা কেউ আর যাস না।" নিজে যাহা করি, চিরকাল মনে করি, অপরে তাহা তেমনভাবে কখনই করিতে পারে না। কিন্তু সঞ্জয় তুখোড় ছেলে, সে না দমিয়া উত্তর দিল "তোর সাপ আমায় দেখলে বাপ বাপ করে পালাবে, ও পুকুরে ত আমরা রোজই পদ্ম তুলি।"

সঞ্জয়ের সঙ্গী বলিল, "তুই পদ্ম আনিস নি, মিথ্যে কথা বলছিস ?"

আমি ইহাদের দুষ্টবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছিলাম। চাণক্য-নীতি শঠে শাঠ্যম্ অনুসরণ করিয়া বলিলাম, "তোদের দেখাই আর তোরা চুরি করে নে ?"

সঞ্জয় ইহাতে আপন নেতৃত্বকে অপমানিত হইয়াছে মনে করিয়া বলিল "তোর পদ্ম কে দেখতে চায়, কাল ঝুড়ি ঝুড়ি এনে তোকে দেখাব, কিন্তু পদ্ম আনা তোর কর্ম্ম নয়।" নিরুপায় আমি কি করিব ভাবিয়া পাই না। শঠকে ধন ভাণ্ডার দেখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তে ঘর করা চলে না, কাজেই নিরুত্তর রহিলাম। একটী ছোট মেয়ে পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে আমার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বেদনার্ত্ত হইয়া বলিল "না সঞ্জয়দা, ও পদ্ম এনেছে।"

সঞ্জয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সদলবলে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে আমার রক্ষাকর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলাম।

মেয়েটীর হাসি-ভরা মুখ। নানা বিক্ষেপ-ভরা সারা দিনের অশান্তির পরে লাবণ্য-ললিত মেয়েটীর মুখ আমার মনে অনেকখানি আনন্দ আনিয়া দিল। সেই আনন্দ আমার মনকে সজাগ করিয়া তুলিল। আমি তৃপ্তচিত্তে বলিলাম "এই, তোর নাম কি ?"

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, শ্লোক আওড়াইয়া উত্তর দিল 'নাম দিয়ে তোর কাম কি" ?

মেয়েটির এই পাকামি-ভরা উত্তর আমাকে ক্ষুব্ধ করে নাই। তাহার সঙ্গে ভাব পাতাইবার জন্য বলিলাম, "তোকে একটা ভাল পদ্ম দেব, বল্ না, তোর কি নাম ?

উৎসবের মূর্ত্ত সুরের মত সে মেয়েটী। সে উত্তর দেয় না, শ্লোক পড়িয়া যায়—

নীল সায়রের কোলে
অশথ-পাতা দোলে,
ওগো তুমি কোন্ সে রাজার ঝি
বল না মোরে নামটী তোমার কি ?

হার মানিয়া জানাই "ওগো পাকা বুড়ি তোমার সঙ্গে ছড়া কেটে আমি জিতব না।"

ভোরের বেলা শিশির-ভরা গোলাপ-কুঁড়ির মত মাথা দোলাইয়া মেয়েটি বলে

সবুজ পাতায় কুন্দকলি
নই গো আমি নই,
শিউলি আমি শিউলি,
ঠিক ত কথা কই।

শিউলি মেয়েটার তর-তরে চলন আর ঝর-ঝরে কথা আমায় মুগ্ধ করিয়া দিল, তাহাকে নিয়া আমার রত্ন-মঞ্জুষা দেখাইলাম ও সাবধান করিয়া দিলাম যেন সে অপর কাহাকেও সন্ধান না দেয়। শিউলি তাহার কথা রাখিয়াছিল, সে কাহাকেও বলিয়া দেই নাই, কিন্তু সঞ্জয়ের দল চতুরতায় শিউলি ও আমার উপর টেক্কা দিল। তাহারা এক ফাঁকে আমার পদ্মগুলি চুরি করিয়া সরিয়া গেল।

পদ্ম অপহরণে আমার দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না, কিন্তু শিউলি বলিল, "কেঁদে কোন লাভ নেই, ওরা তাতে কেবল হাসবে।" শিউলির কথা আমার অন্তর স্পর্শ করিল। 'অমৃত-ফল' হারাইয়া যে কান্না কাঁদিয়াছিলাম, তাহার পিছনে আবদারের তাড়না ছিল, কিন্তু পরের বাড়ীতে কান্না কাটি করা শোভন হইবে না ইহা বুঝিয়াছিলাম। নিজের দুঃখ নিজে বহন করিতে পারাই জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিষ। ভিক্ষুকের মত অপরের সহানুভূতি বাঞ্ছা করায় দুঃখ বই সান্ত্বনা নাই। বড় হইয়া বহুবার ঠেকিয়া শিখিয়াছি, তাই শিউলির এই তুচ্ছ ছোট কথাটিও কালের স্রোতে হারাইয়া যায় নাই। শিউলিকে সাথী পাওয়ায় আমার যে আনন্দ হইয়াছিল ভাষায় তাহা প্রকাশ করা চলে না। চঞ্চল, লঘু, হাস্তচটুল এই ছোট মেয়েটি ঝর্ণার মত চারিদিকে উৎসবের সুর ছড়াইয়া দিতে পারে, তাই তাহার সঙ্গ পরম কামনার ধন।

শিউলি আমার সাথে ভিড়িয়াছে তাহাতে সঞ্জয়ের দলের রাগ হইল। পদ্ম চুরির পর তাহারা বিষম একটা হৈ চৈ হইবে আশা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইয়া তাহারা কলহের সুযোগ খুঁজিতেছিল। বিকাল বেলায় লুকোচুরি খেলিবার সময় শিউলি যখন খেলিতে চাহিল, তখন সঞ্জয় জোরের সহিত বলিল, "না তোকে নিয়ে আমরা খেলব না।"

শিউলি দমিবার মেয়ে নয়, সঞ্জয়ের দলকে সে ভয় করিয়া চলে না। সে, আমি আরও দুএকজনে একত্রে খেলিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইলাম, কিন্তু লোক কম হওয়ায় আমাদের খেলা জমে না।

শিউলি হয়ত আমার জন্য কষ্ট পাইতেছে ভাবিয়া সন্ধ্যা-বেলায় শিউলিকে বলিলাম, "শিউলি, তুই না হয় ওদের সঙ্গে হ', আমি রাগ করব না।" খোলা বারান্দায় চাঁদের আলোর সোণালিতে ঝলমল, শিউলি আমার কথার উত্তর না দিয়া শোলোক বলিয়া যায়,

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
শূন্য ঘরে কে ?
দোদুল দোলায় দোল লেগেছে
দুলবি ওরে কে ?

তারায়-ভরা আকাশ কাজের বাড়ীর সমস্ত ভিড় ভুলাইয়া মনকে টানিয়া লয়। শিউলির মন যেন প্রকৃতির সাথে এক তারেতে বাঁধা, তাই সে সন্ধ্যার সেই অসীম পূর্ণতার কাছে আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিল। আমি পুনরায় বললাম "ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই।"

অসহিষ্ণু হইয়া শিউলি উত্তর দেয় "ঝগড়াঝাঁটা এখন থাক, তুমি একটা রূপ-কথা বল না।"

ঠাকুরমার কাছে শেখা গল্প বলি—"এক যে ছিল রাজা— তার হাতী শালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজার এক ছেলে বড় আদুরে। রাজপুত্তুর বড় হয়ে একদিন কাঁকনবাঁকা নদীতে গেছেন স্নানে, এমন সময় কালো কুচ কুচে এক গাছি চুল—

শিউলি হাসিয়া বলে "কুঁচবরণ কন্যে, যার মেঘবরণ চুল— সেই গল্প ত, ও আমি জানি। তুমি না-হয় ছড়া বল অজিত দা!" জানা ছড়া আওড়াই, চাঁদের আলো শিউলির কালো চুলে লুকোচুরি খেলে, শিউলির মা আসিয়া ডাকে, শিউলি চলিয়া যায়।

পরের দিন ভোজ—চারিদিকে কেবলই গণ্ডগোল। কাজ যত লোক করে, তার চেয়ে বেশী লোক গণ্ডগোল করে। ফপরদালালদের আস্ফালন ও উৎসাহে কান-পাতাই ভার।

সারা সকালের মধ্যে শিউলির দেখা নাই, শিউলির কাকা আসিয়াছে, শিউলি তাহার কাছেই বেড়াইয়া বেড়ায়।

খানিক পরে ঠাকুরমা আসিয়া বলেন, "যাও ত দাদু, তোমার বাবা এসেছেন, তাকে ডেকে নিয়ে এস।"

বাবার খোঁজে বাহির হইলাম, বাহিরের উঠানে সামিয়ানা টানাইয়া বসিবার স্থান করা হইয়াছে—সেখানে লোকে লোকারণ্য। তাহার মধ্য হইতে বাবাকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে স্থির করিলাম, লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া বাবাকে বাহির করিব।

বুদ্ধি করিয়া স্থির করিলাম, বাবার নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয় ও সমীচীন, কারণ কেহই আমাকে চিনে না। অতএব বৃথা অনুসন্ধান ত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কেউ বিজয় রায়কে দেখেছ ?"

প্রশ্নটা শিশুবালকের মুখে খারাপই শোনায়, কিন্তু আমি এই প্রশ্ন নিজের বুদ্ধির বাহাদুরীর জ্ঞাপক ভাবিয়া নির্ভীক-চিত্তে সেই জনসভায় একজনের পর আর একজনকে করিয়া চলিলাম।

জনতার মধ্যে কেহ কেহ পিতাকে চিনিত। তাহারা আমার এই অপূর্ব্ব প্রশ্ন শুনিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহাদের হাসির কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমি হত-ভম্বের মত চাহিয়া রহিলাম।

বাবা কোথায় ছিলেন, ঘটনাস্থলে আসিয়া আমায় বলিলেন, "কি খোকা ?"

আমি ঠাকুরমার প্রদত্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

সকলের কৌতুকোজ্জ্বল হাসির মধ্য দিয়া পিতা-পুত্র বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলাম। সঞ্জয়ের দল কোথা হইতে এই খবরটা শুনিয়াছিল। আমার সহিত দেখা হইবামাত্র, তাহাদের একজন অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "তোমরা কেউ বিজয় রায়কে দেখেছ ?"

নিজেকে অপরিচিত জানিয়া পিতার নাম ধরিয়া প্রশ্ন করাকে সঞ্জয়ের দল বুদ্ধিমত্তার উদাহরণ মনে না করিয়া উপহাসের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে, ইহাতে আমি মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করিলাম।

বাবাকে দেখিয়া, আর এই সব উপদ্রবের জন্য আমার মন বাড়ী ফিরিয়া গেল। মায়ের স্নেহমধুর অমিয়ধারার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলাম। ঠাকুরমাকে যাইয়া বলিলাম, "ঠাকুরমা আমি বাড়ী যাব।"

ঠাকুরমা বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কেন ? আমি একলা কি করে থাকব ?"

আমি বলিলাম, "তা আমি জানিনা।"

ঠাকুরমা বাবাকে ডাকিয়া বলিলেন—ভোজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় অজিতকে নিয়ে বাড়ী যাস্, ও আর থাকতে চায় না।

বাবা বলিলেন, 'আচ্ছা'।

বিকাল বেলায় শিউলিকে একা পাইয়া বলিলাম, "শিউলি আমি বাড়ী যাচ্ছি।" পড়ন্ত রৌদ্র তার ডালিম-রঙা মুখকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, সে হাসি হাসি ভাবে বলিল। "কেন?"

"ওরা আমায় খেপাচ্ছে, আর মায়ের জন্যে আমার মন কেমন করছে ?"

শিউলি গম্ভীর হইয়া শুনিল, পরে হাসিতে হাসিতে শ্লোক আওড়াইল,

"শাক তুললাম খুঁটেমুটে
বেগুণ তুললাম জালি
শিশু মেয়ের বিয়ে দিয়ে
ঘর করলাম খালি
কচি মেয়ে দুধের সর
কেমনে করবে পরের ঘর ?

বিদায়-কালে তাহার এই ব্যঙ্গ আমার কাছে কঠিন লাগিল, আমি রুষ্ট হইয়া উঠিলাম, রুদ্ধস্বরে বলিলাম, "যাও তোমার সঙ্গে আড়ি।" হাসির বাষ্প-ভরা মেয়ে শিউলি, যতই থামাইতে যাই, ততই তাহার হাসি আর কৌতুক উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, সে পুনরায় বলে,

আড়ি, আড়ি, আড়ি
কোথায় তোমার বাড়ী ?

সাগর দিনু পাড়ি
কেমনে যাবে ছাড়ি ?

এই বলিয়া করুণা-মাখা সুরে আমার পানে চাহিল। ইহার পরে রাগ বা অভিমান চলে না ; আমি বলি, শিউলি আমায় মনে রাখবে ? আমার ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে তোমরা আসবে বুঝলে ত ? বাবাকে বলে তোমাদের নিমন্ত্রণ করাব।"

শিউলি হাসিয়া হাসিয়া উত্তর দেয়। "কিন্তু তোমার বাবা যদি নিমন্ত্রণ না করেন ?—"

"বা ! আমি বললে নিশ্চয়ই করবেন।"

"আচ্ছা তাহলে না হয় যাব, কিন্তু তুমি যদি ভুলে যাও ?"

"না কখনই ভুলব না।"

গল্পে রাজার ছেলে যখন রাক্ষসদের হাত থেকে রাজ-কন্যাকে উদ্ধার করিবেন সংকল্প লইয়া বিদায় নেন, তখন যে শপথের ছড়া বলেন, ঠাকুরমার কাছের শোনা সেই ছড়া পড়িয়া বলিলাম :—

"বলছি তোমায় সত্যি করে
ওগো রাজার ঝি !
ভুলব নাকো ক্ষণিক তরে
ভুলতে পারি কি ?

ছড়ায় উত্তর শুনিয়া শিউলি এবার আমায় মহা-সম্ভ্রম করিল, ধীর মধুর বচনে বলিল, "অজিতদা, আচ্ছা যাব।"

বাবা আমায় খোঁজে আসিয়া পড়িলেন, বাবাকে দেখিয়া মহা-আনন্দে বলিলাম, "বাবা, খোকার ভাতের সময় শিউলিকে নিয়ে যেতে হবে।"

বাবা সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, কিন্তু তুই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে, শেষে রাত্রি হয়ে যাবে।"

কাপড় চোপড় পরিয়া ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া যখন বাহির হইব, তখন দেখি শিউলি হাতে একরাশ পদ্মফুল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে আমাকে পদ্মফুল দিয়া বলিল, "এইবার দুঃখ ঘুচেছে ত ?"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। পদ্ম হারাইয়া যে কি গভীর দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, একমাত্র শিউলিই তাহা অনুভব করিয়াছিল, আমি চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া শিউলি সঞ্জয়কে দিয়ে নূতন ফুল তুলাইয়া আনিয়াছিল। সঞ্জয় শিউলির কাছ হইতে মস্ত কিছু ঘুস লইয়া একাজ করিয়াছিল। শিউলির একটী রবারের পুতুল ছিল সঞ্জয়কে তাই দিয়া সে ফুল যোগাড় করিয়াছিল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন করে আনলে ?

শিউলি হাসিয়া বলিল, "তা শুনে কি হবে অজিত দা !"

এই বলিয়া সে বিদায় লইয়া গেল।

সঞ্জয়ের একজন সঙ্গীর কাছ হইতে সংগ্রহের ইতিহাস পাইলাম। বাড়ী ফিরিবার জন্যে মনে উল্লাস ছিল, কিন্তু শিউলির কথা মনে পড়ায় রাস্তায় নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যের উপাদানের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিলাম।

গোধূলির আলো মিলাইয়া যায় যায়। বাড়ীর মাঠে ছেলেরা তখনও চু-কপাটী খেলিতেছিল, আমরা বাড়ী পৌঁছিলাম।

মা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই অজু সন্দেশ কই ?"

মাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করি নাই ভাবিয়া লাঞ্ছিত হইলাম। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া বলিলাম, "মা তোমার জন্য পদ্ম এনেছি।"

কুটুম্ব-গৃহ হইতে মিষ্টান্ন-দ্রব্যাদি দিয়াছিল, কিন্তু তাহা সংগ্রহে আমি কোনই উৎসাহ দেখাই নাই। মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পদ্ম পেয়ে কি সন্দেশের ক্ষিদে মেটে ?"

আমি লজ্জা-বেপথুমান কণ্ঠে বলিলাম, "এ পদ্ম মা শিউলি দিয়েছে।"

মা বলিলেন, "শিউলি কে ?"

মুস্কিলে পড়িলাম, শিউলির পরিচয় সংগ্রহ করি নাই, তাহার ব্যক্তিত্ব আর নাম দিয়া তাহাকে ধরা যায় না।

আমি বলিলাম, "বড় খাসা মেয়ে শিউলি !"

পাশের বাড়ীর ঠানদি মিষ্টান্নের লোভে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন, তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "কেন তাকে বিয়ে করবি নাকি ?"

আমি রাগিয়া উত্তর দিলাম "দূর !"

শ্রীমতিলাল দাশ

মনের নাশ

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র

ভাঙ্গা-গড়া লইয়া ছনিয়া। বাস্তব জগতেই তাহার সীমা-রেখা নয়—মনোরাজ্যেও বিস্তৃতি। স্বপ্নে যাহা গড়ি জাগ্রত অবস্থায় মুছিয়া যায়; কিন্তু নিঃশেষ হয় কি? ছোপ থাকিয়া যায় কেন? জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা, চিন্তা ও দৃশ্যাদি মুমূর্ষুর হৃদয়েও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—কি হেতু?

কারণ একই। কর্ত্তা ও ক্ষেত্র, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সেই মন।

অনুভূতি ও স্মৃতি মনে, ভাবনাও মনে। গর্ভাশয়ে যেমন জ্রূণের সৃষ্টি, স্থিতি ও বৃদ্ধি, সকল ভাবনার, বাসনার কামনার মূলাধার তেমনই মন। উহার উদ্ভব, ব্যাপ্তি, ব্যঞ্জনা ও বিলয় মনেরই নিভৃত আবাসে।

এই মনকে সঠিক চিনিতে পারিলেই সকল তৃপ্তি-অতৃপ্তি, শান্তি-অশান্তি, সুখ-ছুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি।

কিন্তু চিনায় কে? জ্ঞানই তাহার গুরু। বুদ্ধাবস্থায় সেই জ্ঞানের পূর্ণ উদয়। তখন বৌদ্ধশাস্ত্রমতে না থাকে সংসার না নির্ব্বাণ, শূন্য-বাদের ভিত্তি এই ভাবধারায় সূচিত, দৃঢ়ীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত।

কথাটির আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ত আবশ্যক। বেদান্তের বাণী—জগৎ মিথ্যা, জাগতিক যাহা কিছু সকলই ভ্রমাত্মক—স্বপ্ন, কল্পনা, মায়া। বৌদ্ধেরাও তাহা মানিয়া লইয়া অধিকন্তু বলিতেছেন যাবতীয় পদার্থ ছায়ার তুল্য, আত্মা অলীক কল্পনা।

হর্ষ বিষাদ যেমন কাল্পনিক, ইহাও কি প্রকৃতই তাই? নিশ্চয়ই, যেহেতু উহা বিচার-সহ নয়। মিথ্যা কল্পনার ক্লেশ ভোগ করি—অব্যাহতি লাভের উপায় যে নাই। কল্পনাই মিথ্যা, কল্পনা-জাত ক্লেশও সুতরাং অলীক, বুদ্ধি-ভ্রংশে ভুলের নির্ণয়ে অক্ষম মানুষ, ছুঃখ ভোগও কাজেই অনিবার্য্য।

এই ছুঃখ নিবারণের উদ্দেশ্যেই দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি। লগুড়াঘাতেও মোহ দূর হয় না। চিত্রকর রাক্ষসের চিত্র অঙ্কিত করেন, স্বহস্তে অঙ্কিত সেই চিত্র দেখিয়া নিজেই পরে মূর্চ্ছিত হন; আসক্তি-বহুল বিষয়ে আমরা লিপ্ত হই কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করি বলিয়া। ইহারই নাম সংসার। নির্ব্বোধের মত পঙ্কে ডুবিয়া নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিতে পারি না—বিচার বুদ্ধি যে বিনষ্ট।

যত অনর্থের মূলেই মন। কল্পনার দ্যোতনা তাহারই করতলে; বুদ্ধির বিপাক আনে সেই; বুঝিতে দেয় না যে সব শূন্য, কিছু নাই—এপারে এবং পরপারেও। সংস্কর্ত্তা অথবা মিশ্র পদার্থের উদ্ভব কাল্পনিক ধারণা হইতেই, অতএব একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি সেই মন, মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক জন্ম মৃত্যু প্রকটিত করে, জন্মান্তর-বাদেরও সৃষ্টি করে।

সব ভুল, সব ভূয়া, সবই মেকী! শুদ্ধ জ্ঞান যাহার অধিগত বুদ্ধ তিনিই, সবই তাঁহার কাছে শূন্য। সংসার ও নির্ব্বাণ তাঁহার কাছে অস্তিত্ব বিহীন, সত্যের চরম প্রকাশ তাঁহারই নিকটে। তাবৎ পদার্থই আদিসান্ত, স্বচ্ছ, অপরি-বর্ত্তনীয়, নির্ম্মল। সাধারণ ধারণা যে প্রকৃতই চিত্তের বিকার, মায়ার খেলা তখন তাহা পূর্ণ প্রকট।

সুতরাং মনকে বাঁধিতে পারিলেই সকল ছুঃখের অবসান। মাকড়সা যেমন জাল রচনা করে পাকের পর পাক দেয়, সেই ঘূর্ণীপাকে গিয়া পড়ে কীট পতঙ্গ, 'মনো ছুর্ণিগ্রহং চলং'—চপল ও ছুর্ণিগ্রহ মনও তেমনই কল্পনার খেয়ালে রচনা করে—নব নব আকাঙ্ক্ষার মিথ্যা সৌধ। স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়ের রূপ জাগ্রতাবস্থায় মিলাইয়া যায়, অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে যে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার নিকট হইতে এই জগতও তেমনই সরিয়া পড়ে। তখনই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়—'নেতি' 'নেতি' শুধু নয়, 'নাস্তি' 'নাস্তি' কিছু নাই;—না আত্মা, না সুখ-ছুঃখ, না ষড়রিপু, না মুক্তি।

কে করিল সৃষ্টি এই স্বর্গ-নরক, সপ্তলোক ও পাতাল, পুণ্যফলে মনোরম স্বর্গভোগ, পাপের পরিণামে শাস্তি ও নরক-যন্ত্রণা—বার্দ্ধক্য, পীড়া ও মৃত্যু? কল্পনা ইহার কর্ত্রী, মন কর্ত্তা—বাক্‌জাল ও বৈগুণ্য মায়া ও মরীচিকার স্রষ্টা।

এই মনকে সংযত ও দলিত করিতে সক্ষম হইলে জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় অবিদ্যা পরাভূত হইবে, প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকে স্বরূপের ধারণা জন্মিবে, বুদ্ধাবস্থার উদ্ভব হইবে, তখনই পূর্ণ প্রতিভাসিত হইয়া চরম বোধ জাগিবে—না আছে উৎপদ, না নিরোধ, না উৎপত্তি না বিনাশ, না জন্ম না মৃত্যু, শুধুই বিরাজিত শূন্য-মহাকাশ। আচার্য্য নাগার্জ্জুন 'মহায়নবিংশক' নামক বিংশতি শ্লোকপূর্ণ গ্রন্থে ইহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় ভ্রান্ত ধারণার সলিলে পরিপূর্ণ সংসার-মহাসাগরের পরপারে পৌছিব'র জন্য চাই মহায়নরূপী তরণীর সাহায্য। *

যত উপদ্রব সৃষ্টি করে মন। রাজর্ষি জনক সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তাহারই নির্দ্দেশ করিতেছেন—

> প্রবুদ্ধোঽস্মি প্রবুদ্ধোঽস্মি দুষ্টশ্চৌরো মায়াত্মনঃ।
> মনো নাম নিহন্ম্যেনং মনসাস্মি চিরং হৃত॥

—জাগিয়াছি আমি, চিনিয়াছি চোর কে—আত্মাপহারী এই মন, ইহাকেই বধ করিতে হইবে—এই মনই যে চিরদিন সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে!

> তাবন্নিশীথ বেতালা বল্গন্তি হৃদিবাসনা।
> একতত্ত্ব দৃঢ়াভ্যাসাদ্যাবন্ন বিজিতং মনঃ॥

তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ় অভ্যাসে যতদিন না মনের জয় হয় নানা বাসনা বেতালের মত হৃদয়ে নাচিতে থাকে।

> চিত্তং নাভিঃ কিলাস্যেদং মায়াচক্রস্য সর্ব্বতঃ।
> স্থীয়তে চেত্তদাক্রম্য তন্ন কিঞ্চিৎ প্রবাধতে॥

চারিদিকেই মায়াচক্র, মন চক্রের নাভি। এই নাভিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারেন যিনি, সংসারের কোন কিছুই তাঁহাকে পীড়া দিতে পারে না।

বাশিষ্ঠ রামায়ণ ও মাণ্ডুক্যকারিকা হইতে উদ্ধৃত উপরের তিনটি শ্লোকে মনের স্বরূপ বর্ণনা ও নাশের ব্যঞ্জনা। মনঃ-সংযমের উপায় কি? নাশ কি সংযমেরই উর্দ্ধতন ক্রম মাত্র নয়? চিত্তনাশের উপায় দুইটি—যোগ এবং জ্ঞান। চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ এবং সম্যগ্‌ দর্শনই জ্ঞান। গীতাকার বলেন—'অভ্যাসেন তু বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে'—অভ্যাস ও বৈরাগ্য-সাধনে মনোনাশ সম্ভব। অভ্যাস অবশ্য যোগেরই নামান্তর এবং বৈরাগ্য জ্ঞানের।

পতঞ্জলির আদি সংজ্ঞা—যোগ অর্থে চিত্তবৃত্তির নিরোধ। নিরোধের অভ্যাসে ক্রমিক নাশ এবং অবশেষে লয়প্রাপ্তি। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া ক্রিয়া চালিত করিলে, নানা সোপান অতিক্রম করিলে তবেই সাধনা পূর্ণাঙ্গ, সেই সাধনার সহিত সম্যগ্‌ দর্শন হইতে উদ্ভূত জ্ঞান মিলিত হইলে মনের পরাজয় ও বিনাশ; শাশ্বত শান্তি তাহাতেই। যোগীবর কচ একদা সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া সানন্দে বলিয়াছিলেন—

> "কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।
> আত্মনা পূরিতং বিশ্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা॥

—আমি করিব কি, যাইবই বা কোথায়, গ্রহণ করিবার কি আছে, ত্যাগ করিবই বা কি? মহাপ্রলয়কালে জলরাশি যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত সেইরূপ সারা বিশ্ব ভরিয়া আছেন আত্মা। এই ত বুদ্ধাবস্থা—না সংসার না নির্ব্বাণ।

ইহারই অব্যবহিত পূর্ব্বকার অবস্থা প্রহ্লাদের বীতহব্যের ও রাজা শিখিধ্বজের। অবিচলিত ভাব তাহার দ্যোতক—মহাদুঃখেও সংজ্ঞাহীনের ন্যায় রাজা শিখিধ্বজ তিন বৎসর সমাধিগ্রস্ত। মহিষী চূড়ালার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—পরমপদ হইতেও ব্যুত্থাপিত করিবার মানসে রাজ্ঞী পুনঃপুনঃ সিংহনাদ করিলেন। কিন্তু বিফল প্রযত্ন—রাজা জাগিলেন না, বনের পশুপক্ষী সন্ত্রস্ত হইল মাত্র। রাণী করস্পর্শে নানাভাবে পতির দেহযষ্টি তখন বিচালিত করিতে লাগিলেন। যোগীবর ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু প্রবুদ্ধ হইলেন না।

সাধন-মার্গে এমনই বহুক্রম, বহু স্তর; সোপান অতিক্রম

* চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিতের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রক্ষিত ছিল। সম্প্রতি মনীষী শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বহু আয়াসে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া ও লুপ্ত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের 'মোহমুদ্গরের' ন্যায় শ্লোককয়টিতে জ্ঞানের সারাংশ প্রকটিত—তের শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা বিরচিত।

করিতে হয় অসংখ্য। ভয়ের নিবৃত্তি, দুঃখের নাশ, আত্ম-জ্ঞান ও মুক্তি। ইহাই যদি কাম্য হয়, মনের নিগ্রহ অপরিহার্য্য। নিগ্রহের সমাপ্তিতেই নাশ।

অভ্যাসই পর্য্যাপ্ত নহে। যোগাসনে বারবার উপবেশন করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিলেই মনের জয় হয় না। যদি হইত, যাদুকরেরা জীবন্মুক্ত হইয়া যাইত। প্রাণের স্পন্দন নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে চাই যুক্তি-বিচার, নহিলে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ। অন্ধকার নাশ করিতে হইলে চাই দীপের আলোক, চক্ষে অঞ্জন লাগাইলে তিমির দূর হয় না। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-মূলক বিষয়গুলি অভ্যাসের ক্রম অনুসারে সরিতে থাকে—পর্দ্দার পর পর্দ্দা সরিয়া গেলে যবনিকা-পাত যখন হইবে তখনও মন তালপত্রের খাঁড়া লইয়া জাগিয়া। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অন্তর্লোক আলোকিত করিতে হইবে—ব্যাঘ্র যেমন জলন্ত মশাল দৃষ্টে নিস্তেজ হইয়া পড়ে মনেরও তখন সেই অবস্থা। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি-প্রবাহের পুনঃ পুনঃ উদ্বোধনে মনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী—নাশ তখন আপনা হইতেই সুসম্পন্ন।

মনের স্থিতি ও নাশ আধ্যাত্মিক দিক দিয়া বুঝিবারও প্রয়োজন আছে। দিঙ্‌নির্ণয় সহজেই হয়। ধর্ম্ম দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়ের ও বিষয়ের। উহার নানা শাখাপ্রশাখার বিস্তার ও ভঙ্গিমাকেই মন আপনার বলিয়া চিনিয়া রাখে, তাহাতেই লিপ্ত হইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে। এই সুখদুঃখের অনুভূতি যতক্ষণ, মনের বিদ্যমানতাও ততক্ষণ, ইহা সুস্পষ্ট। সুখদুঃখবোধ তিরোহিত বুঝিতে পারিলেই মনেরও নাশ সম্পাদিত, ইহাও সুপরিস্ফুট। বিপদ-আপদ, দুঃখ-দৈন্য, গর্ব্ব-অহঙ্কার, আশা ও জড়তা, উৎসাহ ও উৎসব এই সমস্তেই সম্পূর্ণ অবিচলিত যিনি, মনের নাশ তাঁহারই ঘটিয়াছে।

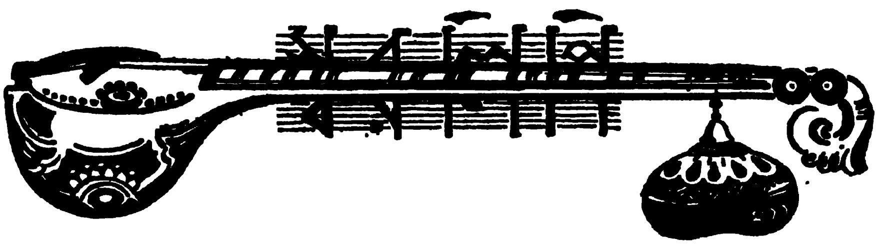
মনের নাশে জীবন্মুক্তি—পুনর্জন্ম হইবে কাহার? বৌদ্ধেরা বলেন—মহাপরিনির্ব্বাণ।

কঠোর তপস্যার ফল অবশ্যই ইহা; কিন্তু এত কৃচ্ছ্র-সাধন ও জ্ঞান আহরণ কেন? দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য? দর্শনের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের চরম ও পরম লক্ষ্য অবশ্য উহাই। কিন্তু কেন?

'সুখ' 'সুখ' করিয়া আমাদের প্রাণান্ত। কোথা সুখ? দুঃখের বেড়াজাল চারিদিকে ঘেরিয়া। এই বেড়াজাল কাটাইবার প্রথম সোপান—বাসনার ক্ষয়, দ্বিতীয় সোপান—মনের সংযম ও নাশ।

শ্রীকালীচরণ মিত্র





দেশ বিহাগ—দাদরা

আজি উতলা মাধবী রাতে
ধীর মৃদুল চরণ পাতে
সুরের আড়ালে কে আসি' দাঁড়ালে
হৃদয়ের আঙিনাতে।
আজি বকুল মালাটি গলে
ওগো পরিয়া এলে কি ছলে,
পবন হয়েছে উদাসী তোমার
নীলঘন অঞ্চলে ;
চকিতে কেমনে ছুঁয়েচ আমার
উন্মন বেদনাতে ?

আজি চঞ্চল দশদিশি
হের, স্বপনে হাসিছে নিশি,
আধেক ছায়ায় আধেক মায়ায়
কি কথা রয়েছে মিশি'।
আজি এ নিশি পোহাবে যবে,
তারি কিছু কি স্মরণে র'বে—
যে গোপন বাণী দিলে মোরে আনি'
কুসুমের সৌরভে,
ঝরা মালা সম গানখানি মম—
লুটাবে কি ভুঁয়ে প্রাতে ?

সুর—শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

কথা—শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ   স্বরলিপি—শ্রীমতী শেফালিকা (ছবি) পালিত

			+				২									০		৩	
সা	সা	II	সা	সপা	পা	।	পা	পমা	মগা	I	গমা	গা	-া	।	-া	গা	মা	I	
আ	জি		উ	ত	লা		মা	ধ	বী		রা-	তে	-		-	ধী	র		

পরা গা মা । গা রা গা I ন্‌রা সা -া । -া -া -া ।
মৃ দু ল চ র ণ পা- তে - - - -

সা স্না গা । গমা পা পনা I না ধর্সা নধা । পক্ষা ধপা মগা I
সু রে র আ- ড়া লে- কে আ- সি- দাঁ- ড়া- লে-

গা মণা ণা । ধা পা পধা I ক্ষা পা -া । -া সা সা II
হৃ দ- য়ে র আ ঙি- না তে - - আ জি

গা মা II পা পনা না । না না নধা । নর্সা র্সা -া । -া র্সা র্সা ।
আ জি ব কু ল মা লা টি- গ- লে - - ও গো

র্সা র্সগা র্গরা । র্রা র্সা নধা I ধনা পা -া । -া -া -া I
প রি- য়া এ লে কি- ছ- লে - - - -

র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সরা র্সা I পা পধা পা । মা গা -া I
প ব ন হ য়ে- ছে উ দা- সী তো মা র

সা রা মা । পা ধা -পধণা I ণা ণা -া । -া -ধপা -া I
নী ল ম ন অঞ্চ- - - - চ লে - - -- -

পা ধা র্সা । র্সরা র্রগা র্গা । র্সা র্সরা র্সা । ণা ণধা -পা I
চ কি তে কে- ম- নে ছুঁ য়ে ছ আ মা- য়্

পা -ধা পা । পা মা মগা I রগা রা -া । -া সা সা II
উ ন্ ম ন বে দ- না- তে - - আ জি

II সা সা সরা । -সা রা গা I মা পা ক্ষা । পা -া -ধা I
আ জি চঞ্চ- - চ ল দ খ দি শি - -

-গা -মা -পা । -গা -মা -রা I -সা -া -া । -া -া -া I

সা সধা ধা । ধা ধা ধা I পধা র্সা ণা । ণা ণধা -পা I
হে র‍্- ষ প নে হা সি- - ছে নি শি- -

পা পধা পা । মা পমা -গা I গা গমা গা । রা সা -ন্‌া I
আ ধে- ক ছা রা- য়্ আ ধে ক মা রা য়্

প্‌া ন্‌া সা । রা রগা রগা I সরা সা -া । -া গা মা I
কি ক ণা র রে ছে মি শি - - আ জি

পা পনা না । না না নধা I নর্সা র্সা -া । -া র্সা র্সা I
এ নি শি পো হা বে- ব- বে - - তা রি

র্সা র্সর্গা র্গা । র্রা র্সা নধা I ধনা পা -া । -া -া -া I
কি ছু- কি স্ব র শে- র বে - - - -

র্সা র্সা র্সর্রা । -র্সা র্সা র্সা I পা পধা পা । মা গা গা I
বে গো প- ন্ বা ণী দি লে- মো রে আ নি

সা রা মা । পা ধা -পধণা I ণা ণা -া । -া -ধপা -া I
কু সু মে র সৌ --- র ভে - - -- -

পা পধা র্সা । র্সর্রা র্গা র্গা I র্সা -র্রা র্সা । র্সণা ণা ণধপা I
ব রা মা লা- স ম গা ন্ খ নি ম ম-

পা পধা পা । মা মা মগা I রগা রা -া । -া সা সা II II
দু টা- বে কি ছু রে প্রা- -ন্তে - - আ জি

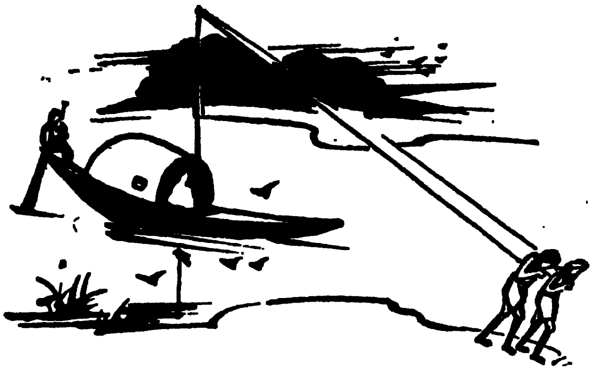
ক'নে ডিঙায় উঠ্‌লো

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

কল্‌মী-লতারা আঁকড়িয়া ধরে,—নৌকার পথ ছাড়িবে না।
ঐ মেয়েটার সাথে যে ওদের আহা কত দিন ধরি' চেনা!
মাঝি লগি ঠেলে।   লগির গোড়ায় ডগা বেধে যায় লাখো লাখো—
লাখো বাহু মেলি' লগির চরণে ডগাগুলো কাঁদে—'রাখো, রাখো—'
মাঝি লগি ঠেলে।   গলুয়ে জড়ায় লক্‌লকে কত হিঞ্চেলতা—
ডিঙা আগু গিয়া পিছাইয়া আসে বুঝি বা বুঝিয়া সে আকুলতা।·····



এই ত পরশু মোচার খোলার মিছামিছি-ডিঙা ভাসোলো জলে
শুক্‌নো সে ডিঙা বড়-ডিঙা পানে তাকাইয়া আছে কৌতূহলে।
মোচার খোলার যে পুতুলটাকে করিয়াছিল ও' দেশান্তরী
হোগ্‌লা-ঝাড়ের আড়ে লুকাইয়া সেও বা কাঁদিছে নয়ন ভরি'।
দেয়ালীর সাঁজে এই খালকূলে কত কত দীপ জ্বালিয়াছে সে—
জলে ভেসে তারা পলাইয়াছিল, আজ কাছাকাছি জুটিল এসে।



মাঝি লগি ঠেলে। আর দুই দাঁড়ি বাঁধালের পথে গুণ টানে—
ডিঙা ত নড়ে না! শেওলা বেধেছে, আর বাধে কিসে,—কোনখানে?
ছাতিম তলায় আঁখি মুছে পিসি, ন' কাকী, পুঁটি ও বৌদিদিরা
নৌকাতে ক'নে, তারি সনে বুঝি আঁখিতে আঁখিতে পড়িল গিরা!
ওরা গুণ টানে।—হিঞ্চে কল্‌মী পট্‌ পট্‌ ছিঁড়ে নৌকা চলে,
আর, ছিঁড়ে যায় মরমের গিঁঠ—শব্দ হয় না—ছাতিম তলে!



ও' পারের ওই গুয়াবন-ঢাকা বাখারির বেড়া কুটীরখানি……
তার খুঁটি ধরে নতুন বৌটি দু'চোখে দিয়াছে আঁচল টানি'।
গত ফাল্গুনে ওরা বিয়া হল; তারি পর হতে পরম্বরী
গুয়াতলী দিয়া আঙিনে ঢুকিল সোনার পুতলী, মরি মরি!
বাপের বাড়ী যে দক্ষিণ-গাঁয়ে, সে পথে তাকায় অনবরত
দখিনের বিল হ'তে চিল উড়ে—তারেও ভাবে সে আপন কত

এপারের মেয়ে বাসন মাজিত, তখন বধূটি আসিত স্নানে
এপারে ওপারে কবে ভাব হ'ল সে কেবল এই খালটি জানে।
নৌকা ছইয়ের ফাঁকে হেরি আজ ওই ক'নেটির সজল আঁখি
কুটীর-বধূর গত ফাগুনের ভোলা-কথা মনে পড়িল বা কি ?
ভারী সাধ হয়, ওরে ডেকে ওর গলা ধ'রে দু'টো কথা বলে—
কথা হ'ল না ত! দরদীর আঁখি দূর হ'তে খালি ভরে জলে।

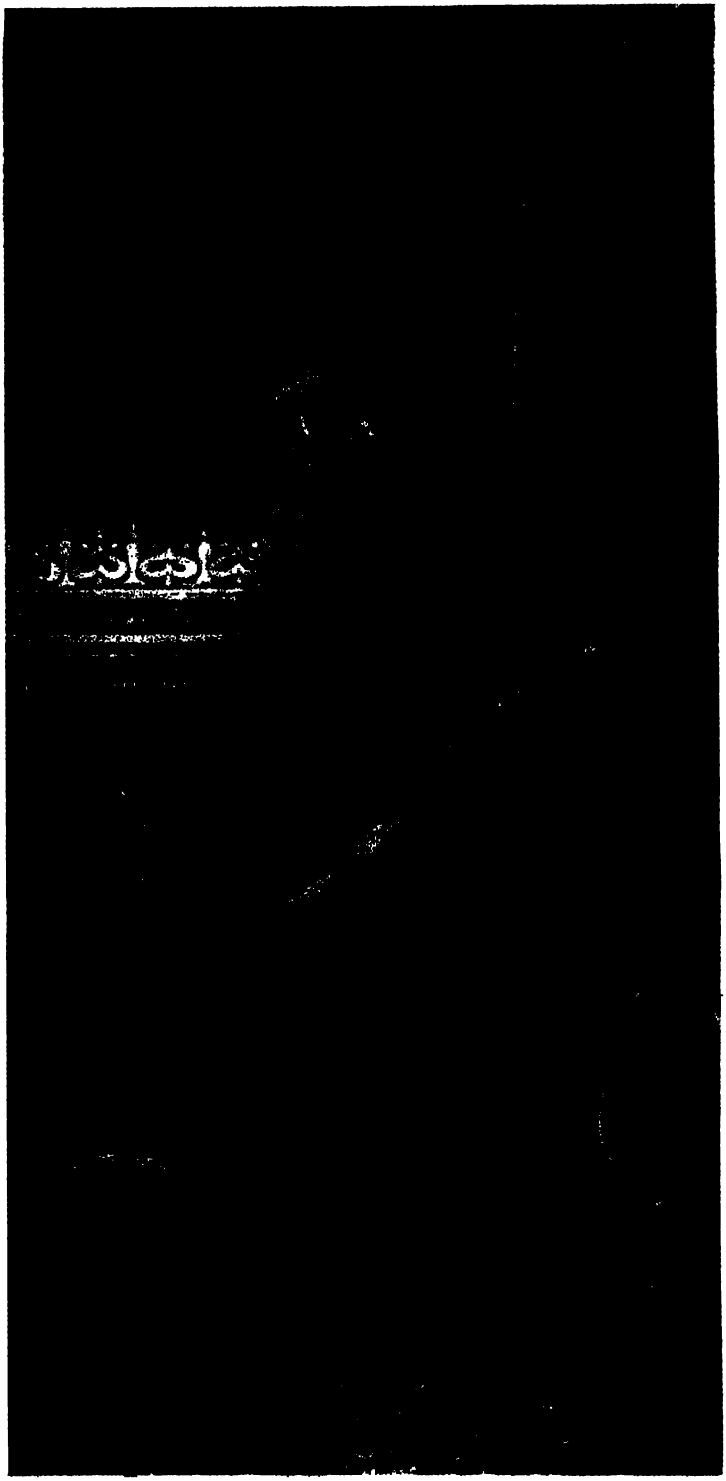


ক'নে কাঁদিতেছে, আর ডিঙা-খোলে টপ্ টপ্ ঝরে আঁখির বারি,
তা' হোক! তাহাতে ডিঙা ডুবিবে না, আঁখি-জল আর কত বা ভারী!
ক'নে কাঁদিতেছে। আর কাঁদে ব'সে বাবলার ডালে শঙ্খ-চিল
খেজুর পাতায় কুচি-কুচি রোদ কেঁপে উঠিতেছে ঝিলিকিমিল্।
বড় জাঙালের কোল-ঘেঁসা পোড়ো বুড়ো অশথের গুঁড়ির কাছে
গরু ছেড়ে দিয়ে কাদের ছেলেটি অমনি একেলা দাঁড়ায়ে আছে।

কবে কেঁদেছিল কোন গেঁয়ো মেয়ে, কবে করেছিল অভিমান
রাখাল ছেলেটি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে গাহিয়া উঠিল সেই গান।
তালগাছগুলি মাথা উঁচু করি চেয়ে দেখিতেছে খাল-ধারে
বেঁটে আমেরা ত দেখিতে পারে না শুধু ডাল নাড়ে বারে বারে
কচি ধান আর আকাশের মেঘ দুই মিতা দূরে গলাগলি
সারা গাঁওখানি তাকাইয়া থাকে—ডিঙা গুটি-গুটি যায় চলি'।

ডিঙা মাঝ-খালে কতদূর গেছে, ঘাটে ব'সে আছে এখনো মা—
ঘাটেতে জননী—মধ্যে অথই—আর নৌকাতে মনোরমা।
ওর চুল রাঙা, ওর মুখ রাঙা, রাঙা রাঙা ওর আঁখি দুটো
ফাঁকায় লেপিয়া গিয়াছে সোনালী সকালের রোদ এক মুঠো!
রাঙা মাছরাঙা পারে উড়ে যায়, রাঙা-মেঘ ভাসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
রাঙা ছায়া প'ড়ে ওর কালো চুল রাঙা হয়ে গেছে কোন ফাঁকে।
কনে কাঁদিতেছে। গালে জল-ধারা! রক্তের মত উহাও লাল,
কূলেতে সানাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুলিয়া তোলে সারা সকাল।

শ্রীমনোজ বসু



জননী

প্রবাসী

বৈশাখ, ১৩৩৮

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

যুগ-সন্ধি

—উপন্যাস—

—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্

৪

প্রভু

একটা শিবিরকে বোল্‌তার চাকের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, বিশেষ ভাবে রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে। রাষ্ট্রের জন্য উদ্বুদ্ধ সৈনিকের দংশনশক্তি শত্রুতাড়নের পর সেনাপতির উপর প্রযুক্ত হইতে দ্বিধা করে না। লাটুর্গ অধিকারী সাহসী সৈনিকগণ এক্ষণে বিভিন্ন ভাব-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল। ল্যান্টিনেক পলায়ন করিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া প্রথমে তাহারা গভেনের বিরুদ্ধে ক্ষাপ্পা হইয়া উঠিল, ল্যান্টিনেকের স্থলে গভেন যখন বন্দীশালা হইতে বাহির হইয়া আসিল তখন খবরটা বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। অমনি সেনাদলের মধ্যে বলাবলি আরম্ভ হইল,—"হুঁ, গভেনের বিচার হচ্ছে! ওতো সব ভুয়ো! ভূতপূর্ব্ব সম্ভ্রান্তগণ আর পাদ্রীর দল, এদেরও আবার কেউ বিশ্বাস করে! এই মাত্র এক ভাইকাউন্ট এক মার্কুইসকে বাঁচিয়ে দিলেন; এখন আবার এক পাদ্রী সেই সম্ভ্রান্ত-বংশীয়কে মুক্তি দিবেন—এই তো হবে"!

কিন্তু যখন গভেনের দণ্ডাদেশ জানা গেল তখন সৈন্যগণের মধ্যে আবার অন্যরূপ গুঞ্জন উত্থিত হইল!

"এ যে ভয়ঙ্কর! আমাদের যুবক অধ্যক্ষ একটা বীরের মতো বীর! না হয় সে ভাইকাউন্টই আছে; আরে তা'তেই তো তা'র প্রশংসা আরো বেশী যে, সে তবু সাধারণতন্ত্রের দলে যোগ দিয়েচে। আর তাকেই চড়ানো হবে গিলোটিনে! পণ্টর্সনের উদ্ধারকর্ত্তা, ডল্ ও লাটুর্গ-বিজয়ী, যা'র বিক্রমে আমরা দুর্দ্ধর্ষ, এই ভেণ্ডিতে যিনি সাধারণতন্ত্রের তরবারী স্বরূপ, তাঁ'র প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে সাহস করে এই সিমুর্দ্যান! কেন, কি জন্যে? না, তিনি এক বুড়োকে বাঁচিয়েছিলেন, যে বুড়ো তিনটি ছেলে মেয়েকে আগুণ থেকে বাঁচিয়েছে"।

এইরূপে বিজয়ী সৈনিকগণ শিবির মধ্যে তাহাদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতেছিল। সকলের ক্রোধ সিমুর্দ্যানকে ঘেরিয়া প্রধূমিত হইতেছিল। একজনের বিরুদ্ধে চারিহাজার লোক—মনে হইতে পারে ইহা একটা প্রচণ্ড শক্তি; বস্তুতঃ তাহা নহে। এই চারি সহস্র সৈনিক জনতামাত্র—আর সিমুর্দ্যান একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি। সিমুর্দ্যানের কুঞ্চিত ভ্রূ সহজেই সৈন্যগণকে সংযত রাখিল। সিমুর্দ্যানের পশ্চাতে কমিটি-অব-পব্‌লিক্ সেফ্‌টির প্রবল প্রতাপ, ইহাতেই সেই কঠোরতার যুগে তাহাকে অধৃষ্য করিয়া তুলিয়াছিল। ক্ষুব্ধ অভিসম্পাত ক্রমে ফিস্‌ফিসানিতে এবং তৎপরে মৌনতায় পর্য্যবসিত হইল।

সিমুর্দ্যানই গভেনের এবং অপর সকলের ভাগ্যের নিয়ন্তা। সকলেই জানে তাহাকে কিছু বলা বৃথা। অপরের অপ্রকৃত ভাবায় বিবেক তাহাকে যাহা বলে সে শুধু তাহাই করে। সামরিক বিচারপতি হিসাবে তিনি যে হুকুম করিয়াছেন, সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি তাহা রদ করিতেও পারেন। একমাত্র তিনিই দয়া দেখাইতে সমর্থ। তাঁহার ক্ষমতা অসীম। একটু ইঙ্গিতে তিনি গভেনকে মুক্তি দিতে পারেন। জীবন-মরণের তিনিই এখন কর্ত্তা। গিলোটিন তাঁহার আদেশবাহী। এই সাংঘাতিক মুহূর্ত্তে তিনিই সর্ব্বক্ষমতাময় প্রভু।

তাহারা শুধু অপেক্ষা করিতে পারে। রাত্রি আসিল।

৫

কারাকক্ষে

বিচার আদালত পুনরায় রক্ষিগৃহে পরিণত হইয়াছে।

রক্ষীর সংখ্যা এখন দ্বিগুণিত। কারাকক্ষের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে ডবল পাহারা।

মধ্যরাত্রে একব্যক্তি প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠনহস্তে হল অতিক্রম করিয়া কারাকক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং শান্ত্রীগণের নিকটে স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিতে আদেশ দিল। ইনি সিমুর্দ্যান।

সিমুর্দ্যান ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার অর্দ্ধোন্মুক্ত রহিল। কক্ষের অভ্যন্তর অনালোকিত, নিঃশব্দ। সিমুর্দ্যান অন্ধকারে এক পা অগ্রসর হইয়া হস্ত-ধৃত লণ্ঠনটি মেঝেতে রাখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। আবছায়ার অন্তরালে কে একজন নিদ্রামগ্ন, তাহার নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। সুষুপ্তির এই শান্তিময় সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সিমুর্দ্যান নীরবে ভাবিতে লাগিলেন।

কারাকক্ষের অভ্যন্তরে দ্বারের বিপরীত দিকে তৃণাস্তৃত মেঝের উপর গভেন শয়ান। তাহারই শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে আগন্তুক আকৃষ্ট হইয়াছিল। গভেন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিমুর্দ্যান তাহার সমীপস্থ হইলেন এবং অপলকনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঘুমন্ত শিশুর পানে, স্নেহাতুরা জননীও বুঝি এমন কোমল দৃষ্টিতে চাহে না। সিমুর্দ্যানের প্রবল ইচ্ছাশক্তিও সে দৃষ্টিকে সংযত করিতে পারিল না। মুষ্টিবদ্ধ হস্তে চক্ষুদ্বয় আবৃত করিয়া সিমুর্দ্যান কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর জানু পাতিয়া গভেনের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার করপল্লব গ্রহণ করিয়া সস্নেহে তাহাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করাইলেন।

গভেন নড়িয়া উঠিল। সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে সে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। লণ্ঠনের স্বল্পালোকে গভেন সিমুর্দ্যানকে চিনিতে পারিল।

"এ কি, আপনি গুরুদেব"! গভেন বলিয়া উঠিল। "আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, যেন মৃত্যু এসে আমার হস্ত চুম্বন করচে"।

সিমুর্দ্যান চমকিয়া উঠিলেন। সহসা যেন তাঁহার মস্তিষ্ক মথিত করিয়া চিন্তার খরস্রোতে ভীষণবেগে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল—সে ঘূর্ণাবর্ত্তে বুঝিবা তাঁহার অন্তরাত্মা নিমজ্জিত হইয়া যায়।

সিমুর্দ্যানের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ কথায় মোটেই ফুটিল না। শুধু তাঁহার মুখ হইতে একটি শব্দ বাহির হইল, "গভেন"!

দুইজন পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল—সিমুর্দ্যানের চক্ষে সেই দীপ্তি যাহাতে অশ্রুর উৎস শুকাইয়া যায়, গভেনের মুখে মিষ্ট হাসি।

কনুইএর উপর ভর দিয়া গভেন মাথা উঠাইল এবং বলিতে লাগিল :—

"আপনার বদনমণ্ডলে যে তরবারীর আঘাতচিহ্ন এখনও রয়েচে, সে আঘাত আমাকে বাঁচাতে গিয়েই আপনি পেয়েছিলেন। গতকল্যও আপনি একেবারে যুদ্ধের সংঘর্ষস্থলে আমার পাশে ছিলেন, তাও আমারই জন্যে। আপনি আমার শৈশবের শয্যাপার্শ্বে এসে না দাঁড়ালে আমি আজ কোথায় থাক্‌তাম্? কোন্ আঁধারে না জানি মিলিয়ে যেতাম। আজ যদি আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবুদ্ধ হয়ে থাকে, সে আপনারই শিক্ষার ফলে। ভুল সংস্কারের শিকলে আমার হাত পা ত জন্মাবধি বাঁধা ছিল, আপনিই সে বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন। আপনারই জন্যে আমি মানসিক স্বাধীনতার মধ্যে বর্দ্ধিত হ'তে পেরেচি। মমীর শবদেহে জীবন সঞ্চার আপনিই তা করেচেন। আমার বিবেক সে ত আপনারই দান। আপনার জন্যই আমার অস্তিত্ব। আমি শুধু "জমিদার" ছিলাম, আপনি আমাকে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন সিটিজেনে পরিণত করেচেন। আপনার শিক্ষায় আমার আত্মার দিব্যজ্ঞান জন্মেচে। সত্য ও আলোকের চাবী আমার হাতে আপনিই দিয়েচেন। প্রভু, গুরু, আপনাকে ধন্যবাদ, আমার সবই আপনার হ'তে"।

সিমুর্দ্যান সেই তৃণশয্যায় গভেনের পাশে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, "তোমার সঙ্গে বসে' খেতে এসেচি, গভেন"।

গভেন কালো রুটিটি ভাজিয়া একখণ্ড সিমুর্দ্যানের হাতে দিল। সিমুর্দ্যান তাহা গ্রহণ করিয়া খাইতে লাগিলেন। তারপর গভেন জলের পাত্রটি আগাইয়া দিল।

সিমুর্দ্যান বলিলেন, "তুমি আগে পান কর।"

গভেন সামান্য পরিমাণ জল পান করিয়া জগ্‌টি তাহার

সঙ্গীর হাতে দিল। সিমুর্দ্যান এক চুমুকে জগের সমস্ত জল নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন।

গভেন আহার্য্য দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতেছিল; সিমুর্দ্যান শুধুই পান করিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছিল যে, একজনের মন শান্ত, অপরের প্রাণে দারুণ জ্বালা! কারাকক্ষে ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। দুইজনে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

গভেন বলিল, "ঘটনাবলী ক্রমেই বিরাট আকার ধারণ কর্‌চে। রাষ্ট্রবিপ্লবের বর্ত্তমান রহস্যপূর্ণ। যবনিকার অন্তরালে যেন কোনো অদৃশ্যশক্তি কাজ কর্‌চে। বিপ্লবের যতটুকু আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেটা বড়ই হিংস্র, নির্ম্মম; আর যা অদৃশ্য তা মহান্। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এটা আমি খুব স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ যে অদ্ভুত, অথচ সুন্দর। অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার প্রয়োজন হয়েচে। এই জন্যেই এই আশ্চর্য্য '৯৩ সাল। বর্ব্বরতার বংশমঞ্চের নীচে সভ্যতার সুন্দর দেবায়তন গড়ে উঠ্‌চে।"

"তা বটে," সিমুর্দ্যান বলিলেন। "অস্থায়ী সামরিক বন্দোবস্ত হ'তেই ক্রমে স্বত্ব ও কর্ত্তব্যের সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়ে উঠ্‌বে। সমানুপাতে কর, বাধ্যতামূলক সামরিক দায়িত্ব, সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যের বিলোপ, এবং সর্ব্বোপরি উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে পক্ষপাতহীন আইনের সরল বিধান। ইহাই সাধারণতন্ত্র।"

গভেন বলিল, "আমার কিন্তু আদর্শমূলক কল্পনার সাধারণতন্ত্রই অধিক ভাল লাগে।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল:—

"গুরুদেব, এইমাত্র আপনি যা' বল্‌লেন তা'র মধ্যে ভক্তি, আত্মবিসর্জ্জন, আত্মবিলোপ, দয়া, প্রেম, স্নেহ এ-সবের স্থান কোথায়? সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন,—বেশ ভাল কথা; কিন্তু সকলকে একসুরে বাঁধ্‌তে পার্‌লে তা' আরও ভালো। ন্যায়ের তুলাদণ্ডেরও উপরে মানব-প্রেমের বীণা। আপনার সাধারণতন্ত্র মাপে, ওজন করে, মানুষের কার্য্য নিয়মিত করে; আমার সাধারণতন্ত্র তাহাকে মুক্ত আকাশে উড্ডীন করে। এই খানেই একটা সিদ্ধান্ত ও দূরগগনবিহারী একটা ঈগল পাখীর মধ্যে পার্থক্য।"

"উড়ে' গিয়ে শুধু, মেঘের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেল বই ত নয়"?

"আর আপনি ত হিসেব নিকেশের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।"

"এক সুরে বাঁধার কথা যা' বল্‌চ, তা'র অনেকখানিই খেয়াল মাত্র।

"আজ্ঞে, বীজগণিতের মধ্যেও খেয়াল-কল্পনার অভাব নেই"।

"আমি জ্যামিতির নিয়মানুসারে মানুষ গঠন কর্‌তে চাই"

গভেন বলিল, "আমার কিন্তু হোমার-অঙ্কিত চিত্রানুরূপ মনুষ্যই অধিকতর পছন্দসই।"

সিমুর্দ্যান ঈষৎ হাস্যমিশ্রিত কঠোর দৃষ্টি গভেনের উপর নিবদ্ধ করিলেন—যদিই বা তদ্দ্বারা সেই ভাবপ্রবণ তরুণ আত্মার উচ্ছ্বাস সংযত করা যায়।

"কাব্য! কবিদের বিশ্বাস কর্‌তে নাই।"

"ঐ উক্তি আমার জানা আছে। তা' হ'লে ত আলো, বাতাস, ফুল, বসন্তের সুরভি-নিশ্বাস, নক্ষত্রের মণিমালা—সবই অবিশ্বাস কর্‌তে হয়।"

"এ সবের কোনটাই মানুষের খোরাক যোগায় না।"

"তা' কি করে' বলা যায়? ভাবও আমাদের শরীর পোষণ করে। চিন্তা করা অনেকাংশে ভোজন করারই মতন।"

"ওসব তত্ত্বকথা রেখে দাও। দুই-আর-দুই এ চার হয়, এ যেমন সুস্পষ্ট, সাধারণতন্ত্রও তেমনই সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য। যা'র যা' পাওনা তা' দিয়ে ফেল্‌লে"—

"যা' তা'র পাওনা নয় সে টুকু দেওয়া তবু বাকী থাকে"।

"তোমার কথার মানে কি?"

"প্রত্যেকেই অপরকে তার দাবীর অতিরিক্ত ছেড়ে দিতে প্রস্তুত না থাক্‌লে সমাজ কি চল্‌তে পারে না"।

"আইনের বাইরে আর কিছু আছে বলে' ত আমি স্বীকার করি না।"

"আইনের বাইরেই ত সব।"

"আমি বুঝি কেবল আইন-সঙ্গত দাবী ও অধিকার।"

"আমার দৃষ্টি আরও উর্দ্ধে।"

"আইনের উপরে আবার কি থাকৃতে পারে?"

"নৈতিক ও স্বাভাবিক দাবী"

মাঝে মাঝে থামিয়া তাহারা যেন ভাবিয়া লইতেছিল।

এইবার সিমুর্দ্যান বলিল,—"ও রকম সাধারণ কথায় চল্‌বেনা, একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পার?"

"তা'ই দিচ্চি। আপনি চান এমন আইন যা'তে আবশ্যক হ'লে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে সৈনিকের কার্য্য করতে বাধ্য করা যায়। আমি—আমি চাই সামরিক দায়িত্ব একেবারে উঠিয়ে দিতে—আমি শান্তির পিয়াসী। আপনি দুঃখীর দুঃখ মোচন করতে ইচ্ছুক; আমি চাই, সংসারে যেন দুঃখের অস্তিত্বই না থাকে। আপনার অভিপ্রায়, আয়ের অনুপাত অনুসারে লোকের উপর কর ধার্য্য হয়; আমি চাই কর একেবারে তুলে' দিতে। ষ্টেটের খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে দিয়ে সমাজের যৌথ উদ্বর্ত্তন থেকে তা' নির্ব্বাহ হয়,—এই আমার অভিপ্রায়।"

"কথাটা আরও খোলসা করে' বল।"

"বল্‌চি, শুনুন। প্রথমতঃ সমাজের পয়ঃশোণিতপুষ্ট অকেজো অঙ্গের—এই যেমন যাজক, বিচারক ও সৈনিক-শ্রেণী এদের—সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। তারপর ধনকে খাটাতে হবে। খানা ডোবায় সার দিয়ে সব ফলিয়ে তুলতে হবে। ফ্রান্সের চারভাগের তিন ভাগ পতিত জমি, এ আবাদ করা চাই। আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক গোচারণ-ভূমি মিছামিছি পড়ে আছে, সেগুলিকে আবাদ করতে হবে। এক একটা গ্রামের জমি সকলের মধ্যে ভাগ করে' দেওয়া হবে যেন প্রত্যেকে সমপরিমাণ চাষের জমি ও বাড়ী পেতে পারে। যা'র যা'র জমি নিজেরা চাষ করবে। তা' হলে দেশের মোট উৎপন্নশস্যের পরিমাণ শতগুণ বেড়ে' যাবে। এখন ফ্রান্সের চাষারা বছরে গড়পড়্‌তায় চার দিন মাংস খেতে পায়; উত্তমরূপে আবাদ হ'লে, ফ্রান্স ৩০ কোটি লোকের অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপের অধিবাসীদের খোরাক যোগাতে পারবে। মানুষের আশ্চর্য্য সহকারী এই জড় প্রকৃতি, অথচ লোকে এর যথেষ্ট কদর করে না। একে যথোপযুক্তরূপে কাজে লাগাতে হ'বে। প্রবহমান বাতাস, প্রতি জলপ্রপাত, চুম্বকশক্তির প্রত্যেক স্ফুরণকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে অসংখ্য শিরা উপশিরা,—তা' দিয়ে জল, তৈল এবং আগুণের স্রোত বইচে। এই সব শিরা ফুটো করে' জলাশয়ের জন্য জল, প্রদীপের জন্য তৈল এবং গৃহচুল্লীর জন্য অগ্নির বন্দোবস্ত করতে হবে। সমুদ্র-তরঙ্গের গতি ও কার্য্য এবং জোয়ার-ভাটার নিয়ম পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে। মহাসাগরের কথা ভাবুন,—একটা প্রকাণ্ড শক্তির আধার, অথচ বর্ত্তমানে বৃথায় সেই শক্তি ব্যয়িত হচ্চে। মানুষ কি বোকা, এই সাগরকে নিজের কাজে লাগাচ্চে না!"

"তুমি যে দেখ্‌চি একেবারে স্বপ্নের পুরো জোয়ারে ভেসে চলেছ।"

"আমি যা বল্‌চি, এর মধ্যে অবাস্তব কিছু নেই।"

তারপর গভেন বলিল, "আর নারী? তা'র সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা?"

সিমুর্দ্যান বলিল, "সে যেমন আছে তা'কে তেমনই থাকৃতে দাও—পুরুষের দাসী।"

"বেশ, কিন্তু এক সর্ত্তে।"

"সেটা কি?"

"পুরুষকেও নারীর পরিচারক হ'তে হবে।"

সিমুর্দ্যান বলিল, "এও আবার একটা কথা? পুরুষ হ'বে পরিচারক? কখনই নয়। পুরুষ সর্ব্বদাই প্রভু। রাজা কেবল এক জায়গায় আমি মানি—সে হচ্চে গৃহে। আপনার ভবনে পুরুষই রাজা!"

"হ্যাঁ, কিন্তু একসর্ত্তে!"

"কি?"

"যে, নারী হবে সেখানকার রাণী।"

"অর্থাৎ তুমি চাও, পুরুষ ও নারীর"—

"সাম্য।"

"সাম্য! একথা কল্পনায়ও আসে তোমার? দুইটি প্রাণী যে একেবারেই বিভিন্ন।"

"আমি বল্‌চি সাম্য—এদের একত্ব কিংবা অভেদ ত আমি বলিনি।"

কিছুক্ষণের জন্য দুইজনেই আবার চুপ করিয়া রহিল। মৌন ভঙ্গ করিয়া সিমুর্দ্যান কহিল, "আর, এদের সন্ততি? তাঁ'দের উৎসর্গ কর্‌বে কাহার কার্য্যে?"

"প্রথমে পিতার—যিনি জনক, তারপর মাতার—যিনি জননী; তারপর শিক্ষকের—যিনি গড়ে' তুলেন, তারপর নগরের—যাহা তাহার সভ্যতার সোপান, তারপর স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির, সর্ব্বশেষে বিশ্বমানবের কল্যাণে।"

"কই, ঈশ্বরের উল্লেখ তো তুমি কর্‌লে না?"

"জনক, জননী, শিক্ষক, নগর, দেশ, বিশ্বমানব—ইহাদের প্রত্যেকটি ভগবৎ-সান্নিধ্য-লাভের সোপানের এক একটি ধাপ।"

সিমুর্দ্যান নীরব।

গভেন বলিতে লাগিল, "সোপানের সর্ব্বোচ্চ ধাপে উঠ্‌তে পারলেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হ'ল। তখন স্বর্গের দ্বার আপনা হ'তেই খুলে' যাবে, প্রবেশ কর্‌লেই হ'ল।"

সিমুর্দ্যান বলিল, "গভেন, পৃথিবীতে ফিরে' এস। যা সম্ভব তাই কর্‌তে আমাদের চেষ্টা করা উচিত।"

"গোড়াতেই এমন কিছু কর্‌বেন না প্রভু, যা'তে সেটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।"

"যাহা সম্ভব সেটা সর্ব্বদাই সাধ্যায়ত্ত।"

"আজ্ঞে, সকল সময় তা' হয় না। কঠোর ব্যবহারে কল্পনার ডিম্ব অকালেই টুটে' যায়। অণ্ডের মতো আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ আর কি আছে?"

"তবু কল্পনাকে জোর করে' বাস্তবের জোয়ালে জুড়ে' দেওয়া আবশ্যক। ভাবের ধোঁয়াকে বস্তুজগতের কর্ম্মময় ব্যাপারে পরিণত করতে হ'বে। তা'তে কল্পনার সৌন্দর্য্য-হানি ঘট্‌লেও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে; আকৃতিতে খর্ব্ব হয়ে পড়লেও উহা প্রকৃতিতে উৎকৃষ্টতর হবে। স্বত্ব ও অধিকার আইনে স্বীকৃত হবে—তা' হ'লেই আইন অমোঘ ও নিরপেক্ষ হইল। ইহাই সম্ভব।"

"আমি বলি, এর চেয়েও অনেক অধিক সম্ভব।"

"আবার তুমি স্বপ্নজগতে বিচরণ করচ।"

"সম্ভব জিনিষটা এক অদ্ভুত বিহঙ্গম, যা সর্ব্বদাই মানুষের মাথার অনেক ঊর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায়।"

"একে ধরা চাই।"

"হ্যাঁ, কিন্তু জীবন্ত।"

গভেন বলিতে লাগিল।—"আমার কথাটা হচ্চে—অবিরাম অগ্রসরণ। মানুষ পিছন পানে চল্‌বে, এটা যদি বিধাতার অভিপ্রায় হ'ত, তা'লে তিনি তা'দের মাথার পশ্চাদ্ভাগে একটা চোখ দিতেন। আমাদের উচিত সর্ব্বদাই ঊষার অভিমুখে, ফোটার দিকে, জন্মের দিকে তাকানো। প্রাচীন বনস্পতির করুণ মর্ম্মর বৃক্ষজীবনের অসমাপ্ত কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য নূতন মহীরুহের নিকট আবেদন মাত্র। প্রতি শতাব্দী তা'র কাজ করে' যাচ্চে—সে কাজ কখনো নাগরিক সভ্যতার উন্নতি, কখনো বা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধন; আজ স্বত্ব-সমস্যা, কাল বেতন-সমস্যা। স্বত্ব এবং বেতন আসলে একই কথা। কিছু না পেলে মানুষ বাঁচতে পারেনা। আমাদের সৃজন করে' ঈশ্বর দেনা করেচেন। স্বত্ব হচ্চে আমাদের জন্মগত পাওনা; আর বেতন দেওয়া মানে নূতন অধিকার লাভ।"

তত্ত্বদর্শী ঋষির ভবিষ্যদ্বাণীর মতো গভেনের কথা গম্ভীর বিশ্বাস ও আন্তরিকতাপূর্ণ, সিমুর্দ্যান অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। তাহাদের সম্বন্ধ এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—ছাত্র এখন শিক্ষকের স্থলাভিষিক্ত।

সিমুর্দ্যান একটু আপত্তির সুরে বলিলেন, "তুমি বড্ডই দ্রুত চলেছ।"

গভেন হাসিয়া বলিল, "হয় তো সেটা আমার সময় সংক্ষেপ বলে'।" তারপর বলিল, "গুরুদেব, একবার চেয়ে দেখুন, আমাদের উভয়ের কল্পনারাজ্যে কত প্রভেদ। আপনি চান সামরিক-দায়িত্ব বাধ্যতামূলক হোক। আমি চাই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে। আপনার স্বপ্ন—পুরুষমাত্রই শিক্ষিত সৈনিক; আমার স্বপ্ন—তা'রা সকলেই—দেশত্রাতা। আপনি তা'কে ভীষণ করে' তুলবার প্রয়াসী; আমি চাই তা'কে চিন্তাশীল করে' তুলতে। আপনার সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তরবারীর উপর; আর আমার"—

একটু থামিয়া গন্তেন বলিল, "আমি সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই মানুষের মনের উপর।"

কক্ষতলে নিবদ্ধদৃষ্টি সিমুর্দ্যান বলিল, "সে দিন আস্‌বার পূর্ব্বে কি কর্‌বে?"

"যা' আছে তাই নিয়ে থাক্‌তে হবে।"

"বর্ত্তমানের উপর তুমি তা' হ'লে কোন দোষারোপ কর না।"

"না।"

"কেন?"

"কারণ, এ একটা ঝটিকা মাত্র। ঝড় তা'র কাজের ফলাফল বোঝে। ঝড়ের বেগে দুই একটা ওক বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, কিন্তু সমগ্র অরণ্যানী তাহাতে স্বাস্থ্যলাভ করে। সভ্যতা মহামারীগ্রস্ত,—রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝঞ্ঝাবায়ু সে বিষবীজ উড়িয়ে দেবে। হয় তো এ ঝটিকা যথেষ্ট সতর্কতার সহিত কাজ কর্‌চে না। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? বড়ই কঠিন কাজ একে দেওয়া হয়েচে। ভয়ঙ্কর দুষ্ট বাষ্পরাশি—এ দূর কর্‌তে প্রবল বাত্যারই প্রয়োজন।"

গন্তেন আরও বলিল,—"কিন্তু দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র থাক্‌লে ঝড় দেখে' ভয় পাবার তো কোনো কারণ নেই। বিবেক ঠিক থাক্‌লে চারিদিকের ঘটনাবলী আমার কি কর্‌বে?"

অপেক্ষাকৃত মৃদু গম্ভীর স্বরে সে আরও বলিল:—

"এমন এক মহাশক্তি আছে যা'র ইঙ্গিতে আমাদের সর্ব্বদাই চল্‌তে হ'বে।"

"কি সে মহাশক্তি?" সিমুর্দ্যান জিজ্ঞাসা করিল।

গন্তেন তাহার অঙ্গুলি মস্তকের উপরে উত্তোলিত করিল। সিমুর্দ্যানের দৃষ্টি সেই ঊর্দ্ধোত্তোলিত অঙ্গুলির অনুসরণ করিল। তাহার মনে হইল যেন সেই খিলানকরা ছাদের ভিতর দিয়া বাহিরের নক্ষত্রোজ্জ্বল গগনমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

উভয়েই পুনরায় নিস্তব্ধ হইল।

সিমুর্দ্যান প্রথমে কথা বলিল।

"সমাজ প্রকৃতিরও উপরে। আমি বলে রাখ্‌ছি, তোমার কল্পনা স্বপ্ন মাত্র—সম্ভাবনার বাহিরে।"

"গন্তব্যস্থল আমি যা' বল্‌চি তা'ই। নইলে সমাজ-গঠনের সার্থকতা কি? আবার আদিম নৈসর্গিক বর্ব্বরতায় ফিরে গেলেই চলে। ওটাহিটি দ্বীপই তা' হ'লে স্বর্গভূম্য বল্‌তে হয়। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন এই স্বর্গের অধিবাসীরা চিন্তা কর্‌তে শেখে নাই। পশুবৎ-বিচার-বুদ্ধিহীন-অধিবাসী-পূর্ণ স্বর্গ অপেক্ষা বুদ্ধিমান-জীব-অধ্যুষিত নরকও বরণীয়। কিন্তু না—নরক চাই না; চাই মানবসমাজ—যাহা প্রকৃতিরও উপরে। নৈসর্গিক অবস্থার উন্নতি সাধন কর্‌তে না পার্‌লে তা'র বাইরে যাবারই বা প্রয়োজন কি? উই পোকা ও মধুমক্ষিকার মতো এক ঘেয়ে গতানুগতিক জীবন যাপন কর্‌লেই হয়—খালি খাটো, খালি খাটো, যে খাটুনীতে বুদ্ধির চর্চ্চা নেই। মৌচাকের যা' অভাব, উই ঢিবির যা অভাব, আমি তা' পূরণ কর্‌তে চাই। আমি চাই কলা, কাব্য, স্মৃতি-মন্দির, বীরত্বের বিকাশ, প্রতিভার স্ফুরণ। চিরকালই বোঝা বইবে, মানুষের নিয়তি তা' নয়। না—না—না; অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, পারিয়া, দাস, নিগৃহীত আর কেউ থাক্‌বে না। মানুষের প্রত্যেকটি বৃত্তি যেন সে যে সত্য—সে যে উন্নতিকামী তা'রই পরিচয় দেয়। মানুষের মন, মানুষের হৃদয়, মানুষের অন্তরাত্মা যেন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নামে সর্ব্বদাই সাড়া দেয়। দূর হোক্ সব বন্ধন! শৃঙ্খলভার বইবার জন্য মানুষ জন্মায় নি; পাখায় ভর করে' অনন্ত আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্যে তা'র সৃষ্টি। সরীসৃপ জীবন তা'র নয়; ধরণীর কীট জীবন্ত কুসুমের মতো প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে' যাক,—এই আমি চাই। আমি চাই"—

বলিতে বলিতে গন্তেনের বাক্যস্রোত সহসা থামিয়া গেল। তাহার চক্ষে অগ্নিশিখার দীপ্তি; ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতেছিল।

কক্ষের দ্বার খোলাই ছিল। বাহিরের নানা প্রকার শব্দ কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিল। দূরে সম্ভবতঃ সৈনিকগণের নিদ্রাভঙ্গসূচক বিউগ লের শব্দ শোনা গেল; তারপর, একসঙ্গে কতকগুলি বন্দুকের গোড়ালী ভূমিতে স্তব্ধ করিবার শব্দ—বোধ হয় পাহারা বদল হইল; তারপর বোধ হইল যেন কারাদুর্গের খুব নিকটে কাঠের বীম ও তক্তা নাড়া চাড়া হইতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া হাতুড়ি পিটানো হইতেছে।

এই সকল শব্দ শুনিয়া সিমুর্দ্যানের মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। তিনি যেন ক্রমেই ভাবনা-সাগরের অতল তলে ডুবিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস যেন আর বহিতেছিল না। সময় সময় তাহার দেহ ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। তাঁহার অক্ষিগোলকে যেন উষার আলোক—ক্রমেই উহা উজ্জলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। তারপর সিমুর্দ্যান জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি ভাব্‌চ গভেন ?"

"আমি ভাব্‌চি ভবিষ্যতের কথা।"

গভেন আবার তাহার চিন্তায় ডুবিয়া গেল। সিমুর্দ্যান তৃণশয্যা হইতে উঠিয়া গেলেন, গভেন তাহা লক্ষ্য করিল না। গভেনের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পশ্চাৎপদ হইতে হইতে সিমুর্দ্যান কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। কারাকক্ষের দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

শ্রীযুক্ত গোপাললাল দে বি-এ

শিরাজের পুষ্পবনে বসোরার গোলাপ উদ্যানে,
যে প্রিয়ার অন্তঃপুর সহস্রেক শত বর্ষ ধরি,
অকস্মাৎ বসন্তের পুঞ্জ শ্যাম সমারোহ গানে,
উদিল সে একদিন বাঙলার কবি চিত্ত ভরি।

স্বপনে কুড়ায়ে তারে কল্পনার রশ্মিজালে ঘিরে,
নিরবধি হেরি তনু, মত্তচিত্ত, পূর্ণ অভিলাষ ;
হেনকালে বসন্তের প্রতিপুষ্পে নিকুঞ্জ মন্দিরে,
হেরি ফুটে' আছে তার দেহ-হীন লাবণ্য-বিলাস !

শিরীষে, অশোকে, নিম্বে, শান্তিলতা, করবী-বিতানে,
কুটজে, গুল্লার কুঞ্জে, টগরেতে গন্ধরাজ-গেহে,
নবীন অশত্থ পাতে, সমীরণে, কোকিলের গানে,
মোর বিশ্বে যাহা হেরি, হেরিয়াছি প্রেয়সীর দেহে।

অন্তরের রাণী আজ চরাচরে পরিব্যাপ্ত জানি,'
অবিরাম জপি নাম ; ইরা, ইরা, ইরাণী, ইরাণী।

আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষার বাহন

শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় পর্ব্ব

ইংরাজী শিক্ষা ও ভাষা সর্ব্বদিক দিয়া আমাদের যে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে তাহা ইহার প্রবর্ত্তকদিগের কল্পনা ও আশার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া, ইহার নিকট আমাদের ঋণের পরিমাণ নির্ণয় আমাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজের সাম্রাজ্য একদিন বিলুপ্ত হইতে পারে। তাহার শাসন ও শোষণ নীতির অবসান ঘটিয়া তাহা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়ীভূত হইতে পারে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মধ্যে যে পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছে, ইংরাজ সাম্রাজ্য বহুদিন বিলুপ্ত হইবার পর পর্য্যন্ত তাহা আমাদের সমাজকে প্রভাবান্বিত ও অনেকাংশে পরিচালিত করিবে। ইংরাজী ভাষা ও তাহার সমৃদ্ধ সাহিত্য গত ৬০।৭০ বৎসরে ভারতীয় মনের যে প্রসারতা সম্পাদন করিয়াছে, বহুদিনকার অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন দেশের মধ্যে যত দ্রুত বর্ত্তমান যুগকে গড়িয়া তুলিয়াছে, অন্য কিছুর দ্বারা তাহা সম্ভব হইত না।

ইংরাজ যখন এদেশে আসে তখন বহির্জগতের সহিত আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছিল। আমাদের পরস্পরের মধ্যে খণ্ড ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়া আমাদিগকে সম্পর্কহীন বহু ছিন্নাংশে বিভক্ত করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে কোনও প্রকারের আদর্শগত সাম্য ছিল না। প্রাচীন সাহিত্য ব্যতীত কোনও সাময়িক সাহিত্য না থাকায় এক প্রদেশের মধ্যেও আদর্শ সাম্যের অভাব ঘটিয়াছিল। যে জ্ঞান একদিন সমস্ত জগৎকে আলোক দান করিয়াছিল, তাহা সে সময় মাত্র পুঁথির পাতায় আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বগতি এবং প্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া মাত্র অন্ধসংস্কারের আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছিল।

মহাত্মা রামমোহন প্রমুখ দূরদর্শী ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত এই মানসিক নির্জীবতা ও পঙ্গুত্ব হইতে উদ্ধারের অন্য পথ নাই। এসিয়ার দীপশিখা বহুদিন হইতেই নির্ব্বাপিত হওয়ায়, ইউরোপের নেতৃত্ব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পরে প্রাচ্যের অন্যান্য জাতিও উন্নতির জন্য এই আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পক্ষেও এই উদ্দেশ্যে ইংরাজী ভাষার সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ দেশীয় বড় বড় ভাষাও সে সময় মাত্র কথ্য ভাষার অধিক মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। অধুনা উন্নত বাংলা ভাষা তখন এতদূর অপরিণত ছিল যে ইহাতে গদ্যের ব্যবহার প্রায় ছিল না বলিলেই হয় এবং নিম্ন-শিক্ষার্থী বালকদিগের উপযোগীও কোনও পাঠ্য পুস্তক ছিল না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সামান্য সাহিত্য ব্যতীত ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগিতে পারে এমন কোনও সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না এবং পাশ্চাত্য চিন্তা ও জ্ঞানধারা বহন করিবার শক্তিও ইহাদের ছিল না। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষে বহু ছোট ছোট ভাষা ছিল (এখনও আছে) যাহার অনেকগুলি লেখা পর্য্যন্ত যাইত না—তাহার সাহায্যে উচ্চ-শিক্ষা দেওয়া ত দূরের কথা। অথচ দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এই সকল ভাষাব্যবহারকারীদেরও শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

সংস্কৃত বা পালীর সাহায্য অবশ্য লওয়া যাইত; কিন্তু তাহাতে প্রাচীন আবহাওয়া দূর হইত না। দেশ অশিক্ষা কুসংস্কার এবং নানাপ্রকার অহিতকর নিষ্ঠুর আচারে পূর্ণ

হইয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞান প্রাণহীন হওয়ায় বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কহীন শুষ্ক পাণ্ডিত্যে পরিণত হইয়া যুক্তিহীন সংস্কারের পরিপোষক হইয়াছিল। কাজেই ইংরাজী ভাষা গ্রহণ ব্যতীত তখন উপায়ান্তর দেখা গেল না।

ইহার প্রবর্ত্তকদিগের সম্বন্ধে একটা কথার উল্লেখ না করিলে তাঁহাদের উপর অবিচার করা হইবে। কোনও বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষার পূর্ণ সুফল যে পাওয়া যাইতে পারে না—সমগ্র জাতির শিক্ষার ব্যবস্থা তাহা দ্বারা করা যে অসম্ভব তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। ক্রমে দেশীয় ভাষাগুলির উন্নতি হইবে এবং তাহাদের সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারিবে, এই স্বপ্ন তাঁহারা দেখিয়াছিলেন। ইহার শেষাংশ না হইলেও প্রথমাংশ অর্থাৎ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির কল্পনা যে অনেকটা সফল হইয়াছে—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন আমাদের ক্রমবর্দ্ধনশীল সাহিত্যকে জনসাধারণের সেবায় নিযুক্ত করা হইবে কিনা তাহা ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব ও চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

ইংরাজী ভাষা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিয়া সমস্ত ভারতবাসীর এক-জাতীয়ত্ব-বোধ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভৌগোলিক সীমার উপর প্রতিষ্ঠিত এই একত্বের চেতনা সম্পূর্ণ নূতন। যুগধর্ম্ম ও পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইহার পরোক্ষ কারণ ও ইংরাজের শাসনে একই প্রকার সুখ দুঃখ ও ব্যবস্থাচক্রের অধীনতা ইহার প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও কার্য্যতঃ ইংরাজী ভাষাই ইহাকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্য হইতে সকল প্রদেশের ভারতবাসীর মানসিক খাদ্য সংগ্রহ হওয়ায় আমাদের মধ্যে আদর্শ ও আকাঙ্খাগত একটা সাম্য স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্য মনীষিগণের চিন্তা ও ভাবধারার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে একটা অপ্রত্যাশিত গতি সঞ্চার করিয়াছে এবং তাহারই ফলে আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির পুষ্টি হইয়াছে।

এখন বিচার্য্য, ইংরাজীর পরিবর্ত্তে বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে আমরা এই সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইব কিনা অথবা আমাদের মানসিক অধোগতি সম্ভব কিনা। তাহা দেখিতে হইলে ইংরাজী ভাষা এই বর্ত্তমানকে কি ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার বিশ্লেষণ আবশ্যক হইবে। ইংরাজী ভাষা দ্বারা পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে স্বীকার করিলে, হয় ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই অথবা তাঁহাদের দ্বারাই ইহা সাধিত হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু সমগ্রদেশের জনসংখ্যার তুলনায় ইহাঁদের সংখ্যা এবং ইহাঁদের শিক্ষার উৎকর্ষ বিচার করিলে কি প্রকারে ইহা সম্ভব হইল তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। সমগ্র বঙ্গদেশের জনসংখ্যা পৌণে পাঁচ কোটি হইলেও ইহার মধ্যের মাত্র কিঞ্চিদধিক সাতলক্ষ লোক ইংরাজী-জানা। সমগ্র ভারতবর্ষে মাত্র ২৫ লক্ষ লোক ইংরাজী জানেন, পুরুষের মধ্যে হাজারকরা ১৬ (ষোল জন) জন ও স্ত্রীলোকের মধ্যে দুইজন মাত্র। ইংরাজীতে বিদ্বান্ অর্থাৎ সত্য সত্য যাঁহারা ইংরাজী সাহিত্য হইতে উপকৃত হইতে পারেন—তাঁহাদের সংখ্যা ইহা হইতে অনেক কম। কোনও ক্রমে ইংরাজীর ২।১টী কথা পড়িতে পারিলে বা ২।১টী কথা লিখিতে পারিলে ইংরাজী শিক্ষার উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহার পর ব্যাপারটি আরও একটু গভীর ভাবে দেখিতে হইবে। ইংরাজী হইতে জ্ঞান আহরণ করিবার মত বিদ্যা যাঁহারা অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও বেশীর ভাগ লোকেই ইংরাজী সাহিত্যের সহিত সংস্রব-শূন্য। আমরা সাধারণতঃ ইংরাজী খবরের কাগজ পড়িয়া, বন্ধুর নিকট ইংরাজীতে পত্র লিখিয়া আমাদের ইংরাজীর চর্চ্চা বজায় রাখি। বর্ত্তমানশিক্ষা-প্রসূত অদ্ভুত মনোবৃত্তি বশতঃ ইহার অশোভনতা ও অস্বাভাবিকতা বুঝিতে পারি না। ইংরাজী দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস এমন কি কথা ও কাব্য সাহিত্যের সহিতও পরিচয় (পাঠ্য ব্যতীত) অধিক লোকের নাই। বস্তুতঃ দেখিতে গেলে অতি সামান্য লোকেই ইংরাজী শিক্ষার উপকার প্রাপ্ত হন। অথচ একথাও সত্য যে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ও মনোভাবকে ইংরাজী শিক্ষাই গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার কারণ, ২।১ জন শক্তি ও প্রতিভাশালী লোকেই তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজের

গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করেন। সাধারণ লোকে চিন্তায়, কথাবার্ত্তায় ও চালচলনে তাঁহাদেরই অনুসরণ করে। ইংরাজী শিক্ষাও এই ভাবেই প্রথমে আমাদের মধ্যে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। পরে আবার এই কারণের সহিত আর একটা কারণও যুক্ত হইয়াছে। ইংরাজী-শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীরা মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। এই সাহিত্য বর্ত্তমানে দরিদ্র নহে। ইহাই আধুনিক চিন্তাধারাকে সমাজের সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত করিয়াছে। এই সাহিত্যই নবযুগকে সুদৃঢ় স্বাভাবিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে। যদি বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজীকে শিক্ষার বাহন না করিয়া ইহাকে মাত্র দ্বিতীয় ভাষারূপে শেখান, তবে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা যে আশঙ্কা করিতেছি সমাজের সেই অগ্রগতি রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ অল্পসংখ্যক প্রতিভাশালী লোক ইংরাজী ও আরও দুই-একটি পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা করিবেনই এবং সমাজ তাঁহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবেই। তাঁহারা নিজেদের জ্ঞানের দ্বারা মাতৃভাষা সমৃদ্ধতর করিবেন,—ফলে তাঁহাদের শিক্ষা দ্বারা সকলেই উপকৃত হইবে। ইংরাজী-শিক্ষাপ্রবর্ত্তনকারীদের এই ইচ্ছা ছিল যে ইংরাজীশিক্ষার ফলে মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হইলে সাধারণ লোকের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ছড়াইয়া পড়িবে। ইঁহাদের এই আশা সফল হইবার সময় আসিয়াছে। বাংলার স্থায়ী ও শিক্ষামূলক সাহিত্য পরিমাণে অধিক না হইলেও ইহার সাময়িক সাহিত্য এত সমৃদ্ধ ও নানাবিষয়ক যে ইহা পড়িয়াই একজন লোক শিক্ষিত পদবাচ্য হইতে পারেন। তাহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত স্থান না পাইলে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ পুস্তক কোনও ভাষাতেই রচিত হইতে পারেনা। অবশ্য একটা ক্ষতির আশঙ্কা সকলেই করিবেন যে ইংরাজীর সহিত কতকটা সংস্রবশূন্য হইলে হয়ত ইহার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না।

আমাদের সাহিত্যের বর্ত্তমানে যাহা অবস্থা—তাহাতে কোনও শক্তিশালী পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত যুক্ত না থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে ইহার দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই। কোনও সাহিত্যই অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া সজীবতা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার বাহন না থাকিলেই কি আমরা ইংরাজীর সহিত সংস্রবশূন্য হইব? মানব-প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্মই হইতেছে যে, বৃহৎ ও শক্তিশালীর সহিত সে যুক্ত থাকিতে চাহে। জ্ঞান ও বিদ্যালাভের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা-বশতঃ বিদ্যাশালী দেশের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে চায়। তাহার প্রমাণ, বিশেষ প্রয়োজন এবং বাহির হইতে উৎসাহ পাইবার কোনও ব্যবস্থা না থাকিলেও এদেশের অনেক লোক ফরাসী এবং জার্ম্মান জানেন এবং তাঁহাদের এই সকল ভাষার জ্ঞানের দ্বারা বাংলা ভাষা পরোক্ষভাবে উপকৃত হইয়াছে। জাপানে শিক্ষার বাহন ইংরাজী অথবা অন্য কোনও পাশ্চাত্য ভাষা নহে অথচ ইউরোপের সহিত জাপানের সম্পর্ক আমাদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। বর্ত্তমান তুরস্ক সর্ব্ব বিষয়ে ইউরোপের শিষ্য কিন্তু এখানেও শিক্ষার বাহন কোনও বিদেশী ভাষা নহে। কোনও প্রকারের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও আমাদের দেশের অনেক লোক সংস্কৃত ও পার্শী শিক্ষা করেন। ইংরাজেরা ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির লোক আমাদের ও অনেক ক্ষুদ্র ও অসভ্য জাতির ভাষাও শিক্ষা করেন। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সংস্কৃতি, বিদ্যা ও চিন্তার ঐক্য আছে তাহার মূলেও পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য কোনও উৎকট বাধ্যবাধকতা নাই। তদ্ব্যতীত মানুষের মনের আর একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, সে তাহার চিন্তা ও জ্ঞানের মূল উৎসের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় রাখিতে চায়। আমাদের বর্ত্তমান মনের গঠন, প্রবৃত্তির ঝোঁক এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষার গতি পাশ্চাত্যের প্রভাব সম্পন্ন। ভারতীয় মন স্বভাবতঃই কৌতূহল, আদর্শ ও প্রেরণার জন্য ইউরোপের দ্বারস্থ হইবে। কিন্তু ইহা হইল ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও প্রকারের বাধ্যতা না থাকিবার অবস্থার কথা। অথচ বর্ত্তমানে অন্ততঃ কিছু দিন পর্য্যন্ত আমরা বাধ্য হইয়াই ইংরাজীর সহিত সংস্রবশূন্য হইতে পারিব না। স্বাধীন ভারতেও ভারতবর্ষের সরকারি সাধারণ ভাষা ইংরাজী হওয়া উচিত হইবে কি না তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। না হইলেও, অন্ততঃ বর্ত্তমানে ইহা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া এবং পরেও ইংরাজী ভাষার সর্ব্বতোমুখী উৎকর্ষ ও এই ভাষাভাষীর সংখ্যাধিক্য (১৬ কোটি) বশতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহার প্রাধান্যের জন্য

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইহাকে বরাবর অবশ্যপাঠ্য দ্বিতীয় ভাষারূপে শিক্ষা দিতে পারিবেন। ইংরাজীর উপর অধিক ঝোঁক না দিয়া সকলকে সামান্য রকম ইংরাজী শিখাইবার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা রাখিয়া উক্ত বিষয়ে যে সকল ছাত্র বিশেষ পারদর্শী হইবেন, শুধু তাঁহাদের জন্য ভালভাবে শিখিবার ব্যবস্থা রাখিতে পারিবেন। ইহাতে এই সুফল পাওয়া যাইবে যে, অধিকাংশ ছাত্র বিদেশী ভাষার নিষ্পেষণের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন এবং এখনও যত ছাত্র ভালভাবে ইংরাজী শিখেন বা উক্ত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন তাঁহাদের সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইবে না। হয়ত ইংরাজীতে সংবাদপাঠকারীদের সংখ্যা কিছু কমিবে,—নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তায় ইংরাজীর মিশ্রণ কমিয়া যাইবে, কিন্তু সত্য সত্য এ দিক দিয়া ইংরাজী শিক্ষা সভ্যতা বা সাহিত্য আমাদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। বরং প্রস্তাবিত পন্থার অধিক সংখ্যক লোকের ইংরাজী ভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা বাড়িবে। কারণ তখন বাংলা ভাষায় তথ্য ও শিক্ষামূলক পুস্তকাদি রচিত হইবে, দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসের ভাল ভাল বই লেখা হইবে, পাশ্চাত্য মনীষিগণের রচনার বাংলা অনুবাদ বাহির হইবে, বাংলা সংবাদপত্রাদির উন্নতি হইবে এবং তাহার ফলে এখন যাঁহারা ইংরাজী না জানার জন্য এই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না, তাঁহাদের সে অসুবিধা দূর হইবে এবং বর্ত্তমানে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা লুপ্ত হইয়া জাতীয় সংহতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

কথা উঠিবে, এ সকল কথা বাংলা দেশের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে এবং বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও হয় ত করিতে পারেন। কিন্তু বাংলা দেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। এখানে কোনও সংস্কারের প্রবর্ত্তন হইলে সমস্ত ভারতকেই তাহা স্পর্শ করিবে। কাজেই কোন প্রস্তাব সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী না হইলে অসুবিধার কারণ হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলার অনুসরণে নিজ নিজ প্রদেশের ভাষা গ্রহণ করিবেন। অথচ অনেক প্রাদেশিক ভাষা এখনও এত অনুন্নত রহিয়াছে যে, তাহাতে উচ্চশিক্ষা প্রদান সম্ভব নহে। অনেকগুলি ভাষা আবার এত অল্প লোকে ব্যবহার করে যে, তাহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেমন অসুবিধার হইবে, তেমনি তাহাদের সহিত কোনও বৃহৎ ভাষার যোগ না থাকিলে তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়াও অসম্ভব হইবে। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, কোনও প্রাদেশিক ভাষা যদি অত্যন্ত শিশু অবস্থায় থাকে তবে সেখানে বর্ত্তমান অবস্থা আরও কিছুদিন চালাইতে হইবে অথবা মাতৃভাষার সহিত নিকট সম্পর্কের কোনও সমৃদ্ধ ভাষাকে আপাততঃ গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সত্বর প্রস্তুত হইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যাঁহাদের ভাষায় লোক সংখ্যা খুব কম তাঁহাদের দ্বিভাষী হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অন্যান্য দেশেও তাহাই হইয়া থাকে। ব্রিটিস্ ওয়েলস্, বেলজিয়াম ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লোকেরা দ্বিভাষী। আর যদি এ সকল অসুবিধা থাকেও, তাহা হইলেও সেজন্য বাংলাদেশের শাস্তিভোগ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। কারণ বাংলা দেশ যদি উন্নতিকর কোনও পন্থা অনুসরণ করিতে পারে তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে আদর্শ ও প্রেরণা যোগাইবে।

এখন এ সম্বন্ধে আর একটা প্রধান আপত্তি এই যে, ইংরাজী ভাষা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে ইহা দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিক ভাবে ছিন্ন হইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়। কারণ, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইলে ইংরাজীতে যাঁহারা বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন তাঁহাদের সংখ্যা না কমিলেও সাধারণের মধ্যে ইংরাজীর প্রসার কমিয়া যাইবেই এবং ফলে বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ লোকেরা পরস্পরের একটা সান্নিধ্যে আসিতে পারিবে না—এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে। সকল প্রদেশের প্রধান সংবাদপত্রগুলি ইংরাজীতে প্রকাশিত হয় বলিয়া প্রদেশগুলির মধ্যে সমসাময়িক ব্যাপার গুলিতে একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে। প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বিত হইলে ইহা কতক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। ব্যাপার এরূপ হইলে রাজনৈতিক হিসাবে আমাদের জাতীয়তা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে, বর্ত্তমানে আমাদের

প্রবেশিকার ছাত্রদের তিনটী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়—, ইংরাজী, মাতৃভাষা ও অপর একটী দ্বিতীয় ভাষা। ইংরাজী যদি দ্বিতীয় ভাষারূপে শিক্ষা করা যায়, তবে চাপ অনেক কমিয়া যাইবে। ফলে, মাতৃভাষা, ইংরাজী এবং অপর একটী ভারতীয় ভাষা অনেকটা ভাল ভাবে বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প সময়ে শেখা যাইবে। যদি সমগ্র ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, একটী মাত্র সাধারণ ভাষার সাহায্যে সংযোগ স্থাপনার ব্যবস্থা না থাকিলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না। কারণ, সকল প্রদেশেরই কতক লোক ইংরাজী, সংস্কৃত ও উর্দ্দু শিখিবেন। ইহাতে বিভিন্ন প্রদেশের এই সকল লোকের মধ্যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিবে। একটী প্রধান ভারতীয় ভাষা অবশ্যপাঠ্য দ্বিতীয় ভাষারূপে যদি আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে স্থান পায় তবে এই সুযোগ আরও অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। বাংলার সকল শিক্ষিত লোককে, কাহাকেও হিন্দী, কাহাকেও তামিল, কাহাকেও তেলেগু, কাহাকেও গুজরাটী, কাহাকেও মারাঠী শিখিতে হইবে। অন্যান্য প্রদেশের লোকদেরও নিজেদের মাতৃভাষা ব্যতীত অপর একটী প্রধান ভারতীয় ভাষা শিখিতে হইবে। এরূপ হইলে প্রদেশগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না এবং এই সম্বন্ধের ভিত্তি অকৃত্রিম ও দৃঢ়তর হইবে। ভারতবর্ষে বহু ভাষা প্রচলিত একথা সত্য, কিন্তু এ জন্য ভারতকে আমরা যতখানি বিভক্ত মনে করি আসলে ততখানি নয়। হিন্দী, বাংলা, তেলেগু পাঞ্জাবী, মারাঠী, তামিল, রাজস্থানী, কন্নাড ও উড়িয়া এই কয়েকটা ভাষায় প্রায় ২৭ কোটী লোক কথা বলে। ইহাদের কতকগুলির মধ্যে অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। বাঙ্গালীর পক্ষে হিন্দী বা মারাঠী বা হিন্দুস্থানীর পক্ষে বাঙ্গালা বা মারাঠী শিক্ষা খুবই অল্প শ্রম এবং সময় সাপেক্ষ। কাজেই সমগ্র দেশের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সংযোগ আছে বলিতে হইবে। ইংরাজ, ফরাসী ও জার্ম্মানী প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই রূপেই সংযোগ রক্ষিত হয়। ইহারা রাজনৈতিক হিসাবে একদল-ভুক্ত না হইলেও ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ মানসিক যোগ আছে।

কিন্তু যে সকল কথা আলোচিত হইল তাহা শিক্ষা সম্পর্কে জাতীয়তার ক্ষতি বৃদ্ধির কথা। ইহাতে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা অথবা শিক্ষার অপকর্ষের সম্ভাবনা আছে কিনা বিচার্য্য।

সর্ব্বপ্রথম পাঠ্য পুস্তকের অভাব। কিন্তু কোনও বিষয় পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে কখনও তাহাতে পুস্তক রচিত হয় না। দেখিতে হইবে সেই ভাষায় পুস্তক রচিত হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা। ইহা বিচার করিবার দুইটী উপায় আছে। ভাষার বর্ত্তমান পুস্তকাদি ও প্রকাশ-ক্ষমতা দেখিয়া তাহার শক্তি নিরূপণ ও সেই প্রকার উন্নতি সম্পন্ন ভাষার নজীর প্রদর্শন। ইতিহাস কথা ও কাব্য সাহিত্যে বাংলায় প্রথম শ্রেণীর মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। দর্শন সম্বন্ধে ভারতীয় ভাষাগুলির ত বিশেষ পারদর্শিতা রহিয়াছে। কাজেই এ সকল বিষয়ে যে অনুবাদ ও পাঠোপযোগী পুস্তক রচিত হইতে পারে তাহাতে সংশয় নাই। এখন কথা হইতেছে বিজ্ঞান লইয়া। বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকও যে বাংলায় একেবারে নাই তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ও উৎকর্ষের দ্বারা বাংলা ভাষার এ বিষয়ে সম্ভাব্যতা নির্ণীত হইবে না। বাংলা ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতার দৈন্য নাই। আটকাইতে পারে পারিভাষিক শব্দের অভাবে। কিন্তু সকল ভাষাতেই পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করিতে হয় বা অন্যভাষা হইতে গ্রহণ করিতে হয়। সংস্কৃত ভাষা বাংলার অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং সংস্কৃতের শব্দ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। তাহার পর অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিবার ক্ষমতাও বাংলার কম নহে। হিন্দী, উর্দ্দু, আরবী, পার্শী হইতে বাংলা বহু শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। ইউরোপীয় একাধিক ভাষা হইতেও বহু শব্দ নিজস্ব করিয়াছে। বাংলা ভাষা প্রয়োজনমত ইংরাজী হইতে শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিবে। কাজেই এ দিক দিয়া আশঙ্কার অধিক কারণ নাই। তাহার পর অন্যান্য ভাষার দৃষ্টান্ত হইতেও ইহার স্বপক্ষেই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দুর সাহায্যে পড়ান হইতেছে। এখানে বি, এ পর্য্যন্ত দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পুস্তকই উর্দ্দুতে অনূদিত হইয়া গিয়াছে। অনুবাদের কার্য্য এখনও চলিতেছে। বোম্বাইয়ে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ চেষ্টা চলিয়েছে। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তারী শাস্ত্র

হিন্দীর সাহায্যে পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। একাধিক ভারতীয় ভাষার পক্ষে যাহা সম্ভব হইতেছে—ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী বাংলার পক্ষে তাহা-সম্ভব হইবেনা কেন? জাপানের বর্ত্তমান সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পূর্ব্বে এই প্রকার অসুবিধাতেই পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু সাহসের সঙ্গে জাপান তাহার সমাধান করিয়াছে, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে।

আর একটা কথা, এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে বিদেশী এমন কি অ-বাঙালী ভারতীয় শিক্ষকদিগের সাহায্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইব এবং পাশ্চাত্য মনীষিগণের নানা বিষয়ক মূল গ্রন্থগুলি আমাদের পড়িবার সুযোগ ঘটিবে না। শিক্ষার উচ্চ বিভাগের পক্ষে কতকটা সত্য হইলেও এ আশঙ্কা এই জন্য অমূলক যে, দ্বিতীয় ভাষারূপে আমরা ইংরাজী শিখিব। কাজেই শিক্ষার উচ্চতম স্তরে যাঁহারা পৌঁছাইবেন তাঁহারা লেখাপড়ার প্রধান অংশ মাতৃভাষায় করিলেও এতটুকু ইংরাজী শেষ পর্য্যন্ত শিখিতে পারিবেন যাহাতে স্বীয় অধীতব্য বিষয়ের ইংরাজী পুস্তকাদি পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন বা প্রয়োজনানুসারে পরিচিত বিষয়ে অধ্যাপকের ইংরাজী বক্তৃতা বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। ইংরাজী যদি অবশ্যপাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা না-ও থাকে তাহাতেও অসুবিধা হইবে না। সমস্ত যোগ্য শিক্ষকের বা কোনও বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের মাতৃভাষা ইংরাজী নয় বলিয়া বর্ত্তমানেও আমরা অনেকটা এই অপরিহার্য্য অসুবিধা ভোগ করিতেছি। পৃথিবীর সকল জাতিকেই এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহার একমাত্র উপায়, যে ছাত্র যে বিষয় অধ্যয়ন করিবেন সে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুস্তকাদি ও পণ্ডিত ব্যক্তি যে দেশের তাঁহাকে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত সেই দেশের ভাষা শিখিতে হইবে, সেই দেশীয় অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে সে দেশে যাইতে হইবে। অন্যান্য দেশেও এ সমস্যার এইরূপ সমাধান হয় কারণ কোনও দেশ বা কোনও ভাষারই সর্ব্ববিষয়ে একচেটিয়া অধিকার নাই। স্বরাজের পর যে সকল বিদেশী অধ্যাপক এদেশে থাকিবেন তাঁহাদের পক্ষে এদেশের ভাষা আয়ত্ত করিয়া লওয়া একেবারে অসাধ্য না হইতে পারে। ভারতীয় ভিন্ন প্রদেশের অধ্যাপকদিগের পক্ষে তাহা ত খুবই সহজ। যে সকল বিদেশী খ্রীষ্টান পাদ্রী এ দেশে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আসেন, তাঁহাদের অনেকেই বেশ ভালভাবেই দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অধ্যাপনার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উচ্চারণ প্রণালীর পার্থক্য তাহার অন্যতম,—যদিও পৃথিবীতে এমন কোনও ভাষা নাই যাহা অন্যূন পাঁচ কোটী লোক ব্যবহার করে, অথচ যাহার উচ্চারণপ্রণালী সর্ব্বত্র সমান। যে ইংরেজী ভাষার স্বপক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শিত হয়—সেই ইংরেজী ভাষার উচ্চারণ-রীতির স্থান বিশেষে এত পার্থক্য আছে যে একস্থানের ইংরাজী-ভাষী লোক অন্যস্থানের ইংরাজী-ভাষী লোকের উচ্চারণ বুঝিতে পারেন না। ইয়াঙ্কির পক্ষে জনবুলের কথা দুর্ব্বোধ্য; * ইংরেজ ও স্কচদিগের উচ্চারণ এক প্রকার নহে এবং এই ভারতবর্ষেও বিভিন্ন প্রদেশের লোকের ইংরেজী উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। আবার একই প্রদেশের সকল লোক একই ভঙ্গীতে ইংরেজী উচ্চারণ করেন না। ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের নানাস্থানের উচ্চারণ-ভঙ্গীর ভিন্নতা সুবিদিত। উহা সত্ত্বেও যখন ইংরাজী চলিতে পারে, নানা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ইংরাজী-ভাষী অধ্যাপকদিগের কথা বুঝিতে যদি কষ্ট না হয়, তবে মাতৃভাষার সম্বন্ধেই বা তাহা বিঘ্ন স্বরূপ বিবেচিত হইবে কেন?

তাহার পর বাংলার নির্দ্দিষ্ট রচনারীতির অভাব। প্রাক্-বঙ্কিম ও অতি-আধুনিক যুগের মধ্যের ব্যবধান বাংলা ভাষার

---

* ইংরাজদিগের উচ্চারণ আমেরিকানদের নিকট কিরূপ অদ্ভুত বোধ হয় নিম্নের উদ্ধৃতাংশ হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

As a conversationist, the Englishman is earnest and fluent, though not always convincing. It is, however, difficult to understand him at times. His accents are so peculiar, and his habit of slurring over certain letters is so common, that a newly-arrived American is not always sure as to what the Englishman is talking about. A cigar store in London, located in Oxford State, has put up the following sign: "American is spoken here."—

Modern Review—March 1931.

ক্রটী স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কথ্য ভাষা সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দূষিত করিয়া ফেলিতেছে, কাজেই ইহা সভ্য সমাজের ও গম্ভীর ব্যাপারের পক্ষে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে—এরূপ কথাও উঠিয়া থাকে। বিভিন্ন যুগের ইংরাজ সাহিত্যিকগণের রচনারীতি ও রচনার বিষয়-বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান। সমসাময়িক লেখক-গণও এসকল বিষয়ে অভিন্ন নহেন। প্রাচীন যুগের কথা বাদ দিলেও এডিসন্ অথবা জনসনের ষ্টাইলের সহিত বর্ত্তমান যুগের টমাস হার্ডি বা এইচ, জি, ওয়েলসের ষ্টাইলের আকাশ পাতাল প্রভেদ। বানান-বিভ্রাটও ইংরাজী সাহিত্যে দেখা দিয়াছে।

বাংলায় প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দী বা উর্দ্দু ভাষী লোক আছেন। বাংলা শিক্ষার বাহন হইলে ইহাঁদের অসুবিধা হইবে এবং যে সকল অ-বাঙালী ছাত্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য বাংলা দেশে আগমন করেন তাঁহারাও বর্ত্তমান সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন—এ প্রকার আশঙ্কাও করা হইয়া থাকে। যে অল্পসংখ্যক লোকের মাতৃভাষা বাংলা নহে, তাঁহাদের সংখ্যা মোটামুটী ২।১টী সহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই সকল স্থানে ইহাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সহজেই করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। বিদেশী ছাত্রের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কখনও কেহ মাতৃভাষাকে খর্ব্ব করিয়াছে, এমন অদ্ভুত কথা কখনও শোনা যায় নাই। বাঙালী ছাত্রেরা যখন বিদ্যা শিক্ষার্থ অন্যদেশে যান তখন তাঁহাদিগকে সেই দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা অধ্যয়ন করিবেন তাঁহাদিগকেও বাংলার ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।

বিশেষ সাহস ও ধৈর্য্যের সঙ্গে আমাদের এই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। সমস্ত নূতন সংস্কারের প্রবর্ত্তক-দিগের যে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির মধ্যে যাইতে হয়, এখানেও তাহা হইবে এবং পৃথিবীর সকল জাতিই যে পন্থার অনুসরণ করিয়া লাভবান হইয়াছে, আমাদের পক্ষেও সম্ভবতঃ তাহা অন্য প্রকার ফল প্রদান করিবে না।

তৃতীয় পর্ব্ব

যে বিষয়েই আলোচনা করা যাউক, সে সম্পর্কে মুসল-মানদিগের বিশেষ সুবিধা-অসুবিধার কথা বিচার না করিলে তাহা অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পার্থিব সকল ব্যাপারের সম্বন্ধ যদিও দেশের সহিত এবং দেশবাসী অন্যান্য জাতির সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত তবুও এ দেশীয় মুসল-মানগণ ধর্ম্মবিশ্বাসকেই এই সকলের মূল ভিত্তি মনে করেন এবং নানা দেশীয় মুসলমানদিগের সহিত কাল্পনিক ঐক্যকেই বড় করিয়া একান্ত অন্ধভাবে নিজেদের স্বদেশীয় অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকের সহিত একটা পার্থক্যের গণ্ডী সৃষ্টি করেন। শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজন হইলে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থা, তাহাদের ভাষা এবং সেই ভাষার সাহিত্যিক সমৃদ্ধি, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং অন্যান্য জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হয়। এ সকল বিষয়েই বাংলার হিন্দুদিগের সহিত বাংলার মুসলমানদিগের যে প্রকার মিল আছে, অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদিগের সহিত এখানকার মুসলমানদিগের তাদৃশ মিল নাই। এক শিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুরা মুসলমানদিগের কিছু অগ্রবর্ত্তী। কিন্তু, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুদের অবস্থার অধিকতর অনুকূল হওয়া এই অগ্রবর্ত্তিতার কারণ নহে। যে জন্যই হউক উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি আগ্রহই ইহার প্রধান কারণ এবং মুসলমানেরা নিজেদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে যাইয়া যে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই পরোক্ষ কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। হিন্দুরা বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইহা মুসলমানদেরও শিখিতে হয়, তাহার পর অন্য প্রদেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় মুসলমানদের ২।১টী ভাষা শিখিতে হওয়ায় ইহাঁরা অতিরিক্ত ভারগ্রস্ত হইয়া পড়েন। মুসলমান-দিগের জন্য বিশেষ প্রাথমিক বিদ্যালয় মক্তাবেও এই ব্যবস্থা অনুসৃত হয়। ইহাই বর্ত্তমানে ইহাঁদের বিদ্যাশিক্ষার পথে বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া আছে এবং পরেও বিশেষ ব্যবস্থার বিঘ্ন উৎপাদন করিবার সম্ভাবনাই অধিক থাকিবে।

প্রধানতঃ রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ঐ ক্ষেত্রে অধিক-তর সুবিধা লাভের আশা হইতেই এই প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য

বিশেষ অধিকার ও সুবিধার দাবী করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সরল বিশ্বাসে সম্প্রদায়ের হিতকল্পে সাধুসংকল্প-প্রণোদিত হইয়াই ইহা করেন। কিন্তু উদ্দেশ্যের সাধুতা ও বিশ্বাসের সরলতা কর্ম্মক্ষেত্রে অপরিহার্য্য হইলেও তাহা আমাদের কর্ম্মফল ও ভবিষ্যৎ শুভাশুভকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। আমাদের প্রেরণা ও আদর্শ যদি আমাদের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়া চলে অথবা সাম্প্রদায়িক মঙ্গলের নেশায় দূরদর্শিতা-বর্জ্জিত হয়, তবে সকল চেষ্টায়ই অদূর ভবিষ্যতে প্রণালীবদ্ধ বিফলতায় পর্য্যবসিত হইবার সম্ভাবনাই প্রবল হইয়া উঠিবে।

কোনও সাম্প্রদায়িক বিশেষ অধিকার দাবী করিবার সময় মুসলমানের একথা মনে রাখা দরকার যে, এই প্রকারের কোনও অধিকারে সাময়িক কিছু সুবিধা থাকিলেও তাঁহারা যে সমগ্র বাঙ্গালী তথা ভারতীয় জাতির অংশ, সেই জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একত্ববোধের বিকাশ লাভে তাহা দুর্নিবার বাধা প্রদান করিবে। কতকগুলি বিশেষ সুবিধা মুসলমানেরা নিজেদের দিকে টানিয়া লইলে, স্বভাবের নিয়মে হিন্দুরা আজই হউক বা কালই হউক নিজেদের দিকে কতকগুলি বিশেষ অধিকার রাখার চেষ্টা করিবেন। এবং পরস্পরের এই দুই বিপরীতমুখী চেষ্টায় দুই সম্প্রদায়ই নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে এমন সংকীর্ণ ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িবেন যে এক মিলিত জাতি গঠিত হইবার আশা লুপ্ত হইবে।

আমাদের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই জাতীয় যে সকল কাজ হইয়াছে তাহার পক্ষে এই সকল কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হইলেও যে-শিক্ষাব্যবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইল তাহার গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং এক্ষেত্রে ইহার ফলও দূরদর্শী হইবে। কারণ মানুষ কাজ করে তাহার মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া এবং শিক্ষাই তাহার মনোবৃত্তি গঠন করে।

আজ হিন্দুদের হইতে মুসলমানের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হওয়ার সত্য কোনও প্রয়োজন আছে কিনা একথাটা উভয় সম্প্রদায়ের মনীষিদিগেরই বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। মুসলমানদিগের জন্য বর্ত্তমান শিক্ষার সর্ব্ব-বিভাগেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা ইহার পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, হিন্দু মুসলমানের জীবনযাত্রা-পদ্ধতির ও প্রকৃতিগত পার্থক্য এত অধিক এবং উভয়ের প্রতিভা এত ভিন্নমুখী যে একই শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর ইঁহাদের মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হইবে না। কিন্তু অন্য প্রদেশের কথা বাদ দিয়া বাংলা সম্বন্ধে এটুকু বলা যাইতে পারে যে শিক্ষিত-দের মধ্যে যদিও বা কিছু পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে, বাংলার পল্লীতে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই। এখানে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বাঙালীর মন ও প্রকৃতি মূলতঃ এক। যে-ভেদ আমরা আপাত দৃষ্টিতে দেখিতে পাই তাহা অতি বাহিরের, মনের গভীর প্রদেশে তাহার স্থান নাই। আলাপ ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, কায়দা কানুন প্রভৃতিতে অনেক কৃত্রিম ভেদের সৃষ্টি হইলেও জাতির অন্তঃপ্রকৃতিকে তাহা স্পর্শ করে নাই। বাংলার যে বিশেষত্ব, বাঙালীর যে স্বাতন্ত্র্য তাহা হিন্দুরও আছে, মুসলমানেরও আছে, অথচ বাঙালী মুসলমান অবাঙালী কোন জাতি বলিয়া অনেকের এত বদ্ধ ধারণা আছে যে অনেক শিক্ষিত ও দায়ীত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির মুখেও মধ্যে মধ্যে শোনা যায় যে, বাংলা মুসলমানের মাতৃভাষা নয়। অথচ সমগ্র ভারতে শুধু একটী মাত্র প্রদেশ আছে যাহার ভাষা দেশগত, শ্রেণীগত নহে। একে ত বহু কৃত্রিম ভেদের সৃষ্টি করিয়া, বহু পার্থক্যের গণ্ডী টানিয়া জাতিকে আমরা শতধা ছিন্ন করিয়াছি—ইহার একমাত্র প্রতিকার ছিল শিক্ষা। ইহা আমাদের জাতীয় একত্ববোধকে জাগরিত করিতে পারিত। কিন্তু এই শিক্ষা-স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা আমরা সেই সম্ভাবনাকেও লুপ্ত করিয়া দিতেছি এবং যেখানে প্রকৃত ভেদ নাই, সেখানে ভেদ সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যৎ অনর্থের সূত্রপাত করিয়া রাখিতেছি। কাজেই সমগ্র বাঙালী জাতির জন্য যে ব্যবস্থা মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে তাহার মধ্যে বাঙালী মুসলমানের জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না। বাংলা ভাষা প্রবর্ত্তন প্রসঙ্গে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আপত্তির মূলে শিক্ষা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র দাবীর বোধ নিহিত রহিয়াছে বলিয়া ইহার অযৌক্তিকতা ও অসারতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন হইল।

কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়াই লওয়া যায়

যে, হিন্দু-মুসলমানের সংস্কার ও প্রতিভা ভিন্নমুখী তাহা হইলেও পৃথক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া এই উভয় সম্প্রদায়কে দুই ভিন্নজাতি করিয়া গড়িয়া তোলা অপেক্ষা বাহার আওতার থাকিয়া এই পার্থক্য ক্রমে মিলাইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করাই উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক হইবে। শিক্ষা-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতীগণ বলিয়া থাকেন নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করিয়া, নিজ বিশিষ্টতার সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া বাঙালী মুসলমানগণ বাঙালীর ঐশ্বর্য্যই বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু কি উপায়ে ইহা সাধিত হইতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। নিজ নিজ বিশিষ্টতার চর্চ্চা করিয়া উভয় সম্প্রদায় পরস্পর হইতে এত পৃথক হইয়া পড়িবেন যে, পৃথকভাবে উভয়ের শিক্ষা ও সভ্যতা উচ্চাঙ্গের হইলেও, তাহার মধ্যে কোনও সংযোগ থাকিবে না, বা তাহাকে সমগ্র বাঙালী জাতির সম্পত্তি বলা যাইবে না। একই দেশে দুই বিভিন্ন হয়ত বা পরস্পর-বিরোধী অনেকাংশে সঙ্কীর্ণ সভ্যতার সৃষ্টি হইতে থাকিবে। অপর পক্ষে যদি এমন কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যেখানে একই শিক্ষালাভ করিয়া, পাশাপাশি বর্দ্ধিত হইয়া একই লক্ষ্যের দিকে একই পথে অগ্রসর হইয়া, পরস্পরের ভাব, প্রকৃতি, মন ও বিশিষ্টতার আদান প্রদান করিয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এক অখণ্ড বাঙালী জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে তবে তাহাতেই জাতির সত্য মঙ্গল সাধিত হইবে। বিশিষ্টতা অর্থে সঙ্কীর্ণতা নহে। দুইজন ভিন্ন প্রকৃতির লোক একই স্থানে বাস করিয়া, একই শিক্ষালাভ করিলে, কাহারও বিশিষ্টতা নষ্ট হয় না—বরং উভয়ের মধ্যে উভয়ের প্রকৃতি সংক্রামিত হইয়া উভয়কেই শ্রেষ্ঠতর মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে ও উভয়ের মধ্যে একটি সংযোগ-সেতু স্থাপন করে। ইহাতে সঙ্কীর্ণতা নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বিশিষ্টতা ও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ব্যবধান অনেক খানি।

তবুও যদি মুসলমানেরা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্রতার দাবী উত্থাপন করেন এবং তাহাতেই মঙ্গল হইবে এরূপ মনে করেন তাহা হইলেও ইংরাজীর পরিবর্ত্তে বাংলার প্রচলন হইলে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায় নষ্ট হইবে না। ইংরাজী শিক্ষার যদি কিছু উপকারিতা থাকে তবে তাহা জাতির সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষেই সমান। যদি ইংরাজী ইসলামীয় সভ্যতা বা চিন্তাধারার বাহন হইত তবে মুসলমানদের পক্ষে ইহার বিশেষ উপযোগিতা থাকিতে পারিত। বর্ত্তমানেও ইংরাজীর মধ্যে দিয়া তাঁহারা ইস্‌লামীয় সংস্কৃতির সহিত যে-সম্বন্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ভবিষ্যতে বাংলার মধ্য দিয়াই তাহা করিতে পারিবেন। বরং ইহাতে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আড়াই কোটীর উপর মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা। মুসলমান লেখকেরা ইহাতে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও ইঁহাদের মধ্যে একাধিক শক্তিশালী লেখক রহিয়াছেন। ইস্‌লামীয় অনেকগুলি ভাষার শব্দভাণ্ডার হইতে ইহার সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইস্‌লামীয় সংস্কৃতির সহিত ইহা ইংরাজীর মত সংশ্রবশূন্য নহে।

বাংলা ভাষায় একশ্রেণী বাঙালী মুসলমানের আপত্তির অন্য এক কারণ এই বলিয়া প্রকাশ যে, ইঁহারা মনে করেন, বাংলার প্রচলন হইলে মুসলমানদের মধ্যে উর্দ্দুর চর্চ্চা কমিয়া যাইবে। উর্দ্দুর প্রতি অত্যধিক প্রীতিই অবশ্য ইহার মূল কারণ। কিন্তু এই সম্পর্কে এই কথাটা বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় উর্দ্দুর যে স্থান আছে বাংলা তাহা গ্রহণ করিবে না। বরং ইংরেজীকে কতকটা স্থানচ্যুত করিবে। সুখের বিষয় সকল মুসলমানই এই প্রকার উর্দ্দুপন্থী নহেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বাংলার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সত্য সত্য উর্দ্দুর প্রতি মুসলমান বাঙালীর বিশেষ আকর্ষণের কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ভারতের বহুলোক উর্দ্দুতে কথা বলেন, এই কারণে যদি উর্দ্দু শেখা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে হিন্দুর প্রয়োজনও এখানে সমানই। বাংলার বাহিরে অধিকাংশ মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দ্দু, এ কারণেও বাংলার মুসলমানের সেদিকে ঝোঁক দিবার কোন কারণ নাই। বাংলার বাহিরে বহু হিন্দুর মাতৃভাষা হিন্দী, রাজস্থানী, মারাঠি এবং অনেক হিন্দু তামিল তেলেগুতেও কথা বলেন,—সেজন্য বাংলার হিন্দুর ত ঐসব ভাষার প্রতি বিশেষ কোন প্রীতি দেখা যায় না। স্বাভাবিক-

ছাত্রের মাতৃভাষা তুর্কী নয় বলিয়া কোন আফ্‌গানীকে ত আক্ষেপ করিতে শোনা যায় নাই। ল্যাটিন ইংরাজের মাতৃভাষা নয় বলিয়া কোন ইংরাজকে লজ্জিত হইতে দেখা যায় না। আবার বাংলার আড়াই কোটী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা বলিয়া অ-বাঙালী কোন মুসলমানের বাংলার প্রতি ত কোন টান দেখি না।

মুসলমানদিগের এ সম্বন্ধে আপত্তির আর একটা কারণ এই যে, ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আমলে তাঁহারা ইহা গ্রহণ না করায় ফলে অনেক বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছেন। অল্পদিন হইতে মুসলমানেরা এই দিকে ঝুঁকিয়াছেন, এখনই যদি ইংরাজী বর্জ্জিত হয় তাহা হইলে, হিন্দু সমাজ ইহার দ্বারা যে প্রকারে উপকৃত হইয়াছে—তাঁহারা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন। পূর্ব্বে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে বোঝা যাইবে যে বাংলা শিক্ষার বাহন হইলেও দ্বিতীয় ভাষারূপে ইংরাজীশিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে এবং মেধাবী ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে ভালভাবে ইংরাজী শিখিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজী সাহিত্যের সহিত বাংলার এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবে যে ইংরাজী শিক্ষার কষ্ট ব্যতিরেকে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই তাহার সুফলের অনেকাংশ পাওয়া যাইবে। ইংরাজী শিক্ষায় মুসলমানেরা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী আছেন বলিয়াই ইংরাজী অপেক্ষা বাংলার সাহায্যে পাশ্চাত্য ভাবধারা সমাজের মধ্যে অনেক অল্প সময়ে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। অতীতে ইংরাজী ভাষা না শিখায় মুসলমানেরা শাসন-বিভাগের সহিত আংশিকভাবে সম্পর্কচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে, ইংরাজী শিক্ষায় পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে রাজনৈতিক হিসাবে তাঁহাদের প্রভূত ক্ষতি হইবে এরূপ আশঙ্কা একান্তই অমূলক। কারণ দেশের সর্ব্বশ্রেণীর পক্ষেই ইংরাজী শিক্ষায় প্রত্যাশিত জ্ঞান মাপ নির্দ্দিষ্ট হইলে কাহারও পক্ষেই ইংরাজী শিখিয়া বেশী সুবিধা পাওয়ার সুযোগ থাকিবে না।

বাংলা শিক্ষার বাহন হইলে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের সুবিধা অধিক হইবে এরূপ আশঙ্কা অনেকে পোষণ করেন। ইঁহারা মনে করেন বাংলায় উচ্চস্তরের পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে হইলে,—বিশেষতঃ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে—বিশেষ [illegible] প্রকাশক ও পারিভাষিক শব্দের জন্য প্রধানতঃ সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হইবে। যে সকল মুসলমান ছেলে সংস্কৃত পড়িবে না তাঁহাদের পক্ষে এই ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইবে, অনেকটা বিদেশী ভাষার ন্যায় শিক্ষা করিতে হইবে এবং উৎপত্তিগত অর্থ জানা না থাকায় অর্থ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইবে না। এই অসুবিধার জন্য অনেক মুসলমান ছেলে বাধ্য হইয়া সংস্কৃত পড়িবেন। মুসলমান সমাজের উপর ইহার ফল মুসলমানদিগের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হইবে না।

উত্তরে বলা যায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংস্কৃত ভাষা হইতেই বাংলার উৎপত্তি। ইহার অত্যন্ত গ্রাম্য বা কথ্যরূপও সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। কাজেই, যাহারা বাংলা-ভাষী তাঁহারা সংস্কৃতের সহিত পরোক্ষভাবে যুক্ত রহিয়াছেন। দু-একটা সংস্কৃত কথা বাংলার সহিত মিশিয়া গেলে সে কথাগুলি আয়ত্ত করা বা তাহার অর্থ বোধ করা কোন বাংলাভাষীর পক্ষে অসুবিধার হয় না। অন্যপক্ষে আবার সংস্কৃতের সহিত বাংলার যতই যোগ থাকুক ইহা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা। অন্য ভাষার সহিত কিছুমাত্র সম্পর্ক না রাখিয়াই ইহা ভালভাবে শেখা যাইতে পারে। সংস্কৃত না জানিয়াও বাংলায় গভীর পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন এরূপ লোকের সংখ্যা সংস্কৃতজ্ঞ বাংলা পণ্ডিতদের অপেক্ষা অধিক। সকল জীবিত ভাষাই কোন না কোন মৃত বা অন্য জীবিত ভাষার সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু তাই বলিয়া কোন ভাষা শিখিবার সময়ে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপরাপর ভাষা অধিক লোকে শিক্ষা করিতে পারে না। বাংলা ভাষায় গভীর ও উচ্চবিষয়ক অথবা বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় রচনায় ভাষা সংস্কৃতাভিমুখী হয় কি না তাহা বিশেষজ্ঞদিগের গবেষণার বিষয় হইতে পারে। শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা বিশেষ বিষয়োপযোগী ভাষার একটি বিশিষ্ট স্তর মাত্র। পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা এবং সংজ্ঞা দ্বারাই, সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে ধারণা জন্মে। প্রত্যেক ভাষাই অপরাপর ভাষা হইতে পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করে এবং উৎপত্তিগত অর্থ না জানিয়াও ভাষা-শিক্ষার্থীরা সেজন্য কোন অসুবিধায় পড়েন না। ইংরেজী ভাষায় পারিভাষিক শব্দ অধিকাংশই গ্রীক ও ল্যাটিন মূল হইতে গৃহীত, কিন্তু অধিকাংশ ইংরেজ বালকই এইগুলি [illegible] [illegible]

আসেন না। এ প্রসঙ্গে স্যাড্‌লার কমিশন আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—"And we suspect that at the root of the objections········lies the the old fallacy that in order to understand fully the meaning of a word we must know its etymology··············The word 'telescope' is used correctly by many sailors, who are entirely ignorant of its Greek derivation,······ ······many words recently introduced into English from French, does not presuppose or require the slightest knowledge of that language."

তাহার পর সংস্কৃত হইতেই যে সকল পারিভাষিক শব্দ সংগৃহীত হইবে এরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই। প্রয়োজন মত অতীতের স্তায় একাধিক মুসলমানী ভাষা হইতে সহজেই আমরা শব্দ গ্রহণ করিতে পারিব। বরং এদিক দিয়া ইংরাজী ও আরও দু-একটী ইউরোপীয় ভাষার নিকট হইতেই আমাদিগকে বেশীর ভাগ ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই সংস্কৃত না শিখিয়াও মুসলমান ছেলেরা কোনও অসুবিধায় পতিত হইবে না।

কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইহাতে হিন্দুদের (যদিও তাহা সম্পূর্ণ অমূলক) অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা হইবে তাহা হইলে কি মুসলমানেরা নিজেদের জন্ত বর্ত্তমান ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিলে এই অসুবিধার হাত হইতে মুক্তি পাইবেন। হিন্দুরা যদি মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন, তবে নিঃসন্দেহে শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইবেন এবং মুসলমানেরা বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষার সকল অসুবিধাই ভোগ করিবেন। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল কল্পিত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা সত্য হইলেও ইংরাজীর তুলনায় সে সকল অসুবিধা একান্তই নগণ্য হইত। বাংলা শিক্ষার বাহন হইলে হিন্দুদের কিছু আপেক্ষিক সুবিধার কথা কল্পনা করিয়া নিজেদের পশ্চাতে পড়িয়া যাইবার ভয়ে ইঁহারা শঙ্কিত হইয়াছেন। ধরিয়া লওয়া গেল, বাংলা ভাষায় মুসলমানদের কিছু অসুবিধা আছে,—তাঁহারা যে বাংলা ব্যবহার করেন, সাহিত্যিক বাংলার সহিত তাহার কিছু পার্থক্য রহিয়াছে, কিন্তু মুসলমানেরা যে ভাষায় কথা বলেন তাহার সহিত ইংরাজীর পার্থক্য আরও অনেক বেশী। কাজেই মাতৃভাষার সহিত শিক্ষণীয় ভাষার পার্থক্যই যদি অসুবিধার কারণ হয় তাহা হইলে ইংরাজী অপেক্ষা বাংলায় অসুবিধা কম হইবে। অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার উপায় হইতেছে মুসলমানদের প্রকৃত মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ইঁহাদের মাতৃভাষা কি তাহার বিচার করিতে গেলেই আপত্তির কৃত্রিমতা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ বলিবেন মুসলমানদের অধিকাংশের বাস পূর্ব্ববঙ্গে। ইঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহা সাহিত্যিক ভাষা ও হিন্দুদের ব্যবহৃত ভাষা হইতে অনেক পৃথক। এই ভাষা মুসলমানী বাংলা নামে খ্যাত এবং ইহার শব্দসম্ভার পারসী ও আরবী হইতে সংগৃহীত। এই ভাষায় লেখা পুঁথি একজন হিন্দু বাঙ্গালী শুনিয়া বুঝিতে পারেন না। কিন্তু কথাটা একটু বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের উচ্চারণ-প্রণালী সামান্ত বিভিন্ন। এই বিভিন্নতা সব ভাষা-ভাষীদের মধ্যে আছে। কিন্তু একই গ্রামের হিন্দু ও মুসলমানের উচ্চারণ বা ভাষায় কোনও পার্থক্য নাই। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের অসুবিধা না হইলে মুসলমানদেরও হইবে না। মুসলমানী পুঁথিতে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহা মুসলমানদেরও কথ্য ভাষা নহে। বিদেশের মুসলমানদের সহিত জাতিত্বের প্রমাণ স্বরূপ মুসলমানেরা এই কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একান্ত কৃত্রিম বলিয়াই এই ভাষার কোনও উন্নতি হয় নাই। এই ভাষা যেমন একজন সাধারণ হিন্দুর দুর্ব্বোধ্য, তেমনি এই ভাষায় অনভিজ্ঞ একজন সাধারণ মুসলমানের নিকটও দুর্ব্বোধ্য। ইহাকেই মুসলমানের মাতৃভাষা মনে করায় বাংলা পড়িতে মুসলমানের অসুবিধা হইবে এরূপ ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক—এবং বাংলা ভাষায় সুবিধা হিন্দু মুসলমান উভয়েই তুল্যরূপে প্রাপ্ত হইবেন।

অনেকের উর্দ্দুর প্রতি একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে বাংলা অপেক্ষা উর্দ্দু

উপযোগিতা যে অনেক কম তাহা দুই এক জন উর্দ্দু্র বিশেষ ভক্তও স্বীকার করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহাতে মুসলমানদের উপর এইজন্য অধিক চাপ পড়িবে যে, ধর্ম্ম ও মুসলমানী সভ্যতার ভাষা স্বরূপে মুসলমানকে আরবী ও পার্শীও পড়িতে হইবে। কিন্তু হিন্দুদেরও ত তেমনি সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত প্রভৃতি পড়িতে হইবে।

মুসলমানেরা তাঁহাদের প্রাচীন সভ্যতা ও ভাবধারার সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। উর্দ্দু্র প্রতি মমত্ব-বোধের অন্যতম কারণ তাহাই। বাংলা ভাষাকে তাঁহারা স্বীকার বা অস্বীকার করুন, সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমান মানসিক পুষ্টির জন্য বাংলা সাহিত্যই পড়িবে। বাংলাকে যদি তাঁহারা গৌরবের আসন প্রদান করেন, ইহাতে সাহিত্য রচনা করেন তবে ইহার সাহায্যেই ইসলামীয় সংস্কৃতি প্রত্যেক বাঙ্গালী মুসলমানের নিজস্ব হইবে। যদি তাঁহারা স্বীয় মাতৃভাষাকে পূর্ণরূপ গ্রহণ করেন তবে একাধারে এই সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান এই উভয় প্রাচীন ও প্রাচ্য ভাবধারার সহিত নবীন ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনে সমৃদ্ধি ও বৈশিষ্ট্যে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিবে।

এই প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক অনেক শিক্ষাভক্ত দূরদর্শী বাঙ্গালী মুসলমান ও ইঁহাদের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান এই পন্থার স্বাভাবিকতা ও যৌক্তিকতা মানিয়া লইয়াছেন এবং স্পষ্ট ভাবে নিজেদের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আশা করা যায় বাংলার সমগ্র মুসলমান সমাজ এই একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ কথাটা বুঝিতে অনিচ্ছুক হইবে না।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

মায়ারি দেশে

৺অচ্যুত ঘোষ

অন্ধকারে ছায়ার পারে
জাগে আমার মায়ারি লোক,
শ্রান্তি সেথা ভুলেছে ব্যথা
ভুলেছে হিয়া দুখেরি শোক,
—সে যে আমার মায়ারি লোক।

অস্তাচলে মেঘের তলে
থামে যেথায় তটিনী-গান,
নীলিম নীলে পরশি দিলে,
পসারি' দিলে উতল প্রাণ—
সেথা আমার থেমেছে গান।

মলয় বায়ে সচল নায়ে
সন্ধ্যা আসি নামিছে যেথা,
সজল ঘন শ্যামল বন
ক্ষণেক থামি কাঁপিছে সেথা—
মলয় আসি' থামিছে হেথা।

আলোর পারে ছায়ার ধারে
সুরেরি রেশ মিলায় এসে,
কাঁদন-ধারা বাঁধন-হারা—
হাসির সাথে এসেছে ভেসে,
স্বপন সম মায়ারি দেশে।

মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে রচিত

বোম্বের মোহ

—বড় গল্প—

—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এম্‌-এ

১৫

কলিকাতা হইতে সোজা বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিলাম। প্রায় সপ্তাহ-ব্যাপী পথক্লেশের পর এক নির্ম্মল প্রভাতে জনবিরল গ্রামপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দুই দিকে শিশির-ভেজা গাছপালার উপর প্রভাতের সুন্দর আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গাছে গাছে পাখীদের নানা রকমের কাকলি।

প্রকৃতি যেমন স্তব্ধ, এখানে মানুষের জীবনও তেমনি শান্ত। কোথায় সেই বোম্বে—যেখানে অট্টালিকার পর অট্টালিকা বিরাট হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ অবিরত অজস্র স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে, যেখানে মিনিটে মিনিটে যানবাহন রাস্তাকে মাতাল করিয়া তুলে;—আর কোথায় এ ছোট্ট গ্রাম, তার কুড়ে ঘর,—তার সাদা মেটো পথ, তার মুষ্টিমেয় অধিবাসী, আর তাহাদের সরল শিথিল জীবনযাত্রা!

আমি বাড়ী আসিয়াছি সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধেরা আসিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। তরুণেরা অসীম কৌতূহল লইয়া আমার সঙ্গ লইল। দুচার দিনের মধ্যে গ্রামের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন মিশিয়া গেল। প্রভাতে একখানি নৌকা লইয়া নদীর উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতাম; দুপুরে মৃদু ঢেউয়ের মধ্যে গা ভাসাইয়া নদীতে স্নান করিতাম; বিকালে গাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া রাখালদের মেঠোসুরের আর মাঝিদের ভাটিয়ালী গান শুনিতাম; সন্ধ্যায় নদীতীরে বেড়াইতাম, আর নূতন শস্যের গন্ধভরা বাতাস প্রাণ আমোদিত করিয়া তুলিত।

জ্যোৎস্না-রাত্রে নদীর ঘাটে একা একা বসিয়া ভাবিতাম, কেন এ শান্তির নীড় ছাড়িয়া বাহির হইলাম? কেন আমি পিতা-পিতামহদের ভিটায় পুরুষানুক্রমিকভাবে অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিলাম না? কেন আটগাঁ ছাড়িয়া ঢাকা গেলাম, কলিকাতা গেলাম, রেঙ্গুন গেলাম, বোম্বে গেলাম? কেন এ সুখের আবেষ্টন ফেলিয়া সুদূরের দুঃখকে বরণ করিতে ছুটিলাম?

ভাবিতাম, আটগাঁ আমার জন্মভূমি, আমার পূর্ব্বপুরুষদের একমাত্র কর্ম্মভূমি। আমি কেন ইহার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিরাট নগরের বিচিত্র জীবনলীলায় যোগ দিতে গেলাম?

কিন্তু এভাব বেশীদিন স্থায়ী হইল না। দুই মাস না যাইতেই মনের নীরব কোণে অসন্তোষের বীজ অঙ্কুরিত হইল। গ্রামের লোকের গতিবিধি আমার কাছে অতিরিক্ত রকম মন্থর বলিয়া মনে হইতে লাগিল; তাহাদের আলাপ আলোচনা অনেকটা অর্থহীন, আলস্য জড়িত, শুধু সময় কাটাইবার ওজুহাত মাত্র বলিয়া বোধ হইল। দেখিলাম, তাহাদের জীবনে উত্তম নাই, উৎসাহ নাই, উল্লাস নাই। তাহাদের চরিত্রে বৈচিত্র্য নাই। তাহাদের চিত্তে সহজ-বৃত্তি আছে, কিন্তু সঙ্কল্প নাই।

ধীরে ধীরে মনের মধ্যে অবসাদ দেখা দিল। একদিন হঠাৎ দেখিলাম, দেহ মনে যেন মরচে ধরিয়া যাইতেছে, সব শক্তি যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

ধীরে ধীরে আবার সহরের ত্রস্ত চঞ্চলতা আমায় আহ্বান করিল; জনতার কোলাহলের স্মৃতি চিত্ত অধীর করিয়া তুলিল। গ্রামে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল।

একদিন প্রভাতে জিনিস-পত্র গুছাইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম।

১৬

কলিকাতা আসিয়া মনের অবসাদের মাত্রাটা বাড়িয়াই

চলিল। সেখানে নিজেকে বড়ই একা মনে করিতে লাগিলাম। চারিদিকে কর্ম্মস্রোত, আমি অলস। এ ভাব দূর করিবার জন্য দিনের পর দিন সহরের সমস্ত সভাসমিতি, আমোদ উৎসবে যোগ দিতে লাগিলাম। কিন্তু সে সবের মধ্যে আমার আরও বেশী করিয়া মনে পড়িতে লাগিল, আমি জগৎ হইতে ছাড়া; স্রোতের পাশে আবদ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মত।

মনে হইল যেন আমি নিজের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য জগতের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু পদে পদে জগৎ আমাকে উপেক্ষার সহিত ফিরাইয়া দিতেছে। যেন নিজের ঝটিকাক্ষুব্ধ চিত্ত হইতে সংসারের শ্যামল তীরের দিকে হাত বাড়াইতেছি, কিন্তু সে হাত আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

একথাটি অতি নিষ্ঠুর হইয়া জাগিল একদিন, যখন অনন্যোপায় হইয়া সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম। সিঙ্গাপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কেইরো পর্য্যন্ত কত সহরের চিত্রগৃহেই না প্রবেশ করিয়াছি। কিন্তু সেবার একদিন কলিকাতার যে অবস্থায় পড়িয়া সিনেমা দেখিতে গিয়াছিলাম, এমনটি আর কোনও দিন হয় নাই।

আমি কলেজ ষ্ট্রীটের একটা সরু গলিতে কেরাণীদের এক মেসে থাকিতাম। সেদিন বিকালে মেসের সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, শুধু আমি ঘরে একা বসিয়া ছিলাম। তখন আমার চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই; চিত্তে যেন কোনও খেদ নাই, কোনও আশা নাই। আমার পিছনে অতীত নাই, সাম্নে ভবিষ্যৎ নাই। শুধু একটা শূন্য বর্ত্তমান চারিদিকে মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করিতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিল। আমি ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। চারিদিকের ঘর বাড়ীগুলি যেন একটা অস্পষ্ট কুহেলিকায় ডুবিয়া গেল। নিজের প্রতি নিজের আতঙ্ক হইতে লাগিল। ভাবিলাম "কি করি ?"

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিলাম; পাইলাম না; সাম্নে একটা খবরের কাগজ পড়িয়াছিল, তাহার উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম সিনেমার বিজ্ঞাপন। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া এসপ্লেনেডের ট্রাম ধরিলাম।

চিত্রগৃহে গিয়া বসিলাম। কিন্তু দারুণ তৃষ্ণায় আমার নিজের হাতের রক্ত চুষিয়া যেমন তৃপ্তি হয় সে সন্ধ্যায় তার চেয়ে বেশী তৃপ্তি আমি পাই নাই।

সিনেমা শেষ হইলে গড়ের মাঠের দিকে গেলাম। মাঠের মাঝখানে ঘাসের উপর শুইয়া পড়িলাম। নির্ম্মল আকাশে তারকা-পুঞ্জ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। তাহারা যেন আমাকে কিছু বুঝাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না।

হঠাৎ ভাবিলাম, আমি নিজের সঙ্গে নিজে এ কি লুকোচুরি করিতেছি! দেহের সারা রক্ত স্পন্দিত হইয়া বলিল, এ কী লুকোচুরি!

নীরব বনপথে যখন দস্যু পথিকের সঙ্গ লয়, তখন দুজনে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে পথ চলে। তারপর পথিক বুঝিতে পারে, এ দস্যু। তবুও স্বাভাবিক ভাবেই পথ চলিতে চেষ্টা করে। জানে, মাঠটা পার হইয়া বনের ধারে গিয়াই তাহার বুকে ছোরা বসাইবে, তথাপি সহজ ভাবেই চলে। বুঝাইতে চায়, যেন সে তাহাকে পথিক বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে, অন্য কিছু মনে করে নাই। কিন্তু হঠাৎ জ্যোৎস্নালোকে পথিকে দস্যুতে চোখাচোখি হয়। দস্যুর ক্রুর দৃষ্টিতে বিজয়ের হাসি ফুটিয়া উঠে। তখন দুজনার স্বাভাবিক পথচলা শেষ হইয়া যায়।

আমারও আজ তেমনি হইল। এতকাল মন প্রাণপণে একটা কঠোর নিষ্ঠুর সত্যকে ফাঁকি দিয়া চলিতেছিল, আজ গড়ের মাঠে নক্ষত্রময় আকাশের তলে তাহা সবলে নিজেকে প্রকাশ করিল।

আমি বোম্বেতে তাহাকে ফেলিয়া আসিয়াছি!

সে তাহার প্রাণের অসীম আবেগ দিয়া আমাকে ভাল বাসিয়াছিল, তাহার কম্পিত কোমল হাতদুটি দিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়াছিল; আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া, পা ছিনাইয়া, চলিয়া আসিয়াছি!

ভাবিলাম, বোম্বের বাড়ীর সামনে ট্যাক্সিতে উঠার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সিনেমায় আসা পর্য্যন্ত, প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে আমার পায়ে সে দৃঢ় কোমল আবেষ্টন অনুভব করি নাই কি?

আজ আগুনের মত আমার পা বেড়িয়া জলিয়া উঠিল,

সেই স্নিগ্ধ-কঠিন স্পর্শ! এক সুন্দরী তরুণীর প্রাণের অসীম ব্যথাভরা বেদনাভরা, আশাভরা একটী কাতর স্পর্শ!

আমি তাহাকে পায়ে ঠেলিয়া আসিয়াছি!

যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলাম, তাহাকে সুদূরে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি!

আকাশের তারকা-লহরীর পানে চাহিতে চাহিতে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, সুন্দর একটি মুখ, অশ্রুভরা, অসীম বেদনায় ম্লান, আমার পানে অসহায় ভাবে চাহিয়া আছে!

বিদ্যুতাহতের মত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

বিদ্রোহী দল যেমন নিরর্থক কোলাহল করিতে করিতে হঠাৎ একটা কর্ম্মের আহ্বান পাইয়া দুর্ব্বার বেগে ছুটিয়া যায়, তেমনই দুরন্তভাবে আমার চিত্ত ঘোষণা করিল,—বোম্বে যাব, তাকে গ্রহণ করব, সে আমার!

১৭

যেখানে স্থির সঙ্কল্প থাকে, আশা থাকে, সেখানে মন চিন্তায় বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত হয় না। চিন্তা বরং তখন মনের একটা বিলাস। ব্যসনের মত ইহাকে নেশার মত করিয়া রাখে।

সেদিন গড়ের মাঠ হইতে ফিরিবার পর তেমনই চিন্তা-জাল আসিয়া বিনিদ্র শয্যার উপর আমাকে জড়িত করিল।

ভাবিলাম, রেবা দামুর সঙ্গে ঘর করিতেছিল, একথায় চিত্ত এত অধীর হইল কেন? চিত্ত অসীম অবজ্ঞাভরে বলিল,—দামু কে? সে তো দুর্দ্দিনের সুযোগ পাইয়া দস্যুর মত তার পতির আসন দখল করিতে চাহিয়াছিল। রেবা কি তাহাকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে? ঘটনা-বিপর্য্যয়ে যদি তাহাকে তাহার সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে হইয়া থাকে, তাহাতে তাহার প্রকৃত চরিত্র ক্ষুণ্ণ হইবে কেন?

মন জোরের সহিত বলিল,—কই তাহার চিত্ত তো স্থির অম্লান রহিয়াছে, দামুর সংস্পর্শ তার সিতোজ্জ্বল জ্যোতিটিকে একটুকুও নিষ্প্রভ করিতে পারে নাই। মন ভাবের স্রোতে বলিয়া যাইতে লাগিল,—যদি বা সে দামুর বিবাহিতা পত্নীই হইত, তথাপি কি আসিয়া যাইত? সে বিবাহের মূল্য কতটুকু?

ভাবিলাম, যেখানে খাঁটি প্রেম, সেখানেই বিবাহ। ইহার বাহিরে, ইহা ভিন্ন বিবাহ নাই।

ভাবিলাম,—মানুষ নিজের ইচ্ছা দ্বারা জোড়া বাঁধিতে পারে, কিন্তু প্রেমই সেই জোড়ার একমাত্র বন্ধন। যেখানে সে বাঁধন নাই, সেখানে চূণহীন ইটের গাঁথনীর মত সে জোড়া আপনা আপনি খসিয়া পড়িবে।

সেদিন মনের সামনে এ কথাটি অতি স্পষ্ট, পরিষ্কার হইয়া উঠিল যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি যতই প্রবল হউক, প্রকৃতির দুর্ব্বার দুর্দ্ধর্ষ নিয়মের কাছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। মানুষ যত যত্নেই সংসার গড়ুক না কেন, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ সেখানে তাহা মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

নীরবে শয্যার উপর শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, পাশের বাড়ীর ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া যাইতে লাগিল।

মনে হইল, প্রকৃতির নিয়ম, 'যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন'। অযোগ্য যোগ্যতরের কাছে পরাস্ত হইবেই। কাপ্তয়ারের শঙ্কররাও ভাবিয়াছিল, রেবা জীবনে মরণে তাহার সম্পত্তি। যতদিন উদ্বর্ত্তনের অবকাশ ছিল না, ততদিন বাস্তবিকই রেবা শঙ্কর-রাওয়ের সম্পত্তি ছিল। মৃত্যুর পরেও তাহার গৃহে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রকৃতির দুর্দ্দম নিয়মে তাহা ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইল, দামুর সঙ্গ লইল। কিন্তু ঐ স্থূলকায় স্থূলবুদ্ধি দামোদর কি তাহার উপযুক্ত স্বামী? প্রকৃতির রাজ্যে কি সেই অপরূপ সুন্দরী তরুণীর স্থান সে পশুপ্রকৃতি যুবকের সঙ্গে? কথনই নয়। প্রকৃতি তাই তাহাকে আমার পাশে পাইয়াই আমার সঙ্গে বাঁধিতে চাহিল। প্রকৃতি যোগ্যতমকে পাইয়াছে, তাই প্রেম এত গভীর, এত সত্য।

ঘড়ী ঢং ঢং করিয়া জানাইল, মধ্যরাত্রি হইয়াছে। কিন্তু তথাপি চিন্তাস্রোত থামিল না। মন পরম উল্লাসের সহিত বলিল,—সমাজে ডিভোর্স চাই, মুক্ত অব্যাহত ডিভোর্স। তাহা না হইলে মানুষের গার্হস্থ্য জীবন প্রকৃতির মুক্ত নির্দ্দেশ পালন করিবে কি করিয়া? আকস্মিক বিদ্যুতালোকে যেমন পথিকের চক্ষুর সামনে হঠাৎ মাঠ, বন, পাহাড়, উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া উঠে, তেমনই নিমেষের মধ্যে যেন একটা গূঢ় সত্য আমার কাছে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করিল।

ভাবিলাম, যে ধারণার বশীভূত হইয়া আমি বিধবাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, সে ধারণা আমাকে স্বামী-বিচ্ছিন্নাকে বা স্বামী-পরিত্যক্তাকে বিবাহ করিতে প্রণোদিত করিবে না কেন? এ দুইয়ে প্রভেদ কোথায়? জীবিতা স্ত্রীর উপর মৃত স্বামীর যে অধিকার, রেবার উপর দামুর মত অপদার্থ ব্যক্তির তার চেয়ে বেশী কি অধিকার আছে? রেবা যে-মুহূর্ত্তে আমাকে ভালবাসিয়াছে, দামোদর সে-মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার নিকট মৃত।

এসব চিন্তার মধ্যে মনের একটা অংশ স্তম্ভিত হইয়া গেল, যেন শঙ্কিত হইয়া এসব যুক্তি শুনিল। তাহারই কোণ হইতে একটা ক্ষীণ কণ্ঠ বলিয়া উঠিল, মানব-সমাজ প্রকৃতির দাস নয়, প্রকৃতির প্রভু; প্রকৃতির হুকুম মানে না, প্রকৃতিকে হুকুম দেয়। জড়-জগতের দিকে চাহিয়া দেখ, সমাজ কেমন ভাবে প্রকৃতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে। তেমনই মনোজগৎকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা তাহার ধর্ম্ম।

সভার ওজস্বী, চিত্তরঞ্জক বক্তার সম্মুখে কোনও প্রতিবাদ-কারী উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে যেমন সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বসাইয়া দেয়, তেমনই করিয়া এ প্রশ্নকে দাবাইয়া দিয়া মনের সতেজ সপ্রতিভ দিক বলিয়া উঠিল,—তা যদি সমাজের ধর্ম্ম হয়, তবে সে ধর্ম্ম আমি চাই না।

মনে হইল, আধুনিক ইউরোপ, আমেরিকা; তাহাদের নূতন সমাজ-গঠন; তাহাদের অক্ষুণ্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা; তাহাদের মুক্ত প্রেম। মনে পড়িল আমেরিকার বিবাহ-আইন সংস্করণ; বলশেভিকের অবাধ দাম্পত্য সম্বন্ধ। আজ আমার কাছে এ সকল অতি সহজ স্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

নিজের মন যাহা চায় তাহা যদি বাহিরের জগৎও সমর্থন করে, তবে একটা স্বাভাবিক তৃপ্তি জাগে। সে কারণেই বোধ হয় সমস্ত চিন্তার শেষে একটা গভীর শান্তি আসিল। বাকী রাত আমাকে আর বিনিদ্রভাবে কাটাইতে হইল না।

যখন ঘুম ভাঙিল, তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। নীচে স্নানের ঝুপ-ঝাপ শব্দ, চাকরদের কাজের কোলাহল। ঘুম ভাঙিয়া মনে হইল কি জানি কেমন একটা মধুর স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিন্তু শুধু স্বপ্নের মাধুর্য্যের ছাপটাই ছিল, স্বপ্ন কি মনে পড়িতেছিল না।

১৮

তারপর যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলাম, তাহা খুবই অস্বস্তির মধ্যে কাটিল। কেন-না তখন আমার মন কলিকাতা ছাড়িয়া আরব সাগর কূলের এক হর্ম্ম্যময় নগরের এক প্রান্তে বিচরণ করিতেছিল। সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইবার জন্ম শুধু দেরী হইল। সে কয়দিন যেন আমি ঠিক প্রবাসীর মত কলিকাতায় বাস করিতেছিলাম। যেন আমার সব কিছু বোম্বেতে, ভারতের পশ্চিম প্রান্তে, এস্থান শুধু দুদিনের আশ্রয়-স্থল। একদিন বিকালে কলেজ-স্কোয়ারের বেঞ্চে বসিয়া এক পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম। বিষয় ছিল, কলিকাতা ও বোম্বে। আমি পরম উৎসাহে কলিকাতা হইতে বোম্বের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতেছিলাম। কলিকাতার গঙ্গা আছে, গড়ের মাঠ আছে, কিন্তু বোম্বের মত সমুদ্র কই, চৌপাটি কোথায়? কলিকাতায় ইডেন গার্ডেন আছে, কিন্তু বোম্বের হ্যাঙ্গিং গার্ডেন ছোট হইলেও চমৎকার। কলিকাতার চৌরঙ্গী, পার্কষ্ট্রীট তো বিদেশীর সমৃদ্ধি ঘোষণা করে, কিন্তু বোম্বের মালাবার হিল দেশী লোকের সম্পত্তি। কলিকাতায় রাস্তাঘাট ভাল, কিন্তু বোম্বের মত সারি সারি ছ'তলা বাড়ী কই?

আমার শ্রোতা আমার স্বদেশ-প্রীতির অভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না, যদি আমাকে কলিকাতা ও বোম্বের প্রকৃত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে হইত, তবে বলিতে হইত, বোম্বেতে রেবা আছে, কলিকাতায় রেবা নাই!

রেবার স্মৃতি এখন আমার সমস্ত মন অধিকার করিয়া বসিল। বাঙালী মহিলাদিগকে দেখিয়া মনে হইত, যেখানে রং জ্যোৎস্নার মত নয়, নাসিকা তুল, তীক্ষ্ণ নয়, দেহ ক্ষীণ ও দীর্ঘ নয়, সেখানে রূপ কোথায়? রঙীন শাড়ী ছাড়া নারীর পোষাক হইতে পারে? আর সে শাড়ীতে যদি জামা না

রহিল, তাহা তো তাহা দেহের বেষ্টন নয়, তাহার আচ্ছাদন মাত্র।

সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা আসিলে বোম্বে যাওয়ার আয়োজন করিলাম। চিত্ত যে কেমন করিয়া এত সবল হইয়া উঠিল তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। মনে হইল, নিজের ভিতরে কোন্ শক্তি কি ভাবে ক্রিয়া করিতেছে, তাহার সন্ধান কতটুকু বা জানি? আমি মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলাম যে, আমার বিচার-শক্তি সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আমার জন্ত সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, প্রকৃত পথ খুঁজিয়া দিয়াছে,—কিন্তু কে জানে সে যুক্তির প্ররোচনা, না তাহা অপেক্ষা প্রবলতর কোনও মনোবৃত্তির প্রেরণা, যাহাকে যুক্তি শুধু নিজের মান বজায় রাখিবার জন্ত আগলাইয়া রাখিতে চায়?

১৯

আষাঢ়ের এক বৃষ্টি-সিক্ত অপরাহ্নে কলিকাতা ছাড়িয়া যাত্রা করিলাম। হাবড়ার প্ল্যাটফর্ম হইতে যখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল, তখন সমস্ত দেহের ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। আমার উচ্ছ্বসিত হৃদয় মুক্তির আনন্দে মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন আমি আমার পুরাতন সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙিয়া প্রাণের সার্থকতা লাভ করিতে ছুটিয়াছিলাম।

কলিকাতায় পড়িবার সময় একবার আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানমন্দিরে একটা অভিনব ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। আচার্য্য যন্ত্র-সংযোগে দেখাইয়াছিলেন, একটা পাতাকে গাছ হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া মাত্র তাহাতে কেমন মুহুর্মুহুঃ স্পন্দন হইতে থাকে। আজ হয়ত আমার জীবনপত্র সমাজবৃক্ষ হইতে ছিন্ন হইয়া তেমনই ক্ষিপ্রভাবে স্পন্দিত হইতেছিল!

ষ্টেশনের রেল-লাইনের জটিল আবেষ্টন ছাড়াইয়া যখন গাড়ী বাহিরের খোলা মাঠে আসিয়া পড়িল, তখন আমার মনে সমুদ্রমত একটা আনন্দলহরী খেলিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম প্রতিমুহূর্ত্তেই আমি রেবার নিকটবর্ত্তী হইতেছি; প্রত্যেক দুই মিনিটে বারো তেইশ মাইলের ব্যবধানের এক একটা মাইল কমিয়া কমিতেছে। সহযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলিবার সময় একটা অব্যক্ত পুলক আমার অভিব্যক্তো ফুটিয়া উঠিতেছিল,—তাহা আমি বুঝিয়াও গোপন করিতে পারিতেছিলাম না।

সন্ধ্যায় গাড়ী টাটানগর অতিক্রম করিয়া গেল। তারপর বেঞ্চে শয্যা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম।

এ ভাবনা আকাশ-কুসুম রচনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভাবিলাম, রেবাকে বেশ ভদ্রসঙ্গতভাবে এক "সমাজের" সাহায্যে বিবাহ করিব। বিবাহের পর বোম্বের বাহিরে একটা বাড়ী লইব। সেখানে দুজনে নিবিড় শান্তিতে থাকিব। সকালে বিকালে সমুদ্রতীরে দুজনে বেড়াইতে যাইব। দুপুর বেলা আমি যখন আফিসে বাহির হইব, তখন রেবা জানালা হইতে ঝুঁকিয়া আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে। গ্রান্ট স্ট্রীটের সুন্দর বাগান-ঘেরা একটি বাড়ীর কথা মনে হইল। কল্পনায় দেখিলাম, সেই বাড়ীর উপরের জানালার পর্দ্দা সরাইয়া রেবা নীচের দিকে চাহিয়া আছে, আমি সম্মুখের রাস্তা দিয়া ষ্টেশনের দিকে দ্রুতপদে চলিয়াছি। সন্ধ্যায় সে-গৃহের দীপোজ্জ্বল কক্ষে রেবা প্রাণ খুলিয়া গান গাহিবে, আমি বসিয়া মুগ্ধ হইয়া শুনিব। বিশেষ করিয়া রেবা আমার শেখানো বাঙলা গানগুলি গাহিবে, তাহার মধুর বিদেশী কণ্ঠে বাঙলা পদগুলি অপূর্ব্ব লালিত্যে ভরিয়া উঠিবে,—যেমন করিয়া খেতওয়াড়ীর বাড়ীতে উঠিত!

ভাবিলাম, কে জানিবে সে কে? আমি কে? বিশ্বের এককোণে আমাদের সুন্দর প্রেমের নীড় রচনা করিয়া দুজনে নির্মল আনন্দে দিনপাত করিব। সমাজ, সংসার, এ সব বড় বড় কথায় আমাদের কাজ কি? আমাদের প্রেমই আমাদিগকে বিশ্বের মহত্তম সাফল্য আনিয়া দিবে।

সে রাত্রির ভাবনা কখন যে স্বপ্নে ডুবিল, স্বপ্ন কখন আবার ভাবনায় পরিণত হইল, তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। প্রভাতে চোখ মেলিয়া দেখিলাম, দুই দিকে মধ্য প্রদেশের বিস্তীর্ণ মাঠ বিছাইয়া পড়িয়াছে। এবং দূরে কে যেন তুলি দিয়া কতকগুলি পাহাড় আঁকিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিপ্রহরে গাড়ী নাগপুরে আসিল। এখানে আমাদের

কামরায় মহারাষ্ট্রীয় যাত্রী উঠিল। মনে হইতেছিল তাহারা যেন আমার আত্মীয়!

নাগপুরে আধ ঘণ্টা থাকিয়া গাড়ী আবার ছুটিল। অপরাহ্ণে বেরারখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিলাম। একের পর এক বড় বড় ষ্টেশন পার হইয়া যাইতে লাগিলাম। ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের উপর রাশি রাশি তুলার বস্তা বিপুল ব্যবসায়ের পরিচয় দিতেছিল।

সারা রাত্রিতে খান্দেশ অতিক্রম করিলাম। শেষরাত্রের দিকে গাড়ী নাসিকে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা গভীর শীতল স্পর্শ জানাইয়া দিল, এ এক নূতন আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রভাতে ছটায় গাড়ী কল্যাণ পৌঁছিল।

কল্যাণে গাড়ী থামিতেই মনটা কাঁপিতে লাগিল। নবীন যুবক চাকরীর উমেদারী করিতে গিয়া বড় সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইয়া বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতে করিতে কল্পনায় নানা রঙীন চিত্র গড়িতে থাকে, তারপর হঠাৎ যখন পেয়াদা আসিয়া বলে, "সাহেব ডাকছেন, আসুন", তখন যেমন করিয়া তাহার বুক ধড়ফড় করিয়া উঠে—আমারও তেমনি হইল। কল্যাণ ছাড়িয়া গাড়ী বোম্বের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল আমার মনের চঞ্চলতা ততই বাড়িতে লাগিল।

২০

বোম্বে গাড়ী সাতটায় পৌঁছিল। মেসে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন প্রায় আটটা বাজিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সহবাসী ও সহকর্ম্মীরা আসিয়া জুটিলেন। একজন বলিলেন, "রমেনবাবু যে! ব্যাপার তো মন্দ নয়! আপনি না ব'লে কয়ে অমনি চলে গেলেন, চাকরী বুঝি এতই সোজা!" কিন্তু জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা হইতে ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ প্রেরিত দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। আর তেমনই আনন্দিত হইলাম, সে প্রভাতের স্নানে। কলের ঝাঁঝরী হইতে নির্ঝরে জল পড়িতেছিল, তাহাতে দেহ স্নিগ্ধ শীতল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, আজ হইতে আমার পূর্ব্বের শত সংস্কার, শত আচার এমনি করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া নিজেকে শুদ্ধ স্নিগ্ধ করিয়া তুলিব।

সেদিন আর আফিসে গেলাম না, যেন না ছুটী ছিল। আফিসে যাইবার সময়েই খেতওয়াড়ী রওয়ানা হইলাম। মনে হইল, গতদিন এমনই সময় গিয়াছিলাম। কিন্তু মন যেন দু'হাতে গতদিনের কথাগুলিকে সরাইয়া ফেলিয়া দিল। ভাবিল, শুধু আজিকার কথা। আজ রেবা দৃষ্টিমাত্রেই কি বলিবে? আমি যখন আমার কথা শেষ করিব, তখন কেমন ভাবে চাহিবে?

২১

সেই খেতওয়াড়ীর বাড়ী। আজ তিন মাস পরে এখানে আসিলাম। কিন্তু অভ্যাসবশে সহজভাবেই উপরে চলিয়া গেলাম। দামোদরের দরজায় যাইতেই দেখিলাম, একটি সবল মেয়েমানুষ ঘর ঝাঁড় দিতেছে।

ভাবিলাম, তাহারা কি এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে? হঠাৎ মনে একটা অসীম হতাশার চিত্র তুলিয়া প্রশ্ন উঠিল, তবে কি তাহারা আবার কারওয়ার ফিরিয়া গিয়াছে?

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেয়ালে দেখিতে পাইলাম, দামোদর ফড়নীসের নামের ছাপ। পিতলের সে পুরাতন অক্ষরগুলি চোখের সামনে অতি স্নিগ্ধভাবে ভাসিয়া উঠিল।

স্ত্রীলোকটী দরজার নিকটে আসিয়া আমাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখ তৈলসিক্ত, চক্ষুর কুটিল দৃষ্টি। ঠোঁটে পানের দাগ স্থায়ীভাবে লাগিয়া আছে। মনে হইল, কেমন কলুষময়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দামোদর রাও কোথায়?"

স্ত্রীলোকটী জড়িতভাবে বলিল, "দামোদর রাও?" বলিয়া থামিল। মুখের ভিতর চিবানো পানের সমষ্টি একপাশে সরাইয়া বলিল, "দামোদর রাও বাহিরে গেছে।"

আমি বলিলাম, "কখন আসবেন?"

সে বলিল, "বিকেলে"। বলিয়া আবার পান চিবাইতে ও ঘর ঝাঁড় দিতে লাগিল।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবাভাই কোথায়?"

সে ঝাঁটা হাতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, কপাল কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "রেবাভাই কে?"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "রেবাভাই তার—," একটু থতমত খাইয়া বলিলাম, "বোন"।

সে অবাক হইয়া বলিল, "সে ত জানিনে।"

আমি বলিলাম, "তার বোন নাও হ'তে পারে—তার"—আমি কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। একটু ভাবিয়া সহজভাবে বলিলাম, "এ বাড়ীতে রেবাভাই বলে একটী মেয়ে থাকৃত না?"

স্ত্রীলোকটী বিস্মিতকণ্ঠে, জোরে জোরে বলিতে লাগিল, "এ বাড়ীতে রেবাভাই! তা'তো আমি জানি নে। ও দিকে দেখ।" বলিয়া ঝাঁটা দিয়া পাশের দরজা দেখাইয়া দিয়া নিজ কাজে মন দিল।

আমি পাশের বাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে ক'দিন আছ?"

সে বলিল, "একমাস।" বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

আমি স্তম্ভিত। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দামোদর রাও বিকালে ক'টার সময় আসবেন?"

সে ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিল, "তিনটায়"।

ভাবিলাম—তবে রেবা দামুকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে? প্রশ্নটা শূন্যের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

"সে কি আবার কারওয়ার ফিরিয়া গিয়াছে?"—

"অসম্ভব।"

"তবে?"

হঠাৎ মনে হইল, সে যদি আমার খোঁজে গিয়া থাকে?

২২

এ সমস্ত প্রশ্ন বিকালে তিনটা পর্য্যন্ত চাপিয়া রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, দামুকে কার্পাসের বাজারে গিয়া খুঁজিয়া নিই না কেন? কিন্তু অনির্দ্দিষ্টভাবে বোম্বেতে একজন লোক খোঁজা, আর সমুদ্রের উপকূল হইতে একটী বিশেষ কোনও রেণুকে বাছিয়া আনা একই রকমের।

তথাপি দামুর সন্ধানে ছুটিলাম। কার্পাসের বাজারে পৌঁছিতে আধ ঘণ্টা লাগিল। সেখানে অনুসন্ধান করিতে করিতে কতজন দুই তিনটা মিলিল, কিন্তু দামুর দেখা পাওয়া গেল না। ওদিকে বেলা তিনটা বাজিয়া আসিল। কাজেই আবার খেতওয়াড়ীর দিকে ফিরিলাম।

কৃষ্ণাসদনে উঠিতে যাইব এমন সময় দেখি দামু একটী কাচের গ্লাসে করিয়া দুধ কিনিয়া লইয়া আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলিল, "বাবু-সাহেব, অনেকদিন বাদে যে!" তাহার চোখের দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিলাম, তাহার অনেক কথা বলিবার আছে।

দামুর সঙ্গে উপরে উঠিলাম। সে আমাকে আদর-পূর্ব্বক চেয়ারে বসাইয়া ডাকিল, "রত্না!" ভিতর হইতে সকালের স্ত্রীলোকটী বাহির হইয়া আসিল। দামু তাহার হাতে দুধের গ্লাসটা দিয়া বলিল, "শিগ্ গির দু'পেয়ালা চা তৈরি কর, বাবুসাহেবও খাবেন।"

রত্না আমার দিকে চাহিয়া দামুকে বলিল, "উনিই সকাল বেলা এসেছিলেন।"

বলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কে?"

দামু বলিল, "এর নাম রত্না।" যেন আমি তাহার নাম জানিতে চাহিয়াছিলাম! তারপর বলিল, "রেবা চলে যাবার পর এ এসেচে। রেবার কথা তো আপনাকে বলাই হয় নি।"

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবা কোথায়?"

দামোদর বলিল, "সে চ'লে গেচে।" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দুটি ছোট হইয়া সাপের চক্ষুর মত ঝিলিক মারিতে লাগিল। বলিল, "সে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে গেচে।" সহসা যেন তাহার চিন্তাস্রোত বক্ষ্যমাণ বিষয় হইতে সরিয়া পড়িল। সে বলিল, "বলুন্ তো বাবু সাহেব, আমার কি দোষ? আমি এমন কি অন্যায় করেচি, যার জন্যে সে আমায় ছেড়ে যেতে পারে?"

আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম তাহা চাপা দিয়া বলিলাম, "এখন বুঝি রত্না তোমার সঙ্গে থাকে?"

সে বলিল, "হাঁ।"

তখন রত্না আসিয়া চা রাখিয়া গেল। দামু একটু আবেগের সহিত বলিল, "রত্না খুব কাজের লোক, বাবু-সাহেব।"

আমি দামুর মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিলাম। সে

দুদিন পূর্ব্বে রেবার মত অপূর্ব্ব রূপবতী গুণবতী নারীর সাহচর্য্য করিয়াছে, আজ সে অতি সহজভাবে এই নীচস্বভাবা মধ্যবয়স্কা মাবল নারীর সঙ্গে জীবন-যাত্রা করিতেছে!

চা পান করিতে করিতে মনের অদম্য কৌতূহল চাপিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেবা কবে গেচে?"

দামু পাত্রের চা গলাধঃকরণ করিয়া, চক্ষু বুজিয়া, একটু ভাবিয়া বলিল, "মাস দু'য়েক কিংবা একটু বেশী হ'বে।" তারপর একটু ত্রস্তভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল, "বাবু-সাহেব, রেবার ভাব দেখলে আপনি অবাক্ হ'য়ে যেতেন। আপনি চ'লে যাবার পর থেকে সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল, আর সকাল বিকাল কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাত্রিতে এসে রান্না ঘরে গিয়ে মাদুর পেতে শুয়ে থাকৃত। আমি বলি 'তোর কি হয়েচে?' সে কেবল কাঁদে। আপনার খোঁজে তিন চার দিন গেলাম। কিন্তু সে বাড়ীতে আপনাকে পাওয়া গেল না, কোথায় গেচেন কেউ বলতে পারল না। রেবা একথা প্রথমে বিশ্বাস করল না। একদিন আমার সঙ্গে সে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গেল। আমি তাকে গাড়ীতে রেখে উপরে গেলাম। সেখানে বাঙ্গালী লোকদের কথাবার্ত্তা শুনে তার বিশ্বাস হ'ল ওটাই আপনার বাড়ী। ফিরে এসে যখন বল্লাম, আপনি নেই। তখন তার মুখটা ছাইয়ের মত হ'য়ে গেল।

"তারপর একদিন তার ভয়ানক অসুখ হল। বার বার ফিট হ'তে লাগল। বড় ডাক্তার ডাক্লাম। ডাক্তার বল্লেন, হিষ্টিরিয়া রোগ। আমার তাকে নিয়ে হ'ল প্রাণান্ত। আমি যথাসাধ্য যত্ন করতে লাগলাম। কিন্তু একদিন তাতে আমাতে বিষম ঝগড়া হ'ল।

"আমি রাগ ক'রে বলেছিলাম, 'বাঙ্গালী বাবুর পায়ে পড়েছিলি, কই, তোকে তো ঠাঁই দিল না।' একথা শুনে রাগ করে বাড়ী ছেড়ে হস্পিটালে চলে গেল।"

আমি বলিলাম, "কোথাকার হস্পিটালে?"

দামোদর বলিল, "যে ডাক্তার চিকিৎসা করতেন তাঁরই প্রাইভেট হস্পিটাল আছে, সেখানে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে এখনও সারে নি?"

দামু সংক্ষিপ্তভাবে বলিল, "সেরেচে বোধ হয়।" তাহাকে ছাড়িয়া যাওয়া যে রেবার অন্যায় হইয়াছে সে কথাটা সে বার বার বলিতে লাগিল। দামু যেন তখন চখের সামনে রেবার যাইবার দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

তাহার কথা শুনিয়া আমি বড়ই চিন্তিত হইলাম। নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিলাম, কেন বোম্বে ছাড়িয়া গেলাম? কিন্তু ভাবিয়া তৃপ্তি হইল যে, রেবা দামোদরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। শুধু তৃপ্তি নয়, তাহার প্রতি যেন একটা কৃতজ্ঞতার প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

দামুকে বলিলাম, "দামোদর রাও, তুমি আমাকে রেবার কাছে নিয়ে যেতে পারবে?"

দামু আনন্দের সহিত বলিল, "খুব পারব বাবুজি। এখনই চলুন, আধ ঘণ্টা পরে।" বলিতে বলিতে সে আমার দিকে গভীর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমি আধ ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিব বলিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

২৩

বাহিরে আসিয়া ট্রামে চড়িয়া কোর্টে গেলাম এবং একটা বড় মনোহারী দোকানে ঢুকিয়া নানাপ্রকার উপহারের জিনিস দেখিতে লাগিলাম। দোকানদার একে একে শেলাইর বাক্স, টয়লেট বাক্স, লিখিবার সরঞ্জামের কেস্, ক্যান্ডি দোয়াত, লিখিবার প্যাড, পেপার প্রেস, ফুলদানি, শেলাইর মডেল বই—প্রভৃতি দেখাইতে লাগিল। হঠাৎ মনে পড়িল, এ সমস্তই বিদেশী, রেবা তো তাহা গ্রহণ করিবে না। তখন সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া লইলাম, মহিসুরে প্রস্তুত একটা ছোট চন্দনের বাক্স, ডালার উপর আঙুরের লতা কাটা।

ঠিক আধ ঘণ্টা পরে খেতওয়াড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম এবং দামুকে লইয়া ডাক্তারখানার উদ্দেশ্যে চলিলাম। সে সেখানে দুইবার গিয়াছিল। ওয়ার্ডেন রোডের উপর সে বাড়ী।

ওয়ার্ডেন রোডের কিছু দূরে ট্রাম হইতে নামিলাম। ডান দিকে মহালক্ষ্মীর ঘোড়দৌড়ের মাঠ, তারপর সমুদ্র, মাঝখানে পীচ-ঢালা অতি সুন্দর একটা রাস্তা ঘোরেল উত্তর

দিকে গিয়াছে। বাঁ দিকে মাথার উপর মালাবার পাহাড়, তাহার উপরের ঘরবাড়ীগুলি ছবির মত দেখাইতেছিল। সে পাহাড়ের নীচ দিয়াই ওয়ার্ডেন রোড চলিয়াছে।

দামু ও আমি পাশাপাশি চলিলাম। একের পর এক বড় বড় অট্টালিকা পার হইয়া যাইতে লাগিলাম। তাহার কোনটা দেশী রাজার, কোনটা বা ক্রোড়পতি ব্যবসায়ীর বাড়ী। প্রায় পনর মিনিট এসব অতিক্রম করিবার পর দামোদর একটা সুদৃশ্য বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। বলিল, "এই বাড়ী, উপরে চলুন।" দুজনে টালি-মোড়ানো সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম।

প্রথম একটা বড় সুসজ্জিত ঘর। তাহার সামনে পিত্তলের অক্ষরে লেখা ডাক্তার এম, সি, নেরলকর। তারপরে লেখা—Out (বাহিরে)।

দরজায় একজন ভাইয়া (হিন্দুস্থানী দারোয়ান) বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "ডাক্তার সাহেব নিজ বাড়ীতে আছেন, ছ'টার সময় আস্‌বেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রোগীরা যেখানে থাকে সে জায়গা কোথায়?" সে আঙুল দিয়া পাসের ঘর দেখাইল।

বারান্দা দিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, এক সারিতে তিনটা ঘর, প্রত্যেকটাতে কয়েকটা খাট পাতা। কিন্তু রোগী দুই তিনটা মাত্র ছিল।

এক কোঠায় একজন কম্পাউণ্ডার বসিয়া ছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েদের ওয়ার্ড কোথায়?" সে বলিল, "তেতলায়, সেখানে নার্সকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে রোগিণী দেখিয়ে দেবে।"

উভয়ে তেতলায় উঠিলাম। দামু বলিল, অন্যবার সে সোজা লিফট্ দিয়া তেতলায় উঠিয়াছে, এবার হাঁটিয়া আসাতে দোতলায় আর তেতলায় গোল বাধিয়া গিয়াছে।

তেতলার সামনের ঘরে গিয়া দেখিলাম, একজন নার্স আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের পোষাক ঠিক করিতেছে। আমি বলিলাম, "আমরা একজন রোগিণীকে দেখ্‌তে এসেচি।"

নার্স বলিল, "নাম?"

আমি বলিলাম, "রেবা ভাই।"

দামোদর বলিল, "রেবা ভাই কড্‌নীস।" নার্স আমার দিকে একটু বক্র কুটিল দৃষ্টিতে চাহিল। তারপর বলিল, "রেবাভাই ব'লে তো কোনও রোগিণী এখানে নাই।"

দামোদর বলিল, "দুইমাস—আড়াইমাস আগে এখানে এসেছিল।"

হঠাৎ নার্সের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একটু হাসিয়া, ঠোঁট বাঁকাইয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "রেবা ভাই! রেবা ভাই কড্‌নীস? বটে? আপনারা তার কে হন?"

দামু বলিল, "আমি তার ভাই। আমি তো দুবার তাকে দেখ্‌তে এসেচি।"

নার্স বলিল, "তা নিশ্চয়ই দুমাস আগে হবে।"

দামু একটু ভাবিয়া বলিল, "হাঁ, তা বটে।"

আমি দামুর হৃদয়হীনতার পরিচয় পাইয়া অবাক হইলাম। গত দুই মাসের মধ্যে সে রেবার খোঁজ নেয় নাই! ইহাতে আমি নিদারুণ দুঃসংবাদ আশঙ্কা করিতাম, যদি নার্সের মুখে মৃদু হাসিটি না থাকিত।

নার্স সুরটা বিশেষ রকম মিষ্ট করিয়া বলিল, "রেবা ভাই—সেই ১৯।২০ বছরের মেয়েটি নয়? গৌর বর্ণ, লেখা-পড়া জানা, নয় কি?"

আমরা উভয়েই মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম।

নার্স আরও মিঠা সুরে বলিল, "সে তো দুমাস আগেই আরোগ্য হয়ে ডিস্‌চার্জ্জ হয়ে গেচে।" বলিয়া আবার হাসিমুখে, তীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল।

আমি বলিলাম, "সে এখন কোথায় আছে বল্‌তে পারেন?"

নার্স ঠোঁট উল্টাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া একটু দুষ্টু হাসি হাসিয়া বলিল, "তা আমি কি ক'রে বল্‌ব? রোগী আরাম হয়ে গেলে তার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক কি?"

আমি ক্ষুণ্ণ মনে সিঁড়ির দিকে চলিলাম। দামুও চলিল। নার্স আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "লিফট্ খুলে হয়েছে, তা' দিয়েই এখন নাম্‌তে পারেন।"

তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, রেবু এই খবরটি

দিতেই আমাদিগকে ডাকে নাই। আরও যেন কিছু বলিবার ছিল।

আমি অন্যমনস্কভাবে ক্ষণেক দাঁড়াইলাম। নার্স একটু অগ্রসর হইয়া চাপাস্বরে দামুকে বলিল, "আপনি তার ভাই?" দামু মাথা নাড়িল।

নার্স বলিল, "আপনি ডাক্তার সাহেবকে আপনার বোনের কথা জিজ্ঞাসা করুন না কেন?"

আমি ফিরিয়া বলিলাম, "ডাক্তার সাহেবের ঠিকানা কি?"

নার্স বলিল, "শান্তি-কটেজ, মালাবার হিল।" একথা বলিয়া যেন অপরাধীর মত সে ধীরে ধীরে নিজেদের ঘরে চলিয়া গেল।

আমি লিফটের বোতাম টিপিলাম। নীচে নামিয়াই একখানা ট্যাক্সি ডাকিলাম। কুড়ি মিনিটের মধ্যে মালাবার হিলের 'শান্তি-কটেজের' সামনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সুন্দর ফ্যাসনেবল বাড়ী। দরজায় জানালায় সুদৃশ্য পর্দা। দেয়ালের কোণ ছাইয়া আইভি-লতা উঠিয়াছে।

দামু ট্যাক্সি হইতে নামিল। তাহাকে বলিলাম, "ডাক্তার সাহেব বাড়ীতে থাক্‌লে আমাকে ডেকো।"

দামু ফটকের কাছে গিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি কান পাতিয়া রহিলাম। বাড়ীর সম্মুখের ঘর হইতে অর্গ্যানে একটা কোমল গৎ বাজিয়া গেল—যেন পরিচিত, সুদূর অতীতের স্মৃতি-জড়িত। পরক্ষণেই তার সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের মধুর সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিল। * * * বাঙ্গালা গান! * * * রেবার কণ্ঠস্বর! আরবের মরুভূমির মধ্যে শুনিলেও আমি বলিতে পারিতাম, "এ রেবার স্বর।" সেই সুরের ঢেউ, যাহা আমি দিনের পর দিন নির্জ্জন অপরাহ্নে কুঞ্জসদনে বসিয়া বহাইয়া দিয়াছিলাম।

দামোদর আমার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "রেবা!" আমি স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ কে যেন একটা জ্বলন্ত লৌহ-শলাকা আনিয়া আমার বক্ষস্থলে বিঁধাইয়া দিল। কে যেন আমার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিতে লাগিল। সে গানের সুর যতই উচ্চে উঠিতে লাগিল, ততই আমার কানের ভিতর যেন তপ্ত সীসা গলিয়া পড়িতে লাগিল।

গান থামিলে, একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ঘর হইতে বারান্দায় নামিয়া আসিল। দামু বলিল, "এই ডাক্তার।" তাহার পিছনে আসিল জরিওয়ালা শাড়ী-পরা একজন মহিলা * * * রেবা! সেই পোষাক হইতে যেন তীব্র একটা জ্বালা বাহির হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দামোদর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল, আমি ট্যাক্সি-ওয়ালাকে বলিলাম, "চল।" ট্যাক্সিতে বসিয়া আমি কি একটা প্রেরণার বশে শুধু বার বার তাহাকে বলিতে লাগিলাম, "জোরে চল, জোরে চল।"

গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীতে উঠিবার সময় পকেট হইতে চন্দনের বাক্সটা বাহির করিয়া পায়ে পিষিয়া চূর্ণ করিলাম।

২৪

ঘরে আসিয়া তপ্ত কণ্টকিত শয্যায় আশ্রয় লইলাম। চিত্ত দারুণ বিদ্রোহে বলিয়া উঠিল, "এই আমার প্রাণভরা ভালবাসার প্রতিদান! অর্থের মোহে বিলাসের মোহে আজ এই অধঃপাত!" দেহের ভিতর দিয়া আগুনের হল্‌কা বহিয়া যাইতে লাগিল। তীব্র বেদনায়, অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিলাম, "ভ্রষ্টা! পতিতা! পাপময়ী! * * * আমার রেবা, যাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, সে আজ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া এক পরপুরুষের আশ্রয় লইয়াছে! এত বড় একটা অনিয়ম, এত বড় একটা পাপ এত সহজে শান্তভাবে জগতে গৃহীত হইবে?"

ডাক্তারের প্রতি দারুণ বৈরীভাব জাগিল। ভাবিলাম, সে নীচ, কাপুরুষ; নিরাশ্রয়া বালিকাকে হরণ করিয়াছে। চিকিৎসাধীনা রোগিণীকে অসৎপথে লইয়া নিজ ব্যবসায়ের নীতিবিরুদ্ধ, আইনবিরুদ্ধ, কাজ করিয়াছে। তাহাকে ফৌজদারিতে দেওয়া যাইতে পারে।

ভাবিতে ভাবিতে মন একটা দুরন্ত সঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া উঠিল। স্থির করিলাম, পর দিন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিব, তাহাকে তাহার unprofessional conduct এর কথা, নীচতার কথা বলিব। আমি রেবার [illegible]

স্বামী—এ ক্ষমতায় তাহাকে ফিরাইয়া চাহিব। যদি দেয় ভাল; না দিলে * * *

বিছানা হইতে উঠিয়া সুইচ টিপিলাম। কোট হইতে চাবি লইয়া একটা পুরাতন ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাহার নীচ হইতে মেসোপোটেমিয়া হইতে আনীত আমার যুদ্ধকালের সঙ্গী রিভলভারটিকে বাহির করিলাম। গুলির "পাউচ" খুলিয়া তাহার ছয়টি চেম্বারই পূর্ণ করিয়া রাখিলাম।

যখন বিছানায় শুইতে গেলাম তখন প্রায় প্রভাত হইয়াছে। হঠাৎ মনে হইল, যদি ডাক্তার নির্ব্বিবাদে রেবাকে আমার সঙ্গে দিয়া দেয়, তবে?

ক্ষণেকের জন্ত চিত্ত বিব্রত হইয়া উঠিল। মনের কোণ হইতে কে বলিল, "ঐ কলুষিত দেহ মন কি কোনদিন সুন্দর গৃহ রচনা করতে পারিবে?" যেমনভাবে আমি সে সন্ধ্যায় চন্দনের বাক্সটিকে পিষিয়া গুঁড়া করিয়াছিলাম, এখন তেমনিভাবে যেন কে আমার হৃদয়কে পিষ্ট দলিত করিতে লাগিল।

কিন্তু সহসা কোথা হইতে একটা প্রবল তেজস্বিতা আসিয়া চিত্ত দখল করিয়া বসিল। উত্তেজিত হইয়া ভাবিলাম, "আমার মত একটা লোক না হয় বিশ্ব হইতে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। আমার সমস্ত রকমের সুখ শান্তি জলাঞ্জলি দিয়া, শত কষ্টকে বরণ করিয়াও, যদি ঐ সুন্দর তরুণ জীবনটিকে শুভের পথে, শুদ্ধির পথে ফিরাইয়া আনিতে পারি, তবে এ জীবন সার্থক হইবে।"

২৫

পরদিন আফিসে ডাইরেক্টরী দেখিয়া ডাঃ নেরলকরের টেলিফোনের নম্বর বাহির করিয়া ফোন করিলাম। ডাক্তার স্বয়ং জবাব দিলেন। আমি বলিলাম, কোনও বিশেষ কাজে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই। তিনি বিকালে সাড়ে চারটায় সময় দিলেন।

ঠিক সাড়ে চারটায়—এক আধ মিনিট আগেও হইতে পারে —তাঁহার ঘরের দরজায় গিয়া কার্ড পাঠাইলাম। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ ডাকিলেন। ভিতরে যাইতেই অভিবাদন করিয়া বসাইলেন। বাঙ্গালী দেখিয়া একটু কৌতূহলী হইয়াছেন, মনে হইল।

আমি বলিলাম, "আমি চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়ে আসি নাই, কোনও প্রাইভেট বিষয়ে আলাপ করিতে আসিয়াছি।"

তিনি উৎসুক হইয়া বলিলেন, "কি, বলুন্।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "আড়াই মাস আগে আপনার হস্পিটালে রেবা তাই কড্নীস ব'লে একজন রোগিণী ছিল।"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলিলেন, "হাঁ, আপনি তার কেউ হন্?"

আমি বলিলাম,—কতকটা ইতস্ততঃ ভাবে,—"আমি তার ভাইয়ের বন্ধু,—তাদের পরিবারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।"

"বটে? আপনারা আপনাদের আত্মীয়া সম্বন্ধে তো খুব যত্নশীল! আড়াই মাস পরে রোগিণীর খোঁজ করতে এসেছেন।" বলিয়া ডাক্তার উঠিলেন, এবং পাশের আলমারী খুলিয়া একখানা খবরের কাগজ বাহির করিয়া আমার সম্মুখে টেবিলের উপর বিছাইয়া, আঙুল দিয়া একটা জায়গা দেখাইয়া দিলেন।

আমি পড়িলাম—

সমাজ সংস্কার

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ডাঃ এম্, সি, নেরলকর এম, বি, বি, এস; এল, আর, সি, পি, এস ও মিস্ রেবাতাই কড্নীসের বিবাহ খুব সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ নেরলকর বোম্বেতে প্রথিতনামা চিকিৎসক, জাতিতে ব্রাহ্মণ, প্রথম বিবাহ গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজে করিয়াছিলেন। মিস্ কড্নীস জাতিতে সারস্বত, কলেজে শিক্ষিতা। বিবাহ সিভিল ম্যারেজ আইন অনুসারে হইয়াছে। ডাক্তার সাহেবের সমব্যবসায়ী ও অপর বহু বন্ধু বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

খবরের দুইপাশে দম্পতির ছবি ছিল।

আমি স্থির দৃষ্টিতে সে ছবি দুইখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ইতি মধ্যে ডাক্তার পাশের দরজায় গিয়া ডাকিলেন, "রেবা!" এবং দরজা কতক খুলিয়া ভিতরে মুখ নিয়া মারাঠীতে বলিলেন, "তোমার একজন আত্মীয় এসেচেন্, দেখবে এসো।"

ডাক্তার চেয়ারে আসিয়া বসিলে বলিলাম, "আচ্ছা এ ব্যাপারে মেয়ের আত্মীয়-স্বজনকে,—অভিভাবককে খবর দেওয়া উচিত ছিল না?"

বলামাত্রই ডাক্তার বলিলেন, "আত্মীয়স্বজন! অভিভাবক! প্রথম কথা, মেয়ে সাবালিকা ছিল, নিজের মত নিজেই গঠন করতে পারত; দ্বিতীয়তঃ, মেয়ের অসুখের সময় আত্মীয়-স্বজনদের তো কোথাও দেখা যায় নি;—যাকে তার অভিভাবক বলচেন—সে তো তার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত বলে' মনে হয় নি। সে যদি নিমন্ত্রণ পাবার উপযুক্ত হ'ত তবে নিশ্চয়ই পেত।"

এমন সময় দরজা খুলিয়া রেবা আসিল। চোখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিল। তারপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি চাহিতে তাহার চোখের পাতা দুটি ঈষৎ নমিত হইল,—হয়ত সঙ্কোচে, হয়ত লজ্জায়, হয়ত অভিমানে,—হয়ত বা অহঙ্কারে। দেহ তার একটুকুও নড়িল না। হাতদিয়া পরণের শাড়ীটিকে কিঞ্চিৎ গুছাইয়া নিল। মুখে স্থির গাম্ভীর্য্য। যেন সামনে কিছু দেখিতেছে না। অথবা যাহা দেখিতেছে তাহা অর্থশূন্য। যেন আমি চিরকালের অপরিচিত। আমাকে চেনে না, জানে না; আমাকে জীবনে কোনওদিন দেখে নাই।

ডাক্তার বলিলেন, "এঁকে চিন্‌তে পারছ?"

রেবা বলিল, "হাঁ।" বলিয়া স্থির, নিশ্চল, প্রস্তর-মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে দেহভঙ্গীতে দৃঢ়তা ছিল না, কমনীয়তাও ছিল না; সে দৃষ্টিতে দম্ভ ছিল না, যাচ্ঞাও ছিল না। সে চেহারায় যেন একটা গূঢ়, জটিল, অনির্দ্দেশ্য প্রহেলিকা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ছিল, যাহা মানুষের বুদ্ধির অগম্য, অবোধ্য।

আমি মুখোমুখি হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। সে অপ্রস্তুত হইল না, অপ্রতিভ হইল না। ঈষৎ নমিত চক্ষু তুলিল, কিন্তু সে দৃষ্টির ভিতর নূতন কোনও অর্থ ফুটিয়া উঠিল না।

মুহূর্ত্তের তরে আমি ভাবিলাম, "মিস্ কর্ণেলীস! জাতিতে সারস্বত!" কিন্তু পরক্ষণেই আমার সমস্ত আত্মসম্মান সঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং স্থির গম্ভীরকণ্ঠে বলিলাম, "ডাক্তার সাহেব, আমি আপনাকে, আপনাদের দুজনকে, অভিনন্দন করছি।"

ডাক্তার স্মিত মুখে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন, "ধন্যবাদ"।

রেবার দিকে চাহিয়া মাথা নোওয়াইলাম, রেবা ঈষৎ মাথা নোওয়াইল। আমি চলিয়া আসিলাম।

২৬

সেদিন সন্ধ্যায় ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ জীবনে আর স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়াইব না।

মেসোপোটেমিয়ায় আমি বেতারের কাজ শিখিয়াছিলাম। দুই সপ্তাহ পরে এ জাহাজে কাজ নিয়া বোম্বে ছাড়িয়া চলিয়া আসি।

কিন্তু আসিয়া অবধি এক এক সন্ধ্যায়, এক এক নীরব রাত্রে, আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে—কিন্তু আমি তাহার ঠিক উত্তর খুঁজিয়া পাই না। প্রশ্নটী এই,—রেবা কি আমার সঙ্গে বিবাহ না হওয়াতে দুঃখিত হইয়াছে?

আমি কল্পনায় বারবার সেই শেষ দেখা মূর্ত্তিটি চোখের সামনে তুলিয়া ধরি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করি, আর ভাবি, তাহার মধ্যে কি আমার প্রতি ভালবাসার কোনও চিহ্ন ছিল! বিদায়ের সময় আমি যখন মাথা নোওয়াই, তখন তাহার মাথা নোয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখদুটি কি কিঞ্চিৎ ছল-ছল হইয়া উঠিয়াছিল!

রেবা কি তবে আমাকে শেষ পর্য্যন্ত ভালবাসিয়াছিল!

আমি আজ এক বৎসর যাবৎ প্রায় সমুদ্রের উপরই বাস করিতেছি। বোম্বেকে ভুলিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সমুদ্রের কলনাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার প্রাণের ভিতর বোম্বের ডাক ফুটিয়া আসে। জাগরণে, স্বপ্নে, এক একবার চোখের সামনে

আসিয়া উঠে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের সেই ছোট দ্বীপটা, তার সেই শ্রেণীবদ্ধ বিরাট অট্টালিকা রাশি; তার সাগরকূল, বন্দর, জনবহুল রাস্তা; তার জীবনের বৈচিত্র্য, আর আমার প্রাণের অন্তস্তলে তার নিবিড় একটুকু স্পর্শ!

উপসংহার

রমেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাসময় কাহিনী যখন একটা জটিল প্রশ্নে আসিয়া সমাপ্ত হইল ও জলরাশির মাঝখানে এক নগরের মনোরম চিত্র গড়িয়া তুলিল, তখন অদূরে সিঙ্গাপুরের নীল বেলাভূমি দেখা দিয়াছে। আমি নীরবে সে তরুণ প্রাণের বেদনার গভীরত্ব অনুভব করিলাম, নীরবে তাহার হাতদুটি আমার হাতে নিয়া সস্নেহে বিদায় লইলাম।

যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে আমাদের বোম্বে আফিসের ঠিকানা দিয়া বলিলাম, যদি সে কখনও বোম্বে যায়, তবে যেন নিশ্চয়ই আমার খোঁজ করে।

সেই আমার শেষ সিঙ্গাপুর প্রবাস। ফিরিবার পথে আমি এক অষ্ট্রেলিয়ান জাহাজে গেলাম। কিন্তু সারাপথ সেই বেতারযন্ত্রচালক সুদর্শন বাঙ্গালী যুবকের কথা মনে পড়িতেছিল।

* * * *

এবার হঠাৎ বোম্বেতে তাহার সঙ্গে দেখা হইল। সে আমাদের আফিসে আসিয়াছিল। আমি তো প্রথম তাহাকে চিনিতেই পারিলাম না। তাহার stylish ইংরেজী পোষাকের বদলে পরিধানে ছিল খদ্দরের জামা আর ধুতি। চেহারায় আগেকার সেই বিষাদমাখা কমনীয়তা ছিল না, তার পরিবর্ত্তে কেমন একটা দৃঢ় তেজস্বিতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আমি তাহাকে আমার বসিবার ঘরে নিয়া সব খবর জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "আপনি বোম্বের মায়া এড়াতে পারলেন না শেষ পর্য্যন্ত!"

রমেন একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তা পারি নি সত্য। আমি আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেছি।"

আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "সে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

রমেন বলিল, "হয়েছে। রেবা একজন 'কেসরিয়া', * 'দেশ-সেবিকা'। কাল তিন মাসের জন্য জেলে গেছে। আমিও দু সপ্তাহ পূর্ব্বে চার মাসের জেল খেটে এসেছি।"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "বটে?"

রমেন বলিল, "হয়ত এ সপ্তাহের মধ্যে আমার আবার যেতে হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের দুজনের মধ্যে আবার মিল হয়েছে, নিশ্চয়?"

রমেন একটু থামিয়া, গম্ভীর ভাবে বলিল, "বোম্বে আমাকে টেনে এনেছিল ভালবাসার মোহে। এসে দেখলাম, ভালবাসার চেয়ে আরও বড় একটা কিছু আছে।"

আমি বলিলাম, "সে কি?"

রমেন বলিল, "আত্মাহুতি। আজ রেবাকে আমি ভালবাসি না, রেবাও আমাকে ভালবাসে না; উভয়ে ভালবাসি একটা তৃতীয় জিনিসকে। হয়ত তার ভিতর দিয়ে আমাদের জীবন পূর্ণতর সার্থকতা লাভ করবে।"

আমি শুধু বিস্মিত দৃষ্টিতে যুবকের উজ্জ্বল, প্রশান্ত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু

* কেসর বা কমলা রংয়ের শাড়ী-পরা মেয়ে ভলান্টিয়ার।



বাঙ্গলার পুঁথি-সাহিত্য

ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম

উর্দ্দু-বাঙ্গলা মিশ্রিত দোভাষী পুঁথি-সাহিত্য মুসলিম বঙ্গের একটা বিরাট সম্পদ। শিক্ষিত সমাজের কাছে ইহা বাঙ্গলার বটতলার পুঁথি বলিয়া অবজ্ঞাত হইলেও বঙ্গদেশের সমগ্র অল্পশিক্ষিত মুসলমানদের নিকট ইহার আদর যথেষ্ট। এই পুঁথি পড়িয়াই তাহারা অনির্দ্দিষ্ট জীবনের পথে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম প্রভৃতি কর্ত্তব্যগুলি বাছিয়া লয়। বঙ্গীয় সাহিত্যামোদী ও সুরুচিসম্পন্ন পাঠকবৃন্দের জন্য যেমন নানা শ্রেণীর পুস্তক নিত্য নূতন বেশে দেখা দিতেছে, তেমনি অল্প-শিক্ষিত অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের নিমিত্ত ঐতিহাসিক, জীবন-চরিত, কেচ্ছা বা গল্পমূলক, নীতি বা উপদেশ-মূলক, ধর্ম্ম বা শাস্ত্র-মূলক, প্রভৃতি নানাবিধ দোভাষী পুঁথি প্রত্যহ বাজারে বাহির হইয়া বিভিন্ন রুচি অনুসারে তাহাদের সাহিত্যের খোরাক জোগাইতেছে। অধুনা নানা-রসযুক্ত নাটক ও উপন্যাসের আবির্ভাবে পুরাতনের উপর একটা ম্লান ছায়া পতিত হইয়াছে। সেকালের মত একালে আর গ্রাম-গ্রামান্তরে পাড়ায় পাড়ায় গৃহস্থরা যাইয়া ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ভাঁজিয়া পাল্লা করিয়া কেতাব পড়ে না। তখনকার দিনে যে ব্যক্তি পুঁথি পড়িতে জানিত, সে প্রতি সন্ধ্যায় নিমন্ত্রিত হইয়া বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া কেতাবের খবর পড়িয়া শুনাইত। বলা-বাহুল্য যাহার কণ্ঠে সুমধুর সুর বিরাজ করিত—সেই সর্ব্বত্র সমধিক আদর লাভ করিত। বাঙ্গলার সে অফুরন্ত সুখের যুগ এখন আর নাই।

মানুষের অন্তরের শান্তির তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের করুণ-রস আকণ্ঠ পান করার নেশাও ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে। পুঁথির লেখক বা পাঠকদের এখন আর সে শৌর্য্য বীর্য্য বা নামডাক নাই। সময়ের নিদারুণ প্রবাহে সব যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন বিবাহ-মজলিশে পুঁথি পড়ার ধুম পড়ে না। কর্ম্ম-নিরত প্রবাসী নাবিকদের নৌকা হইতে কচিৎ গভীর নিশিথে বীর-রস ও প্রেম-রসে পূর্ণ পুঁথি পড়ার মধুর ধ্বনি গগন-পবন মুখরিত করিয়া অনন্ত বায়ুস্তরে মিলাইয়া যায় মাত্র। প্রকৃত পক্ষে এই দোভাষী উর্দ্দু-বাঙ্গলা-মেশানো পুঁথি বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিত্তি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রদ্ধেয় রায় ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বাহাদুর, বি-এ, ডি-লিট, মৌলবী আব্দুল করিম, সাহিত্য বিশারদ, প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ আলোচ্য পুঁথি-সাহিত্যের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী।

অধুনা নাটক নভেল প্রভৃতি উপন্যাস-প্লাবিত দেশে এই সব কেতাবের খবর কোন শিক্ষিত ব্যক্তি জানিতে না চাহিলেও মুস্লিম বঙ্গের প্রায় পনর আনা লোক স্বল্পব্যয়ে এই সকল পুঁথি কিনিয়া মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত পড়িয়া ও শুনিয়া থাকে। নরনারীগণ ইহা শ্রবণে যে, কেবলমাত্র সমধিক শান্তি ও তৃপ্তি পায় তাহা নহে, পক্ষান্তরে জীবন-সংগ্রামে আপন আপন কর্ত্তব্যপথও বাছিয়া লয়। ইহাতে অসংখ্য উদ্ভট কল্পনা, আজগোবী শব্দ ও বর্ণাশুদ্ধি থাকিলেও ইহা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ও সংস্করণের পর সংস্করণ হইয়া অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রেণীর বিরলপ্রাপ্ত অবসরসময়ে চিত্তবিনোদনের সহায়তা করিতেছে। দুষ্প্রাপ্য কেতাবগুলিতে 'উচাটিত', 'খেদাক্তিত', 'পাপীনী', 'অপমিত,' প্রভৃতি অশুদ্ধ শব্দ ও সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায়। পল্লীবাসীর মুখে মুখেও কখনো কখনো কেতাবের বয়ান শুনিতে পাওয়া যায়। বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলে সমগ্র বাংলা ভাষাটা উর্দ্দু-বাঙ্গলা-মিশ্রণ দোষ-দুষ্ট ছিল; নিখিলবাবুর "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী"র মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির দীর্ঘ বিবরণ ও তাহার

হস্তলিখিত উর্দ্দু-বাঙ্গলা ভেজাল পত্রখানি পড়িলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আজকাল ফরাসী, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী গ্রন্থসমূহ হইতে অনেক লেখকদিগকে উপকরণ বা প্লট লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের ঘরের কাঁনাচে-আস্তাকুঁড়ে যে সমস্ত মহামূল্য উপজীব্য রহিয়াছে কে তাহার সন্ধান করে? সত্যসত্যই এই সব কেতাবের ভিতরে সত্যিকারের বা রিয়্যালিষ্টিক আর্টের গন্ধ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই পুঁথির কোন এক একখানি যদি মার্জ্জিত বাঙ্গলা ভাষায় পরিবর্ত্তিত করা যায় তবে তাহা যে অতি উপাদেয় ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ হয় তাহা বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন হইবে না।

যদিও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন লেখকদের লেখনী সংঘাতে বাঙ্গালা সাহিত্যে ঈদৃশ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তথাপি পুঁথি-সাহিত্যের চমৎকার রচনা-কৌশল, মনোহর উপমাবলী দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া উহার রচয়িতার সম্যক প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। শায়ের বা কবিদের লেখায় বেশ একটা মৌলিকত্ব, ভাষার স্বচ্ছন্দগতি ও নানা-রসের একত্র সমাবেশ দেখিলে ইঁহাদের কবি-প্রতিভা যে জন্মগত ঐশী শক্তি তাহা একেবারে অস্বীকার করাও যায় না। তবে অধিকাংশ লেখকের নূতন ভাবধারা আমদানী করার চাইতে অনুকরণ ও ভাষান্তরিত করার ক্ষমতাই প্রশংসার্হ। যাহা হউক, আজ আমরা হাজার হাজার প্রকাশিত পুঁথির মধ্য হইতে মাত্র কয়েকখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া কৌতূহলী পাঠকদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

আমি যে পুঁথিগুলি পড়িয়াছি তাহার মধ্যে গোলে-বকাওলি প্রভৃতি পুঁথিগুলি উপন্যাস শ্রেণীভুক্ত। শাহ্‌নামা সহিদেকারবালা প্রভৃতি ঐতিহাসিক পর্য্যায়ভুক্ত। হাতেম-তাই, আমীর হামজা ইত্যাদি জীবনচরিত। কাছাছল আম্বিয়া, আহ্‌কামুল ইস্‌লাম প্রভৃতি কেতাবগুলি ধর্ম্ম-বা শাস্ত্রমূলক; দুইশত উপদেশ, আওলাদ এহ্‌ছানি প্রভৃতি নীতিমূলক পুঁথি। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মাত্র দুই চারিখানি পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া ইহা শেষ করিব। পুঁথি-সাহিত্য কি,—তাহা পাঠকগণ এই প্রবন্ধপাঠে মোটামুটি বুঝিতে পারিবেন। পুঁথি-রহস্য জানিবার আগ্রহ যদি পাঠক সমাজের মধ্যে উত্তরোত্তর বাড়িতে দেখা যায়—তবে এ সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

নিজামপাগলা—মোহম্মদ ইউছফ্ সাহেব প্রণীত, ৯৪ পৃষ্ঠা। ইহা একখানি প্রাচীন পুঁথি। ইহার বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ:—পূর্ব্বদেশে এক সওদাগর ছিলেন। কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় তিনি বড়ই কাতর ছিলেন। অবশেষে দয়াময় সদয় হইয়া তাঁহাকে এক পুত্র-সন্তান দিলেন। দৈবজ্ঞরা তাহার নাম রাখিলেন,—কিঙ্কর। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিঙ্কর খুব লেখাপড়া শিখিলেন। তখন পিতা জাহাজে জিনিষপত্র বোঝাই করিয়া পুত্রকে বাণিজ্য করিতে পাঠাইয়া দিলেন। কিঙ্কর যথাসময় আর এক রাজার দেশে উপনীত হইয়া কমলাবতী নাম্নী এক অপ্সরা-নিন্দিত কুমারীর কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য পাগলের প্রায় হইলেন। কিঙ্কর নিজামপাগল নামগ্রহণ করিয়া প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া কমলাবতীর চাকর নিযুক্ত হইলেন। নিজামের কাজ ছিল কমলার বইপত্র প্রত্যহ স্কুলে পৌঁছাইয়া দেওয়া। ঐ বিদ্যালয়ে উজীরের পুত্রও পড়িতেন। ক্রমে তাঁহার সহিত কমলাবতীর প্রণয় জন্মে। একদিন কমলাবতী স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য উজীরপুত্রকে অনুরোধ করিলেন। পাগলবেশী নিজাম তথায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উন্মাদ জ্ঞানে তাঁহাকে কেহ গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু উজীরপুত্র প্রাণভয়ে তাঁহার কথায় রাজী না হইয়া পলায়নের প্রস্তাব করেন। কমলাও রাজী হইলে উভয়ে নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির করিলেন। নিজাম গোপনে এই সংবাদ উজীরকে অবিলম্বে জানাইয়া দেন, ফলে পুত্র বন্দী হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট নিশীথে কমলাবতী প্রণয়ীর সহিত অশ্বারোহণে প্রাসাদ হইতে চম্পট দিলেন। যখন ভোর হইল তখন কমলাবতী দেখিলেন যে, ছদ্মবেশী নিজামকে তিনি উজীরপুত্র বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। তখন প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ায় রাজধানী ফিরিবার আর কোন উপায় রহিল না। নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া কমলাবতীর সহিত নিজামের বিবাহ হয়।

নিজাম পথিমধ্যে আর এক রাজার মুল্লুকে উপস্থিত হইয়া লালমতী নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যার সংবাদ পাইলেন। কিন্তু সে দেশের সর্ব্বনাশী দৈত্যকে যিনি হত্যা করিতে পারিবেন, তিনিই কুমারীকে লাভ করিবার অধিকারী হইবেন। নিজাম বহুকষ্টে দৈত্য মারিয়া লালমতীকে বিবাহ করিলেন।

অতঃপর বাহ্মন বাদশার সহিত শ্রীধর রাজার যুদ্ধ বাধে। নিজাম বাহ্মনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীধরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। তখন শ্রীধর স্বীয় অনিন্দ্য-সুন্দরী কন্যা কুমারী সুমতীর সহিত নিজামের বিবাহ দিয়া জামাতাকে সিংহাসনে বসাইয়া সন্ধি করিলেন। শ্রীধর ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দিলেন।

অনন্তর আরবদেশে ইরাবতী নাম্নী আর এক রূপবতী কন্যার সংবাদ পাইয়া নিজাম তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য চিত্রকর-ঘটক তথায় পাঠাইলেন। বহু পরিশ্রমে তাঁহাকেও তিনি বিবাহ করিয়া পূর্ণ শরিয়তের আদেশ বজায় রাখিলেন।

পরিশেষে, কমলা, সুমতী ও লালমতী তিন সতীনে মিলিয়া ইরাবতীর অসতীত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। সতীর প্রখর তেজে খাঁটি রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তখন নিজাম কুচক্রী স্ত্রীত্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া পতিগতা সতী ইরাবতীকে লইয়া পিতৃ-মাতৃ সন্দর্শনে রাজধানী গমন করিলেন। দীর্ঘ দিবস পরে পুত্র-পুত্রবধূর আগমনে মলিন রাজপুরী আবার হর্ষ-কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিল। পুঁথির একটু নমুনা দেখুন,—

"সুমতী ও লালমতী, কমলাবতীরে।
সকলে গাড়িয়া আইল আপনার ঘরে॥
ইরাবতী লয়ে সাধু সুখেতে রহিল।
এয়ছাই কয়েক রোজ গোজারিয়া গেল॥
খুশি খোসালেতে এয়ছা করেন গোজরান্।
নিজ দেসে জাইবার হইল আরমান॥
এয়াদ হইল তার মা বাপ বলিয়া।
অমনী কলেজা তার উঠিল জলিয়া॥"

* * * * * *

গোলেবকাওলি—মুন্‌শী এয়ানতউল্লাহ্ সাহেব রচিত ১২৯ পৃষ্ঠা। ১২৪৭ বঙ্গাব্দে প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ইহাকে অনেকে "তাজল মুল্লুকের পুঁথি" বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন। পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ,—

সরকস্থান নামক পূর্ব্বদেশের বাদশাহের নাম জয়লাল মুল্লুক। তাঁহার চারিপুত্র। পঞ্চমপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া বলিলেন, "যেদিন এই পুত্রের মুখ বাদশা দেখিবেন সেইদিন তিনি অন্ধ হইবেন—ইহাই বিধির নির্ব্বন্ধ।" সুতরাং বাদশাহ প্রাসাদ হইতে দূরে একটি নির্জ্জন কক্ষে মহিষী ও পুত্রকে থাকিতে আদেশ করিলেন। দিন যায় ক্রমে বালক নানাবিদ্যার অধিকারী হইলেন। একদিন শিকারের ইচ্ছায় শাহ্জাদা অশ্বারোহণে জঙ্গলে গমন করেন। অন্যদিকে বাদশাহ স্বয়ং শিকারে বহির্গত হইলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। ফলে বাদশাহ্ অন্ধ হইলেন। অনন্তর বাদশাহ্ চিকিৎসক ও জ্যোতির্ব্বিদকে ডাকাইলেন। তাঁহারা বলিলেন "পরিস্থানে বকাওলী পরীর বাগানে সাহারা নামে এক ফুলগাছ আছে, ঐ গাছের ফুল আনিয়া চক্ষে দিলে বাদশাহ চক্ষুষ্মান্ হইবেন।" কিন্তু কার্য্যতঃ কেহই ঐ ফুলের সন্ধানে যাইতে রাজী হইল না।

অবশেষে বাদশাহের চারিপুত্র ঐ ফুল আনিবার জন্য তাহার খোঁজে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। কনিষ্ঠ তাজল মুল্লুক কৌতূহলপরবশে ছদ্মবেশে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। অতঃপর ফেরদৌস্ নগরে রেজওয়ান বাদশাহের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাজলমুল্লুক হাম্মালার দুহিতা মাহমুদার পাণিপীড়ন করিয়া তাঁহার সাহায্যে বহু কষ্টে পরীরাজ্যে যাইয়া সাহারাফুল সংগ্রহ করিলেন। বাগান বাড়ীতে বকাওলি পরী তখন নিদ্রিতা ছিলেন, শাহজাদা পরীর অঙ্গুরীর সহিত নিজ অঙ্গুরী বদল করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বকাওলির ঘুম ভাঙ্গিলে অঙ্গুরী বদল ও তাহাতে তাজলমুল্লুকের নাম খোদাই দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পুরুষ বেশে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। দীর্ঘ দিন পরে বকাওলি [illegible]স্থানে উপনীত হইয়া শাহজাদার খবর পাইলেন। নানা [illegible]নের মধ্য দিয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে [illegible] তাজল্

মুন্নুকের সহিত বকাওলির মিলন ঘটে। ইহাই পুঁথির সারমর্ম। পুঁথির ছন্দের নমুনা এইরূপ—

"দিবিব্ব করিয়াছি আমি সাখ্যাতে বাবার।
কর্ম্ম সিদ্দ হইলে বিভা হৈবে আমার॥
তাহে পূর্ব্বে বিভা করি পাইয়াছি ভয়।
জদি করি আলিজন জাব জমালয়॥
জলীব মনিখীর কৌতুকের বিভোর।
নিত্য নিত্য নূতন রূপেতে আলিজন বিহার॥
মাহ্মুদা জিজ্ঞাসে বল সুনি সেই কথা।
জার দায় আমার এ জৈবন জায় ব্রথা॥"

অন্যান্য পুঁথিতে উর্দ্দু, ফার্সী শব্দ বেশী, এথানায় সংস্কৃত শব্দ প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত এই পুঁথিখানি বিশেষভাবে হিন্দু-ঘেঁষা, হরগৌরী, বিনোদিনী, ইন্দ্ররাজা, বৈকুণ্ঠ, দিগম্বর, শ্রীচরণ প্রভৃতি হিন্দুয়ানী শব্দ প্রসঙ্গক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখক হিন্দুবিদ্বেষী নহেন, পক্ষান্তরে পুঁথিখানি লিখিবার সময় তিনি স্থানে স্থানে শ্লীলতা, ব্যাকরণ ও বানানের দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। তবে বর্ণনার বাহাদুরী যথেষ্ট, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পাঠকের চিত্ত বিনোদনের জন্য পুঁথি হইতে "বারমাসবর্ণন" শীর্ষক অধ্যায়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

—পতিবিরহে—

"এহিত বৈশাখ মাস নানা পুস্প বিকসিত।
কত লোগে হেরে মত্ত হয় আনন্দিত॥
জাহার লাগিয়া আমি হারায়েছি জাতীকুল।
তাহার মুখেতে হাসী সম নহে এ সবকুল॥
এহিত জৈষ্ট মাস আম পাকে সকলের ঠাঁই।
খাইবে যে সুখে আছে মোর ভাগে নাই॥
আম খাদ্দ হবে জখন তুষে দিবে সেই মোকে।
আলাপে মাতীয়া হয়ে খেয়ে খাওয়াইবে তাকে॥
এহিত আসাড় মাষে মেঘের গর্জ্জনে।
বাহির হইতে নারি দহে প্রেম আগুনে॥
আর প্রাণ কাপে মোর জলদের ডাকের ডরে।
নাগর থাকিলে কাছে জড়াইয়া ধরে॥
এহিত শ্রাবণ মাসে কমল বিকস হবে।
ভ্রমরা জাইয়া তাতে বাইয়া বসীবে॥
আমি ভ্রমর সম হইয়াছি যে পুস্প কারনে।
নাজানি সে বিকসিত হবে কতদিনে॥
* * * *
এহিত অগ্রান মাস শীতে করিবেক ঘর।
নারি পুরুস আশি সবে হবে একেস্তর॥
ধন্তরে জীবন আমার আর প্রেম করারে ধন্ত।
আমার কি নারী পুরুস সদা থাকি ভিন্ন॥
* * * *
এই ত চৈত্র'না মাসে সুর্জ্জের তপনে।
এক ঠাঁই আছে জারা বাঁচে এ দহনে॥
এতেক বিচ্ছেদানল আর সুর্জ্জের তপনে।
কিরূপে বাঁচিবে প্রাণ এ দুই দহণে॥"

—কন্তার রূপ বর্ণন—

"তবে কি তেমন রূপ আছে ত্রিভুবনে।
বুজে দেখ বন্দুগণ ভাবি মনে মনে॥
চন্দ্র আদি তিন লোকে আছে জীব যত।
তার মদ্ধে জার জেই অঙ্গ মনোমত॥
* * * *
কেড়ে লিল চমরা হৈতে চারু চুল।
কেড়ে লিল নাসীকা জিনিয়ে তিল ফুল॥
কেড়ে লিল মুখ ছাদ চান্দে ক্ষুণ্ণ করি।
কেড়ে লিল নয়ন খঞ্জন পক্ষি ধরি॥
কেড়ে লিল ধর-ধনু সে ভুরু ভ্রিজিতে।
কেড়ে লিল কর্ণদ্বয় গৃধীনী হইতে॥
কেড়ে লিল কোকিলের কল করি ভাস।
কেড়ে লিল চঞ্চলা করি হাঁস॥
* * * *
কেড়ে লিল কটী হয়ে করি অরি অরি।
কেড়ে লিল নিতম্ব মেদীনী মাটী করি॥
কেড়ে লিল বাহ্মা পদ কোকনদ হইতে।
কেড়ে লিল সবার সর্ব্বস্ব এই মতে॥"

অতি আধুনিক কেতাবের ছন্দ এইরূপ—

"পূর্ব্বে এ সকল যদি বলিতে আমায়।
কদাচ ইহার বিভা না দিতুম তোমায়॥
এসব আমার দোষ তোমার কিছু নাই।
আপন বুদ্ধের দোষে তোমায় হারাই॥
তুমিই মজিয়া গেছ ছুটের পিরীতে।
তবে সে হয়েছে সাধ অন্তরে সেবিতে॥"

* * * *

বাহারদানেশ—পারস্য ভাষা হইতে অনূদিত। অনুবাদক শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ রায়, ১৩২০ সাল। বিবরণ এইরূপ,—

পশ্চিম দেশে 'মুরজ' নামে এক নগর ছিল। সে দেশের রাজার নাম বিজয়। তিনি নিঃসন্তান, কাজেই তাঁহার প্রাণে এক বিন্দু শান্তি ছিল না। এই বিশাল রাজত্ব তাহার মৃত্যুর পর কে ভোগ করিবে! তিনি একটি পুত্রের আশায় ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে আরাধনা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর তুষ্ট হইলেন, মহারাণী গর্ভবতী; নগরের দিকে দিকে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। যথাসময় রাণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। কুমারের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরবী, ফার্সী, জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র বড় হইয়া প্রায়ই মৃগয়ায় যাইতেন। একদিন মৃগ শিকার করিতে যাইয়া তিনি একটি সারীপক্ষী প্রাপ্ত হন। পক্ষীটি সুন্দর মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারিত। যুবরাজের সম্ভোগের জন্য কয়েকজন যুবতী সখি ছিল। তন্মধ্যে মহের,পরওয়ার নাম্নী সহচরীটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী। সে একদিন দর্পণে স্বীয় রূপ দেখিয়া যুবরাজকে বলিল, 'আমার চাইতে রূপবতী পৃথিবীতে কেহই নাই।' তখন সারীপক্ষী বলিল, 'আরবদেশের রাজনন্দিনী বহরওরবাগুর দাসীর তুল্য সুন্দরী এ নহে।' যুবরাজ মতিমান, জাঁহাদার সুলতান তাঁহার জন্য পাগল হইলেন। তিনি আহার নিদ্রা পরিহার করিলেন।

মন্ত্রীপুত্র সাবাজ যুবরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ঐ দেশের বেনজির রাজে এক চিত্রকরকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রীপুত্র যুবরাজের অনুরোধে বাণিজ্য করিবার জন্য সাগর পাড়ি দিয়া দীর্ঘদিন পরে আরবের উপকূলে জাহাজ নঙ্গর করিলেন। চিত্রকর বণিকবেশে রাজনন্দিনীর রাজধানী যায় ও যুবরাজের ছবি দেখাইয়া তাঁহাকে পাগলিনী করে। অনন্তর রাজ-দুহিতারও এক চিত্র আঁকিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ কুমারকে দেখায়। ফলে কুমার মেহেরপরওয়ারকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পাত্র মিত্র-সভাসদ্ মিলিয়া দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিলেন,—মেহের ব্যাভিচারিণী, বিশ্বাসঘাতিনী ও পলাতক। কিন্তু ইহাতে কুমারের মন পরিবর্ত্তিত হইল না। এমনি প্রেমের জোর! বহু কষ্ট, বিপদ-আপদ উল্লঙ্ঘন করিবার পর উভয়ের মিলন হইল। ইহাই "বাহারদানেশ" নামক মিলনাত্মক পুঁথির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। ইহাতে নায়ক-নায়িকার নাম বড়ই অদ্ভুত। এই সব দেশের নাম বা রাজার নাম কোন ইতিহাস-ভুগোলে নাই। পুঁথিখানির ছন্দ, বন্ধ ও চরণ সুনিয়ন্ত্রিত না হইলেও ইহা করুণ ও চিত্তাকর্ষী।

জহুরা বিবীর কেচ্ছা—মুন্সী তাজউদ্দিন মোহাম্মদ প্রণীত। এই পুঁথিখানি ১২৮১ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ লেখা সমাপ্ত হয়। ইহাও যোগান্ত কেচ্ছা। পুথির বিবরণ এইরূপ,—

হিন্দুস্থানে এক প্রবল পরাক্রমশালী বাদশাহ্ ছিলেন। ইরাণ, তুরাণ, শাম, রুম প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গ তাঁহাকে কর দিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম বাহরাম। ঐ দেশের উজিরের এক কন্যা ছিল—তাঁহার নাম জহুরা। উভয়কে দেখিতে পরম সুন্দর এবং তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁহারা একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে উভয়ের প্রেমভিখারী হইলেন। কথা ক্রমে বাদশাহর কর্ণে পৌছিল, ফলে জহুরা অন্তরীণ হইলেন। এই নির্ম্মম সংবাদ শ্রবণে শাহজাদা পাগলের প্রায় হইলেন। তখন বাদশাহ তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। নির্ব্বাসিত যুবরাজ প্রবাস হইতে জহুরাকে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। বাহক যথারীতি পত্র জহুরার নিকট গোপনে পৌছাইয়া দিল। [illegible] নমুনা দেখুন,—

—বাই অলির গীত রেক্তা—

"রোতা হায় দেল্ হামারা গমে এক্কে দহে মনো,
নাহি মানে মরি প্রাণে দেখে তোমার গোল বদনো ॥
পড়ে তেরী এক্ কাদে দেল্ মোরা ওঠে কেন্দে,
মুখ তেরী মেছলে চাঁদে না দেখে প্রাণ হয় দাহনো ॥
আহুতি লেখা তেরী ; ছেনলিয়া দেল্ হামারা,
হোতা হেয় পারা পারা ; আর নাহি বাঁচে জীবনো ॥
জেয়ছা তু আরব হোকে কেরতা হেয় চারিদিকে,
চাতকী ছুয়ছে দেখে, আছে হয়ে আসা মনো ॥"

অতঃপর দুঃখ-দৈন্য ও দুর্বিপাকের ভিতর দিয়া উভয়ের মিলন ঘটে। বাহ্‌রাম পিতৃবিয়োগে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শূন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। প্রজাগণ বাহ্‌-রামের অমায়িক ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া রাজ-দম্পতীর দীর্ঘ-জীবন কামনা করিল। ইহাই এই পুঁথির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

লালমতী-শাহ্‌জামাল—এয়মন দেশের বাদশার একমাত্র পুত্র শাহজামাল। আর এক দেশের বাদশাহ্ আহিরদ্-দীনের একমাত্র দুহিতা লালমতীর সহিত শাহজামালের বাল্যকালে বিবাহ হয়। আপন আপন পিতৃভবনে থাকিয়া উভয়ে কৃতবিদ্য ও বয়স্ক হইলেন। কিন্তু শাহজামাল জরিনা নারী এক মালিনীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করেন। জরিনার কৌশলে লালমতীর কোনও সংবাদ কেহ আনিতে পারিত না। পরে কোন গতিকে শাহ্‌জামাল লালমতীর এক পত্র পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ম অতিমাত্র ব্যগ্র হন। নিশীথ রজনীতে শাহজামাল ঘোড়ায় চড়িয়া লালমতীর পিতৃভবনে যাইয়া পৌঁছেন। জরিনা এই সংবাদ পাইয়া এক যাদুকরের সাহায্যে লালমতীকে নির্ব্বাসিতা করিয়া তাঁহাকে অশেষ প্রকার কষ্ট দেয়।

শাহজামাল অহর্নিশি অনুসন্ধানের পর চীনরাজ্যে লাল-মতীর খোঁজ প্রাপ্ত হন। চৈনিক রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিতে বহু চেষ্টা করেন ; কিন্তু সতী মেয়ের সতীত্বপ্রভাবে তাঁহার সকল শ্রম ব্যর্থ হয়। শাহ্‌জামাল একদা চীন সেনা-দলকে পরাস্ত করিয়া লালমতীকে উদ্ধার করতঃ এয়মন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবং হিংসুক জরিনাকে হত্যা করিয়া নির্ভয়ে ও সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইহাই পুঁথির মূল মর্ম্ম।

ছহি সোনাভান—সৈয়দ হামজা মরহুম সাহেব প্রণীত, ২১ পৃষ্ঠা। এই পুঁথিখানি ক্ষুদ্র হইলেও বেশ রসাল ও হাস্যোদ্দীপক। এই শ্রেণীর পুঁথি নিছক কল্পিত ; ঐতিহাসিক সত্য একদম নাই ইহাতে। পুঁথির রচয়িতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিভূষিত না হইলেও তাঁহাদের কবিত্বশক্তি ও বর্ণনাচাতুর্য্য যে অসাধারণ—তাহা পুনরায় বলাই বাহুল্য। মার্জ্জিত ভাষায় লিখিত হইলে কোন ভাল উপন্যাস হইতে ইহা হীন নহে। এই পুঁথিখানি সিলেট নাগ্‌রী টাইপে ও বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত দেখা যায়। ইহার নায়ক মোহাম্মদ হানিফা পাহলওয়ান। ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। পুঁথির বর্ণনায় ইঁহার তিন স্ত্রী, যথাক্রমে সমুর্ত্তাভান, জৈগুন ও মল্লিকা আকার। বীররমণী সোনাভানকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবার মানসে স্বামী-স্ত্রী তিনজনে মিলিয়া টুঙ্গির সহর অভিমুখে যাত্রা করেন। চারিজনে আলাদা ভাবে সোনাভানের সহিত যুদ্ধ করেন। অতঃপর সমুর্ত্তাভানের পরাক্রমের কাছে সোনাভান মাথা নত করিতে বাধ্য হন। পূর্ব্বোক্ত পত্নীত্রয়কেও হানিফা যুদ্ধে হটাইয়া দিয়া বিবাহ করেন। অতঃপর বিধর্ম্মী-ললনা সোনাভানকে বিবাহ করিয়া হানিফা গণ্ডা পুরাইলেন। মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত "বিষাদসিন্ধু" নামক বিরাট-কলেবর গ্রন্থে হানিফার কথা উদ্ধারপর্ব্বে প্রসঙ্গতঃ যাহা লেখা হইয়াছে তাহা অনেক স্থলে কাল্পনিক। কিন্তু সোনাভানের পুঁথিতে বর্ণিত আজগোবী কথা অন্ততঃ তাহাতে নাই। পুঁথির ছন্দে হানিফা ও সোনাভানের ঝগ্‌ড়া, এবং সোনাভানের সজ্জার নমুনা,—

"হানিফাকে সোনাভান দেখিবারে পায়।
আশিমণ লোহার কড়া দিয়া আসে পায় ॥
দশমণ লোহার টোপ দিয়াছে মাথায়।
আটমণ লোহার জেরা বান্ধিয়াছে গায় ॥
সোনাভান বলে শুন বিদেশী সওয়ার।
কোথা হইতে আইলে তুমি কি নাম তোমার ॥
পাহলওান কহে বিবি নাহি চেন তুমি।
হানিফা আমার নাম তোমার সোয়ামি ॥

বিবি বলে নেড়ে তোর না হৈল সরম।
কোন্ মুখে কথা কও কিসের ভরম॥
হানিফা কহেন মেরা সরমে কি করে।
টিকিতে না পারি আমি দেখিয়া তোমারে॥

* * * * *

সোনাভান বলে নেড়ে কত জান মায়া।
চাপড়ে ভাঙ্গিব দাঁত শুনরে বেহায়া॥
হানিফা বলেন শুন বেহায়া আওরত।
বেদায়েতে পেয়ে মোরে বাড়িল হেম্মত॥
জবান দাবিয়া বাত কহরে বৈতাল।
নহেত পয়জারে তেরা উড়াইব খাল॥"

ইউছফ জোলেখা—ইঁহারা শুধু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন; পবিত্র মহা-কোরাণেও ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লেখা আছে। কেতাবের বর্ণনা আগা-গোড়া অমূলক। আজীজ মেছেরের পত্নী জোলেখা পয়গম্বর ইউছফকে ভালবাসিতেন। ইউছফ এয়াকুব নবীর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ভ্রাতাদের ষড়যন্ত্রে নির্ব্বাসিত হন, কিন্তু জনৈক বণিক কর্ত্তৃক মিসরের এক বণিকের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন। তাঁহার রূপ দেখিয়া মিশরের রমণীরা অজ্ঞান হইয়া গেল। কতজনে স্বামী, পুত্র, ঘর ছাড়িয়া উন্মাদিনী বেশে উন্মুক্ত বক্ষে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধ আনন্দে বিভোর হইয়া রূপবান ইউছফকে দেখিল। কতজনে রিপুর তাড়নায় ব্যর্থ আশায় জ্বলিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। জোলেখাও ইউছফের রূপ দেখিয়া মজিলেন। আজীজ মেছের জোলেখাকে স্ত্রী ভাবিলেও জোলেখা তাঁহাকে কখনই স্বামীত্বে বরণ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেন নাই।

ইউছফকে দাসরূপে জোলেখা ক্রয় করিয়া তাঁহাকে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে বহু অনুরোধ করেন। কিন্তু পরস্ত্রী জ্ঞানে ইউছফ ভুলিয়াও তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হন নাই। জোলেখার মত সুন্দরী তৎকালে ইজিপ্টে দ্বিতীয় ছিল না। এইরূপে উভয়ে সারাটী জীবন ব্যর্থতার ভিতর দিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের জীবনচরিত বিয়োগান্তক। "ইউছফ-জোলেখা" নামক একখানি হিন্দু-লিখিত নাটকও আছে।

লায়লী মজনু—ইঁহারাও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মজনুর আসল নাম কয়েস। তিনি লাইলীর প্রেমে পড়িয়া মজনু অর্থাৎ পাগল হইয়া যান। উভয়ের মধ্যে প্রণয় এত গভীর হয় যে একজনের আঙ্গুল কাটিলে অন্য জনের ঠিক সেই আঙ্গুল আপনা হইতে কাটিয়া যাইত। প্রত্যেকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে প্রেমার্থীর নাম দৈবীশক্তি বা প্রেমশক্তি প্রভাবে উচ্চারিত হইত। ইঁহারা চির অবিবাহিত। নানা কারণে উভয়ের বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। মৌলবী ফজলুল করীম সাহেবের লেখা একখানি সুন্দর "লাইলী-মজনু" ঐতিহাসিক উপন্যাস আছে।

শিরী-ফরহাদ—ইস্পাহানের ফরহাদ শিরীর প্রেমাসক্ত হন। শিরীও ফরহাদকে অন্তর দিয়া ভালবাসেন। শিরীর পিতা ফরহাদকে দুর্গম-দুস্তর পাহাড় কাটিয়া রাস্তা তৈয়ার করিতে আদেশ করেন। ঐ কার্য্যে সফল হইলে তাঁহাকে কন্যাদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। ফরহাদ ভাল ভাস্কর ছিলেন; তিনি কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার প্রত্যেক ঘাত-প্রতিঘাতে কঠিন পাষাণ গাত্রে এক একটি শিরীর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই কার্য্য শেষ করিতে ফরহাদ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন। এ দিকে শিরীও ফরহাদের অপেক্ষায় কুমারী রহিলেন। আভিজাত্যের দিক দিয়া শিরীর পিতার ইচ্ছা ছিল না যে, স্বীয় গুণবতী কন্যা ফরহাদের ন্যায় একজন সাধারণ ভাস্করকে সমর্পণ করেন। তাই তিনি এইরূপ অসম্ভব আদেশ করেন, একমাত্র উভয়ের গভীর প্রণয় তিরোহিত করিবার জন্য। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায়। অনন্তর জনৈক নগর-বাসী কৌতূহলপরবশে কর্ম্মশ্রান্ত ফরহাদকে শিরীর মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দেয়, ফলে তখনি ফরহাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই নিদারুণ সংবাদ পাইবামাত্র কুমারী শিরীও মুহূর্ত্তে মৃত্যুর মিলন-ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়েন। দুইটি দীপ নির্ব্বাপিত হইল। ইঁহাদের জীবনও মিলনান্তক নহে। উপরোক্ত তিন জোড়া নায়ক নায়িকার প্রেম স্বর্গীয় ও নিষ্কাম। মৌলবী নাসির-উদ্দীন সাহেব রচিত "শিরী-ফরহাদ" নামক একখানি উপাদেয় ঐতিহাসিক উপন্যাস চিত্রাদিসহ বাহির হইয়াছে। অধুনা সিনেমায় ইঁহাদের জীবনচরিত দেখান হইতেছে।

ইউছুফ-জোলেখা, শিরী-ফরহাদ লায়লী-মজনু প্রভৃতির আরবী ও উর্দ্দু সংস্করণও আছে। পুঁথিগুলি যারপরনাই অতিরঞ্জিত, এবং অবাস্তব ও অযৌক্তিক কথায় পূর্ণ।

গাজী-কালু-চাম্পাবতী—শারের মুন্সী আবদুর রহীম। গাজী মুকুট রায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করতঃ রাজকন্যা চাম্পাবতীকে বিবাহ করেন। গাজীর সৈন্য ছিল বাঘ এবং মুকুটরায়ের সৈন্য ছিল কুমীর। কিন্তু জলের কুমীর ডাঙ্গায় দুর্ব্বল বলিয়া বাঘের সহিত পারিয়া উঠে নাই। [এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্য জানিতে হইলে আমার লিখিত ও "প্রবর্ত্তক" পত্রিকায় ১৩৩৬ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "গাজী-কালু-চাম্পাবতীর ইতিকথা" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য] গাজী মিয়ার বিয়ে ও কালু-গাজী-চাম্পাবতী নামক আরও দুইখানি পুঁথি বাজারে দেখা যায়। শেষোক্ত পুঁথিখানির লেখক শেখ্ মোহাম্মদ মুন্সী। এখানা নকল পুঁথি বলিয়া পরিচিত। ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

কাছাছল আম্বিয়া—মুন্সী তাজউদ্দিন মোহাম্মদ খাজের সাহেবান প্রণীত,—৫০০ শত পৃষ্ঠার উপর। মুন্সী রহমতুল্লা সাহেবের অনূদিত আরো একখানি "কাছাছল আম্বিয়া" অথবা পয়গম্বর কাহিনী (Lives of Prophets) দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই খানি বহু প্রাচীন। এই দুইখানি পুঁথিই পারস্য ভাষা হইতে অনূদিত। এই অতিকায় কেতাবে আদিপিতা হজরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে হজরত এয়াকুব, হজরত লুৎ, হজরত ইউছুছ, হজরত আইউব, হজরত শিশ্, হজরত ইছা (Jesus) হজরত ইব্রাহিম (Abraham), হজরত দায়ুদ (David), হজরত ইউছুফ্ (Joseph), হজরত মুছা (Moses) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নবী বা ঐশী বার্ত্তাবহদের জীবন কথা আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে প্রসঙ্গতঃ স্বর্গের বর্ণনা, শেষ বিচারের বর্ণনা ও যমদূতের কথা অতি সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত হজরত মোহাম্মদ, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী লিখিত হজরত মোহাম্মদ, আব্দুর রহীম লিখিত হজরতের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি, ইমদাদুল হক্ সাহেবের "নবী কাহিনী" ফজলুর রহীম সাহেবের "পয়গম্বর কাহিনী," মনসুর সাহেবের "মুসলমানী কথা" প্রভৃতির উপর কেন্দ্র করিয়াই আলোচ্য কাছাছল আম্বিয়া লিখিত বলিয়া আমার মনে হয়। উল্লিখিত পুস্তকগুলি ও কাছাছল আম্বিয়ার ইতিবৃত্ত মূলতঃ এক। তবে পুঁথিখানি বাস্তবতা ও দীর্ঘ অতিরঞ্জনের সংমিশ্রণে রচিত।

মুন্সী রহম তুল্লা সাহেবের অনূদিত "কাছাছল আম্বিয়া" হইতে আদি মানব ও মানবী হজরত আদম (Adam) ও হাওয়া (Eve)এর স্বর্গচ্যুতির বর্ণনায় প্রাচীন বাঙ্গলা-ফার্সী মিশ্রিত খিচুড়ী ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দেখুন :—

"সরন্দীপে ফেলে আদম ইবলিচের তরে।
হাওয়া বিবিকে ফেলে জেদ্দার সহরে॥
সরন্দীপে কেন্দে ফেরে হজরত আদম।
হাওয়া বিবির কারণেতে করে বড় গম॥
আদম কান্দিয়া ফিরে দরিয়া ধারেতে
আঁখী হৈতে আঁছু তার পড়ে যেখানেতে॥
খোরমা লবঙ্গের গাছ সেখানেতে হৈল।
যে আঁছু দরিয়ার গিরে মতী হয়ে গেল॥
এইরূপে আদম ছফি কান্দিয়া বেড়ায়।
তিনসও সাল এয়ছা গোজারিয়া যায়॥"

* * *

শাহিদে কারবালা—মোহাম্মদ মুন্সী প্রণীত,—প্রায় ৫০০ শত পৃষ্ঠা। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রিয় দুহিতা ফতেমার পুত্র হাসান ও হোসেনের সহিত "কারবালা" প্রান্তরে দামস্কসের রাজা এজিদের সহিত যে যুদ্ধ হয় এই পুঁথিতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বিধর্ম্মী এজিদ এই যুদ্ধে জয়ী হন এবং হাসান, হোসেন, কাসেম, ও হাব প্রভৃতি মহাবীরগণ পিপাসায় অতীব কাতর হন, পরে শহীদ অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হন। ইহাই বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল।

পরী সর্দ্দার ইমামদ্বয়ের পক্ষে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ইমাম তাহার এ সদুদ্দেশ্যে রাজী হইলেন না; কারণ ইহা বিধির লিখন। অনন্তর জাফর ছাদেকও ইমামকে সাহায্য করিতে চাহেন—তিনি একেবারে প্রত্যাখ্যাত হন নাই। তিনি সংবাদ দাতা হিসাবে পয়গাম হানিফার নিকট প্রেরিত হইলেন। মুন্সী এয়াকুব আলী

সাহেবের জঙ্গনামা ঠিক এই অনুকরণে লিখিত হইলেও তাহার দিক দিয়া ইহার তুল্য নহে। খাঁটী ইতিহাসের সহিত এই পুঁথির মিল যে সাগরে বারিবিন্দুবৎ তাহা বলাই বাহুল্য।

হজরত হাসানের পুত্র কাসেমের সহিত হজরত হোসেনের কন্যা সখিনার যুদ্ধক্ষেত্রে বিবাহ হইবার বয়ান। হজরত মোহাম্মদ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এই বিবাহ দিতে দৌহিত্র-দ্বয়কে আদেশ করিয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু নিয়তির নির্ব্বন্ধে সেই পবিত্র বিবাহ যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পাদিত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়। ইহার ক্ষণপরেই কাসেম যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হন এবং সদ্যবিবাহিতা সখিনা বিধবা হন। এই দৃশ্যটী বড়ই করুণ।

কেয়ামত নামা—মুন্সী আমান উল্লাহ প্রণীত। নামেই গ্রন্থের পরিচয়। এই পুঁথিখানিতে শেষ বিচারের দিনের পূর্ব্বে দুনিয়ার যে সমস্ত বিপ্লব, অশান্তি প্রভৃতি হইবে প্রধানতঃ তাহাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যথা—দজ্জালের আবির্ভাব, আছমানী নূরের খবর, পোল ছেরাত, দোজখের আগুনের বয়ান ও হাসরের মাঠের বর্ণনা ইত্যাদি।

জঙ্গে খয়বর—মুন্সী দোস্ত মোহাম্মদ বিরচিত। এই কেতাবখানি আগাগোড়া যুদ্ধ-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। "খয়বরের জঙ্গনামা" নামে ঠিক এই ধরণের আর একখানি কেতাব দেখা যায়। ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু? খয়বর কোথায়? যদি 'খাইবার' হয়, তবে কোন্ কালে তথায় কি যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছিল? তবে এই পুঁথিখানির বর্ণনা চমৎকার ও মনোগ্রাহী। কবি স্থানে স্থানে বেশ রসিকতাও করিয়াছেন—

তেছরা রাতে ওমর ওদিয়ার যায়া বাদসার দাড়ি-মোচ মুড়াইবার বয়ান। নমুনা—

"শুইয়া রহিল বাদ্সা তক্তে আপনার।
খাড়া চৌকি দেয় কত সেপাই তাহার॥
যখন হইল বাদ্সা নিন্দে অচেতন।
আস্তে আস্তে যাইয়া তথায় ওমর তখন॥
দাড়ি মোচ তাহার দাবায় মোড়াইয়া।
আবরু উপর তার নিল্ রঙ দিয়া॥
কপালে তিলক ফোটা লাগায় তাহার।
উপটন মলিন মুখে দেখিতে বাহার॥"

* * * *

আমীর হামজা—শাহ গরীব উল্লাহ ও সৈয়দ হামজা প্রণীত। এই পুঁথিখানিও প্রকাণ্ড, ইহার প্রথমভাগ গরীব উল্লার ও দ্বিতীয় ভাগ হামজার লিখিত। গ্রন্থখানিতে লেখকের কল্পনার বাহাদুরী যথেষ্ট। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পিতৃব্য নির্ভীক যোদ্ধা আমীর হামজা এই পুঁথির নায়ক এবং নওশেরোয়ার কন্যা মেহের নেগার নায়িকা। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিতেন, পরে কোন উপায়ে রাজপুরী হইতে মেহেরকে লইয়া আমীর হামজা বিবাহ করেন। হামজা প্রথমে কাফের অর্থাৎ বিধর্ম্মী ছিলেন, পরে ইস্লাম গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাজশক্তিকে একে একে পরাজিত করিয়া রাজা বাদশাহদিগকে ইস্লাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। তিনি আঠারো বৎসর যাবৎ কোহকাফ দেশে যাইয়া দৈত্যদের সহিত লড়াই করিয়া তাহাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া দেন।

পারস্য অধিপতি নওশেরোঁয়া পাত্র-মিত্রের প্ররোচনায় আমীর হামজার বিরুদ্ধাচরণ করেন, ফলে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে নওশেরোঁয়া হারিয়া যায়। এইরূপে বহু রাজা মহারাজাগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া স্বীয় দল বৃদ্ধি করেন। আমীরের শেষ পরিণতি,—তিনি হিন্দিয়া নাম্নী এক বীররমণীর কাছে পরাভূত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হন। আমীর একদিকে বীর-যোদ্ধা, অন্যদিকে দয়া, মমতা, প্রেম, ক্ষমা, অনুতাপ প্রভৃতি গুণের আধার ছিলেন। "খয়বরের জঙ্গনামার" মত ইহাতেও উদ্ভট-উদ্ভট বর্ণনা আছে। এবং "সোনাভানে"র মত আমীর হামজার হাতিয়ার অলঙ্কার ধরণের, যথা—হাতে হাজার মণের গোর্জ্জ, তাঁহার হাঁকের দিগন্তব্যাপী শব্দ "আয়ে দিকে" খোড় প্রদীপ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানযুগের আবিষ্কৃত আর্টিলারি হাউইটজারের শব্দ কমজুর যায়। আমীরের সাজসরঞ্জাম ঘোড়া, "জরজরী", "সাইতন", "এক্তেক", "কমন্দ" "মুক্তার"

প্রভৃতি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন যোদ্ধা। আমীরের অশ্বের নাম "চুল্ চুল্" ও "মেজী"—সুশিক্ষিত, তেজী ও অসম্ভব বেগবান। এই পুঁথি পড়িয়া হঠাৎ "রামায়ণের" লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত চারিটী লাইন মনে পড়িয়া গেল,—

"লঙ্কায় আছিল গাছ দশক্রোশ গোড়া।
গাছের বাড়িতে রথ করিলেক গুড়া॥
হনুমানের মত বীর না হেরি ভারত মাঝারে॥
বিন্ধ্যাচল ঘাড়ে লয়ি মারিল তাহারে॥"

"আমীর হামজা" গরীবুল্লার বর্ণনা হইতে কয়েকটী লাইন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

—উম্মর-উম্মিয়ার যুদ্ধ বর্ণনা—

"উম্মরের বাত শুনে কুকস্ গোস্বায়।
কামান খেচিয়া তীর উম্মরে চালায়॥
কাগজের ঢাল মর্দ্দ পাতিল সামনে।
একেবারে কুদে উঠে যেমন আছমানে"॥

* * * *

"আমীর হামজার" শেষাংশের লেখক সৈয়দ হামজার রচনা হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া গেল।

"উঠিল পাহলওান এক তেগ-লিয়া হাতে।
গোস্বায় চলিল গিধি উম্মরে মারিতে॥
উম্মর-উম্মিয়া তাজ দিলেন মাথায়।
গাএব হইল কেহ দেখিতে না পায়॥"

* * * *

এই বিরাট পুঁথিখানি গ্রাম্য অর্দ্ধশিক্ষিত লোকে সত্য আজে সুর মিলাইয়া যখন পাঠ করে, তখন অনেক নরনারীকে সেই করুণ অধ্যায় শ্রবণে কাঁদিতে দেখা যায়।

শাহনামা—মোহাম্মদ আবুল কাসেম ফেরদৌস্ তুসী "শাহনামা" নামক এই বিরাট গ্রন্থ পারস্য ভাষায় রচনা করিয়া সুলতান মাহমুদকে উপহার দেন। প্রতিদানে তিনি প্রত্যেক লাইনের মূল্য বাবদ ১টী স্বর্ণ মুদ্রা হিসাবে গ্রন্থে লিখিত ষাট হাজার লাইনের বা শ্লোকের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। ইহাকেই সাধারণতঃ ইরাণের মহিষ বা পারস্য প্রতিভা বলিয়া অভিহিত করা হয়। "শাহনামা" পুঁথি এই বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থেরই তর্জ্জমা মাত্র। অনুবাদকের ইহাতে পারদর্শিতা যথেষ্ট, তদ্বিষয়ে মতান্তর নাই। মোজাম্মেল হক্ সাহেবেরও অনূদিত "শাহনামা" সাফল্যের সহিত বাহির হইয়াছে। আমরা পুঁথি হইতে কয়েকটী লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

—তহমিনার রূপ্ বর্ণনা—

"ঠোঁটে যেন রাঙ্গা জবা মাথা ভরা কেশ।
নানা অলঙ্কার ধরি করিয়াছে বেশ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় হইয়া।
আলো করি পালঙ্গেতে রয়েছে বসিয়া॥"

* * * * *

শাহ্নামার একটি বর্ণনা অতিশয় করুণ। পত্নী তহমিনাকে গর্ভবতী দেখিয়া রোস্তম পাহলওয়ান দূরে প্রবাসে যান। বহু বৎসর তিনি প্রবাসে জীবন অতিবাহিত করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তহমিনার সোহরাব নামে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া যথাকালে তিনিও পিতার ন্যায় মহা-বিক্রমশালী যোদ্ধা নামে আখ্যাত হন। পিতৃসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা একান্ত বলবতী হওয়ায় একদিন সোহরাব মাতার নিকট হইতে একটা "পরিচয়নামা কবচ" লইয়া রোস্তমের অনুসন্ধানে বাহির হন। বহু দূরে এক প্রান্তরে জনৈক মহাবীরের সহিত সোহরাবের যুদ্ধ হয়, এবং তাহাতে সোহরাব নিহত হন। সিংহশাবক সোহরাব মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে পিতার বীরত্ব কাহিনী বিজয়ী ঘাতককে শুনাইতেছেন,—

"সোহ্রাব কেন্দে কহে রোস্তমের তরে।
শুন পাহলওয়ান তুমি মারিলে আমারে॥
দরিয়াতে থাক কিম্বা থাক আকাশেতে।
বাপ মেরা পাইলে এ খবর শুনিতে॥
যেখানেতে থাক তুমি মারিয়া তোমারে।
লিবে সে আমার দায় বুঝিবে আখেরে॥"

তখন আগন্তুক বীর বুঝিতে পারিলেন, এই তরুণ যোদ্ধা কে। এ যে তাঁহারই একমাত্র সন্তান,—তিনি স্বহস্তে পুত্র

হত্যা করিয়াছেন! তখন পুত্রহন্তা পিতা রোস্তমের খেদ :—

"জমিনে গিরিয়া গেল বেহাল হইয়া।
ছের ঠোঁকে বন ডাকে সোহ্‌রাব বলিয়া॥
কহে হায় হায়রে সোহ্‌রাব—কি করিনু।
বিনা দোষে আমি তুঝে খঞ্জর মারিনু॥
জেগর ফাটিয়া ভেয়া কৈছু পারাপারা।
শোগের জও হয়ে ছিনা চাক হৈল যেয়া।
যতদিন বেঁচে রব ছিনা হৈতে মোর!
বাহির নাহিক হবে শোগের খঞ্জর॥"

* * * *

কি করুণ বেদনা! এই কেতাব পাঠকালে অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও দুঃখে-ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়া যায়। "শাহ্‌নামা" আদি গ্রন্থের একখানা কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ও অন্য একখানা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। স্যার উইলিয়াম জোন্স "শাহ্‌নামা" সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—"(Shahnama) a glorious monument of Eastern genius and learning which if ever it should be generally understood in its original language, will contest the merit of invention with Homer himself"। এখন আমরা মূল পারস্য গ্রন্থ "শাহ্‌নামা" হইতে একটু নমুনা দিয়া মহাকবি ফেরদৌসীর "শাহ্‌নামা" আলোচনা শেষ করিব। ফেরদৌসী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সুলতানকে কবিতার দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিলেন,—ইহা তৎকালে নিয়ম ছিল।—

চুঁকাওদকে আজ শিরে মাদর বেসাত
ব-গাহওয়ারা মাহ্‌মুদ গোইয়াদনাখাস্ত"

অর্থাৎ—"শিশু মাতৃস্তন্যে রসনা সিক্তি করিয়া, প্রথম যে শব্দটী উচ্চারণ করে তাহা মাহ্‌মুদ।"

সুলতান মাহমুদ মুগ্ধ আনন্দে বিভোর হইয়া অসাধারণ প্রতিভাবান কবিকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। "আয় ফেরদৌসী,—তু দরবারে মা'রা ফেরদৌস কর্দী।" অর্থাৎ—"ফেরদৌসী, তুমি সত্যসত্যই আমার সভাকে স্বর্গে পরিণত করিয়াছ।" এই দিন হইতে কবি আবুল কাসেম, "ফেরদৌসী" নামে জগদ্বিখ্যাত হইলেন। ফৌর্দসী ৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া অমর কীর্ত্তি রাখিয়া ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কিঞ্চিদধিক নবশত বৎসর হইল ফেরদৌসীর বাণীর সুর স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার রেশ এখনো অবিকৃত থাকিয়া যুগের পর যুগ ধরিয়া তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া বিশ্বমানবের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া যাইতেছে।" "He was not for one age, but for ages to come." আলোচ্য "শাহনামা" এই জাতীয় কবির দীর্ঘ সাধনার সার্থকতার ফল।

আছরারচ্ছালাত—মুন্সী আবদুল করীম প্রণীত, ২৪০ পৃষ্ঠা। ইহা শাস্ত্রমূলক গ্রন্থ। ইহাতে নামাজ বা উপাসনার বর্ণনা, ইহুদির উপর অভিসম্পাতের বয়ান ও কয়েকটী সরস হাস্যোদ্দীপক গল্পের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের কাহিনী বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মছায়েলে জরুরিয়া—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ১৬০ পৃষ্ঠা। এই গ্রন্থখানাতে মুসলমান শাস্ত্র ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক হাদীস দলীল হইতে মুসলমানদের ধর্ম্ম সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাহির করতঃ সাধারণ শ্রেণীর উপকারার্থে পদ্যাকারে রচনা করিয়াছেন। অনেক ধর্ম্মভীরু মুসলমান অল্প বিদ্যা লইয়া বড় বড় শাস্ত্রকারদের লেখা বইতে দন্তস্ফুট করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা এই গ্রন্থ পড়িয়াই ধর্ম্মালোচনা ও গবেষণার আনন্দ পায় এবং দৈনন্দিন কর্ত্তব্য বাছিয়া লয়। ইহাতে হজ্বের মাহাত্ম্য, দানের মাহাত্ম্য, পাপের শাস্তি, বিবাহের নিয়ম এবং উহার উপকারিতা, পর্দাপ্রথার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

আমরা ঐতিহাসিক গল্প, জীবনী, শাস্ত্র, নীতিমূলক কেতাব বা পুঁথি সমূহ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধে মোটামুটিভাবে আলোচনা করিলাম। ইহাতে যদি কেহ উপকৃত হন, ও পাঠক সমাজের আরো জানিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ বর্দ্ধিত হয় তবে বারান্তরে এই সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

আধুনিক সাহিত্যের জয়

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ

ঢাকা সহরের রমনা অঞ্চলের একটি দোতলা বাড়ীর উপরের ঘর। ঘরটি বাসর ঘরের মত করিয়া সাজানো। অপরিহার্য্য আসবাবের মধ্যে আছে একটি খাট, তাহাতে বিছানা পাতা রহিয়াছে; একটি টেবিল, তাহার পাশে গোটা দুই চেয়ার; টেবিলের উপর একটি দোয়াতদানি, তাহাতে একটি ফাউন্‌টেন্ পেন; এবং তাহার পাশে একটি রুলটানা রাইটিং প্যাড্। যবনিকা উঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে শানাইয়ের বাজনা, কিছু পরেই বাহিরে গোলমাল এবং তাহার পরেই ভিতরে লোকপ্রবেশ। লোক প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই শানাই বাজানো বন্ধ।

রমেশবাবু — ঢোক্ বলছি, ঢোক্!
অনিল — (বাহির হইতে প্রায় সমস্বরে) ঢোকনা অশোক!
সতীশবাবু — ঢোক মীরা!
বীণা — ঢোকনা মীরা!

রমেশবাবু। (স্টেজের পিছনে দরজার কাছে, এখন দেখা যায় এমন স্থান হইতে) তবুও দাঁড়ায়ে রইলি। আরে নবাবের পুত্র, আমি হ'লাম একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, তিন বছর হ'ল officiate করছি। শীগ্‌গিরই Permanent হব। আমার চোখের ইঙ্গিতে একটা জেলার লোক ওঠে বসে, আর আমার ছেলে হয়ে' তোর কানেই যাচ্ছেনা আমার কথা! ঢোক্ বলছি গাধা, নইলে মারব এক ধাক্কা। (টানিতে টানিতে) জোর করিসনে বলছি, এক ঘুঁষিতে তবে মাথা দেব ফুটো করে'। (এক ধাক্কা দিয়া অশোককে ভিতরে ঠেলিয়া ফেলিয়া) ঢোক্ ভেতরে, বাইশন কোথাকার!

(অশোককে এখন পরিষ্কার দেখা যায়। তাহার মাথায় বিয়ের মুকুট)।

সতীশবাবু। (ভিতরে টানিয়া আনিয়া) শোন মীরা! তোমাকে আমি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছি, কোনদিন তোমার কোন কাজে বাধা দিইনি। কিন্তু সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে। আজ তুমি বিয়ের আসরে যা' করেছ তারপর আমি ভদ্রসমাজে মুখ দেখাব কি করে' ভেবে পাচ্ছিনে। সে যাই হোক, যা হবার তা হয়ে' গেছে, এখন আর কোন কেলেঙ্কারী কোরনা। এখন যদি কিছু কর, তবে মনে রেখো, তোমার মা নেই, আজ থেকে বাপও হারাবে। (মীরাকেও এখন দেখা যায়। তাহার পরণে চেলি, মাথায় বিয়ের পট। বর ও কনে' দুজনেরই মুখ নীচু)

রমেশবাবু। আর তুই যদি এখন কিছু গোলমাল করিস, তবে মনে রাখিস্ গোঁয়ার তোর বাপ আছে, মাও আছে, তাদের কাউকেই হারাবি না, হারাবি তোর নাক, মুখ, চোখ কিংবা তোর প্রাণটা। ইস্! ক'দিন থেকে আমাকে কি জ্বালিয়ে মারলে! একেবারে পাগল করে' ফেল্‌লে! সেই শেয়ালদা ষ্টেশনে এসে বলে, গাড়ীতে উঠবে না, গোয়ালনন্দ ঘাটে নেমে বলে ষ্টীমারে উঠবে না, ঢাকা ষ্টেশনে এসে বলে গাড়ী থেকে নামবে না, বিয়ের লগ্ন উপস্থিত হলে' বলে আসরে যাবে না! এখন আবার বলে কিনা বাসরে ঢুকবে না! কেন ঢুকবি নারে অকালকুষ্মাণ্ড? বাসরে বাঘ আছে নাকি রে শেয়াল?

অনিল। ওর এ বিয়েতে মত নেই, সে তো আপনাকে বহুবার বলেছে।

রমেশবাবু। মত নেই! তোর আবার মত কিরে অর্ব্বাচীন? কেন মত নেই? আরে রাতকানা, তুই যে ওকে বিয়ে করতে চাস্‌নে, ওর সঙ্গে তোর তুলনা হয়? ওর পাশে তো তোর মুখটা দেখাচ্ছে ঠিক যাত্রার যাত্রের মুখের মত!

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে প্রথম অভিনীত।

সতীশ। তুলনার কথা ছেড়ে দাও রমেশ। তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের কখনও তুলনা হয়! কোন মেয়ের এরকম বর পেতে হলে গৌরীর মত সাতজন্ম তপস্যা করতে হয়। (নীরার প্রতি) আর তুমি? তুমি তো শুধু পিং পং আর ব্যাড্‌মিন্টন্ খেলেই চিরদিনটা কাটালে! তুমি কোন মুখে বল এ বিয়ে করবেনা? বাংলা দেশে ক'টা মেয়ের ম্যাজিস্ট্রেট শ্বশুর আছে বলতে পার?

নীরা। শ্বশুর দেখে তো আর ইচ্ছা অনিচ্ছা হয় না! বাংলাদেশে ম্যাজিস্ট্রেট শ্বশুর হয় তো খুব বেশী পাওয়া যায় না কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বর পাওয়া খুবই যায়। আজকাল তো ঝুরি ঝুরি লোক আই-সি-এস্ দিচ্ছে।

অনিল। কিন্তু ঝুরি ঝুরিই আর আই-সি-এস্ হচ্ছে না। বাংলাদেশে কোনবার একটা কোনবার বা একটাও না। ঝুরি ঝুরি দিলে কি হবে, আপনি যদি আই-সি-এস্ না হলে' বিয়ে করবনা এই পণ করে' বসে' থাকেন তবে দেখতে পাবেন, ছেলেরা আপনাকে বুড়ী বুড়ী বলছে, তবুও আপনার বিয়ে হচ্ছেনা।

(ইহার পর হইতে অনিল ও নীরার মধ্যে পরস্পর রোষ-কষায়িত দৃষ্টি-বিনিময়।)

সতীশ। ঠিক বলেছেন। আই-সি-এস তো দূরের কথা, বি-সি-এস্ই বা ক'টা লোক হতে পারে! তবুও তো আজকাল একটু সোজা হয়েছে। আমরা যখন বি-সি-এস্ দিই তখন কি শক্তই না ছিল! রমেশ অবশ্য একবারেই পাশ করে' গেল,—সে ছিল বরাবরই ইউনিভার্সিটির সেরা ছেলে; কিন্তু আমিও তো বরাবরই ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করে' এসেছি, আমি তিনতিনবার পরীক্ষা দিলাম কিন্তু তিনতিনবারই ফেল্ করলাম। শেষে নমিনেশনে ডেপুটী হ'লাম। সবাই কি আর আই-সি-এস্, বি-সি-এস্ হতে পারে?

রমেশ। চুপ করো সতীশ। এখন এসব বাজে কথা বলো না। সবাই না পারে না পারুক, কিন্তু কারো কারো তো পারা উচিত! আমার ছেলে হয়ে ও আই-সি-এস না হোক, অন্ততঃ বি-সি-এস্ টা তো পাশ করা উচিত ছিল! কিন্তু কি করল? ওরে [illegible], ওরে বিশ্বকর্মার পুত্র [illegible], ওরে [illegible], তোর ঘটে কি এমন এক ফোঁটা বুদ্ধিও ছিল না যাতে অন্ততঃ একটা পাশও করতে পারতিস্! আবার কিনা বলিস্ ওকে বিয়ে করব না! কেন করবি না রে টিক্‌টিকির ডিম? ওতো তবু বি-এ পাশ করেছে। আর তুই? তুইতো এল্-এ ফেল্!

অনিল। এল-এ ফেল্ না মামা, আই-এ ফেল্। আজকাল আর আপনাদের সেই এল-এ নেই, সব আই-এ আর আই-এস্সি হয়েছে।

রমেশ। তা' হোক্ গে। সেই আই-এও তো তুই পাশ করতে পারলি না রে অবুঝ! দু' দু' বার ফেল্ করলি!

অনিল। আপনি ওর ওপর অন্যায় করছেন মামা। ও হয়তো আই-এ পাশ করতে পারেনি, কিন্তু ওদিকে তো আর্ট স্কুলের ফার্ষ্ট ক্লাশ ডিপ্লোমা পেয়েছে। সবারই জীনিয়স্ তো একদিকে যায় না! ও যে একদিন বিলাতের রয়্যাল অ্যাকাডেমির মেম্বার হবে না, তা কে বলতে পারে?

রমেশ। হ্যাঃ, হয়েছে রয়্যাল অ্যাকাডেমির মেম্বার! আঁক্ তো একটা উটের ছবি, দেখি কেমন তোর জীনিয়স্! আরে ছারপোকা, তুইও যদি রয়্যাল অ্যাকাডেমির মেম্বার হবি তবে দুনিয়ার কোন ছার বাদ যাবে?

সতীশ। কিছুই বলা যায় না রমেশ। আগে ওকে বিলেত পাঠিয়ে দাও, তারপর বিলেত থেকে ফিরে এলে দেখ কি হয়।

রমেশ। হ্যাঁ, আমি ওকে বিলেত পাঠাচ্ছি আর কি! ও যখন বিয়েই করতে চায় না তখন ওকে আমি বিলেতও পাঠাবনা, দেখি ও কেমন করে' বিলেত যায়!

অনিল। বিয়ে করবে না, তা তো ও বলছেনা।

রমেশ। না, বলছে না! তবে কি বলছে, আমি বিয়ে করব, আমি বিয়ে করব?

অনিল। বিয়ে তো হয়েই গেছে।

রমেশ। তবে বাসরে ঢুকতে চাচ্ছিস না কেন?

অনিল। ওরা তো ঢুকেছে।

রমেশ। তবে ওখানে উজবুকের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? বিছানায় গিয়ে শুলেই পারে।

অনিল। এ বিষয়ে একটা কথা আছে।

রমেশ। এর মধ্যে আবার কথা কি? না না, আমি এখন আর কোন কথা শুনতে পারব না। রাত একটা বেজে গেছে। কথা-টথা থাকে, কাল হবে। এখন সব শোও গে যাও। (অশোকের প্রতি) যা বিছানায় শুয়ে পড়্।

সতীশ। যাও মীরা, শোও গে।

বীণা। ওরও এ বিষয়ে একটা আপত্তি আছে।

সতীশ। আপত্তি থাকে তবে তার নিষ্পত্তি কাল হবে। যাও মীরা, কথা শোনো।

রমেশ (অশোকের প্রতি) কই, শুলিনে?

সতীশ। মীরা, অবাধ্য হয়ো না, শুয়ে পড়।

একটি মেয়ে। (দরজার কাছে, পিছন হইতে) বাঃ এখনই শোবে? বরের কোন গানটান হবে না?

সতীশ। না, গানটান এখন কিছু হবে টবে না। তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ? যাও এখান থেকে সব। বীণা, দরজাটা বন্ধ করে' দিয়ে এসতো। এখানে যেন সার্কাস হচ্ছে।

রমেশ। সার্কাসই তো হচ্ছে! এই বাঁদরটা যে একটা হনুমান তা তো সবাই অনুমান করতে পারে। (অশোকের প্রতি) কিরে কাছিম! তোকে যে শুতে বল্লাম তা বুঝি তোর কানেই গেল না?

অনিল। আপনি বুঝতে পারছেন না, মামা,—

রমেশ। না, আমি বুঝতে পারছি না, যত সব বুঝছ তুমি আর এই হাঁদারাম! কি বুঝতে পারছি না?

অনিল। ও কিছুতেই ও'নের পাশে শোবে না।

রমেশ। শোবে না? ও শোবে না তো ওর বাবা শোবে? কেন শুবি নারে ষাঁড়?

অনিল। (থিয়েট্রিক্যালি) যে রমণীকে সে কখনও ভালোবাসেনি, যাকে সে আগে কখনও দেখেনি, যার সঙ্গে জীবনে সে একটা কথা পর্য্যন্ত বলেনি, যাকে সে ধর্ম্মপত্নী বলে' কিছুতেই মনে করতে পারে না, তার সঙ্গে কি করে' সে একঘরে শোয়?

বীণা। মীরারও সেই কথা। যে নিতান্তই পরপুরুষ, যাকে কিছুতেই সে ধর্ম্মত স্বামী বলে' গ্রহণ করতে পারছে না, তার সঙ্গে সে প্রাণ গেলেও একঘরে শুতে পারবে না।

রমেশ। (কিছুক্ষণ অবাক হইয়া) অ্যাঁ, সতীশ, এরা বলে কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! আজ কালকার ছেলেমেয়েরা কি ধার্ম্মিক রে বাবা! কিছুতেই শুতে পারবে না!—যে ধর্ম্মপত্নী নয়! তার সঙ্গে! আরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, দুদিন পরে তো এঁরই আঁচল ধরে ওঠাবসা করবি, দুদণ্ডও বউ ছাড়া থাকতে পারবিনে, আর আজ কিনা তুই বলছিস, এ তোর ধর্ম্মপত্নী নয়! ধর্ম্মপত্নী নয় কেনরে খরগোস্? সকলের সমক্ষে আসরে বসে জাগ্রত শালগ্রাম শিলা সাক্ষী করে', মন্ত্র পড়ে' এঁকে বিয়ে করিস্ নি?

অনিল। স্বেচ্ছায় করেনি, আপনি জোর করে' করিয়েছিলেন।

রমেশ। তাই বলে কি মন্ত্র ব্যর্থ হয়রে পাজি? তাই বলে কি শালগ্রাম শিলার সাক্ষ্য নাকচ হয়? ধর্ম্মপত্নী পরস্ত্রী হয়?

অনিল। ও মন্ত্র বিশ্বাস করে না; শালগ্রাম শিলা ওর কাছে শিলাখণ্ড মাত্রই।

রমেশ। শিলাখণ্ড মাত্রই! সাহেব হওয়া হয়েছে! ওরে ফিরিঙ্গি টুপী, মন্ত্র বিশ্বাস করিস না তো কি বিশ্বাস করিস?

অনিল। ভালোবাসা।

রমেশবাবু। ভালোবাসা! ওরে অমাবস্যার চাঁদ, ভালোবাসার তুই জানিস কিরে? তোর বয়স কি পঞ্চাশ হয়েছে? ভালোবাসা কি করে' জন্মে, কি করে' মরে তা তুই জানিস? তোর বয়স তো মোটে বাইশ। এ বয়সে লোকে ভালোবেসেই অজ্ঞান! সেই অজ্ঞান-অবস্থায় ভালোবাসার তুই জানবি কিরে যে তাতে আবার বিশ্বাস করবি?

অনিল। এটুকু জানে যে যাকে সে ভালোবাসে না, সে তার পত্নী নয়।

রমেশবাবু। ভালোবাসে না! ভালোবাসার তুই সম্বন্ধে

গেলি কই যে বলছিস্ ভালোবাসিস্ না ? ছদিন আগে যাকই ! তারপর আমার কাছে এসে বলিস্ যে তুই তাকে ভালোবাসিস্ না। তখন দেখব কেমন তুই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এসেছিস্ !

অনিল। কিন্তু কথা হচ্ছে যাকে সে ভালোবাসে না তার সঙ্গে প্রথমেই সে একঘরে শোর কি ক'রে' ?

রমেশ। আবার সেই শোর কি করে' ! কেন সে কি তোকে খেয়ে ফেলবে রে কবুতরের বাচ্ছা ?

অনিল। খেয়ে ফেলার তো কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে পরস্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিবাস করা কি উচিত ?

রমেশ। পরস্ত্রী ! ওরে ছুঁচো ! ও যদি তোর পরস্ত্রী হয় তবে তোর নিজের স্ত্রী কে ?

অনিল। ওর সত্যিকার স্ত্রী হচ্ছে উৎপলা। তাকেই সে ভালোবাসে, কাজেই সেই ওর ধর্ম্মপত্নী, যদিও তার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি।

বীণা। মীরারও সেই কথা। ও ভালবাসে বীজনকুমারকে, কাজেই বিজনকুমারই ওর ধর্ম্মতঃ স্বামী। আর ইনি (অশোককে দেখাইয়া) হচ্ছেন মোটের ওপর পরপুরুষ, সে বিয়েই হোক আর যাই হোক।

রমেশ। সতীশ এরা বলে কি ?

সতীশ। বীণা, তুমি যদি আবার কোন কথা বলবে তবে তোমাকে এঘর থেকে বের করে' দেব বলে দিচ্ছি।

বীণা। বের করে দিলেও আমি যাচ্ছি না। আমি না থাকলে মীরার দুঃখের কথা কে বলবে ?

অনিল। প্রিয় ভগিনী, বিজনকুমার কে শুনতে পাই কি ?

বীণা। আপনার সঙ্গে আমি কোন কথা বলব না। আপনি আর কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

সতীশ। সেই ভালো, তোমার কোন কথা না বলাই উচিত।

অনিল। সতীশবাবু, বিজনকুমার ব্যক্তিটি কে ?

সতীশ। আরে মশাই, কোথাকার এক ভ্যাগাবণ্ড্ ! বিলেত থেকে ম্যাচ্ ম্যানুফ্যাক্চার শিখে এসেছে বলে। কোথায় ফ্যাক্টরী খুলবে তাই এখন পর্য্যন্ত ঠিক করে' উঠতে পারে নি। আর তারই জন্য হপ্তায় তিনবার-ঢাকা কলকাতা যাওয়া আসা আরম্ভ করেছে।

বীণা। চমৎকার ইনট্রডাক্শন্ হ'ল এক ভদ্রলোকের ! ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে কাকা। রমেশবাবু উৎপলা সুন্দরীটি কে ?

সতীশ। তা দিয়ে তোমার দরকার কি বীণা ? তুমি কি মুখ বুজে এক মিনিটও থাকতে পারনা ?

রমেশ। মুখ বুজে থাকার কি দরকার সতীশ ? শুনতে চায় শুনুক। সে কোন সুন্দরী নয়, ম্যাডাম্। সে হচ্ছে এক সুর্পণখা।

অনিল। মামা, শিভলরি বলে একটা কথা আছে।

রমেশবাবু। কোথায় আছে ?

অনিল। সব দেশেই আছে। বিলেত হ'লে'—

রমেশ। (মুখ ভ্যাঙাইয়া) বিলেত হলে' ! তুমি বিলেতের কথা কত জানো ! বিলেত তুমি গিয়েছে কখন ?

অনিল। না গেলেও যাকে আপনার ছেলে ভালোবাসে, সে ধর্ম্মত আপনার পুত্রবধু—

রমেশ। (ভয়ানক রাগিয়া) অনিল, সেই সুর্পণখাকে আমার পুত্রবধু বলোনা বলছি।

সতীশ। কে সেই মেয়ে রমেশ ?

রমেশ। আরে সে এক লেডী ডাক্তার।

সতীশ। লেডী ডাক্তার।

রমেশ। হাঁ, তাকেই কিনা ওই পাঁঠা বিয়ে করতে চায়।

অনিল। দোষ কি ? সেও ত কোন ছোট ঘরের মেয়ে নয়। তারও বাপ ছিল একজন ডেপুটি, হঠাৎ মারা গেল, মেয়েগুলি বাধ্য হ'য়ে তাই কেউ স্কুলমিস্ট্রেস হয়েছে কেউ লেডী ডাক্তার হয়েছে। এতে নাক সিঁটকানোর কি আছে ?

রমেশ। নাঃ কিছুই নেই ! সে যাক গে, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। বিয়ে হয়ে গেছে, এখন বাসর রাত্রি হবে। এই আমার কথা ! দেখি কে তা উল্টোয় ! (অশোকের প্রতি) এই বীরভূম মোরব্বা যা বিছানায় শুয়ে পড়্।

অনিল। (মিনতি কণ্ঠে) মামা, আর কেন ? আপনার জিদ তো বজায় থাকলই। আপনি এখানে অশোকের বিয়ে দেবেনই বলেছিলেন, দিয়েছেনও। এখন এদের ছেড়ে দিলেই পারেন।

রমেশ। (একটু নরম হইয়া) কি রকম ?

অনিল। এরা ছুটো প্রাণী, কেউ কাউকে চায় না। আপনি এদের জোর করে’ বিয়ে দিয়ে দিলেন। সমাজের চোখে এরা এখন স্বামী আর স্ত্রী। এ বিয়ের গেরো আর তারা খুলতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে’ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে’ তাদের গরুর মত খোয়াড়ে আটকিয়ে রেখে কি লাভ ? যতদিন না তারা পরস্পরকে চায় ততদিন তারা আলাদা আলাদা থাকুক না কেন ?

সতীশ। সে মন্দ নয় রমেশ। এরা যদি কিছু দিনের জন্য আলাদা আলাদা থাকতে চায় তা না হয় থাকুক !

রমেশ। বেশ। কিন্তু আজকের জন্য এদের একঘরে থাকতেই হবে।

অনিল। তাই বা দরকার কি ? বিয়ে তো হয়েই গেছে।

রমেশ। না এখনও হয়নি। বাসর-যাপন না করলে বিয়ে সম্পূর্ণ হয় না।

অনিল। (আনন্দোজ্জ্বল মুখে) সত্যি ?

রমেশ। তার মানে ? এত আনন্দ কিসের ?

অনিল। সত্যি বাসর-যাপন না করলে বিয়ে সম্পূর্ণ হয় না ?

রমেশ। সত্যি না তো তোমার সঙ্গে কি আমি ইয়ার্কি মারছি ?

অনিল। (হাত তালি দিয়া লাফাইতে লাফাইতে) হুররে, হুররে ! তাহ’লে ও কিছুতেই ক’নের সঙ্গে শোবে না।

রমেশ। অত বেশী লাফিও না অনিল। আমার ধারণা ছিল তোমার বুঝি একটু বুদ্ধি সুদ্ধি আছে কিন্তু দেখছি তুমিও ওই হনুমানটার সঙ্গে থেকে থেকে একটা জাম্বুবান হয়ে’ উঠেছ। সে যাই হোক, তোমাকে বলছি, ও শোবে না তো ওর ঘাড় শোবে। এখনই দেখ শোয় কি না। (অশোকের প্রতি) ওরে ইঁদুর, যা বিছানায় শু’গে যা। (অশোক নিশ্চল।)

রমেশ। ওরে আরসোলার ঠ্যাং, কথা বুঝি কানে যাচ্ছে না ? (অশোক নিশ্চল।)

অনিল। মিছে বলছেন মামা, ও কিছুতেই শোবে না।

রমেশ। (উগ্র হইয়া) কিছুতেই শোবে না ! (আঙুল দিয়া বিছানা দেখাইয়া) শো, বলছি।

(অশোক নিশ্চল)

রমেশ। (অধিকতর উগ্র হইয়া) শো বলছি।

(অশোকের পা ছুটা একটু কাঁপিল।)

রমেশ। (ভীষণ জোরে) শো !

(অশোক একলাফে বিছানার ওপর ধপাস্ করিয়া শুইয়া পড়িল)

রমেশ। (অনিলের দিকে চাহিয়া) কেমন, শুলো তো ? (সতীশের প্রতি) তোমার মেয়েকে শুতে বল সতীশ। তারপর এখান থেকে যাই চল।

সতীশ। মীরা, তুমিও যাও শুয়ে পড়।

বীণা। কাকা, আপনার বুদ্ধি সুদ্ধি কি সব লোপ পেয়েছে না কি ? এত গুলো লোকের সামনে ও খাটে গিয়ে শোবে ?

রমেশ। তাকে কি হয়েছে ?

সতীশ। না, তা হয় না রমেশ। ও লজ্জা পাবে। চল আমরা এখান থেকে যাই, পরে শোবে ’খন।

রমেশ। আমরা চলে গেলে এরা যদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ?

সতীশ। আ আর যাবে না। একবার যখন শুয়েছে তখন কি আর বেরোয় ? তুমি অনর্থক চিন্তা করছ, চল আমরা এখন বেরোই।

রমেশ। না না কিছুই বলা যায় না। তুমি তো ওই বাঁদরটাকে চেনো না, কি এক গোলমাল বাধিয়ে বসবে দেখো। তার বদলে এক কাজ করা যাক, বাইরে থেকে ঘরে তালাচাবি বন্ধ করে’ যাব, কি বল ?

সতীশ। বেশ। তোমার যা’ ইচ্ছা।

বীণা। কিন্তু কাকা, যে রকম শুনছি, শেষে যদি মীরাকে ধরে’ আর টার [illegible] ?

অনিল। কিন্তু মামা, ক'নের যা লম্বা লম্বা আঙুল দেখছি, যদি খামছি দিতে থাকে তখন কি হবে?

সতীশ। সত্যি রমেশ! এক ঘরে তো বন্ধ করে' যাচ্ছি, শেষে যদি দুজনে মারামারি করে?

রমেশ। এক কাজ করা যাক। এই ঘরের দুপাশে তো দু'টো ঘর আছে, না?

সতীশ। হাঁ, তা দিয়ে কি করবে?

রমেশ। (অনিল ও বীণা দুজনকে দেখাইয়া) এরা দুজনে সেই দু'ঘরে শোবে, যদি মারামারি কিংবা কোন গোলমাল করে তবে এরা এসে বাধা দেবে। যদি না পারে তবে আমাদের এসে জানাবে। এস এখন যাই। তালা আছে? একটা তালাচাবি আনতে বল।

সতীশ। (চেঁচাইয়া) ওরে বাইরে কে আছিস? একটা শক্ত দেখে তালাচাবি নিয়ে আয় তো।

অনিল। কিন্তু আমাকে যে নীচে থাকতে হবে মামা! সুরেশের আজ দুপুরে ক্যালকাটা মেলে আসার কথা ছিল। কিন্তু মেল এখন পর্য্যন্ত আসেনি। কি হয়েছে কে জানে? কখন আসবে তাও বলা যায় না। সে আবার আপনাদের কাউকে চেনেও না। কাজেই এসে যদি আমাকে না দেখে, তবে ভয়ানক চটে যাবে।

বীণা। আমারও নীচে থাকতে হবে কাকা। ক্যালকাটা মেলে সুরমারও আজ আসার কথা আছে। আমি নীচে না থাকলে সে মহা অসুবিধায় পড়বে।

অনিল। সুরমা কে বীণা দি?

বীণা। তা দিয়ে আপনার দরকার কি? আপনার কি সব জিনিষ না জানলেই নয়? সুরেশ কে তাকি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম?

সতীশ। (বিরক্ত হইয়া) তোমার দেখি সব সময়ই ঝগড়া করার ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা করেছে বল্লেই পার! কে সেই সুরমা যার জন্য তোমার নীচে না থাকলেই নয়?

বীণা। কে আবার? মীরার এক বন্ধু। একসঙ্গে ডায়সেসনে পড়েছে এখন বেথুনে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে। (অনিলের প্রতি) আপনার সুরেশবাবু কে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

অনিল। আমার তো মনে হয় খুব পারেন। এটাও যদি না পারেন তবে যে পৃথিবীতে আপনি কি পারবেন আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না। তিনি হচ্চেন অশোকের এক বিশিষ্ট বন্ধু। বেচারার এই বিয়েতে উপস্থিত থাকার ভয়ানক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিয়ে তো হয়েই গেল। ঢাকা মেলে কলিশন্ হয়ে যদি মারা গিয়ে না থাকে তবে এসে দেখবে আসর শূন্য। বাসরেই তাকে একবার নিয়ে আসতে হবে আর কি!

(একটি ভৃত্যের তালাচাবি আনা)

রমেশ। (তালাচাবি লইয়া) তা আনতে হয় এনো, তোমাদের এই পাশের দু' ঘরেই শুতে হবে। তারা এলে তোমাদের খবর দেওয়া হবে। চল সতীশ, বেরোও অনিল, বাইরে থেকে এঘরে তালা দেব। (দরজার দিকে অগ্রসর)

সতীশ। চল বীণা। (অগ্রসর)

রমেশ। (পিছন ফিরিয়া অশোকের প্রতি) এই ডব্লিউ, যেন কোন গোলমাল করিসনে। এই রাত্রে যদি আবার আমার ওপরে আসতে হয় তবে মজা টের পাবি।

সতীশ। (পিছন ফিরিয়া মীরার প্রতি) মীরা, যেন কোন কেলেঙ্কারী কোরনা। আমরা চলে গেলেই চুপ করে শুয়ে পড়বে। আমি আলো নিবিয়ে দিলাম। (সুইচ্ অফ্ করিয়া দেওয়া)

[সকলের প্রস্থান। বাহিরে খানিকক্ষণ তালাচাবির খট-খট শব্দ, তারপর সিঁড়ি দিয়ে লোক নামার জুতার শব্দ, তারপর সব চুপ। ঘর একরকম অন্ধকার, শুধু একটা জানালা দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া খাটের উপর পড়িয়াছে। এমন সময় নহবতে আবার সানাই বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অশোক তড়াক্ করিয়া খাট হইতে লাফাইয়া পড়িল, নামিয়াই সুইচ্ টিপিয়া দিল। মুখ ফিরাইতেই মীরার সহিত চোখাচোখি।]

অশোক। কি?

মীরা। কি?

অশোক। (মাথার মুকুটটা একটানে খুলিয়া আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিয়া) চুলোয় যাক!

মীরা। (মাথার পট ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) গোল্লায় যাক!

অশোক। তুমিও ওদের সঙ্গে গেলে না কেন?

মীরা। আপনি আমাকে তুমি বলবেন না।

অশোক। কেন তাহলে কি মার লাগাবে?

মীরা। তাহলে আমিও আপনাকে তুমি বলব।

অশোক। বল।

(মীরা চুপ)

অশোক। (একটা হাই তুলিয়া) ইস্, ভয়ানক ঘুম পেয়েছে! তুমি এখানে তালগাছের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও এঘর থেকে।

মীরা। বাঃ যাব কি করে'?

অশোক। তা আমি কি জানি। ওদের সঙ্গে গেলেই পারতে।

মীরা। সেতো তুমিও পারতে। তুমি গেলে না কেন?

অশোক। আমি কেন যাব? এ ঘরে তো আমার শোবার কথা হল। দেখলে যখন আমি শুলাম তখন তুমি বেরিয়ে গেলেই পারতে?

মীরা। শুলে কেন?

অশোক। বাঃ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কি ঘুম পাচ্ছিল! তারপর বাবা এখানেই শুতে অতক্ষণ ধরে' পীড়াপীড়ি করলেন, আমি তাঁর কথা ঠেলি কি করে?

(মীরা অবজ্ঞার সঙ্গে অশোকের দিকে চাহিয়া রহিল।)

অশোক। কি, গেলে না এঘর থেকে?

মীরা। একি আবার নাকি? আমি যাই কি করে'?

অশোক। কেন, এ বাড়ী তো তোমাদের; জাননা কি করে' ঘর থেকে বেরুতে হয়?

মীরা। দেখলে না বাইরে থেকে তালাচাবি দিয়ে গেল?

অশোক। আর কোন গুপ্ত দ্বার টার নেই?

মীরা। না। আমরা কোন রোমাণ্টিক্ জগতে বাস করছি না, এ কোন মধ্যযুগের কাস্‌ল্ নয়।

অশোক। (খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া হঠাৎ সচকিত হইয়া) ঠিক হয়েছে, এক উপায় বের করেছি, ওই জানালা দেখছ না?

মীরা। হাঁ।

অশোক। (জানালার কাছে গিয়া উপুড় হইয়া নীচে তাকাইয়া) এর নীচে কি আছে?

মীরা। নর্দ্দমা।

অশোক। কত নীচে?

মীরা। কি জানি? প্রায় ত্রিশ হাত।

অশোক। (মীরার কাছে আসিয়া) বেশ! দেখলাম জানালার পাশ দিয়ে এক পাইপ নেমে গেছে। তুমি সেই পাইপ বেয়ে নীচে নেমে যাও।

মীরা। কে নেমে যাবে?

অশোক। তুমি আবার কে?

(মীরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া অশোকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।)

অশোক। (মীরার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে) চল, তোমাকে আমি জানালার উপর উঠতে সাহায্য করব'খন।

মীরা। (হাত টানিয়া লইয়া) হাত ছাড়। আমি পারব না।

অশোক। (বিস্ময়ে) পারবে না! কেন, তুমি তো খুব ভালো পিং পং খেলতে পার। পিংপং খেলতে পার আর পাইপ বেয়ে নীচে নামতে পার না?

মীরা। না।

অশোক। (মুখ চুণ করিয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া) তাহলে' কি করা যায়? এই ঘরেই আমাদের রাত কাটাতে হবে? সত্যিসত্যিই তবে আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে? তুমি আমাকে স্বামী বলে' ডাকবে?

মীরা। প্রাণ গেলেও তোমাকে আমি কোনদিন স্বামী বলে' স্বীকার করব না।

অশোক। তা তো বুঝছি, আমিও তোমাকে প্রাণ গেলেও কোনদিন স্ত্রীর আসন দেব না। কিন্তু বিয়ে যদি সত্যি সত্যিই হয়ে যায়, এই ঘরেই যদি আমাদের একসঙ্গে রাত কাটাতে হয়, তখন তো অস্বীকার করা যাবেনা।

মীরা। এক কাজ কর না।

অশোক। কি?

মীরা। জানালা গলে তুমিই নেমে যাও না।

অশোক। যোৎ, তা কি হয়? পাইপ্ বেয়ে নামতে যাই আর পা পিছলে নর্দামার পড়ি আর কি?

মীরা। তা হলে কি করবে?

অশোক। (একটু চুপ থাকিয়া বিষণ্ণস্বরে) আমাদের যদি পাখা থাকত তবে জানালা দিয়ে উড়ে যেতে পারতাম।

মীরা। আমরা যদি পক্ষীরাজ ঘোড়া হতাম তাহলেও কোন অসুবিধা হতনা।

অশোক। কিংবা যদি আকাশের পরী হতাম!

মীরা! কিংবা যদি স্বর্গের এঞ্জেল্ হতাম!

অশোক। এঞ্জেল হতে পারলে আরও একটা সুবিধা হত।

মীরা। কি সুবিধা?

অশোক। এঞ্জেল্‌রা কি বলত?

মীরা। তার মানে?

অশোক। এঞ্জেল্‌রা স্ত্রী না পুরুষ?

মীরা। জানি না।

অশোক। এঞ্জেল্‌রা স্ত্রীও না পুরুষও না।

মীরা। বেশ, তাতে কি?

অশোক। কাজেই এঞ্জেল্ হলে' আমাদের কারুরই কোন বিয়ের কথা উঠত না।

মীরা। এঞ্জেল হওয়া যায় না?

অশোক। (দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া) না। (একটু চুপ থাকিয়া হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া) কিন্তু একটা হওয়া যায়।

মীরা। কি?

অশোক। ভূত।

মীরা। ভূত!

অশোক। হাঁ, চল আমরা ভূত হই। ভূত হয়ে' ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। তাদের তো দেখা যায় না!

মীরা। কিন্তু ভূত হব কি করে?

অশোক। কেন, আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা করলেই মানুষের আত্মা ভূত হয়ে' যায়। কেমন রাজি?

মীরা। কিন্তু আত্মহত্যা করাও তো কঠিন! পিস্তলের দরকার। তোমার কাছে পিস্তল আছে?

অশোক। না।

মীরা। তবে?

(অশোক চিন্তিত)

মীরা। এক কাজ করা যাক। এই জানালা দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়া যাক।

অশোক। (উৎফুল্ল হইয়া) বেশ তাই হোক। দাও লাফ।

মীরা। আমি আগে দেবনা, তোমাকে আগে দিতে হবে।

অশোক। না, আমি আগে দেব না। এই নর্দ্দমার গন্ধ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তুমি আগে লাফাও।

মীরা। বেশ আমিই দিচ্ছি। কিন্তু তুমি যদি পরে না লাফাও?

অশোক। খুব লাফাব। আনন্দে দুই হাত তুলে লাফাতে থাকব।

মীরা। নীচে লাফিয়ে পড়বে না?

অশোক। সে তো পড়বই না। তুমি লাফালে পরে আর আমার লাফিয়ে কি দরকার? তখন তো ঘরে কেউ রইল না, আমি একা।

মীরা। না, তাহলে আমি লাফাব না। মরতে হলে দুজনেই মরব। আর যদি একজন মরলেই চলে, তা হলে' তুমি মরবে।

অশোক। না, তুমি ভয়ানক ভীতু। মরণকে এত ভয় কর? (আঙুল দিয়া দেখাইয়া) তোমার হাতে এটা কি?

মীরা। আংটী।

অশোক। (মীরার হাতটা লইয়া) দেখি। এটা কে দিয়েছে?

মীরা। বাবার পেন্নার।

অশোক। বেশ আংটীটা! খুব দামী বলে' মনে হচ্ছে। এর ওপরের পাথরটা কি জল্ জল্ করছে! এটা কি পাথর?

মীরা। কি জানি।

অশোক। নিশ্চয়ই হীরা। একবিন্দু সন্দেহও নেই!

বেশ হল, তুমি মরতে ভয় পাও, দেখ আমি কেমন হাসতে হাসতে মরছি। (মীরার হাতটা মুখের কাছে লইয়া আংটীটা সজোরে চুষিতে লাগিল।)

মীরা। একি করছ?

অশোক। হীরা চুষছি। হীরাতে বিষ থাকে জান না? এখনই দেখতে পাবে আমি ধপাস করে' মাটীতে পড়ে মরে যাব।

মীরা। (হাতটা টানিয়া লইয়া) ছাই মরবে। এটা হীরা কে বলল? পেস্কার আবার হীরার আংটী দেবে!

অশোক। তবে এটা কি?

মীরা। এই সাধারণ একটা পাথর।

অশোক। যাঃ সব পণ্ড হয়ে গেল। তাহলে কি করে' মরা যায়? অথচ আমাদের না মরলেও তো চলবে না। অন্ততঃ একজনের মরতে হবেই।

মীরা। একজনের যদি মরতে হয় তবে তুমি মরবে কিন্তু!

অশোক। আমি তো মরতে গিয়েছিলামই! তোমার এটা হীরার আংটী হলেই তো আমি মরতে পারতাম! তোমার জন্তই তো হল না! তোমার একটা হীরার আংটীও নেই!

মীরা। আহা, আমার জন্তই হল না! তোমারও তো একটা হীরার আংটী থাকতে পারতো।

অশোক। (দুঃখের সঙ্গে) না থাকলে কি করব বল? আচ্ছা এ বিষয়ে রাজারাণীদের কি সুখ, না? তারা যখন ইচ্ছা মরতে পারে। তাদের মুকুটে তো হীরের টুকরো সব সময়ই জল্‌জল্ করছে! এবার মরার পর আমি যদি শীগ্‌গীরই আবার জন্মগ্রহণ করি, তবে যাতে রাজপুত্তুর হয়ে' জন্মাতে পারি তারি চেষ্টা করব। তুমি কি হয়ে' জন্মাবে?

মীরা। আমি—আমি—(চিন্তা)

অশোক। দেখো, সাবধান, আমি রাজপুত্তুর হয়ে জন্মাব বলে তুমি যেন রাণী হওয়ার লোভে আমার স্ত্রী হয়ে' জন্মোনা। তুমি অবশ্য রাজকন্তে হয়ে আমার বোন হয়ে জন্মাতে পারো।

মীরা। তুমি যদি রাজপুত্তুর হয়ে জন্মাও তাহলে আমি পরজন্মে মেয়ে জন্মই নেব না। পুরুষ হয়ে জন্মাব।

অশোক। সেই ভালো। তুমি যদি আমার ভাই হয়ে জন্মাও তাহলে আমি তোমাকে কিছু বলব না, কোনদিন মারব না, খুব ভালোবাসব।

মীরা। কিন্তু তার আগে তো মরতে হবে? মরার তো কোন উপায় দেখছি না।

অশোক। দাঁড়াও, আমাকে একটু ভাবতে দাও। (খানিকক্ষণ পাইচারি করিয়া মীরার সামনে আসিয়া হাত তালি দিয়া) ঠিক হয়েছে, উপায় বের করেছি। আমাদের ফাঁস লটকিয়ে মরতে হবে!

মীরা। সে অনেক হাঙ্গাম। দড়ি-টড়ি পাবে কোথায়? এখানে টাঙ্গাবে কি করে? ঝুলবেই বা কোথায়? আমি অত সব পারব না।

অশোক। তাহলে এক কাজ করা যাক। প্রত্যেকেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে দুই হাতে টেনে টেনে মরি, কি বল?

মীরা। ফাঁস পাবে কোথায়?

অশোক। আমি সব ঠিক করছি, এই দেখ। (চটপট খাট হইতে লেপ বালিশ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চাদরটা একটানে তুলিয়া লইয়া লম্বালম্বি মাঝামাঝি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তারপর একটা অর্দ্ধ খণ্ডের এক্‌দিক নিজের হাতে রাখিয়া অন্যদিক মীরার হাতে দিয়া) ধর, পাকিয়ে নেওয়া যাক। (এইভাবে দুইখণ্ডই পাকানো হইলে একটা ফাঁস নিজের গলায় বাঁধিয়া আর একটা ফাঁস মীরার গলায় বাঁধিয়া দিয়া) এইবার দুহাতে খুব জোরে জোরে টান্‌তে থাক। এই দেখ আমি কেমন করে' টানছি। (জোরে জোরে নিজের গলায় ফাঁস টানিয়া, তারপর একটু থামিয়া) কি তুমি টানছ না যে?

মীরা। না, আমি নিজে নিজে টানতে পারব না। আমার ভয় করে; হাত অবশ হয়ে আসছে।

অশোক। তুমি সত্যিই বড় ভীতু। তাহলে আর এক কাজ করা যাক। তুমি আমার গলার ফাঁস টানো, আমি তোমার গলায় ফাঁস টানি। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে'খন। (এই বলিয়া মীরার হাত দুটী টানিয়া আনিয়া

নিজের গলার ফাঁসের দুই দিকটা তাহার দুই হাতে দিয়া অশোক মীরার গলার ফাঁস টানিতে লাগিল।)

মীরা। (অসহ্য যন্ত্রণায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে) উঃ ম'লাম, ম'লাম, ছাড়, ছাড়। (অশোকের গলার ফাঁস ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিয়া, নিজের গলার ফাঁস খুলিয়া ফেলিয়া) ইস্, মেরে ফেলেছিলে এখনি!

অশোক। ওরকম করে চেঁচাচ্ছিলে কেন?

মীরা। (ভেঙ্গাইয়া) চেঁচাচ্ছিলে কেন! চেঁচাতে পারছিলাম কৈ? দম বলে বন্ধ হয়ে' আসছিল, একটা কথাও বেরুচ্ছিল না, আর কি ভীষণ যন্ত্রণা!

অশোক। তা তো হবেই। মরার সময় একটু যন্ত্রণা হবে না?

মীরা। আমি মরতে চাইনে। উঃ! (গলায় হাত বুলাইতে লাগিল।)

অশোক। দেখি খুব লেগেছে বুঝি? (কাছে আসিয়া মীরার চিবুক ধরিয়া উঁচু করিয়া তাহার গলা দেখিতে দেখিতে) তাইতো, রক্ত জমে গেছে দেখছি। দাঁড়াও, হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, এখনই সেরে যাবে'খন। (হাত বুলাইতে বুলাইতে) বাঃ তোমার গলাটা তো বেশ নরম আর মোলায়েম!

মীরা। (অশোককে ঠেলিয়া দিয়া) খবর্দ্দার আমার গায়ে হাত দিওনা। আবার দিলে কামড়ে দেব বলছি। মনে রেখো তুমি আমার কাছে পরপুরুষ।

অশোক। আর তুমিও মনে রেখো, তুমি আমার কাছে পরস্ত্রী। পরস্ত্রীর সঙ্গে আমি একঘরে শুতে পারব না। তুমি বেরিয়ে যাও এঘর থেকে।

মীরা। বেরুতে পারলে তো এখনই বেরিয়ে যেতাম, তোমার মত হনুমানের সঙ্গে একঘরে কে থাকতে চায়?

অশোক। তাহলে মর।

মীরা। (রাগিয়া) কেন, আমি মরব কেন? তুমি মরতে পার না? তুমি বেরিয়ে যেতে পার না?

অশোক। (বিস্ময়ে) আমি মরব!

মীরা। হাঁ তুমি। তুমি তো খুব জোরে জোরে ফাঁস টানতে পার. আমার গলায় যেমন টানছিলে তোমার নিজের গলায়ও তেমনি টানতে থাক।

অশোক। হ্যাঁ, তাই করি আর তুমি তাই দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে থাক আর কি!

মীরা। তবে আমাকে মরতে বলছিলে কেন? আমাকে বেরিয়ে যেতে বলছিলে কেন?

অশোক। তোমারই ত বেরিয়ে যাওয়া উচিত। আমি আগে এসে এ বিছানায় শুয়েছিলাম তারপর তুমি এ ঘরে এলে কেন?

মীরা। আহা যেন কত ইচ্ছা করেই শুয়েছিলেন! ধমকের চোটে গুড়্ গুড়্ ক'রে বিছানায় গিয়ে উঠলেন, এখন বলছেন কিনা,—

অশোক। ওসব বাজে কথা রাখ, আসল কথা হচ্ছে আমি যে ঘরে আগে শুয়ে পড়েছিলাম তুমি সে ঘরে কেন থাক?

মীরা। আমি কি ইচ্ছা করে আছি?

অশোক। (মোলায়েম হইয়া) ও, তুমি ইচ্ছা করে থাকনি! তাই বল! আমার রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে তুমি আমাকে বিরক্ত করার জন্যই বুঝি ইচ্ছা করে' এখানে থেকে গেলে। তা যখন নয় তবে আর তোমার দোষ কি? সব দোষ তোমার ওই বর্ব্বর বাবাটার। তুমি হলে অবলা মেয়ে-মানুষ, তোমার ওপর এই রকম অত্যাচার করা অত্যন্ত অন-শিভল্‌রস্। সে যাই হোক, এখন কি করা যায়? (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) কি বিপদেই না পড়লাম! একজন পরস্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটানো! কি ভীষণ সমস্যা! (হঠাৎ থামিয়া) আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? তোমার স্বামীকে যদি খবর দেওয়া যায় যে তোমাকে এক পরপুরুষের সঙ্গে এক ঘরে আটকিয়ে রাখা হয়েছে তাহলে' সে এসে উদ্ধার করতে পারে না?

মীরা। কোন স্বামীর কথা বলছ?

অশোক। কোন্ স্বামী আবার? তোমার আবার কটা স্বামী? একটার বেশী আবার স্বামী থাকে না কি? সেই ভ্যাগাবণ্ড্‌টা—কি নাম যেন?—বিজনকুমার।

মীরা। আমার স্বামী সম্বন্ধে তুমি একটু সম্মান সহকারে কথা বলো।

অশোক। আমি তো কোন অসম্মান করছি না। তোমার বাবা তাকে যে নামে পরিচয় দিয়েছেন সেই নামেই বলছি! সেই ভ্যাগাবণ্ড্‌টাকে খবর দেওয়া যায় না?

মীরা। কেন, তার বদলে তোমার সেই সূর্পণখাকে খবর দিলেই পার? সে এসে তোমাকে উদ্ধার করে' নিয়ে যাবে!

অশোক। সূর্পণখা কে?

মীরা। তোমার স্ত্রী আবার কে? সেই লেডী ডাক্তার, যার নাম উৎপলা। লেডী ডাক্তারের নাম উৎপলা হয় এই প্রথম শুনলাম। তোমার বাবাই ভাল নাম দিয়েছিলেন—সূর্পণখা।

অশোক। তুমি যদি আবার তাকে সূর্পণখা বলবে তাহলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

মীরা। তা'হলে তুমি আমার স্বামীকে ভ্যাগাবণ্ড বলছিলে কেন?

অশোক। সে তো ভ্যাগ'বণ্ডই। ভ্যাগাবণ্ড্‌কে ভ্যাগাবণ্ড্‌ বলব না? সমস্ত বিলেত ঘুরে তার সখ মিটল না, এখন ঢাকা আর কলকাতার মধ্যে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছে। কি ম্যানুফ্যাক্‌চার যেন করবে, তোমার বাবা বলল?

মীরা। ম্যাচ্‌-ষ্টিক্‌।

অশোক। ম্যাচ্‌-ষ্টিক্‌ না ফিড্‌ল্‌-ষ্টিক্‌! বিলেত থেকে কিছু পাশ টাশ করে' আসতে পারে নি, এখানে এসে ওই সব কথা বলছে। এখানে থাকতে ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পাশ করতে পেরেছিল?

মীরা। ম্যাট্রিক্যুলেশনও পাশ করেছিল, আই-এস্‌সিও পাশ করেছিল, তোমার মত এল-এ ফেল্‌ না।

অশোক। আমার মত ছবি আঁকতে পারে?

মীরা। তুমি তো শুধু উটের ছবি আঁকতে পার, তা কেন সে আঁকতে যাবে?

অশোক। শুধু উটের ছবি! দাঁড়াও দেখাচ্ছি আমি কেমন আঁকতে পারি। (টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া একটা রাইটিং প্যাড্‌ টানিয়া লইয়া ফাউন-টেন্‌পেন্‌ হাতে লইয়া) তুমি এই চেয়ারটাতে চুপ করে' বসে' থাক, নড়না, তুমি অবাক হয়ে যাবে তোমার নিজের ছবি দেখে। (ছবি আঁকিতে লাগিল)

(মীরা একটু কৌতূহলের সঙ্গে অশোকের ছবি আঁকা দেখিতে লাগিল।)

অশোক। (ছবি আঁকিতে আঁকিতে এবং মাঝে মাঝে মীরাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে লইতে একবার মুখ তুলিয়া অনেকক্ষণ মীরার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া) বাঃ, তোমার চেহারাটা তো বেশ সুন্দর!

(মীরা নীরব)

অশোক। (খানিকক্ষণ পরে) তোমার গালে দেখি একটা তিলও আছে।

(মীরা ঈষৎ লজ্জিত হইল)

অশোক। (আরও একটু পরে) বাঃ তোমার চোখ দুটোও তো বেশ সুন্দর!

মীরা। (এইবার লজ্জায় আরক্ত মুখে) না; আমি এরকম বসে থাকতে পারব না। দরকার নেই আমার ছবি এঁকে। ধরে নিলাম তুমি খুব ভাল ছবি আঁকতে পার।

অশোক। নড়োনা। বেশীক্ষণ নয়, আর একটু পরেই হয়ে যাবে।

মীরা। তবে তুমি আর আমার মুখের দিকে তাকাতে পারবে না।

অশোক। (সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আঁকিতে আঁকিতে একবার মীরার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে) তোমার চোখের পাতা এত কালো আর লম্বা যে তোমার চোখের তারায় তার ছায়া পড়েছে। (একটু চুপ থাকিয়া আবার) বাস্তবিক তোমার চোখ দুটো খুবই সুন্দর, তাতে আলো ছায়া ও কালো মিলে এমন একটা জিনিষ তৈরী হয়েছে—

মীরা। (চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া) আবার! (ছুটিয়া আসিয়া অসমাপ্ত ছবিটা অশোকের সম্মুখ হইতে একটানে কাড়িয়া লইয়া দুই হাতের মধ্যে পাকাইতে পাকাইতে) দরকার নেই আমার ছবি এঁকে!

অশোক। (খানিকক্ষণ বিস্ময়ে অবাক হইয়া) ছবিটা নষ্ট করলে?

মীরা। তুমি আমার দিকে ওরকম করে অনেকক্ষণ ধরে' তাকাচ্ছিলে কেন? আর যা তা বলছিলে কেন?

অশোক। তাতে কি হয়েছে? তোমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসাই তো করছিলাম।

মীরা। আমার সৌন্দর্য্য তোমার আলোচনার বিষয় নয়।

অশোক। তাই বলে আমার ছবিটা নষ্ট করলে?

মীরা। করলাম।

অশোক। আমার ছবির মূল্য বেশী, না তোমার সৌন্দর্য্যের মূল্য বেশী?

মীরা। তার মানে?

অশোক। জানো, এই ছবি হয়তো একদিন রয়্যাল অ্যাকোডেমীতে ঝুলত? তুমি যখন বুড়ী থুড়থুড়ী হতে তখনও এর সৌন্দর্য্য অম্লান থাকত; ডিউক অফ্ ইর্য়ক, ডচেস্ অফ্ মার্ল্‌বরো এই ছবি নিয়ে কাড়াকাড়ি করত? আর তুমি তাকে এমন হেলায় নষ্ট করলে?

মীরা। ভারী তো! রুলটানা রাইটিং প্যাডের ওপর ফাউন্‌টেইন্ পেন্ দিয়ে এক ছবি এঁকেছেন তাই আবার রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে ঝুলত! দেখি কি ছবি হয়েছে! (কাগজটির পাক খুলিয়া পাট করিয়া একবার ছবিটার দিকে তাকাইয়া লজ্জারক্ত মুখে) ছাই হয়েছে!

অশোক। (বিস্ময়ে) ছাই হয়েছে!

মীরা। ছাই বই কি? এতো উটের ছবি হয়েছে!

অশোক। উটের ছবি!

মীরা। তবে কি? আমার ঘাড় বুঝি এত লম্বা?

অশোক। না; মেয়েমানুষ জাতটাই ফ্লার্টের জাত। তারা আর্টের সঙ্গেও ফ্লার্ট করে। আমার এই ছবিটার মূল্য তুমি বুঝলে না? জানো আন্দ্রিয়া দেল্ সার্টো নিজেও বোধ হয় এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দক্ষ হাতে এ ছবি আঁকতে পারত না। দাও, ওটা আমি পকেটে রেখে দি। মেয়েরা যে আর্ট ভাল বোঝে না তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। (ছবিটা লওয়া)

মীরা। রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে পাঠাবে নাকি?

অশোক। উৎপলাকে দেখাব'খন। তার তবু আর্ট সম্বন্ধে একটু আধটু জ্ঞান আছে।

মীরা। (ছোঁ মারিয়া ছবিটা কাড়িয়া লইয়া) না, তুমি এ ছবি তাকে দেখাতে পারবে না। সে একদিক থেকে আমার খুঁত বের করতে আরম্ভ করবে'খন। তার নিন্দা সহ্য করতে পারব না।

অশোক। কিন্তু তোমার কাছে থাকলে যে তুমি ছবির নিন্দা করতে থাকবে, বলবে ছাই হয়েছে, উট হয়েছে—তা আমি সহ্য করব কি করে?

মীরা। আচ্ছা, আর আমি কিছু বলব না। এটা আমার কাছেই রইল। (পিছন ফিরিয়া ব্লাউসের ভিতর ছবিটা রাখিয়া দিয়া, আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) বিজন-কুমার এলে তাকে একবার দেখাব। (একটা চেয়ারে বসিল)

অশোক। তোমার স্বামীকে? একজন পরপুরুষ তার স্ত্রীর ছবি এঁকেছে দেখলে যদি সে চটে' যায়? যদি জিজ্ঞেস্ করে কে এঁকেছে, কি বলবে?

মীরা। বলব, এল-এ, কেল্ আর্টিষ্ট।

অশোক। তাতেই তার রাগ পড়ে' যাবে? (একটা চেয়ারে বসিল)

মীরা। না যায় না গেল। তার যাতে রাগ হয় সেজন্যই তো দেখাব। রাগলে তাকে খুব ভাল দেখায়।

অশোক। তাকে তুমি খুব ভালোবাস, না?

মীরা। তা দিয়ে তোমার দরকার কি?

অশোক। না, এমনিই জিজ্ঞেস করছি। আমার মনে হয় তুমি কাউকে ভালোবাসলে তার মন্দ লাগবে না।

মীরা। চুপ। জাননা পরস্ত্রীর সঙ্গে এরকম কথা বলা উচিত নয়?

অশোক। আমার মনে হয় তুমি ভালোবাসলে আমারও মন্দ লাগবে না।

মীরা। (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) শট্ আপ্! তোমার এসব কথা বলা অত্যন্ত অন্যায়।

অশোক। কেন?

মীরা। আমি যদি তোমাকে সত্যিসত্যিই ভালবেসে ফেলি? ছি ছি! পরপুরুষকে ভালবাসা! কি লজ্জার কথা! তার আগে আমি আত্মহত্যা করব।

অশোক। (লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সত্যি, তুমি আমাকে প্রায় ভালবেসে ফেলেছ? শুনে আমারও বেশ ভাল লাগছে। কেন বল ত? তুমি হলে পরস্ত্রী;

তুমি আমাকে ভালবাস শুনে আমার ভাল লাগা উচিত নয়, তবুও আমার ভাল লাগছে; অথচ উৎপলা আমার ধর্ম্ম-পত্নী, তাকে কল্পনা করতে আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমি এর কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু তবুও তোমাকে খুবই ভাল লাগছে। Oh! how sweet it is to love another man's wife! (অধীর আনন্দে হাততালি দিয়া লাফাইতে লাফাইতে) বুঝেছি, এই জন্যই পরকীয়া প্রেমকে শ্রেষ্ঠ প্রেম বলা হয়। এই জন্যই আধুনিক সাহিত্য পরস্ত্রীকে ভালোবাসতে বলে। জয় আধুনিক সাহিত্যের জয়! আমি যেন চিরদিন পরস্ত্রীকে ভালবাসতে পারি। আমি যেন যথেষ্ট immoral হতে পারি। আজ থেকে আমরা যেন স্বামী স্ত্রীকে ভাল না বেসে পরস্ত্রী এবং পরপুরুষকে ভালবাসতে পারি! জয় আধুনিক সাহিত্যের জয়।

অনিল। } (বাহির হইতে সমস্বরে) অশোক, অশোক, চেঁচাচ্ছ কেন ওরকম করে? আমরা ঢুকছি, সাবধান!

বীণা। } (বাহির হইতে সমস্বরে) মীরা, মীরা, কী হয়েছে? আমরা ঢুকলাম।

(দরজা খুলিয়া গেল এবং ভিতরে ঢুকিল অনিল, বীণা, সুরেশ ও সুরমা। সুরেশের মাথায় হ্যাট্, মুখে গোঁফ এবং গলা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা লম্বা আলস্টার, তাহাতে পায়ের জুতো পর্য্যন্ত ঢাকা পড়িয়াছে। আলস্টারটি যে তাহার নিজের নয়, কাহারও নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াছে তাহা দেখিলেই বোঝা যায়। সুরমার পোষাকে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিবার নেই, তবে তার গায়ে যে একটি শাল আছে তার পরার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ মেয়েরা যেমন তাহাদের কাঁধ ঢাকিয়াই সন্তুষ্ট সে কিন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট নয়, শাল টানিয়া শরীরের অনেক খানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—বাহিরে বোধ হয় শীত খুব বেশী পড়িয়াছিল। ভিতরে ঢুকিয়াই—)

অনিল। } (সমস্বরে) এই যে অশোক সুরেশ এসেছে।

বীণা। } (সমস্বরে) এই যে মীরা সুরমা এসেছে।

(অশোক আর একবার, জয় আধুনিক সাহিত্যের জয়, বলিয়া লাফাইতে গিয়াছিল, সুরেশের নাম শুনিয়াই খাটের ওপর ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল। মীরা পিছনে চাহিয়া সুরমাকে দেখিয়াই টেবিলের কাছে এক চেয়ারে বসিয়া পড়িল, টেবিলের ওপর কপাল ঠেকাইয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিল)।

সুরেশ। (অশোকের কাছে আসিয়া) আমি তোমার বাবা নই অশোক, ধপাস্ করে' বসে' পড়লে কেন? আমি সুরেশ। আমার দিকে তাকাও. আমি সব শুনেছি অনিলের কাছে। কোন ভয় নেই।

সুরমা। (মীরার কাছে আসিয়া) মীরা মুখ তোলো। লজ্জা কি মীরা? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে জোর করে' বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিয়ে এখনও একেবারে হয়ে যায় নি। বাসর-রাত্রি এখনও পোহায় নি, বাসি বিয়ে এখনও বাকি আছে। তার আগেই আমরা সব ভেঙ্গে দেব, বিয়ে আর থাকবে না।

সুরেশ। আমরা আরও অনেক আগে আসতে পারতাম অশোক, আমরা কাল রাত্রে ঠিক সময়েই ঢাকা মেল ধরেছিলাম। কিন্তু পদ্মার চরে ষ্টীমার গেল আটকে। আজকাল শীতের দিন, সকালে এত কুয়াশা হয়েছিল যে ষ্টীমার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, তার ওপর পদ্মার বুকে আজকাল যেখানে সেখানে চর ভেসে উঠেছে। সেই যে একটা চরে ষ্টীমার আটকে গেল আর রাত দশটার আগে কিছুতেই নামল না। তাই এত দেরী হয়ে গেল। আমরা যদি ঠিক সময়ে আসতে পারতাম তবে এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারত না।

সুরমা। ষ্টীমারে সুরেশ বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়, মীরা। কথাবার্ত্তায় বুঝতে পারলাম এ বিয়েতে তোমার আর ওঁর (অশোককে দেখাইয়া) দুজনেরই অমত। তখনই আমরা ঠিক করলাম কি করে এখানে এসে বিয়ে ভেঙ্গে দেব। তারপর যখন ষ্টীমার চরে আটকে গেল, তখন তোমার কথা ভেবে আমার কি কষ্ট হচ্ছিল মীরা, তা তুমি বুঝবে না।

সুরেশ। তোমার জন্যও আমার কি কষ্ট হচ্ছিল অশোক, তা তুমি বুঝবে না। এক একবার প্রায় চোখ ছাপিয়ে জল

এসে পড়ছিল। ভাবছিলাম, বেচারা অশোক! জবরদস্ত বাপের হাতে পড়ে' কি কষ্টই না সে পাচ্ছে!

সুরমা। কিন্তু আর বেশী কষ্ট নেই মীরা।

সুরেশ। এখন সব কষ্ট দূর হবে অশোক।

সুরমা। তোমার উদ্ধারের একটা উপায় ঠিক ক'রে এসেছি।

সুরেশ। তোমার বাপকে কি করে' জব্দ করতে হবে তাও ভেবে এসেছি।

সুরমা। মুখ তুলছ না যে মীরা?

সুরেশ। কথা বলছ না যে অশোক?

অনিল। ওরকম করে' রয়েছ কেন অশোক?

বীণা। মাথা নীচু করে' রয়েছ কেন মীরা?

সুরমা। কি হয়েছে মীরা?

সুরেশ। কি হয়েছে অশোক?

অশোক। (মুখ তুলিয়া) সুরেশ, আমাকে ক্ষমা কর, আমি এক পরস্ত্রীকে ভালবেসে ফেলেছি।

অনিল } (সমস্বরে বিস্ময়ে) অ্যাঁ!
সুরেশ } অ্যাঁ!

মীরা। (মুখ তুলিয়া) সুরমা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? আমি এক পরপুরুষকে ভালবেসে ফেলেছি।

বীণা। } (সমস্বরে বিস্ময়ে) অ্যাঁ!
সুরমা। } অ্যাঁ!

অনিল। (অশোকের প্রতি) তাহলে তোমরা পালাবে না?

বীণা। (মীরার প্রতি) তাহলে তোমরা এই বিয়ে মেনে নেবে?

অনিল। আজকে রাত্রে যে একটা চমৎকার রোম্যান্টিক ঘটনা ঘটবে ভেবেছিলাম তা আর হবে না?

বীণা। (মীরার প্রতি) এই বাসর ঘরের পালা সাধারণ বাসর ঘরেই শেষ হবে?

অনিল। একজন অচেনা মেয়েকে নিয়ে ঘর করবে?

বীণা। একজন এল-এ ফেল্ ছোক্রার সঙ্গে সময় কাটাবে?

সুরমা। অসম্ভব, তা হতেই পারে না। মীরা, তুমি এই এল-এ ফেল ছোকরাটিকে কখনই ভালবাসতে পার না। এ তোমার মহাভুল, পরে পস্তাবে বলে দিচ্ছি।

সুরেশ। ভাই অশোক, তুমিও যে মেয়েকে আগে কোন দিন দেখনি তার সঙ্গে হঠাৎ আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রেমে পড়তে পার না।

সুরমা। এ তোমার চিত্তবিভ্রম মীরা! বিপদে পড়ে তোমার মাথা গোলমাল হ'য়ে গেছে।

সুরেশ। ভাই অশোক, যখন দেখলে বিয়ে হয়ে গেল, আমরাও এলাম না, আর কোন আশাই নেই, ভাবলে যাক্ যা হবার তা হয়ে গেছে।

সুরমা। এবং সেই ভাবের থেকেই তোমার মনে হচ্ছে যে তুমি ওই এল্-এ ফেল্ ছেলেটাকে ভালবাস।

সুরেশ। আর তুমি ভাবছ, ওই ধিঙ্গি মেয়েটাকে ভালবাস!

সুরমা। কিন্তু সত্যি সত্যিই তুমি ওকে ভালোবাস না।

সুরেশ। তুমি ভালবাস উৎপলাকে।

সুরমা। আর তুমি বাস বিজনকুমারকে।

সুরেশ। ভেবে দেখ অশোক, উৎপলার কি দুশ্চিন্তা। তুমি যদি না যাও তার বুকে কত বড় একটা শেল বিঁধবে।

সুরমা। ভেবে দেখ মীরা বিজনকুমারের কি অবস্থা হবে! বেচারা হয়ত পাগল হয়েই যাবে।

সুরেশ। না ভাবার কিছু নেই অশোক, তোমাকে পালাতেই হবে।

সুরমা। হাঁ, তোমাকে পালাতেই হবে মীরা।

অনিল। হাঁ, তোমাকে পালাতেই হবে অশোক। তাড়াতাড়ি চটপট উঠে পড়, কি করতে হবে ঠিক করে নাও। পনর মিনিট মাত্র সময়, তারপরে এদের বেরিয়ে যেতে হবে, তখন মামা এসে আবার দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে যাবেন বলেছেন। এখন এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করার নয়। ওঠ। (হাত ধরিয়া তোলা)

বীণা। ঠিক। এখন এক মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করার নয় মীরা। এখনই হয়ত কাকারা এসে পড়বেন। দেরী করোনা, ওঠ। (হাত ধরিয়া তোলা)

সুরেশ। ক্যুইক্! অশোক! ক্যুইক্!

সুরমা। ক্যুইক্! বীণা! ক্যুইক্!

অনিল। (সুরেশের প্রতি) কি করতে হবে বল, তাড়াতাড়ি করে' নিক।

বীণা। (সুরমার প্রতি) চটপট বল, কি করতে হবে।

অনিল। ক্যুইক্।

বীণা। ক্যুইক্।

সুরেশ। ছদ্মবেশ পরতে হবে।

সুরমা। হাঁ, ছদ্মবেশ পরতে হবে।

সুরেশ। তারপর সেই ছদ্মবেশে দুজনেরই বেরিয়ে যেতে হবে।

সুরমা। বেরিয়ে গিয়ে ডাকবাংলায় উঠতে হবে।

সুরেশ। সেখানে আমরা ট্রেণ থেকে নেমে দুটো ঘর ঠিক করে' এসেছি।

সুরমা। আমাদের জিনিষপত্র সেখানেই আছে।

সুরেশ। তোমরা বেরিয়ে গেলে আমরা এই ঘরে তোমাদের হ'য়ে চুপ করে' বসে থাকব।

সুরমা। তারপর তোমাদের বাবারা এসে আমাদের তালাচাবি বন্ধ করে' যাবে।

সুরেশ। কিন্তু আমরা একটা কায়দা করে' বেরিয়ে এসে তোমাদের সঙ্গে জুটব।

সুরমা। সেখান থেকে একদম প্যাণ্ডেরিয়ায় আমার এক দূর সম্পর্কীয় ভাইয়ের বাড়ী উপস্থিত হব।

সুরেশ। তিনি সে বাড়ীতে এখন একাই বাস করছেন।

সুরমা। ডাকবাংলায় এসেই বেয়ারাকে দিয়ে তার কাছে এক চিঠি পাঠিয়েছি।

সুরেশ। যাতে তিনি দুটো জরুরী বিয়ের আয়োজন করে' রাখেন।

সুরমা। আর পুরুত ঠিক রাখেন।

সুরেশ। সেখানে গেলেই পুরুত মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করবে।

সুরমা। আজ রাত্রের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যাবে।

সুরেশ। তোমার সঙ্গে উৎপলার।

সুরমা। তোমার সঙ্গে বিজনকুমারের।

অনিল। (সুরমার প্রতি) কিন্তু বিজনকুমার সেখানে আসবেন কি করে'?

বীণা। (সুরেশের প্রতি) আর উৎপলাই বা সেখানে আসবে কি করে'?

সুরেশ। (বীণার প্রতি) আছে, সে এক রহস্য।

সুরমা। (অনিলের প্রতি) পরে বুঝবেন।

অনিল। বেশ, তাহলে তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশ পরা হোক।

বীণা। হাঁ, তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশ পরা হোক।

অনিল। (সুরেশের প্রতি) ছদ্মবেশ কই?

বীণা। (সুরমার প্রতি) ছদ্মবেশ?

সুরমা। ছদ্মবেশ তো আনা হয়নি!

সুরেশ। তাই তো!

সুরমা। না হল। (বীণার প্রতি) তোমার কাপড়-চোপড় মীরাকে পরিয়ে দিলেই হবে।

সুরেশ। (অনিলের প্রতি) হাঁ, তোমার কাপড়-চোপড় অশোককে পরালেই হবে।

অনিল। আমার কাপড়-চোপড়ে আর বেশী কি ছদ্মবেশ হবে? মামা ধরে ফেলবেন। তাহলে বেচারা অশোকের মহা বিপদ, হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে।

বীণা। তাই ত, আমার কাপড়-চোপড়েও মীরার যথেষ্ট ছদ্মবেশ হবে না। কাকা ধরে ফেলবেন।

অনিল। (হঠাৎ বুদ্ধি ঠাহর করিয়া) তার বদলে এক কাজ করা যাক। (সুরমার প্রতি) আপনি আসুন, ওই পাশের ঘরে যাই, আপনার শাড়ী অশোককে পরিয়ে দি। মেয়ে সেজে বেরুলে ওকে কেউ বুঝতে পারবে না।

বীণা। ঠিক। (সুরেশের প্রতি) আসুন সুরেশবাবু, এই পাশের ঘরে যাই, আপনার ঐ হ্যাট্ আর আল্‌ষ্টার পরিয়ে দিই মীরাকে—ওর বাবাও ধরতে পারবে না।

সুরেশ। আমার হ্যাট্ ও আল্‌ষ্টার! (বিস্ময়)

অনিল। তাতে কি? সেই, ভাল। আসুন সুরমা দেবী, পাশের ঘরে, আপনার শাড়ী ছাড়বেন।

সুরমা। আমার শাড়ী ছাড়ব? (বিস্ময়)

অনিল। হাঁ, ছাড়বেন। ক্যুইক্!

বীণা। হুইক্!

সুরেশ। কিন্তু!—

সুরমা। কিন্তু—

অনিল। কোন কিন্তু নেই এর মধ্যে, দেরী করবেন না, আর বেশী সময় নেই!

বীণা। আর বেশী সময় নেই।

সুরেশ। তার বদলে আর এক কাজ করা হোক। (বীণাকে লক্ষ্য করিয়া) অশোক আপনার শাড়ী পরুক।

সুরমা। (অনিলকে লক্ষ্য করিয়া) আর মীরা আপনার ধুতি পাঞ্জাবী পরুক।

সুরেশ। সেই ভালো, তোমাদের ত্ো বেরিয়ে যেতে হবে না।

সুরমা। আমাদের তো আবার এই ভাবেই বেরিয়ে যেতে হবে!

অনিল। বেশ তাই হোক। আসুন মীরা দেবী, পাশের ঘরে যাই, আপনাকে ধুতি পাঞ্জাবী পরিয়ে দি। (হাত ধরা।)

বীণা। আসুন অশোক বাবু, আপনাকে শাড়ী পরিয়ে মেয়ে বানিয়ে দিই। (হাত ধরা)

অশোক। (হাত টানিয়া লইয়া) আমি যাব না।

মীরা। (হাত টানিয়া লইয়া) আমিও যাব না।

সুরেশ } (সমস্বরে বিস্ময়ে) যাবে না!
সুরমা যাবে না!
অনিল যাবে না!
বীণা যাবে না!

অশোক } (উভয়েই) না।
মীরা না।

সুরেশ } (সমস্বরে) কেন?
সুরমা কেন?
অনিল কেন?
বীণা কেন?

অশোক } (উভয়েই) (চুপ)
মীরা

সুরেশ। অশোক, উৎপলার কথা ভেবে দেখ একবার!

সুরমা। মীরা, বিজনকুমারের কথা ভেবে দেখ একবার!

অশোক। সেই ত্যাগাবণ্ডটা যেখানে আছে, সেখানে আমি যাবনা।

মীরা। আর সেই শূর্পণখা যেখানে আছে সেখানে আমি যাবনা।

সুরেশ। (মীরাকে লক্ষ্য করিয়া) শূর্পণখা কাকে বলছেন মহাশয়া?

সুরমা। (অশোককে লক্ষ্য করিয়া) আর ত্যাগাবণ্ডই বা কাকে বলছেন মহাশয়?

অশোক। সেই বিলেতফেরতটাকে বলছি।

মীরা। আর আমি বলছি সেই লেডী ডাক্তারকে।

সুরমা। (অশোককে লক্ষ্য করিয়া) তাকে ত্যাগাবণ্ড কেন বলছেন?

অশোক। যেহেতু সে ত্যাগাবণ্ড।

সুরমা। আপনি তাকে চেনেন?

বীণা। সুরমা, চুপ কর, এখন ঝগড়া করার সময় নয়।

সুরেশ। কেন নয়? (মীরাকে লক্ষ্য করিয়া) আপনি উৎপলাকে শূর্পণখা বলছেন কেন?

অনিল। চুপ কর, সুরেশ। এ নিয়ে এখন গোলমাল করে' লাভ নেই।

সুরেশ। নিশ্চয় আছে। কেন উনি আমাকে শূর্পণখা বলবেন?

বীণা। (বিস্ময়ে) আপনাকে?

সুরেশ। হাঁ, আমাকেই তো বলছেন।

(কথা শেষ হইতে না হইতেই খাঁ করিয়া সুরেশের গোঁফ ধরিয়া বীণার একটান, সঙ্গে সঙ্গে হাতের সঙ্গে গোঁফ চলিয়া আসা। চমকিয়া উঠিয়া মুখ সরাইতে সুরেশের হ্যাটটি মাথা হইতে পড়িয়া গেল, প্রকাশ হইলেন লেডী ডাক্তার উৎপলা। তাহা দেখিয়া অনিলও তাড়াতাড়ি সুরমার চুল ধরিয়া আনিল একটান, সঙ্গে সঙ্গে চুল খসিয়া আসিল; দেখা গেল বিলাতফেরত বিজনকুমার।)

অশোক। (বিস্মিত হইয়া) আঁ! একি! এই বুঝি

সেই বিজনকুমার ? মীরা, এই বুঝি তোমার পরপুরুষকে ভালবাসা ?

মীরা। (উৎপলাকে দেখাইয়া) আর এই বুঝি তোমার immoral হওয়া ? এই বুঝি তোমার পরস্ত্রীকে ভালবাসা ?

অশোক। মীরা, আমি এখনই গিয়ে তোমার বাবাকে বলে' দেব তুমি বাসরঘরে সেই ভ্যাগাবণ্ডটাকে নিয়ে এসেছ !

মীরা। আমিও তোমার বাবাকে বলে দেব তুমি সেই শূর্পণখাকে বাসরঘরে ঢুকিয়েছ।

উৎপলা। (অত্যন্ত রাগিয়া গিয়া, পটাপট্ আলষ্টারের বোতাম ছিঁড়িয়া, আলেষ্টার খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে স্বমূর্ত্তিতে মীরার কাছে আসিয়া) আপনি যদি আবার আমাকে শূর্পণখা বলবেন তবে আমি আপনার নাক কামড়িয়ে খেয়ে ফেলে দেব।

বিজনকুমার। তাড়াতাড়ি শাড়ীটা খুলিয়া ফেলিয়া ধুতি-পাঞ্জাবিতে স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া) আর আপনি যদি আমাকে আবার ভ্যাগাবণ্ড বলবেন তবে একঘুঁসি মেরে আপনার মাথা ফুটো করে ফেলব।

অশোক। (মীরাকে লক্ষ্য করিয়া) আমি চল্লাম তোমার বাবার কাছে, তুমি এই গুণ্ডাটাকে ঘরে ঢুকিয়েছ ! (দরজার দিকে অগ্রসর)

মীরা। আমিও চল্লাম তোমার বাবার কাছে, তুমি এই রাক্ষুসীটাকে এনেছ, সে আমার নাক কামড়িয়ে খেতে চায় ! (দরজার দিকে যাওয়া)

অনিল। (অশোককে ধরিয়া) অশোক, তুমি কি পাগল হ'লে ? মামারা যদি এখন এসে পড়েন তবে কি কেলেঙ্কারী হবে ভেবে দেখ দেখি ! তোমার জন্যই উৎপলা এখানে এসেছিল, তোমার বাবা এসে যদি তাকে অপমান করে ?

বীণা। (মীরাকে ধরিয়া) ছি ছি মীরা ! তোমার অন্ততঃ একটু জ্ঞান থাকা উচিত। তুমি নিজেই বিজনকুমারকে চিঠি লিখেছিলে, সে এসে যেন তোমাকে উদ্ধার করে, আর এখন তুমিই তাকে এইভাবে ফেলে চলে যাচ্ছ !

মীরা। (বিজনকুমারের কাছে আসিয়া) বিজন, আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করতে পারবে ?

অশোক। (উৎপলার কাছে আসিয়া তাহার একটি হাত তুলিয়া লইয়া) উৎপল, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছি। তুমি মনে মনে নিশ্চয়ই আহত হয়েছ।

উৎপলা। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) কিছুমাত্র না অশোক ! তোমাকে আমি এত hopelessly ভালবাসিনি যে, তোমার এই ব্যবহারে আমি মর্ম্মাহত হব। তুমি সে ভালবাসার উপযুক্ত নও। তোমার মত অস্থিরচিত্ত লোককে আমি মনে মনে ঘৃণাই করি। ভগবানকে বহু ধন্যবাদ যে, আমি তোমাকে ঠিক সময়ে চিনতে পেরেছি।

বিজনকুমার। ভগবানের কাছে আমিও ধন্যবাদ পাঠাচ্ছি মীরা, যে, তোমার মত দুর্ব্বল-চরিত্র মেয়ের হাত থেকে আমাকে তিনি রক্ষা করেছেন। আজ সমস্ত দিন উৎপলার সঙ্গে আমার স্টীমারে আলাপ হয়েছে, তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি, সে তোমার থেকে অনেক উঁচুদরের লোক। আমি তাকেই বিয়ে করব ঠিক করেছি।

অশোক। (এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া) উৎপল, সেই ভাল, তুমি বিজনকুমার বাবুকেই বিয়ে কর। মনে মনে তো আমিই তোমার স্বামী, তুমিই আমার পত্নী, কিন্তু বিয়ে তুমি কর বিজন বাবুকেই, তাঁকেই ভাল-বাসতে চেষ্টা কর। তিনি অবশ্য ধর্ম্মতঃ মীরার স্বামী। কিন্তু অপরের স্বামীকে ভালবাসায় যে কত সুখ তা তুমি জাননা। আমি জানি আর একজনের স্ত্রীকে ভালবাসায় কত সুখ। তাই বলছি তুমি বিজন বাবুকেই বিয়ে কর, কারণ—

বীণা। চুপ ! চুপ !

অনিল। চুপ। মামারা আসছেন।

(বাহিরে পায়ের শব্দ)

বীণা। (অনিলের কাছে ঘেঁসিয়া) কি হবে ? ওঁরা যদি এসে এঁদের অপমান করেন ?

অনিল। কোন ভয় নেই, আমি সব বুঝিয়ে দেব'খন।

(রমেশ ও সতীশ বাবুর প্রবেশ।)

রমেশ। (ঘরে ঢুকিয়াই) একি ! ঘরের এ দশা কেন ? লেপ বালিশ মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, বিছানার

চাদর ছিঁড়ে দড়ি পাকানো হয়েছে। একি! এ যে দেখি সেই লেডি ডাক্তার। অশোক! এসব কি?

সতীশ। অ্যা! বিজনও দেখি এখানে? মীরা এর কি অর্থ?

অনিল। কিছু নয় মামা। উৎপলা আর বিজনকুমারের বিয়ে।

রমেশ। কি?

অনিল। উৎপলা আর বিজনকুমারের বিয়ে।

সতীশ। এঁরা এখানে এলেন কি করে?

রমেশ। অশোকের যে বন্ধু এসেছিল সে কই?

সতীশ। মীরার সেই বন্ধুই বা কোথায় বীণা?

অনিল। এইতো এরা দুজনেই তারা।

রমেশ } (সমস্বরে) তারাই এরা!
সতীশ } তারাই এরা!

অনিল। হাঁ, এরাই তারা।

রমেশ। এঁরা এখানে কেন এসেছেন?

অনিল। বুঝতেই পারছেন মামা, (মীরা এবং অশোককে দেখাইয়া) এদের এক একজনকে নিয়ে elope করতে।

সতীশ } (সমস্বরে) elope করতে!
রমেশ } কিলোপ করতে!

অনিল। elope করতে মামা, elope করতে। কিন্তু তা আর হল না। এসে দেখেন টু লেট্। অশোক ও মীরা বাসরঘরে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছে!

রমেশবাবু। (পুত্রের দিকে চাহিয়া] তাই না কি রে গাধা? এক রাতও পোহায় নি, এরই মধ্যে?

সতীশ। (উৎপলা ও বিজনকুমারকে দেখাইয়া) এঁরা তাহলে এখন কি করবেন?

অনিল। এঁরা মনের দুঃখে পরস্পরকেই বিয়ে করবেন ঠিক করেছেন।

সতীশ। কবে করবেন?

রমেশ। কবের আর দরকার কি সতীশ? আজকেই তো রাত তিনটের লগ্ন আছে একটা, আজকেই হয়ে যাকনা!

সতীশ। তাও কি হয়! তুমি এক পাগল রমেশ! এদের আত্মীয় স্বজন রয়েছে, তারা এখানে নেই, তাদের অসাক্ষাতে বিয়ে হয় কি করে?

উৎপলা। আমাদের আত্মীয় স্বজনের দরকার হবে না। আজকেই আমরা বিয়ে করব। বন্দোবস্ত করে উঠতে পারবেন।

সতীশ। তা অবশ্য পারা যাবে। কিন্তু আপনাকে সম্প্রদান করবে কে?

অশোক। (আগাইয়া আসিয়া) কেন আমি তো রয়েছি, আমিই সম্প্রদান করব।

সতীশ। তুমি!

অশোক। দোষ কি? আমিই তো ওর—(বলিতে যাইয়া চুপ করিয়া যাওয়া)

রমেশ। চুপ করলি যে? তুই এর কিরে ছাগল?

অনিল। ও এক ছাগলই মামা, ওর কথা আবার কে শোনে? তাহলে' আজকেই বিয়ে হয়ে যাক। আপনারাই কেউ সম্প্রদান করবেন। কি বলেন?

রমেশ। ক্ষতি কি সতীশ?

সতীশ। বেশ! (দূরে আবার শানাই বাজিয়া উঠিল)

অনিল। (শানাই শুনিয়া) সবই তো হয়ে গেল মামা, এখন আমার একটা নিবেদন আছে।

রমেশ। কি?

অনিল। এই সঙ্গে আমার বিয়েটাও হয়ে' যাক।

রমেশ। তোর বিয়ে? তোকে আবার বিয়ে করবে কে রে?

অনিল। (বীণাকে দেখাইয়া) উনি হয়তো করতে চাইবেন। উনি অবশ্য আই-সি-এস্ চান; কিন্তু আমি না হয় ওঁর জন্য আই-সি-এসই হলাম।

সতীশ। আই-সি-এসই হলেন? আই-সি-এস কি এতই সোজা?

রমেশ। তা' ও হ'তে পারে সতীশ। ছেলে ও খুবই ভাল। 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' আমার চেয়ে বিশেষ খারাপ নয়। বরাবর University-তে ফার্স্ট হয়ে এসেছে, একটু

খেটে পড়লেই আই-সি-এস টাও পাশ করতে পারবে।

সতীশ। তাহ'লে এ বিয়ের তোমার আপত্তি কি রমেশ?

রমেশ। আপত্তি? আমার আপত্তি কিছুমাত্র নেই। এ বিয়ে হ'লে আমি খুবই খুসী হব।

সতীশ। তাহ'লে, আর দেরী করে' লাভ কি? চল, নীচে যাই, যোগাড়যন্ত্র করতে হবে, পুরুতঠাকুরকে জাগাতে হবে।

রমেশ। চল যাই। এস উৎপলা, এস অনিল। (অগ্রসর)

সতীশ। এস বিজন, এস বীণা। (অগ্রসর)

অনিল। অশোক তুমি আসবেনা? আমাদের বিয়ে দেখতে?

অশোক। বাবা যদি আপত্তি না করেন, নিশ্চয় আসব

অনিল। বাবা, আমি বাসরঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসব?

রমেশ। ওঃ কি বাধ্য ছেলেরে! দরকার নেই এসে। ওহে তোমরা সব এস। এস সতীশ, চল, আর দেরী করে লাভ নেই। এস উৎপলা, এস অনিল। এস বীণা, এস বীজন। ওরে বাইরে কে আছিস রে? ব্যাণ্ড বাজাতে বল, ব্যাগ পাইপ রেডী হতে বল, শানাই আরো জোরে বাজাতে বল। এস সতীশ, এস, চল, চল, চল………

যবনিকা

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

অশেষ

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দেব

কতপথ চলিয়াছি তবু ত হ'লো না শেষ,
এখনও কাণে বাজে দূরের বাঁশীর রেশ,
ডাকে যেন, আয় আয়, ও পথিক পথভোলা,
দিন গেছে, রাত গেছে, তবু ত রয়েছে বেলা,
ঘরছাড়া, ও পথিক, পথে তোর মিছে ভয়,
তোর সাথী রবি শশী তারকা আকাশময়,
তোর সাথী সমীরণ, অশোকের ফুলদোল,
তটিনীর কলগান, কোকিলের কুহু বোল;
এখনও তরুশিরে ঝলকে অরুণ আলো,
এখনও মানুষেরে মানুষ বাসিছে ভালো,
এখনও ফুলবনে ফোটে ফুল তারি তরে,
বিরহের বাতায়নে জ্যোছনা মুরছি পড়ে;—

ও বাঁশরী, ও বাঁশরী, কেন ক'স মিছে কথা,
নাই আলো, নাই গান, আছে শুধু ব্যাকুলতা;
নিবেছে ফুলের হাসি, ছিঁড়েছে প্রাণের বীণ,
বিহগ গাহে না আর, গ্রহতারা জ্যোতিহীন;
দেবতা গিয়াছে চলে, শুধু তার পদলেখা,
এ মনের বনপথে, রঙীন, রয়েছে আঁকা;
সে ত আর আসিবে না, গেছে চলে চিরদিন,
আজো মোর বাকি আছে শুধিতে ব্যথার ঋণ;
কত পথ চলিয়াছি, তবু ত হ'লো না শেষ,
কবে তুমি নেবে কোলে, বলে দাও হে প্রাণেশ,
সেদিন বাহির হবো, ছাড়িয়া এ খেলাঘর,
আঁধার নিশুতি রাতে,—তারপর,—তারপর?

প্রাচীন ভারতের ভাস্কর-শিল্প

শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম-এ, পি-আর-এস্

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩। মৌর্য্য-যুগ

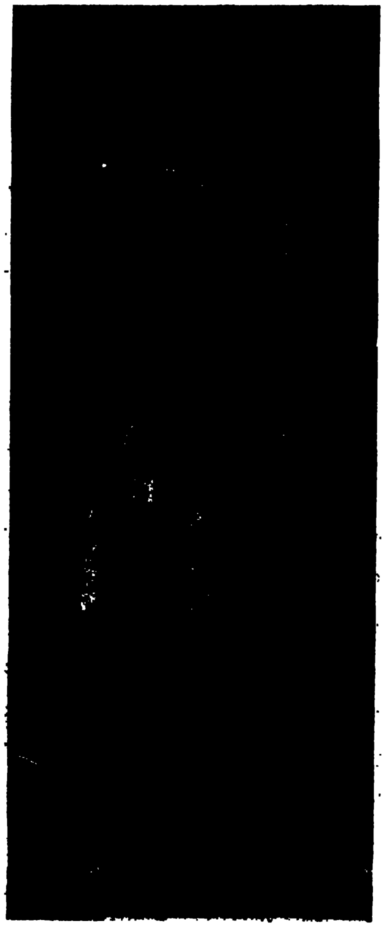
(খ)

বলিয়াছি, মৌর্য্য-রাজ-সভার শিল্পই মৌর্য্যযুগের ভাস্কর্য্যের একমাত্র পরিচয় নয়। যে-বিশেষ সংস্কৃতি ও শিল্পনীতি মৌর্য্যরাজসভায় প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা রাজসভার বাহিরে কোথাও আদৃত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়; সে শিল্পরীতিদ্বারা সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের শিল্প প্রভাবান্বিত হয় নাই। মৌর্য্যযুগে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের খাঁটিপরিচয় সেইখানেই আমরা পাই; সে-শিল্পের ভাবে ও ভাষায় কোথাও কোনো বৈদেশিক প্রভাবের চিহ্ন নাই, রাজসভার সংস্কৃতি ও শিল্পনীতি তাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। কিন্তু যে শিল্পপ্রতিভা রাজসভা হইতে দূরে এইভাবে আপন বৈশিষ্ট্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার নিদর্শন আমাদের সম্মুখে খুব বেশী নাই। তবু যে ২।৩টি আছে, তাহা হইতেই এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় লওয়া কঠিন হইবেনা; মৌর্য্য-রাজ-সভার শিল্পরীতির সঙ্গে এই বিশেষ শিল্পরীতির পার্থক্য যে কোথায়, তাহাও আমরা এই নিদর্শন ক'টি হইতেই জানিতে পারিব।

যুক্তপ্রদেশের মথুরা জেলার পারখাম গ্রামে একটি বৃহদাকৃতি দণ্ডায়মান যক্ষমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পারখামের নিকটেই বরোদায় আর একটি ভগ্ন বিপুলায়তন আবক্ষ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেশনগরে প্রাপ্ত একটি দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তি এবং সারনাথে প্রাপ্ত ভগ্নপ্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ একটি উপবিষ্টা রোরুদ্যমানা বালিকা-মূর্ত্তি, এই দুটিকেও আমরা এই যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। মৌর্য্য-রাজসভার শিল্পরীতির সঙ্গে ইহাদের শিল্পরীতির প্রথম পার্থক্যটি একটু লক্ষ্য করিলেই চোখে পড়ে; যে-উজ্জ্বল সুচিক্কণ মসৃণতা একান্তই সেই শিল্পের নিজস্ব, সে মসৃণতা এই মূর্ত্তিগুলির একটিতেও নাই। যে-বেলে-পাথর খুঁদিয়া এই মূর্ত্তিগুলিকে রূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সূক্ষ্ম বন্ধুরতা, অর্থাৎ পাথরের বাস্তব রূপটি, ইহাদের মধ্যে একান্তই সুপরিস্ফুট; এবং, তাহার ফলে মানবদেহের সজীব প্রাণবান্ রূপটিও ইহাদের মধ্যে বেশী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ভাস্কর্য্যের প্রথম যে উপাদান পাথর, তাহার বাস্তব রূপকে কৃত্রিম উপায়ে রূপান্তরিত করিবার চূড়ান্ত পরিচয় মৌর্য্য-রাজসভার শিল্পে আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু কোনোপ্রকারেই তাহাকে রূপান্তরিত না করিয়া, তাহার বাস্তব রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, উহাকেই জীবনের সজীব গতিচ্ছন্দের বাহন করিয়া তোলা—শিল্পের এই সুকঠিন রীতি ভারতীয় শিল্পীরা আয়ত্ত করিয়াছিল, এবং তাহার পরিচয় খুব প্রাচীন কাল হইতে পাওয়া যায়। মৌর্য্যযুগের ভারতীয় শিল্পেও তাহার প্রমাণ আছে; মানবদেহের মাংসলতার মধ্যে যে একটা স্পর্শসুখের অনুভূতি আছে, পাথরের বস্তুরূপের মধ্যে এই অনুভূতিকে ভারতীয় শিল্পীরা অপূর্ব্ব উপায়ে রূপদান করিয়াছে। মৌর্য্যরাজসভার শিল্পরীতির সঙ্গে উল্লিখিত মূর্ত্তিগুলির শিল্পরীতির দ্বিতীয় পার্থক্যটিও সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশোক স্তম্ভশীর্ষের প্রাণীমূর্ত্তিগুলিতে আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেকটি পৃথক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উদ্ধত শক্তি ও বিক্রমলীলাকে পৃথক পৃথক গড়নের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা; দেখিয়াছি, স্ফীত শিরা উপশিরা ও পেশীসমূহের গড়নরীতিতে অমিত বিক্রমপ্রকাশের ভঙ্গী, সর্ব্বত্র একটা শক্তির উল্লাসকে ফুটাইবার প্রয়াস। কিন্তু যে শিল্পনিদর্শন কয়টির উল্লেখ

আগে করিয়াছি, ইহাদের কাহারও মধ্যে এ প্রয়াস কোথাও নাই, ইহাদের গড়নরীতিতে, ইহাদের ভঙ্গীতে কোথাও দেহের শক্তি ও বিক্রমলীলাকেই বিশেষ করিয়া রূপায়িত করা হয় নাই। অথচ একথা বলা চলিবেনা যে, এই মূর্ত্তিগুলির দৈহিক রূপপরিকল্পনার মধ্যে, ইহাদের শিল্পরূপ ও ভঙ্গীর মধ্যে কোথাও কোনো দুর্ব্বলতার আভাসমাত্র আছে। পারখাম, বরোদা ও বেশনগরের তিনটি মূর্ত্তিই বৃহদাকার, বিপুলায়তন; সুবৃহৎ সুকঠিন পাথর লইয়া কাজ করিবার শিল্পীদের যে দুর্জ্জয় সাহস আমরা মৌর্য্য-রাজসভার শিল্পরীতির মধ্যে দেখিয়াছি, সে দুর্জ্জয় সাহসের অভাব এখানেও নাই; অবলীলাক্রমে তাহাকে লইয়া রূপসৃষ্টি করিবার প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যে কোথাও কোনো দুর্ব্বলতার চিহ্ন এখানে দেখিনা। ইহাদের আয়তনের মধ্যে, আকৃতির মধ্যে, একটা বিপুল পার্থিব শক্তির আভাস অত্যন্ত সুপরিস্ফুট, কিন্তু সে শক্তি অত্যন্ত সংযত ও সমাহিত।

পারখাম মূর্ত্তিটিকে কেহ কেহ শিশুনাগবংশীয় কোন রাজার মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা মনে করিবার মতন প্রমাণ খুব বেশী নাই। মূর্ত্তিটি দেখিলেই বুঝা যাইবে, পাটনায় প্রাপ্ত মৌর্য্য-যক্ষমূর্ত্তিদুটির সঙ্গে ইহার খানিকটা আত্মীয়তা আছে (১নং চিত্র)। মূর্ত্তিটি সম্মুখ-স্থানক, এবং সরলভাবে দণ্ডায়মান, দেহের সমস্তটা ভর যেন দেওয়া হইয়াছে ডান পা-টির উপর, এই পা-টি সে-জন্যই স্থির ও দৃঢ়। বাঁ পা-টি পাদপীঠের উপর স্থাপিত হইলেও জানুটিতে একটু অগ্রগতির আভাস আছে। বাঁ হাতটি উরুদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল বলিয়া মনে হয়; ডান হাতটি একবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পা-দুটির রূপ ও আকৃতি অনেকটা বাস্তবানুসারী এবং পাটনার যক্ষ-মূর্ত্তিদুটির পায়ের চাইতে সুদর্শন; কাপড়ের ভাঁজের নীচ দিয়াও তাহার রেখা ও আকৃতি আমরা অনুসরণ করিতে পারি। মৌর্য্যযুগের পাটনার যক্ষমূর্ত্তিদুটিতে কিংবা দীদারগঞ্জের নারীমূর্ত্তিটিতে কাপড়ের ভাঁজ দেখাইবার এই রীতির পরিচয় কম, কিন্তু শুঙ্গযুগের বরহুতের ভাস্কর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী শিল্পনিদর্শনে কাপড়ের নীচে দেহাকৃতিকে যথাযথভাবে দেখাইবার প্রয়াস অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। এই মূর্ত্তিটিতে সাধারণতঃ কাপড়টি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং একান্তভাবে দেহের সঙ্গে সংলগ্নভাবেই দেখানো হইয়াছে, ভাঁজ অল্পস্বল্প আছে, তাহাও আঁচড়-রেখার সাহায্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র। গলা ও ঘাড়ের রূপাকৃতি ও গড়ন অনেকটা পাটনার যক্ষমূর্ত্তি দুটিরই মতন; তবে ঘাড়ের রেখাটি বক্রতর, এবং মেরুদণ্ডের নির্দ্দেশ গভীরতর, ও সেইহেতু অধিকতর দেহের

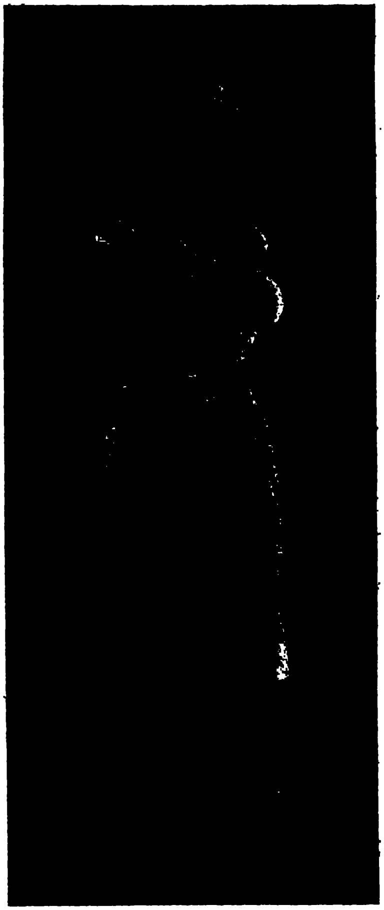


১নং চিত্র। মথুরা জেলার পারখাম গ্রামে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান যক্ষ-মূর্ত্তি।

বস্তুরূপানুসারী। মাথার পশ্চাৎ দিক খানিকটা চ্যাপ্টা; কটিদেশের নিম্নভাগ এবং নিতম্বদেশও তাই, এবং পশ্চাৎদিকের দেহাকৃতি কাপড়ে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এই পশ্চাদ্ভাগের গড়ন এবং সজ্জা ও খানিকটা অযত্নসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়;

বোধ হয় শিল্পীর মনোযোগ শুধু সম্মুখ ভাগেই নিবদ্ধ ছিল। পিছনের দিকে বস্ত্র-সজ্জার রীতি পাটনার মুক্তকচ্ছ যক্ষ-মূর্ত্তিদুটিরই মত, কিন্তু সম্মুখ দিকের বস্ত্রভাগ ভাঁজে ভাঁজে কোঁচান এবং দুইপায়ের মাঝখানে বিলম্বিত। কানের বড় বড় দুল কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কণ্ঠে মোটা মালার লহর একসঙ্গে গাঁথা, ও কেয়ূর। ইহাদের বন্ধনী ঘাড়ের পিছন দিকে বিলম্বিত। দেহের উত্তমার্দ্ধের জামা বুকের নীচপর্য্যন্ত একটি বন্ধনীর সাহায্যে আবদ্ধ। সমগ্র দেহটি অত্যন্ত স্থূল ও আয়তন-বহুল, এবং তলপেটটি এত মাংসল যে তাহা খানিকটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। দেহের এই বিশেষ রূপ, ইহার গলা ও মাথার আকৃতি কতকটা আদিম শিল্পের মনুষ্যমূর্ত্তির পরিকল্পনানুযায়ী; ইহার ঘাড়ের বক্র-রেখায়, মুক্তকচ্ছ বস্ত্রসজ্জায়, এবং দেহভঙ্গিমায় মৌর্য্য-ভাস্কর্য্যের সঙ্গে খানিকটা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ বেশী করিয়া দেখা যায় পরবর্ত্তীকালের সুঙ্গ ও কুষাণ যুগের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে। ইহার দাঁড়াইবার সহজ ভঙ্গিতে, ইহার কাপড়ের গড়ন ও ভাঁজের রীতিতে, ইহার সম্মুখদিকের কোঁচান বস্ত্র-সজ্জায়, ইহার বাঁ-হাটুর অগ্রগতির আভাসে, প্রভৃতিতে আমরা পরবর্ত্তী সুঙ্গ-ভাস্কর্য্যের সূচনা দেখিতে পাই। এই মূর্ত্তিটির সঙ্গে বিশেষ করিয়া পরবর্ত্তী কালের মহাবোধির প্রাচীর-বেষ্টনীর দণ্ডায়মান যক্ষমূর্ত্তির, বরহুতের প্রাচীর-বেষ্টনীতে উৎকীর্ণ দণ্ডায়মান যক্ষমূর্ত্তিগুলির, এবং ভিক্ষু বলের প্রতিষ্ঠিত মথুরার কুষাণ যুগের বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির শিল্পরীতির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই হিসাবেই এই যক্ষমূর্ত্তিটির শিল্পরীতির মধ্যে আমরা পরবর্ত্তী খাঁটি ভারতীয় শিল্পরীতির সূচনা দেখিতে পাই। সেই জন্যই মনে হয়, পারখামের এই দণ্ডায়মান যক্ষমূর্ত্তিটি ঠিক মৌর্য্যযুগের পাটনা ও দিদারগঞ্জের মূর্ত্তিগুলির সমসাময়িক নয়; বোধ হয় কিছু পরবর্ত্তীকালের, অর্থাৎ মৌর্য্য-রাজসভার সংস্কৃতি ও শিল্পরীতির প্রভাব যখন মৌর্য্য-রাজবংশের পতনে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে যখন পুরাতন শিল্প-রীতিকে অবলম্বন করিয়া খাঁটি ভারতীয় শিল্পরীতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, পারখামের যক্ষমূর্ত্তিটি সেই সময়ের। এই পরিবর্ত্তন-যুগের চিহ্ন ইহার মধ্যে সুপরিস্ফুট।

বেশনগরে যে দণ্ডায়মানা যক্ষিণী মূর্ত্তিটী পাওয়া গেছে, (২নং চিত্র) তাহার সঙ্গে দিদারগঞ্জের নারীমূর্ত্তিটির সাদৃশ্য খুব কম। দু'টি মূর্ত্তিই সরলভাবে দণ্ডায়মানা, অলঙ্কার ও বসনবিন্যাসের মধ্যেও খানিকটা সাদৃশ্য হয়ত আছে, কিন্তু দিদারগঞ্জের মূর্ত্তিটিতে যে-একটি সহজ দৈহিক লীলা-বিলাসের আভাস



২ নং চিত্র। বেশনগরে প্রাপ্ত দণ্ডায়মানা যক্ষিণী মূর্ত্তি।

আছে, বেশনগরের মূর্ত্তিটিতে তাহা নাই। এই মূর্ত্তিটি স্থির ও দৃঢ় এবং গতিহীন। দেহাকৃতি ও তাহার গড়নের মধ্যে কোনো সৌকুমার্য্যের পরিচয় নাই; বসনের গড়ন ভারী এবং ভাঁজের রেখাগুলির গড়নও স্থূল, যদিও তাহা দেহের রেখা

ও আকৃতি অনুসারী। মূর্তির হাত দুইটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাণে ভারী গোল কুণ্ডল, গলায় স্থূল ও ভারী হারের লহর এমন ভাবে সমস্ত বুক ও স্থূল গোলাকৃতি স্তন দুটির খানিকটা ঢাকিয়া দিয়াছে যে তাহাতে দেহের উত্তমার্দ্ধের সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে, গড়নটিও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। নিতম্ব দেশের কাঞ্চী ও মেখলার অলঙ্কারও অত্যন্ত স্থূল ও ভারী। বসন-বিন্যাসের রীতি পরবর্ত্তী সুঙ্গযুগের বরহুতের প্রাচীর-বেষ্টনীর যক্ষিণী মূর্তিগুলিরই মতন, বিশেষ করিয়া পা দুটির মাঝখানে বিলম্বিত কোঁচানো ভাঁজগুলির মধ্যে এই সাদৃশ্যের পরিচয় আছে। সুঙ্গ যুগের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে সাদৃশ্য গোল চ্যাপ্টা মুখের আকৃতিতে এবং কেশগুচ্ছের স্থূল বিন্যাসভঙ্গীতেও পাওয়া যায়। কটিদেশে জড়িত বস্ত্রভাগটুকুর গড়ন স্থূল, এবং দেহের নিম্নার্দ্ধের শিল্পরূপের মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যের আভাস-ও কোথাও নাই। নিতম্বদেশ ভারী ও প্রশস্ত, এবং পা'দুটির রেখার মধ্যে লীলা-বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার মধ্যে জীবনের আভাস ফুটিয়া উঠে নাই। এই মূর্তিটির শিল্পরীতির সঙ্গে মহাবোধির প্রাচীরবেষ্টনীর দণ্ডায়মানা যক্ষিণী-মূর্তিটির, বরহুতের যক্ষিণীমূর্তি-গুলির, এবং পূর্ব্ববর্ত্তীকালে বসার ও ভীটা প্রভৃতি স্থানে পোড়ামাটীতে উৎকীর্ণ যে-সব নারীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের শিল্পরীতির নিকট সম্বন্ধ খুব সহজেই চোখে পড়ে।

কিন্তু সারনাথের একটা প্রস্তর খণ্ডে উৎকীর্ণ যে উপবিষ্টা রোরুদ্যমানা বালিকা মূর্তিটি (৩নং চিত্র) পাওয়া গিয়াছে, সুঙ্গ-পূর্ব্ব ভারতীয় ভাস্কর-শিল্পে কোথাও তাহার তুলনা নাই। অশোকের রাজসভায় মিশ্র-শিল্পরীতির প্রভাব ইহাকে স্পর্শও করিতে পারে না; এবং কি শিল্পরীতিতে, কি ভাব ও অনুভূতিতে, কি পরিকল্পনায় ইহার পাশে দাঁড়াইতে পারে, মৌর্য্যযুগের এমন একটি নিদর্শন-ও আমাদের জানা নাই। ইহার কল্পনা ও শিল্প-রীতি, ইহার অনুভূতি একান্তভাবেই ভারতীয় শিল্প-প্রতিভার নিজস্ব। এই প্রস্তর খণ্ডটা বোধ হয় কোনো প্রাচীর-বেষ্টনীর ভগ্নাংশ। ইহারই মধ্যে একটি বালিকা মূর্তি তার দুটি সুকোমল হাত ও হাঁটু দুটির মধ্যে সুকুমার মুখখানি গুঁজিয়া বসিয়া আছে। শ্রান্ত ক্লান্ত বালিকাটি কি একটু অবসরে ঘুমাইয়া লইতেছে, না সে কোনো প্রিয়জনশোকে কাঁদিতেছে? কিছুই ভাল করিয়া বুঝিবার উপায় নাই; কিন্তু, মনে হয় শোকভারেই যেন



৩ নং চিত্র। সারনাথে প্রাপ্ত রোরুদ্যমানা বালিকা মূর্তি।

তাহার সমস্ত দেহটা বিনম্র, দুঃখে কষ্টে মাথাটা যেন একেবারে নুইয়া পড়িয়াছে। দেহে বসনের প্রাচুর্য্য একেবারে নাই বলিলেই চলে, উত্তমার্দ্ধ অনাবৃত, নিম্নার্দ্ধেও পা দুটি উলঙ্গ, শুধু খাটো শাড়ীটি মেখলা অলঙ্কারে কটিদেশে আবদ্ধ। কেশগুচ্ছের বিন্যাসভঙ্গী ও তাহার উপরকার অলঙ্কার সজ্জার ভঙ্গি বেশনগরের নারীমূর্তিটির প্রায় অনুরূপ। বিলম্বিত বেণীটি পিঠের সুমধুর বক্ররেখাটী অনুসরণ করিয়া নামিয়া আসিয়া একটি ঝুমকাতে আবদ্ধ হইয়াছে। পায়ে ভারী

নূপুর, এবং সমস্ত মূর্ত্তিটি যেন একটি স্থির ভাবনম্রতার মধ্যে বিকৃত। কিন্তু যত মাধুর্য্য সব যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে দেহের বক্র রেখাগুলির মধ্যে। মাথার উপরকার রেখাটি পিঠের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়া বেণীর ঝুমকাটির কাছে একবার থামিয়া আবার একেবারে মেখলা পর্য্যন্ত বাঁকিয়া গিয়াছে। মেখলা হইতে একটি বক্ররেখা একদিকে উরুদেশটিকে, এবং আর একদিকে বুকটিকে যেন আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার বসন এবং অলঙ্কার বিন্যাস ও রীতির সঙ্গে বেশনগর ও দিদারগঞ্জের নারীমূর্ত্তি দুটির সাদৃশ্য খানিকটা আছে বটে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে সুকঠিন শিল্পরীতি, এবং শিল্পীর যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার কোনো তুলনা নাই। এ পর্য্যন্ত যতগুলি মূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি, সবগুলিই সম্মুখ-স্থানক, এবং প্রত্যেকটিই দণ্ডায়মান। কিন্তু এই মূর্ত্তিটি পার্শ্ব-স্থানক, এবং একটি সুকঠিন ভঙ্গীতে উপবিষ্ট। স্বল্প একটু স্থানের মধ্যে এমন সুকঠিন ভঙ্গিতে পার্শ্ব-স্থানক অবস্থায় ইহাকে রূপায়িত করিবার মধ্যে শিল্পীর যে-বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় আমরা পাইলাম, এ পরিচয় এ যাবৎ ভারতীয় ভাস্কর্য্যের আর কোথাও নাই। শুধু নৈপুণ্যের প্রগতিই যে ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই নয়, মানব দেহাকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীর সবিশেষ জ্ঞান, এবং তাহার প্রতি একটা সহজ দরদবোধও এই মূর্ত্তিটির মধ্যে সুপরিস্ফুট। দেহভঙ্গীর মধ্যে, তাহার গড়নের মধ্যে, তাহার উপস্থিতির মধ্যে মানব-মনের একটা অনুভূতিকে এমন করিয়া ফুটাইবার চেষ্টা ভারতীয় ভাস্কর্য্যে আর দেখা যায় নাই; পৃথিবীর কোনো দেশেরই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শিল্পে মানবমনের অনুভূতির এমন সজীব ও জাগ্রত পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। শিল্পী যেন এখানে কোনো রীতির, কোনো বিশেষ ব্যাকরণের দাস নয়—সে যেন নিজে ইহা অনুভব করিয়াছে, এবং অনুভব করিয়া নিজের রীতি নিজেই আবিষ্কার করিয়াছে। এই মূর্ত্তিটির মধ্যে যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্পীমনের একটি সহজ নির্ভুল পরিচয় ধরা পড়িয়াছে, সে শিল্পী যেন দুঃখের রূপটিকে নিজের চোখে দেখিয়াছে, এবং এমন একটা আবেষ্টনের মধ্যে দেখিয়াছে যাহা একান্তই ভারতীয়। সেই জন্যই তাহার শিল্পসৃষ্টিটির মধ্যে কোথাও কোনো প্রভাবের চিহ্নমাত্র নাই—না রীতিতে, না বিন্যাসে, না ভাবে, না ভঙ্গিতে। প্রাক্‌সুঙ্গ ভারতীয় ভাস্কর্য্যের যতগুলি নিদর্শন আমরা দেখিয়াছি, এই দুঃখভারবিনম্রা বালিকা-মূর্ত্তিটী তাহার মধ্যমণি, এবং সে-যুগের ভারতীয় শিল্পের যতকিছু মাধুর্য্য, যতকিছু নৈপুণ্য, যতকিছু সৌন্দর্য্য ইহারই মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই সে-যুগের খাঁটি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একমাত্র নিদর্শন, একমাত্র পরিচয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়



ঝঞ্ঝা রাতের পথিক

শ্রীযুক্ত অভয় পাল

বড়োর কথা সংসার চিরদিন মনে রাখে। তার গুণগান সে চিরদিনই করে। কিন্তু যাহাদের লইয়া এই বড়ো তাহাদের একটিবারও ভাবে না, বা ভাবা প্রয়োজন মনে করে না। আলেকজাণ্ডার কবে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, ইতিহাস আজও তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু যে সৈন্যবাহিনীর উপর তাঁহার নির্ভর, তাহাদের কথা কয়জনই বা স্মরণ রাখিয়াছে? তাহারা গোলার মুখে বুক দিয়াছে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে কতদিন হয় ত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, গিরিলঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, সাঁতরাইয়া নদী পার হইতে হইয়াছে, —এমনি কত কি দুঃসাহসের কাজই না তাহাদের করিতে হইয়াছে! তবু কি সংসার তাহাদের কথা স্মরণ রাখে?

...যদিই বা ইহাদের কথা ক্ষণেকের তরে স্মরণ করে, কিন্তু যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অপরের অর্থাগমের পথ সুগম করিয়া দেয়, তাহাদের কথা একটিবারও ভাবে না, জঞ্জালের ন্যায় দূরে তাহাদের ঠেলিয়া রাখে। কিন্তু তবুও তাহারা মানুষ, তাহারাও হাসে কাঁদে, আবার সময়ের প্রলেপে দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়।

গয়ারামের চাক্‌রী গিয়াছে। কথাটা মুখে মুখে প্রচার হইয়া গেল। সকলের মনই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাইত, কাজ করা দেখিতেছি দায় হইল সামান্য ভুলে যদি এমনি করিয়া চাক্‌রী যায়!

২৲ ২॥৹ ৩৲ এমনি সব 'হপ্তা' পায়। ইহাতে পেটও পুরা ভরে না, দেহও সম্পূর্ণ ঢাকে না। তবু ইহাতেই জীবন মরণ নির্ভর করে। তাই গয়ারামের মুখ এতটুকু হইয়া গেল।

গয়ারাম চলিয়া গেল। ঘরটা খালি খালি মনে হয়। কিন্তু ও দু' একদিনের জন্য। আবার নূতন লোক আসে, খালি ঘরটা ভর্ত্তি হয়, তারপর সেও আবার ইহাদের সাথে মিলিয়া যায়। দিনে দিনে গয়ারামের স্মৃতি সকলের মন হইতে মুছিয়া যায়।

বদ্‌রিনারায়ণের পা কাটিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছে। এমন ত প্রায়ই হইয়া থাকে। তবুও সবাই দেখিতে যায়। লাইনের এক ধারে জমাট রক্ত, তাহারি পার্শ্বে মৃত বদ্‌রিনারায়ণ পড়িয়া আছে। কোথাও এতটুকু টস্‌কায় নাই —কে বলিবে সে মরিয়াছে, যেন অঘোরে ঘুমাইতেছে। প্রীহাসার রুগ্ন দেহটি লইয়া স্ত্রী-পুত্রের জন্য কি হাড়ভাঙা খাটুনিই না তাহাকে খাটিতে হইয়াছে। তবু কোন দিন পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ক্লান্ত হইলেও এক মুহূর্ত্ত ছায়ায় দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিবার উপায় নাই—ফাইন্ হইয়া যায়। কোম্পানি মাহিনা দিতেছে - কাজের জন্য, বিশ্রামের জন্য নহে। তাই বুকের রক্ত জল করিয়া ৮টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খাটিতে হয়। কিন্তু এত খাটিয়াও কোন দিন মনিবের নিকট এতটুকু সহানুভূতি পায় নাই। তাই আজ সে তাহার দেহের রক্ত দিয়া তাহার কাজ শেষ করিয়াছে—আজ হইতে তাহার চিরবিশ্রাম!

দেখিতে দেখিতে ভিড় বাড়িয়া যায়। এমন সময় সাহেব আসিয়া পড়ে, দরোয়ান আসিয়া পড়ে। ধমক দিয়া ধাক্কা দিয়া ভিড় সরাইয়া দেয়—তাহার পর লাস্ লইয়া কোথায় চলিয়া যায়।

বদ্‌রিনারায়ণের স্ত্রী কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা কুটিয়া আকুল হইয়া পড়িল, দুনিয়ায় দাঁড়াইবার আর যে কোথাও স্থান নাই!

প্রতিবেশী নারীরা সান্ত্বনা দিতে কাছে আসে,—জাত বিজাতের কথা ভুলিয়া যায়। তাহারা নারী, তাই নারীর

সমবেদনায় নারীরা ছুটিয়া আসে, তা হোক্ না কেন হিন্দুস্থানী মুসলমান, বাঙ্গালী।

বদ্রীনারায়ণের জীবনের মূল্য স্বরূপ কোম্পানী নগদ ২০০৲ টাকা তাহার স্ত্রীকে দিয়াছে, তাহা লইয়াই তাহাকে এ স্থান-ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

প্রতিবেশী নারীরা কাঁদে। তাহাদের চোখের জলের ভিতর দিয়া বদ্রিনারায়ণের স্ত্রী তাহার পুত্রেদের হাত ধরিয়া দেশে চলিয়া যায়।

মোড়ের মাথায় কাবলীওয়ালা ঠায় দাঁড়াইয়া থাকে,—ঠিক্ ছুটির সময়। যে দিন যে ধরা পড়িয়া যায় তাহার লাঞ্ছনার আর সীমা পরীসীমা থাকে না।

সে দিন রামতারণ কাবলীওয়ালার হাতে ধরা পড়িয়া গেল। অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া যখন কড়া কথা, গালিগালাজ ও অবশেষে লাঠির গুঁতা খাইয়া সেদিনকার মত সে নিস্তার পাইল, তখন তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে। তাহার যা' আয় তাহাতে কোনমতে দুই জনের পেট চলিয়া যায়। যদি একমাস অনাহারে থাকিয়া সমস্ত টাকা কাবলীওয়ালার চরণে দিতে পারা যায় ত' কতক ঋণ পরিশোধ হয়। ভাবিতেও দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া যায়, চোখের সাম্‌নে অন্ধকার দেখে!

অবসন্ন মন লইয়া বাসায় আসিয়া দেখে স্ত্রী ক্ষেমঙ্করী চুপ করিয়া বসিয়া আছে—উনানের আঁচ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে।

রামতারণ কহিল—কিরে, ব'সে ব'সে কি কর্‌ছিস্,—খাওয়া দাওয়ার কতদূর কি হোল?

ক্ষেমাঙ্করী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, মনটা তাহারও ভাল ছিল না। এমন চাল ডাল আলুও নেই যে একবেলা ফুটাইয়া খায়। তাহার উপর কাবলীওয়ালা মিন্সে যখন তখন আসিয়া দোরে চাপিয়া বসে—অভদ্র ইঙ্গিতও করিতে ছাড়ে না। তাই এক একবার মনে হয় রামতারণের গলায় কণ্ঠি না দিয়া যদি সে শ্যামের গলায় দিত ত' আজ হয় ত তাহাকে এমন করিয়া পেটের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতে হইত না। আজও ত শ্যাম বলে— 'আর ক্ষেমি আয়। কেন ওর কাছে প'ড়ে মর্‌ছিস্,—হুঁ! শালার এক কড়ার মুরদ নাই, শালা আমার গেল কণ্ঠিবদল কর্‌তে! আমার যা' কিছু আছে সবই ত' তোর হবে।' কথাগুলা শুনিয়া সে দিন শ্যামকে সে কি গালাগালিই না দিয়াছিল। কিন্তু আজ শ্যামের কথাগুলোই বার বার মনে পড়ে। বিরক্ত ভাবে কহিল—আমার পিণ্ডি চটকে রেখেছি তাই গিল্‌বে, আর খাওয়ার ব্যবস্থা কি কর্‌ব?

চোখ মুখ রাঙা করিয়া রামতারণ কহিল—কী? কি বল্‌লি? তোকে হাজার দিন না মানা ক'রে দিয়েছি—পিণ্ডি পিণ্ডি বল্‌বি না।

ক্ষেমঙ্করীও রুখিয়া কহিল—আমার পিণ্ডি তুই খাবি না ত' কি তোর পিণ্ডি আমি খাব? ঘরে চাল কলা থাক্‌লে তোর পিণ্ডি চট্‌কে রাখতুম!

কথায় কথা বাড়ে। তাহার পর হাতাহাতি হয়। এক্ষেত্রে এক তরফা রামতারণই প্রহার করিতে লাগিল। অপর পক্ষ কাঁদিয়া কাটিয়া মাটিতে মাথা কুটিয়া রক্ত বাহির করিল।

ক্রমে লোকজন আসিয়া পড়িল এবং রামতারণকেই দোষী করিয়া ছি ছি করিতে লাগিল। ইহাতে রামতারণের ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া গেল। মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির করিতে পারিল না। কিন্তু রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষেমঙ্করী মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

এদিকে তখন কর্ম্মশ্রান্ত পুরুষেরা কয়েক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের পর মহল্লায় মহল্লায় আনন্দোৎসব সুরু করিয়াছে।

যাহার যাহাতে আনন্দ—

উৎকলবাসীরা একধারে বসিয়া সমস্বরে মহাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতেছে। গুণকীর্ত্তন যত হউক বা না হউক একগাল পান ঠাসিয়া যাহা বলিতেছে তাহা অস্পষ্ট, এবং মুখ দিয়া থুতু বাহির হইতেছে প্রচুর! ইহাতেই ইহাদের আনন্দ।

আর একদিকে মুসলমান। তাহাদের কোন এক আগত-প্রায় পরবের জন্য রাংতামোড়া কাঠের তলোয়ার ও অস্ত্রাস্ত্র

কৃত্রিম অস্ত্র সস্ত্র লইয়া পুরাদমে 'রিহার্‌সল্‌' চলিতেছে। সঙ্গে সেই সনাতন বাজনা—চড়্‌-চড়্‌-চড়্‌।

অন্যদিকে হিন্দুস্থানীর দল। ইহারা অতশতর ধার ধারে না। শ্রীরামচন্দ্রের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত যে ভজন পাইয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট। ইহারা খোল-করতাল-সংযোগে চোখ কান বুজিয়া যাহা ভজন করিতেছে তাহাতে যে কোন দেবতা বা মানব সন্তুষ্ট হইতে পারে তাহা ত মনে হয় না। তবে এক দিস্তা বা দুই দিস্তা ডাল সংযুক্ত রুটি হজম করিবার জন্য ইহা এক উৎকৃষ্ট পন্থা তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

অন্যদিকে বাঙ্গালীরা। ইহারা একটা ভাঙ্গা হারমনিয়ম্‌ ও একটি খোল জোগাড় করিয়াছে। প্রায় শ'খানেক লোক গোল হইয়া বসিয়া হারমনিয়ম লইয়া একটি লোক গলার শিরা স্ফীত করিয়া গাহিতেছে—

গোবিন্দের দু'টি পদ, যার ধন সম্পদ-ও-ও—

অন্যান্য সকলে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—

গোবিন্দের দু'টি পদ—

এক একটা লাইন অন্তত পাঁচবার। এমনি একটা দুইটা করিয়া চারি পাঁচ খানি গান হয়। তখন রাতও হয় বেশ। অধিকাংশ গায়ক তখন ঢুলিতে থাকে, কেহ বা চট্‌ পাতা আসরে 'কাৎ' হইয়া পড়ে। ধাক্কা দিয়া, ঠেলিয়া ইহাদের তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহার পর যে যাহার ঘরে চলিয়া যায়।

এমনই ইহাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রণালী। পাঁচটার সময় কারখানা হইতে ফিরিয়া যেমন সমস্ত পল্লীটাকে মুখরিত করিয়া তুলে, তেমনি সকাল সাড়ে সাতটার সময় যখন সকলে কাজে বাহির হইয়া যায়, তখন সমস্ত পল্লীটা খাঁ খাঁ করিতে থাকে। মনে হয় যেন ঘুমন্ত পুরী।

কতক লোক কিন্তু এই নিত্য জীবনযাত্রার বাহিরে। তাহারা কাজ হইতে ফিরিয়া হয় গঞ্জিকা নয় ধান্যেশ্বরীর আরাধনায় বিভোর হইয়া পড়ে।

শ্যাম ইহাদের মধ্যে একজন। গঞ্জিকা সেবনেই তাহার আনন্দ। সেদিনও ধূমপান চলিতেছিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—তাইত ক্ষেমীদের ঝগড়ার কি হোল দেখা প্রয়োজন।

ঘুমন্ত ক্ষেমীর কাছে আসিয়া শ্যাম ডাকিল—অ—ক্ষেমি, ক্ষেমি!

ডাক শুনিয়া ক্ষেমী ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল।

শ্যাম কহিল এ গেলো কোথায়?

ক্ষেমী কহিল—যম জানে!

প্রশ্নের উত্তর আসিয়া গেল,—তাহা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি ঝাঁঝালো। সুতরাং ইহার পর আর প্রশ্ন চলিতে পারে না। অগত্যা শ্যাম কহিল, এখনও বোধ হয় খাওয়া হয় নি?

ক্ষেমঙ্করী কোন উত্তর দিল না।

সারাদিন যে তাহার আহার হয় নাই ইহা শ্যামের অগোচর ছিল না। অথচ সোজাসুজি ভাবে যদি তাহাকে আহার করিবার কথা বলা হয় ত' প্রত্যাখ্যান যে করিবেই তাহা শ্যামের ভালরূপই জানা ছিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্যাম কহিল—জানিস্‌ ক্ষেমি, আজ হরিদাস বাবাজীর ওখানে গিয়েছিলাম। প্রভুর ভোগ খেয়ে এলাম।—আহা, যেন অমৃত!—জানিস্‌ ক্ষেমি, যেন অমৃত! খেলুম ও তেমনি দমভোর। এখনও পেট ভার, খিদে নেই। এবেলার সব ভাত পড়ে আছে, কি করব তাই ভাবছি। তুই যদি খাস্‌, তো বেঁচে যাই মাইরি! কথায় বলে ভাত লক্ষ্মী, ফেলে দেব রে!

কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেও ক্ষেমীর বুঝিতে বাকি রহিল না। অপমানে তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বাহিরের গাঢ় অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—শ্যামের এই সহানুভূতি পাইবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইল না কেন? স্বামীর অর্থ থাকিলে কি এমন করিয়া অপমান কুড়াইতে হইত? সে যে খাইতে পায় না ইহা আর কাহারও অবিদিত নাই। শ্যামের এই আন্তরিক সহানুভূতি পাইয়া কৃতজ্ঞ না হইয়া সে অপমান বোধ করিল বেশী! সে খাইতে না পাইয়া মরিবে সেও ভাল তবু কাহারও করুণা চাহে না।

ক্ষেমঙ্করীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া শ্যাম কহিল—কিরে চুপ করে রইলি যে?

ক্ষেমঙ্করী কহিল—আমার ক্ষিদে নেই।

—আহা সারাদিন ত কিছু খাস্‌নি। তাই বল্‌ছিলাম—

ক্ষেমঙ্করী দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—আমি খাই না খাই তোর কি? তুই তোর ঘরে গিয়ে গাঁজা খেগে যা। বলিয়া এমন ঝাঁঝিয়া উঠিল যে শ্যাম আর পলাইতে পথ পাইল না।

ক্ষেমঙ্করীর নিকট এ ব্যবহার সে প্রত্যাশা করে নাই। তাই হঠাৎ এই রূঢ় ব্যবহার পাইয়া মনটা তাহার বিরূপ হইয়া উঠিল। ভাবিল পরের উপকার করিতে গেলে এমনিই ব্যবহার পাওয়া যায় বটে! অকৃতজ্ঞ মানুষ!

শ্যাম শয্যা গ্রহণ করিল, আহারে তাহার রুচি ছিল না। শুইয়া শুইয়া কত কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহার পর এক একটি করিয়া অতীতের সেই স্মৃতিগুলা মানসপটে ভাসিয়া উঠিল।

তখন তাহার বয়স মাত্র বারো। নয় বৎসরের ক্ষেমির হাত ধরিয়া তাহার মা আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া তাহার পিতার চরণে ধরিল। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব স্থান না দিলে কে দিবে? তাই পিতা ইহাদের স্থান দিলেন। ক্ষেমির সঙ্গে অল্পদিনেই তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। উভয়ের পিতা মাতা যখন ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাইত তখন,—সেই সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন, বউবর খেলিয়া, ইটের বেড়া দিয়া ঘর তৈয়ার করিয়া, ধুলার ভাত বাঁধিয়া—আনন্দে কাটিয়া যাইত। এমনি করিয়া দিন যায়। ক্রমে উভয়ে যৌবনে আসিয়া পড়িল, এবং খেলা ধুলা ছাড়িয়া ভিক্ষা কার্য্যে বাহির হইতে হইল।

ক্ষেমি রোজগারে সকলকে ছাড়াইয়া গেল। দিনে তিন চার টাকা করিয়া রোজগার করিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া রবিবার বাবুরা ঘরে থাকিলে টাকা পয়সাটা কিছু বেশী হইত।

যৌবনের প্রথম উন্মেষে ক্ষেমিকে ভারি সুন্দর দেখাইত, আর তার গলাও ছিল ভারি মিঠা। সুতরাং উপার্জ্জন হওয়াটা বিশেষ আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়।

শ্যামের পিতার চক্ষে কিন্তু এটা মোটেই ভাল লাগিত না। কারণ ক্ষেমিকে পুত্রবধূ করিয়া লইবার বাসনা তাহার ছিল। তাই এক দিন কথায় কথায় এই কথাটা পেড়ে পাড়িল। ক্ষেমির মা কিন্তু ইহাতে সম্মত হইল না। মেয়ের রোজগারে ইদানীং তাহার কিছু পয়সার গরম হইয়াছিল। তা ছাড়া মেয়েকে পরের ঘরে দিলে অর্থাগম বন্ধ হইয়া যাইবে।

এই বিবাহ-ব্যাপার লইয়া উভয় পক্ষে কলহের সৃষ্টি হইল এবং তাহাই একদিন ঘোরতর আকার ধারণ করায় ক্ষেমির মা অন্যত্র উঠিয়া গেল।

কিছুদিন পরে খবর আসিল, ক্ষেমীর খুব ভাল ঘরে বিবাহ দিয়া বুড়ী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

তাহার পর কত দিন কত বৎসর চলিয়া গেল,—ক্ষেমীর আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে বৎসর বারো পরে হঠাৎ একদিন নবদ্বীপে দেখা হইয়া গেল। উভয়েই কাঁদিল। বিগত দিনের এক একটি কথা যেন মূর্ত্ত হইয়া তাহাদের চোখের সাম্‌নে দেখা দিতে লাগিল।

এইখানে ক্ষেমীর কাছে সংবাদ লইয়া শ্যাম জানিতে পারিল যে, তাহার প্রথম স্বামী বহুদিন মারা গিয়াছে এবং তাহার পর রামতারণের গলায় কণ্ঠিবদল করিয়াছে। রামতারণ অতি হতভাগা। একটি পয়সাও রোজগার করিতে পারে না, উপরন্তু ক্ষেমীর যা কিছু ছিল, মদ খাইয়া খোয়াইয়াছে—দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। তাহার পর কত বুঝাইয়া রামতারণকে এই কারখানায় সে ভর্ত্তি করিয়া দিল।

ক্ষেমী যে তাহাকে পূর্ব্বের মতই ভালবাসে ইহার প্রমাণও সে পাইয়াছে। যদি ভালই না বাসিবে ত' তাহার অসুখের সেবা করিতে আসিয়া মাতাল স্বামীর হাতে মার খাইয়া মরিবে কেন? মার খাইয়াও কিন্তু সেবা করিতে ছাড়ে নাই—সেত বেশী দিনের কথা নহে।

কিন্তু আজকের ব্যবহার শ্যামের কাছে যেন অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিল।

হঠাৎ বাহিরে রামতারণের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। সে কোথা হইতে এক পেট মদ খাইয়া দুইটা ইলিশ মৎস্য কিনিয়া আনিয়াছে এবং তাহাই ক্ষেমীর পায়ের কাছে

রাখিয়া দন্ত ভরে বলিতেছে, লে! কত খাবি খা! আরে আমি বেঁচে থাক্‌তে খাবার ভাব্‌না? হুঁ!

ইলিশ মৎস্য দেখিয়া ক্ষেমী জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—নিরাগুন্ মুখপোড়া, নুন নেই, তেল নেই, ডাল নেই, চাল নেই—মুখপোড়া আমার মাছ কিনে এনেছে। তোর গলায় দড়ি রে, তোর গলায় দড়ি।

এমনি দু'এক কথা হইতে হইতে তুমুল ঝগড়া। তাহার পর ক্ষেমী উঠিয়া আসিয়া শ্যামের ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়া চীৎকার করিয়া কহিল—তুই মর্, বাঁচ আমি কিছু জানি না। আমি এই শ্যামুর কাছে রইলুম··· নিকের বর, ঠিকের ঘর তার আবার ইয়ে—

রামতারণ মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। এমনটা যে হইবে তাহা সে ভাবে নাই। প্রথমে খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিল, তাহার পর কাকুতি মিনতি, অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল—তুই না এলে মাইরি বলছি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব। তখন কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌বি!

বুঝিতে পারুক বা না পারুক ক্ষেমী কোন উত্তর দিল না। অগত্যা রামতারণ বাহির হইয়া গেল, এবং যাইবার সময় বলিয়া গেল যে কল্য আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

সমস্ত ব্যাপারটা এমনি অতর্কিত ভাবে হইয়া গেল যে শ্যাম কোন কথা বলিতে পারিল না। শুধু এই কথাটা ভাবিতে লাগিল যে শয়নের পূর্ব্বে ঘরে খিল দিয়া দিলে এমন বিশ্রী ঘটনার ভিতর তাহাকে জড়াইতে হইত না। মনের ভুলে খিল না দিয়া বড়ই খারাপ কাজ করিয়াছে। সত্যই যদি রামতারণ রাগের মাথায় কোন কিছু 'ভাল মন্দ' করিয়া বসে ত তাহাকেও পুলিশ আসিয়া টানাটানি করিবে। ভাবিয়া শ্যাম গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। সে আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

ক্ষেমী ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া রামতারণের কোন সাড়া না পাইয়া খিল খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং দাওয়ায় শুইয়া রাত কাটাইয়া দিল।

সকাল হইতেই সকলে রন্ধন কার্য্য সুরু করিয়াছে। পুরুষেরা তেল মাখিয়া স্নান সারিয়া আহারের জন্য তাগিদ দিতেছে। ক্ষেমী দাওয়ায় বসিয়া চুপ করিয়া ইহাদের কার্য্য দেখিতেছিল। তাহার আজ কোন কাজ নাই। কিন্তু এই অবসর ক্ষেমী মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারিল না। ঐ যে একটি লোক—যাহাকে লইয়া এত গণ্ডগোল, যে মরিলে সে বাঁচিয়া যায়, সে যদি না থাকিত এত কর্ম্ম ভোগ করিয়া মরিতে হইত না, ইত্যাদি কত কথাই বলিয়াছে, আজ তাহার জন্যই প্রাণটা হাহাকার করিতে লাগিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে কিছুতেই ভাল লাগিতেছিল না,—চোখে কেবলই জল আসিতেছিল।

ক্ষেমী উঠিয়া ঘরের জিনিষ পত্র নাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া স্নান সারিয়া আবার চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পুরুষেরা তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। মেয়েদের ঝঞ্ঝাট নাই। হিন্দুস্থানীদের চামেলী, উড়েদের সুভদ্রা ক্ষেমীর কাছে আসিয়া কত বুঝাইতে থাকে। বলে যা, যা হোক্ দুটি রাঁধ্, লোকটা এলে আগে খেতে দে, তার পর যা হয় করিস্, আমরা চাল ডাল দিচ্ছি।

ক্ষেমীর একবার মনে হয়—সত্যি দুই মুঠা রাঁধিতে পারিলে হয়, কখন হঠাৎ আসিয়া পড়িবে—কাল, সেই কখন দুইটি খাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিসের লজ্জা আসিয়া মনের কথা মনেই রহিয়া যায়, বলে··থাক্‌গে, আমি আর রাঁধ্‌তে পার্‌ব না।

অনেক বুঝাইয়া শেষে হার মানিয়া চামেলী ও সুভদ্রা চলিয়া গেল। ক্ষেমী তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বেলা ২টার সময় খবর আসিল রামতারণ ইহলীলা সাজ করিয়াছে। আকণ্ঠ মদ্যপান করিয়া কারখানায় কাজ করিতে গিয়াছিল। 'ভারায়' উঠিয়া চিমনির উপর কি একটা কাজ করিতে গিয়া হঠাৎ হাত পিছলাইয়া উপর হইতে পড়িয়া মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া মৃত্যু হইয়াছে।

এ সংবাদ ক্ষেমীর বুকে শেলের মতই বাজিল। কিন্তু আঘাতের কোন লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পাইল না। শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কি যেন একটা ওলট-পালট হইয়া গেল—বুঝিবার কোন শক্তি রহিল না। বাতাস বহিয়া যায়—মনে হয় কে যেন কাণের কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল। খররৌদ্র মনে

যেন শ্মশানের চিতার আগুন। আকাশের শূন্যতা তাহার মনের ভিতর ঝাঁকিয়া বসিল।

আঘাতের প্রথম বেগ কমিয়া গেলে, ক্ষেমী ঘরে উঠিয়া গিয়া খিল দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া সে খুব খানিকটা কাঁদিল। রামতারণের এই অপমৃত্যুর জন্য সে আপনাকেই অপরাধী করিল। ভাবিল অত কড়া কথা বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। সত্যই ত লোকটা অত খারাপ ছিল না। মদের মুখে যাহাই করুক্ যাহাই বলুক—অন্তর ছিল তার সরল স্নেহপ্রবণ। কত দিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছে—ক্ষেমী পেট ভরে খেতেও পেলাম না আর তোকে খাওয়াতেও পারলাম না—মলেও এ দুঃখ যাবে না। তবে মদ খাইয়া গালাগালির কথা? সে স্বতন্ত্র। অভাবের দারুণ নিস্পেষণে, সংসারের শত সহস্র অভিযোগের ভিতর মানুষের মনের বিকৃতি হয়-ই। আর সে যে একাই গালাগালি করিত এমন নহে—অভাবে পড়িয়া ক্ষেমীও বড় কম যাইত না। এমনি কত কথাই ক্ষেমীর মনে হয় আর কাঁদিয়া আকুল হয়।

এমন সময় শ্যাম আসিয়া ডাকিল—ক্ষেমি ক্ষেমি!

ক্ষেমী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া শ্যামকে দেখিয়া ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্যাম কি বলিবে কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না। মানুষের মর্ম্মান্তিক দুঃখে কি বলিয়াই বা সান্ত্বনা দিবে। কহিল—কেঁদে আর কি কর্‌বি ক্ষেমী, ধৈর্য্য ধর। যাঁর জিনিষ তিনি নিয়েছেন, কিছুত বলবার নেই। প্রভুর নাম নে ক্ষেমী, শান্তি পাবি।

ক্রমে রাত হইয়া আসিল। শ্যাম কিছু তৈয়ার করিয়া অনেক বুঝাইয়া ক্ষেমীকে আহার করাইল, তাহার পর দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় তাহাকে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত আধি হইয়া গেল। কথা কহিতে কহিতে কখন তন্দ্রা আসিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে শ্যাম যে ঘুমাইয়া পড়িল তাহা সে জানিতেও পারিল না।

ঘুমন্ত শ্যামের মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষেমী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার পর আপনার ঘরে আসিয়া খিল দিল।

পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর অধিকাংশ নরনারীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। এবং কাজে যাইবার আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিল। যে মরিয়াছে সে মরিয়াছে—যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের খাটিয়া খাইতে হইবে।

কোলাহলে শ্যামেরও ঘুম ভাঙিয়া গেল। ক্ষেমীকে পাশে না দেখিয়া ক্ষেমীর ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল। ঘরে কবাট দেওয়া। ভাবিল ঘুমাইতেছে ডাকিয়া প্রয়োজন নাই। তাহার পর প্রাত্যহিক কর্ম্ম সারিয়া, রান্না বান্না সারিয়া আহার করিয়া কাজে যাইবার পূর্ব্বে ক্ষেমীর দরজার কাছে গিয়া ডাকিল—ক্ষেমী! ক্ষেমী!

ভিতর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। জানালার এক অংশ খোলা ছিল। তাহা দিয়া ঘরের ভিতর দেখিতে গিয়া শ্যাম যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল—মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। পরণের কাপড় দিয়া ক্ষেমী গলায় দড়ি দিয়াছে।

শ্যামের ডাকহাঁকে পাড়ার অনেকেই আসিয়া পড়িল। একজন ছুটিয়া পুলিশে খবর দিতে গেল। পল্লীময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

যথাসময়ে পুলিশ আসিয়া লাস লইয়া চলিয়া গেল। এবং তাহাদের যথাবিহিত কর্ম্ম সারিয়া যখন লাস ছাড়িয়া দিল তখন বেলা ৪টা কি ৫টা। তাহার পর শ্যাম দুই চারি জন লোক লইয়া ক্ষেমীর শেষ কার্য্য করিতে গেল। যখন ফিরিল তখন রাত ১টা।

শ্যামের চক্ষে আর ঘুম নাই। সারা রাত কেবল বাঁধা হাঁদা করিল আর গাঁজা খাইল।

পূর্ব্ব দিক একটু ফর্সা হইলে শ্যাম বুঁচ্‌কি কাঁধে ফেলিয়া বাহিরে আসিল। পল্লীর তখন কেহ উঠিয়াছে, কেহ উঠে নাই। শ্যাম সকলকে ডাকিল, ডাকিয়া বিদায় লইয়া কহিল,—চল্লুম ভাই—এতদিন কত অন্যায় না করেছি, কিছু মনে করো না।

সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, জিজ্ঞাসিল—কোথায় যাবে? কাজে যাবে না?

ঘাড় নাড়িয়া শ্যাম কহিল—না। বৈষ্ণবের ছেলে বৃন্দাবন যাব। চাকুরি বাকুরি আর পোষাবে না।

বিদায় লইয়া শ্যাম রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মোড় পর্য্যন্ত অনেকেই আসিল। শ্যাম আর একবার সকলের কাছে বিদায় লইয়া আপনার গম্য পথে চলিতে লাগিল।

কিছু দূর গিয়া শ্যাম গান ধরিল। ক্রমে ভোরের সেই অস্পষ্ট আলোকে আর শ্যামকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তবে তাহার গানের এক কলি তখনও বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল—

এ মায়া প্রপঞ্চময়—এ মায়া প্রপঞ্চময়। ..

শ্রীঅভয় পাল

বিচিত্রার দপ্তর

[বিশ্বামিত্র]

প্রথম ইংরাজী চিঠি

লাটিন বা ফরাসী শুধুই এই দুই ভাষায় পত্র-ব্যবহার বহুকাল অবধি বিলাতে প্রচলিত ছিল। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় লিখিত প্রথম পত্র প্রাপ্ত হন স্যর জন্ পেলহাম্। তাঁহার ভার্য্যাই এই পত্র তাঁহাকে লেখেন। তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় গৃহীত বিধিবলে ইংরাজী ভাষার ইজ্জত বহাল হয়। আইন প্রণয়নে ও ধর্ম্মাধিকরণে ইংরাজীর ব্যবহার প্রচলিত হইল। পাঁচশত বৎসরে ভাষার কি দ্রুত উন্নতি হইয়াছে ভাবিলে বস্তুতই চমৎকৃত হইতে হয়।

স্বপ্ন কয় প্রকার ?

বিশেষজ্ঞ ডাঃ গ্রাহাম হাউ স্বপ্নের ফিরিস্তি দিয়াছেন। বলিতেছেন—সাধারণতঃ স্বপ্ন পাঁচ প্রকার, পাঁচটির বাহিরে যাহা কিছু সে সমস্তই ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা বিধেয়।

প্রথমতঃ কামনা পূর্ণ হওয়ার স্বপ্ন। খেলনার বাইসিকেল প্রভৃতির লাভ ইত্যাদি বিষয়ে শিশুরা যে স্বপ্ন দেখে তাহা এই শ্রেণীভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্কেরা শত্রু-নিপাতের যে স্বপ্ন দেখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে তাহাও এই পর্য্যায়ে পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ দুশ্চিন্তাবিষয়ক স্বপ্ন। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। রেলগাড়ী ফেল হওয়া, পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা, ভীষণ পাহাড় অধিরোহণের ব্যর্থ চেষ্টা প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। মানুষ যে সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেছে অনেক সময় ভাবে হয়ত তাহা সফল হইবে না। এই দুর্ভাবনা হইতেই এই শ্রেণীর স্বপ্ন উদ্ভূত।

তৃতীয়তঃ সংকল্প-সিদ্ধি বা সমস্যা-সমাধান মূলক স্বপ্ন। কার্য্য সিদ্ধির জন্য কি করা কর্ত্তব্য বা কোন্ পথে চলা আবশ্যক কোন্ কোন্ উপায়ে সাফল্য লাভ সম্ভব তাহার নির্দ্দেশ এই শ্রেণীর স্বপ্নে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তারের এক রোগিণী পাউডার কৌটার যাদু বিষয়ক স্বপ্ন দেখেন। বুদ্ধিমতী রমণী ইহার এই ব্যাখ্যা করেন যে, রমণীসুলভ হাবভাব ও কারসাজি দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবে। মহিলা সারাজীবন বিফলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলেন, স্বপ্নদৃষ্ট পথের অনুসরণ করায় ভাগ্য-লক্ষ্মী অবশেষে তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন।

চতুর্থতঃ আত্মবিশ্লেষণ মূলক স্বপ্ন। নিজের দোষ ত্রুটী কি—হয়ত প্রচুর এমনই একটা মনোভাব কাহারও কাহারও থাকে। স্বপ্নেও তাহার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠে। ডাক্তারের জনৈক রোগী স্বপ্নে দুর্ব্বলপদ অশ্বের স্বপ্ন দেখে। তাহার ধারণা

জন্মে যে, তাহার নিজের মানসিক দুর্বলতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব ইহা হইতে সূচিত হইতেছে।

পঞ্চমতঃ সেই সমস্ত বিষয়ের স্বপ্ন যাহা জাগ্রতাবস্থায় মনকে আন্দোলিত ও আলোড়িত করিয়াছে। বাঘে তাড়া করা, জলে ডুবা, সাপে কামড়ান হইতে কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার, ধনলাভ, অর্থহানি, মনস্তাপ, মৃতের প্রসঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি।

উক্ত পাঁচ প্রকারের স্বপ্ন ব্যতীত আর যাহা তাহাই ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত করা সঙ্গত, ইহাই ডাক্তার সাহেবের শেষ কথা।

বৈদিক যুগে ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির ধারা

সুদের আশায় টাকা আমানত প্রভৃতি ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি যে বৈদিক যুগেও এদেশে প্রচলিত ছিল তাহার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। দিল্লীস্থ রোটারি ক্লাবে শ্রীযুক্ত মেসানি এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ধর্ম্ম, বিত্তাবস্থা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন ভারতে যেমন সুসঙ্গত বন্দোবস্ত ছিল ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্বন্ধেও তাই। সহযোগিতামূলক উচ্চাঙ্গের নানাবিধ প্রণালীর উদ্ভাবন ও প্রচলন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সেকালের নির্ব্বাচন-প্রথার নিয়মাবলী, জেলা ও গ্রামসমূহের নির্ব্বাচন বিষয়ক শ্রেণী বিভাগ, বেলট্-রীতি, ভোট-পত্রের খুঁটিনাটি বিচার, তর্কবিতর্কের আইন, কার্য্য-পরিচালনার কানুন, ভোট দিবার নিয়ম, ভোট গণনার ধারা, কমিটি পদ্ধতি প্রভৃতি বৃত্তান্ত পাঠ করিলে প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়। এবং বর্ত্তমান কালে বিলাতে হাউস্ অব্ কমান্সে প্রচলিত নিয়মাদির সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

অর্থনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই প্রাচীন ভারতীয় শাসনপদ্ধতি ও দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। বণিকগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। রাজস্ব-বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্যকেই দুগ্ধবতী গাভীরূপে দোহন করা হইত। শাস্ত্রকারেরা অনুশাসন প্রবর্ত্তন করিলেন—"গাভীকে দোহন কর কিন্তু পালানে ছিদ্র করিওনা।" ট্যাক্স বা কর প্রজার আয় ও অবস্থা অনুসারে নির্দ্ধারিত হইত, পারিশ্রমিক হিসাবে নৃপতির তাহা প্রাপ্য এবং রাজকার্য্যেই উহা ব্যয় হইত। আয়ের উপরেই কর নির্দিষ্ট হইত, মূলধনের উপর নয়। যে দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া দেশের অন্যান্য ব্যবসারের সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহা আমদানী করিবার নিয়ম ছিল। পক্ষান্তরে যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিলে এখানে মূল্য বৃদ্ধি হইয়া প্রজার কষ্ট সম্ভাবনা তাহার রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হইত।

বৈদিক যুগেও শ্রম ও শ্রমিকের বিভাগ বহুল প্রচলিত ছিল। বাণিজ্য-বিষয়ক পাঞ্চায়েতী সম্মিলন, অন্য ব্যবসায়ীগণের ও ব্যাঙ্কারদের 'গিল্ড' বা সময়ায় প্রচলিত ছিল। এগুলির নিয়মাদি স্ব স্ব প্রণীত—রাজাকেও তাহা মানিয়া চলিতে হইত। সুতরাং ভারতে সুদূর অতীতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস বিকশিত হয়—এইরূপে সামাজিক ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবল হয়—ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনীতির দিক দিয়াও। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বেও রাজকর্ত্তৃত্বের বিলোপ ঘটে ও বহুস্থলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাঙ্কে এখন যেমন টাকাকড়ি জমা রাখা হয় সেকালে ব্যাঙ্কারদের কাছেও তাহাই হইত। গচ্ছিত ধন হিসাবে তাহা রক্ষিত হইত। বার্ষিক শতকরা ৯৲ হইতে ১২৲ হিসাবে সুদ দেওয়া হইত। অর্থ-সর্ব্বস্ব বেণিয়াকে লোকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ করিতে না পারিলে ঋণ-গ্রহীতাও অবজ্ঞাত হইত। সত্যাগ্রহ ও উপবাস অনাদায়ী ঋণ আদায় উসুলের পন্থারূপে পরিগণিত ছিল।

হুণ্ডির প্রচলন অনাদিকাল হইতেই এদেশে প্রচলিত ছিল। ইংরাজেরা ইহারই সাহায্যে যৌথ কারবার আদির প্রতিষ্ঠা করেন।

দাস-প্রথা বিলুপ্ত নয়

কবি বর্ণনায় ধরণী সুন্দরী। সুন্দরীর ক্রোড়ে কিন্তু অসুন্দর প্রচুর। দাস-প্রথা অসংখ্যের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত। এই কুপ্রথা এখন বিলুপ্ত ইহাই সাধারণের ধারণা। সত্যই কি তাই? সুনীতি দুর্নীতি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, নির্ম্মূল হয় না।

আরব দেশে মক্কা সহরে নরনারীর পণ্যের হাট এখনও বসে, বিচিত্র কি? স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকা ৯ হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লম্বা লম্বা পাথরের বেঞ্চে সারি সারি বসিয়া আছে—সিড়ির মত ধাপ ধাপে করিয়া বেঞ্চি। গলিটা অতি অপ্রশস্ত, প্রকাণ্ড মসজীদের সন্নিকটে, গলির বাড়ীগুলা অথচ আকাশ স্পর্শ করে এত উচুঁ, সূর্য্যের কিরণ গলির ভিতর শীতগ্রীষ্ম কোন ঋতুতেই পৌছে না। ইহার নাম—ক্রীতদাসের হাট। সকাল বিকাল হাট বসে, নরনারী আত্মবিক্রয়ের জন্য খরিদ্দারের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। অধিকাংশই কাফ্রি—ভূতের মত কৃষ্ণবর্ণ, মাঝে মাঝে ফিকা পীতবর্ণ স্ত্রী পুরুষ, ইহারা দক্ষিণ আরবের, মক্কার, কতক এশিয়া মাইনরের ও আফ্রিকার। চারিশত হইতে হাজার টাকা দরে এক একটি স্ত্রী ও পুরুষ বিক্রীত হয়। রূপ যৌবন ও গৃহকর্ম্মে নিপুণতার তারতম্য অনুসারে নারীর দর নির্ণীত হয়। পুরুষের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মপটুতা অনুযায়ী। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মূল্য অবশ্যই অল্প।

গৃহস্থালীর চাকর, ভিস্তি, দ্বারবান, সহিস ও ঘেসেড়ার কাজে, কৃষক মেষপালকও উষ্ট্রচালকের কাজে পুরুষেরা নিযুক্ত হয়; মেয়েরা বাঁদী হিসাবে বেগমদের পরিচারিকা পদে বাহাল হয়।

পুরুষ বা স্ত্রী দাস দাসীর প্রতি প্রভুরা সদ্ব্যবহার করে। নিজেরা যাহা খায় তাহাই খাইতে দেয়, পরিধেয় বস্ত্রাদি যোগায়। যে সমস্ত ক্রীতদাসকে বাঁদী হিসাবে না রাখে তাহাদের সঙ্গে দাসগণের বিবাহও দেয়।

প্রভুর ঔরসে যদি কোন বাঁদীর সন্তান জন্মে তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়—সন্তানও স্বাধীন বলিয়া গণ্য হয়। বাঁদীকে অতঃপর বিবাহ করাই রীতি, তবে যদি প্রভুর চারিটি বিবাহিতা পত্নী থাকে, একটিকে তালাক না দিলে বিবাহ করা চলে না।

হাটে খরিদা দাসদাসী সাধারণত কুশ্রী ও কুরূপ। সুন্দরী দাসী লইতে হইলে ভবিষ্য প্রভুরা তাহার পিত্রালয়ে যায় অথবা নারী প্রভুদের বাড়ীতে আনীত হয়। দালাল মধ্যস্থতা করে, পরে কয়েক দিন দর কষাকষি করিয়া মূল্য নিরূপিত হয়। নীলাম ডাকিয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্যেও অনেক সময় বিক্রয় চলে।

তুরস্কের সংস্কারক-দল দাস-প্রথা উঠাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হন। মক্কার শাসনকর্ত্তা ও অধিবাসীদের বিরোধিতায় চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে নাই। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধির একটি সর্ত্ত অনুসারে জেদ্দার ইবু সৈয়দ ইংরাজের আগ্রহাতিশয্যে দাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হন, দাস-প্রথা কোরাণের অনুমোদিত বলিয়া নিজেও প্রাণে প্রাণে তাহা সমর্থন করেন নাই সুতরাং কুপ্রথা রহিয়াই গেল।

দাসের হাটে বিদেশীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। মিঃ এল্‌ডন্ রট্টর বহু কষ্টে জীবন পণ করিয়া জনৈক আরবী সঙ্গী সহ ঐখানে উপস্থিত হন। দেখেন বেদুইন ক্রেতায় হাট পরিপূর্ণ। নারীদিগকে ইহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেছে—দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক কাহাকে কি মূল্যে ক্রয় করিবে তাহা বিবেচনা করিতেছে। তাঁহারই প্রদত্ত বিবরণী হইতে এই সন্দর্ভ সঙ্কলিত হইল।

জলের কাহিনী

জল—নারায়ণ

জলে জলময় বিশ্ব—সৃষ্টির প্রাক্কালে, আদিযুগের শাস্ত্র-বর্ণনা এই। একালের ভৌগোলিক হিসাবেও পৃথিবীর তিন ভাগ জল। উপরের কঠিন স্তর ভেদ করিলে ধরিত্রী অন্তঃ-সলিলা—পাতাল প্রদেশ জলেরই রাজ্য। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত তথ্য ইহা। মেঘলোক—সেও জলেরই রূপান্তর; বাষ্প ও বৃষ্টির আকার জলের গতায়তি।

ভূর্ভুবঃস্বঃ—ত্রিলোক জুড়িয়া জল। গায়ত্রী মন্ত্রের তাই পুরোভাগে অপ—'আপোজ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্ম।' জল এখানে ব্রহ্মের প্রতীক। সামবেদীয় সন্ধ্যা-বিধিতে ছোটবড় আধারের ভেদ নাই। মরুপ্রদেশে উৎপন্ন জল, জলময় দেশের জল, সমুদ্রের জল, কূপের জল—সকল জলেরই তুল্যরূপে স্তবস্তুতি, আবাহন ও আরাধনা। কারণহীনও নয়। জলে দেহ ক্লেদমুক্ত, পুণ্যস্নানে মনও পবিত্রীকৃত—ফলে উপাসকের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ সংসাধিত। মূলে অবশ্যই জল, তেজ ও রস।

উহাতেই স্থূল দেহের সৃষ্টি ও পুষ্টি। এদিক দিয়াও প্রাধান্য জলের। দৈহিক ও মানসিক তৃষ্ণায় জল, শ্রাদ্ধ-তর্পণেও জল। জলেই ব্রহ্মত্ব কল্পিত ও আরোপিত।

আবার ব্যাধিমন্দির শরীরে জলের অভাব হইলে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান দেহযন্ত্রে লোণাজল সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা দেন। বিসূচিকা-পীড়ায় 'সেলাইন্ ইন্‌জেক্‌সন্' বর্ত্তমানে প্রচলিত প্রথা।

কিন্তু জলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য অনাদিকাল হইতেই ভারতবর্ষে শতধা প্রকীর্ত্তিত। ভক্তের ভগবান গণ্ডূষ পরিমিত সলিলেই পরিতুষ্ট—জলই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।

বিদেশীর চক্ষে

ভারতীয়ের এই ভাব-ধারা, হিন্দুর এই জলভক্তি বিদেশীর চক্ষেও উদ্ভাসিত হইয়াছে। নানাদিক দিয়া আলোচনা ও গবেষণা করিয়া তাঁহারা ইহার তারিফও করেন। সম্প্রতি করিয়াছেন লেপ্‌টেনাণ্ট্ কর্ণেল্ এ, ভি, ষ্টুয়ার্ট—কলিকাতা যাদুঘরের বৈঠকে। আলোচ্য বিষয়বস্তু—'জল ও জল সরবরাহের রহস্য'। উপসংহারে বলেন—'জলই মানুষ-জীবনের ভিত্তি, সুতরাং প্রাণী-জগতে মানুষের যেমন ক্রম-বিকাশ ঘটিয়াছে সেই সঙ্গে জলের প্রতিও তাহার গভীর শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। এই ভক্তি হেতু আদিম-কালে মানুষ জলদেবতার পরিকল্পনা করিয়াছে। কিন্তু জল-ভক্তি এবং জলের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর পূজার্চ্চনা হিন্দুস্থানে যেরূপ প্রসারতা লাভ করিয়াছে পৃথিবীর অপর কোন দেশেই সেরূপ নাই'।

হিন্দুর মর্ম্মকথা সাহেব ঠিকই ধরিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি পত্র-পুষ্প-ফল-জল ভক্ত যাহাই নিবেদন করুন তাহাই সানন্দে গ্রহণ করি। পত্র-পুষ্প-ফল সর্ব্বদা অনায়াসলভ্য নয়, কিন্তু জল সর্ব্বত্রই—তাহাতেই তিনি তৃপ্ত।

সভ্যতা-বিস্তারে জল

প্রাচীন সভ্যতার যুগে জলময় বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রচুর ছিল—জলও সুতরাং অতি সুলভ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিশর, ইরাণ ও ভারতে সিন্ধু প্রদেশস্থ মহানজো-দেরোর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ হাজার অব্দে মহানজোদেরোর জল-সরবরাহের জন্য বহু পুষ্করিণী ও কূপাদির প্রচলন হয়। পরে সভ্যতার অধিকতর বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে জল আনয়নের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। রোমানেরা ও সিংহলবাসীরা সেই সুদূর অতীতেও পয়ঃ প্রণালীর ব্যবস্থা করেন। জল সরবরাহে অধুনা খোলানালার যথেষ্ট চলন। তবে ইস্পাতের নলের ভিতর দিয়া জল চলাচলের পদ্ধতি অবশ্য বেশী প্রচলিত।

জলের উৎপত্তি

কোন্ কোন্ স্থান হইতে ও কি ভাবে জল আসে তাহার বর্ণনা করিয়া ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন যে, ভূমির নিম্নস্থ জল (Sub soil water) সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—ভারতের অধিকাংশ স্থলে জল সরবরাহের উহাই একমাত্র পন্থা! নাতিদূরে ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থান হেতু ভারতে যে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ইহা অসঙ্কোচে বলা যায়।

দূষিত জল

পুষ্করিণী ও তড়াগে যদি ময়লা বস্ত্রাদি ধৌত না করা হয়, সেই জল পানীয় হিসাবে ব্যবহারে কোন আপত্তি নাই। সাহেব দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে অগভীর কূপের জল সহজেই দূষিত হয়, অতএব বালতি ও দড়ি সংযোগে কূপ হইতে জল তুলিবার যে প্রথা চলিত আছে তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

জমায়েৎ জল

জল জমায়েত রাখিবার উপায় তিনটী। সেই তিনটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া সাহেব বলেন—পৃথিবীর সকল বড় বড় সহরের প্রকাণ্ড টাকিতে জল ধরিয়া রাখিবার প্রথা প্রচলিত। এইরূপে জমায়েত রাখিয়া ও পরিষ্কার করিয়া প্রতি ভবনে বা রাজপথে সরবরাহের ব্যবস্থা নির্দোষ নয়—তাহাতে বহু অনিষ্টের সম্ভাবনা। সেই জলে ক্লোরিণ দিয়া ক্ষতির প্রবণতা নাশের চেষ্টা করা হয়, জলেরও শোধন সাধিত হয়—তাহার কার্য্যকারিতা কিন্তু সুদৃঢ় নয়। এই সঙ্গে ইহাও

যে বড় বড় নগরের সাধারণ স্নানাগারগুলি প্রকৃতই বিপজ্জনক, তবে যদি শোধিত জল ব্যবহৃত হয় সে কথা স্বতন্ত্র।

আরও জল

সহরবাসীর নিকট সাহেব সহরের দিক দিয়াই জলের আলোচনা করিয়াছেন। নগরের বাহিরে যে বিপুল বিশ্ব তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-বহুল জল, মেরু প্রদেশে বরফের নদীতে জল, নদী-প্রসবনের জল, পাতালের অথৈ জল, বায়ুলোকে মেঘের কায়ায় জল—হিমালয় শিখরে সেই জলের স্বচ্ছন্দ গতি—জলের কুহকিনী মায়ার কথা চমকপ্রদ।

নানা কথা

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব

পঁচিশে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এ উৎসব শুধুই শান্তি-নিকেতনের নয়, সারা বাংলাদেশের। যাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে বা ঘটনা-চক্রে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না,—আমরা জানি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ গৃহে, নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী কিছু কিছু উৎসবের আয়োজন করিতেছেন। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানগুলি কবির চরণে বাংলা দেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি;—আমরাও এই উপলক্ষে কবির নিকট আমাদের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলাদেশের নয়, তিনি বিশ্বের কবি,—তাই আজ তাঁহার সপ্ততিতম জন্মোৎসবে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য দেশ বিদেশেও কিছু কিছু আয়োজন চলিতেছে। বাঙালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই; সেইজন্যই বাঙালীর নিকট তাঁহার এই সপ্ততিতম জন্মোৎসবের আনন্দ নিবিড়তর। আমাদের এই আনন্দ আমরা দেশ বিদেশের লোকের নিকট যদি কিছু কিছু বিতরণ করিতে পারি, তবে আমরা ধন্য হইব,—কিন্তু উৎসবটি বিশেষ করিয়া আমাদেরই, একথা বিস্মৃত হইতে পারিব না। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু বাংলা-দেশের কবি,—তাহা নয়,—বর্ত্তমান বাংলার তিনি অন্তরতম আত্মা। বাংলা-দেশের প্রাকৃতিক রূপ তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়া বাঙালীর অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, বাঙালীর গোপনতম আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া বাঙালীকে সজাগ ও সচেতন করিয়া দিয়াছে, তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত শক্তি বাঙালীকে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই উদ্বুদ্ধ, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাঁর সঙ্গীত বাঙালীর দৈনন্দিন ব্যক্তিগত জীবনকে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে, তাঁর রচনা-ভঙ্গি ও প্রকাশ-রীতি বাঙালীর জীবনকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে,—তাঁর চিন্তাধারা বাংলার শিক্ষিত সমাজের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া বাঙালীকে নূতন নূতন সৃষ্টি-কার্য্যে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

প্রিয়জনের জন্মদিনেই মানুষে উৎসব করিয়া থাকে; রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর প্রিয়তম; তিনিই আধুনিক বাংলাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনিই বাঙালীর প্রাণে নিত্য নূতন আশার সঞ্চার করিতেছেন, অজানার, অভাবনীয়ের নিত্য নূতন আহ্বানবাণী বাঙালীর প্রাণের মধ্যে বহন করিয়া আনিতেছেন; বাঙালীকে চির-নবীনের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁর দান আজও শেষ হয় নাই, তাঁর সৃষ্টির ভাণ্ডার অফুরন্ত। তাই আমরা প্রার্থনা করি, বয়সের কোঠায় রবীন্দ্রনাথ যতই অগ্রসর হউন না কেন, এখনো অনেক দিন ধরিয়া বর্ষে বর্ষে এই দিনে যেন বাংলাদেশ তার চির-নবীন কবিকে এমনি অভিনন্দন করিতে

পারে,—শুধুই তাঁহার অতীত দানের মহিমায় নয়, ভবিষ্যতের আশাতেও বটে।

এই প্রসঙ্গে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মোৎসবে কবি যাহা বলিয়াছিলেন,—তাহা হইতে কয়েকটি কথা, কৌতুকজনক হইতে পারে, বিবেচনায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কবির জন্মদিনে কবি বলিয়াছিলেন,—

"আনন্দের শঙ্খধ্বনি মানুষের জন্মকালে বেজে ওঠে। প্রত্যেক জন্মের মধ্যে আনন্দময় একটি মহৎ প্রত্যাশা থাকি, কোনও সান্ত্বনা এনে থাকি, তবে সে দেওয়া হ'য়ে গেছে, সাম্‌নে আর কিছু নেই।

"কিন্তু তবু মন ত বলে না, সকল প্রত্যাশার প্রান্তে এসেচি। * * * এখনো জীবনে অভাবনীয় কি কিছু নেই? তা তো বল্‌তে পারিনে। অজানার ডাকে এখনো প্রাণ সাড়া দেয়, নূতনের ভাষা এখনো বুঝ্‌তে পারি।" (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৩ হইতে উদ্ধৃত)

কবির যাহা কিছু দেবার তাহা দেওয়া যে শেষ হইয়া



উনসপ্ততিতম জন্মদিবসে—
প্যারিসে ছাত্রমণ্ডলীসহ রবীন্দ্রনাথ
২৫শে বৈশাখ ১৩৩৭

আছে। মানুষের চিরকালের যে আকাঙ্খা তাই পূর্ণ হবে, যুগযুগান্তের এই প্রত্যাশা বারে বারে নবজাত শিশু বহন ক'রে আনে; আমাদের ভিতর যা কিছু অসম্পূর্ণ তাই সম্পূর্ণ হ'বে, এই সম্ভাব্যতা তার মধ্যে আছে। কিন্তু আজ আমার জন্মদিন তেমন নূতন জন্মদিন নয়, নূতন প্রত্যাশা জাগাবার সম্ভাবনা তার আর নেই। আমার কর্ম্ম প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। যদি কোনো আনন্দ দিয়ে

গিয়াছে,—একথা কবি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বলিতে গিয়াও মনের মধ্যে সে কথার সমর্থন পান নাই,—আজও কখনই সে কথা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন না। বস্তুত তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান যে ভবিষ্যতের মধ্যে এখনো লুকানো নাই,—তাহা কে জানে? ইংরাজ কবি Robert Bridges তাঁহার মৃত্যুর মাত্র পূর্ব্ব বৎসর তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ গত পাঁচবৎসরের মধ্যে

যাহা দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ হয় ত বাঙালী পাঠকের নিকট নিষ্প্রয়োজন। তবুও এই প্রসঙ্গে, মাসিক পত্রের পাতায় পাতায় যাহা ছড়ানো রহিয়াছে, সেগুলি বাদ দিয়া, পুস্তকাকারে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহারই একটি তালিকা দিলাম :—

ঋতুরঙ্গ, নটরাজ (সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিই বিচিত্রা আষাঢ় ১৩৩৪ সংখ্যার প্রকাশিত হইয়াছিল,—পৃথক পুস্তকাকারে এখনো প্রকাশিত হয় নাই), মহুয়া, লেখন, নটীর পূজা, শেষরক্ষা, পরিত্রাণ, তপতী, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, যাত্রী, ভানুসিংহের পত্রাবলী, **Fireflies, Religion of Man.**

এতদ্ব্যতীত এই পাঁচ বৎসরের মাসিক পত্রের পাতায় পাতায় যাহা ছড়ানো রহিয়াছে,—তাহা একত্রে সংগ্রহ করাটাই নিতান্ত সহজসাধ্য কাজ নয়। এই ত গেল সাহিত্যের কথা। চিত্রজগতেও সম্প্রতি কবি একটি নূতন ধারা আনয়ন করিয়াছেন,—সে-কথাও কাহারও অবিদিত নাই।

তাই আজ রবীন্দ্রনাথের এই সপ্ততিতম জন্মদিনেও আমরা সেই কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছি, সৃষ্টির অফুরন্ত উৎসাহে ও আনন্দে যিনি চির-নবীন, স্রষ্টার অপ্রতিহত তেজে যিনি বারে বারে আপনাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, যাঁহার সপ্ততিবর্ষব্যাপী সাধনার গৌরবের সঙ্গে একমাত্র ভাবীকালের মহতী সম্ভাবনারই তুলনা করা যাইতে পারে।

এই উপলক্ষে আমরা বিচিত্রার পাঠকবর্গকে সম্প্রতি রচিত ও কবির স্বহস্ত-লিখিত একটী কবিতা উপহার দিলাম।

ভ্রম-সংশোধন

গত ফাল্গুন ১৩৩৭ সংখ্যা 'বিচিত্রায়' কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। সেগুলি নিম্নে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল।

১। ৪১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'যাদুকর' গল্পটির লেখকের নাম শ্রীযুক্ত তারাপদ রাহা এম্-এ। সাহা ও রায় ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে।

২। "পঞ্চাগ্নিতত্ত্বে ক্ষরাক্ষর প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে, ৩৭৩ পৃষ্ঠায় প্রথম তিন লাইনের সংশোধিত পাঠ এইরূপ হইবে ;—

"পাইলাম—ক্রতুময় পুরুষ। যদি শ্রদ্ধাখ্যা অপের পরিণতিতে ক্রতুশীল মনের উৎপত্তি হয় তবে, সোম না বলিয়া ক্রতুর উল্লেখ করিলেই চলিত,—এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। সোম বলার তাৎপর্য্য বোধ করি অপ্ শব্দের পরিণাম দেখাইতে হইলে আর একটি রসাত্মক শব্দ আনা প্রয়োজন অথচ যজ্ঞের অর্থও যেন তাহাতে স্ফুট থাকে। সোমরস যজ্ঞের যেরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ, তদ্রূপ সোম অর্থে যজ্ঞও বুঝায়। সুতরাং সোমশব্দে দুই অর্থেরই ব্যঞ্জনা আছে,—১ম ব্যাপক………"

Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherji at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 6A. Bhim Ghosh Lane, Calcutta.



বুদ্ধদেবের ভবিষ্য-দর্শন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ

বিচিত্রা

চতুর্থ বর্ষ, ২য় খণ্ড	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮	ষষ্ঠ সংখ্যা

রেখার মায়াজাল

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী রাণী দেবীকে লিখিত

১

কল্যাণীয়াসু,

মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন কোনোমতেই মর্‌বার লক্ষণ দেখাচ্ছিলেন না, তখন তাঁর ছেলের রাজ্যভোগের আশা যেমন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছিল, এবারকার শরতের সেই দশা। বর্ষা শেষ পর্য্যন্ত তার আকাশের সিংহাসন আঁক্‌ড়ে রইল,—মাঝে মাঝে দু' চার দিন ফাঁক পড়েছে—হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানীর দল ক্ষণকালের জন্য যেমন তাদের মাদোল-পিটুনিতে ক্ষান্ত দেয়, সেই রকম, তার পরেই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কোলাহল সুরু করে। এমনি ক'র্‌তে ক'র্‌তে শরতের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল—হেমন্ত এসে হাজির। ধরাতলে শিউলি, মালতী অভ্যর্থনার আয়োজন যথেষ্ট করেছে, কিন্তু আকাশতলে দেবতা পথ আট্‌কে ছিলেন। শীতের বাতাস সুরু হয়েছে, গায়ে গরমকাপড় চড়িয়েছি। ভালোই লাগ্‌ছে—বিশেষতঃ বেলা দশটার পর থেকে প্রান্তরের উপর যখন পৃথিবীর রোদ পোহাবার সময় আসে —নির্ম্মল আকাশে একটা ছুটির ঘোষণা হ'তে থাকে—পথ দিয়ে পথিকেরা চলে, মনে হয় যেন ছবি রচনায় সাহায্য করবার জন্যেই, তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই চেয়ে দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমার কাছে পুরোনো হ'লো না—ওর সঙ্গে আমার মোকাবিলা চ'ল্‌ছে এইটেই আমার সব খবরের চেয়ে বড়ো খবর। কিন্তু বিজন অবকাশ এখনো পাইনি, লোকজনের আনাগোনা চল্‌ছেই। লোকসমাগমে আমার ছবি আঁকার বাধা পড়ে ব'লে মনটা

অস্থির হয়। ছবিতে আমাকে বেশী ক'রে ভুলিয়েছে। কাল দুটো এঁকেছি—লোকে ভালোই ব'ল্‌ছে। কিন্তু লোকে কী না বলে—তাদের কথায় কান দিতে নেই। যাই এবার স্নানের চেষ্টায়—বেলা হয়ে গেল—অতিথিদের খাওয়াতে হবে। তোমার শরীর কীরকম থাকে খবর দিয়ো।

আমি আছি তথৈবচ। ইতি—১৮ই কার্ত্তিক ১৩৩৫।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমার এখনকার সব-প্রধান দৈনিক খবর হ'চ্ছে ছবি-আঁকা। রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চ'লে গিয়েছে। কোনোকালে যে কবিতা লিখ্‌তুম সে কথা ভুলে গিয়েছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত ক'রে যে আকর্ষণ ক'র্‌ছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা থেকে গোমুখী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেম্‌নি ক'রে কাব্যের ঝরণা কলমের মুখে তীর রচনা ক'রে ছন্দে প্রবাহিত হ'তে থাকে। আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টো প্রণালী—রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌছতে থাকে মাথায়। এইরূপ সৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্‌ট্‌ হতুম তাহলে গোড়াতেই সঙ্কল্প ক'রে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিষ বাইরে খাড়া হ'তো—তাতেও আনন্দ আছে। কিন্তু বাইরের রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরো যেন বেশী নেশা। ফল হয়েছে এই যে, বাইরের আর সমস্ত কাজ দরজার বাইরে এসে উঁকি মেরে হাল ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। যদি সেকালের মতো কর্ম্মদায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাক্‌তুম্‌ তাহলে পদ্মার তীরে ব'সে কালের সোনার তরীর জন্যে কেবলি ছবির ফসল ফলাতুম। এখন নানা দায়ের ভিড় ঠেলে ওর জন্যে অল্পই একটু জায়গা ক'র্‌তে পারি, তাতে মন সন্তুষ্ট হয় না। ও চাচ্ছে আকাশের প্রায় সমস্তটাই, আমারো দিতে আগ্রহ, কিন্তু গ্রহদের চক্রান্তে নানা বাধা এসে জোটে—জগতের হিতসাধন তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইতি—২১ কার্ত্তিক ১৩৩৫।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নব-বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়,

প্রীতিভাজনেষু

১

অগ্রহায়ণের 'ভারতবর্ষে' আমাকে যে লম্বা খোলা চিঠি লিখেছেন (১) তা প'ড়লুম্। 'বিজ্ঞানের ট্রাজিডির' পর 'বিজ্ঞানের সুমতি' দেখে বোঝা গেল ট্রাজিডিটা বিজ্ঞান বেচারীর পক্ষে একবারে মারাত্মক হয় নি; বরং ফলে ওর সুমতি এসেছে। 'A great sorrow hath humanised its soul'।

আপনার 'বিজ্ঞানের ট্রাজিডি' উপলক্ষ্য ক'রে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে 'বিচিত্রা' কাগজে আমি যা লিখেছি (২) তার ছাঁদটা আপনার কাছে বাঁকা মনে হয়েছে। কিছুই আশ্চর্য্য নয়। প্রাক্-বিংশ শতকের মদোদ্ধত বিজ্ঞানের ধর্ম্মদ্বেষ থেকে বিনয়-নম্র নব-বিজ্ঞানের ধর্ম্মপ্রাণতায় আপনি যে সোজা পথে পৌঁচেছেন আমার বিবেচনায় তা অতিরিক্ত রকম সরল;—সেই শ্রেণীর সরল পথ যা কখনও গন্তব্যে পৌঁছে না, তাকে tangentially কেটে যায়। আমার ধারণা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের যোগাযোগ দেখ্‌তে একটু ঘোরা পথেই যেতে হয়। সেই পথের কিঞ্চিৎ আভাষ আমার 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করেছি। সে পথ যদি আপনার কাছে বক্রগতি মনে হয় তবে ক্ষুণ্ণ হবার আমার অধিকার নাই।

কথাটা একটু খুলে বলাই ভাল। আপনি ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সখ্য প্রমাণ করেছেন প্রধানত নব-বিজ্ঞানের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্যদের বচন তুলে। আমার মতে এটা পণ্ডশ্রম। ও পথে এক বাক্যের ধুলো খাওয়া ছাড়া আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নেই। কারণ, প্রথমতঃ বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়ে কোনও কথাই বলেন না। তাঁরা নিজের নিজের বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে একাগ্র থেকে কাজ ক'রে যান, বেশীর ভাগ লোক যেমন একনিষ্ঠ সাংসারিক জীবন যাপন করে। সুতরাং দু চার জন বৈজ্ঞানিকের বচন বৈজ্ঞানিকদের মত ব'লে এ ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া চলে না। তারপর যে অল্প কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে কথা বলেন তাঁরা সবাই এক কথা বলেন না। এডিংটন যা বলেন, স্তর জেম্‌স্ জীন্‌স্ তা বলেন না; হোয়াইট্‌হেড যা বলেন, বারট্রাণ্ড রাসেল তার বিপরীত বলেন। বৈজ্ঞানিকদের বাক্য দিয়ে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের অবিরোধ প্রতিষ্ঠা হয় না, কেবল তাঁদের পরস্পরবিরুদ্ধ বচন দর্শনে বচনৈকপ্রমাণ লোকদের বুদ্ধিভেদ জন্মে। কিন্তু এ আপ্ত-প্রমাণের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় আপত্তি যে বৈজ্ঞানিকদের বাক্য এ ক্ষেত্রে আপ্ত-বাক্য নয়, কারণ এ বিষয়ে তাঁরা আপ্ত-পুরুষ, অর্থাৎ expert, নন্। বিজ্ঞানের যে বিশেষ কোঠায় যে বৈজ্ঞানিক কাজ করেন, সেইখানেই তাঁর বাক্য আপ্ত-বাক্য; অর্থাৎ যে পরীক্ষা ও যুক্তি দিয়ে সেখানে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় তা দেখার ও বোঝার যাদের ক্ষমতা বা সময় নেই তারা বৈজ্ঞানিকের কথার উপর বিশ্বাস ক'রে সে সত্য মেনে নিতে পারেন। কিন্তু তাঁদের নিজের কোটের বাইরে বৈজ্ঞানিকেরা যে সব বাক্য বলেন, বিজ্ঞান বিশেষের আচার্য্য ব'লে তার কোনও বিশেষ মূল্য নেই। সেখানে তাঁরা সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্র, বিশেষজ্ঞ নন্। অনেক বৈজ্ঞানিক নিজের বিশেষ বিজ্ঞানের বাইরে অনেক অদ্ভুত কথা বলেন, কারণ সে ক্ষেত্রে তাঁদের বুদ্ধির অনুশীলন হয় নি। হয় তো শিশুকালে উপদিষ্ট বা চারপাশের

(১) বিজ্ঞানের সুমতি। 'ভারতবর্ষ,' অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭।
(২) ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। 'বিচিত্রা'; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭।

প্রচলিত অন্ধসংস্কার ছাড়া তাঁদের সে সব মতামতের আর কোনও ভিত্তি নেই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্বন্ধ বিচার বিজ্ঞান বিশেষ নয়, এবং বৈজ্ঞানিকের বিশেষ ক্ষেত্র নয়। "একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রবণ বৈজ্ঞানিকের একটি বই" সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের যে ধারাল সমালোচনাটি উদ্ধৃত ক'রেছেন তা স্মরণ করুন। "The part about the changed attitude of modern Science to its own field of discovery is interesting.......The latter part of this book about religious experience I find very feeble; it gives me the impression of a hen scratching the surface of the earth to find a scrap or two of food—nothing deeper."। কেন এমন হয়? বিজ্ঞানের ঈগল পক্ষী ধর্ম্মানুভূতির ক্ষেত্রে কেন পোষা মুরগী হ'য়ে পড়ে? কারণ আর কিছুই নয়,—এ ক্ষেত্রে ঐ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকটির আমাদের মত পাঁচ জন অপ্রসিদ্ধ সাধারণ লোকের সঙ্গে কোনও তফাৎ নেই। তাঁর ধর্ম্মপ্রবণতা কোনও গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; জনসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসের মত গতানুগতিক সংস্কারের ফল। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচারে তিনি যে বুদ্ধির প্রয়োগ করেছেন তা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির স্বরূপ-নির্ণয়কুশল দার্শনিক বুদ্ধি নয়, সাংসারিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপযোগী ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমাত্র।

আপনি কয়েকজন 'ধর্ম্মপ্রবণ' বৈজ্ঞানিকের বচন চয়ন করেছেন এই আশায় যে বৈজ্ঞানিকদের কথাতেই যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের মনে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা মৃতকল্প হয়েছে, তখন তাঁদের কথাতেই তা আবার নব-জীবন পাবে। যে বিশ্বাস এমনি ধারা কথাতেই যায় আবার কথাতেই হয় তা ম'রলেই বা দুঃখ কি, আর বাঁচলেই বা লাভ কতখানি? তার জন্য কেন বৃথা পরিশ্রম? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানবুদ্ধির উপর ওর চেয়ে একটু বেশী ভরসা রাখাই ভাল। বৈজ্ঞানিকদের বচন শুনিয়ে আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস জন্মানের 'সাইকলজিকাল' ফিকির হয় ত 'সেন্‌সেশোনাল্', কিন্তু ওতে স্থায়ী ফলের কোনও সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত ফললাভের পথ হচ্ছে যুক্তির পথ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও বিচার। নবীন বৈজ্ঞানিকদের বাক্য দিয়ে প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের বাক্যের মোহ থেকে মনকে মুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে আফিম্ ধরিয়ে মদ ছাড়ানের চেষ্টার মত। পশ্চিমী বুলির মোহান্ধতা দেশের মন থেকে দূর করার উপায় নয় আরও এক রকমের ঐ দেশী বুলি সেখানে জমা করা। তাতে সুধু এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে কি অন্ধকার কি আলো সবই আন্‌তে হবে সেখান থেকে, তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আপনি একে বলেছেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। কথা ঠিক। একমাত্র গঙ্গাজলের পাবনত্বে যখন সংস্কার দৃঢ় হয় তখন গঙ্গাপূজাও গঙ্গাজলে না ক'রে উপায় থাকে না।

২

আপনি 'বিজ্ঞানের সুমতি' প্রবন্ধে লিখেছেন যে "আধুনিক চিন্তাশীল মানুষ (ও বৈজ্ঞানিকও) আবিষ্কার ক'রেছেন যে বিজ্ঞান প্রথমটায় স্বাধিকার-প্রমত্ত হ'য়ে এমন সব বিষয়ে অম্লানবদনে রায় দিতে সুরু ক'রেছিল, যে-সব বিষয়ে রায় দেওয়ার অধিকারী সে নয়।" আর এমনধারা জজিয়তীর দাবীর "অসারতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করার এক্তিয়ার মানুষের চিরন্তন।" এবং একটু অনুযোগের সুরে ব'লেছেন, "আর 'বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডি'-তে আমি এ ছাড়া কীই বা ক'রেছি বলুন?" কেবল যদি তাই হ'তো তবে বোধ হয় স্বীকার ক'রবেন যে প্রবন্ধের 'বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডি' নামটা হ'য়েছিল একটু অতিরিক্ত রকম—যাকে বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলে—'চমকপ্রদ'। কিন্তু সত্য কথা তা নয়। আপনার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল যে বিজ্ঞান আজ একটা ট্র্যাজিক অবস্থায় উপনীত হ'য়েছে, আর প্রতিপাদ্য ছিল সেই ট্র্যাজিডির স্বরূপ। অবশ্য আপনি গুণীলোক, শুধু ঐ কথাটাই সোজাসুজি ব'লে থামেন নি, অনেক মনোহারী কথা সঙ্গে সঙ্গে ব'লেছেন যারা হ'য় তো মূল বিষয়টাকে একটু ছাপিয়ে গেছে, গানের সুর যেমন তার কথাকে ছাপিয়ে যায়। অল্প কথায় 'বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডিটা' হচ্ছে এই:—বিজ্ঞানের কাজ কর্ম্ম চলে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায়, অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে

এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে। কিন্তু আজ বৈজ্ঞানিকেরা হঠাৎ আবিষ্কার ক'রেছেন যে এই বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, ওকে বিনা প্রমাণে মেনে নিতে হয়। সুতরাং বিজ্ঞানের যে মজবুত-দর্শন যুক্তির পাকা গাঁথনি তার ভিত্তি হচ্ছে একটা প্রমাণহীন অর্থাৎ অন্ধ বিশ্বাস মাত্র। এবং যদি তা-ই হয় তবে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা যখন প্রমাণহীন বস্তুতে বিশ্বাসের দাবী করে তখন তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের কিছু বলার অধিকার নেই। বিজ্ঞানের এই non-rational basis প্রকাশ হ'য়ে পড়াতে এ যুগে তার আত্মসর্ব্বস্বতা ক'মে এসেছে; এবং "য়ুরোপের (অনেক) চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক ও মনীষীরা.........অযৌক্তিক বিশ্বাস, ধর্ম্ম, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রভৃতিকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন"।

স্পষ্ট ক'রেই বলছি এই 'ট্র্যাজিডির' প্রথম অঙ্ক থেকে শেষ পর্য্যন্ত সব-ই আমার কাছে অবোধ্য মনে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে ওর ইতিহাস কাল্পনিক, ওর 'লজিক' বে-পরোয়া, ওর 'সাইকলজি' মনগড়া। কারণ কি, সংক্ষেপে নিবেদন করছি। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলায় বিশ্বাস, অর্থাৎ যে Causality inductionএর মূল, তা যে প্রমাণ করা যায় না, বিনা প্রমাণে মেনে নেওয়া হয়, এটা এ যুগের কোনও বৈজ্ঞানিকের হঠাৎ আবিষ্কার নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম-লাভের বহু শতাব্দী বৎসর পূর্ব্বে থেকেই দার্শনিকেরা ও তর্ক তুলেছেন। কারণ induction ত শুধু বিজ্ঞানের মূলে নেই, যে জ্ঞানের উপর আমাদের দৈনিক জীবন-যাত্রা চলছে তারও ঐ মূল। ক্ষুধা পেলে আমরা খাই, কিন্তু খেলে যে ক্ষুধা যাবে এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি? দার্শনিকেরা দেখিয়েছেন যে শেষ পর্য্যন্ত এ বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। এ তর্ক কত প্রাচীন তাই দেখাবার জন্য আমার 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে চার্ব্বাকের অনুমান-প্রমাণ-খণ্ডনের কথা বলেছিলাম। সেটা আপনার কাছে এমন অসঙ্গত রকম অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে যে আপনার হাস্য-রসকে উদ্রিক্ত ক'রে 'পিকুইক পেপার্স'-এর স্থান বিশেষ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কেন তা ঠিক বুঝতে পারি নি। কেমন সন্দেহ হচ্ছে যে চার্ব্বাক-উদয়নের নাম না ক'রে যদি কোনও গ্রীক স্কেপ্‌টিকের নাম করতুম তা হ'লে এ রকম অসঙ্গতি-বোধ মনে জাগ্‌তো না। যা হোক প্রাচীন কথা ছেড়েই দি। বারট্রাণ্ড রাসেলের নজীরে অবশ্য স্বীকার করবেন যে Causality ও induction নিয়ে এই 'scandal' আরম্ভ হয়েছে "ever since the time of Hume"। কারণ রাসেলের 'Is Science Superstitious?' আমি পড়ি বা না পড়ি আপনি অবশ্য পড়েছেন। হিউম তাঁর 'মানবীয় জ্ঞানের তথ্যানুসন্ধান' নামে যে পুঁথিতে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের এই বৈনাশিক বিচার করেন তা প্রকাশ হয় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে। নিশ্চয়ই জানেন কাণ্ট নিজে বলেছেন যে সেই বিচার পড়েই তাঁর 'ডগ্‌মাটিক্' তন্দ্রা ছুটে যায়, এবং জ্ঞানের স্বরূপ ও সম্ভাবনা অনুসন্ধানে তিনি ব্রতী হন। ফল The Critique of Pure Reason; যে গ্রন্থে কাণ্ট প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সাধারণ বোধ মানুষ ভূয়োদর্শনের ফলে পায় না; ওর ছক মনের মধ্যেই আছে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে মন সেই ছকের মধ্যে গ্রহণ করে। এ গ্রন্থ প্রকাশ হয় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে। কাণ্টের মত ভুল কি শুদ্ধ তা নিয়ে কথা নয়। কিন্তু তাঁর আলোচনায় এটা অবশ্যই প্রমাণ হয় যে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল-ভিত্তি প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসের যুক্তি-প্রমাণ যে শিথিল এটা এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার নয়। আর কি ক'রেই বা বিশ্বাস করা যায় যে বৈজ্ঞানিকেরা হিউমের পর দেড়-শ বছর ধ'রে ও তথ্য সম্বন্ধে হত-চেতন ছিলেন, আজ হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে তা চোখে দেখ্‌লেন। আপনি লিখেছেন, এ তথ্যে 'বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তির মধ্যে ভূমিকম্প হ'য়ে যায়'। অবশ্য হয়। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন এ ভূমিকম্প নিতান্ত কমপক্ষে আরম্ভ হয়েছে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে। নিউটনের 'প্রিন্‌সিপিয়া' প্রকাশ হয় ১৬৮৫ থেকে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানের ইমারতের বেশীর ভাগ গড়া হয়েছে ঐ ভূমিকম্পের মধ্যেই। কারণ অতি স্পষ্ট। ও 'বৈজ্ঞানিক—দর্শনের' উপর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রসার কিছুমাত্র নির্ভর করে না। এ কথা আমার 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে বলতে চেষ্টা করেছি, পুনরুক্তি ক'রে লাভ নেই। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাস যে

যুক্তিসিদ্ধ সত্য নয়, বিশ্বাস মাত্র—এই তথ্যের আবিষ্কারে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিনয়ী হ'য়ে উঠেছে এ ইতিহাস মেনে নেওয়া কঠিন, কারণ সন তারিখের মিল হয় না।

এ 'ট্র্যাজিডির' যুক্তির দিকটাও মনে সমান খট্‌কা লাগায়। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাস যুক্তি-প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়, faith মাত্র; সুতরাং religions faithও সমান গ্রাহ্য কেননা দুই-ই faith—এটা যুক্তি নয়, সুধু কথা নিয়ে খেলা। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় যে faith তা মানুষের প্রতিদিনকার প্রতিকাজে verify হচ্ছে, এবং সেইজন্যই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাক না যাক মানুষ তাতে আস্থাবান। Religious faith এ ধরণের faith নয়, এবং এই উপমান প্রমাণটিও সেইজন্য লাগসই নয়। যদি হ'তো তবে ওলাদেবী ও মা শীতলার faith-এর বিরুদ্ধেও কিছুই বলার থাক্‌তো না। আপনি এডিংটনের বচন তুলেছেন "I think we should not deny validity to certain inner convictions, which seem parallel with the unreasoning trust in reason which is at the basis of mathematics."। আমাদের কতকগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রামাণ্যে যে সংশয় করা চলে না এতে কোনও কথা নেই, কিন্তু তার কারণ এ নয় যে গণিত শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানের মূলে যে যুক্তি-নিরপেক্ষ বিশ্বাস রয়েছে ঐ আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি তার সমধর্ম্মী। আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলির প্রামাণ্য হচ্ছে তার নিজেদের স্বরূপ যা সংশয়ের কোনও অবসর রাখে না, সমস্ত সংশয় ছেদন ক'রেই মনে উদয় হয়। ঐ inner convictionগুলির validity রয়েছে convictionগুলির মধ্যেই, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের মূলের 'unreasoning trust'-এর সঙ্গে parallelism-এর মধ্যে নয়। এ 'unreasoning trust' ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি মোটেই সমধর্ম্মী নয়। এর প্রথমটি হচ্ছে hypothesis ও postulateজাতীয়, দ্বিতীয়টি illumination; যে reason এর উপর প্রথমটির বিশ্বাস তা হচ্ছে বুদ্ধির abstraction, আধ্যাত্মিক অনুভূতি হ'লো concrete realisation। এর প্রথমটির সঙ্গে সমধর্ম্মিত্ব দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে মনকে নিঃসংশয় করে এ কথা এডিংটন বল্লেও মানা চলে না। 'বাধিতমর্থং বেদোঽপি ন বোধয়তি'।

তারপর আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞানের non-rational ভিত্তির অনুভূতিই এডিংটন প্রভৃতির ধর্ম্ম-প্রাণতা ও আধ্যাত্মিকতার কারণ? সত্য কথা কি এই নয় যে মনের একদিকের প্রেরণায় তাঁরা হয়েছেন বৈজ্ঞানিক, অন্যদিকের প্রেরণা তাঁদের ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রদ্ধাশীল করেছে। এবং যেহেতু তাঁরা প্রথমে বৈজ্ঞানিক ও পরে আধ্যাত্মিক সেইজন্য তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'এপলজিয়া' রচনা করে দেখিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। এবং কখনও কখনও একটু মাত্রা ছাড়িয়ে বিংশ-শতাব্দীর নব-বিজ্ঞানের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার সমর্থন খুঁজেছেন। তাঁদের এই শেষ শ্রেণীর চেষ্টাগুলিকে বেশী চেপে ধরা কিছু নয়। কারণ একটু চাপাচাপি কর্‌লে এ চেষ্টার মূলে এই মনোভাব বেড়িয়ে পড়ে যে জড় সূক্ষ্ম ও জটিল হ'লেই চৈতন্যের কাছাকাছি আসে। 'এটমের' মার্ব্বেল যদিও জড় পদার্থ ছিল, ইলেক্‌ট্রনের 'ওয়েভ মিকানিক্স' চিৎবস্তুরই সামিল! স্যামুয়েল জন্‌সন্ যে পাথরটিতে বুটের লাথি মেরে বিশপ বার্কলির সর্ব্ব-বিজ্ঞানবাদ অপ্রমাণ কর্‌তে চেয়েছিলেন, সে পাথর বিদ্যুৎকণার সমষ্টি প্রমাণ হওয়ায় জন্‌সনের চেষ্টার হাস্যকরত্ব আরও বেশী সপ্রমাণ হয়েছে! এ সব কথা অতি বড় বৈজ্ঞানিকে বল্লেও কথাগুলি ছেলেমানুষিই থেকে যায়।

৩

আপনি বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের যোগাযোগ সম্বন্ধে আপনার ও আমার মতের মিল-গরমিলের কথা তুলেছেন, এবং বলেছেন যে তর্কের ধূলো সরিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে আমাদের মধ্যে 'বিরোধের চেয়ে মিলই বেশী। এ কথা অবশ্য সত্য। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে জগতের একটা বিশেষ রকম ঐকদেশিক জ্ঞান, এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভালমন্দ কোনও সমালোচনা তার এলাকার বাইরে—এ আমাদের উভয়েরই বক্তব্য। কিন্তু আপনি যখন নব-বিজ্ঞানের দু-এক জন আচার্য্যের অনুসরণ ক'রে বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক

তথ্যের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার অনুকূল যুক্তি খুঁজে বের করেন, তখনি আমার আপত্তি আরম্ভ হয়। কারণ আমার মতে এ চেষ্টা সুধু নিরর্থক নয়, মিথ্যা-জ্ঞানের বীজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের মধ্যে কোনও জাতিভেদ নেই, এবং সকল শতাব্দীর বিজ্ঞানই হবে ঐ এক জাতীয়; অর্থাৎ মানুষের জাগতিক অনুভূতির এক বিশেষ রকমের ঐকদেশিক জ্ঞান। সেইজন্ত সকল শতাব্দীর বিজ্ঞান ও সকল রকম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার একই সম্বন্ধ—ঔদাসীন্ত বা 'নিউট্রালিটি', শত্রুভাব কি মিত্রভাব নয়। কোনও বিশেষ যুগের বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা চিন্তাধারাকে আধ্যাত্মিকতার অনুকূল ব'লে গ্রহণ ও প্রচারের লোভটা সম্বরণ করতে হবে। কারণ ওটা মায়া। আর এ কথাও ত খুব স্পষ্ট যে মিত্র যে হ'তে পারে, তার শত্রু হবারও সামর্থ্য ও সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি মুখে বলেছেন বটে যে আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির গ্রাহ্যত্ব বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণও হ'তে পারে না, অপ্রমাণও হ'তে পারে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ঐ প্রতিজ্ঞার প্রথম অংশটা সম্পূর্ণ নির্ম্মম হ'য়ে আপনি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করতে পারেন নি। মনের কোণে কেমন একটু মমতা রয়েছে যে নব-বিজ্ঞানের বাণী থেকে আধ্যাত্মিকতার সপক্ষে যদি দু একটা যুক্তি পাওয়া যায় তবে মন্দই বা কি; যদিও ও প্রতিজ্ঞাটির প্রথম ও শেষ অংশ একই সুতোয় বাঁধা, ওর একটিকে ছেড়ে অন্যটিকে নেবার যো নেই। জানি আপনার এ চেষ্টার সমর্থনে খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকের দুটো একটা নজীর আছে। কিন্তু তাতে সুধু এই সন্দেহই দৃঢ় হয় যে যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে একটা বৈজ্ঞানিক-দর্শন গ'ড়ে উঠেছিল, যা বহুলোকের বুদ্ধিকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রেছিল, এবং আজও করছে; তেমনি বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে আর একটা বৈজ্ঞানিক-দর্শন তৈরী হচ্ছে যা মানুষের বুদ্ধিকে অন্য পথে হ'লেও সমানই বিপথগামী করবে। এবং ও বিজ্ঞানের পরমায়ু যখন শেষ হবে তখনও তার ভূত মানুষের বুদ্ধির কাঁধে চেপে দৌরাত্ম্য করতে থাকবে।

বিজ্ঞান ও এই বৈজ্ঞানিক-দর্শনের মধ্যে আমি যে ভেদ-রেখা টেনেছি সেটা আপনার কাছে নব্য-ন্যায়ের চুলচেরা ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। কিন্তু বিষয়টি আপনি আলোচনা করেন নি, শুধু আলোচনার মোড় ফিরিয়ে তাকে এমন পথে নিয়েছেন যেটা একটা 'কাল্ ডি সাক্'। আপনি প্রশ্ন তুলেছেন এই বৈজ্ঞানিক-দর্শনের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান দায়ী কিনা। এখানে বিজ্ঞান অর্থে বৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়ে বৈজ্ঞানিক-দর্শনের সৃষ্টি ও প্রসারে সাহায্য করেছেন কিনা। উত্তর—কেউ কেউ করেছেন,কেউ কেউ উল্টো করেছেন, কারণ তাঁরা গোড়া খৃষ্টান ছিলেন, বেশীর ভাগ ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামান নি, নিজের কাজ ক'রে গেছেন। মেনে নিলুম্ 'নেগ্‌লিজেন্স' দোষে এ শেষের দলও দায়ী, "অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাঽপি নরো ভবতি কিল্বিষী"। কিন্তু এ তর্কের ফল কি? এতে কি বিষয়ের আলোচনা এক পা-ও এগিয়ে যায়? প্রকৃত আলোচনার বিষয় হচ্ছে উন্‌বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির মধ্যে এমন কিছু ছিল কিনা যার 'লজিক্যাল' ফল হচ্ছে এই বৈজ্ঞানিক-দর্শন। যদি না থেকে থাকে তবে ও দর্শনের জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক-দর্শন যে-সব তর্ক তুলেছে তার যে কোনও প্রকৃত সমর্থন বিজ্ঞানের মধ্যে নেই এই-টিই হচ্ছে জ্ঞাতব্য ও অনুধাবনার বিষয়। কোন্ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ না বুঝে বিজ্ঞানের নামে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে মূর্খের মত আক্রমণ করেছে—এটা অতি তুচ্ছ ঝগড়া। এই অন্যায় আক্রমণের জন্য আপনি অনেকখানি moral anger 'আধ্যাত্মিক উষ্মা' প্রকাশ করেছেন। এবং খৃষ্টানদের অসহিষ্ণুতার জন্য বারট্রাণ্ড রাসেল যে যীশুকে দায়ী করেছেন, দেশপ্রেমের অনাচার দেখে রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি যে 'শেষটায় দেশপ্রেম-পরিপন্থী হ'তে বাধ্য হয়েছেন'—এ সব নজীরও দেখিয়েছেন। আপনাদের হৃদয়ের সুগোলব মহত্ত্বের কাছে মাথা নোয়াচ্ছি। সুধু বুঝ্‌তে পারছি না এ সব সহৃদয়তার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণ হচ্ছে কি? ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা নামে পৃথিবীতে অনেক নিষ্ঠুরতা ও ভণ্ডামী এসেছে—তার জন্য ওদের বিদায় দিতে হবে, না বিজ্ঞানের

নামে অনেক অজ্ঞান প্রচার হ'য়েছে ব'লে বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য কর্‌তে হবে? মানুষের অদৃষ্টই এমনি যে সে যদি একটা সত্য পায়, তখনি তিনটা মিথ্যা তার আশ্রয়ে গজিয়ে উঠে তাকে আঁকড়ে ধরে। এ জন্য সত্যের উপর চোখ রাঙিয়ে লাভ নেই। বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে এই মিথ্যা থেকে সত্যকে তফাৎ ক'রে জানা ও জানানো।

৪

বৈজ্ঞানিক-দর্শন ও বিজ্ঞান যে এক বস্তু নয়, ওরা যে "তমঃপ্রকাশবৎ বিরুদ্ধস্বভাব", এই বিবেকজ্ঞান না হ'লে গোলযোগ ঘটে পদে পদে। তখন এর একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ ক'রে নানা মায়া ও মিথ্যাজ্ঞানে মানুষের বুদ্ধি নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। বারট্রাণ্ড রাসেলের 'Is Science Suprestitions?' সন্দর্ভটি এর একটা উদাহরণ। বিজ্ঞানের ব্রহ্মাবর্ত্ত পশ্চিম ইউরোপে বিজ্ঞানের পুরোহিত-মণ্ডলীতে যে বিশ্বাস ও ভক্তির খর্ব্বতা লক্ষ্য ক'রে রাসেল বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়েছেন তা মোটেই বিজ্ঞানের উপর ভক্তি বিশ্বাস নয়, এই বৈজ্ঞানিক-দর্শনের উপর আস্থা ও অনুরক্তি। রাসেল যাকে বলেন 'Scientific outlook' তা science-এর 'আউট্‌লুক্' নয়, উনবিংশ শতাব্দীর এই scientific philosophyর 'আউট্‌লুক্'। অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে একটা কাটা ছাঁটা ধারণা ও সংস্কার। রাসেল ধ'রে নিয়েছেন যে গত তিন শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির মূলে রয়েছে এই ধারণা ও সংস্কার। এটা একটা প্রকাণ্ড মায়া। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা প্রকৃত স্রষ্টা, সুধু গুণজ্ঞ নন্‌, রাসেলের ভাষায় যাঁরা creator কেবল appreciator নন্‌, তাঁরা যে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে কোনও একটা বিশেষ ধারণা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ব্রতী হ'য়েছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই। বরং উল্টো দেখা যায় যে বিজ্ঞানের প্রধান স্রষ্টাদের অনেকের মনে নানা অন্ধ-সংস্কার ছিল, যে সব সংস্কার তাদের বিশেষ বিভাগের বৈজ্ঞানিক কাজের কোনও বাধা হয় নি। কেপ্‌লার বিশ্বাস কর্‌তেন যে প্রতি গ্রহের এক এক জন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, যিনি কেপ্‌লারের আবিষ্কৃত নির্দ্দিষ্ট পথে গ্রহটিকে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিউটন জগৎ-সৃষ্টির, বিশেষ ক'রে জীব-সৃষ্টির কৌশল দেখে একজন চেতন ও বুদ্ধিমান জগৎ-স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন, রাসেল নিশ্চয় যাকে 'এনথ্রপমরফিক্‌' কুসংস্কার বল্‌বেন। সত্য কথা এই যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে একটা অখণ্ড দৃষ্টি বা 'আউট্‌লুকে' বৈজ্ঞানিকের কোনও প্রয়োজন নেই। এ রকম দৃষ্টি, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে একটা তত্ত্ববিশেষে এমন আবদ্ধ যে তার পরিপন্থী কোনও কিছুকে স্বীকার কর্‌তে নারাজ, তা বৈজ্ঞানিকের কাজের সহায় নয়, বাধা। জগৎ সম্বন্ধে এরকম 'আউটলুকের' সৃষ্টি, যার কোথাও কোনও গরমিল থাক্‌বে না—এ হচ্ছে দর্শন-শাস্ত্রের চেষ্টা। এবং এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা বরাবর নিউটনের সতর্কতার বাণী মেনে আস্‌ছেন, "Beware of metaphysics"। যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের যে বিশেষ বিভাগে কাজ করেন তাঁর কাজের উপযোগী 'আউট্‌লুক্‌' তাঁর প্রতিভা তাঁকে এনে দেয়। সে 'আউট্‌লুক্‌' মানুষের সমস্ত অনুভূতির সঙ্গে খাপ খায় কিনা, এমন কি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের লাগ-সই কিনা সে চিন্তা তাঁর নেই। 'Scientific outlook' কথাটাই একটা abstraction। সব বিজ্ঞানের এক 'আউট্‌লুক্‌' নয়। আধুনিক mathematical physics-এর যে 'আউট্‌লুক্‌', আধুনিক biologyর কাজ সে 'আউট্‌লুক্‌' নিয়ে চলে না। বরং physics-এর 'আউট্‌লুক্‌' নিয়ে কাজ কর্‌তে গিয়ে তার উন্নতি বহুদিন বন্ধ ছিল। সে 'আউট্‌লুক্‌' ছেড়ে বিষয়ের উপযোগী অন্য 'আউট্‌লুক্‌' নিয়ে কাজ আরম্ভ করায় বিংশ শতাব্দীর biology অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকৃত স্রষ্টা, বারট্রাণ্ড রাসেলের মত কেবল রসয়িতা নন্‌, এমন একজন লোকের সাক্ষ্য নেওয়া যাক্‌। আমেরিকান বৈজ্ঞানিক রবার্ট মিলিকান বিংশ শতাব্দীর নব-বিজ্ঞানের একজন প্রধান কর্ম্মী। ইলেক্‌ট্রণ সম্বন্ধে তাঁর মাপযোকের কাজ সুপরিচিত, যার জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ফিজিক্সের নোবেল পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে 'কস্‌মিক্‌ র‍্যাডিয়েশন্‌' সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের বিস্ময়। তাঁর Science and the New

Civilization গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে মিলিকান লিখ্ছেন, "I am not worrying here over the recent introduction of the so-called 'principle of uncertainty' in microscopic processes, an event that is causing so much excitement among physicists just now. This may indeed be consoling or, at least, illuminating to those non-physicists who have been worrying their heads over their inability to reconcile the principle of law with the facts of free-will and responsibility. We physicists have hade much worse contradictions than these to put up with in the subject of physics alone, as for example, the reconciliation of the wave theory of light with the essentially corpuscular light-quant theory. Experiment has told us that both theories are right, and we have had the limitations of our knowledge jolted into us enough times lately in physics to believe it in spite of our inability to see as yet just now how the reconciliation is to be made. * * * But I do'nt think this particular problem ever worried the physicist, for he has always known that his ignorance was as yet quite ample enough to cover the links in the reconciliation that must exist. Eighteenth-and-nineteenth century materialsm never had any lure for him, for it always represented quite as pure dogmatism—assertiveness without knowledge —as did mediaeval theology". (১)। বলা বাহুল্য বারট্রাণ্ড রাসেল যাকে বলেন 'scientific outlook', তাই হচ্ছে মিলিকানের Eighteenth—and—nineteenth century materialism"। রাসেলের মতে বৈজ্ঞানিক-মনে এর প্রেরণাই বিজ্ঞানকে ক্রমাগত অগ্রসর ক'রে এনেছে, মিলিকান বলেন বৈজ্ঞানিকদের মনে এর কোনও আকর্ষণই নেই। মতামত হিসেবে যে রাসেলের মতের চেয়ে মিলিকানের মত মান্য এ কথা বলছি নে। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে একটা বিশেষ মনোভাব বৈজ্ঞানিকদের মনে কাজ করছে কিনা, এবং তাঁদের বৈজ্ঞানিক কাজের প্রেরণা যোগাচ্ছে কিনা। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের সাক্ষ্যই অবশ্য সব চেয়ে প্রামাণ্য। তবে যদি রাসেল বলেন ও মনোভাব মিলিকানের মনে ঠিক রয়েছে শুধু তিনি 'Z্তি' পারছেন না'—সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

রাসেল যাকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব বলেন তা যে একটা দার্শনিক তত্ত্বমাত্র, বিজ্ঞানের উৎস নয়—তার প্রমাণ তাঁর শোকের কারণ হ'ল যে উৎসের জোর কমেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিজ্ঞান-প্রবাহের প্রসার কি গভীরতা এক বিন্দুও কমে নি। বিংশ শতাব্দীর ফিজিক্স সম্বন্ধে মিলিকানের রায় হচ্ছে;—"I feel altogether confident that the historian of the future will estimate the past thirty years as the most extraordinary in the history of the world up to the present in the number and the fundamental character of the discoveries in physics to which it has given birth. * * * There has been no period at all comparable with it unless it be the period about 300 years ago, which saw the development of Galilean and Newtonian mechanics". (২)। এর উল্টো কথা রাসেল অবশ্য বলেন নি, কারণ বলার উপায় নেই। বিজ্ঞানের মন্দিরে পূজারীরও সংখ্যা কমে নি, নৈবেদ্যের ভারও লঘু হয় নি। রাসেলের শোক ও শঙ্কার কারণ হচ্ছে তিনি ভুল দেবতার মন্দিরের দিকে চোখ চেয়ে আছেন। বৈজ্ঞানিক-দর্শন সম্বন্ধে আস্থা-হ্রাস রাসেল বিজ্ঞানে অধ্যাস ক'রে শোকাকুল হয়েছেন। "পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বাহ্যমেব বিকলঃ সকলোবেতি বাহ্যধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্যতি"।

রাসেলের 'Is Science Suprstitious ?' নিয়ে আপনার আমার মধ্যে ছোট একটা তর্কের কথা একটু ব'লে সারি। হিউমের সংশয়বাদ সম্বন্ধে রাসেল যা বলেছেন. আপনি তাকে বলেছিলেন বিজ্ঞানের দুরবস্থার রাসেলের 'প্রকাশ্য ক্রন্দন'। আমি বলেছিলুম ওটা 'ছদ্ম বিদ্রূপ'। উত্তরে আপনি সন্দেহ করেছেন যে রাসেলের প্রবন্ধটা আমি মোটেই পড়েছি কিনা। মনে করেছিলুম ও সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখবো, কিন্তু ভেবে দেখলুম তা নিরর্থক। কোনও

(১) Three Great Elements in Human Progress : ১৮০—১৮২ পৃঃ।

(২) ঐ পুঁথি : The Last Fifteen years of Physics ; ১১৪ পৃঃ।

লেখার মূল রসটা হাস্য না করুণ এটা শেষ পর্য্যন্ত রুচির কথা, যুক্তি-তর্কের নয়। এবং দেখছি আপনার আমার মধ্যে বেশ রুচিগত ভেদ রয়েছে। যেটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নয় সেখানেও যে লোকে বিজ্ঞানের নামে শির নোয়ায় সেই প্রসঙ্গে আমি লিখিছিলুম,"এটা স্বাভাবিক। ওকালতি বা ভূষিমালের ব্যবসায় যে বড় হ'য়েছে, সাহিত্য সভায় তাকে আমরা নিত্য মোড়লি করতে দিচ্ছি।" ভেবেছিলুম একটা বিদ্রূপ করলুম। কিন্তু আপনার লেখা প'ড়ে জানলুম যে ওটা 'মানব-মনের ব্যাপক দুর্ব্বলতার পক্ষে আমার সলজ্জ ওকালতি'। প্রথমটা একটু চমকে গিয়েছিলুম, কিন্তু পরে বুঝলুম যে বিদ্রূপে আমার হাত নেই, আর ওকালতি আমার ব্যবসা; সুতরাং আমার মুখের বিদ্রূপ কারও কানে ওকালতির মত শোনানো বিচিত্র নয়।

৫

পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, আর একটা তর্কের প্রসঙ্গ দিয়েই শেষ করবো। আমি লিখেছিলুম, "বিংশ শতাব্দীর উদারপ্রাণ বৈজ্ঞানিকেরা যে ধর্ম্মের খাতিরে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে সূর্য্যের অনধিকার প্রবেশ রদ করে সে স্থান পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, এবং বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্বই তত্ত্বকথা ব'লে মেনে নিচ্ছেন সে খবর এখনও পাওনা যায় নি"। এ সম্বন্ধে আপনি লিখেছেন যে 'বিজ্ঞান এখনও পৃথিবীকেই সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরাচ্ছে, সূর্য্যকে পৃথিবীর চারদিকে নয়' এ নিয়ে 'জাঁক' করাটা আমার ঠিক হয় নি। কারণ রিলেটিভিটি তত্ত্বানুসারে যখন সব গতিই আপেক্ষিক তখন 'অত্যাধুনিক বিজ্ঞান-অনুসারে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে বলাও যতখানি সত্য, সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে বলাটাও অবিকল ততখানিই সত্য'! এ কথায় প্রথমত আপনার একটু শক্ লেগেছিল বটে, কিন্তু সাম্‌লে নিয়ে ভেবে বুঝেছেন 'যে কথাটা মিথ্যা নয়; এবং আমি যদি এ বিষয়ে এখনো পরাজয় স্বীকার না করি তবে নাচার'।

এ সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই। প্রথমত সূর্য্য ও পৃথিবীর পরস্পর সম্পর্কে গতির কথা আমি ও জায়গায় কিছু বলিনি, বলেছি সৌরজগৎ সম্পর্কে তাদের পরস্পর অবস্থান সম্বন্ধে। দুটো ঠিক এক কথা নয়। কিন্তু সে কথা যাক্। রিলেটিভিটি-বাদের আপনার এ ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে আশ্চর্য্য না হ'য়ে পার্‌ছি না। সব গতিই আপেক্ষিক—তার অর্থ এ নয় যে কোনও গতি সম্বন্ধে সব রকমের উক্তিই সমান শুদ্ধ বা সমান ভুল। ওর অর্থ হচ্ছে—কোনও গতি সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলেই সে কথা বল্‌তে হয় একটা নির্দ্দিষ্ট frame of reference বা কাঠামো সম্পর্কে, না হ'লে গতি কথাটার কোনও অর্থই হয় না। যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একটি মাত্র বস্তু থাকতো তবে 'তার গতি' এ কথার কোনও অর্থ হ'তো না। যদি মাত্র দুটি বস্তু থাক্‌তো তবে প্রথম বস্তুর গতি দ্বিতীয় বস্তুর দিকে, না দ্বিতীয় বস্তুর গতি প্রথম বস্তুর দিকে এ প্রশ্নেরও কোনও অর্থ থাক্‌তো না, কারণ ও দুই-ই হ'তো এক কথা। অর্থাৎ যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য আর পৃথিবী এই দুটি মাত্র বস্তু থাক্‌তো সূর্য্যের চার পাশে পৃথিবী ঘুরছে বা পৃথিবীর চারপাশে সূর্য্য ঘুরছে ও দুই-ই এক কথা হ'তো। কিন্তু ব্যাপার ত তা নয়, ওদুটি হচ্ছে অসংখ্য বস্তুর মধ্যে মাত্র দুটি। সুতরাং যখন ওদের গতি সম্বন্ধে কথা ওঠে তখন একটা frame of reference সম্পর্কে সে কথা বল্‌তে হয়। সৌর-জগৎ হ'লো এই রকম একটা frame of reference বা কাঠামো। এর সম্পর্কে যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর গতির কথা বলা হয় তখন সূর্য্যের চারপাশে পৃথিবী ঘুরছে বলা যা, পৃথিবীর চারপাশে সূর্য্য ঘুরছে বলা তা নয়। ওর প্রথম প্রতিজ্ঞা শুদ্ধ, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা ভুল। আইন্‌ষ্টেনের রিলেটিভিটি কোপার্নিকাস্ ও কেপলারকে বাতিল করে নি। সৌরজগৎ সম্পর্কে অত্যাধুনিক বিজ্ঞানেও পৃথিবীই সূর্য্যের চারপাশে ঘুরছে, বিকল্পে সূর্য্য পৃথিবীর চারপাশে নয়। সৌর-জগৎ নিরপেক্ষ কে কার চারপাশে ঘুরছে? রিলেটিভিটির উত্তর—ও প্রশ্নের কোনও অর্থ হয় না। এরই নাম সব গতিই 'রিলেটিভ' বা আপেক্ষিক,' অ্যাবসলিউট' বা নিরপেক্ষ গতি ব'লে কোনও কিছু নাই, অর্থাৎ তার মানে হয় না।

গণিত শাস্ত্রে আমার জ্ঞান কিছুমাত্র নেই বল্‌লেই চলে। যদি ভুল কিছু ক'রে থাকি শুধরে দেবেন। নিবেদন ইতি।

গুণমুগ্ধ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

সাহিত্য-বিচারে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতে একটা উক্তি আছে—"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ, মা লিখ মা লিখ"। প্রকৃতপক্ষে রসগ্রহণ করিবার মত সুরসিক লোক খুবই অল্প। রস-বিচারের ক্ষমতাসম্পন্ন লোক আরও অল্প। কারণ রস-বিচার অনেক দিক দিয়াই সুকঠিন। শুধু রস-বোধ থাকিলেই চলে না;—এই অনুভূতিকে ভাবের জগৎ হইতে প্রকাশের জগতে আনাও সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। যে অবাঙ্‌মনস-গোচর-ভূমিতে ভাবের কল্পলোকে অনুভূতির জন্ম—সেখান হইতে তাহাকে বাহিরের বিশ্বজগতের নিতান্ত সম্মুখে আনিতে পারেন—এমন ভগীরথও নিতান্তই দুর্লভ। শুধু তাহাই নহে। রস-সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রকৃষ্ট বিচারক হইল মহাকাল। এই মহাকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করাও বিশিষ্ট দৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের ক্ষমতা। "যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক এক জনের প্রতিভা সর্ব্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে—সর্ব্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি বিচারের প্রতিভাও আছে। এক এক জনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সঙ্কীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন এক মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন। স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্ব্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।" (রবীন্দ্রনাথ)

কিন্তু আবার এমন বিচারকও আছেন—যাঁহাদের দিঙ্‌নাগের ন্যায় স্থূলহস্তাবলেপ সারস্বত কুঞ্জের বীণাপাণিকে সচকিতা করিয়া তোলে। প্রত্যুত সারস্বতদিগের গুণের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন যাঁহারা, তাঁহারা নিজেরাই বাগ্দেবীর বরপুত্র। তাই শেক্‌স্‌পীয়ারের শ্রেষ্ঠ সমালোচক হইলেন ভিক্টর হুগো আর কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমর্থক হইলেন শেলী।

সাহিত্যবিচারে সাহিত্যিকের অধিকার এবং যোগ্যতা যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল—তখন যাঁহার কাব্য ও সাহিত্য-সম্পদে শুধু বঙ্গসাহিত্যই নহে—সমগ্র বিশ্বসাহিত্যই অশেষ সম্পদ্‌বান্ হইল, সেই রবীন্দ্রনাথ যে কাব্য ও সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও শ্রেষ্ঠ বিচারকরূপে পরিগণিত হইবেন—তাহাত নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ হইলেন সব্যসাচী। তিনি সব্যসাচীর ন্যায় উভয়-হস্তেই ধনুত্যাগ করিতে পারেন। সাহিত্য-রচনায় যেমন তিনি বাংলা সাহিত্যকে হোরাকের মত ære perennius করিয়া দিয়াছেন সাহিত্য-বিচারেও তিনিই বাংলা সাহিত্যের অগ্রদূত হইলেন!

বঙ্গ-সাহিত্য যখন হইতে একটা জাতীয় সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইল—তখন হইতেই বাংলা-সাহিত্য বলিতে আমরা বুঝি বাংলার রস-সাহিত্য। সাহিত্য বিচার অথবা সাহিত্য সমালোচনার একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আমরা বাংলা সাহিত্যে খুঁজিয়া পাই না।

বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করিলে বাংলা সাহিত্যের এই দৈন্য আমাদিগকে বিশেষ করিয়া আঘাত দেয়। ইংরেজী অথবা ফরাসী সাহিত্যের পুঁজী বাংলা সাহিত্যের মত শুধু কথা সাহিত্যে নহে। ইংরেজী সাহিত্যে এক শেক্‌স্‌পীয়ারের কত দক্ষ সমালোচক হইল—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শুধু কথা-সাহিত্য লইয়া ত কোন দেশের কোন সাহিত্যই সঞ্জীবিত থাকিতে পারে না। তাই আজ বাংলা-সাহিত্য-প্রেমিককে "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে সন্দিহান ও শঙ্কাকুল হইতে হয়। কিন্তু এই প্রদোষান্ধকারের ক্লান্তি, নৈরাশ্য ও দ্বিধার মধ্যে উদাত্তস্বরে আশ্বাসবাণী শুনাইলেন

রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যের সকল দৈন্য, সকল অভাবকে যিনি ঘুচাইয়াছেন, তিনিই সাহিত্যবিচারে অগ্রণী হইয়া পথ-প্রদর্শন করিয়া চলিলেন।

* * *

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিচার অথবা সাহিত্য-সমালোচনার ধারাকে বুঝিতে হইলে, সাহিত্য-শিল্প-সৌন্দর্য্য-রস সম্বন্ধে তাঁহার নিজের যে একটি বিশিষ্ট philosophy আছে তাহাকেই বুঝিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, Personality এবং Creative Unity প্রভৃতি গ্রন্থে এবং সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধেই তিনি সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে একটা মৌলিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। সেই মতবাদই হইল তাঁহার Standard বা পরিমাপ। তাই সাহিত্য-বিচারে এবং শিল্প-বিচারে সর্ব্বত্রই তিনি এই Standardএর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার স্বকীয় মতবাদের সহিত সুপরিচয় না থাকিলে—তাহার সাহিত্য-বিচারকে কখনই বুঝা সম্ভব হইবে না।

* * *

মানুষের কাছে দুইটি জগৎ। এক হইল বাহিরের বিশ্বজগৎ যাহাকে আমরা পাই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া। আর একটা জগৎ হইল আমাদের নিজের সৃষ্টি—বাহিরের জগৎকে ব্যক্তিগত রূপ-রস-চৈতন্য প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তির বিচিত্র রসে অভিষিঞ্চিত করিয়া—মনের মধ্যে একটা অভিনব জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলি। একটা হইল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আর একটা হইল ইন্দ্রিয়াতীত। একটা জগৎ হইল আমাদের দৈহিক ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য, একটা হইল মানসিক ক্ষুধা-তৃপ্তির জন্য। এই বাহিরের জগৎ কিন্তু অন্তরের জগৎ হইতে ভিন্ন নহে। বাহিরের জগৎই যখন একান্ত আপনার হইয়া উঠে তখনই উহা অন্তরের জগতে পরিণত হয়। এই হৃদয়ের জগৎ আবার বাহিরে রূপ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই ব্যাকুলতাই—মানুষের চিরকালীন সাহিত্যাবেগের জন্য দায়ী। এই যে বাহিরের বিশ্বজগৎ হইতেই চিত্তবৃত্তির বিশিষ্ট সমাবেষ্টনে একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই আবার বাহিরে রূপ দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রবৃত্তি—ইহাই রবীন্দ্রনাথের মতে সকল সাহিত্য, সকল শিল্প, সকল কলার উৎস। সুতরাং শিল্প-সৃষ্টির প্রধান উপাদান হইল মানুষের ব্যক্তিত্বের জগৎ—ইংরেজীতে যাহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"The World of Personality."

কিন্তু এই শিল্প-সৃষ্টি অথবা সাহিত্য-সৃষ্টির শক্তি আসে কোথা হইতে? বাস্তব-জীবনের বহুমুখী ঘাতপ্রতিঘাতেও মানুষের সকল শক্তি, সকল প্রেরণা, সকল জ্ঞানের সঞ্চয় নিঃশেষ হইয়া যায় না। পশুর জ্ঞান—সে শুধু আপনার বাস-স্থান-নির্ম্মাণ, আহার্য্য-সংগ্রহ প্রভৃতি জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানেই নিঃশেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার এত ক্ষুদ্র, এত অকিঞ্চিৎকর নহে। জীবন-ধারণের জন্য যে পরিমাণ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা ছাড়াও তাহার একটা Surplus জ্ঞানের ভাণ্ডার আছে। এই Surplus জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই মানুষের সকল দর্শন, সকল সভ্যতা, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাসাদ গড়িয়া উঠে। ঠিক এইরূপেই, মানুষের একটা Surplus goodness এর ভাণ্ডার আছে—যাহাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে মানুষের নীতিজ্ঞান—Ethics। মানুষের শিল্পের মূলও এই surplus অথবা "Superfluous"এর জগৎ।* এক ফরাসী দার্শনিক যে বলিয়াছিলেন—"L' art commence ou la vie cesse",—তাহার অর্থও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই "theory of the Superfluous"। মানুষের জীবনের যেখানে পরিসমাপ্তি—জীবনের সকল প্রয়োজনের বন্ধন যেখানে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—মানুষের অন্তরের সম্পদ যেখানে অতিরিক্ত হইয়া প্রকাশের পথ খুঁজিয়া বেড়ায়—আর্টের সৃষ্টি হইয়াছে সেই "অতি-রিক্ততা"র মধ্যে—ছান্দোগ্য উপনিষদে যাহাকে বলা হইয়াছে "উচ্ছিষ্ট"। মানুষ কথা বলে যখন প্রয়োজন হয়—প্রয়োজন না থাকিলে মানুষ গান গাহে। হাঁটিবার প্রয়োজন থাকিলেই মানুষ হাঁটে—তাহা না হইলে নৃত্য করে। এইরূপে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল অনুষ্ঠান সমাপ্তির

* "Man has a fund of emotional energy which is not all occupied with his self-preservation. This Surplus seeks its out-let in the creation of Art, for man's civilisation is built upon its Surplus".

—Personality : Tagore.

পরে যে অবসর এবং শক্তি অবশিষ্ট ও "উচ্ছিষ্ট" থাকে—তাহাই মানুষ নিয়োজিত করে নৃত্য-গীত-কলা-সৃষ্টির মধ্যে।

সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মত অনুধাবন-যোগ্য।

টেনিসন্ বলিয়াছিলেন—

"I do but sing because I must,
And pipe but as the linnets sing,"

হ্বার্ডস্হ্বার্থ ও গ্যটের কাব্যসমালোচনা-কালে কাব্য ও সাহিত্যকে বলিয়াছিলেন "inevitable"। হ্বার্ডস্হ্বার্থ ও টেনিসন্ উভয়েই কাব্য ও সাহিত্যের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ততার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে সাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত বলিয়াই তাহার কোন প্রয়োজন অথবা দার্শনিক পরিভাষায় যাহাকে "ulterior aim" বলা হয়—তাহা থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের মতবাদ কিন্তু ঠিক বিপরীত। তিনি সকল সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যেই সাহিত্যিকের একটি বিশিষ্ট মনোভাবের ইঙ্গিত পাইয়াছেন।

মানুষের মনোভাবের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই যে মানুষ তাহার জীবনের অধিকারকে সর্ব্ব-প্রকারে পরিব্যাপ্ত ও সুপ্রশস্ত করিয়া তুলিতে চায়।

"প্রকৃতিতে আমরা দেখি ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্ব্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে।

"মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেই রকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহু মনকে আয়ত্ত করা।

"এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায়, কত প্রাচীনকাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি, কত পাথুরে খোদাই, কত ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই, কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস—বাঁ দিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে! কি? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না, তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে, চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে! আমার বাড়ীঘর আমার আসবাবপত্র আমার শরীর মন, আমার সুখ দুঃখের সামগ্রী সমস্তই যাইবে, কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে"। (রবীন্দ্রনাথ)

শাশ্বত মহাকালের উপরও মানুষ আপনার প্রভাব, আপনার অধিকার বিস্তার করিতে চাহে। ইহাই হইল অমৃত যাহার লোভে মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন—"যেনাহম্ নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" তাই "Posterity will not willingly let die"এর আশাতে অনুপ্রাণিত হইয়াই মিল্টন্ লিখিতে বসিলেন মহাকাব্য; আর "Exegi monumentum aere perennius"-এর আশাই হইল হোরাকের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল।

এই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই সকল সমালোচনা, সকল তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সারবান সাহিত্য অপেক্ষা নাটক-নভেল-কাব্যের প্রাচুর্য্য অধিক হইতেছে। কারণ সারবান সাহিত্যে চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা বড় কম। কারণ জ্ঞানের কথা একবার প্রচার হইয়া গেলে তাহার প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু হৃদয়ের কথা, ভাবের কথা কখনও পুরাতন হয় না। তাই সাহিত্যের অবলম্বন হইল জ্ঞানের বিষয় নহে ভাবের বিষয়। কিন্তু এই ভাবের কথাকে "সঞ্চার" করিতে হইলে—নানাপ্রকার ছলাকলা এবং আভাষ ইঙ্গিতের প্রয়োজন। "এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা ভাবের দেহের মত। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়—ইহার শক্তি অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে" (রবীন্দ্রনাথ)। ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের, একমাত্র রচনাভঙ্গীই হইল

সাহিত্যিকের নিজস্ব—সুতরাং রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থ-রূপে বাঁচিয়া থাকে। ভাবকে একটা বিশিষ্ট রূপ প্রদান করিয়া সর্ব্বকালের আনন্দের সামগ্রীতে পরিণত করাই সাহিত্যরচনার বিশেষত্ব।

এই যে "আনন্দসৃষ্টি," ইহার উপর কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বত্রই বিশেষ emphasis দিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরাও "নিঃস্বার্থ আনন্দ"কে সাহিত্যের প্রাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। বামনাচার্য্য ত স্পষ্টই বলিয়াছেন—"কাব্যং সদৃষ্টাদৃষ্টার্থম্ প্রীতি-কীর্ত্তি-হেতুত্বাৎ।" তিনি নিজেই উক্ত সূত্রের বক্ষ্যমান ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"কাব্যং সচ্চারু দৃষ্ট-প্রয়োজনং প্রীতিহেতুত্বাৎ—অদৃষ্ট-প্রয়োজনম্ কীর্ত্তি-হেতুত্বাৎ।" লক্ষ্য করিয়া দেখিবার বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতবাদের প্রীতি ও কীর্ত্তি দুইটিই বর্ত্তমান। কিন্তু সাহিত্য অথবা শিল্প আনন্দ-পন্থী বলিয়াই—তাহারা "সৌন্দর্য্যের" সহিত identical নহে। প্রকৃতপক্ষে "beauty in art has been the mere instrument and not its complete and ultimate significance" (Personality)

প্রকৃত সাহিত্য কি করিয়া সত্য ও শিব-সুন্দরের পরিপূর্ণ ও সুষ্ঠু সম্মেলনে সৃষ্ট হয়—সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে সত্যম্ ও শিবম্ই সাহিত্যিকের কলানৈপুণ্যে সুন্দরম্-এ পরিণত হয়, আবার সত্যম্ ও সুন্দরম্ শিবম্-এ পরিণত হয়। ইহা কি করিয়া সম্ভব হয় বুঝিতে হইলে সুন্দর ও কল্যাণের গূঢ়তত্ত্বের সন্ধান করিতে হয়, সৌন্দর্য্যের সহিত সত্য এবং কল্যাণ কি করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত তাহা উপলব্ধি করিতে হয়।

সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের কাছে সম্পূর্ণতালাভ করে তখনই যখন মানুষ শুধু চোখের দৃষ্টি নহে—মনের দৃষ্টি দিয়া দেখে। কিন্তু "মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধি-বিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহার সঙ্গে হৃদয়-ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরো বাড়িয়া যায়—ধর্ম্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরও অনেকদূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্ম দৃষ্টি খুলিয়া দিলে দৃষ্টি-ক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।"

"অতএব যে দেখাতে আমাদের মনের বড় অংশ অধিকার করে—সেই দেখাতেই আমরা বেশি তৃপ্তি পাই। ফুলের সৌন্দর্য্যের চেয়ে মানুষের মুখ আমাদিগকে বেশী টানে, কেন না, মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুষমা নয়, তাহাতে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ের লাবণ্য আছে; তাহা আমাদের চৈতন্যকে, বুদ্ধিকে দখল করিয়া বসে।"

"আবার মানুষের মধ্যে যাঁহারা নরোত্তম, ধরাতলে যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে প্রকাশ, তাঁহারা আমাদের মনকে এতদূর পর্য্যন্ত টান দেন—সেখানে আমরা নিজেরাই নাগাল পাই না। এইজন্য যে রাজপুত্র মানুষের দুঃখমোচনের উপায় চিন্তা করিতে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য, কত চিত্ররচনায় লাগাইয়াছে তাহার সীমা নাই।" (রবীন্দ্রনাথ) কারণ এখানে ভারবীঠাকুরের সেই "হিতং" এবং "মনোহারি"র সুদুর্ল্লভ সমাবেশ।

এখানেই কিন্তু কবি ও দার্শনিকের প্রভেদ। দার্শনিক মঙ্গল প্রচার করেন প্রয়োজনের দিক দিয়া, আর কবিরা মঙ্গলকে তাহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই দার্শনিকের আবেদন হইল আমাদের মস্তিষ্কে আর কবির আবেদন হইল আমাদের হৃদয়ে। Philosophy reconciles the world to our reason; poetry to our feelings. Disorder and irritability philosophy cannot tolerate; ugliness and disgust with nature and society poetry cannot accept."—কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিলে চলিবে না কবি ও সাহিত্যিক কখনও দার্শনিক হইতে পারেন না এবং দার্শনিক কখনও কবি হইতে পারেন না। মঙ্গল এবং কল্যাণের প্রয়োজনের দিক ও সৌন্দর্য্যের দিক এই দুইটিই যখন মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে—তখনই কবি দার্শনিক-এ পরিণত হ'ন—আর দার্শনিকের সকল দর্শন সাহিত্য-সম্ভারে পরিণত হয়। তাই স্পিনোজার নীতিশাস্ত্র আর প্লেটোর দর্শন বহুকাল যাবৎ কাব্য বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে—এমন কি ব্যর্গস'র দর্শনকেও অনেকে দর্শন বলিয়া স্বীকার করিতেই পরাঙ্মুখ—আর রবীন্দ্রনাথ ত প্রায় সর্ব্বদেশেই poet-philosopher বা দার্শনিক-কবি রূপে পরিচিত হইয়া আছেন।

"বস্তুতঃ মঙ্গল যে সুন্দর সে আমাদের প্রয়োজন-সাধন করে বলিয়া নহে। ভাত আমাদের কাজে লাগে—ছাতা-জুতা আমাদের কাজে লাগে; ভাত-কাপড়-ছাতাজুতা আমাদের মনে সৌন্দর্য্যের পুলকসঞ্চার করে না। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন—এই সংবাদে আমাদের মনের মধ্যে বীণার তারে যেন একটা সঙ্গীত বাজাইয়া তোলে। ইহা সুন্দর ভাষাতেই, সুন্দর ছন্দেই সুন্দর করিয়া সাজাইয়া স্থায়ী করিয়া রাখিবার বিষয়। ছোট ভাই বড় ভাইএর সেবা করিলে সমাজে হিত হয় বলিয়া যে এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। ইহা সুন্দর বলিয়াই। কেন সুন্দর? কারণ মঙ্গল মাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য্য আর আমাদের অগোচর থাকে না।" (রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের ও মঙ্গলের এই সুসমঞ্জস মিলনের কারণটিও সুনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—"সৌন্দর্য্য জগৎ-ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করে, মঙ্গলও মানুষের জীবনের মধ্যে তাহাই করিয়া থাকে; মঙ্গল সৌন্দর্য্যকে শুধু চোখের দেখা নয়, শুধু বুদ্ধির বোঝা নয়, তাহাকে আরো ব্যাপক, আরো গভীর করিয়া মানুষের কাছে আনিয়া দিয়াছে; তাহা ঈশ্বরের সামগ্রীকে অত্যন্তই মানুষের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ মঙ্গল মানুষের নিকটবর্ত্তী অন্তরতর সৌন্দর্য্য; এই জন্যই তাহাকে আমরা অনেক সময়ে সহজে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারি না—কিন্তু যখন বুঝি আমাদের প্রাণ বর্ষার নদীর মত ভরিয়া উঠে, তখন আমরা তাহার চেয়ে রমণীয় আর কিছুই দেখি না।" সুতরাং যেখানে সুন্দর সমগ্র বিশ্বব্যাপারের সহিত অখণ্ডরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে—সেখানেই তাহার কল্যাণরূপ! সুতরাং এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময় পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালেও একটা অনন্ত জগৎ রহিয়াছে—যেখানে কল্যাণ ও সুন্দর সার্থক-সম্মেলনে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে—ইহাই হইল সাহিত্যিকের জগৎ, কবির জগৎ, শিল্পীর জগৎ। হেগেলের মতে তাই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল—"to present in forms for the imagination features of the ultimate ideal of the harmonised universe."

Churton Collinsও কাব্যের true function নির্দ্দেশ করিলেন—"the revelation of that world of which this world is but the Shadow or the drossy copy, the revelation of the eternal, the unchanging and the typical which underlies the unsubstantial and ever-dressing phenomena of earth's empire of matter and time" (The true function of Poetry : Churton Collins)

এই মহত্তর এবং বৃহত্তর জগতের সহিত সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পের কি রকম অখণ্ড এবং অবিচ্ছি সংযোগ তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিশেষ করিয়া প্রাচ্য শিল্পরীতির মধ্যে। তাই ভারতীয় চিত্রাঙ্কনরীতির গূঢ়তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়া Lawrence Binyon এই বৃহত্তর এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগতেই উপনীত হইয়াছেন—"Not the glory of the naked human form.........the noblest and most expressive of symbols; not the proud and conscious assertion of human personality: but instead of these, all thoughts that lead us out from ourselves into the universal life, hints of the infinite, whispers from secret sources—mountains, waters, mists, flowering trees, whatever tells of powers and presences mightier than ourselves, these are the themes dwelt upon, cherished and preferred."

(Painting in the Far Fast : Binyon)

অতএব বাহিরের forms সাহিত্যিকের নিকট শুধু symbols অথবা রূপকের কাজই করে। সুতরাং এই রূপকের রহস্য ভেদ করিয়া যে একটা সুমহৎ শিবসুন্দর মূর্ত্তি বিরাজমান—তাহার দর্শন না পাইলে—সাহিত্য অথবা শিল্পের প্রাণপ্রবেশই হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই একটা সুন্দর ও মনোরম দৃষ্টান্ত দিয়া অতি সহজভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কালিদাস 'তাঁহার

বিরহী যক্ষের প্রণয়বার্ত্তা প্রেরণ করাইলেন—আষাঢ়ের প্রথম দিবসের মেঘকে দিয়া। তিনি ত বসন্তের বাতাসকেও এ কার্য্যে প্রেরণ করিতে পারিতেন—বিশেষতঃ উত্তরে যাইতে হইলে দক্ষিণের বাতাসকে কিছুমাত্র উজানে যাইতে হইত না। তবে আষাঢ়ের মেঘকেই কেন বিশেষ করিয়া পছন্দ করিলেন? "ধরণীর তাপ-শান্তি, শস্যক্ষেত্রের দৈন্যনিবৃত্তি, নদী-সরোবরের কৃশতা-মোচনের উদার আশ্বাস তাহার স্নিগ্ধ নীলিমার মধ্যে যে মাখানো। মঙ্গলময় পরিপূর্ণতার গম্ভীর মাধুর্য্যে সে স্তব্ধ হইয়া থাকে।·········সে যে জগতের তাপ নিবারণ করে—সে কি শুধু প্রণয়ীর বার্ত্তা প্রণয়িণীর কানের কাছে প্রলাপিত করিবে? সে যে 'সমস্ত পথটায় নদী-গিরি-কাননের উপর বিচিত্র পূর্ণতার সঞ্চার করিতে করিতে যাইবে। কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে, ভরা নদীর জল ছল্ ছল্ করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে এবং জনপদবধূর ভ্রূ-বিলাসহীন প্রীতি-স্নিগ্ধলোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরো জুড়াইয়া যাইবে। বিরহীর বার্ত্তাপ্রেরণকে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল ব্যাপারের সঙ্গে পদে পদে গাঁথিয়া গাঁথিয়া তবে কবির সৌন্দর্য্য-রসপিপাসু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।" (রবীন্দ্রনাথ)

কালিদাস যে অকাল বসন্তর আকস্মিক উৎসবে, পুষ্পশরের মোহবর্ষণের মধ্যে হর-পার্ব্বতীর মিলনকে চূড়ান্ত না করিয়া, বেদনার তপস্যার মধ্যে তাহাদের মিলনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন আর অভিজ্ঞান-শকুন্তলের রাজদম্পতির মিলনকে বাসনার চাঞ্চল্যের এবং কামনার আঘাত আলোড়নের মধ্য হইতে আনিয়া শান্ত-সংযত চিত্তের কমনীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন—সেও শান্ত এবং মঙ্গলের মধ্যে সৌন্দর্য্যের চরম সম্পূর্ণতা দেখাইবার জন্যই। এই পরিণতিতেই সৌন্দর্য্যের সহিত মঙ্গল একাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

এই শিব সুন্দরের মিলন দেখাইয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হ'ন নাই। তিনি সত্যকেও শিবসুন্দরের সহিত identify করিয়া দিয়াছেন।

কুমার-কাব্যের তাপসী উমা শঙ্করের রূপগুণ-বয়স-বিত্তবের নিন্দা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"মমাত্র ভাবৈক রসং মনঃস্থিতম্!" ভাবের রসকেই তিনি আনন্দের চরম উপকরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, তিনি মহাদেবকে দেখিয়াছিলেন কল্যাণ দৃষ্টি দিয়া। শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে—হয়ত' অনেক খুঁত, অনেক ক্রটিই বাহির হইত। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত মানুষ যখন কল্যাণ-বুদ্ধিকে এবং সৌন্দর্য্য-বোধকে যোগ দেয়, তখন বাহিরের সকল দ্বন্দ্ব, সকল ক্রটিই একটা সুসংহত সামঞ্জস্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। প্রকৃত এবং অপ্রকৃতের এই সামঞ্জস্যই হইল "সত্যম্"। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ "ইন্দ্রিয়ের সুখকর এবং অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর এবং অমঙ্গলকর এই দু'এর ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে, তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।"

"তখন কি হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য্য।"

তাই কীট্স্ বলিয়াছেন—"Truth is beauty, beauty truth"। "উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমস্তই truth এবং সমস্তই beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্!" (রবীন্দ্রনাথ)

"সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্য্যকারণপরম্পরা সে কথা জানাইবার অন্যশাস্ত্র আছে—কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে "রসো বৈ সঃ; রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" তিনিই রস, এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।"

* * * *

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্য ও রসের গভীরতম অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহাদের মূলতত্ত্বের সন্ধান করিয়াছেন। তাই সাহিত্যের বিচার করিতে যাইয়া তিনি কখনও

রস ও সৌন্দর্য্যের এই মূল এবং প্রধান সত্তাগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। যে সাহিত্যে রসসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে সে সাহিত্যের গৌরব তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে ঘোষণা করিয়াছেন। আর যে সাহিত্যে রসসৃষ্টি সার্থক হয় নাই প্রকৃত রসিকের ন্যায় সে সাহিত্যের দোষ এবং ত্রুটি দেখাইতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাই যে রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্যধর্ম্ম" লিখিয়া তরুণের বিরাগভাজন হইলেন সেই রবীন্দ্রনাথই আবার বাংলার তরুণ সাহিত্যিকের রসসৃষ্টির শক্তির পরিচয় পাইয়া "সাহিত্যে নবত্ব" লিখিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন। এই দুইটি আপাতবিষম মতবাদ লইয়া বাংলা সাহিত্যে কত অনর্থক বাদানুবাদ হইয়া গেল! কত মিথ্যা আন্দোলনের সূত্রপাত হইল! কত অরসিক জন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচার ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন!

ঠিক এই কারণেই যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে "অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়-রবি-রশ্মি-সমুজ্জল তুষার-কিরীট"এর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন—সেই রবীন্দ্রনাথই যখন আবার "কৃষ্ণ-চরিত্রে"র সমালোচনাকালে তাঁহার দোষ ত্রুটি দেখাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ করিলেন না, তখন অনেকেই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ রসবিচারে সর্ব্বত্রই আপনার মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। "সঞ্জীবচন্দ্র" "বিহারীলাল" প্রভৃতি অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্যবিচারই তিনি করিয়াছেন। কোথাও কোন দোষত্রুটি পরিহার করিয়া আপনার নিরপেক্ষতা-চ্যুতি করেন নাই। সর্ব্বত্রই তাঁহার গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত মতবাদ অনেকে গ্রহণ করিতে না পারেন কিন্তু তাঁহার রস-বিচারে ক্ষমতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি এবং সর্ব্বোপরি অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি বাংলার সমালোচনা-সাহিত্যে যে একটা নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছে—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য—বিশেষ করিয়া কালিদাসের সাহিত্যের এত বড় সমালোচক "নভূতঃ ন ভবিষ্যতি" সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার কাব্যরসের কত বিচিত্র দ্বারই না উদ্ঘাটিত করিলেন তিনি! কত "কাব্যের উপেক্ষিতার" সন্ধান পাওয়া গেল—তাঁহার তুরীয় দৃষ্টির ভিতরে!

শুধু সংস্কৃত সাহিত্যই বা কেন বলিব? সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের সকল ধারা, সকল উৎসের সন্ধানই ত তিনি দিয়াছেন। নিরলঙ্কার গ্রাম্য সাহিত্যের রস এবং সৌন্দর্য্যও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

বস্তুতঃ সাহিত্য বিচারের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলা এবং তথা বিশ্বসাহিত্যে কত বৃহৎ দান করিলেন—তাহার পরিমাপ করিবার সময় এখনো আসে নাই। তবে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি—

"Nullum quod tetigit non ornavit"—যাহা কিছু ধরিয়াছেন—তাহাই অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়



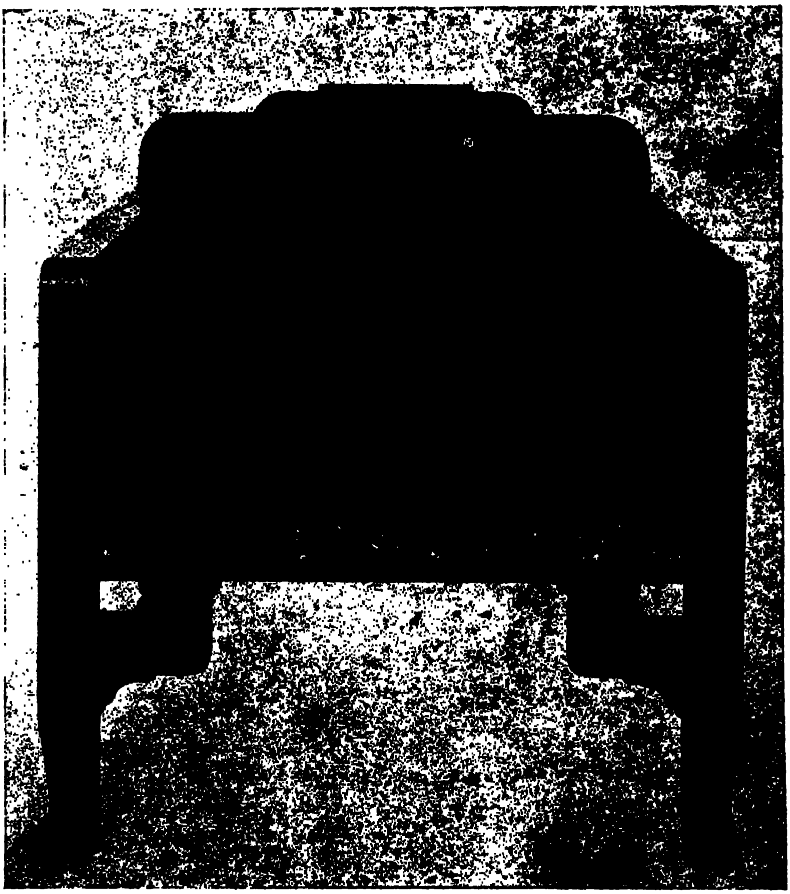
রবীন্দ্র-পরিষদের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত। লেখক প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বিঃ সঃ।



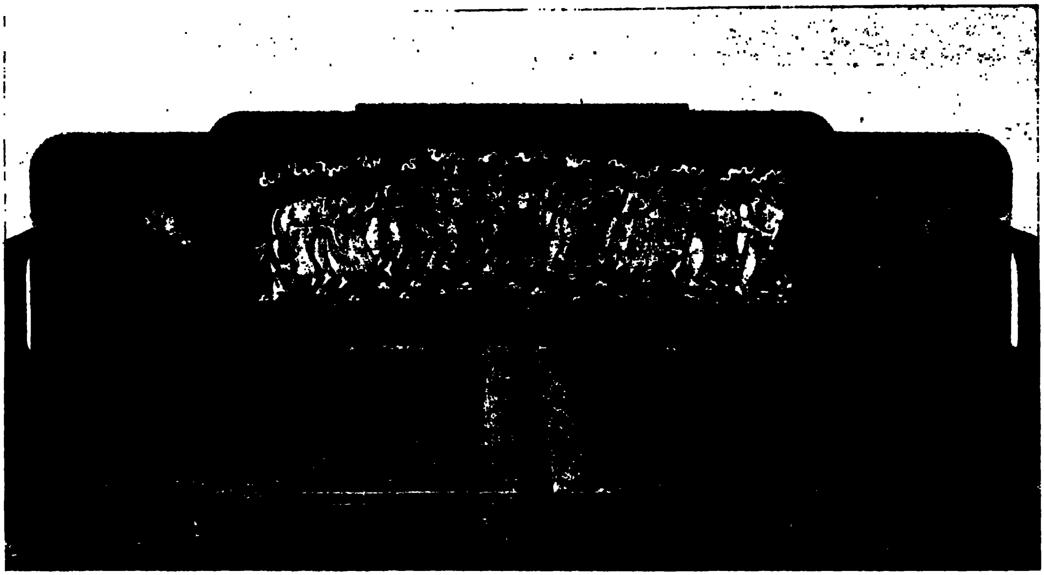
পোড়া-মাটির তৈয়ারী বুদ্ধমূর্ত্তি ও কাঠের খোদাই মণ্ডলী

পরিচয়

ইউ পি গভর্মেণ্টের নির্দ্দেশে লক্ষ্ণৌ আর্ট ও ক্রাফ্‌টস্‌ স্কুলের প্রিন্সিপাল বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের জন্য কয়েকটি আসবাব পরিকল্পনা করিয়া প্রস্তুত করান। বর্ত্তমান চিত্রশালায় আমরা সেই আসবাব-পত্রের প্রতিলিপি দিলাম। রক্ত-পাথরের তৈয়ারী হলে বিশেষভাবে মানাইবে বলিয়া শিল্পী আসবাবগুলিতে প্রধানতঃ সবুজ ও সোনালী রং-এ লাক্ষার মনোরম কাজ করাইয়াছেন। বিঃ সঃ।



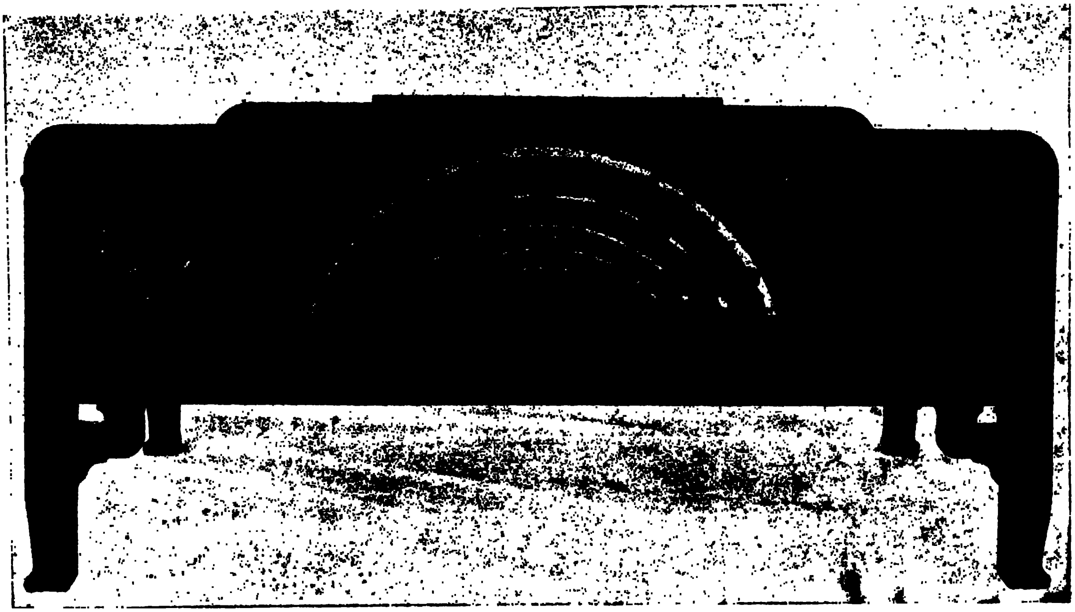
মানসীলা



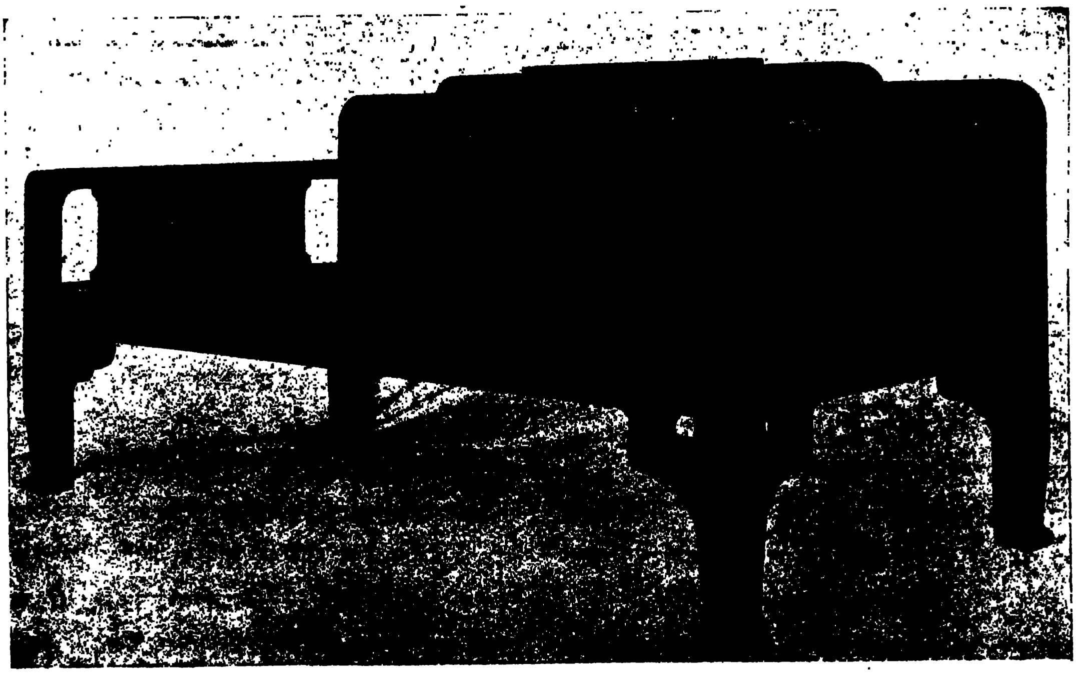
রাসলালা



মানলীলা



লীলা-কমল ও হংস-মিথুন



রাসলীলা—পার্শ্বদৃশ্য

"শ্রীকান্তে" ইন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত মুকুট রায়

সুবৃহৎ শ্রীকান্ত উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের স্থান অতীব সঙ্কীর্ণ।

ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি বহ্বারম্ভে অবতারণাপূর্ব্বক অকালে উপসংহার করাতে উপন্যাসের কোনো চরম অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াও থাকিতে পারে কিন্তু পাঠকের মনে ক্ষুব্ধ কৌতূহল প্রশমিত হয় না। সত্য বটে, গ্রন্থকারের অসমাপ্ত চরিত্র সম্পূর্ণ করিয়া লইবার সাহায্য করে পাঠকের কল্পনা, কিন্তু কেবল মুকুল দেখিয়া ফলের স্বাদ অনুমান নির্ভর করে বিভিন্ন-প্রকৃতি পাঠকের অভিরুচির উপর।

প্রথমেই লক্ষ্য করা যায়, ইন্দ্রনাথের নাই বিশ্লেষণ করিবার মতো আধুনিক-উপন্যাস-সুলভ কোন জটিল মনস্তত্ত্ব, কিন্তু অনুভব করা যায় তার প্রত্যেকটি অঙ্গের প্রবল ও প্রখর অস্তিত্ব। উপন্যাসে যে স্বল্প-পরিমিত স্থান স্বল্পকালের জন্য সে নিজের জোরে অধিকার করিয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও তাহার মহিমা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত্ত হইতে স্মরণাত্মক চিহ্নমাত্র না রাখিয়া অতিকায় উপন্যাস হইতে তাহার অকস্মাৎ অন্তর্ধান পর্য্যন্ত দেখা যায়, সমসাময়িক সকল চরিত্রগুলির বহু উর্দ্ধে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে ইন্দ্রনাথ।

মানব-চরিত্রের কোন অসাধারণত্বের জন্য ইন্দ্রনাথের এত প্রভাব নহে; কিন্তু সদ্‌গুণ বিশেষের অসদ্ভাব সত্ত্বেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা তাহার অসাধারণ।

সুসভ্য সমাজ ও উচ্চ-শিক্ষা-লভ্য উন্নত আদর্শ, উন্নত-জ্ঞান, সৎকর্ম্মে প্রেরণা, সদসদ্ বিবেচনা, পরিণত বয়সের পরিপক্ক বুদ্ধির দিক হইতে ইন্দ্রনাথকে মনে হইবে "প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।" যদি বঙ্গপল্লীর স্বচ্ছন্দবনজাত গ্রাম্যজীবনের আবহাওয়া হইতে রাজধানীর সুসজ্জ নাগরিক শিষ্টাচারের আওতায় তাহাকে স্থানান্তরিত করা যায়, নিশ্চয় সে নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে। মনে হয়, ইন্দ্রনাথকে চট্ করিয়া আনিয়া যদি কলিকাতার রাস্তায় ছাড়িয়া দেওয়া যাইত, সেই মুহূর্ত্তেই সে গাঁড়াতলার মোড়ে একলা দুইটা পকেট-মার গুণ্ডাকে ঠেঙাইয়া নিরীহ ভদ্রলোককে সমূহ বিপদ হইতে ত্রাণ করিয়া ওদিকে গিয়া কড়া বর্ম্মা চুরুট মুখে দিয়া নিশ্চিন্ত মনে 'দেলখোস্ ক্যাবিনে' চা ফরমাস করিয়াছে—যেন এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল সেটা বর্ম্মা চুরুট খাওয়ার চেয়ে একটুও উৎকট নহে। সভ্যতার প্রচলিত সুসঙ্গতির মানদণ্ডে তাহাকে পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু সেই পল্লীচিত্রের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহাকে স্থাপিত করিয়া দেখিলে, উদার বিশ্ব-প্রকৃতির স্বহস্ত-পালিত, বাধাহীন, অকুণ্ঠিত, সঙ্কোচের আড়ষ্টতাশূন্য, সাবলীল মানবশিশুর "পঞ্চরসাত্মক" চরিত্র-মাধুর্য্য যথার্থ উপলব্ধি হইবে। সকল উপাদানই তাহার অতি সাধারণ, অমার্জ্জিত, অপরিপক্ক কিন্তু তাহার সংমিশ্রণটি যেমন সরল তেমনি চমকপ্রদ যেমন উচ্ছৃঙ্খল তেমনি আত্মসমাহিত।

পালিস করা সোনার উজ্জ্বলতা বা কারুকার্য্য তাহার চরিত্রে নাই। সে খনির অসংস্কৃত আকরিক বহুমূল্য ধাতুপিণ্ড-মাত্র। সংস্কার করিলে কী দাঁড়াইত গ্রন্থকার তাহার আভাস দিয়াছেন মাত্র, ব্যক্ত করেন নাই। আকৃতি ও স্থূলত্ব দেখিয়া নিবৃত্ত হইলে তাহার চরিত্রের মূল্যবান মূলতত্ত্ব পাওয়া দুষ্কর।

শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে কোন ঔপন্যাসিক ইন্দ্রনাথের মত চরিত্র অঙ্কন করিতে চেষ্টা করেন নাই বলা যায় না। কিন্তু মধ্যবিদ্ ভদ্রসমাজের মধ্যে এইরূপ চরিত্র প্রতিষ্ঠা করিতে আর কেহ সাহস করেন নাই। সাহিত্য-সমাজে আভিজাত্যের প্রাধান্য যে-কালে ছিল, সে-কালে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিবার জন্য 'বিশ্বনাথ বা বিশুডাকাত'-কে ইতর শ্রেণী হইতে সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু এ-কালের সাহিত্যও আভি

জাত্যাভিমান ও অস্পৃশ্যতা ত্যাগ করিতেছে, কাজেই "রবিন-হুড" ও "তান্তিয়া ভীলের" বঙ্গীয় সংস্করণ ইন্দ্রনাথকে অঙ্কন করা শরচ্চন্দ্রের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে।

যে-পারিপার্শ্বিকের মধ্যে 'রবিন-হুড' ও তান্তিয়া গঠিত, সে-তুলনায় ইন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিক অপেক্ষাকৃত সহজ, লঘু ও কম কষ্টাশ্রিত। এবং বাংলার জলবায়ুতে পরিপুষ্ট ইন্দ্রনাথের চরিত্রও দৃঢ়তায় ও দুর্নীতিপরায়ণতায় তাহাদের তুলনায় সেই পরিমাণে খর্ব্ব। এই ইন্দ্রনাথ বাংলায় না জন্মিয়া, স্কটলাণ্ড বা রাজপুতানার দুর্গম গিরিসঙ্কটের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইলে ঐ দস্যুবীরদিগের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইত সন্দেহ নাই—শুধু দুর্দ্ধর্ষতায় নহে, চরিত্রের ঔদার্য্যেও। মূর্খতা ও কঠিনতার সঙ্গে কতদূর কোমলতা ও মহাপ্রাণতা থাকিতে পারে তুচ্ছ বাঙ্গালী বালক তাহার তুচ্ছ প্রমাণ নয়।

জীবনটাকে তুচ্ছ করা নয়—জীবনটাকে তুচ্ছ জানা মনের অতি অসামান্য ক্ষমতা। যথার্থ সাহসিকতার উৎপত্তি সেই ক্ষমতায়। অদৃষ্টের প্রতি অন্ধবিশ্বাস মনের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক; ইন্দ্রনাথ তাহা মনেও স্থান দেয় না বরং

"তুরঙ্গ সম অন্ধ নিয়তি
বন্ধন করি তায়,
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
ছুটায় তাহারে প্রতিকূল ঘটনায়।"

সেই অদৃষ্ট-দমন সাহসের বলে কী সমাজ, কী ভদ্রতা, কী শিষ্টাচার-বাহুল্য সভ্যতা, কী জাত্যাভিমান সমস্তই উপেক্ষা করিতে সে সমর্থ। কিন্তু কাপুরুষতাকে বরদাস্ত করিতে সে অসমর্থ। নৌকারোহণে শ্রীকান্ত বেগতিক অবস্থা দেখিয়া মৎস্য অভিযানে আর অধিক অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিলে ইন্দ্রনাথ তাহাকে 'কাপুরুষ' বলিয়া গালি দিয়াছিল—তাহার বাড়া কটূক্তি তাহার তূণে নাই। তেমনি কাহারও নির্ভীক সাহসিকতার পরিচয় পাইলে সে উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। সাপুড়িয়াদের কুটীরে যে সাপ ইন্দ্র ধরিতে সাহস করে নাই, অন্নদা দিদি অক্লেশে সেই বুনো গোখরোকে ধরিয়া আনিলে ইন্দ্রনাথ আন্তরিক আবেগে বলিয়া উঠিয়াছিল, "দিদি' তুমি যদি আমার দিদি হ'তে!"

অন্নদা দিদির প্রতি ইন্দ্রের এই শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস কেবল সাময়িক নহে। অন্নদা দিদি যেমন দেখিয়াছিল ইন্দ্র সামান্য বালক নহে, ইন্দ্রও দেখিয়াছিল অন্নদা দিদি অসামান্যা স্ত্রীলোক। একে অবলা, তায় বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে যার জন্ম, সে কি করিয়া এই চির-অনাচরিত পথের পথিক হইল—বনে জঙ্গলে, সাপের আড্ডায় মুসলমান সাপুড়ের সঙ্গে কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে যার বার মাস বাস! নিজের সৎসাহসের সঙ্গে পরিমাপ করিয়া অন্নদা দিদির সাহসকে ইন্দ্র উচ্চ আসন দিয়াছিল। বিশেষ যখন সে জানিল, অন্নদা দিদি মুসলমান ত নয়ই ব্রাহ্মণের মেয়ে, এবং সতীর সতী, পাতিব্রত্যের জন্যই যে অম্লান বদনে চিরকালের জন্য কুলত্যাগিনী নাম লইয়া নরহন্তা পাষণ্ড স্বামীর সহগামিনী হইয়াছিল তখন তাঁহার অপরিসীম দৃঢ়তা অকুতোভয়তা, ঈশ্বরে অটল-নির্ভরতা ইন্দ্রের শ্রদ্ধা প্রবলরূপে আকর্ষণ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! জলকে টানাই জলের ধর্ম্ম। উচ্চ পর্ব্বত-শিখর হইতে বেগবতী নদীকে আকর্ষণ করে বহু নিম্নে সুদূর প্রশান্ত সমুদ্র। Like draws unto like.

বাস্তবিক চুরি করিয়া মাছ খাইবার প্রতি তাহার লোভ নাই। পরের দ্রব্য অপহরণ করিবার মত নীচ প্রবৃত্তি তাহার চরিত্রে কি সম্ভব? সেই নিশা-অভিযানের সহিত জড়িত যে ভয়াবহ মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা, প্রতিপদে তাহার সহিত স্বীয় বাহুবল পরীক্ষা করিবার সুযোগের প্রতিই তাহার লোভ। ভীষণ অন্ধকার, ভীষণ নদীর পাড়ি,—ভাঙন আর খরস্রোত, শত্রুর ব্যূহ এড়াইয়া খালে প্রবেশ, শত্রুবেষ্টিত প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ দেখিয়া, তন্মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া আরো দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল পথ কাটিয়া বাহির হইতে শরীর ও মনের সকল শক্তি প্রয়োগ করিবার যে উৎকট আনন্দ, তাহার লোভ সে ছাড়িতে পারে না। কিন্তু এত কষ্ট এত বিপদ লঙ্ঘন করিয়া মৃত্যুর করাল দংষ্ট্রা হইতে যে মাছ সে ছিনাইয়া লইয়া আসে, হেলায় তাহা সে দেয় বিলাইয়া। চুরি যদি কেবল চুরি মাত্র হইত তাহা হইলে সে কখন চুরি করিত না। চুরি তাহার চক্ষে উপলক্ষ্য মাত্র, মৃত্যুর শঙ্কাহরণ বিপদ বরণের যেখানে সম্ভাবনা তাহার আহ্বান সেইখানে; সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া সে সেই দিকে

ছুটিবে। সে লুণ্ঠন করে, লুণ্ঠিত দ্রব্য ভোগ করে না। লুণ্ঠন করিয়াই তাহার আনন্দ—গ্রাস করিয়া নহে। চোরের মত চুরি বা কপটতাচরণ দেখিলে সে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিত না। তাহার মধ্যে কপটতা ছিল না; অসত্যকে সে মনে কখন স্থান দিত না। প্রতারণা করিয়া অপরকে বঞ্চনা করিতে সে কখনই পারিত না।

সর্পাঘাতের দৈব চিকিৎসা প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রনাথের নির্ব্বন্ধাতিশয্যের উত্তরে যখন অন্নদা দিদি বলিয়াছিলেন "গুপ্ত মন্ত্র কী বিষপাথর সব মিথ্যা * * * আমরা যে সাপুড়ে, ঠকানোই আমাদের ব্যবসা।" ইন্দ্রনাথ সেই কপটতার ইঙ্গিতে অধীর হইয়া গেল। এবং এত শ্রদ্ধার পাত্রী অন্নদা দিদিকেও "এই তোমাদের ব্যবসা, মিথ্যাবাদী, চোর" বলিতে সে পশ্চাৎপদ হইল না। হীনতা ও দীনতা তাহার দুই চক্ষের বিষ।

কিন্তু ভয়ের সঙ্গে ইন্দ্রনাথ চিরপরিচিত। শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ বলিত "ভয় কি রে? সেই ত মজা!" এই spirit of adventure আর chivalry অর্থাৎ বিপদকে অকুতোভয়ে স্বেচ্ছায় বরণ করিবার নেশা হইতে সাপুড়িয়াদের সঙ্গে তাহার সংশ্রব। এবং এই অদম্য সাহসের বলেই কাপুরুষ সমাজ কর্তৃক নির্য্যাতিতদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে সে সক্ষম। সমাজ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না। সে অনায়াসে যখন মৃত বালকের দেহ শৃগালকুকুরের মুখ হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গেল, শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "কোন জাতের মড়া?" ইন্দ্রনাথ হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল "মড়ার কী জাত থাকে রে!" তাহার ভাষাতেই বলা যাইতে পারে—বন্ধনলেশশূন্য ইন্দ্রের কী সমাজ থাকিতে পারে?

পরোপকার করা কর্ত্তব্য বলিয়া সে পরোপকার করে না। পরোপকারের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন সে অল্পই শুনিয়াছে। তাহার পরোপকার-প্রচেষ্টার মধ্যেও সেই spirit of adventure সতত জাগরূক। বিঘ্ন ও বিপদের গন্ধেই তাহাকে প্রলুব্ধ করে—কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য বিচার বুদ্ধির দ্বারা নহে। যুদ্ধের তপ্ত রক্ত বিপদের তাড়নায় না ফুটিয়া উঠিলে হয়ত সে শীতল শোণিতে পরোপকারের জন্য তর্জ্জনীও উত্তোলন করিত না। কী মনের কী বাহুর শক্তি যেখানে যে অবস্থায় প্রয়োজন, সেইখানেই তাহার অনুরক্তি। নয়ত সে চুরির জন্য চুরি করে না; পরোপকারের জন্য পরোপকার করে না। সে সঞ্চয় করে নিজের ভোগের জন্য নহে—পরকে বিলাইবার জন্য। ভোগে তাহার স্বার্থ নয়; ত্যাগে তাহার স্বার্থ।

"তাহার শুদ্ধ সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের উমেদারী না করিয়াই ঠিক ব্যাপারটি টের পাইত। বাস্তবিক অকপট সহজ বুদ্ধিই সংসারে চরম ও পরম বুদ্ধি।" মানুষের অতি প্রাচীন সেই অস্ত্র, অশিক্ষিত পটুত্বই তাহার জীবনোদ্যমে একমাত্র সহায়, যে জীবনকে সে কাণাকড়িরও তুল্য জ্ঞান করিত না। সে অস্ত্র অনৈতিহাসিক গুহাবাসী মনুবংশধরের (cave man) পরশু—প্রয়োগেতে যার দ্বিধা নাই, শুভাশুভের পূর্ব্বাপরপাত নাই, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নাই। অকুটিল অসন্দিগ্ধ তাহার আকর্ষণ আশুকালের প্রতি, অপ্রত্যাশিতের প্রতি, অসম্ভাব্যতার প্রতি।

বে-পরোয়া জীবনের সমাপ্তিও বে-পরোয়া! "ঘর-বাড়ী বিষয়-আশয় আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে এক বস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল আর কখন ফিরিয়া আসিল না।" গৃহকোণে মুহ্যমান অলসজীবন কি করিয়া সে কাটাইবে? সে ত ঘর ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইবেই। কার জন্য সে আপনার স্মরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইবে? পিছনের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধই বা কী? সে যে নিরুদ্দেশের যাত্রী। Spirit of adventure—নিরুদ্দেশেই তার নেশা! নয়ত ইন্দ্রনাথকে অন্নদাদিদি বলিবে কেন?—"ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্ব্বাদ করলুম বটে কিন্তু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্ব্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের চরণে তোমাকে মনে মনে সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার ক'রে নেন।" সুতরাং গ্রন্থকার অপ্রয়োজনে ইন্দ্রনাথকে গলা টিপিয়া উপসংহার করেন নাই—ঘর-ছাড়া প্রভঞ্জনকে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে মুক্তি দিয়াছেন!

শেষের চিঠিতে অন্নদা দিদি শ্রীকান্তকে লিখেছিল "আমার জন্য তোমরা দুঃখ করিও না। ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে সে জানি কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া নিরস্ত করিও।" ইন্দ্রকে অন্নদা দিদি চিনিত বলিয়াই এত তার সতর্কতা। অন্নদা দিদি যেমন জানিত সূর্য্য ওঠে পূর্ব্ব দিকে তেমনি জানিত ইন্দ্রনাথ তাহার সন্ধানে বাহির হইবেই। নদীর প্রবল বারিস্রোত যেমন ফেরানো যায় না ইন্দ্রকেও কেহ নিরস্ত করিতে পারিবে না তবু শ্রীকান্তকে তার জন্যই এত অনুরোধ! এ শুধু অন্নদা দিদির ভবিষ্যবাণী নয়; এ ধারণা ছিল তাহার অটল যে 'লক্ষ্মীমন্ত' হয়ে ঘরের কোণে থাকিবার ছেলে নয় ইন্দ্র!

কিন্তু পাঠকের ক্ষুব্ধ ব্যাকুল হৃদয় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আজিও জিজ্ঞাসা করে—কোথায় গেল ইন্দ্রনাথ? কোথায় রে! কোথায়? কোন বিভুঁই বিদেশে আজিও কী সে খুঁজিয়া ফিরিতেছে অন্নদা দিদিকে?

শ্রীমুকুট রায়

এপার ওপার

শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ, বার-এ্যাট-ল

এক

গ্রীষ্ম

বাংলা দেশের পূণ্যা নদী
চওড়া বেশী নয় ;
ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে
এঁকে বেঁকে বয়।
তারই একটি বাঁকের ধারে
পূণ্যা নদীর দখিন পারে
ছোট একটী পল্লীগ্রাম
নামটি 'চন্দ্রচর' ;
ছড়িয়ে আছে কুটিরগুলি
গ্রাম্য মাঠের পর।

ঘরখানি তার এই গ্রামেরই
পূণ্যা নদীর তীরে ;
কলাগাছের সারি দিয়ে
রেখেছে তায় ঘিরে।
হঠাৎ যদি হাওয়া বেগে
কলাগাছের পাতায় লেগে
একটু ফাঁকে তার আঙিনা
দেয় ধরা দেয় মোরে,
অমনি তারে বাঁধি আমি
আমার নয়ন ডোরে।

আমি থাকি নদীর এপার
ওপারে তার ঘর,
মাঝখানেতে পূণ্যা নদী
বইছে নিরন্তর।

যাইনি কভু ওপারে তাই,
পাড়ি দেওয়ার সাহস যে নাই ;
এপারে তাই নানানরূপে
আমার নয়ন ভরে,
ওপারের ঐ ছবিখানি
কেবল খেলা করে।

* * *

প্রথম যেদিন দেখি তারে
সেই সে শুভক্ষণ
চিরদিনই পাগল ক'রে
নাচায় আমার মন।
সে যেন এক সৃষ্টিছাড়া
হঠাৎ কেমন দিশাহারা,
প্রবল বেগে কাঁপন লেগে
যেন ক্ষণেক তরে
বিশ্ব-ভুবন দাঁড়িয়ে গেল
আমার প্রাণের পরে।

বৈশাখের এক বেলা-শেষে
সারা আকাশ ছেয়ে
থরে থরে কালো মেঘের
তুফান এ'লো বেয়ে ;
ঐ ওপারের গ্রামের পিছে
ধানের ক্ষেতের মাটির নীচে
চারিদিকেই ছড়িয়ে গেল
পূণ্যা নদীর জলে—
কালো ছায়ার পরশটুকু
সাঁতার কেটে চলে।

ব'সে আছি ক্লান্ত হিয়া
একলা নদীর কূলে,
হঠাৎ এলো বৈশাখী-ঝড়
হাজার ফণা তুলে ;
লাগল নাচন রুদ্র নাচন,
জগৎ জুড়ে মরণ বাঁচন
মাতাল হ'য়ে ধূলার পরে
এক সাথে আজ টলে ;
পাগল নাচে বাঁধন-ছেঁড়া
পুণ্যা নদীর জলে।

এমন সময় ঐ ওপারের
কলাগাছের ফাঁকে
আকুল হ'য়ে কে বেরুল
নাম ধরে কার ডাকে ;
মাঠের পরে চৌদিকে চায়,
ব্যাকুল চোখে কূল নাহি পায়,
কি যেন তার হারিয়ে গেছে
আজকে প্রলয় ঝড়ে
মণিহারা ফণীর মত
তাই সে কেমন করে।

একলা মাঠে তাহার রূপে
ঝড়ের পাগল খেলা
দেখেছিলাম বৈশাখে সেই
রুদ্র সন্ধ্যা বেলা।
যৌবনে তার লজ্জা বাঁধন
ভাঙতে হবে এই যেন পণ,
বৈশাখী-ঝড় মাতাল আজি
বাধা নাহি মানে,
সরমটুকু রাখবে না আজ
দেহের কোনখানে।

উতল হাওয়া ছুটে এসে
এলো চুলের পরে
আকুল হয়ে বারে বারে
আছাড় খেয়ে মরে ;
রঙিন সাড়ীর আঁচল নিয়ে
দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে
হঠাৎ আবার উড়িয়ে এনে
আঁচল জড়ায় গায়ে।
সোহাগ ভরে লুটিয়ে পড়ে
কভু পায়ে পায়ে।

সেই ত তারে প্রথম দেখি
সেই সে ঝড়ের রথে,
হঠাৎ এলো বেরিয়ে এলো
আমার নয়ন পথে।
কেই বা সে যে জানিনা ভাই,
নামটী তাহার জানাত নাই ;
শুধু জানি এপার ওপার
আজকে শুভক্ষণে
এক হ'য়ে যে গেল মিশে
নিবিড় আলিঙ্গনে।

তাই ত যখন মেঘ কেটেছে
সারা আকাশ ভরা
অন্ধকারের গলায় খালি
তারার মালা পরা,
মনে হ'ল ঐ ওপারে
নীরব মাঠে অন্ধকারে
কে যেন যায় হারিয়ে যাওয়া
গাভী নিয়ে ঘরে,
এপারে সে চরণ-ধ্বনি
বাজে হাওয়ার পরে।

* * *

মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের এক
স্তব্ধ দুপুর বেলা
ভুবন ভ'রে রৌদ্র খেলে
অগ্নি নিয়ে খেলা ;
আকাশ চাহে রুদ্র চাওয়া,
থেকে থেকে দমকা হাওয়া
মাঠের পরে ঘূর্ণি পাকে
গগন-পথে ওঠে
ব্যাকুল হ'য়ে ঝরা পাতা
এদিক ওদিক ছোটে।

আজ দুপুরে গ্রামখানি ঐ
অলস ঘুমে ভরা,
একটী ঘুঘু কেবল ডাকে
পরাণ উদাস করা ;
অনেক দূরে একটী গাছে
কোথায় যেন লুকিয়ে আছে,
ঘুমপাড়ানি মন্ত্র ছড়ায়
গ্রামের মাঠে মাঠে,
সেই সে মন্ত্র ছলছলিয়ে
বাজে নদীর ঘাটে।

এমন সময় চেয়ে দেখি
আমার পল্লী-প্রিয়া
সিনান তরে ঘাটে এলো
কাঁকে কলস নিয়া ;
কলসটিরে রাখল তীরে,
নামল জলে ধীরে ধীরে
সরমটুকু আড়াল করি
পূণ্যা নদীর জলে,
অঙ্গে অঙ্গে ঢেউয়ে ঢেউয়ে
কানাকানি চলে।

কভু দেখি ডুব দিল সে,
এলোচুলের রাশি
জলের উপর ছড়িয়ে গিয়ে
আপনি উঠে ভাসি।
কখনও বা দুহাত দিয়ে
দিচ্ছে জলের ঢেউ সরিয়ে,
হাতের বালার কিঙ্কিণী আর
ছলছলানি জলে
মৌন দুপুর মুখর করে
স্তব্ধ গগন-তলে।

সিনান ক'রে উঠল তীরে,
সিক্ত বসন তার
অঙ্গে অঙ্গে বইতে নারে
যৌবনেরই ভার ;
মুক্তি খেলে অঙ্গ ভরে
সারা দেহ সজাগ করে ;
হঠাৎ দেখি নয়নে তার—
আজও পড়ে মনে—
কিসের আলো উঠল কেঁপে
অতি সঙ্গোপনে।

আমায় কি সে দেখেছিল ?
আজও নাহি জানি,
নদীর ওপার বকুল তলায়
ছিলাম আমি মানি।
হঠাৎ দেখি ভিজে সাড়ী
জড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি
নীচু মুখে ত্রস্তপদে
কলসটি তার ভ'রে,
চাইল না আর এদিক ওদিক
চ'লে গেল ঘরে।

যেথায় তুমি যাওনা কেন
আড়াল ক'রে মোরে,
এবার আমি প্রাণ বেঁধেছি
তোমার আঁখি-ডোরে।
আজ দুপুরে রুদ্র সুরে
জলেস্থলে জগৎ জুড়ে
কে সন্ন্যাসী অগ্নি-তেজা
শুভ মন্ত্র পড়ে,
পুণ্য লগন গগন ভ'রে
সোনার স্বপন গড়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

উপহার

—গল্প—

শ্রীযুক্ত সতীশ রায়

এক রকমের লোক আছে তা'দের আমি মোটেই বুঝতে পারি না; তারা হচ্ছে কৃপণ। আমি যে-কোনো লোকের মত টাকা ভালবাসি আর প্রায়-সময় ভাবি যদি কেউ আমাকে এমন কিছু সম্পত্তি দিয়ে যায়, যার বারো মাসে আয় বারো হাজার টাকা তা'হলে তাই নিয়ে কি করি! কেবল টাকা জমানোর ভিতর কোনো আনন্দ আছে কি না ভেবে পাই না।

কিন্তু তুমি যদি কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে টাকা জমাও, যেমন মনে কর তুমি একখানা গরদের শাড়ী কিন্‌বে, কিংবা একদিন শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখ্‌বে তা'হলে অবশ্য টানাটানি স্বীকার করেও দু'আনা চার আনা ক'রে টাকা জমানোর ভেতর বেশ একটা আনন্দ আছে। মনে কর, কাছাকাছি কোথাও যেতে 'বাসে' না উঠে হেঁটেই গেলে, কিংবা দামী খাবার জিনিষে লোভ না ক'রে অল্প দামেরি কিন্‌লে—কিছু জমল ত!

কিন্তু এখন আমার সময়টি বেশ সুন্দর ভাবেই কাট্‌ছে, সামনের সপ্তাহে সংসার খরচটা কেমন ভাবে চালাব তারি জল্পনাকল্পনা ক'রে—হয়ত মাস ছয়েকের মধ্যে আমি টাকা পঞ্চাশ জমাতে পারব।

সেই জন্যেই গেল বছরে 'ওঁর' জন্মদিনে আমাকে বড় বেশী ভাবিয়ে তুলেছিল। ওঁর যে মোটেই কিছু দোষ নেই, তা' বলছি না; কিন্তু এটা সত্যি কথা······দেখেছি ত।······আর-কোনো স্বামীকে এত সাহায্য করতে উৎসুক কিংবা স্ত্রীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে দেখিনি। আমরা তখন সমাজের পাশের দিকের গলির একটা বাড়ীতে খান দুই ঘর নিয়ে ছিলাম। সেই সময়ে স্বামী প্রভুদের সম্বন্ধে আমার বেশ কিছু অভিজ্ঞতা হ'য়ে গিয়েছে। অনেক সময়ে দেখ্‌তাম কর্ত্তাটি বেশ আরাম ক'রে দক্ষিণের বারান্দায় ডেক-চেয়ারে ঠেস দিয়ে সিগারেট ফুঁক্‌ছেন আর নভেল পড়ছেন আর তাঁর স্ত্রী-বেচারা রান্নাঘর

তদ্বির, খাবারের জায়গা করা, রাত্রের মত চুলবাঁধা আবার খুকীকে শান্ত করা একই সময়ে এতগুলো কাজ নিয়ে একেবারে উদ্ব্যস্ত! স্বামীদেবতাটি যে স্ত্রীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে একটু দৃষ্টি দেবেন তার অবসর নেই।

কিন্তু আমার যতীনের—এঃ, নাম ক'রে ফেললুম!—আমার মত নবীনারা কেউ দোষ নেবে না জানি, কিন্তু পুরানোপন্থী যদি কেউ থাকত ক্ষমা কোর ভাই! আমারটি এ বিষয়ে বাস্তবিকই দেবতা! বলতে লজ্জা কি? অবস্থা খারাপ, ঝি-চাকর রাখ্‌তে পারি না, কিন্তু রুচিটা ত আধুনিক! খাওয়ার পর ডিশগুলো, কাঁচের গেলাসগুলো আমাকেই ধুতে হয়, আর তিনি সেগুলো ঝাড়ন দিয়ে বেশ পরিষ্কার ক'রে মুছে আলমারীতে সাজিয়ে রাখেন। যদি বলি, "ওগো শুনছ! রেখে দেও দেখি, আমি করছি!" তিনি বলেন, "কেন আমার কি হাত নেই?" বলি, "পাগল! ও কি পুরুষ মানুষের কাজ গো?"

জবাব নেই!

আফিসের ভাত সকাল সকালই রেঁধে দিতে হয়। আমার আবার কি বদ অভ্যাস!—এক এক দিন সকালে উঠ্‌তে দেরী হ'য়ে যায়। কিন্তু তাই ব'লে কেউ কি আমাকে জাগাবে? স্বপ্নেও ভেবনা। উঠে দেখি, উনানে আগুন ঠিক সময়ে পড়েছে, আঁচ হ'য়েছে, চা'র জলও কেটলিতে টগবগ ক'রে ফুটছে। আর পাশে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত মুখে উনি বল্‌ছেন, "মিনি, কোনো অসুখ করে নিত তোমার?"

তাঁর মুখের পানে সকৌতুকে কটাক্ষপাত ক'রে বলি, "অসুখ আবার কিসের?"

শুনে উনি মৃদু হেসে বলেন, "তা হ'লেই ভাল।"

কি লজ্জা আর কি জ্বালা বল ত! কি করব একে নিয়ে?

সংসারের জিনিষপত্র নিজে না কিনলে আমার পছন্দ হয় না। শনিবারে বিকেলের দিকে উনি আফিস থেকে ফিরে এলে আমি বেরুই সওদা করতে, কোনোদিন কাছাকাছি কোনো বাজারে, কোনোদিন বা নিউমার্কেটে। এসে হয়ত দেখলাম আমাদের ভাঁড়ার ঘরটি উনি বেশ সুশৃঙ্খলভাবে সাজাতে ব্যস্ত। যদি আশ্চর্য্য হওয়ার ভাণ করে গালে হাত দিয়ে বলি, "অবাক কাণ্ড! এসব হচ্ছে কি?"

হাসিমুখের জবাব আসে "কেন, ঘরের কাজ!"

হয়ত একটু কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললাম, "অনধিকার চর্চ্চা!"

উনি বল্‌লেন, "ঘর তোমার মানি, কিন্তু আশ্রিত স্বামী অতিথি, সুতরাং কাজ দু'জনার।"

এমন দেখেছ তোমরা? কাজেই বুঝতে পারছ দু'বছর ধ'রে বিবাহিত জীবনের স্বর্গসুখ ভোগ করবার পর যতীনের জন্মদিনে তাকে তার বিশেষ প্রিয় কোনো একটা জিনিস উপহার দিতে কেন আমি এত উৎসুক হ'য়ে পড়েছিলাম।

জানতাম যতীনের অনেকদিনের মনের সাধ একটা বিলিতী ছুতরের যন্ত্রের দামী বাক্স।

উনি আমাকে মাঝে মাঝে বল্‌তেন, "জান মিনি, লেসলির দোকানে যেমন দেখ্‌লাম অমনি যদি একটা ছুতরের যন্ত্রের বাক্স কিন্‌তে পারতুম!"

আমি তার আনন্দোজ্জ্বল মুখের পানে অবাক হ'য়ে তাকিয়েই হেসে ফেলি, আর বলি, "ছুতোরের যন্ত্রপাতি যখন এত ভালবাস, নিশ্চয়ই তুমি আরজন্মে ছুতোর ছিলে।"

আমার গালে দুই আঙ্গুলের টোকা দিয়ে উনি বলেন, "আর তুমি ছুতোরণী!"

সে কথায় কান না দিয়ে বলি, "এ জন্মে Mechanical Engineer হ'লে না কেন?" ওঁর হাসিভরা মুখখানা হঠাৎ আঁধার ক'রে এল, বল্লেন, "তোমাকে বিয়ে করতেই ত তাড়াতাড়ি মার্চেন্ট আফিসে ঢুকলাম!"

অভিমানে চোখে জল এল, বলে ফেল্লাম, "তুমি ত প্রাণ ভালবাস না, শুধু যন্ত্র ভালবাস!" আমার নাকটা ধ'রে একটু নেড়ে দিয়ে মৃদুহেসে উনি বল্লেন, "দুই ভালবাসি গো, দুই-ই!"

একদিন খবরের কাগজে গভর্মেণ্ট সার্প্লাস বিক্রী হ'বে ব'লে বিজ্ঞাপন বেরুল। তার মধ্যে ছিল একটি ছুতরের বাক্সের ছবি—যেমনটি যতীন বর্ণনা করেছিল, ঠিক তেমনি—দাম ৫৭।৶০। যতীনের জন্মদিনের আর তিনমাস বাকী।

আমি তখনই মন ঠিক ক'রে ফেললুম যেমন ক'রে হোক এটা ওকে ওর জন্মদিনে আমার উপহার দেওয়া চাই।

সেই দিনই আমি পাঁচ টাকা দিয়ে আমার ফণ্ড আরম্ভ করলুম। মা ও আমি একদিন নিউমার্কেটে বাজার করতে যাই, তখন তিনি আমার কাছ থেকে ঐ টাকাটা ধার নেন। হ্যাঁ, আর একটা আট-আনি—যতীনের সঙ্গে বাজি রেখে ঐ আট-আনিটা আমি একদিন জিতেছিলাম। এখন আমার মুস্কিল হ'ল টাকাটা রাখি কোথায়!

আমার দিদি আমাকে বর্ম্মাদেশের একটা সুন্দর কাঠের কৌটা উপহার দিয়েছিলেন। সেইটার কথা হঠাৎ মনে পড়ল। কৌটাটি দেখ্‌তে খুব সুন্দর, কিন্তু তার চাবীটা ভারি মজার এবং খোলা বড় মুস্কিল। বাক্সের আসল চাবীটা পেতেই দু'তিনটা কল খুলতে হয়। এবং শেষে যখন অনেক চেষ্টার পর তুমি চাবীটা পেলে তখনো বাক্স খুলবার জটিলতা যে কিছু কমল তা' মনে কোর না,—যতক্ষণ না চাবীর গর্ত্তটি খুজে বার করতে পারছ ততক্ষণ কিছুরই ঠিক নেই।

এতদিন পর্য্যন্ত এটা একটা সুন্দর অথচ অ-দরকারী জিনিষের মত আলমারীর মাথায় প'ড়ে ছিল। কিন্তু এখন বুঝতে পারলুম এতে ক'রেই আমার উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে।

যতই ভাঙা পয়সার দরকার হোক না কেন আমি যে কেবল দু'চার আনার জন্যে ঐ বর্ম্মীজ বাক্স খুলব তার আর সম্ভাবনা রইল না। এমন কি আমি প্রতিজ্ঞাও ক'রে ফেললাম যে যতীনের জন্মদিনের দু'দিন আগে ছাড়া ঐ বাক্সটা আমি খুলবই না। কত জমল রোজ না গুণে বরং একটা ছোট হিসেবের খাতা ক'রে যা' আমি বাক্সে ফেল্‌লুম তার একটা হিসেব রাখ্‌ব।

কাজেই আমার সেই পাঁচ টাকা আট আনা বাক্সের মধ্যে ফেল্‌লুম। আর বাক্সটাও আলমারীর মধ্যে রাখা গেল। উনি আমাকে ক্ষেপাবার জন্যে বল্‌লেন, "তোমার ও বাক্সটা আলমারীর মধ্যেই মানায় বেশী!" জানি, কথা বেড়ে যাবে; তাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সংক্ষেপে বললুম,—"বেশ!"

একদিন যেমনি আমি কাঠের বাক্সটা আলমারীর মধ্যে রাখ্‌তে যাব, অমনি উনি ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "মিনু, আমাদের পিসিমা এবার ১১ই মাঘে আমাদের যে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন, সেইটে আমি খরচ করব ঠিক করেছি।" আমি শুধোলাম, "কিসে?" উনি হয়ত তাঁর ছুতোরের যন্ত্র কিনবার কথা তুল্‌তে পারেন ভেবে আমার মনের মধ্যে উদ্বেগের অন্ত ছিল না, কিন্তু পরের কথায় আশ্বস্ত হলাম।

যতীন বল্‌লে, "সবিতা অলক এরা ত আমাদের কখনো থিয়েটারে কখনো বায়স্কোপে প্রায়ই নিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্চেও,—কিন্তু আমরা আর কিছুই করতে পারিনে একমাত্র রবিবারে চা খাওয়ানো ছাড়া!"

আমি বললুম, "সে কথা সত্যি!"

"আচ্ছা, ঐ টাকাটা খরচ করে আমরাও ত এদের দু' একবার নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে পারি—দু'চারবার বায়স্কোপেও নিয়ে যাওয়া যায়! আসছে রবিবার ওদের এখানে খেতে বলব' কেমন?"

সবিতা আমারি ছোট বোন। একসঙ্গে আমরা স্কুলে পড়েছিলাম। সবিতা দেখ্‌তে বড় সুন্দর, বিয়েও হ'য়েছিল এক আর্টিষ্টের সঙ্গে। বড় বংশের ছেলে কিন্তু আগে তার অবস্থা খারাপই ছিল, আজকাল বেশ ভাল—অলক আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল। আমারি মত সবিতা অলককে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল—তার টাকাকে বিয়ে করে নি! তবে একথা বলতে হ'বে যে তার কপালটা ভাল! অলকের ত বিশ্বাস যে সবিতার মত লক্ষ্মী মেয়েকে ঘরে এনেই তার অবস্থা ফিরেছে।

আনন্দে যতীনের হাতদুটি ধ'রে তার মুখের পানে হাসি-মুখ তুলে বললুম, "তুমি খুঁজে খুঁজে খুব সুন্দর মতলব বার কর কিন্তু!"

যতীন বল্লে, "তোমাকেই খুসী করতে মিনি!"

যতীনের বাঁ হাতখানা আমার কোমরে জড়িয়ে এল। আমি তার বুকে মুখ রেখে হেসে বল্‌লুম, "মুখে না বল্‌লে আমি কি বুঝতে পারি না ভাব?"

চারদিকে তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও আছে কি না, তার পর সে যা' ভালবাসে তাই তা'কে পুরস্কার দেই—সেও তার শোধ দেয়! কি বলব, হাতে হাতে, না মুখে মুখে?

আগামী রবিবারের নিমন্ত্রণের কথা আলোচনা করতে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল যে আমার মটকার ব্লাউসটা

ইঁদুরে কেটে ফেলেছে—খদ্দরের ঢাকাই শাড়ীর সঙ্গে মটকার ব্লাউস না পরলে মোটেই মানায় না যে! এদিকে যত রকম বিবিয়ানা করি না কেন, ভুলতে পারি না মটকার ব্লাউস আর খদ্দরের ঢাকাই পরাই আজকালকার ফ্যাসান!

আমার বাপের বাড়ীতে কেউ বেড়াতে এলে ছোট জামাইয়ের কথা উল্লেখ ক'রে মা গর্ব্বের সঙ্গে ব'লে থাকেন, "অলক সবিতাকে সর্ব্ব রকমে সুখে রেখেছে!"

তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতটা যে কোথায় গিয়ে বেঁধে তা' আমার অন্তর্য্যামী জানেন! অবিশ্যি, এ কথা সত্যি যে সবিতার মুখের কথা ফেলবার অপেক্ষামাত্র, অমনি হরেক রকম শাড়ী-সেমিজ-সায়া-ব্লাউসে অলক দোকান বানিয়ে ফেলতে পারে! কিন্তু, আমার সামনে ও-কথা বলার তাৎপর্য্য কি? মানুষ ত কেবল পোষাক নয়—ওটা ত মানুষের উপরের উপরের তস্য উপরের খোলস! নয় কি?

যাক্ সে কথা! নিশ্চয়ই সবিতা আমাদের নিমন্ত্রণে নূতন কিছু পরে আসবে, আর মিসেস সেন ও মিসেস মিত্র এঁরাও কম যাবে না, তখন আমার গায়ে ইঁদুর-কাটা ব্লাউসটা মোটেই মানাবে না কিন্তু! সবিতার সঙ্গে মাঝে মাঝে নিউমার্কেটে কিম্বা সিনেমায় যাবার জন্যে একটা ক্রিম কলারের ক্রেপের ব্লাউস করিয়েছিলাম। সেটা দিশি কি বিলিতী ধরবার যো নেই—সেইটেই এখন আমার একমাত্র সম্বল।

ইঁদুর-কাটা ব্লাউসটা মাপের জন্যে পুরানো খবরের কাগজে জড়াতে জড়াতে বললুম, "তুমি যদি আমার জন্যে একটা মট্‌কার ব্লাউস আন্‌তে পারতে……

যতীন কথাটা শেষ করতে দিলে না, বল্লে, "আমি যদি একবার বড়লোক হ'তে পারতুম মিনি! তা' হ'লে তোমাকে··· তোমাকে রাণীর বেশে সাজাতুম···মনের মত করে···প্রত্যেক দিন! সত্যি করে বল আমাকে আমরা গরীব বলে তোমার বড় বেশি দুঃখ কি হয়?"

আমি আবেগ ভরে যতীনের গলা জড়িয়ে ধরলুম, বললুম, "ওগো, এমন নিষ্ঠুর কথা বলে আমার মনে ব্যথা দিতে তুমি কেমন করে পারলে? কেন তুমি আমাকে এত ছোট করে দেখ? তুমি কি জান না যে তোমাকে পেতে হ'লে যদি হাজার জন্ম গরীব হ'তে হয় তাও আমি হব!"

যতীন আমাকে বাহুবেষ্টনে বন্দী করে, মৃদু হেসে, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বল্লে, "আর মিনু! তুমিও জেনো যে-কোনো শাড়ী পরে এস না কেন, আমার চোখে তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী সব চেয়ে মধুময়ী মিনু হ'য়েই থাকবে!"

এর পরের দিনগুলো আমার কাছে আশা ও আনন্দে ভরে উঠ্‌ল। জমানো টাকা খরচ করে সাজপোষাক করবার ইচ্ছে মন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিলাম। মনের মধ্যে কেবল এক ভাবনা জেগে থাকল যে যতীনকে তার জন্ম দিনে কেমন করে একটা ছুতোরের বাক্স উপহার দিতে পারব। আমি নিজের সমস্ত টুকিটাকি খরচ খরচা কমিয়ে দু'এক পয়সা করে টাকা জমাতে লাগ্‌লুম।

একটু একটু আমার সঞ্চয় ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। আমি মহিলা-সমিতি থেকে সেলাই নিই, দিন রাতের মধ্যে যখনি একটু অবসর পাই তখনি তাই নিয়ে বসি, অথচ যতীনকে জানতে দেই না। সেলাই করে যে পয়সা পাই তার কিছুই খরচ করি না। একবার যদি তুমি জমাতে আরম্ভ কর তবে খরচ কমাবার অনেক উপায় বের করতে পার এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে পয়সাও বেড়ে চলে।

প্রত্যেক শনিবারে আমি খাতায় জমা করা টাকা গুলো গুণে দেখি আর কাঠের বাক্সটা কাণের কাছে নেড়ে তার বাজনা শুনে আনন্দ পাই—হাত তুলে অনুভব করি দিন দিন কতটা করে তার ওজন বেড়ে চলেছে। আর খবরের কাগজে ছুতরের বাক্সের যে বিজ্ঞাপনটুকু কেটে যত্ন করে রেখে দিয়েছি সেটার দিকে তাকাই আর ভাবি সত্যিকার বাক্সটা খুলে যতীনের মুখ কেমন অপরূপ আনন্দে ঝলমল করে উঠবে। অবশেষে সত্যিসত্যিই এমনি দিন এল যেদিন. ৫৯।/০ আমার খাতায় জমানো হিসাবে পাওয়া সম্ভব হল। যতীনের জন্মদিনের আর দু'দিন মাত্র বাকী আছে।

রাত্রের খাবার শেষ করে যতীন বল্লে, "মিনু, আমি আমার গরম কোটটা ড্রাইং ক্লিনিং-এ দিয়ে আসি—পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরব।"

যেমনি ও চ'লে গেল, আমি আলমারিটা খুলে সেই বার্ম্মিজ কাঠের বাক্সটা বার করলুম। মনে করলুম যে, টাকাটা বের করে পরের দিনের উপহার কেনার জন্যে আমার হাত ব্যাগের মধ্যে রেখে দেব।

বাক্সটা কিন্তু আমার খুব হাল্কা মনে হল! আমি সেটা কানের কাছে তুলে নাড়া দিলাম,—মোটেই বাজল না!

তাড়াতাড়ি খুলতে যাই, অথচ খোলে না—সুতরাং বুড়ো বার্ম্মিজ কারিগর বেচারা অকারণ গাল খেল!—এই ছোট্ট বাক্সটার ভেতর এতগুলো দেরাজ আর ছিটকিনি করবার দরকার ছিল কি?

অবশেষে চাবীর গর্ত্তটা খুঁজে পেয়ে চাবী ঘোরালুম কিন্তু ডালা খুলে দেখি, সর্ব্বনাশ! বাক্সর ভিতর একেবারে শূন্য—একটি পয়সা পর্য্যন্ত নেই!

ঘরে চোর ঢুকেছিল নাকি? কিন্তু কি করে সে বাক্স খুলবার কৌশল জানবে? তবে যদি কোনো বার্ম্মিজ চোর হয় ত বলতে পারি নে!

"ও মিনি! এধারে এক মিনিটের জন্যে একবার এস দিখি নি!"

"আসছি, যতীন!"

অতি কষ্টে চোখের জল সামলে নিয়ে বাক্সটা যতশীঘ্র সম্ভব বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে দিলাম।

আমাদের শোবার ঘরের ঠিক দরজার কাছে যতীনের সঙ্গে দেখা হ'ল।—তার মুখে রহস্যপূর্ণ মৃদু হাসির আভা!

যতীন বললে, "দেখি তোমার হাতটা। আচ্ছা এইবার চোখ বোজ, তোমাকে এখনি একটা উপহার দেব। আচ্ছা, আন্দাজ কর দেখি, সে উপহার কি হ'তে পারে!"

এই কথা বলতে বলতে সে আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। আমি তেমনি চোখবুজে চলতে চলতে হাসিমুখে বললাম, "একটা চুমু!"

—"হ'ল না, আচ্ছা, আবার বল!"

—"চকোলেট!"

—"এবারো ভুল! আচ্ছা, এইবার চোখ খুলে দেখ দেখিনি!"

আমি চোখ খুলে বিছানার উপর তাকালুম, নিজের চোখকে বিশ্বাস হ'ল না। খাটের উপর একটি মট্‌কার ব্লাউজ ও একটি গরদের শাড়ী!

আমি আনন্দে অধীর হ'য়ে শুধালুম, "ওগো, এ তুমি কোথায় পেলে?"

যতীন বক্তার মত হাত নেড়ে বললে, "পৃথিবীর ভিতর সব চেয়ে শ্রমশীলা সব চেয়ে প্রিয়তমা মধুময়ী মিনুরাণীকে উপহার দিয়েছে তার অপদার্থ স্বামী,—যে স্বামী কোনো বিষয়ে মোটেই তার যোগ্য নয়!"

—"কিন্তু তুমি এত টাকা কোথায় পেলে?"

—"ও, তার জন্যে ভেব না, আজকাল আফিসে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি,—বদ্ অভ্যাস! জান ত, ডাক্তারেরা বলে বেশী তামাক খেলে বুক খারাপ হ'য়ে যায়। আর দুপুর বেলা কতকগুলো বাজারের খাবার গিলে অম্বল বাধাতেও চাই না, তাই ওটাও ছাড়তে হ'ল! কাছেই একটা চার দোকান আছে সেখানে দুপুর বেলা টিফিনের সময় এক কাপ চা' খেলেই তাজা হ'য়ে উঠি। আজকাল রোজ সকালে হেঁটেই আফিস যেতে সুরু করেছি, অনর্থক ট্রাম কোম্পানীকে পয়সা যুগিয়ে লাভ কি?"

বিস্মিত হ'য়ে বলে উঠলাম, "হেঁটে আফিস যাও?"

"কেন যাব না? খাবার পর খানিকটা করে হাঁটলে শরীর ভাল থাকে জান না? দু'আনা করে দু'বেলায় চার আনা পয়সা বেচে যায় রোজ! মিনি, প্রতিদিন পয়সা বাঁচানোর ফিকির খুঁজে বার করায় যে কি মজা আছে, তা' তুমি জান না!"

আমি গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বললুম, "তা থাকতে পারে!"

—"ভাখ্ ভাখ্ ক'রে বেড়ে ওঠে! যে বার্ম্মিজ কৌটটা দিদি আমাদের দিয়েছিলেন, সেইটেতেই আমি জমাতুম কি-না!"

"ও!"

—"হ্যাঁ, যাতে করে তার মধ্যে থেকে এক পয়সাও খরচ করবার প্রলোভন আমার না আসে! কারণ, জান ত সেটা খোলা ভারি হাঙ্গাম—"

—"তা জানি!"

—"কিন্তু তুমি একথা জান না যে আজ সকালে যখন আমি বাক্সটা খুললুম তখন তার মধ্যে যত টাকা পাব আন্দাজ করেছিলাম তার চেয়ে কত বেশিই যে পেলাম! আমি অবশ্য হিসেব রাখতাম না, কিন্তু টাকা জমাতে আরম্ভ করলে এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এত বেশি জ'মে ওঠে তা-ও জানতাম না!"

"যতীন!"

—"হ্যাঁ, এতেই বুঝতে পারছ যে, যখনি তুমি একটা ভাল কাজ করব বলে মন ঠিক কর তখন আর তোমার অসাধ্য কিছু থাকে না। তোমাকে একটা মটকার ব্লাউস কিনে দেব এই ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখ্‌লুম তার চেয়েও বেশী জমে গিয়েছে তখন সবিতাকে এখানে আসবার জন্ম সকালে ফোন করে দিলাম, তাই আজ সে সকালে আমাদের চায়ে এসেছিল! তারপর তাকে নিয়ে দোকানে গেলে পর সে এই গরদের শাড়ী আর ব্লাউস তোমার জন্তে পছন্দ ক'রে কিনেছে। আর এই জুতো সে তোমাকে উপহার দিয়েছে, আমাকে দাম দিতে দেয় নি! শাড়ীটার আলো পড়ে কেমন ঝিকমিক করছে দেখ!"

এই বলে যতীন শাড়ীটা কেনা-বেচায় দক্ষ দোকানদারের মত আমার দিকে এগিয়ে দিলে!

আমি মুখে হাসি আর চোখে জল নিয়ে যতীনকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ লুকোলুম।

যতীন আদর করে আমার পিঠে ডান চাপড়াতে চাপড়াতে বল্‌লে, "হয়েছে মিনু, এখন বোস—ওকি! বোকামনির আবার কান্না আসছে কেন? তোমাকে মটকার ব্লাউস কিনে দেব মনে ক'রে সব খরচ বাঁচিয়ে টাকা জমিয়েছি, এ আর বেশী কথা কি? কত আনন্দ পেয়েছি বলত এতে? তোমার হয়ত বিশ্বাস হ'বে না মিনু! কিন্তু যখন সবিতা একগাদা শাড়ীর ভেতর থেকে ঐটে খুঁজে বার করলে তখন আমার এত আনন্দ হচ্ছিল যে আর কি বলব? আমার স্ত্রীর জন্তে যে এমন সুন্দর শাড়ী আমি কিনে দিতে পারছি এই জেনে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছিল। নাও, এখন কান্না থামাও দেখি মিনু। আবার একি হাসিও আসছে—বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে—যেন শরতের ক্ষণিক বর্ষণের পর হঠাৎ মেঘ ঠেলে এক ঝলক কাঁচা সোণালি রোদ এসে পড়ল। চুমু খাবার মত লোভ হ'চ্ছে কিন্তু!"

"যাও, দুষ্টু!" বলে ঘাড় বেঁকিয়ে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে আমি হেসে উঠ্‌লুম।

মনটা এমন খুসীতে আর উদারতায় ভরে উঠেছিল যে, তার পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে ইচ্ছে হ'ল না। তারপর যতীন বল্‌লে, "সে শাড়ী আর ব্লাউসটা একবার পরে এস না মিনু। কেমন মানায় তোমায় তাই একবার দেখব!"

তার অনুরোধ এবারও রাখলুম। লজ্জায় দুঃখে ও আনন্দে আমার কান ও মুখ গরম হয়ে লাল হয়ে উঠল—খুব হাসিও পাচ্ছিল।

যতীন মুগ্ধ চোখে চেয়ে বল্‌লে, "দিব্যি লক্ষ্মী ঠাকরুণটির মত মানিয়েছে কিন্তু তোমাকে।"

—"আঃ তোমার ছেলেমানুষি থামাও নাগো!"

—"তুমি যেন কোন্ এক পূজারিণী তাপসী! আমার এই গরীব ঘরে তোমাকে যেন মোটেই মানায় না! আজ আমার মনে হ'চ্ছে মিনু তোমাকে বিয়ে করে তোমার উপর বড় অবিচার করেছি; এই দারিদ্র্যের মধ্যে তোমাকে টেনে আনা আমার অমার্জনীয় স্বার্থপরতা!"

আমি রাগ করে বলে উঠলুম, "ফের যদি তুমি ও সব কথা বল তা হ'লে"—"কি যে বলব তা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। যতীন বল্‌লে, "তা হ'লে যা করবে তা আর ক'রে কাজ নেই।" বলে সে পাশ ফিরে শুল।

যতীন ত ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু তার জন্মদিনে আমি কি করব ভেবে আমার পোড়া চোখে ঘুম এল না। যতীন যে জলখাবারের পয়সা বাঁচিয়ে, বাসে না চ'ড়ে, সিগারেট না খেয়ে টাকা জমিয়ে আমাকে গরদের শাড়ী কিনে দিয়েছে ভেবে মনে গর্ব্ব আর আনন্দ অনুভব করছে, সত্যি কথা বলে ওর সে ভুল ভেঙ্গে দিতে আমার মন একেবারেই সরে না।

আবার ওর জন্মদিনে দু'চার টাকা খরচ করে তা'কে যা' হো'ক একটা উপহারই বা দেই কি করে? ও জন্ত তার

কাছেও আর টাকা চাওয়া যায় না। এক মা কিংবা সবিতার কাছে টাকা ধার করে কিনতে পারি—কিন্তু ধার করে নেওয়া টাকায় ছুতরের যন্ত্রের বাক্স কিনে উপহার দিলে যতীন খুসী হ'বে না নিশ্চয়। এখন করি কি?

যতীন যখন নিজের প্রতিদিনের ছোটখাট সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে না তাকিয়ে আমার জন্তে কষ্ট করে টাকা জমিয়ে আমাকে এমন সুন্দর শাড়ী ব্লাউজ কিনে দিয়েছে—তখন তাকে নিতান্ত যা' তা' উপহার দিতে ত মোটেই আমার মন সরে না। ত্যাগ দিয়ে তৈরী ওর ঐ প্রেমের উপহারে আমার সমস্ত মন যে খুসীর জোয়ারে ভরে উঠেছে—একেবারে কানায় কানায়! সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে যতীনকে যদি একটা রুমাল দেই তা' হলেও পৃথিবীর সব চেয়ে ভাল ছুতোরের বাক্স উপহার পাওয়ার মতই খুসী হ'বে। আর এই সামান্ত উপহার পেয়ে খুসী হ'লে আমার মনে ভারি কষ্ট হবে কিন্তু! তখন এই গরদের শাড়ী পরে নিমন্ত্রণে যাবার মধ্যে কি আর কোনো আনন্দ থাকতে পারে?—আচ্ছা তোমরাই বল!

পরদিন সকালে উঠে কিন্তু একটা কথা মনে প'ড়ে গিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। যতীনকে বল্লাম, "যতীন, আমার জন্মদিনে অমন দামী আর সুন্দর উপহার তুমি আমাকে দিলে, কিন্তু আমার ত' আর তোমার মত ওরকম বর্ষার বাক্স নাই, আমি কাল তোমার জন্মদিনে কি উপহার দেব জান?"

যতীন ঔৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি দেবে?"

বল্লাম, "নিউ মার্কেটে গিয়ে তোমার জন্তে একটি শ্বেত পদ্মের তোড়া কিনে এনে তোমাকে দেব।"

যতীন হাসিমুখে বল্লে, "খুব চমৎকার উপহার, কিন্তু এর জন্তে তোমাকে কষ্ট ক'রে নিউ মার্কেটে যেতে হবে কেন মিনু? একটি গোলাপী পদ্ম বাড়িতেই আছে। তাই আমাকে দিয়ো।"

আমি বিস্মিত হ'য়ে বল্লাম, "বাড়িতে আবার গোলাপী পদ্ম কোথায় আছে?"

যতীন আমার চিবুকে হাত দিয়ে বল্লে, "আর্শির সামনে গিয়ে দাঁড়াও, তা হ'লেই দেখতে পাবে।"

একটু চুপ ক'রে থাক্লাম, তারপর বল্লাম, "তাতে তুমি খুসী হবে?"

যতীন বল্লে, "খুব! গরদের শাড়ী আর মটকার ব্লাউস পেয়ে তুমি যত খুসী হয়েছিলে তার চেয়েও বেশি!"

শুনে আমার চোখে জল এল, বললাম, "একটা ভাল ছুতোরের বাক্স পেলে যত খুসী হ'তে তত হবে কি?"

যতীন বললে, "তার চেয়েও আরো বেশি!"

মনে মনে স্থির করলাম যতীন যা বলছে তাই না হয় করা যাবে কিন্তু সে গোলাপী পদ্মকে যতীনের সামনে উপস্থিত ক'রেই নিরস্ত হব না, তার পাদপদ্মে নিবেদন করব।

শ্রীসতীশ রায়



সত্যাসত্য

শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়

৫১

এদিকে উজ্জয়িনীর যেমন বীণা ওদিকে বাদলেরও তেমনি এক বন্ধু হয়েছে। ফ্রেড্ কলিন্স্।

ফ্রেড্ কলিন্স্ কখন এসে বাদলের পাশে দাঁড়িয়েছে বাদল লক্ষ্য করেনি। বাদল একখানা নতুন বইয়ের ব্যর্থ সন্ধানে গলদঘর্ম্ম হচ্ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী যুবকটি বল্ল, "কোন বইখানি খুঁজ্ছেন জান্‌তে পারি কি ?"

বাদল বল্লে, "নিশ্চয়। Molnar's Plays."

যুবকটি উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক বল্ল, "লাইব্রেরীর এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি চুঁড়লেও ও-বই পাবেন না। অত নতুন বই এরা রাখ্‌বে কেন ?" একটু থেমে বল্ল, "কিন্তু আমি আপনাকে সংগ্রহ করে দিতে পারি। কবে চান ?"

"সম্ভব হ'লে কাল। অজস্র ধন্যবাদ।"

সেই রাত্রেই যুবকটি বাদলকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে আরো একজন কে থাকে। দু'জনে থাকায় ভাড়া কম লাগে। যে অংশে যুবকটির অধিকার বাদল সেখানে বসে বইপত্র নাড়া চাড়া কর্‌ল। কিন্তু বই দেখে টের পেল না যুবকটি কিসের ছাত্র। বেশীর ভাগ বই Art সংক্রান্ত, কিছু rare books, কিছু মনোবিজ্ঞানের বই।

বাদল জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "যদি কিছু না মনে করেন জান্‌তে পারি কি আপনি কিসের ছাত্র ?"

যুবকটী স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাস্য সহকারে বল্ল, "আপনিই আন্দাজ করুন।"

"আমি তো ভেবেই পাইনে।"

"আমি ছাত্রই নই। আমি বুক্ সেলার। এতদিন অন্যের দোকানে কাজ শিখ্‌ছিলুম, সবে নিজের দোকান খুলেছি।"

বাদল বল্ল, "হাউ ইন্টারেষ্টিং।" বাদলের কল্পনা দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল। আহা, তারও যদি একটি বইয়ের দোকান থাকত। দুনিয়ার বাছা বাছা বই সেখানে বিক্রী হতো, বই বিক্রীর অবসরে সে নিজে সেই সব বই পড়ে শেষ করত।

কলিন্স্ তাকে দোকানে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখ্‌ল। বল্ল, "যদি কোনোদিন নষ্ট করবার মতো সময় আপনার হাতে থাকে তবে আস্‌বেন আমার দোকানে। যত খুসী বই ঘাঁটবেন। তর্ক কর্‌বেন। আরো অনেকে আসেন।"

সিটি অঞ্চলে দোকান। একটা ছোট গলির একপ্রান্তে basement এর ভিতর। বাদল একদিন বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে উপস্থিত হলো। দেখ্‌লে কলিন্স্ একা বসে কাজ কর্‌ছে একটি কোণে। দু'খানা ঘরে নূতন ও পুরাতন বই সযত্নে সাজানো। কতক শেল্‌ফের উপর, কতক টেব্‌লের উপর। এ ছাড়া শো-উইণ্ডোতে কিছু টাট্‌কা বই পথিককে হাতছানি দিচ্ছে।

এক সঙ্গে অনেক বই দেখ্‌লে বাদল শোকার্ত্ত হয়। জীবন ব্যর্থ গেল, পৃথিবীর জ্ঞান সঞ্চয় প্রায় অনাস্বাদিত রইল। প্রতিদিন মানুষের জ্ঞাতব্য স্তূপাকার হয়ে চলেছে কিন্তু দিনের পরিমাণ সেই চব্বিশটি ঘণ্টা।

বাদলকে দেখে কলিন্স্—ছুটে এলো। তার হাতে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে তার কব্‌জির হাড়গুলোকে মট্‌কায় আর কি! মানুষ গ্রেট। ছ'ফুট লম্বা ষণ্ডা ছেলে, অট্টহাসিতে ছাত ফাটায়, কথা বলে যেন গাঁক গাঁক করে। বাদলেরই সমবয়সী, কিন্তু ইয়া মোটা তার হাড়, ইয়া শক্ত তার মাংস-পেশী, ইয়া চওড়া তার বুক। বাদলের কান্না পেতে লাগ্‌ল ওর সঙ্গে নিজের তুলনা ক'রে।

কলিন্স্ বল্ল, "আমার সহকারীটি গেছে তার লাঞ্চ খেতে। তাই একা। আপনার খাওয়া হয়েছে?"

বাদল বল্ল, "না।"

কলিন্স্ বল্ল, "তবে এক সঙ্গেই খেতে যাওয়া যাবে। সহকারটী ফিরলে তার উপর দোকানের ভার দিয়ে যাবো।"

কলিন্স্ বাদলকে বই পেড়ে পেড়ে দেখায়। বইয়ের ভিতরটার চেয়ে বাইরেটারই সমালোচনা করে বেশী। কারা ছেপেছে, কারা প্রকাশ করেছে, বইয়ের বাজার কেমন,—এই সব বলে। কলিন্সের অভিলাষ শুধু পুস্তক-বিক্রেতা নয় পুস্তক-প্রকাশকও হবে, নিউ ইয়র্কে থাকবে তার শাখা। বাদলের দেশে—কল্‌কাতায়—শাখা স্থাপন করতেও পারে। সবই ক্রমে ক্রমে হবে। সকলেই সামান্য থেকে আরম্ভ করে। এই দেখ না কেন Ernest Benn এককালে কী ছিলেন, আর আজ কী হয়েছেন!

কলিন্সের বাহুতে যেমন বল, প্রাণে তেমনি অভিলাষ। নিজের হাতের জোরে সে একটা জিনিষ তৈরি ক'রে তুলছে, তার ভাগ্যের বিধাতা সে নিজে। এতে তার আত্মবিশ্বাস বিকাশ পাচ্ছে। কোনো একটা বড় দোকানের বড় চাকুরে হলে এমনটি হতো না।

খেতে খেতে এই নিয়ে কলিন্সের সঙ্গে বাদলের আলোচনা। কলিন্স বল্লে, "আমার ব্যবসাকে কোনোদিন আমি লিমিটেড্ কোম্পানী হতে দেবো না। লিমিটেড্ কোম্পানী হওয়াটা ব্যবসায়ের পক্ষে চরম অবস্থা। তার পরে সে হয় টিঁকবে, নয় ভাঙ্‌বে কিন্তু বৃদ্ধি তার ঐ পর্য্যন্ত। টাকা? টাকা চাই বটে, কিন্তু তার চেয়েও যা চাই তা হচ্ছে কর্তৃত্ব। বৃদ্ধি চাই বলেই সর্ব্বময় কর্তৃত্ব চাই।"

বাদল বল্ল, "আপনি তা হলে ডেমক্রেসীতে আস্থাবান নন্ মিষ্টার কলিন্স্।"

সেভোর্‌'স ওয়েস্ট্রেসের প্রতি সম্মানবশত কলিন্স্ তার স্বভাবসিদ্ধ উদ্দাম হাসিকে অতিকষ্টে চাপ্‌ল। বল্ল, "ডেমক্রেসীর নমুনা দেখাতে পারেন?"

বাদল বল্ল, "কেন, ইংলণ্ড?"

কলিন্স্ আবার হাসি চাপ্‌ল। চাপাহাসি মুখের এক স্থানে বাধা পেয়ে মুখের সর্ব্বত্র চারিয়ে গেল। বল্ল, "ওটা আগে ছিল ছদ্মবেশী অলিগার্কী, এখন ছদ্মবেশী ব্যুরোক্রেসী। কন্‌সারভেটিব বলুন, লিবারল বলুন, লেবার বলুন যেই রাজত্ব করুক না কেন ইংলণ্ডের শাসনযন্ত্র যেমন চল্‌ছে তেমনি চল্‌তে থাকবে। আমার মতো উচ্চাভিলাষী লোক পলিটিক্সে গিয়ে বড় জোর ঠুঁটো প্রাইম মিনিষ্টার হতো। তাতে আমোদ নেই, মিষ্টার সেন। আমোদ আছে তার আলফ্রেড্ মণ্ড্ হওয়ায়। ব্যবসায় জগতের মুসোলিনী হওয়ায়।"

বাদল চিন্তা করতে লাগ্‌ল।

কলিন্স্ বল্ল, "এদেশের পলিটিক্স এদেশের সর্ব্বনাশ করেছে। এর মঙ্গল এর পলিটিক্সে নেই। জনকতক বড় ইকনমিষ্ট, বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় বিজ্‌নেস্ আইডিয়ালিষ্ট্—যেমন মণ্ড্—এরাই একজোট হয়ে এ দেশকে বাঁচাতে পারে। নান্য পন্থাঃ।"

বাদল বল্ল, "কেন অমন কথা বল্লেন ওর কৈফিয়ৎ দিন্ মিষ্টার কলিন্স্।"

কলিন্স্ তার প্রিয় খাদ্য রোষ্ট বীফ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। উত্তর করল না। কিন্তু বোঝা গেল কী একটা বল্‌তে তার মন আঁকু-পাঁকু করছে।

বাদল সেই সুযোগে আরো একটি প্রশ্ন করল। বল্ল, "অমন করে একটা প্রথম শ্রেণীর শক্তিকে ক'বছর বাঁচিয়ে রাখা যায়; ইটালীর কথা আলাদা, ইটালী একটা বাজে নেশন, তাকে না করে কেউ ভয় না করে কেউ ভক্তি।"

কলিন্স্ এতক্ষণে মুক্তকণ্ঠ হয়েছিল। বল্ল, "কিন্তু ইটালীর শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা যে অসীম। বড় ইকনমিষ্ট বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় বড় আদর্শবাদী বণিক যদি ইটালীর জোটে তবে কোনো ব্যুরোক্রেসী তাদের পদে পদে হোঁচট্ খাওয়াবে না। যদি আমাদের ভাগ্যে জোটে—জুটেছে আমাদের ভাগ্যে—তবে আমাদের শাসনযন্ত্র হবে তাদের প্রতি-কূল। আর এদেশে যে-সব রাজ-নৈতিক দল আছে তারা যেমন নির্ব্বোধ তেমনি কল্পনাকুণ্ঠিত এবং মেয়েমানুষের মতো হিংসুটে।" এই বলে সে হাস্যবিদীর্ণ হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে থেমে গেল।

নারীনিন্দা শুনে বাদল বিরক্ত হয়ে চুপ করল।

৫২

কলিন্স মোটা গলায় গাঁক গাঁক ক'রে গান কর্‌তে কর্‌তে কাজ করে। বাদল তার পাশের চেয়ারে বসে বই পড়ে। ইচ্ছা করে কলিন্সের মতো কাজের লোক হয়, কিন্তু দু'একদিন সখের শিক্ষানবিশী ক'রে দেখ্‌ল দোকানদারীতে মন লাগ্‌ছে না, বই পড়ার নেশা দুর্ব্বার হচ্ছে। ময়রার দোকানে কাজ শিখ্‌তে গেলে বাদল বোধ হয় চুরি ক'রে মিষ্টান্ন ধ্বংস কর্‌ত। কোনো সত্যিকারের ময়রা তা করে না।

বাদল বই পড়ে আর থেকে থেকে তর্ক করে। কলিন্স্ চতুর ব্যবসাদার, তার দোকানের আগন্তুকদের সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। তাঁরা বই কিনুন বা না কিনুন প'ড়ে দেখুন। প'ড়ে তর্ক করুন, গল্প করুন, চা খা'ন। কলিন্স্ সবাইকে এ কথা ব'লে রেখেছে। নষ্ট কর্‌বার মতো সময় যাঁর হাতে থাকে তিনিই একবার কলিন্সের দোকান হ'য়ে যা'ন্। তাঁদের কেউ বা প্রোফেসার, কেউ বা ব্যাঙ্কের কেরাণী, কেউ ছাত্র। কলিন্সের ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে কেউ তাকে ধাপ্পা দেবার কথা মনে আনেন না। কারণ একবার ধাপ্পা দিলে দ্বিতীয়বার মুখ দেখাতে পারবেন না, তাতে নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়।

কলিন্সের দোকান যেন জনকয়েক বন্ধুর যৌথ দোকান। এঁরা মূলধন খাটান নি, লভ্যাংশও পা'ন্ না। কিন্তু এঁরা বই কেনার উপলক্ষে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন সেটার বহু গুণ ফিরে পা'ন বিনা মূল্যে আরো অনেক বই পড়্‌তে পাওয়ায় এবং দশজনে মিলে চিন্তা-বিনিময় করায়। কলিন্স্ সবাইকে খুলে ব'লে রেখেছে, "আপনারা এখানে যে টাকাটা খরচ করেন সেটার থেকে দোকানের খরচা ও দোকানদারের মজুরি বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে আমি আরো বই কিনি, বইগুলিকে আরো বেশী জায়গা দিই এবং আপনাদের আরামের জন্যে আরো ভালো বন্দোবস্ত করি। দোকানটি বাড়্‌তে থাকুক এই আমার কামনা; সেই সঙ্গে আমিও যেন বেচারা অনাহারে না মরি।"

কাজেই দোকানটির প্রতি সকলেরই বিশেষ মমতা। একবার এসে কেউ খালি হাতে ফিরে যান না, বড় একটা। অন্তত একখানা বই কি পত্রিকা কেনেন। কতকগুলি বাঁধা খরিদ্দার থাকায় কলিন্সের দোকান এই অল্প দিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সে আরো মূলধন খাটাতে ইচ্ছুক, কিন্তু পরের কাছ থেকে সংগ্রহ কর্‌লে পাছে পরের মুরুব্বিয়ানা সহ্য কর্‌তে হয় সেইজন্য মনের মতো অংশীদারের প্রতীক্ষা কর্‌ছে। সে চায় তারই মতো বিজ্‌নেস্ আইডিয়ালিষ্ট, যে মানুষ নিজের স্বার্থের চেয়ে দোকানের স্বার্থকে বড় কর্‌বে।

বাদলের যদি টাকা থাক্‌ত তবে বাদল কলিন্সের অংশীদার হতো। কিন্তু এখনো সে তার বাবার গলগ্রহ। এজন্যে তার মাঝে মাঝে গ্লানি বোধ হয়। তখন সে কি কর্‌বে ভেবে কাতর হয়, কিন্তু লজ্জার খাতিরে সুধীদাকে বল্‌তে পারে না, পাছে সুধীদা বাবাকে জানায়। অনু-শোচনায় খাওয়া বন্ধ করে, কিন্তু না খেয়ে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারে না। একবেলা কিছু না খেলে অন্যবেলা দু'গুণ খায়! মনকে বোঝায়, ধার নিচ্ছি বৈ তো নয়। বাবার টাকার পাই পয়সা হিসাব ক'রে বাবাকে ফিরিয়ে দেবো, সাথে সুদ। তিনি যদি না নেন তো তাঁর নামে একটা লাইব্রেরী করে দেবো। এই ভেবে সে হিসাব কর্‌তে বসে অদ্যাবধি তার বাবা তার দরুণ কত খরচ করেছেন। জন্মদিন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত মাসে গড়পড়তা পঞ্চাশ টাকা করে ধরা যাক্। তা হলে দাঁড়ায় বিলেত আসার পূর্ব্বাহ্ন অবধি মোট বারো হাজার টাকা। মাঝখানে কয়েক বছর সে স্কলারশিপ পেয়েছে। সেটা না হয় বাদ দেওয়া গেল। তারপর আসার খরচ ও আসার পর থেকে একুনে আঠার হাজার টাকা। সর্ব্বমোট ত্রিশ হাজার টাকা। compound interest হিসাব কর্‌বার মতো ধৈর্য্য বাদলের ছিল না। আচ্ছা, দশ হাজার টাকাই না হয় সুদ বলে দেওয়া গেল। তা হলে দাঁড়ায় চল্লিশ হাজার টাকা। এখনকার বিনিময়ের হারে তিন হাজার পাউণ্ড। ভবিষ্যতে যদি এই বিনিময় হার টেকে তবে বার্ষিক তিন হাজার পাউণ্ড তার আয়

ব্যারিষ্টারের এক বছরের আয় থেকে শোধ করে দেওয়া সম্ভব।

অপাতত কলিন্সের ব্যবসায় মূলধন চালাতে হলে বাবাকে বিরক্ত করতে হয়। একে তো ভারতবর্ষীয় মূলধন "লাজুক"। তা ছাড়া ভারতবর্ষ নিজেই এখন মূলধনের অল্পতার কষ্ট পাচ্ছে, ঘরের মূলধন বাইরে পাঠালে নিজের প্রতি অন্যায় করবে। ভারতবর্ষের প্রতি বাদলের দরদ অকৃত্রিম। তবু সে সরকার বলে, "আপনি মশাই ভারতবর্ষের কেউ নন্। ভারতবর্ষের electrification ইত্যাদির জন্যে মাথা ঘামান কেন? সেটা আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে বলে?"

বাদলকে ওরা ইচ্ছা ক'রে ভুল বোঝে। ক্যাপার। ব্যঙ্গ করে। বলে, "শাসিতের দল ছেড়ে শাসকের দলে ভর্তি হয়ে অনেক সুবিধা আছে, সেন সাহেব। কিন্তু তাতে নূতনত্ব নেই। বছর পঞ্চাশ আগে জন্মালে বাহবা পেতেন। কিন্তু এটা গান্ধী-যুগ। এযুগে স্বয়ং সাদা চামড়ার অধিকারী অধিকারিণীরা ভারতীয় হতে পারলে ধন্য হয়।"

বাদল যত বলে, "আমি ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে ইংরেজ হচ্ছিনে, গভীরতম অভিরুচি থেকে হচ্ছি" ওরা ততই ক্যাপার। বলে, "যদি বুলগেরিয়ান হতেন, হাঙ্গেরিয়ান হতেন, চেক্ হতেন তবে প্রমাণ হতো গভীরতম অভিরুচি বটে।"

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকা-ফেরৎ বাঙালী ছাত্র ছিল। সে বলে, "সেন সাহেব কিন্তু ঘোড়দৌড়ের দিনে ভুল ঘোড়ার উপর বাজী রাখ্ছেন। ইংলণ্ডের ভবিষ্যত অন্ধকার। একে একে নিবিছে দেউটি। আর পঞ্চাশ বছর পরে ইংলণ্ড হবে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি। সময় থাকতে আমেরিকান হ'ন, মিষ্টার সেন। তা যদি না পারেন, তবে রাশিয়ান।"

বাদল তাদের বিশ্বাস করাতে পারে না যে তার ইংলণ্ড প্রীতির হেতু আর যাই হোক এটা নয় যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের মালিক কিম্বা পৃথিবীর সেরা নেশন। ইংলণ্ড যদি কাল ভারতবর্ষের অধীন হয় তা হলেও সে ইংরেজ রইবে। Lafcadio Hearn যে কারণে জাপানী সেও সেই কারণে ইংরেজ। সেই কারণটি হচ্ছে মনের পক্ষপাত।

কলিন্সের সঙ্গেও তার এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। কলিন্স বলে, "ইংলণ্ডে বহু বিদেশী বাসা বেঁধেছে—ইহুদী, আর্মিনিয়ান, গ্রীক, রাশিয়ান, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান। গত শতাব্দীতে যতগুলো বিপ্লব হয়ে গেছে ইউরোপের নানা দেশে, তার প্রত্যেকটাতে কিছু না কিছু পলাতক ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছে ও অবশেষে ইংরেজ হয়ে গেছে। এই শতাব্দীতে হলো রাশিয়ার বিপ্লব, ইংলণ্ডে আজ রাশিয়ান শরণাগত বহু সহস্র। ভারতবর্ষেও একটা বিপর্য্যয় অনিবার্য্য, ভারতবর্ষ থেকেও দলে দলে পলাতক আসবে এবং তাদের আশ্রয় দিতে আমরা ধর্ম্মত বাধ্য।"

বাদল মর্ম্মাহত হয়ে বলে, "কিন্তু আমি তো পলাতক নই, আশ্রয় চাইনে। আমি প্রেমিক, আমি চাই গৃহ। ভারতবর্ষে থেকে আমি কর্ম্মী ও নেতা হতে পারতুম, এখনো ফিরে গিয়ে হতে পারি। কিন্তু ওতে আমার তৃপ্তি হবে না। আমি থাকব সভ্যজগতের কেন্দ্রস্থলীতে। আমি বাসিন্দা হবো সেইখানকার যেখান থেকে ও যেখানে এসে চিন্তা ও কর্ম্মের বিশ্বব্যাপী প্রবাহ আরব্ধ ও অবসিত হচ্ছে। জীবনের প্রতি আমার মনোভাব ইংরেজের মনোভাবের সদৃশ। তাই আমি ইংরেজ।"

কলিন্স রসিকতা করে বলে; সাবাস্। কিন্তু আমাদের এই খেয়ালী ওয়েদারকে বরদাস্ত না করতে পেরে শেষকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কোরো না, সেন।"

৫৩

কলিন্সের দোকানকে যাঁরা অনবরত যাতায়তের দ্বারা আপনার করে নিয়েছেন তেমন অনেকের সঙ্গে বাদলের পরিচয় হলো। আলাপের একটা বাঁধিগৎ এই যে, "ইংলণ্ড আপনার কেমন লাগ্ছে?" এই প্রশ্নের উত্তর বাদল এক এক জনকে এক এক রকম দেয়। নীচে শুধু বাদলের উত্তরগুলিই দেওয়া গেল।

"ভালো লাগ্ছে কি মন্দ লাগ্ছে ও কথা বল্লে সম্যা-

সরি রায় দেওয়া হয়। তাই আমি একটু বিশদভাবেই বিচারফল বলবো। ইংলণ্ডের মানুষ ছুটে চলে, তাদের সঙ্গে অবিশ্রান্ত ছুটতে ছুটতে আমার দেহের ভারকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়েছে, আমার দেহযন্ত্রের ব্যালান্স হয়েছে অন্তরকম। তাই এখন ইংলণ্ড. ইংলণ্ডের মতো লাগ্‌ছে এবং আমাকে লাগছে ইংরেজের মতো।" (কলিন্‌স্‌ টেব্‌ল চাপ্‌ড়ে বল্ল "হিয়ার হিয়ার"।)

"ইংলণ্ডের শীতটাকে বৃষ্টিটাকে কুয়াশাটাকে আমি উৎসাহের সঙ্গে নিয়েছি। এই নিয়ে যখন ঘর করতে হবে তখন খুঁৎ খুঁৎ করাটা ছেলেমানুষী। নয় কি, মিষ্টার ওয়েণ্ডড্‌?"

"ভদ্রতার খাতিরে বল্‌তে হয় ভালো লাগ্‌ছে, কিন্তু আসলে ভালো লাগা বলে কোনো জিনিষ থাক্‌তে পারে না।" (মিষ্টার মিল্‌ফোর্ড ভুরু কপালে তুল্‌লেন।) "লোকে যখন অন্তর থেকে বলে, এদেশ ভালো লাগছে, তখন ধরে নিতে হয় দেশের আবহাওয়ায় বক্তার শরীর ভালো থাক্‌ছে, হজম ভালো হচ্ছে, ঘুম ভালো হচ্ছে, দেশের মানুষের সঙ্গে বন্ধুতা হচ্ছে, দেশের শিল্পসম্পদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনে ধর্‌ছে। এই যদি হয় ভালো লাগার সংজ্ঞা তবে আমার নিছক ভালো লাগ্‌ছে না—অন্তর থেকে বল্‌ছি।" (মিষ্টার মিলফোর্ড সহানুভূতিদ্যোতক ঘাড় নাড়লেন।) "কিন্তু আসলে ভালো লাগা বলে কোনো জিনিষ আছে কি?" (মিলফোর্ড মশাই দুই কাঁধ তুলে shrug কর্‌লেন।) "মনের কথা স্পষ্ট করে বোঝাতে পার্‌ছিনে, মিষ্টার মিল্‌ফোর্ড, কিন্তু আমার কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে রকম মনে হয় ভালো লাগা মন্দ লাগা বলে কিছু নেই, আছে সত্য লাগা মিথ্যা লাগা। ইংলণ্ডকে সত্য লাগ্‌ছে অর্থাৎ ইংলণ্ডকে ইংলণ্ডের মতো লাগছে। পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা নেই।"

"হাস্‌ছেন, মিষ্টার ডসন?" (মিষ্টার ডসনের প্রতিবাদ—"বিদ্রূপের হাসি নয়, মিষ্টার সেন। আমি অভয় দিচ্ছি, আপনি বলে যান্‌। আপনার কথায় মৌলিকত্ব আছে।") "দেখুন, প্রত্যেক ফলের যেমন একটি নিজস্ব স্বাদ প্রত্যেক ফুলের যেমন একটি নিজস্ব গন্ধ প্রত্যেক দেশের তেমনি একটি নিজস্ব অনুভূতি। দেশটাকে ইংলণ্ড-ইংলণ্ড লাগছে। এই বলে মোটামুটি বলা হয়। এটা হয় তো খুবই মামুলি শোনাবে। কিন্তু আমি বল্‌ছি নিজের উপলব্ধি থেকে। অনেক কিছু ভালো লাগছে, অনেক জিনিষ ভালো লাগছে না বলে ভালো লাগাতে চেষ্টা কর্‌ছি, নতুন লাগছে কতক বিষয়, কতক বিষয় সার্ব্বভৌম। তবু ইংলণ্ডে থাকার একটি বিশেষ অনুভূতি আছে যা তার নিকটস্থ ফ্রান্সে থেকে নেই।" (ডসন কৌতুক হাস্য কর্‌লেন।) "ফ্রান্সের সঙ্গে আমার পরিচয় অত্যল্প। তবু ফ্রান্সে থাক্‌লে আমার রক্ত আরেক তালে নাচে।"

"ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমরা ছোটবেলা থেকে খোঁজ খবর রাখি, মিষ্টার মোরল্যাণ্ড। একটু বেশী করেই খোঁজ রাখি, কেননা ইংরেজী ভাষা ও ইংলণ্ডের ইতিহাস আমাদের বিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য।" ("সত্যি?"—খাঁটি বিস্ময়ের সুর।) "সত্যি। কিন্তু ইংলণ্ড সম্বন্ধে এত খোঁজ খবর রেখেও যখন ইংলণ্ডে আসি তখন পদে পদে অবাক্‌ হয়ে যাই। বই কাগজ থেকে একটা দেশের কতটুকু জানা যায়? গোলাপ জল থেকে গোলাপের বাগান অনুমান কর্‌তে পারেন? আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য। তবু ভারতবর্ষের অনেকের ধারণা অধ্যবসায়ের সহিত ইংরেজী বল্‌তে কইতে পারলে ইংরেজী পোষাক পর্‌লে ও ইংরেজী কেতা দুরস্ত হলে ইংরেজ হওয়া যায়।("বটে?") "বটে। ওরা বোঝে না যে ইংলণ্ডের বাইরে ইংরেজ নেই। ইংলণ্ডের বাইরে গেলে জন্ম-ইংরেজেরও স্বভাব বদলায়। এটা বায়োলজী দিয়ে বোঝানো যায়। আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে নিতে এক আর হয়ে ওঠে।"

"আচ্ছা সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ইংলণ্ড আমার কেমন লাগ্‌ছে। আমি ভাব্‌ছি প্রত্যাবর্ত্তনের জিজ্ঞাসা কর্‌বো আমাকে ইংলণ্ডের কেমন লাগ্‌ছে।" (হাস্য।) "বাস্তবিক, আমারও জান্‌তে ইচ্ছা করে আমাকে পেয়ে ইংলণ্ডের বিরাট হৃদয়ে ঈষৎ আনন্দের আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে কিনা। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি পাগল। না মিষ্টার—" ("সেমুর-হিক্‌স্‌।" না, না, তা কেন ভাববো?") হয়তো ভাবছেন লোকটা funny, কিন্তু আমার ধারণাই ঐ।" ("মন্দ কী?")

কারো সঙ্গে আলাপ হলেই এই জাতীয় কয়েকটা প্রশ্নের জন্যে তৈরি থাক্‌তে হয়। বাদল আগে থেকে উত্তর বানিয়ে রাখে। তাই উত্তরের অভাবে অপ্রস্তুত বা উত্তরের মামুলিত্বের দরুণ অবহেলিত হয় না। বাদলের সঙ্গে যেই আলাপ করে সেই সশ্রদ্ধ বা সোৎসুক হয়। কেউ মুখ ফুটে জানায়, তারি চমৎকৃত হলুম, কেউ বা তাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে বা রেস্তোরাঁতে। এই সব আলাপের উত্তেজনায় বাদলকে স্থির হয়ে জোরে বস্‌তে দেয় না, সে সারাক্ষণ ভঙ্গী বদল করতে থাকে।

সে অন্যমনস্ক হ'য়ে বাড়ী যায়, ভুল ট্রেনে চাপে, টিকিট কিনে রেজকি নিতে ভুলে যায়। রাত্রে তার ঘুম আসে না, শুয়ে শুয়ে কথাবার্ত্তায় জাবর কাটে। কী বল্‌তে কী বলেছে, আরো কী বলা উচিত ছিল, কেমন ক'রে বল্লে আরো impressive হতো, আরেকবার দেখা হলে কোন কোন ভঙ্গী সংশোধন করবে। বাদলের স্মৃতি যেন গ্রামোফোনের রেকর্ড। বাদল ঐ রেকর্ড বারবার বাজায়। সঙ্গীতের দাপটে ঘুম ফেরার হয়। অনেক সাধ্য সাধনা করলে ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসে, কিন্তু এমনি নিষ্ঠুর মিসেস্ উইল্‌স্ যে ঠিক সাড়ে আটটার সময় তাঁর ব্রেক্‌ফাষ্ট টেবিলে বাদলকে হাজিরা দিতে হবেই।

কাজেই এত বড় বিলাতপ্রেমিকের শরীর বিলাতে সাম্‌ছে না। এমন একটাও দিন যায় না যেদিন সকালে উঠে তার বোধ হয় যে বেশ পরিতৃপ্তির সহিত ঘুমিয়েছি। অসন্তোষে তার দিনের আরম্ভ। সারাদিন ঘুম পায়, হাই ওঠে, অথচ ঘুমবার না থাকে সময় না থাকে অনুকূল অবস্থা। শীতে হাত পা জমে যায়, কান জ্বালা করে, নাক লাল হয়—এমনি ইংলণ্ডের শীতকাল। তদুপরি অবিশ্রাম বৃষ্টি, সন্নিপাত রোগীর মতো আকাশ। দিনে সময় পাক্‌লেও বিছানায় যেতে প্রবৃত্তি হয় না, বিছানা যে বরফ জলের মতো ঠাণ্ডা। রাত্রে হট্‌ওয়াটার বটলে হাত পা সেঁকে শুতে হয়। তবু যদি দেশের শীতকালের মতো আরাম হতো। ভারতবর্ষের আর কিছু না মনে পড়ুক শীতকালের [illegible] সোফায় [illegible] পড়ে।

শীতে অসাড় শরীরটাকে চাঙ্গা করবার জন্যে ইংরেজ তরুণরা ঐ বৃষ্টির মধ্যেও ফুটপাথে ফুটপাথে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করে, তাতে তাদের শরীরও মজবুৎ হয়। ওদের মতো গেঞ্জি-ও-হাফপ্যান্ট-পরা গায় রবারের জুতো-পরা পায় ছুটোছুটি করতে বাদলেরও সাধ যায়, কিন্তু লজ্জা করে। গুরু ও ভারি ওভারকোটটা বইতে বইতে বাদল রোজ কিছুক্ষণ হাঁটে, জোরে হাঁটে। জোরে হাঁট্‌লেই তার মননক্রিয়াও দ্রুত হয়। আবার, তার মননক্রিয়া দ্রুত হলেই সে জোরে হাঁটে। তবু মনের সঙ্গে চরণের ঘনিষ্ঠতায় ফল শরীর পায় না। অর্থাৎ দু'বেলা হাঁটলে অন্যের শরীর চালনা হয়, বাদলের হয় মনের চালনা।

৫৪

দিবারাত্র একটা অনবচ্ছিন্ন উত্তেজনার মধ্যে বাস করতে করতে বাদল সুধীকে ভুল্‌ল। সাতদিনে একবারও দেখা হয় না। সুধী ফোন করলে অন্যে ফোন ধরে, বাদল বাড়ী থাকে না। বাদল ফোন করলে কেবল বলে নতুন কার সঙ্গে আলাপ হলো ও তাঁর সঙ্গে কী নিয়ে তর্ক হয়ে গেলো। এতে সুধীর সন্তোষ হয় না। সে বাদলকে আরো গভীর ভাবে জান্‌তে ও পেতে চায়।

আগের মতোই সে বন্ধু-বৎসল আছে, দিনান্তে অন্তত একবার তার বাদলকে মনে পড়ে। বাদল আজ কী করল কী ভাব্‌লে কী ভাবে দিনটির ও নিজের পরিচয় পেল—বাদলকে শুধাতে চায়, পাট্‌নার মতো। বেশীদিন আগের কথা তো নয় যখন তারা পরস্পরকে নিজ নিজ জীবনের নূতনতম উপলব্ধির অংশ দিত। তখনকার দিনে তাদের জীবনে ঘরা ছিল না, দু'বেলা নব নব অতিথির আকস্মিক আগমন ঘটত না, তাদের জগতের লোক সংখ্যা ছিল মাত্র দুই। বিলাতে এসে সুধী নিজের জগৎকে জনবহুল করে নি; তার পরিচিত ও আলাপী সংখ্যা একাধিক হলেও তার বন্ধু [illegible] ছিল সেটিও আর নেই। [illegible] কথা [illegible] [illegible] হয়ে মনকে [illegible] করে [illegible] [illegible] চিঠি লিখে [illegible]। [illegible] হয় না।

বাদলকে একদিন সুধী বহুকষ্টে পাকড়াও করল। সুধী জানত বাদল রবিবারে বেলা করে ওঠে। বাদলের বাড়ীর কাউকে খবর না দিয়ে সুধী এক রবিবারের সকালে সোজা গিয়ে বেল টিপ্‌ল। উইলস্‌রা ঐ দিনটা একটু বাদসাহী ধরণে ঘুমায়, ওদের ঘুম ভাঙ্‌ল না। বেচারা বাদল তার ভাঙা ঘুম জোড়া লাগ্‌বে এই আশায় একটা পুরাণো স্বপ্নের উপসংহার রচনা কর্‌ছিল, অগত্যা সেই অপ্রসন্ন মনে নীচে নেমে এলো।

"তুমি!"

"চিন্‌তে পেরেছিস্ এই যথেষ্ট।"

"কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।"

"তা হোক্, আজ দিন্‌টা পরিষ্কার। আয়, বাসের মাথায় চ'ড়ে সহর বেড়াই।"

ওটা একটা নতুন আইডিয়া। বাদল উৎসাহের সঙ্গে রাজি হলো। কিন্তু মিসেস্ উইল্‌সের যখন ডাক পড়্‌বে তখন অনুপস্থিত থাক্‌লে যে মুস্কিল। সুধীর পরামর্শ অনুসারে বাদল মিসেস্ উইলস্‌কে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেল।

যে দিকে খুসী সে দিকে যাবে, যতক্ষণ খুসী ততক্ষণ বেড়াবে, খিদে পেলে কোথাও নেমে খাবে, জল এলে বাসের ভিতর ঢুকবে—এই হলো তাদের সেদিনের প্রোগ্রাম।

বাদল বল্ল, "কতকাল তোমার সঙ্গে কথা কওয়া হয় নি, সুধীদা। আশ্চর্য্যি, বাংলা এখনো অনায়াসে বল্‌তে পার্‌ছি। এই কয়েক সপ্তাহে ভয়ানক ইংরেজ হয়ে গেছি।"

সুধী বল্ল, "ঐ নিয়ে তোর সঙ্গে আজ তর্ক কর্‌তে এসেছি, বাদল। তোকে মনে করিয়ে দিতে চাই বিলাত আসার আগে তুই ও আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার ধারে ব'সে কী ব্রত গ্রহণ করেছিলুম।"

"অতীতকে মনে করে রাখ্‌তে আমার প্রবৃত্তি হয় না, সুধীদা। অতীতকে মন থেকে না লুকাতে পার্‌লে বর্ত্তমানকে আসন দিতে পারিনে। আহূত অতিথির মতো সে দরজার বাইরে পায়চারি করতে করতে কখন এক সময় 'মরে' পড়ে অপমানের গ্লানিতে।"

"তবে কি তুই বলতে চাস্ যে মানুষ তার অতীতের প্রতিশ্রুতি ভুলবে, সংকল্প রক্ষা করবে না, ঋণ শোধ করবার সময় এলে বল্‌বে 'কিসের ঋণ'? তোর ইংরেজরাও এই কথা বলেন না কি?"

বাদল ইন্‌ডিগ্‌নান্ট্ হয়ে বল্লে, "ইংরেজ কখনও কথার খেলাপ করে না। রাশিয়া যেমন ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ করল, তারপর ঋণটি কর্‌ল অস্বীকার, ইংলণ্ড তেমন করে না, কর্‌তে পারে না।"

"অত উত্তেজিত হ'স্ কেন? আমি কি এমন আভাস দিয়েছি যে ইংলণ্ড আমেরিকার হাত পা ধ'রে ঋণের বহরটা লঘু করবার চেষ্টায় আছে এবং তার সেই কাকুতি মিনতির সপক্ষে রকমারি যুক্তি দেখাচ্ছে?"

বাদল রীতিমতো ক্ষেপে গেল। সুধী বল্ল, "এই চুপ, চুপ, চুপ। পাশের বেঞ্চির লোকগুলো ভাব্‌বে কালো মানুষগুলো বাঙ্গরে ভাষায় বিষম বচসা কর্‌ছে!"

বাদল বল্ল, "ভারি তোমার ভালো মানুষ আমেরিকা। সাইলকের অবতার। মানুষের বিপদে সাহায্য করে যক্ষের ভড়ং কর্‌লেন। এখন চা'ন মোটে একটি পাউণ্ড মাংস।"

দিনটি সত্যিই স্নিগ্ধরৌদ্রোজ্জ্বল ছিল। ইংলণ্ডের শীতকালে এমনটি হয় না। সুধী ও বাদল উভয়েরই মনের উপর থেকে একটা পর্দ্দা উঠে গেছ্‌ল।

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দু'জনে দু'দিকের দৃশ্য দেখ্‌তে দেখতে চল্ল। লণ্ডনের স্থলে স্থলে বহু পুরাতন পার্ক কিম্বা বাগান থাকায় ঋজু দীর্ঘ বীচ বার্চ ওক প্রভৃতি বৃক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দেখা হয়ে যায়। মানুষের তুলনায় ওরাই সূর্য্যের আলোর বেশী সমঝদার। সুধী ওদের দিকে ও বাদল পথিকদের দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট কর্‌ল। একজনের পক্ষপাত প্রকৃতির প্রতি, অপরজনের পক্ষপাত মানুষের প্রতি। সুধী ভাবে, এই যে ওক্ ফার পাইন গাছগুলি এরা কোনো ইংরেজের চেয়ে কম নয়, দেশ এদেরও দেশ, হয় তো এদেরই বেশী, কারণ দেশের মাটিকে এরা সাতপাকে জড়িয়েছে এবং দেশের আলো হাওয়া সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশী ক'রে এদেরি আছে বলার জোর। মানুষের সংসারে মানুষ নিজেকে অত্যন্ত বড় ব'লে জাহির করুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু বিশ্বসংসারে মানুষ অসংখ্য জাতির মধ্যে একটি জাতি এবং এই কথা মনে রেখে তার বিনয়ী হওয়া ভালো। বাদল ভাবে, শুধু মানুষের

জন্য। যা-কিছু দেখ্‌ছি সব মানুষের হাতের ছোঁয়া ও মগজের ছাপ নিয়ে মূল্যবান হয়েছে, নইলে খুঁটো দলিলের মতো তারা থেকেও থাকৃত না। এই দেশের মাটী জল আকাশ এদেশের মানুষের খাকয় বহন ক'রে যা-কিছু বিশেষত্ব পেয়েছে, নইলে আমি ইংলণ্ডে জন্মাতুমও না, আসতুমও না।

রবিবারের সকাল। দিনটিও উজ্জ্বল। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ পার্কের অভিমুখে চলেছে। যারা পেয়েছে তারা কাল সমুদ্রকূলে গেছে; যারা পারে তারা আজও যাচ্ছে, যারা পারে না তাদের যাবার মতো জায়গা লণ্ডনের বৃহদায়তন বৃক্ষগহন অসমতল উপবনগুলি। হ্যাম্পষ্টেড্ হীথ, কেন্‌উড্, রিজেন্টস্ পার্ক, সাউথ কেনসিংটন, হাইড্ পার্ক। প্রত্যেক-টাতে লোকারণ্য। তবু ঘাসের উপর ঝোপের ভিতর প্রণয়ী প্রণয়িনীরা অর্দ্ধশয়ান রয়েছে এবং তাদেরই কাছ দিয়ে বয় স্কাউটরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটোছুটী করছে।

দলে দলে সৈনিক শোভাযাত্রায় চলেছে। মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজছে। বাচ্চারা আগে আগে ও বুড়োবুড়ীরা পিছু পিছু চলেছে। ফুটপাথ দিয়ে ঠেলা গাড়ীতে চ'ড়ে যাচ্ছেন হাত-পা-ভাঙা দ কিম্বা নবজাত শিশু। সামরিক সংস্কার বৃদ্ধ ও মুমূর্ষু থেকে শিশুতে সংক্রামিত হচ্ছে। পাশ দিয়ে চলে গেল সৈনিকের মতো সার বেঁধে ও পা ফে'লে কালো ইউনিফর্ম পরা বালিকার দল। ওরা গির্জ্জায় যাচ্ছে। ফুটপাথের খোঁড়া ভিখারী ও হাত-কাটা ভিখারী এতক্ষণ হাত দিয়ে ও পা দিয়ে ছবি আঁকছিল, কার্টুন আঁকছিল। শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়েছে। তাদের ছবি দেখার ভাণ করে কোনো দয়ালু ভদ্রলোক তাদের চিং-ক'রে-রাখা টুপিতে দু'টি পেনী ফে'লে দিয়ে গেছেন।

৫৫

সুধী বল্ল, "বাদল, জীবনের সঙ্গে flirt করার নাম বাঁচা নয়। এ তুই করছিস্ কী। জীবনের কাছে একদিন যে অঙ্গীকার করেছিলি এতদিন তা মনেও আনবি নে?"

বাদল অবাক হ'য়ে বল্ল, "সুধীদা, তুমি কোন অঙ্গীকারের কথা বলছ?"

এরূপ প্রশ্নের জন্যে সে প্রস্তুত থাকে নি। Woolworthএর মুড়ি ও মুড়কির মতো সব জিনিষ এক দরে বিক্রী কর্‌বার দোকান দেখে চিন্তা কর্‌ছিল, একই কোম্পানীর এক জাতীয় chain store আজ লণ্ডনের সর্ব্বত্র। কাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছাইবে। এই সব chain store বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে দ্রুতগতিতে একটা economic unit ক'রে তুলছে। পৃথিবীকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধবার এ এক অভিনব শিকল। নাইবা থাকল এর পিছনে আদর্শ। বিনা আদর্শবাদে যদি জগতের প্রগতি হয় তবে কী দরকার আদর্শবাদের?

ঐ শোভাযাত্রার কুফল ফল্‌বার আগে এই সব chain storeএর সুফল ফল্‌বে। যুদ্ধ করতে গিয়ে ব্যবসার ক্ষতি করতে কেউ রাজী হবে না। স্বার্থপরতা দিয়ে জগতের স্থায়ী মঙ্গল হ'বে, স্বার্থত্যাগ দিয়ে যা হয়েছে তা ক্ষণকালীন।

এমন সময় সুধীর খাপছাড়া প্রশ্ন শুনে বাদলের চিন্তার খেই গেল হারিয়ে।

সুধী বল্ল, "কথা ছিল আমরা দুই বন্ধু দুই স্বতন্ত্র পথ দিয়ে একই সত্যের অভিসারী হবো। তুই নিবি ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ, আর আমি ইনটুইশনের মার্গ। এবং দু'জনেই রইব শেষ পর্য্যন্ত অনভিভূত, অনুত্তেজিত ও মোহমুক্ত। তার বদলে এ কী দেখছি? দেখছি তুই পথভ্রষ্ট হয়ে চোরা গলিতে পা দিয়েছিস্ ও ইচ্ছাপূর্ব্বক মাদক ব্যবহার কর্‌ছিস্।"

বাদল বল্ল, "থামো। চার্জ্জগুলো একে একে শোনাও এবং বোঝাও।"

"এক নম্বর চার্জ্জ এই, যে, ইংরেজ হবার জন্যে আলু খাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই, ওটা অপথে চলা।"

"আমি নট-গিল্‌টী।"

"বেশ। কৈফিয়ৎ দিতে হবে।"

বাদল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। তার কাজের কারণ নিশ্চয় আছেই, কিন্তু কাজের পর কাজ জ'মে উঠে কারণটাকে কোন পাতালে চাপা দিয়ে fossilএ পরিণত করেছে। এখন স্তরের পর স্তর খুঁড়ে মৃত ও জীর্ণ কারণকে অবচেতনার "hades" থেকে চেতনার আলোকে উত্তীর্ণ করা যাক।

বাদল মনোরাজ্যের দিকে দিকে মোটর হাঁকিয়ে দিল। কেয়ার কারণটাকে পাকড়াও করে আনা চাই-ই, নইলে মুণ্ডু নেবো।

আবিষ্কারের উত্তেজনায় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তারপর ব'সে প'ড়ে বল্ল, "তুমি ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে সত্যের পরিচয় নেবে, ঠিক করেছ। ওর বিপরীত হচ্ছে ইংলণ্ডের দৃষ্টি। ইংরেজের চোখে জীবনকে কেমন দেখায় তাই জান্‌বার জন্যে আমার ইংরেজ হওয়া। নইলে তুমি কি মনে করো, সুধীদা, যে ইংরেজী পোষাক ও ইংরেজী চাল এর প্রতি vulgar অনুরাগবশত আমি বিলিতি বাঁদর সেজেছি?"

সুধী বাদলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্ল, "রাগ করিস্‌নে বাঁদর। কিন্তু পোষাকের বাঁদরামির চেয়ে আত্মার বাঁদরামি আরো শোচনীয়, আরো সাংঘাতিক। মনে কর হাতীর সাধ গেছে পাখীর জীবনের স্বরূপ দেখ্‌বে। সে কেমন মূর্খতা বল্ দেখি।' "

বাদল সুধীর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বল্ল, "হাতীর অমন সাধ যায় না, যেহেতু সে অনিবার্য্যভাবে হাতী। তুমি কি জোর করে বল্‌তে পারো, সুধীদা, যে তুমি ও আমি অনিবার্য্যভাবে ভারতীয়?"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আমরা হিন্দু হয়ে জন্মিয়েছি ব'লে আমরণ আমরা হিন্দু থাক্‌তে বাধ্য? ভারতবর্ষে জন্মিয়েছি ব'লে অন্য দেশের সিটিজ্‌ন্ হতে পারিনে? সমস্ত সভ্য দেশে naturalisation এর ব্যবস্থা আছে, এই ইংলণ্ডেই কত বিদেশীকে ইংরেজ হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে এ জাতীয় ব্যাপার ভূরি ভূরি। সমস্ত সভ্যদেশে বিদেশিনীকে স্বামীর ন্যাশনালিটী দেওয়া হয়, এর পিছনে কি একটা সহজ সত্য নেই, সুধীদা?"

সুধী হেসে বল্ল, "ওগুলো সম্পত্তির ও সন্তানের খাতিরে। আমার খাতিরে যে নয় তা জোর করে বল্‌তে পারি, বাদল। তুই তেমন ইংরেজ হলে আমি আপত্তি কর্‌তুম না রে। তবে শ্রীমতী উজ্জয়িনীর দশা ভেবে বিচলিত হতুম। সে যে ক্রমেই 'কঠোর' স্বদেশী হয়ে উঠ্‌ছে।"

বাদল কৌতূহল চেপে গম্ভীরভাবে বল্ল, "তাকে আমি নিষ্কৃতি দেবো, সুধীদা।" তারপরে কৌতূহলের উপর থেকে চাপ তুলে নিল। বল্ল, "তাঁর কাছ থেকে খুব চিঠি পাও বুঝি?"

"পাই বৈ কি। তবে চিঠিগুলো আমাকে উপলক্ষ করে যাকে লেখা তার হাতে দিতে পার্‌লে খুসী হই।"

"না, না, না।" বাদল সাতঙ্কে বল্ল। "ওসব মেয়েলি বাংলা চিঠি পড়বার সময় বা সখ নেই আমার। জবাব যখন লিখ্‌তে পারব না তখন শুধু প'ড়েই বা করব কী! একটা কথা তোমাকে বলি, সুধীদা, আমি ওঁর পাতিব্রত্যকে প্রশ্রয় দিতে চাইনে। বরঞ্চ উনি আমার উপর রাগ ক'রে আমাকে ত্যাগ করুন ও ভুলুন এই আমার মনোবাঞ্ছা।"

সুধী বল্ল, "কিন্তু বাদল, ওঁর দিকে যা আছে তা পাতিব্রত্যের চেয়ে সরস।"

"না, না, না, সুধীদা। তাকেও আমি প্রশ্রয় দিতে পারব না। আমি ভালোবাসা-টালোবাসা জানিনে, সুধীদা। ওটা খুব সম্ভব একটা glandular action. কার শরীরের মধ্যে কোন্ ক্রিয়া চল্‌ছে সে খবর নিয়ে আমার কী লাভ? আমার ইন্‌সম্নিয়া কিছু কম্‌বে?"

আহত হয়ে সুধী বল্লে, "হ্যাঁ, ইংরেজ হয়েছিস্ বটে ঠিক্। দোকানদারের মতো লাভ লোকসান ওজন কর্‌তে শিখেছিস্ দয়া মায়া স্নেহ প্রীতিরও।"

বাদল তখনো ভাব্‌ছিল বিশ্বব্যাপী Chain Storeএর দ্বারা মানব ঐক্যের কথা। বল্ল, "ব্যঙ্গ করো আর যাই করো এ এক মহৎ সত্য যে দোকানদারদের দিয়ে পৃথিবী যতটা ঐক্য পাবার ততটা পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো পাবে। ইউরোপীয় দোকানদারেরা যা মেরে এশিয়ার ঘুম ভাঙিয়েছে, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছে ও আফ্রিকাকে মানুষ কর্‌ছে। এই যে আজ রেল জাহাজ এরোপ্লেন দেশে দেশে মানুষকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, এই যে স-তার ও বেতার টেলিগ্রাফের সাহায্যে আমাদের সংবাদপত্রগুলি সারা দুনিয়ার তাজা খবর জু'গেয়ে আমাদের দিচ্ছে, এ সব তো দোকানদারেরই স্বার্থপরতার দ্বারা সম্ভব হলো।"

সুধী তার পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বল্ল, "সাধু, সাধু। আর

কিছুদিন এই ধরণের ট্রেনিং পেলে রজারবীরার কি বীভার ক্লাব তোকে লুফে নেবে দেখিস্। যেমন পাকা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠ ছিস্ ভয় হয় পাছে লাট হয়ে বাঁকীপুরেই যাস্।"

সুধীদাও তাকে ভুল বোঝে! অভিমানে বাদলের মুখ ফুটছিল না। সুধী তার মনোভাব আন্দাজ ক'রে বল্ল, "তোর sense of humour নেই, তুই কিসের ইংরেজ? চল্, কোথাও খেতে যাই।"

ভোজনের পরে বাদলের মনে পড়্ল সুধীদার তার নামে আরো একটা চার্জ্জ আছে। বল্ল, "তোমার দু'নম্বর চার্জ্জ কোথায় সুধীদা?"

সুধী বল্ল, "থাক্, থাক্, এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বেদনা দিয়েছি। একেই তো আমার ছায়া মাড়াস্ নে, এর পর হয় তো আমাকে দেখে চিন্‌তে দ্বিধা বোধ কর্‌বি।"

বাদল জেদ ধরে বল্ল, "না, সুধীদা, একটা বোঝা পড়া হয়ে যাক্। নইলে তোমার ঐ কথাগুলো আমার স্মরণে খচ্ খচ্ কর্‌বে যে জীবনের সঙ্গে আমি flirt কর্‌ছি।"

সুধী বল্ল, "ক্ষমা প্রার্থনা করি, বাদল; কথাগুলো একটু কটু হয়ে গেছে।"

বাদল অধৈর্য্য হয়ে বল্ল, "থাক্ সে কথা। এখন আস্তিন থেকে বের করো তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ।"

সুধী দুষ্টুমি ক'রে তার আস্তিন দু'টো ঝাড়্ল। তার ফলে বাদল আরো চট্‌ছে অনুমান ক'রে সে গম্ভীর হয়ে বল্ল, "এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসা সহস্র জনের জীবনে ঘট্‌ছে। কেই বা তোর মতো নেচে বেড়াচ্ছে শুনি?"

বাদল বল্ল, "ঐ খানেই তো গলদ। ওরা আসে এক দেশ থেকে অন্য দেশে' আমি আস্‌ছি আপনার মনোমতো দেশে। উত্তেজনা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মোহ বল্‌ছিলে কাকে?"

"কোনো জিনিষকে বাড়িয়ে দেখার নাম মোহ।"

"নিজের জিনিষকে মানুষ একটু বাড়িয়ে দেখেই থাকে। তা ছাড়া আমার ইংলণ্ড তো একটা আইডিয়া। যেমন তোমার ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া। আপন মনের সৃষ্টির সম্বন্ধে সব মানুষের দুর্ব্বলতা আছে।"

"কিন্তু আমার ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া নয়, বাদল। সেখানে আমার রক্তমাংসের প্রিয়জন আছে। ওদের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান। সেই টানে ওরা আমাকে এই মুহূর্ত্তেই টান্‌ছে। এদেশে কোনো ভারতীয়কে দেখ্‌লে আমার হৃদয় প্রীতিতে উদ্বেল হয়। কিন্তু কোনো ইংরেজকে দেখ্‌লে তোর যা হয় সেটা অজানাকে জান্‌বার উত্তেজনা ও স্থূলকে সূক্ষ্ম কল্পনা কর্‌বার মোহ। যে দরের মানুষের সঙ্গে মিশে তুই রোমাঞ্চ বোধ করিস্, বাদল, তুই নিজে তাদের থেকে ঢের উঁচু দরের।"

বাদল অনুধাবন কর্‌তে লাগ্‌ল। বাস্তবিকই সুধীদার অন্তর্দৃষ্টি আছে। যা বল্‌ছে তা নেহাৎ ভ্রান্ত নয়। তবে কিনা, তবে কিনা—বাদলের উদ্দেশ্য ও উপায় আলাদা, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি আলাদা, সে যা কর্‌ছে তা অন্যের পক্ষে মিথ্যা হলেও তার নিজের পক্ষে সত্য। মোহ এবং উত্তেজনা যদি বিষ হয় তবে বাদল হচ্ছে নীলকণ্ঠ; অপরে যা আত্মসাৎ ক'রে লাভবান হ'তে পারে না বাদল তা পারে। গর্ব্বে বাদলের বুক ফুলে উঠ্‌ল। তার সত্যের সন্ধান সর্ব্বজন পরিত্যক্ত পথে। মধ্যযুগে জন্মালে সে বোধ করি তান্ত্রিক হতো।

বাদল আবেগের সঙ্গে বল্ল, "আস্‌বে, সে দিন আস্‌বে। আমি আমার অপথে চল্‌তে চল্‌তে একদিন এমন পরশ পাথর পেয়ে যাবো যে এই আপাত অর্থহীন flirt করা পরম অর্থপূর্ণ ব'লে প্রমাণিত হবে। যে আগুন আমার প্রাণে জ্বল্‌ছে, সুধীদা, তুমি আমার নিকটতম বন্ধু আজো তার তেজের পরিমাণ পাওনি। আমার সব তুচ্ছতা, সব ভ্রান্তি, সব পাপ সেই আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। অতএব মা ভৈঃ।"

সুধী তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মনে মনে তাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে লাগ্‌ল।

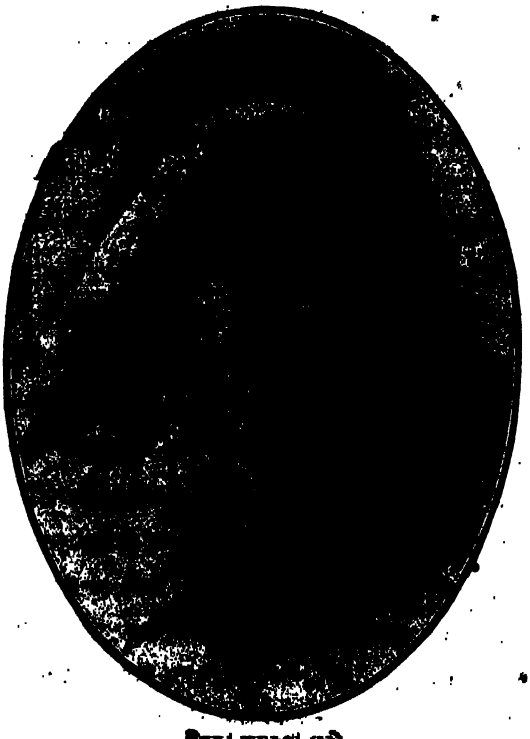
শ্রীলীলাময় রায়

প্রাথমিক শিক্ষা

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

(নিখিলবঙ্গ মহিলা কংগ্রেসে পঠিত)

রাত্রি যখন প্রভাত হয় তখন স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সবাই জাগে, শুধু মেয়েরা অথবা শুধু পুরুষেরাই জাগ্রত হয় না। জাতীয় জীবনও যখন জাগিয়া উঠে, তখনও সুপ্তোত্থানের এই পূর্ব্ব নিয়মটীর ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না; নিশাবসানে নিদ্রোত্থিত নরনারীর মতই জড়তান্ধকার-সমাবৃত নারী-পুরুষ



শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

তাদের আলস্য-সুপ্তি ভঙ্গ করিয়া প্রায় একত্রই জাগ্রত হয়। যতদিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল, ততদিন জানা গিয়াছিল, এদেশের রাজনৈতিকক্ষেত্রের রজনী প্রভাত হয় নাই।

এতদিনে জাগিয়াছে দেশ, ভারতের কুম্ভকর্ণ তার গভীর সুপ্তি ভঙ্গ করিয়াছে। বিগত সত্যাগ্রহ-সময়ে ভারতীয় পুরুষের পার্শ্বে ভারতীয়া নারী তাঁদের দীর্ঘ দিনের অনভ্যস্ত মুক্তবায়ু এবং সুদীর্ঘ দিনের পরানুকৃতির অবরোধ ভাঙিয়া আসিয়া ভারতসতীর চিরমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। সতী পতির সহ-ধর্ম্ম-চারিণী হইয়াছেন। বিবাহমন্ত্রের এক হৃদয় এবং একচিত্ততার প্রতিশ্রুতি সফল হইয়াছে।

কিন্তু শুধু দেশ জাগিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। ঘুমন্ত পুরীতে প্রয়োজন ছিল শুধু চৌকিদারের, এখনই সত্যকার কর্ম্মকারকের প্রয়োজন। কাজ করার দিন আসিয়াছে, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ নেওয়া এবং দেওয়ার ব্যবস্থা চাই।

সে ব্যবস্থা চাই সবারই জন্য। শুধু ছেলের জন্যও নয়, শুধু মেয়ের জন্যও নয়। একপক্ষ পক্ষীর মত মেয়েদের বাদ দিয়া পুরুষদের কোন উন্নতির উচ্চাকাশে উড্ডীন হওয়া কোন-মতেই সম্ভব নহে। মেয়েদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন না করিয়া পরন্তু তাদের অকল্যাণের পথে ফেলিয়া রাখিয়া পুরুষের দল যে-পথেই অগ্রসর হইতে যাইবেন, পিছনের টানের চাপে তাঁদের পিছাইতে হইবেই, তাই চাই তাঁদের একত্রিতভাবে সমোন্নতি। একথা বলিয়া আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, এইরূপ উন্নতি করিতে হইলে নারী-পুরুষকে একই শিক্ষা একই দীক্ষা লইতে হইবে। এরোপ্লেনে সমরেবিপণে বিবাহ-বিচ্ছেদে, আরও বেশি কোন কিছুতে সর্ব্বত্রই মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দিয়া বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবে। আমার মতে রাষ্ট্রে ও সমাজে নারীরও কতকটা অধিকার আছে। গার্হস্থ্য-জীবনে পুরুষেরও কতকটা দায়িত্ব আছে। নিজের নিজের মুখ্য কর্ত্তব্যে লক্ষ্য রাখিয়াও নারী পুরুষে দেশের কাজ দশের কাজ, এবং অন্যের কর্ত্তব্য পালন অনায়াসেই করিতে পারেন। বিশেষ দেশে যখন আপৎ কাল উপস্থিত

হয়, তখন নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষেই আপদ্ধর্ম পালন করিতে বাধ্য। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র তখন তার গৃহধর্ম্মেই কেবলমাত্র নিবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। দেশবাসী মাত্রেরই যখন দেশ-ঋণ আছে, তখন দেশের অর্দ্ধাংশকে পরিহার করিলে আপদুদ্ধার হইবে কেমন করিয়া? এর জন্য এবং আর সমস্তরই জন্য শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন্ করিতে হইবে। স্বরাজ গবর্ণমেন্টের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে, প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন্ এবং বাধ্যতামূলক করা। শিক্ষা এবং জ্ঞান কোন সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ববস্তু নয়, জগতের প্রত্যেক নর এবং নারী একই ভাবে ইহা পাইবার অধিকার দাবী করিতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যাহীনকে পশুর সহিত তুলিত করা হইয়াছে। যদিও একদেশদর্শীভাবে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বাধা সকল সমাজেই মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়াছে, তথাপি সে সব অসত্যের বাধা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না, হিন্দু শাস্ত্রের এমন উদ্দেশ্য হইতে পারে না সমাজের অর্দ্ধাংশকে পশুভাবাপন্ন রাখা।

এদেশে প্রাচীনকালে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার ছিল, তাহা সকলেই জানেন। পৌরাণিকযুগে বৌদ্ধযুগে তৎ-পরবর্ত্তীযুগেও বহুতর নারী ধর্ম্মে, কর্ম্মে জ্ঞানে সমুন্নতির শীর্ষে দাঁড়াইয়া ভারতের ভিতরে এবং এমন কি তার বহির্ভাগেও নিজেদের যশের কেতন উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন। ভারত-সম্রাট অশোক-দুহিতা সিংহলের ধর্ম্মবিজয়িনী সঙ্ঘমিত্রা এবং নেপালে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারিকা চারুমতীর কথা আপনারা হয়ত শুনিয়া থাকিবেন। কতবেশী শিক্ষিতা হইলে মেয়েরা এতবড় কাজ করিতে পারেন? পরাধীন জাতির জাতীয়তাই যখন পরপদাঘাত-চূর্ণ হয়, তখন তার সেই দুরবস্থার দিনের কথা, সে বড় লজ্জারই কথা; সে সব দিনের আচার ব্যবস্থা সেও কতকটা আপদ্ধর্ম; তা লইয়া গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই এবং তার মধ্যের যেগুলা বর্ত্তমানের আপদ্ধর্ম্ম পালনের অপরিপন্থী সেগুলাকে পরিবর্ত্তন এবং সংস্কার করিবার প্রয়োজনও আসিয়াছে। এছাড়া আর একটা কথা বলার আছে যে, এদেশে মেয়েদের শিক্ষাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করা হইতেছে এই বিভ্রান্তই আধুনিক বর্ত্তমান যুগে। এর অল্প দিন পূর্ব্বেও যখন সমাজ ছিল, পল্লী-জীবন সতেজ ছিল, যৌথপরিবার প্রথা অটুট ছিল, তখনও পুঁথিগতভাবে না হইলেও নানাদিক দিয়াই আমাদের মেয়েদের শিক্ষা আমাদের দেশের পরিবারের এবং সমাজের দিক হইতে যথেষ্টরূপেই সু-শিক্ষা ছিল। পুরাণ ভাগবত ব্রতকথা, ত্যাগ সংযম, মানুষকে দিব্যভাবাপন্ন করিতে, যথার্থ শিক্ষার ফল প্রদান করিতে যাহা প্রয়োজন তাহার কিছুরই ত্রুটী ছিল না। তবে তখন মেয়েদের কাজ ছিল মসিজীবী বা কৃষিজীবী পিতাপতিপুত্রের জন্য গৃহসুখ গঠন করা, পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি বজায় রাখা; আজ শুধু ঐটুকুতেই হইবে না। আজ তাদের ঘরের, পরিবারের, সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রেরও কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। গৃহপালিত পশুর মত গৃহ-লালিত শিশুর ভার বহনই নয়, তাকে বীর-প্রসবিণী বীরাঙ্গনা হইয়া দেশঋণ শোধ দিতে হইবে। এ ঋণ দেশবাসীরও যেমন দেশবাসিনীরও তেমনই, ইহাতে কোন ইতর বিশেষ নাই।

কিন্তু এ ঋণ শোধ দিতে হইলে দেশকে দেশের অতীত-বর্ত্তমানকে ভাল করিয়া জানিয়া চিনিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে। দেশকে জানিলে, চিনিলে, ভালবাসিলে তবেই দেশ-মাতৃকার পূজায় আয়োজনে আত্মনিয়োগ-চেষ্টা আসিবে, দেশসেবাব্রতের কৃচ্ছ্র সাধনে অনুরাগ জন্মিবে, দেশঋণ পরিশোধ করিতে আগ্রহ হইবে। তাই সার্ব্বজনীন্ বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই দেশাত্মবোধ-সৃষ্টিকারী এবং ধর্ম্ম ও নীতির দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত প্রকৃত শিক্ষাই যাহাতে আমাদের ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য প্রবর্ত্তিত হয় সে বিষয়ে আমাদের বিশেষরূপে চেষ্টা করা আবশ্যক। কিন্তু এই শিক্ষা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই যাহাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা এই শিক্ষার প্রভাবে নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের ধর্ম্মকে ভালবাসিতে শ্রদ্ধা করিতে গৌরব বোধ করিতে শিক্ষা করে, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ করিতে শিখে না। যদি আধুনিক বিদ্যাশিক্ষার ধাঁচে এই সার্ব্ব-জনীন্ শিক্ষাও নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সে কুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

নিরুদ্দেশ

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

আজও যাহা অসমাপ্ত
আজও যার হয় নাই শেষ,
আজও যার জীবনেতে
পাই নাই কিছুই উদ্দেশ ;
প্রভাতের সূর্য্যালোতে মাঝে মাঝে যাহার পরশ
লভিয়াছি চিত্ত তলে অমৃত সরস—
মুগ্ধ এই হিয়া
সে সুধা সুগন্ধ লভি ওঠে উচ্ছলিয়া
উন্মুক্ত আকাশতলে হৃদয়ের কোণে ;
যাহার অতৃপ্ত ছোঁয়া লেগে ক্ষণে ক্ষণে
কেঁদেছে আকুল চিত্ত
নিত্য নিত্য,
সে অনিত্য মধুর দোলায়
দুলায়ে দুলায়ে মোরে বাঁধন খোলায়
উতল শ্রাবণ রাতে স্নিগ্ধ মধুমাসে ;
যার তীব্র স্পর্শখানি চিত্তে ভেসে আসে
উছল উথল রস বেদনা-বিধুর
তবু নাহি ধরা যায় তবু সে সুদূর—
অশেষ সে রসধারা অসংখ্য সে মায়া
কভু আলো মনে হয় কভু যেন ছায়া,
তবু এই হৃদিশতদলে
খুলিল যে-কটি পাতা
আজি তার পরশ কোমলে
সে কয়টি দল
কখনো শুকাতে চায়
কখনো বা সুগন্ধ-উতল।

কভু তপ্ত মধ্যাহ্নেতে সূর্য্যালোকময়
অস্পষ্ট হৃদয়ে তারে মিথ্যা মনে হয়—।
আজও এই জোৎস্না-রাতে
সে বিভোল আনে গন্ধখানি
একি সত্য ? একি মিথ্যা ?
কিছু নাহি জানি।
একি মুগ্ধ অগ্নি-শিখ,
একি দীপ্ত হেম ?
নিরুদ্ধ হৃদয়-দ্বারে
একি মোর প্রেম ?
মধুময় মরীচিকা আনন্দে অশেষ
মুক্ত অন্তরীক্ষতলে হ'ল নিরুদ্দেশ।
আজি এই জোৎস্নারাতে সেই স্বপ্নখানি
চক্ষুতে দেখিতে চাই সম্মুখেতে আনি ;
কিছু তার অর্থ নাই, কিছু তার নাহিক নিয়ম,
সে যে আলোছায়াময়
সে যে স্বপ্নসম,
কখনো সুতীব্র, কভু মধুর সরল,
আলোড়িত হৃদিতলে সে মৃদু পরশ
বাহিরে আনিতে চাই
লিখিলের নিত্য দুয়ার।
আপনারে ধন্য গণি
যতটুকু শুনি ধ্বনি
ধ্বনিত করিতে যাই—
[illegible] মর্ম্মরিত [illegible]।

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ

শ্রীযুক্ত অমিয়া দত্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ল্যাডিস্‌ল্‌ রেমেণ্ট (Ladislaws Reymont)

জন্ম—১৮৬৮ ; প্রাইজলাভ—১৯২৪

সিঙ্কিভিচ নোবেল পুরস্কার লাভ করিবার ১৯ বৎসর পরে পুনরায় একজন পোল্যাণ্ডদেশীয় কথা-শিল্পী উক্ত পুরস্কার লাভ করিয়া পোল্যাণ্ডের মুখ উজ্জ্বল করেন। ইঁহার নাম ল্যাডিস্‌ল্‌ রেমেণ্ট। পোল্যাণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে দুইবার নোবেল পুরস্কার লাভ করা বিশেষ গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। তরুণ পোল্যাণ্ডের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে রেমেণ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "কৃষক" (The Peasants) নামক সুবৃহৎ উপন্যাসখানি তাঁহার অমর কীর্ত্তি ও নোবেল পুরস্কার লাভের প্রধান কারণ। এই উপন্যাস চার খণ্ডে সমাপ্ত। ইংরাজীতে ইহার অনুবাদ আছে। পুস্তকগুলির নাম যথাক্রমে "শরৎ", "শীত", "বসন্ত" ও "গ্রীষ্ম"। প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা রেমেণ্টের অত্যন্ত প্রবল। এজন্য তিনি প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ প্রদর্শনের ইচ্ছায় চারিটি ঋতুর নামে তাঁহার গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন। টমাস হার্ডি ও জর্জ মেরিডিথের মত তিনিও প্রকৃতিকে তাঁহার গল্পে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এমন কি, অনেক সময় প্রকৃতির খাতিরে তাঁহার অনেক প্রধান চরিত্রকে, বিশেষতঃ ইয়াগ্‌নাকে অবহেলা করিয়াছেন। বৃহৎ হইলেও "কৃষক"-এর গল্পে পাঠকের ঔৎসুক্য সমানভাবে বজায় থাকে। কেননা ইহাতে মানব-মনের নানাভাবের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আছে, যেমন "শরৎ"-এর বিবাহোৎসব কিম্বা কিউবার মৃত্যু, "শীত"-এর ইয়াগ্‌না ও অ্যানটেকের ব্যাকুল অনুসন্ধান ও পিতাপুত্রের তিক্ত বিরোধের চিত্র ইত্যাদি। এই উপন্যাসে পোল্যাণ্ডের আচার ব্যবহার, পৌরাণিক কাহিনী ও বহু অনুপম পোলিশ জনপ্রবাদ আছে। পোলিশ কৃষকগণের ফটোগ্রাফের মত সুন্দর বাস্তব চিত্র, তাহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ ও সুপ্ত স্বাধীনতার আকাঙ্খা তাঁহার নিপুণ তুলিকাপাতে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শেষ দুইখণ্ড অপেক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড বেশী স্বাভাবিক ও নাটকীয় ভাবে ভরা। গ্রন্থখানির একমাত্র দোষ যে, যাহা অল্প কথায় বলা যায় তাহাকেও তিনি ফেনাইয়া বলিয়াছেন এবং একই কথা বহুবার লিখিয়াছেন। ১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসের 'আটলান্টিক মান্থলী'তে এই চারিখণ্ড পুস্তকের একটি সুন্দর সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

১৮৬৮ সালে Kobiala Wielka গ্রামে ল্যাডিস্‌ল্‌ রেমেণ্টের জন্ম। তাঁহার পিতা Windmill-এর মালিক ছিলেন। অল্পবয়সে তিনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতেন এবং অবসর সময়ে তাঁহাকে ক্ষেত-খামার ও গরু-বাছুরের তত্ত্বাবধান করিতে হইত। গ্রাম্য স্কুলের পড়াশুনা শেষ হইবার পর তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। সেখানে রুশীয়দিগের আদেশ অমান্য করিয়া পোলিশ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইয়াছিল। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তিনি কেরাণী, অভিনেতা, রেলের সিগ্‌ন্যালার প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্য করিতে বাধ্য হন। তাঁহার অনেক উপন্যাসে তিনি এই সকল অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিয়াছেন। ইংরাজীতে অনূদিত তাঁহার "The Comedienne" নামক পুস্তকে তাঁহার অভিনেতা-জীবনের ছায়া দেখা যায়। এই গল্পের নায়িকা যশের লোভে থিয়েটারের অভিনেত্রী হয়। কিন্তু সে আলেয়ার পশ্চাতে

ছুটিয়াছিল। তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণাম ও ব্যর্থতা পাঠকের সহানুভূতি উদ্রেক করে।

"কৃষক"-এর পূর্ববর্ত্তী উপন্যাস "The Promised Land"-এ ধনী ও জমীদারদিগের বিরুদ্ধে প্রজা-সাধারণের বিদ্রোহের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রচণ্ড বাস্তবতার জন্য অনেকে ইহাকে ফরাসী উপন্যাসিক জোলার "Germinal" নামক উপন্যাসের সহিত তুলনা করেন।

রেমণ্ট এ পর্য্যন্ত প্রায় ২৫খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি জার্ম্মানীতে সুপরিচিত ও সমাদৃত। ইংরাজীতে তাঁহার অতি অল্প পুস্তকেরই অনুবাদ পাওয়া যায়। সিঙ্কিভিচের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া একজন সমালোচক বলেন যে, "সিঙ্কিভিচের ছবি আঁকিবার দক্ষতা ও নাটকীয় ক্ষমতা বেশী, কিন্তু বাস্তব চিত্রাঙ্কনে রেমণ্ট অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"

বার্ণার্ড শ' (Bernard Shaw)

জন্ম—১৮৫৬ ; প্রাইজলাভ—১৯২৫।

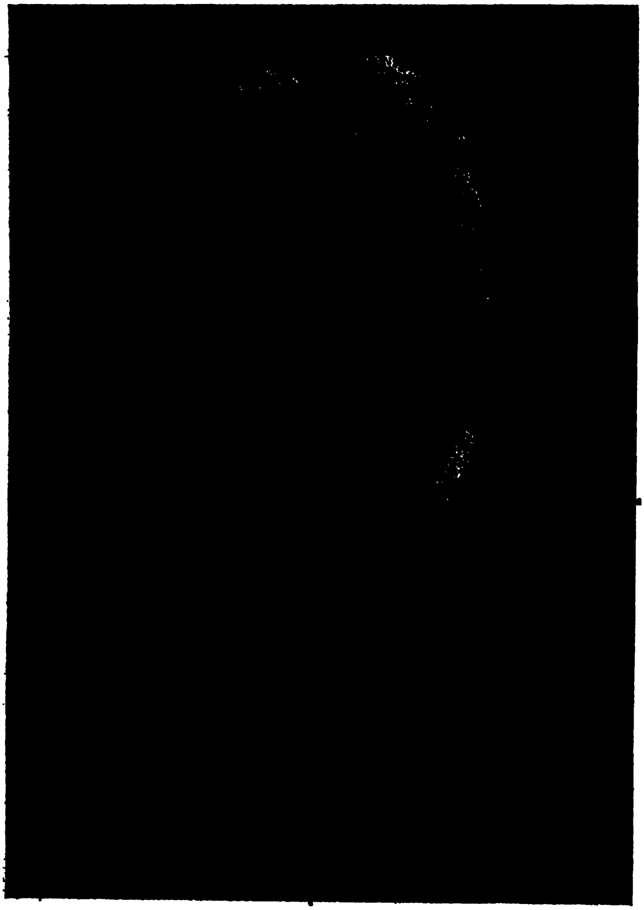
সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশিল্পী জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' বর্ত্তমান ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি জাতিতে আইরিশ, কিন্তু স্থায়ীভাবে ইংলণ্ডেই বাস করেন। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাবলিন্ সহরে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা জর্জ্জ কার্ শ' কিছুদিন সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। পরে ঐ পদ গবর্ণমেণ্ট তুলিয়া দেওয়ায় তিনি নিজের পেনসন্ বিক্রয় করেন এবং সেই অর্থে শস্যের ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্যবসা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, কাজেই ইহাতে তিনি লাভবান হইতে পারে নাই। তাঁহার অবস্থা এরূপ অসচ্ছল ছিল যে, পুত্র বার্ণার্ড অল্পবয়সেই কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শ' স্বয়ং তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"আমার পিতার শিক্ষা, অর্থ, পেশা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। তিনি যে শস্যের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন, সে বিষয়েও তাঁহার কণামাত্রও অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ছিল না।" তাঁহার মাতা সুগায়িকা ছিলেন। মাতার নিকট হইতেই শ' সঙ্গীত ও কাব্যানুরাগ লাভ করেন।

কেরাণীর জীবনে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ১৮৭৬ সালে শ' লণ্ডনে আসেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি। লণ্ডনে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন একখানি সান্ধ্য সংবাদপত্রের সঙ্গীত-সমালোচকের কার্য্য করিয়াছিলেন। তখন কোন সম্পাদকই তাঁহার লেখা প্রকাশ করিতে সম্মত হইতেন না। কতদিন যে অর্থাভাবে তাঁহাকে উপবাস করিতে হইয়াছে তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু নিরাশ না হইয়া তিনি অনবরত ভাগ্যলক্ষ্মীর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। শোনা যায়, নয়বৎসরে রচনার সাহায্যে তিনি মাত্র আশী টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার নাটক পৃথিবীর অন্যান্য নাট্যকারদিগের অপেক্ষা অধিকমূল্যে বিক্রয় হয়। একমাত্র আমেরিকা হইতেই তিনি বৎসরে দুইলক্ষ টাকারও বেশী অর্থ "রয়াল্টি" হিসাবে পাইয়া থাকেন। তাঁহার পুস্তকের প্রথম সংস্করণগুলিও উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার "Widowers' Houses" নামক নাটকখানি ২২০০ টাকায় ও "The Unsocial Socialist" ২১০০ টাকায় দুইজন মার্কিন ভদ্রলোক ক্রয় করিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর উপেক্ষা করিয়া ইংরাজ জাতি এখন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

"Mrs. Warren's Profession" নামক নাটকখানি লিখিয়া শ' সাহিত্যজগতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাহারপর তিনি ক্রমান্বয়ে বহু সমাজ-সমস্যামূলক নাটক লিখিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত নাট্যকার ইব্‌সেনের শিষ্য। যাহা কিছু ভুয়া ও মেকী, সভ্যতার সহস্র প্রচ্ছন্ন পাপ— সকলেরই তিনি তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ ও সমালোচন করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান কালের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি মানুষের অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর সন্দেহ প্রকাশ এবং আচার ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। শ্লেষাত্মক রচনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা। বিবাহ, পরিবার, সম্পত্তি, ধর্ম্ম, গণতন্ত্রবাদ প্রভৃতি সকল বিষয়কেই তিনি প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছেন ও অন্তর্নিহিত দোষ-ত্রুটি উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যঙ্গ যতই কটু ও আক্রমণ যতই প্রচণ্ড হইয়াছে,

রচনার বিচিত্র ভঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়া লোকে ততই তাঁহাকে তারিফ্ করিয়াছে।

সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে শ' আজীবন সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। এই সংগ্রামেই তাঁহার আনন্দ। ইহারই ফলে তিনি ভুলিয়া যান যে, যুদ্ধ অবসানের



বার্ণার্ড শ'

জন্যই সংগ্রামের প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নারীর অধিকারের জন্য জীবনব্যাপী আন্দোলন করিলেও তাঁহার অঙ্কিত বহু নারী-চরিত্রের মধ্যে কেবলমাত্র একটিই সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান আকর্ষণে সমর্থ এবং মাত্র দুইটি নারী ভালবাসার যোগ্য।

কল্পনার প্রসারতা শ'-এর লেখায় নাই। মস্তিষ্কের নিকট হৃদয়কে, ও বুদ্ধির নিকট অন্তর্জাত সহজ জ্ঞানকে তিনি বলি দিয়াছেন। নানা প্রতিষ্ঠান ও মণ্ডলীকে অগ্রাহ্য ও অমান্য করিতে গিয়া অনেক সময় তিনি ব্যক্তিত্বকে অনাদর করিয়াছেন। তাঁহার মনে আব্ছা কিছুই নাই। সমস্তই স্বচ্ছ, হৃদয়াবেগমুক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। রহস্যবাদ ও মানবের সুকুমার চিত্তবৃত্তির সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি মানববিদ্বেষী নহেন। তাঁহার অনুভূতি তীব্র; সামান্য অন্যায় আচরিত হইতে দেখিলে তিনি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, মানবতায় যে তাঁহার বিশ্বাস নাই ইহা সম্ভাবনার বাহিরে। তাঁহার মানবতা—মানুষের গোষ্ঠীকে লইয়া, ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া নহে। সাধারণের অর্থের অপব্যয়, জাতীয়-দারিদ্র্য ও অকর্ম্মণ্যতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। লেনিনের উপর তাঁহার শ্রদ্ধার কারণ কি ও মুসোলিনীকে তিনি কেন সমর্থন করেন, ইহা হইতে তাহা সুস্পষ্ট। দুর্ব্বলতা ও দ্বিধাভাব তিনি আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। আত্ম-প্রত্যয় তাঁহার অত্যন্ত প্রবল, এজন্য বিরুদ্ধ-বাদীকে স্বমতে আনিবার ক্ষমতা তাঁহার খুব বেশী।

শ' আজন্ম প্রভুত্বপ্রিয়, শাসন করিতে পারিলেই খুসী। তাঁহার সমস্ত নাটকে, এমনকি "সেণ্ট্ জোয়ান" নাটকে পর্য্যন্ত তিনি নিজেই প্রধান চরিত্র। বড় বড় তর্ক-ব্যাপারেও নায়ক স্বয়ং তিনিই। অধিকাংশ লোকের তাঁহার মত তর্ক-শক্তি অবশ্য নাই, সুতরাং তাহারা তর্কে পরাভূত হয়; তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া লন যে তাহারা সকলেই ভ্রান্ত। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার কথার প্রতিবাদকারীকে তিনি নির্ব্বোধ বলিয়া সাব্যস্ত করেন। স্বীয় সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত ইহা তাঁহার স্থির বিশ্বাস। অপরের বিরুদ্ধমত-সহনশীলতা তাঁহার আদৌ নাই।

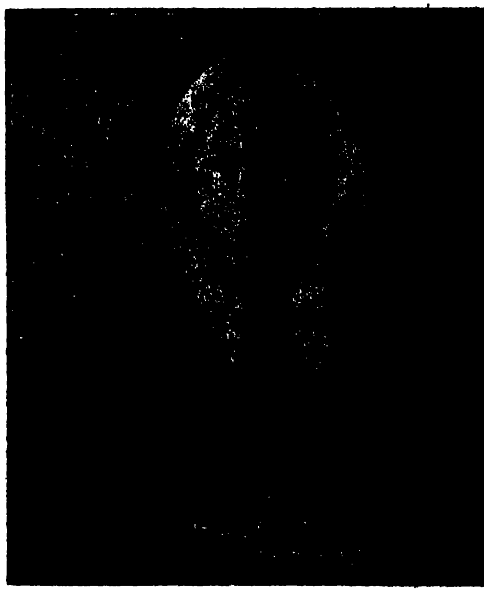
তাঁহার মস্তিষ্ক ও মেজাজের ত্রুটীবিচ্যুতি নগণ্য নয়, কিন্তু মানবজাতির উন্নতির জন্য যে তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছেন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—"র‍্যাবিলিয়াসের পুনরাভিনয় আমার কাজ। লোকে যাহাতে আমার কথায় কর্ণপাত করে সেজন্য আমাকে বিদূষক সাজিতে হইয়াছে, এবং সত্যকথাকে হাল্কা করিয়া বলিতে গিয়া সমধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।" কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। অধ্যাপক Harold Lasky বলেন "বার্ণার্ড শ' যে অকাতর পরিশ্রম করিয়াছেন একথা অতিরঞ্জিত নয়। তিনি আমাদের চিন্তারাজ্যে এমন একটি ভাব জাগাইয়াছেন, যাহা অপরের পক্ষে অসাধ্য। তিনি এ যুগের খুব বড় সঞ্জীবনী টনিক।"

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা (Grazia Deledda)

জন্ম—১৮৭৫ ; প্রাইজলাভ—১৯২৬।

নোবেল প্রাইজের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার একজন মহিলা কথা-শিল্পী লাভ করেন ১৯২৬ সালের পুরস্কার। তাঁহার নাম গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা। জাতিতে তিনি ইতালিয়ান্ এবং সার্দ্দিনিয়া দ্বীপের নুয়োরো নামক একটি ক্ষুদ্রগ্রামে তাঁহার জন্ম। তিনি কৃষককন্যা। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সার্দ্দিনিয়ার অধিবাসীদিগের ভিতর কুসংস্কার এখনও বদ্ধমূল; এজন্য স্কুল কলেজের উচ্চশিক্ষা লাভ তাঁহার ভাগ্যে হয় নাই। তাঁহার যা কিছু শিক্ষা নিজের চেষ্টায়—গৃহের অভ্যন্তরে। বিবাহের পূর্ব্বপর্য্যন্ত তিনি সার্দ্দিনিয়াতেই বাস করিতেন। এই সুন্দর দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও অধিবাসীদিগের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন তাঁহাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাসের আখ্যানবস্তু যে সার্দ্দিনিয়া হইতেই গৃহীত, বিচিত্র কি? কয়েকখানি গ্রন্থে তিনি আধুনিক ইতালির নাগরিক জীবনের চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু সহরগুলিকে যে তিনি বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাহা তাঁহার লেখা পড়িলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সার্দ্দিনিয়াকে তিনি হৃদয়ের সহিত ভালবাসেন। এই উপেক্ষিত দ্বীপ ও ইহার অধিবাসীদিগের দারিদ্র্য, শিক্ষাহীনতা, প্রভৃতির উপর তিনি জগতের ও বিশেষ করিয়া ইতালির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। এদিক দিয়া দেখিলে তাঁহার পুস্তকগুলিকে উদ্দেশ্যমূলক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার গ্রন্থগুলির কোথাও "উদ্দেশ্য" বড় হইয়া উঠিয়া আর্টকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

পনেরো বৎসর বয়স হইতেই দেলেদ্দা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস "ভস্ম" প্রকাশিত হইলে সাহিত্য-জগতে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ও সমালোচকগণের



গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। সংক্ষেপে উক্ত উপন্যাসের গল্পাংশ এই—সার্দ্দিনিয়ার একটি বুদ্ধিমান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক নিজ জননীর সন্ধান জানিত না। এজন্য তাহার পরিচয় বাহির করিয়া মাতৃ-অন্বেষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া সে দিবারাত্রি তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করে। পরিশেষে সে তাঁহার সন্ধান পায় কিন্তু তাহাদের মিলন আনন্দের না হইয়া অবশেষে দারুণ দুঃখময় হয়। মাতার কলুষিত ও হীন জীবন দেখিয়া যুবক অত্যন্ত ব্যথিত হয়, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে মাতাকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া সেবা

ও যত্ন করিতে চেষ্টা করে। তবে এরূপ মাতা যে তাহার ভবিষ্যৎ-উন্নতির একান্ত অন্তরায়, একথা সে ভুলিতে পারে না। নিজের অজ্ঞাতসারে যুবক মাতার মৃত্যু কামনা করিতে থাকে। অবশেষে তাহার মাতা পুত্রের মনোগত অব্যক্ত ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়াই যেন আত্মহত্যা করে ও পুত্রকে মুক্তি দেয়। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ও চরিত্র চিত্রণে গল্পটি পরম রমণীয়।

দেলেদ্দা এ পর্য্যন্ত প্রায় কুড়িখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'মা', 'সঙ্গীহীনের রহস্ত' প্রভৃতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। গল্পাংশে, ঘটনা সংস্থাপনে ও প্রধান চরিত্র দুইটির মনোবিশ্লেষণে তাঁহার "মা" নামক উপন্যাসখানির মত গ্রন্থ অল্পই দেখা যায়। পুত্রকে প্রলোভন ও শপথভঙ্গের পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্ম মাতার জীবন-দান এই পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয়। বহু সমালোচক ইহাকে শ্রেষ্ঠ গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার "Reeds in the Wind" নামক উপন্যাসখানিতে তিনি ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছেন। চরিত্র চিত্রণে ও সার্দ্দিনিয়ার চিত্তাকর্ষক দৃশ্য-বৈচিত্র্যের বর্ণনায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সমুজ্জ্বল। ইহার বৃদ্ধ সন্ন্যাসী চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়া উল্লেখ যোগ্য।

দেলেদ্দার পুস্তকগুলিতে নিরাশা ও বিষাদের চিত্রই বেশী। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, সম্ভবতঃ তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখের নয়। কিন্তু এ অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। দাম্পত্য জীবনে তিনি বিশেষ সুখী। তাঁহার দুইটি পুত্র আছে, তাহারা তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও গৌরবের বস্তু। তিনি তাহাদের সহিত নূতন করিয়া স্কুলের পড়া মুখস্থ করেন। জননী ও গৃহিণীর কর্ত্তব্য সুচারুরূপে পালন করিয়াও তিনি আর্টের দাবী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্য এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ যে, গৃহকর্ম্মের অবসরে তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দুই তিন ঘণ্টা লিখিয়া থাকেন। আর্টের নামে আজকালকার বস্তুতন্ত্রবাদ তাঁহার প্রিয় নয়। তাঁহার লিখনভঙ্গী ও বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার ভাষা মধুর ও কবিত্বময়। মানব জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব বিশ্লেষণে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী। সার্দ্দিনিয়ার আদিম অধিবাসীগণ তাঁহার নিপুণ তুলিকায় জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান ইতালীয় সাহিত্যে দেলেদ্দার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। উপন্যাস ব্যতীত ছোট গল্পেও তিনি সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। প্রতিভাশালিনী না হইলেও তিনি প্রকৃত শিল্পী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমিয়া দত্ত

ভারত কি ধ্বংসের পথে?

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র

ভয় ও ভাবনা

ভয় আছে, ভাবনাও আছে—লোকসংখ্যার বৃদ্ধিতে। ভয়—দেশে চাষ-আবাদের ভূমি যে পরিমাণে তাহাতে যদি সকলের সংকুলান না হয়। ভাবনা ত্রয়ী সঙ্কটের—দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অরাজকতার।

আইন কানুন? আছে বৈ কি; কিন্তু তাহারই জন্য কে ভয় রাখে? মরিয়া যে, অনশনে সপরিবারে মৃত্যুমুখে—তাহার কাছে কিসের আইন? ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান?—জঠর-জ্বালায় কাতর যে, স্ত্রীপুত্রাদির আর্ত্তনাদে ক্ষিপ্ত বাতুল উন্মাদ হিতাহিত-বোধ-রহিত, উচ্ছৃঙ্খলতায় সে ভরপুর,—বিধি-নিয়ম তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে, সাধ্য কি?

হিতাকাঙ্ক্ষীর ত্রাস

হিতৈষীরা তাই আতঙ্কিত হইয়াছেন। 'ইণ্ডিয়ান্ মেডিকেল গেজেট'—পত্রে জনৈক ইংরাজ লেখক সম্প্রতি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতের কল্যাণকামীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। বলিতেছেন—যে হারে প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে, দেশের আবাদী ও অনাবাদী জমি একত্র করিলেও উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের যোগান যথেষ্ট হইবে না, সুতরাং অচিরে তাহার প্রতিকার-চেষ্টা বিধেয়; চাই প্রতিবিধানের আশু সদুপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন, নহিলে অনাহারে ও রোগপীড়ায় দেশের সর্ব্বনাশ।

সমতার রক্ষা

ফসলের সহিত প্রজাসমষ্টির সমতা-বিধান সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম। ব্যতিক্রমের উদ্যোগ হইলে, অর্থাৎ প্রজা-বৃদ্ধি ঘটিলে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী দেখা দেয়, ফলে বহুর প্রাণহানিতে রাষ্ট্রের সমতা রক্ষিত হয়। চিরন্তন রীতি এই। তবে বুদ্ধিবলে মানুষ তাহার ব্যত্যয় সাধনে অবশ্য সক্ষম। লেখক বলেন, সুদক্ষ সৈন্যদলের সমাবেশে যুদ্ধের উপদ্রব বর্ত্তমান ভারতে নগণ্য, চিকিৎসার নবনব প্রণালীর উদ্ভাবনে ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে মহামারী ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নাই, খাল-বিল-কূপাদি খননের সুব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষ অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য যে মৃত্যুর কারণসমূহের সম্পূর্ণ উচ্ছেদে না হউক সফল প্রতিরোধে অকালমৃত্যু বহুলাংশে হ্রাস পাইতে বাধ্য এবং হইতেছেও তাই—ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের জনসংখ্যা প্রায় দশ কোটি বাড়িয়াছে, গত দশ বৎসরে শুধু বাংলায় শতকরা সাত জন! এই হিসাবে কষিলে শতকরা সাত জন! এই হিসাবে কষিলে শতবর্ষে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িতে পারে। এখনই ভূমিজাত পুষ্টিকর দ্রব্যের যোগান যথেষ্ট নয়, লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িলে দেশে কি হাহাকারই না উঠিবে!

শতবর্ষ পূর্ব্বের তুলনা

একশত বর্ষ পূর্ব্বে জনসংখ্যা অবশ্যই অনেক কম ছিল। ইতিমধ্যে জনমণ্ডলী বহুল বৃদ্ধি পাইলেও সে সময়ের তুলনায় বর্ত্তমানে প্রজাসাধারণের আর্থিক ও সর্ব্ববিধ অবস্থা বহুগুণে উন্নত। লেখকের মতে প্রয়োজনমত বিলখাল খনন, রেলের বিস্তার, কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতির নানা পন্থা আবিষ্কার হেতু ইহা সম্ভব হইয়াছে। যাহাতে জন্মের হার বাড়ে ও শিশু-মৃত্যুর কমে তজ্জন্যও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।

শিশু মঙ্গল না অমঙ্গল?

শিশুর প্রসঙ্গে লেখক বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, শিশু-মঙ্গল-সমিতির শিশুরক্ষা-চেষ্টার প্রতি কটাক্ষ করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্তপথে চালিত, দেশের মঙ্গল শিশুর রক্ষায় নয়, শিশুর মৃত্যুতে।

কথাটা অদ্ভুত অবশ্যই। ব্যাপার দাঁড়াইল এইরূপ।

শিশুমঙ্গল-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষেরা বলিতেছেন—ভারতের মত এত শিশু-মৃত্যু দুর্নিবার আর কোথাও নাই। এরূপ চলিলে দেশ অচিরে না হউক নিকট ভবিষ্যতে ছারে-খারে যাইবে। এস, বাঁচাই শিশুকে, শিশুর সঙ্গে জাতি বাঁচিবে—দেশও।'

'গেজেটে'র লেখক ধুয়া ধরিয়াছেন উল্টা সুরে—'গগন-ভেদী কলরব কেন? শিশুকেত বাঁচাইলে, শিশু বড় হইলে খাইতে দিবে কে? তাহাদের পর্য্যাপ্ত উদরান্ন দেশ যোগাইতে পারিবে কি? দীর্ঘকাল খাওয়াইয়া পরাইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া ত বড় করিলে, তাহার পর? ফসলের অল্পতায় খাদ্যদ্রব্যের অনটনে অকালমৃত্যু বরণ করা ভিন্ন পূর্ণবয়স্কের গত্যন্তর থাকিবে না। তখন দুর্দশা এই দাঁড়াইল না কি যে, জনকজননীর লালনপালন জনিত অশেষ ক্লেশভোগ পণ্ড, অর্থব্যয় ব্যর্থ? অধিকন্তু শৈশব অপেক্ষা বয়সের মৃত্যুতে তীব্রতর রোগযন্ত্রণা ভোগ অনিবার্য্য। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া যাহারা ভবলীলা সাঙ্গ করিল তাহাদের নিকট হইতে, উসুল হইল কি? শৈশবে মরিতে দিলে অকারণ দুর্ভোগ হইতে অভি-ভাবক ত্রাণ পাইবে, যে সকল শিশু টিকিয়া যাইবে অধিক-তর যত্নলাভে তাহারা সুস্থ সবল ও জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে এবং ভবিষ্য পোষ্য পোষণেও সমর্থ হইবে। সুতরাং প্রমাণ হইল না কি যে, শিশুকে বাঁচাইবার অকাতর চেষ্টা অহেতুক, তাহাতে 'খাল কাটাইয়া কুমীর' ডাকা সার হইবে? অতএব মায়াকান্না ভুলিয়া—দাও মরিতে শিশু-দিগকে দলে দলে।'

লেখক নানাদিক দিয়া সমস্তার আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—'প্রজার সংখ্যা অনুপাতে খাদ্যের অভাব ঘটিলে প্রকৃতি-দেবী রেহাই দিবেন না, অর্দ্ধাশন অনশন ও ব্যাধি এই ত্রিমূর্ত্তিকে সর্ব্বত্র ছাড়িয়া দিবেন, চিকিৎসকেরাও নূতন নূতন ব্যাধির প্রতিকারে অপারগ হইবেন, খাদ্যাভাবে যাহার দেহ-যন্ত্র বিকল ঔষধই বা তাহার রোগের কি উপশম করিবে? বহুকষ্টে ও অর্থব্যয়ে মানুষ করিয়া খাদ্যসঙ্কটে কালকবলে বয়স্ক পুত্রকন্যা সমর্পণে অভিভাবকের প্রাণে কি যে বিবার্চ্চিদহন তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব যত পারে মরুক্ শিশু রাশিরাশি।'

ভারতবাসীর বিবাহ-লোলুপতা

ভারতীয়েরা যে অতিমাত্রায় বিবাহ-লোলুপ তাহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হয়। জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ এই তিনটি যে জীবনের প্রধান ঘটনা—সে বিষয়ে আমরা পূর্ণ সজাগ। সেকালে মাতৃগর্ভেই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া যাইত—যদি তোমার পুত্র এবং আমার কন্যা জন্মে এই সম্ভাবনায়। কথা ফুটিতে না ফুটিতে বালকবালিকার মনে বিবাহের ভাব জাগাইয়া দেওয়া হয়—খেলাধূলায়, ব্রতপার্ব্বণে নানাভাবে। ছয়মাস বা এক বৎসর বয়সে পরিণয় এখনও বিরল নয়—সর্দা আইন অমান্যের তুমুল ঢেউ বহিতেছে।

এই উৎকট বিবাহ-প্রীতির প্রতি লেখক উষ্মা প্রকাশ করিয়েন, বিচিত্র কি? বলিতেছেন—নাবালকের বিবাহ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত। পাশ্চাত্যে বালকবালিকারা উদ্বাহের মনোভাব প্রকাশ করিলে মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। সেরূপ প্রসঙ্গও সেখানে অকথ্য ও অশ্রাব্য—পারিবারিক আবেষ্টনী ও শিক্ষাদীক্ষার গুণে অবশ্যই।

কিন্তু বাল্যবিবাহের মূলীভূত কারণ কি? প্রাচীনকালে যুদ্ধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব বশতঃ হয়ত এই কুপ্রথার উদ্ভব হইয়াছিল, কে জানে! বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে যত শীঘ্র ও যত বেশী সন্তানলাভ সম্ভব তজ্জন্য চেষ্টার হয়ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, প্রথার অবসান হয় নাই।

লেখক তাহা বুঝিয়াছেন এবং আরও বুঝিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য ও যৌবন-বিবাহ এদেশে প্রবর্ত্তণের আশা দুরাশা, তাই

জন্ম নিয়ন্ত্রণের

সুর তুলিয়াছেন। বলিতেছেন—কৃত্রিম উপায়ে জন্মশাসন একান্ত বাঞ্ছনীয়, ইহার প্রচারকার্য্য সজোরে চালান আবশ্যক। মহীশূরের নৃপতি স্বরাজ্যে এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন; অন্যান্য প্রদেশেও ইহার প্রচার পূর্ণমাত্রায় না চলিবে কেন? জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অপেক্ষা জন্মরোধ করাই যে সমীচীন তাহাতে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। এ বিষয়ে ভাবিবার বস্তু বহু প্রকারের। তজ্জন্য যোগ্য দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ নরনারী লইয়া

কমিশন বা বৈঠক

বসান অবিলম্বেই আবশ্যক। নহিলে ভারতের সর্বনাশ, ভারতবর্ষ নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এই বৈঠকে সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত ও বিচার হইবে এবং ইতিকর্ত্তব্য স্থির হইবে।

আমাদের মন্তব্য

মাল্থস্ নীতি

'গেজেটে'র লেখক যে ধুয়া তুলিয়াছেন তাহা নূতন নয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম বয়সে আমরা অনুরূপ বাক্‌বিন্যাসের সম্মুখীন হই। ডাক্তার মাল্থস্ প্রচার করেন যে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দিনদিন বাড়িতেছে অথচ ফসলের উপযোগী ভূমির পরিমাণ একই রহিয়াছে, সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবী এবং সঙ্গে-সঙ্গে দুর্ভিক্ষ মহামারী ও উহার অগণিত অনুচরের আবির্ভাব অনিবার্য্য, অতএব সময় থাকিতে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য, জন্মনিরোধই প্রতিকারের একমাত্র পন্থা, জন্ম-শাসন-মূলক কৃত্রিম উপায়ের অবাধে সর্ব্বত্র প্রবল প্রচার অত্যাবশ্যক।

যত দোষ নন্দ ঘোষ

সেই হইতে এ পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে একদল ভাবুকের উদয় হয়। তাঁহারা রব তুলেন—বাঘ এল, খাদ্যাভাবে পৃথিবীর লয় হ'ল। ধরিত্রী কিন্তু সনাতন অবজ্ঞাভরে আপনমনে চলিয়াছে, ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ নাই, ভয়ের চিহ্-

মাত্র নাই। ভারতে লোকসংখ্যা যে বাড়িয়া চলিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু ইউরোপের নানা-দেশের এবং চীন ও জাপানের আপেক্ষিক তুলনায় বৃদ্ধির হার অনেক কম। নির্ভরের না হইলেও ইহা যে আশ্বাসের কথা তাহা নিশ্চয়।

এই লোকসংখ্যার বৃদ্ধিতে উদ্বেগ-অশান্তির কারণ কি বস্তুতঃ আদৌ নাই? বর্ত্তমান আর্থিক দুর্ব্বৎসরে এই প্রশ্ন স্বতঃই মন আন্দোলিত করে, যদিও সারা পৃথিবী জুড়িয়া অর্থকৃচ্ছ্রতা, দুর্ভাগ্য ভারতের একার নয় এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধিও ইহার মূলীভূত কারণ নয়। ভারতের লোকসংখ্যা অন্যায় অসঙ্গত বা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধেও মতভেদ যথেষ্ট। কিন্তু এ কথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে জমির উপর নিত্যই বেশী চাপ পড়িতেছে, ভূমির উৎপাদিকা ও উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতেছে—স্বাভাবিক অপচয় ও ক্ষয়ের প্রতিবিধান অভাবে এবং কর্ষণোপযোগী ভূমির অসংখ্য ভাগ বাটোয়ারা হেতু। এদিকে কলকারখানা আদির অভাবে জিনিস তৈয়ারির কাজও ঝিমাইয়া আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে ফসল যাহাতে বাড়ে, ঘরে ঘরে গৃহস্থলীর নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য যাহাতে প্রস্তুত হয়, কলকারখানা স্থাপিত হইয়া দেশের প্রয়োজন দেশ হইতেই মিটে তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই বিষয় স্থানান্তরে সবিস্তারে আলোচিত হইল।

শিশুই দেশের আশাভরসা

শিশুবংশ নির্ব্বংশ করিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। শিশুকে বাঁচইয়া রাখায় ধর্ম্ম ও মঙ্গল দুই আছে। জাতির সম্বল যে তাহারাই। জনসংখ্যার হ্রাসে দেশের কল্যাণ—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না। চাই বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার গ্রাসাচ্ছাদনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা।

জন্ম-নিরোধ না ব্রহ্মচর্য্য?

কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিরোধে প্রত্যবায় আছে। যে দম্পতি ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করে ও সেই অনুসারে চলিতে থাকে তাহাদের প্রতি নিষেধ-বাণী প্রচারে ফল নাই। কৃত্রিমতা বহু রোগের আকর, মানসিক অধোগতিও তাহাতে পূর্ণ মাত্রায়—এ কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য মাত্র। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানুষ সর্ব্বদাই নিরত। ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ যোগ-প্রক্রিয়ায়—যে সমাধিসাধনে ভগবানের সান্নিধ্যে পৌছান যায় তাহাতেও। স্বাভাবিকতার দোহাই দিয়া জন্ম-শাসনে অধর্ম্ম—শুধু এই কথা প্রচার করিলে বিংশ শতাব্দীতে লোক হাসিবে। তবে জন্ম রোধের ফল যে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি-সঞ্চয় ও অসংযত যৌনলিপ্সা এবং সেই ফল যে অশুভ ইহার উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য।

জন্ম-নিরোধের কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে সমর্থ কে বা কাহারা তাহারও একটা নিরিখ আবশ্যক। শিক্ষিত পুরুষ ও শিক্ষিতা নারীর পক্ষেই তাহা সম্ভব। তাহাদের দৃষ্টান্তে আপামর সাধারণের মধ্যে যদি উহার প্রসারতা লাভ ঘটে এই আশা। তবে দেশে এখনও যেরূপ শিক্ষার অভাব তাহাতে উহার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কৃত্রিম প্রক্রিয়ার প্রচলন সীমাবদ্ধ থাকিলে পরিণাম এই হইবে যে, শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক সংখ্যা কমিবে এবং অশিক্ষিতের মধ্যে প্রচুর বাড়িবে। ফলে দেশের দুরবস্থার চূড়ান্ত—মস্তিষ্কের স্থান গৌণ হইবে ও পাশবিক বল প্রাধান্য লাভ করিবে।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ঋষি মনুর কথা মনে পড়ে। তিনি বলেন—মাংস ভক্ষণে মদ্যপানে ও মৈথুনে দোষ নাই কারণ মনুষ্যের ইহাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু এসকল হইতে নিবৃত্ত হইলে মহাফললাভ হয়। নিবৃত্তির পরম উপায় ব্রহ্মচর্য্য পালন। সেই ব্রহ্মচর্য্য এ দেশের ধাতুগত নহে—'গেজেট'-লেখকের ইহাই সুস্পষ্ট অভিমত। যে হিন্দুর দেশে অসংখ্য বিধবা ব্রহ্মচারিণী সে দেশে ব্রহ্মচর্য্যের চাষ যদি বিফল হয়, সফল হইবে কি ভোগবিলাসের ভূখণ্ডে? ত্যাগের মন্ত্র যে দেশে মজ্জাগত সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের সৌধ গড়িয়া উঠিবে না ত পাশবিক আচরণের লীলাকেন্দ্রে মূর্ত্ত হইবে কি? কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়-সেবায় যে মানসিক অধঃপতন জ্ঞান গরিমায় সেই ইন্দ্রিয়ের সংযম অভ্যাস এমন কি কঠিন? সংযমের সাধনকালে কাহারও কাহারও কখন কখন পতন ঘটিতে পারে—মানুষ দুর্ব্বল, তা' বলিয়া আদর্শের খর্ব্বতা বা চেষ্টার বিরতি কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। অভ্যাসবলে অসাধ্য-সাধন অবশ্যই ঘটিবে, হিন্দুস্থানে আবহমান কাল ঘটিয়াও আসিয়াছে, এখনই বা তাহার

ব্যতিক্রম কেন হইবে? তবে জপমালা হওয়া চাই সেই পুরাতন কবি-বাক্য—'মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন।'

রাজনৈতিক দিক

জনসংখ্যার হ্রাসে দেশের প্রভূত অকল্যাণ। দেশ স্বাধীন থাকিলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা অসাধ্য, পরাধীন অবস্থায় সাফল্যের সহিত স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা অসম্ভব। সংখ্যা-হ্রাস হেতু ফরাসী রাজনীতিকের মাথাব্যথা কেন, অবিবাহিত ও বিবাহিত নিঃসন্তানগণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য কেন, বহু সন্তানবতীকে রাজকোষ হইতে পেন্সন দান কেন, তাহা নিশ্চয়ই বিবেচনার বিষয়। বলা বাহুল্য, এই ফরাসী রাজ্যই জন্ম-নিরোধের আদি ও অকৃত্রিম লীলাক্ষেত্র, সেখান হইতেই ঐ মতবাদ নানাদেশে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

জন্ম ও মৃত্যু প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত। পরের মুখাপেক্ষী যাহাকে থাকিতে হয় তাহার জীবন মৃত্যুরই সমতুল্য। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নিকেতন ফরাসী মুলুকে পরাধীনতার ছায়াও অসহ। জনসংখ্যার হ্রাস হইলে সমরাঙ্গনে লড়িবে কে?—এই ভাবনায় ফরাসী আকুল। ভবিষ্যৎ মহাবিপদের আতঙ্কে যাহারা অধীর আমরা কি তাহাদেরই শঙ্কাজনক প্রণালীর অসার অনুকরণ করিব ও শৃঙ্খল চিরস্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত পদাঙ্ক অনুসরণ করিব? ইহা সর্ব্বথা আলোচ্য, তাই এখানে তাহার ইঙ্গিত।

বৈঠকের অধিবেশন

কমিশন বসাইয়া সকল বিষয় বিশ্লেষণ ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'—ভারত-তহবিল। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে ব্যয়বহুল কমিশনের সার্থকতা কোথায়? তাহাও ত শুধুই হৈ চৈ, দিন কয়েক মহাধুমধাম, অজস্র অর্থব্যয়! প্রস্তাব কোন মতেই অনুমোদনীয় নয়। সেই ধন দেশের ধনবৃদ্ধিকল্পে—অর্থসঙ্কটে পতিত কলকারখানার মালিককে ঋণ দিলে বহু শ্রমিকের অন্নসংস্থানের উপায় হইবে।

কর পন্থা?

এখন শেষ কথা—পন্থা কি? অসঙ্গত বৃদ্ধি না হইলেও এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় কম হইলেও ভারতের লোকসংখ্যা যে বাড়িতেছে তাহা নিশ্চিত, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু দেশবাসীর আহার্য্য সংগ্রহের উপায় কি? আমাদের মতে

(১) ভূমির উৎকর্ষসাধন।

(২) চাষ-আবাদের নূতন নূতন পন্থা অবলম্বন—যন্ত্রপাতির সাহায্যে।

(৩) যাহাতে ফসল ও শস্যাদির ফলন বেশী হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন। সেই সঙ্গে নানাবিধ দ্রব্যের উৎপাদন। শুধুই ধান্য, শুধুই তুলা বা শুধুই পাট, গম, তিসি লইয়া থাকিলে চলিবে না; সকলগুলিকে লইয়া কৃষি সুবিস্তৃত হওয়া চাই।

(৪) কুটীর শিল্পের বহুধা প্রচলন।

(৫) বিবিধ কলকারখানা প্রতিষ্ঠা—যাহাতে বিদেশী আমদানির সহিত প্রতিযোগিতা চলে।

(৬) বহির্বাণিজ্যের বিশেষপ্রবর্ত্তন—দেশ দেশান্তরে পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি। ব্যবসায়ে প্রচুর ধনাগম উহাতেই।

(৭) চাউল, গম আদি নিত্য-ভোজ্য দ্রব্য এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি যাহাতে সুলভ হয় তাহার সুব্যবস্থা।

উপরোক্ত উপায়-সমূহ অবলম্বিত হইলে লোকসংখ্যা শতবর্ষে দ্বিগুণ কেন চতুর্গুণ হইলেও ত্রাসের বা জন্ম-নিরোধ প্রক্রিয়ার প্রচলনের কোনই কারণ উপস্থিত হইবে না। স্বাবলম্বন তাহার প্রধান সহায়ক, বলাই বাহুল্য।

যে পরিমাণে আবশ্যক সেইমত সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যই যে স্বদেশে উৎপন্ন না হইলে চলিবে না তাহা নয়। পৃথিবীর বহু দেশে খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, অপর দেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বিধাতার কৃপায় ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠ, সেটা আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু যদি উৎপন্ন দ্রব্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয় বরং স্বল্পতর হয় তাহাতেও আতঙ্কের কারণ নাই। দেশান্তর হইতে ভক্ষ্যদ্রব্য আমদানি করিলেই চলিবে।

প্রধান কথা কৃষিজাত শস্যাদির প্রাচুর্য্য নয়, দেশের ধনাগম। ভারতভূমি যাহাতে প্রকৃত ঐশ্বর্য্যশালিনী হয় তাহাই অবশ্যকরণীয়, কৃষির উন্নতি তাহার মধ্যে অন্যতম পন্থা মাত্র।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও উচ্চচিন্তা পোষণের সহিত পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশমত চলিলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব। সেই দিকে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিলে ভারতের লোকসংখ্যা হ্রাসের কোন প্রয়োজন কখন ঘটিবে না, শিশুহত্যা বা জন্মনিরোধেরও আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে না। 'গেজেটের' লেখক ঐ দুই কথায় যে আমাদিগকে সচকিত ও শঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা স্বপ্নের মতই অলীক প্রতীয়মান হইবে।

মাভৈঃ!—বাণীর উচ্চাটন সহজ, সেই বাণীর সার্থকতা সম্পাদনে অক্লান্ত শ্রম ও অশ্রান্ত চেষ্টা আবশ্যক! উদ্যোগী পুরুষের সহায় দেবতা স্বয়ং। বিদেশী কর্ত্তৃকদেশের অর্থ-শোষণনীতির তীব্র প্রতিবাদেই দুঃখদৈন্য দূর হইবে না। নিজেদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য অত্যাবশ্যক—আত্মপ্রত্যয় ও স্বকীয় শক্তির সর্ব্বথা বিকাশ-সাধন।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

দুই নারী

—বড় গল্প—

—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এম্-এ

পূর্ণিমা রাত। সহ্যাদ্রির চূড়ায় চূড়ায় স্বপ্নের আবেশ লেগেচে। নীচে কৃষ্ণা, শাদা বালুচরার মাঝখানে কালো পাথরের উপর দিয়ে ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো জল, জ্যোৎস্নায় ঝল্‌সে উঠ্‌চে।

একদিকে জোয়ারী ক্ষেত, অপর দিকে বিস্তীর্ণ ঘাট, ধাপে ধাপে সিঁড়ি এসে কৃষ্ণাতে নেমেচে। ওপরে দেব-মন্দির, বড় তীর্থস্থান।

আজ পূর্ণিমার যাত্রা। লোকে লোকারণ্য। চারিদিক হতে "বাসে" ভরে যাত্রী এসেচে। নরসোবা দেব—যার নামে গাঁয়ের নাম নরসোবাবাড়ী—এ অঞ্চলে অতি প্রসিদ্ধ। সুদূর কোঁকন হতে দলে দলে লোক এসে এখানে বাস করে, রোগ সারাবার জন্তে দেবতার পায়ে ধন্না দেয়।

সন্ধ্যায় দেবতার পাল্‌কি বেরুল। মস্ত ভিড়। দু তিন জন মেয়েমানুষের 'গায়ে দেব এল',—তারা পাগলের মত নাচ্‌ল!

রাত হয়ে এলে একে একে "বাস" গুলো চলে যেতে লাগ্‌ল। স্থানটা খালি হয়ে পড়্‌ল। শুধু ঘাটের সিঁড়ির ধাপে ধাপে কেউ বসে রইল, কেউবা মন্দিরের সমুখের আঙিনায় শুয়ে পড়্‌ল। রাতের মৃদু বাতাসের সঙ্গে অস্পষ্ট আলাপ ভেসে চল্‌ল।

হঠাৎ তা ডুবিয়ে দিয়ে মন্দিরের এক পাশ হতে একটা মেয়ে গান ধর্‌ল। করুণ সুর! যেন একটা গভীর ব্যথা 'গুমরে গুমরে' উঠ্‌ছিল। বাতাসকে যেন চোকের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছিল! লোকে চুপ করে সে গান শুন্‌তে লাগল।

গান শেষ করে মেয়েটি উঠ্‌ল। মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছোট মন্দির। তার দরজার পাথরটাকে লোকে মাথা দিয়ে ঘসে' ঘসে', কালো করে দিয়েচে। মেয়েটী তারই ওপর মাথা রাখ্‌ল, একটা বুক-কাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে পাথরটাকে যেন তাতিয়ে তুল্‌ল।

কোমল মুখখানি তার। মাথার চুল কাটা। লাল কাপড়ে সব শরীর ঢাকা। গায়ে জামা নেই। হাত খালি।······সে বিধবা।

হাত জোড় করে দেবতাকে কি বল্‌ল—তা' সে জানে আর তার দেবতা জানে। হয়ত প্রাণের নিভৃত কোনো কথা, নিশ্চয়ই বড় ব্যথার কথা, যা' জগতে কারো কাছে বল্‌তে পারে না। প্রণাম করে মেয়েটি ধীরে ধীরে মন্দিরের পাশের রাস্তা দিয়ে বাইরে চলে গেল।

সে যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিক থেকে আর একটী মেয়ে এল। তার চেয়ে বয়সে বড়। তার কপালে সিঁদুরের টিপ, পরণে আস্‌মানী রংয়ের শাড়ী, পায়ের পাতা পর্য্যন্ত পড়েচে, গায়ে পোল্‌কা, হাতে দুগাছা করে সোনার চুড়ি, পোলকার হাতার উপর এঁটে রাখা হয়েচে। নব্য ধরণের মেয়ে সে। মাথায় ঘোমটা, সুতরাং ব্রাহ্মণ নয়।

মেয়েটি ধীরে ধীরে এসে দেবতার সাম্‌নে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে মাথা নোয়াল। সেই কালো পাথরটার ওপর উপুড় হয়ে প্রণাম করল। হঠাৎ তার সুন্দর পাত্‌লা ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠ্‌ল, একটা কালিমা এসে সারা মুখখানি ছেয়ে ফেল্‌ল, কালো পাথরটার ওপর তার মসৃণ কপালটী সে নির্ম্মমভাবে পিষ্‌তে লাগ্‌ল।

আবার একটা বুক ভাঙা নিঃশ্বাস এসে ওই পাথরটাকে যেন তাতিয়ে দিল।

তারপর মেয়েটি উঠে, পাশের কুণ্ড হতে একমুঠো ভস্ম নিয়ে খানিকটা কপালে মাখ্‌ল, বাকিটা হাতে করে নিয়ে চলে গেল।

মন্দিরের অপর দিকে একজন বুড়ো মেয়েমানুষ রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে বসে জপ কচ্ছিলেন, মেয়েটি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধা দেখ্‌ছিলেন মেয়ের তাঁর চোক দুটি বেয়ে অকারণ জল পড়্‌চে।······মেয়ের অন্তরাত্মা

জানত, তা মোটেই অকারণ নয়। আজ সে কারণকে ঘিরে ঘিরেই তার মন উতলা হয়ে উঠছিল, আর চোকের জলের ও দীর্ঘশ্বাসের মালা গাঁথছিল।

* * *

সে ছবছর আগেকার কথা।

একদিন সকালে সাতটার গাড়ীতে কিষাণপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হ'তে এক তরুণ যুবক নামল। তার চোখা নাক, ধারাল চোক, ফর্সা রং, জোরালো ছটি বাহু, দেখলেই মনে হয় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তার গায়ে মোটা কাপড়ের শার্ট ও কোট, মাথায় খদ্দরের টুপী, হাতে দেশী কম্বলে বাঁধা একটা গাঁঠরি। তা' হাতে করেই সে ষ্টেশন হ'তে বেরুল। রাস্তায় প্রভাতের মোলায়েম রোদ ছড়িয়ে পড়েছিল, পাশ দিয়ে টাঙ্গার পর টাঙ্গা ছুটে যাচ্ছিল, তা' দেখে যুবকের মন খুসী হ'য়ে উঠল। বহুকাল আশায় থেকে থেকে সে আজ পাড়াগাঁ ছেড়ে সহরে পড়তে এসেচে।—কিন্তু ভাগ্য-দেবতা যদি থেকে থাকেন, আর হাসতে জানেন, তবে নিশ্চয়ই যুবকের এ উৎসাহ দেখে তাঁর হাসি সামলানো কঠিন হ'য়ে পড়েছিল। কেননা, আজ যে এত আশা নিয়ে চলেচে, এক বৎসর না যেতেই······থাক্, সেকথা পরেই বলচি।

* * *

সেদিন মডেল স্কুলের ম্যাট্রিক ক্লাসে একটা নূতন নাম উঠল,—মাধব রামচন্দ্র কর্ম্মাকর। স্কুল দেখে মাধব আনন্দিত হ'ল। সুন্দর তেতলা বাড়ী। ছেলেরা কেমন ফিটফাট, পরণে শাদা ধবধবে ধুতি বা পাজামা, মাথায় পশমের টুপী বা রঙিন পাগড়ী, গায়ে অনেকেরই পশমের কোট। তাদের সঙ্গে মেয়েও আছে, তাদের নূতন ধরণের শাড়ী, নূতন ধরণে চুল বাঁধা, খোঁপায় ফুল!······এ জায়গা তার পাড়াগাঁ হ'তে কত বিভিন্ন!

সন্ধ্যায় মাধব ঘরে আলো জালিয়ে তার গাঁঠরিটি খুলে মেজের ওপর বিছানা পাতল। গাঁঠরির ভিতর হ'তে একখানা ছোট ছবির ফ্রেম বেরুল, তার উপর বহু চন্দনের টিপ। সে মারুতির ছবি। মাধব তা' দেয়ালে টাঙ্গাল। তার পর মারুতিকে অভিবাদন করে অভ্যাসমত কয়েক শত 'জোড়' ও 'বৈঠক' করল। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে কম্বলের ওপর শুয়ে পড়ল। কম্বলখানি আসবার সময় গাঁ হ'তে কিনে এনেচে। বুড়ো ধোণ্ডীবা তা' তার জন্যে বিশেষ করে তৈরি করে দিয়েচে। মাধবের চোক যখন ঘুমে জড়িয়ে এল, তখন তার সামনে ভেসে উঠল, লম্বা, কালো, বড় বড় গোঁফওয়ালা ধোণ্ডীবা, বাবল গাছের পাশে বসে টাকু দিয়ে ভেড়ার লোমের সুতো পাকাচ্ছে—পাশে তার স্ত্রী ও ছেলের বৌ তাঁত বুনচে।······

* * *

ধীরে ধীরে মাধব স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে লাগল। গোপালের সঙ্গে তার ভাব হ'ল। গোপাল ক্রিকেট খেলোয়াড়। সে যখন "লেগ-গার্ড" ও "নাক্‌ল-গার্ড" পরে ব্যাট হাতে নিয়ে 'হিট্' করত তখন মাধব অবাক হয়ে চেয়ে থাকত।

আর ভাব হ'ল জয়সিং-এর সঙ্গে। জয় সিং একজন গাইয়ে। তার "বন্দেমাতরম্" গানটা মাধবের বড় ভাল লাগত। জয় সিং অভিজাত বংশের ছেলে। তার মা মুসলমান বেগমদের মত অসূর্য্যম্পশ্যা। কিন্তু জয় সিং মায়ের স্বরূপ জগতের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েচে। তার চঞ্চল চোক, পাতলা ঠোঁট, রাঙা গাল, তার কাঁপা স্বর—সব হুবহু তার মা'র। তাকে দেখলেই মনে হয় 'মায়ের ছেলে'!

মাধব কিন্তু ক্রিকেটও খেলত না, গানও গাইত না। বিকেলে যখন সব ছেলেরা খেলার মাঠে, তখন মাধব একখানি লেঙ্গুট পরে নদীর জলে মাইলখানেক পর্য্যন্ত সাঁতার কাটত! গোপাল তাকে খুঁজতে খুঁজতে নদীতে গিয়ে পেয়েচে, কিন্তু খেলাতে নিতে পারে নি। কারণ, মাধব নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে অভ্যস্ত নয়, তা'তে বন্ধুত্ব থাক্ আর যা'ক্। সে একলাই থাকত। লোকে বলে গৃহই দুর্গ। মারাঠাদের পুরাণো ধরণের নিচ্ছিদ্র ঘরগুলি যে দুর্গ হিসেবে তৈরি করা হ'ত তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু মাধবের পক্ষে শুধু গৃহ নয়, তার দেহখানিই দুর্গ। অধিকাংশ সময়েই তার "দ্রু-ব্রীজ"টা

ভুলে, বাহিরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়ে, নিজের মধ্যে নিজে বাস করত।

ভোরে উঠে কসরত, পড়াশোনা করত, খাবার বেলা পাশের হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসত, বিকেলে নদীতে বেত, সন্ধ্যায় চুপটি করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড়ের পানে চেয়ে থাকত, দেখত পাহাড়ে রাস্তার ওপর মোটরের আলোগুলি কেমন করে এক একবার জ্বলে ওঠে, আবার নিবে যায়।

* * *

এক ভাদ্রদিনের অপরাহ্নে মডেল স্কুলের ম্যাট্রিক ক্লাশে শিক্ষক বসে পড়াচ্ছিলেন। বিষয় ভূগোল। লাইব্রেরী থেকে মানচিত্র আনা হয়েচে, খোলা হয় নি। শিক্ষক জার্ম্মেনীর নগরগুলির নাম কর্চ্ছিলেন। ক্লাসের অতি ভাল ছেলে শিবরাম, সে নাম মনোযোগপূর্ব্বক শুনছিল। অন্যেরা প্রায় সবেই উদাসীন। মেয়েদের একজন খাতায় একটা চিত্র আঁকবার চেষ্টায় ছিল। অপরেরা তা' দেখছিল। সে চিত্রটা শিক্ষকের, না কোনও ছাত্রের, না কাল্পনিক, তা' বলা কঠিন। ছেলেদের মধ্যে কেউ অর্দ্ধ নিদ্রামগ্ন। মাথায় বিশাল হলদে পাগড়ী পরা শ্রীমান্ গজানন আগলাওয়ের চিত্ত বোধ হয় কল্পনায় সেই পূর্ব্বপুরুষের অনুসরণ কর্চ্ছিল যিনি (যুদ্ধে কিংবা লুটে) কোথাও আগুন লাগিয়ে বংশধরদের জন্য এ মহাপদবী অর্জ্জন করে গেচেন। শ্রীমান্ নরহরি বকরে (তার আদিপুরুষ কি ছাগল রাখতেন?) রাস্তায় একদল ভিখারীর দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ ঘরের এক কোণ হ'তে এক টুক্‌রা কাগজ টুক্ করে এসে মেয়েদের ডেস্কের পাশে পড়ল। গুটিকতক ছেলে তা' দেখে মুচকি হাসল। মেয়েদের একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কোণের ছটি ছেলের দিকে চাইল। মাষ্টার নিদ্রালু কণ্ঠে বলে যেতে লাগলেন "বার্লিন্, ড্রেসডেন্, লিপ্‌ঝিক্‌…।"

ঘণ্টা বাজলে মাষ্টার ও মেয়েরা বেরিয়ে গেল। তখন শ্রীমান্ বামন তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ডেস্কের নীচ হতে কাগজের টুক্‌রাটা তুলল, এবং খুলে পড়তে লাগল। তাদের মধ্যে হাসির রোল উঠল।

টিফিনের ছুটিতে প্রায় সব ছেলেই যখন বাইরে চলে গেল, তখন বামন চুপি চুপি তার ফাউণ্টেন পেন্‌টা বের করে মেয়েদের ডেস্কের উপর লিখতে লাগল, "কমলাবাই…।" হঠাৎ পেছন হ'তে সজোর একখানা হাত এসে তার পেনটা কেড়ে নিল। বামন ফিরে দেখল, মাধব। মাধব ফাউণ্টেন পেন দিয়ে ডেস্কের লেখাটা বার বার কাটতে কাটতে পেন্‌টাকে ভোঁতা করে ফেলল।

পরের ঘণ্টায় যখন ক্লাসে মাষ্টার এলেন, তখন বামনের পেনটা তাঁর হাতে। সে মূল্যবান্ পেনটাকে এমন ভাবে নষ্ট করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মাধব চুপ করে রইল। মাষ্টার বহু বলেও মাধবের মুখ হ'তে কথা বের করতে পারলেন না। তখন রেগে বেত হাতে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন।

হঠাৎ সমস্ত ক্লাসে একটা অস্বাভাবিক রকম গাম্ভীর্য্য দেখা গেল। যেখানে ছেলেমেয়েরা একত্র পড়ে, সেখানে ছেলেরা সব সহ্য করতে পারে, বাদে মেয়েদের সামনে মার খাওয়া। এ অপমান অসহনীয়। মাষ্টার আসাতেই মাধব বিচলিত হয়ে পড়ল। মাষ্টার বুঝলেন, ব্যাপার গুরুতর। বেত ছেড়ে ফাইন করলেন।

তখন জয়সিং উঠে আসল কথাটা ফাঁস করে দিল।

এদেশে ছেলেমেয়েরা এক ক্লাসে পড়লেও তাদের মধ্যে মেলামেশা হয় না। মেয়েরা একপাশে বসে, ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে না, শিক্ষকেরাও তাহাদের বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। স্থির প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসে থাকাই তাদের আদব, তাদের কাছে না ভিড়াই ছেলেদের শিষ্টতা। এ শিষ্টাচারের ব্যতিরেক গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হয়।

"বামন মেয়েদের ডেস্কের উপর লিখছিল"? বলে মাষ্টার রেগে উঠলেন। কিন্তু কি ভেবে শাসন ছেড়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। ছেলেদের বোঝালেন, এ ক্লাসটা একটা পরিবার, ছেলেমেয়েরা ভাইবোন, ইত্যাদি। বিষয়টা বড় বড় কথার মধ্য দিয়ে কেটে গেল দেখে' বামন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু মাধবের সঙ্গে তার শত্রুতার সূত্রপাত হ'ল।

* * *

তা' গুরুতর হয়ে উঠল কয়েক দিন পরে খেলার মাঠে। মডেল স্কুল আর সরকারী স্কুলে ক্রিকেট ম্যাচ। ছেলেদের মধ্যে ভয়ানক হৈ-চৈ! দুপুর একটাতে "লাঞ্চের" ছুটি হয়েচে,

মাঠ প্রায় খালি, শুধু এক কোণে মডেল স্কুলের গুটিকতক ছেলে গোল পাকিয়ে বসেচে। মাধব তাদের সঙ্গে। প্রথম পনের মিনিট খেলার কথা হ'ল। তার পর বাজে কথা চল্‌ল। বামন বল্‌ল, "আজ স্কুলে কমলা কেমন শাড়ী পরে এসেছিল দেখেছিলি? খোঁপায় ফুল বেঁধেছিল! কম্‌লি খুব সৌখীন মেয়ে বটে"! শ্রোতার দল—সকলেই ম্যাট্রিক ক্লাসের—খুব হাসল। সে ক্লাসের পাঁচটা মেয়ের মধ্যে কমলাই বিশেষ করে এ সব খোসগল্প ও হাসির বিষয়, তার কারণ, রং ঈষৎ ময়লা হ'লেও তার চেহারাটি বেশ। ইন্দুর ঠোঁটদুটি অতিরিক্ত রকম পুরু, কপালখানি অতিরিক্ত রকম চওড়া, তাই সে ছেলেদের কৌতূহলের বাইরে। আর একটী, গোয়ানী মেয়ে,—পিঠে বেণী দুলানো, গায়ে হাঁটুর ওপর পর্য্যন্ত "জাম্পার," পায়ে "সেল্‌ফ-কালার" (self colour) মোজা, উঁচু হীলের জুতা, কানে দুল। মেয়েটার রং ময়লা, কিন্তু রোজ মুখে "পাউডার" মেখে আসে। রোদের দিনে, ঘেমে ঘেমে, গালের ওপর মঙ্গল গ্রহের খালের মত কালো দাগ পড়ে যায়! ছেলেরা তাকে একটা মস্ত তামাসা বলে মনে করে। অপর দুটি মেয়েও সাধারণ গোছের। কিন্তু ছেলেদের কাছে কমলার ডাগর চোকদুটির কোণে বিদ্যুৎ খেলত,—তার মৃদু হাসির সঙ্গে একটা অতি কমনীয় আলোকের ছটা ছড়িয়ে পড়ত—যা "রমণ-এফেক্টের" চেয়েও ঢের জটিল, আর তার গতির মধ্যে একটা সলীল ছন্দ ফুটে উঠে তার তরুণ সহ-পাঠীদের হৃদয়ের দ্বারে গিয়ে ধাক্কা দিত! ইতিমধ্যেই শ্রীমান্ বকরে তার ওপর একশ' তেরোটি কবিতা লিখেচে; তার তিনটী স্কুলের হাতের লেখা মাসিকে "তাহাকে" নাম দিয়ে বেরিয়েচে। কবি নিজের নাম দেয়নি, "রমেশ" বলে সই করেচে। কিন্তু বাংলা নাম দিয়ে কি হবে? বেচারা বকরে ওমার খাইয়াম পড়ে নি, তার ইংরেজী রুবাইয়ত বা বাংলা রোবায়ত দেখে নি, তাই তার কাব্যের ধূপ মডেল স্কুলের হাতের লেখা মাসিকেই মিলিয়ে গেল, বিকচ সাহিত্যের বেদীর দিকে অগ্রসর হতে পারল না!

বামনের মধ্যে কিন্তু ওসব কল্পনার রঙীন স্বপ্ন জাগে না, বাস্তবের তুচ্ছ খুঁটিনাটিই তার জড়পন্থী হৃদয় দখল করে থাকে। তাই কমলার সেদিনকার বেশ-গৌরব তাকে বিশেষ করে জিজ্ঞাসু করে তুল্‌ল।

বামনের কথায় মাধব রুখে উঠল। বল্‌ল, "চুপ কর বামন। কমলা নতুন শাড়ী পরল বা পুরাণো শাড়ী পরল তা'তে তোর কি?"···ছেলেদের আবার হাসি!" বামন খানিক চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগল, "কাল ও শাড়ীখানা পরে কমলা হ্রদের ধারে বেড়াতে গিয়েছিল; সঙ্গে কে ছিল জানিস্?" ছেলেদের দল কৌতূহলী হয়ে বল্‌ল, "কে? বল্ বামন।" বামন মৃদু হেসে বল্‌ল, "সেই কলেজের ছেলে,—দানে।" জয়সিং প্রতিবাদ করে বলল, 'দানে কমলার ভাই হয়, বামন।" বামন একটু থেমে ব্যঙ্গের সুরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "কেমন ভাই হয়, জয়সিং? খুড়তুতো, না মামাতো, না পিস্‌তুতো? না খুড়ীমার মাসতুতো ভাইয়ের ছেলে? বলচো না যে জয়সিং?" সহসা বামনের ঘাড়ে দুম্ দুম্ করে মাধবের ঘুসি এসে পড়ল। তারপর দুজনে ভীষণ লড়াই! অন্য ছেলেরা না থামালে সেদিনকার ব্যাপার বামনের পক্ষে গুরুতর হয়ে পড়ত।

পরদিন ক্লাসে মাধব দেখছিল, কমলার দৃষ্টি বার বার তার দৃষ্টির সঙ্গে এসে মিলচে। তবে কি কমলা সব জেনেচে? ছেলেদের মধ্যে কি তার গুপ্তচর আছে?

মাধব সেদিন লক্ষ্য করল, কমলার শাড়ীখানি ফিকে গোলাপী রংয়ের। দেখল পাতলা ঘোমটার নীচে খোঁপায় একরাশ ফুল গোঁজা।

ছুটির পর বাড়ী ফিরবার সময় নীচে নাম্‌চে, এমন সময় দেখ্‌ল বাঁদিকে কমলা দাঁড়িয়ে! উত্তরে উত্তরের দিকে চাইল। কমলা হাস্‌ল, মাধব হাস্‌ল। যদি হাসি কষতে জানে এমন একজন জহুরী সেখানে থাকত, তবে বল্‌ত এ হাসি বালক বালিকার নয়, এতে আঠারোর প্রাণের নেশা মেশানো।

* * *

সেদিন সন্ধ্যায় মাধব নিজের ঘরে বসে দেয়ালে মারুতির ছবিখনার দিকে ভক্তিভরে চেয়েছিল। হঠাৎ দেখল, মারুতির লেজ নেই, তার বানরের মুখ শূন্যে মিলিয়ে গেছে, তার কোমল দেহ অদৃশ্য হয়েছে;—তার জায়গায় গোলাপী শাড়ী পরা একটী তরুণী,—দেহখানি ঈষৎ হেলানো, মুখখানি

হাসিতে টল টল,—তার পানে সলাজ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে!

মাধব গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বস্‌ল, আলো চড়িয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণখানা খুলে প্রাণপণে ধাতুরূপ মুখস্থ লেগে গেল।

পড়ায় আকস্মিক মনোযোগের প্রধান কারণ মাসিক পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী। বাড়ী হতে বাপ লিখেচেন, পরীক্ষায় ফল ভাল হওয়া চাই, নইলে চল্‌বে না। সে কালির অক্ষর গুলির ভিতর দিয়ে মাধব শুনতে পেল, পিতার কঠোর, কর্কশ স্বর,—'নইলে চল্‌বে না!' সে কথা বাস্তবে শুন্‌লে মাধবের উষ্ণ রক্ত হঠাৎ শীতল হয়ে পড়ত! মার মৃত্যুর পর থেকে বাপ তাকে অতি কঠোর শাসনের মধ্যে মানুষ করেচেন।

* * *

পরীক্ষায় মাধবের ফল মোটামুটি ভালই হ'ল, তবে ইংরেজীতে সুবিধে করে উঠতে পারল না। তার প্রধান কারণ, সে সাধারণত উচ্চারণ অনুযায়ীই বানান লিখত, যা' দেড়শ দুশ বছর পরে হয়ত ইংরেজেরা নিজেরাই লিখবে, কিন্তু এখন তো আর লেখে না, তাই মাধবের বহু বানান ভুল হয়। অক্ষরের জঞ্জালে পড়ে মাধবের ভাবগুলো মাঠে মারা যাচ্ছিল!

মাধব সংস্কৃতে প্রথম হ'ল। সে অতি ছেলেবেলা হ'তে সংস্কৃত শিখেচে, আর বাপ বাড়ীতে যে কথা বলেন তার বারো আনা সংস্কৃত।

মাধব আনন্দে বাপের কাছে চিঠি লিখল। বাপ খুসি হলেন। লিখলেন, প্রথম স্থান যেন বরাবর বজায় থাকে।

কিন্তু সংস্কৃতে প্রথম হওয়াতে আর একদিকে গোল বাধল। গত দু তিন পরীক্ষায় কমলা প্রথম হয়ে আসছিল, আজ সে স্থান হ'তে বিচ্যুত হয়ে দুঃখে ক্ষোভে তার অন্তর ভরে গেল। বামন সেদিন কমলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল, "আরে, মেয়েমানুষও কোনো দিন প্রথম হ'তে পারে? এতদিন শাস্ত্রী ম'শায়ের পক্ষপাতিতায় হয়েছিল বলে'!" কমলা ঠোঁট কামড়ে, ভুরু কুঁচকে' বাড়ী চলে গেল, গিয়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল, আগামী মাসে সে প্রথম হবেই।

* * *

তার পর থেকে দেখা গেল, কমলার শাড়ীর রং বদলায় না, ক্লাসে বসে সে ছবিও আঁকে না, পড়াশোনায় দুরন্ত মনোযোগ। মাসিক পরীক্ষা হ'ল। ফল বেরুলে দেখা গেল, সংস্কৃতে কমলা প্রথম হয় নি, মাধব হয়েচে। সে এবার আগের চেয়ে আরও বেশী নম্বর পেয়েচে। সেদিন ক্লাসে বসে কমলা মাধবের চোকে চোকে চাইল, কিন্তু সে দৃষ্টিতে মাধুর্য্য ছিল না—ছিল শুধু জীগিষা, ক্ষোভ, ব্যথা।

মাধব আবার বাবার কাছে চিঠি লিখল। বাপ খুসি হয়ে উত্তর দিলেন। তা' পড়তে পড়তে মাধব মনশ্চক্ষুর সামনে দেখতে পেল, একদিকে তার বাপ দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, কঠোর;—আনন্দে তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে; আর একদিকে কমলা, তার কোমল চোকদুটি ছল-ছল, তার ঈষৎ শ্যাম, স্নিগ্ধ মুখখানি ব্যথায় ম্লান। মাধবের মন দোটানায় পড়ল!

পরীক্ষার খাতাগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। সেদিন ছুটির পর মাধব সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌বে এমন সময় পাশ হ'তে কমলা বলল, "করমারকর, যাবার বেলা আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো।" বলে মেয়েদের ঘরে চলে গেল। ছেলেরা চলে গেলে মাধব সে ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। অন্য মেয়েরা চলে গিয়েছিল। ঘরে কমলা একা। মাধবের বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটতে লাগল।

কমলা বল্‌ল, "করমারকর, তোমার পরীক্ষার খাতা খানা আমায় দেখ্‌তে দেবে"? বৈষয়িক আলাপ।

মাধব হাস্‌বার চেষ্টা করে বল্‌ল, "তা দেব বৈ কি?" বলে খাতাখানা খুলে কমলার হাতে দিল।

মাধব বল্‌ল, "তোমার কাগজখানা দেখ্‌তে পারি কি?"

কমলা নাক সিঁট্‌কে বলল, "আমার কাগজ? সে জঘন্যি। তা তুমি দেখে কি করবে?"

মাধব মৃদু হাস্‌ল। বল্‌ল, "আমি তা দেখতে চাই।"

কমলা নাক চোখ ঘুরিয়ে বল্‌ল, "না তা' আমি দেব না।" বলে ফিরে দাঁড়াল।

মাধব বলল, "দাওই না।"

কমলা আব্দারের সুরে বল্‌ল, "না।"

মাধব অন্ধ হ'ল। উত্তরে তার সুরের মোলায়েম ভাবটি চলে গেল। সে রেগে বলল, "তা হ'লে আমিও আমার খাতা দেব না।"

কমলার চোকে জল এল। সে খাতাখানা তার ওপর ছুড়ে' দিয়ে চোকের জল মুছ্‌তে লাগল।

মাধব অবাক হয়ে ভাব্‌তে লাগল, 'ও কাঁদ্‌চে কেন?' সে বাপের একমাত্র সন্তান, ঘরে বোন ছিল না।

কমলা ত্রস্তপদে মাধবের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মাধব বোকার মত মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বাড়ী গেল।

* * *

পরদিন প্রাতে মাধব স্নান করে উচ্চৈঃস্বরে গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি কর্‌ছিল, এমন সময় নীচে একটি ছোট ছেলে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "করমারকর কোথায়?" বাড়ীওয়ালী মাধবের ঘরে যাবার সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দেখিয়ে দিল। ছেলেটি ওপরে উঠে, দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাক্‌ল, "করমারকর!" মাধব অবাক হয়ে দরজা খুল্‌ল। ছেলেটি তার হাতে এক তাড়া কাগজ দিল। মাধব আশ্চর্য্যের সহিত দেখ্‌ল, কমলার পরীক্ষার খাতা!

মাধব ছেলেকে নাম জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

ছেলে সহজভাবে বল্‌ল, "বালু"।

মাধব জিজ্ঞাসা কর্‌ল, কমলা তার কে হয়।

বালু বল্‌ল, "কমলা? সে আমাদের কমলা-ভাই (কমলা-দিদি)।" বলে সে চলে গেল। মাধব কত কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু বালুর ছোট্ট কচিমুখ দেখে মন সর্‌ল না।

বসে বসে মাধব কমলার পরীক্ষার খাতা খানা দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কোণে সুতার বাঁধটা, তার পাশে আঙুলের কালির ছাপ, কেমন কোমলতা মাখা! কেমন মেয়েলি অক্ষরগুলো! প্রত্যেক রেখায় রেখায় ভেসে উঠ্‌তে লাগল সেই ঘোমটা পরা তরুণী মেয়েটি, তার স্নিগ্ধ মুখখানি তার ডাগর চোখছটি...

হঠাৎ খাতার ভিতর হতে একখানা ছোট কাগজের টুকরা পড়্‌ল। তা'তে ইংরেজীতে লেখা, "কাল ক্লাস আরম্ভ হবার আধ ঘণ্টা আগে খাতা খানা আমায় স্কুলে ফিরিয়ে দিলে সুখী হব।" নাম নেই। মাধবের প্রাণে বিদ্যুৎ ছুঁয়ে গেল।

* * *

পরদিন সকালে দশটায় হোটেলওয়ালী বলছিল, "কি মাধবরাও, আজ যে কিছুই খেলে না। অত পড়া শোনা করে করে শরীর নষ্ট করে ফেল্‌বে যে।"

মাধব সাড়ে দশটায় স্কুলে গেল। যেন চোরের মত। তখনও কমলা আসে নি। ভাব্‌ল বড্ড শিগ্‌গির এসে গেচে!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে কমলা এল। মেয়েদের ঘরে গিয়ে বস্‌ল। মাধব খাতাখানা দিয়ে বল্‌ল, ভুলগুলো শুদ্ধ করে দিয়েচে। এক জায়গায় ভুল ছিল না, তবু পণ্ডিত মশা'য় কেটে দিয়েচেন। কমলা খাতাখানা নিল। গম্ভীরভাবে বল্‌ল, "তোমাকে আমার জন্যে কষ্ট করতে হ'ল।" মাধব নির্ব্বাক। কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। একটু পরে একখানা বই দিয়ে বল্‌ল, "এ ব্যাকরণ খানা খুব ভাল, তুমি পড়ে দেখো।" কমলা বইখানা নিল।

তারপর মাধব নিজের পরীক্ষার খাতাটি তুলে বল্‌ল, "এটা নিতে পার।"

কমলা বল্‌ল, "তোমার পরীক্ষার কাগজ?"

মাধব ঈষৎ সলজ্জভাবে বলল, "হ্যাঁ"।

কমলা অভিমানের সুরে বল্‌ল, "না, আমি চাই না। তুমি কাল দিয়ে কেড়ে নিয়েচ, তা' আমি আবার নিতে যাব কেন?" ঝগড়ার সুর।

মাধবের গত কালের উদ্ধতভাব রইল না। যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। বল্‌ল, "আমার অন্যায় হয়েচে।"

কমলা নীরব।

মাধব বল্‌ল, "তুমি তা' মনে নিয়ো না...মিস্ ঘাট্‌গে!"

কমলা অনুযোগের সুরে বল্‌ল, "কেন নেব না, আমার আত্মসম্মান নেই?"

মাধব পরাজিত, কুণ্ঠিত। সে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কমলার ঘর্ম্মাক্ত মুখখানির দিকে চেয়ে রইল। দেখ্‌তে লাগ্‌ল তার নাকের ডগাটি ঘামে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!

কমলা বল্‌ল, "আমি বইখানা পড়ে দু'তিনদিন পরে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।" বলে ঘরের আর এক পাশে চলে গেল।

মাধব ক্লাসে গেল। কিন্তু আজ পড়াশোনায় মোটেই

তার মন বসছিল না। মাষ্টার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে যেন ঘুম থেকে ওঠে।

বুড়ো পণ্ডিত মশায় যদি আজ তার হৃদয়ের ভিতরটি দেখ্‌তে পেতেন, তবে বল্‌তেন, "কুসুমে কীট ঢুকেচে।"

মাধব বাড়ী যেতে যেতে ভাব্‌ছিল, কমলা আজ সকালে তাড়াতাড়ি ঘেমে স্কুলে এসেছিল তারই সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, অথচ তার খাতাখানা নিল না! এ কি রকম!

সেদিন রাত্রিতে ওপরের ঘর হ'তে ভিঙন্তপদের আবৃত্তিতে বাড়ীওয়ালীর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল না। পরদিন সকালে মাধবের 'জোড় বৈঠকের' সংখ্যা কমে গেল। বিকেলে সে নদীতে গেল না। হয়ত বই ফিরে পাওয়ার একটা অনিশ্চিত আশায় ছিল। একটু সময়ের জন্যে বাইরে গিয়েছিল, এসে বাড়ীওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করল তার কাছে কেউ এসেছিল কিনা।

* * *

তার তিন চার দিন পর থেকে প্রায় রোজই মাধবের ঘরে লোক আসে। সে আর কেউ নয়, ছোট্ট বালু। পাহাড়ে ঝরণার মত তার গতি। বই আনে নেয়। বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম নোট, তার পর চিঠি!

বালুর সেই ক্ষুদ্র হাত ছুটির ভিতর দিয়ে ছুটি তরুণ প্রাণের কত আবেগময় বাণীই না আনাগোনা কর্‌ছিল! দুচার দিনের মধ্যেই 'করমারকর' ও 'মিস্ ঘাটগে' 'মাধব' ও 'কমলা'তে পরিণত হ'ল। 'মাই ডিয়ার মাধব', 'মাই ডিয়ার কমলা', তারপর 'মাই ডিয়ারেষ্ট মাধু', 'মাই ডিয়ারেষ্ট কমল।" অবশ্য সব চিঠিই ইংরেজীতে লেখা হ'ত। তার কারণ আমরা জানি না। তবে সম্ভবতঃ ভাবগুলো ইংরেজী হতে ধার করা বলে'। কিন্তু হায়! যাঁরা ইংরেজী ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেচেন, তাঁরা যদি এ চিঠির ভাষা পড়তেন, তবে মাথা খুঁড়ে মরতেন! কোথায় বড় অক্ষর ছোট অক্ষর, কোথায় আর্টিকেল, কোথায় অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, —আর বানানের তো কথাই নেই। শেক্‌স্পিয়ার, শেলি, রবীন্দ্রনাথ এঁরা কি কোনোদিন ভেবেছিলেন যে পশ্চিমঘাট পাহাড়ের ভিতরে ছুটি কিশোর কিশোরী তাঁদের কথা দিয়ে —অনেক সময় বানান ও অর্থ দুইই বদলিয়ে—নিজেদের প্রাণের আবেগ ব্যক্ত করবে?

* * *

একদিন বালু অতি আনুষ্ঠানিক ভাষায় লেখা একখানা চিঠি আন্‌ল। "মাই ডিয়ার মাধব, তুমি কি আজ অপরাহ্ণ তিনটায় চা পানে আমায় তোমার সাহচর্য্যের আনন্দদান করবে?" মাধব চিঠি পড়ে' মৃদু হাস্‌ল। ভাব্‌ল, এতদিনে কমলা-তাই আই-সি-এসের পত্নী হবার যোগ্য হয়েচে। স্কুলে একটা গুজব ছিল! কমলার নাকি আই-সি-এস ছাড়া বিয়ে হবে না!

যথাসময়ে মাধব কমলাদের বাড়ী গেল। কমলা দরজায় এসে তাকে "রিসিভ" কর্‌ল। হাসিতে কমলার মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। মাধব জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "তোমার বাবা কোথায়?" কমলা চোখের কোণ কুঞ্চিত করে বল্‌ল, "বাবা দেশের বাড়ীতে গেচেন, আর ঠাকুরমা মন্দিরে পুরাণ শুন্‌তে গেচেন।"

মাধবকে ওপরে ছোট একখানি ঘরে নিয়ে বসাল। মাধব বল্‌লে, "কমল, এ তোমার ঘর?" কমলা বল্‌ল, "হ্যাঁ"। বলে মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌ল।

কমলার মুখের দিকে চাইতেই মাধবের মনে সব চিঠি-গুলোর কথা মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। মনে মনে সে মুখখানির সঙ্গে চিঠির সুন্দর সুন্দর কথাগুলো মেলাতে লাগ্‌ল।

কমলা বল্‌ল, তাকে কতদিন ডাকবে ভেবেচে। কিন্তু পারে নি। সে এসেচে তা কত আনন্দের বিষয়। একটু বেশী মিষ্টি করে হেসে বল্‌ল, মাধবের নিশ্চয়ই এখানে আস্‌বার কথা একটিবারও মনে হয় নি। নয় কি?

মাধবের মুখের মধ্যে শুধু রক্তের প্রবাহ ওঠা নামা করতে লাগল। তার উজ্জ্বল চক্ষুছুটি এক একবার কমলার দিকে, এক একবার তার নিজের হাতের দিকে ফিরতে লাগল। সে শুধু বল্‌ল, কমলা যে তা' ভেবেচে তা' সে কল্পনা করে নি।

কমলা হাসিমুখে খাবার আন্‌তে গেল। মাধব কমলার বই কাগজপত্র সব নেড়ে নেড়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ কাগজের নীচ হতে বেরুল একটা চিঠি, তারই নামে লেখা।

মাধব সেখানা তুলে নিল। কমলা রেকাবে করে খাবার নিয়ে এসেছিল, মাধবের হাতে চিঠি দেখে তা' রেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বল্‌ল, "দাও, আমার চিঠি পড়তে পারবে না।"

মাধব বল্‌ল, "এ তো আমার কাছে লেখা।"

কমলা বলল, "হ'লই বা। তোমাকে না দেওয়া পর্য্যন্ত এ আমার জিনিস। আমাকে ফিরিয়ে দাও।"

কমলা চেয়ারের পেছন হতে মাধবের ওপর ঝুঁকে রয়েছিল। তার গরম নিঃশ্বাস মাধবের গালে এসে লাগছিল।

মাধব মৃদু হেসে বল্‌ল, "দেবো না।"

কমলা বল্‌ল, "দিতেই হ'বে।" তারপর মুখ ভার করে বল্‌ল, "না দিলে, আমি আর তোমার কাছে চিঠি লিখবো না, কথাও বল্‌বো না। তা' নিতে হয় তুমি নাও।"

মাধব বাধ্য হয়ে চিঠিখানা দিয়ে ফেল্‌ল। কমলা তা ভাঁজ করে কাঁচুলির হাতার মধ্যে গুটিয়ে রাখল।

তারপর গিয়ে চা আন্‌ল। খাবার ও চা মাধবের সামনে রাখল।

মাধব বল্‌ল, "কমল তুমি খাবে না ?"

কমলা মৃদু হেসে বলল, "না। আমি পুরুষ মানুষের সঙ্গে খাই না।"

মাধব বলল, "তা' একদিন না হয় খেলেই বা !"

কমলা মৃদু হাস্‌ল। বল্‌ল, "তুমি খাও, আমার খিদে নেই।"

তখন দেখা গেল, মাধবেরও মোটেই খিদে নেই। সে হাত তুলে বসে রইল। অগত্যা কমলা এসে তার সঙ্গে বস্‌ল।

তখন সেই ছোট ঘরটিতে দুটি তরুণ তরুণী লাড়ু, নারকেলের বরফি আর কাজু খেতে খেতে কত মিষ্টি হাস্‌ল, ফিস্ ফিস্ করে কত কি কথা বল্‌ল ! তার কোনোটার অর্থ ছিল, কোনটার মোটেই ছিল না !

মাধব দেখল কমলার বাহু দুটি কেমন সগোল, শরীরের চামড়া কেমন পালিশ ! হাস্‌লে তার দাঁতগুলো কি সুন্দর দেখায় ! তার কথাগুলো কি মিষ্টি !

চা খাওয়া হ'লে মাধব উঠল। কমলা জামার হাতা হ'তে বের করে তার হাতে চিঠিখানা গুঁজে দিল। মাধব বল্‌ল, "এখন ?"

কমলা তার ঐ শাদা দাঁতগুলো বের করে শুধু হাসল !

যাবার সময় মাধব দরজার কাছে ক্ষণেক দাঁড়াল। দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে বল্‌ল, "এ ছবি কার ?"

কমলা বল্‌ল, "ওর নাম স্নেহলতা। ওর কথা জান না ?"

মাধব বল্‌ল, "না।" সে এতদিন পাড়াগাঁয়ে থেকে অনেক কথাই জান্‌ত না।

কমলা বল্‌ল, "সে বাঙ্গালী মেয়ে। বাপে বিয়ের পণ দিতে পারে নি বলে কাপড়ে কেরোসিন দিয়ে পুড়ে' মরেচে।" বলে মাধবের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে আবার বল্‌তে লাগল, "তোমরা পুরুষেরা ভারী নির্দ্দয়। বিয়ের বেলা বড় বড় 'হুণ্ডা' চাওয়া। আমার মতে 'হুণ্ডা' দেওয়ার চেয়ে মেয়েদের বিয়ে না করা উচিত।"

মাধব প্রশংসমান দৃষ্টিতে কমলার তেজোদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কমলা হঠাৎ বলল, "মাধব তুমি লক্ষ্মীর মন্দিরে যাও ?"

মাধব বল্‌ল, "একবার গেচি।"

কমলা বল্‌ল "আমার ঠাকুরমা প্রায়ই যান পুরাণ শুন্‌তে। আমি ভাবছি, আমিও তাঁর সঙ্গে যাব।" বলে কুটিল দৃষ্টিতে মাধবের দিকে চাইল। মাধব চোকে চোকে চাইল। তার চোক নেচে উঠল।

তাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে কমলা ওপরের বারান্দায় গেল। দেখল, মাধব সোজা চলে যাচ্চে, পেছনদিকে এক আধবারও ফিরে চাইল না !

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু



বিচিত্রা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

জেন্নৎ মহল
[দিল্লীর বেগম]

শিল্পী—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রকৃষ্ণ রায়

ঋষি-বাণী

শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম-এ,

অন্যমনস্কভাবে বাইবেলের পাতা উল্টাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল—

"But I say unto you, that ye resist not evil : but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also."

সঙ্গে সঙ্গে "নৈবেদ্যের" দুটী লাইন মনে পড়ল—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে।"

ভাবলাম কি আশ্চর্য্য! দুজনেই ঋষি, দুজনেই সত্য-দ্রষ্টা অথচ এতবড় একটা বিষয়ে কি রকম সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরস্পর-বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন! একজন বলছেন, কখনও অন্যায়ে বাধা দিও না, আর একজন বলছেন, অন্যায় করা ও অন্যায় সহ্য করা সমান অপরাধ। অথচ মনে হয় দুজনেই সত্য কথা বলেছেন, উভয় বাণীতেই ত মন সাড়া দেয়। তবে কি এ বাণী দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়? এ দুয়ের মধ্যে কি কোন মিল আছে? বাইবেলের পরের একটী অংশের উপর চোখ পড়ল—

"That ye may be the children of your Father which is in heaven : for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust."

আর মনে পড়ে গেল 'বলাকার' 'বিচার' কবিতাটী—

"হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কারা সবে ধূলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায়।
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার।
তার পরে দেখি,
এ কী,
খোলা তব বিচার ঘরের দ্বার,
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের পরে;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস;
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজা দীপমালা
তাদের মত্ততাপানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধূলা দিয়ে যারা চলে যায়।

* * *

প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনা মাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে
সখার হৃদয় রক্ত-পাতে
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণায় পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।"

ঋষিদ্বয়ের মতের ঐক্য দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখতে

পেলাম। অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে কেউই বলেন নি। অন্যায়কে জয় করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? গায়ের জোরে নয়। গায়ের জোরে অন্যায়কে জয় করতে গেলে শুধু খোঁচা দিয়ে অন্যায়কে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। অন্যায়কে জয় করতে হবে প্রেম দিয়ে, ত্যাগের মধ্যে দিয়ে, অন্যায়ের বহ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে।

মনে ভারি একটা আরাম পেলাম। আর মনে পড়ে গেল বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাধকের কথা। মহাত্মাজী ৬৩ বৎসর ধরে তাঁর সমস্ত বাণী, সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে এই সত্যইত শুধু প্রচার করেছেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত

আমারে বেঁধেছে নদী—

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

আমারে বেঁধেছে নদী—
তারি কলরোল শুনি উতরোল হৃদিতলে নিরবধি।
ছলছল তা'র ঢেউয়ে-ঢেউয়ে জ্বলে রৌদ্র-কিরণ-মণি
কূলে কূলে জাগে পল্লবে বনে মৃদু-মর্ম্মর-ধ্বনি,
দুলে' দুলে' চলে কত না তরণী লহরে লহর তুলি'
বাতাসে দুলায়ে সবুজ, বাদামী, শাদা, রাঙা পাল্ গুলি;
আমি তারি এক না'য়
কূলের বাঁধন ফেলিয়া চলেছি কোন্ দূর অজানায়।

আমার নৌকা ঘিরে'
নৃত্য-গীতের অস্ফুট রেশ বাতাসে মিলায় ধীরে।
মধুর নেশায় ভরি' ওঠে মন, আঁখিতে স্বপন ভাসে;
সুনীল আকাশ, চঞ্চলা নদী মায়াময় হাসি হাসে।
—কোথা যাই? সে কি কল্পলোকের—ইন্দ্রধনুর দেশে?
গোপন স্বপন মূরতি ধরিবে আজিকে যাত্রা-শেষে?
উড়িয়া চলেছে মন,
আঁখির রাজ্য দূরে ফেলে রেখে গেছে সে বহুক্ষণ

শিশুকাল হ'তে মোর
নদী-তরঙ্গ-কল্লোলে যেন লেগেছে নেশার ঘোর।
···নদী-হারা দেশ শুষ্ক নীরস কঠিন মাটির' পরে
মায়া-বাঁধা মন সেই উচ্ছলা মুক্তি খুঁজিয়া মরে।
···সেই ঢেউগুলি,—কূলে-কূলে তা'র সবুজের সমারোহ!
জল বুঝি কোন্ যাদু জানে, আর বাতাসে ছড়ায় মোহ।
আলো আর মেঘ হাসে
সলিল-কুমারী তাদেরো বেঁধেছে মায়াময় বাহু-পাশে।

বাহাত্তর টাকা

—গল্প— —শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম্‌-এ, বি-এল্‌

১

কুঞ্জলালদের সাংসারিক অবস্থা কেহ কখনো সচ্ছল দেখে নাই; না বাপের, না নিজেদের আমলে।

গ্রামের স্কুলের কয়েক ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়া কুঞ্জলাল গ্রামের তালুকদার হরিহর বাবুর বাড়ীতে শিক্ষানবীশ মুহুরী স্বরূপে প্রবেশ করিল। বাবুকে প্রথম হইতেই সে বাবা বলিয়া ডাকিতে লাগিল; ভাবিল ইহাতে কাজের ও মাহিনার সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে, কিন্তু বাবুর কাছে ও-সবের যে তেমন মূল্য নাই, তা' সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। তিনি বোঝেন টাকা, শুধু টা-কা। যাহা হউক, বছর তিনেক কাল 'বাবা' ডাকিয়া ও বিনা মাহিনায় কাজ শিখিয়া বাবুর বাড়ীতে কুঞ্জলাল বৎসরে বাহাত্তর টাকা মাহিনায় তহশীলদারের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। তখন হইতে তার নাম হইল কুঞ্জ সরকার।

কুঞ্জ সরকারের সাহস হিম্মত, গলাবাজির অভাব নাই; প্রজা বা খাতকদের নিকট হইতে টাকা আদায়ে খুবই মজবুত, কিন্তু হিসাব রাখা? ওটা তার পক্ষে নাকি সম্ভবপর নয়। কেহ বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে বলিত, 'ও-সব মুদীর ব্যাপার আমার হ'য়ে ওঠেনা, কিন্তু চাইলে দিতেই বা এমন কি কষ্ট, ওতো আমার মনেই মুখস্থ হয়ে আছে'।

সরকার পদবীতে আরূঢ় হইবার কিছু পরেই কুঞ্জলালের বিবাহ হইল। জীবন ধারণের পক্ষে জলবায়ুর যেমন দরকার, বাঙ্গালীর পক্ষে আরো একটা জিনিষেরও তেমনি দরকার—স্ত্রী। ওটা না জোটা পর্য্যন্ত তার মাথা ঠিক সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। অন্য অনেক কারণেও তার দরকার। স্ত্রী না থাকিলে কে রান্নাবান্না করে, ঘর দুয়ার দেখে, ধানসিদ্ধ কাপড়সিদ্ধ করে; তা' ছাড়া আর একটা মহৎ কাজ—ভবিষ্যতে পুন্নাম ভীষণ নরকের যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার পন্থা কে আর করিয়া দিবে?

মাধবীর দেহেও একসময় যৌবন-সুষমা দেখা দিয়াছিল; সমুন্নত স্তনে, নয়নযুগলের বিস্তারে, চালচলনে, দেহ এক নূতন লাবণ্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ও-সব দিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ সংসারমগ্ন দম্পতীর কাহারো ছিল না। রমণী-সৌন্দর্য্য সম্যকরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে নাকি নানাপ্রকার ফ্যাসনের গহনা, সুশ্রী কাপড় চোপড় প্রভৃতির দরকার। মাধবীর সঙ্গে ও-সবের কোনও সম্পর্ক ছিল না, ময়লা ছেঁড়া কাপড় ও সর্ব্বক্ষণ খাটুনির মধ্যে প্রতিপদের সন্ধ্যার জ্যোৎস্নার মত তার যৌবনে যেন তেমন রং ধরিল না। তার উপর অল্প বয়সেই এক আধমরা সন্তানের জন্মগ্রহণের পর যা কিছু তার সৌন্দর্য্য-সম্ভার সমস্তই রৌদ্র-পোড়া শুষ্ক পাতার মত ঝলসিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল; দেখিলে মনে হইত দস্তুর মত প্রৌঢ়াবস্থা, একবার চাহিলে আর সেদিকে মুখ ফিরাইতে কাহারো ইচ্ছা হইত না। বিবাহ হইল, সন্তান জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু মাহিনা সেই—বাহাত্তর টাকা।

হরিহর রায়ের আমলে কুঞ্জলাল সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। উপরি কিছুই যে একেবারে হাতে আসিত না এমন নয়, তবে মাত্রা বড়ই কম। চেষ্টা উত্তমের অবশ্য কুঞ্জ সরকারের কোনও ত্রুটী নাই; তার কথা, 'ঢেউ গুণেও যখন টাকা রোজগারের কথা শুনা যায়, তখন এমন মস্ত বড় তালুকটা নাড়াচাড়া করে কি তার মত লোকের সামান্য রকমের ভরণপোষণটাও চলবেনা—এও কি একটা কথার কথা'?

হরিহর বাবুর মৃত্যুর পর কুঞ্জ ভাবিল এবার যে কিছু

সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে ; বাবুর সবেমাত্র কলেজ-ছাড়া ছেলে অখিল বাবু জায়গা-জমী মামলা-মোকদ্দমার বুঝিবে কি? অধিকন্তু তাহার উপর নির্ভর না করিয়া অখিলের চলার উপায় কৈ? ভগবানের বিশেষ দয়া, তাইতো বুড়োটা মরিয়াছে। কিন্তু মাস কয়েকের মধ্যেই কুঞ্জলালের সব আশা নির্মূল হইল। দেখা গেল পুত্র সব বিষয়েই স্বর্গগত পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে তো লাগিলেনই, উপরন্তু হিসাব-নিকাশের ছাপানো ফরম জারি করিয়া ছিটা ফোঁটা যা' কিছু আঙুলের ফাঁক দিয়া কুঞ্জলালের হাতে আসিয়া সময় সময় পড়িত তাহার পথও একপ্রকার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

এদিকে কুঞ্জের অবস্থা দিন দিনই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রী যখন একবার ঘরে আসিয়া হাজির হইলেন, মা ষষ্ঠীর কৃপায় দশ বছরের মধ্যে ছয় নম্বরের এক কাঁদি না নামাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না। ইহার মধ্যে কতক মরিল। যারা বাঁচিয়া রহিল, তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়—চার। স্ত্রী, তার উপর এই অপোগণ্ডের দল, সর্বক্ষণ নাই নাই খাই খাই ভাব, ব্যারাম-পীড়া—কুঞ্জলাল হাঁফাইয়া উঠিল।

তবুও তো কুঞ্জলালের সংসার চলিতেছে! সে হাটে মাঠে যায়, চলা ফেরা করে, লোকের সঙ্গে বড়-গলায় কথা-বার্ত্তা বলে, তর্ক করে, হাসে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কুঞ্জ ঈষৎ হাসিয়া বলিত, 'হ্যাঁ চল্‌ছে বই কি সংসার, তবে জগন্নাথের রথচলার মত, টানা হেঁচ্‌ড়া, ধাক্কাধাক্কি হৈ চৈ, কোনটার অভাব নেই, রথ কিন্তু যেখানে, সেখানেই'। পরিবার প্রতিপালন করা ছাড়া গোদের উপর বিষফোড়ার মত আর এক উপসর্গ আসিয়া দেখা দিয়াছে—মোকদ্দমা। বিলাত হ'তে আমদানী এই মহাবস্তুর রসে যে একবার মজিয়াছে তার পক্ষে এর হাত ছাড়া কি সহজ ব্যাপার? বাড়ীর পাশে পৈতৃক আমলের বড় একখানা ক্ষেত, এটার কল্যাণেই বছরের ভাত-কাপড়ের অনেকটা যোগাড় হয়, তার সীমানা লইয়া মাধব যুগীর সঙ্গে মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। যুগীর পোর পয়সা হইয়াছে, তার লাঙ্গলের ফলক এখন বাঁকিয়া বাঁকিয়া কুঞ্জদের ক্ষেতের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। কুঞ্জ সরকার দাদা হরনাথকে চোখ রাঙাইয়া স্বভাবসিদ্ধ মোটা ভাঙ্গা গলায় ঝাঁজ লাগাইয়া বলিল, 'তুমি পাঠশালের মরা পণ্ডিত, গরুর মত নরম, মেয়েছেলের অধম, তুমি সহ্য কর্‌তে হয় করো, আমরা জমীদার-ঘেঁষা লোক, যাই বল, গরীব হয়েছি বলেই এতটা অত্যাচার বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ব না'। ফলে সেই যে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, তা' আর ক্ষান্ত হইল না ; কখনো ফৌজদারী, কখনো দেওয়ানী—হনুমানের লেজ জ্বলিতেই লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিন ভাইএর যৎসামান্য যা কিছু জমি-জমা ছিল লণ্ডভণ্ড হইতে আরম্ভ করিল।

২

অখিলচন্দ্র তহশীলদারকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দেখি হিসাব-নিকাশ, বাবার আমলের নিকাশ অনেকদিন দেখা হয় নি'। কুঞ্জ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর করিল, 'হিসাব-নিকাশ, হিসাব-নিকাশ! তা' দিতে হবে বৈ কি! দিচ্ছি, মাসেকের ভিতর'। কিন্তু মাস আর শেষ হয় না। এ-মাস সে-মাস করিয়া আরো মাস পাঁচেক চলিয়া গেল। এদিকে অখিলচন্দ্রও ছাড়িবার পাত্র নয়, কুঞ্জের ব্যবহারে তার মনে নানাপ্রকারের সন্দেহ দেখা দিল। নাছোড়বান্দা হাল-আমলের বাবু।

অবশেষে ক্রমাগত বাবুর তাড়া খাইতে খাইতে একান্ত হায়রাণ হইয়া কুঞ্জকে এক নিকাশ পেশ করিতে হইল।

দেখা গেল কুঞ্জের নিকট একশত টাকার কিছুর উপরে পাওনা। অখিল মুখ লাল করিয়া মাথা নীচু করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, 'টাকাটা শীগ্‌গিরই দেওয়া চাই, তা' না হ'লে তোমাকে কাজে রাখা হবে না, বুঝ্‌লে তো'?

কুঞ্জ সরকার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, 'টাকা যখন ভেঙেছি, তখন দিতে হবে বৈ কি। দিতেই হবে। তবে বাবু, আমার একটা আরজি'।

অখিল বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে আবার কি'?

কুঞ্জ বিনম্র বচনে বলিল, 'সেটেলমেন্টের কাজে দুটো দুটো বছর হালের বলদের মত খাটলাম, অন্য হিস্সার বাবুদের তহশীলদাররা সকলেই বক্‌শিস্ পেলে, কুঞ্জের ভাগ্যে শুধু কিছু হলোনা। আমি কি ঐ দু'বছরের বাবদ একটু বেশী মাইনের দাবী করতে পারিনে? হুজুর তো এমন বিদ্বান, বড় চাকরী করেন, দেশের রাজা, হুজুরই বিচার করে দেখুন'!

অখিল একটু থতমত খাইয়া গেলেন এবং অবশেষে বলিলেন, 'তা ঠিক্; আচ্ছা, ঐ দুবছরের জন্যে তোমার মাহিনা মাসে এক টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া গেল'।

কুঞ্জ মাথা নীচু করিয়া ও কপালে জোড় হস্ত ছোঁয়াইয়া অখিলের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল, 'হুজুরের দয়া।' একটু থামিয়া বলিল, 'যদি গরীবের প্রতি অনুগ্রহই দেখালেন, তা'হলে ও দু'বছরের জন্যে মাহিনা মাসে মাসে আর কিছু বেশী করে দিতে আজ্ঞা হয়, একটা টাকা—বড় কম, আর তাতে হুজুরের মর্য্যাদারও হানি হয়। অপর হিস্সার গোমস্তাদের কাছে মুখ খাটো করতে চাইনে। হুজুর যাই করেন, আমাকে কিন্তু দুটো টাকা করে মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন এই বলতে হবে, এখন হুজুরের যা' ইচ্ছে। নিজের কপালে যাই থাক্, বাইরের লোকের কাছে হুজুরকে খাটো করতে পারবোনা কিছুতেই।'

যুক্তির অকাট্যতায় পরাভূত হইয়া অগত্যা অখিলচন্দ্রকে কুঞ্জের প্রস্তাবেই সম্মতি দিতে হইল। তখন নিকাশ-আমলে প্রাপ্য টাকা হ'তে দুইবৎসরের বৃদ্ধি মাহিনা আটচল্লিশ টাকা বাদ দিয়া অখিল বলিলেন, 'তা হ'লে তোমার কথাই ঠিক থাক্‌লো, এখন বাকী পঞ্চান্ন টাকা দিও'।

কুঞ্জ চাপা হাসিতে ধূসরবর্ণ মুখ প্রদীপ্ত করিয়া বলিল, 'হুজুর যখন এতটাই অনুগ্রহ করলেন, তখন তার মাত্রাটা আর একটুকু বাড়িয়ে দিলেই সব গোলমাল চুকে যায়, হুজুরেরও নিকাশের জন্য মিছা কষ্ট করতে হয় না, আমারও দুশ্চিন্তা চলে যায়—দু'দিকেরই সুবিধে। হুজুর বড় লোক, আমার মত চুণো পুঁটি টিপে দিলেই মারতে পারেন, আবার দয়া করলে বেঁচেও থাকতে পারি'।

আবার কুঞ্জ কি কন্দীর মতলব করিতেছে ভাবিয়া অখিলচন্দ্র একটু চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আবার কি? তোমার কথাইতো রইলো, আর কি চাই? না, না, —আর কিছু হবে না, এখন বাকী টাকাটা শোধ করা সম্বন্ধে যা করবার করো'।

কুঞ্জ নিরুত্তর।

তাকে তদবস্থায় দেখিয়া কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অখিল বলিলেন, 'শুনিই না তোমার কি প্রস্তাব, কি প্রস্তাব শুনি'।

কুঞ্জ উত্তর করিল, 'প্রস্তাব আর কিছু নয়, হুজুরের কর্ত্তার আমলের কর্ম্মচারী, এ সংসারের জন্যেই দেহপাত কচ্ছি, অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই, ভরসাও নেই—ঐ দুবছরের জন্যে আর দুটা টাকা করে যদি মাস মাস মাইনা বাড়িয়ে দিতেন, তা হ'লে আমার মনও খুসী থাক্‌তো, বুক ফুলিয়ে লোকের কাছে বাবুর দয়ার কথা বলে বেড়াতে পারতাম, নিকাশ আমলেও তেমন কিছু পাওনা থাক্‌তনা। নিতান্ত সোজা প্রস্তাব, জানেনইতো হুজুর আমার মধ্যে কোনও ঘোর প্যাচ নেই। দু'টাকা যে মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন দু' বছরের জন্যে, তাতে বাবু, আমার কিছুই লাভ হলো না—সেই বছরে বাহাত্তর টাকা বজায় রইলো মাত্র'।

অখিল বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া বলিলেন, 'সে কি রকম? কম্‌সে কম্ আটচল্লিশটা টাকা বেশী পেয়ে গেলে, তাও লাভ হলো না!'

'আজ্ঞে গত শীতে যে আমার গাইটে মারা গেল, সেটার দামও আটচল্লিশ পঞ্চাশের কম হবে না। মোটের মাথায় খতিয়ে দেখবেন, আমার মাইনে বছর সেই বাহাত্তরেই গিয়ে দাঁড়ালো। ভেবে দেখুন হুজুর, গরীবের কথা'।

অখিল চটিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'না, না,—এসব চালাকি চল্‌বেনা, যথেষ্ট দয়া দেখানো হয়েছে, আর নয়; টাকাটা না দেবার জন্য যত সব দুষ্টামি।' অখিল নীতি-নিয়ম পালনের বিশেষ পক্ষপাতী, চোরকে দয়া দেখানো তার চক্ষে নীতি-বিগর্হিত।

কুঞ্জ বুঝিল, বাবু শেষ মাত্রায় চড়িয়াছেন, আর নামানো যাইবেনা। অগত্যা তাকে বাকী টাকাটা পরিশোধ করিবার জন্য কিছু সময়ের প্রার্থনা করিতে হইল। অখিল নিতান্তই নারাজ; চোর, বদমায়েস্, জোচ্চোর প্রভৃতি নানাপ্রকার সম্ভাষণে নিত্যই কুঞ্জের কর্ণ-কুহর তৃপ্ত হইতে লাগিল। অব-

শেষে অনেক কথা কাটাকাটী ও অনুনয় বিনয়ের পর আষাঢ় মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত দেনা টাকাটা শোধের জন্য সময় দেওয়া হইল।

*   *   *   *

সময় পাওয়া গেল সত্য কিন্তু টাকা কোথায়? এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে বছর বাহাত্তর টাকা মাহিনার তহশীলদারের সংসার যে এতদিন ধরিয়া চলিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য, তার উপর আবার এক সঙ্গে পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হইবে কেমন করিয়া? তজ্জন্য কুঞ্জের বিশেষ চিন্তাও যেন নাই, অখিল মাঝে মাঝে তাগাদা দিয়া দেনার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, কুঞ্জের মুখে একই জবাব—'আসুকতো ত্রিশে আষাঢ়, ব্যবস্থা একটা করা যাবেই?' বাবু বলিতেন, 'জানইতো আমি এক কথার লোক, সময়মত টাকাটা না দিতে পারলে কিন্তু চাকরীতে রাখা হবেনা ঠিক জেনো'। কুঞ্জ ধীরে উত্তর করিত, 'তাতো জানাই আছে'।

ক্রমে ত্রিশে আষাঢ় উপস্থিত হইল কিন্তু টাকা পরিশোধিত হইল না। কুঞ্জ বাবুর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া আরো কিছু সময়ের জন্য বারবার প্রার্থনা জানাইল কিন্তু কোনও ফল হইল না। পিতার আমলের পুরাতন কর্ম্মচারী বলিয়া তার বিরুদ্ধে আপাততঃ তহবিল ভাঙার জন্য কোনও ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিবেন না অখিলচন্দ্র আভাসে এই মহানুগ্রহের বিষয়মাত্র জানাইলেন, কিন্তু কার্য্য হ'তে বরখাস্ত করিলেন। জানিয়া শুনিয়া এমন অলস, অকর্ম্মণ্য চোরকে কেমন করিয়া আর কাজে রাখা চলে।

ষোল বছরেরও উপরের চাকরী গেল। কিন্তু তজ্জন্য কুঞ্জ সরকারকে বিশেষ চিন্তিত বা বিব্রত দেখা গেল না।

৩

কিছুদিন পরে অখিল সপরিবারে কার্য্যস্থল কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

মাস তিনেক পরে পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া একদিন হাটে বেড়াইতে গিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে কুঞ্জ সরকার চাল, ডাল, তেল নুণ প্রভৃতি জিনিষের এক মুদীর দোকান খুলিয়া খালি গায় চটের উপর বসিয়া নিবিষ্ট মনে জিনিষপত্র বিক্রী করিতেছে। অখিল তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কতক্ষণ চাহিয়া অবশেষে হাসিয়া বলিলেন, 'কি হে কুঞ্জ, শেষে কি এই মুদীর কাজে লাগ্‌লে? চলছে কেমন?'

কুঞ্জ ত্রস্ত ব্যস্তভাবে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া বাবুকে জোড় হাতে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া সহাস্যমুখে উত্তর করিল, 'চলছে! আজ্ঞে, আগেও যেমন, এখনো তেমন, তবে একটু বেশী টানাটানি—সেই বাহাত্তর টাকা। বাবু, আপনারা যিনিই যা'না কেন করেন, কুঞ্জ সরকারের বাহাত্তরের মার নেই কিছুতেই। বাহাত্তুরে কপাল আমার। যেমন করে হোক্ তার যোগাড় হবেই। হুজুর যখন চাকরী হতে ছাড়িয়ে দিলেন, তার কিছু পরেই ঘোর বর্ষা দেখা দিল, চারিদিকে জল, বাড়ী ঘর জলে ডুবু ডুবু। কোথায় বা যাই, এমন সময় ছেলে পুলে কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে মরবার উপক্রম। হুজুররা বড়লোক, পেটের জ্বালা যে কি জ্বালা, আমাদের গরীবের দুঃখ-কষ্ট বোঝে কে? উপায়ান্তর না দেখে জমী বেচে গোটা কয়েক টাকা জুটিয়ে এই ব্যবসা কচ্ছি। নিজেরা বাঁচি আর নাই বাঁচি ছেলেপুলের মুখে তো চারটী ভাত দেওয়া চাই। তবে বেশী রোজগার হয় না, যেমন সামান্য পুঁজি, কায়ক্লেশে সংসার চলে যায়। আমার কোষ্ঠীতেই নাকি লেখা আছে বাহাত্তর টাকা বছর'।

কিন্তু সেই দোকানও বেশী দিন চলিল না। চলিবে কি করিয়া? হিসাব পত্র নাই, যে বাকীতে নেয় সে টাকা পয়সা তেমন শোধ করে না, আদায়ের সম্ভাবনাও কম; তা ছাড়া চা'ল ডাল প্রভৃতি অনেক জিনিষই কুঞ্জের নিজ সংসারের জন্য খরচ হইয়া যায়। দাদা হরনাথ জিজ্ঞাসা করিত, 'হাঁরে কুঞ্জ, দোকানের হিসাব রাখিস্ তো? ওটাই হচ্ছে ব্যবসায়ে বড় হওয়ার উপায়, দেখিস্তো সা শুঁড়ীরা এক পয়সার হিসাব মিলাতে গিয়ে চার পয়সার তেল খরচ করে'। কুঞ্জ হাসিয়া উত্তর করিত, 'হুঁ, তুমিও যেমন দাদা, হিসাবই যদি লিখ্‌বে কুঞ্জ, তা হ'লে বাবুর বাড়ীর এত দিনের এমন সোনার চাকরী কুঞ্জ সরকারের যায়! বাবুর

জায়গাজমী খাজনাপত্র এত টাকাপয়সার হিসাব রাখ্‌লেম না, আর এতো একটা মুদীর দোকান, মুখে মুখেই আমার হিসাব। জিজ্ঞাসা করেই দেখোনা কার কাছে দোকানের কত পাওনা, এক নিঃশ্বাসেই সব বলে দিচ্ছি'।

* * * *

চৈত্রমাসের মাঠ-ফাটা রৌদ্র। অখিলচন্দ্র কার্য্যোপলক্ষে সহরে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে ছাতা মাথায় বাড়ী ফিরিতেছেন, এমন সময় সিংহ পাড়ার বড় তেঁতুল গাছের নীচে কুঞ্জ সরকারের সঙ্গে অকস্মাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই দুপুর রৌদ্রে, কোত্থেকে আস্‌ছ'? খালি-পা, ময়লা কাপড়-পরা, গলায় ময়লা চাদর জড়ানো, ছাতাশূন্য—কুঞ্জের সমস্ত শরীর দিয়া ঘাম বাহির হইতেছিল।

উত্তর হইল, 'বটু সিমুলিয়া হ'তে। সেখানে কৈলাস গোপের বাড়ীতে একটা পাঠশালা কচ্ছি এখন'।

অখিল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'বটু-সিমুলিয়া! সে যে তিন চার মাইলের পথ! আর পাঠশালাই বা কেন? দোকান কি হ'লো'?

কুঞ্জ সরকার বলিল, 'দোকান! দোকান!—দোকান খেয়ে ফেলেছি অনেক দিন'।

অখিল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'সে কি! খেয়ে ফেলেছ! বলো কি? দোকান খেলে কি করে? দোকানও আবার খাওয়া চলে না কি'?

কুঞ্জ উত্তর করিল, 'বাবু, গরীবের পেট, আমাদের অখাদ্য, কুখাদ্য কি আছে? বড়ই বিষম পেটের জ্বালা! চা'ল, ডাল, মরিচ, তেল—ধীরে ধীরে নিয়ে খেতে খেতে দোকান শেষ হয়ে গেল'।

'ও তাই। তাই বলো না। আমি ভেবে অবাক্—দোকান খায় কি করে'!

'কিছুই আশ্চর্য্য নয়, বাবু, কিছুই নয়। খালিপেটের দল, সব পারি আমরা—হাঁড়ি, কলসী, চটু, যা কিছু, সব খেতে পারি। খেয়েছিও সব। কিন্তু যে করেই হোক্, নিজেকেও বাঁচাতে হবে, ছেলেপুলেদেরও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই এখন দু'টা পাঠশালা খুলে পণ্ডিতি কচ্ছি'।

অখিল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত হয়'?

কুঞ্জ হাসিয়া বলিল, 'হওয়াতো বাঁধাই আছে বাবু। তা আর জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কেন। ছেলেদের হ'তে কিছু ধান চালের সিধে পাওয়া যায়, তা ছাড়া কিছু ছাত্র-বেতন—মোটের মাথায় সেই বছর বাহাত্তর টাকা, ওর বেশী হবার তো জো নেই। হুজুর, আপনারা চাকরীই নিন, আর যাই করেন, কুঞ্জ সরকারের বছর বাহাত্তর টাকা নিতে পারবেন্ না। জন্মের পর ষষ্ঠীর দিন বৃহস্পতি ঠাকুর আমার কপালে লিখে দিয়ে গেছেন, সাধ্য নেই ও কেউ নিতে পারে'।

অখিল বলিলেন, 'এ-সব কোন কাজের কথা নয়, চেষ্টা কর মনে-মুখে অবস্থা ভাল করতে, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই'।

'বাবু, আপনারা আছেন মহাসুখে, স্বর্গে, আর আমরা আছি নরকে। আপনাদের বেলা ভগবানের নিয়ম কানুনই অন্যধরণের, যা বলেন, যা করেন, সবই শোভা পায়। ইঁদুরের মত চাপাকলে জন্ম হতে আট্‌কে পড়ে আছি আমরা, কিন্তু করার কি জো আছে? তা না হলে সে-বার কি বিপদেই ফেলেছিলেন বাবু, অমন বর্ষাকাল, চারিদিকে থৈ থৈ জল, ঘর হ'তে পা বের করবার পর্য্যন্ত উপায় নেই, এমন সময় ঘরের কুকুরকে পর্য্যন্ত তাড়াতে নেই, অমন ভাবে বয়-খাস্ত করে দিলেন! তাও কপালে ঐ বাহাত্তর টাকা ছিল বলেই না দোকান দেবার বুদ্ধি জাগ্‌লো, তা না হলে আণ্ডা বাচ্চা নিয়ে কি আর বেঁচে থাক্‌তে পারতাম সেই দুর্দ্দিনে'?

অখিল বলিলেন, 'তা আর কি করা যায়। হিসাবপত্র টাকা পয়সা না দিলে রাখাই বা যায় কেমন করে'?

কুঞ্জ বলিল, 'হিসাবপত্র যদি অত ঠিক করে দিতেই পারবো, তা হ'লে আর আমরা এমন গরীব হয়ে জন্মেছিলাম কেন? আমরা কখনো টাকা পয়সা তেমন চোখে দেখিনি, হিসাবও রাখ্‌তে শিখিনি। বাবু, গরীবের দিকে একটু দৃষ্টি রাখ্‌বেন, গরীবের চোখে মাঝে মাঝে তাদের দিকে চাইবেন; অত হিসাবপত্র নিলে কি আমাদের উপায় আছে, অত বিদ্যাই কি শিখিয়েছে আমাদের কেউ? ভেবে দেখুন বাবু, দু'টাকা মাহিনায় নিজেই বা কি খাই, ছেলেপিলেদের বা কি খাওয়াই। তার উপর অমন কড়া হিসাব'।

৪

বছর তিনেক আর কুঞ্জ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। অখিল বাড়ী আসিলে কচিৎ কাহারো কাছে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন ও জানিতে পারেন যে তার সাংসারিক অবস্থা নাকি দিন দিনই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। দু'খানা ঘর ছিল, তার মধ্যে রান্নাঘরখানা সেই যে বড় ঝড়ের সময় পড়িয়া গিয়াছে, আর উঠাইবার ক্ষমতা হয় নাই। একটা মেয়েও ইতিমধ্যে হইয়াছিল, সেটা নাকি মাস দুই কাল থাকিয়া মারা গিয়াছে। তার বড় বোনটিও মারা গিয়াছে।

সেবার দেশে শীতলাদেবীর বড়ই অনুগ্রহ। কত লোক যে বসন্তে মারা গেল বলিবার নয়। সরকার হ'তে লোক সকলকে টীকা দিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে; স্বয়ং ডাক্তার সাহেব ও সাবডিভিশনাল অফিসার আসিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রামবাসিদের টীকা লইবার জন্য নানা প্রকারে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ও দফাদার চৌকিদারদের উপর বিশেষ কড়া হুকুম প্রচার করা হইয়াছে।

অখিল ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং পরিবার সহ সহরে ফিরিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন।

প্রভাতে চা পানের শেষে চিন্তান্বিত মুখে তিনি বাহির বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় কুঞ্জ সরকার আসিয়া মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। খালি পা, নিতান্ত ময়লা কাপড়, গায়ে বহুদিনের পুরাতন ছেঁড়া ময়লা সার্ট, তেল-শূন্য বড় বড় চুলগুলি উস্ক-খুস্ক, লম্বা লম্বা হাত পা, ভাঙা গাল—সেই সনাতন বেশ ও চেহারা, তবে এবার যেন তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেখাইতেছে, ও গায়ের রং পোড়া কাঠের মত ঘন কালো ও অনেকটা তামাটে ভাব ধারণ করিয়াছে। অখিল সহাস্যমুখে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'কি, কুঞ্জ যে, হঠাৎ কি মনে করে, কেমন আছ'?

উত্তর হইল, 'কেমন আছি? হুজুররা যেমন দয়া করে রেখেছেন, তেমনি আছি। হুজুরের বাড়ী আসার খবর পেয়েছি অনেকদিন, গোলমালে আস্তেও পারিনি এতদিন, একটুকুও সময় পাইনে। খবর নিলাম বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের নাকি টীকা দেওয়া হবে, তাই এসেছি টীকা দিতে'।

অখিল অবাক্ হইয়া চোখ বড় করিয়া কুঞ্জের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছু পরে বলিলেন, 'সে আবার কি? এ বিদ্যে আবার কবে শিখ্‌লে'?

কুঞ্জ উত্তর করিল, 'আজ্ঞে, কি আর করা যায়। পেটের তাড়নায় কোথা থেকে কখন কোথায় যেয়ে যে ছিট্‌কে পড়ি ঠিক নেই।'

অখিল বলিলেন, 'কেন তোমার পাঠশালার পণ্ডিতগিরি'?

"সে কাজ ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন, চলল না। ছেলেপিলেদের হ'তে মাইনে আদায় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, তার উপর একবছর ধরে যেমন দুর্ভিক্ষ যাচ্ছে, তাতে ধান চালের সিধা যা কিছু আগে পাওয়া যেত তাও এক রকম বন্ধ হয়ে গেল। তার পরে কত কাজই করা গেল। সম্প্রতি এই টীকাদারের কাজটা হাতের কাছে পেলাম, নিয়ে নিলাম। বাঁচাতো চাই কোন প্রকারে, বাবু'।

অখিল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতে কেমন প্রাপ্তি হয়? কি মাইনে'?

'মাইনে বাঁধা তেমন কিছুই নেই, যতটা টীকা দিতে পারি, তার উপর চুক্তিমত কমিশন। তার উপর এই-বা ক'দিন চলবে? যতদিন মা শীতলার কৃপা আছে লোকজনের উপর, ততদিন যা কিছু পাওয়া যাবে, তার পরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়্‌তেই দেবী যেই পা গুটিয়ে ঘরে বস্‌বেন, কাজও'এ বছরের জন্যে খতম্ হয়ে যাবে।' ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কি আর হবে, মোটের মাথায় সেই বছর বাহাত্তর টাকা, যেমন আমার বরাত, ওতো খণ্ডানো যাবে না। চেষ্টা-চরিত্র কিছু নয়, কিছু নয় বাবু, বরাত, বরাত।'

অখিল বলিলেন, 'বাহাদুরী তোমার বুদ্ধি হিম্মতের। কিন্তু কথা হচ্ছে, একটা কিছুতে লেগে থাক না কেন, তা' না হ'লে কি কিছু করা যায়'?

'ইচ্ছে তো করে অমন, কিন্তু পারি কৈ বাবু? মেয়ে দুটো যখন না খেয়ে পেটে হাত দিয়ে উপুড় হ'য়ে মাটিতে পড়ে থাকে, ছেলেটাতো গিয়েছেই, তখন আর ঠিক থাক্‌তে

পারিনে বাবু, যেখানে গেলে ছুটো পয়সা পাওয়া যায়, সেখানে ছুটে যেতে হয়'।

অখিল ঔৎসুক্যপূর্ণ মুখে বলিলেন, 'মেয়ে মরার কথা-ইতো শুনেছিলাম! ছেলে মারা গেছে! সে কি? কবে'?

'এইতো গত মাঘে। একটা মেয়ে তো অনেক আগেই মরেছিল। তারপর ছোট একটা মেয়ে, ওটার জন্যে কে ভাবে? মরেছে না বেঁচেছে। না খেয়ে খেয়ে ছেলেটা হাড়-সারা হয়েছিল। তার উপর হলো আমাশা। ডাক্তার কবিরাজও ডাকতে পারলাম না, মাস তিনেক ভুগে ভুগে মারা গেল। সুন্দর ছেলেটি ছিল, অনেকেই বলতো এমন ছেলে বড়লোকের ঘরেও তেমন দেখা যায় না—বছর দশে-কের হয়েছিল। কি আর করা যায়'?

অখিল দেখিলেন কুঞ্জের লাল চোখ ছুটা জলে ভরিয়া উঠিয়া তার গলার স্বর কেমন গাঢ় হইয়া উঠিল।

কিছু পরে কুঞ্জ সরকার তার কাজ শেষ করিয়া স্বভাব-সিদ্ধ ত্রস্তগতিতে হন্ হন্ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

* * * *

পর বৎসর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিয়া সংবাদ লইতেই অখিল জানিতে পারিলেন কুঞ্জ সরকার মারা গিয়াছে। ব্যারামের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে কেহ বলিল জ্বর, কেহ বলিল যক্ষ্মাকাশ, তখন তার মাত্র বেয়াল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। সে বার তার পক্ষে সেই বাঁধা বাহাত্তর টাকারও যোগাড় হয় নাই।

অখিলচন্দ্রের ইচ্ছা হইল কুঞ্জ সরকারের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের কিছু সাহায্য করা কিন্তু কার্য্যতঃ তা' আর ঘটিয়া উঠিল না। অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি জানিতে পারিলেন কুঞ্জের মৃত্যুর কিছু পরেই মোকদ্দমা সম্পর্কে প্রাপ্য খরচের টাকার জন্য নানাপ্রকারের বচসা করিয়া তার বড় মেয়েটাকে মাধব যুগীর ছেলে নবীন যুগী বাহির করিয়া নিজ ঘরে লইয়া গিয়াছে, এবং তার কিছু পরে কুঞ্জের স্ত্রী বৈষ্ণবী হইয়াছে, সঙ্গে ছোট মেয়েটাকে লইয়া গিয়াছে, আর কুঞ্জর শূন্য ভিটায় এবার মাধব যুগী পাটের চাষ করিয়াছে—লোকে বলে এমন আশ্চর্য্য ফসল নাকি সচরাচর দেখা যায় না।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত

মুক্তি

শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

জাগায়ে দিয়েছ মোরে, হে কল্যাণি,
কঠোর আঘাতে তব; তাই মোর
চোখে আসে না'ক ঘুম; এতদিনে
ছিনু আত্মভুলি মোহ নিদ্রাগত।
তুমি ক্রূর করে টুটিলে বন্ধন।
দেখি যৌন পথ মাঝে চলিয়াছি
গহন তিমির ঠেলে একা আমি।
একা,—তাহে নাহি ভয়, আমি আজি
আমারই আশ্রয়। যৌবনের
নব নাট্যশালে নিভে গেছে দীপ
থেমেছে কিঙ্কিণী; শুধু অন্ধকার
বিরাট প্রেতের মত বিভীষিকা
নিয়ে। তাই ভয় হয়, এ আঁধারে
কেমনে চলিব একা। এ কী বাণী
শুনি কোন্ অন্তরের অন্তরাল
হ'তে—সে আমারে কানে কানে কয়,—
"নাহি ভয়, ওরে নাহি, নাহি ভয়!
"আমিও রয়েছি একা; একা,—তাই
"পূর্ণতেজোময়; সঙ্গীহীন ব'লে
"অদ্বিতীয় তাই; সত্য চিরন্তন
"নাহি তার মিথ্যার দোসর, তাই
"সদা দীপ্তিমান সীমা সঙ্গহীন
"অনন্তের বুকে"।—তবে তাই হোক
আলো-বিরহের মাঝে পূর্ণ মুক্তিলোকে।

আধুনিক জাপানের সমাজ

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ সুর বি-এ

জাপানের আধুনিক ইতিহাস বলিলে ইহার ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পরের ইতিহাসকে বুঝাইয়া থাকে। ইহার মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইউরোপীয় জাতিগণ জাপানে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন। আমেরিকার পেরী (Commodore Perry) সাহেব এই প্রচেষ্টার পথপ্রদর্শক এবং তিনি ১৮৬৩ সালে বন্ধুত্ব ও বাণিজ্য-বন্দর স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া জাপানে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপান সম্পূর্ণ প্রাচ্য দেশ ছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে বৈদেশিকগণের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের স্বার্থের সংঘর্ষ এবং মিশনরীগণের ধর্ম্মপ্রচার ও শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টার আবর্ত্তে পড়িয়া জাপান ক্রমে ক্রমে আধুনিক হইতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু এখনো সে দেশের পরিবর্ত্তনের যুগ শেষ হয় নাই।

আধুনিক যুগের প্রারম্ভ হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, জাপান প্রধানতঃ বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা প্রসারের দিকেই বেশী চেষ্টা করিয়াছে। শিক্ষা-বিস্তারের জন্যও জাপান অনেক করিয়াছে, কিন্তু সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য বিশেষ কিছু করে নাই। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা ও শিক্ষা-বিস্তারের সাথে সাথে যে-টুকু পরিবর্ত্তন আপনি আপনি আসিয়াছে, তাহাই আধুনিক জাপানী সমাজে পরিলক্ষিত হইবে।

জাপানের ইতিহাসের গোড়া হইতেই দেখা যায় সে দেশের প্রত্যেক অধিবাসী স্বভাবতই স্বদেশপ্রেমিক এবং দেশের সম্রাটের প্রতি তাহাদের একটা অহেতুক ভক্তি ও আকর্ষণ আছে। এই স্বদেশপ্রীতি ও রাজভক্তি আধুনিক জাপান গঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ১৮৬৮ সালে সম্রাটের হাতে দেশ-শাসনের কর্তৃত্ব ফিরিয়া আসে, ইহাকেই Restoration বলে। রেষ্টোরেসনের পর দেশের জননায়কগণ জগতের অন্যান্য অগ্রগামী জাতিগণের সমকক্ষতা লাভের জন্য রাষ্ট্রে ও সমাজে যে সব পরিবর্ত্তন আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বদেশপ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ দেশবাসী নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। জাপানের সমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল; তদুপরি যতদিনের লিখিত ইতিহাস আছে তাহার মধ্যে জাপান কখনো পরাধীন হয় নাই বা সেখানে কখনো সমাজ-বিপ্লব হয় নাই, সেজন্যও উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রক্ষণশীলতা তাহার সামাজিক পরিবর্ত্তনের স্বপক্ষে দাঁড়ায় নাই। কিন্তু যাঁহারা মুকডেন ও মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ও পোর্ট-আর্থার আক্রমণের সময় জাপানীদের স্বদেশপ্রীতি, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার বিবরণ জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন এ জাতির পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমেরিকা জাপানে আস্তানা গাড়িতে না গাড়িতে ইংরাজ আসিয়া দেখা দিলেন এবং তাঁহার পিছনে পিছনে অন্যান্য শ্বেতজাতি ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন। জাপানের জননায়কগণ দেখিলেন, দৈহিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন এই সব জাতির সহিত সমকক্ষতা করিতে হইলে দেশের জনসাধারণকে সেই সব শিক্ষা দিতে হইবে যাহার গুণে পাশ্চাত্য দেশ আজ জগতের অন্যান্য জাতির উপর কর্তৃত্ব করিবার দাবী করিতেছে। ইহার ফলে, প্রথমতঃ দেশবাসীকে বৈদেশিকগণের আচার ব্যবহার, হাব ভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করা হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য দেশের পোষাক-পরিচ্ছদ বাহিরের কাজের বিশেষ উপযোগী এবং জাপানী পোষাকের অপেক্ষা ইহা সস্তা। নাবিক ও সৈনিকগণের বাধ্যতামূলক

ইউরোপীয় পোষাক ব্যবহারের জন্ম সরকারী আইন বিধিবদ্ধ হইল, এবং দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক যুবককে সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইতে হইত। সুতরাং দেশের শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রসার বাড়িতে লাগিল; অর্থশালীরাও অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইউরোপীয় পোষাকের সহিত চেয়ার, টেব্‌ল, প্রভৃতি আসবাবপত্রের প্রচলন বাড়িয়া চলিল, কারণ এই পোষাকে জাপানী প্রথায় উঠা-বসা করা অসুবিধাজনক, সঙ্গে সঙ্গে নূতনের প্রলোভনও আছে। স্কুলে ছাত্রগণ মাটিতে বিছানা পাতিয়া পড়াশুনা করিত, কিন্তু এই সময় হইতে চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি প্রচলন সুরু হইল। মোটের উপর, বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই সময় হইতে জাপানীদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

কোন সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান দেখিয়া সে সমাজের সভ্যতার একটা নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জাপান সম্বন্ধে হয়ত একথা সত্য নয়। জাপান স্বাধীন দেশ—সেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতাও আছে, কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীলোক সেখানে কোনদিন পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে নাই। নারী চিরদিন পুরুষের মুখ চাহিয়া আসিয়াছে, কিন্তু পুরুষও কোনদিন তাহাকে দাসীর আসনে স্থান দেয় নাই। স্ত্রী ও পুরুষের সমবায় ও সহযোগিতায় সমাজ-প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। বর্তমান যুগে ভোট প্রদানের অধিকারই সভ্যতার মাপকাঠি বলিয়া পরিগণিত হয়; সে দিক দিয়া দেখিতে গেলেও নারী এখনো পুরুষের সমান অধিকার পায় নাই—কারণ সেখানকার নারীর ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু বাহিরে সমান অধিকার না থাকিলেও অন্দরে তাঁহারা এখনো কর্ত্রী আছেন।

আধুনিকযুগে স্ত্রী-শিক্ষা খুব প্রসার লাভ করিয়াছে, এবং নারীরা কোন কোন বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করিতেছেন। জাপান প্রাথমিক শিক্ষার উপর খুব জোর দিয়াছে, সেখানে ছেলে ও মেয়ে একসঙ্গে স্কুলে পড়ে এবং শতকরা ১০০ জন ছেলে-মেয়েই স্কুলে যায়। রেষ্টোরেসনের পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে একদল মেয়ে উচ্চ-শিক্ষার জন্ম আমেরিকা চলিয়া যায়, তাহার পর হইতে মেয়েদের শিক্ষার জন্ম একটা প্রেরণা আসে। মিশনারীগণ এজন্ম বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেয়েদের শিক্ষার জন্ম সরকারী ও মিশনারী উচ্চ বিদ্যালয় আছে, টোকিওর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়িবার ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া মিশনারীদের চালিত কলেজও আছে। এ সব ছাড়া, মেয়েদের জন্ম একটী স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে—উহা ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপান আয়তনে খুব ছোট, প্রায় ভারতবর্ষের মাদ্রাজ প্রদেশের মত। উপরের এইটুকু বিবরণ হইতেই বোঝা যাইবে যে, সে-দেশ স্ত্রী-শিক্ষায় কতো অগ্রসর। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীর একসঙ্গে লেখাপড়া করিবার কোন বাধা নাই, তবুও মেয়েদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু বাংলা দেশে ছাত্র-ছাত্রীর একসঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা মাত্র ২।৩টী কলেজে নাম মাত্র চলে, এবং মেয়েদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় এখানে নাই। সমগ্র ভারতে মেয়েদের জন্ম একটীমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে—তাহাও বাংলা দেশ হইতে বহুদূরে।

জাপানে ছেলেমেয়েদের বিবাহ সাধারণতঃ অভিভাবকরাই ঠিক করেন এবং প্রত্যেক অভিভাবকের শীঘ্র শীঘ্র ছেলে-মেয়ের বিবাহ শেষ করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে। বর্তমান আইনে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৫ ও ছেলেদের ১৭। তবে সাধারণতঃ মেয়েদের ১৭-১৮ বৎসরের আগে বিবাহ হয় না, কারণ ঐ বয়সের পূর্বে তাহাদের স্কুলের পড়া শেষ হয় না। অনেক মেয়ের বেশী বয়সেও বিবাহ হয় তবে ২১ বৎসরের আগেই অধিকাংশ মেয়ের বিবাহ হইয়া যায়। ছেলেরা সাধারণতঃ ২৪-২৫ বৎসরের আগে বিবাহ করে না। একই লোকের একই সময়ে দুইটী বিবাহ করা আইনে নিষিদ্ধ—তবে একাধিক উপপত্নী রাখিতে সামাজিক কোন বাধা নাই। আধুনিক যুগে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে ও হইতেছে, শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের বেশী বয়সে বিবাহ হয় এবং অনেক স্থলে পাত্র-পাত্রী নিজেরাই নিজেদের পছন্দ করে, অভিভাবকের কোন দরকার হয় না।

জাপানীদের বিবাহ পদ্ধতিতে একটু বৈচিত্র্য আছে।

জগতের সকল সভ্যজাতির বিবাহ ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট, কিন্তু জাপানীদের বিবাহের ধর্ম্মের সহিত কোন সংস্রব নাই, এমন কি, তাহাদের বিবাহে পুরোহিত বা অন্য কোন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রতিনিধির কোন স্থান নাই। পূর্ব্বে বর-বধূর মাতা পিতা এবং ঘটক ও তাঁহার স্ত্রীর সমক্ষে ইহা সম্পাদিত হইত, রাজার কোন আইনের অধীনেও ইঁহাদের বাঁধা হইত না। তবে আজকাল বিবাহ রেজেষ্ট্রী করিতে হয়। বিবাহের পর বধূর আর পিত্রালয়ে যাইবার নিয়ম নাই। বিবাহের সময়ই বধূ জন্মের মত পিত্রালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তবে কখনো বিশেষ দরকার হইলে সামান্য সময়ের জন্য তিনি পিত্রালয়ে যাইয়া থাকেন। বাংলা দেশের মত একযাত্রায় ৩।৪ মাস 'বাপের বাড়ী' বাস করিবার সুযোগ ইঁহাদের কখনো ঘটে না। স্বামীর মাতা-পিতাকে ইঁহারা 'মা' ও 'বাবা' বলিয়াই সম্বোধন করেন।

জাপানে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ বিপত্নীকগণই বিধবা-বিবাহ করিয়া থাকেন। ইহা খুব সুন্দর নিয়ম, কিন্তু অর্থশালীদের অত্যাচারে কখনো কখনো ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের ১৪ বৎসরের মেয়ের চেলীর লাল আঁচল ধরিয়া সংসার প্রবেশের বিসদৃশ দৃশ্য সেখানে বিরল।

জাপান প্রধানতঃ কৃষি-প্রধান দেশ। এখানকার শতকরা ৬০ জনের উপজীবিকা কৃষি। সম্পন্ন ঘরের মেয়েরা ব্যতীত অন্য সকল মেয়েই পুরুষদের এই কাজে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন। জাপান জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সিল্ক প্রস্তুতকারী দেশ, এবং বিশেষ করিয়া এই ব্যাপারে মেয়েরা সকল কাজই করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গৃহ-শিল্পের সকল প্রকার কাজই সাধারণতঃ মেয়েরা করিয়া থাকেন। কল-কারখানার দিকে দেখিলেও দেখা যায়, সেখানেও মেয়েরা বেশ বড়ো স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সেখানে মজুরদের মধ্যে শতকরা ৬০-৮০ জন স্ত্রীলোক এবং শিশুদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই বালিকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কল-কারখানায় যাহারা কাজ করে, তাহাদের বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক। এই সমস্ত মেয়েদের পল্লীগ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য সর্ব্বদাই দালালরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেজন্য কল-কারখানার স্ত্রী-শ্রমজীবীরা সেখানে কি অবস্থায় বাস করে তাহার একটু বিবরণ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কারণ তাহাতে সমাজের অন্য দিকের চিত্রই উদ্ঘাটিত হইবে। এইজন্য এখানে একজন বিশেষজ্ঞের লেখা হইতে একটু অনুবাদ ও অন্য একজনের লেখা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন কি ভীষণ ঘৃণ্য অবস্থার ভিতর এই সব মেয়েরা বাস করে। কিন্তু এই বিভীষিকাময় আবহাওয়ার মধ্যে বাস করাকে জাপানে পাপ বলিয়া গণ্য হয় না এবং এই সব মেয়ের পক্ষে পরে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার পক্ষে কোন বাধা জন্মে না।

'কোন স্ত্রী-শ্রমজীবী কারখানায় উপস্থিত হইলে যাহাতে সে পলায়ন করিতে না পারে সেজন্য তালাবদ্ধ ঘেরা বাড়ীর মধ্যে তাহাকে আটকাইয়া রাখা হয়। শয়নের জন্য মাত্র একটী করিয়া মাদুর দেওয়া হয় এবং সেখানে তাহার সম্ভ্রম বা লজ্জাশীলতা রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। যেখানে রাত্রি-দিন কাজ চলে, সেখানে একই বিছানা দিবারাত্র ব্যবহার হয়।* খুব দীর্ঘ সময় ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া চিত্তবিনোদন বা আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা থাকিলেও অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃ কেহ তাহা ভোগ করিতে পারে না। এই রকম অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে ও বাস করিতে হয় বলিয়া শ্রমজীবীদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। তাহাদের নৈতিক অবস্থাও ভালো নয়'।*

'A Japanese Factory expert has affirmed that in some factories it is not uncommon that more than half the girls lose their virtue in a year. The long hours leave the workers so weary that any sort of excitement is welcome, and consequently vicious pleasures and pastimes are encouraged and common. The most usual amusements are drinking, gambling and sensuality'—Bryan, Japan from Within, p. 139.

পতিতা নারীর সংখ্যাও জাপানে কম নয়—৫০,০০০

* Dr. H. M. Vinacke, History of the Far East in Modern Times. P. 321.

হাজারেরও বেশী সরকারী লাইসেন্স পাওয়া মেয়ে দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করে এবং অনেকক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ বাপ-মাকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। গণিকাবৃত্তিকে আমাদের দেশে যেমন হীনচক্ষে দেখা হয়, জাপানে তাহা নয়, বরং যে সব মেয়ে মাতা-পিতার সাহায্যের জন্য এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, অনেক সময় তাহারা প্রশংসিত হয়। গণিকাগণের বাসের জন্য গবমেণ্ট হইতে বড়ো রাস্তার উপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আছে। এবং এই সব মেয়েদের সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থাও আছে। নৈতিক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, এই সব লাইসেন্স-প্রাপ্তা গণিকাদের সঙ্গে 'গেইসা'দেরও (Geishas) গণনা করা উচিত। গেইসারা নর্ত্তকী এবং আমাদের দেশের বাইজীদের মত তাহারা সামাজিক উৎসবে নাচ-গান করিয়া থাকে। তবে বাইজীদের সহিত তাহাদের একটু প্রভেদ আছে, এখানে 'বাইজী'দের কেহ সম্ভ্রম করে না, কিন্তু জাপানে সম্ভ্রম না করুক, কেহ ঘৃণা করে না। চা-এর দোকান, রেষ্টোঁরা প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে 'গেইসা' দেখিতে পাওয়া যায়। গেইসা অবস্থায় কোন যুবকের চিত্ত হরণ করিতে পারিলে, গেইসা তাহাকে বিবাহ করে। গণিকাদেরও বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার পক্ষে বিশেষ কোন বাধা নাই। যাহা হউক, আজকাল গবর্ণমেণ্টের লাইসেন্স দিয়া গণিকাবৃত্তি প্রচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠিতেছে।

সামাজিক দিক হইতে জাপান এখনো তাহার বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। জাপানে পরিবারকেই সামাজিক ইউনিট ধরা হয়, ইউরোপ বা অ্যামেরিকার মত ব্যক্তিতান্ত্রিক ইউনিট এখনো সেখানে অচল। এদিক দিয়া ভারতের সহিত তাহার মিল আছে। বিশেষজ্ঞরা অর্থের অভাবই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। এইখানে Robertson Scott-এর Foundations of Japan হইতে কয়েক লাইন তুলিয়া দিলাম, তাহা হইতে বিষয়টী আরো পরিস্ফুট হইবে।—"The family system, by which all is subordinated to family, is conveniente to farmers for it means increased labor and economy of living······generally speaking, the family system at one and the same time keeps youngmen from striking out in the world and compels their early marriage so that the helping hands to the family may be more numerous. P. 329. তবে দেশের industrial development-এর সঙ্গে সঙ্গে লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অনেকে সহরে গিয়া বাস করিতেছে এবং সেখানে বিবাহ করিতেছে। এই প্রকারে জাপান ব্যক্তিতান্ত্রিক হইবার পথে অগ্রসর হইতেছে।

বাহির হইতে দেখিলে ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নিদর্শন জাপানের সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই সভ্যতার প্রভাব এখনো সেখানকার পারিবারিক জীবনে বিশেষভাবে বিস্তারিত হয় নাই। স্ত্রীস্বাধীনতা সেখানে আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এখন নারীরা সমান অধিকার ভোগ করিতেছেন, তবুও সাধারণে অন্তঃপুরই নারীর উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে।

জাপানীরা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাতি বলিয়া কথিত। বিশেষতঃ সেখানকার মেয়েরা এজন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। সংসারের সর্ব্বপ্রকারের কাজ তাঁহারা করিতেছেন, তবু সর্ব্বদা প্রজাপতির মত সাজিয়া আছেন। গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে পারিপার্শ্বিক শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতায় চোখ জুড়াইয়া যায়। সেখানকার নারী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর মত গৃহস্থালীকে উজ্জ্বল করিয়া আছেন। গৃহস্থের বাড়ীর পরিচারিকাদেরও যথেষ্ট সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে এবং তাহার সর্ব্বদা এমন ফিটফাট থাকে যে, কে বাড়ীর পরিচারিকা বা কে বাড়ীর মেয়ে অনেক সময় তাহা বোঝা কঠিন।

সাধারণ গৃহস্থের মেয়ে-বধূরা নিজ হাতে রাঁধিয়া থাকেন। শুনা যায়, জাপানী মেয়েদের মত সুন্দর ভাত রাঁধিতে জগতের আর কোন স্থানের মেয়েরা পারেন না। ভাতই জাপানের প্রধান খাদ্য। মাছ, ডিম, ও অন্যান্য নানাপ্রকারের তরকারী তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চীনাদের মত আরসুলা প্রভৃতি না খাইলেও তাহারা

ইঁহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলে আগ্রহ সহকারে ইহা খাইয়া থাকেন।

প্রায় সকল পুরুষই তামাক খান, সুরাপানও করেন। মেয়েরাও অনেকে এই সব নেশা করিয়া থাকেন। ছেলেদের গুরুজনের সামনে চুরুট খাওয়া বা সুরাপান করা দোষের নয়। ছেলে-মেয়েরা অভিভাবকদের সাথে 'গেইসা'দের নাচ-গানও দেখিতে যায়।

জাপানীরা সভ্যজাতি হইলেও সময়ের মূল্যজ্ঞান ইঁহাদের খুব কম। ইঁহারা সময়-নিষ্ঠা (punctuality) আদৌ মানিতে জানেনা না। ১২টার সময় নিমন্ত্রণ থাকিলে কেহ যান ১টার সময়, কেহ যান ২টায়। দর্জ্জির দোকানে একটা পোষাক প্রস্তুত করিতে দিলে নির্দ্দিষ্ট দিনের অনেক পরে ভিন্ন তাহা পাওয়া যায় না। এই ব্যাপার সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই হইতেছে।

জাপানীদের শিষ্টতা বিশ্ববিশ্রুত। ইঁহাদের আদব-কায়দার অন্ত নাই। জাপানীরা সকলের সহিত ভদ্রব্যবহার করেন। বাড়ীর পরিচারক বা পরিচারিকাকেও কেহ কখনো রূঢ় কথা বলেন না, বা তাহার সহিত অভদ্র ব্যবহার করেন না। জাপানী ভাষায় গালাগালির শব্দ কিছু নাই—ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা রূঢ় কথা 'বাকা', অর্থাৎ বোকা।

জাপানী মেয়েরা তাঁহাদের বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রকারের 'খোঁপার' জন্য প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ ৫৭ প্রকারের খোঁপা জাপানে প্রচলিত আছে, তবে প্রজাপতি খোঁপার প্রচলন বেশী। জাপানী মেয়েরা স্নানের সময় খোঁপায় জল লাগিতে দেন না, এবং খোঁপা ভাল করিবার জন্য ডিম ভাঙ্গিয়া চুলে দেন। খোঁপা নষ্ট হইবার ভয়ে তাঁহারা শুইবার সময় বালিশ মাথায় দেন না,—এক প্রকারের কাঠের উপাধান ঘাড়ের নীচে ব্যবহার করেন। জাপানী মেয়েদের আর একটা বৈশিষ্ট্য তাঁহারা কখনো অলঙ্কার ব্যবহার করেন না।

জাপানের দক্ষিণাংশ গ্রীষ্মপ্রধান এবং সেখানকার লোকদের প্রত্যহ একাধিকবার স্নান করিবার অভ্যাস আছে। স্নানের জন্য সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে চৌবাচ্চা আছে। তবে দরিদ্রলোকে সাধারণ স্নানাগারে স্নান করিয়া থাকে। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটা লাইন পড়িলে ঐ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে এবং এই সাধারণ স্নানাগারের বিবরণ সমগ্র জাপান সম্বন্ধে প্রযোজ্য।—'In the city of Tokyo there are nearly 1000 public baths, where hundreds of thousands wash themselves daily for a half-penny a head, men and women together, till recent regulation undertook to restrict this innocent promiscuity.'

The New History of the World, Vol. VII, Part II. P. 46.

আধুনিক জাপানের প্রচলিত ধর্ম্মের সম্বন্ধে দু'একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক কারণ সমাজের সহিত ধর্ম্মের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জাপানে বর্ত্তমানে ৩টী প্রধান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তবে এই তিনটীর প্রত্যেকেরই বিভিন্ন শাখা আছে।

১। শিন্টোধর্ম্ম—প্রকৃতপক্ষে ইহা পূর্ব্বপুরুষদের উপাসনা। ইহার ভিতর ১৩টী বিভাগ আছে এবং ১৯২২ সালে প্রায় ১ কোটী ৬০ লক্ষ এই ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছিল। *

২। বৌদ্ধধর্ম্ম—এই ধর্ম্ম খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে জাপানে নীত হয়। বর্ত্তমানে ইহার ১২টী বড়ো বিভাগ আছে—এবং ইহাদের প্রত্যেকের শাখা-প্রশাখা আছে। ১৯২১ সালে জাপানে ৭১ হাজারেরও বেশী বৌদ্ধ মন্দির ছিল †। ইহা হইতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য অনুভূত হইতে পারিবে।

৩। খৃষ্টধর্ম্ম—এই ধর্ম্ম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানে প্রবেশ লাভ করে, এবং মিশনারীগণের প্রচেষ্টায় ও Y. M. C. A, Y. W. C. A., Salvation Army প্রভৃতির চেষ্টায় খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শ জাপানের সর্ব্বত্রই বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে।

উপরের লিখিত বিবরণ হইতে জাপানের সমাজ সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মিতে পারিবে। তবে বিষয়টা খুব জটিল এবং বড়ো; কোন একটা প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত আলোচনা হওয়া কঠিন। আমি প্রত্যেক বিষয়ের অল্প একটু করিয়া আভাষ দিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর

* Japan Year Book 1926. P. 187

† Vinacke History of For East. P. 336.

যুগসন্ধি

—উপন্যাস— শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এম্‌-এ, বি-এল

৬

সূর্য্যোদয়ে

প্রাচীতে উষার আভাষ ফুটিয়া উঠিল। দিবাগমের সঙ্গে সঙ্গে সকলে দেখিল, লা টুর্গের মালভূমিতে এক অদ্ভুত, নিশ্চল, রহস্যময় পদার্থ। ফুজার্সের অরণ্যের উপর দিয়া উহার মাথা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে।

রজনীর অন্ধকারে উহা ঐখানে স্থাপিত হইয়াছে। মনে হয় ওটা যেন মাটী ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে—তৈরী হয় নাই। উহার ঋজু কঠিন অবয়ব-রেখাগুলি আকাশের পটে চিত্রিত প্রাচীন মিশরের দুর্ব্বোধ্য সাঙ্কেতিক বর্ণমালার মতো দেখাইতেছিল।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়, আপন পারিপার্শ্বিকের সহিত জিনিসটার সামঞ্জস্য নাই। কুসুমাকীর্ণ কানন-ভূমির মধ্যে এই রাক্ষস-মূর্ত্তি—কোন্ প্রয়োজনে? উহার দিকে চাহিতে চাহিতে দর্শকের বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে—দেহের রক্ত যেন শীতল হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়।

জিনিসটা একটা টেবিলের মতো মঞ্চ—চারটা খুঁটি উহার চারটা পা; ঐ মঞ্চের একপ্রান্তে দুইটি উঁচু খুঁটি সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে; উহাদের উপরের মাথা একখানা আড়াআড়ি কাষ্ঠখণ্ডে সংযুক্ত। সেখান হইতে একটা ত্রিকোণাকৃতি পদার্থ ঝুলিতেছে। প্রভাতের নীলাকাশের পৃষ্ঠে সেই ত্রিভুজটা কালো দেখাইতেছিল। মঞ্চের অপর-প্রান্তে একটা মই। খুঁটি দুইটার মধ্যভাগে এবং ত্রিভুজটির ঠিক নিম্নে দুইটি সমানভাগে বিভক্ত একটি তক্তা। খণ্ড দুইটি পরস্পরের সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে—কিন্তু মাঝখানে মানুষের গলদেশ পরিমাণ একটি গোল ছিদ্র রহিয়াছে। এই তক্তার উপরার্দ্ধ ইচ্ছামত একটি বৃন্ত হয়। সম্প্রতি সেগুলি বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। যে দুইটি খুঁটি হইতে ত্রিভুজটি দোদুল্যমান তাহাদের পাদদেশে একটি তক্তা কব্জির উপর আঁটা, আবশ্যক মতো ঘুরানো যায়।

এই তক্তার পার্শ্বে একটা লম্বা খাঁচা। উঁচু খুঁটি দুইটির মধ্যে, মঞ্চের সম্মুখভাগে অপরপ্রান্তে আরো একটি চতুষ্কোণ খাঁচা। এই অদ্ভুত অস্বাভাবিক পদার্থটা লাল রঙে চিত্রিত। ত্রিভুজটা লৌহ নির্ম্মিত—বাকী সবই কাঠের। জিনিসটা এতই কুৎসিত এবং অপ্রিয়দর্শন যে, উহা যে মানুষের হাতের তৈরী তাহাতে কাহারও সন্দেহ হয় না, অথচ এমনই দুর্দ্ধর্ষ যে, মনে হয় বুঝিবা ওটা কোন দানবীশক্তিরই সৃষ্টি।

এই সৌষ্ঠবহীন পদার্থটা হইতেছে গিলোটিন।

ইহার সম্মুখে, কিয়দ্দূরে আর এক দৈত্য মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছে—সেটা লাটুর্গ। পাথরের রাক্ষস যেন কাঠের রাক্ষসের সাহচর্য্য করিতেছে। মানুষের হাত লাগিলে কাঠ ও পাথর আর প্রাণহীন জড়পদার্থ থাকে না। মানবীয় ভাবে সেগুলিও কতক পরিমাণে অনুপ্রাণিত হয়। একটা অট্টালিকা যেন একটা মতবাদের মূর্ত্ত অভিব্যক্তি; একটা যন্ত্র, একটা বিশেষ ভাবের দ্যোতক।

লাটুর্গ পঞ্চদশশত বৎসরের সংক্ষিপ্তসার—মধ্যযুগের অন্ধকার, এবং সামন্ত-প্রথার দাসত্বের ঘনীভূত প্রতিরূপ। আর গিলোটিন এক বৎসরের—'৯৩ সালের প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু এই বারোটি মাস ঐ পঞ্চদশ শতাব্দীর সহিত সমান পাল্লা দিয়াছে!

লা-টুর্গ রাজতন্ত্র; গিলোটিন রাষ্ট্রবিপ্লব। উভয়ের সংঘর্ষ—এক নিদারুণ ট্র্যাজিডি।

একদিকে খাতক, অপরদিকে মহাজন। হিসাব নিকাশের দিন সমুপস্থিত।

একদিকে প্রজা ভূম্যধিকারী, দাস, প্রভু, অভিজাত অনভিজাত সম্বন্ধীয় অসংখ্য বিধিনিষেধ, প্রথা ও দেশাচারের জটিল সংমিশ্রণ; পৌরোহিত্যের প্রভাবান্বিত বিচারাদালত, বন্ধনের উপর বন্ধন, রাজস্বের গুরুভার, আইনের অত্যাচার, কুসংস্কার, বিশেষ অধিকার, ধর্মান্ধতা, সিংহাসন, রাজদণ্ড, রাজাতে দেবত্বের আরোপ; অপরদিকে কেবল একটিমাত্র জিনিষ—সংহার-যন্ত্র।

একদিকে গ্রন্থি; অপরদিকে কুঠার!

বহুযুগ ধরিয়া লাটুর্গ এই মহারণ্যের নিভৃতে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। সে এতকাল আপনার উত্তপ্ত-তৈল-পূর্ণ কটাহ, গলিত সীসক, নরকঙ্কালাবৃত চত্বর, পেষণ-যন্ত্র ও অন্ধ-কারাকক্ষের সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা লইয়া চতুপার্শ্বস্থ জনপদের উপর ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। এই আলোকহীন বনস্থলীতে তাহার বর্ব্বরতার রাজত্ব এতদিন অপ্রতিহত প্রভাবে চলিয়াছে। কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। আজ সহসা আর এক করালী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিল—গিলোটিন।

সময় সময় অচেতন জড়পদার্থকেও অদ্ভুত দৃষ্টি-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। মনে হয় পাষাণ মূর্ত্তি যেন লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে, উচ্চ দুর্গচূড় যেন সতর্ক প্রহরীর মতো চাহিয়া রহিয়াছে, প্রাসাদতোরণ যেন কোনো বিশেষ আকাঙ্ক্ষার মগ্ন। মনে হইতেছিল, লাটুর্গ যেন গিলোটিন-টাকে অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। ওটা আবার কি? বোধ হয় তাহার মনে এই প্রশ্নই জাগিতে-ছিল।

দেখিয়া মনে হয়, যেন ওটা মাটি হইতেই গজাইয়াছে। আর বলিতে গেলে এই বিষবৃক্ষটি ঐ ভয়ঙ্কর ক্ষেত্রেই অঙ্কুরিত হইয়াছে। মানুষের শ্রমবারি-নিষিক্ত, অশ্রুধারা-সিঞ্চিত, মর্ম্মান্তিক মৃত্তিকা হইতে, সংখ্যাহীন অত্যাচারের লক্ষ লক্ষ বলি,—যুগযুগ সঞ্চিত পাপরাশি—যাহার গোপনতলে লুক্কায়িত, সেই ধরণী-পৃষ্ঠ হইতেই এক বিধাতৃ-নির্দিষ্ট দিনে এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, রক্ত-পিপাসী, করবাল-ধারিণী উদ্ভব। ৯৩ সাল যেন প্রাচীন জগতকে ডাকিয়া বলিতেছে,—"দেখ, দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ!"

আর গিলোটিন বোধ হয় এই কারাদুর্গ টিকে বলিতেছিল, 'আমি তোমারই সন্ততি।'

সেই মুহূর্ত্তে লাটুর্গের ভীমদুর্গ এই নবোত্থিত শক্তির কবলে আপনার বিনাশ অনুভব করিল।

গিলোটিনের নৃমুণ্ডমালিনী মূর্ত্তির সমক্ষে লাটুর্গ যেন ভয়ে কাঁপিতেছিল। ঐ ভীষণ প্রস্তরস্তূপ রাজশ্রীমণ্ডিত হইলেও একটা বিরাট অপকীর্ত্তি; আর সেই রক্তত্রিভুজসমন্বিত কাষ্ঠখণ্ডের কুখ্যাতি তদপেক্ষাও কলঙ্ক-মলিন। অস্তগামী প্রতাপ-তপন নবোদিত শক্তিসূর্য্যের খরকরে ম্লানীভূত। অপরাধের ইতিহাস যেন বিচারের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতেছে। অতীতের নৃশংসতা যেন বর্ত্তমানের নৃশংসতার সহিত নিজের তুলনা করিয়া দেখিতেছে। এই প্রাচীন দুর্গ, এই প্রাচীন কারাগার, প্রাচীন প্রভুত্বের প্রেত-লীলার এই শ্মশানভূমি—যেখানে কত শত নিপীড়িত হতভাগ্যের অন্তিম চীৎকার পাষাণ প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া বৃথায় ফিরিয়া আসিয়াছে; সংগ্রাম এবং হত্যার প্রয়োজনে গঠিত এই কারাদুর্গ—বর্ত্তমানে নিরর্থক আত্মরক্ষায় অসমর্থ, ভগ্ন বিধ্বস্ত, ভস্মমুষ্টিতে পরিণত, স্খলিত পাষাণের কদাকার স্তূপ, শত শতাব্দীর স্মৃতির দংশনে জর্জ্জরিত—আজ মরণের পথে অগ্রসর হইতে হইতে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিতেছিল, কেমন করিয়া জীবন্ত বর্ত্তমানের এই সংহার মূর্ত্তি দিকে দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। গতকল্য যেন অন্ধকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। বর্ব্বর যুগের নিষ্ঠুরতা তাহার এই আধুনিকতম রূপান্তরের নিকটে নতমস্তকে পরাজয় স্বীকার করিতেছে। মরণোন্মুখ স্বৈরাচার এই কল্কি-অবতারের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে।

প্রকৃতি করুণাহীন। মানুষের নিষ্ঠুরতা, মানুষের অত্যাচার, মানুষের যন্ত্রণা, এ সকলের সম্মুখেও সে তাহার পুষ্প তাহার সঙ্গীত, তাহার সূর্য্যালোক, তাহার আনন্দ বিক-শিত করিয়া মানুষকে কশাঘাত করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বিধাতৃ-বিধানের স্বর্গীয় সুষমা এবং নরলোকের কার্য্যকলাপের বৈপরীত্য দেখাইয়া প্রকৃতি মানুষকে একেবারে অভিভূত

করিয়া ফেলে। হত্যা, প্রতিহিংসা, বর্ব্বরতার মধ্যেও মানুষকে অনুভব করিতে হয় যে, চারিদিক হইতে পূতশীল পদার্থ নিচয় তাহার দিকে তাকাইয়া আছে; নিখিল প্রকৃতি এবং শান্ত উদার আকাশের তীব্র তিরস্কার হইতে কিছুতেই তাহার পরিত্রাণ নাই। মানুষের গড়া বিধি সকলের নগ্ন কদর্য্যতা শাশ্বত সৌন্দর্য্যের দিব্য দীপ্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হয়। মানুষ ভাঙে, ধ্বংস করে; মানুষ হত্যা করে, গ্রাম জনপদ ছারখার করে; কিন্তু বসন্ত বসন্তই থাকে, শতদলের সৌন্দর্য্যের হ্রাস নাই, নক্ষত্র চিরকাল অম্লান।

প্রভাতটি স্নিগ্ধ, রবি-করোজ্জ্বল। মৃদু সমীরণে মাঠের ঝোপঝাড় ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। বৃক্ষপত্রে নয়নাভিরাম শিহরণ। লতাগুল্মের অন্তরালে নির্ঝর সকল উপল-ঝঙ্কারে যেন অরণ্যের মর্ম্মকথা কহিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। সুনীল জলধির মতো নীল নভোমণ্ডল, তাহাতে ভাসমান শুভ্র মেঘ-খণ্ড, স্বচ্ছ-সলিল সরিৎ, অরণ্যের শ্যামলিমা সুসমঞ্জস বর্ণ-বৈচিত্র্য, বিশাল মহীরুহের অটবী, কোমল সবুজ মখমলের মতো তৃণাস্তরণ, শান্ত শস্যক্ষেত্র—সকলের ভিতর হইতে একটা পবিত্রতা—যাহা মানুষের প্রকৃতির চিরন্তন উপদেশ—নিঃশ্বসিত হইতেছে।

এই শান্তিপূর্ণ সুন্দর দৃশ্যাবলীর মধ্যেই মানুষের নির্লজ্জতার কুৎসিত মূর্ত্তি—কারাদুর্গ এবং বধ্যমঞ্চ, সংগ্রাম ও শাস্তি, অতীতের ও বর্ত্তমানের রক্তপিপাসু অপদেবতা, প্রাচীন যুগের নিশীথ-পেচক এবং ভাবীকালের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের কুদর্শন বাদুড় দণ্ডায়মান। লা-টুর্গ এবং গিলো-টিনকে ঘিরিয়া পুষ্পাকীর্ণ, সুরভি-মাখানো সোণালী উষার দীপ্তি জড়ানো প্রকৃতি মানুষকে যেন বলিতেছে,—"দেখ, আমি কি করেছি, আর তুমি কি করছ।" সূর্য্যের আলোক এই আত্ম-পরীক্ষার মানুষকে বাধ্য করে।

এরূপ দৃশ্যের ও দর্শকের অভাব ছিল না।

মালভূমির উপর চারি সহস্র সৈনিক যোদ্ধবেশে সজ্জিত। গিলোটিনের তিনদিক ঘেরিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছে; চতুর্থ দিক উন্মুক্ত। সেইদিকে খদ—সেটা যেন লা-টুর্গের দিকে ভ্রূকুটিভঙ্গে চাহিয়া আছে।

এই সৈনিকসজ্জায় একটা বর্গক্ষেত্রের মতো হইয়াছে। উহার কেন্দ্রস্থলে বধ্যমঞ্চ। দিবাকর যতই দিক্‌চক্রবাল সীমার ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর গিলোটিনের ছায়া ততই হ্রস্ব হইয়া আসিতেছিল।

গোলন্দাজেরা তাহাদের তোপের পার্শ্বে দণ্ডায়মান; পলিতাগ্রে অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছে।

একটি নীলাভ ধূম্ররেখা খদ হইতে উপরে উঠিতেছিল। উহা নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নিকাণ্ডের শেষ নিঃশ্বাস।

এই লঘু ধূম-যবনিকা লা টুর্গকে বেড়িয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছিল; কিন্তু তাহাতে দুর্গ টি আবরিত হইয়া যায় নাই। কারাদুর্গের উচ্চ মঞ্চ এবং গিলোটিনটার মধ্যে কেবল খদটির ব্যবধান। দুইটায় কথাবার্ত্তা চলিতে পারে। মঞ্চের উপর, ত্রিবর্ণের পতাকার নীচে বিচারাদলতের চেয়ার ও টেবিল স্থাপিত হইয়াছে।

ক্রমে লা-টুর্গের পশ্চাতে দিনদেব গগনমণ্ডলের আরও ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলেন। তাহার উজ্জ্বলতর প্রভায় কারাদুর্গের কৃষ্ণচ্ছবি অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, এবং দেখা গেল পতাকা-নিম্নস্থ কাষ্ঠাসনে কে একজন বুকের উপর হাত দুইটি আড়া-আড়ি ভাবে রাখিয়া নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মতো বসিয়া রহিয়াছে।

ইনি সিমুর্দ্যান। তাঁহার অঙ্গে কমিটি-অব-পবলিক-সেফটির ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির পরিচ্ছদ; মস্তকে ত্রিবর্ণের 'বো' যুক্ত হ্যাট; পার্শ্বে তরবারী লম্বমান, এবং কটিতে পিস্তল। সিমুর্দ্যান নির্ব্বাক্, সমস্ত জনতা মূক, সৈনিকগণ মৌন—বন্দুক হস্তে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া। অস্পষ্টভাবে কত কথা তাহাদের মনে জাগিতেছিল—এই দারুণ সমর, সংগ্রামের পর সংগ্রাম, পরাজিত কৃষক বিদ্রোহীর দল, অধিকৃত দুর্গ সকল, কত বিজয়ের গৌরব—আজ সেই সমস্ত গৌরব যেন লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা নিদারুণ প্রতীক্ষার গুরুভার সকলেরই বক্ষে চাপিয়া রহিয়াছে। তাহারা দেখিতে পাইল, ঘাতক আসিয়া বধ্যমঞ্চোপরি গিলোটিনের পার্শ্বে দাঁড়াইল। প্রভাত-রৌদ্রের ক্রমবর্দ্ধমান তেজঃপুঞ্জ সমস্ত আকাশকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বস্ত্রাবৃত ড্রামের বিষাদগম্ভীর

শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। শোকবাদ্য ক্রমে নিকটতর হইল। সৈনিকশ্রেণী পথ ছাড়িয়া দিল, একটি মিছিল সেই সৈনিক-বেষ্টিত বর্গক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বধ্যমঞ্চের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

প্রথমে, কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত ড্রাম স্কন্ধে ড্রামবাদকগণ; তৎপর নতশীর্ষবন্দুক হস্তে বন্দুকধারী সৈন্যগণ, তৎপর নিষ্কোষিত-তরবারি-করে একদল অস্ত্রধারী পুলিশ, সর্ব্বশেষে দণ্ডিত গভেন। দৃঢ়, অকম্পিত পদে সে হাঁটিয়া যাইতেছিল। তাহার হাতে বা পায়ে শৃঙ্খল ছিল না। অবসরকালে সামরিক কর্ম্মচারীগণ যেরূপ পোষাক পরিয়া থাকে গভেনের পরিধানে সেইরূপ পরিচ্ছদ। তাহার কটিদেশে তরবারি লম্বমান। তাহার পশ্চাতে আর একদল সৈন্য কুচ করিয়া আসিতেছিল।

সিমুর্দ্যানের প্রশ্নে গভেন যখন বলে, "আমি ভাবচি, ভবিষ্যতের কথা," তখন তাহার বদনমণ্ডল যে ভাবনা-গম্ভীর আনন্দের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, এখনও তাহার মুখে সেই হাসির রেখা। কি উদার মহৎ, কি মর্ম্মস্পর্শী এই হাসিটি।

সৈনিকবেষ্টিত সেই সাংঘাতিক ভূমিতে উপনীত হইয়া প্রথমেই সে দুর্গশীর্ষাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। গিলোটিনকে সে গ্রাহ্য করিল না। গভেন জানিত সিমুর্দ্যান এই শেষকার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে। দুর্গশীর্ষে মঞ্চের দিকে সে চাহিল। দেখিল, সিমুর্দ্যান সেখানে রহিয়াছেন।

সিমুর্দ্যানের মুখ মৃত্যু-পাণ্ডুর; দেহ শীতল হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বে দণ্ডায়মান ব্যক্তিরাও তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দ শুনিতে পাইতেছিল না। গভেনকে দেখিয়া তাহার একটি পেশীও বিচলিত হইল না।

গভেন বধ্যমঞ্চের অভিমুখে অগ্রসর হইল। চলিতে চলিতে সে সিমুর্দ্যানের দিকে চাহিল। সিমুর্দ্যানও তাহার দিকে চাহিল। বোধ হইল, গভেনের নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি যেন এখন সিমুর্দ্যানের একমাত্র নির্ভরস্থল।

মঞ্চের পাদমূলে পৌঁছিয়া গভেন তদুপরি আরোহণ করিল। অস্ত্রধারী পুলিশের নায়ক তাহার অনুসরণ করিল। গভেন কটিবন্ধনী হইতে তরবারীটি উন্মোচন করিয়া নায়কের হস্তে সমর্পণ করিল; আর গ্রীবাচ্ছদ অপসারিত করিয়া ঘাতকের হস্তে দিল।

বধ্যমঞ্চের উপরে গভেন দাঁড়াইয়া—আত্মবিস্মৃত, ধ্যানমগ্ন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! এত সুন্দর বুঝি তাহাকে আর কখনও দেখায় নাই। ললাট-স্পর্শী স্বর্ণাভ চূর্ণকুন্তল বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শিরশ্ছেদের পূর্ব্বে কেশ কর্ত্তন করিবার পদ্ধতি তখনও চলিত হয় নাই। তাহার তুষার-শুভ্র গ্রীবাদেশ তরুণীর গ্রীবার মতোই মনে হয়। তাহার বীরত্বব্যঞ্জক, প্রভুত্বসূচক দৃষ্টি দেবতার কথা মনে করাইয়া দেয়। সৌরকর-দীপ্ত গভেনের বদনমণ্ডল দিব্যজ্যোতিমণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছিল।

দণ্ডিতকে বন্ধন করিতে হইবে। ঘাতক রজ্জুহস্তে অগ্রসর হইল।

সৈনিকেরা যখন দেখিল গিলোটিনের খড়্গ একেবারে তাহাদের যুবক সেনাপতির মাথার উপরে উদ্যত তখন তাহারা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। শোক-মুহ্যমান সহস্র কঠোর হৃদয় মথিত করিয়া আর্ত্ত চীৎকার আকাশে উত্থিত হইল, "দয়া কর! দয়া কর!"

কেহ কেহ নতজানু হইয়া রহিল; কেহ কেহ হাতের বন্দুক ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দুর্গশীর্ষে যেখানে সিমুর্দ্যান উপবিষ্ট সেইদিকে যুক্তকরে চাহিয়া রহিল; একজন গিলোটিনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "যদি পরিবর্ত্ত দেওয়া চলে, তবে আমি প্রস্তুত।"

ক্ষিপ্তের মতো সকলে চীৎকার করিতে লাগিল, "দয়া কর! দয়া কর!" শোণিত-লোলুপ সিংহও বোধ হয় সেই সমবেত আর্ত্তনাদে আপনার হিংস্রত্ব ভুলিয়া যাইত। যোদ্ধার চক্ষে জল—এ বুঝি পাষাণও গলাইতে পারে।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ঘাতক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তখন দুর্গশীর্ষ হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আইনের হুকুম তামিল কর।"

স্পষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে উচ্চারিত হইলেও সেই কঠোর কথাগুলি সকলেই শুনিতে পাইল। সিমুর্দ্যানের

বজ্র-কণ্ঠ সকলেই চিনিতে পারিল। সৈনিকবৃন্দ শিহরিয়া উঠিল।

ঘাতকের আর দ্বিধা রহিল না। রজ্জুহস্তে সে অগ্রসর হইল।

গভেন বলিল, "একটু অপেক্ষা কর।"

তখন সিমুর্দ্যানের দিকে ফিরিয়া সে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করতঃ তাহাকে বিদায়-অভিবাদন জ্ঞাপন করিল, তৎপর ঘাতককে তাহার হস্তপদ বন্ধন করিতে ইঙ্গিত করিল।

বন্ধন কার্য্য সমাপ্ত হইলে গভেন পুনরায় ঘাতককে বলিল," অনুগ্রহপূর্ব্বক আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর।"

অতঃপর সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "সাধারণ তন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক্।"

তক্তার উপর তাহাকে শায়িত করা হইল। মহৎ শির নিক্ষিপ্ত যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইল। ঘাতক আস্তে আস্তে তাহার দীর্ঘকেশ সরাইয়া দিয়া গ্রীংটি স্পর্শ করিল। ত্রিভুজটা নামিয়া আসিতে লাগিল প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত গতিতে—একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল—

সেই মুহূর্ত্তে আরও একটা উচ্চ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। কুঠার-পাতের প্রত্যুত্তরে যেন একটা পিস্তলের আওয়াজ হইল। যে মুহূর্ত্তে গভেনের মস্তকহীন দেহ খাঁচার মধ্যে গড়াইয়া পড়িল সেই মুহূর্ত্তে সিমুর্দ্যান কটিনিবদ্ধ একটি পিস্তল তুলিয়া লইয়া তাহার গুলিতে আপনার হৃদয়বিদ্ধ করিলেন। মুখ দিয়া রক্তঝলক বহিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার মৃতদেহ ভূপতিত হইল।

দুইটি মুক্তাত্মা অনন্তের পথে উড়িয়া চলিল—একের ছায়া অপরের জ্যোতিতে মিশাইয়া গেল।

সমাপ্ত

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী



ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র

শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্ত্তী পি-এচ্-বি

১

দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ভগবান্ তথাগতের অন্তরে যে "বোধি" স্ফুরিত হইয়াছিল তাহা তিনি সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত করেন বারানসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের সমীপে। তাঁহার এই প্রথম ধর্ম্মদেশনা ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনসূত্ররূপে আমরা পাইতেছি। বৌদ্ধধর্ম্মের মর্ম্মকথা অতি সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে এই সূত্রে নিহিত আছে।

কোণ্ডন্য, বপ্র, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ এই পাঁচটি ব্রাহ্মণকুমার গৃহত্যাগ করিয়া মোক্ষান্বেষণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, বহু আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এবং নানাপ্রকারের সাধনা করিয়াও যখন তাঁহাদের মনে শান্তি মিলিল না তখন তাঁহারা কঠোর তপশ্চর্য্যারত গৌতমের দর্শনলাভ করেন এবং তৎপ্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সেবা যত্ন করিতে থাকেন। কঠোর ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ভিতর দিয়া সত্যের সন্ধান না পাইয়া গৌতম যখন তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্য পথ গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার প্রতি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ-কুমারের ভক্তিশ্রদ্ধা হ্রাস পাইল; তাঁহারা গৌতমকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বুদ্ধত্বলাভের পরে তাঁহার নূতন ধর্ম্মদেশনা শুনাইবার লোক খুঁজিতে খুঁজিতে ভগবান্ যখন ঋষিপত্তন মৃগদাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সেখানে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণকুমারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি তাঁহার ধর্ম্মদেশনা আরম্ভ করেন। ইহাই তাঁহার প্রথম উপদেশ এবং এই পাঁচজনই তাঁহার প্রথম শিষ্য।

যে শুভলগ্নে ভগবান্ তথাগত এই ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা মানব জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। এই শুভক্ষণে প্রভু অমিতাভ তাঁহার কঠোর তপস্যালব্ধ বোধিরূপ অমৃতমণ্ড জরাব্যাধিমরণগ্রস্ত জীবগণের নিকট প্রথম বিতরণ করেন। পৃথিবীর ধর্ম্ম-ইতিহাসে মুক্তির উদার রাজবর্ত্ম এমন সহজ সরলভাবে আর কেহ কোন কালে প্রদর্শন করেন নাই। ঈশ্বর, আত্মা ও পরকালের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক না রাখিয়া শুধু আত্মনির্ভরতাসহায়ে সংযম ও অনুশীলনের দ্বারা নির্ব্বাণ প্রাপ্তির এমন অভিনব মৌলিক উপায় আর কেহ কোন দেশে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

২

বারানসীর নিকট ঋষিপত্তন মৃগদাবে অবস্থানকালে ভগবান্ তথাগত কোণ্ডন্য, বপ্র, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ—এই পঞ্চভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া এই উপদেশ করিয়াছিলেন—

দেখ ভিক্ষুগণ, দুইটি চরম পথ রহিয়াছে যাহার কোনটিকেই প্রব্রজিত ব্যক্তি অবলম্বন করিবেনা। একটা হইল 'কামসেবন' অপরটি হইল 'আত্মনিগ্রহ'। ইহাদের প্রথমটি হীন, গ্রাম্য, প্রাকৃতজনসেব্য, অনার্য্য ও অনর্থকর; দ্বিতীয়টিও ক্লেশদায়ক, অনার্য্য ও অনর্থকর।

হে ভিক্ষুগণ, এই দুইটি অন্তকে বর্জ্জন করিয়া তথাগত একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পথে প্রবেশ করিলে চক্ষু খুলিয়া যায়, জ্ঞানলাভ হয়। ইহা উপশম, অভিজ্ঞা, সমাধি ও নির্ব্বাণ লাভের হেতু। সেই মধ্য পথটি (মজ্‌ঝিমা পটিপদা) কি? না—আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (অরিয়ো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গ)। (১) সম্যক্ দৃষ্টি (২) সম্যক্ সঙ্কল্প (৩) সম্যক্ বাক্ (৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত (৫) সম্যক্ আজীব (৬) সম্যক্ ব্যায়াম (৭) সম্যক্ স্মৃতি এবং (৮) সম্যক্ সমাধি।

৩

ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্রে আষ্টাঙ্গিক মার্গের শুধু উল্লেখ রহিয়াছে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। সহজে বুঝিবার জন্য এখানে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে।

(১) সম্যক্ দৃষ্টি—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায় এই চারি আর্য্য সত্য জ্ঞানের নামই সম্যক্ দৃষ্টি।

(২) সম্যক্ সংকল্প—নিষ্কাম বা নৈষ্কর্ম্মের সংকল্প, অব্যাপাদ অর্থাৎ অন্যের অপকার না করিবার ও উপকার করিবার সংকল্প, অহিংসার সংকল্প।

(৩) সম্যক্ বাক্য—মিথ্যাবাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য ও বৃথা গল্প—এই সকল হইতে বিরতি। সত্য গোপন করা ও মিথ্যা রচনা করার নামই 'মিথ্যা বাক্য'। একজনকে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার মানসে একের কথা অপরকে বলার নাম 'পিশুন বাক্য'। ক্রোধহেতু অভদ্রোচিত ভাষায় নিন্দা তিরস্কার করার নাম পরুষ বাক্য। অন্ন, পান, রাজা, অমাত্য, চোর দস্যু প্রভৃতি বিষয়ক "আষাঢ়ে গল্পের" নামই 'বৃথাগল্প', এই সকল হইতে বিরত হওয়ার নামই 'সম্যক্ বাক্য'।

(৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত—মিথ্যা কর্ম্ম হইতে বিরতি। মিথ্যা কর্ম্ম ত্রিবিধ—প্রাণিহত্যা, পরস্বাপহরণ ও মৈথুন।

(৫) সম্যক্ আজীব—(বা সম্যক্ জীবিকা) সৎপথে থাকিয়া সদুপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করা। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে মৎস্যবাণিজ্য, মাংসবাণিজ্য, প্রাণিবাণিজ্য, অস্ত্রবাণিজ্য, বিষবাণিজ্য, উৎকোচগ্রহণ, বাস্তুবিদ্যা, মূষিকবিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা, বায়সবিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা মিথ্যা জীবিকা।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম—উৎপন্ন পাপের বিনাশ, অনুৎপন্ন-পাপের অনুৎপাদন, উৎপন্ন পুণ্যের সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন এবং অনুৎপন্ন পুণ্যের উৎপাদনের জন্য যে অধ্যবসায় তাহাকে 'সম্যক্ ব্যায়াম' বলে।

(৭) সম্যক্ স্মৃতি—'কায়বিষয়ে কায়দর্শন', 'বেদনা বিষয়ে বেদনা দর্শন', 'চিত্ত বিষয়ে চিত্ত দর্শন' এবং 'ধর্ম্ম বিষয়ে' ধর্ম্মদর্শন—ইহাদের নাম 'সম্যক্ স্মৃতি'।

(ক) কায়বিষয়ে কায়দর্শন—কেশ, লোম, নখ, দন্ত প্রভৃতি যে সকল অশুচি পদার্থ এই দেহে বিদ্যমান আছে তাহা প্রত্যবেক্ষণ করিতে হয়। এই দেহে পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু ধাতু আছে, তাহা প্রত্যবেক্ষণ করিতে হয়।

(খ) বেদনা বিষয়ে বেদনাদর্শন—সুখ, দুঃখ কিংবা উপেক্ষা যখন যেরূপ বেদনা অনুভূত হয় তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে হয়।

(গ) চিত্ত বিষয়ে চিত্তদর্শন—চিত্ত কখন কি অবস্থায় থাকে, উহাতে আসক্তি, মোহ কিংবা বিক্ষেপ উপস্থিত হয় কি-না তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে হয়।

(ঘ) ধর্ম্ম বিষয়ে ধর্ম্মদর্শন—পঞ্চনীবরণ, (কামেচ্ছা, দ্বেষ, আলস্য ও জড়তা, ঔদ্ধত্য, কুকৃত্য ও সংশয়), পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান), ষড়ায়তন (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন), সপ্তবোধাঙ্গ (স্মৃতি recollection, ধর্ম্মবিচয় investigation, বীর্য্য energy, প্রীতি joy, প্রশ্রব্ধি calmness, সমাধি contemplation, উপেক্ষা equanimity) ও চারি আর্য্য সত্য (দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখনিরোধগামী পথ) —এসব বিশেষ ভাবে জানার নাম ধর্ম্মদর্শন।

(৮) সম্যক্ সমাধি—ইহার চারিটি স্তর। এক একটি স্তর এক একটি ধ্যান নামে অভিহিত। বৌদ্ধ সাধকেরা সকল কামনা এবং পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্যানের পথে পদার্পণ করেন।

প্রথমাবস্থায় তাহার মধ্যে পাঁচটি জিনিষ থাকে—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা। ইহার নাম প্রথম ধ্যান।

বিচার ও বিতর্কের উপশম করিয়া দ্বিতীয় ধ্যানে প্রবেশ করা যায়। এই ধ্যান বিচারবিতর্কহীন, চিত্তের একাগ্রতা-প্রসূত এবং প্রীতি ও সুখ পূর্ণ।

তৃতীয়াবস্থায় সুখ, একাগ্রতা ও বিরাগ উৎপন্ন হয়, তখন সাধক সুখেদুঃখে সমভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করেন এবং স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া সুখানুভব করেন। ইহার নাম তৃতীয় ধ্যান।

চতুর্থাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক সুখদুঃখ অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ হয়। ইহার নাম চতুর্থ ধ্যান৫

৪

ভিক্ষুগণ, দুইটি অন্তকে বর্জ্জন করিয়া যাহা "মধ্যপথ" ইহাই তাহা। ভগবান্ তথাগত ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পথে প্রবেশ করিলে চক্ষু খুলিয়া যায়, জ্ঞান লাভ হয়। ইহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণলাভের হেতু।

এক্ষণে হে ভিক্ষুগণ, দুঃখের অস্তিত্ব বিষয়ে এইটি আর্য্য সত্য—জন্মে দুঃখ, জরাতে দুঃখ, ব্যাধিতে দুঃখ, মরণে দুঃখ। অপ্রিয় বস্তুর সংযোগে দুঃখ, প্রিয় বস্তুর বিয়োগে দুঃখ, যে বাসনা পূর্ণ হয় না তাহাও দুঃখপ্রদ। সংক্ষেপত পঞ্চ উপাদানস্কন্ধই দুঃখ।

হে ভিক্ষুগণ, 'দুঃখ সমুদয়' বিষয়ে আর্য্যসত্য হইতেছে তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের কারণ; কাম ও সুখাসক্তি ইহার সহচর; উহা একবার এখানে একবার ওখানে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়। এই তৃষ্ণা ত্রিবিধ—কামতৃষ্ণা (সুখ-সম্ভোগের তৃষ্ণা) ভবতৃষ্ণা (বাঁচিয়া থাকিবার তৃষ্ণা) ও বিভব তৃষ্ণা (সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির তৃষ্ণা)।

দুঃখের নিরোধ সম্বন্ধে এইটি আর্য্যসত্য—এই তৃষ্ণার নিঃশেষে বিলোপ হইলেই দুঃখের নিরোধ হয়। সর্ব্ববিধ কামনার বিলয়—তৃষ্ণার পরিহার—তৃষ্ণা হইতে মুক্তি—তৃষ্ণার বিনাশ—ইহাই হইল 'দুঃখনিরোধ'।

হে ভিক্ষুগণ, দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা সম্বন্ধে এইটি আর্য্যসত্য—ইহা অষ্টাঙ্গমার্গ (অরিয়ো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো), ইহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ, দুঃখ সম্বন্ধে এই যে চারিটি আর্য্য সত্য কথিত হইল, ইহার বিষয় পূর্ব্বে আর কেহ কখনো শুনে নাই। এই সত্যকে দর্শন করিবার চক্ষু আমার ভিতরে ফুটিয়াছে, ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জ্ঞান আমার ভিতরে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রজ্ঞা আমাতে আবির্ভূত হইয়াছে, ইহা হইতে মুক্তি পাওয়ার মার্গ নির্দ্দেশ করিবার বিদ্যা আমাতে উৎপন্ন হইয়াছে, অন্ধকার দূরীভূত করিবার আলোক আমাতে আসিয়াছে।

ভিক্ষুগণ, যতকাল এই চারিটি আর্য্যসত্যের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমার জ্ঞানদর্শন সুবিশুদ্ধ হইয়া না উঠিয়াছে ততকাল আমি স্বর্গ-মর্ত্ত, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মনুষ্য-দেবতার মধ্যে অতুলনীয় যে সংবোধি তাহা সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছি বলিয়া প্রচার করি নাই।

কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলাম এই চারিটি আর্য্য-সত্যের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান-দর্শন সুবিশুদ্ধ হইয়াছে তখনই প্রচার করিতে লাগিলাম, স্বর্গ-মর্ত্ত, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মনুষ্য-দেবতার মধ্যে অতুলনীয় যে সংবোধি আমি তাহাকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছি। আমার জ্ঞান ও দর্শন উদিত হইয়াছে। আমার চিত্তবিমুক্তি নিশ্চিত। ইহাই আমার শেষ জন্ম। আমার পুনরুৎপত্তি নাই।

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু ভগবানের এই ধর্ম্মদেশনা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মদেশনা শ্রবণের পর কোণ্ডাঞ্ঞের বিরজ বীতমল ধর্ম্মচক্ষু স্ফুরিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যাহার উৎপত্তি আছে তাহার নিরোধও আছে।

এইভাবে ভগবান্ কর্ত্তৃক ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইলে পৃথিবীর দেবতাগণ এই বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন :—

"বারাণসীতে ঋষিপত্তন মৃগদাবে ভগবান্ কর্ত্তৃক ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইল। শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, দেবতা, মার বা ব্রহ্মা অপর কাহারো দ্বারা এই ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না।"

তাঁহাদের এই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া চাতুর্ম্মহারাজিক দেবগণও অনুরূপ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকের দেবগণ এইরূপ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ঘোষণা বার্ত্তা উচ্চতম ব্রহ্মলোকে গিয়া পৌঁছিল। উক্ত সুগম্ভীর নিনাদে দশ সহস্র লোকধাতু (World system) ভীষণ ভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল, দেবগণেরও অসহনীয়, অপরিমেয় এক তীব্র জ্যোতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইল।

তৎপর ভগবান সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, কোণ্ডাঞ্ঞ ইহা জানিয়াছেন। এই কারণে আয়ুষ্মান্ কোণ্ডাঞ্ঞের নামকরণ হইল 'অঞ্ঞাত কোণ্ডাঞ্ঞ'।

মহাবগ্গে উক্ত আখ্যানভাগটি আরো একটু অগ্রসর হইয়া সমাপ্ত হইয়াছে।

আয়ুষ্মান্ কোণ্ডাঞ্ঞ সত্যকে দর্শন করিয়া, সত্যে পৌঁছিয়া, সত্যকে অবগত হইয়া, সত্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া, অনিশ্চয়তা পরিত্যাগ করিয়া, প্রত্যয় লাভ করিয়া, আচার্য্যোপদিষ্ট ধর্ম্মের জ্ঞানের জন্য নিজছাড়া অপর কাহারো উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

আমি কি ভগবানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারি, আমি কি উপসম্পদা পাইতে পারি ?

ভ্রাতঃ, সত্য ত উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পবিত্রতার সাধন কর, তবেই দুঃখ সর্ব্বতোভাবে নিরাকৃত হইবে।

বৌদ্ধ জাতক হইতে জানা যায়, ইহার পর বপ্র, ভদ্রীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ নামক আরো চারিজন ব্রাহ্মণকুমার দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ইহাও লিখিত আছে যে কোণ্ডাঞ্ঞেরও সহিত বহু দেবতাও দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

তাম্রপালীর নবজন্ম

শ্রীমতী সুজাতা রায়

কমল-দেহ ধরি, পঙ্কে ছিনু পড়ি
ও পদপঙ্কজে হইনি কভু লীন ;
ভৃঙ্গ দলে দলে, বসিত কত ছলে
মিটায়ে যেত চ'লে পিপাসা নিশিদিন।
রূপের পারাবার, পূর্ণ যৌবন
পূর্ণ শশী তাহে আনিল আলোড়ন।
কত না সাজে ভরি, ভাসানু দেহতরী,
আরোহী তুষিবারে কত না আয়োজন।
দখিণ মধু বায়ে, বিটপী ছায়ে ছায়ে,
ক্ষেপণী মৃদু ঘায়ে এ তরী নেচে যায়,
অদূরে তটে থাকি, তৃষিত কত আঁখি,
নিমেষহারা যেন, তরণী পানে চায়।
কখন উঠে মেঘ, স্রোতের বাড়ে বেগ,
বাজায় বুঝি শিঙা আপনি মহাকাল,
নদীর আঁখি রাঙা, কোথায় তীর ডাঙা,
তরীর হাল ভাঙা ছিঁড়িয়া গেল পাল।
এমনই ভাবে হায়, কি এক ছলনায়,
দিবস চলি যায় পাষাণে বাধি বুক,
সুখের নেশা মোর, ভাঙে না ঘুমঘোর,
পরায় মোহ ডোর হরিতে যত দুখ।
আলেয়া ছল করি, আমারে নিল হরি,
আলোক অবতরি বাঁচালে কে আমায়,
ক্ষুধিত মরু সম, দারুণ জ্বালা মম
জুড়াল আজি প্রাণ সঁপিয়া তব পায়।
বিগত লীলা স্মরি, শিহরি লাজে মরি,
দাসীরে কৃপাকরি দিলে যে নবপ্রাণ,
হে প্রভু দয়াময় তোমার গাহি জয়,
কভু না ভুলি যেন এ তব অবদান।

[কথিত আছে ভগবান্ বুদ্ধ তাম্রপালী নামে এক বারনারীর গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং তাহাকে মন্ত্রদান করিয়া নূতন জীবনে দীক্ষিত করেন। উপরের কবিতাটি এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত। বিঃ সঃ]

রাত্রির রোমান্স্

—গল্প—

—শ্রীযুক্ত মনোজ বসু

বধূ ডাকিল—ঘুমুচ্ছো ?

মনোময় পাশ ফিরিয়া শুইল এবং বলিল—উঁহু—

বধূ কহিল—বালিশ কোথায় ? অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্ছি না ত ! হ্যাঁগো, আমার বালিশ কোথায় লুকিয়ে রাখ্‌লে ? না—এই যে পেয়েছি—। বলিয়া আন্দাজী বালিশ খুঁজিয়া লইয়া তাহার উপর শুইয়া পড়িল।

মনোময় বলিয়া উঠিল—আঃ ঘাড়ের উপর শু'লে কেন ? সরে' গিয়ে জায়গায় শোও—।

বধূ বলিল—সর্ব্বনাশ ! গায়ের উপর শুয়েছি নাকি ? পিদ্দিমটা নিভে গেল, অন্ধকারে কিছু বুঝ্‌তে পারি নি। ভাগ্যিস্ কথা কইলে—

কিন্তু কথা যদি মোটে নাই কহিত তা' হইলেও মনোময়ের অস্থিসার দেহটাকে তুলার বালিশ বলিয়া ভুল করা কাহারও উচিত নয়।

এবারে শুইয়া পড়িয়া বধূ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কতক্ষণ! একা একাই কথা চলিতে লাগিল—উঃ কী গরম ! বৃষ্টি-বাদলার নাম গন্ধ নেই, গরমে সেদ্ধ করে' মার্‌ছে। তার উপর চু-চুটো উনুনে যেন রাবণের চিতে ! সেই বেলা থাক্‌তে রান্নাঘরে ঢুকেছি আর এখন বেরিয়ে আসা, ঘরে একটা জানালাও নেই। ওগো, ও কর্ত্তা—ও ছোটবাবু, তোমরা রান্নাঘরে একটা জানালা করে' দাও না কেন ? এইবার করে' দিও—বুঝলে ?

তবু ছোটবাবু সাড়া দিল না। বোধ করি, সে জানালা করিয়া দিবেই, তাই কথা কহিল না। বধূর মুখের কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কয়টা মশা ভন ভন করিয়া উঠিল। তবু যা' হোক কথার দোসর জুটিল, ঐ মানুষটিকে আর ডাকিয়া ডাকিয়া খুন হইবার দরকার নাই। মশার সাথেই আলাপন সুরু হইল।—দাঁড়া, কাল তোদের জব্দ কর্‌ছি। সন্ধ্যাবেলা নার্‌কেলের খোসার আগুন করে' আচ্ছা করে' ধুনো দেব, দেখি ঘরে থাকিস্ কি ক'রে ?—খানিক জোরে জোরে পাখা করিতে লাগিল। তারপর মনোময়ের গায়ে নাড়া দিয়া বলিল—ঘুমুচ্ছো কি করে' ? মশায় কামড়ায় না ? সরে' এসো একটু, মশারি ফেলি—

এখানে বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে ঘুম সম্বন্ধে মনোময়ের বিশেষ প্রকার নিপুণতা আছে। মশা ক্ষুদ্র-প্রাণী, কামড়াইয়া কি করিবে ? ঘুম যদি সত্য-সত্যই আসিয়া থাকে সুন্দরবনের বাঘে কামড়াইলেও ভাঙ্গিবে না।

বধূ মশারী ফেলিল। ফেলিয়া মনোময়ের পাশটা গুঁজিয়া দিবার জন্ত তাহার গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। খাটের একেবারে কিনার ঘেঁসিয়া শুইয়াছে মনোময়। বধূ তাহার হাতখানা সরাইয়া দিল, যেখানে সরাইয়া রাখিল, সেইখানেই এলাইয়া পড়িয়া রহিল। পুনরায় তুলিয়া লইয়া সেই হাতখানা নিজের হাতের উপর রাখিল। তারপর মনোময়ের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—ঘুমুলে নাকি ? ওগো শুন্‌ছ ? এরি মধ্যে ঘুম !

মনোময় নড়িয়া চড়িয়া পাশ বালিশটা টানিয়া লইয়া বলিল—ঘুম কোথায় দেখ্‌লে ? বলো কি বলবে।

বধূ বলিল—এসো খানিক গল্প করি, এত সকাল-সকাল ঘুমোয় না—

মনোময় কহিল—করো—

বধূ কহিল—কাল্‌কে আমি গল্প বলেছি, আজ তোমার পালা। সেই রকম কথা ছিল না ?

মনোময় বলিল—হুঁ—

—তবে ?

মনোময় বলিল—তা' হোক, আজও তুমি বলো উষা। কালকের শেষটা শোনা হয় নি—ঘুম এসেছিল।

বধূর নাম উষা। বলিল—আজও তেমনি ঘুমুবে ত?

মনোময় কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—কখনো নয়।

উষা কহিল—কিন্তু এখনি ত ঘুমুতে আরম্ভ করেছ, ঐ যে দেখ্‌ছি—

মনোময় বলিল—দেখ্‌তে পাচ্ছো? অন্ধকারে তোমার চোখ জ্বলে বুঝি—

উষা বলিল—জ্বলেই ত। সাত রাজার ধন মাণিকের গল্প শোন নি—অজগর সাপ সেই মাণিক মাথা থেকে নামিয়ে গোবরে লুকিয়ে রাখ্‌লো, গোবর ফুঁড়েও তার আলো বেরোয়। তেমনি একজোড়া মাণিক হচ্ছে আমার এই চোখ দুটো। চিন্‌লে না ত!

মনোময় বলিল—কিন্তু মাণিক ছাড়া মেনী বেড়ালের চোখও অন্ধকারে জ্বলে, বিজ্ঞানপাঠ পড়ে' দেখো—

—কিন্তু এবার ত আর চোখ দিয়ে দেখা নয় মশায়, হাত দিয়ে ছোঁওয়া—অন্ধকারের মধ্যে উষা মনোময়ের চোখের উপর হাত বুলাইয়া দেখিল উহা যথানিয়মে মুদ্রিত হইয়া আছে। ভারী রাগিয়া গেল। বেশ, ঘুমোও—খুব করে' ঘুমোও—আমি জ্বালাতন করবো না—বলিয়া উষা সরিয়া গিয়া উল্টা দিকে মুখ করিয়া শুইল।

মনোময়ও সরিয়া আসিল, আসিয়া তাহার একখানা হাত ধরিল। বলিল—ফিরে শোও, অত রাগ করে না—এদিকে একবার ফিরেই দেখো, ঘুমিয়েছি কিনা! ফিরবে না? আহা, যদি কথা না বলো মাথা নাড়্‌তে কি বাধা?

অপর পক্ষ নির্ব্বিকার। যেন ঘুম পাইয়াছে, তেমনি গভীর নিঃশ্বাস পড়িতেছে।

মনোময় বলিল—ঘুমুলে নাকি? ও উষা, ঘুমিয়ে পড়েছ? তারও পরীক্ষা আছে, সত্যি সত্যি যদি ঘুমিয়ে থাক 'হ্যাঁ' বলে জবাব দাও।

এবার উষা কথা কহিল।—খুব যা' তা' বুঝিয়ে যাচ্ছো!—

মনোময় হাসিতে হাসিতে বলিল,—কি?—

—এই যে বল্লে, ঘুম এসে থাক্‌লে আমি 'হ্যাঁ' ব'লে উত্তর দেবো। ঘুম এলে বুঝি জ্ঞান থাকে? ভাবো আমি বুঝিনে কিছু—আমি বোকা!—

মনোময়ের দুর্গ্রহ। বলিয়া বসিল-বোকা নওত কি! আমি বরাবর জেগেই আছি। তুমি চোখে হাত দিয়ে বল্‌লে, আমার চোখ বোজা—খোলা চোখে হাত দিলে বুজে যায় না কার? নিজের চোখে হাত দিয়ে দেখো না। আর, এই নিয়ে তুমি মিছামিছি রাগারাগি কর্‌লে—

উষাকে বোকা বলিলে ক্ষেপিয়া যায়। বলিল—আমি বোকা আছি, বেশ আছি—তোমার কি?—বলিয়া জানালার ধারে একেবারে খাটের শেষ প্রান্তে চলিয়া গেল এবং তাহার ও মনোময়ের মধ্যেকার ফাঁকটুকুতে দুম্‌ দুম্‌ করিয়া দুইটা পাশ বালিশ ফেলিয়া দিল।

মনোময় হতাশভাবে বলিল—তা' বেশ! মাঝে একেবারে ডবল পাঁচিল তুলে দিলে—। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—বেশ আমার দোষ নেই—এবার তবে নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাক্‌—।

যা' বলিল তাই। হাই তুলিয়া সত্য-সত্যই পাশ ফিরিয়া শুইল।

তা' হোক! উষাও পড়িয়া থাকিতে জানে। দুইজনেই চুপচাপ। যদি কেহ দেখিতে পাইত, ঠিক ভাবিত উহারা নিঃসাড়ে ঘুমাইতেছে।

খানিকপরে উষা উসখুস করিতে লাগিল। এমনও হইতে পারে মনোময় সুযোগ পাইয়া এই ফাঁকে সত্য-সত্যই খানিকটা ঘুমাইয়া লইতেছে। ইহার পরীক্ষা করিতে কিন্তু বেশী বেগ পাইতে হয় না, গায়ে একটু সুড় সুড়ি দিলেই বোঝা যায়। ঘুম যদি ছলনা হয় মনোময় ঠিক লাফাইয়া উঠিবে, চুপ করিয়া সে কখনও সুড়সুড়ি হজম করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি সে না ঘুমাইয়া জাগিয়াই থাকে, এবং উষা গায়ে হাত দিবামাত্রই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে! না—রাগ করিয়া শেষকালে অতখানি অপদস্থ হওয়া উচিত হইবে না।

ও ঘরে বড়জায়ের ছেলে জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে তিনি দালানে আসিয়া ডাকিলেন—ছোট বউ, অ ছোট বউ, ঘুমুলি নাকি?—

বার দুই ডাকাডাকির পর উষা উঠিয়া গিয়া ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি?—

—তোর ঘরে স্পিরিটের বোতলটা আছে, বের কোরে দে—খোকার দুধ গরম কর্‌ব—।

বোতল বাহির করিয়া দিয়া তোষকের তলা হইতে দেশলাই লইয়া উষা প্রদীপ জ্বালিল। মধ্যেকার পাশ বালিশের প্রাচীর তেমনি অটল হইয়া আছে। উষা যখন উঠিয়া গিয়াছিল, অন্ততঃ সেই অবকাশে বালিশ দুইটির অন্তর্দ্ধান হওয়া উচিত ছিল। কাণ্ডখানা কি? দীপ ধরিয়া মনোময়ের মুখের দিকে তাকাইতে বুঝিতেই পারিল, সে দিব্য অঘোরে ঘুমাইতেছে—ঘুম যে অকৃত্রিম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দাম্পত্য জীবনের উপর উষার ধিক্কার জন্মিয়া গেল। পুরুষমানুষের কেবল চিঠিতে চিঠিতেই ভালবাসা—ভালবাসা না—ছাই! গরমের ছুটিতে ক'দিনের জন্ম বাড়ী আসা হইয়াছে, একেবারে রাজ্যের ঘুম সঙ্গে করিয়া লইয়া। আজ যখন কাজকর্ম্ম মিটাইয়া নিজেরা খাইয়া বাসন-কোশন ও পিঁড়ি তুলিয়া এঘরে চলিয়া আসিতেছে—এমন সময় টুপ-টুপ করিয়া রান্নাঘরের পিছনে সিন্দুরে গাছের তলায় কয়টা আম পড়িল। সেজ জা প্রস্তাব করিলেন—চল্‌ না ছোট বউ, আম ক'টা কুড়িয়ে আনি—। উষা বলিল—এখন থাক্‌গে, সকালে কুড়োলেই হবে—। সেজ জা বলিলেন—সকালে কি আর থাক্‌বে? রাত থাক্‌তেই পাড়ার মেয়েগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। তখন বড় জা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—না—না—সেজ বউ, ও ঘরে যাক্‌—আর একজনের ওদিকে ঘুম হচ্ছে না, তা বোঝো? চলো, তুমি আর আমি কুড়োইগে। আজ তোরও খুব ঘুম ধরেছে, না রে উষা?—উষার লজ্জা করিতে লাগিল। জোর করিয়া বলিল—না আমিও কুড়োতে যাবো—এবং খুব উৎসাহের সহিত আম কুড়াইয়া বেড়াইয়াছিল। তখনই কিন্তু ছ্যাঁৎ করিয়া মনে উঠিয়াছিল—জাগিয়া আছে ত?

এবারে মনোময়ের ট্রাঙ্ক হইতে উষা কয়খানা উপন্যাস আবিষ্কার করিয়াছে। আজ রান্নাঘরে ভাত চড়াইয়া দিয়া তাহার একখানা লইয়া বসিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধন পালিত মহাশয়ের রচিত 'অদৃষ্টের পরিহাস'। বইখানা শেষ করিতে পারে নাই, কেন উৎলাইয়া উঠিল—অমনি সে পাতা মুড়িয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এখন এমন করিয়া একা শুইয়া কি করা যায়, ঘুম যে আসে না! কুলুঙ্গী হইতে বইখানা টানিয়া লইল। খাসা লিখিয়াছে, পড়িতে পড়িতে উষা অবিলম্বে মগ্ন হইয়া গেল।

উপন্যাসের নায়িকার নাম অধীরা। সম্প্রতি তাহার সঙ্গীন অবস্থা। নায়ক প্রণয়কুমারকে দস্যু ভৈরব সর্দ্দার ইতিপূর্ব্বে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। অধীরা অনেক কৌশলে তাহার সন্ধান পাইয়া স্বয়ং দস্যুগৃহে গিয়াছিল, এখন রাত্রিকালে ফিরিয়া আসিতেছে। বর্ণনাটা এই প্রকার:—

একে অমাবস্যার রাত্রি, তায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সূচীভেদ্য অন্ধকার, কেবল মধ্যে মধ্যে খদ্যোতকুল ঈষৎ জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে। সেই অন্ধকার-মগ্ন নিস্তব্ধ নিশীথে অরণ্য-সমাকীর্ণ পথপ্রান্তে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে কে? পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছেন, ইনি আমাদের সেই জমিদার দুহিতা ষোড়শী সুন্দরী অধীরা। কণ্টকে পদযুগল রক্তাক্ত হইতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময়ে পশ্চাতে পদধ্বনি শ্রুত হইল। নিশ্চয়ই ভৈরব সর্দ্দারের অনুচর অনুসরণ করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অধীরা আরও দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। পশ্চাতের পদধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। অধীরা অধিকতর বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুর্দ্দৈববশতঃ একটি বৃক্ষ-কাণ্ডে বাধিয়া পদস্খলন হইল। অনুসরণকারী তৎক্ষণাৎ বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার হস্তধারণ করিল। অধীরা নানাপ্রকার অঙ্গসঞ্চালন করিয়া দস্যুহস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন! এই সময়ে চকিতে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। দামিনীর তীব্র আলোকে দেখিতে পাইলেন অনুসরণকারী আর কেহ নহে—স্বয়ং প্রণয়কুমার। প্রণয়কুমার প্রশ্ন করিল—"পাপীয়সি, এই গভীর রাত্রে নিবিড় অরণ্য মধ্যে কোথায় চলিয়াছিস্? আমি তোকে ভালবাসিয়া পরম বিশ্বাসে বক্ষে ধারণ করিয়াছি, সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান?—" প্রণয়কুমার আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ মেঘগর্জ্জন দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া তাহার কণ্ঠস্বর বিলুপ্ত করিয়া দিল এবং প্রবলবেগে বাত্যা ও ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইল।

ঐ যে বাত্যা ও ধারাবর্ষণ সুরু হইল, ইহার পর পাতা তিনেক ধরিয়া আর তাহার বিরাম নাই। বর্ণনাগুলি বাদ দিয়া উষা পর পরিচ্ছেদে আসিল। সেখানেও বৃহৎ ব্যাপার। প্রণয়কুমার একাকী পঞ্চাশজন আততায়ীকে কিরূপ বিক্রম সহকারে ধরাশায়ী করিয়া দস্যুগৃহ হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল তাহার রোমাঞ্চকর বিবরণ। কিন্তু উষার তাহাতে মন বসিল না। ষোড়শী সুন্দরী অধীরা নায়ককে খুঁজিতে গিয়া যে উল্টা উৎপত্তি ঘটাইয়া বসিল, সে কোথায় গেল? প্রণয়কুমারের বিক্রমের বৃত্তান্ত পরে অবগত হইলেও চলিবে, উষা তাড়াতাড়ি একেবারে উপসংহারের পাতা খুলিল।

উপসংহারে আসিয়া অধীরার দেখা মিলিল, কিন্তু বেচারী তখন অন্তিম শয্যায়। এমন সময়ে অতি আকস্মিক উপায়ে প্রণয়কুমার তথায় উপস্থিত হইল। স্থান সম্ভবতঃ হিমালয় কিম্বা বিন্ধ্যাচলের একটি নিভৃত গুহা, কারণ ইতিপূর্ব্বে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গের বর্ণনা হইয়া গিয়াছে। উষা পড়িতে লাগিল—

অধীরা বলিল—"আসিয়াছ, হৃদয়বল্লভ? আমি জানিতাম, তুমি নিশ্চয় আসিবে। এই সংসারে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। শেষ মুহূর্ত্তে বলিয়া যাই, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। ভৈরব সর্দ্দারের গৃহে যে ছদ্মবেশী নবীন দস্যু তোমার শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দিয়াছিল, সে এই দাসী ভিন্ন আর কেহ নহে। হায়, আমাকে চিনিতে পার নাই।"

প্রণয়কুমার বক্ষে করাঘাত করিয়া কহিল—"আমি কি দুরাত্মা! তোমার ন্যায় নিষ্পাপ সরলাকে তুষানলে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিলাম। আমারই দুষ্কৃতিতে অদ্য একটি অম্লান অনাঘ্রাত কুসুম কাল-কবলিত হইতে চলিয়াছে। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে?"

অধীরা গদগদ কণ্ঠে কহিল—"তোমার কোন দোষ নাই, সমস্তই অদৃষ্টের পরিহাস। আমার জন্য তুমি কত যন্ত্রণা সহিয়াছ। যাহা হউক এই পৃথিবী হইতে অভাগিনীর অদ্য চিরবিদায়। আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে, যাই প্রাণেশ্বর—।" এই বলিয়া অধীরা ঝঞ্ঝাতাড়িত লতিকার ন্যায় প্রণয়কুমারের পদতলে পতিত হইল।

বই শেষ হইয়া গেল, তবু উষার ঘুম আর আসে না। ঐ বইয়ের কথাই ভাবিতে লাগিল। এ সংসারে পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর ভুল নাই। অতবড় দাম্ভিক দুর্দ্ধর্ষ প্রণয়কুমার—তাহাকেও শেষকালে অধীরার শোকে রীতিমত বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া ভাসাইতে হইয়াছে। হাঁ—বই লিখিতে হয় ত লোকে যেন গোবর্দ্ধন পালিত মহাশয়ের মতো করিয়া লেখে। বিছানার ও পাশে তাকাইয়া মনোময়ের জন্য অনুকম্পায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। আজ ভাল করিয়া কথা কহিলে না, মাঝের বালিশ দুইটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একটুখানি টানাটানিও করিলে না, করিলে তোমার অপমান হইত—বেশ ঘুমাও, এমনিভাবে অবহেলা করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাও—কিন্তু একদিন বুক চাপড়াইতে হইবে। উষার রাগ আরও ভয়ানক হইল, রাগের বশে কান্না পাইল। এমন করিয়া এক বিছানায় শুইয়া থাকা যায় না। উষা ভাবিতে লাগিল—এখনই একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া দূরে—বহুদূরে একেবারে চিরদিনের মতো চলিয়া গেলে হয়, কাল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া তখন প্রণয়কুমারের মতো হাহাকার করিতে হইবে। আলো লইয়া টেবিলের ধারে গিয়া সে সত্যিসত্যিই চিঠি লিখিতে বসিল। কিন্তু ছত্র পাঁচেক লিখিয়া আর উৎসাহ পাইল না। কারণ, দূরে—বহুদূরে—চিরদিনের মতো যে স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা জানা নাই। বাহিরে উঠানের পরপারে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় লিচুগাছটি ডাল পালা মেলিয়া ঝাঁকড়া-চুল ডাইনী বুড়ীর মতো দাঁড়াইয়া আছে। আর যাহাই হোক এই রাত্রিতে দরজার খিল খুলিয়া উহার তলা দিয়া কোথাও যাওয়া যাইবে না ইহা নিশ্চিত,—অতএব চিরদিনের মতো দূরে—বহুদূরে যাইবার আপাততঃ তাড়াতাড়ি নাই। উষা পুনরায় বিছানায় শুইতে আসিল। আসিয়া দেখে ইতিমধ্যে মনোময় কখন জাগিয়া উঠিয়া মিটমিট করিয়া তাকাইয়া আছে। আলো নিভাইয়া গম্ভীরমুখে শুইয়া পড়িল।

হঠাৎ মনোময় ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল—উষা, উষা—দেখ্ছো—লিচুগাছের ডালে কে যেন ধব্ধবে কাপড় পরে' দাঁড়িয়ে আছে, জানলা দিয়ে ঐ মগডালের দিকে তাকিয়ে দেখ না—।

উষা বুঝিল, ইহা মিথ্যা কথা। সে বড় ভীতু বলিয়া মনোময় মিছামিছি ভয় দেখাইতেছে। তবু তাকাইয়া দেখিবার সাহস হইল না, সে চোখ বুজিল। কিন্তু চোখ বুজিয়া আরও মনে হইতে লাগিল, যেন সাদা কাপড় পরিয়া তাহার মেজ জা একেবারে চোখের সামনে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতেছেন। এই বাড়ীতেই মেজ জা মারা গিয়াছেন, চৈত্রে চৈত্রে এক বৎসর হইয়া গিয়াছে, লিচুতলা

দিয়া তাঁহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল। ঊষা এমন করিয়া আর চোখ বুজিয়া থাকা বড় সুবিধাজনক বোধ করিল না। একবার ভাবিল—তাকাইয়া সন্দেহটা মিটাইয়া লওয়া যাক, মিছা কথা ত নিশ্চয়ই—ভূত না হাতী।—সাহস করিয়া সে চোখ খুলিল, কিন্তু তাকাইয়া দেখা বড় সহজ কথা নয়। ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ কট্-কট্ করিয়া বাঁশবনের আওয়াজ আসিতেছে, তাকাইতে গিয়া কি দেখিয়া বসিবে তাহার ঠিক কি? মনোময়ের উপর আরও রাগ হইতে লাগিল। এতক্ষণ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া জ্বালাইল, এখন জাগিয়া উঠিয়াও এমনি করে!

উঠিয়া তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করিতে গেল, অমনি মনোময় খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বসিল।—ও কি? কি হচ্ছে? এই গরমে জানলা বন্ধ করলে টিঁকবো কি করে?—

ঊষা বলিল—আমার শীত করছে—।

মনোময় বলিল—বোশেখ মাসে শীত কি গো?

ঊষা বলিল—শীত করে না বুঝি! কখন থেকে একলা একলা খোলা হাওয়ায় পড়ে আছি—। ঊষার গলার স্বর ভারী-ভারী।

মনোময় বলিল—আচ্ছা, আমি জানলার দিকে শুই—তুমি এই দিকে কেমন?

ঊষা কহিল—থাক্ থাক্—আর দরদে কাজ নেই—। দু'ফোঁটা চোখের জল গড়াইয়া আসিয়া মনোময়ের গায়ে পড়িল।

মনোময় শুনিল না—বালিশ দু'টাকে এক পাশে ফেলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া ঊষাকে ডানদিকে শোওয়াইয়া দিল। ঊষা আর নড়িল না, শুইয়া রহিল। একেবারে চুপচাপ।

খানিকক্ষণ পরে মনোময় ডাকিল—ওগো!—

ঊষা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনোময় জিজ্ঞাসা করিল—হাস্‌ছ কেন?

ঊষা বলিল—ঘুমুচ্ছিলে যে বড়!

মনোময় কহিল—তুমি যে রাগ করেছিলে বড়! এমন ভয় দেখিয়ে দিলাম—

ঊষা বলিল—না, তুমি বড় খারাপ! অমন ভয় আর দেখিও না। আমি সত্যি সত্যি যেন দেখ্‌লাম, কাপড় পরা মেজদিদির মতো কে একজন। এখনো বুক কাঁপছে, তুমি সরে' এসো—বড্ড ভয় করে—

ভাব হইয়া গেল।

টং—

বড়জায়ের ঘরে ক্লক আছে, নিশুতি রাত্রে তাহার শব্দ আসিল।

মনোময় বলিল—ঐ একটা বাজলো—আর বকে না, এবার ঘুমানো যাক্—।

ঊষা বলিল—একবার আওয়াজ হোলেই বুঝি একটা বাজবে। উঃ কী বুদ্ধি তোমার! বাজলো এই মোটে সাড়ে ন'টা—।

মনোময় বলিল—সাড়ে ন'টা বেজে গেছে সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে—।

ঊষা বলিল—না-হয় সাড়ে দশটা, তার বেশী কক্ষণো নয়—।

মনোময় বলিল—তারও বেশী। আচ্ছা, দেশলাই জ্বালো, আমার হাত-ঘড়িটা দেখা যাক—।

ঊষা তবু তর্ক ছাড়িল না।—তা' বলে' এর মধ্যে একটা বাজতেই পারে না—।

মনোময় বলিল—আলোটা জ্বালো আগে—।

ঊষা কহিল—জ্বালি। তুমি বাজী রাখো, হেরে গেলে আমায় কি দেবে?

মনোময় বলিল—যা' দেবো তা' এখনো দিতে পারি—মুখটা এদিকে সরাও—

ঊষা বলিল—যাও!—

দেশলাই ধরাইয়া কুলুঙ্গীর মধ্য হইতে হাত-ঘড়ি বাহির করিয়া দেখা গেল, কাহারও কথা সত্য নয়—একটা বাজে নাই, আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বনাশ! ঊষা শঙ্কিত হইয়া পড়িল! আবার খুব সকালে সকলের আগে উঠিতে হইবে। না হইলে রাধারাণী নামক এক ক্ষুদে ননদী আছে, সে উহাকে ক্ষেপাইয়া মারিবে।

বিছানাময় স্বচ্ছ জ্যোৎস্না। চাঁদ অনেক নামিয়া পড়িয়াছে। উষা হঠাৎ জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। আগে বুঝিতে পারে নাই, শেষে দেখিল তখনও ভোর হয় নাই। ভাল হইয়াছে। সেজ জা ও রাধারাণীকে ডাকিয়া তুলিয়া রাত থাকিতে থাকিতেই ননদভাজে মিলিয়া বাসনমাজা গোবর ঝাঁট দেওয়া ও আর আর সকল কাজ সারিয়া রাখিবে, শাশুড়ী সকালে উঠিয়া দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া যাইবেন।

খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া আগের রাত্রির কথাগুলো ভাবিতে ভাবিতে উষার হাসি পাইল। বাপ্‌রে বাপ্‌, মানুষটি এত ঘুমাইতে পারে, এখনো বেঁহুস! আগে ভালো করিয়া দেখিয়া লইল মনোময় সত্যিসত্যিই ঘুমাইয়া আছে কিনা, তারপর চুপি চুপি তাহার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিল। এ' কয়দিন রোজ সকালেই সে প্রণাম করে, কারণ গুরুজন ত! রাত্রে ঘুমের ঘোরে কতবার হয় ত গায়ে পা লাগে। তবে মনোময়কে চুরি করিয়া এই কাজটা করিতে হয়, সে জানিতে পারিলে ঠাট্টায় ঠাট্টায় অস্থির করিয়া তুলিবে।

মনোময়ও একটু পরে জাগিল। তাকাইয়া দেখে, পাশে উষা নাই। আকাশে তখন চাঁদ আছে। কি কাজে হয়ত বাহিরে গিয়াছে, ঘুমের ঘোরে এমনি একটা যা' তা' ভাবিয়া সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে জাগিয়া উঠিয়াও পাশে উষাকে দেখিতে পাইল না। তাহাতে অবশ্য আশ্চর্য্য নাই, রোজ সকালেই উষা অনেক আগে উঠিয়া যায়। সেল্‌ফ্‌ হইতে দাঁতন লইতে গিয়া মনোময় দেখিল, টেবিলে প্যাডের উপর উষার হাতের লেখা চিঠি রহিয়াছে। রাত্রে বসিয়া কি লিখিতেছিল বটে! উষা লিখিয়াছে—

তোমার কোন দোষ নাই। তুমি আমার জন্ত কতই যন্ত্রণা সহিয়াছ। রাত্রিতে তোমাকে শান্তিতে ঘুমাইতে দিই না, তুমি কতই বিরক্ত হইয়াছ। এই পৃথিবী হইতে অভাগিনীর জন্ত চিরবিদায়। জন্মান্তরে আবার দেখা হইবে, যাই—

ইহার পর 'প্রাণেশ্বর' কথাটা লিখিয়া ভাল করিয়া কাটিয়া দিয়াছে। উষার পেটে পেটে যে এত তাহা মনোময় আগে জানিত না, এরূপ লিখিবার মানে কি? যাহা হউক সে বাহিরে গেল। অন্তদিন উষা এই সময়ে রান্নাঘরের দাওয়া নিকায়। আজ সেখানে নাই। এবার একটু শঙ্কা হইল। মেয়েরা ত হামেশাই আত্মহত্যা করিয়া বসে, যখন তখন শুনিতে পাওয়া যায়। খিড়কীর পুকুর বেশী দূরে নয়, জলও গভীর। কিন্তু কি কারণে উষা যে এত বড় সাংঘাতিক কাজ করিবে তাহা বুঝিতে পারিল না। রাত্রে ঘুমের ঘোরে হয়ত সে কি বলিয়াছে! আনাচ কানাচ সকল সন্দেহজনক স্থান দেখিয়া আসিল, উষা কোথাও নাই। এমন মুস্কিল যে একথা হঠাৎ মুখ ফুটিয়া কাহাকেও জানাইতে লজ্জা করে। পোড়ারমুখী রাধারাণীটাও সকাল হইতে কোথায় বাহির হইয়াছে যে তাহাকে দুটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে! অবশেষে মনোময় বড় বৌদিদির ঘরে ঢুকিল, সে ঘর ইতিপূর্ব্বেই একবার খুঁজিয়া দেখা হইয়াছে। বড়বধূ বিছানা তুলিতেছিলেন, বোধ করি মনোময়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—হাসিয়া বলিলেন,—হারানিধি মিল্‌লো না? না ভাই, আমি চোর নই। ঘর ত একবার দেখে গিয়েছ, বিছানাপত্তর ঝেড়ে ঝুড়ে দেখাচ্ছি—এর মধ্যে সেরে রাখিনি।—

মনোময় বলিল—ঠাট্টার কথা নয় বৌদিদি, ছোট বউ কোথায় গেল বল দিকি? এই দেখ চিঠি—। বলিয়া চিঠিখানা দেখাইল।

চিঠি পড়িয়া বড় বধূ গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন—কী হয়েছিল বলো ত—এ ত ভয়ের কথা!

মনোময় প্রতিধ্বনি করিল—সাংঘাতিক ভয়ের কথা!

—তোমার দাদাকে বলি তবে?

বিমর্ষ মুখে মনোময় কহিল—না বলে' উপায় কি?

বড় বধূ বলিলেন—ভাল করে' খুঁজে টুজে দেখছ ত?

—কোথাও বাকী রাখিনি, বৌদিদি!

—গোয়ালঘর সিঁদুরে-আমতলা?

—হুঁ

—চিলে কোঠা?

—হুঁ।

তোমার নিজের ঘরে? সিন্দুকের তলায় কি বাক্সের পাশে? ছুষ্টুমী করে' লুকিয়ে টুকিয়ে থাক্‌তে পারে!

মনোময় বলিল—তাও দেখেছি, তন্ন তন্ন করে' দেখেছি।

বড়বধূ হতাশভাবে বলিলেন, তবে কি হবে? আচ্ছা, সিন্দুকের ভিতরে, বাক্সের ভিতরে? বলিতে বলিতে হাসিয়া ফেলিলেন।

মনোময় মাথা নাড়াইয়া বলিল—হাস্‌ছে বৌদি, ব্যাপার কিন্তু সহজ নয়—।

বড়বধূ বলিলেন—নয়ই ত! আচ্ছা এসো ত আমার সঙ্গে—আমি একটু দেখি—। বলিয়া মনোময়কে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ' ঘরটা দেখেছো?

এত সকালে রান্নাবান্না নাই-এ ঘরে আসবে কি করতে?

কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, থালার উপর লঙ্কা ও লবন সহযোগে কাঁচা আম জারানো হইয়াছে। মুখোমুখী বসিয়া উষা ও রাধারাণী নিঃশব্দে মনোযোগের সহিত আহার করিতেছে। মনোময়কে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া উষা হাত গুটাইয়া লইল। রাধারাণী হাসিয়া উঠিল।

শ্রীমনোজ বসু

কখন ডাকি?

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা

প্রাতঃকালে পেটের তালে—
সময়টা যে যাচ্ছে কেটে;—
দু'টো খেয়ে অম্‌নি ধেয়ে
আফিস্ পানে চল্‌ছি ছুটে!
খেটে খুটে সারাটা দিন
বিকাল বেলা ঘরে ফিরি—
তামাক টেনে আপন মনে
খানিক তখন আয়েস করি!
একটুখানি না বেড়ালে
মাথাটা যে ঠিক থাকে না,
কখন তাঁরে ডাকি বল!
সময়টা কই—তাই বল না?
সন্ধ্যা বেলা ফিরে দেখি
ইয়ার বন্ধু বসে মেলা—
ভদ্রতাটার খাতিরে তাই
দু'চার ঘণ্টা করি খেলা।
"কচ্চা বার" "ছক্কা" সেরে—
ভোজন পরে করি শয়ন
তোমরা যে সব ডাক্‌তে বল!
আচ্ছা! তাঁরে ডাকি কখন?
ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখে
তাঁ'রে যে ভাই উঠব ডেকে—
ভাবনা তারো নাইক কোনো
স্বপন দেখি "টাকা"টাকে!
সকল দিকটা বজায় রেখে
ডাকব যে—তা—সময় কোথা?
কি বলহে?—"আজ্ঞে তাই ত!
'তা' বটেই ত—বটেই ত তা!"

বর্ত্তমান রসায়নের ভাবধারা

শ্রীযুক্ত মতিলাল সেন-গুপ্ত বি-এস্-সি

বিগত এক শতাব্দীর রসায়নের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে দিন দিনই ইহার ভাবধারার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ভাবধারা মানুষকে মানবের অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে ক্রমশই যথেষ্ট আস্থাবান করিয়া তুলিতেছে। সোলোমন বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—'It is the glory of God to conceal a thing. but the glory of a king is to search it out। বিশ্বজগতের বৈজ্ঞানিকগণ এই উক্তির সত্যতা অবিসম্বাদীরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অধুনা যে পথ বাহিয়া চলিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়।

রসায়নের ইতিহাস পূর্ব্বাপর অলোচনা করিলে ইহার জন্মবৃত্তান্ত একটু রহস্তময় বলিয়াই মনে হয়। কবে, কোন্ দেশে, কোন্ মনীষীর হৃদয়াগারে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। আজ ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে, প্রাচীন রসায়ন ভারতে বনচারী মুনি ও কাপালিক সম্প্রদায়ের এবং প্রতীচ্যজগতে ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মযাজকদের একটা গোপন বিদ্যা ছিল। অতি পুরাকালে রসায়ন একটা ভোজবিদ্যা বা যাদুবিদ্যার সামিলই ছিল। হীনধাতু হইতে মূল্যবান ধাতুর রূপান্তর প্রক্রিয়া লইয়া (transmutation of metals) প্রাচীন গ্রীসে যে কত ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অথচ আজ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে মানুষের জ্ঞাত এমন কোন প্রক্রিয়া নাই, যদ্বারা হীনধাতুকে মূল্যবান ধাতুতে পরিণত করা যায়। কিন্তু প্রাচীন পুরুষদের এই অস্বাভাবিক মোহ কতই না রক্তপাতের সৃষ্টি করিয়াছে! রসায়নশাস্ত্র আজ যেমন একটা সর্ব্বতোভাবে সকলের অধিগম্য বিদ্যা হইয়াছে পুরাকালে তাহা ছিল না। আমাদের দেশে কত সাধুসন্ন্যাসী কেপ্পারদকে স্বর্ণে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া লোকচক্ষে ধূলা দিয়াছেন, তাহার হিসাব কে রাখিয়াছে। এই ভোজবিদ্যা বা যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে লেমারী বলিয়াছেন:—They professed an art the beginning of which was deceit, the progress of which was falsehood and the end beggary। কি করিয়া রসায়ন ভোজবাজীর হাত এড়াইয়া একটা সত্যের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিতে গেলে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়। বর্ত্তমানে আমরা যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সংবাদ অবগত আছি তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহই হয় না এবং সন্দেহ করাও যথেষ্ট অন্যায়, কারণ. তাহা হইলে মানুষের সত্যানুসন্ধিৎসাকে অতি বিশ্রীভাবে অবজ্ঞা করা হয়।

জড়জগতের জড়পদার্থের বিশ্লেষণ বা কয়েকটী জড়-পদার্থের সংযোজনে যে নূতন পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহার রূপ নির্দ্ধারণই রসায়নের প্রধান লক্ষ্য এবং গত দুই শতাব্দী যাবত রাসায়নিক যে কত নূতন পুরাতন পদার্থের সৃষ্টি করিয়া মানুষের কাজে লাগাইয়াছে, তাহা সকলেরই কিছু না কিছু জানা আছে। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসর যাবত রসায়নের ভাবধারা যথেষ্ট বদ্‌লাইয়াছে এবং এই ভাব পরিবর্ত্তনের পরিণতি যে কোথায় তাহাও বলা যায় না। রসায়নের ভাব-ধারা বর্ত্তমানে তিনটী পথ বহিয়া চলিয়াছে—(১) রেডিয়ম ধাতুর ক্রিয়া এবং মৌলিক পদার্থের সংগঠন (Radioactivity and the constitutien of elements) (২) সংযোজন রসায়ন (Synthetical chemistry) (৩) জৈব সংযোজন (Vital synthesis)। নিম্নে এই তিনটীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাসায়নিক Dalton তাঁহার পারমাণবিকবাদ (Atomic theory) প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন,—তিনি বলিয়াছেন, বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর আকর্ষণের ফলেই নূতন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং এই পরমাণুই জড়পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ; ইহার আর সংবিভাগ চলে না।

এই পারমাণবিক-বাদের উপর নির্ভর করিয়া রসায়ন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে লর্ড কেলভিন্ উইলিয়াম ক্রুক্স্, টমসন্, লেনার্ড রঞ্জন, রাদারফোর্ড ও বোর প্রভৃতি মনীষিগণ যখন বায়বীয় পদার্থকে বিদ্যুৎ শক্তিদ্বারা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন যে একটী পরমাণু দুইভাগে বিভাজ্য; এর মধ্যে একটী কেন্দ্রিন্ (Proton) ও আর একটী বিদ্যুতিন্ (Electron), তখন বাস্তবিকই ব্যাপারটা বিরাট রহস্যময় বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং অধুনা ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে যে জড়পদার্থ-সংবিভাগের শেষফল—দুইটী বিপরীত বিদ্যুতের কণা এবং বিদ্যুৎ লইয়াই সমস্ত বিশ্বজগৎ। বহির্বিশ্বে যেমন গ্রহ-উপগ্রহে একটা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে জড় পদার্থের অন্তস্তলেও বিদ্যুৎকণাগুলি সেই তুমুল কাণ্ডই বাধাইয়া তুলিয়াছে। যখন একটী কণা একটী কক্ষ হইতে লাফাইয়া আর একটী কক্ষে চলিয়া যায়, তখন একটী মৌলিক পদার্থ আর একটী মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। ইহার কিছু দিন বাদে যখন স্বতঃরশ্মিবিকীরণকারী রেডিয়ম ধাতুর আবিষ্কার হইল তখন এই মতবাদ এতই সুদৃঢ় হইল যে বিশ্ব-সংসারকে আজ বিদ্যুৎ বলিয়া মানিয়া লইতে অতি অল্প লোকেই সঙ্কুচিত হয়। আজকাল রাসায়নিক জানে পারা ও সোনা একই জাতভাই; কেবল প্রভেদ কয়েকটী বিদ্যুৎ কণায়; যদি একটী হইতে কয়েকটী বিদ্যুৎকণা অপসারিত করা যায় তবে প্রাচীন ভোজবিদ্যা যে একটী মহাসত্যে পরিণত হইবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে আজও মানুষ এই বিদ্যুতিন্ অপসারণ বিদ্যায় পারগ হইয়া উঠে নাই।

রেডিয়াম ও ইউরেনিয়াম ধাতু হইতে স্বভাবতঃ রশ্মিকণা বিনির্গত হওয়ার ফলে যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহাতে আমরা রেডিয়াম ক, খ বা ইউরেনিয়াম ক, খ ইত্যাদি করিয়া রেডিয়াম বা ইউরেনিয়ামের এক একটী বিশিষ্ট মৌলিক ধাতুর পরিবারের সহিত পরিচিত হইয়াছি। আজ পর্য্যন্ত মানুষ সংখ্যায় তিরানব্বইটী মৌলিক পদার্থের খবরই জানে এবং পূর্ব্বকথিত রেডিয়াম ক, খ ইত্যাদি ধাতু এই তিরানব্বইটীরই কোন না কোন রূপান্তর। বিশ্বজগতের মানুষ যেমন স্বয়ম্ভু মনু হইতে সম্ভূত হইয়াছে, বিশ্বের মৌলিক পদার্থগুলিও ঠিক সেই প্রকার স্বতঃ প্রকাশিত ইউরেনি-য়ামের পুত্র, পৌত্রাদি ক্রমে অধস্তন বংশধর। আজ তাই রাসায়নিক জোর গলায় বলিতেছে দুনিয়ার সমস্ত পদার্থেরই একই আদি পদার্থ হইতে উদ্ভব হইয়াছে। ইউরেনিয়াম ধাতুর স্বতঃক্ষয়ের (Spontenaous decomposition) পরিমাপ হইতে রাসায়নিক নিতান্ত একটী mathematical equation দিয়া বুঝাইয়া দিতেছে মাতা বসুন্ধরার এখন কৌমার, না যৌবন, না জরা। বসুন্ধরার জাতপত্র এখন মানুষ নিতান্ত সহজেই বিচার করিতে পারিতেছে। 'জবা-কুসুমসঙ্কাশ' যে সূর্য্য, আদিকাল হইতে যিনি আমাদের দেবতার আসন পাইয়া আসিতেছেন, আজ তিনিই রাসায়নিক বিচারে কতগুলি উত্তপ্ত বাষ্প ও জ্বালাময় ধাতুর ঘূর্ণ্যমান সমষ্টি। রাসায়নিক নিতান্ত নির্ম্মমভাবে সূর্য্যের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া, তাহার দৈনন্দিন ক্ষয়ের অঙ্ক কষিয়া সুদূর ভবিষ্যতে প্রলয়ের ভবিষ্যৎ বাণী করিতেছেন,—বলিতেছেন, একদিন আসিবে, যখন সূর্য্যের উত্তাপ লয় পাইবে, সমস্ত সৌরজগৎ ধ্বংস হইবে, মহাকাল প্রলয়ের ডঙ্কা বাজাইবেন।

একদল রাসায়নিক যখন বিশ্বের অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক তখনই আর একদল ব্যস্ত ছিলেন—কি করিয়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিয়া মানুষের অত্যাবশ্যকীয় পদার্থগুলি শুধু সংযোজন ক্রিয়ার ফলে (Synthetically) প্রেক্ষাগারেই সৃষ্টি করা যায়। আজ তাই রাসায়নিকের সার্থকশ্রমের ইতিহাস আমাদের কাছে ধরা দিয়াছে—Synthetic drugs, antiseptics, alkaloids, dyes এবং rubber ইত্যাদি রূপে। এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক অনুসরণ করিয়াছে প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে—স্বয়ং প্রকৃতিকে। সংযোজন রসায়নের সহিত ভোলার, লিবিগ, গ্রাইবে, লিবারম্যান, কেকো প্রভৃতি রাসায়নিকের নাম প্রণিধানযোগ্য।

সংযোজন রসায়নের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে আর একটী ব্যাপার, তাহা হইল Vital Synthesis অর্থাৎ জীবদেহে যে সব সংযোজন ক্রিয়া ঘটে তাহার ব্যাখ্যা ও প্রেক্ষাগৃহে সেই প্রক্রিয়া ফলবতী করিবার চেষ্টা। এই Vital synthesisএর ইতিহাসের প্রথম পাতা লেখা হয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে যখন ভোলার জীবমূত্রে বিদ্যমান ইউরিয়া নামক পদার্থকে নিতান্ত অজৈব (Inorganic) পদার্থ হইতে তৈয়ার করিয়াছিলেন। তারপর এক শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে,—আজ পর্য্যন্ত যে সব ঘটনা ওই ইতিহাসে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। চিনি যে ছাব্বিশ সাতাশ রকম থাকিতে পারে, ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারিত, যদি না Emil Fischer তা' হাতে হাতে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেন? আজ রাসায়নিক বহির্জগৎ ছাড়িয়া জীবদেহে ও উদ্ভিদ্‌দেহে কি কি রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিতেছে, তাহা জানিবার জন্য আকুল। উদ্ভিদের সবুজ সারগুলি অর্থাৎ chlorophylls কি করিয়া আকাশস্থ অঙ্গারক গ্যাসকে আত্মসাৎ করিয়া কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া তাহাকে শ্বেতসারে পরিণত করে তাহা জানিবার জন্য কৈমিতিক কত ব্যাখা দিতেছেন। ultra-violet রশ্মির সাহায্যে প্রেক্ষাগারে সেই সকল প্রক্রিয়াগুলি প্রত্যক্ষ করাইয়া বিশ্বমানবের কাছে উদ্ভিদ্-দেহের নিগূঢ় ক্রিয়াকে প্রকট করিয়া তুলিতেছেন। জীবদেহে কি করিয়া বসা প্রভৃতি পুঞ্জীভূত হইয়া দেহের উত্তাপ রক্ষা করিতেছে, শর্করা জাতীয় পদার্থ কি করিয়া সেই চর্ব্বির যোগান দিতেছে, তাহা বিশ্বাস করা আজ নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িয়াছে। মাটীর নীচে কিম্বা বায়ুতে যে সব বীজাণু বিচরণ করিয়া উদ্ভিদ্-দেহের ক্ষয় বা বৃদ্ধি করিতেছে,—যাহাদের ক্রিয়ার জন্য গাছ ফলফুলে শোভিত হয়,—সেই সব বীজাণুকে বোতলে পুরিয়া রাখিয়া রাসায়নিক আজ তাহাদের ক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত। আজকাল রাসায়নিক চেষ্টা করিতেছেন কি করিয়া সেই সব বীজাণুর সাহায্যে, বীজাণুর ক্রিয়া দ্বারা ইচ্ছামত গাছে ফুল ফুটানো যাইবে; কি করিয়া ফুলকে ফলে পরিণত করা যাইবে। কবি বলিয়াছেন;—

"ওগো তোরা পার্‌বিনে কেউ, পারবিনে ফুল ফোটাতে।"

কিন্তু রাসায়নিকের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হইতেছে হয় ত মানুষ এককালে ফুল ফুটাইতে পারিবে,—তবে তাহাতে ফুলের সেই সৌরভ থাকিবে কি না কে বলিবে!

শ্রীমতিলাল সেন গুপ্ত

যুগধর্ম্ম

শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ বেদান্তাচার্য্য এম্-এ

ভারতবর্ষের সনাতন আর্য্যজাতি যেমন অতি প্রাচীন, তাহাদের ধর্ম্মও সেরূপ অতি প্রাচীন। যিশুখৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি নূতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ যেরূপ সময় বিশেষে আবির্ভূত হইয়া জগতে নূতন মতের আলোক বিকীর্ণ করিয়াছেন এবং তাহা মানব সমাজে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম সেরূপ ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা ভারতবর্ষীয়গণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। কোন্ প্রাচীন যুগে কোন্ মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রথম এই সনাতন আর্য্যধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা মানবের নিকট অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। এজন্য প্রাচীনতম এবং পরম পবিত্র বেদ স্বয়ং পরমেশ্বর দ্বারা প্রণীত ইহাই সনাতন আর্য্যজাতির সিদ্ধান্ত।

"ধর্ম্ম" এই শব্দটী দ্বারা আমরা কি বুঝি? সংস্কৃত ভাষাতে সাধারণতঃ দ্বিবিধ অর্থে অনেক শব্দেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। শব্দের মুখ্য অর্থ এবং গৌণ অর্থ। শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগার্থ দ্বারা যে অর্থের প্রতীতি হয় তাহাই ঐ শব্দের মুখ্য অর্থ। বিশ্বের সজীব বা নির্জীব সকল বস্তুরই কোন একটী বিশেষগুণ আছে; ঐ গুণই (property) এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। এ প্রকার বিশিষ্ট গুণের নামই ধর্ম্ম। কারণ, ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা; তাহার পরে কর্ত্তৃবাচ্যে "ম" প্রত্যয় করিয়া "ধর্ম্ম" এই পদটী গঠিত হইয়াছে। যেমন, দাহিকাশক্তি অগ্নির ধর্ম্ম; শৈত্য-গুণ জলের ধর্ম্ম ইত্যাদি। কারণ, অগ্নির দাহিকাশক্তিই ইহাকে অন্য পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় এবং জলের শৈত্যগুণই জলকে অন্য বস্তু হইতে ভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করে। আর্য্যধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি বাক্যে "ধর্ম্ম" মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; এরূপ স্থলে গৌণ অর্থে ধর্ম্ম শব্দের ব্যবহার করা হয়। নিম্নে তাহার কারণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

অন্যান্য পদার্থের ন্যায় মানবেরও এরূপ একটী সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম আছে, যে ধর্ম্মটী তাহাকে নানা প্রকার সজীব বা নির্জীব পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া রাখিতেছে। মানবের এই বিশেষ গুণের নাম মনুষ্যত্ব বা বিবেক। "বিবেক" এই শব্দের অর্থ "বিচার পূর্ব্বক পরিণাম চিন্তা"। পরিণাম চিন্তা ঐহিক এবং পারমার্থিক এ উভয় বিষয়েই হইতে পারে। পৃথিবীতে মানব ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণীরই পরিণাম চিন্তা নাই। যদিও পশু প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যেও কিছুপরিমাণে পরিণাম চিন্তা পরিলক্ষিত হয় তথাপি তাহাদের মধ্যে বিচার শক্তির সম্পূর্ণ অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; এজন্য তাহাদিগকে বিবেকী বলা যায় না। ঐহিক এবং পারমার্থিক এ উভয় প্রকার পরিণাম চিন্তা বা বিবেকই ধর্ম্ম শব্দের মুখ্য অর্থ। ইহা কেবল মনুষ্যেতেই বর্ত্তমান আছে; অন্য কোন প্রাণীরই নাই।

মানবের বিবেক বা পরিণাম চিন্তার ঐহিক ফল বৈষয়িক সুখলাভ, এবং পারমার্থিক ফল স্বর্গলাভ বা মুক্তি। বৈষয়িক সুখপ্রাপ্তির জন্য মানবকে অর্থার্জ্জন প্রভৃতি কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয় এবং পারমার্থিক স্বর্গ বা মুক্তি-লাভের জন্য তাহার ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। সাধারণতঃ ধর্ম্ম শব্দটী বিবেকরূপ মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক মুক্তিলাভের উপায় ঈশ্বরের উপাসনারূপ গৌণ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। এজন্য মানবগণ যেরূপেই হউক ভগবানের উপাসনাকেই তাহাদের পরমধর্ম্ম বলিয়া জানে।

ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে খৃষ্টান মুসলমান ইহুদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সহিত ভারতীয় সনাতনধর্ম্মাবলম্বীদিগের কতক পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশানুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারাই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হন। কারণ,

তাঁহাদের শাস্ত্রে যেরূপ উপাসনার প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে সেরূপ উপাসনাই ধর্ম্ম। আচার বা খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি নিয়মপালন তাহাদের ধর্ম্ম নহে। আহার বিহার প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আচার-বিচারের অভাবে তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোনও প্রকার হানি হয় না। কিন্তু সনাতন আর্য্যজাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম-পদ্ধতি অনেকাংশে ইহার বিপরীত। আর্য্যগণের ধর্ম্মগ্রন্থ তাহাদিগকে আচার বিচার প্রভৃতি নিয়ম বিষয়েই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, পরন্তু উপাসনা বিষয়ে ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইঁহাদের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের লক্ষণই অন্যবিধ।

ধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ।

এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ মনুসং।২।১২।

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি এ চারিটী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রমাণ বলিয়া মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইহার দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য মনু অন্য একটী শ্লোকেও বলিয়াছেন :—

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাম্।

আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥ মনুসং।২।৬।

সমস্ত বেদ, বেদবেত্তা মনুপ্রভৃতির স্মৃতি, ব্রহ্মণ্য প্রভৃতি শীল, সাধুদিগের সদাচার এবং মহাত্মাগণের আত্মতুষ্টি এ সকলই ধর্ম্মে প্রমাণ।

কেবল উপাসনাই ধর্ম্ম নহে, চরিত্র সদাচার প্রভৃতিও ধর্ম্ম; কারণ, ইহারাও বিবেক হইতে উৎপন্ন। এজন্য সনাতন আর্য্যগণ উপাসনা বিষয়ে পরস্পর বিভিন্নমতাবলম্বী হইলেও আচার বিষয়ে তাঁহাদের মতের বড় বেশী অনৈক্য হইত না। তাঁহারা জানিতেন—উপাসনা আত্মার উন্নতির জনক এবং সদাচার দৈহিক ও মানসিক উন্নতির কারণ।

উপাসনা বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীন হওয়ার কারণ এই— তাঁহারা উত্তমরূপে অনুভব করিয়াছিলেন যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গণপতি প্রভৃতি সকলেই একমাত্র বিশ্বব্যাপী সর্ব্বভূতাশ্রয় পরমেশ্বরেরই প্রতীক। যে ব্যক্তি যে নিয়মেই যাহার উপাসনা করুক না কেন ধারণা, ধ্যান ও সমাধির আশ্রয়ে সকলেই সেই পরমপুরুষ ভগবানেরই উপাসনা করে। কেবল উপাসনার প্রকার ভেদ হয় মাত্র, তাহাতে কোনও পারমার্থিক হানি নাই।

পক্ষান্তরে শীল (morality), সদাচার প্রভৃতি অন্তঃকরণ ও শরীরের সংস্কার ও পবিত্রতা সম্পাদান করে। শরীর বা অন্তঃকরণের যদি পবিত্রতা সম্পাদন করা না যায় তাহা হইলে ধ্যান বা সমাধির অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" শরীর যদি সুস্থ না থাকে এবং মন যদি অপবিত্র হয় তাহা হইলে ঐহিক বা পারমার্থিক উন্নতির জন্য কোন প্রকার সদনুষ্ঠানই সম্ভবপর হয় না। তাই আর্য্যগণ সৎপ্রবৃত্তির জনক সদাচার রক্ষার জন্য এত দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন।

অতএব দেখা যায়, অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা সনাতন আর্য্যধর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম পদ্ধতি অনেক পরিমাণে বিভিন্ন। আর্য্যগণ কেবল উদ্দেশ্যটাই (end) নির্দ্দেশ করেন নাই, উদ্দেশ্য-সাধনের সর্ব্ববিধ উপায়কেও (means) ধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, উপায় ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। কিন্তু তাঁহারা দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে মানবকে উপায় (শীল সদাচার প্রভৃতি) অবলম্বনের জন্যও অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন।

জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন সজীব দেহ বা নির্জীব পদার্থ কিছুই ক্ষণমাত্রও একভাবে অবস্থান করিতে পারে না। কালের গতি যেমন রোধ করা যায় না, নিয়তই চলিতেছে, সেরূপ বিশ্বের সমস্ত পদার্থ নিয়তই পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কালেই জগতের আশ্রয়, কালের আশ্রয় কিছুই নাই ("কালোহি জগদাধারঃ কালাধারো ন বিদ্যতে")। যে পর্য্যন্তকালের এই অক্ষুণ্ণ গতি থাকিবে, কালের আশ্রিত এই জগতের পরিবর্ত্তনও ততদিন অবাধিতরূপেই চলিবে। কেবল বেদান্ত প্রতিপাদ্য নিত্যবুদ্ধশুদ্ধস্বভাব পরব্রহ্ম অথবা তারশাস্ত্র প্রতিপাদ্য ঈশ্বর এই পরিবর্ত্তনের অধীন কি-না এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতান্তর দেখা যায়। কিন্তু এ বিশ্বের পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রাকৃতিক; ইহা রোধ করে কার সাধ্য!

এ পরিবর্ত্তন দ্বিবিধ; একটী বৃদ্ধির দিকে, অপরটী ধ্বংসের দিকে। উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেরই বৃদ্ধির একটী সীমা আছে। সে সীমাতে উপস্থিত হইয়াই প্রাকৃতিক নিয়মে উহা পুনর্ব্বার ধ্বংসের দিকে চলিতে থাকে। বর্ত্তমানে জগতের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দুইটী মতের বিশেষ প্রাবল্য দেখা যায়। এক সম্প্রদায় বলিতেছেন যে, জগৎ এখন বৃদ্ধি ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে; অপর সম্প্রদায়ের মতে জগতের বৃদ্ধি (উন্নতি) শেষ সীমায় পৌছিয়া এখন পুনরায় ধ্বংসের দিকে চলিতেছে।

আর্য্য ঋষিগণের মতে সত্যযুগই জগতের উন্নতির শেষ সীমা; ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এ তিন যুগেই জগৎ ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে যায়। জগতের এ পরিবর্ত্তনের সহিত জাগতিক সমস্ত বস্তুরই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য মানবের ধর্ম্ম, ভাষা, প্রবৃত্তি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইবে।

ঋষিগণ এ ক্রমপরিবর্ত্তনের নিয়ম বিষয়ে বিশেষরূপেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা বিভিন্নযুগের জন্য বিভিন্নশাস্ত্র, বিভিন্নধর্ম্ম, বিভিন্নরূপ আচার-ব্যবহার প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ আমরা সে বিষয়ে চিন্তা করি না অথবা পর্য্যালোচনা করি না। এজন্যই বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে।

আর্য্যজাতির সংহিতাই প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। কিন্তু সংহিতার সমস্ত গুলিই সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য নহে। বিভিন্ন যুগ-ধর্ম্ম অনুসারে ঋষিগণ বিভিন্ন সংহিতা রচনা করিয়াছেন। সত্যযুগের জন্য যে সংহিতা প্রণীত হইয়াছে যদি কলিযুগে তাঁহার অনুসরণ করা যায় অথবা দ্বাপরের জন্য যে সংহিতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা যদি সত্যে অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে সমাজে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে। অধিকরণ অনুসারে বিধির অনুসরণ না করিলে বহুবিধ অশান্তি ও উৎপাতের সৃষ্টি হয়—একটু চিন্তা করিলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এজন্য সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিত যে, আমরা কোন্ যুগের লোক এবং আমাদের জন্য কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি কিরূপ ধর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমাদের আবির্ভাবের যুগটী অতি ভয়াবহ। এ যুগের নাম কলি—অর্থাৎ মূর্ত্তিমান পাপ। মহর্ষি পরাশর নিম্নোদ্ধৃত দুইটী শ্লোক দ্বারা এ যুগের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দ্বারাই এ যুগের মাহাত্ম্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

ধর্ম্মোজিতো অধর্ম্মেণ জিতঃ সত্যোঽনৃতেন চ।
জিতা ভৃত্যৈশ্চ রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষা জিতাঃ॥
সীদন্তি চাগ্নিহোত্রাণি গুরু পূজা প্রণশ্যতি।
কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন কলি যুগে সদা। প সং
১।৩০, ৩১।

কলিযুগে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, মিথ্যা দ্বারা সত্য পরাজিত হয়, রাজা তাহার ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন, এবং পুরুষগণ স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। এ কলি যুগে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, মানব ইষ্ট পূজা ও উপাসনা পরিত্যাগ করে, এবং কুমারীগণ (বিবাহের পূর্ব্বেই) সন্তান প্রসব করে।

কলিযুগের ধর্ম্ম ও আচার মহর্ষি পরাশর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেন করিয়াছিলেন তাহা পরাশর-সংহিতার প্রথম অংশে কথিত আখ্যায়িকাটী হইতে স্পষ্ট হইবে।

পূর্ব্বকালে একদা হিমালয় পর্ব্বতের উপরে দেবদারু বনময় আশ্রমে মহর্ষি ব্যাস একাগ্রচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মহর্ষিগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সত্যবতী-নন্দন! এ কলিযুগে কোন ধর্ম্ম এবং কি রকম শৌচ ও আচার মনুষ্যের হিতকর হইবে? সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যাস উত্তর করিলেন—ঋষিগণ! আমি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নই; কিরূপে এ প্রশ্নের উত্তর করিব? এ বিষয়ে আমার পিতা পরাশরকে প্রশ্ন করা উচিত।

ঋষিগণ তখন ব্যাসকে অগ্রে করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় মহর্ষি পরাশর প্রধান প্রধান ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ব্যাস ঋষিগণের সহিত তথায় উপনীত হইয়া জনককে প্রদক্ষিণ, প্রণাম ও স্তুতি দ্বারা পূজা করিলেন।

ব্যাস পরাশরকে বলিলেন—পিতঃ! আমি আপনার নিকট মনু অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি এবং তাহা স্মরণেও রাখিয়াছি। কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্ম সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান কলিযুগে ঐ সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব আমাদিগের নিকট এই কলিযুগের উপযোগী চারিবর্ণের ধর্ম্ম ও সাধারণ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন। ব্যাসের প্রার্থনা শুনিয়া ঋষি-প্রবর পরাশর ধর্ম্মের স্থূল এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিস্তৃতরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি পরাশর তৎপ্রণীত সংহিতাগ্রন্থের প্রারম্ভেই যুগ-ভেদে যে ধর্ম্মেরও ভেদ হয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন :—

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ॥ প সং ।১।২১।

সত্যযুগে মানবের একপ্রকার ধর্ম্মপ্রচলিত, ত্রেতাতে অন্যবিধ, দ্বাপরে আর এক রকম এবং কলিযুগের জন্য অন্যরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে।

তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞান মুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যুচুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে॥ প সং ।১।২২।

সত্যযুগে তপস্যাই পরম ধর্ম্ম; ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে একমাত্র দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহর্ষি তপস্যাকে সত্যযুগের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ তপস্যা পরাক, চান্দ্রায়ণ, সান্তপন, প্রাজাপত্য প্রভৃতি ব্রত। কঠোর উপবাস ও অনশন হেতু এ সকল ব্রতানুষ্ঠান অতি কষ্টসাধ্য। কলির জীব অন্নগত প্রাণ; একথা পরাশরই পরে উল্লেখ করিয়াছেন :—

কৃতে চাস্থিগতাঃ প্রাণা স্ত্রেতায়াং মাংসসংস্থিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিষু স্থিতাঃ॥ প সং ।১।২৯।

সত্যযুগে মনুষ্যের প্রাণ অস্থিগত—অর্থাৎ অস্থি সকল দেহ হইতে বিচ্যুত না হইলে প্রাণ অপগত হইত না। ত্রেতায় মাংসগত; দ্বাপরে প্রাণ শোনিতগত এবং কলিতে মনুষ্যের অন্ন প্রভৃতি খাদ্যগত প্রাণ—অর্থাৎ এ যুগে মানবের প্রাণ খাদ্যের অভাবে অতি সহজেই দেহ ত্যাগ করে।

এই অন্নগতপ্রাণ কলির জীব যদি সত্যযুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বহুদিনব্যাপী কঠোর উপবাসসাধ্য ব্রত নিয়ম প্রভৃতি আচরণ করিবার জন্য তৎপর হয় তাহা হইলে অন্নাভাবে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তখন তপস্যার অনুষ্ঠান করিবে কে? এমন কি ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের জন্য মহর্ষিগণ বহু উপবাসসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জনের নিয়ম করেন নাই।

তাহার পর ত্রেতাযুগে জ্ঞানই মানবের পরম ধর্ম্ম বলিয়া উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। উপনিষৎও "আত্মানং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু কলির দুর্ব্বলচিত্ত মানবের পক্ষে ঐ জ্ঞান-লাভের উপায়স্বরূপ যম, নিয়ম, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ-সাধনের শক্তি কোথায়? কলিতে চঞ্চলচিত্ত মানবের পক্ষে শ্রবণ মননাদির ক্ষমতাই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ ত্রেতাযুগে অবস্থিত ছিলেন; তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞান লাভের অধিকারী ছিলেন। তুচ্ছ কলির জীব আমরা,—আমাদের আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের অধিকার কোথায়?

তারপর দ্বাপর যুগে জনসাধারণ অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় তাহাদের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান করা হইল। তাহাদের প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভের উপায় না থাকিলেও তাহারা যজ্ঞদ্বারা মুক্তি বা স্বর্গের পথ রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের ন্যায় কলির জীবের সে পথও অপরিষ্কৃত। কারণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে উপযুক্ত ঋত্বিক্ (পুরোহিত) নিযুক্ত করা আবশ্যক। অথবা যজমান স্বয়ং যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

বর্ত্তমান যুগে যে সকল যজমান বা পুরোহিত আছেন তাঁহাদের পৌনে ষোল আনারও অধিক যজ্ঞাদি কার্য্য অনুষ্ঠানের উপযুক্ত নহেন। কারণ, শাস্ত্রেই আছে, যজ্ঞ পূজা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাহা যদি উদাত্ত ও অনুদাত্ত ভেদে শুদ্ধরূপে উচ্চারিত না হয় তাহা হইলে ঐ মন্ত্র দ্বারা যজমানের ইষ্ট সাধিত না হইয়া বরং অনিষ্টই ঘটে।

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থ মাহ।
স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

মন্ত্রের উদাত্তাদি স্বর বা বর্ণ সকল যদি পরিশুদ্ধ ভাবে উচ্চারিত না হয় তাহা হইলে ঐ সকল মন্ত্র-উচ্চারণ মিথ্যা হয়। যে উদ্দেশ্যে ঐ মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাহা সিদ্ধ হয় না। পরন্তু ঐ বাক্য বজ্রস্বরূপ হইয়া যজমানের ধ্বংসের কারণ হয়। যেমন, "ইন্দ্রশত্রুং জহীহি" এ মন্ত্রটী উচ্চারণের দোষে যজমানেরই ধ্বংসবিধান করিয়াছিল।*

মন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে যদি তাহার অর্থবোধ না হয় তাহা হইলেও ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করা বৃথা। তাহাদ্বারা কোন ফল হয় না।

"যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিবশুষ্কৈধো ন তজ্জলতি কর্হিচিৎ॥"

ঋগ্বেদ, সায়নভাষ্য।

অগ্নিহীন শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন প্রজ্বলিত হয় না—অর্থাৎ অগ্নিহীন কাষ্ঠদ্বারা যেমন পাকাদি কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না, সেরূপ অর্থজ্ঞান ব্যতিরেকে মন্ত্র যদি কেবল অভ্যাস বশতঃ উচ্চারিত হয়, তাহাতেও কোন ফল হয় না।

বর্ত্তমান কলিযুগে ব্রাহ্মণগণের উচ্চারণশক্তি বা মন্ত্রের অর্থজ্ঞান অনেকেরই খুব অল্প। এজন্য উপযুক্ত ঋত্বিকের অভাবেই যজ্ঞাদি কার্য্য যথাযোগ্যরূপে অনুষ্ঠিত হয় না।

এজন্যই পরাশর কলির ক্ষীণ জীবের জন্য দানই পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য অন্যান্য ধর্ম্মের কথাও যে তিনি বলেন নাই তাহা নহে। তবে তাহাদের ফল সংশয়িত, কিন্তু দানের ফল অনেকটা স্থির ও উহা সহজসাধ্য।

পরাশর কলিতে দানের প্রকার যেরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও অভিনব। আজকাল যে স্বার্থশূন্য দান প্রায়ই দেখা যায় না পরাশর তাহারও আভাস দিয়াছেন।

অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহুয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচনায়ৈব সেবয়া দীয়তে কলৌ॥

পরাশর সং ১।২৮।

সত্যযুগে গ্রহীতার নিকট যাইয়া দান করা হয়; ত্রেতাতে দাতা গ্রহীতাকে ডাকিয়া (নিজগৃহে আনিয়া) দান করেন। দ্বাপরে প্রার্থী হইলে তাহাকে দান করা হয় এবং কলিতে সেবা করিলে সেবক প্রভুর দান প্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমান যুগে ধনিগণ কখন কখন সেবাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের ভৃত্যগণকে বেতনের অতিরিক্ত অর্থ বা প্রয়োজনীয় বস্তু দান করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি প্রার্থিবর্গ ধনীর দ্বারে উপস্থিত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করেন।

সকল যুগে সকল সংহিতাই প্রমাণ নয়। দেশকালপাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা যে প্রমাণ এবং কালানুযায়ী সংহিতার প্রামাণ্যই গ্রহণ করা যে আবশ্যক, তাহাও পরাশর বলিয়াছেন :—

কৃতেতু মানবোধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ॥

প সং ১।২৩।

সত্যযুগে মনুকর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম আচরণীয়; ত্রেতাতে গৌতম কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত ধর্ম্মই প্রমাণ। দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত মুনি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম অনুসরণীয় এবং কলিতে পরাশর কর্ত্তৃক নিরূপিত ধর্ম্মই প্রশস্ত।

সত্যপ্রভৃতি চারি যুগের জন্য মাত্র পাঁচজন ঋষির সংহিতা প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইল। অনেকে মনে করিতে পারেন যে অবশিষ্ট পনরখানা সংহিতা এবং উপসংহিতাগুলি নিরর্থক, কারণ, তাহাদের প্রামাণ্য ও ব্যবহারের অবকাশ বা সার্থকতা কোথায়? কিন্তু কোন সংহিতাই ব্যর্থ হয় না। চারিযুগে যখন বিশখানা সংহিতা রচিত হইয়াছে তখন প্রতিযুগেই যে

---

* দেবগণের সহিত অসুরগণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য দেবগণের হত্যামানসে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ তখন অনন্তোপায় হইয়া সরস্বতী দেবীকে শুক্রাচার্য্যের নিকটে পাঠান। সরস্বতী শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধিভ্রংশ করিবার জন্য তাঁহার কণ্ঠে আশ্রিত হন। এ অবস্থায় শুক্রাচার্য্য যখন "ইন্দ্রশত্রুং জহীহি" এই বলিয়া যজ্ঞে আহুতি দিলেন তখন বুদ্ধিভ্রংশদরুণ প্রথম পদটী উদাত্ত না হইয়া দ্বিতীয় পদটী উদাত্তরূপে উচ্চারিত হইল। এজন্য ঐ আহুতি দ্বারা দেবগণ হত না হইয়া অসুরগণই হত হইল। কারণ প্রথম পদটী উদাত্ত (accent) হইলে অর্থ হয় "ইন্দ্ররূপ শত্রুকে হত্যা কর"। এরূপ উচ্চারিত হইলে দেবগণ হত হইত। কিন্তু পরের পদটী উদাত্তরূপে উচ্চারিত হওয়ায় অর্থ হইল "ইন্দ্রের যে শত্রু (অসুরগণ) তাহাকে হত্যা কর"। এজন্য অসুরগণ শত্রু বধের জন্য যজ্ঞ করিয়া নিজেরাই হত হইল।

একের অধিক সংহিতা রচিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে ত্রেতাতে এবং দ্বাপর যুগেই বহুসংহিতা রচিত হইয়াছিল।

সত্যযুগের জন্য কেবল মনুসংহিতাই রচিত এবং প্রধানতঃ ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। এ সংহিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর; ইহাতে উল্লিখিত বা আলোচিত হয় নাই প্রায় এমন বিষয়ই নাই। কিন্তু ত্রেতা বা দ্বাপর যুগের জন্য যে সকল সংহিতা রচিত হইয়াছে তাহা একদেশস্পর্শী। কোন সংহিতাতেই সকল বিষয় আলোচিত হয় নাই। একজন মহর্ষি নিজগ্রন্থে যে বিষয় আলোচনা করেন নাই অপর একজন অন্যসংহিতায় তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। এজন্য যে যুগে যতগুলি সংহিতা রচিত হইয়াছে ঐ যুগের জন্য তাহাদের প্রত্যেকখানাই প্রমাণ। যেমন বৃহস্পতিসংহিতাতে কেবল দানের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে; এজন্য ঐযুগে অর্থাৎ যে যুগে বৃহস্পতি-সংহিতা রচিত হইয়াছে, দান বিষয়ে বৃহস্পতির মতই শ্রেষ্ঠ। এরূপ, প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে যমসংহিতা; বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিষয়ে হারীতসংহিতাই প্রমাণ। এরূপে দেখিতে গেলে কোন সংহিতাই নিরবকাশ (ব্যর্থ) হয় না; নিজ নিজ যুগের জন্য সকলেরই সার্থকতা আছে।

বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড দেশে একযুগেই হয়ত দেশভেদে ব্যবস্থাভেদ এবং আচার ভেদের প্রয়োজন হইয়াছিল। একযুগেই বিভিন্ন দেশের জন্য বিভিন্ন সংহিতা প্রস্তুত হওয়াও অসম্ভব নয়। একটি উদাহরণ আলোচনা করা যাইতেছে। লিখিতসংহিতায় অশৌচ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে :—

ষষ্ঠেনশুধ্যতৈকাহং পঞ্চমে ত্র্যহ মেবতু।
চতুর্থে সপ্তরাত্রং স্যাৎ ত্রিপুরুষে দশমেঽহনি॥

লিখিত সং।৮৭।

(জ্ঞাতিমরণে) ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্ত একদিন, পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত তিনদিন, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সাতদিন এবং তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত দশদিন অশৌচ হয়।

এপ্রকার অশৌচের ব্যবস্থা অন্য কোন সংহিতাকারই কোন যুগের জন্য ব্যবস্থা করেন নাই। এজন্য ইহা দেশ বিশেষের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন।

পরাশরসংহিতাতেও সকল বিষয় সুচারুরূপে উল্লিখিত ও মীমাংসিত হয় নাই। যাহা পরাশর বলেন নাই তাহা প্রয়োজন অনুসারে অন্যসংহিতা হইতে সংগ্রহ করাই উচিত। কিন্তু পরাশর যাহা বলিয়াছেন কলিযুগের জন্য তাহাই সর্ব্বোপরি প্রমাণ। সে বিষয়ে অন্য কোনও সংহিতার মুখাপেক্ষী হওয়া ন্যায়বিরুদ্ধ এবং সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর।

অনেকে বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের উপর দোষারোপ করিয়া বলেন যে বর্ত্তমানে সামাজিক বিপ্লব সম্বন্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণই দায়ী। কারণ, তাঁহারা অন্যযুগের ধর্ম্ম কলিতে প্রয়োগ করিয়া সমাজে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছেন। কিন্তু ইহার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী সংহিতা-গ্রন্থসমূহের নিবন্ধকারগণ।

মিতাক্ষরা, হারলতা, বাচস্পতি মিশ্রকৃত নিবন্ধগ্রন্থ, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক প্রভৃতিগ্রন্থ, রঘুনন্দন কৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব ইত্যাদি অনেক সংগ্রহগ্রন্থ বিভিন্ন নিবন্ধকারগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছে। নিবন্ধকারগণ সকলেই সংহিতাগ্রন্থসমূহকে প্রধান উপজীব্য করিয়া নিজ নিজ নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমার সকল নিবন্ধগ্রন্থের সহিত বিশেষ পরিচয় নাই। বঙ্গের সর্ব্বত্র-প্রচলিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের যে অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব আছে তাহার আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে রঘুনন্দন বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্ম্মভীরু ও পরম সুপণ্ডিত ছিলেন। সংহিতা বিষয়ে তিনি এক একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া এরূপ সূক্ষ্মবিচার করিয়াছেন যে, ইহা দেখিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার গুণকীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার যুক্তি, তাঁহার তর্ক, ও সিদ্ধান্ত অভিনব ও অত্যন্ত প্রীতিকর। কিন্তু তাঁহার সকল সংহিতার একত্র সমন্বয়ের চেষ্টা ও সমন্বয়-সিদ্ধান্তই বর্ত্তমানে সমাজবন্ধনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেখা যায়, সংহিতাপ্রণেতা মহর্ষিগণের মধ্যে অনেক বিষয়ে পরস্পর যথেষ্ট মতভেদ আছে। আমাদের ধারণা, যুগভেদ এবং দেশভেদেই এ মতভেদের কারণ। একজন মহর্ষি কোনও দেশবিশেষের জন্য একপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন; অপর একজন মহর্ষি অন্যদেশের জন্য অথবা অন্যকালের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের মতভেদ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। রঘুনন্দন তাহার আত্মন্ত নিবন্ধ

গ্রন্থেই সকলদেশে এবং সকল যুগেই এপ্রকার বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন—যেন সকলস্থানে এবং সকল সময়েই সমস্ত সংহিতাশাস্ত্রের আদেশ সমানরূপে গ্রাহ্য ও প্রতিপাল্য। যুগভেদে ও স্থানভেদে আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মচর্য্যার যে ভেদ হয় তাহা তিনি অতি অল্পই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এজন্য তিনি পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য সমূহের অর্থের অনেকটা সঙ্কোচবিধান করিয়া উভয় বাক্যের এক-বাক্যতা স্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু যদি কোনও মীমাংসক বা নিবন্ধকার সংহিতাস্থিত মুনিবচন সকলের যে স্বারসিক অর্থ তাহার সংস্কোচ না করিয়া বিভিন্নযুগের জন্য এবং বিভিন্নদেশের জন্য প্রত্যেক সংহিতারই সার্থকতা আছে দেখাইয়া দেন এবং তাহাদের অবকাশ স্থাপন করেন তাহা হইলে বোধ হয় তাহার মীমাংসাও গর্হিত হয় না। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান যুগের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকগণের তাহা করিবার ক্ষমতা খুব কম। তাঁহারা কল্পনাও করেন না যে, নিবন্ধকারগণ কর্ত্তৃক মীমাংসিত বিষয়ের অন্যপ্রকারেও ধর্ম্মসঙ্গত মীমাংসা হইতে পারে।

মহর্ষি পরাশর কলিকালের আচার ব্যবহার বিষয়ে শাস্ত্রের কঠোরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছেন। যথা :—

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াংগ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে॥

পরাশর সং ।১।২৪।

পাপীর সংস্রব পরিত্যাগ করার জন্য সত্যযুগে পাপী যে দেশে বাস করে ঐ দেশ পরিত্যাগ করিবে; ত্রেতাতে পাপীর গ্রাম ত্যাগ করিবে। দ্বাপরে কেবল পাপীর কুলত্যাগ করিবে এবং কলিযুগে যে পাতকী কেবল তাহাকেই ত্যাগ করিবে।

এবচনটী দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে বিশেষ করিয়া যে স্থানে বলা হইয়াছে তাহা ভিন্ন কলিতে সংসর্গ দোষ নাই। পাপীর প্রথম সংসর্গী দ্বিতীয় সংসর্গী প্রভৃতি সংসর্গিগণ যে দোষী বলিয়া কোন কোন সংহিতাকার এবং নিবন্ধকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অন্য যুগের জন্য বিধান করা হইয়াছে। কারণ, সাধারণতঃ পাপীর কুলই প্রথম সংসর্গদোষে দোষী হয়। পাপীর গ্রাম দ্বিতীয় সংসর্গ দোষে দোষী হইতে পারে এবং দেশ তৃতীয়াদি সংসর্গে কলুষিত হয়। এ অবস্থায় পাপীর দেশ গ্রাম বা কুল পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা যুগান্তরের জন্য বিধান করা হইয়াছে, কলিযুগের জন্য হয় নাই। কলিযুগে পাতকীর সহিত যে সংসর্গ করে তাহার সংসর্গে থাকিলেও পাপী হইতে হয়, এ বচন দ্বারা তাহা অনুমান করা যায় না। বিশেষতঃ "কর্ত্তারঞ্চ কলৌযুগে—কলিযুগে কেবল পাতকীকেই পরিত্যাগ করিবে" এ উক্তি কলিযুগে পাপীর সহিত যাহারা সংসর্গ করে তাহাকেও যে সমাজ হইতে পরিত্যাগ করিতে হইবে এরূপ ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী।

অবশ্য মহর্ষি কয়েকটী বিশেষ গুরুতর পাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—ঐ সকল পাপে যাহারা লিপ্ত থাকে তাহাদের সংসর্গীরও পাপ হয়; এজন্য ঐ সকল পাতকীর সংসর্গীকেও সমাজ হইতে বর্জ্জন করিতে হইবে ইহা মহর্ষির অভিমত।

কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥

পরাশর সং ।১।২৫।

সত্যযুগে পাপীর সহিত আলাপ করিলেই পতিত হয়; ত্রেতাতে পাপীর দর্শনে পাতিত্য জন্মে, দ্বাপরে পাপীর অন্ন গ্রহণ করিলে পতিত হয় এবং কলিযুগে পাপীর (যজনাদি) কার্য্য করিলে পতিত হইতে হয়।

"দ্বাপরে চার্থমাদায়—অর্থাৎ দ্বাপরে পাপীর অর্থ গ্রহণ করিলে পতিত হয়" এরূপ পাঠও দেখা যায়।

এ বচন দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কলিতে পাপীর সহিত আলাপ, দর্শন অথবা তাহার দান বা অন্নগ্রহণেও দোষ (পাতিত্য) হয় না; কেবল তাহার যাজন (পাপীর পৌরোহিত্য) করিলেই পতিত হইতে হয়।

অতএব মহর্ষি পরাশর কলিকাল এবং কলির জীবের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, যদি অন্যান্য যুগের ন্যায় এ যুগেও আচার ব্যবহার বা ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে লোকস্থিতির পক্ষে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। এ জন্য তিনি আচার ও ব্যবহার বিষয়ে যাহা একান্ত অপরিহার্য্য কেবল সেই বিষয়ে কিছু কঠোরতা অবলম্বন করিয়া সাধারণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে উদার পথ অবলম্বন করিয়াছেন।



দরজী

বিচিত্রা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রভাত নিয়োগী

আচার ব্যবহার বিষয়ে সকল যুগে এবং সকল দেশেই দুই প্রকার সম্প্রদায় গঠিত হয়। এক সম্প্রদায় থাকে শাস্ত্রাদেশরক্ষণশীল বা নৈষ্ঠিক এবং অপর সম্প্রদায় থাকে উদারপথাবলম্বী বা নিরীহ। ধর্ম্মশাস্ত্রে এ দুই সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারগণ ইহাদিগকে সগুণ এবং নির্গুণ এই দুই নামে অভিহিত করিয়াছেন। সগুণ শব্দের অর্থ—যাঁহারা অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে আচার ও ধর্ম্মচর্য্যা প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত আদেশ পালন করেন। যাঁহারা শাস্ত্রাদেশ পালন সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে স্বাধীন, যে অবস্থায় যতদূর সম্ভবপর হয় মাত্র সে পরিমাণেই শাস্ত্রাদেশ রক্ষা করেন, অথচ শাস্ত্রের প্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকে, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগকে "নির্গুণ" শব্দ দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন।

মহর্ষিগণ এই সগুণ এবং নির্গুণ ভেদে মানবের জন্য আচার ব্যবহার বিষয়েও দ্বিবিধ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশৌচ বিষয়ে সগুণ ও নির্গুণ ব্যক্তিগণের ব্যবস্থা ভেদের একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।

ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্ত দ্বিহীনো দশভির্দিনৈঃ॥ প সং।৩৫।

সাগ্নিক ও বেদাধ্যায়ী বিপ্রের একদিন অশৌচ হয়, যে ব্রাহ্মণ কেবল বেদাধ্যয়ন করে (সাগ্নিক নয়) তাহার তিন দিন অশৌচ হয় এবং যে বিপ্র সাগ্নিক নয় এবং যে বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত তাহাদের দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়।

জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।

নামধারক বিপ্রস্তু দশাহং সূতকং ভবেৎ॥ প সং।৩৬।

যে বিপ্র জন্ম-কর্ম্ম পরিভ্রষ্ট (সংস্কারহীন), সন্ধ্যা ও উপাসনা বিহীন, যিনি কেবল নামধারী বিপ্র তাঁহার দশদিন সূতক অশৌচ হয়।

স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণের অশৌচ একদিন বা তিনদিন; কিন্তু বর্ত্তমানে একদিন বা তিনদিন অশৌচসম্পন্ন ব্রাহ্মণ প্রায় দেখা যায় না। এ জন্য বর্ত্তমান যুগে সগুণ ব্রাহ্মণ প্রায় নাই। আজ কাল যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ নৈষ্ঠিক বলা যায় তাঁহারাও অগ্নির পরিচর্য্যা বা বেদাধ্যয়নবর্জ্জিত, এজন্য তাঁহারাও নির্গুণ ব্রাহ্মণ এবং দশদিন অশৌচ পালন করেন।

যদিও বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারিবর্ণের মধ্যে প্রায় সকলেই নির্গুণ তথাপি আচার ব্যবহার বা ধর্ম্ম-পরিচর্য্যা বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদে প্রভূত ভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক সম্প্রদায় আচার ও ধর্ম্মচর্য্যা সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব শাস্ত্রাদেশ রক্ষা করিতেছেন; অপর সম্প্রদায় আচার ও ধর্ম্মচর্য্যা বিষয়ে অনেক পরিমাণে স্বাধীন মত পোষণ করেন।

আমি এই প্রবন্ধে রক্ষণশীল সম্প্রদায়কে 'নৈষ্ঠিক" নামে অভিহিত করিলাম এবং স্বাধীন বা উদারমতাবলম্বী সম্প্রদায়কে "নিরীহ" বলিয়া উল্লেখ করিলাম। কারণ, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, এখন সগুণ সম্প্রদায়ের অভাব দরুণ প্রায় সকলেই নির্গুণ। এ জন্য পূর্ব্বের ন্যায় এখন সগুণ ও নির্গুণ এই দুই প্রকার ভেদ করিলে ঠিক হইবে না।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে অতিরিক্ত সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়া সমাজকে প্রায় উচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পরস্পর বিদ্বেষ ও দলাদলি প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। এ অশান্তির কারণ সনাতন আর্য্যশাস্ত্র নয়; বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার ও জেদ। সমাজে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে যুগধর্ম্মানুসারে চলিয়া সকলেরই জেদ পরিত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। নৈষ্ঠিক ও নিরীহগণের মধ্যে চিরকাল ভেদ আছে এবং থাকিবেই। প্রাচীন কালেও সগুণ ও নির্গুণগণের মধ্যে আচার বা ধর্ম্মচর্য্যা বিষয়ে ভেদ ছিল, কিন্তু পরস্পর মনোমালিন্য বা দলাদলি ছিল বলিয়া জানা যায় না। সগুণ সম্প্রদায় নিজেদের আচার ও ধর্ম্মচর্য্যা বিষয়ে পবিত্রতার জন্য নির্গুণ সম্প্রদায়ের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছে; বর্ত্তমান যুগেও প্রকৃত নৈষ্ঠিক সম্প্রদায়ের নিরীহ সম্প্রদায়ের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিলে তাহা অনুচিত হইবে না। মোটের উপর শাস্ত্রদৃষ্টিতে যতদূর সম্ভব নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া দেশ হইতে দলাদলির উৎপাত দূর করাই একান্ত উচিত।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ বেদান্তাচার্য্য

কলিকাতায় একদিন

শ্রীযুক্ত কাননবিহারী বসু এম্‌-এস্‌-সি

১

সেদিন শনিবার। শান্তার কাজের সীমা পরিসীমা নেই। অনেক দিনের সাধ কল্‌কাতা দর্শন,—এইবার তা' পূর্ণ হ'বে। স্বামী রমেশ গ্রামের ডিস্‌ট্রিক্টবোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডার। বেতন মাত্র কুড়ি টাকা। অর্থাভাবেই তাদের এতদিনের সাধ পূর্ণ হয় নি, যদিও তাদের গ্রাম থেকে কল্‌কাতা রেলগাড়ীতে মাত্র ঘণ্টা পাঁচেকের পথ।

আরও বাধা অবশ্য ছিল। ডিস্‌ট্রিক্টবোর্ডের দলাদলির ঘুর্ণিপাকে পড়ে অনেকেরই চাকুরি নিয়ে টানাটানি পড়ত। কাজেই রমেশের ছুটী পাওয়া নিতান্ত সহজ ছিল না। কিন্তু আজ তাদের সে বাধা দূর হয়েছে। পাশের গ্রামের জমিদারের কারবান্‌কল্‌ হওয়াতে প্রায় তিন মাস যাবত রমেশকে ড্রেস করতে যেতে হত। পুরস্কার স্বরূপ একশো টাকা তিনি রমেশকে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, জমিদারবাবু আরও কিছু সুবিধা করে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কল্‌কাতার একটি বড় হোটেলের ম্যানেজারের আলাপ আছে, তিনি সেইখানে রমেশের জন্য একটি ভাল ঘর এবং সেই হোটেলের হাওয়া-গাড়ীর যথেচ্ছ ব্যবহারের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।

এত সুখের মধ্যেও একটুখানি কাঁটা এই যে রমেশের ছুটি মাত্র একদিন,—কেবল রবিবারটি। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার মাত্র একদিনের জন্য নিজেই প্রেসক্রিপসন্‌ সারৃভ করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই একদিনের বেশী ছুটী তার ভাগ্যে জুটল না। কল্‌কাতার মতন বড় জায়গা এক দিনে সব দেখে ওঠা দুঃসাধ্য। তাই রমেশ গ্রামের দু'চারজন যারা কল্‌কাতা দেখেছে তাদের কাছে থেকে দেখবার জায়গা গুলির একটি ফর্দ্দ করে নিয়েছে। চিড়িয়াখানা যাদুঘর কালীঘাট ত আছেই। আজকাল আবার বাংলা ভাষার কথা-কওয়া বায়স্কোপ উঠেছে তাও দেখতে হবে। জিনিষ-পত্রও কিছু কিছু কেনা দরকার। তাই ভোর চারটের গাড়ীতে গ্রামের রেল ষ্টেশন থেকে রওনা হ'য়ে বেলা ন'টা আন্দাজ যদি কল্‌কাতায় পৌছান যায়, তবে চারটি খেয়েদেয়ে মোটরে করে ঘুরলে, সহর-পরিদর্শন ও কেনাকাটি —দুইই হ'য়ে উঠতে পারে। ছেলেমেয়েদের রেখে যাওয়াই স্থির হ'য়েছে; তারা ছোট, দেখে কিছুই বুঝবে না। তা ছাড়া একদিনের জন্য যাওয়া,—শান্তা ও রমেশকে ছেলে মেয়েদের তত্ত্বাবধান করতে গেলে সব জিনিষ দেখা হ'য়ে উঠবে না। তার ওপর কল্‌কাতায় যাবার গাড়ী রাত চারটের আর ফেরবার গাড়ী রাত বারটায়, কাজেই ছেলেমেয়ের ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ও আছে। তাই শান্তার মা এসে দুদিন তাদের বাড়ী থাকবেন,—ও ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করবেন, এই রকম বন্দোবস্ত হ'য়েছে।

আজ তিন চার দিন থেকে শান্তা ও রমেশের এক রকম ঘুম নেই বললেই হয়। রমেশকে সারাদিনই প্রায় কাজে থাকতে হয়। তাই রাত্রে ভিন্ন পরামর্শর সুবিধা হয় না। একটি সুটকেশের মধ্যেই দরকারী সব জিনিষ পুরে নিতে হবে। রমেশের ফতুয়া ছিঁড়ে গেছে, তা পরে কল্‌কাতায় যাওয়া চলে না। যদিও রমেশ তাই পরেই যেতে রাজি কিন্তু শান্তার তাতে বিষম আপত্তি। শান্তা নূতন কাপড় আনিয়ে নিজেই দুটো ফতুয়া সেলাই করেছে। বুরুস না হলে রমেশের দাঁত মাজা হয় না, সেইটেই সুটকেশে নিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যে তার ছোট ছেলে তার সন্ধান পেয়ে সেটা নিয়ে খেলা করছিল। তাই মনে পড়ে গেল। রমেশ ত নিজের বিষয়ে নির্ব্বিকার, গোছানর ভার শান্তার ওপর। কাজেই শান্তার দায়িত্ব ঢের।

যদিও ভোর চারটের গাড়ী ধরবার জন্য তাঁদের উঠতে হ'বে

রাত তিনটের মধ্যেই, তবুও আজ তাদের বিশ্রাম করবার সময় হয়ে ওঠেনি। রমেশ শান্তাকে ডেকে বল্‌লে "দেখ আজ রাত তিনটেয় উঠতে হবে। এখনই রাত ন'টা বেজে গেছে এই বেলা একটু ঘুমোও। আমার বড় ঘুম আস্‌ছে।"

শান্তা উত্তর দিল "ঘুমবার কি সময় আছে—এতদিন ধরে তোমায় বল্‌ছি কল্‌কাতা থেকে কি কি কিনে আনতে হবে তার একটা ফর্দ্দ কর। তার নামটি নেই।"

রমেশ বলল "সে কল্‌কাতায় গিয়ে হবে এখন। তার আর তাড়া কি?"

শান্তা। বেশ লোক যা হোক। সেখানে গিয়ে ঘুরে বেড়াবে,—না ফর্দ্দ করতে বস্‌বে। নাও,—ঘুম ত চিরকালই আছে, কল্‌কাতা যাওয়া ত আর তা নয়। এস এখন ফর্দ্দটা করি।

রমেশ তখন আর কি করে। অগত্যা হাই তুলতে তুলতে বলল "যো হুকুম। তাই ফর্দ্দই ধর। তবে মনে রেখ রেস্ত ঐ একশো টাকা।"

টাকার অঙ্ক সীমাবদ্ধ হওয়াতেই শান্তার ফর্দ্দ করতে অত কষ্ট। ছেলেমেয়েদের ছুটো করে হাল ফ্যাসানের জামা কিন্‌তেই হবে। তার কোলের ছেলেটি তিন বছরের। তার একটা পোষাক কেনবার ভারী ইচ্ছা। মা এসে ছেলে মেয়েদের আগলাবেন, তাঁকেও একখানা সাড়ী দিতে হবে। বড় ছেলে একটা ফুটবলের ফরমাস করেছে। মেয়ে একটি বড় খোকা পুতুল চেয়েছে। রমেশের ধুতি। টাকায় কুলোয় ত কাঁসার থালা একখানা চাই। বাটনা-বাটা শিলটা গর্ত্ত হয়ে গিয়েছে। শান্তার বাটনা বাটতে বড় কষ্ট হয়। একটা নূতন শিল নোড়া। এইরূপ সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কত কি জিনিষ। রাত ১২টা বেজে গেল তবুও ফর্দ্দ শেষ হ'ল না। প্রায় টাকা পঞ্চাশের জিনিষ কিনতেই হবে।

২

রেলের দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে সময়টা যে কত শীঘ্র কেটে গেল রমেশ ও শান্তা তার কিছুই টের পেল না। যখন কল্‌কাতার ষ্টেশনে এসে রেল পৌছল তখন একদল কুলি রমেশের কাছ থেকে তার সুটকেশটি নেবার জন্য অনুনয় বিনয় করতে আরম্ভ করল। রমেশ হেসে শান্তাকে বলল "এই ত একটা সুটকেশ। তার ভারই বা কি? এর জন্যে আবার কুলি করতে হবে! এর চেয়ে কত বেশী ভারী জিনিষ কত দিন তুলে বয়েছি।" শান্তার মন কিন্তু কুলীদের অনুনয় বিনয়ে একটু নরম হয়েছিল। সে বলল "আহা দাও না—দু' চারটে পয়সা বইত নয়।" তখন রমেশ একটি কুলীর মাথায় সুটকেশটি দিয়ে পথ চল্‌তে লাগল।

যথা সময়ে তারা হোটেলে এসে পৌছল। হোটেলের ম্যানেজার চিঠি পেয়ে তাদের সব বন্দোবস্ত ঠিক রেখেছিলেন। শান্তা জীবনে কখন এত বড় বাড়ী দেখেনি। যে-ঘরটি তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল, তার পাশেই সংলগ্ন স্নানের ঘর। দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা, তার ওপর ইলেট্রিক পাখা ঘুরছে। বাথ্-রুমের ভিতর একটি ফোয়ারার কল ছিল, শান্তা সেইটে খুলে দিয়ে কতক্ষণ সেই জলে তার হাত পা ভেজাতে লাগল। ইচ্ছে হচ্ছিল ফোয়ারার নীচে বসে সারাদিন কাটিয়ে দেয়। শান্তা ও রমেশের মনে আনন্দের আর সীমা ছিল না।

খাওয়া শেষ হতে বেলা প্রায় এগারোটা বেজে গেল। মোটরে করে ঘুরলে, যা' যা' দেখবার তা' দেখতে সময়ের তেমন অকুলান হবে না। রমেশ স্থির করেছিল কোন রকম কার্পণ্য করে দেখবার কিছুই বাকী রাখবে না। কলকাতা দেখা ভাগ্যে আবার হবে কিনা সন্দেহ।

খাওয়া শেষ করে যখন একটু জিরোবার জন্যে বিছানায় রমেশ ও শান্তা এসে বসেছিল তখন ইলেট্রিক পাখার হাওয়াতে দুজনেরই একটু ঘুম আসছিল। উপরি উপরি তিন চার দিন ভাল ঘুম না হওয়াতে দুজনেই খুব ক্লান্ত হয়েছিল, কাজেই তারা স্থির করলে, মোটর গাড়ী যখন পাওয়া গিয়েছে,—আর সময়ের তেমন অভাব নেই, তখন মিনিট কুড়ি ঘুমিয়ে নিলেও কোনো ক্ষতি নাই। তার পর বেরুলেই হ'বে। তবু শান্তা একবার বল্‌ল, 'যদি ঘুম ভাঙতে দু'টো বেজে যায়'!—

—"আরে না—না—ক্ষেপেছ। আমি ঠিক কুড়ি মিনিটের মধ্যেই উঠ্‌ব। বড় জোর আধ ঘণ্টা"!

* * * *

প্রথমে রমেশেরই ঘুম ভাঙল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখে চারদিক যেন অন্ধকার। ভাবল, একি—আজ সূর্য্যগ্রহণ নাকি! এই মাত্র ত সে ঘুমোল,—এরি মধ্যে অন্ধকার! বাড়ী থেকে বেরোবার আগে সে পাঁজি দেখেছিল কিন্তু কই তাতে কোন গ্রহণের কথা ছিল না ত। তবে একি হ'ল? তবে কি সে—ঘুমিয়ে—সারাদিনটাই কাটিয়ে দিয়েছে? এই নির্ম্মম সত্যটা সে মনে করতেও পারছিল না, কিন্তু তাকে ঠেকিয়ে রাখাও ত যায় না। একটা অনির্ব্বচনীয় বেদনায় ধীরে ধীরে সে খাট থেকে নামল এবং লাইটটা জ্বাল্‌ল, ঘড়িতে দেখল রাত ন'টা বেজে গিয়েছে। শান্তা তখনো ঘুমে অচেতন। রমেশ নির্নিমেষ নয়নে তার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। ডাক্‌তে মন সরল না।

মিনিট কয়েক এমনি ভাবেই গেল। রমেশ বাহ্যজ্ঞান-হীন বাক্‌শক্তিরহিতের মতই নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তার মন থেকে কিয়ৎক্ষণের জন্য যেন সমস্ত ভাবনা চিন্তা সুখ দুঃখের বোধ তিরোহিত হ'য়ে গেল। সহসা তার মনে পড়ল, —এখনি যে ফেরবার আয়োজন করতে হ'বে।

তখনই তার লুপ্ত চেতনা ফিরে এসে তার অন্তরে ব্যর্থতার বেদনার যেন একটা বন্যা বইয়ে দিল। আপন মনে অস্ফুটস্বরে সে একবার বলে উঠল—"ছি! ছি!" কি আর ক'রে! অতি ধীরে ধীরে ডাক্‌ল,—"শান্তা!"

শান্তার ঘুমন্ত মুখের উপর তখন যেন একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। বোধ করি বা সে সবাক্‌-চিত্রের স্বপ্ন দেখছিল। রমেশ আবার একটু জোরে ডাকল,—"শান্তা! শান্তা!"

শান্তা ধড় মড় করে উঠে বস্‌ল। ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় সে চোখ চাইতে পারছিল না। মিনিট খানেক চিত্রার্পিতের ন্যায় বসে রইল।

রমেশ বলল—"সব পণ্ড হ'ল শান্তা,—ঘুমিয়েই দিনটা কাট্‌ল।"

শান্তা জিজ্ঞাসা করল,—"কটা বেজেছে এখন?"

রমেশ উত্তর দিল,—"প্রায় দশটা বাজে।"

শান্তা বিস্মিত হ'য়ে বলল—"দশটা! সে কি! এখনি ত ফিরতে হ'বে"। বলেই সে খাট থেকে নেমে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে গেল, বুঝিবা ফোয়ারার জলে চোখের জল মুছে ফেলবার জন্যই। প্রায় মিনিট পনেরো পরে বেরিয়ে এসে বলল,—"তা' আর কি হ'য়েছে। তুমি মনে কষ্ট করো না, অনেকগুলো টাকা ত বেঁচে গেল"।

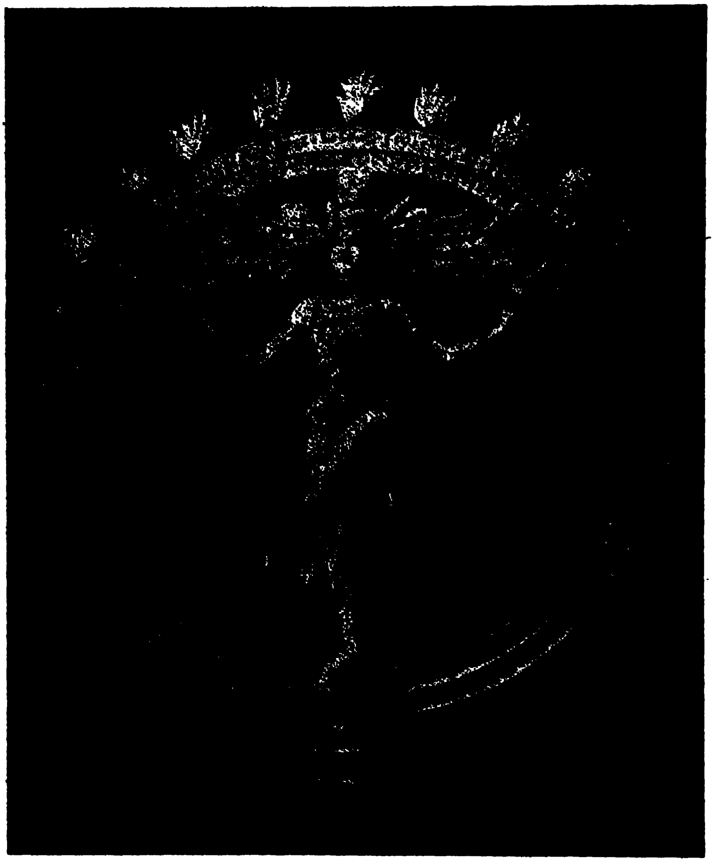
শ্রীকাননবিহারী বসু



ভারতীয় নৃত্যকলা

চিত্রগুপ্ত

বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নৃত্যকলার যেমন একটা উঁচু আসন আছে ভারতে তা' নেই। এখানে নাচ তার গৌরবের আসন ত্যাগ করে প্রধানতঃ গান-সমাজের মজলিসেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কদাচিৎ প্রাচীনপন্থীদের উৎসব সভাতেও নাচের অল্লাধিক চলন দেখা যায়। এখন এদেশে নৃত্যকলার এমন শোচনীয় অবনতি হয়েছে যে, বিদেশী কেউ ভারতের নৃত্যকলার পরিচয় জান্‌তে চাইলে তা'কে আমাদের থিয়েটারে বিলিতি নিকৃষ্ট নাচের নিকৃষ্টতম অনুকরণের নমুনা দেখানো ছাড়া দেখাবার মত আর বেশী কিছু হাতে নেই। খুব বেশী খুঁজলে এতবড় ভারতবর্ষে গুজ্‌রাটের গরবা কিম্বা জাগ প্রভৃতি নৃত্যের মত হয় ত আর দু'একটি সমাজ-প্রচলিত নাচের নমুনা মিল্‌তেও পারে, কিন্তু তা দিয়ে ভারতের লজ্জা বাড়্‌বে ছাড়া কম্‌বে না। কারণ তার পার্শ্বে ওদেশের সমাজে এবং দৈনন্দিন জীবনে নাচ যে কেমন করে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে তার পরিচয় আমরা নিত্য তো পাচ্ছিই, অধিকন্তু বিশিষ্ট কলাবিদ্‌রা ও ব্যক্তিগত সাধনার সাহায্যে এই কলাটীর ভিতর দিয়ে কতবড় সৌন্দর্য্যের সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছে তারও পরিচয় আমরা সর্ব্বদাই পাই। নিজে নিস্কি, গোনিয়া অ্যানাপাব্‌লোভা, রোশেনারা, মড্‌ এ্যালান প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সাধকদের নাচ এবং তার আদরই দৃষ্টান্ত। তবু আজ এইটুকু সুখের বিষয় বল্‌তে হ'বে যে, ভারতবর্ষও রাগিণী দেবী বা উদয়শঙ্করের মত দু'একজন প্রতিভাশালী শিল্পীকে পেয়েছে যাদের নাম করে সে কোন মতে মানটুকু বজায় রাখতে পারে। কিন্তু সত্যি



বিলাতী নর্ত্তকী মিস লীলা—নটরাজের ভঙ্গীতে নৃত্য

বিচার কর্ত্তে গেলে দেখা যা'বে যে, এরকম দু'একজনের নাম করে তখনকার মত পরিপূর্ণ অগৌরব থেকে সামান্য মাত্র বেঁচে গেলেও মূলে আমাদের ত্রুটীটুকু কিন্তু কিছুতেই ঢাকা পড়ে না। কারণ ও কলাটীর সম্মান আজ এদেশে নেই বলে ব্যাপকভাবে তা'র চর্চ্চাও আমাদের সমাজে প্রচলিত নয়, অথচ পাশ্চাত্যদেশে তার কতখানি উন্নতি ঘটেছে। পাশ্চাত্য নৃত্যকলার এতখানি উন্নতির কারণ, ওখানকার সব দেশেই নাচ হচ্চে সামাজিক জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় ও কথা খাটে না। দক্ষিণ ভারতে যদিও কোন কোন স্থানে সামাজিক জীবনে নাচের স্থান আছে কিন্তু তা এত সামান্য যে তাকে নেই বলাই চলে, আর অন্য জায়গার তো কথাই নেই। ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে বাইজীদের মধ্যে যদিও নাচের কতকটা চলন আছে কিন্তু তার চর্চ্চা সমাজের বাইরে কেবল বাইজীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই তার উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা শ্রদ্ধা ও যত্নের অভাবে বরং তা' দিন দিন নীচের দিকেই নেবে পড়্ছে। তা ছাড়া বিশেষজ্ঞেরা সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, বাইজীর নাচ মূলেই ভারতীয় নাচ কি না। কারণ আমাদের শাস্ত্রে যে সব বিধি ও লক্ষণের কথা লেখা আছে বাইজীদের নাচের সঙ্গে তা কোন রকমেই মেলে না, তার ওপর বাইজীদের পা'ঢাকবার প্রথাটা একেবারেই ভারতীয় প্রথা নয়। বাইজীদের নাচে যাকে বলে Classical grace অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভারতীয় নৃত্যের সুষমা, তার কোন চিহ্ন নেই। বিশেষ বাই-নাচ জিনিষটা যে যথেষ্ট একঘেয়ে ব্যাপার একথা সবাই স্বীকার কর্বেন। অথচ প্রত্যেক ভারতীয় কলারই বিশেষত্ব এই যে, তা'র মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব বড় থাকে না। সে যাই হোক, অন্যত্র তবু যা' হয় একটা কিছুর চলন আছে এবং সেটা নেহাত নিন্দনীয় নয়,—কিন্তু নাচ বিষয়ে বাংলা দেশই সবচেয়ে নিন্দনীয়। এখানে নাম করবার মত কিছুই নেই। অবশ্য অনেক প্রাচীন লোকে বলেন যে, আগে না কি বাংলায় যাত্রার আসরে বিশুদ্ধ ভারতীয় নাচের চলন ছিল, কিন্তু তখন থাকলেও আজকালকার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টির মধ্যে তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বাংলার জাতীয় নাচ বলতে যে বাউল নাচকে বোঝায় তা'র মধ্যে তো উচ্চ আর্টের নামগন্ধও নেই। সংকীর্ত্তনে এক রকম নাচের চলন আছে বটে কিন্তু তাও নাম করবার মত নয়।

এ ছাড়া ঝুমুর, নেড়ানেড়ী, খেমটা প্রভৃতি নাচও দিশী বটে কিন্তু তা এত নীচুদরের এবং রুচি হিসেবে তা এত

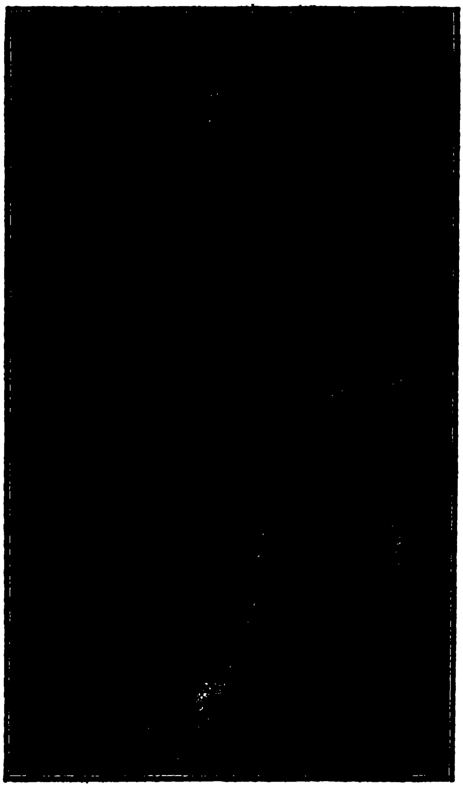


ভারতীয় নাচের ভঙ্গীতে আনাপাভ্‌লোভা

জঘন্য যে যত শীগ্‌গীর দেশ থেকে তার চিহ্ন একেবারে লোপ পাবে, তার কুৎসিৎ লজ্জা থেকে দেশও তত শীগ্‌গীর মুক্তি লাভ করবে।

এই ত' ভারতীয় নৃত্যের অবস্থা! অনেকে বল্‌তে পারেন নাই বা থাক্‌লো বাপু, আমাদের দেশে নাচ এবং ভালো

নাচের চলন. জীবনের সঙ্গে ও জিনিষটার এমনই বা কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর সভ্য-অসভ্য সকল দেশের সকল সমাজেই যে দেখতে পাই নাচ বস্তুটি তাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশিয়ে আছে, এ কেন? জীবনযাত্রার পথে নাচের কি কোনই প্রয়োজন নেই? নাচ জিনিষটা আর কিছুই নয় কেবল গতির ছন্দ; মানুষ এই যে



শ্রীরাগিণী দেবী
(আমেরিকার কলারসিক সমাজে ইনি ভারতীয় নৃত্যকলা দেখিয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন)

প্রগতির পথে চলেছে তার জীবনযাত্রার রাস্তাটা ধরে, এর মাঝে তার গতিকে উৎসাহে সতেজ কোরে তোলার জন্যে একটা আনন্দোদ্দীপক ছন্দের কি কোনই প্রয়োজন নেই? যদি থাকে তাহলে নাচের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার কর্ব্বার তো কোন উপায় নেই। নাচই তো সেই গতিতে ছন্দ যোজনা করে, তাকে সরস ও সুন্দর কোরে তোলে।

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে নাচের প্রচলন হওয়া যে প্রয়োজন, তা প্রমাণ করবার জন্যে পাশ্চাত্য নৃত্যতত্ত্ববিদ্— H. D. Hambly তাঁর Tribal Dancing and Social Development গ্রন্থে বলেছেন,—

Recent research in factories has shown conclusively that a task performed with regular muscular movements is one accomplished with great economy of energy and consequent reduction of fatigue.

এবং তিনি বলেন কাজের মধ্যে এইভাবে ছন্দকে নিয়ে আসার দরুণ তা যেমন সরল হয়ে আসে, জীবনযাত্রার মধ্যে নৃত্যকে সন্নিবেশিত কর্ত্তে পারলে তাও তেমনি সহজ হোয়ে আসবে। কারণ নৃত্য ও ছন্দের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। তিনি তাঁর এই মতের সত্যতা দেখা'বার জন্যে বর্ত্তমান সভ্যজগৎ থেকে দূরে বাস কর্চ্ছে যে সব অনুন্নত জাতি তা'দের জীবনযাত্রাপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই সব জাতি তাদের জন্মথেকে মৃত্যুপর্য্যন্ত জীবনের সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্বভাবে নাচকে কেমন করে গ্রহণ ক'রে তাদের অনাড়ম্বর জীবনকে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সমাবেশে প্রভূত আনন্দবোধের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করে।

তারা শিশুর জন্ম-দিনে, প্রথম সামাজিক জীবন গ্রহণের উৎসবে, বিবাহে, সাময়িক আনন্দোৎসবে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ধর্ম্ম-সাধনায়, উপাসনায়, পিতৃপুরুষের স্মৃতি-তর্পণে, পৌরোহিত্যে, আহার ব্যাপারীয় সমস্ত অনুষ্ঠানে, যেমন শীকার মাছ-ধরা কৃষিকার্য্য বর্ষা-উৎসব প্রভৃতিতে, অসুখের সময় রোগ তাড়াবার জন্যে, এমন কি মৃত্যুর পর মৃতের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময়ে পর্য্যন্ত নাচকে কোথাও বাদ দিয়ে চলেনি— এবং এর ফলে বিশেষ লাভবানই হয়েছে—জীবনের অনেকখানি আনন্দ থেকে তাদের বঞ্চিত হ'তে হয় নি।

সামাজিক জীবনকে সুন্দর কর্ত্তে হোলে, তার মধ্যে নাচকে গ্রহণ করা যে একান্ত প্রয়োজন, শ্রীযুত A. R. Brown তাঁর "The Andaman Islanders" বইতে তা' এই ভাবে বলেচেন—

"The psychology of dancing offers a wide field for study.·········

The dance produces a condition, in which the unity, harmony and concord of the community are at a maximum."

শ্রীমতী E. A. Rout নারীর দেহতত্ত্ব ও দৈহিক ক্রিয়াদি



ইন্দ্র-নৃত্য—উদয়শঙ্কর

সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি Sex and Exercise বলে একখানা বই লিখেছেন, তাতে বলেছেন যে প্রাচীনকালে নাচ সমাজের মধ্যে অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকায় তখনকার মেয়েদের বিশেষ কতকগুলো মাংসপেশী এখনকার মেয়েদের চেয়ে ভালভাবে পুষ্ট হ'বার সুযোগ পেতো এবং তাতে করে তাদের শরীর মাতৃত্বলাভের বেশী সহায়ক ভাবে গড়ে উঠ্‌তো। তা ছাড়া নাচে যে রীতিমত ব্যায়াম হয় তার দ্বারা তাদের সাধারণ স্বাস্থ্য তো ভাল হোতই।

এইটে বিশেষজ্ঞদের মত। একে না মান্‌বার কোন উপায়ও নেই, কারণও নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কি ব্যক্তিগত কি সামাজিক উভয়বিধ জীবনেই নাচ জিনিষটার প্রয়োজন আছে। এবং যে প্রয়োজনীয়তাকে অনেক বড় বড় মনীষী মিলে বিশেষ চেষ্টায় প্রমাণিত কোরেছেন, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অনুন্নত লোক তাকেই কেমন সহজ অনুভূতি দিয়ে বোধ করেছে এবং গ্রহণ করেছে।

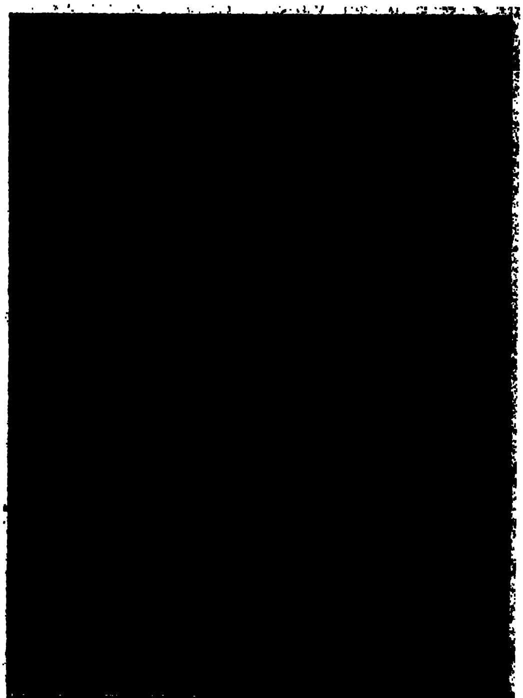
প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্যে প্রাচীন প্রস্তর যুগের যে মূর্ত্তি পাওয়া গেছে তাতেও এক-একটী সুন্দর নাচের ভঙ্গি দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং তাতে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগেও নাচের প্রচলন ছিল। এবং শুধু যে প্রচলন ছিল তাই নয়, নৃত্য-কলার যথেষ্ট উন্নতিও হয়েছিল। Fritz Weege বলে একজন জার্ম্মান নৃত্যতত্ত্ববিদের প্রাচীন নৃত্য সম্বন্ধে একখানা বই আছে,—'Der Tanz in der Antike.'। ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে প্রাচীন যুগের নাচের যে সব ক্ষোদিত নিদর্শন পাওয়া যায়, তার অনেকগুলি ছবি তাতে তিনি ছেপে দেখিয়েছেন যে তখনকার নাচ কত সুন্দর ছিল। তার এক একটী phase এত সুন্দর যে তা আয়ত্ত করা এখনকার নামজাদা একজন নাচিয়ের পক্ষেও গৌরবের কথা। যাঁরা জীম্‌নাষ্টিক করেন তাঁরা Arch হওয়া Peacock হওয়া প্রভৃতি শক্ত শক্ত কসরৎ দেখান, সেগুলি প্রাচীন ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতির নাচের মধ্যে এক একটী সাধারণ ভঙ্গি ছিল। অবশ্য Weege প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের আলোচনা করেন নি। তা' যদি কর্ত্তেন তা' হলে তিনি দেখ্‌তেন ভারতীয় নৃত্যের মধ্যেও এ সবের স্থান ছিল। সে সব ভঙ্গির ক্ষোদিত নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাচীন ভারতে Peacock হওয়ার নাম ছিল গঙ্গাবতরণম্‌, Arch হওয়ার নাম ছিল অতিক্রান্তম্‌ প্রভৃতি, যদি ও ভারতীয় নৃত্যকলার চরম বিকাশ আবার এইতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং ভারতীয় উচ্চতম নৃত্যের অনির্ব্বচনীয় সুষমার কাছে এ সব কসরৎ উল্লেখযোগ্যই নয়।

যে যাই হোক, যে নৃত্যকলা যুগে যুগে সর্ব্বদেশে এইভাবে মর্য্যাদা পেয়ে এসেছে, অশ্রদ্ধার সঙ্গে তার চর্চ্চাকে ত্যাগ করে আমাদের ভারতবর্ষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় নি।

অথচ এই ভারতবর্ষেই একদিন নাচের যথেষ্ট আদর ছিল। প্রাচীন বৈদিক যুগেই এদেশে রীতিমত নাচের চলন ছিল। সে যুগে পুরুষ ও মেয়েরা এক সঙ্গে নাচত। বৈদিক অনুষ্ঠান 'মহাব্রত যজ্ঞে'—মেয়েরা গোল হয়ে সারি বেঁধে নাচ্‌ত। ঋগ্বেদে 'আঘাটী' অর্থাৎ মন্দিরা বাজিয়ে নাচের উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে নাচ গৃহস্থাশ্রমে খুব প্রচলিত ছিল। কেবলমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানেই যে নাচের প্রচলন ছিল তা নয়, নিছক আমোদের জন্যে গোল হয়ে সারি বেঁধে নাচাও—মেয়েদের মধ্যে খুবই চলিত ছিল। মহাভারতে আছে, মৃত্যুশয্যায় ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে নাচ, গান, বাজনা প্রভৃতি শিখ্‌তে উপদেশ দিয়েছিলেন। তা'ছাড়া অর্জ্জুন যে নাচ-গানের ওস্তাদ ছিলেন এবং বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাসের সময়ে তাঁর অন্তঃপুরে মেয়েদের নাচ-গান বাজনা শেখাতেন একথা সবাই জানেন। শান্তনুর সাম্‌নে গঙ্গাদেবী নাচ্‌তেন। বলরাম রেবতীর সঙ্গে, কৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে, অর্জ্জুন সুভদ্রার সঙ্গে নাচ্‌তেন। যাদবেরাও নিজের নিজের স্ত্রীর সঙ্গে নাচ্‌তেন। রামায়ণেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, সুন্দরী মেয়েরা রামচন্দ্রের সাম্‌নে নাচ্‌তেন।

ভারতের সর্ব্বত্র এবং বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে মহাদেবের অসংখ্য নটরাজ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই নটরাজ মূর্ত্তির একটী বিশেষ অর্থ আছে। শাস্ত্রমতে মহাদেব হচ্ছেন নটরাজ—নট বা নর্ত্তকদের প্রধান উপাস্য। শোনা যায় তাণ্ডবের মধ্যে দিয়ে তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ, তাঁর এই পাঁচটী বিশেষত্বকে প্রকাশ করেন, যা'র পঞ্চ প্রতিমূর্ত্তি হচ্ছেন—যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর ও সদাশিব।

মহাদেব নিজের শক্তিকে মন ও জড়পদার্থের ভিতর বিকীর্ণ ক'রে দেন এবং তা'দের ভিতর নৃত্য-লীলা জাগিয়ে তোলেন। তাঁর নাচের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মায়ার ফাঁদ থেকে অসংখ্য মানবাত্মাকে মুক্তি দেওয়া। কুমারস্বামীর —"The Dance of Shiva" হইতে নটরাজ মূর্ত্তির বিস্তৃত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে—তা'তে এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জান্‌তে পারা যা'বে। তা'হলেই দেখা যাচ্ছে, এই ভারতবর্ষ একদিন নৃত্যকলাকে এতখানি সম্মান দিয়েছিল যে, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে আরাধ্য দেবতার উপরও তাকে আরোপ কর্ত্তে ছাড়েনি। তাছাড়া বিবিধ উপাখ্যানে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরার, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরকন্যা প্রভৃতির, এমন কি সেদিনকার মনসার গানে বেহুলার পর্য্যন্ত নাচের উল্লেখের অভাব নেই।



তরবারি নৃত্য—উদয়শঙ্কর

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই নাচ আজ বিকৃত অপহৃত। তবে একেবারে হতাশ হ'বার কারণও নেই,—চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, প্রভৃতি অপরাপর কলার মত এ কলাটীরও আবার উন্নতিসাধন করা একেবারে অসম্ভব নয়। চোখের সাম্‌নে তার প্রমাণ রয়েছে সমস্ত পাশ্চাত্য-জগৎ। যদিও বর্ত্তমানে এদেশ অনিন্দনীয়ভাবে নাচের চর্চ্চা কর্চে কিন্তু তবুও তারও এ অবস্থা চিরকাল

ছিল না। পূর্ব্বে য়ুরোপে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান সমূহে উপাসনা প্রভৃতির সময় মেয়ে-পুরুষের একত্র নগ্নদেহে নাচের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে এই নাচের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব এসে পড়ায় ক্রমে নানাবিধ ব্যভিচার দেখা দিতে আরম্ভ করে। সুতরাং ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান সমূহের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে সেখান থেকে নাচ নির্ব্বাসিত হয় ও ফলে শীঘ্রই সে দেশে নাচের রীতিমত অবনতি ঘটে। তারপর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপের আধুনিক নৃত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এবং মাত্র কিছুদিন হোল রেমণ্ড ও ইসাডোরা ডান্‌কান দুই ভাই ও বোনের চেষ্টায় গ্রীস, রোম, মিশর প্রভৃতি দেশের প্রাচীন মন্দির প্রভৃতিতে ক্ষোদিত ভাস্কর্য্য দেখে পুরোনো নাচের ভঙ্গিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং ও বিষয়ে আরও উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে।

নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করলে—আমাদের দেশেও ঐভাবে আবার লুপ্ত নৃত্যকলার পুনরুদ্ধার সাধন করা যেতে পারে। ভাস্কর্য্যে ও চিত্রকলার প্রাচীন নৃত্যভঙ্গির অজস্র উদাহরণ তো রয়েছেই, তা ছাড়া এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের লেখা বইয়েরও অভাব নেই। নারদের সঙ্গীত মকরন্দ, নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকর, ভরতের নাট্য-শাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে নৃত্যকলার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এমন জিনিষ আছে, সামান্য মাত্র পরিশ্রমে যা'র সামান্য অংশও আয়ত্ত কর্ত্তে পারলে সারা জগতকে স্তম্ভিত করে দিতে পারা যায়।

সাহিত্যের কাজ

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত বি-এ

ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—নিজেকে ভূমার সঙ্গে বৃহত্তের আনন্দের সঙ্গে এক করে পাওয়াতেই সুখ; ক্ষুদ্র সহজ-ব্যাপারের সীমার অনুভূতির মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রাখাতে সুখ নেই। বিচিত্র—'বহু', অনির্ব্বচনীয়—'এক' থেকে নেমে এসেছে, সেই পরম একেরই ইচ্ছায়। বহুর সার্থকতা একের মহিমা ও গরিমাকে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা, পূর্ণ করে পাওয়া, একেরই গোপন-ইচ্ছা-উদ্‌যাপনের আধারক্ষেত্ররূপে নিজেকে পেতে দেওয়া। নিজেকে হারিয়ে ফেলা নয়, এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আবার একের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করা। বৈচিত্র্যের বহুধা গতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললে নিজের খণ্ড অস্তিত্বের সঙ্গেই শুধু পরিচয় ঘটে; তাকে আবার পূর্ণ পরিচয়ও বলা যেতে পারে না। কারণ, চেতনার ভার-কেন্দ্রকে 'নেতি' 'নেতি' করে যদি উপরে তুলে নেওয়া না যায় তা'হলে যেমন ঊর্দ্ধের আবিষ্কার সম্ভব হয় না তেমনি আবার 'ইতি' 'ইতি' করে নেমে না আসলেও শুষ্কশাখা নব ফুলফলে মুঞ্জরিত হয় না। এখানেই এক ও বহুর সামঞ্জস্য ও সার্থকতা। তেমনি সাহিত্যিকেরও আছে একটা সর্ব্বজনসম্মত লক্ষ্য এবং পৃথক পৃথক সাধকের সেই লক্ষ্যকে আবিষ্কার এবং প্রকাশ করিবার বিশিষ্ট পন্থা। চরম-মোহানাকে বিস্মৃত হয়ে কোনও নাবিক যদি একটা নদীপ্রবাহের মধ্যস্থলে ক্রমাগত সামনে পেছনে চলতে থাকে অথবা একটী কেন্দ্রের চারিপাশে কেবলি ঘুরতে থাকে তাহ'লে কি বুঝতে হবে না যে তার যাত্রা সেখানে লক্ষ্যহীন বা অন্ততঃ গতিহীন হয়ে পড়েছে? তেমনি সাহিত্য-স্রষ্টাও যদি বিবর্ত্তনের একটা সু-উচ্চ সীমাকে লক্ষ্যের মধ্যে না রাখেন বা রাখ্‌তে না চা'ন তাহ'লে তিনিও হয়তো উপরি-উক্ত নাবিকের মতো কোনও সিদ্ধিতে পৌঁছতে পারবেন না।

স্থিতির মাঝে উন্নতি নেই, তাই তা'তে আনন্দও নেই। একটা বড় কিছুকে আয়ত্ত করেও মানুষ কোনদিন বলেনি যে আর অগ্রসর হয়ো না—এই-ই

তোমার কল্পলোকের শেষ প্রান্ত। এক জায়গায় স্থিতি —একই বিষয়ের বর্ণনা ও আলোচনা—হৌক সে বহুভঙ্গিমায়, বহুমূর্চ্ছনায়—কল্পনারও একান্ত বিরোধী। কারণ, কল্পনা কবির কাছে চিন্তার বিলাস মাত্র তো নয়, সে যে সত্য-শিব-সুন্দরের intuition। বৃহত্তম কল্পনার অধিকারী, দূরতমপ্রসারী কল্পনার দ্রষ্টা—সে যে ব্রহ্মা স্বয়ং—তাই তিনি ঋষিদের চোখে শ্রেষ্ঠ কবি। কল্পনার কাজই হ'ল সামনে অগ্রসর করিয়ে দেওয়া। মানুষ যখন আবিষ্কৃত ও আস্বাদিত পরিবেষ্টনের মধ্যে আনন্দের ঐশ্বর্য্য আর খুঁজে পায় না, তখন সে কল্পনার আলোকে ও প্রেরণায়—কলম্বসের মহাদেশ আবিষ্কারের ন্যায়—নূতনতর সৃষ্টির জন্য, নব নব আনন্দলোক উদ্ভাবনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠে।

কিন্তু সমস্যা এইখানে যে নাবিক বা সাহিত্যিক যদি জানতে না পারে যে তার পথ চলা আনন্দ হ'তে আনন্দে পরিক্রমণ করছে কিনা—কোথাও ভাবের আতিশয্যে দুকূল-প্লাবী হয়ে, কোথাও শান্ত সংযমে ভাবঘন হয়ে, কোথাও সিদ্ধির মোহানায় অব্যর্থ ঋদ্ধিমান হয়ে—তবে তাহার সমস্ত প্রয়াস একটা বেদনাময় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'তে পারে।

তাই সাহিত্যিকের নিজের কাজ সম্বন্ধে sincere হওয়া প্রয়োজন। তবে এ sincerity মানে প্রতিপাদ্য বিষয়টাকে নিখুঁতভাবে আদর্শের অনুযায়ী মনোরম করে গড়ে তোলা মাত্র নয়, পরন্তু সাহিত্যের চরম যে কাম্য, শ্রেষ্ঠ ফল, তার দিকে লক্ষ্য রেখে, তাকে মনের উদয়াচলে রূপে রাগে ফুটিয়ে তুলে সৃষ্টি কতদূর সার্থকতা লাভ করছে তাও ভাব্‌তে হ'বে।

তারপর একটা গোটা মানুষের সমগ্র সত্তাকে যদি জাতীয় সাহিত্য আনন্দের খোরাক না জোগাতে পারে তবে তা'কে পঙ্গু বলতেই হ'বে। শুধু হৃদয়ের বা অনুভবের ক্ষেত্র মানুষের সবটা নয়। তবে এটাও ঠিক যে মানুষের হৃদয়টাই তা'র চৈত্য-সত্তাকে (inner soul) পিছনে রেখে তার হাসি-কান্না, সুখ দুঃখ, আনন্দ-আবেগের আশ্রয়ভূমি হয়ে সাহিত্যের দর্পণে নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে চায় এবং তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া গীতাঞ্জলি যে পড়েছে সে যে পঞ্চদশী বা কর্ম্মযোগ পড়ে কোন আনন্দ পাবে না তা' বোধ হয় কেউই স্বীকার কর্বেন না। মনে হয় passive দার্শনিকতা ও active কর্ম্মপ্রবৃত্তি এই দুই extreme-এর হাত থেকে, দুই বিভিন্নমুখী ঝোঁকের কবল থেকে মানুষকে একটা স্নিগ্ধ মধুর শান্ত-সুন্দর মধ্য-পথ দেখিয়েছে তা'র সেই ধরণের সাহিত্য বা নিছক হৃদয়বৃত্তি দ্বারা যুগে যুগে সৃষ্ট হয়েছে। Psychology হিসাবে যেমন মানুষ জ্ঞানের ভাস্বরতা এবং কর্ম্মের প্রচণ্ডতাকে হৃদয়ের মধুরতার মধ্যে সম্পুটিত করে, আনন্দের দ্বারা মণ্ডিত করে নিতে চায়, তেমনি সত্য সাহিত্যিকও মানুষের জ্ঞান ও কর্ম্মের বিষয় এবং প্রয়োজনকে আনন্দের রসে সঞ্জীবিত করে ধরতে পারেন; শুধু তাই নয়, প্রেমের অনুভূতি ও আনন্দই হয় তাঁহার হাতে জ্ঞানের উজ্জ্বল শিখা এবং কর্ম্মের অব্যর্থ অঙ্গুলি-সঙ্কেত।

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত



জরার রাজপাট

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ

শ্রাবণগগনে যখন কালো মেঘ এলোচুলে ফিরিতেছিল তখন আকাশের দিকে চোখ্ রাখিয়া এক যুবক কি দেখিতেছিল! মিশ্ কালো আকাশের গায়ে ঐ কি দেখা যাইতেছে—একটি পথভোলা গোছের বক যেন মাঝ-গগনে উদাসভাবে উড়িতেছে। যুবক গুণ-গুণ করিয়া আনমনা আবৃত্তি করিল—

বলাকা বাঁকিয়া নভকোণে ঘুরে
চিকণতারকা সম!

তারকার ন্যায় ঝিলুকঝলমল আলো জ্বালাইয়া কাজল-নভে বলাকা কেমন উদাসসুর হাওয়ার মধ্যে বুনিয়া দিতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চক্ষুতে যেন কিসের পরশ ছুঁইতেছিল, কর্ণে যেন কোন্ সুদূর নভকোণের গোপন গান লাগিতেছিল। কিন্তু এই মৌন মিলন আচম্‌কা ভাঙ্গিয়া গেল। পিছন হইতে কে তাহার কানে কহিল—"ঐ দেখ, তোমায় কে ডাকিতেছে।" যেমন চুপি চুপি বলা অমনি লুকাইয়া যাওয়া! অত উঁচু আকাশের গা হইতে চোখ ফিরাইয়া যুবক দেখিল দক্ষিণে বামে কোথাও কিছুই নাই—সকলদিকের খোলাখুলির মধ্যে সে একলাটি। কিন্তু তাহার উদাসবিভল সুখতন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, জীবনের সুর অত উঁচু হইতে সহসা স্খলিত হইয়া শিশিরের ন্যায় এপাশ-ওপাশে ছড়াইয়া পড়িয়া গেল! একটা কেমন যেন মন-কেমন-করা গোছের গোলাপী নেশায় প্রাণের প্রান্ত পর্য্যন্ত ছাইয়া আসিল। ডাকিল কে, কেনই বা ডাকিল জিনিসটা মানুষ মাত্রকেই একটু নাড়া দেয়। যুবক ডাকিল—"আমাকে কে ডাকিলে সাড়া দেও—সাড়া!"

দুর্গ-প্রাকারে সে শব্দের প্রতিঘাত জাগিল—সাড়া! যুবক যেখানে দাঁড়াইয়া আকাশ-নিরীক্ষণতৎপর ছিল। সে স্থানটি লতাবিতানমধ্যবর্ত্তী একটি নয়নশোভন পুষ্পোদ্যানের শেফালি-ঢাকা শেফালি বৃক্ষের ঠিক নীচে। অদূরে অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া এক ভাঙা দুর্গের খিলান দাঁড়াইয়াছিল। সে দুর্গ-দেয়ালের সকল প্রকার আত্মরক্ষার শক্তিই বিলুপ্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু অতীতের আভিজাত্য একেবারে বিস্মৃত হইতে না পারায় কোনরূপ জোরাল আওয়াজ হইলে তন্মুহূর্ত্তেই তে‌ালস্বরে ইহার একটা জবাব দিয়া থাকে। সেই দেয়ালের দিকে একটু ভ্রূটানাগোছের চাওনি চাহিতেই যেন আবছায়ার মত দেয়ালের গায়ে কি লাগিয়া আছে দেখিতে পাইল! তখন সন্ধ্যা ঘনাইতেছিল—শ্রাবণের শুক্ল-পক্ষের সন্ধ্যা। ফুলের সাজি হইতে ফুল ছড়ানর মতন মেঘাপগমে আকাশের গায়ে পলকে পলকে তারার সারি কে যেন অলক্ষ্যে ছড়াইতেছিল। এই তারার ওড়নাখানি গায়ে দিয়া যখন জ্যোৎস্না-রাণী ফুল্লযৌবনা, তখন গত-সুষমা সন্ধ্যাময়ী নীরূপা সতীনের মত যেন ঈর্ষ্যায় দুঃখে মরমে মরিয়া গেল। সন্ধ্যাবিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে যুবকের মনে কি এক পূর্ব্বশ্রুত রাগিণীর আলাপন জাগিয়া উঠিল!

দেওয়ালের গায়ে ছায়ামূর্ত্তির মত একটি অস্ফুট আকার ক্রমে ক্রমে যেন স্পষ্ট হইতে লাগিল, উহার দিকে যুবকের দৃষ্টি যতই আকৃষ্ট হইতে লাগিল ততই সেই মূর্ত্তিটির গঠন যেন পরিপুষ্ট হইতে চলিল। চিত্রকরের হাতে পরিকল্পনা যেমন রঙ ফলানর সঙ্গে সঙ্গে সাবয়বা হইয়া উঠে, এখানেও তেমনি যুবক যত গভীর মনোযোগের সহিত দৃকপাত করিতেছিল ততখানি উজ্জ্বল হইয়া সেই মূর্ত্তিটিও ফুটিয়া উঠিতেছিল। চক্ষে পলক লাগিল কি মূর্ত্তিটিও মিলাইয়া গেল—এ ত বেশ এক অদ্ভুত ব্যাপার! আবার যুবক ভ্রূটানা-চোখে চাহিল আবার সে মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে কেমন একটা খটকা জাগিল—একি হইতেছে? সে যেন এ ব্যাপার আধ-আধ জানে—ঈষৎ মনে পড়িতে চায় অথচ চায় না—এ মূর্ত্তি কি ঠিক ঠিক, না অন্য কিছু? যাহা দেখিতেছে

সে বাস্তব, না স্বপ্নলোকের কোন জীব? না না সে ত স্বপ্ন দেখিতেছে না—এই কিছুকাল আগে সে আকাশে বলাকা দেখিতেছিল; সে ত তখন নিদ্রিত ছিল না, আর এখনও নয়। যদি প্রশ্ন উঠে প্রমাণ? প্রমাণ দেওয়া শক্ত, কারণ যে ঘুমাইয়া আছে সে কেমন করিয়া জানিবে যে সে নিদ্রিত যতক্ষণ না জাগিতেছে! তখন যুবক চিন্তা করিল, নিদ্রিত ইচ্ছা করিতে পারে না যে আমি জাগিব, তবে সে নিদ্রিতই নয়। সুতরাং প্রশ্নের মীমাংসা হইল না, সে নিদ্রিত না জাগরিত।

মীমাংসার লহর এলোমেলো যতই ছড়াইতে লাগিল ততই সে একটা জিনিষ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইল যে, সেই দেয়ালের কল্পিত মূর্ত্তির বিষয় আর পর্য্যবেক্ষণ করা হইবে না। সে কিছুই দেখিতে চাহিল না—যাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনের মধ্যে একটি সন্ধান জাগিতে লাগিল। একদিন শ্রাবণের ঘন বর্ষণের পর সে যেন সুরম্য এক দুর্গপ্রাকার শোভিত সুবিশাল অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল······মনের মধ্যে সেই ছবিটি ঈষৎ ভাসিয়া উঠিল। বাহিরে যেমনি তাহার চক্ষু দেয়ালের দিকে ধাইল অমনি দেখিতে পাইল—একি সে ভাঙ্গা দেয়াল নাই, তাহার স্থলে মণিময় ঐশ্বর্য্যঝলমল এক দুর্গবলয় দাঁড়াইয়া আছে। ভিতরে বৈজয়ন্ত প্রাসাদ তুল্য হীরকশীর্ষ সৌধ জ্যোৎস্না-সায়রে ভাসিতেছে।

সে ত বিস্ময়ে অবাক—একি হইল? সে চক্ষু মুদিল—কেমন যেন তাহার মনে হইতে লাগিল—এক শোভাযাত্রা আসিতেছে। চাহিল,—ঠিক ঠিক, তাই ত—ঐ কিসের গুঞ্জরণ বাতাসে ভাসিতেছে,—দূরে বহুদূরে পণবমৃদঙ্গের সহিত নাকাড়ার কড়া আওয়াজ একটু ত্রিমি ত্রিমি তালে শুনা যাইতেছে—বহুলোকের পদচারণার অস্ফুট ধ্বনি ইহাদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া বেশ শুনাইতেছে। ক্রমে সে শোভাযাত্রা নিকটতর হইতে লাগিল এবং ইহার অগ্রভাগ বড় বড় মশাল আলোকে উজ্জ্বল হইয়া দেখা যাইতে লাগিল। প্রশস্ত রাজপথে এ জনযাত্রা কার উদ্দেশে রওনা হইয়াছে? দেখিতে দেখিতে সে লোক-সংহতি আরও নিকটে আসিয়া পড়িল। একটা পাতলা মেঘের ক্ষণিক গতিতে শিশির রয়ার ন্যায় মৃদু এক পশলা বৃষ্টি হইল—আলোগুলি নিস্প্রভ হইয়া আবার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সে জনতা যেন উদ্যানের পথ ধরিল—তাহারা কি এ দিকে আসিতেছে তবে? যুবক বিহ্বল হইয়া গেল—তাই ত! এই সোরগোল আলোকের রোশনাই নৃত্যবাদ্য সকলই তাহার অভিমুখী—এখন উপায়?

পলায়নের কোন পথ নাই—ধরা দিতেই হইবে? কিন্তু ইহারা এ দিকে আসে কেন? তাহার প্রতি ইহাদের কি গূঢ় অভিসন্ধি আছে? সে মনে মনে খানিক চিন্তা করিল কিন্তু কোনও প্রকার কিনারা হইল না—মনে যেন সে কথাটা একেবারেই স্ফুট হইতে চাহিল না। দেখিতে দেখিতে সে জনস্রোত তাহার শেফালি-আস্তরণের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। যতই ইহারা নিকটতর হইতে লাগিল ততই সেই যুবক শেফালি বৃক্ষের নীচে একেবারে কোণ-ঘেঁষা হইয়া রহিল। সমগ্র মিছিলটি যেন তাহার গা ঘেঁসিয়া চলিয়াছিল—কাতারে কাতারে পদাতিক, পশ্চাতে সারি সারি অশ্বারোহী, ইহার পিছনে সাতরঙ হস্তিসমূহের সচল তোরণাবলি যেন কোন স্বপ্নে-চলা ঘুমন্ত নগরীর মত রাজপথে আন্দোলিত হইতেছিল। সর্ব্বশেষে আসিতে লাগিল প্রেক্ষার সারি। অগ্র পশ্চাতে বহু শিবিকার মধ্যে কনককেয়ুরমণ্ডিত এক রথের উপরে ছিল এক রত্নদোলা—ইহা সমগ্র শোভাযাত্রার ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘাস্বরূপ। স্ফটিক বর্ত্তির মালা পরিয়া কিংখাপের পর্দ্দা ঘেরা হইয়া এই রত্ন-দোলায় যিনি আছেন তিনিই যে এ শোভাযাত্রার প্রাণস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার উদ্দেশে ধবলচামর ব্যজন হইতেছে—মণিময় ছত্র রাজশ্রী ঘোষণা করিতেছে—তাঁহারই প্রাণের পুলকশিখা সমস্ত শোভাযাত্রার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিনি কে? যুবকের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া সেই রত্নদোলার প্রতি যখন মগ্ন হইল তখন দেখা গেল কিংখাপের গির্দায় ঠেস খাইয়া এক অভিনব রমণীয়া বিকচকমনীয়া যাহার মুখশ্রী সকল আলোকের শিখা নিভাইয়া আপনি নিভাননী। তাহার চক্ষু স্পন্দিত হইয়া সহসা মুদিয়া গেল—এ কে? মনে যেন পড়ে অথচ পড়ে না, দেয়ালে আবছায়া মূর্ত্তির মধ্যে যে চিত্র সহসা জাগিয়া একটা পূর্ণাকার দেখিয়াছে—সেই কাহিনীটা বিস্মরণ-লোকে

হইতে এ পর্য্যন্ত সে চিন্তার পথে ভাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আর ত মনে পড়ে না।

মিছিল অতি ধীরমন্থর তালে মন্দাক্রান্তছন্দে চলিয়াছে—গজমতিহার বক্ষে দুলাইয়া সালঙ্কারা সাভরণা মনের সাধে মালা গাঁথিতেছে—সহসা তাহার চম্পকাঙ্গুলির ফাঁক দিয়া একটি ফুল ছিটকাইয়া পড়িল—অমনি কমললোচনার চক্ষু উহার অনুগামী হইল। সে ফুল আসিয়া যুবকের ভ্রূযুগমধ্যে তিলকের টিপের মত ছুঁইতেই যেমনি সে কাঁপিয়া উঠিল অমনি শেফালিগাছে সে কাঁপন লাগিয়া একটি ফুল ঝরিল—সে ফুল সেই ললাম ললনার বুকে গজমতিহারে আসিয়া লাগিল। যাহা বিদ্যুৎঝলকের স্থায় নিমেষে ভাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে কথায় জগতে ফুটাইতে কত না সময় লাগে! নিমেষে এ ফুলদৌত্য ঘটিয়া গেল—ফুলশর লইয়া যাহার লীলাখেলা সে পুষ্পধন্বা একটু হাসিলেন।

সহসা মিছিল থামিয়া গেল। নায়িকার একটু চক্ষুর ইঙ্গিতে সকলের গতি থামিয়া গেল—ঘোড়া থামাইতে যেমন একটু রাশ টানিতে হয় তেমনি অমরবর্ণিনীর একটু চোখের চাহনি। দূতীর পর দূতী নামিতে লাগিল—ইহারা কোন্ পুরীর পুরন্ধ্রী? ইহাদের এক হাতে মঙ্গল ঘট, অপর হাতে হেমঝারি। ইহারা অগ্রে জল ছিটাইতে ছিটাইতে চলিল, পশ্চাতে এক মেঘবরণ তাঞ্জাম বাহকস্কন্ধে মৃদু মন্দ হেলিতে দুলিতে আসিতে লাগিল। যুবক যেখানে সেই ললনার পুষ্পাহত হইয়া স্বপ্নরাজ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতেছিল ঠিক সেখানে পুরস্ত্রীরা মঙ্গল ঘটের জল ছড়াইতে ছড়াইতে কখন যে তাহাকে অবলীলাক্রমে সুকোমল হস্তে তাঞ্জামে বসাইয়া দিল সে ইহা ভাবিতেও পারিল না!

আবার দামামা বাজিল—আবার পদাতিক পদ-সঞ্চালন করিল—আবার অশ্বের হ্রেষারব ছাড়িল এবং হস্তী শ্রেণীর কণ্ঠে রৌপ্যঘণ্টাগুলি মধুর ছন্দে বাজিয়া উঠিল। শোভাযাত্রার সর্ব্বপশ্চাতে মেঘদ্যুতি তাঞ্জামে বসিয়া যুবক কেবলি ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল? কোথায় ছিলাম, এখানে কেনই বা আসিলাম? ইহারা কারা—আমাকে কোথায় বা লইয়া যাইবে? হায় হায়—আমি কেন এখানে আসিলাম? ঐ রূপময়ী কে? আমাকে যাদু-মুগ্ধ করিল কি? ঠিক তাহাই হইয়াছে—আমার সত্তা ভুলিয়া যাওয়ার কি সঙ্গত ব্যাখ্যা থাকিতে পারে? কিছুই না—আমি মায়ার ফাঁদে পড়িয়াছি। এইরূপ কত কি ভাবনায় শুধু তাহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইল, কিন্তু সে মনের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিল ঐ যে আকাশে খসে-যাওয়া তারার স্থায় ফুলটি তাহার ভালে পরশ ছুঁয়াইল, সেই হইতে সে যেন ইন্দ্রজালের আকর্ষণে ধরা দিয়াছে। এখন সে স্থির করিল তাঞ্জাম হইতে সে আর পলায়নের পথ খুঁজিবে না, সে দেখিতে চায় মায়ার খেলা তাহাকে কোথায় নিয়া পৌছায়।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া শোভাযাত্রা সেই সুবৃহৎ প্রাসাদের সিংহদ্বারে আসিয়া থামিল। দুর্গতোরণ হইতে নাকাড়া বাজিল আর অমনি পদাতিক রথিক ও অশ্বারোহীরা আপন আপন সেনাশিবিরে ফিরিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে শোভাযাত্রা মিলাইয়া গেল, সুরগোল থামিয়া গেল এবং আলোর রোশ্‌নাই থামিল। একাকী মেঘবর্ণ তাঞ্জামে বসিয়া যুবক যেন কোন্ স্বপনপুরের অভিনয় দেখিতেছে। যখন রাজপথ একেবারে শূন্য হইয়া গেল তখন হেলিতে দুলিতে সে ধবলবাহনটি সিংহদ্বার পথে ঢুকিল। যেখানে ইহা থামিল সেখান হইতে মর্ম্মরসোপান হংসগ্রীবার স্থায় বীণায়িত হইয়া কোন্ রাজ-ভবনের তুঙ্গ শিখরে চলিয়া গিয়াছে। তাঞ্জাম হইতে যেখানে প্রথম পদার্পণ ঘটিবে সেখানে চারু আলিপনায় দুইটি শ্বেত পদ্ম কি সুন্দর অঙ্কিত। তাহারই উপর পা রাখিয়া সে যখন সেখানে দাঁড়াইল তখনই প্রাসাদের বাতায়নে নহবৎ বাজিয়া উঠিল—ভিতরের নূপুরনিক্বণ ও অস্ফুট কলগুঞ্জন ভাসিয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কনককুণ্ডলা নয়নমনোহরা সখিরা চন্দ্রমুখে ঈষৎ মেঘাবরণের স্থায় নিবীত উড়াইয়া শ্রোণীতে রশনা পদে নূপুর বাজাইয়া সোপান অতিক্রম করিতে করিতে যে নৃত্যের ঢেউ তুলিতেছিল তাহার হিল্লোল যুবককে একেবারে বিহ্বল করিয়া দিল।

তাহাকে ঘেরিয়া ইহারা এমনি তালে নৃত্য তুলিল যে কোন সম্ভাষণের বা আলাপনের প্রয়োজন হইল না, যুবক আপনা আপনি সোপান হইতে সোপানান্তরে স্বচ্ছন্দে যাইতে লাগিল। যখন প্রাসাদ শিখরে যুবকের পা ঠেকিল অমনি

বিদ্যুৎ ঝিলিক যেমন করিয়া আকাশে মিলাইয়া যায় এই সব পুরাঙ্গনারা তেমনি ত্বরিৎ কোথায় মিলাইয়া গেল! নাটকে দৃশ্যের যেরূপ ক্ষিপ্রগতি তেমনি এ দৃশ্য মিলাইতেই নূতন পট উঠিল, প্রেক্ষাগৃহ হইতে যেন নূতন নটেরা আসিয়া দাঁড়াইল। দৌবারিকেরা সসম্মানে তাহাকে অভিবাদন করিল—সে আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল শত কক্ষে সশস্ত্র রক্ষী অস্ত্রের ঝনৎকার তুলিয়া টহল ফিরিতেছে। সে দেখিল সকলের মধ্যে সেই সেলাম কুর্ণীশের অতিমাত্রায় ব্যঞ্জনা—তাহাকে দেখিয়া সকলে চমকিত হইতেছে, সভয়ে ভূমিলুণ্ঠিত হইতেছে—ইহার অর্থ কি?

পশ্চাৎ হইতে কে কহিল—"এ দিকে প্রভুর শুভাগমন হউক"। চাহিয়া দেখিল এক অতি বৃদ্ধ, সে জানু পাতিয়া করজোড়ে কহিল—"প্রভুর জন্যে বালাখানা সাজাইয়া আসিয়াছি, যদি দয়া করিয়া সে কক্ষে পদার্পণ হয় তবে রুচি অনুরূপ পোষাক দিয়া ধন্য হই।"

যুবক একটু হুকুম দেওয়ার স্বরে কহিল—'চল'।

বালাখানা শালদোশালায় জরির পোষাকে একেবারে জল্ জল্ করিতেছে, ইচ্ছানুরূপ সে আপন বেশ আপনি করিল—হীরক-খচিত উষ্ণীষ মাথায় বাঁধিয়া যখন সে দাঁড়াইল তখন তাহাকে দেখিতে কেমন হইল বলা হয়ত কঠিন হইত, কিন্তু যখনি সে তোষাখানা হইতে বাহির হইবে অমনি সেই রাজবেশরক্ষী বৃদ্ধ একেবারে ঘরের গালিচা অবধি মাথা নীচু করিয়া কহিল—"অধিরাজের এদিকে মর্জ্জি হউক!"

সে আর একটি কক্ষ—প্রসাধনের সকল সম্ভারে উহা একেবারে ভরপূর। ধূপ গুগ্গুল জ্বলিতেছে—একটু ধূঁয়া নীহারিকার ন্যায় বড় বড় স্ফটিক-বর্ত্তিকাগুলিকে ঘেরিয়া কেমন যেন অস্ফুট রহস্যের মত ঠেকিতেছে। প্রসাধন-কক্ষে প্রবেশ করিতেই পশ্চাৎ হইতে তোষাখানার দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। যুবক চাহিয়া দেখিল সে বৃদ্ধ আর এখানে আসে নাই, আসা হয়ত বেয়াদপী। তাই তাহাকে আর ডাকিল না। সে এখন একেবারে একাকী—গবাক্ষপথে চাহিয়া দেখিল তারা জ্বলিতেছে—চাঁদ হাসিতেছে—পার্শ্বের আম্রকাননে দোয়েল মিঠা সুর ভাঁজিতেছে। সকলি নিখুঁত—একটা সচকিত দৃষ্টি সহসা পর্দার আড়ালে পড়িল! ঐ কে—একখানি মুখ না? যুবক শিহরিয়া উঠিল। ভ্রূটানা দৃষ্টি ফেলিয়া দেখিতে লাগিল—দেখিল তাহার মাথার উষ্ণীষের হীরক যেমন জ্বলিতেছে, সেখানেও তেমনি; তাহার উষ্ণীষের মল্লিকাক্ষ-পুচ্ছ যেমন ঈষৎ বিকম্পিত হইতেছে সেখানেও তেমনি—তাহার ওষ্ঠাধরের যে মৃদু কম্পন সেখানেও সেই। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার ন্যায় তাহার মুখে হাসি ফুটিল—ওঃ এ যে আমি! এ নিশ্চয় তবে খুব বড় আয়না। সে যতই কাছে যাইল ছবিখানি ততই মিলাইতে লাগিল। পর্দ্দাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল উহাতে জরির বাদ্লাই শুধু ঝিল্মিল করিল কোনরূপ দর্পণ আবিষ্কৃত হইল না। দেয়ালের ধারে জানালাটির মাথা মুড়িয়া এ পর্দ্দাটি খাটান হইয়াছে। কিন্তু কোনরূপ আদর্শের সংস্থান উহাতে নাই। তবে প্রতিকৃতি পড়ে কিসে? সে যতই পিছাইয়া যাইল ততই ছবিখানি আবার ফুটফুটে হইল।—এ ত তাহারই তস্বীর, কিন্তু আঁকিল কে? বড় আশ্চর্য্য ত!

কক্ষের ঠিক মাঝখানে একটি বড় টানা চোখ অত্যন্ত দামী পাথরের টুকরা দিয়া আঁকা ছিল—সে চক্ষের তারা যেন ঈষৎ বেপমানা হইতেছিল, উহার দৃষ্টি যেন এ পর্য্যন্ত তাহার ছবি সে যেখানে দেখিতেছিল সেখানেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুবক স্পষ্ট লক্ষ্য করিল সে চক্ষের তারা যত প্রাবৃত্যমাণ হইয়া অন্যদিকে ঘুরিতেছে ততই যেন তাহার প্রতিকৃতিখানি দেয়ালে মুছিয়া যাইতেছে। ক্ষণিকের মধ্যে সে চক্ষু ঘুরিয়া অপর একটি পর্দ্দাঘেরা জানালার প্রতি স্থির হইল, অমনি যুবক দেখিতে পাইল সেইখানে আর একটি মুখ জাগিয়া উঠিতেছে। এ কে? ইহার মস্তকেও সেই উষ্ণীষ—গায়ে ঠিক তাহারই পোষাক—সকলই এক কিন্তু প্রভেদ শুধু মুখশ্রীতে। সে উষ্ণীষ নাড়িলে তাহার উষ্ণীষ নড়ে না, তাহার ঠোঁট কাঁপিলে সেখানে ঠোঁট কাঁপে না। সে এক স্থির প্রতিমা! পূর্ব্বের ন্যায় সকৌতুকে সে যত নিকটে গেল তত সে ছবি মিলাইয়া গেল—যখন সে গবাক্ষ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল তখন সেখানে একেবারে শূন্য! আবার সে ধীর পদক্ষেপে কক্ষের মধ্যস্থলে আসিলে ছবিখানি বেশ ফুটফুটে হইয়া উঠিল। ক্ষণিকের মধ্যে দেখা গেল সে ছবিখানি যেন হীনপ্রভা হইয়া মিলাইয়া যায় যায় হইয়াছে—অমনি

যুবক সেই পাথরের চক্ষুর দিকে তাকাইল, দেখিল সেখানে আবার দৃষ্টি ঘূর্ণ্যমাণ হইয়া ভিন্নমুখী হইতে চলিয়াছে। কিন্তু যুবক সেই স্তিমিতাননের দিকেই চাহিয়া থাকিল ; ক্রমে সে আকৃতি তলাইয়া গেল। যখন সকল চিহ্ন মুছিয়া গেল তখন যেন সেই অন্তমন স্থান হইতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফুটিয়া বাহির হইল। সে নিঃশ্বাসে যেন স্ফটিকদীপের ঝাড় ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল আর অমনি অতি করুণ অতি ক্ষীণ বিষাদ-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ন্যায় একটি রব উঠিল, "আজ তুমি রাজা, ওগো আমিও এমনি ছিলাম, আমিও এমনি ছিলাম।" বাহিরে একটা নিশাচর পাখী ডাকিয়া উঠিল—যুবকের হৃদয় মধ্যে যেন তুষারশীতল হাওয়া লাগিয়া কেমন একটা কম্পন জাগিল। এ সব কি? কিন্তু ভাবিবার সময় কোথায়? ঐ যে আর একটি মুখ ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেও তবে রাজা? সেও তেমনি ফুটিল মিলাইল এবং মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে সেই এক কথাই শুনাইয়া যুবককে ব্যাকুল করিয়া দিল! দিকে দিকে একে একে রাজারা সব জাগিল আবার মিলাইয়া গেল। সমুদ্রে লহরীমালা যেমন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে আবার ক্ষণিকে মিলাইয়া যায়, তেমন করিয়া অতীতের কুক্ষি হইতে এক একটি রাজা জাগিয়া উঠিল আবার সত্তা হারাইল। কাল যাহাদিগকে করালগ্রাসে টানিয়া লইয়াছে তাহাদিগকে গবাক্ষের ফাঁকে ফাঁকে কোন্ নিপুণ শিল্পী আলেয়ার আলো দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে! ইহারা জলিল, নিভিল—এ কক্ষ কি স্মৃতির মর্ম্মর দিয়া রচিত? তাহার উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু আবার সেই পাথরের মায়া-চক্ষুর দিকে আকর্ষিত হইল। দেখিল সে চক্ষু বিস্ফারিত হইতে হইতে ক্রমে যেন স্তিমিত হইতেছে, অক্ষি-গোলক ক্রমে স্থিরতর হইতে হইতে একেবারে নিস্পন্দ হইতেছে, ক্রমে সে তারা মুছিয়া আসিতে লাগিল আর অমনি স্ফটিক-দীপমণ্ডলী যেন ঈষৎ বিকম্পিত হইয়া স্তিমিত হইয়া গেল—যুবকের চক্ষুতেও কেমন রাবিমা ঘনাইয়া আসিল —তাহার প্রাণে মননে দর্শনে যেন নিদ্রার-নিচল একটা শিথিল তন্দ্রা ঢাকিয়া ফেলিল। পাথরের মায়াচক্ষু মুদিয়া গেল—অমনি সহস্রশিখ স্ফটিকবর্ত্তি যুগপৎ নিভিয়া গেল —এই আলো নিভার সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রায় নিরিবিলিজনে রাজবেশী যুবক অতুল ঐশ্বর্য্যের ঠাটে সহসা ঢলিয়া পড়িল।

ভোরের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একটি বড় গাছের নীচে যুবক জাগিল, উঠিয়া বসিল—পার্শ্বে দেখিল ভিক্ষার ঝুলি পড়িয়া আছে, পরণে দীন ভিখারীর বেশ। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কাল রাত্রে সে রাজার হালে সম্রাটমহালে ছিল এই যে একটি স্বপ্নের পাতা প্রভাতের আলোতে তাহার কাছে যেন ফুটি ফুটি করে সেটি কি? সে কি বাস্তব না স্বপ্ন? সত্য হইবে কেমন করিয়া? —তাহার নিজের দিকে চাহিলেই ত সে ভ্রম একেবারে চুকিয়া যায়! সে দীন দরিদ্র ভিখারী—রাজস্বপ্ন তাহাকে শুধু উপহাস করিবার জন্য ছাড়া আর কি হইতে পারে? এ কথা যত মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলা যায় ততই মঙ্গল কারণ ভিখারীর রাজ-ঐশ্বর্য্য-স্বপ্ন শুধু দুঃখীর দুঃখ বাড়াইতে চায়! গা নাড়া-চাড়া দিয়া যুবক ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া দুয়ারে দুয়ারে হাত পাতিতে বাহির হইল। দিনমণি ঘুরিয়া গিয়াছেন—ভিখারীর থলে পূর্ণ হইয়াছে—সে বাড়ী ফিরিতেছে—এমন সময় আলোকের রোশ্‌নাই দেখিয়া ভাবিল, একি! এ বিশাল সৌধ যে সে স্বপ্নে দেখিয়াছে— এ ত সেই সৌধ! সান্ত্রীর অস্ত্রের ঝনৎকার শুনিয়া সে তাহার চির-পরিচিত পথে বৃক্ষতলে নির্জ্জনে আসিয়া পৌঁছিল। দীন-ভিখারী খায় কি—মুষ্টিভিক্ষার উপরে তাহার জীবন। পেট না খুসি হইলে গতর খাটে না—ঘুম আসে না, তাই খাইতে হয়। রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাখীগুলির কিচির-মিচির অনেক রাত অবধি চলিতে লাগিল।

একটা কিসের ভীষণ শব্দে যেন আধ-ঘুম আধ-জাগা ভাবে সে ঈষৎ চাহিয়া দেখিল—একি? সে কোথায়? সেই চকমিলান বিরাট অট্টালিকায়! সে সেই স্মৃতিকক্ষে না কেমন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—ওঃ তাইত! বড় ঘুম তাহাকে বিভোর করিয়া দিয়াছিল। স্ফটিক দীপালী কেমন উজ্জ্বল হইয়া জলিতেছে—আর ঐ দূরের গবাক্ষশিয়রে তাহার রাজ-রূপ কেমন সুন্দর মিনারদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে! বেশ, বেশ, বড় সুন্দর—সে এই রাজপুরীর রাজা! আচ্ছা, এই

এ কেমন মনে পড়িতেছে সে যেন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া দ্বারে দ্বারে হাত প্যাতিতে বাহির হইয়াছিল—এটা কি? এই দীপালি-ঝলমল রাজভবনে এমন একটা চিন্তা তাহার মনে আসিতে চায় এ কত বড় বেয়াদপী। রাজ-ঐশ্বর্য্য তাহার অঙ্গে উছলিয়া যাইতেছে, তাহার নিকট একটা দীন হীন ভিখারীর রূপ আসিয়া বলিতে চায় যে, এ তুমি—এ কত বড় দুঃসহ প্রবঞ্চনা! সে দুহাত দিয়া এ ভিখারীর চিন্তাকে ঠেলিয়া দিল—কত বড় আস্পর্দ্ধা—আমি ভিখারী! উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে কিংখাপের খাপে তরবারী দুলিয়া উঠিল, ইহার সংলগ্ন সোনার শিকলে কেমন একটু আওয়াজ হইল আর অমনি দ্বার-পথে রক্ষী করজোড়ে হাজির হইয়া জানাইল—"হুজুরের কি হুকুম?"

সগর্ব্বে সে বাহিরে আসিল—দেখিল প্রাসাদের বাতায়নে বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম ঘটিয়াছে, বেশ-ভূষার পারিপাট্য সুরুচি-সম্ভব। ইহারা সকলে মৃদু পদে অস্ফুট আলাপে যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। যেমনি সে বাহিরে আসিল অমনি সকলে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইল। প্রধান অমাত্য নিকটে আসিয়া জানাইল "জন্মতিথির সকল আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে, অধিরাজের শুভাগমন হউক।" যুবক চলিল, অমাত্যবৃন্দ অনুগামী হইল। রাজছত্র মাথার উপর ধরিয়া বাহী চলিল, কিঙ্কর চামর ঢুলাইল—মহা সমারোহে অধিরাজ যাইয়া চন্দ্রাতপের নীচে বসিল, আর অমনি সৈন্যের কুচ্ কাওয়াজ সুরু হইল। রণদামামা বাজিতে লাগিল, এক এক ধরণের ভিন্ন ভিন্ন ফৌজ আসিয়া প্রথমে অধিরাজের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া আপনাদের রণকৌশল দেখাইতে তৎপর হইল। সৈন্যের খেলা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সচিব অধিরাজকে লইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল—তৎক্ষণে দরবার-কক্ষ সম্ভ্রান্ত জনসমাগমে পরিপূর্ণ হইল। চারিদিকে কেবলি লাল নীল উষ্ণীষের বাহার, পরিচ্ছদের গায় উজ্জ্বল মণিরত্নের ঝিলমিলানি এবং ঊর্দ্ধে বিলাস-দীপালীর মেলা। এ যেন দেব-সভা বসিয়াছে। সকলেই যেন বাসবের জন্য অপেক্ষা-কাতর! প্রধান সচিবের সঙ্গে অধিরাজ দরবার-কক্ষে প্রবেশ করিলেন আর অমনি নাকাড়া বাজিয়া উঠিল, নহবতে দরবারী কানাড়ার মীড় খেলিয়া গেল এবং নকীব ফুকারিয়া উঠিল। অধিরাজ যাইয়া রত্নসিংহাসনে বসিতেই দরবার-কার্য্য আরম্ভ হইতে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না।

রাজদরবার প্রারম্ভে অধিরাজের সম্মুখে এক এক জন অমাত্য আসিয়া আভূমিপ্রণত হইয়া সিংহাসনের পাদানিতে থান থান মোহর রাখিতে লাগিল আর নকীব পরিচয় স্বরূপ নাম ফুকারিতে লাগিল। অধিরাজ তাহার দিকে চাহিয়া একটু স্মিতহাস্য করিবামাত্র তাহার নৈবেদ্য গৃহীত হইয়াছে এই ভাবিয়া সে যতই পুলকে বিদায় মাগিতেছে ততই নবোৎসাহে নূতন পূজারী তাহার স্থলবর্ত্তী হইয়া সিংহাসনতলে অর্ঘ্য ধরিতেছে। যাহার একটু হাস্যে প্রাণে পুলকের বন্যা বহিয়া যায় সে ভাগ্যবানের মন এই রাজ ঠাটে থাকিয়াও যেন কিসের অভাব বোধ করিল—এই পদপ্রান্তে লুটান দরবার পাইয়াও তাহার যেন প্রাণ ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিল। এমনি মোতি-ঝলমল আসনে বসিয়া কাহার মালা-গাঁথার ফুল তাহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল—সেই নিভাবরীর মুখ মনে জাগিল! সেই বিজয়িনীই ত তাহার হৃদয় হরণ করিয়া তাহারি জয়-যাত্রায় মিলাইয়াছিল—আজ তাহার ঐশ্বর্য্যের দীপ ঝলমল্ করিয়া জ্বলিয়াছে, কিন্তু সে কোথায় লুকাইল? দরবার আর ত ভাল লাগে না—আমীর-ওমরাহ অমাত্য লইয়া বাদসাহের মন কতখানি ভরে? ইহারা যেন মণিকে খচিত করিবার জন্য শুধু সাটিনের টুকরা মাত্র! যুগ্মনেত্র না হইলে নেত্রের শোভা কই—যুগ্মহৃদয় না হইলে রাজশ্রী বৃথাই। কিন্তু বিজয়িনীর খবর কে বলিবে?

গাছে পাখীরা প্রভাতী অনেকক্ষণ গাহিয়া গাহিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, বেলা অনেক হইয়াছে, গা নাড়া চাড়া দিয়া ভিখারী জাগিল। চাহিয়া দেখিল কোথায় সেই হিরণ্ময় সিংহাসন—সে জীর্ণ কাঁথায় শুইয়া আছে, চক্ষু কচ্লাইয়া স্বপ্নের বিন্দু-গুলি যেন আঁখিপাতা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিল। সে কে?—দীন ভিখারী—যেমনি ছিল তেমনি আছে। এ প্রশ্নের প্রয়োজন কি? সে দশ দুয়ারে হাত পাতিয়া খায়—ইহাতে কি সংশয়! চলন্ত-বর্ষা-মেঘের ন্যায় সে একটা সোনার

স্বপন দেখিয়াছে তাই বলিয়া সে কেন রাজা হইতে যাইবে? দীন ভিখারীর রাজস্বপ্ন দেখা একটা মস্ত বেয়াকুফি—কারণ ইহা মুখ ফুটিয়া বলাতেও দোষ আছে। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া ভিখারী মাগিতে বাহির হইল, রোজ যেমন করিয়া মাগনে বাহির হয়—আজও তেমনি। ইহাতে বৈচিত্র্য আর কিছু ছিল না। দরবার-স্মৃতি যদি চ মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছিল, উহা অবিরত ভিক্ষুকের কাতর ধ্বনির মধ্যে গুলিয়া গেল। আবার রাত্রিতে বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় সে শুইয়া আছে—সমগ্র দিনের পরিশ্রমে গভীর নিদ্রা তাহাকে ঢাকিয়া দিল।

জয় ঢাকের কড়া আওয়াজে তাহার ঘুম যেন ভাঙিল, সে দেখিল দরবার প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সকল দরবারীরা আসন ত্যাগ করিয়া তাকে অভিবাদন জানাইতেছে। আবার দামামা বাজিয়া উঠিল এবং অধিরাজের মনে যে ভিখারীর ছবিটি জাগিয়া উঠিতেছিল তাহা রোলকলা রাজসিকতার ঢেউ-এ ভাসিয়া গেল! দরবারের অবসান ঘটিল, সুন্দর বাদ্য-তরঙ্গের মধ্যে সে দিনের কাজ সমাপ্তি লাভ করিল। অধিরাজ তাহার খাস কামরায় চলিয়া আসিয়াছে, সেখানে আসিয়া দেখে তাহার জন্য সোনার খাটে জরির মশারি খাটান রহিয়াছে, আর ঊর্দ্ধে স্নিগ্ধ আলো জলিতেছে। এ খাটে তাহাকে শুইবার সকল আরাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে! দরবারের ক্লান্তি যেন তাহাকে স্পর্শ করিতেছে, সে এখন আলো নিভাইয়া শুইবে। মশারি তুলিয়া খাটে শুইল কিন্তু আলো নিভান আর হইল না। ক্লান্তি ভরে সে অমনি এলাইয়া পড়িল—তাহার চোখে ঘুম-ঘোর! এমন সময় তন্দ্রাগমের ফাঁকে ফাঁকে যেন নূপুর গুঞ্জরণ শুনা যাইতে লাগিল, তন্দ্রা-ঢুলুঢুলু চোখে যেন ঈষৎ দেখিতে পাইল—মুক্ত দ্বার-পথে চন্দ্রমুখীরা নৃত্যের ছন্দে হেলিয়া দুলিয়া আসিতেছে। তাহাদের মুখ এক-একখানি নীল ওড়না আধেক মুখ ঢাকিয়া, আধ চোখের সলজ্জ চাহনি উদ্ভাসিত করিয়া কি সুন্দর মানাইয়াছে। তারার ন্যায় সারি দিয়া তাহারা অধিরাজকে কোমলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—

"তুমি কেমন বেরসিক, আমাদের রাণীকে দুঃখের হানিয়া এখানে দিব্য আরামে আপন সুখ খুঁজিতেছ; আর ও-দিকে আমাদের সখির অশ্রুজলে চোখের কাজল গুলিয়া বক্ষের গজমোতি কাল হইয়া যাইতেছে! উঠ, এসো!"

নৃত্যের ছন্দে ললনারা তাহাকে মধ্যমণি করিয়া এমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল যে সে পথ স্মরণে রাখা অসম্ভব, আরও বিশেষতঃ ইহাদের অপাঙ্গে যে বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত হইতেছিল তাহাতে একদিকে যেমন পথে পথে দীপগুলি ঝিলিক হানিতেছিল অপরদিকে সঙ্গীর চক্ষুও বিদ্যুদ্দগ্ধ হইতেছিল, সুতরাং পথের নিশানা রাখা বড় শক্ত! যেখানে শত রমণীর হাতে বীণা বাজিতেছিল, তালে তালে হাতের কাঁকন শব্দিত হইতেছিল, চরণে সোনার নূপুর মুখরিত হইতেছিল, আর সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কুসুম কোমল-বুকে মণিহার নিক্বণ তুলিতেছিল,—সেই কক্ষের সমক্ষে তাহাকে রাখিয়া সহচরীরা ত্বরিৎ মিলাইয়া গেল! অধিরাজ সে কক্ষে ঢুকিতেই নৃত্যশীলার চরণ থামিল, কণ্ঠে সুর রেশ হারাইল—নৃত্যের গমক সমস্ত অঙ্গে রুদ্ধ হইয়া শুধু নয়নের চারু-চাহনিতে পরিব্যাপ্ত হইল। সেই খানে আসিয়া সে ত অবাক! ডাহিনে বামে শত পদ্ম ফুটিয়া আছে—উহাদের কাল চিকণ ভ্রূ, মধু-অন্বেষী মধুপের ন্যায় মুখকমলে শোভা পাইতেছে। এমন রূপের হাটে সে যেন সহসা অপ্রতিভ হইয়া গেল, যেন নিজকে অপরাধী জ্ঞান করিল। তাহার আচম্কা প্রবেশে বীণাবেণু সকলি যে থামিয়া গেল!

"নাচ থামিয়া গেল, সুর ঝরিয়া গেল কেন রে?" বীণা-বিনিন্দিত সুরে কে যেন এই কথাগুলি শিশিরের ন্যায় সমস্ত পল্লবকুঞ্জ ছড়াইয়া দিল। "ওগো দেখ দেখ, এই যে কে আসিল!" বলিয়া সুন্দরীরা একধারে সরিয়া গেল। তখন অধিরাজ দেখিল দূরে বহুদূরে বৃহৎ প্রকোষ্ঠের শেষ প্রান্তে মর্ম্মরশুভ্র দেয়ালে পটে-আঁকা ছবির ন্যায় একটি ফুল-দোলের উপর পা ছড়াইয়া নিবিষ্ট মনে এক তন্বী মালা গাঁথিতেছে। একটু চাহিয়াই চিনিতে বাকী রহিল না—এই সেই! তাহার হৃদয়ে দুরু দুরু মেঘমন্দ্র জাগিল। সেই অপরাজিতার যেন মালা গাঁথা আর শেষ হয় না। চিত্রার্পিতের ন্যায় সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সুন্দরীরা কহিয়া উঠিল—"এমনি করিয়া বুঝি

অতিথিকে ভুলিতে হয়? দূতী পাঠাইয়া তাহাকে ত ডাকাইলে, সে আসিল আর এখন তাহাকে কাঙালের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া, ঘটা করিয়া মালা গাঁথায় মজিয়া গেলে? বলিহারী সখি!" এইবার যেন সেই দিব্যাঙ্গনা মুখ তুলিল, উদাস নয়নে যেন কিছু দেখিতে না পাইয়া কহিল "কি রকম, এত অনুযোগ কেন রে?" সহসা যেন তাহাকে দেখিতে পাইল—"এ কে সখি?" সুন্দরীদের হাসির রোল পড়িয়া গেল—"তুমি চোখে কাজল পরিয়াছ, সে কাজল বিরহে চোখের জলে ভিজিয়া ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে—তাই চিনিতে পারিতেছ না—নয় কি?" স্নিগ্ধস্বরে এইবার অপরাজিতা কহিয়া উঠিল—"ওগো, ঠিক বলিয়াছ—এতক্ষণে আমি ঠিক চিনিয়াছি—সেই শোভাযাত্রায় যাহার উপর আমার মালার ফুল পড়িয়াছিল! তোমাদের কি অন্যায়, ইহাকে বসাও নাই। ইহাকে খাইতে সমাদর কর নাই!" তখন সখিরা সকলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল—সেখানে ভোজন-ভাণ্ডার যেন নন্দনকানন হইতে সরবরাহ করা হইয়াছিল, সোনার থালায় স্বর্গের অমৃত পরিবেষণ করা হইয়াছিল। সে যখন অমৃত-আস্বাদনে আত্মহারা, সখিরা চামেলী ফুলের বাস আতরদানি হইতে ছড়াইতেছিল তখন রূপরস-গন্ধে ভরা এই পানপাত্রের পিছনে ছায়ার মত একখানি মলিন হাতে পর্ণপাত্র হইতে আহার করিতেছে এমন একজন দীনভিখারীর মুখ জাগিয়া উঠিল! এ কে? তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল—এই ভিক্ষুকের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? সে কেন উঁকি মারিয়া তাহার দিকে তাকায়?—আবার বেয়াদপী কতখানি, সে তাহারি রূপ ধরিয়া আসে ব্যঙ্গ করিতে! সে অধিরাজ,—একটা পথের কাঙালের সহিত তাহার কি পরিচয়!

আবার তাহাকে লইয়া সখিরা সেই কক্ষে আসিয়া পৌঁছিল। বিজয়িনী তখনো খালি মালা গাঁথিতেছে,—সখিরা কহিল—"একি গো, তুমি ফুলের সহিত ফুল মিলাইতেছ, তোমার হৃদয়ের সহিত আর একজন যে আপনার হৃদয় মিলাইতে আসিয়াছে সে খবর রাখনা বুঝি! আমরা সব চলিলাম!" সুন্দরীর সারি পলকে মিলাইয়া গেল, বিজয়িনী কহিয়া উঠিল—"না না থাক থাক, যেওনা!" কিন্তু অভিমানিনীরা আর ফিরিল না—নিমেষে বুদ্বুদ্ থামিয়া গেল, রূপের চিক্‌মিকানি নিভিল।

"ওরা বুঝি সব চলিয়া গেল—যাক্ ভাল হইয়াছে; রঙ মশাল, শোভাযাত্রা, রাজঠাট এতক্ষণ তোমার ও আমার মধ্যে ব্যবধান রচিয়াছিল, তাই আমাকে দেখিতে পাও নাই—এখন ঠিক তোমার সমুখে আমি একেবারে মুখোমুখী, কেহ নাই—কিছু নাই। বিজন নিরালায় আমরা দু'জনে—আমি ফুলের মালা গাঁথিতেছি, তোমার গলায় পরিবে?" অধিরাজ কি বলিবে? সে কি জাগ্রত না নিদ্রিত! তাহার প্রাণে বসন্ত সমীর খেলিয়া গেল! একি সত্য?

"ভাবিতেছ সত্য বলিতেছি কি না—একেবারে সত্য! যদি বল পারিব, অমনি তপ্ত বাসনার পরশমণি এ কামফুলহার তোমার গলায় আপন হাতে পরাইয়া দিব। কি বল প্রিয়?"

সে কি উত্তর করিবে? ঐ কুসুম-কোমল হাতের পরশ—সে যে অনেক খানি—

"কেন অনেক খানি হইবে? তোমার মনের কথাখানি আমার মনের বীণায় বাজিয়া উঠে—জানো?—পুষ্পিত এই তনু লইয়া সকল সৌন্দর্য্য-সুষমার পরাগ ছুঁয়াইয়া এই মাল্যখানি তোমার গলায় পরাইয়া দিব। কি বলো?"

অধিরাজের মুখে যে কথা ফুটিতে চায়না—সে কি ভাবিবে? সবই যে তাহার জন্য।

"উত্তর করো—পরিবে, কি পরিবে না?"

সে শুধু অস্ফুট স্বরের একটা আভাষ ফুটাইয়া যেন কহিতে চাহিল পরিব!

"মালা পরিবে—বেশ বেশ! এসো কাছে এসো!"

সে যেন বিভ্রমিত কায়ে কাছে সরিয়া আসিল। এত কাছে আসিল যেন সেই কমললোচনার নিশ্বাস-পরিমল তাহার মুখ ছুঁইতে লাগিল—সেই তম্বীর বরবপু যেন অপরূপ মাধুরিমা লইয়া তাহার চোখ মুখ ঝলসাইয়া দিল!

"এই মালা পরিলে কি পাইবে জানো?"

তাহার মুখে ভাষা ফুটিল—"কি"?

"যে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছ—সে পুরী তোমার হইবে, যে সম্ভার পাইয়াছ উহার পরিমাণ বাড়িবে ছাড়া কমিবে না—ভোগের ভাণ্ডার অফুরন্ত হইবে। বিলাস-

জল জল করিবে।" এবার তাহার মুখে আওয়াজ ফুটিল—"সবই যদি দিলে তবে হৃদয়-দোলে শূন্যতা রাখিয়া রাজপাট দিয়া আমাকে বরণ করায় কি সার্থকতা!"

"তুমি আমাকে চাও—এইত! সে কথা জানিতে আমার ত বাকি নাই! তোমার গলায় মালা দিলে, সে মালার ফুলে ফুলে দলবিদলে আমার আমিখানি মিশাইয়া দিব। আমাকেই যদি না পাইলে তবে আর কি দান করিলাম। যাহা কিছু পাইবে সকল তাতেই আমি থাকিব—আমাছাড়া আমার কিছু নাই।"

কথাগুলি যেন প্রহেলিকার জালের ন্যায় এদিক ওদিক ছড়াইয়া গেল। এসব কথার অর্থ কি? সে চায় তাহাকে পাইতে, একথার সঙ্গে অতখানি হেঁয়ালি বুনিলে ভাবের জগৎ আড়ষ্ট হইয়া যায়। "তুমি ভাবিতেছ আমি হেঁয়ালি বুনিতেছি—না না একেবারে নিছক সত্য। তুমি জান আমি কে?"

সে শুধু প্রতিধ্বনি করিল 'কে?' একটি অজ্ঞাত হেঁয়ালীর রহস্য-কুজ্ঝটিকা যেন সেই সুবিশাল বিলাস-কক্ষের দীপগুলিকে অবগুণ্ঠন পরাইয়া দিল—দীপগুলি যেন কেমন স্তিমিত হইয়া গেল। কিসের অজানা কৌতূহলে যেন তাহার মন ব্যাকুল হইল।

"আমি জরা—এই রাজপাট রাজঠাট আমার—এ রাজত্ব আমারি, সৈন্য সামন্ত অমাত্য পৌরজন সকলি আমার,—আমার ইঙ্গিতে ইহারা তোমাকে দোলায় তুলিয়াছিল, তুমি যে বহুমান্যাস্পদ হইয়াছ সে শুধু এ অঙ্গুলি-সঞ্চালনে। চিনিলে আমি কে? এ মালার ফুলে ফুলে আমার রাজপাট লিখা রহিয়াছে—যেমনি তুমি মালা পরিলে অমনি ধনাগার ফৌজ কটক তোমার হাতে আসিয়া পড়িল, সে কি সহজ কথা? রূপের পিয়াসা জাগিবামাত্র আমারই অনুরূপা একটি কেন শত শত পাইবে। এই যে সারি সারি সখিদের দেখিলে, ইহাদের দিকে চোখ তুলিয়া ভাল করিয়া দেখ নাই—তবে বুঝিতে পারিতে দর্পণে নিজ রূপের যেমন পার্থক্য নাই, ইহাদের সহিত ও আমার তেমনি। আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্তে এক হইতে বহু হইতে পারি। তুমি ভাবিতে পার ইহারা সব ভিন্ন ভিন্ন পৃথক—ওগো তা নয়, ইহারা সবই আমি!"

অধিরাজ ত একেবারে থ খাইয়া গেল, তাহার প্রেম-ফুলটি ফুটি ফুটি করিয়া কুঁড়িতে শিথিল রহিল।

"ওগো ভাবিওনা—সত্যই এসব আমি। বিশ্বাস না হয় প্রত্যক্ষ কর, আবার সখিরা আসিতেছে।"

ব্রীড়ার ছন্দে ধান্যশীর্ষের ন্যায় মুখখানি নীচু করিয়া আবার মালা গাঁথায় মন দিল—অমনি কঙ্কণঝঙ্কার নূপুররণরণির সহিত বাজিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে ললিতারা সকল কক্ষে পদ্মবন ফুটাইয়া পূর্ব্ববৎ সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস তুলিল—অধিরাজের মন নবীন মেঘের ন্যায় ভাসিয়া গেল। ইহাদের মুখে চোখে সেই একেরই লাবণ্য, একেরই বিকাশ—শত সরোবরে যেমন একচন্দ্রের প্রকাশ। গানের রেশ থামিতে থামিতে বিদ্যুতীরা সব তেমনি মিলাইয়া গেল।

"দেখিলে ইহারা সকলি আমি—আমা হইতেই বাহির হইয়াছিল আবার আমাতেই মিলাইয়া গেল। আশ্চর্য্য কিছু নয়—এ আমার স্বভাব। এ যেমন দেখিলে তেমনি এই বিশাল রাজপুরীও আমারি অঙ্গীভূত। উর্ণনাভ যেমন করিয়া আপন অঙ্গ হইতে জাল বুনিয়া আপনি উহাতে গোপনে বসিয়া থাকে—এ রাজপাট রাজঠাট—ফৌজকটক সকলি তেমনি আমার আমিত্ব হইতে উদ্ভূত—ইহাদের সব রচনা করিয়া আমি নিগূঢ় ভাবে বসিয়া আছি। এখন আমাকে চিনিলেত? ফুলের মালা গলায় পরিলে যতদিন এ ফুল না মলিন হয় ততদিন রাজ-টীকা তোমার ভালে লগ্ন থাকিবে, যেমনি ঝরিবে তেমনি তোমার সুখ মরিবে।"

যুবক শিহরিয়া উঠিল "উঃ"—কিন্তু জরা কহিতে লাগিল—"না হইয়া উপায় নাই, ফুল ফোটে ঝরে তাই নিয়া জরার খেলাধূলা—ইহার বাহিরে যাইতে আমার শক্তি নাই। আমি দিব ততখানি যতখানি আমার আছে, তার বাড়া দিবার আমার কি অধিকার?"

তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—প্রেমের মুকুল ত্রাসে শুকাইয়া গেল—এ মালা গলায় পরিলে কি হইবে তাহাত মায়া-চক্ষু দেখাইয়াছে—সেই রাজাদের মর্ম্মভেদী হাহাকার। সে ছবিখানি মনে জাগিয়া তাহার মনে যতই শঙ্কার প্রলয়-ডঙ্কা বাজিতে লাগিল ততই চলচল অর্দ্ধ-আবরী জ্যোৎস্নার ন্যায় ছড়াইয়া জরা কহিতে লাগিল—"এসো এসো এসো—

আরও নিকটে এসো! আমার হাত ব্যথা হইয়া গেল, মালাখানি গলে পর ত প্রিয়তম!"

এই অতি-ব্যস্ততায় তাহার মনে হইতে লাগিল পাছে শিকার পলাইয়া যায়, তবে মাকড়শার যে ক্ষিপ্রতা এখানেও সেই। সে স্পষ্ট বোধ করিল যেন একখানি সোনার সূতায় বানানো একটি জালে তাহাকে ফেলিবার জন্তে এত ধড় উদ্যোগ আয়োজন—এত মধুর সম্ভাষণ! সে পিছাইয়া যাইবে—নিশ্চয়! এক পা পিছাইয়া আসিল!

"ওকি কর? এ মালা পরিবে না?"

সে তাহার মুখের দিকে চাহিল—ওঃ কি ভয়ঙ্কর সুন্দর সে তনিমা—এমন একখানি মুখ পাইলে বুঝি বা সে সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারে। আবার এক পা অগ্রসর হইল। সে রূপ চায়—মালা পরিবে। কিন্তু মালায় যে বিষধর সাপ শুইয়া আছে। ওঃ নাঃ—আবার পিছাইল—আবার সে বিলোল চাহনিতে যেন আকৃষ্ট হইয়া আগুয়ান্ হইল—এই দোটানায় বেচারীর অবস্থা দেখিয়া মহীয়সী জয়া একটু স্মিতহাস্ত করিল—"এমনি সৃষ্টি!"

রোদ আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে ভিখারী জাগিল। দেখিল বৃক্ষতলে তাহার ভিক্ষার ঝুলি, জীর্ণ কন্থা সকলি তাহাকে ভিক্ষার পথে টানিতেছে, আর মনে স্বপ্নের রেশ রাজপুরীর দিকে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। আবার দোটানা! সে স্থির করিল এখানে আর থাকা হইবে না। জয়ার রাজপুরী যেদিকে ছিল তাহার বিপরীত দিকে সে কত রাত্রি কত দিন যে চলিল তাহা হিসাবের খাতায় একেবারে অস্পষ্ট!

শেফালী গাছের নীচে যেখানে যুবক দাঁড়াইয়া শ্রাবণ গগনে বলাকা দেখিতে দেখিতে সহসা কাহার অস্ফুট আহ্বান শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ফুকারিয়াছিল—"আমাকে কে ডাকিলে সাড়া দাও, সাড়া" এবং দুর্গকন্দরে যে আঘাত প্রতিঘাত করিয়াছিল—"সাড়া", ঠিক সেই গাছের নীচে যুবক যেন সাক্ষিকের জন্য উৎসুক হইয়া জাগিতেছে এইরূপ বোধ করিল। সে দাঁড়াইয়াছিল শ্রাবণ-সন্ধ্যায়, দেখিতেছিল বলাকা, আর এখন উষার আভাষ আকাশে ফলিতেছে,—সে ছিল সোনার গোধূলি আর এ হইল কনক উষা। আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল, যেখানে বলাকা দেখিতে পাইয়াছিল সেখানে প্রভাতের শুকতারা জল জল করিতেছে। তন্দ্রার আবরণে থাকিয়া স্বপন-পুরের যাহা যাহা সে দেখিয়াছে তাহা যেন ভাসিয়া আসিতে চায়—ইহারা সবই যেন সেই ভাঙা খিলানের মধ্যে লুকাইয়া আছে। ঐ দুর্গপ্রাকারে সে যে ছবিখানি সর্ব্ব-প্রথমে দেখিয়াছিল এবং চিনিতে তখন পারে নাই তাহাকে এখন চিনিতে পারিল—এ সেই কাজলা নদীর তীরের জয়া। প্রভাতের সমীরে তাহার গা কাঁটা দিয়া উঠিল! সে যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিল পূর্ব্বজন্মের তাহার জীবনের অধ্যায়টি এখানে যেভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহারই একটি সজীব চলচ্চিত্র তাহাকে খুলিয়া দেখান হইল। তখন ছিল সে ভিখারী, জয়া তাহাকে রাজপাট দিতে চাহিয়াছিল, সে-ও লুব্ধ ছিল। এ জন্মে মণিমহালে তাহার সে রাজশ্রী-লাভ ঘটিয়াছিল কিন্তু জয়ার স্বরূপ-দর্শনে সে বৈরাগ্য-পাথারে ভাসিয়া আসিয়াছে। প্রভাত পরিস্ফুট না হইতেই সে সেই নির্জ্জন প্রান্তর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

একটি শ্রাবণী সন্ধ্যায় যে কাহিনী সুরু হইয়াছিল উহা নিশি-ভোরে আসিয়া, স্বপ্ন যেমন জাগরণের তীরে ধাক্কা খাইয়া অবসান হয়, তেমনি প্রভাত-তপনে ঠেকিয়া অবসান হইল। আখ্যানভাগ স্বপ্নের তন্তু দিয়া বোনা, বেদান্তে "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" সূত্রে মায়িকী সৃষ্টির বিকাশ আছে, উহা বৃহদারণ্যকের মন্ত্রে অনুপম ভঙ্গিতে বর্ণিত হইয়াছে—

"অথ ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে।"

স্বপ্নের উপাদান যেমন নিদ্রা, কারণ নিদ্রা না হইলে স্বপ্ন দর্শন হয় না, তেমনি স্বপ্নময় এই সংসার-সৃষ্টির উপাদানও মায়া।

"মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।"

মায়া সকল অলীক ফাঁদ ফাঁদিয়াছে, ঊর্ণনাভের তন্তুর মত মিথ্যা বিকারের বৈচিত্র্য বাড়াইয়াছে, মাকড়শার জালের জাল ফেলিয়া মায়া খেলিতেছে। জয়ার রাজপাট মায়ারই খেলা।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের চূড়ার মন্দিরশ্রেণী

শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার বসু এম্-এস্-সি

কাথিওয়াড়ের দক্ষিণে পালিতানা রাজ্য। পালিতানার অনতিদূরে শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের দুইটী চূড়া সুরক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য মন্দির-শীর্ষ লইয়া যমজভগ্নীর মত পাশাপাশি সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। মনে হয় যেন আকাশের উপর এই মন্দিরের সহরটী বেবিলনের শূন্যোদ্যানের মত, কোলাহলময় জগতের সমস্ত দুঃখ কষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া পরিপূর্ণভাবে শান্তি উপভোগ করিতেছে। পাহাড়টী উচ্চতায় প্রায় ২০০০ ফিট। পাহাড়ের উপর হইতে একটা রাস্তা ২।৩ মাইল নামিয়া আসিয়া পালিতানার রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে।



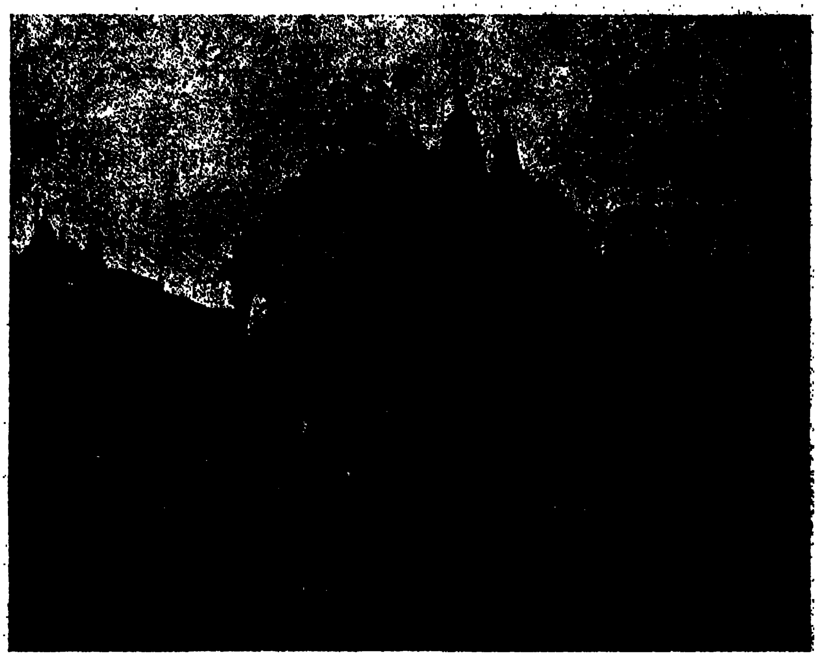
শত্রুঞ্জয়-পাহাড়ের দক্ষিণের চূড়ার মন্দিরশ্রেণী

জৈনদের আদিগুরু আদিনাথ বা বৃষবনাথের নামে যে প্রাসাদোপম মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত তাহা দক্ষিণের চূড়ার সমস্তটা জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। পাহাড়ের উপর আরও প্রায় ২৩টি জৈন গুরুদের মন্দির আছে। জৈনদের বিশ্বাস ইঁহারা পৃথিবীকে পাপ হইতে ত্রাণ করিবার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রত্যেক মন্দিরের অন্ধকার গর্ভে আদিনাথ, উজিত অথবা অন্য কোন তীর্থঠাকুরের এক বা একাধিক প্রস্তরগঠিত সৌম্য শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি স্থাপিত। রৌপ্যনির্ম্মিত প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে মূর্ত্তিগুলি অস্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ধূপ ও ধূনার গন্ধে চতুর্দ্দিক সর্ব্বদা আমোদিত থাকে। স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিতা মন্দিরের সেবিকারা অনাবৃত পদে নিঃশব্দ পদচারণে সুমধুর ভজন গাহিতে গাহিতে গোল হইয়া নৃত্য করিয়া এক মোহময় রাজ্যের সৃষ্টি করে। শত্রুঞ্জয় জৈনদের একটী পুরাতন ও শ্রেষ্ঠ মন্দির ও নির্ব্বাণকামীদের প্রথম ও চরম তীর্থ।

আশীবৎসর পূর্ব্বে কিনলক্ ফরবস্ সাহেব এই মায়াময় পর্ব্বতকে যেমন অবস্থায় দেখিয়াছিলেন ঠিক তেমনিভাবে আজও সে মায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। অশ্লীলতা মন্দিরের ছায়াও স্পর্শ করে নাই। একমাত্র মন্দিরের পূজারিগণ ব্যতীত পর্ব্বতের উপর অন্য কেহ বাস করে না।

বৌদ্ধদের মত জৈনরাও কোন দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন পুণ্যাত্মা জৈন অথবা তীর্থঠাকুরগণ জন্ম হইতে জন্মান্তর গ্রহণের সময় এই পাপময় পৃথিবীকে কোটী কোটী বৎসর হইয়া যাইবে। শত্রুঞ্জয় রাখি এই দীর্ঘ কালের সঙ্গে লড়াই করিয়া এখনও জীবিত আছেন ও তাঁহার স্থানমাহাত্ম্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে জৈনরা যখন নিরীশ্বরবাদী তখন তাহাদের মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা কি? এই জন্যই উহারা দুইটি বেশ বড় দলে বিভক্ত। এক সম্প্রদায় মন্দির ও মূর্ত্তির উপাসক, অন্য সম্প্রদায় ইহার বিরোধী। প্রথম সম্প্রদায়ের যে কোন বুদ্ধিমান লোককে যদি মূর্ত্তিপূজার যৌক্তিকতা



প্রধান মন্দিরের চূড়া

পাপমুক্ত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আদিনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত তীর্থঠাকুরদের জীবনী আলোচনা করিলে তাঁহাদের আয়ু ও শরীরের দৈর্ঘ্য ও বিভিন্ন তীর্থ-ঠাকুরগণের জন্মের মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্বন্ধে এমন সব আশ্চর্য্যজনক ও অসম্ভব কথা পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমানকালের কুজ্ঝটিকাগণ হিংসায় ফাটিয়া মরিতে পারেন। তাঁহারা বলেন আদিনাথ ৮৪,০০০০০ লক্ষ বৎসর আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইভাবে সমস্ত তীর্থঠাকুরগণের বয়স একত্র করিলে

সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যায়—তিনি, তাঁহার মতের পোষকতা করিয়া বলিবেন যে তাঁহারা বাস্তবিকই মূর্ত্তিপূজা করেন না। কেবল মাত্র মনের স্থিরতা আনয়নের জন্য মূর্ত্তির নিকট অবনত হইয়া তাঁহাদের পুণ্যময় জীবনের কার্য্যাবলী ও অমূল্য উপদেশ স্মরণ করিয়া থাকেন। মূর্ত্তি তাঁহাদের নিকট প্রতীকমাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই সব মূর্ত্তি মস্তকও মুক্তোপরিহিত কিংবা অনাবৃত অবস্থায় কাহাকেও মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এমন

নানাপ্রকারের জটিল প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—যথা, স্নান, অভিষেক, ফুল ও স্বর্ণহীরা জহরতাদির দ্বারা সজ্জা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই সম্প্রদায়ের জৈনরা মূর্ত্তিকে তীর্থঠাকুরদের প্রতীক বলিয়া গণ্য করে এবং তাঁহাদের মূর্ত্তিতে তাঁহাদের আবাহন করে। ইহা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, কারণ প্রত্যেক তীর্থঠাকুরই নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ভগবানে লয় প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রে বৃষ্টিবিন্দু পতনের



পার্শ্বনাথের মর্ম্মরমূর্ত্তি

মত নির্ব্বাণলাভের পর আত্মার নিজের বিশিষ্ট কোন সত্তা থাকিতে পারেনা। সুতরাং মূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার অস্তিত্বের কোন অর্থ থাকেনা। অপরদিকে ধুন্দিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা এই সম্প্রদায়কে মূর্ত্তিপূজক বলিয়া গণ্য করে কারণ উহারা হিন্দুদের বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি গ্রহণ করার ফলে এই সকল মূর্ত্তি তাহাদের মন্দিরে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

জৈনদের মধ্যে পৌরহিত্যের প্রচলন নাই—শিক্ষাগুরু আছে। মন্দিরের পূজার অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণ কিম্বা অন্য যে কোন জাতির লোকদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে।

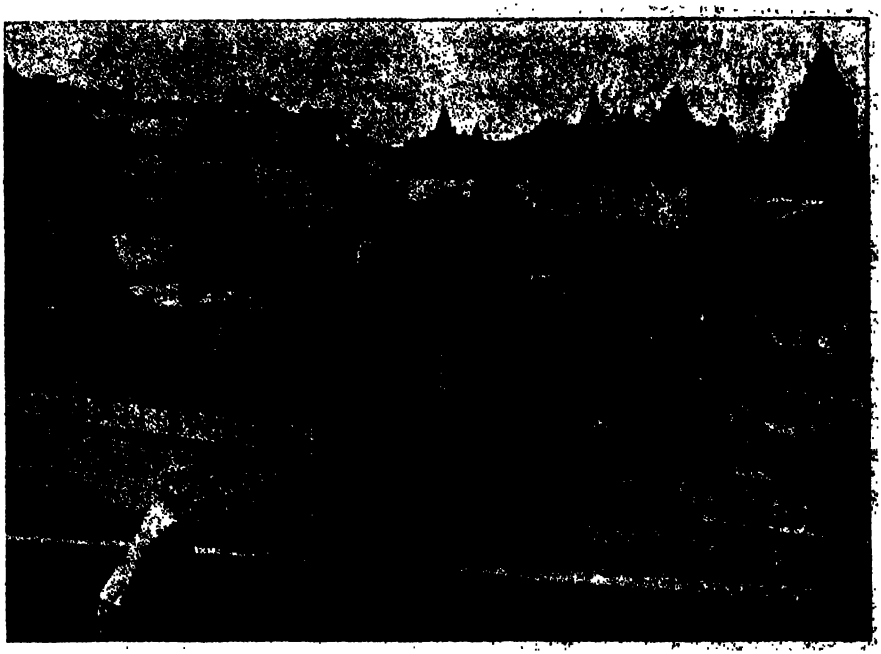
পীতবস্ত্র-পরিহিত শিক্ষাগুরু সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা ভিক্ষাদ্বারা আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। রন্ধন করা, অর্থ স্পর্শ করা বিবাহ করা, কিম্বা রাস্তায় কাহাকেও প্রণাম করা তাহাদের শাস্ত্রে নিষেধ।

গুজরাট ও কাথিওয়ারের মুসলমান অভিযানের সময় জৈনদের মন্দিরগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তারিখাঙ্কিত ভগ্ন মর্ম্মরনির্ম্মিত পরবর্ত্তী কালের অনেক মন্দির পাওয়া যায়। মূর্ত্তিভগ্নকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জৈনরা তাহাদের প্রধান প্রধান ধর্ম্মমন্দিরের উপর ছোট ছোট মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

যাত্রীর ভীড় দিনরাত্রি লাগিয়াই আছে তবে উৎসবের সময়ের ভীড় কল্পনাতীত, দৃশ্য অতুলনীয়। রঙ বেরঙের পোষাকে স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা কলহাস্যে পাহাড়ী পথ মুখরিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সমস্ত দুঃখ কষ্ট যেন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে। এমনকি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও পাহাড়ে পায় হাঁটিয়া উঠিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। মেয়েদের কেহ কেহ ডুলিতে চড়িয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে পীত কিম্বা শ্বেত বস্ত্র পরিহিত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনীরা যাইতেছে। পথে অনেক গোঁড়া ভক্তের সাক্ষাৎ মিলে যাহারা শাস্ত্রের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া থাকে। স্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহারা রেশমী রুমাল দ্বারা মুখ ও নাক বেশ করিয়া বাঁধিয়া লয়, পাছে মূর্খ পোকাগুলি তাহাদের আত্মহত্যা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদের নাক কিম্বা মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বসে!

স্ত্রীলোকেরা তামার পাত্রে চন্দন ও কুঙ্কুম লইয়া অঙ্গুলির দ্বারা সোপানের উপর ছিটাইয়া দেয়। সোপান বাহিয়া পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া মন্দিরের গলিগুলি ও বিভিন্ন মন্দির শ্রেণীর মধ্যস্থিত তোরণগুলি অতিক্রম করিয়া আদীশ্বর-মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যায়। শ্বেত ও রক্তবর্ণের চন্দ্রাতপের নীচে এক বিশাল জনতা সমবেত হইয়াছে। প্রজ্বলিত ধূপ ও ধূনার গন্ধে বায়ু আমোদিত

হইয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ও সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনা-সঙ্গীত মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মাদকতার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে যেন রূপ, বর্ণ, গন্ধ, হীরা-জহরতের প্রতিযোগিতা লাগিয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গণের কোন এক প্রান্তে ফুলওয়ালারা-ফুলের নানাপ্রকারের অলঙ্কার দর্শনার্থী যাত্রীদের কাছে বিক্রয় করিতেছে। যাত্রীরা দেবতাকে অর্ঘ্য দিয়া চরিতার্থ হইতেছে। পূজারী মূর্ত্তিকে স্নাত ও সজ্জিত করিতেছে।



শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের দুই চূড়ার মধ্যস্থিত মন্দিরশ্রেণী

পীত কিম্বা রক্তবর্ণ-কটিবস্ত্র পরিহিত স্বর্ণহার ও বলয়ে সজ্জিত মন্দিরের পূজারীরা গলায় রেশমী চাদর জড়াইয়া চন্দন ও কুঙ্কুমের থালা লইয়া ব্যস্তভাবে মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে ছুটিয়া চলিতেছে। এই সুঠাম ও সুন্দর মূর্ত্তি চিত্রকরের তুলির উপযুক্ত। মন্দিরাভ্যন্তরে স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকারা নতজানু হইয়া ভক্তি-গদগদচিত্তে প্রার্থনা-সঙ্গীত গাহিতেছে। সিংহাসনের উপর রক্তবর্ণ গোলাপের মালায় সজ্জিত হইয়া ঋষভ দেবের বিশাল মর্ম্মরমূর্ত্তি ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বসিয়া আছে — হস্তদুখানি পদ্মাসনের ক্রোড়ে স্থাপিত। উৎসবের দিনে মূর্ত্তিকে বহুমূল্য হীরা জহরতের অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়— মস্তকে কিরীট, হস্তে কঙ্কণ, মণিমুক্তাখচিত মালা গলায় শোভা পায়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মন্দিরগুলির একটা বিশেষত্ব। হিন্দুমন্দিরের তুলনায় ইহাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধবধবে সাদা বারান্দা ও স্তম্ভগুলি ও চকচকে মন্দিরের মেঝে দর্শকদের বড় আনন্দ দান করে। পাহাড়ের উপর মূর্ত্তির সংখ্যা দশহাজার হইবে এবং প্রতিবৎসর বাড়িয়াই যাইতেছে। প্রত্যেক জৈনই সক্ষম হইলে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে কারণ তাহাদের বিশ্বাস, মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাতা সেই মূর্ত্তি-উপাসকগণের পুণ্যের অংশগ্রহণের অধিকারী হয়।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

ইণ্ডিয়ান্ ষ্টেট্ রেলওয়ে ম্যাগাজিনের সৌজন্যে।

পুস্তক-পরিচয়

১

"বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ"—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি-আই-ই লিখিত ভূমিকা। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, কলিকাতা, ১৩৩৮। পৃষ্ঠা ১২২; দাম এক টাকা। সুন্দর পরিষ্কার ছাপা, সুদৃশ্য বাঁধাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে ব্রজেন্দ্র বাবুর উদ্যম যে শুধুই প্রশংসনীয়, তাহাই নয়; বোধ হয় এই দুরূহ পথে অগ্রণীদের তিনি অন্যতম। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে যে ধৈর্য্য, যে বিচার ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা, যে পক্ষপাতশূন্য বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি থাকা প্রয়োজন, তাহার প্রত্যেকটিই ব্রজেন্দ্রবাবুর আছে; এবং রামমোহন রায় ও বাংলার সাময়িক পত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই যে-সমস্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানাদি তিনি করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাহার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বাংলা দেশে আজ তিনি সুপরিচিত, এবং তাঁহার শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যতে যখন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস লেখা হইবে, ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুসন্ধানের মূল্য তখনই আমরা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিব; আজ শুধু তিনি সেই ভবিষ্যত ইতিহাসের উপাদান মাত্র সংগ্রহ করিয়া যাইতেছেন। সেই উপাদান ছড়াইয়া আছে সরকারী দপ্তরের কাগজ-পত্রে, প্রাচীন কীটদষ্ট সাময়িক পত্রের পাতায়, বিভিন্ন সাধারণ ও ব্যক্তিগত পাঠাগারের জীর্ণ পুঁথি ও পাণ্ডুলিপিতে। ব্রজেন্দ্রবাবু এই দুরূহ কাজে যে ধৈর্য্য ও একনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় দিতেছেন, তাহার জন্য তিনি বাঙালীর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জনের অধিকারী হইয়াছেন।

তাঁহার "বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ" মহানুভব বিদ্যাসাগরের জীবনী নহে। বাংলা ভাষায় তাঁহার জীবনচরিতের সংখ্যা একাধিক; কিন্তু কোনো চরিত-লেখকই বাংলাদেশে শিক্ষা-বিস্তার কার্য্যে তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তির কথা সবিস্তারে আলোচনা করেন নাই। প্রধানতঃ এই অভাব পূরণের জন্যই "বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ" রচিত হইয়াছে। ইহার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক সংস্কৃত-শিক্ষার সংস্কার, সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন, বাংলা-শিক্ষা প্রচলনে বিদ্যাসাগরের চেষ্টা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার কীর্ত্তি, এবং গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা হিসাবে ও স্বাধীন কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে শিক্ষাসংস্কার ও বিস্তৃতির ব্যাপারে তাঁহার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারও পরিচয় আছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর বইখানির বিশেষত্ব এই যে, এই আলোচনা ও পরিচয় দিতে গিয়া তিনি কোনো শ্রুতি-স্মৃতির উপর নির্ভর করেন নাই; আমরা আজকাল যাহাকে একান্ত ভাবে ঐতিহাসিক উপাদান বলি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছেন। "বাংলা ও ভারত গবর্ণমেণ্টের দপ্তর-খানায় অনুসন্ধানের ফলে, শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী এবং বেসরকারী পরামর্শদাতা রূপে বিদ্যাসাগরের যে পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল, সেগুলি আমার হস্তগত হয়। প্রধানতঃ এই সকল অপ্রকাশিত চিঠি পত্রের সাহায্যেই 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনচরিতকারগণ কেহই এই অমূল্য উপাদানের সন্ধান পান নাই।" ব্রজেন্দ্রবাবুর ভাষা সরল, ও লিখিবার ভঙ্গী সুন্দর। এই বইখানা বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের কাছে আদর পাইবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের ভূমিকাটি সুন্দর ও সুলিখিত। বিদ্যাসাগরের জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি অতি চমৎকার অজ্ঞাত আখ্যায়িকা এই ভূমিকাটিতে আছে; এবং শাস্ত্রী মহাশয়

দিবে তাঁহার সাক্ষ্য। "এই আখ্যায়িকা ক'টি হইতে বিদ্যাসাগর-মানুষটির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

২

"রোগীর জগৎ"—শ্রীসুধাকান্ত দে প্রণীত। ১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীপ্রিয়নাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৪৮ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা চারি আনা। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর ও সুদৃশ্য।

"রোগীর জগৎ" গল্পের বই; আটটি ছোট গল্প এই বইটিতে আছে, প্রথম গল্পটির নামানুসারে বইটির নামকরণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি গল্প কোনো প্রসিদ্ধ মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখার তারিখ দেখিয়া মনে হয়, অধিকাংশ গল্পই বহুদিন আগে লেখা। সেই জন্যই, বাঙ্লা ছোট গল্পের যে-ধারা এখন আমরা দেখিতেছি, এই গল্পগুলি ঠিক্ সে পর্য্যায়ের নহে। আমাদের সনাতন চিরাচরিত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রাই এই গল্পগুলির বিষয় যোগাইয়াছে; এবং তাহারই মধ্যে লেখক বাঙালী জীবনের বৈচিত্র্য খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে, এবং প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই তিনি আমাদের জীবনের সুখ দুঃখের বিচিত্র সুরকে, বেদনার অনুভূতিকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন। তবে দু'একটি গল্প, যেমন রোগীর জগৎ গল্পটি, একটু একঘেঁয়ে এবং depressing ও morbid ধরণের। যাহা হউক, লেখকের গল্প বলিবার ক্ষমতা আছে, লেখার ভঙ্গিটি সুন্দর ও সাবলীল। আশা করি, গল্পগুলি পাঠকের ভাল লাগিবে। বাংলা দেশে 'গল্পের বই বিকায়না', লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। বাঙালী 'গল্প শুনিতে ভালবাসেনা, এমন হইতে পারে না'। এই স্থির বিশ্বাসে লেখক তাঁহার 'সর্ব্বোত্তম দান' পাঠকের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন; লেখকের এই আশা সফল ও সার্থক্ হোক্, এই কামনা করি।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

৩

আল্-ইস্লাম—(২য় সংস্করণ)—লেখক খান বাহাদুর আলহাজ্ মৌলবী আহ্ছানউল্লা এম্-এ; এম্-আর্-এস্, এ; আই-ই-এস্। বইখানি মোট ২২০ পৃষ্ঠা। ইহা একখানি ইস্লামধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক। লেখকের মোট বক্তব্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ইস্লাম শুধু যে অন্য যে-কোন ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তা নয়, ইস্লাম "সমস্ত ধর্ম্মের নির্য্যাস"। অন্যান্য ধর্ম্মে যা কিছু সত্য নিহিত আছে সবই ইস্লাম ধর্ম্মে পাওয়া যায়, তা বাদে ইস্লাম ধর্ম্মে এমন অনেক জিনিষ আছে যা অন্য কোন ধর্ম্মেই নেই। অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই সত্যের আংশিক বিকাশ মাত্র, ইস্লাম ধর্ম্মেই শুধু সত্যের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে। "একমাত্র ইস্লামই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সনাতন মানবীয় ধর্ম্ম।"

লেখকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে কোন রকম আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটা কথা বলতে চাই,—বইখানি ঠিক বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধী, নিরাসক্ত, সংযমী, কঠিন মন নিয়ে লেখা নয়; বইখানি লেখা হয়েছে ভক্তের উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন নিয়ে। ইস্লাম ধর্ম্মের মহত্ত্বপ্রচারের সাধু উদ্দেশ্য ঠিক এই ধরণের লেখায় সিদ্ধ হয় না—বিশেষতঃ সত্যানুরাগী উচ্চশিক্ষিত সমাজে।

সাহিত্যের দিক দিয়ে বইখানির প্রশংসা আমি করতে পারি না। ঝর্ ঝরে পরিষ্কার ভাষায় গুছিয়ে নিজের বক্তব্য বিষয়টা লেখক প্রকাশ করতে পারেন নি। গুছিয়ে না নেবার ফলে বক্তব্য বিষয় স্থানে স্থানে জড়িয়ে গেছে। ভাষায় অকারণ অজস্র আরবী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে অনেক স্থলেই লেখা দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়েছে। এই বিষয় নিয়ে আমার এক উচ্চশিক্ষিত মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বল্লেন এরকম বিষয় নিয়ে কিছু লিখ্তে গেলে কতকগুলি আরবী শব্দ ব্যবহার না করে উপায় নেই। কারণ এমন অনেক আরবী শব্দ আছে বাংলায় বা অন্য কোন ভাষায় এক কথায় যার সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এই আল্ইস্লাম বইখানি নিয়ে উল্টে পাল্টে আমার সে বন্ধুও শেষে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে এত আরবী শব্দ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিলনা।

বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত

৪

ক্ষণজন্মা ক্ষণাদেবী। শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। ৬৮।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট 'প্রতিভা' প্রেস হইতে শ্রীসুবোধকুমার দত্ত এম-এস-সি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পাশ্চাত্যে পদার্থ-বিজ্ঞানের আদর প্রচুর। প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষ-শাস্ত্রেরও ছিল তাহাই। সেই জ্যোতির্বিদ্যার মানস-তনয়া ক্ষণা। এত বড় মনস্বিনী রমণী পৃথিবীর যে কোন দেশে সর্ব্বকালেই দুর্লভ।

পতি-দেবতা সেই গৌরবের পুরস্কার দিলেন চমৎকার। নিরীহ নির্দ্দোষ মহিয়সী মহিলাকে নৃশংস হত্যা করিয়া অন্ধ পিতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন—যে পিতা শৈশবে তাম্র-কুণ্ডে সাগরজলে তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় ভাসাইয়া দেন!

ওজস্বিনী ভাষায় গ্রন্থকর্ত্রী প্রাচীন কাহিনীর ব্যাখ্যান করিয়াছেন। ভাষার গুণে বর্ণনার ভঙ্গীতে চির-পুরাতন ঘটনার নূতন রং ধরিয়াছে।

এই পুস্তকপাঠে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। উপন্যাস-পাঠে যে আগ্রহ উদ্বেগ ও হর্ষ-বিষাদের দ্বন্দ্ব মনে উদিত হয় ইহাতে তাহার অভাব নাই। গ্রন্থখানি প্রকৃতই উপভোগ্য। পরিশিষ্টে খনার বচন ও তাহার প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা সংযোগে গ্রন্থের কদর যে বাড়িয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

রোমান্টিক মুভমেন্ট্ ও মানবমন

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ইংরাজী সাহিত্যে রেণাসাঁসএর পূর্ণ-পরিণতি যখন Romantic Movementএ প্রকাশ পেল তখন এমন কতকগুলি কবি জন্মেছিলেন যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হয়েই থাকবেন। সমস্ত Movement'টার উপর নজর দিলে তার মধ্যে এমন একটি ক্রম-বিকাশ লক্ষ্য করা যায়—যার সঙ্গে আমাদের এই মানবমনের ক্রম-বিকাশের বেশ তুলনা করা যেতে পারে। এই যুগের প্রত্যেক কবি যেন মানবমনের এক একটা স্তর;—এক একটার প্রভাব এক একজন কবির ভিতরে প্রকাশিত হয়েছে। এই যে কবি-সঙ্ঘ যাঁদের প্রত্যেকের একটি করে নিজস্ব বাণী ছিল, যাঁরা প্রত্যেকেই, নিজের গড়া পথে চলেছিলেন—তাঁদের ভিতরে এই সমস্ত প্রভেদ সত্বেও একটা চমৎকার ঐক্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যা প্রত্যেক কবিকে অপরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে রেখেছে।

প্রথমেই নেওয়া যাক্ Coleridgeকে। তিনি এলেন ভূত-প্রেত, অপার্থিব বস্তু, supernatural dread নিয়ে—যেন তিনি শিশুমনের প্রতীক। ভূতের গল্প, অসম্ভাব্যের ভীতি, শীতলস্পর্শ, অশরীরী জীব, অজানা পাখী—এই হ'ল তাঁর উপাদান—যা শিশুমনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে। Ancient Mariner পড়্‌তে পড়্‌তে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে,—সেই প্রশান্ত সাগরের অশ্রান্ত জলকল্লোলে অন্ধকারময়ী রজনীর বিভীষিকা বুকের রক্ত চঞ্চল ক'রে তোলে এক অনাগত আশঙ্কায়। এখানে পেলাম মানবমনের সেই আদিম অবস্থার পরিচয় যখন সে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের কথা না ভেবে কল্পনার সাহায্য নিয়ে এক অতীন্দ্রিয় অজানা রাজ্যের সন্ধানে ব্যস্ত থাকে, যা এমন কোনও জিনিষের কথা শুনতে চায় যা মনের মধ্যে সহজ সাধারণ ভাবস্রোতের বৈচিত্র্য না তুলে এক অভূতপূর্ব্ব রহস্যের সন্ধান দেয়—অর্থাৎ মানবমনের সেই অবস্থা যখন সে অচিন্‌দেশের রাজ-

কুমারের সঙ্গে নিশুত-পুরীর রাজ-কুমারীকে জাগাতে যায়।

এই মানবমনের যখন উন্নতি হ'তে থাকে—চোখ মেলে যখন সে জগৎকে দেখ্‌তে শেখে, তখন অজানাকে ভুলে গিয়ে তার আশেপাশের সৌন্দর্য্যে সে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে। তাই দেখি Wordsworth স্বভাবের কবি। এখানে নিসর্গ-লীলা মানবমনের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে ফেলে। মানবমন যে কেবল অদ্ভুতের মধ্যে ব্যস্ত থাকে তা নয়—সে তার সম্বন্ধ খুঁজে নেয় এই মাটীর জলহাওয়ার সঙ্গে—এই ধরণীর লতাপাতা-ফলফুলে জড়িয়ে থাকে তার জীবনের প্রাণশক্তি—সে এই সুন্দরী ধরিত্রীকে ভালবাসতে শেখে। সূর্য্য অস্ত যাবার কালে যখন আকাশ রাঙিয়ে ওঠে সে হয়ত মুগ্ধ হৃদয়ে তাই দেখে, আলোছায়ার নিবিড় মিলনের ভিতর তার প্রাণের অনাহত রাগিণী আপনিই বাজতে থাকে। কোকিলের ডাকে সে বনানীর গানই শুন্‌তে পায়, বসন্তের আগমনে সে দেখে প্রকৃতির রূপ-হাসি, এমন কি বর্ষার নীল-নভঘনে সে তার সৌন্দর্য্য-বস্তু খুঁজে নেয়।··· এই হোলো মানবমনের কিশোর অবস্থা।

তারপর সে অবস্থা হারিয়ে যায় পরিণতির প্রক্রিয়ার মধ্যে। কিশোর তার কৈশোর ফেলে যৌবনের কোঠায় পা দেয়। বুকে তার অনন্ত আশা,—পেশীতে তার সতেজ শক্তি, উদ্দাম তার যৌবন বেগ, সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে সে হয় বিভোর—এই অবস্থার কবি Byron।···· প্রকৃতি আর পূজা পায় না, সে হয় তখন তার অনন্ত শক্তির আধার যার সঙ্গে তার মরণলীলা চল্‌তে থাকে। ফুলের কোমল পাপ্‌ড়িতে সেই যুবকমন আকৃষ্ট না হ'য়ে অশ্রান্ত কল্লোলিত সমুদ্রের উদ্বেল সঙ্গীতে আপনাকে সে হারিয়ে ফেলে। প্রাকৃতিক elementএর সঙ্গে বাধে তার সংঘর্ষ, তাই হয় সে বিদ্রোহী,—গড়ার দিকে লক্ষ্য না রেখে ভাঙনের মধ্যে পায় সে বিরাট আত্মতুষ্টি। আপনার তেজে, আপন গর্ব্বে, সে যেতে চায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন লঙ্ঘন ক'রে বিজয়ী বীরের মত—উদ্দেশ্যহীন ভাবে জগৎ তার কাছে আসে বিরুদ্ধ রূপ নিয়ে, সে ভয় পায় না, তাই যুদ্ধ চল্‌তে থাকে অবিরাম। জগতের প্রতিচ্ছায়াকে সে দেখে cynic'এর চক্ষে, এর (জগতের) অনন্ত মঙ্গলের প্রতি, শুভের প্রতি তার দৃষ্টি অন্ধ হয়। পৃথিবীর বুকে সে কেবল নটরাজের তাণ্ডব নর্ত্তনই শুন্‌তে পায়।···এই হোলো মানবমনের যৌবনের অবস্থা।

কিন্তু এমনভাবে কি আর চিরদিন চলে? যে প্রচণ্ড তেজে সে আপনার মধ্যে আপনাকে খুঁজতে চেয়েছিল, সে তাপ হারিয়ে যায়—সে প্রচণ্ড গতিরও হয় অবসান। তখন দৃষ্টি তার আর কেবল নিজের দিকেই থাকে না। সে কোনও অজানা দেবতার ডাক নিজের মধ্যে শুন্‌তে পায়—আর মনের সঙ্গোপন কক্ষে জেগে থাকে তার পরাজয়ের গভীর বেদনা। তাই দেখি কবিবর শেলী (Shelley) এলেন মুখে হাসি আর চোখে অশ্রু নিয়ে। জীবনে তার আঘাত জম্‌লো বিস্তর, তাই তিনি বল্লেন, আমাদের sweetest songs সেইগুলি যেগুলি saddest thoughts এর কথা বলে,—তাই তিনি বল্লেন,

> Out of the day and night
> A joy has taken flight."—

তাই তিনি west windকে ডেকে কেঁদে বল্‌ছেন, ওগো, আমায় তোমার বাঁশী করে নাও, তোমার বয়ে যাওয়ার ব্যথা আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে উঠুক করুণ সুরে। কিন্তু এখানে মানবমন আশাহীন নয়। এত ব্যর্থতার মধ্যে সে সান্ত্বনার অভাব বোধ করে না, জীবনের সুন্দর সার্থকতা তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তাই Shelley বল্লেন,

> "What if my leaves are falling like its own!
> The tumult of thy mighty harmonies
> Will take from both a deep autumnal tone
> *Sweet* though in sadness."—

ব'রে যদি যায় যাক আমার জীবন শরতের পত্রগুচ্ছের মত, তবুও যে সুর বেজে উঠ্‌বে তা' অনন্ত দুঃখের ভিতরও মধুর—মধুর।

তারপর আসে মানবমনের শেষ পরিণতির অবস্থা যেখানে তার চোখে চিরসুন্দরের দ্বার খুলে যায়—যখন সে এই জগতেরই হয়েও জগতের বাইরে বিরাজ করতে থাকে। দুঃখই হয় তার জীবনের শেষ সম্বল, কিন্তু এই ব্যথার বিষ তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না, সে তখন ব্যথার উপর দাঁড়িয়ে

কালিয়-দমন করতে থাকে। সুন্দর ও সত্যের, সুন্দর ও মহানের মধ্যে সে দেখ্তে পায় জীবনের চরম সার্থকতা। তাই Keats এসে বল্লেন,

"Beauty is truth, truth beauty'—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know—"

জীবনের যুদ্ধ যখন আস্তে আস্তে থেমে আসে, একটী একটী করে যখন তার ফোটাফুল ঝরে যায়, তখন তার সান্ত্বনা থাকে কেবল ব্যর্থতারই মাঝে—না-শোনা বাণী হয় তার কাছে মধুরতম, তার গলা চিরে এই কথাই বেরিয়ে আসে

"Heard melodies are sweet, but those unheard
Are sweeter ;—"

নির্জনতার ভাষা সে শুনতে পায়—কেন না তার ব্যথার পূজা যে সমাপন হয় এই ব্যথারই আরতি জেলে।

Keats হ'চ্ছেন দুঃখের কবি। জীবনে ব্যথা পায় নি কে?—আর কেই বা তাঁর মত ব্যথার মুহূর্ত্তক্ষণকে অমর করতে পেরেছে? তাই তিনি বলছেন যে এমন কি কেউ আছে যে "writhed not at passed joy?—এমন কি কারও ব্যথায় বোঝা আছে যা' was never said in rhyme? মনে হয় জীবনে দুঃখটাই গভীর সত্য। কিন্তু এই দুঃখই মানবমনকে এক অজানা লোকে, এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের পারে নিয়ে যায়, যেখানে কবি নিজকে হারিয়ে ফেলেন;—তিনি চলে যান যেখানে তরুণী কৃষকবালা 'রুথ' শ্যামল ক্ষেতের মাঝে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে—সেই বিদেশ-ধানের-ক্ষেতে—

The same that oft-times hath
Charmed magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in fairy lands forlorn.

আবার সঙ্গে সঙ্গে কবি ফিরে আসেন এই বর্ত্তমানের মন্দিরে—আবার বেদনা পান, কেন না, এই যে জগৎ—"where but to think is to be full of sorrow."

এই মানব মনের শেষ পরিণতি যেমন ব্যথায় বেদনায় ভরা, যেমন জীবনে তার এই কথা সত্য তেমনি সে যে সুন্দরের রাজ্যে আছে তাও তেমন সত্য। এই যে সুন্দরতমধন যা' জগতের আলোর রেখায়, আঁধারের সীমানায়, বলাকার পাখায়, বিজলীর ইঙ্গিতে, তরুণীর ইসারায়, পত্রের কম্পনে, ফুলের প্রস্ফুটনে লুকিয়ে আছে, মানব মন চায় তাকেই একান্তভাবে। কিন্তু সুন্দর সে ত' ভোগের নয়—অনুভবের, তাই আসে ব্যর্থতা, বেদনা তার সাথী। তাই বেদনায় বুক ভ'রে ওঠে শরবিদ্ধ বনের পাখীর মত। সেই জন্যে দুঃখের কবি কীট্স সবার উপরে সুন্দরের কবি—সুন্দরের পূজারী।

এই যে মহাসন্ধিস্থল—সুন্দরের ও ব্যথার মিলনের তীর্থ—এই যে মানব-জীবনের প্রয়াগ এতে অবগাহন করতে হয় সকলেরই—এয়াই জীবনের খাঁটী সত্য—ব্যথা ও সৌন্দর্য্য।

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ইরাণী

শ্রীযুক্ত গোপাললাল দে

১

লক্ষ শত বৎসরের জীর্ণ এই ধূসর ধরায়,
জল কাঁদে ছল ছল হাওয়া শোকে করে হায় হায় ;
গুমরিয়া কাঁদে মাটি মাঝে মাঝে বুক ফাটে তার !
মৃত ও জীবিত মিলি অবিরাম করে হাহাকার।

মনে কি পড়িছে কবি, এরই মাঝে নয়নাভিরাম,
মাঝে মাঝে পেয়েছিলে নন্দনের বৈজয়ন্ত ধাম ?
একটি প্রাঙ্গণ শুধু, একখানি অলিন্দ চত্বর,
একটু সঙ্কীর্ণ পথ নিরালায় স্বল্প-পরিসর,

একটি সোপান শ্রেণী, নিরজন এক কক্ষতল,
এতটুকু অন্ধকার দীপশিখা ম্লান অনুজ্জ্বল,
নিভৃত ছাদের কোণ, সাধারণ শুভ্র শয্যাখানি,
আর তাহাদের মাঝে সঞ্চারিণী ইরাণের রাণী।

অমৃত করেছ পান পারিজাত-পরিমল-চোর,
স্বর্গবাস, স্বর্গবাস, নিশ্চয় সে স্বর্গবাস তোর।

২

একদা প্রাসাদ শিরে শরতের বিচলিত বেলা,
অস্তমান রবিরশ্মি নীলসরে করে হোলি খেলা,
দারু-সিংহাসন পরে ধরণীর রাজরাণী বেশে,
লীলাভরে ধ্যানময়ী বসেছিল রাসরসাবেশে।

দীন ভৃত্য মুগ্ধ কবি মালঞ্চের লুব্ধ মালাকর,
সে স্বর্গে প্রবেশ লভি সাজাইল পুষ্প থরে থর,
গ্রীবাটি বাঁকায়ে দিল, সযতনে স্তনচূড়াপরে
অঞ্চলের কারুকার্য্য সাজাইল চারু ভঙ্গীভরে।

করপদ্ম-সনাথিনী, মণিবন্ধ বাহু-মৃণালিনী,
রাখি দিল নবরূপে জানুসন্ধি পরে তাঁর আনি,
সুরধনী-সিক্ত পদ নিজ করে রাখি হেমাঙ্গনে,
আপনা-বিস্মৃত কবি অকস্মাৎ বসিল চরণে।

ধরণী হয়েছে দীনা হারাইয়া সে অপূর্ব্ব ছবি,
নভ পটে আঁকি তাহা ধন্য হোল অস্তমান রবি।

নানা কথা

রবীন্দ্রনাথের আত্ম-পরিচয়—

শান্তি-নিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিনের অভিভাষণের মধ্যে যে আত্ম-পরিচয়টি আছে, সেটি যেমন গভীর তেমনি মনোজ্ঞ ও সরল। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীর ক্রোড়-পত্র হইতে সেটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, সত্তর বৎসরে পৌঁছবার অবকাশ না দিতেন, তাহলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানাখানা ক'রে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্ত্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানাকর্ম্মের উপলক্ষ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানাজনের গোচর হয়েচে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই—একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাইনে হ'তে নববঙ্গে নবযুগের চালক'। সে কথা সত্য বলেছিলাম। শুভ্র নিরঞ্জনের যারা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্ম্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য, তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানাবর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন; আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমি নাচি, নাচাই, হাসি, হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর, আমরা তাঁরি দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে' তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবী রাখিনে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুইধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য্য, যে ফুল পাতা, যে পাখীর গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে-বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে সুখদুঃখের আঘাত-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়। অন্য বিশেষণও লোকে আমাকে দিয়েছেন; কেউ বলেছেন, তত্ত্বজ্ঞানী, কেউ আমাকে ইস্কুল-মাষ্টারের পদে বসিয়েছেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কেবল মাত্র খেলার ঝোঁকেই ইস্কুলমাষ্টারকে এড়িয়ে এসেছি—মাষ্টারী পদটাও আমার নয়। বাল্যে নানা সুরের ছিদ্রকরা বাঁশি হাতে যখন পথে বেরলুম তখন ভোরবেলায় অস্পষ্টের মধ্যে স্পষ্ট ফুটে উঠতে চাচ্ছিল, সেইদিনের কথা মনে পড়ে। সেই অন্ধকারের সঙ্গে আলোর প্রথম শুভদৃষ্টি; প্রভাতের বাণীবন্যা সেদিন আমার মনে তার প্রথম বাঁধ ভেঙেছিল। দোল লেগেছিল চিত্তসরোবরে, ভালো করে বুঝি বা না বুঝি, বলতে পারি বা না পারি, সেই বাণীর আঘাতে বাণীই জেগেছে। বিশ্বে বিচিত্রের লীলায় নানা সুরে চঞ্চল হয়ে উঠচে নিখিলের চিত্ত, তারি তরঙ্গে বালকের চিত্ত চঞ্চল হয়েছিল, আজো তার বিরাম

নেই। সত্তর বৎসর-পূর্ণ হ'ল, আজো এ চপলতার জন্য বন্ধুরা অনুযোগ করেন, গাম্ভীর্য্যের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার ফরমাসের যে অন্ত নেই। তিনি যে চপল, তিনি যে বসন্তের অশান্ত সমীরণে অরণ্যে অরণ্যে চির-চঞ্চল। গাম্ভীর্য্যে নিজেকে গড়খাই করে আমি তো দিন খোয়াতে পারিনে। এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলা-সহচর। আমি কি করেছি, কি রেখে যেতে পারব, সেকথা জানিনে। স্থায়িত্বের আবদার করব না; খেলেন তিনি, কিন্তু আসক্তি রাখেন না; যে খেলাঘর নিজে গড়েন, তা আবার নিজেই ঘুচিয়ে দেন। কাল সন্ধ্যাবেলায় এই আম্রকাননে যে আলপনা দেওয়া হয়েছিল, চঞ্চল তা এক রাত্রের ঝড়ে ধুয়ে মুছে দিয়েছেন, আবার তা নতুন করে আঁকতে হ'ল। তাঁর খেলা-ঘরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি, তা মহাকাল সংগ্রহ করে রাখবেন এমন আশা করিনে। ভাঙা খেলনা আবর্জ্জনার স্তূপে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি সেই সময়টুকুর মধ্যেই মাটির ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি সেই যথেষ্ট। তার পরের দিন রসও ফুরোবে, ভাঁড়ও ভাঙবে, কিন্তু তাই বলে ভোজ ত দেউলে হবে না। সত্তর বৎসর পূর্ণ হবার দিন আজ আমি রসমজ্ঞের দোহাই দিয়ে সবাইকে বলি যে, আমি কারু-চেয়ে বড় কি ছোট সেই ব্যর্থ বিচারে খেলার রস নষ্ট হয়; পরিমাপকের দল মাপকাঠি নিয়ে কলরব করচে, তাদেরকে ভোলা চাই। লোকান্তরে খ্যাতির যে হরির লুঠ ধুলোয় ধুলোয় লোটায়, তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে চাইনে। মজুরীর হিসেব নিয়ে চড়া গলায় তর্ক করবার বুদ্ধি যেন আমার না ঘটে।

এই আশ্রমের কর্ম্মের মধ্যেও যেটুকু প্রকাশের দিক তাই আমার; এর যে যন্ত্রের দিক যাঁরা তা চালনা করছেন। মানুষের আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাকে আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই তার রূপ-ভূমিকার উদ্দেশে একটি তপোবন খুঁজেছি। নগরের ইট কাঠের মধ্যে নয়, এই নীলাকাশ উদার প্রান্তরে এই সুকুমার বালক বালিকাদের লীলাসহচর হ'তে চেয়েছিলাম। এই আশ্রমে প্রাণসম্মিলনের যে কল্যাণময় সুন্দর রূপ জেগে উঠছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। এর বাইরের কাজও কিছু প্রবর্ত্তন করেছি, কিন্তু সেখানে আমার চরম স্থান নয়, এর যেখানটিতে রূপ সেখানটিতে আমি। প্রাণের অব্যক্ত বেদনা যেখানে প্রকাশ খুঁজে ব্যাকুল; আমি তার মধ্যে। এখানে আমি শিশুদের যে ক্লাস করেছি সেটা গৌণ—প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে শিশুদের সুকুমার জীবনের এই যে প্রথম আরম্ভরূপ, এদের জ্ঞানের অধ্যবসায়ের আদি সূচনায় যে উৎসুক দৃষ্টি, যে নবোদ্গত উদ্যমের অঙ্কুর, তাকেই অবারিত করবার জন্য আমার প্রয়াস, না হলে আইনকানুন সিলেবাসের জঞ্জাল নিয়ে মরতে হ'ত। এই সব বাইরের কাজ গৌণ, সেজন্য আমার বন্ধুরা আছেন। কিন্তু লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, কখনো ছুটি দিয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা। এর চেয়ে গম্ভীর আমি হ'তে পারব না; গম্ভীরতা বাড়িয়ে যাঁরা আমাকে উচ্চ মঞ্চে বসাতে চান, তাঁদের আমি বলি, আমি নীচেকার স্থান নিয়েই জন্মেছি, প্রবীণের প্রধানের আসন থেকে খেলার কর্ত্তা আমাকে ছুটি দিয়েছেন। এই ধুলোমাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি।"

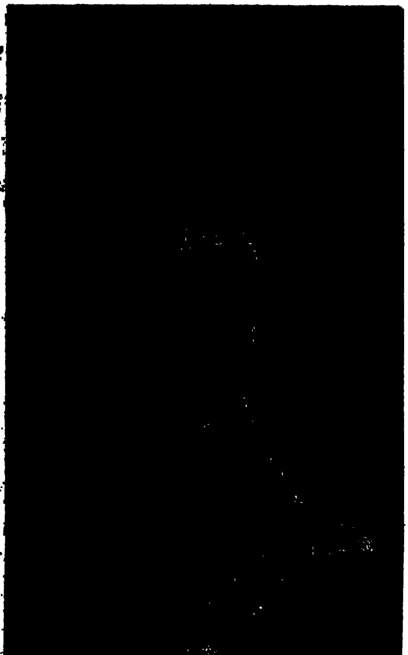
২৫এ বৈশাখ, ১৩৩৮।
শান্তিনিকেতন

[শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত ও কবি কর্ত্তৃক সংশোধিত]

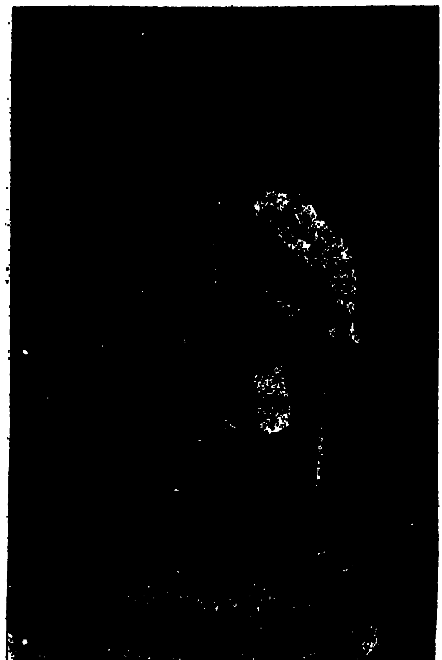
শিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু

বিলাতের বকিংহাম প্যালেসের প্রসাদোপরত পাদ্রী মরাম এড ওয়ার্ড, রাণী আলেকজান্দ্রা, সর্ব্বত্রার সবাই পঞ্চম জর্জ, ও মহারাণী মেরীর যে তৈল চিত্র আছে তাহার

অনুরূপ চারখানি তৈলচিত্র করাইয়া দিল্লীর লাট প্রাসাদের South State Drawing-room সজ্জিত করা হইবে স্থির হয়। উক্ত কার্য্যের ভার বিলাতের কোনও শিল্পীর উপর না দিয়া ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে দুইজন চিত্রকর নির্ব্বাচিত করেন। বঙ্গদেশ হইতে শ্রীযুক্ত অতুল বসু এবং বম্বে প্রদেশ হইতে শ্রীযুক্ত জে, এ, লালকাকা নির্ব্বাচিত হন এবং তদনুযায়ী ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীযুক্ত অতুল বসু ইংলণ্ড গমন করেন। সে সময়ে আমরা এ সংবাদ বিচিত্রার পাঠকগণকে দিয়াছিলাম এবং তদুপলক্ষে ১৩৩৬ সালের চৈত্র সংখ্যা বিচিত্রায় অতুলবাবুর শিল্পী-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁহার অঙ্কিত কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল।



শ্রীযুক্ত অতুল বসু অঙ্কিত সম্রাজ্ঞী মেরীর তৈলচিত্র



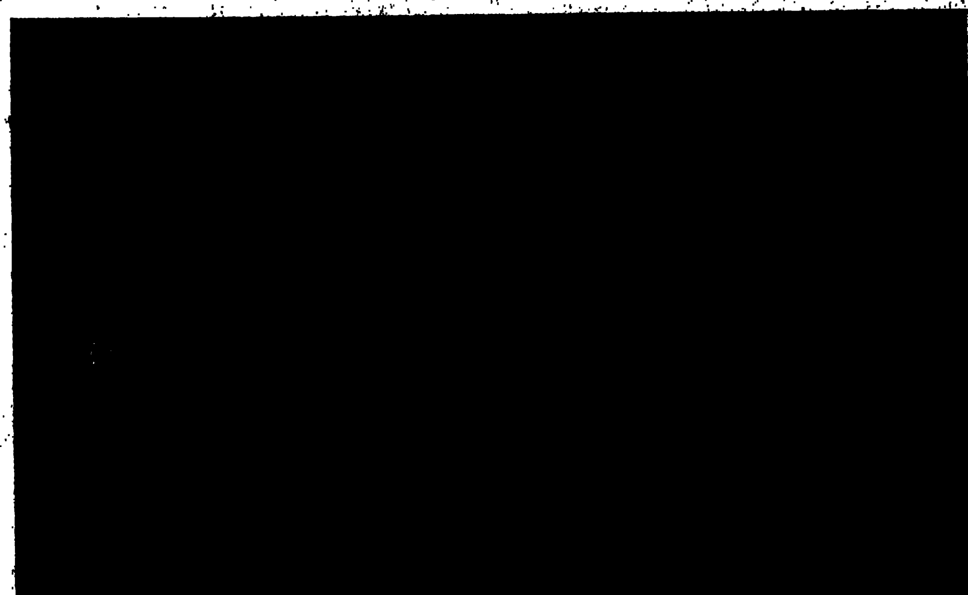
শ্রীযুক্ত অতুল বসু অঙ্কিত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের তৈলচিত্র

প্রাচ্যকলানুযায়ী কোনও চিত্র অথবা শিল্প-কার্য্য করাইবার প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে ভারতীয় চিত্র-শিল্পীগণ ভারত গভর্ণমেণ্ট অথবা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া ফরমাশ পাইবার সম্মান লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুযায়ী চিত্রাঙ্কণ বিষয়ে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতীয় শিল্পী নির্ব্বাচিত হওয়া এই প্রথম। এইরূপে ভারতীয় শিল্পীর প্রতিভা স্বীকার করিবার জন্য লর্ড আরউইন্ নিশ্চয়ই ভারতবাসীর ধন্যবাদার্হ।

চারখানি চিত্রের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞী মেরীর চিত্র দুইখানি নকল করিবার ভার পড়ে অতুল বাবুর উপর। বাকি দুইখানি লালকাকার অংশে পড়ে। চিত্রগুলি দৈর্ঘ্যে নয় ফুট ও প্রস্থে ছয় ফুট। প্রতিকৃতিগুলিও সেই মাপে করা হইয়াছে। রাণী মেরীর মূল তৈল চিত্রটি বিখ্যাত চিত্রকর Sir William Llewellyn P. R. A. কর্ত্তৃক অঙ্কিত,—বাকি তিনখানি আঁকিয়াছিলেন পরলোকগত Sir Luke Fildes R. A.।

লণ্ডনের বকিংহাম্ প্যালেসের ব্লু ড্রয়িং রুমে অতুলবাবুর Studio নির্দ্দিষ্ট হয়। সেইখানেই তিনি তাঁহার অংশের চিত্র দুটির অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত করেন। অনুরূপ দুইটি এত সুন্দর হইয়াছে যে, মূল চিত্রের সহিত পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। এই চিত্র দুইটি অঙ্কিত করিয়া অতুলবাবু ইংলণ্ডের অনেক চিত্রকরের নিকট

হইতে, বিশেষতঃ Sir William Llewellyn P. R. A. Sir Edwin Lutyens K. C. I. E., R. A. এবং Glyn Philpot R. A.-র নিকট হইতে অত্যুচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। একটি ছবি দেখিয়া ঠিক সেইরূপ আর একটি ছবি আঁকা যত সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। মাপ জোক্ এবং অনুরূপ রং ব্যবহার করিয়া মূল চিত্রের যথেষ্ট কাছাকাছি ("near enough") যাওয়া যায় বটে, কিন্তু আরও কাছাকাছি ("nearer still") যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সেই



ব্লু ড্রয়িং রূম্—বকিংহাম্ প্যালেস, লণ্ডন

শ্রীযুক্ত অতুল বসু তাঁহার অঙ্কন-কক্ষে বসিয়া আছেন।

সহজ সুগম অংশের সীমার পর যে সামান্য দুরধিগম্য অংশ আছে সেই খানেই শিল্পীর প্রতিভার বিশেষত্ব নিহিত থাকে, যাহা প্রতিকৃতির মধ্যে সঞ্চার করা অত্যুচ্চ ক্ষমতাসাপেক্ষ। টিশিয়ান্ এবং অপরাপর বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর চিত্রাদির যে-সকল নকল ইয়োরোপের আর্ট গ্যালারীগুলিতে দেখা যায় তন্মধ্যে লেন্ব্যাক্ (Lenback)-কৃত প্রতিকৃতিগুলিকেই নকল বলা যায়, অন্যগুলি শুধু মাপ-জোকের নকল।

বকিংহাম্ প্যালেসে অতুলবাবুর কার্য্য পরিদর্শন করিতে গিয়া নূতন দিল্লীর রচয়িতা পূর্ব্বোক্ত স্যর্ এড্উইন্ লাটিয়েন্স্ এতদূর সন্তুষ্ট হন যে, তিনি বৈঠক দিয়া অতুলবাবুর দ্বারা তাঁহার একটি তৈলচিত্র করাইয়াছেন। তাহা ছাড়া বিলাতে অবস্থানকালেই অতুলবাবু কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের জন্য ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা অধ্যাপক H. M. Percival-এর একটি তৈলচিত্র আঁকিয়া দিবার ফরমাশ্ পান। এ সমস্তই তাঁহার উচ্চ শিল্প-প্রতিভার পরিচায়ক। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী অতুলবাবুকে বকিংহাম প্যালেসে গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রিত করিয়া সম্মানিত করেন।

লর্ড আরউইন ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে অতুলবাবু স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। লর্ড এবং লেডী আরউইন্ কর্তৃক আহুত হইয়া দিল্লীর লাট প্রাসাদে তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ে সমাদরের সহিত অতুলবাবুকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অঙ্কিত চিত্র দুটির বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলার গবর্ণর স্যর্ ষ্ট্যান্লি জ্যাক্সন্‌ও অতুলবাবুকে বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছেন।

বড়লাট সাহেবের মিলিটারী সেক্রেটারী Col. Harveyর নিকট হইতে অতুলবাবু এই সম্পর্কে যে পত্রাদি পাইয়াছেন তাহার মধ্য হইতে একটি সমগ্র পত্র এবং দুইটি পত্রের অংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে অতুলবাবুর

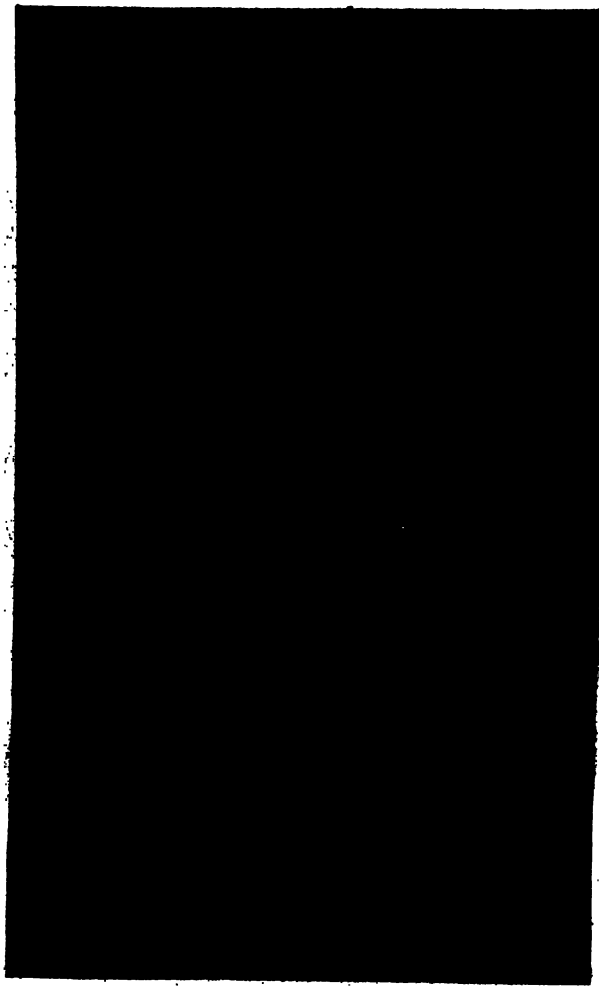
D. O. No. 6347

Military Secretary
to the Viceroy.

The Viceroy's House
NEW DELHI
17th November, 1930.

Dear Mr. Atul Bose,

The portraits which you have painted of



দ্য ড্রয়িং রুম্—বকিংহাম্ প্যালেস্

মধ্যে তাঁহার অঙ্কন-কক্ষে চিত্রকর অতুল বসু দণ্ডায়মান। অদূরে সপ্তম এডওয়ার্ডের চিত্রের পার্শ্বে তাঁহার পরিচারক দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

সম্পাদিত কার্য্যের সফলতা কিরূপ হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইবে।

Her Majesty Queen Mary and King Edward have arrived and are already framed and

in position in the South State Drawing Room.

They look very well indeed, and Their Excellencies are both very pleased with them. They desire me to offer you their warm congratulations on the success of your work and to tell you how pleased they are with the result.

I hope that when you return to India you will be able to come to Delhi sometime and see them for yourself.

Yours very truly

(Sgd.) C. O. Harvey.

ATUL BOSE ESQ.
C/O. Messrs. Thos. Cook & Son,
Berkeley St, Piccadilly,
London W. I.

* * *

from letter of Col. Harvey M. S. V. to Atul Bose

I will also leave a note for him (M. S. V.) that, in the event of any artistic works being required, he could not do better than communicate with you.

* * * The work has been done quite excellently and Mr. Bose has earned the praise of all the eminent painters both in England and India who have seen his portraits.

I am directed by His Excellency the Viceroy *to give* Mr. Bose *this letter not* only to record his appreciation of his work but also in the hope that it may enable him to obtain commissions from any who may be desirous of commissioning an artist.

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অতুল বসু সেখানকার প্রতাপশালী কয়েক জন শিল্পীর সুপারিশে একটি চিত্রবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে কিছু দিন যোগ দিয়া পুরাতন অপরিচ্ছন্ন চিত্রের পুনরুদ্ধার ও নূতন চিত্রের সংরক্ষণ বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার এই নবলব্ধ জ্ঞান ভারতবর্ষের চিত্র-জগতে বিশেষ কল্যাণ সাধন করিবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ

আজ চার বৎসর হইল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে, কতিপয় উৎসাহী ছাত্র-বৃন্দের উদ্যমে প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই চার বৎসরে, রবীন্দ্র-পরিষদের খ্যাতি কলিকাতার সাহিত্য-সমাজে প্রকৃত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; বিশেষতঃ 'বিচিত্রা'র পাঠক-পাঠিকারা এই পরিষদে পঠিত অনেক গুলি প্রবন্ধের সহিতই সুপরিচিত। তাই এখানে নূতন করিয়া রবীন্দ্র-পরিষদের কোনো পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কয়েকটি প্রবন্ধ একত্র করিয়া 'কবি-পরিচিতি' নাম দিয়া একখানি দুই শত পৃষ্ঠার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। দুই শত পৃষ্ঠার মধ্যে অবশ্য মাত্র নয়টির বেশী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয় নাই, কিন্তু প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ লেখকদের লেখা উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-আলোচনা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও কিছু লেখা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে,—প্রথমেই একটি 'সম্প্রতি-রচিত কবিতা,' পরে পরিষদে দুইটি মৌখিক অভিভাষণের লিখিত অনুবৃত্তি,

বইখানি যে সর্ব্বতোভাবেই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে,—এ কথা বোধ হয় বলাটাই অতিরিক্ত।

বাংলা-সাহিত্যে আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা আমরা যদি ঠিক গ্রহণ করিতে পারি এবং যথোচিত কাজে লাগাইতে পারি, তবে বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ যে খুবই উজ্জ্বল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইজন্ত আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বাংলা-সাহিত্যে উচ্চ-অঙ্গের সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করা। মানব-জীবনের চরম আনন্দ যে-সৃষ্টিকার্য্যে, সেই সৃষ্টি-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্ত প্রভূত উপকরণ রবীন্দ্রনাথ ছড়াইয়া দিয়াছেন বাঙালীর ভাব-জীবনে; সেই সব উপকরণের যথাযথ ব্যবহারের জন্ত যে সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শের প্রয়োজন, রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা করাটাই সেই আদর্শের সন্ধান-লাভের একটা প্রকৃষ্ট উপায়। এমন কথা বলিতেছি না, যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই বাংলা-সাহিত্য চিরকাল তাহার আদর্শ অনুসন্ধান করিবে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর মনকে যে জায়গায় রাখিয়া যাইবেন, বাঙালীর মন ঠিক সেই জায়গায় নিশ্চল হইয়া থাকিবে, আর নড়িবে না। কেহই ইহা আকাঙ্ক্ষা করেন না। আমাদের বক্তব্য এই যে, আজ বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—তাহার সার্থকতা শুধু আপনার গৌরবের মধ্যেই আবদ্ধ নহে, ভবিষ্যতের অন্ধকার পথেও সেই আদর্শ আলোক-সম্পাত করিতে পারে,—যদি উপযুক্ত সমালোচনার দ্বারা আমরা সেই আলোক জ্বালাইয়া রাখিতে পারি। সকল সাহিত্যেই সর্ব্বকালেই সমালোচনার প্রয়োজন,—রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় মনীষীর আবির্ভাবের পরে সেই সমালোচনার প্রয়োজন বহুগুণ বাড়িয়া যায়। নিয়ন্ত্রিত ভাবে এই সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করিতে বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্র-পরিষদ অগ্রণী, তাই রবীন্দ্র-পরিষদ বাংলার সাহিত্য-সমাজের বিশেষ ধন্তবাদার্হ। কবি-পরিচিতি বইখানির যে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্ম-বাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবেই সার্থকতা,—তা' নয়;—ইহার সার্থকতা গভীরতর,—পাঠক-সমাজে বইখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দ্রুত বাজারে বইখানি কতদীঘ্র কাটিয়া যায় ইহা দেখিয়া যেন কেহ বইখানির সমাদরের পরিমাপ না করেন। দুঃখের বিষয় নানাকারণে আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে বই-কেনা অভ্যাসটা বড়ই কম। তাই কোনো পুস্তকের কোনো একটি সংস্করণ নিঃশেষ হইতে দেরী হইতেছে দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে বইখানি জনসাধারণের নিকট সমাদর লাভ করে নাই। আমরা অনেকেই পুস্তকাদি, সংবাদ-পত্র, মাসিক-পত্রিকা ইত্যাদি অপরের নিকট চাহিয়া চিন্তিয়া পড়িয়া থাকি; ইহাতে সৎসাহিত্যের সমাদর যদি বা করা হয়, সৎসাহিত্য-সৃজনের যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হয় না। তাই আমরা অন্তরে অন্তরে যতই কামনা করি না কেন, একটু দুরাশা না করিলে বোধ হয় ঠিক বলিতে পারি না যে বৎসরে বৎসরে বাংলাদেশের পাঠক-সাধারণ রবীন্দ্র-পরিষদের নিকট এই রকম একখানি করিয়া পুস্তক দাবী করিবে।

কিন্তু একথা বলিতে পারি যে বাহিরের অর্থনৈতিক জগতে একটা সুস্পষ্ট প্রকাশ না থাকিলেও এই দাবী জন-সাধারণের অন্তরে অন্তরে আছে। কেন-না যাহা প্রয়োজন, অন্তরের মধ্যে তার একটা দাবী থাকেই,—বাহিরে স্পষ্ট করিয়া দাবী প্রকাশ করিতে না পারিলেও। রবীন্দ্র-পরিষদ হইতে প্রতি বৎসরেই যদি এই রকম একটি করিয়া পুস্তক প্রকাশিত হয়, তবে আমরা সকলেই সেই বই একখানি করিয়া কিনি আর নাই কিনি, অন্তরে অন্তরে যে পুলকিত হইব, এবং না কিনিলেও যে অন্তত চাহিয়া চিন্তিয়া একখানি সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া ফেলিব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের অন্তরের প্রয়োজন ও বাহিরের প্রকাশ্য দাবীর মধ্যে এই যে অসামঞ্জস্য, ইহার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী অবশ্য দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা। দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থার যথোচিত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে দেশের আবহাওয়া জাতীয় শিল্প ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির অধিকতর অনু-কূল হইবে, ইহা আশা করা যায়; কিন্তু ইতিমধ্যে এই দারুণ অর্থকষ্টের দিনেও যাহারা ক্ষতির আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়াও শিল্প ও সাহিত্য-চর্চ্চার দ্বারা জাতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষণা মহত্তর ও বিস্তীর্ণতর করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টা সামান্ত হইলেও যাহাতে ব্যর্থ না হয়, সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শিশুর চরকা-কাটা

নীচে যে ছবিটি দিলাম, তাহা পাঠকের মনে কিছু বিস্ময় উদ্রেক করিতে পারে। যে শিশুটি চরকায় পরিষ্কার সূতা কাটিতেছে, তাহার বয়স মাত্র পনেরো মাস। এলাহাবাদের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মাণিকলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র।



পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা জীবিতা দশজন নারী

নিউ ইয়র্ক কমিউনিটি চর্চ্চের পাদ্রী Rev. John Haynes Holms সম্প্রতি পৃথিবীর জীবিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা দশজন নারীর একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। বিচিত্রার পাঠকবর্গের নিকট তালিকাটি কৌতুহলোদ্দীপক হইতে পারে মনে করিয়া আমরা নিম্নে উহা মুদ্রিত করিলাম।

(১) Jane Adams—আমেরিকার [illegible] সমাজ-সেবিকা, ইংলণ্ডে "Plum-[illegible] Jane" নামে পরিচিত; সম্প্রতি ইংলণ্ড পরিভ্রমণ কালে বিশেষ একটি সজ্জা ব্যবহার করিবার জন্য।

(২) Annie Besant—সুপ্রসিদ্ধা থিওসফিষ্ট।

(৩) Mme. Curie—ফরাসী বৈজ্ঞানিক।

(৪) Emma Goldman—সুবিখ্যাতা শ্রমিক-নেত্রী।

(৫) Helen Keller—মূক এবং অন্ধদের শিক্ষয়িত্রী এবং লেখিকা।

(৬) সরোজিনী নাইডু—কবি এবং ভারতবর্ষের জাতীয় নেত্রী।

(৭) Edna St. Vincent—স্ত্রী-কবি।

(৮) Margaret Sanger—লেখিকা এবং সমাজ-সেবিকা।

(৯) Singrid Undest—নরওয়ের বিখ্যাত লেখিকা।

(১০) Catherine Breshkovsky—রুশ বিপ্লবের জননী।

এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বোম্বাইয়ের এই সুপ্রসিদ্ধ ইনসিওরেন্স কোম্পানীটির ১৯৩০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে শেষ বর্ষের [illegible] বিবরণী পাঠ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উক্ত বর্ষের কার্য্য পরিচালনার ফলে ইঁহাদের সুনাম ও প্রসিদ্ধি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া বৃদ্ধিই পাইয়াছে। সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস [illegible] কোম্পানীর টাকা খাটাইবার প্রণালী, আর ব্যয়ের [illegible] গচ্ছিত অর্থ ও সিকিউরিটির পরিমাণ প্রভৃতির উপর [illegible] করে। এই সকল বিষয়গুলির হিসাবে পরীক্ষা [illegible] দেখিলে দেখা যায় যে, এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া [illegible] এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের অবস্থা অতিশয় [illegible] জনক।

আলোচ্য বর্ষে এই কোম্পানীর আয় [illegible] ৬৭,১০,৫২২ টাকা ও সুদের হিসাবে ১৪,৭৬[illegible] টাকা, অর্থাৎ মোট ৮১ লক্ষেরও অধিক হইয়াছিল; [illegible] চালনায় ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ১০,৮৪,৩৫৬ টাকা। [illegible] মৃত্যুর জন্য কোম্পানীকে দিতে [illegible]

৯,৯২,১৭৫ টাকা ও মেয়াদী বীমার বাবৎ ১৮,৫৯,৬৫২ টাকা। কোম্পানীর সম্পত্তির মোট মূল্য সাড়ে তিন কোটি টাকারও অধিক। ঐ বৎসরে কোম্পানী ১,৬২,১৯,৬৭৯ টাকার বীমার জন্য ৯৯৮৩ খানি আবেদন পাইয়াছিলেন, এবং ৭৮০৩ খানি পলিসিতে ১,৪০,০২,১৩৫ টাকার বীমা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

মেস্যার্স ডি, এম, দাশ এণ্ড সন্স লিমিটেড বহুদিন হইতে এই কোম্পানীর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এজেন্টস্। মিঃ দাসের মৃত্যুর পর হইতে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন এই চীফ এজেন্সী পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন।

ইঁহার মত কার্য্যনিপুণ ও উচ্চ সংগঠনশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির পরিচালনায় বঙ্গদেশে এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমরা এই দেশী কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

আমাদের নিবেদন ও বিচিত্রার পঞ্চম বর্ষ

ভগবানের কৃপায় এই জ্যৈষ্ঠ মাসে বিচিত্রার চতুর্থ বর্ষ সমাপ্ত হইল এবং ইহার পর হইতেই পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইবে। বিচিত্রাকে তাহার আদর্শ মত চালাইতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই—কিন্তু এ কথাও আমরা অনুভব করি যে, নানাপ্রকার অসুবিধা এবং বাধাবিঘ্নের জন্য আমাদের সঙ্কল্প অনুযায়ী বিচিত্রার উন্নতিসাধন আমরা করিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে বিচিত্রা পরিচালনার জন্য আমরা যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি তাহাতে বোধহয় আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, পঞ্চম বর্ষে আমাদের সঙ্কল্প সফল করিতে পারিব। কিন্তু সফলতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ সফল হওয়া, সুতরাং এ বিষয়ে উপস্থিত অধিক কিছু বলাও অসঙ্গত মনে করি। শুধু এই কথাটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বাংলার লেখকলেখিকাগণের মধ্যে যাঁহারা শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা যেরূপ সদয় প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি তাহাতে আমরা বিচিত্রার পাঠকমণ্ডলীকে যে আশ্বাসটুকু দিলাম তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা সানন্দে জানাইতেছি যে, সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র মিত্র এম-এ, ডি-লিট্ ঘনিষ্ঠ সূত্রে আমাদের সহিত যোগ দিয়াছেন। তাঁহার সহযোগিতায় এবং কর্ম্মোদ্যমে বিচিত্রা সৌষ্ঠবের সহিত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে তাহা আশা করি।

বিচিত্রার অনুরাগী বহু গ্রাহক ইহারই মধ্যে পঞ্চম বর্ষের মূল্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা না পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ যে, ২৫শে আষাঢ়ের মধ্যে তাঁহারা যেন মণি-অর্ডারে পঞ্চম বর্ষের মূল্য মায় ডাক মাশুল ৬৷৹ টাকা পাঠাইয়া দেন, অন্যথা পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যা তাঁহাদের নামে ভি পি যাইবে ও অনর্থক ভি পি খরচ লাগিবে। যে সকল গ্রাহক কোনো কারণে পঞ্চম বর্ষে বিচিত্রার গ্রাহক থাকিবেন না স্থির করিয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক নম্বর সহ পত্র লিখিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইলে অনর্থক ভি পি পাঠাইয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।

মণি-অর্ডারে টাকা পাঠাইবার সময়ে কুপনে পুরাতন গ্রাহকগণ "পুরাতন" ও নূতন গ্রাহকগণ "নূতন"—এই কথা দুটি যথা-প্রয়োজনে লিখিয়া দিলে আমাদের বিশেষ সুবিধা হয়। নচেৎ পুরাতন গ্রাহকের নিকট হইতে পূর্ব্বে বার্ষিক মূল্য পাইয়াও কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার ভি পি পাঠাইয়া আমরা অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হই।

ঠিকানা পরিবর্ত্তন

৬এ, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে বিচিত্রা-কার্য্যালয় ১৪৯, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট শ্যামবাজার, কলিকাতা প্রশস্ততর গৃহে উঠিয়া আসিয়াছে। অতঃপর লেখক, গ্রাহক, এজেণ্ট ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহ করিয়া নূতন ঠিকানায় চিঠি-পত্র, মণি-অর্ডার, প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন।

আমাদের ফোন নং বড়বাজার ৫০৭

Edited by Srijut Upendranath Ganguli. Printed by Srijut Sarat Chandra Mukherjee at the Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpur Road, Calcutta and published by the same from 149, Raja Dinendra Street, Calcutta.